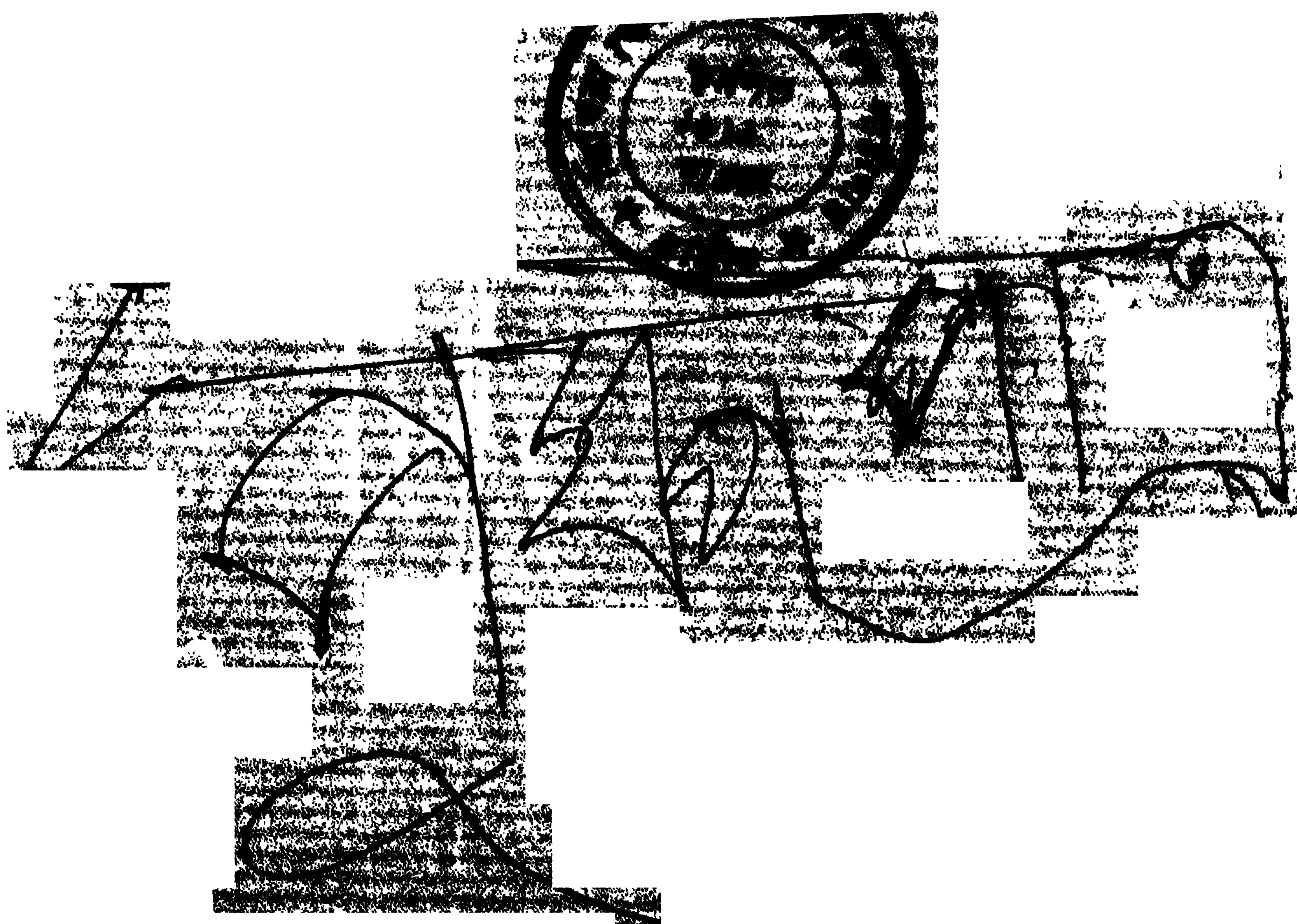
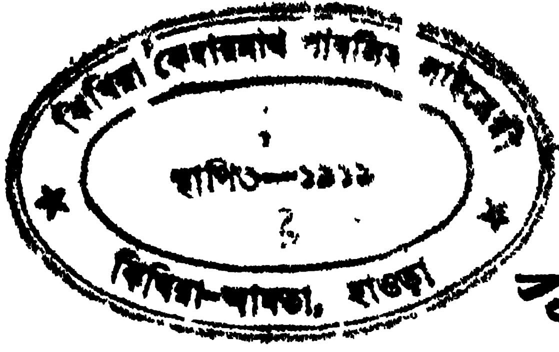






সূচীপত্র

বৈশাখ হইতে চৈত্র, ১৩৩৮

(লেখক লেখিকার নামানুসারে)



৫ম বর্ষ | বৈশাখ, ১৩৩৮ | ১ম সংখ্যা

নব-বর্ষে

অনেক আশা-নিরাশা, হর্ষ-বিষাদের মধ্য দিয়া প্রতি বৎসরই যেমন পুরাতন বর্ষ বিদায় হয় এবং অনেক উজ্জল আশার ভিতর দিয়া নববর্ষের আগমনকে বরণ করা হয় এবারও পুরাতনকে তেমনি ভাবেই বিদায় দিয়া আমরা নূতন বছরকে বরণ করিয়া লইতেছি। নিখিল কালের প্রবাহে বর্ষ পরিক্রমণ একটা সামান্য বুদ্বুদের তুল্য হইলেও মানুষের স্বল্প স্থায়ী জীবনে এক একটা বর্ষ কম রেখাপাত করিয়া যায় না। বিশেষতঃ এই সময়ে—যখন যুগ পরিবর্ত্তনকারী রাষ্ট্রীয় উদ্বেলতা জাতিকে প্রতিনিয়ত আঘাতে সচেতন রাখিতেছে, যখন বিশ্বগ্রাসী প্রবল ক্ষুধার তরঙ্গে ভারত হাবুডুবু খাইতেছে, যখন তাহার স্বপ্ন-বিলাস সব ভাঙ্গিয়া আসিতেছে!

এমন সময়ও সাহিত্যের মধ্য দিয়াই আমরা বাংলার নর-নারীকে আমাদেরই প্রাণের কথা, হর্ষ-বিষাদ, আশা-নিরাশার কথা জানাইতে যাইতেছি। প্রতিদিন দেশের শিক্ষিত লেখক-লেখিকাদের মনে যে চিন্তার তরঙ্গ উঠিতেছে—তাহারই প্রকাশ আমরা করিতেছি। ইহার সঙ্গে দেশের অন্তরাত্মার যোগ কতখানি তাহা পাঠক-পাঠিকারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বাংলার মত নিরক্ষর ও স্বদেশী ব্যবসায় শূন্য দেশে মাসিক সাহিত্য প্রচার করিয়া দু'একজন ভাগ্যবান কিঞ্চিৎ লাভবান হইলেও অনেকেই যে বিপুল ক্ষতি সহ্য করিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ক্ষতির মধ্য দিয়াই বাংলার সাহিত্য-জীবনের স্পন্দন শোনা যাইতেছে—ইহাই পরম লাভ।—এই ক্ষতির রাজ্যেও পুষ্পপাত্রের পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ আমাদিগকে নিরাশার মধ্যেও যথেষ্ট আশা দিতেছে।—

আজিকার নববর্ষে পুষ্পপাত্রের জনকস্বরূপ, প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্রকে মনে পড়িতেছে। প্রিয়তমা কন্যা পুষ্পের স্মৃতি জীবন্ত করিতে তিনি তাঁহার আজীবনের সাহিত্য-সাধনাকেও মূর্ত্ত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন এই পুষ্পপাত্রের মধ্যেই—আজ কন্যা ও জনক দু'জনারই স্মৃতির অমর নিদর্শন হইয়াছে এই পুষ্পপাত্র।—

যে সব ক্ষমতাশালী লেখক-লেখিকার সাহায্য আমরা প্রতি মাসে নূতন ভাব সম্পদের অর্ঘে পাইতেছি—আজ নব বর্ষের প্রারম্ভে তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ জানাইতেছি। আর যাহারা পুষ্পপাত্রকে জীবন্ত রাখিবার জন্য গ্রাহক-গ্রাহিকা হইয়া বা বিজ্ঞাপন দিয়া ইহাকে সাহায্য করিতেছেন তাঁহাদেরও শত ধন্যবাদ জানাইতেছি।

—আশার মধ্য দিয়াই আমরা নববর্ষকে বরণ করিয়া লইতেছি, আমাদের সে আশা সফল এবং পুষ্পপাত্রকে উত্তরোত্তর আরো সমৃদ্ধ করিতে পারেন—লেখক-লেখিকা, ও গ্রাহক-গ্রাহিকারাই। আমরা সব সময়ই তাঁহাদের মনস্তুষ্টির সাধ্যমত চেষ্টা করিব—বিনিময়ে তাঁহাদের সহৃদয় সহানুভূতি পাইলেই আমাদের সকল প্রচেষ্টা সার্থক হইবে।

মর্ম্মর

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

মর্ম্মর! মর্ম্মর! মনোহর মর্ম্মর
মর্ম্মের নর্ম্মের শোনো স্বর থর্ থর্!
কাঁপে মন, কাঁপে বন, পুলকের শিহরণ,
কান ভ'রে প্রাণ ভ'রে করে সুর বিতরণ!
ভরে সুখ, ভরে দুখ, ভরে মোর যৌবন,
চারি ভিত্ ভ'রে প্রীত্ গায় গীত যৌবন!
মনোহর মর্ম্মর— শোনো স্বর থর্ থর্!

মর্ম্মর! মর্ম্মর! তপতীর মর্ম্মর!
চুম্বনে ঝন্ ঝুন্ কপোতীর অম্বর!
কুঞ্জ কি ঘন-শ্যাম, মুঞ্জরী অভিরাম!
দোল্ সখী, হিন্দোলে তান ধরে অবিরাম!
ঠোঁটে ঠোঁট, বুকে বুক, জ্যোৎস্নার চন্দন!
নন্দিত প্রাণ-মন ছন্দিত নন্দন!
তপতীর মর্ম্মর—ছায়াময় অন্তর!

মর্ম্মর! মর্ম্মর! সুন্দর মর্ম্মর!
তটিনীর তট ঘেঁসে তোল্ কবি তোর ঘর!
কল-তান নদী গায়, তার সাথে মন ছায়—
পল্লব-মূর্চ্ছনা— জাগ্রতে, তন্দ্রায়!
তাই শোনে চন্দ্রমা, সূর্য্য ও শুকতারা,
তাই শোনে নিশীথের আঁখিজল-মুক্তারা!
সুন্দর মর্ম্মর—তোল্ হেথা তোর ঘর!

মর্ম্মর! মর্ম্মর! উন্মাদ মর্ম্মর!
সেই তালে বাদলের কালো মেঘ ঝর্ঝর!
মাঠে আজ কল্-কল্, বন্যার দলবল,
কুল্কুচো করে ছাখ্ মেঘ্লার দম্কল্!
দোলে গাছ ঝঞ্ঝায়, গায় মধু মল্লার,
অম্বরে ডম্বর, হুল্লোড় হল্লার!
সেই তালে মর্ম্মর, বর্ষার ঝর্ঝর!

মর্ম্মর! মর্ম্মর! নন্দিত মর্ম্মর!
মঞ্জুল বঞ্জুল আনে প্রেম-মন্তর!
ফাল্গুনে বন-বীথি, ভ'রে আজ কোন্ গীতি
চুল্বুলে ফুল-বাঁশী, রাঙা সুর শোন্ নিতি!
চোখে মৌ-মঞ্জুষা—প্রাণ-চুরি মন্তর!
কোকিলার মুখখানি পায় চুমু চঞ্চুর!
—আর নাচে মর্ম্মর,
অশোকের মন্তর!

মর্ম্মর! মর্ম্মর! অস্ফুট মর্ম্মর!
আসে শীত বর্ব্বর, কম্পিত জর্জ্জর!
কুয়াশার জাল-বোনা, মিছে আজ তাল-গোনা,
তার-ছেঁড়া শ্যাম-বীণা, মরা-চাঁদ আল্পনা!
হিমিকার বুক ভ'রে কাঁদে তাই বুল্বুলি,
পাতা সব ঝরা আর উড়ে যায় ফুল-ধূলি!
ম'রে যায় মর্ম্মর—
হিম-শীতে জর্জ্জর!

বাণী

শ্রীজগদীশ গুপ্ত (গল্প)

কন্যা বাদ্‌লী বা অপর্ণা আই এ পাশ করিতেই মিষ্টার সেনের মনে হইল, তিনি পূরাপূরি 'ফরেন্' আব্‌হাওয়ায় পৌঁছিয়া গেছেন। পূর্ব্ব হইতেই ঐ দিক্‌কার, হাওয়ার মাঝেই না হোক্, সীমানায় তিনি বিচরণ করিতেন—পঠদ্দশায় একবার তাঁর বিলাত যাত্রার প্রস্তাব হইয়াছিল; তিনি উপরকার ত্বক্ আর ভিতরকার জিহ্বা দুরস্ত করিতে সুরু করিয়াছিলেন...তাহাদের ভারতীয় গন্ধশূন্য করিতে সক্ষম হইয়াছিল কিনা এই সমস্যা মনে যখন প্রবল তখন দৈবাৎ যাওয়ার প্রস্তাব নাকচ্ হইয়া যায়—

কিন্তু সূত্র পাইয়া যে 'ফরেন্' ভাবটি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছিল সেটা তাঁহাকে ত্যাগ করিল না।

সেন দম্পতির এ আক্ষেপ যাইবার নয়—বিলাত যাওয়া ঘটে নাই; অতিরিক্ত আক্ষেপ এই যে, সন্তান দুটিই কন্যা রূপে আসিয়াছে; কিন্তু এটি গোপনীয়; শয়নকক্ষে নিভৃত আলাপে গৃহিণীর মুখে এই আক্ষেপটা শোনা যায়—সেন নির্লিপ্ত, অন্ততঃ তাই মনে হয়।

ওঁরা বড় কন্যা সুপর্ণার বিবাহ দিয়াছেন বড় জমিদারের ঘরে; কিন্তু যতদূর অনুমান হয়, জমিদারের ঘরে সুপর্ণা সম্পূর্ণ সুখী নহে। জমিদারের গৃহে তাহাকে জমিদার গৃহিণীর মত থাকিতে হয়, অর্থাৎ "তুল্‌তামলি" ঝামেলার মাঝে তাহাকে শারীরিক ও মানসিক শ্রম করিতে হয়—মেম্‌সাহেবের মত নহে...তাকে যারা মা বলিয়া ডাকে তাহাদের দিকে সে আগে ভ্রূভঙ্গী করিয়া চাহিয়া থাকিত-এখন ক্রমশঃ সহিয়া আসিয়াছে।

কনিষ্ঠা কন্যা অপর্ণার বিবাহ দিলেই হয়—পাণিপ্রার্থী একাধিক সুযোগ্য ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ হাজিরা দিতেছে; কিন্তু পাত্র নির্ব্বাচন লইয়া সেন দম্পতির মতভেদ ঘটিয়াছে।

* * * *

হরিবিলাস সেনের গৃহিণী চম্পকবরণীর প্রতি অসাধারণ অনুরাগ; অনুরাগের একটা ফল ইহাই দাঁড়াইয়াছিল যে, স্ত্রীর বাক্যালাপে কর্ণপাত করিতে না চাহিলেও কথাগুলি ব্যর্থ হয় না—তার কর্ণে প্রবেশ করে—

এখনও করিতেছিল—

ঈষৎ উত্তাপের সহিত ঈষৎ শ্লেষ মিশাইয়া চম্পকরাণী বলিতেছিলেন,—সুপি সুখী হয় নাই তা' বোধ হয় এতদিনে তোমার কানে গেছে। খেটে' খেটে' তার শরীর ভেঙে যাচ্ছে এ আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। সে ত' জমিদার নয়—চতুর্ভুজ এক দেবতা; চার হাতে করে' মেয়েটিকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।—বলিয়া চম্পকবরণী একটা নিঃশ্বাস চাপিয়া গেলেন...

জীবন্ত মানুষকে পুতুল নাচের পুতুল করিয়া তুলিলে যে শোচনীয় কাণ্ড ঘটিতে থাকে, একটি নিঃশ্বাসে সে কষ্টের কিছুই প্রকাশ হয় না।

ঠোঁটের ভিতর হইতে চুরুটটা টানিয়া লইয়া হরিবিলাস বলিলেন,—"ভাল কথা!...কাল দেখা করতে গিয়েছিলাম প্রবোধের সঙ্গে--দেখা হ'ল; সুপিকেও দেখে এলাম, রং আরো খুলেছে মনে হ'ল, শরীরও বেশ—

চম্পকবরণী চোখ পাকাইয়া বলিলেন,—ঠিক্' ঠিক্...আমার কথা উলটে' দেয়া চাই-ই ত, তোমার! একেবারে স্বচক্ষে দেখে' এসে দাঁড়িয়েছ হলপ্ করে...

হরিবিলাস বলিলেন,—অস্বাস্থ্যকর মেদবৃদ্ধি; তা ছাড়া আর কিছু নয়; আমি তা' দেখেই বুঝেছি—বদ্ধ বাতাসে বাসের দোষ।

কিন্তু চম্পকবরণী শান্ত হইলেন না; বলিলেন,—যে তোমাকে জানে না তার কাছে তোমার এই চালাকি চলুক..

—আমি বল্‌ছিলাম...

চম্পকবরণী স্বামীর মুখের দিকে অনড় দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন,—তুমি কি বল্‌ছিলে আর তার অর্থ কি তা' আমি তখনই বুঝ্‌তে পেরেছি...তুমি অবাক্ হবার ভাণ করলেই আমি তা' ভুলে যাব না।

একটা আপোষের চেষ্টায় হরিবিলাস বলিলেন,—অপর্ণার সম্বন্ধে তোমার কি ইচ্ছেটা ?

—সুপির কথা ভেবে তোমার অস্বস্তি হয় কি না আমায় পরিষ্কার বলো দেখি আজ !

সেন বলিলেন,—হয়।

—তবে ?

বুঝিতে না পারিয়া সেন বলিলেন,—তবে কি ;

তুমি প্রতুলকে আসকারা কেন দিচ্ছ তা' হলে ? উড়নচণ্ডীর একশেষ—চালচুলো নেই—সম্বলের মধ্যে এক মাতুল শকুনি আর কলকাতার কলেজের বিদ্যে ! ছিঃ—বলিয়া চম্পকবরণী ঘৃণাভরে ওষ্ঠদ্বয় কিয়ৎক্ষণ বিকৃত করিয়া রাখিলেন।

হরিবিলাস সেই বিকৃতির দিকে চাহিয়া খুক্ খুক্ করিয়া একটু কাশিয়া লইলেন...নীরবতার মাঝে দু'জনের একজন অস্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছিয়া গেলে সঙ্গসুখে কেবল ব্যাঘাত ঘটে এমন নয়—কেমন যেন ভয় ভয় করে। বলা বাহুল্য হরিবিলাস স্ত্রীকে স্বাভাবিক অবস্থাতেই ভয় করিয়া চলেন।

চম্পকবরণীর ঝোঁক্ পড়িয়া গেল—কথাটা তিনি শেষ করিবেনই ; বলিলেন,—তুমি যাকে বলো চট্‌পটে, আমি তাকে বলি ছট্‌ফটে...তুমি যাকে বলো চার চৌকশ, আমি তাকে বলি ডেঁপো'।...কিসের সঙ্গে কিসে !

হরিবিলাস বলিলেন,—আমি ত' তা কিছু বলিনি... তবে বুঝ্‌বার ভুলে—

—তুমি বলেছ, সত্য গোপনের অপরাধ কত বড় সে শিক্ষা তুমি পাওনি !..অতুল রায় পাঁচ বচ্ছর বিলেতে বাস করে এসেছে—তোমার ব্যবহারে তুমি তা অস্বীকার করছ, তার বাপের টাকায় বাংলাদেশের আদ্দেক কেনা যায়, কিন্তু মুক্তো তুমি চেন না।

হরিবিলাস বলিলেন—আমি ত' কারু স্বপক্ষে কি বিপক্ষে কিছুমাত্র জিদ্ প্রকাশ করিনি ! তুমি ভুল বলছ।

—ফলে ঘট্‌ছে কি ?

কিছুই না।

—উল্টো ঘট্‌ছে। আমি ভুল বলিনি···তোমার নিজের প্রকৃতি কদর্য্য, রুচি কদর্য্য—তাই বাঁদরটাকে তোমার ভাল লাগে।

শুনিয়া হরিবিলাসের মনে হইল, কোথাও অপরাধ ঘটিয়াছে নিশ্চয়ই—নতুবা এই কথাগুলি কন্যার সম্মুখে স্ত্রীর মুখ দিয়া নিঃসঙ্কোচে বাহির হইত না ; সবিনয়ে বলিলেন—আমি তবে এখন থেকে নির্লিপ্ত রইলাম, তোমরা মা ও মেয়ে যা করবে তাতেই আমার সায় দেয়া রইল ; আমি ছুটি নিলাম। অপি কি বলে ?

সেলাই লইয়া অপর্ণা সেই টেবিলের ধারেই ছিল—পিতামাতার কথোপকথন তার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল কিনা সন্দেহ...দু' একবার মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া কখন বাপের মুখের দিকে কখন মায়ের মুখের দিকে চাহিতেছিল—কিন্তু সেটা দৈবাৎ, তার অর্থ নাই।

বাপের মুখে তারই সম্বন্ধে প্রশ্ন শুনিয়াও সে মুখ তুলিয়া চাহিল না। চম্পকবরণী তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু সীবনমগ্ন চিত্তে কোনো রেখাপাত হইয়াছে কিনা মুখ দেখিয়া তাহা বুঝা গেল না ; নিষ্কাম মুখমণ্ডলে একটা অখণ্ড একাগ্রতা ছাড়া আলোকের প্রতিবিম্ব নাই।

সবাই যেন ওজনের পাল্লায় উঠিয়া দুলিতেছেন কোন্ দিকে ভারি হইবে ঠিক নাই। এমন সময় বৈঠকখানা ঘরের দুয়ারের উপর করাঘাতের শব্দ হইল...

হরিবিলাস উঠিয়া দাঁড়াইলেন—এমনভাবে যেন কঠিন বন্ধন মুক্ত হইয়া গেছে—

চম্পকবরণী বলিলেন,—এসেছেন বাবু...বাড়ীর মালিক...দুয়োরে জুতো ঘষছে বুঝি ! পথের কাদায় ঘর দুয়োর আমার ভরে দিলে ! বলিয়া দুস্তর ঘৃণায় তাঁর বাক্য বন্ধ হইয়া রহিল...বলিলেন—এমন ফচ্‌কে দেখেছ কখন !

স্ত্রীর এই বিষদৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া হরিবিলাস কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, মায়ের আজিকার মুখের পাশে তার মুখখানা অতিশয় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল।

* *

হরিবিলাস দরজা খুলিয়া দিয়া প্রতুলকে একেবারে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন।

প্রতুল চ্যাটার্জ্জী ছাব্বিশ বছরের সুশ্রী যুবক—আধুনিকতার কোনো লক্ষণের অভাব তাহাতে নাই।

চেয়ারে সে বসিল না ; চেয়ারের পিঠের উপর দু'হাত তুলিয়া দিয়া হাসিমুখে আর কলস্বরে একটা সংবাদ সে

রাশ্রী করিয়া দিল, বলিল—এক নতুন জিনিষ দেখা গেল আজ—শুনে অবাক্ হয়ে যাবেন। বলিয়া সে একে একে সবারই মুখের দিকে চাহিল—যেন এখনই তাঁদের অবাক্ হইয়া যাইবার কথা।

চম্পকবরণী বলিলেন—বটে!

হরিবিলাস ওষ্ঠদ্বয় প্রসারিত করিয়া একটু হাসির ভঙ্গী করিলেন।

প্রতুল বলিতে লাগিল—মেয়েমানুষ ভাগ্য গণনার পেশা নেয় জান্‌তাম না—ধাপ্পাবাজী পুরুষেরই একচেটে ছিল—

চম্পকবরণী স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—তা ঠিক্।

প্রতুল বলিল—ভবিষ্যৎ জান্‌বার এত ব্যাকুলতা মানুষের কেন তা জানিনে...

চম্পকবরণী বলিলেন—অনেক কথাই শেষ পর্য্যন্ত জানবার থাকে—কারু কারু জানাই হয় না।

হরিবিলাস বলিলেন—তা ঠিক্।...তারপর?

—ধর্ম্মতলা দিয়ে আসছি...এক জায়গায় দেখি, বেজায় মানুষের ভিড়। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হে? সে বল্‌লে, ভেতরে ভৈরবী রয়েছেন।...কি ভেবে ঘরের ভেতর ঢুকে গেলাম জানিনে—

চম্পকবরণী বলিলেন,—কারু কারু জীবনের উদ্দেশ্য থাকে না, কাজেরও কারণ কি কৈফিয়ৎ থাকে না।

প্রতুল বলিল,—তা ঠিক্।...তারপর শুনুন!...আমি শুনে অবধি সেই থেকে মনে মনে খালি হাস্‌ছি।

—কি বল্‌লে বলো বাপু। বলিয়া অতিশয় উত্তাপ বশতঃ চম্পকবরণী নড়িয়া বসিলেন।

হরিবিলাস বলিলেন—বস', বসে বলো। অপর্ণা কৌতূহলী হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল...

কিন্তু চ্যাটার্জী বসিল না, দাঁড়াইয়া সে বলিতে লাগিল, টাকা দুটো জলে দিয়ে এসেছি।

চম্পকবরণী বলিলেন—তা আর বেশী কি! কারু কারু তার ঢের বেশী জলে পড়েছে!

অপর্ণা বলিল—তা ঠিক্। তারপর কি হ'ল বলুন।

আমার ডান হাতের রেখাগুলো দেখে দেখে সে বলতে লাগল, তুমি একটা অপদার্থ, পাষণ্ড তোমার আচরণে তোমার মা কেঁদে কেঁদে চক্ষু অন্ধ করে ফেলবে, কুসঙ্গে মিশে তুমি জাল জোচ্চুরী নেশা টেশা করবে; জুয়া খেলতে টাকা চুরি করবে—তার ফলে পাঁচটি বৎসর তোমাকে শ্রীঘর বাস করতে হবে। আমি তাকে বললাম, ফাঁসি হবে না শুনে আমি দুঃখিত হয়েছি। ভৈরবী বল্‌লে, দুঃখিত কেবল তুমিই হবে এমন নয়, আরও অনেকে হবে! বলিয়া প্রতুল চ্যাটার্জ্জি কৌতুকভরে ঠিক্‌রাইয়া ঠিক্‌রাইয়া হাসিতে লাগিল...

চম্পকবরণী খুশী হইলেন—

বলিলেন, আমি ত এতে অত হাসির কথা কিছু দেখছি নে!

— দেখছেন না!

চম্পকরাণী অকাট্য কণ্ঠে বলিলেন,—না।

শুনিয়া প্রতুলের কৌতুকহাস্য নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতে লাগিল...

হরিবিলাস বলিলেন,—আমি হলে ব্যাপারটা গোপন রাখতাম, প্রতুল...তুমিও আর কাউকে বলো না।

শুনিয়া প্রতুল বড় দমিয়া গেল...অপ্রত্যাশিত একটি ধাক্কা যেন আসিয়াছে। শুষ্ককণ্ঠে বলিল,—আপনারা নিশ্চয়ই এ-সব বিশ্বেস করেন না!

চম্পকরাণী বলিলেন,—করি। কখন কখন ওদের কথা সত্যিসত্যিই ফলে যায়—দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়।

হরিবিলাস বলিলেন,—অবাক্ হয়ে কেবল যেতে হয় নয়, বহুদিন পর্য্যন্ত অবাক হয়ে থাকতে হয়—শেষদিন পর্য্যন্ত। আমি একবার হাত দেখিয়েছিলাম যখন কলেজে পড়ি। দৈবজ্ঞ বলেছিল, তোমার যিনি স্ত্রী হবেন তাঁর মত সুন্দরী আর সুশীলা মেয়ে...

প্রতুল হঠাৎ পরমোৎসাহে বলিয়া উঠিল—তা হলেই দেখুন...তা তা তা—

বলিতে বলিতে তেমনি হঠাৎ গলা কাঠ হইয়া প্রতুল থামিয়া হা করিয়া রহিল।

চম্পকবরণীর নাসিকাদ্বয় স্ফুরিত হইয়া ওঠা নামা করিতে লাগিল; বলিলেন—কি বলতে যাচ্ছিলে?

—বলতে যাচ্ছিলাম যে, দেখুন তা হলে ওদের কথা কখন কখন সত্যি না হয়ে যায় না! বলিল বটে, কিন্তু যে অনিষ্টের তুলনা নাই তাহার সংশোধন হইয়াছে বলিয়া ঘুণাক্ষরেও মনে হইল না— তার মনের হাঁপানিও কমিল

না ..চাহিয়া দেখিল, অপর্ণা গম্ভীর, মিঃ সেন ততোধিক গম্ভীর এবং মিসেস্ সেন ততোধিক গম্ভীর।

প্রতুল চেয়ারের উপরে হাত বুলাইতে লাগিল ..

হরিবিলাস মৃত্তিকার দিক হইতে চোখ তুলিয়া প্রতুলের দিকে চাহিয়া মৃদু একটু হাস্য করিলেন ..

হাসিটুকু ভূমিকা—

পরক্ষণেই তিনি একটি গল্প করিলেন এক ব্যক্তি অবগত হইয়াছিল যে, সে কোনও অজ্ঞাত আত্মীয়ের ধনের অধিকারী হইবে। শুনিয়া আনন্দে সে চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছিল। এরূপ সাতবৎসর বেকার অবস্থায় কাটাইবার পর তার বৃন্দাবনবাসিনী এক পিসি তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া নগদ ছাপ্পান্নটী টাকা তাহার হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।

প্রতুল বলিল,—আমার মনে হয়, ভৈরবী আমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিল মনে মনে আমি তাকে বিশ্বাস করিনে ; মনে আমার বজ্জাতি আছে তাই আক্রোশ করে শুনিয়ে দিয়েছে যা তা। আপনার কি বিশ্বাস? বলিয়া সে অপর্ণার দিকে চাহিল।

কিন্তু অপর্ণাও তার বিরুদ্ধে গেছে, বলিল,—নিশ্চয় জানিনে যখন, তখন একেবারেই অবিশ্বাস করি কেমন করে। চুরি ত আমরাই করি, জেলেও যাই। বলিয়া সে হাতের খুঁটির দিকে চাহিয়া রহিল।

চম্পকবরণী বলিলেন,—একশোবার।

অপর্ণার মুখের কথা শুনিয়া প্রতুলের মনোবেদনার অন্ত রহিল না ; আবেগভরে বলিল,—আপনাদের ভাব দেখে মনে হচ্ছে আমি যেন সত্যিই ওই সব করে বেড়াই—এতদিনে ভৈরবীর কথায় ধরা পড়ে গেছি। আপনি একবার চলুন না ; কি বলে দেখি।

যেন অকস্মাৎ জ্ঞাননেত্র ফুটিয়া গেছে—

এমনি দীপ্ত আর ক্ষিপ্র দৃষ্টিতে চম্পকবরণী কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন ; বলিলেন,—নিশ্চয় যাবে। সত্যি কথা শুনতে ভয় করবে আমার মেয়ে তেমন নয়। বলিয়া মেয়ের গুণে যেন প্রথম মুগ্ধ হইয়া তিনি স্বামীর মুখে গর্বের পুলকের তরঙ্গাভিঘাত ঘটে কি না তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন..:

প্রতুল বলিল,—সত্যি কথা যতই কদর্য্য হোক, আমার কথা বলছি, আমি তা বিশ্বাস করবো না।

চম্পকবরণী বলিলেন,—তাতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নেই, আর সে পরের কথা। বলিয়া তিনি ভ্রূভঙ্গী করিয়া রহিলেন।

নিঃশব্দে আর নিরানন্দ প্রভাবে ভিতর হইতে মনমরা প্রতুল চ্যাটার্জ্জি সকাল সকাল আর ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

* * * *

পরদিন প্রত্যূষে হরিবিলাস এবং কিছু বেলা হইলে অপর্ণা বাহির হইয়া গেলে চম্পকবরণী অতীতের স্মৃতির মাঝে মগ্ন হইয়া গেলেন···অপর্ণার শৈশব, কৈশোর এবং সম্প্রতি সমাগত যৌবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি নিরিবিলি বসিয়া তিনি মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। করিতে করিতে সুপর্ণার মইয়ের উপর হইতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া পা মচকানটা অপর্ণার আরোপ করিয়া বসিলেন—কিন্তু অল্পসময়ের জন্য, পরক্ষণেই চমকিয়া তিনি সতর্ক হইয়া গেলেন...

তারপর যে কার্য্যটি তিনি করিলেন তাহা আরো গোপনীয়। অপর্ণার শোবার ঘরে আসিয়া তার ড্রয়ার খুলিয়া তার সেদিনকার তোলা ফটোখানা লইয়া, একখানা গাড়ী ডাকাইয়া তিনি ধর্ম্মতলার দিকে রওনা হইয়া গেলেন।

* * * *

ধর্ম্মতলায় যাইয়া তিনি কাহার সঙ্গে কি কথা কহিলেন তাহা কেহ জানিতে পারিল না, কিন্তু দশটার সময় যখন তিনি টেবিলে নামিলেন, তখন মনে হইল, পূর্ব্বদিনের বন্দোবস্ত তিনি ভুলিয়া গেছেন...

কিন্তু অপর্ণা ভোলে নাই, সে মনে করাইয়া দিয়া বলিল—মা, আমি কার সঙ্গে যাব?

—কোথায়?

—ধর্ম্মতলায়। ভুলে গেছ নাকি!

চম্পকবরণী জানিতেন, বাধা দিলে মেয়ের জেদ বাড়ে; মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—আমি ত যেতে বারণ করি।

অপর্ণা বলিল,—কিন্তু কালকে ত তোমার কথায় মনে হয়েছিল অন্যরকম!

—ভেবে দেখলাম, ওসব কথায় কান না দেয়াই ভাল, অনর্থক সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা।

হরিবিলাস বলিলেন,—তা ছাড়া আর কিছু নয়।

—কিন্তু আমি যাব।

—তবে যাও। চম্পকবরণী তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন; এবং স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া কন্যাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিলেন—নাম ধাম খবরদার বলিসনে, যতই জেরা করুক।

অপর্ণা বলিল—আচ্ছা।

রামজিওনের জিম্বায় বাড়ীর গাড়ী অপর্ণাকে লইয়া অল্পক্ষণ পরেই ধর্ম্মতলার দিকে ছুটিল।

* *

অপর্ণা দেখিল, আধা অন্ধকার ঘর; বিপুলকায়া ভৈরবী তার অনুচরবর্গ লইয়া কম্বলাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে—পার্শ্বেই সিন্দুর চর্চ্চিত বিশাল ত্রিশূল...তার সম্মুখে জলচৌকি; জলচৌকির দক্ষিণ দিকে ছোট একখানি কম্বলের আসন... কিছুদূরে দর্শকগণের অথবা দর্শন প্রার্থী অথবা দর্শনীদাতাগণের বসিবার জন্য বেঞ্চি পাতা রহিয়াছে; কিন্তু সে আসন এখন শূন্য...

ভারতীয় তপঃক্লেশের কোনো লক্ষণই ভৈরবীর দেহে বিদ্যমান নাই...গৈরিক বসন, চুলের রং কটা. চুলগুলি আগোছাল, যেন কেউ চুলগুলি তুলিয়া ধরিয়া দুলাইয়া দিয়া গেছে ..

মানুষকে ভয় দেখাইবার কি প্রলুব্ধ করিবার কোনো আয়োজনই সেখানে নাই—অত্যন্ত সাদাসিদে...মনে হয় না যে ভিতরে ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

ভৈরবী সহচরীর সঙ্গে কথা কহিতেছিল—

অপর্ণা প্রবেশ করিতেই ভৈরবী একবার তার দিকে চাহিয়া মুখের কথাটা আগে শেষ করিল, তারপর বলিল,—এস, মা, এস, বস'। বলিয়া জলচৌকির পাশেই যে আসন খানা ছিল তাহার দিকে চাহিল...

অপর্ণার মনে হইল, ভৈরবীর কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট, কিন্তু সে বসিল না; দাঁড়াইয়াই জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি অদৃষ্টজ্ঞ?

ভৈরবী হাসিয়া বলিল,—লোকে বলে তাই।

—লোকে যা-ই বলুক আপনি কি যথার্থ ই তাই?

—হাঁ।...বস'।

ভৈরবীর স্বর অতি স্পষ্ট, এবং অপর্ণার মনে হইল, গম্ভীর।

অপর্ণাকে কে যেন টানিয়া লইয়া যথাস্থানে বাসাইয়া দিল, এবং তার বাঁ হাতখানা টানিয়া লইয়া জলচৌকির উপর চিৎ করিয়া পাতিয়া দিল...

ভৈরবী অপর্ণার প্রসারিত করতলের উপর আসমানী রঙের একটা তরল পদার্থ খানিকটা ঢালিয়া দিয়া বলিল,—বাম হস্তে বিগত জীবন, দক্ষিণ হস্ত ভবিষ্যৎ...বলিতে বলিতে সে হাতের উপর আরো একটু ঝুঁকিয়া আসিল .. একটানা অস্ফুট গুঞ্জনস্বরে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিল—

তারপর প্রাঞ্জল সুস্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিল—ছোট্ট মেয়েটী, একমাথা ঝাঁকড়া চুল...চার বছরের শিশু... জ্বরবিকারে শয্যাগত...আরোগ্য লাভ বায়ান্ন দিনে... বেড়ালের আঁচড়—দু'হাতে ঝর্‌ঝর্ রক্তপাত।...ইস্কুলে যাতায়াত—সখীসঙ্গে গলাগলি। সমুদ্রতীর—ঢেউয়ের আঘাতে পতন—মানুষের চাঞ্চল্য, জননীর ক্রন্দন। গাড়ীতে মোটরে সংঘর্ষ; পিতা সামান্য আহত; পুত্রী অজ্ঞান।; স্কুল হইতে কলেজ—পদকলাভ...নতমুখী সুন্দরী ছাত্রীর দিকে চাহিয়া বিরাট সভা করতালি দিতেছে...

ঘুমপাড়ানির গানের মত বহমান সুরে অপর্ণার অলস বোধ হইতে লাগিল ..

ভৈরবী বলিতে লাগিল—তারপর দেখছি স্বয়ম্বরের আয়োজন। বলিয়া ভৈরবী অপর্ণার বাম হস্ত ত্যাগ করিয়া বলিল—এখন ভবিষ্যৎ। দক্ষিণহস্ত। বলিয়া সে নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতে লাগিল—কিন্তু অপর্ণার মুখের দিকে চাহিল না।

অপর্ণা প্রথমে বিস্মিত পরে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল; দক্ষিণ হস্ত সমর্পণ করিবার পূর্ব্বে সে ভৈরবীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল—কিন্তু সেখানে কোনো ভাবেরই বিকাশ নাই—না দ্বন্দ্ব, না উদ্বেগ, না প্রয়াস, না হর্ষ। জ্ঞাতসারে ক্রমাগত মিথ্যার বাহিনী সে অবলীলাক্রমে উচ্চারণ করিয়া চলিয়াছে কিনা তাহা তাহার মুখমণ্ডলের রেখাপথগুলিকে দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই। কেবলমাত্র সহজ অথচ অসাধারণ অনুমানশক্তির উপর নির্ভর করিয়া যাহা সে বলিতেছে তাহা এই মুহূর্ত্তে মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়া যাইতে পারে—এদিকেও তার অসীম নিশ্চিন্ত নিঃস্পৃহা!

অপর্ণা তার ডান হাতখানা ধীরে ধীরে জলচৌকীর উপর তুলিয়া দিল, বলিল—যদি ভয়ঙ্কর কিছু হয় তবে বল্‌বেন না।…স্থানের আবহাওয়ার গুণেই তার কণ্ঠস্বর খুব মৃদু হইয়া ফুটিল।

ভৈরবী বলিল—সম্মুখে বিপদ থাকলে আমি সতর্ক করে দিতে পারি…কি তুমি গ্রহণ করবে, কি তুমি পরিহার করবে তারও ইঙ্গিত তুমি পেতে পারো।

বলিয়া ভৈরবী পুনরায় সেই গুঞ্জনস্বরে সুরু করিল, —সহস্রলোকে মুখের দিকে সাগ্রহে চেয়ে আছে…কৃপাপার্থী দুটি লোক অগ্রসর হয়ে আস্‌ছে—একজন গৌরবর্ণ, একজন শ্যামল, দুইজনেই একনিষ্ঠ পাণিপ্রার্থী; উভয়েই ধনী… গৌর ব্যক্তি নিজের শক্ত—অকুণ্ঠিত ব্যয়ে নিঃস্ব—পরের দুঃখের কারণ…এদেরই একজন তোমার ভবিষ্যৎ পতি—

—কোন্‌টি?

—বুঝতে পারছিনে ঠিক।

অপর্ণা ব্যগ্র হইয়া বলিল,—ভালকরে দেখুন।

—দেখি। তিনজনে চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আছে; একজন হাসিমুখে তাকিয়ে আছে যে দিকে সে দিকে সুবৃহৎ অট্টালিকা, ধনের সমারোহ; দ্বিতীয়টি—

বলিয়াই ভৈরবী যেন হঠাৎ দিশেহারা হইয়া গেল খানিক নিঃশব্দ থাকিয়া বলিল,—জাঙিয়া পরা, গলায় পদক, অধোবদন—তার সম্মুখে কারাগৃহ আর কিছু দেখছিনে, বোধহয় আমার দেখবার নয়। বলিয়া ভৈরবী যখন অপর্ণার হাত ছাড়িয়া দিল তখন অপর্ণার সেই হাতখানা কাঁপিতেছে।

ভৈরবী চোখের উপর হাত বুলাইয়া শ্রান্ত দেহে শিথিল হইয়া বসিয়া রহিল…

অপর্ণার মাথা ঘুরিতেছিল—

সে ভৈরবীর সম্মুখে দর্শনীর টাকা দুটি রাখিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, এই অলৌকিক ঘটনার পর পৃথিবী যেন চেহারা বদলাইয়া একেবারে পর হইয়া গেছে—ঘরের কাছে তার সাড়া নাই; দূরে একান্তে দাঁড়াইয়া আছে।

* * * *

অপর্ণা যখন গাড়ীতে উঠিল তখন তাহার মনে হইতেছিল, বাবা আর মায়ের কাছে সব কথা বলিতে পারিলে বুক যেন খালি হয়; কিন্তু চল্‌তি গাড়ীতে বসিয়া ক্রমশঃ তার ইচ্ছার ভাবান্তর ঘটিতে লাগিল। অতীত ও ভবিষ্যতের রহস্যের অভ্যন্তরে মানুষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির এই প্রবেশ চমক্‌প্রদ বটে; কল্পনাতীত কত ব্যাপারই সম্ভব হইবার সংবাদ অহরহ পাওয়া যাইতেছে—এটাও হয়তো তাহারই একটা…কিন্তু তবু কোথায় যেন প্রতিবাদ আছে, অপ্রত্যয়ের কারণ আছে!

গৌরবর্ণ ব্যক্তিটি যে প্রতুল তাহাতে সন্দেহ নাই, আবার আছেও যেন…

বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া গাড়ী হইতে নামিবার সময়েও সে ভাবিয়া কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই..

* * *

বাপ মায়ের সম্মুখে সে অতিশয় গম্ভীর হইয়া রহিল… কিন্তু তার কথা কহিবার অহেতুকী অনিচ্ছা জননীর জিহ্বা-তাড়নায় অচিরাৎ ধূলিসাৎ হইয়া গেল—

আদ্যন্ত শ্রবণ করিয়া হরিবিলাস মুগ্ধস্বরে কহিলেন,—আশ্চর্য্য শক্তি!…এই সব বল্‌লে?

অপর্ণা শান্তস্বরে বলিল,—হ্যাঁ অবিকল বল্‌লে।

চম্পকবরণী বলিলেন,—"কে রে যায় বেড়ী পায় বিরস বদন"ই তোমাদের প্রতুল চ্যাটার্জ্জী…তিনিই ঘোরতর গৌরবর্ণ। আমার যেটুকুন্ সন্দেহ ছিল তা' গেছে।

হরিবিলাস উত্তরোত্তর অধিকতর বিস্মিত হইয়া পড়িতেছিলেন, বলিলেন,—বাঃ!…প্রতুলকেও সে চেনে না, অপর্ণাকেও চেনে না; ওদের সম্ভাবিত নৈকট্যের কথাও জানে না; অথচ দৈবী দৃষ্টিতে তা' হুবহু ধরা পড়ে গেছে।…আশ্চর্য্য বটে…আমার আর সন্দেহ নেই।… কেমন করে এসব ঘটে তা' কল্পনাও করতে পারিনে। বলিয়া হরিবিলাস ভৈরবীর শক্তিমত্তায় পরম পুলকিত হইয়া স্ত্রীর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন…

চম্পকবরণী প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—ঐশী শক্তি। বলিয়া স্বামীর চোখের ইসারায় চোখ ফিরাইয়া দেখিলেন, অপর্ণা চোখে রুমাল চাপা দিয়া কাঁদিতেছে।

হরিবিলাস উঠিয়া দাঁড়াইলেন—

অপর্ণা চোখের উপর হইতে রুমাল সরাইয়া প্রশ্ন করিল,—কিন্তু সে যে প্রতুলবাবুর কথাই বলেছে তা' তোমরা কেমন করে জেনে একেবারে নিঃসন্দেহ হচ্ছ?

চম্পকবরণী বলিলেন,—কিছুদিন সবুর সয়ে থাক্‌লেই সন্দেহ ঘুচে যাবে। বলিয়া তিনিও উঠিয়া গেলেন।

অপর্ণা একাকিনী বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল তাহার হিসাব কিতাব নাই।

* * *

প্রতুল চ্যাটার্জ্জী কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিল; ফিরিয়া দেখিল, তাহার স্থানচ্যুতি ঘটিয়া গেছে, এবং তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে অতুল রায়।...তিনদিন আমোদ-প্রমোদ আর ভ্রমণের ঘূর্ণীর মাঝে ফেলিয়া-চম্পক বরণী কন্যার নিরুত্তমতা ক্ষয় করিয়া আনিয়াছিল।

অপর্ণা পুনরায় সুশ্রী হইয়া উঠিয়াছে—

একটি বিষয়ে জননীর সঙ্গে তার মতভেদ নাই, তাহা এই যে, রায়ের বাক্‌পটুতায় সামান্য ব্যাপারই অসামান্য রসাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল..বিলাতের মেম সাহেবের সম্বন্ধে কৌতুকের কথা কি এতও সে জানিত—হাসাইয়া মারিয়াছে!

এমনি একটা হাসাহাসির মাঝেই প্রতুল চ্যাটার্জ্জি প্রবেশ করিয়াই অনুভব করিল, সিংহাসন শূন্য নাই—এমন কি, যেন অভিষেকেরই একটা আয়োজন চলিয়াছে।... তাহার দিকে কেহ চাহিয়াও দেখিল না।

কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী অতুল রায় বলিল—এস প্রতুল; ফির্‌লে কখন? বলিয়া সে সকৌতুকে অর্পণার মুখের দিকে চাহিতে যাইয়াই একটা দ্বিধা জাগিয়া সে প্রতুলের দিকেই চাহিয়া রহিল...

প্রতুল বসিল না—

চম্পকবরণী বলিলেন,—অতুল, তোমার বিলেতেও দৈবজ্ঞ আছে শুনেছি, কিন্তু এমনটি বোধ হয় নেই—এ সর্ব্বজ্ঞ। কাউকে কষ্ট দিবার অভিপ্রায় আমার নেই; কিন্তু নাছোড়বান্দা লোককে শোনানই ভাল যে, অপর্ণাও তাকে হাত দেখিয়েছিল...অদৃষ্ট গণনায় যাকে জেনে—

প্রতুল বলিয়া উঠিল—কিন্তু নির্ঘাৎ সনাক্ত ত' এখনো হয় নাই..গৌরবর্ণ অশেষ নিগুর্ণ ব্যক্তিটি কে, আর শ্যামবর্ণ অশেষ গুণবান্‌-ব্যক্তিটিই বা কে!

চম্পকবরণী একেবারে দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন,—জান্‌তে কি আর বাকি থাক্‌বে!

—আমি বল্‌ছি, অদূর ভবিষ্যতের কথা—আজকালের মধ্যেই জান্‌বার কি উপায় আছে!

—আমাদের তাড়াতাড়ি নেই।

—মিস্ সেন এ-সব রাবিশ বিশ্বেস করেন না এ ভরসা আমার আছে।

অপর্ণা বলিল—রাবিশ নেহাৎ নয়...আমার ছেলে-বেলাকার অত কথা সে কেমন করে বল্‌লে!

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস নিক্ষেপ করা ছাড়া প্রতুলের গত্যন্তরই রহিল না—তা-ও নিঃশব্দে।

চম্পকবরণী বলিলেন,—আমরাও কিছু বুঝি সুঝি... একেবারেই অজ্ঞান নই।

খানিক্ চুপ্ চাপ্ গেল...

মাঝখানে অতুল রায় এক্সচেঞ্জ রহস্য ব্যাখ্যা করিতে সুরু করিয়াছিল—এক্সচেঞ্জের হারের দরুণ ভারতবর্ষের বহু টাকা লোক্‌সান যাইতেছে—ইহাই ছিল তার প্রতিপাদ্য...

কিন্তু প্রসঙ্গ নীরস বলিয়া কেহ তাহাতে মনোযোগ দিলেন না...

চারিটি ব্যক্তি একত্র হইয়া আছে, কিন্তু নিঃশব্দ দেখিয়া মনে হয়, সবাই আপন চিন্তায় বিভোর, কিন্তু তা নয়... মনে মনে সবাই ছটফট যাই যাই করিতেছিলেন—

এই দুরূহ অবস্থায় আসান্ দিলেন সেন—

তিনি গৃহে ছিলেন না; বাহিরে আওয়াজে বুঝা গেল, তিনি আসিয়াছেন—

চারিজনেরই মনে হইল, বাঁচা গেল।

কিন্তু বাঁচা গেল কই!—হরিবিলাস এমন গম্ভীর মুখ লইয়া প্রবেশ করিলেন যাহা দেখিয়া তাঁর হিতৈষী মাত্রেরই শঙ্কিত হইয়া উঠিবার কথা...

তিনি ঝপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া এমন শোকাচ্ছন্ন আকার গ্রহণ করিলেন যে, কাহারো বুঝিতে দেরী হইল না, ব্যাপার গুরুতর। সবাই চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—

চম্পকবরণী ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিলেন,—কি হয়েছে তোমার?

হরিবিলাস অঞ্জলির ভিতর হইতে মুখ তুলিয়া কেবল

বলিলেন—আমার? কিছুই না! বলিয়া তিনি পুনরায় অঞ্জলির ভিতর ডুব দিলেন।

অপর্ণা নত নেত্রে নিজের করাঙ্গুলির নখমালা দেখিতে লাগিল; প্রতুল খদ্দরের চাদরের সরু মোটা সুতা বাছিতে লাগিল; অতুল দেয়াললগ্ন "তুমি ভয়াবহ" নামক ছবিখানা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, এবং চম্পকবরণী অসহিষ্ণু হইয়া আঙ্গুল তুলিয়াছেন—স্বামীকে কিঞ্চিৎ সম্বোধন করিতে যাইবেন, এমন সময় হরিবিলাস আবার মাথা তুলিলেন; বলিলেন—জ্যোতিষীর কররেখা বিচারই বল, আর ভবিষ্যৎ দর্শনই বল, সব সময়েই কি সত্য হয়?

মনে হইল, সত্য না হওয়াটাই যেন তিনি চান্।

চম্পকবরণী বলিলেন,—সে জ্যোতিষীর জ্ঞানের ওপর উপর নির্ভর করে...

—আমি বল্‌ছি ধর্ম্মতলার ঐ ভৈরবীর কথা।

—নিশ্চয়! তার ঐশী ক্ষমতা আছে!...আর কেউ তা' স্বীকার না করুক, অপর্ণা তা' বেশ জানে।

অতুল রায় বলিল,—আমার পাঁচ সাতটি পরিচিত লোক হাত দেখিয়েছিল; তারাও বল্‌ছে ঐশী শক্তিই বটে!

হরিবিলাস কাতর স্বরে বলিলেন,—তবু, ভুলচুক্ কি হ'তে পারে না! তাড়াতাড়িতে, কি হঠাৎ অন্যমনা হ'য়ে গুলিয়ে যেতেও ত' পারে। কি বলিতে কি ব'লে ফেলা—

চম্পকবরণী মাথা নাড়িয়া চূড়ান্ত করিয়া দিলেন; বলিলেন,—উঁহু।

অতুল রায় বলিল,—না।

চম্পকবরণী স্বামীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন,—তোমার চিরটা কালই দু'নৌকায় পা দিয়ে গেল...কোন্ দিকে গেলে সুবিধে হয় তা' তোমার ঠাহর কর্‌তে এত সময় লাগে যে সহ্য করা কঠিন...তুমি যে মানুষ হ'লে না তার কারণ একদিকে তোমার হঠকারিতা, অন্যদিকে তোমার দ্বিধা...

চম্পকবরণী এম্‌নি করিয়া স্বামীর সহস্র দোষ উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন—কিন্তু সেন সাহেবের ম্লান চক্ষে দীপ্তি ফিরিল না...তাঁর নাক দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ঘন ঘন বাহির হইতেছিল, তাহারও শেষ হইল না...তাঁর অস্থির দৃষ্টি ঘুরিতে ঘুরিতে একসময়ে প্রতুল চ্যাটার্জ্জির উপর পড়িতেই তাঁর আকাশে দোদুল্যমান আত্মা যেন ঠাঁই পাইয়া গেল...

চম্পকবরণীর বিস্ময়াহত চক্ষুর সম্মুখে তিনি হঠাৎ উঠিয়া আসিয়া হাত বাড়াইয়া প্রতুলের হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন...

চম্পকবরণী বলিলেন,—ও কি হ'চ্ছে?

প্রতুল বলিল,—হাম্‌বাগ্! আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে পুলিশ ডেকে ভৈরবীর বুজ্‌রুকি ভেঙে' দি'।...সে আপনাকে কিছু বলেছে নিশ্চয়! চাব্‌কে,—

চম্পকবরণী রাগে কাঁপিতেছিলেন; বলিলেন,—তা' তুমি পারো; কিন্তু তাতে তোমার সুবিধে হতে পারত হাটে হাঁড়ি ভাঙার আগে।...সে যদি কোনো অকল্যাণের কথাও বলে থাকে তবে—

বলিতে বলিতে স্বামীর আর্ত্তনাদে তিনি চম্‌কিয়া উঠিয়া থামিয়া গেলেন, হরিবিলাস বলিতে লাগিলেন,—বল' না, বল' না; অকল্যাণের কথা জিহ্বাগ্রেও এন না। বলিয়া তিনি প্রতুল চ্যাটার্জ্জির হাত ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িলেন।

চম্পকবরণী ভয় পাইয়া গেলেন; আর প্রশ্ন করিলেন না। সেন বলিলেন,—বল্‌ছি, ব্যস্ত হ'ও না; আমায় একটু একটু সাম্‌লে নিতে দাও...

—সাম্‌লে তুমি নাও। কিন্তু তোমার মন ভাল নেই, তুমি ওপরে যাও

—না না; একা আমি এখন কোথাও থাক্‌তে পারব না...তোমাদের পাঁচজনের মুখের দিকে চেয়ে তবু একটু সুস্থ আছি।

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল,—কি হয়েছে, বাবা?

—আমিও গিয়েছিলাম তোমাদের সেই ভৈরবীর কাছে কেন গিয়েছিলাম তাই এখন ভাবছি!...একেবারে বুজ্‌রুক আগাগোড়া মিথ্যে...অসম্ভব...কিছু সে জানে না...

প্রতুল বলিল,—আমি তা' বরাবর বলে' আস্‌ছি!... কি বলেছে সে আপ্‌নাকে?

হরিবিলাস তাঁর একমাত্র অবলম্বন প্রতুল চ্যাটার্জ্জির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—বলেছে...বলিয়া ম্লান একটু

হাসিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন,—বলেছে, আমি নব্বই বছর পর্য্যন্ত বাঁচব; চিরদিন সুস্থ সবল থেকে নব্বই বছরে সজ্ঞানে হঠাৎ আমার মৃত্যু হবে। কিন্তু...

বলিয়া হরিবিলাস স্ত্রীর দিকে চোখ ফিরাইলেন—

বিষণ্ণ ছল ছল চক্ষে চাহিয়া রহিলেন...

এবং সেদিনকার বিচ্ছেদ-বেদনা তাঁর নয়নপল্লবে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল...

চম্পকবরণী স্বামীকে চিনিতেন; তাঁহার মুখ দিয়া হাসি কান্নায় মিশ্রিত একটা অদ্ভুত শব্দ নির্গত হইল...বলিলেন, তুমি মিছে কথা বল্‌ছ।

—সে ত' সুখের কথা; চিরদিন সুস্থ সবল থেকে নব্বই বছরে সজ্ঞানে হঠাৎ মৃত্যু খুবই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু উনি—

চম্পকবরণী ধমকাইয়া উঠিলেন,—ওঠো···ওপরে যাও বল্‌ছি।

—যাই।...ভৈরবী বল্‌লে, তোমাকে দ্বিতীয় বার দার-পরিগ্রহ করতে হবে...তার কটা চোখ আর লাল মুখ দিয়ে ঝড় বইবে; শুনে' অবধি...

সেন আসিতেই বুঝা গেল তিনি সেই হইতে দুঃসহ কষ্ট ভোগ করিতেছেন...

চম্পকবরণী চোখ বুজিয়া রহিলেন...

প্রতুল হাসিয়া বলিল,—মিছে কথা মিছে কথা, এমন মিছে কথা আর হয় না।

হরিবিলাস কাতরকণ্ঠে জানিতে চাহিলেন,—ঝড়ের মত মুখ চোখ। সে কেমন ধারা?

চম্পকবরণী চোখ খুলিয়া তাকাইলেন; ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—চোখে দেখলেই আর সন্দেহ থাক্‌বে না।... তোমার কপালে যদি বিপত্নীক হওয়া লেখা থাকে তবে হবেই...চোখ আর মুখ—

প্রতুল বলিল,—কটা চোখ আর লাল মুখ!

—চোখ মুখ দেখে' শিক্ষে পাবার লোকই তুমি...

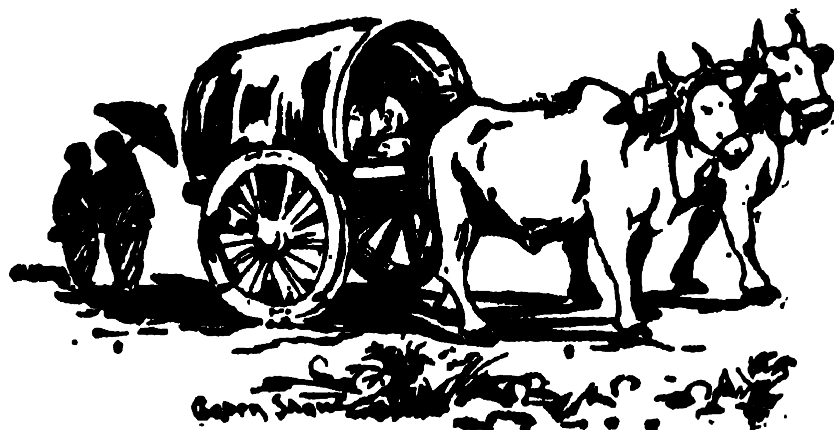
—কিন্তু এত সত্বর। তিন হপ্তা আর তিন মাস! মোটে!—তোমার পরমায়ুঃ আর একুশ দিন, আমার গ্রহের ফের সুরু হতে আর তিন মাস আছে।—বলিয়া চোখে দিবার অভিপ্রায়ে কোঁচা তুলিতে যাইয়াই হরিবিলাস দেখিলেন, তিনি পেণ্টুলান পরিধান করিয়া আছেন; রুমালের কথা তার মনেই পড়িল না।

চম্পকবরণীর অকারণেই মনে হইতে লাগিল, প্রতুল চ্যাটার্জ্জিটা তাঁহারই দিকে চাহিয়া আছে—আর কত দুষ্ট হাসি সে চাপিয়া আছে তাহার ঠিক্ নাই···

প্রতুলও তাঁহারই উদ্দেশে বলিল,—কাতর হবেন না—সত্যি এ হতেই পারে না।...আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন—আপনার আশীর্ব্বাদে আমার ফাঁড়াও কেটে যাবে।

মিষ্টার সেন এতক্ষণে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন, একুশ দিন ত' মোটে।···দেখা যাক্!

কিন্তু চম্পকবরণী ততক্ষণে বাহির হইয়া গেছেন।



পাথেয় উপন্যাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

পৌষের একটি সন্ধ্যা।

শুক্লা একাদশীর রাত্রি, শীতের কুয়াসায় জ্যোৎস্না স্পষ্ট হইয়া ফুটিতে পারে নাই। বাড়ীর সম্মুখের ফুলগাছগুলিতে ফুল ফুটিতে পারে নাই; পাতাগুলি শীতে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

রতিনাথবাবুর সুবৃহৎ অট্টালিকার দ্বিতলে একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে পিয়ানো বাজিতেছিল। খোলা জানালা পথে কক্ষস্থিত বৈদ্যুতিক আলোর রেখা বাহিরে আসিয়া জ্যোৎস্নার সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল।

তরুণী কেবল পিয়ানো বাজাইতেছিল, কণ্ঠে তাহার গান ছিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া একটী গৎ বাজাইয়া সে থামিল, দ্বারের কাছে কাহার পদশব্দ পাইয়া সে মুখ তুলিল।

ভৃত্য কৃষ্ণ দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল, অনেকক্ষণ হইতে সে অপেক্ষা করিতেছিল, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। এখন বাজনা থামিতে সে আস্তে আস্তে প্রবেশ করিল।

মনীষা জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই কৃষ্ণ?

কৃষ্ণ বলিল, 'একটি বাবু কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, কর্ত্তাবাবু তো এখনও ফেরেন নি, কি বলব তাঁকে?"

মনীষা বিস্ময়ে বলিল, "বাবা এখনও ফেরেন নি? এই শীত, তার ওপরে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। গাড়ী গেছে তাঁকে আনতে?"

কৃষ্ণ বলিল, "মোটর রোজকার মত চারটে না বাজতেই অফিসে গেছে।"

ব্যস্ত হইয়া মনীষা বলিল, "ছটা পর্য্যন্ত দেখে কাউকে বাবার অফিসে পাঠান উচিত ছিল, কোন্ একটা দুর্ঘটনা ঘটাও তো বিচিত্র নয়। তুমি নিজে যাও, না হয় বাবুর সেক্রেটারীকে পাঠাও।"

কৃষ্ণ চলিয়া যাইতেছিল, মনীষা আবার ডাকিল,—"যে বাবুটীর কথা বলছিলে—"

কৃষ্ণ বিরক্তভাবে বলিল, "তাকে এত করে বলছি তিনি কথা মোটে কানেই তুলছেন না। অবস্থা দেখে ভারী গরীব বলে মনে হল, হয় তো কিছু সাহায্যের জন্যে বাবুর কাছে এসেছে।"

মনীষা বলিল, "তুমি গিয়ে আগে সেক্রেটারী বাবুকে আফিসে পাঠিয়ে তারপর এই বাবুটীর নাম ধাম আর কি চায় তা জেনে এসে আমায় বল।"

কৃষ্ণ চলিয়া গেল।

মনীষা উদ্বিগ্ন ভাবে পিয়ানো ছাড়িয়া বাহিরে বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল।

কলিকাতার পথে দুর্ঘটনা ঘটা কিছু বিচিত্র নহে। রতিনাথবাবু কোনদিন এরূপ সন্ধ্যা করেন নাই, প্রতিদিন তিনি ঠিক পাঁচটার সময়ে বাড়ী ফিরিয়া আসেন, আজ সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে, এখনও তাঁহার ফিরিয়া না আসা চিন্তার কথাই বটে।

খানিক বাদে কৃষ্ণ ফিরিয়া আসিল। ব্যগ্রকণ্ঠে মনীষা জিজ্ঞাসা করিল, "আফিসে লোক গেছে?"

কৃষ্ণ বলিল, "হ্যাঁ, সেক্রেটারী বাবুকে বলতেই তিনি চলে গেছেন?' নীচের সেই বাবুটী—

মনীষা বলিল, "তিনি চলে গেছেন?"

কৃষ্ণ বলিল, "না, এখনও বসে আছেন, বল্লেন—বাবু এলে দেখা করে তবে যাব।"

মনীষা বিরক্ত হইয়া বলিল, "তিনি কি কিছু সাহায্য চান, না চাকরী চাইতে এসেছেন?

কৃষ্ণ বলিল, "কোন্ কথাই বল্‌লেন না, বল্‌লেন যা কথা তা বাবুর সঙ্গে হবে।"

মনীষা বিরক্ত হইয়া বলিল, "চল আমি যাচ্ছি। যদি কিছু সাহায্য চায় ওখান হ'তে দিয়ে বিদায় করে দিতেই হবে এখন, বাবা এই সারাদিন খেটে শ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফিরছেন এ সময়ে ও লোকটা আবার তাঁকে জ্বালাতন করে মারবে। এখন তুমি এসো তো কৃষ্ণ, একবার দেখি সে কি চায়?"

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে কৃষ্ণ বলিল, "লোকটা এ দিকে তো গরীব, অথচ, চালটুকু আছে ষোল আনা আমি চাকর বলে আমায় কিছু বলবে না, বলতে চায় খোদ কর্ত্তার কাছে।"

মনীষা হাসি চাপিয়া বলিল, "এ তার ভারি অন্যায়। তার জানা উচিত, কর্ত্তাবাবু নামেই কর্ত্তা, আসলে সকল কাজ আমাদের কৃষ্ণবাবুই করে, কাজেই কৃষ্ণের কাছে তার দরবার করা উচিত।"

লজ্জিত হইয়া কৃষ্ণ বলিল, "দিদিমণি তামাসা করছেন।"

মনীষা হাসিয়া ফেলিল, "তামাসা কি করে হল বল দেখি? বাবা সংসারের সব ভার তো তোমার পরে ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন, এটা কি তামাসার কথা?"

নীচে বৈঠকখানা ঘরে একখানা চেয়ারে সঙ্কুচিতভাবে নিরঞ্জন বসিয়া ছিল। এই ঘরের সাজসজ্জার সহিত নিজের পরিচ্ছদের তুলনা করিয়া সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার ছিন্ন জুতা, অর্দ্ধমলিন জামা কাপড়ের পানে তাকাইয়া এই ধনীর গৃহ যেন বিদ্রূপ করিতেছিল।

ঘরের মেঝে মূল্যবান কার্পেটে আবৃত, তাহার ছিন্ন জুতা পায়ে দিয়া এ ঘরে সে প্রবেশ করিতে লজ্জা বোধ করিয়াছিল, জুতা সে দরজার সম্মুখে খুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল।

এই গরীব লোকটাকে দেখিয়াই কৃষ্ণ তাহার উপর বিরূপ হইয়াছিল এবং তাহাকে দেখা মাত্র বিদায় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এরূপ ধরণের লোক ধনী গৃহের চৌকাঠ এপর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে পারে নাই, কিন্তু এ লোকটা একরূপ প্রায় জোর করিয়াই ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, কৃষ্ণ বাহির হইতে বলাসত্বেও নড়ে নাই।

সত্যই নিরঞ্জন মরিয়া হইয়া উঠিয়া ছিল। বাঙ্গালির ছেলে চাকরীর জন্য সব কাজই করিতে পারে, বড়লোকের বাড়ীর ভৃত্যের অপমান সহ্য করা তো ছোট কথা।

ঘরে যাহার অভাব, তাহার কানে তূলা দিতে হয়, পিঠখানা গণ্ডারের চামড়া দিয়া মুড়িতে হয়, আত্মসম্ভ্রম-বোধ শক্তি বিসর্জ্জন দিতে হয় নহিলে চাকরী মিলেনা, অনাহারে শুকাইয়া মরিতে হয়।

রতিনাথবাবুর অফিসে সে চার পাঁচদিন হাঁটিয়াছে, দ্বারোয়ান তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় নাই, তাহার হাতে নাম লেখা কাগজখানি পর্য্যন্ত বাবুর নিকটে লইয়া যায় নাই। ছাপান কার্ড হইলে হয় তো নিরঞ্জনের নামটাও রতিনাথবাবুর নিকটে উপস্থিত হইত, হাতে লেখা কাগজখানা দ্বারোয়ান ফেলিয়া দিয়াছিল।

আজ জোর করিয়াই নিরঞ্জন রতিনাথের বাড়ীতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং একখানা মূল্যবান চেয়ার দখল করিয়া বসিয়াছে। আজ সে রতিনাথের সম্মুখে নিজের ব্যথা বলিবে, এবং যেমন করিয়াই হোক, একটা কাজের ঠিক করিবেই।

কৃষ্ণ দরজার পর্দ্দা সরাইয়া বলিল, "বাবুর আসতে কত রাত হবে জানিনে, দিদিমণি এসেছেন, আপনার যা কথা থাকে ওঁকে বলে চলে যান।"

দিদিমণি—

নিরঞ্জন ঘামিয়া উঠিল। নিজের অর্দ্ধমলিন কাপড় জামার উপর চোখ পড়িতে সে শিহরিয়া উঠিল। না, এখানে আর না থাকাই ভাল, সে কখনও দিদিমণির সঙ্গে কথা বলিতে পারিবে না, সুশিক্ষিতা সুসভ্য ভদ্রমহিলার সম্মুখে সে এই সজ্জায় সজ্জিত হইয়া কথা বলিবে কি করিয়া—তাহার এই বেলা সরিয়া পড়াই উচিত, আর এখানে থাকা ভাল নয়।

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

ঠিক সেই সময় দরজার কাছে কাহার অতি মধুর কণ্ঠস্বর শুনা গেল—"তুমি একটু বাইরে থেকো কৃষ্ণ, বাবা এলেই আমায় খবর দিয়ো।"

দরজার পর্দ্দা সরাইয়া মনীষা প্রবেশ করিল। নিরঞ্জন সবিস্ময়ে এই মেয়েটির পানে তাকাইয়া তখনই চোখ নামাইল। মনীষা নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনিই বুঝি বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?

উঠ্‌লেন কেন—বসুন। বাবা এখনও ফেরেনি তা বোধ হয় শুনেছেন, আপনার যা কথা থাকে আমার বলতে পারেন।"

তাহার কণ্ঠস্বরে এমন একটা সহৃদয়তার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল যাহাতে নিরঞ্জন মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিল না, সে চোখ তুলিয়া ভাল করিয়া মেয়েটার পানে তাকাইল।

সুন্দর—অতি সুন্দর। দিদিমণি বলিতে সে যাহা ভাবিয়াছিল, এ মেয়েটার মধ্যে তাহার কিছুই নাই। সে ভাবিয়াছিল—এখানে এমন কোনও মেয়েকে দেখিবে যাহার পাশ্চাত্য বেশভূষা আগেই তাহাকে আঘাত করিবে। এখন দেখিল এ মেয়েটা তাহারই ঘরের একটা মেয়ে মাত্র। তরুণী বিধবা, শুভ্র একখানি থান তাহার কোমল দেহখানি বেষ্টন করিয়া আছে, সুন্দর দেহ অলঙ্কারশূন্য। বিলাসিতার লেশমাত্র ইহার মধ্যে নাই, তাহার সম্মুখে একটা পবিত্রা ব্রহ্মচারিণী দণ্ডায়মান।

নিরঞ্জন নরমস্বরে বলিল, "হ্যাঁ, তাঁর কাছে আমার খুব দরকার। চার পাঁচদিন তাঁর অফিসে দেখা করতে গিয়েছিলুম, কিন্তু নিতান্ত গরীব জেনেই দারোয়ান আমায় ভেতরে যেতে দেয়নি। এমন কি আমার নাম লেখা শ্লোগজখানা পর্য্যন্ত তাঁকে দেয়নি। সেই জন্যে বাধ্য হয়ে আজ জোর করে এঘরে বসেছি, আপনার চাকর উঠিয়ে দিতে এলেও আমি উঠি নি।"

ছেলেটার কুণ্ঠাহীন কথায় মনীষা খুসি হইয়া উঠিল, "হ্যাঁ, ও তা আমায় বলেছে। আমিও—"

নিরঞ্জন একটু হাসিয়া বলিল, "আপনিও সেই মতলবেই এসেছিলেন তা বুঝেছি—কি জানেন, গরীব হওয়া মস্ত বড় অভিশাপ, কিন্তু বাধ্য হয়েও, লোককে এ অভিশাপ কুড়াতেই হয়। ধনী হওয়ার ইচ্ছা করে সবাই, কিন্তু সবাই কি হতে পারে? জগতের দিকে ফিরে চান—দেখবেন দরিদ্রই বেশী, ধনীর সংখ্যা খুব কম। তবু মজার কথা কি জানেন, কোনোদিন এই দরিদ্রেরাই আবার হয় তো ধনী হয়, ধনীই হয় তো তাদের মত একমুঠো ভাতের জন্যে হাহাকার করে বেড়ায়। ওই যে একটা কথা আছে না— "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুখানি চ" এ কথাটা মানুষ জানে তবু তো বুঝতেও চায় না।"

মনীষার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে অস্ফুট কণ্ঠে বলিল, "সত্যিই দুনিয়ার ধারাই এই—বুঝেও তবু বুঝতে চায় না। আজ যে রাজা কাল সে ফকীর, আজ যে ফকীর কাল সে রাজা, বরাবর এই ধারাই পৃথিবীতে চলে আসছে।

নিরঞ্জন চেয়ারের হাতা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, "আপনাকে আর বিরক্ত করব না, তাঁর আসতে এখনও হয় তো অনেক দেরী হবে, আমি এইবার যাই, অদৃষ্ট নিতান্তই খারাপ নইলে কয়দিন অফিসে গিয়ে দেখা পেলুম না, আজ বাড়ীতে এসেও দেখা পেলুম না। যাই হোক একটা দিন ঠিক করে বলে দিতে পারবেন কি, কোন সময়ে এলে দেখা হবে সেটাও বলে দিলে ভাল হয়, তা হলে সেই দিনে সেই সময়ে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করব।"

মনীষা বলিল, "রবিবার দিনটা তিনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না, আর যে কোনওদিনে আপনি সকালবেলায় আসবেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। আমি আপনার কথা তাঁকে বলে রাখব, কিন্তু কি দরকারে এসেছেন সেটাও যদি বলে যান, আমি তাঁকে জানাব।"

শুষ্ক হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল, "কি দরকার তা এখনও বুঝতে পারেন নি জেনে আশ্চর্য্য হয়ে যাই। বাঙ্গালীর ছেলের দরকার চাকরীর, নইলে তারা না খেয়ে মারা যায়, দয়া করে তাঁকে বলে রাখবেন, যদি একটা কুড়ি টাকার চাকরীও আমায় দেন আমি চিরজীবন কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। তিনটী প্রাণীর ভরণ পোষণের ভার আমার উপরে—একটী পয়সা এ পর্য্যন্ত ঘরে নিয়ে যেতে পারিনি অথচ ঘরে কোনদিন অর্দ্ধাহার কোনদিন অনাহার—"

থামিয়া গিয়া সে হাতখানা কপালে ঠেকাইল, "নমস্কার, আসি তা হলে। আপনি দয়া করে তাঁকে বলে রাখবেন যেন ভুলবেন না।"

মনীষা কিছু বলিবার আগেই সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

দরজার পাশ হইতে রুষ্টস্বরে কৃষ্ণ বলিল, "লোকটা আস্ত জানোয়ার।"

মনীষা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "পেটে ভাত না থাকলে অনেক লোকই জানোয়ার হয়।"

(২)

রতিনাথ মিত্র গভর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, সংসারে

প্রতিপত্তি যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু জীবনের শেষ ভাগে তিনি সুখী হইতে পারেন নাই।

একদিন তিনি সোনার সংসার পাতিয়া ছিলেন, স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া সুখী হইবার আশা করিয়াছিলেন, আজ তাহাদের মধ্যে কেহই নাই, একমাত্র বিধবা পুত্রবধূ মনীষাই তাঁহার জগতে সম্বল।

পত্নী পুত্র ও কন্যাকে রাখিয়া অনেকদিন পূর্ব্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। অনেকের অনেক অনুরোধসত্ত্বেও পুত্রকন্যার মুখের পানে চাহিয়া রতিনাথ আর বিবাহ করেন নাই।

কন্যাকে তিনি উপযুক্ত রকম শিক্ষিতা করিয়া উপযুক্ত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। জামাতা শশাঙ্ক সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু অদৃষ্টে এ সুখ সহিল না, বিবাহের কিছুকাল পরেই করুণা মারা যায়। শশাঙ্ক আর বিবাহ করে নাই, বিবাহ করিবে না বলিয়া দৃঢ়পণ করিয়াছে। এখনও সে পূর্ব্বের সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া মাঝে মাঝে শ্বশুরালয়ে আসিয়া দুচারদিন থাকিয়া যায়।

মনীষা রতিনাথ বাবুর বাল্যবন্ধু সুরেশবাবুর কন্যা। বাল্যকালে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। যখন তাহার বিবাহ হয় তখন হিরণ্ময় পঞ্চদশবর্ষীয় বালক ও মনীষা মাত্র অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা।

এই বিবাহের মূলে ছিল দুই বন্ধুর প্রতিজ্ঞা। পুত্র কন্যার জন্মের বহুপূর্ব্বে হইতে এই দুইটী অভিন্ন হৃদয় বন্ধু বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিলে রতিনাথবাবু পুত্রের বিবাহ দিয়া এই মেয়েটীকে কাছে লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, সুরেশবাবুর ইহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ইহাতে অসম্মত হইলেন—এতটুকু বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে তিনি একেবারেই অনিচ্ছুক ছিলেন।

কিন্তু তাঁহার মত এখানে কিছুমাত্র ফল দিল না, রতিনাথবাবু যখন সুরেশবাবুর হাত দুখানা চাপিয়া ধরিয়া মনীষাকে তখনই প্রার্থনা করিলেন তখন সুরেশবাবু মত না দিয়া পারিলেন না। স্ত্রীর অসম্মতিতেও একদিন মহাসমারোহে মনীষার সহিত হিরণ্ময়ের বিবাহ হইয়া গেল।

কিন্তু বিবাহের ফল হইল অন্যরূপ। রতিনাথের সকল আশা ব্যর্থ করিয়া বালিকা মনীষার নাম হতভাগিনী বিধবার শ্রেণীভুক্ত করিয়া বিবাহের দুই বৎসর পরে হিরণ্ময় ইহলোক ত্যাগ করিল।

এই সময় মনীষা ছিল তাই রতিনাথ বাবু আবার উঠিতে পারিয়াছিলেন, আবার দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই মেয়েটী বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভালবাসিত, পিতার নিকটে কন্যা যেমন অসঙ্কোচে আবদার করে তেমনিই করিত। বিবাহের পূর্ব্ব হইতে সে রতিনাথবাবুর নিকটে থাকিত। পিতা মাতা ভাই বোনের সহিত তাহার বিশেষ সংস্রব ছিল না। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পরে রতিনাথ বাবুর অন্তরের পুঞ্জীকৃত—স্নেহ ভালবাসা সকলই মনীষার উপর গিয়া পড়িয়াছিল।

মনীষা বি এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, সে এখানেই বরাবর-কার জন্য রহিয়া গিয়াছিল, পিত্রালয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই চলে। রতিনাথের উপর অত্যন্ত রাগ করিয়াই সুরেশবাবুর স্ত্রী সুরমা কন্যার সহিত সম্পর্ক রাখেন নাই। তিনি পূরা রকমে পাশ্চাত্য প্রথায় চলিতেন, পুত্র কন্যা সকলকেই তাঁহার মতানুসারে চলিতে হইত। মনীষাকে নিজের কাছে আনিয়া তাহাকে তিনি নিজের মতানুযায়ী গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা করিয়া ছিলেন, কিন্তু মেয়েটী সব রকমেই তাঁহাকে এড়াইয়া গেল, সে কিছুতেই মায়ের কাছে ধরা দিল না।

রতিনাথের প্রদত্ত শিক্ষায় সে শিক্ষিতা হইয়াছিল, মায়ের এতটা বাড়াবাড়ি তাহার একেবারেই অসহ্য মনে হইত, সেই জন্য সে স্বেচ্ছায় মায়ের সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়াছিল।

এই বয়সেই কন্যা যে সর্বত্যাগিনী ব্রহ্মচারিণী হইয়া উঠিল, ইহাতে সুরমা মর্ম্মাহতা হইয়াছিলেন বড় কম নয়, ইহার জন্য তিনি স্বামীকে দোষ দিতেন, নিজের ললাটে করাঘাত করিয়া চোখের জল ফেলিতেন।

পিতা মাতার বুক হইতে সন্তানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রতিনাথও বড় কম অনুতপ্ত হন নাই। তিনি সন্তানকে ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মনীষা নড়িল না।

ব্যাকুলভাবে রতিনাথ কেশ বিরল মাথায় হাত বুলাইতেন, কিন্তু প্রতিবিধানের কোনও উপায় তিনি খুঁজিয়া পাইতেন না। মাঝে যে ঘটনা পূর্ণ দিনগুলো আসিয়াছিল

যদি তাহা কোনরূপে মুছিয়া দিয়া তিনি মনীষাকে পিতা মাতার কাছে ফিরাইয়া দিতে পারিতেন, তবে নিজের জীবনে চিরকালের জন্য একাকীত্বের কষ্ট বরণ করিয়া লইতেন, মনীষাকে জড়াইতেন না।

এই মেয়েটীর অন্তর বড় কোমল ছিল, কাহারও দুঃখ কষ্ট দেখিলে বা কানে শুনিলে সে ব্যগ্র হইয়া উঠিত, তাহার জন্য রতিনাথকেও বড় কম ব্যস্ত হইতে হইত না। অনেক সময়ে নিজের কাজের ক্ষতি করিয়াও তাঁহাকে মনীষার আবদার রাখিতে হইত।

সেদিন নিরঞ্জনের মলিন মুখ ও দুঃখপূর্ণ কথাগুলিতে মনীষা অন্তরে সত্যই বেদনা অনুভব করিয়াছিল। ধনীর দুলালী হইলেও সে দরিদ্রের দুঃখ কষ্ট বুঝিত এবং সে দুঃখের বেদনা নিজের হাতে মুছাইয়া দিতে তৎপর হইত।

সংসারে নিরঞ্জনের বৃদ্ধ পিতা ও মাসীমা ছিলেন। একটী মাত্র ভগিনীর সম্প্রতি বিবাহ দিতে তাহাদের যথা সর্ব্বস্ব গিয়াছে, মাথা রাখিবার আশ্রয় দেশের বাড়ীখানি পর্য্যন্ত নাই। পিতা স্থবির বৃদ্ধ, তাহার উপর নিত্য অসুখ লাগিয়াই আছে।

একদিন সৌভাগ্যের তুঙ্গশিরে তিনি আসীন ছিলেন। মফঃস্বলের কোন সহরে ওকালতি করিয়া যৌবনে তিনি প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে কর্ম্মত্যাগ করিয়া তিনি সঞ্চিত অর্থ লইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু সৌভাগ্য লক্ষ্মী তাঁহার উপর বিরূপ হইয়া ছিলেন, তাই বিদেশের ব্যবসার সহিত যোগ রাখিতে গিয়া তাঁহার ব্যবসা নষ্ট হইয়া গেল. উপরন্তু দেনার দায়ে যথা সর্ব্বস্ব গেল।

এই সময় হইতে দারুণ মনোকষ্টের দরুণ তাঁহার স্বাস্থ্যও নষ্ট হইয়া গেল, জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য ঘটিল, আর কিছুতেই তিনি সুস্থ হইতে পারিলেন না।

নিরঞ্জন বি এ পাস করিয়াও অদৃষ্টের জন্য কোন কাজ পাইতেছিল না, অনেক চেষ্টা করিয়াও সে ব্যর্থ হইতেছিল।

গৃহের অভাব দিন দিন বাড়িয়া চলিতে ছিল, রুগ্ন ও বিকৃত মস্তিষ্ক পিতার নিকটে সংসারের ব্যাপার আর প্রচ্ছন্ন রাখা চলে না। নিরঞ্জন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

একখানি ক্ষুদ্র খোলার ঘর ভাড়া লইয়া তাহাতে এই চারিটী প্রাণী কোন রকমে মাথা গুঁজিয়া ছিল। খোলার ঘরের সামান্য মাসিক ভাড়া কিন্তু তাহাই তিনমাস দেওয়া হয় নাই।

মাসিমা উমাসুন্দরী আছেন বলিয়াই কোন রকমে সংসার চলিতেছে। তিনি বাল বিধবা, ভগিনীর নিকটেই বরাবর ছিলেন, ভগিনীর মৃত্যুর পরেও এখানে রহিয়া গিয়াছেন।

(৩)

"মনি—মা—"

কানে এই আহ্বান আসিবামাত্র মনীষা উত্তর দিল, "যাচ্ছি বাবা—"

হাতের বোনাটী টেবিলের উপর ফেলিয়া সে উঠিয়া আসিল।

রতিনাথ শ্রান্তভাবে একখানা ইজিচেয়ারে অড়ি হইয়া পড়িয়াছিলেন, মনীষা আসিয়া তাঁহার পিছন দিকে দাঁড়াইল।

রতিনাথ বলিলেন, "আজকাল মায়ের আমার কি যে এত কাজ পড়েছে তা বুঝতে পারি নে, ডেকে ডেকে তবে কাছে পাওয়া যায়।"

কুণ্ঠিত হইয়া মনীষা বলিল, "না বাবা শুধু আজকের দিনটাই তো ডেকেছেন, অন্যদিন আমি তো এখানেই থাকি।"

চাপা হাসি হাসিয়া রতিনাথ বলিলেন, "না হয় আজকের দিনটাই, কিন্তু কেন হল বল দেখি মা?"

মনীষা তাঁহার শুভ্র মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, "একটা গলাবন্ধ বুনছিলুম বাবা! যার জন্যে বুনছিলুম তার কথা ভাবছিলুম কিনা, সেই জন্যে আপনার আসার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম।"

রতিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার গলাবন্ধ বুনছিলে মা?"

মনীষা বলিল, 'পাশের বাড়ীতে একটী বউ আছে তাকে গলাবন্ধ বুনে দেওয়ার জন্যে তার স্বামী হুকুম দিয়েছে। তার হুকুম মত যদি বুনে না দেয় বউটীর লাঞ্ছনার সীমা থাকবে না অথচ বেচারার সারাদিনের মধ্যে এতটুকু অবকাশ নেই। কিন্তু স্বামী তো সেকথা বুঝবেন না, এদিকে ঘড়ি ধরে সব কাজ নিয়মিত হওয়া চাই—একচুল

এদিক ওদিক হলে বউটীর লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। বাড়ীতে একটী মাত্র ঝি আছে, তা থাকা সত্ত্বেও সমস্ত কাজ বউটীকে করতে হয়, সে থাকা না থাকা সমান। এর পর ছুটি-ছেলেপুলে, এসব নিয়ে স্বামীর হুকুম মত গলাবন্ধ বুনে দেওয়া-যে কি হাঙ্গাম তা তো তিনি বুঝবেন না, তাঁর গলাবন্ধ চাই-ই। বউটী কাল সব দুঃখের কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ভাসাচ্ছিল, আমি তার সেই গলাবন্ধ বুনে দেওয়ার ভার নিয়েছি।"

রতিনাথ একটু হাসিলেন, তখনই গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "জীবনটা শুধু পরের কাজেই কাটিয়ে দিলে মা। কার কি হল, কে খেতে পায় নি, কার সেবা করতে কেউ নেই, এই সব দেখে আর তার প্রতিবিধান করতেই দিন কাটালে, আমার ঘরের কাজ যে এদিকে কিছুই হয় না।"

মনীষা অভিমানের সুরে বলিল, "তা তো আপনি বলবেনই বাবা; আমি ঘরের কাজ করে তবে তো বাইরের কাজে হাত দেই। ঘরের কাজ মানে কেবল আপনাকে দেখাশুনা, আর কি করতে দেন শুনি?"

রতিনাথ হাসিতে লাগিলেন—"পাগলী মা আমার এইবার রাগ করেছে বুঝেছি। না মা, রাগ দুঃখ করো না, আমি শুধু তোমায় রাগাবার জন্যেই এ সব কথা বলছি। আমি কি জানি নে তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, যে কাজে তোমার হাত না পড়ে তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, দুদিন ছিলে না তাতে আমার খাওয়া হতে আরম্ভ করে সব বিষয়েই দারুণ বিশৃঙ্খলা ঘটেছিল। ডেকে ডেকে একটা চাকরকে পাই নে, খেতে গিয়ে দেখি তরকারী কোনটা নুণে ভরা, কোনটাতে নুণ নেই। অফিসে যাওয়ার সময় এতগুলো চাকর থাকতেও কোথায় জামা, কোথায় জুতো, জামায় হয় তো বোতাম নেই—এমনই হাজার অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল।"

তিনি প্রচুর হাসিতে লাগিলেন, মনীষা শুধু মলিন মুখে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

"আচ্ছা বাবা একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমাদের দেশে অনেক পুরুষে মেয়েদের অভাব বোঝে না কেন, এত নির্য্যাতন করে কেন? আপনি স্বামীত্বের অহঙ্কার নিয়ে মার উপর কোন দিন স্নেহের নামে এ রকম অত্যাচার করে ছিলেন?"

রতিনাথ গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন, অতীতের সেই দিনগুলার কথা মনে জাগিয়া উঠিল, ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, "না মা, কোনদিন আমার জ্ঞানে তাঁকে একটা কড়া কথা বলিনি। স্ত্রী যে সহধর্ম্মিণী, গৃহের লক্ষ্মী, আমার সন্তানের মা, তাঁকে কি অপমান করা চলে মা? যে সংসারে নারীর অপমান হয় সে সংসার যে উচ্ছন্ন যায় আমাদের হিন্দুশাস্ত্রও তো এ কথা স্পষ্ট বলে থাকে।"

মনীষা বলিল, "তবে কেন ওরা অমন ধারা অত্যাচার করে বাবা? পাশের বাড়ীর এই বউটী—দেখেছি ভোর হতে রাত অবধি ভূতের মত খাটে, একদণ্ড ওর হাতের পায়ের বিশ্রাম নাই, কতদিন গভীর রাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে, আমার ঘরের জানলা বরাবর ওদের খোলা জানলা পথে দেখেছি স্বামী দিব্য আরামে ঘুমাচ্ছে আর বউটি তার গা টিপে দিচ্ছে, ঘুম আসছে—ঝোঁকে তার গায়ের পরে পড়তেই স্বামীর ঘুম ভেঙ্গে সে গর্জ্জে উঠছে।"

রতিনাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "এদেশের হাজার করা নয়শ নিরেনব্বই জন মেয়েকে এইভাবে নিজের কর্ত্তব্য পালন করে যেতে হয় মা। তাদের যখন বিয়ে হয় তখনই তাদের নিজের বলতে যা কিছু সব বিসর্জ্জন দিয়ে আসতে হয়, তারপর তাদের আত্মমর্য্যাদা বোধ পর্য্যন্ত রাখা চলে না।

মনীষা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "মেয়েরা না হয় তাদের স্বভাব অনুযায়ী সেবা করতে ভালবাসে বলেই সেবা করে, কিন্তু পুরুষেরা কেমন করে অসঙ্কোচে সেবা নেয়, অনেক সময়ে জোর করে সেবা দিতে বাধ্য করে আমি কেবল তাই ভাবি। সেদিন এই বউটীর স্বামী তাকে মেরেছিল, অথচ আপনি বলেন স্ত্রী গৃহের লক্ষ্মী, দেবী, কিন্তু সে কথা এরা কি জানে না বাবা? এ সংসারে পুরুষের পূর্ণ অধিকার রয়েছে—থাকবেও, মেয়েদের কি কোন অধিকার নেই?"

রতিনাথ শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "তাই কি হতে পারে মা, আমার তো তা বলে মনে হয় না। আমার মনে হয় সংসারে পুরুষের যেমন অধিকার, মেয়েদের অধিকার বরং তার চেয়েও বেশী, কারণ নারী মা, সংসারের গৃহিণী। পুরুষ বাইরে অক্লান্তভাবে খাটতে পারে, ঘরের মধ্যে সে

দৃষ্টি দেবে কখন, আর বাইরে খেটে এসে ঘরে যদি সে এতটুকু শান্তি তৃপ্তি না পায়, সে খাটবে কি করে? এই দেখ না, আমি কেমন বাইরে সারাদিন ভূতের মত খেটে এসে বাড়ীতে তোমার স্নেহ, যত্ন, আদর পেয়ে খাটনির কথাই ভুলে যাই, এমনই তো সকলেরই মা। তোমরা যে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছ মা, তোমরা যে মা। এই মাতৃজাতিকে যারা সম্মান করে না, তাদের কতখানি আত্মদানে সংসার সুখময় হয় তা যারা ভাবে না তাদেরকে আমি মানুষ বলি নে, তারা পশু। একদিন এ দেশে অসীম শক্তিশালিনী নারীকে দেবীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে, পুরুষ প্রকৃতির পূজা করে ধন্য হয়ে গেছে। সেই দেশেই নারীর এই নিত্য নির্য্যাতনে অপমানে শক্তি কি ঘুমিয়েই থাকবে মা, ওকে যে জেগে উঠতে হবেই। একটা কথা আছে জানো অত্যাচার বাড়তে বাড়তে যখন অনেক বেশীই হয়ে যায়, তখন বিপরীত দিকে কেউ তাকে বাধা দিতে দাঁড়ায়। সহনশীলা নারীরও এই অবাধ অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠেছে, দিন আসছে মা—দেখতে পাবে সমস্ত নারীসমাজ এই পুরুষ সমাজের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবেই, সে দিনের আর দেরী নেই।"

মনীষা একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আপনার আশীর্ব্বাদ সফল হোক, সে দিনের আর দেরী নেই বাবা, দিন আসছে। কারণে বিনা কারণে নারী যে অত্যাচার, যে লাঞ্ছনা সহ্য করছে, তাদের বুকের অন্তঃস্থল হতে যে দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠছে, চোখ হতে যে জল ঝরে পড়ছে, এ সবই জমা হচ্ছে। এমনি করে জমতে জমতে এই ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস একদিন মহাঝড়ে পরিণত হবে, এই লুকিয়ে ফেলা দু'চার ফোঁটা চোখের জল বিশাল সমুদ্রে পরিণত হবে। সেই মহাঝড়ে পৃথিবীর বুকের অত্যাচার উপদ্রব উড়িয়ে নিয়ে যাবে, অনন্ত চোখের জল সাগরে প্রচণ্ড ঢেউরূপে এসে সমস্ত দেশের বুকে প্লাবন আনবে, সেই প্লাবনে সকল মলিনতা ধুয়ে যাবে। সে দিনের আর দেরী নেই তা জানা যাচ্ছে না বাবা?"

রতিনাথ একটু হাসিলেন।

৪

হাতে লেখা নামের কার্ডখানা দ্বারোয়ানের হাতে দিয়া ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া নিরঞ্জন স্পন্দিত দেহে বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। দ্বারোয়ানের নিকটে সে আগেই সংবাদ লইয়াছিল রতিনাথ এখন বাড়ীতেই আছেন, কোথাও যান নাই।

খানিক বাদে দ্বারোয়ান ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বসিতে বলিল, জানাইল বাবু এখনই বাহিরে আসিবেন, তখন দেখা হইতে পারিবে।

সেই বৈঠকখানায় আজও নিরঞ্জন বসিল।

আজ সে কতকটা ভদ্রভাবে আসিয়াছিল। তাহার পায়ে কমদামের একজোড়া স্যাণ্ডাল ছিল, পরণের কাপড়খানা ও জামাটা পরিষ্কার ছিল।

প্রতিদিন কত দরজায় তাহাকে ফিরিতে হয় কোন স্থানে যাইবামাত্র গলাধাক্কা পাইয়াছে, কোন স্থানে এতটুকু বসিয়া বিনয়নম্র কথায় বিদায় পাইয়াছে।

প্রায় মিনিট পনের বাদে রতিনাথ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

নিরঞ্জন সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল, রতিনাথ একটু হাসিয়া শুধু মাথাটা একটু নত করিলেন। কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি আসিয়া একখানা চেয়ার সরাইয়া দিল, তিনি তাহাতে বসিলেন, শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "বস।"

নিরঞ্জন বসিল।

রতিনাথ বলিলেন, "আমার মার কাছে শুনলুম তুমি নাকি আরও একদিন এবাড়ীতে এসেছিলে, কিন্তু সেদিন আমি বাড়ী ছিলুম না, তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি।"

নিরঞ্জন নম্রভাবে বলিল, "তিনি আমায় রবিবার ছাড়া আর যে কোনদিন আসবার কথা বলে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন তিনি আপনাকেও আমার কথা বলে রাখবেন।

রতিনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি সব শুনেছি। কিন্তু আমি একটু মুস্কিলে পড়েছি কেননা আমার অফিসে এখন কোন কাজ খালি নেই তবে হ্যাঁ, মা যখন কথা দিয়েছেন তখন আমায় তোমার একটা কাজ যোগাড় করে দিতেই হবে। আমার একটী বন্ধুর ছেলে সুশীল একটা অফিস খুলছে শুনেছি, সে প্রায়ই আমার কাছে আসে, আজও আসবার কথা আছে। আমি ভেবেছি সে এলেই আমি তার কাছে তোমার কথা বলব, আমার বিশ্বাস তার ওখানে তোমার কাজ নিশ্চয়ই হবে।"

নিরঞ্জন হতাশ হইয়া পড়িল। যে দিন হইতে সে আশা করিয়া আছে, রতিনাথবাবু তাহার একটী কাজ নিশ্চয়ই দিবেন। কে সেই সুশীল, কোথায় তাহার অফিস, কিসের অফিস, সে তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে কিনা তাহাই বা কে জানে

তাহার মলিন মুখখানার পানে তাকাইয়া একটু হাসিয়া রতিনাথ বলিলেন, "তুমি তার জন্যে হতাশ হয়ো না, আমি জানি সুশীল আমার অনুরোধ,—তার দিদিমণির অনুরোধ ঠেলতে পারবে না। কতদূর পর্য্যন্ত পড়েছ, আর কোথাও কাজ করেছ কি না—"

নিরঞ্জন শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "বি, এ, পড়েছি—একজামিনে ফার্ষ্ট হয়ে পাশও করেছি, কিন্তু চাকরীর বাজারে তার কোন দাম নেই। এখন মনে হয়—যে পয়সাটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ডিগ্রি কিনতে ঢেলেছি, সেটা যদি থাকত তবু আজ একটু উপকার হতে পারত। চাকরী দু এক জায়গায় দু'চার দিনের জন্য করেছি মাত্র, স্থায়ী কাজ কোথাও পাই নি।"

রতিনাথ মাথা দুলাইয়া বলিলেন, "তুমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির কথা বললে সেটা বাস্তবিক সত্য। বড় চাকরী এককালে ডিগ্রির জোরে মিলত বটে। আর বড় চাকরী পাওয়ার লোভে বাঙ্গালী বাস্তবিক সব কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করে—এমন কি পেটে না খেয়ে পর্য্যন্ত ডিগ্রি নেওয়ার চেষ্টা করেছে, এখনও করছে। এত ছেলে যে উচ্চশিক্ষা লাভ করছে এদের সকলেরই লক্ষ্য চাকরী, দাসত্বের নেশা এদের এমন পেয়ে বসেছে যে এরা আর নূতন কোন কিছু করবার কল্পনা পর্য্যন্ত করতে পারে না। দেশের জমিগুলো দিন দিন অনুর্ব্বর হয়ে উঠছে, গো-বংশ ধ্বংস হয়ে আছে,—পেটে খেতে পাচ্ছে না, কাপড় পরতে পারছে না—তবু এরা এদিক পানে চাইতে পারে না। কেন—চাকরী করার চেয়ে সম্মানের সঙ্গে নিজের মাঠে চাষ করা কি মন্দ, কাপড় বোনা কি শক্ত; দেশের ভবিষ্যৎ আশা কচি ছেলেগুলো যে এতটুকু হতে দুধ খেতে না পেয়ে শুকিয়ে যায়, তাদের মস্তিষ্ক অনুর্ব্বর হয়ে পড়ে,—তাদের জন্য গো-পালন করা কি খারাপ?"

নিরঞ্জন খানিক চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "দেখুন যা বললেন সবই সত্য; যদি নিরেট মুর্খ হতুম, শিক্ষার বীজ যদি উর্ব্বর মাথায় না বোনা হতো, গরু পুষতে পারতুম, মাঠেও চাষ দিতে পারতুম, চরকায় সুতো কেটে কাপড়ও তৈরী করতে পারতুম। কিন্তু এই পাশ্চাত্য শিক্ষাই না আমাদের জানিয়েছে ও সব ছোটলোকের কাজ, শিক্ষিত ভদ্রলোক চাকরী করে খেতে পারে—মাঠে চাষ করতে যেতে পারে না।"

রুষ্টভাবে রতিনাথ বলিলেন, "পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণই ওই। এর কাজটা কি রকম জানো—অতি ধীরে কেন না হঠাৎ যদি কোন সংস্কার উচ্ছেদ করতে যাওয়া যায় তার ফল ভাল হয় না, কিন্তু আস্তে আস্তে দুদিনের জায়গায় দু বছর লাগালে ঠিক ফল দেবেই। পাশ্চাত্য প্রাচ্যের মুখে বিষের বাটী ধরেছে, এ বিষে একেবারে মারবে না, তাকে জর্জ্জর করে ধীরে ধীরে হত্যা করবে। তুমি প্রত্যেক বিষয়ে লক্ষ্য করে দেখ ওদের এই নীতিটা বেশ দেখতে পাবে, ধীরে ধীরে আমাদের যা কিছু একদিন অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হতো, তার পরে, কি রকম বিদ্বেষ এনে দিচ্ছে, আর ওরা-

দরজার পর্দ্দাটা একটীবার কাঁপিয়া উঠিল, তাহার পরই পর্দ্দা সরাইয়া একটী ইউরোপীয়ান পরিচ্ছদে সজ্জিত যুবক প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া রতিনাথ বলিয়া উঠিলেন, "এই যে, তুমি এসেছ সুশীল, এই আর একটু আগেই তোমার নাম করছিলুম।"

নিরঞ্জন ঘামিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি সে মুখ নত করিল। তাহার মনে হইতেছিল কোন ক্রমে এ স্থান ত্যাগ করিতে পারিলে সে এখন বাঁচিয়া যায়, পরিচিতের সম্মুখে অপদস্থ হইতে হয় না।

সেই সুশীল—সে আজ সৌভাগ্যের উচ্চশৃঙ্গে বসিয়া, আর তাহারই সহপাঠি সে, সে আজ কোথায়? সুশীল তাহার বাল্যবন্ধু স্কুলে তাহারা বরাবর একত্রে পড়িয়াছিল, তাহার পর ম্যাট্রিক পাশ করিয়া একই কলেজে তাহারা দুই বৎসর একত্রে পড়িয়াছিল, আই এ পাশ করিয়া সুশীল বিলাতে চলিয়া গিয়াছিল, সে আজ চার বৎসর পূর্ব্বের কথা মাত্র।

অদৃষ্ট চক্রের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। সুশীল যেমন ছিল তেমনই আছে, কিন্তু নিরঞ্জনের শুধু ভাগ্যই পরিবর্ত্তন

হয় নাই, তাহার আকৃতির পর্য্যন্ত যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে যাহাতে সুশীল অপরিচিত বোধে হঠাৎ নিমিষের দৃষ্টি লাভে তাহাকে চিনিতে পারিল না।

পরের কাছে দীনতা জানানো তবু সম্ভব বোধ হয়, কিন্তু আত্মীয় বন্ধুর নিকটে কিছুতেই মাথা নত করিতে পারা যায় না। একদিন, যে সুশীলের পার্শ্বে বন্ধুরূপে সে দাঁড়াইয়াছে, আজ তাহাকে প্রভু স্বীকার করিয়া তাহার আসনের নীচে সে বসিবে কি করিয়া, এ কল্পনাও যে অসহ্য।

সুশীল অপরিচিত এই লোকটার পানে মোটে দৃষ্টিপাত করে নাই বলিলেই হয়। সে রতিনাথকে নমস্কার করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া তাঁহার কাছেই বসিয়া পড়িল, পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল, "যাই বলুন—রাজার নিজের দেশটা বেশ, বারমাসই ঠাণ্ডা, গরম কাকে বলে তা কেউ জানে না। এই সকাল বেলাই এ দেশে কি গরম দেখেছেন ঘেমে যেন স্নান করে উঠেছি।"

একটু হাসিয়া রতিনাথ বলিলেন, "বৈশাখ মাস গরম পড়বারই কথা। পল্লীগ্রামের দিকে যাও এখানকার চেয়ে একটু ঠাণ্ডা বোধ হবে। সহরের মধ্যে অসহ্য গরমে টেঁকা যখন দায় হয়ে ওঠে, তখন পল্লীগ্রাম বেশ ঠাণ্ডা মনে হয়।"

সুশীল বলিল,—"অন্য বছর আপনাদের অফিস দার্জ্জিলিংয়ে উঠে যায়, এ বছর গেল না কেন?"

মুখখানা বিকৃত করিয়া রতিনাথ বলিলেন, "কর্ত্তাদের ইচ্ছা, আমাদের কথাতো ওখানে খাটে না, ওরা যা খুসী তাই করে যাবেন আমরা কেবল হুকুম মেনে যাব বইতো নয়, হাজার দু হাজারই মাইনে পাই না, তবু আমরা সেই চাকর, হুকুম তামিল করা ছাড়া ওদের মনস্তুষ্টি করা ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই!"

ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া সুশীল বলিল, "যাই বলুন, এমনভাবে নিজের সত্তা বিসর্জ্জন দিতে বাঙ্গালীরা যত বেশী পারে আর কেউ তত পারে না। সমস্ত বাঙ্গালী একসাথে কোন দিন মিলতে পেরেছে—না পারবে? আজকে দেশে এই একটা হুলুস্থুলু কাণ্ড পড়ে গেছে, এতে সকলেই কি যোগ দিয়েছে? যারা সরকারের চাকরী করে তারা ভয়ে জড়সড়, পাছে কিছু হয়, পাছে চাকরী যায়। এমনি করে হুকুম তামিল করতেই এরা অভ্যস্ত, একদিন যদি হুকুম তামিল না করতে পারে—তাদের জীবনটাই দুর্ব্বহ হয়ে ওঠে।"

রতিনাথ একটু হাসিলেন, পরক্ষণে গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তুমি যা বলেছ সেটা বাস্তবিকই ঠিক কিন্তু—

বাধা দিয়া সুশীল বলিল, "আবার মজা দেখুন—ওদের দেশে ওদের সঙ্গে মিশলে এ রকম ভাবটা দেখা যায় না, ওরা ঠিক নিজের মতই আপনাকে দেখবে, কিন্তু এদেশে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাবটা এমন বদলে যায় যে আপনি তখন ভাবতেই পারবেন না তার সঙ্গেই আপনার সেখানে এত ভালবাসা ছিল! এখানে এসেই সে আপনার সঙ্গে প্রভু ভৃত্য সম্পর্কটা জাগিয়ে তুলবে, তার সমান হয়ে পাশে দাঁড়ানোর অধিকার আর আপনার থাকবে না।"

রতিনাথ বলিলেন, "সেটা এদেশের জল হাওয়ার দোষ। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ কথা চলন আছে লঙ্কায় যে আসে সেই রাক্ষস হয়, কথাটায় মিথ্যে বাস্তবিকই নেই, তার প্রমাণ আমরাও অহোরাত্র পাচ্ছি। ওদের দেশ স্বাধীন, পরাধীন নয়, তাই নিজের দেশের আব-হাওয়ার মধ্যে থেকে পরের মর্য্যাদা রক্ষা সম্বন্ধে ওরা যথেষ্ট সচেতন থাকে। এদেশ পরাজিত, এদেশের মাটিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতনভাব ওদের দূর হয়ে যায়; পরাজিতের পরে বিজেতার যে হীন মনোবৃত্তির ভাব জেগে ওঠে তার জন্যে ওদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, মানুষের স্বভাবজ ধর্ম্মই এই যাকে আমি দু কথা শুনিয়ে দিতে পারি তাকে তা শুনাতে আমি ইতস্ততঃ করিনে। যারা আমার অধীনে কাজ করে তারা আমাদেরই দেশের লোক, তার জাতি ধর্ম্ম, আমার জাতি ধর্ম্ম সবই এক, তবু সে আমার অধীনে কাজ করে বলেই আমি নিজের প্রভুত্বটুকু বজায় রাখতে—নিজের সম্মান-টুকু পুরাদস্তুর আদায় করে নিতে ভুলিনে। সেইটুকুই যেন আমার লক্ষ্য আমার বড় কাজের সার্থকতা।"

সুশীল অন্যমনস্কভাবে ঘুর্ণায়মান ইলেকট্রিক পাখার পানে তাকাইয়াছিল। রতিনাথ বলিলেন, "আশা করেছি তোমার জ্ঞান সার্থক হয়ে তোমার মধ্যে এ ভাবটা জাগাবে না। তোমার অফিসে কি রকম চলছে বল দেখি?—"

সুশীল সংক্ষেপে উত্তর দিল, "মন্দ নয়।'

রতিনাথ বলিলেন, "এই ভদ্রলোকটী কাজের প্রার্থী হয়ে আমার কাছে এসেছেন, আমি ওকে আশা দিয়েছি তোমার অফিসে যাতে কাজ হয় সে চেষ্টা করব। বি, এ পর্য্যন্ত পড়েছেন, দুই এক জায়গায় অস্থায়ীরূপে কাজও করছেন। তোমার অফিসে একটু বিচিত্রতা আছে, অত বড় একটা ব্যাপারে তুমি ভারতীয় ছাড়া আর কারও সাহায্য নাও নি সেই জন্যেই আমি একে আশা দিয়েছি, স্বজাতীয় একে তুমি ফিরাবে না।

সুশীল এতক্ষণে মুখ তুলিয়া ভাল করিয়া নিরঞ্জনের পানে চাহিল, সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"নিরু না ?"

নিরঞ্জনের মুখে বড় মলিন একটু হাসির রেখা জাগিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল, ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, আমিই বটে।"

সুশীল লাফাইয়া উঠিল—"আমায় ক্ষমা করতে হবে, আমি তোমায় মোটেই চিনতে পারি নি। না খেয়ে খেয়ে চাকরীর জন্য দরজায় দরজায় ঘুরে যা চেহারা করেছ তাতে আমি কেন—চার বছর পরে যদি তোমার বাবাও তোমায় দেখতেন চিনতে পারতেন না।"

প্রবল আকর্ষণে নিরঞ্জনকে তাহার প্রশস্ত বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া দুই একটা ঝাঁকানি দিয়া সুশীল বলিল, "তোমার মত অকৃত্রিম বন্ধু পেলে আর আমি কাউকেই চাই নে। বস এই চেয়ারটায়।"

নিজের পার্শ্বের চেয়ারটায় সে জোর করিয়া নিরঞ্জনকে বসাইয়া দিল।

রতিনাথ হাসিয়া বলিলেন, "তবে আর কি, তোমরা যখন বন্ধু—" মুখের কথা লুফিয়া লইয়া সুশীল বলিল, "বন্ধু বলে বন্ধু, ওকে আমার জীবনদাতা বলুন। স্কুলে যখন পড়তুম যত অন্যায় কাজ করতুম তার দরুণ যত শাস্তি সব বয়েছে নিরু, আমায় এত তফাতে রাখত যে কেউ জানতেও পারত না যত অকাজ আমার দ্বারাই হয়েছে। ওর পিঠখানা খুলে দেখুন—বোধ হয় হেডমাষ্টারের বেতের দাগগুলো এখনও পিঠে রয়েছে।"

বলিতে বলিতে সে নিরঞ্জনের পিঠ চাপড়াইতে লাগিল।

রতিনাথ বলিলেন, "শুনে সত্যাই আমার খুব আনন্দ হল। তা হলে আমি এখন নিশ্চিন্ত—তোমার বন্ধুর জন্যে আর আমায় ভাবতে হবে না,"

উৎফুল্ল মুখে সুশীল বলিল, "কিছু না, কি বল নিরু ?

নিরঞ্জন কেবল একটু হাসিল।

(৫)

সুশীল কেবলমাত্র অফিসে পৌছাইয়াছিল, সেই সময় আর্দ্দালী আসিয়া সেলাম দিয়া দাঁড়াইল।

সুশীল জিজ্ঞাসা করিল, "কিছু দরকার আছে ?"

বিনীতভাবে সে বলিল, "হ্যাঁ সাহেব।"

একখানা কার্ড সে সুশীলের হাতে দিল, তাহাতে নাম লেখা আছে, মিস ইরা দাস।

চকিতে সুশীলের মনে পড়িয়া গেল মিস ইরা দাস দুইদিন আগে টাইপের কাজের দরখাস্ত করিয়াছিল, সে তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়াছে, এবং অবিলম্বে তাহাকে অফিসে আসিয়া দেখা করিতে বলিয়াছে।

নিরঞ্জন অফিসে ছিল, সুশীল আর্দ্দালীর হাতে কার্ড দিয়া বলিল, "ম্যানেজার বাবুকে নিয়ে গিয়ে দাও, আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসছি। বাবুকে বল গিয়ে যে মেয়েটী এসেছেন তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলেন।

বাহিরে কোথায় কাজ ছিল, তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া গেল, এবং অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়া আসিল।

হাতের কাগজপত্রগুলা নিজের অফিস রুমের টেবিলে ফেলিয়া সে নিরঞ্জনের নিকটে চলিল।

নিরঞ্জনের ঘরে গোল টেবিলটার একপাশে বসিয়া নিরঞ্জন লিখিতেছিল, অপর পাশে বসিয়া একটী মেয়ে সেদিনকার সংবাদপত্রখানা দেখিতেছিল। সুশীল প্রবেশ করিতেই সে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হাত দু'খানা কপালে ঠেকাইল। সুশীল প্রত্যভিবাদন করিয়া শ্রান্তভাবে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, বলিল "বসুন আপনি। কি রকম গরম দেখেছ নিরঞ্জন, পথে বার হওয়ার যো নেই। এইটুকু পথ হেঁটে গেছি, তবু তো পায়ে জুতো আছে—তাতেই প্রাণ বার হয়ে যাচ্ছে। কত গরীব লোক যে শুধু পায়ে পথ হাঁটছে কি করে আমি তাই ভাবছি।"

চাপা হাসি হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল, "ওরা হাঁটছে পেটের দায়ে, মটরে উঠে বেড়ানোর অদৃষ্ট তো সবাই নিয়ে আসে না, এমন কি পয়সা খরচ করে ট্রামে বা বাসে উঠবার

ক্ষমতাও সকলের নেই, কাজেই ওই পিচ গলা রাস্তাতে লাফাতে লাফাতেও তাদের হাঁটতেই হয়—নইলে খেতে পাবে না।"

"উঃ কি দুঃখময় জীবন—" সুশীল শ্রান্ত ভাবে চেয়ার হেলান দিল।

নিরঞ্জন হাসি চাপিয়া বলিল, "এখন তোমার ভাব বৈচিত্র্য রেখে দিয়ে আসল কাজের কথা বল। ইনি মিস ইরা দাস, সেদিন টাইপের জন্য এখানে দরখাস্ত করেছিলেন, তুমি এঁর দরখাস্ত মঞ্জুর করেছ। মিসেস ব্রাউনের বিশেষ পরিচিতা তোমার গার্জেন মিঃ রায় তাঁর বিশেষ বন্ধু তিনি একখানি পত্র লিখে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

মেয়েটী বিনীত ভাবে একখানা পত্র বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

মিঃ দেব নারায়ণ রায় ইংলণ্ডে রহিয়াছেন, তাঁহার কন্যা ইন্দিরাও তাঁহার নিকটে রহিয়াছে। মিঃ রায়ই সুশীলকে, ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাকে সুশিক্ষিত করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছেন, নিজের অসীম ধনসম্পত্তি ভবিষ্যৎ জামাতার হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

মিসেস ব্রাউন দেবনারায়ণ রায়ের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন। ইন্দিরাকে তিনি স্নেহ করিতেন, ভালবাসিতেন, তাহার জন্য সুশীল তাঁহার স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিল।

সুশীল পত্রখানা তুলিয়া লইল: মিসেস ব্রাউন লিখিয়াছেন মিস দাসকে তিনি সুশীলের নিকট পাঠাইতেছেন তিনি আশা করেণ, এখানে মিস দাস সম্মানের সহিত কাজ করিতে পাইবে। এই মেয়েটী টাইপ এবং সার্টহাণ্ডের কাজ খুব সুন্দর জানে, তিনি আশা করেন ইহার দ্বারা সুশীলের উপকার ছাড়া অপকার হইবে না।

সুশীল অন্যমনস্ক ভাবে পত্রখানা মুড়িতে মুড়িতে মিস দাসের পানে চাহিল।

শ্যামবর্ণা মেয়েটী—বয়স বাইশ তেইশ হইবে, লম্বা—রোগা ধরণের আকৃতি। মাথা ভরা কালো চুল, বেণীর আকারে পিছনে জড়ানো আছে; যদিও মাথায় সামান্য একটু কাপড়ের আবরণে লুক্কাইত তথাপি উপর হইতে দেখিয়াই তাহার পরিমাণ বেশ বুঝা যায়। বড় বড় দুইটী চোখে শান্ত স্নিগ্ধ সরল দৃষ্টি, সেই দৃষ্টিতেই যেন তাহার অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। পরণে সাদাসিদা হাত কাটা একটী ব্লাউজ, একখানি কালা ফিতা সাড়ি, পায়ে অল্প মূল্যের লেডিস্ সু। অলঙ্কারের বাহুল্য ছিল না; কানে দুইটী ক্ষুদ্র ইয়ারিং হাতে দুইগাছি করিয়া সরু সোণার চুড়ি।

তাহার বেশভূষা অতি সামান্য কিন্তু ইহাতেই তাহাকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। সুশীল পলকের দৃষ্টিপাতে তাহাকে দেখিয়া লইয়া চোখ ফিরাইয়া বলিল, "ব্রাউন যখন আপনাকে পাঠিয়েছেন তখন আপনার এখানে কাজের সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ করতে হবে না। আপনি আজ হতে এ অফিসে কাজ করতে আরম্ভ করুন। তার আগে আপনাকে একটা কথা জানিয়ে রাখি; আমরা যে কাজটা আরম্ভ করেছি আমি এর প্রকৃত মালিক নই। মিঃ দেব নারায়ণ রায় যতদিন ইংলণ্ড হতে না ফিরে আসেন ততদিন আমিই এর কর্ত্তা, তিনি ফিরে এলে সমস্তই তাঁর হাতে যাবে। আপনার বেতন সম্বন্ধে—"

মিস দাস মৃদুকণ্ঠে বলিল, "মিসেস ব্রাউনের কাছে সে কথা শুনেছি, এখানে চল্লিশটাকা করে বেতন পাবো।"

সুশীল বলিল, "উপস্থিত তাই বটে তবে আমাদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা আপনার বেতনও বাড়িয়ে দেব, আমরা—ভরতীয়েরা ব্যবসাবণিজ্যের প্রণালী ইউরোপীয় ধারায় গঠন করে সেই ধারাটা চালাতে চাই। যে নূতন পথে চলেছি—ছয়টী মাস গেলে ঠিক বুঝতে পারব। আমাদের কোম্পানীর নাম মেরিন ট্রেডিং কোম্পানী। এর অংশীদার ভারতীয় কর্ম্মচারীরাও ভারতীয়, বিদেশীকে এর সঙ্গে জড়াতে নেব না। ইউরোপীয় যে কোন জাতি সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে—আশাতীত উন্নতিও লাভ করে, কিন্তু এ দেশের লোকেরা কেন তা পারে না আমি একবার সেইটাই পরীক্ষা করতে চাই।"

একটু থামিয়া সে বলিল, "অবশ্য যার কাজ তিনি জানেন না আমি এই নূতনতর ধারায় কাজ করতে আরম্ভ করেছি। যদি উন্নতিলাভ করতে পারি তা হলে তাঁর মনের সংস্কারটা দূর হয়ে যাবে। বুঝেছ নিরু, আমি একদিন তাঁকে আমার কল্পনার এতটুকু আভাস দিয়েছিলুম, কিন্তু তাতে তিনি স্পষ্টই বলেছেন ভারতীয়দের দ্বারা কিছু হয় নি, হবে না। আমি তখন মাড়োয়ারী ভাটিয়া প্রভৃতি জাতির কথা তুলেছিলুম, তিনি বলেছিলেন তবু

ওরা পারবে কিন্তু বাঙ্গালী কোনদিন কিছু পারবে না। আমারও তাই জিদ পড়ে গেছে, আমি আমার কাজ কেবলমাত্র ভারতীয়দেরই দেব, বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালীকেও বাদ দেব—না।"

মিস দাস প্রশংসমান দৃষ্টিতে এই দীর্ঘ দেহ সুপুরুষ যুবকটীর মুখের পানে চাহিল, শান্তকণ্ঠে বলিল, "বাঙ্গালী হয়ে বাঙ্গালীকে মানুষ করবার জন্যে আপনি যে যত্ন চেষ্টা করছেন তাতে যদিও প্রশংসার কিছু নেই কারণ এটা করা সকল বাঙ্গালীরই উচিত তবু প্রশংসা করি কারণ উচ্চশিক্ষিত কেউই এ রকম করে দেশের পানে জাতির পানে তাকান না। আমি খৃশ্চান হলেও বাঙ্গালী, আমার বাপ মা পূর্ব্বপুরুষ সবই বাঙ্গালী। বাঙ্গালা আমার জন্মস্থান, আমি বাঙ্গালাকে আন্তরিক ভালবাসি। আপনি বাঙ্গালীর জাতীয় কলঙ্ক মুছিয়ে দিয়ে যে রকম চেষ্টা করছেন, যে প্রতিষ্ঠানটী গড়ে তুলছেন, আপনার দেখাদেখি আরও পাঁচজন শিক্ষিত বাঙ্গালী এইরকমভাবে এই জাতিকে সংঘবদ্ধভাবে গড়ে তুলবার চেষ্টা করবেন, বাঙ্গালীকে একটা জাতি নামে পরিচিত করবার চেষ্টা করবেন।"

নিরঞ্জন একটু হাসিয়া বলিল, "আপনাদের মনের ইচ্ছা খুবই মহৎ তাতে অনুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু কথা হচ্ছে কি, অনেক সময়ে মনের ইচ্ছা কাজে পরিণত করা যায় না। একদিন বাঙ্গালী জাতি নামে পরিচিত হবে কিন্তু তা ব্যবসার দিক দিয়ে নয়—অন্য দিক দিয়ে। ব্যবসার কাজে বাঙ্গালী এখনও নাবালক রয়েছে, মাথা পাকাতে এখনও অনেক দেরী রয়েছে।"

উত্তেজিতভাবে সুশীল বলিল, "তুমি কি চাও বাঙ্গালী চিরদিনই পেছনে পড়ে থাকবে, বাঙ্গালী কোনদিন সগৌরবে, মাথা তুলে জগতের মাঝখানে নিজের জাতীয়তা প্রমাণ করতে পারবে না? এই শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশ, এই দেশে যতটা আয় এত আর কোন দেশে হয় দেখাতে পার?"

মৃদু মৃদু হাসিয়া নিরঞ্জন বলিল, "ধীরে বন্ধু ধীরে। শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশে আর আছে কি? মাঠগুলো ধূ ধূ করছে, নদী খাল বিল কচুরী পানায় ভরে গিয়ে ম্যালেরিয়ার বিষ সঞ্চয় করছে, তবু বলতে চাও শস্যশ্যামলা বঙ্গদেশে নেই কি? হ্যাঁ, তবু এতে আয় হয়। মাঠে ফসল উৎপন্ন না হলেও কৃষককে খাজনা দিতে হয়, পেটে না খেয়েও খাতককে মহাজনের দেনা শোধ করবার জন্যে মাথা গুঁজবার স্থানটুকু বিক্রি করতে হয়। হ্যাঁ—তবু আয় আছে বই কি, বাংলা সরকারের একটা প্রধান আয়ের যন্ত্র, যত ঘুরায় ততই টাকা পড়ে একথা অস্বীকার করতে পারব না।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সুশীল বলিল, "বাংলার প্রকৃত রূপটাকে তুমি দেখলে কোথায় নিরঞ্জন?"

নিরঞ্জন বলিল, "দেখবার অভাব? তোমরা কলকাতার বাইরে হয়তো যাও না, যদিও যাও সেই রকমভাবে যাও যাতে নিজেদের দিক ছাড়া অপর দিকে দৃষ্টি পড়ে না। তোমরা অনেক সময় সখের খাতিরে পল্লীগ্রামে বেড়াতে যাও, কিন্তু সেখানে কতটুকু দেখতে পাও বল দেখি? সবুজ ধানের ক্ষেত দেখতে যাও, পাঁচ ক্রোশ মাঠের মাঝখানে বিঘাখানেক সবুজধানের ক্ষেত দেখে আনন্দে অধীর হয়ে ওঠ কিন্তু সে যে কতটুকু তা তো দেখ না। নদী দেখতে যাও, কলকাতার গঙ্গা দেখে দেশের যাবতীয় নদী সম্বন্ধে ধারণা করে নাও, কিন্তু সে কথাতো ভাবনা নিজেদের স্বার্থের জন্যে সরকার এই দিককার গঙ্গা পরিষ্কার রেখেছে কিন্তু অন্যদিকে এই গঙ্গাই বন্ধ হয়ে এসেছে, অন্য সব নদীর কথা দূরে থাক। তোমরা দেখতে পাও শুধু ওপরটা, ভেতর তো কোনদিন দেখ নি, হয়তো দেখতে পাবেও না।"

সে উঠিয়া দাঁড়াইল—"না, অনর্থক বাক্যব্যয় করার আর দরকার নেই। তুমি বস সুশীল, আমি মিস দাসকে ওঁর কাজগুলো বুঝিয়ে দিয়ে আসি।"

সঙ্গে মিস দাসও উঠিয়া দাঁড়াইল। সুশীল একটা হাই তুলিয়া আড়ামোড়া ছাড়িয়া বলিল, "ওঁকে বুঝিয়ে দিয়ে এসো তারপর তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

তাহাকে অভিবাদন করিয়া মিস দাস নিরঞ্জনের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল।

মিনিট কুড়ি পঁচিশ পরে নিরঞ্জন ফিরিয়া আসিল টেবলের উপরিস্থিত ছড়ানো কাগজ-পত্রগুলো গুছাইয়া এক করিতে করিতে বলিল, "মেয়েটী বেশ চালাক আর

খুব কর্ম্মঠ তা বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। এর আগে যে টাইপিষ্ট ছোকরাটা ছিল সে কোনকাজ বুঝতে পারত না, কিন্তু একে একবার দেখিয়ে বলে দিতেই বেশ বুঝে গেল দেখলুম।”

সুনীল গম্ভীরভাবে বলিল, “তা তো বুঝলুম, কিন্তু এই এতগুলো পুরুষের মধ্যে একটামাত্র মেয়ে টাইপিষ্ট আমার যেন কি রকম বোধ হচ্ছে ”

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিল, “ভয় হচ্ছে ?”

সুনীল তাহার কথার মর্ম্ম বুঝিয়া হাসিল, গর্ব্বিতভাবে বলিল, “ভয় নয়। জানইতো আমার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, মিস ইন্দিরা আমার বাগ্‌দত্তা পত্নী, আর সেই জন্যেই মিঃ রায় এতটা সম্পত্তি নিঃসঙ্কোচে আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। ইন্দিরাকে যদিও তুমি দেখনি, কিন্তু তার ফটো দেখেছতো তার কাছে মিস দাস দাঁড়াতে পারে ?”

নিরঞ্জন বলিল, “তবে ? স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে থাকতে হবে বলে কুমার হৃদয় বুঝি সঙ্কুচিত হয়ে উঠচে, অথবা মিস রায় কি ভাববেন সেই ভয়ে—”

সুনীল মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, মিস রায় ওকে দেখলে সে ভয় করতে পারবে না। তবুও পাছে আর কেউ কিছু বলে তাই ভাবছি।”

নিরঞ্জন বলিল, “তবে নিশ্চিন্তে থাক। আজ কাল অনেক মেয়েই পুরুষদের সঙ্গে মিশে কাজ করতে যায়, তা হলে সে রকম জায়গায় পুরুষদের কাজ করতে না যাওয়াই উচিত। বিলেতে যে স্ত্রী পুরুষে একত্রে কাজ করে তার বেলায় তোমাদের মনে এতটুকু দ্বিধা ভাব জাগতে পারে না, বরং সেই সাম্যভাবে তোমরা মুগ্ধ হয়ে যাও, যত দোষ হল কি এই দেশের বেলায় ?”

সুনীল উত্তর না দিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, “তা হলে তুমিই সব দেখা শুনা কোর আমি চললুম।”

সে বাহির হইয়া গেল।

(৬)

আকাশ নিবিড় মেঘে ছাইয়া আসিয়াছে, বহুকাল পরে দারুণ গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রের পর মেঘের এই ছায়াটুকু বড়ই প্রীতিপ্রদ বলিয়া বোধ হইতেছে।

গেটের সম্মুখে প্রকাণ্ড কৃষ্ণচূড়া গাছটা লাল ফুলে উঠিয়া অপরিসীম সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। ছোট ছোট পাখীগুলা ফুলের উপর বেড়াইতে কচিৎ দুই একটা পাপড়ি খসিয়া পড়িয়া যাইতেছে। অনতিদূর পথ হইতে চলন্ত ট্রামের মোটরের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল। মনীষা স্নানান্তে পূজার ঘরে যাইতেছিল, লাল ফুলে ভরিয়া উঠা সুন্দর গাছটার পানে একটাবার দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারিল না। রতিনাথ আহারান্তে খানিক আগে আফিসে গিয়াছেন, এতক্ষণে সময় পাইয়া মনীষা স্নানান্তে প্রত্যহ পূজাহ্নিক করিতে যায়। রতিনাথ বাড়ী থাকিতে তিনি তাহাকে শত অনুরোধ করিলেও সে নিজের কাজে যায় না, প্রত্যেক রবিবারে এজন্য সে পিতৃসম শ্বশুরের নিকট তিরস্কৃতও হয় বড় কম নয়।

আসল কথা পূজাহ্নিক সারিতে তাহার প্রায় দুইঘণ্টা সময় লাগে। প্রত্যহ পূজাহ্নিক সারিয়া নিজের অন্যান্য কাজ সারিয়া যখন সে আহার করিতে বসে তখন দুইটা বাজিয়া যায়। বাড়ীর দাস দাসী সকলের খাওয়া হইল কিনা, কাহার অসুখ করিয়াছে এই সব দেখাশুনা তাহার নিত্য কর্ত্তব্য কাজ। রতিনাথ মনে মনে খুসি হইয়া উঠিলেও, মুখে অনুযোগ করিতেন, মনীষা হাসিয়া উত্তর দিত—ওরা পেটের দায়ে চাকরী করতে এসেছে বাবা, আহা,—ওরাও মানুষ তো। ওদের না দেখলে যে ভগবানের কাছে দোষী হতে হবে।”

প্রত্যহ শিবপূজা করা তাহার চিরন্তন নিয়ম। একজন ব্রাহ্মণ প্রত্যহ গঙ্গা মৃত্তিকা, ফুল বিল্বপত্র চন্দন ইত্যাদি আবশ্যকীয় জিনিষ ঠিক করিয়া রাখিয়া যায়, কাজেই মনীষাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না।

আপন মনে স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে মনীষা পূজার আয়োজন করিয়া লইল। স্বামীর ফটোখানি শিবলিঙ্গের পার্শ্বে রাখিয়া সে পূজা করিতে বসিল।

পূজা শেষান্তে সবে মাত্র সে প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে সেই সময় হাসির শব্দ কানে আসিল।

আগন্তুক খানিক আগে আসিয়া দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল, সে দিকে পিছন থাকায় মনীষা দেখিতে পায় নাই।

“বাঃ, খাসা পূজো করতে শিখেছ যে মনীষা, তোমার এ বুদ্ধি কে দিলে জিজ্ঞাসা করি—।”

চমকাইয়া উঠিয়া মুখ ফিরাইয়া, মনীষা দেখিল দরজার উপর দাঁড়াইয়া শশাঙ্ক।

মনীষার মুখখানা সিঁদুরের মত লাল হইয়া উঠিল, সে বলিল, "ঘরে গিয়ে বস দাদা আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি আমার পূজা হয়ে গেছে।"

শশাঙ্ক বলিল, এখানে দাঁড়ালেই বা কি হল? ভয় নেই, এই ম্লেচ্ছ লোকটা তোমার পূজোর ঘরে ঢুকে সব অপবিত্র করে দেবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক।

মনীষা সঙ্কোচের সহিত বলিল, "তা ওঘরে গিয়ে বসলেই বা কি ক্ষতি?

শশাঙ্ক বলিল, "এখানে দাঁড়ালেই বা কি ক্ষতি? অর্থাৎ কি জানো—কোন সেই ছোট বেলায় মায়ের কোল ছেড়ে বিধর্ম্মীদের সঙ্গে থেকে তাদের চেয়েও ঘোর পাষণ্ড হয়ে উঠেছি। তাদের তবুও একটা ধর্ম্ম আছে, আমার কিছু নেই, যে যখন যে দিকে টানে সেই দিকেই আছি—অর্থাৎ দরকার পড়লে খৃশ্চান মুসলমান ব্রাহ্ম হিন্দু—আর যাই বল সবই হই। কিন্তু আসল কি জানো—কোন ধর্ম্মই নেই নি, কাজেই পৈত্রিক ধর্ম্মটা কোন মতে টিকে আছে বলে মানতেই হবে, হয়তো মরব যখন তখন হরিবোল শব্দটাও হবে। সত্যি—পূজো কখনও দেখিনি,—নাস্তিক কিনা—চোখ বুজে কাণে হাত চাপা দিয়ে পালিয়েছি। আজ একটু না হয় দেখতেই দাও মনীষা পূজো জিনিষটা কি?"

দরজার ওদিকে দুখানা হাত রাখিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে দেখিতে লাগিল, মনীষা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিতেছিল।

"ওটা কি ঠাকুর বল দেখি? যা করে আকন্দ ফুল আর ধুতুরা ফুল বেলপাতায় ঢেকে দিয়েছ তাতে তো ঠাকুরকে দেখে চেনার পথ রাখনি দেখছি। কি ঠাকুর বল দেখি?"

মনীষা উত্তর দিল না।—

শশাঙ্ক একটু ভাবিবার ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ওঃ, বুঝেছি, তোমায় বলার লজ্জা হতে মুক্তি দিচ্ছি মনীষা, শিব ঠাকুর ছাড়া আর কোন ঠাকুরই তো বেলপাতা আকন্দ ধুতুরা ফুল ভাল বাসেন, না, কাজেই ওটিয়ে স্বয়ং শিব তা বুঝতেই পারছি।"

মনীষা, একটু হাসিয়া বলিল, "আমার পূজা হয়ে গেছে, চল ও ঘরে যাই।"

সে উঠিয়া পড়িল

শশাঙ্ক বলিল, "রোসো রোসো, আর একটু দেখে নেই অসভ্য ভেবনা মনীষা, নেহাৎ দেখিনি বলেই এমন করে খুঁটিয়ে দেখছি। তারপর—ওখানা কি বই—এখানে নভেল নাটকও আসে নাকি?"

মনীষা বলিল, "নভেল নাটক পড়ার সময় কোথায়, জানই তো সংসারে আমার কত কাজ,—কাজ বাড়ছে ছাড়া কমছে না তো। ওখানা নভেলও নয় নাটকও নয়, ওখানা গীতা।"

শশাঙ্ক যেন চমকাইয়া উঠিল—"এঃ, আবার গীতাও পড়তে সুরু করেছ। বুঝলে মনীষা, ও সব এ যুগের বই নয়, ওর যুগ চলে গেছে, ও সব এখন চালিয়ো না।"

মর্ম্মাহত হইয়া মনীষা বলিল, "চলে যায়নি দাদা, ওর যুগ আছে, চিরকাল থাকবেও। তুমি পড়নি এ কথা বলতে পার, পড়বে না এ জোরও করতে পার, কিন্তু আর কেউ যে পড়বে না এ কথা বলা চলে না।"

শশাঙ্ক বলিল "আমি পড়ব না, একথা বলতে পারিনা। তবে-

মনীষা বলিল, "তবে পড়ে ফেল, অনেক কিছুই জানতে পারবে, বুঝতেও পারবে।"

গম্ভীর মুখে শশাঙ্ক বলিল, "হুঁ, এইবার পড়তে হবে। বইখানা ও ঘরে নিয়ে যাবে মনীষা, ওখানা উদরস্থ করা চাই। সব কিছুই তো উদরস্থ করেছি, ওখানা আর বাকি রাখি কেন? এরপর দরকার পড়লে কোন হিন্দু মহাসভায় খানিক খানিক উগরে ফেলতে পারব।"

বলিতে বলিতে সে অত্যন্ত খুসি ভাবে হাসিতে লাগিল।

তাহার হাসিতে মনীষা আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। অনেকগুলা কথা তাহার ওষ্ঠাগে আসিয়া ফিরিয়া গেল; কয়েক বৎসর পরে শশাঙ্ক আসিয়াছে, এখন কোন শক্ত কথা বলা উচিত নহে।

মনীষা কোন কথা না বলিয়া বাহির হইয়া আসিয়া দরজায় শিকল তুলিয়া দিল, তাহার পর চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করি দাদা, সত্যি বল দেখি—সত্যিই তুমি ভগবানকে মানো না?"

শশাঙ্ক মাথা দুলাইয়া বলিল, "মানব কি করে, এমন কি প্রমাণ আছে যাতে ভগবান বলে কেউ আছে মেনে নেব ?"

মনীষা বলিল, "তবে এই যে সৃষ্টি—"

বাধা দিয়া শশাঙ্ক বলিল, "সব প্রকৃতির নিজের সৃষ্টি, এর মধ্যে কারও হাত নেই। কল্পনা বাগীশ কতকগুলো লোক এই কতকগুলো সৃষ্টি করছে ; যা স্বভাবতঃ হয়—ওরা দেখতে চায় ভগবান নামে কেউ আছে যে এই সব করছে। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি মনীষা, যদি ভগবানই থাকবে—তবে মরা কেন বাঁচে না ? জীবন দেওয়ার ক্ষমতা বাস্তবিকই যদি ভগবানের থাকে তবে এতটুকু প্রমাণ নাস্তিক কেন পায় না ?

মনীষা স্থিরকণ্ঠে বলিল, "হয়তো কোনদিন এ প্রমাণ মিলতে পারে দাদা। জীবের জীবন যা তাকে দেওয়া হয়েছে তার একটা সীমা আছে, সেই সীমার একচুল এ দিক ও দিক হওয়ার শক্তি জীবের নেই। সেই সীমাটুকুর মধ্যে আমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবন ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই হয়তো এমন কোন প্রমাণ পেতে পারি যাতে বিশ্বাস করতে বাধ্য হব—ভগবান সত্যিই আছেন, প্রকৃতিও তাঁর হাতের সৃষ্টি, তার হাতে এই কাজের ভার দিয়ে তিনি সর্ব্বদাই দেখছেন। এখনও যার সত্য নিরূপণ করা যায়নি তার জন্যে প্রস্তুত হতে আমি তোমায় বলিনে। আমার বিশ্বাস আছে প্রমাণ আপনিই আসবে, তাকে জোর করে টেনে আনা চলে না।"

শশাঙ্ক একটু হাসিয়া বলিল, "হয়তো তোমার কথা একদিন ঠিক হতে পারে ; যদি ঠিক না হয় তার জন্যেও আমি ততটা উৎসুক হব না" একটু থামিয়া সে বলিল, "আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মনে কিছু করো না ; তোমার ঠাকুরের পাশে একখানা ছোট ফটো দেখতে পেলুম ওখানা কার ফটো ?"

মনীষা উত্তর দিল, "আমার স্বামীর।"

তাহার দৃঢ়কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হইয়া শশাঙ্ক তাহার পানে চাহিল, হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "কবে কার সঙ্গে কোন সেই ছোটবেলায় বিয়ে হয়েছিল, যাকে চিনতে না চিনতে সে চলে গেল তবু তাকেই স্বামী বলে জানতে চাও মনীষা ?"

মনীষার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল, চলিতে চলিতে সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, দৃপ্তনেত্রের দৃষ্টি শশাঙ্কের মুখের উপর স্থাপন করিয়া শান্ত সংযতকণ্ঠে বলিল, "তুমি নাস্তিক, বুঝতে পারবে না এ রহস্য কি রকম জটিল। তবে তোমায় এইটুকুই বলে রাখছি দাদা যে ধর্ম্মের ছায়ায় তুমি চিরকাল কাটিয়ে এসেছ, চিরদিন যাদের সঙ্গে মিশেছ, আমরা তার ছায়ায় যাই নি, তাদের সঙ্গে মিশলেও নিজেদের বৈশিষ্ট্য তোমার মত বিসর্জ্জন দিতে পারিনি। আজ তুমি যে কথা আমায় জিজ্ঞাসা করছ, এ কথা জিজ্ঞাসা করতে পারতে না যদি তোমার মা থাকতেন। মানুষ অনেক কিছুই তার মায়ের কাছ হতে শিক্ষা পায় এ কথা মান তো ?"

শশাঙ্কর মুখখানা মুহূর্ত্তমধ্যে মলিন হইয়া গেল, প্রায় তখনই স্বাভাবিক ভাব ফিরিয়া আসিল, সে বলিল, "সে কথা খুব মানি। কিন্তু জানোই তো আমার জীবনটা কিভাবে কেটেছে। সাতমাস বয়স যখন তখন মা মারা যান, একবছরের সময় বাবা মারা যান, বাবার বন্ধুর কাছে গেলুম, অচিরে তিনি মারা গেলেন, তখন বয়স মাত্র পাঁচ বছর। তাঁর স্ত্রী আবার বিয়ে করলেন, আমায় বোর্ডিংয়ে দিলেন। আমার জীবনের ঘটনাতো তোমাদের কাছে গোপন নেই মনীষা।"

সে যে কতকটা রূঢ়ভাবেই কতকগুলা কথা বলিয়া গিয়াছে এজন্য মনীষা অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, কোমল-সুরে বলিল, "সব জানি দাদা, তোমায় আর সে সব পুরান কথা নতুন করে বলতে হবে না। ওদিকে আবার যাচ্ছো কোথায়, এই ঘরে এসো।"

অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া শশাঙ্ক গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল।

(ক্রমশঃ)

গয়ায় একদিন

(ভ্রমণ)

শ্রীগিরিবালা দেবী

অগ্রহায়ণের মেঘস্নিগ্ধ সন্ধ্যায় আমরা গয়ার গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। শীতের প্রারম্ভ—পশ্চিমের গাড়ী একেবারেই জন শূন্য। মাত্র দুইটি মহিলা আমাদের সহযাত্রী হইলেন। একটি তরুণী, অপরা বৃদ্ধা। তরুণীর স্বামী থিয়েটারের অভিনেতা। শরীর অসুস্থ বলিয়া কাশীতে জ্যেঠামহাশয়ের বাড়ীতে বিশ্রাম করিতে যাইতেছেন। সঙ্গের মেজুরটি অভিনেতার মাসীমা

গাড়ী ছাড়িবার পর সঙ্গিনীদের সহিত অল্প অল্প আলাপ করা গেল। বৃদ্ধা প্রতিকথায় "কাশীতে আমাদের বাড়ী আছে।" বলিয়া গর্ব্ব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখে কাশীর বাড়ীর বর্ণনা শুনিয়া আমি জানালার পাশে আশ্রয় লইলাম।

রাত্রি বাড়িবার সাথে সাথে মেঘের ঘোর কাটিয়া ম্লান জ্যোৎস্নালোকে চারিদিক হাসিতে লাগিল। পাতলা কুয়াসার আবরণ ভেদ করিয়া প্রকৃতির প্রফুল্ল কান্তি পরিস্ফুট হইল।



ধ্যানমূর্ত্তি বুদ্ধ

মোটা কম্বলে গা ঢাকিয়া আমরা সকলেই শয়ন করিলাম। রাত্রি চারিটায় ট্রেণ গয়া ষ্টেশনে পৌছিবে—কাজেই উৎকণ্ঠার সহিত জাগিয়া কবি সম্রাট রবীন্দ্রের 'যোগাযোগ'খানি পুনরায় পড়িতে লাগিলাম। ভাব সম্পদে ভাষার অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে অল্প সময়ের মধ্যেই অভিভূত হইয়া রহিলাম।

তিনটার পর আর যোগাযোগ লইয়া তন্ময় হইয়া থাকা চলিল না। সাথে আমার বৃদ্ধা শ্বশ্রুমাতা, জিনিষপত্র সহকারে তাঁহাকে লইয়া নামিতে হইবে। কাজেই বিছানা বাঁধিতে হইল। রজনী শেষ হইলে তখনও শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় চরাচর হাসিতেছে। ঘনবৃক্ষশ্রেণীর শেষ সীমায় কাল পাহাড়গুলি পটে আঁকা ছবির ন্যায় আকাশের গায়ে মিশিয়া গিয়াছে।

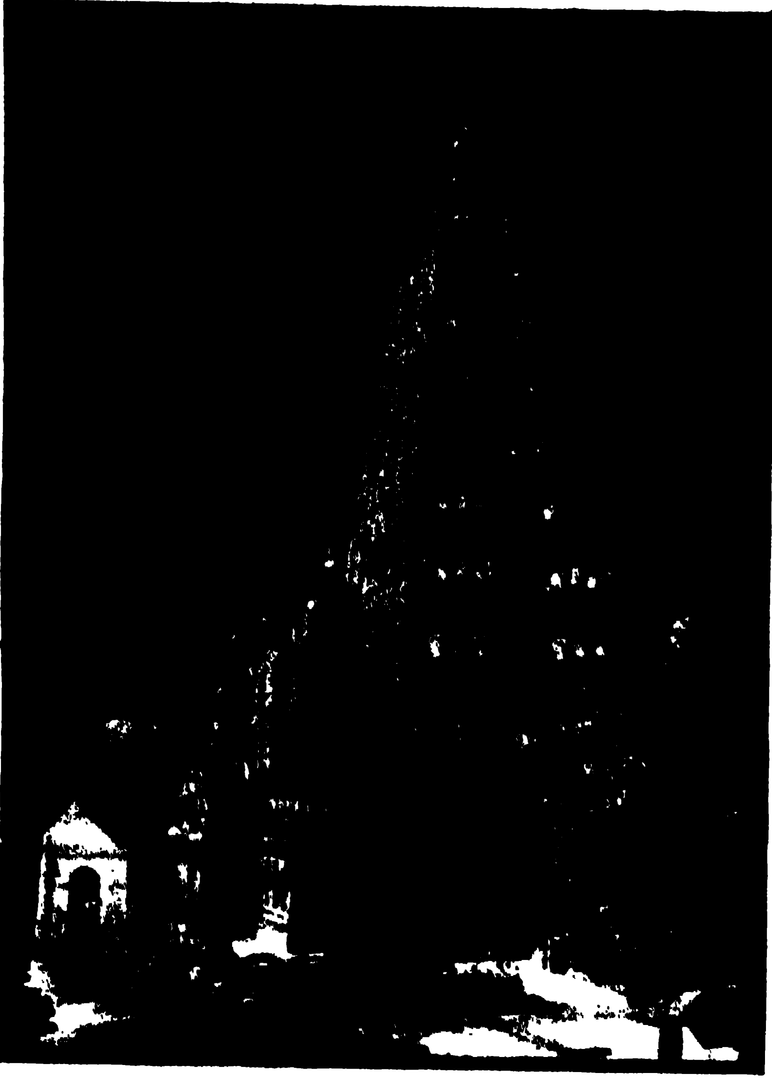
পথের একদিকে অগণিত গিরিমালা, অপর দিকে প্রান্তর—স্থানে স্থানে স্বল্প জলাশয়গুলি রূপার পাতের মত ঝক্‌মক্ করিতেছে।

বাঁশীর তানে চঞ্চল করিয়া রাত্রি চারিটায় ট্রেণ গয়া ষ্টেশনে থামিয়া গেল। আমরা নামিলাম।

গয়ার ষ্টেশনটি ক্ষুদ্র। গাড়ী ঘোড়ার ভিড় যত না-হোক পাণ্ডার জনতা অনেক বেশী। কম্বলে আপাদ মস্তক ঢাকিয়া দলে দলে পাণ্ডা শিকারে বাহির হইয়াছে। ঘৃতে দুগ্ধে পুষ্ট স্বাস্থ্যের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি গয়ালীরা ক্ষীণদেহী বাঙ্গালীর দেখিবার বস্তু।

একদল পাণ্ডা পরিবৃত হইয়া আমরা একটা সাঁকো পার হইয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিলাম পাণ্ডার দল চতুর্দ্দিক হইতে আমাদের বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিয়া তুলিল। এক বাঙ্গালী পাণ্ডার নাম বলিয়া অতি কষ্টে আমরা তাহাদের নিকটে অব্যাহতি পাইলাম।

ষ্টেশন ছাড়াইয়া আমাদের গাড়ীখানি প্রশস্ত রাস্তায় গিয়া পড়িল। রাস্তার দুই পাশে দোকান, ইস্কুল, কলেজ, আদালত গৃহ দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মান। সমস্ত গয়া সহরটি চন্দ্র কিরণ মাখিয়া মহাসুপ্তিতে মগ্ন। অগণিত তারকা ও রাত্রি শেষের মলিন চন্দ্র আমাদের সঙ্গের সাথী হইয়া সাথে সাথে চলিল।



বৌদ্ধ-মন্দির (বুদ্ধগয়া)

ষ্টেশন হইতে আমাদের গন্তব্যস্থান বহুদূর। সেখানে পৌঁছিতে পৌঁছিতেই পূর্ব্বাকাশে উষার অরুণরাগ ফুটিবার আয়োজন করিতেছিল।

আমাদের পাণ্ডার নাম রাম ভট্টাচার্য্য, কপর্দ্দক শূন্য অবস্থায় এখানে আসিয়া যাত্রী পরিচালনার কার্য্যে তিনি এখন বহু টাকার মালিক। আমরা যখন পাণ্ডার গৃহে উপনীত হইলাম তখন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। তাঁহার পরিচারকগণ আমাদিগকে খাতির করিয়া ঘরে লইয়া গিয়া বসাইল। দাই হাতমুখ ধুইবার জল আনিয়া দিল। দালানে অনেকগুলি নধরকান্তি গাভী বাঁধা দেখিলাম।

হাতমুখ ধুইয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া আমি একটি বাতায়নে গিয়া বসিলাম। আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত করিয়া কত কথা মনে পড়িতে লাগিল।

দুই বছর পূর্ব্বে আমার স্বর্গীয়া জননী, এখানে দর্শনে আসিয়াছিলেন, তিনি এই ঘরটিতে কয়েকদিন বাস করিয়াছিলেন সেই গৃহ সেই সব আজও তেমনি রহিয়াছে, জগতের কিছুরই পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল মা আমাদের মধ্য হইতে অনন্ত কাল সমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারই পদধূলিলিপ্ত স্মৃতি বিজড়িত কক্ষের সুশীতল মেঝেয় লুটাইয়া একবার 'মা' বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা হইল।

(২)

সকলের মুখ হাত ধোয়ার'পর আমাদের পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমার পিতৃদেব পূর্ব্বেই আমাদের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া ইঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন আমাদের দেখিয়া রামবাবু খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

আমার শ্বশ্রূমাতার ব্যতীত গয়াতে আমাদের করণীয় কিছুই ছিল না। কথা হইল বেলা হইলে পাণ্ডা আমাদিগকে লইয়া স্নান দর্শনাদি করাইবেন।

পাণ্ডাকে বিদায় দিয়া ঘরে তালা লাগাইয়া আমরা তখনই বেড়াইতে বাহির হইলাম। অগ্রহায়ণের প্রথম হইলেও তখনি গয়াতে বেশ শীত পড়িয়াছে, পথে বাহির হইয়া শীতের প্রকোপ বেশ ভাল রূপেই বুঝিলাম।

সহরের চারিদিকে কত মন্দির দেবালয়, দেউড়ির রুদ্ধ দ্বার ভেদ করিয়া প্রভাতের মঙ্গল বাদ্য বাজিতেছে। দোকানীরা দোকানের ঝাঁপ খুলিয়া দ্রব্যাদি সাজাইতে ব্যস্ত গয়ার প্রসিদ্ধ কষ্টি পাথরের দোকানে স্তরে স্তরে পাথরের বাসন সজ্জিত। এক পাথরের বাসন ভিন্ন এখানকার প্রস্তুত আর কোন দ্রব্য দেখা গেল না। রাস্তাগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেও ধূলায় ধূসরিত। অনেক দেশের অনেক অধিবাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। স্থান মাহাত্ম্যে দূর দূরান্তের যাত্রীদলের সমাবেশ হইয়াছে।

চারিদিক বেড়াইয়া বেলা নয়টার সময় আমরা বাসায়

ফিরিলাম। রামবাবু আমাদের প্রতীক্ষায় বসিয়াছিলেন। তাঁহার ওখানেই আমাদের নিমন্ত্রণ করিলেন।

কিয়ৎকাল পর রামবাবুর সহিত বাহির হওয়া গেল। দাই সকলের কাপড় গামছা লইয়া সাথে চলিল।

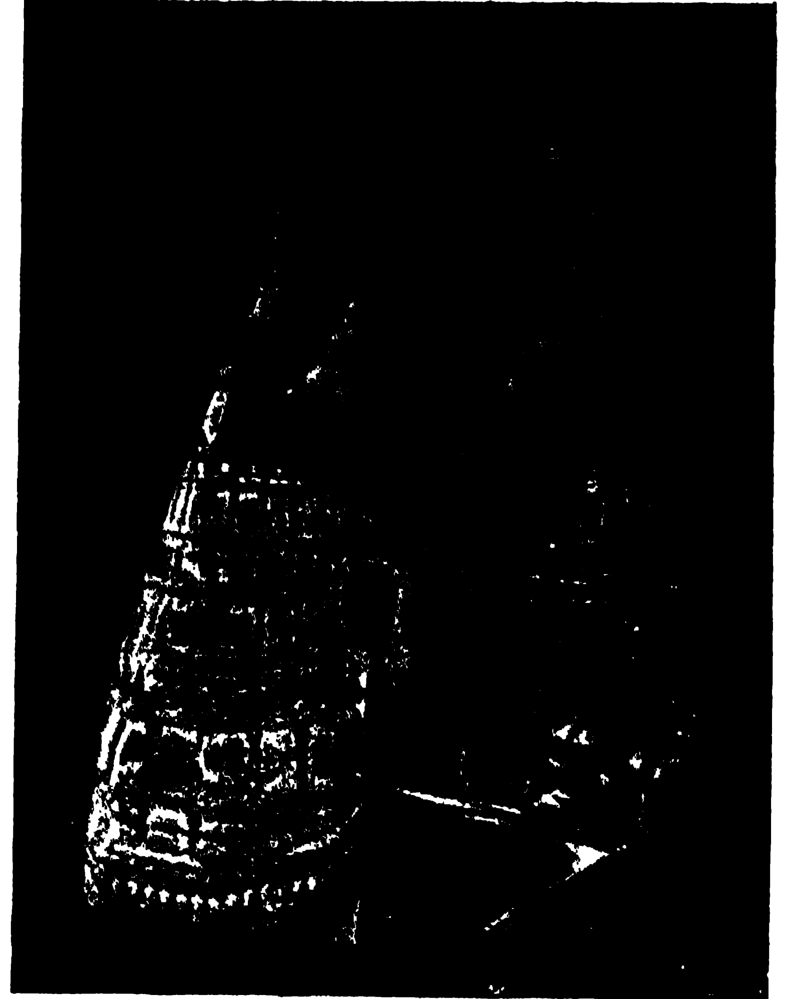
রামবাবুর বাড়ী হইতে ফল্গু দূর নহে। একটা সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া আমরা ফল্গুতে উপনীত হইলাম।

সারি সারি সোপানে সজ্জিত বহুদূরব্যাপী ঘাট, ঘাটের চত্বরে দলে দলে লোক মুণ্ডিত মস্তকে নববস্ত্র পরিধান করিয়া পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ তর্পণ করিতেছে। সাধু প্রজ্জ্বলিত ধুনীর সম্মুখে হাত পাতিয়া বসিয়া আছে। ভিখারীরা উচ্চ চীৎকারে ভিক্ষা চাহিতেছে। কয়েকটা গাভী পরম উৎসাহে মানুষের হস্ত হইতে ফুল বেলপাতা কাড়িয়া খাইতেছে। ভিমকান্তি গয়ালীদের হুঙ্কারে, দরিদ্র যাত্রীগণের কাতর নিবেদনের সহিত ভিখারীদের ঐকাতান মিশিয়া স্থানটী মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

ফল্গুর অপরপারেও বিপুল জনতা, সেখানেও যাত্রীগণ পিণ্ডদান করিতেছে। দুই তীরের কোলাহলের মাঝখানে ফল্গু তরঙ্গ তুলিয়া আপনার মনে বহিয়া যাইতেছে। জল এক হাঁটুর বেশী নহে, স্ফটিক স্বচ্ছ জলের মধ্যে হীরকচূর্ণের ন্যায় বালুকণা ঝিক্ মিক্ করিতেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে ক্ষুদ্র মৎস্য জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে জল সরিয়া গিয়া শুভ্র বালুকায় ভূষিত ছোট ছোট চরার সৃষ্টি হইয়াছে। চরার পাশ ঘেঁষিয়া এক একটী ক্ষীণধারা সরিয়া গিয়া জলাশয়ে পরিণত হইয়াছে। এই সেই অন্তঃসলিলা ফল্গু কাব্যে কবিতায় চিরসম্পদশালী, অমর। ইহারই তটে একদিন সতীকুলরাণী সীতা দেবী অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারই অভিশাপে সলিল বিপুলা তটিনীর বক্ষে আজ অনন্ত বালির শয্যা।

স্নানের জন্য আমরা সকলেই জলে নামিলাম। জল ভয়ানক ঠাণ্ডা, মনে হইতেছিল পা দুইখানি বুঝি কাটিয়া লইবে। ফল্গুর পরিসর বেশী নহে, পরপার হইতে একবার ঘুরিয়া আসা গেল। গামছা দিয়া কয়েকটা চুনা মাছ ধরিয়া আবার ছাড়িয়া দিলাম। জল অল্প হইলেও জলে অনেকটা নিরাপদে ছিলাম, তীরে ওঠামাত্র নানা ব্যবসায়ী নানারূপ লোক আসিয়া হাজির। কাহারো হাতে সিন্দুর, কাহারো ফুল, প্রতি পদক্ষেপে 'দাও পয়সা, দাও পয়সা,' ভিখারীর যেমন অত্যাচার ততোধিক অত্যাচার গৈরিক পরা ভণ্ডদের।

রামবাবু সকলকে হটাইয়া দিয়া আমাদিগকে লইয়া উপরে আসিলেন। সেই স্থানে মার করণীয় যাহা সমাধা করিয়া আমরা মন্দিরে গেলাম।



বিষ্ণুপাদ (গয়া)

বৃহৎ মন্দির আলোকিত না হইলেও খুব অন্ধকার নহে। দেয়ালের গায়ে কয়েকটী দেবদেবীর প্রতিমূর্তি, সিন্দুর ও পুষ্পমাল্যে আচ্ছাদিত। মন্দিরের মধ্যস্থলে রূপ বাঁধা এক অনতি গভীর গহ্বর। গহ্বরের বিরাট পাষাণ শিলার উপর সেই বিশ্ববাঞ্ছিত, হিন্দুর চির আরাধ্য পবিত্র পদ চিহ্ন। ইহাই গৌরাঙ্গের সাধনাক্ষেত্র, পিতৃলোকের মাতৃলোকের পুণ্যতীর্থভূমি। ভক্তি বিমণ্ডিত হৃদয়ে কত পিতৃ-মাতৃহীন স্বজনহারা বেদীমূলে উপবেশন করিয়া অশ্রুজলে অভিসিক্ত হইয়া গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে প্রিয়জনের তৃপ্তির নিমিত্ত পিণ্ডদান করিতেছে।

দর্শনান্তে বেদী [illegible] করিয়া আমরা বাহিরে আসিলাম। বাহিরে অসংখ্য গাভী শ্রীপাদপদ্মের পরিত্যক্ত পিণ্ড খাইতেছে। মন্দিরের অনতিদূরে অক্ষয় বট। অক্ষয়

বটের মূলে পিণ্ডদান প্রশস্ত। অক্ষয় বটের চারিদিকে বেদী। বেদীর পাশে কয়েকটি ক্ষুদ্র কুটীর। কুটীর সম্মুখে দুইটি সন্ন্যাসী ভস্ম মাখিয়া ধ্যানে মগ্ন। তাহাদের কম্বলাসন চাউল পয়সায় ভরিয়া উঠিয়াছে



ফল্গুতীর

অক্ষয় বটের কাছে কাজ সারিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া আমরা রাস্তায় আসিতেই অনেকগুলি ভিখারী ও সাধু আমাদের অনুসরণ করিল। সকল দলের মধ্যেই এক একটা দলপতি। উহাদিগকে বিদায় করিবার জন্য রাম বাবুর নিকটে টাকা ধরিয়া দেওয়া হইল। তিনি কয়েক সের প্যাড়া কিনিয়া দিয়া উহাদের বিদায় করিলেন। নূতন আর একদল কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া আমাদের সঙ্গী হইল। বাড়ীর দরজায় তাহাদের টাকা দিয়া বিদায় করিয়া দরজা বন্ধ করা হইল।

সকলেই অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছিলাম, বেলাও হইয়াছিল, সামান্য কিছু জলযোগ করিয়া সকলেই শুইয়া পড়িলাম। ক্ষণকাল পর রামবাবু আমাদের আহারের নিমিত্ত ডাকিতে আসিলেন।

রামবাবুর স্ত্রীর সহিত কয়েকটা কথা বলিয়া আমরা খাইতে বসিলাম। সকলেরই ক্ষুধা পাইয়াছিল, রামবাবুর স্ত্রী চমৎকার রন্ধন করিয়াছিলেন। পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করা গেল।

(৩)

গুরু আহারের পর বেশীক্ষণ বিশ্রাম হইল না। সেই দিনই বুদ্ধগয়া দেখিয়া রাত্রের গাড়ীতে আমাদের কাশী রওনা হওয়া স্থির হইয়াছিল। সময় সংক্ষেপ—পাণের পরিবর্ত্তে মশলা চিবাইয়া সকলে বাজারের পথ ধরিলাম। দুই তিন দোকান ঘুরিয়া কতকগুলি পাথরের বাসন কিনিয়া বাসায় ফেরা গেল তারপর বিছানা-বাক্স বাঁধিবার পালা। বুদ্ধগয়া হইয়া ষ্টেশনে যাইবার নিমিত্ত গাড়ী ভাড়া হইল।

বেলা তিনটায় রামবাবুর নিকটে বিদায় লইয়া আমরা গাড়ীতে গিয়া বসিলাম।

অল্পক্ষণ পর সহর ছাড়াইয়া গাড়ীখানি একটি ছায়াময় বনপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথটি কাঁচা হইলেও অসমতল নহে, দক্ষিণে কৃষকের শান্তির কুটীর, উপবন, শস্যক্ষেত্র, বামে চির রহস্যময়ী ফল্গু। জলের সহিত তেমন সম্বন্ধ নাই। ক্রোশের 'পর ক্রোশ বালির চড়া ধূ ধূ করিতেছে। পরপারে হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্র, তৎপশ্চাৎ বহুদূরবর্ত্তী শৈলমালা, গাঢ় নীলাকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। মেয়েরা দুইতিনটা কলসী পর পর মাথার উপর সাজাইয়া জল লইয়া ঘরে ফিরিতেছে। কেহ কেহ বালি খুঁড়িয়া অঞ্জলি অঞ্জলি জল তুলিয়া কলসী ভরিতেছে। দেখিয়া কবির কথা মনে পড়িল—

যেখানে দু'কর দিয়ে বালুকা খুঁড়ে
জলপান করে লোক আঁজল পুরে।
যে নদী শুকানো মরা,
দেখিবে দুকূল ভরা—
পার হয়ে কিছুদূর আসিতে ঘুরে।

পথের পাশে মহুয়া গাছের তলায় হাট বসিয়াছে। হাটের অধিকাংশ লোকই কোল, উহাদের মধ্যে কয়েকজনাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। কালো পাথরের নিখুঁত ছবি, এ কালো রূপে জগত আলো। কোল যুবকদের মাথায় পাখীর পালক, মেয়েদের ফুল। পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া ঘরে ফিরিতেছে। অনেকেই গোচারণ শেষে গান গাহিতে গাহিতে বাড়ীর পথ ধরিয়াছে, তাহাদের গানের কথাগুলি অস্পষ্ট, কিন্তু স্বরটুকু 'কাণের ভিতর দিয়া মরম স্পর্শ করে।'

সন্ধ্যার অনতিবিলম্বে আমরা বুদ্ধগয়ার পাদদেশে উপনীত হইলাম। কত বৌদ্ধ, জৈন, ইংরাজ মন্দির

দেখিতে আসিয়াছে। সুদূর বর্ম্মার অধিবাসীরাও আসিয়াছে।

মন্দিরটি মাটির নীচে অনেককাল আত্মগোপন করিয়াছিল, বহু অর্থ ব্যয়ে তাহাকে লোক-লোচনে প্রতিভাত করা হইয়াছে। মন্দিরের উদ্যানে কুলীরা মাটী কাটিয়া দ্রষ্টব্য স্থান সব বাহির করিতেছে। মন্দিরটি নিম্ন ভূমিতে—মাটী কাটিয়া যাতায়াতের সিঁড়ি করা হইয়াছে।

মন্দির প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিতেই শরীর মন যেন জুড়াইয়া গেল। চারিদিকের দৃশ্য বড় সুন্দর রমণীয়। চতুর্দ্দিকেই বুদ্ধদেবের অসংখ্য প্রতিমূর্ত্তি। কোথায় ধ্যানী বুদ্ধ, কোথাও শিষ্য পরিবৃত বুদ্ধ, কোথাও বা বরাভয়-দাতা বুদ্ধদেবের প্রসন্ন মূর্ত্তি।

রাস্তাতেই আমাদের একটি গাইড জুটিয়াছিল, মন্দিরে আর একটি জুটিল।

জুতা বাহিরে রাখিয়া আমরা মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। দ্বারে একটি স্ত্রীলোক পদ্মফুল বেচিতেছিল। কয়েকটি পদ্মফুল কিনিলাম। এক মুণ্ডিত মস্তক ভিক্ষু আসিয়া আমাদের মন্দিরে লইয়া গেলেন।

বুদ্ধের বিরাট স্বর্ণময় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলাম। এতবড় প্রতিমূর্ত্তি আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইল না। হাতের ফুলগুলি অঞ্জলি দিয়া সেই—

"বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে,
নিরঞ্জন আনন্দ মূরতি"র পানে চাহিয়া রহিলাম।

গাইড আমাদিগকে মন্দিরের উপরে লইয়া গেল। মন্দিরের গা দিয়া দুইটি সোপান দ্বিতলে উঠিয়া গিয়াছে। মন্দিরের কারুকার্য্য অতীব সুন্দর, ঘুরাণো বারান্দার চারিকোণে চারিটি ক্ষুদ্র মন্দিরে বুদ্ধের মাতার এবং পত্নীর প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে।

মন্দিরের পশ্চাতে বোধিদ্রুম, বুদ্ধদেবের চরণ চিহ্নে ভূষিত। দর্শকগণ বোধিদ্রুম স্পর্শ করিতেছে, আমরাও করিলাম। মন্দিরের অনতিদূরে এক স্বচ্ছ সলিলা পুষ্করিণী, তাহার নাম পাতাল গঙ্গা। উদ্যানের স্থানে স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া 'রামসীতা' "লক্ষ্মী নারায়ণ" প্রভৃতি হিন্দু দেবীর মূর্ত্তি গড়িয়া অনেকেই পয়সা উপার্জ্জন করিতেছে।

চারিদিক দেখিয়া আমরা বুদ্ধদেবের স্তূপমূলে উপবেশন করিলাম। মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জলিত হইল, উদ্যানস্থ পুষ্পকলিকাগুলি তথাগতর শ্রীচরণ উদ্দেশে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিবার নিমিত্ত ফুটিয়া উঠিল। দূর এবং নিকটের বিটপী শ্রেণী হইতে বন বিহগ তাঁহারি বন্দনা গান গাহিতেছিল। আমাদের মাথার উপরে জ্ঞানী বুদ্ধের, ধ্যানী বুদ্ধের এবং ত্যাগী বুদ্ধদেবের সন্ধ্যারতির নক্ষত্রের প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল।

কলীন_মূর

(অভিনেত্রীর কাহিনী)

শ্রীমনোমোহন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ

আজ কলীন মূরের নাম চিত্রপ্রিয়দের নিকট খুবই সুপরিচিত। কিন্তু তার পূর্ব্ব জীবনের আত্মনির্ভরশীলতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণের কথা শুনলে শ্রদ্ধায় এই তরুণী চিত্রনটীর প্রতি মন ভরে উঠে; যশ যে কত সাধনার সহজেই তা অনুমিত হয়।

সে আজ ১৯০০ সালের ১৯শে আগষ্টের কথা; যখন মিচিগানের পোর্টহূরন নামক স্থানে কলীন মূর জন্মগ্রহণ করে। তার বাপ ও মা স্কটিস্ ছিলেন। ফ্লোরিডার টাম্পা নামক্ স্থানের এক কন্‌ভেণ্টে লেখাপড়া শেখবার জন্য কলীন মূরকে শৈশবকাল যাপন করতে হয়েছে। তার মা বাপের ইচ্ছা ছিল যে বড় হয়ে কলীন মূর আর্কেষ্ট্রাতে পিয়ানো বাজায়। সেই জন্য পাঁচবছর বয়স থেকে তাঁরা তাকে গানবাজনা শেখাচ্ছিলেন। যখন কনভেণ্টের লেখাপড়া কলীন মূর ছেড়ে দিলে তখনো সে "Detroit Conservatory of Music"এ গান বাজনা শিখছে।

গানবাজনা কলীন মূর খুবই ভালবাসত কিন্তু সেটা যে আজ জীবিকা স্বরূপ গ্রহণ করে জীবন কাটাতে হবে এ চিন্তা তার অসহ ছিল। দশবছর বয়স থেকে তার মনে অভিনয় করবার স্পৃহা জাগে। সেই সময় নিকটবর্ত্তী

এক ষ্টক কোম্পানী থেকে একটা ছোট থিয়েটারের দল খোলা হয়, কলীন সেখানে নায়িকার ভূমিকা অভিনয় করে। প্রথম প্রভাতে, জীবনের যাত্রাপথে মানুষ যদি সুগম পথ, বিশ্বস্ত সঙ্গী আর উৎসাহ উদ্দীপনা পায় ত তার গতি স্বচ্ছন্দ, লীলায়িত ও জয়যুক্ত না হয়ে পারে না। কলীন মুরের এই প্রথম অভিনয় সাফল্যতার প্রাণে নব উৎসাহের বাণ ছুটিয়ে দিলে। আশার স্বপ্নে সে একেবারে মেতে উঠল।

আজ কলীনমুরের দিগন্ত বিস্তৃত প্রতিপত্তির ভিতর কারো কি কল্পনায় আসে যে এই তরুণী প্রথমে 'নগদ কাজ' পাবার জন্য ষ্টুডিওর বাইরের বেঞ্চে একাদিক্রমে ছ'মাস বসে কাটিয়েছে ?

এই 'নগদ কাজের', ইতিহাস শুনলে আমাদের দেশের পেশাদার অভিনেত্রীরা পর্য্যন্ত চটে যাবেন। অথচ হলিউড ষ্টুডিওর আসপাসের গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা পর্য্যন্ত অবসর মত এই "নগদ কাজ" করে তাদের পকেট খরচ চালিয়ে নেয়।

ব্যাপারটা হচ্ছে এই: ষ্টুডিওতে কোন ফিলিম তোলা হচ্ছে, তার কোন ভিড়ের দৃশ্যে,



কলিন্ মুর

দোকানের দৃশ্যে বা যে কোন দৃশ্যে দাসী বাঁদি বা যে-কোন ভূমিকার জন্য মাঝে মাঝে 'অতিরিক্ত' (extra), লোকের দরকার হয় এবং সেই আশায় বাইরে অসংখ্য মেয়ে 'হাঁ-করে' বসে থাকে। যখন প্রয়োজন হবে প্রযোজক এসে পছন্দসই জনকতককে ডেকে নিয়ে কাজ শেষ্ করেন। যারা কাজ পেলে—তারা দাম নিয়ে, আর যারা পেলে না তারা শুধু হাতেই ঘরে ফিরল! দৈবাৎ এদের ভিতর থেকে দু'এক জনকে মাহিনা দিয়ে দলভুক্ত ক'রে নেয়াও হয়! এত চেষ্টা, যত্ন করে নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলে তাই পাশ্চাত্য অভিনেত্রীদের পায়ে 'জগতজোড়া নাম' 'থলিভরা দাম' লুটিয়ে পড়ে আর আমাদের দেশে যে ক'দিন অভিনয় করে সেই ক'দিন 'অডিটোরিয়ম ভরা' নাম ও দামের অভাবে অভিনেত্রীরা "নেপথ্যে" সরে পড়ে।

তারপর—ছ'মাস কলীনমুর এমনিতর "নগদ কাজে"র আশায় ষ্টুডিওর বাইরের বেঞ্চে বসে কাটিয়েছে। তার এক কাকা বিখ্যাত সংবাদপত্র-সম্পাদক ছিলেন। একদিন তিনি 'ঈষ্টানে কোম্পানী'র অফিসে গিয়ে ভাই-ঝিকে বাইরের বেঞ্চে বসে থাকতে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'তুমি এখানে কেন?' কলীন তাঁকে সব খুলে বল্‌লে; তাতে তিনি বল্‌লেন—'তা' তুমি আমায় বলনি কেন? আমি তোমায় ভাল জায়গায় কাজ করে দিতুম।' তাতে কলীন জবাব দিলে—'আমি জানি আপনি পারেন; কিন্তু আমি তা চাই না। যদি আমার যোগ্যতা থাকে, আমি নিজেই কাজ পাব—এবিষয়ে কারো সাহায্য আমি চাই না। আপনি বলুন, এখানে আমার জন্য কাকেও কোন অনুরোধ করবেন না!' কাকা রাজী হলেন।

অন্য কেউ হ'লে এ সুযোগ ছাড়্‌ত?

মাঝে মাঝে হতাশায় ক্ষুব্ধ হ'য়ে তার মনে 'হত

'কাকাকেই বলি'; তখনি আবার আত্মসম্মান সজাগ হয়ে উঠত। এর পরেই সে তিন দিনের জন্য কাজ পেলে।

কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন বিখ্যাত প্রযোজক D. W. Griffith কলীনমূরকে তার কাকার বাড়ী দেখে এল, তাতে চিত্রাভিনেত্রীর সাফল্য সম্ভাবনা অনুভব করে সব্বাইকে বললেন। ফলে এক সপ্তাহের মধ্যেই মিস্ মূর Griffithএর অধীনে অভিনয় করবার জন্য কালিফোর্ণিয়ায় চলে গেল।

কিছুদিন ছোটখাট ভূমিকায় অভিনয় করবার পর, "Fleming youth" চিত্রনাট্য নায়িকার ভূমিকা অভিনয় করবার জন্য "First National" ষ্টুডিও মিস্ মূরের সঙ্গে চুক্তিপত্র সই করলে। সেইথেকে মিস্ মূর উন্নতির সোপান বেয়ে ক্রমশঃই উঠছে।

"So big", 'Sally" "Irene', "The perfect Flapper', 'The Desert flower', 'Pointed people'; 'Flirting with love', 'We Moderns', 'Elia cinders', "Twinxletoes,' 'Orchids and Ermine', 'Naughty but Nice', 'Hot wild Oat', 'Love never dies', 'Happiness Ahead',, Oh Joy'

নানা বিখ্যাত ও জনপ্রিয় চিত্রনাট্যগুলিতে প্রধান ভূমিকা অভিনয় করে আজ কলীনমূর চিত্রাভিনেত্রী শিরোমণিদের পার্শ্বে বসবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেছে।

এদেশের জনসাধারণকে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেখা যায় না কিন্তু ওদেশে যায়। তাও যেমন তেমন করে নয় সমারোহে। কোন বায়স্কোপ অভিনেত্রীরা ছবি দেখতে আসবে, দু'ঘণ্টা আগে থেকে বায়স্কোপের সামনে গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়ে এক জন-সমুদ্রের সৃষ্টি হয়ে গেল। কে জানে রোদ, কে জানে বৃষ্টি! শুদ্ধ একবার চোখের দেখার জন্য! এদেশের ফুটবল মাঠের মত ও-দেশে অভিনেত্রীদের দেখবার জন্য 'সিট' ভাড়া পাওয়া যায়।

এক জায়গায় কলীনমূর নিজে লিখেছে—"I'll never forget the opening of the 'Chinese Theatre in May, 1927. It was the greatest crowd that has ever been seen in Hollyword. All the traffic along the Boubevard was diverted for hours before the performance, to make space for the crowd and give the cars a chance to get through. It took 2,500 people over 2½ hours to get inside the theatre, and when we came out we stood on the pavement for exactly 1½ hours before our car came along in its turn. To go and look for it would have been madness, so we simply had to wait."

* * * *

"In spite of that awful downpour on immense crowd stood for hours and hours in puddles and ponds some with raincoats, very few with umbrellas."

এদেশে অহীন্ চৌধুরী বাস থেকে নেমে থিয়েটারে ঢুকছে—রাস্তার দু'একজন যারা চেনে, কেউ বললে "এ্যা—চুলগুলো সব ছেটে ফেলেছে!" কেউ বললে—"এইবার ভুঁড়ি বাগাচ্ছে।" মাত্র এই পর্য্যন্ত। আর অভিনেত্রীদের ত কথাই নেই।

১৯২৩ সালের ১৮ই আগষ্ট প্রতিভাশালী প্রযোজক John Macormixএর সঙ্গে মিস মূরের বিবাহ হয়। কলীন মূরের অধিকাংশ চিত্রনাট্যের প্রযোজনা তিনিই করেছেন। প্রায় দু'বৎসর সুখে স্বচ্ছন্দে 'ঘরকন্না' করবার পর, শতকরা ৮০টি চিত্রনটীর যা হয় কলীনমূরের তাই হয়েছে! বিগত জুন মাসে স্বামীর বিরুদ্ধে গালাগালি ও দুর্ব্যবহারের অভিযোগ করে আদালত থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ করেছে।

কলীনমূরের বাৎসরিক আয় গড়পরতায় নব্বই হাজার পাউণ্ডেরও উপর।

খেলা ঘর

শ্রীপূর্ণশশী দেবী

(গল্প)

এক

জমিদার দুহিতা অশোকাদের খেলাঘরে আজ মহাধূম। অন্যান্য দিন তার খেলার ঘর করণার একমাত্র সাথী ও সহকারিণী ছিল ছোট বোন রেণুকা, কিন্তু আজ তার খেলুড়ীর সংখ্যা অনেক গুলি, খুড়তুতো দুই বোন ব্রততী ও তপতি পিসতুতো বোন গীতা কাজেই খেলাটা বেশ জমেছিল

জমীদার মহাশয় সম্প্রতি যে পুষ্করিণী খনন করিয়েছিলেন পিতৃ পুরুষদের অক্ষয় স্বর্গ কামনায়—এই পুণ্যাহ বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে তার প্রতিষ্ঠা করা হল, সেই শুভানুষ্ঠানে যোগ দিতে কলিকাতা হতে অশোকার কাকা আর পিসিমাও এসেছেন।

এই সুযোগে অশোকা তার আদরের কন্যা 'ডলি'কে পাত্রস্থা করে ফেলেছে, পাত্র তপতীর বড় খোকা পুতুল শ্রীমান 'মানস মোহন'। এই মানসমোহন জামাতা হবার আগেই বালিকা শ্বশ্রূ মাতার মানস মুগ্ধ এবং লুব্ধ করেছিল কিন্তু স্কুলে প্রাইজ লব্ধ এই পুতুলটীকে হাত ছাড়া করতে তপতী মোটেই রাজি নয়, তবু বিয়ের পর জোড়ে আসার বাহানায় জামাইটাকে কিছুদিন কাছে রাখা এবং নাড়া চাড়া করা যাবে তো!—তাই এ ব্যবস্থা।

সেই শুভপরিণয়ের আজ প্রীতি ভোজ। সেজন্য অশোকা আর অশোকার বোনেরা ভোজের আয়োজনে রীতিমত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কেউ লুচি বেলছে কেউ ভাজছে, ছোট ছোট থুরীতে সাজিয়ে রাখছে, উৎসাহের অন্ত নেই। সব চেয়ে বেশী ব্যস্ত অশোকা, কারণ সে কনের মা এবং ঘরের গিন্নি

সামনে ফুলের মালা দিয়ে সাজানো রঙ্গীন্ বেদীতে সুখাসনে বসে নির্জ্জীব বরকন্যা দুটী, তারা নিষ্পলক নেত্রে এই সজীব পরিজনদের আগ্রহ ও ব্যগ্রতা দেখে যেন মিটি মিটি হাসছে।

খেলা ঘরটা পাতা হয়েছিল বাগানে একটা ঝাঁকড়া ফুল গাছের তলায়, সেই গাছের ওপার দিয়ে পায়ে হাটা সরু পথখানি সাপের মত বেঁকে গিয়ে রাস্তায় মিশেছে।

গীতা কুট্‌নো কোটা শেষ করে চাট্‌নির জন্য কাঁচা আম সংগ্রহ করতে দেখে খানিক তফাতে সেই পথের ধারে দাড়িয়ে আছে একটা মেয়ে, তাদেরই সমবয়সী হবে। রোগা রোগা শ্যামবর্ণ মুখখানি মোটের উপর মন্দ নয় বেশ একটু শান্ত শ্রী আছে; তবে গাল দুটী একটুখানি পুরন্ত হলে ভাল দেখাত।

একখানা আধময়লা বাগ্‌দী ডুরে গাছ কোমর বেঁধে পরা। এলো চুল, গায়ে সেমিজ নেই, গলায় লাল সুতোয় বাঁধা একটা তামার মাদুলী, হাতে একগাছি করে রাঙা 'কড়', কাণে কবেকার ময়লা পড়া পাশী মাকড়ী তার ছোট মুখখানিতে আদপে মানায়নি।

মেয়েটী সেই অপরূপ খেলা ঘর এবং বিশেষ করে বিচিত্র সাজে সজ্জিত নব বিবাহিত দম্পতীর পানে লুব্ধ অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল—এমন কাণ্ড যেন জীবনে কখনো দেখেনি সে!

তার দিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই গীতা একটু এগিয়ে এসে তড়াতাড়ি বললে—

"তুমি কখন্ এলে ভাই?"

বালক বালিকা যেন পরিচয়ের ধার ধারে না।

গীতার অকুণ্ঠিত প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটী সঙ্কুচিত ভাবে বললে "এই খানিকক্ষণ হল।'

"ওমা! তা এখানে চুপ্‌টী করে দাঁড়িয়ে কেন? তুমি আমাদের সঙ্গে খেলবে?"

মেয়েটী ঘাড় কাৎ করে একটুখানি হাসলে শুধু, সে হাসিতে খুসী, বিনয় ও ব্যগ্রতা স্পষ্ট প্রকাশ পাইল।

তা হলে এসোনা ভাই! আমাদের খেলা ঘরে, কাল অশোকার মেয়ে ডলির বিয়ে হয়েছে কিনা, আজ তাই নেমন্তন্ন,—ও অশোকা! তোর কে বন্ধু এসেছে দেখ্‌না…"

মেয়েটীর হাত ধরে গীতা কাছে আসতেই মেয়েদের

কুতূহলী দৃষ্টি একসঙ্গে পড়ল নবাগতার দিকে। অশোকা ভুরু কুচকে তাচ্ছিল্যের স্বরে বলে উঠল—"ধোৎ! ও আমার বন্ধু হতে গেল কেন?—গীতাদি যেন কি!"

"তবে ও কে ভাই?"

অপরিচিতার আপাদ মস্তক একবার অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে জমীদার নন্দিনী অপ্রসন্ন স্বরে বল্লে "তা কি করে বলব?—আমি কি ওকে চিনি না জানি? অমন মেয়ের সঙ্গে বন্ধুতা করলে মা আমাদের আস্ত রাখ্‌বে কি না! হুঁ! সেদিন চৌধুরীদের লক্ষ্মীর সঙ্গে একটু পুতুল খেলেছিলুম বলে—মা বকে ঝকে কি রকম অনর্থ করে ছিলেন জিজ্ঞাসা করোনা রেণুকে—"

রেণুকা দিদির কথায় সায় দিয়া গম্ভীর মুখে বলে উঠল—"হ্যাঁ মা বড় রেগে যান—আমাদের যার তার সঙ্গে খেলতে দেখলে, বাবাও বলেন ছোটলোকের মেয়ে ছেলের সঙ্গে কখনো মিশতে নেই, তাতে মন ছোট হয়ে যায়—" আর মেয়েটীর মুখে চোখে, দীনতা ও নৈরাশ্যের বেদনা পরিস্ফুট হল।

রুদ্ধকণ্ঠে কুণ্ঠিত স্বরে সে রেণুর কথায় বাধা দিয়ে বল্লে "কিন্তু আমরা তো ছোট লোক নয়—বামুন, আমার বাবা চাটুয্যে—"

"ও:! তবে আর কি?"

গীতা ভিন্ন আর সকলেই হেসে উঠ্‌ল

অশোকা বল্লে—"বামুন হলে কি হয়? তোমরা গরীব তো? গরীব হলেই যে ছোট লোক বলে তাকে। তা নইলে এমন নোংরা কাপড় নিয়ে—ম্যা-গো:! গায়ে একটা সেমিজও কি জোটে নি?—"

মেয়েটীর ব্যথাহত ম্লান মুখখানির পানে চেয়ে গীতার কোমল চিত্ত করুণা ও দরদে ভরে গেল, কিন্তু গৃহিণীর সম্মতি না পেলে তো এই অপরিচিতাকে তাদের খেলাঘরে আসন দিতে পারে না? তাই অশোকার দিকে তাকিয়ে মিষ্ট অনুনয়ের সুরে সে বল্লে "তা হোক না ভাই! বেচারী খেল্‌তে এসেছে তখন খেলুক না একটু"—

"হ্যাঁ কি নাম ভাই! তোমার?"

মেয়েটী মাথা নীচু করে বাধ বাধ ভাবে বল্লে—"আমার নাম,—ভাল নাম তো কিশলয়—"

"ওরে বাবা! কি-শ-ল-য়!

অশোকার মুখে কথাটা উচ্চারণের ভঙ্গী দেখে সব মেয়ে কটী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

ব্রততী তাদের মধ্যে সকলের বড় বয়সেও এবং বিদ্যাতেও তাই সে শুধু হেসেই শান্ত হল না, মেয়েটীর অপ্রতিভ মুখের পানে চেয়ে সকৌতুকে প্রশ্ন করলে "ও কথাটার তুমি মানেও জানো? কিশলয় কাকে বলে?'

কিশলয় থতমত খেয়ে মাথা নেড়ে ধীরে ধীরে বল্লে "তা কি জানি। ওনাম আমার মাসিমা রেখেছিলেন নিজের পছন্দে ওনামে তো আমাকে কেউ ডাকেনা—"

"তবে কি বলে ডাকে?

"হারাণী। আমি হবার আগে মার অনেকগুলি ছেলে মেয়ে,

ঠিক ঠিক! এই নামই তোমাকে মানায় বেশ, কেমন ভাই অশোক!

আহা! অমন মিষ্টি নামটী—

গীতা আর চুপ করে থাকতে পারলে না, ব্রততীর কথার সজোরে প্রতিবাদ করে সে বলে উঠল—

"এ যে তোমাদের অন্যায় কথা ভাই! নামের আবার তেতো মিষ্টি কি? যার যা ইচ্ছে রাখতে পারে, তাতে কারুর কিছু বলবার তো নেই—"

তারপর সেই কুণ্ঠিতা অপমানিতা বালিকার হাত ধরে সহানুভূতিভরে বল্লে—"তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ ভাই? বসো না, ঐ ইট্‌টার ওপর বসো, আচ্ছা আমাদের যজ্ঞিবাড়ীতে তুমি কি কাজ করবে বলো দেখি?"

অশোকা ঠোঁট ফুলিয়ে বল্লে—"ও আর কি করবে?

অশোকার বেহান তপতী হয়তো প্রত্যাখ্যাতার প্রতি অনুকম্পা দেখিয়েই বল্লে "কেন বেয়ান? ওকে ঝিয়ের কাজ দিলেই তো হয়—ও যদি নেহাৎ খেলতেই চায়…

কিশলয়ের শ্যামল মুখখানি পলকে লাল হয়ে উঠল।

"না, খেল্‌তে আমি চাই না,—আমি শুধু দেখতে এসেছিলুম—খেল্‌তে আসি নি তো!"

ব্যথাবিদ্ধ কণ্ঠে ঝাঁঝালো সুরে কথাক'টী বলেই কিশলয় ফিরে চল্‌ল যে পথে এসেছিল।

তার গমন পথের পানে চেয়ে গীতা ম্লানমুখে একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লে, "না বুঝে সুঝে তোমার ও কথাটা

বলা ভাল হয় নি তপতী ! আহা ! কত আশা করে এসেছিল—"

তপতী মনে মনে একটু অপ্রতিভ হয়েছিল নিশ্চয় কিন্তু সেটা প্রকাশ না করে মুখভার করে বললে, "আমি আর মন্দ কি বলেছি গীতাদি ? অমন মেথরাণীর মত চেহারা ও ঝিয়ের কাজ করবে না তো কি করবে ? কলকেতায় আমাদের বুড়ো ঝিয়ের নাৎনী পারুল সেও যে এর চেয়ে ঢের পদে আছে, কি রকম সভ্য ভব্য দেখেছ তো ?"

"তা সহরে আর পাড়াগেঁয়ে একটা তফাৎ থাকবে না ?"

"কেন ? আমার বেয়ানও তো পাড়াগেঁয়ে মেয়ে কেউ বলুক দেখি ?"

অশোককে অসন্তুষ্ট করা গীতার মনোগত অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য ছিল না তাই অশোকের অপ্রসন্ন মুখের পানে আড়ে আড়ে চেয়ে সে কথার সুর বদলে ফেলে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—"তুই একটা আধ পাগল তপি ! কার সঙ্গে কার তুলনা করছিস্ বল্ দেখি ? আমাদের অশোকার মত শিক্ষা-দীক্ষা কজন সহুরে মেয়ের ভাগ্যে ঘটে ? মামাবাবুটি কম চেষ্টা করছেন কম পয়সা ঢাল্‌চেন ওদের দুটী বোনের শিক্ষার জন্যে ?"

ব্রততী উভয় পক্ষেরই মন রেখে বল্লে- "সেতো ঠিক কথা। কিন্তু মেয়েটার কি রকম তেজ দেখেছিস্ ভাই? এক কথাতেই কেমন ফরকে চলে গেল !—"

"তেজ নয় দিদি ! ভারি দুঃখ হয়েছে ওর, দেখলে না চোখ ছল ছলিয়ে এসেছিল মুখখানি একেবারে শুকিয়ে—

শুকিয়ে তো যাবেই রে। ওযে কিশলয় !…

আবার হাসি !

সেই সমবেত সশব্দ হাস্যরোল বোধ হয় কিশলয়ের কাণেও গিয়েছিল, কিন্তু সে আর মুখ না ফিরিয়ে হন্ হন্ করে চলে গেল।

দুই

মেয়ের রূপ নেই, মেয়ের বাপের রূপার জোর নেই, কাজেই দুশ্চিন্তায় উদ্বেগে পাড়াপ্রতিবেশীদের পক্ষেও নিদ্রা দুর্লভ হয়ে উঠেছিল, তাই তো ! মেয়েটার কি যে গতি হবে !

কিন্তু প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে এবং পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে কিশলয় বা হারাণীরও গতিমুক্তি হয়ে গেল কন্যা-কাল উত্তীর্ণ হবার পূর্ব্বাহ্ণেই। পাত্রটীর নাম পুলিন কৃষ্ণ মুখুজ্যে, স্বভাব চরিত্র ভাল, অল্প বয়সে পিতৃহীন হয়ে লেখাপড়ায় বেশীদূর এগোতে পারেনি। গ্রামে একখানা মেটে বাড়ী আর কয়েক বিঘা জমি ভাগে দেওয়া আছে, তাতে স্বচ্ছলতা না থাকলেও ভাতের ভাবনা ভাবতে হয় না, তাছাড়া পুলিন সম্প্রতি কলকেতায় একটা প্রেসে কাজ শিখছে মাসে প্রায় টাকা কুড়িক পারিশ্রমিক পায়।

হারাণীর মত মেয়ের পক্ষে তাই যথেষ্ট। সবাই বল্লে হারাণীর বরাত ভাল।

শ্বাশুড়ী রুগ্না, রোগজীর্ণ দেহখানা নিয়ে তিনি সংসারের ঠেলা ঠেলতে আর পারছেন না, কাজেই ধুলো পায়ে দিন করে বিয়ের অব্যবহিত পরেই মা-হারা মেয়েটাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে হারাণীর পিতা দুহাতে চোখের জল মুছতে মুছতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

পাত্র নিজে পছন্দ করে হারাণীকে গ্রহণ করেছে, সুতরাং তার দিক থেকে অসন্তুষ্টি বা অনুযোগের সম্ভাবনা ছিল না। শ্বাশুড়ী একমাত্র পুত্রবধূর রূপ এবং অলঙ্কারের অভাবে একটু মনক্ষুণ্ণ হলেও ঘরের লক্ষ্মীকে আদর করে ঘরে তুল্লেন।

অন্তর থেকে অজস্র স্নেহাশীর্ব্বাদ করে বল্লেন— মা আমার ! তোমার লক্ষ্মী ভাগ্যিতেই আমার পুলিনের সংসার যেন…শ্বাশুড়ীর সেই আশীর্ব্বাদ হারাণী তাঁর পায়ের ধুলোর সঙ্গে পরম বিশ্বাসে ও ভক্তিভরে মাথায় তুলে নিয়েছিল।

পুলিনও তার নবপরিণীতার নামের শূন্যতা জ্ঞাপক প্রথম শব্দটী সযত্নে পরিহার করে শুধু "রাণী" নামেই ডেকে ছিল, কিন্তু হারাণী তার আন্তরিক যত্ন সেবা শ্রদ্ধা ভালবাসা দিয়ে শ্বশ্রূ ও স্বামীকে তুষ্ট পরিতৃপ্ত করলেও সংসারে লক্ষ্মী ভাগ্যি আনতে পারলে না। নববধূর প্রথম দৃষ্টিপাতেই দুধের কড়া উথলে পড়লেও তার শ্বশুর ঘর উথলে পড়ার কোনো সম্ভাবনাই দেখা গেল না।

তবু গরীবের মেয়ে হারাণী গরীবের ঘরের বউ হয়ে নিজেকে একদিনের তরেও অসুখী বোধ করেনি। পীড়িতা শ্বশ্রূকে বিশ্রামের অবাধ অবসর দিয়ে সে তার পরিত্যক্ত সংসারের অচল প্রায় চাকা খানা নিপুণ হাতে বেশ সহজেই ঘুরিয়ে নিয়ে চল্ল।

তিন

বছর দুই পরের কথা।

এরমধ্যে হারাণীদের সংসারের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে।

পুলিনের জননী স্বর্গগতা। বধু হারাণী এখন ঘরণী গৃহিণী।

মাতার-অবর্ত্তমানে হারাণীকে গ্রামে একলা রাখা চলে না, কাজেই পুলিনকে বাধ্য হয়ে কলকেতায় বাসা করতে হয়েছে। তাতে খরচ বেড়ে গেছে বিস্তর। অবশ্য মাহিনাও এই দুবছরে মারকাট্ করে, বেড়েছিল দশটী টাকা, কিন্তু কল্কেতা সহরে বাসা করে সপরিবারে না হলেও সস্ত্রীক বাস করা বিশেষ ব্যয় সাপেক্ষ, সে ব্যয়ের অনুপাতে এই 'বাড়তি' আয়টুকু যথেষ্ট নয়। তবু হারাণীর গৃহিণীপণা গুণে গরীবের ঘরকন্না স্বচ্ছন্দে না হোক্—শান্তিতে চলে যাচ্ছিল!

কিন্তু সংসারীর পক্ষে শান্তিরক্ষা বড়ই দুরূহ ব্যপার, বিশেষতঃ যেখানে অর্থবল নেই।

মাস তিনেক হল, হারাণীর একটী সন্তান হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে, ঠিক তার পরই হারাণী আঁতুড় কাটিয়ে উঠতে না উঠতে—পুলিন অসুখে পড়ল।

এই আকস্মিক বিপদপাতে হারাণী তার দুদিনের পাওয়া সন্তানটীর মৃত্যুশোকে একটু কাঁদবার অবকাশও পেলে না। তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেলে সে মনে মনে বল্লে "স্বামীকে ভাল করে দাও ঠাকুর। ছেলেয় তার কাজ নেই..."

পুরো দেড়টী মাস শয্যাগত থাকার পর হারাণীর অশ্রান্ত সেবা, ঐকান্তিক প্রার্থনা এবং অখণ্ড আয়তির বলে পুলিন আরোগ্য লাভ করে আবার কাজে যাচ্ছে। এবং হারাণী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অগোছাল সংসারটাকে টেনেটুনে কোনো মতে একটু গুছিয়ে নিয়েছে এমনি সময় তার আলাপ হল পাশের বাড়ীর একটী বউয়ের সঙ্গে। হলদে রঙের প্রকাণ্ড তেতালা বাড়ীখানা, ঘন সবুজ রংয়ের ঝক্‌ঝকে দরজা জানালাগুলো তাতে ভারি সুন্দর মানিয়েছে।

দেখলে মনে হয় যেন রাজপুরী।—

সেই রাজপুরীর মালিক কলকেতার একজন মস্তবড় এটর্নী, বউটী তার কনিষ্ঠ পুত্রবধূ।—নাম করুণা

ধনী কন্যা ধনীর বধূ হলে কি হয় বউটী ছিল তার নামের মতই মিষ্টি ও নম্র, ভারি সরল মিশুক স্বভাবটুকু তার।—বাপের বাড়ী থেকে এসে পর্যন্তই করুণা তার প্রায় সমবয়স্কা হারাণীর সঙ্গে ভাব করবার জন্য উৎসুক হয়েছিল। কিন্তু সুবিধা হয়ে উঠছিল না শুধু হারাণীর অমনোযোগিতায়—সে যেন দেখেও দেখে না।

পায়রা খোপের মত বাড়ীখানার একাংশে দুখানি ছোট ছোট ঘর নিয়ে হারাণীর সংসার। একটায় রান্না ভাঁড়ার সবই,—আর একখানা শোবার ঘর। সেই ঘরদুখানার সামনের খোলা ছাতটুকুতে হারাণী কাপড় কাচে, বাসন মাজে, চাল ঝাড়ে, বড়ি দেয়, আরো কত কাজ করে।

আবার বৈকালের দিকে ভিজে চুল শুকোতে বা কাচা কাপড়গুলো তুলতে এসে সারাদিনের খাটুনীর পর—মুক্ত আকাশের তলে একটু ক্লান্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচে।

করুণা তাদের তেতলার ঘরের একটা জানলার ফাঁক দিয়ে তাই দেখে।

গরীবের ঘরের ঘরণী হারাণীর আকৃতি ও বেশভূষায় দেখবার মত কিছুই ছিলনা, তবু এই প্রায় সমবয়সী নিরলস মেয়েটীর কাজকর্ম্মে তৎপরতা ও চলা ফেরার ভঙ্গীটুকু দেখতে বউটীর বেশ লাগত। কিন্তু হারাণী নিজের কাজেই মগ্ন থাকে, কোন দিকে চাইবারও যেন ফুরসৎ নেই তার।

সেদিন দুপুর বেলা আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে, কাল বৈশাখীর মেঘ, স্বল্প হলেও উপেক্ষা করবার নয়।

হারাণী সেই হাতে কাচা ধুতি দুখানা কুঁচিয়ে বাক্সের উপর রেখে, স্বামীর সাবান দেওয়া কামিজটা তুলে দেখছিল শুকিয়েছে কিনা—এমন সময় একটু জোরে খট্ খট্ করে শব্দ হল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে দেখলে সেই রাজপুরীর খোলা জানালায় একটা কপাট ধরে দাঁড়িয়ে একটী বউ।

বেশ ফরসা মোটা-সোটা নধর গঠন। গোল গাল কচি কচি মুখখানি যেন হাসিতে ভরা। গা ভরা গহনা। পরণে একখানা চওড়া জরীপার খয়ের রংয়ের সাড়ী—এ কাপড় হয়তো আট পৌরেই পরে থাকে......কত বড় ঘরের বউ সে!

হারাণীকে অবাক্ হয়ে চাইতে দেখে বউটী ফিক্ করে হেসে বল্লে—"বাঃ বা! এতক্ষণে হুঁস্ হল! কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি!"

হারাণী বিস্মিত হয়ে বল্লে—"আমার জন্যে?"—

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ! তোমার জন্যে নয়তো কি পাড়ার কথার শেষটা শুধু হাস্য চপল চোখ দুটীর ইসারায় সেরে বধূটী উৎফুল্ল স্বরে বল্লে—শুধু আজই নয় কদিন ধরে বাপের বাড়ী থেকে এসে পর্য্যন্তই তোমার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ছট্‌ফট্ করছি, কিন্তু তোমার যে ফুরসদই হয়না।"

হারানী কামিজটা পাট করতে করতে একটু হেসে বল্লে—"ফুরসৎ কি করে হবে ভাই? সংসারে কাজ করবার লোক আর তো কেউ নেই—"

"তাই তো দেখছি। সংসারে কেবল তোমরাই স্বামী স্ত্রী বুঝি? তোমার বর কি করেন ভাই?—"

হারানী তার শেষ প্রশ্নের উত্তরে ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত বল্লে "একটা ছাপাখানায় কাজ করেন।"

"ও! তাই—সেদিন দেখলুম কালিঝুলি মেখে... তোমাদের কলতলা বুঝি ঐ ধারে?—"

"হ্যাঁ, ঐ যে রান্না ঘরের ডান দিক পানে—কতটুকুই বা জায়গা?"

"রান্না তুমি নিজেই করো—?"

"তা না তো কে করবে?"

"আহা তাহলে তোমার ভারি কষ্ট হয়তো! এই গরমে আগুন তাতে দুটী বেলা—"

"নাঃ—কষ্ট আবার কি দুজনের তো রান্না।

"তা হলেও, আমার তো ভাই! আগুণ তাতে গেলেই মাথা ধরে ওঠে, আর পারিও না—সামলাতে, সেদিন শাশুড়ীর জন্যে একটু চা তয়ের করতে গিয়ে দু'টো আঙুল ফোস্কা পড়িয়েছি—দেখনা?—"

করুণা হাস্তে হাস্তে ডান হাতখানি বাড়িয়ে দেখালে, সেই শুভ্র নিটোল হাতে 'চেপে' বসা একরাশ উজ্জ্বল স্বর্ণ চুড়ী যেন বিদ্যুতের মত ঝক্‌মকিয়ে উঠ্‌ল।

হারাণী একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলে বল্লে—

"তুমি আর আমি কি সমান? যার কোনো কালে অভ্যাস নেই···"আচ্ছা, তোমার ও চুড়ীগুলি কি প্যাটার্ণের ভাই? দুরকম নয়? বেশ দেখ্‌তে-

"হ্যা—দু 'সেট', এগুলো ইলেক্‌ট্রিক আর এইগুলো কি বলে—কার্ণিশ্ চুড়ী, গড়ন মন্দ নয়। কিন্তু বড্ড ভারি করে ফেলেছে, আবার কোথাও নেমন্তন্নে গেলে ঠেলে এর ওপর জড়োয়া চুড়ী, ব্রেসলেট তাও চাপাতে হয়, আমার ভাল লাগে না ভাই, কিন্তু কি করি বলো?, শাশুড়ীর হুকুম, তাঁর ইচ্ছে বউয়েরা সকল সময় এক গাদা গয়না পরে বেড়ায় ··ভাগ্যে—গায়ে গয়না পরা উঠে গেছে।"

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলে—বউটী—হারাণীর মুখপানে চেয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসতে লাগ্‌ল।

সে হাসিতে আভিজাত্যের গর্ব্ব এতটুকু ছিল না, ছিল শুধু আদরিণীর পরিতৃপ্ত প্রাণের সরল মধুর—আনন্দোচ্ছ্বাস। তবু—হারাণী সেই হাসিতে যোগ দিতে পারলে না। তার মুখখানি কেমন উদাস হয়ে গেল। তাকে নীরব দেখে করুণা গল্প করবার একটা ছুতো ধরেই যেন বল্‌লে—"তোমার হাতের ঐ চুড়ী কগাছিও বেশ সুন্দর দেখতে—"

হারাণী অপ্রস্তুত হয়ে বলে "ও তো সোণার নয়—কাঁচের—"

করুণা বেশ চালাক মেয়ে, নিজের ভ্রান্তি সংশোধন করে সে তৎক্ষণাৎ বলে উঠল—

"তা' জানি। আজকাল কাঁচের চুড়ী এমন সুন্দর করেছে যে সোণার চুড়ীকে হার মানিয়ে দেয়। আমার ভারি ইচ্ছে করে ঐরকম কাঁচের চুড়ী পরি, কিন্তু পরতে দেয় কে?"

তারপর আরও অনেক কথাই হ'ল।

সেইদিনকার আলাপ পরিচয়ে এই সমবয়সী, ও অসম অবস্থার মেয়ে দুটীর পরস্পর সদ্ভাব জন্মে গেল।

পরম সৌভাগ্যবতী ধনী বধূ করুণার সরল সৌহার্দ্দের তলে দরিদ্র গৃহিণী হারাণীর দীনতা হীনতার সকল লজ্জা, সকল ব্যথা চাপা পড়ে গেল।

কিন্তু তাদের আলাপটা সেই জানলা থেকেই হ'ত নিভৃতে, তৃতীয় প্রাণীর অগোচরে।

চার

'ও দিদি! কাল যে তোমাকে একবার আসতে হবে ভাই!"

"কোথায় গো?"

"এখানে,—আমাদের বাড়ী—"

কথাটা শুনে হারাণীর বড় আশ্চর্য্য বোধ হল।

এদিন, করুণার সঙ্গে আলাপ পর্য্যন্ত এমন কথা সে তো কথাও বলেনি, কতবার যেন বল্‌তে বল্‌তে থেমে গিয়েছে,—তার ভাব ভঙ্গী দেখে মনে হ'ত, হারাণীর সহিত সখ্যতা যেন বাড়ীর লোকের কাছে গোপন রাখতে চায়—তবে আজ এ উপরোধ কেন?

ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে করুণার ফুটন্ত ফুলের মত হাসিতে ঢল ঢল মুখখানির পানে চেয়ে—হারাণী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে "কেন? কাল তোমাদের বাড়ী কি ভাই?"

"সে এলেই দেখতে পাবেখ'ন—"

বলে করুণা সলজ্জভাবে মুখখানি নামিয়ে নিলে।

মনে মনে কি একটা অনুমান করে হারাণী সহাস্যে বলে উঠল "ওঃ বুঝেছি! কাল তোমার সাধ বুঝি, না?—"

"বাঃ? ঠিক তো ধরেছ! কি করে বুঝলে ভাই?"

"তোমার মুখ দেখে, আর ভুঁড়িখানির বহর দেখে!"

দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল। করুণা হাসতে হাসতে কিল্ উঠিয়ে বল্লে—

"মাইরি কি দুষ্টু তুমি! কাছে থাকতে, দিতুম এক ঘা বসিয়ে! ওর যেন আর ভুঁড়ি কখনো হবে না!"

আর হয়ে কাজ নেই! বাবাঃ! যা ভোগটা ভুগেছি—"

করুণা এদিক ওদিক চেয়ে তাকে আস্তে বল্লে

"কিন্তু আমার শাশুরীতো এরি মধ্যে মাথা কোটাকুটি আরম্ভ করে দিয়েছিলেন বলেন—মোটা হয়ে চর্ব্বি হয়ে যাচ্ছে, হয়তো আর—"

"তোমার কথা স্বতন্ত্র। আমাদের গরীবের ঘরে... আচ্ছা ভাই! নিজের সাধের নিমন্ত্রন্ন নিজেই করলে বুঝি?"

উপরে মিষ্টি হাসি হেসে, টুক্‌টুকে ঠোঁট খানি একটু ফুলিয়ে করুণা বল্লে—"বন্ধুকে তাই যদি করে থাকি তাতে দোষ হয়েছে কি?"

"না দোষ হবে কেন, এতো বড় সুখের, বড় আহ্লাদের কথা। কিন্তু—

"না, তোমার ও কিন্তু,কিন্তু আমি মানব না, তোমাকে একবারটী আসতেই হবে বুঝলে, শাশুড়ীও বলেছেন তোমাকে নেমন্তন্ন করতে পাঠাবেন—

"তাঁকে তুমিই বলেছিলে বুঝি?"

"বলি নি, তবে বলিয়েছি বটে! নিজের মুখে কি বলা যায়?"

"কার মুখে বললে? বরের?

করুণা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

হারাণী একটুখানি মুচ্‌কে হেসে বলে—

"কাল 'সাধ', তাই বুঝি সোহাগিনীর সব সাধই পূর্ণ করতে হবে তাকে?"

'হ্যাঁ গা হ্যাঁ! বেশী চালাকী করতে হবে না আর! এখন বলো—কাল আসবে তো?— ঠিক?"

হারাণী একটুখানি ভেবে বল্লে—"ঠিক কি করে বলব? তবে দেখি—"

"এতে আর দেখাদেখির কি আছে ভাই? এই তো দোরগোড়ায়—একবাড়ী বল্লেই হয়—তার জন্যে এত··· ওঃ বুঝেছি! কর্ত্তা মশাইয়ের হুকুম নিতে হবে, না? তা আজ রাত্তিরেই নিয়ে রেখো, নইলে···" লক্ষী দিদি আমার! তোমার দুটী পায়ে পড়ি, একবারটী এসো, আরও কত মেয়েরা আসবে, কত আমোদ হবে, তুমি না এলে কিন্তু..."

সরল প্রাণা সখীর সেই অকপট স্নেহানুরোধ, সাদর আমন্ত্রণ হারাণী এড়ায় কি করে? রাত্রে স্বামীকে সমস্ত জানিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—"যাব একবার? অত করে বলছে ··"

সে ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তর পুলিন সহসা দিতে পারলে না। ভাবতে লাগল।

স্বামীকে নির্ব্বাক দেখে হারাণী বুঝল স্বামীর মত নেই। তার মনে শুধু অভিমান নয়—একটু দুঃখও হ'ল—

এই কল্‌কাতা সহরে দেখবার মত জিনিস ও জায়গা কত আছে; থিয়েটার বায়োস্কোপ—আরও কত কি! সকলি ব্যয় সাপেক্ষ ও তাদের সাধ্যাতীত বলে—তেমন কোনো আব্দার ও উপরোধ স্বামীর কাছে সে কোনোদিনই করেনি তো!

কিন্তু আজ এই ঘরের দোরগোড়ায় তারপর সখীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ...তবু—

ক্ষুব্ধকণ্ঠে সে বল্লে "তোমার যদি ইচ্ছে না হয় তবে থাক্—আমি না গেলে তাদের কাজ আট্‌কে থাকবে না তো!"—

পুলিন বিমর্ষভাবে একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লে—"আমার ইচ্ছে খুবই আছে রাণী! তুমি পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে মিশবে—আমোদ-আহ্লাদ করবে—আমার কি তাতে অসাধ? কিন্তু আমরা গরীব, ওঁরা বড়লোক, তাই ভয় করে—"

হারাণীর বুকটা 'ছ্যাঁৎ' করে উঠল। মনে পড়ল করুণার সাথে প্রথম সাক্ষাতে নিজেদের পরিচয় দিতে গিয়ে কি রকম লজ্জায় পড়তে হয়েছিল, আবার যদি সেই রকম... তার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। কিন্তু না গেলে করুণা কি মনে করবে? হয়তো ভাব্বে—কর্ত্তা হুকুম দেন নি, তাই—স্বামীর অপরিমিত ভালবাসার কথা বলে বন্ধুর কাছে সে যে কত দিন কত গর্ব্ব করেছে—সে গর্ব্ব তার আর রইল কই?

স্ত্রীর শুষ্ক ম্লান মুখখানি আদরে চুম্বন করে পুলিন ব্যথাভরা স্নেহের সুরে বল্লে—"আচ্ছা, তুমি যেও রাণী! একবারটী যেও, নইলে তোমার বন্ধু দুঃখিত হবেন। কিন্তু এই বেশে যাবে? ছুদিন এগিয়ে বল্লে, তোমার চুড়ী কগাছি আর হার ছড়াটা একবার চেয়ে এনে দিতে পারতুম—"

হারাণীর অলঙ্কারের মধ্যে ঐ হার ও চুড়ী, তাও আঁতুড় তোলা এবং স্বামীর অসুখের খরচে, বাঁধা পড়েছিল। তা হোক্...

হারাণীর এখন সেই বয়স, যে বয়সে মানুষ সংসারটাকে কেবল সবুজ সমতল দেখে, তার কোনোখানে যে কাঁটা খোঁচা উঁচু নীচু থাক্‌তে পারে তা তলিয়ে দেখে না, দেখতেও চায় না, তাই হারাণী অত সাত পাঁচ না ভেবে স্বামীর সাদর সম্মতি পেয়ে পুলকিত স্বরে বলে উঠল—"থাক্,—নাই বা হল গয়না? আমি তো আর সেখানে সাজ দেখাতে যাচ্ছি না যাচ্ছি শুধু বন্ধুর কথা রাখতে—"

পাঁচ

"সাজ দেখাতে যাচ্ছি না—" কথাটা স্বামীর কাছে বড় মুখ করে বল্লেও পরদিন স্বামীকে যথাসময়ে কাজে পাঠিয়ে হারাণী যখন নিজেকে ধনী গৃহে প্রবেশের উপযোগী করে নিতে গেল, তখন শুধু ব্যস্তই নয়—একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। তাদের দীন কুটীরে প্রসাধনের উপকরণ নেই বল্লেই হয়। তবু রোজকার দাড়াভাঙা চিরুণীর পরিবর্ত্তে বাক্সে সযত্নে তুলে রাখা নূতন চিরুণীতে বেশ পরিপাটী করে চুল বেঁধে, মিশ্‌মিশে কালো চুলে প্রায় ঢাকা ছোট্ট কপাল খানিতে একটী লাল সিঁদুরের 'টিপ্' পরে আয়নাখানা হাতে তুলে হারাণী কেবল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল—নাঃ! মন্দ কি দেখাচ্ছে? কিন্তু কাণের সেই ঢল্ ঢলে মাকড়ী দুটো......আঃ!

হারাণীর আজ ভারি আপশোষ হল, এদ্দিন কলকেতায় এসেছে, এই সেকেলে মাকড়ী দুটো ঘুরিয়ে দুটো আধুনিক ফ্যাসানের দুল কি 'টপ্' কিন্‌তে পারত নাকি?—

না, সে বুদ্ধি তার যোগায় নি, কি বোকা মেয়ে সে! কিন্তু হারাণী ভুলে গেল, নিজের দিকে চেয়ে দেখবার অবকাশ সে কবেই বা পেয়েছে? তার জীবন বসন্তের মধুর দখিনা বাতাসটুকু যে আস্‌তে না আস্‌তে নিদাঘের উষ্ণশ্বাসে মিলিয়ে গেছে—মুকুলিত যৌবন নিকুঞ্জের আধ ফোটা কুঁড়িগুলি ফুল হয়ে ফোটবার আগেই......

যাক্...

আয়না চিরুণী কুলুঙ্গীতে তুলে রেখে হারাণী আর একবার হাত মুখ ধুয়ে এল। এবার কাপড় ছাড়বার পালা।

একে পল্লীর মেয়ে পল্লীবধূ, তাতে গরীব, হারাণীর কাপড় জামার সংখ্যা অতি অল্পই ছিল। বিয়ের চেলী ছাড়া সিল্কের সাড়ী বলতে বউ ভাতে পাওয়া—একখানি মাত্র কমলালেবু রংয়ের পার্শী সাড়ি, হারাণী সেইখানা নাড়াচাড়া করে দেখতে লাগল, সাড়ীটার জৌলস আছে বটে, কিন্তু রংটা যেন বড্ড গাঢ়, গর্ গরে, চোখে যেন বিঁধে যায়! তা হোক্—হারাণীর তো রঙীন্ কাপড় পরবার বয়স যায় নি এখনো—তার বয়সী মেয়েরা যে...কিন্তু এ কাপড়ের সঙ্গের জামা কই? সিল্কের সাড়ীর সঙ্গে সাদা জামা পরা চলবে না তো! তবে...

ট্রাঙ্কের তলা থেকে একটা মাজেণ্টার রংয়ের সিল্কের হাতকাটা লেশ দেওয়া, আধা ব্লাউস্ আধা জ্যাকেট গোছের—জামা বার করে হারাণী মনকে আর খুঁৎখুতুনির অবকাশ না দিয়েই পরে ফেল্লে। তারপর কাপড়খানা অনেকটা আধুনিক ধরণে পরে, সেফ্‌টীপিনে আঁচল আটকে স্বামীর একটা কাচা রুমাল কোমরের কাপড়ে গুঁজে প্রসাধিত রূপখানি একবার দেখবার আশায় আয়নাটা আলোর

দিকে ধরে দেখতে লাগল, ক্ষুদ্র দর্পণে সব দিক্ দেখা যায় না তবু—হারাণীর স্বল্প রঙীন্ তরুণ চিত্ত একান্ত সংক্ষুব্ধ আহত হয়ে উঠল। মা গো! একি কিম্ভুত কিমাকার মূর্ত্তি হয়েছে তার! ধ্যেৎ! এ মূর্ত্তি দেখ্‌লে সবাই 'সং' বলে হাস্‌বে যে! মনে করবে পাড়াগেঁয়ে ভূত···সহুরে সভ্য ভব্য মেয়ে তারা···

হ্যাঁ, এই কাপড়জামার ওপর যদি দুচারখানা দামী গহনা হ'ত কিম্বা রূপের 'জেল্লা' একটু থাকত—ভগবান তাও দেন নি তো!

একটা ক্ষুব্ধ নিশ্বাস ফেলে হারাণী সেই সিল্কের কাপড় জামা তখুনি খুলে ফেল্লে। তার মনে হ'ল সখীর নিমন্ত্রণ স্বীকার করে সে ভাল কাজ করে নি। কিন্তু এখন আর অনুশোচনার সময় নেই, গাড়ী এল বলে।

হারাণী এবার একখানা কুচিয়ে রাখা চুড়ীপাড় দেশী সাড়ী আর ফেরিওয়ালার কাছ থেকে সম্প্রতি কেনা গোলাপী ছিটের একটা সাদাসিদে ব্লাউস বার করে সোজা-সুজিভাবে তাড়াতাড়ি পরে নিলে।

হ্যাঁ, এ তবু যেন একটু ভদ্রগোছ পোষাক হয়েছে! এ পোষাকে সুশ্রী না দেখালেও হারাণীকে নেহাত বিশ্রী দেখাচ্ছে না বোধ হয়। কিন্তু বুক কাটা জামা—গলাটা যেন বড় 'ন্যাড়া ন্যাড়া' লাগছে...একছড়া সরু হার যদি...

মরুক্‌গে! খালি নেই—নেই—নেই!—সকলের সব জিনিস থাকে কি? বন্ধুর সাধের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এই সাজই যথেষ্ট।

ছয়

হারাণীর সে ভুল ভেঙ্গে গেল অচিরে। যখন বড় লোকের বাড়ীর ঝি, গিন্নিমার প্রধান ও প্রিয় সেবিকা শ্রীমতী কুসুম সুন্দরী ওরফে কুসী,—ভারিক্কি চেহারা, দুধের মত সাদা ধপ্‌ধপে গরদের থান পরে, মাংসল হাত দুখানায় দুগাছা মোটা মোটা সোণার তাগা, গলায় একছড়া ভারি চক্‌চকে বিছে হার ঝুলিয়ে,—গাল ভরা পান মুখভরা হাসি নিয়ে, কাশীর সুরতির সুগন্ধে ভুর্ ভুর্ করতে করতে অভ্যর্থনা করতে এলো, তখন বেচারী হারাণী যেন হক্‌চকিয়ে গেল।

আধ ঘোমটার ভিতর থেকে সে হতভম্বের মত চেয়ে রইল—এটি ঝি? ঝিয়ের এত·····

তার গায়ে তো সোণার মধ্যে—সেই মাকড়ী আর পাতলা সোণার পাত মোড়া ম্যাড় ম্যাড়ে শাঁখা দুগাছি!

হারাণীর সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠল, যখন সেই ঝিটী তাকে নিমন্ত্রিতা মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরের একটা পর্দ্দা ফেলা দরজার সামনে পৌঁছে দিয়ে কার্য্যান্তরে চলে গেল।

সুসজ্জিত প্রশস্ত কক্ষ।

ঘর জোড়া পুরু নরম গালিচায় বসে অনেকগুলি মহিলা প্রবীণা, নবীনা সবই আছেন। তবে নবীনার সংখ্যাই অধিক।

তাদের কেশ বেশের পরিপাট্য, মণিমুক্তা খচিত উজ্জ্বল স্বর্ণাভরণের তীব্র দীপ্তি যেন চোখ ঝল্‌সে দিচ্ছিল।

যাদের রূপ নেই বেশ ভূষার বাহুল্যতা তাদের আরো বেশী, রূপের অভাব তারা যেন প্রসাধনে পূর্ণ করতে চায়।

মাথার উপর একখানা নয় দু দুখানা 'ফ্যান্' হুস্‌হুস্ করে অশ্রান্ত ভাবে ঘুরে ঘুরে তরুণীদের বিচিত্র সাড়ীর রঙ্গীন্ আঁচল চঞ্চল উদ্দাম করে তুলছিল।

সমস্তই হারাণীর অ-দৃষ্ট পূর্ব্ব।

এই ইন্দ্রপুরীর কল্পনাও বোধ হয় সে কোনদিন মনে আনতে পারে নি। পর্দ্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকে হারাণী দরজার কাছটীতেই দাঁড়িয়ে রইল নিতান্ত জড়সড় হ'য়ে।

নিমন্ত্রিতারা তখন পরস্পর কথাবার্ত্তা—ও গল্পের মধ্যে নিমগ্ন, কার জামাতা কেমন রোজগার করে—কার বউয়ের বাপের বাড়ী হ'তে বারোমাসে তের পার্ব্বণের তত্ত্ব আসে, কার স্বামী কাকে মাসে একখানা করে গহনা গড়িয়ে দেয়—ইত্যাদি—

বাড়ীর মেয়েরাও যে যার কাজে ব্যস্ত। করুণার যা এবং ননদেরা বহুদিন অ-দর্শিতা সঙ্গিনীদের সঙ্গে হাস্য পরিহাসে একান্ত মস্‌গুল!

বাড়ীর গিন্নি করুণার শাশুড়ী ঠাকরুণ—বধূর সাধ ভক্ষণের জন্য 'যেচ্' পোয়াতী নির্ব্বাচনে ব্যস্ত ছিলেন। তাতো আবার হারানী সকলেরই অচেনা; কাজেই তার সে ধারে উপস্থিতি কেউ লক্ষ্য করলে না।

"ওমা! মাগো!—সোফার জিজ্ঞাসা করছে সে এখন ফিরে যাবে না কি..."বল্‌তে বল্‌তে একটী সাত আট

বছরের প্রজাপতির মত বিচিত্র রঙীন্ সাজে সজ্জিতা একটী বালিকা হুস্ করে পর্দ্দা ঠেলে প্রায় ঘাড়ে পড়ে—হিল্‌দেওয়া চকচকে জুতার তলায় হারাণীর একখানা পা মাড়িয়ে দিয়ে গট্‌গট্ করে তার মায়ের কাছে ছুটে গেল।

যন্ত্রণায় অস্ফুট স্বরে 'ইঃ' বলে দাঁতে ঠোট চেপে হারাণী ভিতরের দিকে খানিক সরে এলো।

ব্যাকুলদৃষ্টি প্রসারিত করে সে দেখতে লাগল এই অপরিচিতাদের মধ্যে সেই চেনা মুখখানি যদি...হাঁ, ঐ যে ওপারে জানলার দিকে বসে তার বন্ধু করুণা···

সাধের জন্য আনা ধূপছায়া রংয়ের নূতন ঝক্‌মকে দামী বেনারসী—আর একগাদা অলঙ্কারের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে সে যেন অতিষ্ঠ হয়ে বসে আছে। তাকে ঘিরে কয়েকটী তরুণী, হাত মুখ নেড়ে হেসে হেসে কি বলাবলি করছিল। কেউবা তারি মধ্যে করুণার নূতন ও পুরাতন গহনা গুলি খুঁটায়ে খুঁটায়ে দেখে সমালোচনা জুড়ে দিয়েছিল।

হারাণীর দিকে দৃষ্টি পড়তেই করুণা একটু খানি মুচ্‌কে হেসে হাতছানি দিয়ে ডাকলে। সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গিনীদের এবং আর ও অনেকগুলি চোখের উৎসুক দৃষ্টি পড়ল সেই অতিমাত্র সঙ্কুচিতা, অতি সাধারণ অপরিচিতা মেয়েটীর উপর।

হারাণী কারুরদিকে না চেয়ে নত মুখে কুণ্ঠিত চরণে একধার দিয়ে পাশ কাটিয়ে বন্ধুর কাছে গেল।

করুণা সাগ্রহে তার হাত ধরে হাসতে হাসতে বল্লে—বসো ভাই!—এতক্ষণে সময় হল বুঝি!—কর্ত্তা যে ছেড়ে দিলেন?"

করুণার ঠিক সামনে যে মেয়েটী বসেছিল, হারাণীর আপদ মস্তক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার দেখে, সে করুণার মুখের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করলে "এ কে ভাই?"

"আমার এক বন্ধু, এই পাশের বাড়ীতে

'সর্ব্বরক্ষে!—আমি মনে করেছিলুম ও বুঝি ডোমের—শেষ কথাটা সে অতিসন্তর্পণে করুণার কানে কানে বলে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল।

করুণা হাসি চাপ্‌তে চাপ্‌তে তাকে ঠেলে দিয়ে বল্লে—"দূর!—তা কেন!—"

হারাণীর মুখখানি বৈশাখের প্রখর রবি তাপে আতপ্ত কচি কিশলয়ের মত নিমেষে ম্লান ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। চোখ দুটীর কোণে কোণে জল ভরে এলো।

তার স্মৃতিপটে চকিতে ভেসে উঠল - অতীত দিনের একটী বিস্মৃত প্রায় চিত্র।—সেই অশোকের খেলা ঘর!

হায়!—শৈশবের সেই ধূলার খেলা-ঘর হারাণীকে যে খানটীতে আসন দিতে চেয়েছিল - আজ সত্যিকার সংসারও তাকে আসন দিতে চায় সেইখানে—তার চেয়ে এতটুকু উর্দ্ধে নয়।

এখানেও সে কিশলয় নয়—রাণী নয়—শুধু হারাণী!

হারাণীর নেমন্তন্ন বাড়ী থেকে ফিরতে দেরী হবে মনে করে পুলিন রোজকার চেয়ে দেরী করেই এসেছিল, কিন্তু এসে দেখলে ঘর বন্ধ নয় খোলা, হারাণী কাপড় ছেড়ে—পরিত্যক্ত আধ ময়লা কাপড়খানা পরে তক্তপোষের ওপর চুপটী করে শুয়ে আছে।

পুলিন একটু ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করলে "কই—তুমি যাওনি?"

হারাণী তাড়াতাড়ি উঠে ছাড়া কাপড় জামা একপাশে সরিয়ে রেখে বল্লে "গিয়েছিলুম, কিন্তু হঠাৎ মাথাটা এমন ধরে উঠল যে বসতে পারলুম না, যা ভিড়! আমার তো কোনো কালে অভ্যাস নেই···"

এইমাথাধরার প্রকৃত তথ্য হারাণীর চোখ মুখের ছল ছল ম্লান ভাব দেখে পুলিনের জানতে দেরী হল না—সে বলতে যাচ্ছিল—আমি এই জন্যই তো বলেছিলুম কিন্তু পত্নীর ব্যথিত অপমানাহত চিত্তে পুনর্ব্বার আঘাত দিতে তার প্রবৃত্তি হল না, তাই পুলিন সমবেদনা ভরে স্নেহকোমল কণ্ঠে শুধু বল্লে "তোমার খাওয়া হয়েছে?"

"না, অতবেশী মাথা ধরলে কি খাওয়া যায়?"

"আচ্ছা তাহলে এবেলা আর রান্নার হাঙ্গামে কাজ নেই তুমি শুয়ে থাক, আমি বাজার থেকে—"

"না, না, বাজারের খাবার খাবে কেন?—তোমার জন্যে সব গোছ করেই তো গিয়েছিলুম এক্ষুণি রান্না হয়ে যাবে।—

বলতে বলতে হারাণী হয়তো তার উপ্‌চে পরা চোখের জল সাম্‌লাতেই স্বামীর সান্নিধ্য এড়িয়ে রান্নাঘরে চলে এলো

তখন করুণাদের বাড়ী অর্গানের সুরে সুর মিলিয়ে কে একটী মেয়ে চন্‌চনে চড়া গলায় গান করছিল—

"আর কাহারো কাছে যাব না আমি—
তোমারি কাছে র'ব হে!
আর কাহারো সাথে ক'ব না কথা—
তোমারি সাথে ক'ব হে!"

মহাভারত—স্বর্গের পথে—

শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা

পাত্র :—পঞ্চপাণ্ডব !

স্থান :—ইন্দ্রপ্রস্থের—উপান্ত।

সহদেব।—রক্তসিন্ধু মন্থন করা—ঐ ইন্দ্রপ্রস্থ এখনো চিত্রের মত দেখা যাইতেছে। শুধুই কি দেখা যাইতেছে ! যেন মৌন ভাষায় - আকুল বেদনায় আমাদের আহ্বান করিতেছে। বিদেশগামী পুত্রের প্রতি মাতা যেমন সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকেন, ইন্দ্রপ্রস্থ ঠিক তেমনই বিহ্বল প্রেক্ষণে আমাদের গমনভঙ্গি লক্ষ্য করিতেছে।

নকুল।—ঠিক লক্ষ্য করিয়াছ - সহদেব। এ মূর্ত্তি তো ইন্দ্রপ্রস্থের কখনো দেখি নাই। জড় নগরীর এমন প্রাণ আছে ? চলিতে বাধা পাইতেছি। মনে হইতেছে চলিব না—যাইব না, এইখানে মিশিয়া থাকি। এই ধূলির সঙ্গে মিশিয়া যাই ! কোথায় যাইব স্বর্গে !

দ্রৌপদী একটু উপবেশন করিলে

সকলেই একটু বসিলেন।

সহদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন। দাদা ! এই স্বর্গ যাত্রার উদ্দেশ্য কি ? সারা জীবন কূল পাইবার জন্য প্রাণান্ত করিয়া, কূল পাইয়া তাহা পরিত্যাগ করিবার কি তাৎপর্য্য।

যুধিষ্ঠির—নিয়তি সহদেব ? মানব নিয়তির দাস। নিয়তির পরিচালনায় কুরুক্ষেত্র সংঘটন, নিয়তির নির্দ্দেশেই এই মহাযাত্রা।

ভীম—কিছুই বুঝি নাই ; আজও বুঝিতে পারিলাম না। কৌরব সভায় বিবসনা পাঞ্চালীকে দেখিয়া যখন পঞ্চ পাণ্ডব জড় পুত্তলিকার মত বসিয়াছিলাম, যখন দ্বৈপায়ন হ্রদ হইতে অসহায়, প্রাণভয়ভীত দুর্য্যোধনকে যুদ্ধার্থে আকর্ষণ করিয়া আনা হইল, যখন শ্মশান সমতুল্য কুরু-বংশের সম্রাটত্ব গ্রহণ করা হইল, আবার যখন ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন হইবার পর এই মহাযাত্রার সূচনা হইল, এই সমস্ত ঘটনার আদি কি, অন্ত কি কিছুই বুঝি নাই। যন্ত্র আমি যন্ত্রের মতই চলিয়াছি।

পাঞ্চালী অধোমুখে বসিয়া ছিলেন। একবার মধ্যম পাণ্ডবের মুখের দিকে চাহিলেন ; তারপর অর্জ্জুনের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—আমি বুঝিয়াছি—আমি বুঝিয়াছিলাম। যে দিন পাঞ্চালরাজ সভায় লক্ষ্য ভেদ করিয়া তোমরা জয়যুক্ত হইলে, যে দিন জতুগৃহ দাহ হইল, যে দিন পাশায় হারিয়া আমায় পণ রাখা হইল, যে দিন অজ্ঞাতবাস স্বীকৃত হইল, দ্রুপদ সভায় যে দিন আমার অপমান হইল, তারপর প্রত্যেক ঘটনায় বুঝিয়াছি উজ্জ্বল ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি রাজসূয় যজ্ঞে, জরাসন্ধ বধে, শিশুপালের শিরশ্ছেদনে, অভিমন্যু বধে বুঝিয়াছি, বুঝিয়াছিলাম কি আমাদের জীবনব্রত।

যুধিষ্ঠির—কি বুঝিয়াছিলে রাজ্ঞি ! আর আজ কি বুঝিতেছনা ?

দ্রৌপদী—বুঝি নাই মহারাজ ! প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জননীর পুত্রমুখ দর্শনের মত স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছি, প্রাতঃ সূর্য্যের মত স্বপ্রকাশ—দীপ্যমান বিভাসিত নিখিল বিশ্বে, নিখিল গগনে, আলোকস্রাবী পঞ্চ পাণ্ডবের শক্তি সৃষ্ট মহাভারত ! সব সহিয়াছি ; অভিমন্যুর মরণে নয়নধারা ফেলি নাই ; রাজসভায় পাপাত্মা দুঃশাসনের কেশাকর্ষণে কাঁদি নাই ; উত্তেজিতা হই নাই—ঐ মহা আশায়।

সহদেব—কি তোমার স্বর্ণস্বপ্ন পাঞ্চালী !

দ্রৌপদী—সব্যসাচীকে শুধাও আর্য্যপুত্র।

সহদেব—দাদা !

অর্জ্জুন—ধর্ম্ম রাজ্য ভাই। পাণ্ডবদের আর কি জীবন-ব্রত থাকিতে পারে ?

যুধিষ্ঠির—অর্জ্জুন। কিন্তু আমিও বুঝি নাই ভাই ! কেবল সাক্ষাৎ নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করিয়াছি। হিংসার পরিবর্ত্তে হিংসায় কি করিয়া ধর্ম্ম হইতে পারে, কনিষ্ঠকে হত্যা করিয়া, গুরুহত্যা করিয়া, রাজ্য হইতে পারে, ধর্ম্মরাজ্য কি করিয়া হইতে পারে তাহা কখনও বুঝি নাই। আচার্য্য দ্রোণকে পরাভূত

করিতে "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" বলিয়াছি, মূর্ত্তিমান নিয়তির নির্দ্দেশে নারায়ণের অনুশাসনে। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন সে দিনও বুঝি নাই, আজিও বুঝি নাই।

দ্রৌপদী—কেন, তবে এই মহাসমর ঘটিল মহারাজ! আমার ধর্ম্ম, তোমার ধর্ম্ম, গীতার ধর্ম্ম কোথায় কাহার বিরোধ ছিল মহারাজ?

যুধিষ্ঠির—হয়তো ছিল, কিম্বা ছিল না। গীতার ধর্ম্ম হয়তা বুঝি নাই, হয়তো আমি বুঝিবার অধিকারী নই। তবুও পাঞ্চালী আমার ধর্ম্ম আছে; অপরিবর্ত্তনীয় অক্ষয়, ধ্রুব সে ধর্ম্ম। সে ধর্ম্মের দাস—ক্রীতদাস আমি; সে ধর্ম্মের বিনিময়ে আমার কাছে উন্নততর, কিছু শুভতর কিছু, পবিত্রতর কিছু নাই। আমার সে ধর্ম্ম সত্য, অচ্ছিদ্র, অখণ্ড, পরিপূর্ণ, অপরিবর্ত্তনীয়। তাহা যুক্তিতর্ক সমস্তের সম্পর্কশূন্য।

ভীম—কেন তবে এই যুদ্ধে সম্মতি দিয়াছিলেন? আপনার মুখ চাহিয়া কি না সহিয়াছি? আরও না হয় সহিতাম। কেন নিরর্থক একটা হত্যাকাণ্ড ঘটিতে দিলেন?

যুধিষ্ঠির—কেন? এ কথা আজিও বুঝ নাই ভীম! সত্য আমার ধর্ম্ম বলিয়া যুধিষ্ঠিরকে কখনো উদ্ধত দুর্ব্বিনীত স্পর্দ্ধিত দেখিয়াছ? সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, মূর্ত্তিমান সত্য যেখানে আমার শিয়রে, সেখানে যুধিষ্ঠিরের কি স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে ভাই। আমি যুদ্ধ করিয়াছি শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিতে প্রিয়তম!

পার্থ—দাদা! ধর্ম্ম রাজ্য নিরর্থক? একটা কি কল্পনা? মহাদেবতা নারায়ণের উদ্দেশ্যহীন, অর্থ হীন, কার্য্যকারণ পারম্পর্য্য বিহীন শিশুর শৈশব ক্রীড়ার মত বাল্য চাপল্য।

ভীম—তাহা নহে পার্থ! কখনই হইতে পারে না? কিন্তু ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই স্বর্গ যাত্রা এতো পরাজয়। ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনার ফল কি?

সহদেব—বুঝিয়াছিলাম যখন জরাসন্ধ শিশুপাল প্রভৃতি ক্ষত্রিয়বৃন্দ ভারতের বক্ষের উপর আসুরিক দম্ভে রাজ্য করিতেছিল, তখন ভারত অধর্ম্মের অনলে ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছিল, সেই মৃত্যু-অগ্নি হইতে উদ্ধার করাই ধর্ম্ম রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্য। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্য ভারতকে কি দান করিল, তাহা যে বুদ্ধির অগম্য দেখিতেছি।

পাঞ্চালী। রাজপুত্র! আমার মানসনেত্রে ছিল—অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী রাজন্যবৃন্দকে শক্তির শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া পঞ্চভ্রাতা ভারত-সিংহাসনে সমাসীন। গীতার ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান; প্রেমের ধর্ম্ম ভারত ব্যাপিত, পাণ্ডব শক্তি দীপ্যমান, ভারত জাতি উন্নত, জীবন্ত, বলবন্ত, স্নিগ্ধ শান্ত তৃপ্ত দীপ্ত।

নকুল—তাহার পরিবর্ত্তে কি দেখিতেছ মহারাণি।

ভীম—আমি তাহার স্থানে দেখিতেছি এক মহাশ্মশান—এক বিরাট নারীরাজ্য, ক্ষাত্র বীর্য্যহীন পতিত ভারত।

সহদেব—তাহা হইলে নারায়ণের ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ। ভারতকে উন্নত করিতে গিয়া পতিত করা হইল।

পার্থ—সহদেব! শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্ম মিথ্যা? গীতার বাণী বিস্মৃত হইলে?

যুধিষ্ঠির। "কর্ম্মণ্যেব্যাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" চল ভাই! কর্ম্ম করিয়াছি এখন মহা প্রস্থান করি।

পাঞ্চালী—কিন্তু ভারত! ভারতের ধর্ম্ম—ভারতের জাতি—মহাভারত!

পার্থ—পাঞ্চালী! আমরা নির্ম্মোক মাত্র। যন্ত্র মাত্র। কর্ম্মে আমাদের অধিকার! আর কি করিবার সামর্থ্য আছে আমাদের? কিছুই যে নাই। আর তাহা বুঝিয়াছি সেই দিন, যে দিন বন-প্রান্তে নারায়ণের দেহত্যাগান্তে যাদব নারীকে রক্ষা করিতে গিয়া গাণ্ডীব উত্তোলন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম। যে গাণ্ডীব আমার ক্রীড়নক, সেই গাণ্ডীব আমি তুলিতে পারিলাম না!

ব্যাসদেব গীতা গান করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

যুধিষ্ঠির—মহর্ষি! আজ স্বর্গযাত্রার পথে আমরা দ্বিধা-সঙ্কুল চিত্ত। আপনি চিরদিন আমাদের গুরু। পথদ্রষ্টা! আজ বলিয়া দিন কেন আমাদের এই নিষ্ফল নৈরাশ্য!

ব্যাস—কিসের নিরাশা মহারাজ। দীর্ঘকাল ধর্ম্ম-শক্তিতে বলীয়ান হইয়া পঞ্চভ্রাতা হিমাচলের অপেক্ষা অচল অটলভাবে রাজ্য পালন করিয়াছিলে; অবশেষে জীবন-কর্ত্তব্য শেষ করিয়া মহাপ্রস্থান—এতো উল্লাস! এই তো পরিপূর্ণতা! নিরাশা কোথা হইতে আসিল?

যুধিষ্ঠির—ঠিক নৈরাশ্য—নহে প্রভু! সন্দেহ! মহাভারত কই? সারাজীবন সহস্র দুঃখ বেদনা সহিয়া যাহার জন্য সাধনা করিলাম, তাহা কই?—

অর্জ্জুন—তাত! আমরা শুধু কি সাম্রাজ্যের জন্যই কুরুক্ষেত্র মহাসমর করিয়াছি! শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা আপনার উপদেশ কি পঞ্চভ্রাতাকে একটা উন্নততর আদর্শ দেয় নাই?

ব্যাস—কুরুক্ষেত্রের উদ্দেশ্য—মহাভারত!

পাঞ্চালী—কই সে মহাভারত ঋষিবর! ভারতের ক্ষত্রিয় নিঃক্ষত্রিয়। তাহার স্থানে শুদ্ধশক্তি, পবিত্র তেজ নূতন ক্ষত্রিয় জাতি উঠিল না, সারা ভারতে একটা মৃত্যুময়ী অবসাদ কালিমা! ইহাই কি মহাভারত!

ভীম—পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাসদেব কি এই শ্মশান ভারতই চাহিয়াছিলেন। এই কি মহাভারত!!

সহদেব—ভারতের ধর্ম্মরাজ্য মহাভারত সম্ভব শ্মশান-ভারত! যেখানে ভারতের ক্ষাত্রতেজকে নির্ব্বাণ করিয়াই মহাভারত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, সেখানে আর কি হইতে পারে তাহা কল্পনাতীত!

নকুল—ভারতের তরুণ প্রাণ যেখানে বলি প্রদত্ত হইয়াছে, অভিমন্যুকে উৎসর্গ করিয়া যাহার প্রতিষ্ঠা চেষ্টা, তাহা আর কি হইতে পারে?

ব্যাসদেব—গীতা-বাণী ভুলিয়াছ মাদ্রীপুত্র! কিসের জন্য কুরুক্ষেত্র সমর-যজ্ঞ!

নকুল—কিসের জন্য ঋষিবর!

ব্যাস—পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম! ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়...”

ভীম—বুঝিলাম ঋষি! অত্যাচারী রাজন্যবর্গের হাত হইতে সাধুগণ পরিত্রাণ পাইয়াছেন। বুঝিলাম উদ্ধত অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী, শক্তিমদমত্ত নৃপতিকুলকে উচ্ছিন্ন করিয়া দুষ্কৃত দমন হইয়াছে! কিন্তু ধর্ম্ম স্থাপন?

ব্যাস—ধর্ম্ম যে চিরন্তন মধ্যম পাণ্ডব!

সহদেব—অতএব—

ব্যাস—কুরুক্ষেত্রের অব্যবহিত পূর্ব্বের ভারত পলিত-গলিত মৃত দেহ! তাহা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিলীয়মান! রাজা, রাজশক্তি, ক্ষাত্রবীর্য্য, ব্রাহ্মণ্য শক্তি, শাস্ত্র, সাহিত্য, সমাজ, সকলের মধ্যে বিনাশের বিষ প্রবেশ করিয়াছিল। এ ভারত এই উপনিষদের ভারত! নিমি, হরিশ্চন্দ্রের ভারত, জনক সনক প্রভৃতিরভারত অচিরেই বিনষ্ট হইত! চির-তরে বিনষ্ট হইত। কুরুক্ষেত্রে তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল।

যুধি—এই হত্যায়, এই মৃত্যু-যজ্ঞে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল! সে কেমন কথা মহর্ষি!

ব্যাস—ঠিক তাই। ভারত জীবনের পলিত-গলিত বিষ-দুষ্ট অঙ্গ তাহার ক্ষাত্র তেজ দুর্য্যোধন কর্ণ শিশুপাল জরাসন্ধ! উহা রহিলে সমগ্র দেহ গলিয়া খসিয়া পড়িত! ভারতের ধর্ম্ম প্রাণহীন হইয়াছিল—উহাতে ছিল কেবল কামনার তাড়না। সনাতন ধর্ম্ম মরিতে পড়িয়াছিল! পাশবতা, ভোগতৃষ্ণা, প্রচণ্ড জিঘাংসু অতৃপ্ত লালসাবহ্নি ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছিল! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদি অবতীর্ণ না হইতেন তবে বিশ্ব নাথের একটা মহান্ সৃষ্টি, একটা সুপ্রাচীন বহুসাধনালব্ধ সভ্যতা চিরকালের মত ধরা পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইত! ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মতত্ত্ব বড় গূঢ় বড় জটিল। নারায়ণের লীলা নির্ণয় মানব বুদ্ধির অতীত। তাই কৃপা সিন্ধু কৃপা করিয়া ভ্রান্ত মানবকে সস্নেহে উপদেশ দিয়াছেন।—

“কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তে
মা ফলেষু কদাচন!”

ক্ষুদ্র চেতা শান্ত পরিমিত মানুষ আমরা বেশী কিছু করিতে যাইলেই অকর্ম্ম করিয়া বসি!

পার্থ—ঋষিবর! গীতার বাণী কর্ণে ধ্বনিয়া আছে, প্রাণের সহিত মিশিয়া যায় নাই! একবার—একবারমাত্র নিমেষের জন্য সেই মহাদেবতার কৃপা করুণায় বিশ্বরূপ দর্শনের সময় গীতা তত্ত্ব অনুভূত হইয়াছিল; তাহার পর আর প্রাণের মাঝে গীতা তত্ত্ব জাগ্রত জীবন্ত সত্য হইয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে না ঋষিবর।

ব্যাস—পার্থ! সত্যই তাই! ঐ মহাতত্ত্ব নারায়ণের কৃপা ব্যতীত ধারণা করিবার সাধ্য ক্ষুদ্র মানব আমাদের কোথায় বৎস!

পার্থ—ঋষিবর। খাণ্ডব দাহনের সময় ধারণা হইয়াছিল পাণ্ডবদের জীবনব্রত কি? বুঝিয়াছিলাম, এই খাণ্ডব সারা ভারত ব্যাপিয়া, আর তাহাই ভস্মীভূত করিয়া আনন্দ মুখরিত, ঐশ্বর্য্য শান্তি পরিপূর্ণ এক মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিতে হইবে। আর তাহাই মহাভারত! কিন্তু একি

হইল ? নারায়ণ ব্যাধ শরে দেহ রক্ষা করিলেন ; পার্থ আমি, গাণ্ডিব তুলিতে অসমর্থ হইলাম ! শক্তির মূর্ত্ত বিভূতি পঞ্চ পাণ্ডব প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন। ভারতে ক্ষাত্র শক্তি নির্ব্বাপিত হইল। সমস্তই যেন আজ কুয়াসাচ্ছন্ন !

ব্যাসদেব—অর্জ্জুন ! দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া তুমি একি কথা বলিতেছ বৎস ! মহা দেবতা নারায়ণের লীলা আমরা সসীম শক্তি মানুষ আমাদের জ্ঞানের অগম্য। কর্ম্ম করাই আমাদের কর্ত্তব্য ; আর কিছু দেখিতে যাওয়া অসঙ্গত।

ভারত মহাভারতই হইল ! আজ তুমি দেখিতেছ, আমি দেখিতেছি ক্ষাত্র শক্তি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। তাই বলিয়া নারায়ণের লীলা কি ব্যর্থ হইয়াছে ?

দ্রৌপদী—কে তাহা বলিবে মহর্ষি ! আমরা বিক্ষুব্ধ চিত্ত, বিভ্রান্ত বুদ্ধি, কিছুই যে বুঝি না প্রভু ! কোথায় সেই মহিমান্বিত মহাভারত ?

ব্যাস - দেবি ! নারায়ণের লীলা— মানব বুদ্ধির অগম্য। মহাভারতই রচিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের রক্তাম্বুধি মন্থন করিয়া ভারতের মহাভারত মূর্ত্তিই উদ্ভূত হইয়াছে।

ভারতের ধর্ম্ম, যাহা শাশ্বত সনাতন, অমৃতময়, যাহা মানুষকে বাঁচায়, ধর্ম্মকে রক্ষা করে, জাতিকে আনন্দময় করে, যাহা সৃষ্টির অমৃত, তাহা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বে ভারতে, ভারতের প্রাণশক্তিতে যে কি ভীষণ বিনাশ-বিষ আক্রমণ করিয়াছিল, ধর্ম্মে সভ্যতায় সমাজজীবনে রাজশক্তিতে একটা জাতি-জীবনের অন্তরে বাহিরে কি যে সর্ব্বনাশী—কি যে কালান্তক আসুরিক ভাব আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। কুরু সভায় রাজ্ঞীর অপমানে, কংশের অত্যাচারে, দুর্য্যোধনের মদমত্তায় তাহা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আবার ব্রহ্মণ্যশক্তিও তখন কলুষিত। ব্রাহ্মণ জাতির শীর্ষদেশ। ক্ষত্রিয়ের পরিচালক—সেই ব্রাহ্মণ মনীষাও তখন বিকৃত—ব্রাহ্মণ যে কি পর্য্যন্ত ধর্ম্মহীন পতিত হইয়াছিল—তাহা বুঝাইবার উপায় নাই। দ্রোণ কৃপাচার্য্যে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে পরিস্ফুট। উপনিষদের ধর্ম্ম—ভাগবত ধর্ম্ম কোথাও ছিল না। ভারত অচিরেই বিধ্বস্ত হইয়া যাইত।

ভীম। ভারতের রহিল কি ?

ব্যাস। বৃকোদর ! কাল যে অপরিমেয় ! ক্ষুদ্র দৃষ্টি কিছুই লক্ষ্য হইতেছে না। ভারতকে অনন্তকালের জন্য অমৃতমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়া হইল। কুরুক্ষেত্রে ভারতের রোগমুক্তি মাত্র, ভারতের বাঁচিবার সূত্রপাত। যে ভারত অদূরবর্ত্তী কালের ভিতর ধ্বংস হইয়া যাইত, তাহাকে চিরকালের জন্য জীবিত রাখিবার ঔষধ দান করা হইল !

পার্থ। কি উপায়ে মহর্ষি।

ব্যাস—গীতামৃতে ! মানবের ধর্ম্মই শক্তি, ধর্ম্মই প্রাণ, ধর্ম্মই সর্ব্বস্ব। এই ধর্ম্ম আব্যাকৃত রহিল—মানুষ বাঁচে, জাতি অমর হয়। গীতা অনন্ত অমৃত-প্রস্রবন। ভারত-চিত্তে যে আর্য্যোচিত ক্লৈব্য মোহ আসিবে, গীতার স্পর্শে তাহার অপনোদন হইবে। অন্য ধর্ম্ম বিকৃত হয়, গীতার ধর্ম্ম চির শুদ্ধ, চির নির্ম্মল, চিরন্তন কালের জন্য ওজস্বী, প্রাণপ্রদ ! অনন্তকাল ধরিয়া "ক্লৈব্য মাস্ম গমঃ" বলিয়া ঐ গীতা-গাথা ভারতকে উদ্বুদ্ধ করিবে। যখনই ভারত-চিত্তে অবসাদ, ক্লৈব্য, মোহ, আর্য্যজনোচিত গ্লানির উদয় হইবে তখনই নারায়ণের বাণীমূর্ত্তি বজ্র নির্ঘোষে নিনাদিত হইবে—

"ক্লৈব্য মাস্ম গমঃ।"

ভারতে যখনই তামস-যুগের আবির্ভাব হইবে তখনই তমো মগ্ন ভারতজাতির কর্ণে বাজিয়া উঠিবে—ক্লৈব্য মাস্ম গমঃ।

মহাভারত কেবল আজিকার জন্য নয়—অনন্তকালের জন্য। এই কুরুক্ষেত্র সমরে ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল বৎস। ভবিষ্যৎ ভারতে ইহার পূর্ণাহুতি। নারায়ণের ধর্ম্ম রাজ্য কল্পিত নহে ; তুমি আমি দেখিতেছি না ; কিন্তু একদিন বিস্ময়মুগ্ধ বিশ্ব, আকাশের গ্রহ নক্ষত্র তারা, উদয়াচলের সূর্য্য দেবতা সকলেই দেখিবে মহাভারত ! দেখিবে এক মহা সাম্রাজ্য, দেখিবে এক মহাজাতি তাহাদের জীবন যজ্ঞ, কর্ম্মফলহীন মহা যজ্ঞ ! তাহা দেবযজ্ঞ ঋষিযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ অপেক্ষাও মহীয়ান ! দেখিবে তাহাদের মহামন—সমত্বযুক্ত সর্ব্বত্র, ব্রাহ্মণ কুক্কুর হইতে তৃণ লতা পর্য্যন্ত সকলের প্রতি সমভাব। আর দেখিবে তাহাদের ভাগবতী বীর্য্যদ্যুতি—যাহা জগতে ধর্ম্ম সৃষ্টি করিবে। আজ নয়, কাল নয়, কত পরিবর্ত্তন, কত বিপ্লব কত অবস্থার স্তর পারম্পর্য্য অতিক্রম করিয়া নারায়ণের এই মহা বাসনা সম্পূর্ণ হইবে। অনন্তের দিক্ দিয়া দেখ ! বিশ্বরূপ দর্শন কর ! অহঙ্কার পরিহার করিয়া বল "শিষ্যস্তেহং। শাধিমাং ত্বাম্ প্রপন্নম।"

মহাভারত ধর্ম্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠা যে বাসুদেবের ইচ্ছা। ভারত—মহাভারতই হইবে !

আধপয়সার টিকিট।

' (গল্প)

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ

বাঙ্গালীরাম জাতিতে কাহার। বাড়ী চম্পারণ জেলার একটি নগণ্য পল্লীগ্রামে—যাহার নাম বলিলে সেখানকার অধিবাসী ভিন্ন বড় একটা কেহ বুঝিবে না।

বিহারে কাহার দিগকেই কুলিন শূদ্র বলিতে হইবে—কারণ সমগ্র বিহারাঞ্চলে তাহারা ব্যতীত অবস্থাপন্ন উচ্চ জাতীয় হিন্দুর আর অন্য গতি ছিল না এবং এখনও প্রায় নাই, তবে তাহারাও আজকাল সভাসমিতি আরম্ভ করিয়াছে, বাড়ীর মেয়েরা 'দাই'য়ের অর্থাৎ ঝিয়ের কাজ করে তাহাদেরও সন্ধ্যার পরে আর আপন আপন বাড়ীর বাহির হইবার 'হুকুম' নাই। যে যেখানেই কাজ করুক না সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিতেই হইবে।

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ—পান ইত্যাদি ছোটখাটো জিনিষের দোকান সুরু করিয়াছে এবং বৈশ্যত্বের দাবীতে তাহারাও একদিন "তেজঃহীন ব্রহ্মণ্যের নির্বিষ খোলস" পরিধান করিবে এইরূপ আভাসও দিতেছে। কাজেই ইহারাও আর বেশীদিন শূদ্র থাকিবে না।

যে সময়ে বিহার ও বাংলা একত্র ছিল ও বিহারে বাঙ্গালীদেরই সবচেয়ে বেশী প্রতিপত্তি সেই সময়ে বাঙ্গালীরাম চাকুরীর চেষ্টায় একেবারে সদরে অর্থাৎ মতিহারী আসিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে মাসিক তিনটাকা বেতন ও 'খোরাক পোষাকে' এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পরিবারে চাকুরী গ্রহণ করে; তিনি মতিহারীর সেই সময়কার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন। তাঁহার নাম হীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। স্বভাবটি বড় মধুর। মনে কিছুমাত্র ময়লা নাই। সকল জিনিষের মধ্য হইতে মন্দটি ছাড়িয়া ভালোটি লওয়া অভ্যাস। সংসার পুত্র, কন্যা, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী, ভ্রাতুষ্পুত্রী ইত্যাদিতে ভরা। সকলের দিকেই কর্ত্তা এবং গৃহিনীর এমন সমদৃষ্টি যে একদিনের জন্যও কাহারও মনে কোন ক্ষোভ হয় না।

বাঙ্গালীরাম বেশ চতুর। প্রথম হইতেই সে প্রভু ও প্রভু পত্নীর মন যোগাইয়া চলিতে লাগিল। কোলের ছেলেটিকে যত্ন করিয়া তাহাকে একান্ত অনুগত করিয়া ফেলিল। ছেলের কান্না আর বড় একটা শুনিতে পাওয়া না। কাঁদিবামাত্র বাঙ্গালীরাম হাতের কাজ ফেলিয়া—ছেলেকে থামায়। প্রভুপত্নী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ঘর দুয়ারা বাঙ্গালীরাম আপন মনেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া যায়। বাবুর বসিবার ঘরের টেবিল চেয়ার সযত্নে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া রাখে। প্রভুও মনে মনে ভৃত্যের অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে বাঙ্গালীরাম প্রভু ও প্রভুপত্নী উভয়েরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল।

বাঙ্গালীরামের দুপয়সা বেশ উপায়ও হইতে লাগিল। মক্কেলদের দুই এক বাল্‌তি জল দিয়া এক আধটা ফরমাস খাটিয়া তাহাদের নিকট বক্‌শিস্ মিলিত। বাজার হইতে বাছিয়া বাছিয়া ভাল জিনিষ আনার জন্য অন্যান্য ভৃত্য থাকিতেও প্রভুপত্নী বাঙ্গালীরামকে দিয়াই বাজার করাইতেন—ইহাতে তাহার দুপয়সা বেশ থাকিত! বাজারের উপার্জ্জনটা বাঙ্গালীরামের দুই দিক দিয়াই হইত। দোকানীদের নিকট হইতে দস্তরিও আদায় করিত, তাহার উপর আড়াইসের জিনিষের জায়গায় দুইসের দেড় পোয়া লইত। ইহাতেও কিছু বাঁচিয়া যাইত অথচ ধরা পড়িত না। কিন্তু দামে কখন বেশী করিত না। কাজেই তাহার উপর কাহারও সন্দেহ হইত না।

সারা বৎসর ধরিয়া এই রকম টাকা উপার্জ্জন করিয়া বাঙ্গালীরাম হোলীর সময়ে একবার বাড়ী যাইত এবং প্রত্যেক বারেই কিছু না কিছু জমী কিনিয়া আসিত। শেষে ভাল দেখিয়া একজোড়া বলদও কিনিয়া ফেলিল। ক্রমে বাঙ্গালীরামের গ্রামে বেশ প্রতিপত্তি হইয়া গেল। সারা গ্রাম কেন সে দিকের সারা অঞ্চলের মধ্যে কেবল তাহার ছেলে মেয়েরাই 'বাঙ্গালী' অর্থাৎ ইংরাজী ফ্যাসানের জামা গায়ে দিত; অবশ্য বাবুর ছেলেমেয়েদের পুরাণো জামা কাপড়েই তাহার চলিয়া যাইত—আর আলাদা করিয়া কিনিতে হইত না।

এত নাম থাকিতে তাহার নাম বাঙ্গালী রাখা হইয়াছিল কেন জিজ্ঞাসা করিলে বাঙ্গালীরাম বলিত, বাঙ্গালীরাই বড় বড় চাকুরী পায়, সব দেশে হাকিমী করে, ফরফর করিয়া ইংরাজী বলিয়া লোকের তাক্ লাগাইয়া দেয় সেজন্য ছেলের ভবিষ্যৎ ভাল হইবে কামনা করিয়া তাহার পিতা তাহার নাম বাঙ্গালী রাখিয়াছিল।

একবার ফসল কাটিবার সময় বাঙ্গালীরামের এক মাসের ছুটি লইবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু যাইবার প্রধান বাধা হইল ছুটি লইয়া। ছুটি যে পাইবে না তাহা নয়। ছুটি পাইবে সঙ্গে সঙ্গে মাহিনাও পাইবে তাহা সে খুব জানিত। কিন্তু উপরি পাওনা? তাহা যে মাঠে মারা যাইবে। ইহার উপর আর এক বিপদ। বাজার করিবার লোভ সকল চাকরের। যাহার উপর বাজারের ভার পড়িবে সে যদি বাজার করাটা পাকাপাকি পাইবার লোভে সাধু সাজিয়া বসে? যদি দস্তরির পয়সা পর্য্যন্ত মনিবকে ধরিয়া দেয় বা সব কথা বলিয়া দেয়?

তখন পুরা একদিন ধরিয়া বাঙ্গালীরাম উপায় ও অপায় দুই চিন্তা করিয়া প্রভুপত্নীর কাছে আসিয়া কহিল, "আমাকে এক মাসের ছুটি দিতে হবে মাইজী।

'মাইজী' একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "সে কি করে হবে, বাঙ্গালী? তোমাকে এখন একেবারে এক মাসের ছুটি কি করে দিই? ছেলেরা তুমি না হলে শান্ত থাকে না; তার উপর খোকা তো তোমাকে ছেড়ে একদণ্ড থাকতে চায় না।"

বাঙ্গালীরাম ইহাতে মনে মনে খুসী হইয়া বলিল, "আমিই কি মাইজী দেশে গিয়া থাকিতে পারি? তা আপনি যদি বলেন আমার ছেলেকে এক মাসের জন্য রেখে যাই। সে খোকাকে দেখ্‌তে পারবে; যদি বলেন বাজারও করবে।"

গৃহিণী বলিলেন, 'তা নেহাৎই যদি যেতে হয়, তাই কর। তোমার ছেলেকে আনিয়ে নিয়ে, কাজকর্ম্ম দেখিয়ে শুনিয়ে তবে যাও।'

গৃহিণীর মত হইবার পর কর্ত্তার মত হইতে আর দেরী হইল না। বাঙ্গালীরাম আর বিলম্ব না করিয়া তাহার চতুর্দ্দশ বর্ষবয়স্ক পুত্র মহাবীরকে দেশ হইতে আনাইল।

মহাবীরকে দেখিলেই মনে হয় ২।১ বৎসরের মধ্যেই সে মহাবীরই হইবে বটে। বেশ দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ;—পাড়া গাঁয়ের ভাবটা ষোল আনা না হউক চৌদ্দ আনা এখনও বজায় আছে। তাহার কারণ সহরে আসিবার তাহার বড় একটা দরকার হইত না। বাঙ্গালীরাম তাহাকে দুই চারি দিনের মধ্যে এক প্রকার গড়িয়া পিটিয়া লইল দোকানীদের কাছে তাহাকে লইয়া গিয়া চিনাইয়া দিল। বলিয়া দিল মহাবীর তাহারই ছেলে; যেন তাহারা উহাকে ছেলেমানুষ পাইয়া ঠকাইয়া না লয় দস্তরিটা যেন নিয়মমত ছেলেমানুষকে দেয়।

গোপনে ছেলেকে জিনিস কিনিবার মূলতত্ত্ব বুঝাইয়া দিল। সওয়া সের জিনিস কিনিতে দিলে কি করিয়া একসের তিন ছটাক জিনিস কিনিতে হইবে, বাকি এক ছটাকের দামটা কি করিয়া গোপনে কাচার খুঁটে বাঁধিয়া রাখিতে হয়, বেশী পরিমাণে জিনিস কিনিতে দিলে কি করিয়া ঐ হিসাবে অর্থাৎ পাঁচ পোয়ায় এক ছটাক হিসাবে জিনিস কম কিনিতে হইবে—ইত্যাদি তথ্য পুত্রকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিল। ইহা ছাড়া দোকানী দস্তরি দিবে। দস্তরি ধরা পড়িলেও তেমন ভয় নাই; কারণ উহা প্রায় জানা কথা। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে ব্যাপারটা কতক অভ্যাস করাইয়া বাঙ্গালীরাম গৃহিণীর নিকট হইতে কিছু অগ্রিম লইয়া এক মাসের ছুটিতে বাড়ী গেল।

(২)

বাঙ্গালীরামের ছেলে মহাবীরও বেশ চট্‌পটে। যে কাজ তাহাকে একবার বলিয়া দেওয়া হয় তাহাই বেশ মন দিয়া করে। তবে সে একটু বেশী মাত্রায় সরল। তাহার বাপ যে বীজ মন্ত্র কানে দিয়া গিয়াছিল তাহার মর্য্যাদা সে প্রাণপণে রাখিয়া চলিত। তবে এক এক সময়ে মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত। ইহা লইয়া একদিন একটা বড় হাসির সৃষ্টি হইল।

একদিন গৃহিণী চিঠির কাগজে একখানি চিঠি লিখিতে গিয়া দেখিলেন মাত্র একখানি এক পয়সার টিকিট আছে, আর একখানি দরকার। সে সময় একখানি খামের বা খামের টিকিটের দাম দুই পয়সা ছিল। ডাকঘর কাছেই ছিল। মহাবীরকে ডাকিয়া তিনি তাহার হাতে একটি পয়সা দিয়া তাড়াতাড়ি একখানি টিকিট আনিতে বলিলেন।

মহাবীর তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল ও খানিক পরেই ফিরিয়া আসিয়া তাহার আনীত দ্রব্য গৃহিণীর হাতে দিল।

তাহার দিকে চাহিতেই গৃহিণী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যারে মহাবীর, একি আনলিরে?"

ডাকঘরে টিকিটের যে বড় বড় পাত থাকে তাহার চারিদিকে টিকিটের মাঝে যে সকল অপ্রয়োজনীয় অংশ-গুলি থাকে উহা তাহারই একখানা। মহাবীর কিন্তু অম্লানবদনে বলিল, "কেন মাইজী এই তো ডাকঘরের টিকিট।"

গৃহিণী এবার একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—'টিকিটে রাজার বা রাণীর মুখ থাকে জানিস্ নে? এতে সে সব কই? তুই পাগল হলি নাকি?'

মহাবীরের চোখে মুখে এবার উদ্বেগ ফুটিয়া উঠিল। তথাপি সে মুখের সাহসে বলিল যে ডাকঘরে সে এই টিকিটই তো পাইয়াছে।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে দিল তোরে এরকম টিকিট?"

মহাবীর তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, 'খুদ ডাকবাবু।'

গৃহিণী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠিক করে বল্ পয়সা হারিয়ে ফেলেছিস, তাই ছাই ভস্ম যা হয় একখানা নিয়ে এসেছিস্ না কি—ঠিক করে বল্।"

মহাবীর বেশ একটু ভণিতা করিয়াই উত্তর দিল যে সে ছেলেমানুষ নহে—যে পয়সা হারাইয়া ফেলিবে; সত্য কথাই সে বলিয়াছে।

সেদিন কোর্টের ছুটি। হীরেন্দ্রনাথ আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিতেছিলেন। গৃহিণী গিয়া স্বামীকে উঠাইয়া বলিলেন, "দেখগো, মহাবীর ডাকঘর থেকে এক পয়সার টিকিট এনেছে দেখ। একবার খোঁজ নেও তো ব্যাপার কি।"

হীরেন্দ্র নাথের সহিত পোষ্টমাষ্টারের বন্ধুত্বই ছিল। তিনিও বাঙ্গালী। তৎক্ষণাৎ একখণ্ড কাগজে ঘটনাটা লিখিয়া তিনি ব্যাপার কি জানিতে চাহিলেন। অপর একভৃত্য সেই চিঠি লইয়া পোষ্টমাষ্টারের কাছে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই পোষ্টমাষ্টার বাবুর নিকট হইতে চিঠির উত্তর আসিল। তিনি লিখিয়াছেন—বেলা ২টা আন্দাজ আপনার বালক ভৃত্য সটান আমার কাছে আসিয়া বলে, 'আধেলাক ডাক টিকিট দিজীয়ে ডাক্‌বাবু।' আজকালকার দিনে এতটা জ্ঞানের প্রাচুর্য্য বড় একটা দেখা যায় না; তাই এই অপরূপ ক্রেতার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তাহাকে দেখিয়া মনে হইল, পল্লীগ্রাম হইতে সম্প্রতি আসিয়াছে। ভাবিলাম বোধহয় জানে না। তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম, আধপয়সায় টিকিট পাওয়া যায় না; পূরা একটা পয়সা লাগিবে। ঐ বাবুর কাছে গিয়া টিকিট লও।

কথাটা তাহার বিশ্বাস হইল না। সে বলিল, না হয় একটু কম করিয়া দিন; কিন্তু আধ-পয়সারই টিকিট চাই। কিছুতেই আপনার ভৃত্যকে বুঝাইয়া পারিলাম না যে আধ পয়সার টিকিট শুধু দুর্ল্ভ্য নহে, একেবারে অলভ্য। সে বেশ গম্ভীর ভাবেই বলিয়া গেল, এক পয়সার টিকিট যদি পাওয়া যায় আধ পয়সার কেন পাওয়া যাইবে না? সে একেবারে গাঁওয়ার (পাড়াগেঁয়ে) লোক নহে; বুদ্ধিসুদ্ধি তাহার আছে; কেহ তাহাকে ঠকাইতে পারিবে না।

"তাহার কাছে কাজেই হার মানিতে হইল। বলিলাম ঠিক ধরিয়াছ বাপু, পাওয়া যাইবে না কেন? যায়। তবে সবাইকে আমরা দিই না। তুমি খুব বুদ্ধিমান তাই তোমাকে দিলাম। লও; কিন্তু কাহাকেও বলিও না। বলিয়া তাহাকে ঐ নূতন আধ পয়সার টিকিট দিলাম। টিকিট লইয়া সে হাত পাতিয়া বলিল, বাবু আধেলা দিন পয়সা দিতেছি। বুঝিলাম পূরা পয়সাটা আমার হাতে আগে দিতে তাহার ভরসা হইতেছে না। তাহাকে বলিলাম "তোমাকে একটু কষ্ট দিয়াছি সেজন্য ওই টিকিট-খানি তোমাকে বিনামূল্যে দিলাম; উহার দাম তোমাকে দিতে হইবে না।"

হৃষ্টচিত্তে সে যাইতে উদ্যত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে কোথায় থাকে।

উত্তরে জানিলাম ও রত্ন আপনার। কিন্তু কেন যে সে হঠাৎ আধপয়সার টিকিট কিনিতে আসিল তাহা এখনও ঠিক বুঝিতে পারি নাই। আশা করি আপনার সহিত দেখা হইলে তাহা জানিতে পারিব। জানিবার কৌতূহলও রহিল, কারণ ব্যাপারটায় বেশ মৌলিকত্ব আছে।"

চিঠি পড়িয়া স্বামী স্ত্রী খুব খানিকটা হাসিলেন।

মহাবীরকে ডাকা হইল। হীরেন্দ্র নাথ বলিলেন, "বাপু, তুমি তো ছেলেমানুষ, ইহারি মধ্যে এত বুদ্ধি কোথায় পাইলে? একপয়সার টিকিট আনিতে গিয়া আধ পয়সার টিকিট কেন চাহিলে?"

মহাবীর দেখিল বাবু সবই জানিতে পারিয়াছেন সে তখন হাতযোড় করিয়া ক্ষমা চাহিল ও পিতৃদণ্ড উপদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া সব কথা বিশদভাবে বলিয়া গেল।

গৃহিণী তো হাসিয়া খুন! বলিলেন, "হাসতে হাসতে যে পেটে খিল ধরে গেল! উঃ বাঙ্গালীর পেটে এত বুদ্ধি ছিল তা জানতাম না! ছেলেটাকে দেখলে তো একেবারে নিরীহ বলে মনে হ'ত। ওরও এত গুণ!

হীরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন, মহাবীরের তেমন দোষ নেই। দোষ হচ্চে ওর পূজনীয় পিতৃদেবের যিনি ওকে এই সুপথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। এবার আসুন একবার তিনি!"

পরে মহাবীরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "খবর্দ্দার, আর কখন আধ পয়সার টিকিট অনবিনে। পূরো একপয়সার টিকিট এনে বরং তোর মাইজীর কাছে ২।১টা পয়সা চেয়ে নিবি। বুঝলি?"

মহাবীরের ভয় হইয়াছিল পাছে বাবু মারিয়া বসেন বা তাড়াইয়া দেন। দুইটার কোনটিই হইল না দেখিয়া সে অতি কৃতজ্ঞ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে সে বুঝিয়াছে এবং বলিল যে এবার হইতে দরকার হইলে সে এক আধ পয়সা চাহিয়াই লইবে; ওপথে আর কখন যাইবে না।

হীরেন্দ্র নাথ স্ত্রীর পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আজকাল হাসি আর আনন্দ দুর্লভ। ছুটির দিনে ও যে বিমল আনন্দ ও প্রচুর হাসির সৃষ্টি করেছে তার জন্য ওকে এবার ক্ষমা করা গেল। কি বল?"

গান

শ্রীসুধীরকুমার সেন

ভোরের ঐ শুকতারাটি
যে বাতি জ্বাল্‌লো প্রাণে;
সে আলো উঠ্‌লো ফুটে
আজি মোর নূতন গানে।

ধরণী চেতন হারা,
নিভেছে সকল তারা,
সে কেন একলা জাগে
কি ব্যথায় সেই তা জানে।

সকলেই গেছে চলে
যে ছিল তাহার সাথী;
নিরালায় গগন মাঝে
একা সেই জ্বালায় বাতি;

ছেড়েছে সবাই তারে,
একা তাই বারে বারে,
আসে সে চুপে চুপে
চেয়ে রয় পথের পানে।

আগমন রাতি শেষে
প্রভাতে মিলিয়ে যাওয়া;
বিদায়ের বার্ত্তা বয়ে
আনে তার ভোরের হাওয়া;

তারি সে মৌন ব্যথায়,
আমার এই বুক ভেঙ্গে যায়,
কি জানি কোন মমতায়
নিয়ত আমায় টানে।

পরিশিষ্ট

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

জীবনচরিতটা খুব বেশী বড় নয়,—আরম্ভটা খুবই সংক্ষিপ্ত; কিন্তু পরিশিষ্ট—তার যেন সীমা নেই—

নিঃসন্তান দম্পতি; স্বামী ছিল সরকারী বনবিভাগের অফিসের কেরাণী। জঙ্গলে ঘেরা উপত্যকার ঘনবনের সীমান্তে তাদের আপিস। সেখানেই দিনের পর দিন কাটে।

লেখাপড়া হয়ত, শিখেছিল খানিকটা; কিন্তু ঘন অরণ্যের লীলার নীড়ে—আর কাজের ভিড়ে লেখাপড়ার চর্চ্চা হয়ে ওঠে না। শ্রান্ত দেহে রাত্রে এসে শুধু ঘুমিয়ে পড়ে।

স্ত্রীটিও ছিল তেমনি; সারাদিন কি করে,—কি করে শ্রান্ত হয় বলা যায় না; কিন্তু রাত্রে স্বামীর পাশে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ে, একেবারে সকালে ঘুম ভাঙে।

বয়স বেশীও নয় কমও নয়—। কিন্তু আপনাদের নিয়ে অপনারা থাকাতে যে বিশেষ ক্ষোভ বেদনা জাগে মনে, এমন মনে হয় না।

পাহাড়ের কোলে নেমে আসা পাইন দেবদারু বন; নীচের ঘন নানাবিধ গাছের—বনের দিকে চেয়ে স্ত্রীর সময় কাটে, কি কাজ করে কাটে বলা শক্ত। কিন্তু কাটে বেশ, গুনগুন করে গান গেয়ে—সকালে আফিসের রান্না করে,—সন্ধ্যায় আপিস ফেরতের জলখাবার, খাবারের আয়োজনে—আপনার প্রসাধনে—এমনি করে। নিতান্তই সোজাসুজি; কিন্তু মাঝে মাঝে তারা কাব্যের মতন কথা কয়—।

নিশ্চিন্ত নির্ভরে স্বামীর বাহুমূলে মাথা রেখে স্ত্রী বলে, 'দেখ, আমার মনে হয় যেন তোমার কাছে একেবারে অসহায়ের মতন হয়ে যাই তো বেশ হয়—

'তোমার কি সহায় আছে নাকি—অসহায়ই তো!' সকৌতুকে স্বামী জবাব দিলে।

স্ত্রীও হাসে। কিন্তু তবু অসহায়তার—বিপুল কি এক গৌরবে সে সহায়কে আপনার সম্পূর্ণ নির্ভর দিয়ে দিতে চায়;—যে সহায় তারও যেন গর্ব্বের—মধুর কোমল অহঙ্কারের—গৌরবের সীমা নেই যেন।

স্ত্রী আবার বল্লে, 'না এরকম করা নয়—সে যেন কি রকম একটা—'

বুঝতে পারা যায় না যেন।...আনন্দময় বেদনায় দুজনেই চুপ করে ভাবে।—

ঐ টুকুই—নয়ত এই ধরণেরই;—

'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে' কি' যৌবন বেদনা রসে উচ্ছল দিন গুলির' ধারণা—অথবা ধূপের ঐ আপনাকে লোপ করে দেওয়ার অপূর্ব্ব বেদনাময় স্বপ্নে অন্তর ভরে ওঠে—কি কেইবা জানে। চোখ ঘুমে ভরে আসে।

পাহাড়ের পেছন থেকে সূর্য্যোদয় হয় সে দিকে কিন্তু অনেক বেলায় সূর্য্য দেখা দেন। প্রথমে ওপারের ঘন শ্যাম বন রক্তাভায় রঞ্জিত করে ওঠে তারপর ছায়াঘন উপত্যকায় বেলার সূর্য্য প্রসাদ বিতরণ করেন।

রাত্রির পর দিন যায়—।

মজুর নারীরা সন্তানদের ঝুড়িতে বসিয়ে পিঠে করে কাজের ক্ষেত্রে যায়,—দিনের শেষে ফিরে আসে। সুরমা ছোট ছেলের গাল টিপে দেয়, মজুরণীদের দাঁড় করিয়ে ঘর করণার কথা কয়।

নিজেদের নিয়েই নিজেরা পরিপূর্ণ।—

ছুটীর দিন সকালে স্বামী-স্ত্রী রৌদ্রে বসে কাজের নয়, নিরর্থক কথা কইছিল।

রবিবারটা যেন কবিতার বইয়ের একখানি পাতা। "ক্ষণিকার" মত কবিতার বইয়ের পাতা খুলে যে কোন কবিতা পড়া। "লোভে কম্পমান গানের বুক," "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাওয়া," "নিজের লেখা সমালোচনার মতন" নিরর্থক হাসি আর কথায় রান্নাঘরের কাজ মোটেই এগোচ্ছে না, অথচ কি রান্না হবে তার তালিকা পুরুষের অনভিজ্ঞ নির্দ্দেশে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে, সুরমা গীতায় অনন্ত শেষ নেই।

শেষ অবধি রাগ করে খিচুড়ী চড়িয়ে—স্ত্রী এসে দাঁড়াল

বনের পথে সহর থেকে একটী ছেলে বেড়াতে এসেছিল। বেশী বড় নয়—ডানপিটে দুরন্ত হাসিমুখ।

মোড়ের মুখে বাঙ্গালীর গলা শুনে সে দাঁড়াল, সুরমার স্বামী তাকে বাঙ্গালী দেখে ডাকলে। পরিচয় পাবার আগে বেশ চেনা হয়ে গেল। যাবার সময় সুরমা জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার নাম কি"?

সে বল্লে, 'সুবোধ, বাপ মা নেই দেশে কাকা মামা আছেন ইত্যাদি—এদেশে চাকরী করতে এসেছে।' সুবোধ চলে গেল।

সুরমাদের রবিবাসরীয় আসরে সুবোধের রীতিমত স্থান হয়ে গেল।—যে তৃতীয়জন কোনো দিন ছিল না সে যে এতখানি আত্মীয় হয়ে উঠবে ওরা ভাবেনি। কল্পনা—শতপথে ফুল ফুটিয়ে চলে "—

নিঃসন্তান নারীর মনে যেন জাগে, নিজের সন্তান হলে হয়ত এছেলেটীর চেয়ে একটু ছোট থাকত মাত্র!—

নিশ্চিন্ত হয়ে—শুয়ে আর তার কোনো কথাই মনে পড়ে না যেন—শুধু ভাবে।

—স্বামী ডাকেন, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছোট্ট কি একটা নামে, সে জবাব দেয় এক অক্ষরে;—কিন্তু নিশ্চিন্ত তৃপ্তি না নিশ্চিন্ত শ্রান্তি কি বলা শক্ত, তাকে অসহায় তার অসীম লোকে নিয়ে ফেলেছে যেন। সে আপনাকে একেবারে ধূপের মতনই নিঃশেষ করে দিতে চায়। তেমনি যেন কি এক সার্থক বেদনার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে ভস্মাবশেষ হয়ে—অপরূপ সার্থক হয়ে উঠতে চায়।

রবিবারের পর রবিবার চলে যায়। সুবোধ সুরমাদের রবিবারের অবসরে রবিবারে মতনই মিলে গেছে

সেদিন ছুটী ছিল না, অবসরও ছিল না, সুবোধও আসেনি। স্বামী ফিরলেন সকাল করে।

তারপর আর একটী রবিবার এসে দাঁড়াবার আগেই স্বামী বল্লেন, কিছুই পারলাম না। যা রইল তাও পর্য্যাপ্ত নয়, কি করে থাকবে—কোথায় যাবে?

সে একটা কথারও জবাব দিলে না, শুধু ব্যাকুল অসহায়ভাবেই তাঁর বাহুর মূলে মাথাটা গুঁজে চুপকরে

যে অসহায়তার সীমাচিহ্ন না আজ—তার সঙ্গে নিঃ পরিচয় হয় নি। নির্ভরহী বেদনাময় সীমা নেই।

চাকর বল্লে, "বহুজী আমি তোমার বেটা আছে।" সুবোধ এসে দাঁড়াল খবর পেয়ে—সেও নতমুখে অতিকষ্টে বল্লে, "আপনি কিছু ভাববেন না" আর বলতে পারলে না। ভাববার ছিল অনেক, কিন্তু ভাবতে পাবার শক্তির অভাব ছিল।

* * * *

রাত্রি দিনের স্রোত তেমনি বয়ে যায়।

সুবোধ আসে প্রতিদিন। তার ঐ বেদনা পীড়িত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অসহায়া নারীর ওপর করুণার শেষ নেই, হয়ত মায়াও জন্মে।

কথানাই বা পাতা! সুরমা একমনে রোজই পড়ে। এত সময় ছিল? কিন্তু কথা কওয়া তো হয়নি। মনের দিক দিগন্ত এমন আকাশের মতন সীমাহীন? সেই দিগন্তের কোন এককোণে শুধু জীবনের অল্পমাত্র লেখা পড়েছে। তাও খরচপত্র আয় ব্যয়ের মলিন লেখায় ভরা। এত ঘুম? এত কাজ? নিষ্প্রয়োজনের উৎসবময় দিন রাত্রিকে সে কি ফিরিয়ে দিয়েছিল? চোদ্দ পনেরো বছরের মাঝে কটী দিনরাত্রি তার কমলদল মেলেছিল?

সুবোধ এসে দাঁড়ায়।

সুরমা অন্যমনস্কতা পরিহার করে উঠে বসে। কাজ কর্ম্মের কথা কয়। খানিকক্ষণের জন্য সুবোধের স্নিগ্ধ করুণাময় মনখানি তাকে অন্যদিকে নিয়ে যায়।

কিন্তু অতীতে-তন্ময় মন সমুখের জিনিস সরে গেলে তেমনি কোথায় গিয়ে সেই অনাদ্যন্ত পুরাণ খুলে বসে

বনের পথে তেমনি মজুর মেয়েরা ছেলে কোলে করে যায়। কেউবা গাছতলায় বসে ছেলেকে ঘুম পাড়ায় খাওয়ায়। জননী শিশুতে নিষ্কারণ পুলকের খেলা চলে।

সুরমা ডাকে, খাবার দেয়, কোলে নেয়। শিশুরা এসে সুরমাকে ঘিরে নেয়। সে আদর করে, সোহাগ করে, কিন্তু জননীর মতন করে সে একটী শিশুকে পায়নি, সেকথা হেমন্তের কুহেলিকাচ্ছন্ন আকাশে আকস্মিক দিগান্তে বিদ্যুৎ প্রকাশের মতন কোথায় গোপন বুকের মাঝে চমকে বিপুল শূন্য দিগন্তর দেখিয়ে দেয়।

* * *

চাকর এসে বল্লে, "মাজী, সুবোধবাবুর অসুখ"।



মাতৃহারা

শ্রীশিবপদ দে গীতায় অনর্ধ

নিজেদের বাসায় একটা ঘরে সুবোধ চুপচাপ শুয়েছিল। সুরমা মৃদু পায়ে ঘরে ঢুকল।

"তোমার অসুখ করেছে ?"

"আমি ভেবেছিলাম, সেরে উঠব," সুবোধ বল্লে।

"ওকি কথা বাবা, সুরমা অপ্রস্তুতভাবে তার মাথায় হাত রাখলে।"

নিঃসন্তানা নারী অপ্রস্তুতভাবে তার সেবা করে। দুধ, ফল, জল, ওষুধ নিয়মিত দেবার চেষ্টা করে।

সুবোধ একমনে তাকে দেখে।

রাত্রির আছন্ন অন্ধকারে সুবোধের মাথার কাছে বসে সে ভাবতে থাকে। আকাশ পাতাল, ভবিষ্যৎহীন দুর্গম দিন, স্বজনহীন পীড়িত সুবোধের কথা, সবটাই নিজের কথা।

দরজার বাইরে চাকরটা বসে ঢুলতে থাকে, নয়ত ঘুমায়।

অসুখ কি তা সুরমা বোঝেও না, জানেও না, জ্বর কখনো বাড়ে কখনো কমে; ডাক্তার কি বলেন, তাও সুবোধ কিছুই বলে না।

সুরমার রাত্রি জেগেই কাটে।

মন দিন রাত্রির হিসাব নেওয়ারও বাইরে থাকে যেন.।

ভোরের আলো বাইরে, ঘরে অন্ধকার।

সুবোধ মাথার ওপর থেকে সুরমার হাতখানা টেনে নিলে। সুরমা জিজ্ঞাসা করলে "কি সুবোধ ?"

সুবোধ শুধু তার দুখানা হাতের ভেতর মুখ রেখে বল্লে "মা"।

সুরমার চোখ থেকে জল পড়তে লাগল। নত হয়ে তার মাথার ওপর মুখ রেখে বল্লে, "বাবা তোমার কি কষ্ট হচ্ছে ?"

সুবোধ বল্লে, "মা, তুমি এবারে দেশে চলে যেয়ো"।

সুরমার চোখ থেকে শুধু জল পড়তে লাগল।

সুবোধ চলে গেল।

* * * * *

শীতের দিন।

পাশের বাড়ীর হিন্দুস্থানী মেয়েটা তার ছেলেকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করছিল। অনেক কাজ তার, বড়ির ডালবাটা, রান্না।

সুরমা ছাতের ওপর বসে নিয়মিত পূজার পর গীতা পড়ছিল। সেদিন দুরন্তপনার জন্য ছেলেটার মার খেয়েও বকুনী খেয়েও ঘুম এলো না।

"নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো"

সুরমার দুঃখ হলো, কেন মারে—আহা!

শিশুর কোমল হাতখানি মার বুকের আঁচলের নীচে আপনার প্রসাদ খুঁজছে; ঠোঁট দুখানিতে তখনো অভিমানের কাঁপন লেগে।

মা আবার বকে, "বড়িবজ্জাত"

সুরমা বল্লে, "আমাকে দেবে বহু" ?

বহু সবিস্ময়ে একটু থমকে স্মিতমুখে ছেলে দিয়ে গেল।

"ঐ পাখী" বলে পায়রা কাক ডেকে, "ঐ লালছবি" বলে ঘরের চতুর্দ্দিকে টাঙানো ঠাকুরদেবতার বিচিত্র বর্ণের ছবি দেখিয়ে, চাকি বেলুন আলু বেগুন, বন্ধ্যার ঘরের প্রবীণ প্রাচীনের খেলনায়, সঞ্চয়ের সমৃদ্ধিতে নানাবিধ অপরূপ প্রলাপ আলাপে কথায় শিশুর মন মুগ্ধ হয়ে গেল।

ওদিকে বহুর শিল নোড়া রীতিমত কাজে লেগেছে।

সুরমার রান্নার আয়োজন হয়নি, যোগাড় হয়নি, গীতার পঠ্যমান অধ্যায়টী সম্পূর্ণ হয়নি, জপও যেন বাকি; পট্টবস্ত্রও ছাড়া হয়নি।

সুরমা ও শিশু দুজনেই খেলার—নতুনতর খেলনার আনন্দে মগ্ন।

খানিক পরেই ক্রীড়াশ্রান্ত শিশুর ঘুম এলো।

সুরমা স্তব্ধ নিস্পন্দ ব্যথিত স্নেহে চুপ করে তার ঘুম ভাঙার ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে কোলে নিয়ে রইল। নিদ্রাতুর খোকা মাতৃবক্ষ মনে করে তার বুকে হাত রেখে তেমনি নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমলো।

কুলহারা ভাবনায় অন্তরের মাঝে কোথায় কোন্ বেদনা বাজে; নিঃসন্তানা নারীর বুকে কোন্ চিরন্তনী জননীর অশ্রুসিন্ধু আকুল হয়ে ওঠে যেন।

''মাইজী রসুই না পাকাবে?—দেবে ওকে?'—বহু পরিধেয় বসনে জলের হাত মুছতে মুছতে এসে দাঁড়াল।

চকিত হয়ে সুরমা চাইলে—'নাও'।—সন্তর্পণে মা তার ছেলে নিয়ে যায়।

সুরমা অসমাপ্ত পুনা পাঠে মন দিয়ে গীতায় অনধ অধ্যায়টি খুলে বসল।

নাড়াচাড়াতে শিশুর ঘুম তখন ভেঙে গেছে। অপরাহ্ণ বেলায় রৌদ্রে ছাতে বসে অবসর প্রাপ্ত জননীর—আর শিশুর নিরর্থক আনন্দের লীলার শেষ নেই।

দুগ্ধপানরত শিশু একবার করে দুগ্ধ খায়—আবার মুখ সরিয়ে মায়ের মুখ পানে চেয়ে হাসে। জননীও হাসে। ছেলের রাঙা ঠোঁটের পাশ থেকে দুধের ধারা গড়িয়ে আসে।

সুরমার মনের কোণ থেকে কখন গীতার পাঠরত অধ্যায়ের পাতা উল্টে গেল।

সমস্ত জীবনচরিতের ১৪।১৫ খানা পাতা উড়ে উড়ে অসংলগ্ন লিপিকাবলী চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলে.. প্রথম দিকে শরৎ মাধবীর ক'খানা পাতা যেন জাগে ;—কিন্তু যেন চোখের জলে ঝাপসা হয়ে—উঠল ...।...লেখা না দৃষ্টি ?

তারপর সুবোধের কথা—সুবোধের 'মা' বলে ডাকা... যতদিন সুবোধ কাছে এসেছিল, ততদিন সুবোধের কথা ভাবার অবসরও যেন সে পায়নি—সে যে নিঃসন্তানার অন্তরের মাঝে কতখানি বেদনাময় স্নেহের সঞ্চার করেছিল—সুবোধ চলে গেলে তাকে সমগ্র ভাবে ভাববার অবসর পেলে। স্বামীহীনার সন্তান থাকলে কি রকম হয়...?—

জীবন চরিতের দ্বিতীয় অধ্যায়ের খান দুই পাতাও সাঙ্গ হয়ে গেল।

সুরমা—পূজার অসমাপ্ত আয়োজন নিয়ে অন্য মনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল—

কোন্ চিরন্তনী বিরহমিলন গঙ্গাসাগর-সঙ্গমের এলো মেলো যেন লোণা বাতাসে সমাপ্তিহীন পরিশিষ্টের পাতাগুলি ক্রমাগত তরতর করে উড়তে থাকে—

———

চিরাগতা

শ্রীবাণী রায়

গগনে আজি কার খুলেছে নীলবাস
কাহার ছোঁয়া পেয়ে দুলিছে শাদা কাশ ?
নদীর কালোজলে কাহার হেরি হাসি
কে মোর হিয়া, পরে পরালো প্রেম ফাঁসি !

জীবনে আজো যারে পাইনি ভালো ক'রে
পড়িনু বাঁধা কিরে তাহার ছল-ডোরে ?
দ্বারের পাশ হতে দেখেছি হাসি তার
তাহারে আজি বুঝি দেখিনু আরবার।

হৃদয় নাচে মোর পুলক-মদিরায়,
নয়ন বার বার সুদূরে ছুটে যায় ;
হিয়ার দ্বারে আজ নূপুর বাজিল রে
মালিকা গলে মোর দিল সে রাঙা করে।

ভারতের ভবিষ্যৎ

শ্রীভারত কুমার বসু

ইণ্ডিয়া ইন্ বনডেজ্"—নামক পুস্তকের গ্রন্থকার, ভারতের একান্ত বন্ধু, আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের রেভারেণ্ড ডাক্তার জে, টি, সান্ডার ল্যাণ্ড কিছুদিন আগে চিকাগোর "ইউনিটি" পত্রিকায় যা লিখেছিলেন, তার-ই মর্ম্মার্থ নীচে দেওয়া হ'লো ; —

লণ্ডনের গোল টেবিল বৈঠক শেষ হবার সময়ে মিঃ ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড্ এই ঘোষণা ক'রেছিলেন যে, একটা নূতন শাসন-বিধি এবং কতকগুলি প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ব্যবস্থা ঠিক হ'লেই, গোটা কয়েক দরকারী রক্ষা কবচের (safe guard এর) সঙ্গে ভারতবর্ষকে দায়িত্বপূর্ণ শাসনের—স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার দিতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছে করেন। এবং এর অর্থ যদি এই হয় যে, ভারতবর্ষকে বাস্তবিকই স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হবে, তা হ'লে, ভারতের অসন্তোষের যে শেষ হবে এবং ব্রিটিশ রাজত্ব ও ভারতবর্ষের উপর যে বজ্র এবং বিদ্যুৎ-ভরা ঘন মেঘপুঞ্জ জ'মে র'য়েছে, সে-সব যে স'রে যাবে, এ-কথা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে বলেই মনে হয়।

কিন্তু যে-ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিরাট জাতি বিগত দুই কিম্বা তিন হাজার বছর ধ'রে রক্ষা-কবচ না নিয়েও রাজত্ব চালিয়েছিল এবং পৃথিবীর মধ্যে প্রভাবে ও গৌরবে এমন একটা স্থান অধিকার ক'রেছিল, যা কোনো জাতিই ক'রতে পারেনি, সে-জাতির জন্য রক্ষা-কবচের দরকার কি? এ জাতি কি বর্ত্তমানে নিজেদের শাসন ক'রতে পারে না? যদি পারে না, কেন পারে না? ১৭০ বছর ধ'রে ব্রিটিশের শাসনে এরা এম্নি অধঃপতিত হ'য়েছে যে, সেই অধঃপতনের জন্যই এরা তা পারে না,—অথচ তারা তা এককালে পেরেছিল অনেক দিন ধ'রে—রীতিমত সাফল্যের সঙ্গে। ভারতবর্ষ এই সব রক্ষা-কবচের জন্য নিজেকে অপমানিত বোধ করে।—

ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার দেবার নামে, ব্রিটেন কি এই সব রক্ষা-কবচের দ্বারা ভারতকে বাস্তবিকই উক্ত শাসনাধিকার দিতে অস্বীকৃত হচ্ছে না?

রক্ষা-কবচগুলি কি?

প্রথম : —ভারতের রক্ষী অর্থাৎ ভারতের সৈন্যের উপর গ্রেটব্রিটেনের কর্ত্তৃত্ব থাকবে। ভারতের সৈন্য প্রচুর আছে। এদের উপর কর্ত্তৃত্বের অর্থ কি? যদি আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রে আমাদের প্রচুর সৈন্য থাকে, এবং ফ্রান্স, জাপান, জার্ম্মানী কিম্বা গ্রেটব্রিটেন তাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করে, এবং মাত্র একটা সৈন্যের উপরও যদি আমাদের শাসনাধিকার না থাকে, তা হ'লে বাস্তবিক পক্ষেই বলা যাবে কি যে, আমরা স্বাধীন, কিম্বা, স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার পেয়েছি? ভারতবর্ষের সৈন্যের উপরে ব্রিটিশের কর্ত্তৃত্বের অর্থ এইতেই বোঝা যাবে। জগৎ কি জানে না যে, যে-কোনো জাতির সৈন্য বিদেশী শক্তির দ্বারা শাসিত হয়, সে-জাতি বাস্তবতঃ স্বাধীন কিম্বা স্বায়ত্ত শাসনাধিকার—প্রাপ্ত না হ'য়ে বিপদ-জনক নিবিড় শৃঙ্খলে বাঁধা থাকে?...

দ্বিতীয় :—যে-নূতন শাসন-বিধি তৈরী হবে, তার মধ্যে ভারতের বৈদেশিক রাজনৈতিক ব্যাপারে ব্রিটেনের কর্ত্তৃত্ব থাকবে। এর মানে কি?—এর মানে, কাগজে-কলমে ভারতবর্ষ অন্য জাতির সঙ্গে পত্র-ব্যবহার, বৈদেশিক সন্ধিতে স্বাক্ষর, কিম্বা যে-কোনো বৈদেশিক কাজ করতে পারবে না। ভারতবর্ষ অন্য জাতির কাছে দূত, মন্ত্রী, পদস্থ কর্ম্মচারী কিম্বা প্রতিনিধি পাঠাতে পারবে না। ভারতবর্ষ অন্য জাতির কাছে একটা জাতি ব'লেই গণ্য হ'তে পারবে না। সমস্ত পৃথিবীর কাছে সে কেবল গ্রেট ব্রিটেনের পদানত প্রদেশ ছাড়া আর-কিছু ব'লেই বিবেচিত হবে না। এর নাম-ই কি স্বরাজ হবে?

তৃতীয়ঃ—ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক পণ্য-বিনিময়—ইত্যাদির উপর ব্রিটেনের কর্ত্তৃত্ব থাকবে! অর্থাৎ, ব্যবসার ব্যাপারে ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণভাবে গ্রেট ব্রিটেনের হাতে থাকতে হবে। ভারতীয় ব্যবসাদাররা বলে যে, ভারতের দারিদ্র্যের একটা প্রধান কারণ এই যে, অনেক

দিন থেকেই ভারতীয় বাণিজ্য, ব্রিটিশের শাসনাধীন হ'য়ে আছে। এবং এ-কথা সত্য যে, বাণিজ্যের শক্তি রাজনৈতিক শক্তিকে শাসন করে। সুতরাং যে কোনো দেশ যে-কোন জাতির বাণিজ্যকে শাসন করে, সেই দেশ সেই জাতিকেও শাসন করে।

চতুর্থ :--প্রস্তাবিত নূতন শাসন-বিধির মধ্যে ভারতের জাতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বড়লাটের যথেষ্ট দায়ীত্ব থাকবে এবং প্রকারান্তরে আগেকার অন্যান্য বড়লাটের চেয়ে, ভারতবাসীদের জন্য, তাঁকে অনেক বেশী স্বেচ্ছাধীন, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেওয়া হবে। অপর কথায়, ব্যবস্থাপক-সভা-শাসনের কিম্বা ব্যবস্থাপক-সভাকে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতা তাঁর থাকবে এবং তিনি যথেচ্ছাচার দেশ শাসন ক'রতে পারবেন।

এই-ই শেষ নয়। যেহেতু, গ্রেট ব্রিটেন ভারতের প্রাদেশিক শাসক এবং বড়লাট নিযুক্ত ক'রবেন এবং এ-বিষয়ে ভারতের কোনো কথা বা শক্তি থাকবে না,. এই কারণে, ভীষণ অত্যাচারী স্যার মাইকেল-ও'-ডায়ারের মতো লোকের দ্বারা শাসিত হ'তে, ভারতবর্ষ কোনো প্রকারেই বাধা দিতে পারবে না।—এর নামই কি ভারতের স্বরাজ ?—

এই চারটাই হচ্ছে প্রধান রক্ষা-কবচ (আর-ও রক্ষা-কবচ আছে। কিন্তু এই চারটাই বিশেষ দরকারী।) ভারতবর্ষকে গ্রেটব্রিটেন যে-নূতন শাসন-বিধি দয়া ক'রে দিতে যাচ্ছেন, তার মধ্যে ওই কটা রক্ষা-কবচ না থেকে পারেই না!...

এই নূতন শাসন-বিধির দ্বারা ভারতবর্ষ কি বাস্তবতঃ দায়ীত্বপূর্ণ শাসনাধিকার পাবে? অপরপক্ষে, আগেকার মতই সে কি পরাধীন জাতি হ'য়েই থাকবে না? যে-শৃঙ্খলের দ্বারা তাকে বাঁধা হবে, তা হয়ত আকারে তফাৎ হ'তে পারে,—সেটা কিছু লম্বা হ'তে পারে—যার দ্বারা সে বন্দী-জীবনে চলা-ফেরার জন্য কিছু-বেশী স্বাধীনতা পাবে, কিন্তু তার বাঁধন ত তখনও শৃঙ্খলের-ই থাকবে,—ইস্পাতের শৃঙ্খলের? --আগেকার মতো এ-শৃঙ্খল ত সেই দৃঢ়, সেই দুঃখের, সেই দুঃসহনীয়?

কোথা

শ্রীঅমলা দেবী

অচঞ্চল চির দীপ্ত তারার মালিকা
ওরি মাঝে কোন খানে দীপালির শিখা
জ্বালিয়ে তুলিব ধরি? মানসের ধন
কোন দেবালয় মাঝে মোর আয়োজন
নিবেদন করি দেব? ভাবি ক্ষণে ক্ষণে
আজিকার প্রীতি-পুষ্প সে দিন স্মরণে
ম্লান হয়ে যায় যদি! অনন্ত জগতে
কোন চিহ্ন লয়ে আমি চলিব সে পথে?



বজ্রদগ্ধা

—উপন্যাস—

শ্রীপ্রমীলা রায়

(১)

সবে মাত্র শীত পড়তে আরম্ভ হয়েছে, গায়ে লেপ দেওয়াও যায়না ; আবার কিছু গায়ে না দিলেও ভোরের দিকে যেন পায়ে শীত করে, সমস্ত গায়ের ভিতর শির শির্ করে ওঠে। আলসেমির জন্যে নিজ গায়ে কাপড় টেনে দেওয়া যায় না—কেউ দিয়ে দিলে খুব আরাম বোধহয়, এ সেই সময়।

ভোর প্রায় হয়ে এল। কলকাতার একটা বড় রাস্তার ওপরেই, মস্ত গেটওয়ালা বাড়ী—দিনের বেলায় গেটের লোহার শিকের ফাঁক দিয়ে ভেতরের সবুজ মাঠ, খেলবার জায়গা, দরোয়ানদের ঘর, লোকজনের আসা যাওয়া, সবই বেশ দেখা যায় ; কিন্তু এখন সেটা যেন বিরাট দৈত্যের মত, প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে। এর ভেতরে যে কত মানুষের প্রাণ এখন নিশ্চিন্ত নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে তার ঠিক নেই। বাড়ীটার আয়তন ও অবস্থান দেখলেই মনে হয় যে এটা কারো বাসের বাড়ী নয়। হয় কারখানা, না হয় অফিস না হয়তো ছাত্রাবাস চলতি কথায় যাকে বলে বোর্ডিং।

এই বোর্ডিংএ তিনতলার একটা ঘরে খান পাঁচ ছয় লোহার খাট্ পাতা। তাতে নানা বয়সের মেয়েরা ঘুমে আচ্ছন্ন। শ্বাস-প্রশ্বাসের সমতালের একটা শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছেনা। রাস্তার গ্যাসের আলোর দুএকটা রেখা ছাড়া ঘর একেবারে অন্ধকার—কারণ ঘরে আলো রাখার নিয়ম নাই। ভোরের পাত্‌লা অন্ধকারেই রাস্তায় ঝাড়ুদারের শব্দ শোনা গেল। গ্যাস নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের পূব দিকটা অল্প লাল হয়ে উঠ্‌ল আর সেই লালের আভা তেতলা বাড়ীর ঘরের খোলা জানালা দিয়ে, জানালার কাছে যে মেয়েটী শুয়েছিল তার মুখের ওপর পড়ল। নিশ্বাস ফেলার ছন্দ পতন হল। চোখের ওপর আলো পড়াতে ঘুমটা তারই আগে ভাঙল। চোখ মুছে নিয়ে ঘরের সব ক'খানি খাটের ওপরেই সে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। সবাই নিদ্রামগ্ন। দেখে মৃদু হাসির একটা অতিসূক্ষ্ম রেখা তার প্রসন্ন মুখে ফুটে উঠলো। খাটের নীচ থেকে স্লিপার দুটো পায়ে ঢুকিয়ে, খোলা বিনুনিটা হাত দিয়ে জড়াতে জড়াতে পাশের খাটে যে মেয়েটি পাতলা একখানা ধোয়াটে রংয়ের শাল মুড়ী দিয়ে আরামে ঘুমুচ্ছিল, আচমকা তার গা থেকে সেখানি নিজের গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সামনের ছাদে বেরিয়ে পড়ল।

অসময়ে সুখ নিদ্রা ভেঙে যাওয়াতে, নিদ্রকারিণী বিরক্তি ভরা কণ্ঠে বল্‌লে 'আঃ! মীনু কি হচ্ছে ? সকাল বেলায় আর জ্বালাতন করিস্‌নে। দে আমার র‍্যাপার ফিরিয়ে দে!'...

"ওঠ ঠাকরুণ! আর রাতি নাই ভোর হইয়াছে। এখুনি উপাসনার ঘণ্টা পড়বে।"—মুখখানাতে দারুণ অসন্তোষের ছাপ নিয়ে মীনার সহপাঠি মাধবী অগত্যা বিছানা ছেড়ে উঠেই পড়্‌ল। কারণ তখন থেকে প্রস্তুত হতে আরম্ভ না করলে, হয়তো সকাল থেকেই, 'সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট' মিস হাজরার কাছে বক্তৃতা শোনা ও কর্ত্তব্যে অবহেলার ফর্দ্দ শুন্‌তে শুন্‌তে কান ঝালাপালা হয়ে যাবে।

মাধবী উঠে দেখ্‌লে মীনা তার র‍্যাপারখানা বেশ পাট করে, মাথার বালিশের নীচে রেখে দিয়ে, তার বিছানাটা বেড্ কভারে ঢেকে ফেলেছে। সেও যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি এ কাজগুলো সেরে ঘরে আর যে চার জন ঘুমোচ্ছিল, তাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। কারণ এসপ্তাহে সেই ওদের 'মণিটরেস'। তাদের যত কিছু বিশৃঙ্খলতার জন্যে দায়ী সেই-ই।

ছাদে, তখন আরো দু একজন এসে জুটেছিল—মাধবী গিয়েও সেইদলে মিশলো। মীনা, তখন সুপ্রীতি, তার আর একজন বন্ধুর সঙ্গে মহা উৎসাহে, শেলি ভাল কি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভাল, বায়রণ ভাল কি কীট্‌স ভাল, সংস্কৃত

ভাল কি পালি ভাল এই নিয়ে, সরব আলোচনা লাগিয়ে দিয়েছে। মাধবী তাদের মাঝে গিয়ে দাঁড়াতেই, সে অভিনয়ের ভঙ্গীতে বলে উঠ্‌লো আইয়ে জনাব, হুকুম ফরমাইয়ে।"

কথাটার একটু ইতিহাস আছে। গ্রীষ্মের বন্ধের সময়ে ছুটী হবার দিন, সব বোর্ডার মিলে বিখ্যাত নাটক আবু হোসেন অভিনয় করেছিল; তাতে মাধবী নিয়েছিল বাদশার পার্ট আর রঙ্গময়ী মীনা হয়েছিল দাই। থিয়েটার কবে চুকে গিয়েছে কিন্তু পরিহাসপ্রিয়া মীনা, মাধবীকে কলেজের সময় ছাড়া, আর সব সময়েই 'জনাব' বলেই ডেকে থাকে।

তার পিঠে সশব্দে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে মাধবী, নিজের ব্যাপারের একটু আশ্রয় পাবার জন্য মীনার গা ঘেঁসে বসে পড়্‌ল। তাই দেখে সুপ্রীতি বল্‌লে "এই যে পূর্ণিমা, অমাবস্যার মিলন হয়েছে। "এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস"—তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে মীনা বলে উঠল "হৃদয় আবরি তোমা রাখি হে।"—মাধবী বল্‌লে "কালো বলে কি এত ঠাট্টা করতে হয়? জানিস্ তো, 'কোকিল যে কালো, তাতে কিবা আসে যায়? থিয়েটারের যত 'মেল' (Male) পার্ট আছে, বেছে বেছে আমিই করি আর কেমন নিখুঁত ভাবে! তোরা তো এগোতে সাহসই করিস্‌নে। কেবল ছিঁচ্‌কাঁদুনের মত "প্রাণেশ্বর! কি কুক্ষণে দাসী তব"—কণিকা এতক্ষণ ছাদের আল্‌সেয় ঠেস্ দিয়ে এদের কথা শুনছিল। হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে কি দেখে নিয়ে বল্‌লে "আপাততঃ তোমরা চুপ করলেই ভাল হয়। কারণ মিস্ হাজরা এইমাত্র বেরোলেন দেখ্‌লাম।"

মিস্ হাজরার নাম শুনে অত বড় বড় কলেজের মেয়েদের মনেও একটু অস্বস্তির ভাব এলো। এমনি ছিল তাঁর প্রতাপ! মেয়েদের তিনি যে খুব শাস্তি দিতেন তা নয়, কিন্তু কেমন এক আশ্চর্য্য চোখের দৃষ্টি ছিল তাঁর, যে, যে মেয়েই হোকনা কেন ভয় পেয়ে উঠ্‌ত। সে চোখ যেন পাথরের চোখ্ যার দিকে চাইতো, তার বুকের ভিতর পর্য্যন্ত হিম হয়ে যেত। কালো রং এ, পুরু লাল ঠোঁটে তার ওপর ওই আশ্চর্য্য চোখের দৃষ্টিতে তাঁকে মেয়েদের কাছে একটা ভয়ের জিনিস করে রেখে ছিল। ভয় ছিলনা কেবল একটী মেয়ের; তার নাম রেবা। রেবার সঙ্গে মিস্ হাজরার কথা নিয়ে বোর্ডিং শুদ্ধ সব মেয়েদেরই কথা কাটাকাটি ও মনান্তর চলতই।

সেই মিস্ হাজরার, আসার আশঙ্কায় মীনা তাড়াতাড়ি মাধবীর ব্যাপারটা তাকে একেবারেই ছেড়ে দিয়ে, নিজেরটার সন্ধানে ঘরে ঢুকে পড়্‌লো। রেবা হো হো করে হেসে বল্‌লে "কণা, যা হোক্ একটা কাজ করলি। মিস্ হাজরার নামে একেবারে পট পরিবর্ত্তন!"

গাল ফুলিয়ে কণিকা বল্‌লে "ফেভারিট" বলে, তোমার না হয় মিস্ হাজরাকে ভয় নেই। আমরা তুচ্ছ প্রাণী- অল্পেই ভয় পাই। একটু ধৈর্য্য ধরে দেখই না কেন, শুধু 'নাম' কি কাম! ঐ শোনো জুতোর শব্দ এগিয়ে আস্‌ছে— তোমার সাহস থাকেতো দাঁড়িয়ে থেকে ওঁর বচনাবলী শোনো। আমার অত সাহস নেই আমি পালাই।'

উত্তরে রেবা বললে "তোমরা ওঁকে যতটা বাড়িয়ে বল, আসলে উনি ততটা নন্।"

"ও বাবারে! গায়ে যে তোর ফোস্কা পড়্‌ল দেখ্‌ছি। কি দেখেই যে মজেছ! ওর চেয়ে যদি সুপ্রভাদিকে পছন্দ করতিস্ তাঁর 'এডমায়ারার' হতিস্ তো, তোর পছন্দর বাহাদুরী আছে বল্‌তাম। তা না, একেবারে "Cut and dried! শুষ্কং,কাষ্ঠং!"

রেবা তবুও হঠল না—বল্লে "রূপেতে কি করে বাপু, গুণ যদি থাকে!"

এমন সময় যে মিস্ হাজ্‌রার কথা নিয়ে সকালবেলাই আলোচনার সভা বসে গিয়েছিল, তিনি সশরীরে হাজির হলেন। কণিকা কোথায় যে লুকাল, তা কেউ টের পেলনা; আর অন্য সব মেয়েরা হুড়োহুড়ি করে পালাবার এত ধুম লাগিয়ে দিলে যে বেচারী রেবা একলাই তাঁর সামনে পড়ে গেল

রেবার আপাদমস্তক একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বল্লেন 'রেবা! তোমরা বড় মেয়েরাও যদি, সব কাজ রুটিন- মত না করো, তবে ছোট মেয়েরা শিখ্‌বে কি দেখে?"

একটু লজ্জিত হয়ে রেবা বললে "এখনও তো উপাসনার ঘণ্টা পড়েনি!"

"না, পড়ুক। কাজের মধ্যে আনন্দকে খুঁজে নিতে হয়, তা হলে কাজের মূল্য থাকে। না হলে সে কাজ শুধু

কঠিন কর্তব্যের রূপ ধরে মনকে পীড়াই দেয়। সব সময়ে মনে রাখ্‌বে

"In each duty
Lies a beauty—"

ততক্ষণে মীনা তার কাপড়-চোপর, চুল পরিস্কার করে, হাত-মুখ ধুয়ে এসেছে। দেখে হাজরা বোধহয় একটু খুসী হলেন। কারণ তাঁর দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁটে অল্প হাসির রেখা ফুটে উঠেই যেন মিলিয়ে গেল। মুখে শুধু বললেন "বড় খুসি হলাম মীনা যে এতগুলি মেয়ের মধ্যে এক তুমিই যা একটু সময়ের মূল্য বুঝতে শিখেছ।"

হাজ্‌রা তাঁর বক্তৃতা শেষ করে চলে যেতেই, ঘরের মধ্যে থেকে, অদৃশ্য মূর্ত্তিগুলি একে একে দৃশ্যমান হলো। একসঙ্গে পাঁচ সাত জনে মীনাকে বল্‌লে "কার মুখ দেখে, তুই আজ উঠেছিলি মীনু, রেবার বদলে মিস্ হাজরা আজ তোকে প্রশংসা করে গেলেন ?"

কণিকার গায়ের জালাটা তখনও কমেনি। সে চরকির মত এক পাক ঘুরে নিয়ে, রেবার মুখের কাছে হাতটা নেড়ে উঠ্‌লো "ও রেবা, রেবেকা সুন্দরী! প্রশংসায় যে 'পঞ্চমুখ' হয়ে উঠেছিলে ? কি হোলো এবার !"

রেবার মুখখানা লজ্জায় ও অপমানে কালো হয়ে গেল।—

নীচে ঘণ্টা বাজলো—ঢং—ঢং—ঢং। মুখরোচক আলোচনাটা তখনকার মত স্থগিত রেখে সকলে উর্দ্ধশ্বাসে উপাসনায় যোগ দিতে চল্‌লো।

(২)

পূজার ছুটি হতে আর বেশী দেরী ছিলনা। চারিদিকে ব্যস্ততা, গোলমাল ও আকাশ বাতাসের অপূর্ব্বশ্রীতে সব যেন সজীব হয়ে উঠেছে! যার কিছু নেই, একেবারে নিঃস্ব, সেও যেন 'পূজা' এই অক্ষর দুটী মহামন্ত্র মনে করে জপ করে যাচ্ছে। "দুর্গা নাম মহামন্ত্র, হৃদয় সদা জপ নাম !"

কল্‌কাতার সেই বোর্ডিংটাতেও ব্যস্ততার আর শেষ ছিল না। কেউ কেউ বাড়ী চলেই গিয়েছে, কেউবা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত থেকে যাবে। যারা বাড়ী যাচ্ছিল তারা তো খুসী বটেই, কতদিন পরে আত্মীয় স্বজনদের প্রিয় মুখগুলি দেখতে পাবে এই চিন্তা তাদের মনে প্রবল হলেও, সখীদের বিরহ যে তাদের কাতর করে না তুলছিল, এমন নয়! কতদিনে আবার আসবে কি ভাবে আসবে, হয়তো যে মুখগুলি ছেড়ে যাচ্ছে, পুনর্মিলনের দিনে তারা না থাকতেও পারে সব, এই রকম দুশ্চিন্তারও দু একটা কালো ছায়া, তাদের মনের ওপর চকিতে দেখা দিয়ে বাড়ী যাওয়ার আনন্দকে ম্লান করে তুল্‌ছিল।

মীনাদের বোর্ডিং থেকে প্রায় সবাই চলে গিয়েছে, বাকী শুধু তারা জন চারেক। তার মধ্যে তিনজনে মিলে চাঁদা করে গোটা উত্তর ভারত দেখে বেড়াবে, এটা অনেক আগেই ঠিক হয়ে ছিল, অপেক্ষা করছিল শুধু মীনার জন্য। তাকে তার বাবা হাজারিবাগ থেকে নিতে পাঠালেই, অন্য তিনজনে নির্ভাবনায় বেরিয়ে যেতে পারে।

মীনার কোন উপায় না হওয়া অর্থাৎ তার বাবার কাছে রওনা না হওয়া পর্য্যন্ত মিস হাজরাও আটকে পড়েছিলেন। তাঁর এক একটী দিন যাচ্ছিল, আর তিনি মীনার ওপর বিরক্তির মাত্রা বাড়িয়ে তুল্‌ছিলেন। শেষে মীনাকে নিতে তার বাবা লোক পাঠালেন।

লোক যে এল তার নাম সতীশ্বর! তার সঙ্গেই সে নিজের সব কিছু জিনিস গুছিয়ে নিয়ে রওনা হল। কারণ মীনার বাবা রমাপতি বাবু যে চিঠি দিয়েছিলেন তাতে লেখা ছিল যে মীনার বোর্ডিং বাস আপাততঃ শেষ হল। দরকার হলে ছুটির পরে এসে আবার এ্যাডমিশন নেবে।

মিস্ হাজরা যখন গম্ভীর মুখে এই আদেশ প্রচার করে চলে গেলেন, তখন উপস্থিত চারটী প্রাণীরই গভীর বিস্ময়ে কথা আর ফুটলো না। এ পরোক্ষ ইঙ্গিতের যে কী অর্থ তা বুঝে নিতে প্রথম যে কথাটী সকলের মনে হল, তার শুদ্ধ ভাষায় নাম উদ্বাহ, অর্থাৎ বিয়ে! মাধবীই এই নিস্তব্ধতা ভাঙলে। বল্লে "মীনু, আর কি, এবার নীরস নোট লেখা থেকে অব্যাহতি পেয়ে 'প্রেয়সী বধূর' সাজ পরো গে। আর দুকাণ ভরে অনবরত শোনা গে

'তোমারেই ভাল বাসিয়াছি আমি শতরূপে শতবার,
যুগে যুগে অনিবার—"

হেসে মীনা বললে "তুই যে রাম না হতেই রামায়ণ আরম্ভ করলি মাধু! বিয়ে ছাড়া কি আর যুক্তি সঙ্গত কোনো কারণ থাকতে পারে না বোর্ডিং ছাড়বার ?— "

'কোনো কারণই থাকতে পারে না মশায়, কোনো কারণই থাকতে পারে না। স্কুল, কলেজ ছাড়বার মত

যুক্তিসঙ্গত কারণ একমাত্র, সেটা হচ্ছে 'বিয়ে'। হিন্দুর মেয়ের তা ছাড়া আর কোনো কারণই থাকে না। বোর্ডিং এই থাক, আর কলেজেই পড়, সেন্‌সাসের সময় 'কাষ্ট' হিন্দুই লেখাতে হবে তো?"

"বিশ্বাস কর মাধু সে সব কিছু নয়। হয়তো মা জেদ ধরেছেন আর বোর্ডিং এ রাখবেন না—অগত্যা কলেজ ত্যাগ। ও আমার মোটেই মনে হয় না।"—

"ওরে বাস্‌রে! কেন? তুমি কি? আর যদি গিয়ে দেখ যে চেলীর কাপড় আর মাথার 'সিঁথি ময়ূর' শুধু তোমার পরবার পথ চেয়ে পড়ে আছে, তা কি কর্‌বে?"—

এবারে মীনা সশব্দে হেসে বল্‌লে তোমার 'কথাতেই তুমি ঠক্‌লে এবার! কারণ আমরা যখন হিন্দু, তখন বিয়েটা যদি হতেই হয়, তবে এ দুমাসে হবে না—আশ্বিন, কার্ত্তিকে কি হিন্দু মতে বিয়ে হয়?—কাজেই 'সিঁথি ময়ূর' আর চেলীর শাড়ী শুধু পর্‌বার অপেক্ষায় নয়, কিনবার অপেক্ষাতেও থাক্‌বে—হয়তো বা তৈরীর অপেক্ষাও তারা করবে।'

"হয়েছে, হয়েছে মীনু দর্প করে অত বলিসনে। জানিস্ তো "অতি দর্পে হতা লঙ্কা"।

"খুব জানি। কিন্তু এও জানিস্ মাধু, যে বিয়েই যদি কর্‌তে হয় আমাকে তো, তোরা তার অনেক আগেই খবর পাবি। আর জুটতেও হবে সবাইকে এসে—না হলে 'শিবহীন যজ্ঞ' হবে নাকি!"

একটু হেসে মাধবী ও সুপ্রীতি বল্‌লে "হাঁ রে মীনু, আগে সবাই বলে থাকে, তারপরে, একেবারে সিঁদুর পরে এসে হাজির হয় আর ক্রমে ক্রমে সেই নতুন সাথীটার মায়ায় এমন জড়িয়ে পড়ে যে পুরাণোদের কথা আর মনেই থাকে না।"

অনীতা খ্রীষ্টান রোমান ক্যাথলিক। উদাস ভাবে বল্‌লে "বড়জোর একপাতা লুচি খেয়ে তোদের যুগল রূপ দেখে আস্‌ব—এর বেশী আর আমি কি করতে পারি? অবিশ্যি যদি তুই নেমন্তন্ন করিস

হাতের খাতাটা দিয়ে ঠক্ করে অনীতার পিঠে একটা আঘাত করে মীনা উচ্ছ্বসিত হয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে "এত কথাও জানিস্ তোরা?—"—

হাজারিবাগের পথ। ভোরে ট্রেণ থেকে নেমে "প্লেজার কারে" করে মীনা যতীশ্বরের সঙ্গে 'হাজারীবাগ টাউনে' চলেছে। বাড়ী থেকে তাকে ষ্টেশনে নিতে এসেছিল তাদের অনেক দিনের পুরোণো জমাদার। সামনে ড্রাইভার, তার পাশে যতীশ্বর, তার পাশে হীরা সিং এর দীর্ঘ, উন্নত চোহারা মাঝে মাঝে সামনের দৃশ্যগুলোকে ঝাপসা করে তুল্‌ছিল। মীনা ভাবছিল, তার বোর্ডিং থেকে আস্‌বার দিনটার কথা। মাধু, সুপ্রীতি ও অনীতা যদিও তাকে হাসিমুখেই ষ্টেশনে তুলে দিতে এসেছিল, তবুও তারা এবং সে, সব ক'জনেই যেন মনে মনে বুঝতে পারছিল যে হয়তো এমন ভাবে আর মেলা হবে না। কতদিনের কত সুখ দুঃখের সাথী তারা, বালিকা মীনা ধীরে ধীরে পরিণত হয়ে আজ পূর্ণ তরুণী! তার মনের বাসনা পুষ্প এদের কাছেই ধীরে ধীরে দল খুলেছে, এদের সে সখী বলে ভালবেসেছে এদেরই সে বিশেষ করে চেনে! যদিই আর বোর্ডিংএ যাওয়া না হয় যদিই এই চলে আসাই শেষ হয়, তবে পরের দিনগুলো কি করে কাটবে, এই চিন্তাতে মীনা এখনই কাতর হয়ে পড়ছিল। মনে পড়ছিল সখীদের অশ্রু সজল ম্লান দৃষ্টির মধ্যেকার জোর করে মুখে ফুটিয়ে তোলা ম্লান হাসিটুকু আর মনে পড়ছিল ঠোঁটের ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা "au revoir!" কথাটা! নিজের মনে এই সব আলোচনা করতে করতে তার মন এমন জায়গায় এসে থামল যেখানে অতি ধীরে ছুঁলেও সমস্ত রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। সকালের মাঠের হাওয়া, সরল পথ, মোটরের অবাধ গতি কিছুই তার মনকে আকর্ষণ করতে পারলে না। দুধারের খোলা মাঠের মাঝে, রাখালের মেঠো সুরে মন তার কোথায় হারিয়ে গেল।

মোটর চল্‌তেই থাকল রাঁচি, হাজারিবাগ, জগদীশপুর, গিরিধি, এ সব জায়গায় মোটর চালাবার যে কি সুবিধা তা বলে শেষ করা যায় না। যেমন সুন্দর পথ, তেমনি তার প্রাকৃতিক দৃশ্য। পথে অনাবশ্যক কোনো জীব, জন্তু এমন কি মানুষও নেই। হাট বার না হলে লোক দেখাই যায় না। একটানে বিনা বাধায় চলে এসে মোটর 'বগোদরে' থামল। এটা হল হাজারিবাগ রোড থেকে হাজারি বাগ টাউনে যেতে হলে প্রায় ৪০ মাইলের মাঝামাঝি একটা 'হন্টিং' ষ্টেশন। দু চার ঘর লোকের

বসতিও আছে। আর আছে একটা আড্ডা। যেখানে মোটর প্রভৃতি অচল হলে তাকে সচল করবার ও তার যত কিছু দরকার হতে পারে সবেরই ব্যবস্থা করা যায়। মোটর থামলে মীনা দরজাটা খুলে নেমে পড়ে একটু পায়ে হাটবার লোভে চল্‌তে থাকল। হীরা সিং তার লম্বা লাঠিখানা নিয়ে তার অনুসরণ করতেই, সে হেসে বললে "দরকার নেই দরোয়ান—আমি বেশী দূর যাব না।"

সকালের ঝলমলে আলোয় চারিদিকের মাঠ ভরে গিয়েছে—হয়তো দু একটী পাখী এসে একটু বস্‌ছে আবার উড়ে চলে যাচ্ছে, গরুর গলার ঘণ্টাগুলো টুং টাং করে মৃদু মধুর বেজে এক অপূর্ব্ব রাগিণীর সৃষ্টি কর্‌ছে। চারিদিকের সজীবতা ও আনন্দ দেখে মীনার মনে অচলায়তনের পঙ্ককের মত বন্ধন মুক্ত হবার একটা আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল।

পিছন থেকে যতীশ্বর বললে "হেঁটেই কি বাকী পথটুকু শেষ করবে নাকি?"

"আ! যতীদা, তুমি যে দেখছি 'স্পাই' হয়ে উঠলে! দু পা এসেছি কিনা, অমনি পিছু নিয়েছ? তোমাদের জ্বালায়, আমরা কি স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলতেও পাব না?

শান্তস্বরে যতীশ্বর বল্‌লে "পাবে, বাড়ী গিয়ে। তোমার বাবা, মার কাছে তোমাকে সসম্মানে পৌছে দিতে আমি বাধ্য এবং অনুরুদ্ধও বটে! সুতরাং বুঝতেই পারছ, যতক্ষণ তুমি আমার দায়ীত্বের মধ্যে আছ, ততক্ষণ তোমাকে খুসীমত চল্‌তে দিয়ে আমি তোমার কিছু অত্যাহিতের দায়ী হতে পারব না

"বক্তৃতা দিতে খুব পার তো। হেঁটে বেড়ানর মধ্যে অত্যাহিতটা কি এলো?"

"কি, তা এখুনি দেখতে পেতে, বলেই যতী চোখের নিমেষে মীনাকে রাস্তার মাঝখান থেকে একেবারে মাঠের মধ্যে ঠেলে দিয়ে, নিজেও তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মীনা বিরক্ত হয়ে 'আঃ' বল্‌তে গিয়ে থেমে গেল। এক খানা মোটর মীনা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেইখান দিয়ে মুহূর্ত্তের মধ্যে উল্কার মত বেগে ছুটে গেল। বিশ পঁচিশ গজ গিয়ে সেখানা একেবারে থামল। গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার ও আরোহী দুজনেই লাফিয়ে নামল।

গাড়ীটা ছিন্নমস্তার দিক থেকে আস্‌ছিল। মাঝপথে কি একটা যন্ত্র খারাপ হয়ে যাওয়ায় এই গতিবেগের সৃষ্টি। আঘাত বেশী কারোই লাগেনি। গাড়ীটা একেবারে অকেজো হয়ে যাওয়ায় আরোহী খুবই মুস্কিলে পড়লেন দেখে যতী একটু এগিয়ে গিয়ে বল্লে "আপনি কোথায় যাবেন? আমার দ্বারা আপনার কি কিছু সাহায্য হতে পারে?"

ভদ্রলোক যেন অকূলে কূল পেলেন। বল্লেন "ছিন্নমস্তা" থেকে হাজারিবাগে ফিরে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বোধহয় ফেরা এখন হল না। গাড়ী ঠিক না হলে কি করে যাব?"

"যদি অসুবিধা মনে না করেন তো আমাদের গাড়ীটায় আসতে পারেন। আমাদের বাড়ী গিয়ে, সেখানে 'ডাল-ভাত "দুটী খেয়ে তার তারপরে আপনার গন্তব্য স্থানে আপনি যেতে পারেন। কি বলেন, আপত্তি আছে?"

"থাকা উচিত নয়। কিন্তু আপনি তো আমাকে আহ্বান করছেন -বসাবেন কোথায়? স্থানাভাব তো একান্তই দেখছি।"

যতী একথার জন্য প্রস্তুত ছিল। সে শুধু বল্লে "উঠে বসবার কথাটাই আপনি ভাববেন। স্থানাভাবের কথা তো আপনার নয়। "বলেই সে তাড়াতাড়ি হীরা সিংকে বল্‌লে দরোয়ান তুমি পিছনের লগেজ কেরিয়ারে কিংবা ছাদের উপরে এই বাকী পথটুকু যেতে পারবে?"

হাতের লাঠিখানা সামনে ঝুকিয়ে সেলাম করে হীরা সিং বল্‌লে "আল্‌বাৎ! হুকুম হলে আমি পায়দলেই এক ক্রোশ পথ যেতে পারি।" বাঙ্গালীদের সঙ্গে ছোটবেলা থেকে, থেকে থেকে সে খুব ভাল বাংলা বল্‌তে পারত।

যতী বল্‌লে "না, অত কষ্ট করতে হবে না—গাড়ীতেই গেলে হবে।"

মীনা এতক্ষণ চুপ করে সব কথা শুনিতেছিল। যতীকে ডেকে এইবার সে বল্‌লে "যতীদা, তুমি গায়ে পড়ে এত আলাপ জমাতে পার, যে এক এক সময় রাগ ধরে যায়!"

"আচ্ছা সে না হয় আমার দোষ বলেই মেনে নিলাম—কিন্তু তোমার বাবার কানে যখন একথা উঠত, আর তিনি আমার বিবেচনার দোষ দিতেন, তখন কি তুমি আমাকে সে বকুনি থেকে রক্ষা করতে?"

ঝাঁঝালো সুরে মীনা বল্‌লে "নেমন্তন্ন তো করা হল,

এখন বসাবে কোথায়, তোমার মাথায়? দেখ্‌ছ গাড়ী ভর্ত্তি—তবু—"

"আহা চট কেন মীনা—যেখানেই বসাই তোমার মাথায় বসাব না এটা ঠিক।" বলে হীরা সিংকে ইঙ্গিত করতেই সে গাড়ীর ছাদে উঠবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল। তা দেখে মীনা বল্‌লে "কি বুদ্ধি! বুড়ো মানুষ রদ্দুরে আমসী হয়ে যাক্‌ আর কি! তা হবেনা হীরাসিং তুমি গাড়ীর ভিতরে বসো।"

এক মুখ হেসে হীরা সিং 'খুকী দিদিমণির পায়ের কাছে গাড়ীর মেঝেতে বসে পড়ল। যতী নতুন লোকটাকে ডেকে নিয়ে গাড়ীতে উঠে বস্‌ল। ড্রাইভার ষ্টার্ট দিল।

যতীর এই কাণ্ডে মীনা তার ওপর হাড়ে চটে রইলো। সামনের মনোহর দৃশ্যগুলি তার মনকে কিছুতেই আকর্ষণ করতে পারলনা। নানা এলোমেলো ভাবনার মধ্যে দিয়ে সে এক সময় আবিষ্কার করলে যে নিজেরও অজ্ঞাত সারে সে কখন লোকটার চেহারা দেখায় মন দিয়েছে। এই খবরটুকু জান্‌তে পেরেই তার কানের ডগা লাল হয়ে উঠল। এই অন্যমনস্কতার ভিতর দিয়ে প্রায় এগারটার সময় মীনাদের গাড়ী তাদের বাড়ীর ফটক দিয়ে সুরকি ঢালা পথের ওপর দিয়ে ঘুরে বারান্দার নীচে এসে থাম্‌ল আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর মুখ নিয়ে সে গাড়ী থেকে নেমেই সামনের হলটায় ঢুকে গেল। যেতে যেতে শুন্‌তে পেলে যতী সেই লোকটাকে বল্‌ছে "আসুন প্রভাতবাবু কাকাবাবু এ সময়টায় বাগানের তদ্বিরে থাকেন। চলুন আপনাকে সেইখানেই নিয়ে যাই। ওরে গোসলখানায় জল দে।"

(৩)

হাজারিবাগ অঞ্চলে প্রায় দোতলা বাড়ী নেই বল্লেই চলে। যা দু-একখানা আছে, তা নিতান্ত সখের খাতিরে। মীনার বাবা রমাপতি বাবুরও এই ধরণের একখানা সখের দোতালা ঘর ছিল। যখন ছুটীতে মীনা আস্‌তো, তখন এই ঘরখানা ব্যবহার হতো—না হলে অন্য সময়ে তালা বন্ধ পড়েই থাক্‌তো।

এবারে মীনা বোর্ডিং থেকেই একটু বিষন্ন মন নিয়ে এসেছিল, তার ওপর পথের মধ্যে যতীর আত্মীয়তায় বাড়ীতে একটী নতুন অতিথির উদয় হওয়ায় সে মনে মনে তার ওপর বিষম চটে ছিল। শুধু খাওয়ার সময় ছাড়া সে আর তার সেই ঘরখানা ছেড়ে নড়ত না। নীচে, বাড়ীর হাতার মধ্যে প্রকাণ্ড বাগান থাকা সত্ত্বেও তার বেড়াবার সীমানা দোতলার ছাদ পর্য্যন্তই বদ্ধ হয়ে রইলো।—

সন্ধ্যার আবছায়ার মধ্যে মীনা একলাই ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ভাব্‌ছিল নতুন লোকটার বেয়াড়া আক্কেলের কথা। সেই যে দু-তিন দিন আগে মোটর ভাড়ার সুযোগ নিয়ে এ বাড়ীতে এসে ঢুকেছে, যাওয়ার তো আর নাম নেই! তারপরে সবরাগ গিয়ে পড়ল তার নিরীহ বাবার উপর! বাবা যেন কি! লোক দেখ্‌লে যেন স্বর্গ পান! কথেকার কে, কোথাকার চেনা, অমনি তাঁর কায়েমী বন্দোবস্ত হয়ে গেল এখানে! বাইরের লোক এসে ঘর জুড়ে বসে রইলো, আর তার জন্যে, সে স্বচ্ছন্দ মনে হাঁটা চলা করতে পাবে না! যদিও রমাপতিবাবুর মতটা স্ত্রী স্বাধীনতার খুব পক্ষপাতী ছিল, তবুও মীনা এখন রাগের ঝোঁকে সবটাই তাঁকে দোষ দিয়ে দিল।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। সে উঠে নিজের ঘরের আলোটা জ্বেলে সেই আলোর দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলো। দু-তিন দিন আসা হল, অথচ কেন যে তাকে বোর্ডিং ছাড়ান হল, সে খবরটা আজও সংগ্রহ হয়ে ওঠেনি। তার মনে অবিশ্যি জিজ্ঞাসা করবার জন্যে প্রবল একটা আগ্রহ হচ্ছিল কিন্তু ওই নতুন লোকটার হঠাৎ এসে পড়ায় তার মন এত বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল যে তার যে কোন বিষয়েই অসুবিধা বা খারাপ বোধ হচ্ছিল সবের জন্যই সে ওই প্রভাতকেই দায়ী করছিল।

নীচে শাঁখের শব্দ শোনা গেল! চমকে উঠে, খোলা চুলটা বাঁ হাতে জড়াতে জড়াতে সে নীচে নাম্‌ল। নেমে দেখলে তার মা তখন হিন্দুস্থানী ঝিএর সঙ্গে বাজারের ফেরত পয়সা নিয়ে খুব বকাবকি করছিলেন। সেদিন ছিল হাটবার। দুপুরে হাট বসে প্রায় সন্ধ্যার সময়ে ভাঙে। একেবারে দু-তিন দিনের মত বাজার করে রাখতে হয়। অনেকক্ষণ ধরে বকাবকি করে মীনার মা শতদল ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে আসতে দেখে পারিত্রাণ পেয়ে বল্লেন "এসেছিল মা মিনি! দাই এর কাছে বাজারের হিসেবটা মিলিয়ে নে তো! আমি যাই, উনি আবার

আজ প্রভাতবাবুকে খাওয়ানো উপলক্ষ্য করে জন কুড়ি, পচিশ লোক নেমন্তন্ন করেছেন। না দেখিয়ে দিলে পোলাও আর মাংসটা মহারাজ যা করে রাঁধবে তার ঠিক নেই! আর হ্যাঁ আর একটা কথা ভুলেই যাচ্ছি—হিসেব মিলিয়ে, তুই যদি মা একবার চপের পুরটা ঠিক করে দিস্!" শতদল কাজের তাড়ায় চলে গেলেন।

হাতের কাছে একটা কাজ পেয়ে মীনার বিমনা মনটা একটু খুসী হয়ে উঠছিল। কিন্তু ফের এই প্রভাতের খাওয়ার কথায়, তার মন দ্বিগুণ বেঁকে বস্‌ল। কে এই প্রভাত! কোথায় ছিল সে আর কেনই বা ছেলে বুড়ো ঝি, চাকর সবাই মিলে তাকে এমন করে ঘিরে ধরেছে? এ বাড়ীতে অপ্রত্যাশিত, অনাহুত অতিথি তো এই প্রথম নয়? কত এসেছে, কত গিয়েছে। কেউ কিন্তু এমন করে আসন পেতে বসে নি তো! এই হাজারিবাগে এসে কণ্ট্রাক্টর রমাপতিবাবুর বাড়ীতে যে অন্ততঃ একবেলাও না খেয়েছে, তার হাজারিবাগ আসা অসার্থক! আর কি বেহায়া এই প্রভাত! যার সঙ্গে চেনা নাই, যাকে চোখেও একদিন দেখেননি, বিপদে পড়ে তার বাড়ী এসে, দিব্যি দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছে! সব শেষে রাগ হল নিজের ওপর। কেনই বা সে প্রভাতের সামনে বের হয় না। একি রাগ, না লজ্জা, না উপেক্ষা, না অনুরাগ? শেষের কথাটা মনে হতেই মন তার আবার বেঁকে বসল। দাই বললে "দিদি অন্য কাজে যাব, হিসেব মিলিয়ে নেও!" এক ধমকে তাকে চুপ করিয়ে মীনা বল্‌লে "যা, যা, তুই তোর কাজে যা অন্য সময়ে বলিস্ লিখে নেব।" বলে সে যেন এতক্ষণে মায়ের দ্বিতীয় অনুরোধের কথাটা একবার ভেবে দেখলে—তারপর ঠোঁট উল্টিয়ে বললে "পারবনা আমি—ভারী বয়ে গিয়েছে, আমার করতে। ওই মহারাজই যা পারে করবে না হয় বৌদি দেখাবে খন।

পাশেই ছোট একটা ভাঁড়ার ঘর ছিল। কাছেই সেই ঘরটা পেয়ে মীনা তাতে ঢুকে পড়ে দেখলে তার বৌদি মলিনা যেন বিশ্বের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে সেই ঘরে তরকারী কুটতে ব্যস্ত। সেখানে আর একজন ঝি শুধু তাকে সাহায্য করছে। মলিনার ও ঝিএর হাত ও মুখ সমানেই চল্‌ছে. দেখে সে হেসে বল্‌লে "বক্তৃতাটা কিসের? বুঝিয়ে দিলে আমিও কিছু বল্‌তে পারি।"

মলিনাও ছাড়বার পাত্রী নয়—সেও হাই স্কুলে থার্ড ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়েছে। বয়সে সে মীনার চেয়ে কিছু বড় হলেও বাড়ীতে আর কোনো সমবয়সি না থাকার দরুণ সম্বন্ধটা তাদের সখিত্বে এসে দাঁড়িয়েছে। হেসে বল্‌লে "শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়ার পরে যে বাগ্মী বক্তৃতা করতে আসে, তার বক্তৃতা দিয়ে আর বিড়ম্বনা ভোগ করানো—কেন? সভায় ঢুকে যিনি বুঝতে না পারবেন যে সভার উদ্দেশ্যে কি, তাঁর না ঢোকাই ভাল।"—

"আজকের প্রেসিডেন্ট কে?"

"প্রেসিডেন্ট এখনও কাউকে করা হয়নি মিনু, তোর জন্যে ঐ পদটা আর আসনটা খালি রেখেছি।" বলে মলিনা মীনাকে বস্‌বার জন্যে একটা চালের বস্তা দেখিয়ে দিয়ে তার দিকে চেয়ে বল্‌লে "তারপর, এই সন্ধ্যে বেলা পর্য্যন্ত বিদুষী মহিলার হচ্ছিল কি?—চুল টুল কিছুই তো বাঁধা হয়নি দেখছি, কি ভাবে বিভোরা ছিলে?—পড়ার না বিয়ের?"—

মীনা মলিনার ঠিক সাম্‌নে বসেছিল। হাত বাড়িয়ে তার পরিপাটী করে বাঁধা এলো চুলের খোঁপাটাতে একটান দিয়ে সে বল্‌লে "বিয়ের ভাবনায় আমার তো ঘুমই আস্‌ছেনা তোমার বুঝি তাই হ'ত?"—

"তা, একেবারে যে কিছু হ'ত না, তা কি করে বলি! এই ধর্ মনটা উড়ু উড়ু ঠিক যেন পাখীর মত, প্রাণটা ত্রাহি, ত্রাহি, যেন তপ্ত খোলায় কৈ মাছ, জীবনটা বিফল, যেন ইউনিভারসিটীর সদ্য ফেল করা ছাত্র, তনু অবশ—'সখি ধর, ধর, কাঁপে লো অন্তর মোর' ভাব, হয়েছিল বই কি। এই সব লক্ষণ মিলিয়ে দেখে তবে না আমার বিয়ের 'সময়' এল। তোর যখন এ রকমটী হবে, বুঝ্‌বি 'নিদান কাল' এসেছে—আমাকে বলিস্; ওষুধ দেব।"

"বাবা রে বাবা, এত কথাও জানিস্ ভাই বৌদি। আমার কিন্তু ওসব কিছু না হলেও মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে, তাই তোমার কাছে এলাম, তুমি আর দগ্ধিও না।"

"এই হয়েছে—এও একটা লক্ষণ। মাকে বলে, তোমার একটা গতি শীগ্‌গীরই করতে হবে—দেরী নয়।"

"কেন, আমি কি 'অবারের' মড়া যে আমার গতি করবে। তোমার মেয়ে ক'টার বেশ ভাল করে গতি

করে দেও যে মহা পুণ্যি হবে। আমাকে নিয়ে পড়লে কেন? বিয়ে বিয়ে করে আমি হেদিয়ে মরছিনে।"

"চালাক মেয়ে যে! বাইরে মরবে কেন? ভেতরে ভেতরে 'থাবি' খাচ্ছ!"

ঘরের দরজায় মীনার বড়দাদা শুভ্রাংশু দাঁড়ালেন। বল্লেন "'থাবি' খাচ্ছেন কে, খাওয়াচ্ছে বা কে?"

শুভ্রাংশুকে আসতে দেখে মীনা লজ্জায় অস্থির হল এই ভেবে যে হয়তো তার বৌদি এখন কি ফাঁস কথা বলে তাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে। হলোও তাই—মুখরা মলিনা বল্লে "তোমার বোনের তো তোমরা কোন খবর রাখ না—বিয়ের বয়েস হল, অথচ বিয়ে দেওয়ার নামটা নেই। মরা কেটে কেটে, আর দিন রাত মানুষের দেহের কষ্ট বুঝে বুঝে কি আর তুমি জ্যান্ত মানুষের মনের কষ্ট কিচ্ছু বোঝ না!" বলা বাহুল্য শুভ্রাংশু ডাক্তার।

স্নিগ্ধ চোখে বোনের দিকে চেয়ে তিনি বল্লেন "ভাঁড়ারে আর রান্নাঘরে তোমাকে ধরে না মলিনা তুমি নারী জাগরণের দোহাই দিয়ে দেশের কাজে নেমে পড়।"

মলিনা বল্লে "যেতে তো চাই—শুধু তোমার দশা কি হবে ভেবে, আমার যেতে ইচ্ছে হয় না"

"মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব—
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব!"

মীনা ও ঝি এদের অজ্ঞাতসারে অনেকক্ষণ চলে গিয়েছিল।

ডাক্তার হলেও শুভ্রাংশুর ভিতরটা এখনও শুকিয়ে যায় নি; সেখানে প্রেমিকের প্রাণ তখনো জেগেছিল। সুন্দর সন্ধ্যা, নির্জ্জন ঘর ও অনুপম সুন্দর মুখের আকর্ষণে ডাক্তার শুভ্রাংশু হঠাৎ নব বিবাহিত শুভ্রাংশু হয়ে মলিনার বঁটির পাশে বসে পড়ে তাকে একেবারে কাছে টেনে নিয়ে বল্লেন "এই পঁচিশ, ছাব্বিশ বছরেই মরার কথা কেন? ডাক্তার হলেও, তোমার মরার কথা, আমাকে দুর্ব্বল করে ফেলে। শুধু শুধু এমন করে কষ্ট দিয়ে কি লাভ?"

মলিনাও এক মিনিটের জন্যে তার কাজ বন্ধ রেখে কি বলতে যাচ্ছিল—ব্যস্তভাবে শতদল সে ঘরে ঢুকে যেন অপ্রস্তুত ভাবে বল্লেন "মলিনা, মা, পেলাম না তো সেই মসলার পোঁটলাটা?" বলে ঘরের ভিতরে এটা সেটা নাড়তে লাগলেন।

শুভ্রাংশু মায়ের সামনে হাতে হাতে ধরা পড়ে কি বলবে ভেবে না পেয়ে বল্লে "মিনি, কোথায় গেল মা? বাবা তাকে তৈরী হয়ে নিতে বল্লেন—বাইরে গোটা কতক গান টান করবে।" তাড়াতাড়ি সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তিনি যেন বাঁচলেন।

ছেলের এই ছলনাটুকু শতদলের চোখ এড়াল না—প্রৌঢ়া শতদল শুধু একটু মুচকে হাসলেন

(৪)

প্রভাতের কাছে তার পরিচয় নিয়ে রমাপতি বাবু যখন জানলেন যে সে তাঁর বাল্য বন্ধু ও সতীর্থ জগমোহন বাবুর ছেলে, তখন একদিকে বন্ধুর ছেলে বলে ও অন্য দিকে অতিথি বলে তার সমাদরটা তাঁর কাছে খুব বেড়ে গেল। তাঁর এই আনন্দ উচ্ছ্বাস কিন্তু তিনি তাঁর মনে সংযত রেখে, আর একটা যে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত হয়ে শাখা পল্লবে, তাঁর মনকে ঢেকে ফেলছিল, সেটার কথাই তিনি তাঁর উপযুক্ত পুত্র ও মন্ত্রণা দায়ক শুভ্রাংশুকে জানিয়ে ছিলেন। শুভ্রাংশু, পিতার কথামত, তাঁর মনের ই কাকেও জানালে না

যে রমাপতি বাবুকে লোকে সংসার বিষয়ে উদাসীন বলেই জানতো তিনি তাঁর একমাত্র মেয়ে মীনার জন্যে অনেকখানি সংসার আসক্তির পরিচয় দিলেন। শতদলকেও না জানিয়ে তিনি প্রভাতের বাবা জগমোহন বাবুকে, তাঁর আসার কথা, মোটর ভেঙে যাওয়ার সব জানিয়ে শেষে লিখলেন—

"এতদিন দেশ-ছাড়া হয়ে অচিন্তিত ভাবে যখন তোমার ছেলেটীকে দেখতে পেলাম, তখন থেকেই মনে করছি, একে আপনার করে রেখে দিই। তোমার ছেলেকে যত দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি। সহজ ভাষায়, আমার একটী মেয়ে আছে সে বেথুনে আই,এ, পড়ছে—তোমার ছেলের সঙ্গে তার বিবাহ দিতে চাই। মেয়ে সম্বন্ধে বেশী কিছু লিখবনা—তুমি এলেই দেখতে পাবে। বুড়ো হয়েছি, কখন ডাক এসে পড়বে—ছেলেদের লেখাপড়া শেখাচ্ছি—কপালে থাকে তো ভদ্রভাবে খেতে পারবে—মেয়েটীর ভার যদি তুমি নেও তো এজন্মের মত নিশ্চিন্ত হই। তোমার ছেলে এখানে আছে বলে মনে করোনা, যে আমার মেয়ের সঙ্গে তার কোর্টশিপ চলছে

মেয়েকে কলেজেই পড়াই আর বোর্ডিংএই রাখি, বাড়ীতে অনাচার ঘটানোর পক্ষপাতী আমি নই। শীঘ্র মতামত জানিয়ে নিশ্চিন্ত করে দিও।

শ্রীরমাপতি মিত্র

যথা সময়ে তাঁর ঈপ্সিত উত্তর এল। জগমোহন খুব উদার ভাবে জানিয়েছেন

প্রিয় রমাপতি,

বহুদিন পরে তোমার চিঠি পেলাম। তোমার খবর আমি প্রায়ই নিয়ে থাকি। কারণ হাজারিবাগ অঞ্চলে যে যায়, এসে বলে, রমাপতি বাবু কনট্রাক্টরের বাড়ীর আতিথ্য যত্ন ও সমাদরের কথা। আমি শুনে মনে মনে হাসি।—থাক্।

প্রভাত বাবাজী তোমার কাছে আছে, বড় সুখের কথা। ছুটির আগে আমাকে লিখেছিল, ছুটি হলে হপ্তা দুয়েক পরে সে কুমিল্লায় আসবে—এ দু হপ্তা সে দেশ দেশ ঘুরে বেড়াতে চায়। আমি অমত করিনি, কারণ ছেলে এখন বড় হয়েছে, মনের খোরাকও চাই। এখনকার ছেলে পিলেরা আর ছুটি হলে আমাদের মত পুকুরে ঝাঁপিয়ে, বাজা রেখে ভাত খেয়ে, বাইচ খেলে, দাঁড় টেনে আমোদ বা তৃপ্তি পায়না—এসব গেঁয়োমি। তারা চায় 'ট্রাভ্‌ল' আর 'রিফ্রেস' হ'তে। দেখছ তো পাড়াগাঁয়ে থাকি বলে, মতটাও আমার পুরোণো বা পচা নয়।

সেদিন যে মোটর এ্যাক্‌সিডেন্ট হয়েছিল তাও 'বিধিলিপি' দেখ্‌ছি। না হলে এত দেশ থাকতে হাজারিবাগে যাওয়ার মন হবে কেন? আর ঘটনাটা তোমার লোকটীর সামনেই বা হবে কেন? এযে হতেই হ'ত। হিন্দু যখন, তখন অদৃষ্টকে তো মানতেই হবে। তাই আমার ঘরের লক্ষ্মী খুঁজতে প্রভাতকে অতদূরে যেতে হয়েছে।

তার পরে আসল কথা বলি। আমার ছেলেটীর বদলে তুমি তোমার মেয়েটী আমাকে দেবে লিখেছ, এর চেয়ে সুখবর আর কি হতে পারে? আজ বহুদিন আমি বিপত্নীক—সুতরাং লক্ষ্মীছাড়া—বহুদিন পরে বুড়ো বয়সে তুমি আমাকে লক্ষ্মীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা কর্‌বার লোভ দেখিয়েছ। আমি একটু আভাস পেয়েই অনেকখানি লোভ করেছি—বুড়ো বয়সে চাকর বাকরের ভরসায় আর থাকতে পারিনা—ইচ্ছে করে ছোট বেলায় মার কোলের ছেলের মত শান্ত ভাবে, নিরুপদ্রবে জীবনের বাকী দিন ক'টা কাটিয়ে যাই। "আজি বড়ই শ্রান্ত আমি—ওমা কোলে তুলে নে না।"

বিপত্নীক হয়ে মাতৃহীন শিশু চারটীকে যে কী করে মানুষ করেছি তা অন্তর্য্যামী জানেন! বড় হয়ে মেজ ছেলে প্রভাস জাপান যেতে চাইলে, সেজ প্রণব বল্লে দেশে কিছু হবে না বাবা—বিলেত থেকে টেলিগ্রাফি শিখে আসি—সেও গেল। প্রভাতকে বল্‌লাম তুই বা কেন বাকি থাকিস্ বাছা—তুইও হনলুলু কি নিউজীল্যাণ্ড ঘুরে আয়। প্রভাত তখন এম, এ পড়্‌ছে বল্লে "সবাই গেলে চল্‌বে কেন বাবা? ওরা আসুক তো সুবিধা হলে আমি যাব। আপনাকে দেখবারও তো লোক চাই। প্রভাস ও প্রণব ফিরে এসেছে—এখন ছোট প্রশান্ত যেতে চাইছে। কিন্তু প্রভাত যাওয়ার নামও করে নি আর। তোমার মেয়ে খারাপ হবেনা শিক্ষা দীক্ষায়—তাই আমার যে প্রভাত আমারই নিজের উন্নতির দিকটাও দেখ্‌লে না, তাকে তোমার মেয়ে দিয়ে তার জীবন ও আমার সংসারের গোড়া বাঁধতে চাই। অগ্রাণের প্রথমে যেদিন পাবে লিখো—আমি ছেলে নিয়ে হাজির হব।—

প্রভাতকে আমার চিঠি দেখাবে। আমি জানি, আমার ইচ্ছাই তার ইচ্ছা—সুতরাং সে অমত করবে না। তুমি আমার প্রীতি নিও। প্রভাত ও মা লক্ষ্মীকে আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। বেহান্‌কে নমস্কার দিও। ইতি—

শ্রীজগমোহন দে।

রমাপতি যখন এই চিঠি পড়ে শেষ কর্‌লেন, তখন তাঁর আর সে আনন্দ একা মনে ধর্‌ছিল না। প্রথমেই তাঁর মনে হোল শতদলকে এবার বলা যাক্—কিন্তু আবার ভাবলেন, যেমন তিনি তাঁকে সংসার বিরাগী বলেন, তেমনি দেখিয়ে দেবেন যে উদাসী হয়েও, তলে তলে তিনি মেয়ের জন্যে কেমন সুপাত্র ছেঁকে তুলেছেন। শেষে ঠিক হোল প্রভাত যাওয়ার আগে তাকে যখন তার বাবার চিঠিখানি দেখানো হবে, তখনই সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হবে যে প্রভাত শুধু পথ থেকে কুড়িয়ে আনা অতিথি নয় সে এবাড়ীর ভাবী জামাতা। মীনার মুখখানি মনে পড়্‌ল—

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়্‌ল একদিন তিনি প্রভাতকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন বলে, সে যেন অভিমান করেই তাঁর কাছে আসেনি। অনুপস্থিতা মেয়েকে সম্বোধন করে তিনি বল্‌লেন "ওরে বেটি! তোর ঐ মান এবার আমি এমন জিনিস দিয়ে ভাঙব যে তুই আর কোনো দিন মান করে থাক্‌বিনে।"

ক' দিন থেকেই প্রভাত 'যাব' 'যাব' করছে—অফিস তার খুলে গিয়েছে, আর থাকা চলেনা কোনমতেই। রমাপতিবাবু ঠিক করুলেন জন কয়েক বন্ধুলোক নিমন্ত্রণ করে প্রভাতকে তাঁর ভাবী জামাতা বলে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। আর ওই সঙ্গে অমনি প্রভাতকেও তার বাবার চিঠিখানি পড়্‌তে দিয়ে তার মতামত জেনে নেবেন।

বাইরে তিনি প্রকাশ কর্‌লেন যে প্রভাত তাঁর বন্ধু-পুত্র। তাকে একটা বিদায় ভোজ দেওয়া একান্তই কর্ত্তব্য। শতদল তাঁর স্বামীকে খুব ভালমতই জান্‌তেন; সুতরাং বিস্মিত হবার কিছু পেলেন না. এ রকম ভোজ তো নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেদিন রমাপতিবাবু নিজের কাজ থেকে খুব সকাল সকাল ফিরে এলেন। উপযুক্ত ছেলে শুভ্রাংশুর সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক কর্‌লেন যে যদিও প্রভাতের বাবা সব বিষয়ই তাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, তবুও বিয়ের কথা পাকা হবার আগে, প্রভাতের একবার মীনাকে দেখা দরকার। যাতে করে বাড়ী গিয়ে প্রভাত তার বাবাকে ভাবী বধূ সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে পার্‌বে। কিন্তু মীনাকে দেখান যায় কি করে? দেখ্‌লে প্রভাত যে অরাজী হবে, তা নয়; যে মেয়ে মীনা, ঘুণাক্ষরেও যদি এ চক্রান্তের আভাস পায় তো আর তাকে ঘর থেকে বের করাই যাবে না।

অনেক ভেবে ভেবে শুভ্রাংশু বল্‌লেন "গান শোনাবার নাম করে তাকে ডাকা যাক্। এতে তো আর অরাজী হবার কোনো কথা উঠ্‌তে পারে না।"

রমাপতিবাবু এতক্ষণ ঠিক মত 'হাল' ধরে এসে, তাঁর নিজের মেয়ের কাছে যেন হার মেনে যাচ্ছিলেন। কারণ মীনা তাঁর একমাত্র আদুরে মেয়ে। শিক্ষার সঙ্গে, তার দৃঢ়তা মিশে তাকে সকলের কাছেই একটু আলাদা করে রেখেছিল। তাইতে রমাপতিবাবু ভয় পেয়ে যাচ্ছিলেন। শুভ্রাংশুও যে ছোট বোনটার কথা মোটেই জানতেন না এমন নয়। কিন্তু তিনি একেবারে 'হাল' ছেড়ে দেন নি।

লোক জন এসে পড়্‌ল। শুভ্রাংশু মীনাকে নিয়ে আস্‌বার জন্য গেলেন। প্রায় মিনিট পনের পরে তিনি মীনাকে নিয়ে ফির্‌তে রমাপতিবাবু হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লেন। রমাপতি বাবুরই সমবয়স্ক ও সহকর্ম্মী দয়ালবাবু মীনাকে বল্‌লেন "মা, মিনু, তোমার ত একটী গান শুন্‌তেই আমরা এসেছি, যদিও তার পরে খাওয়া দাওয়ার একটা কথা, আছে।" মীনা একটু হাস্‌লে। বল্‌লে "কাকাবাবু, গান যে আমার কত ভাল হয়, তা তো আর আমার নিজের জান্‌তে বাকি নাই-তবে আপনারা যে এই গান শুনেই 'ভাল' বলেন, সে শুধু ভাল গান শোনেন নি বলেই।"

"হোক্ মা তাই-ই হোক। তোমার কচি মুখে তুমি যা গাইবে তা-ই আমাদের ভাল লাগবে। অমৃতম্ বাল ভাষিতম্।"

এক বাড়ীতে থাকা সত্ত্বেও প্রভাত সেই একদিন ছাড়া মীনাকে আর দেখেই নি। তাও সে গাড়ীর সামনের 'সীটে' ছিল বলে ভাল করে দেখার সুযোগই হয়নি। আজ সামনা-সাম্‌নি মীনাকে দেখে সে একটু চম্‌কে গেল ও মনে মনে বল্‌লে এদের বুঝি সবই সাহেবী কায়দা? অনূঢ়া, তরুণী কন্যা, সকলের সঙ্গেই বুঝি মেলা মেশা করে? হবেও বা!"

অচেনা এক তরুণীর আসার সঙ্গে ঘরে অত লোক থাকতেও প্রভাত লজ্জায় ঘেমে উঠ্‌ল। বাতাস চলাচল না হলে যেমন দম বন্ধ হয়ে আসে, তার ঠিক সেই অবস্থা হয়ে এল। উঠে গিয়ে একটু মুক্ত বাতাস পাবার জন্য সে যেন অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। শেষ পর্য্যন্ত, থাক্‌তে না পেরে সে সবার অলক্ষ্যে বাইরে যেতে চাইল, কিন্তু রমাপতি বাবুর দৃষ্টি প্রভাতের ওপরেই ছিল। সে বাইরে আসতেই তিনি তাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার বাবার চিঠিখানি পড়্‌তে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে বাইরে এসে দাঁড়ালেন মীনার গান তখন আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, তারই প্রথম লাইনটা বারে বারে এসে প্রভাতের কাণে ঢুক্‌ছিল, মনে নয়।—

গান আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে প্রভাতের চলে যাওয়া অবধি তার চোখে কিছুই এড়ায়নি। তাকে এড়িয়ে চল্‌বার এই সুস্পষ্ট নিদর্শনে কুঞ্চিত ভ্রূ তার আরো কুঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল। সে কিন্তু বাইরে গেয়েই চলল—

"ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি
পরমোৎসব রাতি।"

(ক্রমশঃ



ভারতবর্ষ—চৈত্র—১৩৩৭

এসংখ্যায় একখানি উপন্যাস "রক্তের টান" শেষ হইয়াছে। কেদারবাবুর "আই হ্যাজ" এবং বহুকাল পরে শরৎবাবুর "শেষ-প্রশ্ন" আবার দেখা গেল। "বিপত্তি" কিন্তু পূর্ব্ববৎ পুরাদমে চলিতেছে।

ছোট গল্পের সমষ্টি এ সংখ্যায় মাত্র তিন। প্রথম গল্প শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকারের "বাজীকর।" গোড়া হইতে শেষ অবধি করুণ রসসৃষ্টির প্রয়াসে রচনাটি জমিয়া উঠিতে পারে নাই। আর্থিক অভাবে মানুষকে যে দারুণ কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তারই কতকগুলি সকরুণ বার্ত্তা ও দু'একটী ভাঙা ভাঙা চিত্র। কৌশলের অভাবে কোনটাই তারিফ করিবার মত হইয়া উঠে নাই।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীজগৎ মিত্রের "বিংশ শতাব্দী।" সুপ্রাচীন-পন্থী ও অতি নবীন-পন্থীর জীবনধারায়, মত ও পথে যে সুগভীর বৈষম্য থাকে তারই একটী সকৌতুক ছবি লেখক বেশ লঘু হাতে অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু স্থানে স্থানে রঙ ও রস যেন অপরিমিত;—ইহাতে সৌন্দর্য্য একটু ক্ষুণ্ণ না হইয়া পারে নাই। যেমন—

"মোহিত গম্ভীর স্বরে বলিল "চট্‌বেন না বাবা, পাত্র সন্ধানে আছে।" "পিতা বলিতেছেন * * * আমার বাড়ীতে হিঁদুর বাড়ীতে 'দভ্?" আর এক জায়গায় "জানো আমি হিঁদুর সন্তান, স্কুল মাষ্টার?" মাষ্টার মহাশয়দের প্রতি এমন নির্ম্মম বিদ্রূপ কেন? ইহা কি কেবল অহেতুক কৌতুক না মূলে কোন দুঃখ-স্মৃতি ..ভূত?

তারপর এমন মস্তিষ্কহীন স্বল্প মাহিনার স্কুল মাষ্টার কি খুঁজিলে মেলে যিনি মেয়ের উদ্বাহে বরপণ দিতে ব্যাকুল হ'ন? না দিলে ভাবেন, প্রাচীন প্রথার একটী বিশিষ্ট অঙ্গের হানি ঘটিতেছে?

লেখকের রসসৃষ্টির শক্তি আছে; প্রকাশ ভঙ্গীও বেশ এবং রচনাটিতে একটু বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়।

তৃতীয় গল্প শ্রীঅরুণময় সেনগুপ্ত এম-এ ইঃর "নির্ব্বাচন।" একটী বিশেষত্ব বর্জ্জিত অসম্পূর্ণ রচনা—না-মঞ্জুর করিলে পাঠকগণের ভাগ্যে পাঠের দুর্ভোগ ঘটিত না।

এ সংখ্যায় ভ্রমণ আছে একটী ডাঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম-এ ইঃর "চক্রধরপুর!" সিংহভূম জেলার এই স্থানটি ও তৎসন্নিহিত অপরাপর দর্শনীয় স্থানগুলির সংক্ষিপ্ত খবর ইহাতে মেলে। রচনাটিতে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস দু'এক যায়গায় পরিস্ফুটই বলিতে হইবে। তবে মোটের ওপর পাঠে তেমন আমোদ হয় না।

এগুলি ছাড়া আরও একটী রস-রচনা আছে—শ্রীসুধাংশু কুমার হালদার আই-সি-এসের "মৃগদাবের মনস্তাপ।" কিন্তু ভারতবর্ষ যখন এটিকে "জাতকের" পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন, তখন ইহা বৌদ্ধগণের অবশ্য পাঠ্য ও পণ্ডিত-গণের অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্য এবং একটা নূতন সৃষ্টি বৈকি।

বাগবাজারের "নীলুখুড়ো" তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র-মহলে স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনা ও বিচিত্র কর্ম্মবলে চিরস্মরণীয়। তিনি এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া হাওড়ার পোল পার হইতেই যে কাণ্ড ঘটাইয়াছিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মুখে আজও সে কর্ম্ম-মাহাত্ম্য শোনা যায়। .আর এক "খুড়ো" তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া প্রয়াগ ঘুরিয়া কাশী হইতে "মৃগদাব" বা সারনাথ অবধি গিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের যে দারুণ মনস্তাপের কারণ হইয়াছিলেন, রচনাটির রসভাগ তাহাই। এই "খুড়োটিও" "নীলু খুড়ো" অপেক্ষা যে বুদ্ধি বিবেচনা ও কর্ম্মমাহাত্ম্যে কম নয়—রচনাটিতে তার পরিচয় ও বার কয়েক অরসিকের মত "সে অনেক কথায়" আভাষ মেলে। যাহা হউক, "খুড়ো ভাইপোর" ব্যাপার—রস আছে!

এ সংখ্যায় ভারতবর্ষ পাঁচটি ও পরিশেষে একটী ছয়টী কবিতা ছাপিয়াছেন।

ষষ্ঠ কবিতাটি কবি উমাদেবীর তিরোধানে শ্রীনরেন্দ্র দেবের হৃদয়োচ্ছ্বাস। বাংলার কবিতা পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট উমা দেবীর পরিচয় নিষ্প্রোয়জন। শ্রীনরেন্দ্র ইঁহাকে "বান্ধবী" "সখী" রূপে দেখিতেন। তাই শ্রীনরেন্দ্র খেদ করিতেছেন—

"* * * পেয়েছিনু যে মধুর স্নিগ্ধ পরিচয়
হে বান্ধবী জানি তাহা নহে ভুলিবার * * *"

তারপর "* * * আবার যেদিন টানিয়া আনিল মোরে তবদ্বারে সখী।"

কবি নিরঙ্কুশ কিন্তু চক্ষুষ্মান তাই—

"তথাপি দেখিয়াছিনু সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া
আনন্দ চঞ্চল প্রাণ দুলিছে কাঁপিয়া।"

ইহা এক বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যার আঁধারে যখন "কাব্যের কূজন ল'য়ে দু'জনে "নিভৃতে গুঞ্জন করিতেছিলেন, তখন কবির চোখে পড়ে। কিন্তু মোরা অন্ধ হে কবি—

দেখেছিলে কার—ওসে কার প্রাণ সর্ব্বাঙ্গে দুলিতে ?

এই হৃদয়োচ্ছ্বাস শেষে গিয়া একেবারে মিলের জন্য কাগজে মাথা ঠুকিয়াছে—

"মুকুল ঝরিয়া গেল ফলে না চুমিতে
রজনী গন্ধার ডাল লুটালো ভূমিতে !"

ফল ফলিলে মুকুল তাতে যে চুমা দেয় এ উপমা অভিনব, অনুপম ও বড় মধুর। ইহাই শ্রীনরেন্দ্রের বিশেষত্ব। রজনী গন্ধার ডাল মাটিতে লুটাইতে দেখিয়া কবি খেদ করিয়াছেন ; কিন্তু সে খেদের কোন কারণ নাই ! একটা কাটি পুঁতিয়া সে ডাল আবার খাড়া করা চলে। ভাগ্যে ভারতবর্ষ কবিতাটিকে পরিশেষে ছাপিয়াছেন ! নতুবা পাঠকমহলে কি কাণ্ড যে ঘটিত ভাবিতেই গা ছম্ ছম্ করে।

চারখানি রঙিন ছবিতে এবার অঙ্গ শোভার আয়োজন করা হইয়াছে।

প্রথম ছবি শ্রীযুক্ত সারদা উকীলের 'অন্নপূর্ণা'। শিব অন্নপূর্ণার দ্বারে ভিক্ষা মাগিতেছেন। ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা। কাজেই শিবের চেহারা কঙ্কলাশের মত। তিনি অন্নপূর্ণার সম্মুখে যেমন করিয়া হাত তুলিয়া, পা বাঁকাইয়া বসিয়া আছেন তাতে তাঁর ভাঙের নেশাটা যে বেশ একটু চড়িয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। বোধ করি শিল্পী যখন শিবকে আঁকিতে ছিলেন তখনই নেশার মাত্রাটা একটু বেশী ছিল। দেবতারা সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াও বাহু দিয়া জানু চুলকাইতে পারেন, কিন্তু পা' দুখানার দৈর্ঘ্য বর্ণনা আজ অবধি কোথাও শোনা যায় নাই। তবে এই ছবিটি দেখিয়া একটা আন্দাজ পাওয়া যায়—হাঁ, লম্বা বটে। এবং যে দিকে ইচ্ছা সেদিকে তাহা বাঁকানো যায়। আর অন্নপূর্ণার কটিদেশ ও তদোর্দ্ধে বক্ষতট যেন কুঁজার সরুগলা ও পেট।

দ্বিতীয় ছবি "শ্রীযুক্তা হাসিরাশি দেবীর।

'ওরে, ও শ্বেত করবী !
—আজি কি সখী ভাঙলো ঘুমঘোর ?"

এক বিলাতি পুতুল শ্বেতকরবীর ডালের আড়ে ফোটা করবীকে আঙুলে চাপিয়া নীরবে ঐ কথাগুলি বলিতেছে ! ছবিখানি আড়ষ্ট।

তৃতীয় ছবি "শ্রীযুক্ত কুলজারঞ্জন চৌধুরীর লক্ষ্মণ ও সীতা।" দণ্ডকারণ্যের ব্যাপার ভয়াকুলা সীতা লক্ষ্মণকে বিপন্ন রামের সাহায্যে যাইতে বলিতেছেন। আর লক্ষ্মণ-সেনও হাত নাড়িয়া বলিতেছেন না—না—না। অবশ্য সীতার ও লক্ষ্মণের ছবি দেখিয়া তা বোঝা যায় না, আন্দাজে ধরিয়া লইতে হয়। ধানকী লক্ষ্মণ বীর ছিলেন ; কিন্তু তিনি যে ভাবে ধনুর্দ্ধারণ করিয়া সীতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তাতে মনে হয়, ধনুকটি ফেলিতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যান।

চতুর্থ ছবি "শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মজুমদারের দিনের শেষে" দুইটি পশ্চিমা মজুর ও মজুরণী মাটি কাটিয়া সম্ভবতঃ ঘরেই ফিরিতেছে। মজুরটির কাঁধে আবার একটী খোকা—খুকীও হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের চাঁচর কেশ ও চিকন বেশ দেখিয়া মনে হয়, যেন ছবি আঁকাইতেই দুজনে বাহির হইয়াছে। গায়ে একটুও মলিনতার ছাপ নাই, মুখে চোখে দেহে শ্রমশ্রান্তির আভাষও দেখা যায় না। এমন না হইলে আবার ছবি !

রুচির কথাও একটু আছে এই যে বাঙালী শিল্পীরা বাংলার নরনারীর মধ্যে সৌন্দর্য্যের উপাদান খুঁজি[illegible] না—তাঁদের পছন্দ উৎকলবাসী অথবা সাঁওতা[illegible]

অবাঙালী। বাঙালী শিল্পীদের ইহাই বাঙালীত্ব। তাঁরা ঘর ছাড়িয়া পরের দিকেই চোখ দিয়া থাকেন।

প্রবাসী চৈত্র - ১৩৩৭

প্রবসীর এই সংখ্যা প্রবন্ধ গৌরবে অতুলনীয়। ইহা ছাড়া রবীন্দ্র নাথের দুইখানি চিঠি রাশিয়ার শিক্ষা সম্বন্ধে ও গ্রামবাসীদের প্রতি উপদেশ আছে।

গল্পরস পিপাসুগণের জন্যও দুইটি উপন্যাস ও চারটি ছোট গল্প আছে। উপন্যাস দুইটি পূর্ব্বের "মহামায়া" ও "অপরাজিত।" মহামায়া এই সংখ্যায়ই সমাপ্ত; কিন্তু অপরাজিত যে ঠিক কোন অবস্থায় তা বুঝা গেল না:— নীচে "ক্রমশ:" বা "সমাপ্ত" কোনরূপ নির্দ্দেশই নাই; ইহার সমাপ্তি ও ক্রমান্বয় পাঠকের বুদ্ধির উপরই নির্ভর করিতেছে।

গল্প চারটির মধ্যে প্রথম গল্প শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের "দীপশিখা ও তৈল।" বর্ত্তমান যুগের দীপশিখা যন্ত্র ও তার তৈল মানুষ। মানুষের সবটুকুর ইন্ধনে এই বিশাল শিখাটি লেলিহান জ্বলিতেছে। যারা ইহাকে জ্বালাইয়াছে তাদের কাছে হৃদয় মূল্যহীন—হৃদবৃত্তিগুলিকে তারা উপেক্ষা করিয়া চলে—এই কথাটি লেখক একটী মিলের গল্পে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিসের মিল তা অবশ্য বলেন নাই, অবশ্য সে দরকারও নাই। Propagandaর উদ্দেশ্য বুঝানো লইয়া কথা। কিন্তু গল্পটি তারিফ করিবার মত নয়।

মাঝে একটু সৃষ্টি রহস্য আছে। আর এক যায়গায় লোক বলিতেছেন "× × × সহসা তরঙ্গশীর্ষ বিদীর্ণ হইয়া গেল। জলধির মধ্য স্থলে জাগিয়া উঠিল—একখণ্ড শ্যামল ভূমি। তিনি যেন অমৃতরূপিণী রমা,—প্রসন্ন হাস্যে মঙ্গলাশীষ বিলাইয়া তৃষ্ণার্ত্ত সৃষ্টির বিশুষ্ক প্রায় অধরে ইত্যাদি।"

তারপর তাঁর "রুক্ষ প্রান্তরে প্রথম অর্ঘ্য রচনা করিল নব-অঙ্কুরিত দুর্ব্বাদল।" ব্যাপার ভূতত্ত্বের—কিন্তু সিন্ধুর তামসাচ্ছন্ন অন্তর তল হইতে যে ভূমি খণ্ড বাহির হইয়া আলোর তোরণ তলে দাঁড়াইল তার বর্ণ কি শ্যামল? আর "তৃষ্ণার্ত্ত সৃষ্টির বিশুষ্ক প্রায় অধর" বস্তুটি কি? সৃষ্টি যদি তৃষ্ণার্ত্ত হয় তবে "রচনাও" চাতকের মত "স্ফটিক জল" বলিয়া কণ্ঠ বিদীর্ণ করিতে পারে। তারপর ঐ ভূখণ্ডের জন্মের পূর্ব্বেও যে সৃজন লীলা নিশিদিন চলিতেছিল। জলধির গর্ভে অতি ক্ষুদ্র দেহী প্রাণীর দেহ স্তরে স্তরে পুঞ্জিকৃত হইয়া ভূমিকে সহসা জাগাইয়াছে। তা হইলে সৃষ্টির বিলুপ্ত প্রায় অধরে নয়, লীলা রসাতুর অধরপুটেই। তবে এ কথা গুলিকে "কবিত্বের প্রয়াস" বলিয়া উপেক্ষা করা যাইতে পারে। এই কবিত্বের মতে "তৈল" কথাটি কয়েক বার বড় অস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যেমন "ভূমি লক্ষীর পরমায়ু প্রদীপে নিরন্তর তৈল প্রদান" "পৃথিবীর তৈল বিন্দু" ও "বুকের তৈলবিন্দু পোষণে যাহার পরিপুষ্টি"—এত তৈলাধিক্য ভাল নয়।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "হারজিত।" একটী রস রচনা। দাম্পত্য কলহের কাণ্ড —রসটুকু ক্রুদ্ধা পত্নী ও শান্ত পতির কথোপকথনে মন্দ জমে নাই। কিন্তু কলহের কথাগুলি সকল সময় মনে হাসি-উৎসের দরজা খুলিয়া দেয় না।

তৃতীয় গল্প শ্রীদীনেশচন্দ্র গুপ্তের "মেঘ ও রৌদ্র।" দীনেশচন্দ্র কর্ণেল সিমসন হত্যামামলার প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত আসামী. গল্পটি বেশ ঝর ঝরে ভাষায় লিখিত। লেখ-কের সংযমও আছে। সুযোগ পাইলে তিনি কথা শিল্পেও নিপুণতা লাভ করিয়া যশার্জ্জনে সক্ষম হইতেন।

গল্পটি পুলিশের দারোগা নাম ধেয় কর্ম্মচারীর একটী চরিত্র চিত্র। দারোগা বাবু কেমন ক্ষণে ক্ষণে সূর্যের প্রচণ্ড তেজেরও মেঘের মত ছায়া ফেলিয়া আত্ম প্রকাশ করেন—নিম্নস্থ বা জনসাধারণের সঙ্গে ব্যবহারে তিনি প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড এবং উপর ওয়ালা বা শ্বেতাঙ্গের কেবল মাত্র নাম শ্রবণেই সন্ত্রস্ত শান্ত ও ভূমি বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়েন—লেখক একটী ঘটনায় তাই অঙ্কিত করিয়াছেন। মনে হয় গল্পের নামটি "দারোগা চরিত" হইলেই বেশ খাঁজে খাঁজে বসিয়া যাইত।

চতুর্থ গল্প শ্রীঅপূর্ব্বমণি দত্তের "পুরুষস্য ভাগ্যং।" ভাল হয় নাই।

প্রবন্ধগুলির মধ্যে শ্রীনীরদ চন্দ্র চৌধুরীর "বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষ"। প্রবন্ধটি আর কিছু না করুক পাঠকের মনে একটু উত্তেজনার সৃষ্টি করিবে। এই হিসাবে ইহা মাসিক সাহিত্যে স্থান না পাইয়া কোন সংবাদ পত্রে বাহির হওয়াই উচিৎ ছিল।

প্রবন্ধটির আগাগোড়াই উষ্মা ও শ্লেষ। বাঙালী জাতির প্রকৃত শক্তি যতটা না থাক তার হাঁক ডাক, প্রাদেশিকতা বোধ ও শক্তির গর্ব্ব আছে তার অপেক্ষা চতুর্গুণ এবং সেই কারণে সে ভারতের অপরাপর প্রদেশকে ছোট করিয়া আপনাকে তাদের হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এরূপ হওয়া কেবল জাতির জীবনে কেন কোন ব্যক্তির জীবনেও বড় ভয়ের। কেননা বৃথা গর্ব্ব উন্নতির পরিপন্থী। প্রবন্ধকার তাঁর এই উক্তি সমর্থন করিতে দেশবন্ধু রবীন্দ্র নাথ, প্রমথবাবু প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীগণের রচনা ও উক্তি হইতে অনেক বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। এমন কি দেশবন্ধুর তদানীন্তন পার্শ্বচর সুভাষবাবুকেও উপেক্ষা করেন নাই, তাঁরও বাক্যাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে।

কিন্তু গৌরব প্রকাশ সকল সময়েই যে অহিত ঘটায়-উন্নতির পথে বাধা একথা বলা ভুল। কোন্ জাতি না আত্মগরিমার ধ্বজা তুলে? অরে "প্রাদেশিকতা বোধ" কি কেবল বাঙালীরই "মর্ম্মে জড়িত?" এ কথা একবারে মিথ্যা যে—"ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে স্থানীয় বৈশিষ্টকে আকড়াইয়া ধরিয়া স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবার ইচ্ছা বড় একটা নাই।" "বড় একটা" যে আছে তা তিনি এই প্রবন্ধেরই এক যায়গায় স্বীকার না করিয়া পারেন নাই—"আসামীদের জন্য আসাম, বিহারীদের জন্য বিহার ইত্যাদি" "তাহার অতি জাজ্বল্য মান ও অপ্রীতিকর প্রমাণ," তবে একথা বলার সার্থকতা কি? যাক্, প্রবন্ধটি বিশদ আলোচনার স্থান আমাদের নাই, এবং তার আবশ্যকও বোধ করিতেছি না।

এসংখ্যায় তিনখানি রঙিন ছবি দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ছবি "রাজকুমারী— প্রাচীন চিত্র হইতে।"

দ্বিতীয় ছবি "আর ভূত কর্তৃক অঙ্কিত—সিরাজ।" বেশ লাগিয়াছে।

তৃতীয় ছবি শ্রীসারদা "উকীলের—ঘুঘু।" এই সুন্দর ঘুঘু দম্পতিকে কয়েকমাস পূর্ব্বে মডার্ণ রিভিউতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে। অবশ্য তাতে ক্ষতি নাই, সুন্দর সৃষ্টি চিরদিনই আনন্দের।

বসুমতী—ফাল্গুন—১৩৩৭

এ সংখ্যায় গল্প-উপন্যাসের মহা বন্যা। একসঙ্গে চারখানি উপন্যাস—"মাটির স্বর্গ," "ধর্ম্মদাস," "রহস্যের খাসমহল," "জীবনস্বপ্ন" ও "বিদায়-বাণী" কে বাহির হইতে দেখিয়া পাঠকগণ নিশ্চয়ই হতভম্ভ হইয়া গিয়াছেন! এ যেন বড় লোকের বাড়ী ভোজের আয়োজন। এখন অসুখ না করিলেই মঙ্গল।

গল্পও আছে পাচটি। প্রথম গল্প শ্রীচরণদাস ঘোষের "মনের কথা।" নাম শুনিয়া কেহ যেন গল্পটিকে পড়িতে আপত্তি না করেন। ইহা লেখকের মনের কথা নয়—গল্পের নায়িকার পাতানো নাম। এক অসহায়া বিধবার প্রতি গাঁয়ের মোড়ল কেমন নির্ম্মম অত্যাচার করিতে পারে, তার নামে কলঙ্ক দাগিয়া দেয় ও গ্রামবাসীরা নির্লজ্জের মত সেই রক্তযজ্ঞে যোগ দেয় তারই কাহিনী। আর সেই সঙ্গে কলঙ্ক কথায় অবিশ্বাস করিয়া কেহ তাকে মুখে ক্ষমা করিলেও অন্তরে অন্তরে যে তার প্রতি "মারমুখো" হইয়া থাকে, তারও একটু ঘোরালো রঙের ছবি আছে। রচনাটির ঐটুকুই কৌশল, কিন্তু তেমন কুশলতা পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই।' গল্পের ভাষা বেশ ঝরঝরে কোথাও অনাবশ্যক আড়ম্বর নাই।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীধীরেন্দ্র নারায়ণ (কুমার) রায়ের "প্রগতি।" শত চেষ্টায়ও ইহার মধ্যে গল্পত্ব খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল বিদ্বেষবহ্নি জ্বালা। বসুমতী নিশ্চয় এটিকে ভাল গল্প বলিয়া ছাপিয়াছেন। অতএব ভালই।

তৃতীয় গল্প শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রক্ত-সন্ধ্যা।" মনে পড়ে কয়েক মাস পূর্ব্বে লেখকের একটী গল্প পড়িয়াছিলাম —"জাতি-স্মর।" সেই গল্পটির সহিত ইহার মিলটা এত স্থূলে যে মনে হয়, লেখক এই ধরণের গল্প বেশী লিখিলে চিত্তাকর্ষক রচনায় সক্ষম হইবেন না। এ রচনায় কিছু নূতনত্ব আছে বটে, কিন্তু ঘটনায় প্রাচীনত্ব অনেক খানি। তা ছাড়া বিবৃতিতে বৈচিত্র্য নষ্ট হয়! বক্ষ্যমান গল্পটি বেশ হইয়াছে - ব্যক্তির জাতিস্মরতায় যাঁদের বিশ্বাস গভীর, বিশেষ করিয়া তাঁদেরই ইহা প্রচুর আনন্দ দান করিবে

কলিকাতার বহুবাজারের এক মুসলমান মাংসওয়ালা একদিন তার দোকানে কালিকটের এক নবাগত পর্ত্তুগীজ ব্যবসায়ীকে মাংস ক্রয়েচ্ছু হইয়া উপস্থিত দেখিয়াই —"ভাস্কো-ডা-গামা—ভাস্কো-ডা-গামা—"বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে মাংসকাটা বড় ছোরা দিয়া খুন করিয়া ফেলে। এযুগে এই ঘটনার সঙ্গত কারণ পাওয়া

যায় না। আসামী তার পূর্ব্বজন্মের কাহিনী টানিয়া আনিয়া এক নিরপেক্ষ দর্শকের কাছে ইহার একটা কৈফিয়ৎ দেয়। কাহিনীটুকু স্থানাবশতঃ দেওয়া সম্ভব হইল না। ইহার শেষে লেখক বলিতেছেন "ক্ষণকাল পরে সান্ধ্য নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া ভাস্কো-ডা-গামার জাহাজ-হইতে দামামা ও তূর্য্য বাজিয়া উঠিল।

"সূর্য্য তখন সমুদ্রপারে অস্তমিত হইয়া অন্য কোন নূতন গগনে উদিত হইয়াছে—"অর্থাৎ ভারতে মুসলমান রাজত্বের যবনিকাপাত হইল। গল্পের উদ্দেশ্য সেই ছবিটিকে আঁকা। পরিশেষে একটী কথা—মুসলমানগণ কি পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করেন?

চতুর্থ গল্প শ্রীপ্রভাবতী দেবী (সরস্বতীর) "পরাজয়।" গল্পটি মৌলিকতায় পরিপূর্ণ—যেমন—"সাতকড়ি মণ্ডলের বৃদ্ধা মা যখন মারা গেল, তখন বাঁশ যোগাড় করার জন্যই সাতকড়ি বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিল।"

"মৃতা মায়ের জন্য শোক করার অবকাশও তাহার অদৃষ্টে জুটিল না। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।" মায়ের জন্য শোকটা গৌণ করিয়া বাঁশ যোগাড়কে মুখ্য উদ্দেশ্য করায় মৌলিকতা নাই কি? লিপিকৌশল আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—সাতকড়িকে মাথায় হাত দিয়া বসাইয়া ব্যস্ত করায়। কেননা রাখাল তাঁকে বাঁশ দিতে চায় না। আবার সাতকড়িকে এই বাঁশ রাখালের ঝাড় হইতে যোগাড় করিতে হইবে—যদিও হরিদাস মাটি গাঁয়ে আর বাঁশের ঝাড় আছে কিনা, সে কথার কোন উল্লেখ নাই। যাহা হৌক, রাখাল স্বেচ্ছায় সাতকড়িকে বাঁশ না দিলেও, সে ঝাড়ের বাঁশ কাটাইল সাতকড়ির স্ত্রী মন্দা রাখালের অনুপস্থিতিতে। যদি বলেন, স্বামী যেখানে হার মানিল, স্ত্রী কিসের জোরে জয় লাভ করে? বুদ্ধি? না। গায়ের জোর? না। মুখের জোর? তাও না। তবে কি? মন্দার বিবাহের পূর্ব্বে রাখালের সঙ্গে, একটু কি বলে, প্রেমের সম্পর্কের জোরে। মন্দা বাঁশ আনিল বটে কিন্তু রাখালও ছাড়িবার পাত্র নহে। মাঠ হইতে ঘরে ফিরিয়া যখন তার ঝাড়ের বাঁশ লইয়া গিয়াছে শুনিল তখন "দপ্ করিয়া তাহার মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল।" সে অবস্থা-পন্ন কৈবর্ত্তের সেকেণ্ড ক্লাশ অবধি পড়া ছেলে। "কি সুচেহারায়, কি স্বভাব চরিত্রে, কি বলে বুদ্ধিতে সে সকলকে পরাজিত করিয়াছিল।" কাষেই একটা মোটা লাঠি লইয়া রুগ্ন, শীর্ণ, দরিদ্র, নিরন্ন, শোকার্ত্ত সাতকড়ির মাথা ভাঙিতে আসিল। কিন্তু পথে মন্দার সহিত তার দেখা। মন্দা ঘাট হইতে বাসন মাজিয়া ঘরে ফিরিতেছে। আর যায় কোথায়? তখন রীতিমত হম্বীতম্বী, কথা কাটাকাটি। পরিশেষে মন্দা বলিল—"মনে পড়ে রাখালদা সেই একদিন" ব্যস্। এ যেন জোঁকের মুখে লবণ, পোড়ার উপর স্পিরিট,—রাখাল অমনি জলবৎ শীতলং। তখন আর লাঠির দরকার নাই। রাখাল শরীর চর্চ্চা করে, তাই "হাতের লাঠিটাকে" কাছে নয় "দূর নদীবক্ষে ছুড়িয়া ফেলিল।" কেন এমন হইল? একটু উদ্ধৃত করিলেই কারণটা চট করিয়া বুঝিয়া ফেলা যায়—

"সে আজ অনেক দিনের কথা।

"সেদিন মন্দা ছিল মন্দা ও রাখাল ছিল রাখাল। তাহাদের মাঝখানে সাতকড়ি আসিয়া দাঁড়ায় নাই, মন্দা সেদিন মন্দা বউদি, রাখাল—রাখাল ঠাকুরপো. হয় নাই।"

সাতকড়ির এতবড় অপরাধের মূলে ছিল মন্দার পিতা চরণদাসের কন্যা-পাত্রস্থা করার তাগিদ। ইহাতে সাতকড়ির কোন হাত ছিল না বরং রাখালকেই দোষ দেওয়া যায়। কেননা সে মন্দার পিতার অনুরোধের কোন স্পষ্ট জবাব দেয় নাই। কাজেই চরণ দাস সাতকড়ির হাতে কন্যা সম্প্রদান করে। প্রেমিকরা জানেন প্রেম অন্ধ—সুবুদ্ধি কৈবর্ত্তের ছেলে রাখাল তাই সাতকড়ির সর্ব্বনাশে মন দিল। সে নানা মতে সাতকড়িকে জব্দ করিয়া তার বাস্তখানি পর্য্যন্ত নীলাম করাইল। তখন সাতকড়ি ম্যালেরিয়ায় মরণাপন্ন। সে বেচারী ভিটার মায়ায় কাঁদিয়া আকুল। কিন্তু মন্দা বড় শক্ত মেয়ে। তার সহিত রাখাল পারিবে কেন? সে রুগ্ন স্বামীকে লইয়া গরুর গাড়ীতে চড়িয়া গাঁ ছাড়িল—আর রাখাল?

"সেই দুইহাতে আর্ত্ত বুকখানা চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ দিয়া একটী মাত্র শব্দ বাহির হইল, "মন্দা"—এখন পাঠক বলুন, পরাজয় কার? গল্পটির সুরু হইতে শেষ অবধি মৌলিকতায় পরিপূর্ণ নহে কি? 'ক' লিখিতে যেমন বয়ে আঁকড় দিলেই চ'লে তেমনি একটি প্লট

যোগাড় করিয়া সেটাকে "develope" করিলেই তা গল্প। আর মাসিক সাহিত্যের বাজারে পয়লা নম্বর, দোস্‌রা নম্বর ছাপ পরিয়া তা বেশ বিকাইয়া যায়।

পঞ্চম গল্প—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "রাজা।" বাঙালীর নয়, এক বীর সাঁওতাল যুবকের প্রেমের গল্প। বাঙালীরা ত গল্পে বহুকাল হইতেই প্রেমে পড়িতেছে, তাদের গল্প পুরাণো। এদিকে যদিও কিছুকাল ধরিয়া সাঁওতালিরাও প্রেমে পড়িতেছে, তথাপি ইহার মধ্যে একটু নূতনত্ব আছে; এবং তা' এই যে, নায়ক ভোজুল মাঝি বীর। লেখক বলিতেছেন—"কি জানি কেন, কিন্তু ইহা সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বত্রই (পাঠকগণ পৃথিবীর ইতিহাসটা একবার মনে মনে আলোচনা করুন ও আশ-পাশে নজর রাখুন) দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে সত্য সত্য বীর, সে একজন গভীর প্রেমিক।" যে সত্য সত্যই প্রেমিক, সে কিন্তু বীর নয়:—তাই "ভোজুল" নায়িকা "মোতিয়ার" জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল, যদিও দেয় নাই। প্রেমের এতবড় নিদর্শন তিন লোক খুঁজিলেও পাওয়া যায় না যে! নায়ক বীর বটে কিন্তু তার জাত-জন্মের ঠিক ছিল না; মোতিয়ার বাবা তাকে ভালুকের গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করে। এই বীরকে ভালুকে মারিতে পারে নাই, কিন্তু মারিয়াছিল কন্দর্প একটা একটা করিয়া পাঁচটি শরেই। তাই বীর ভোজুল মোতিয়াকে ভাল-বাসিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু গল্প ত জমানো চাই, সেজন্য মামুলি প্রথামত তার হাতে কন্যাদানে পিতার ঘোর আপত্তি। কিন্তু প্রেমের টান জোয়ারের টানকেও হার মানাইয়া দেয়। তার সঙ্গে আবার প্রেমিক যদি বাঁশী বাজাইতে জানে ত ঘরে থাকে কার সাধ্য। "ভোজুল নদীর ধারে বটতলায় বাঁশী বাজাইত, সে সুর শুনিয়া মোতিয়াও ঘরে থাকিতে পারিত না," কলসী না লইয়াই সে ছুটিয়া যাইত। অবস্থা যখন এমনি সঙ্গীন তখন, বলিতে হৃদয়ে বীর রসের সঞ্চার হয়—"বীর হৃদয়ের প্রেম কোন বিবেচনার অপেক্ষা রাখে না। তাই এক গভীর রাত্রিতে মোতিয়া ভোজুর হাত ধরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।" Dramatic situation! লেখকের বাহাদুরী ত এইখানেই! আরও বাহাদুরী যে এই যাওয়ায় বীরের বীরত্বের চেয়ে মোতিয়ার আকুলতাকে স্পষ্ট অক্ষরে লিখিয়া তার Effectটুকু ভোজুলের উপর দেওয়া। তারপর শুনুন—"সর্দ্দার সকল কথাই বুঝিল; কিন্তু সেও ছিল বীর।" অর্থাৎ "হাম্ ভি মিলিটারী, তুম্ ভি মিলিটারী," ফলে—"সেইদিন হইতে সে মোতিয়া মরিয়াছে—এই কথাই—" থাক, আর না। অন্নভোজী বাঙালী, বীরত্বের কাহিনী আলোচনা করিয়া প্লীহা বিদীর্ণ হইতে পারে।

এই বীরত্ব কাহিনী, মাঝখানে এমন এক অদ্ভুত ঘটনায় রূপান্তরিত হইয়া গেল যে পরিশেষে ভোজুল একটী স্ত্রীলোকের মাতৃহীন শিশুকে কোলে করিয়া "ধেই ধেই" করিয়া নাচিতে লাগিল। "মোতিয়া ক্রীড়াচঞ্চল দুটি শিশুর উপর সোহাগ প্রসন্ন দৃষ্টি মেলিয়া অবাক হইয়া রহিল।"

"* * * ভোজু তখনও নাচ থামায় নাই। সে মোতিয়াকে ডাকিয়া কহিল, "দেখ, একেই আমরা রাজা বানাব ইত্যাদি।" আর ঐ প্রসঙ্গে গল্পের নামকরণও হইয়া গেল। তারপরই পত্রিকায় প্রকাশ ও প্রখ্যাতি লাভ! এই নির্জ্জীব রচনার পরিশেষে একটু তৃপ্তিও বোধ করি আসিয়াছিল। কত মেকী যে এমনি করিয়া চলে।

এ সংখ্যায় একখানি নক্সাও আছে—"বায়স্কোপের সিনারিও" লেখক শ্রীঅপ্রকাশ গুপ্ত। নামটি পাওয়া নয়, দেওয়া। কেননা সখ্ করিয়া আর কে নাম রাখে—"ডুবে থাক্।" নামের দিক দিয়া যাই হোক, নক্সাখানিতে সত্যই কতকগুলা ভাবিবার কথা আছে। কেবল ভাবিলেই চলিবে না। বাংলার ছায়া-চিত্রের যথার্থ উন্নতি সাধনে যত্নবান হওয়া একান্ত দরকার। বাংলা ছায়া-চিত্রের বৈশিষ্ট্য হইতেছে মাথা-মুণ্ডহীন কতকগুলা অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ আবার তার মধ্যেও নিতান্ত আজগুবি এমন সব কাণ্ড থাকে ও অভিনেতাগণ এমন বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী সহকারে সে গুলিকে অভিনয় করেন যে দেখিলে সারামন "ঘিন্ ঘিন্" করে। এতবড় একটা art এর মূলে যে সাধনা ও শিক্ষার দরকার, বোধ করি তার অভাবই ইহার কারণ। কিন্তু স্বয়ম্ভুদলের সেদিকে দৃষ্টি নাই।

তারপর, নক্সাকার এক যায়গায় বলিতেছেন "আমি লেখক" আর—এক যায়গায় বলিতেছেন "গল্প উপন্যাস রচনায় আমি আনাড়ি এ দুইয়ের কোন্‌টা সত্য? তবে তিনি লেখেন কি? নক্সা? নক্সা আঁকিয়া যদি কেহ

"চিত্র শিল্পী" হইতে পারে, তাহা হইলে অবশ্য নক্সা লিখিয়াও "লেখক" হওয়া সোজা ও স্বাভাবিক। সে পদ তাঁর বহাল রহিল। তবে যদি কোন সমালোচকের তীব্র কথা তাঁর পৃষ্ঠে পড়ে, ত বিচলিত হইবেন না। শিক্ষার শৈশবে এমন কতদিন হয়ত গিয়াছে যেদিন—যাক্ পুরাতন কথা। বোধকরি কোন নির্দ্দয় সমালোচকের নির্ম্মম আঘাতের স্মৃতি মনে করিয়াই তিনি লিখিয়াছেন—"সমালোচকবর্গ কুক্কুরের মত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে—দারিদ্র্য-মূর্ত্ত ছেঁড়া কানি, ছেঁড়া জুতার লোভে রসনা মেলিয়া লম্ফ দেয়" চমৎকার উপমা! একবারে পায়ের তলা ও আঁস্তাকুড় হইতে তিনি এ ভাবটিকে কুড়াইয়া আনিয়াছেন। দৃষ্টির এই অধোগতি দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়।

এ সংখ্যায় রঙিন্ ছবি আছে—তিন খানি। প্রথম ছবি স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর প্রতিকৃতি।

দ্বিতীয় ছবি শ্রী সতীশচন্দ্র সিংহের "প্রদোষে।" শিল্পী দুইটি অর্দ্ধনগ্ন নারীকে একবারে পাহাড়ের ডগায় বসাইয়া দিয়াছেন—বোধকরি সন্ধ্যাতারার effect দেখাইতে। বিবশা না করিলে Art যে ফোটে না এবং দৃষ্টিও ঠিক-মত খোলে না।

তৃতীয় ছবি শ্রীভুবন মোহন দের "ঐ বুঝি বাঁশী বাজে—।" (রবীন্দ্র নাথ) হায় কবি! বাঁশী তোমায় উন্মনা করিয়া ছিল, আর সেই কথা আজ শিল্পীকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া কি কাণ্ড যে ঘটাইল—যার ঠেলায় শ্রীরাধার বাম হাতের কব্জি ও তালু ডান হাতে রূপান্তরিত হইয়া গেল! আর বসুমতীর কৃপায় একদম এই খোদার উপর খোদ্‌কারী সকলকে নিরুপায়ের মত দাঁড়াইয়া দেখিতে হইল। ইহাকেই বলে creative genius,

অদৃষ্টের পরিহাস

শ্রীসুজাতা দেবী

১

রাত্রি দশটা, মিহির টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া পড়িতেছিল। হঠাৎ টেবিলের উপর টাইম-পিস্ ঘড়িটার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় বইটা মুড়িয়া রাখিয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল, রাত দশটা? এখনও বীথির আসার সময় হ'লনা—মিহিরের কথা শেষ হইতেই বীথি মিহিরের প্রিয়তমা পত্নী এক মুখ হাসি লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল,—বারে তুমি সবই আমার দোষ দেখ? এবার মিহির চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বীথির নিকট আসিয়া বলিল, আচ্ছা বীথি তোমার প্রাণে কি একটুও দয়া মায়া নেই? আমি সেই থেকে যে, হাঁ করে বসে আছি, আর ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি কখন তুমি আসবে বোলে—আর তুমি দুষ্টুমী করে কেবল রাত করবে? বীথি হাসিয়া ফেলিল—ও হরি এই জন্য রাত দশটা অবধি বই হাতে করে বসে থাকো? মন তাহলে একটুও বইএর দিকে থাকে না, আমি কোথায় ভাবি যে তোমার সামনে এম, এ, পরীক্ষা—শীঘ্র শীঘ্র তোমার কাছে গিয়ে তোমার পড়ার ক্ষতি কোরব না আর তুমি বুঝি এই করো? বীথি মুখে কাপড় দিয়া জোরে হাসিয়া উঠিল। মিহির বীথির হাসি দেখিয়া লজ্জিত হইয়া বীথিকে কাছে টানিয়া বলিল, যাঃ কেবল তুমি হাসতেই থাকো আর ত কিছুই বোঝনা এদিকে তোমার বাবা লিখেছেন পরশু তোমায় বেনারস নিয়ে যাবেন কাল তোমার দাদা আসছেন, আমার যে কি অবস্থা হবে তা জানিনা। বীথি খানিক-ক্ষণ চুপ করিয়া বলিল, কেন কি অবস্থা হবে শুনি? তোমাকে ত আর একা ফেলে যাচ্ছি না, মা রয়েছেন, তোমার বৌদি রয়েছেন—কথায় বাধা দিয়া মিহির বলিল, যতই মা বৌদি' থাকুন, তোমার অভাব ত কেউই পূরণ কর্ত্তে পারবেন না তাত বোঝ? এবার বীথি স্বামীর হাতটা নিজের হাতের উপর রাখিয়া বলিল—এসময় কি আমার তোমার কাছে থাকা উচিৎ? তা'হলে যে তোমার পড়ার কত ক্ষতি হবে? মিহির জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তুমি কাছে না থাকলেই আমার

পড়ায় মোটেই মন যাবে না বীথি, সেই চার বছর আগে তোমায় আমায় মিলে ছিলাম তারপর এর ভিতর সেই বিয়ের পর কিছুদিনের জন্য ছাড়া আর একদিনও তোমায় ছেড়ে থাকিনি,এই আমাদের বলতে গেলে প্রথম বিচ্ছেদ।— কি করে আমি তোমায় ছেড়ে থাকি বল তো? বীথি তাহার স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। স্বামী-স্ত্রী কি মিষ্টি সম্বন্ধ। এর ভিতর কোন ব্যবধান নাই ছাড়া-ছাড়ি লুকোচুরী কিছুই নাই। কিন্তু বীথি ভাবিতে-ছিল সকলই স্বামী স্ত্রীর ভিতরই কি এইরূপ! তাহার মত স্বামী প্রেমে সুখী কি সকলেই? হঠাৎ কি ভাবিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। তাহারই বাল্যবন্ধু মতীর কথা আহা কি দুঃখী সে! বীথিকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মিহির বলিল, চুপ করে রইলে বীথি কথা বলো, বলে দাও কি করে তোমায় ছেড়ে থাকবো—।" এইবার বীথি আস্তে আস্তে স্বামীর কথার উত্তর দিল, তুমি পুরুষ মানুষ এত অধৈর্য্য হলে কি চলে? কর্ত্তব্যের খাতিরে অনেক কিছু কর্ত্তে হয় আর তুমি সামান্য দু তিন মাস আর আমায় ছেড়ে থাকতে পারেবে না? যদিও আমি একথা বলে তোমায় বুঝাচ্ছি আমারও যে কত কষ্ট হবে তোমায় ছেড়ে থাকতে তা বলে জানাবার নয়।--মিহির অধৈর্য্যভাবে বলিয়া উঠিল, আচ্ছা বীথি বলতে পারো যে স্বামী স্ত্রীকে প্রকৃত প্রাণ দিয়ে ভালবাসে সে কি করে ইচ্ছা করে সেই স্ত্রীকে ছেড়ে দূরে সরে থাকে? আমার মনে হয় তারা প্রকৃত ভালবাসে না বা বাসতে জানেনা। বীথি মৃদু হাসিয়া বলিল ধেৎ দূরে দূরে থাকলেই কি ভালবাসে না, কত লোক যে অসুবিধার জন্যও স্ত্রীকে দূরে রাখতে বাধ্য হয় তা বলে কি তারা নিজের স্ত্রীকে ভালবাসে না? এর কোন অর্থ নেই। মিহির বলিল, না বীথি তুমি জাননা আমি এমন অনেক লোককে জানি স্ত্রীকে ঝঞ্ঝাট মনে করে দূরে ফেলে রাখে আর সুবিধা অসুবিধার খোঁজও লয় না মাঝে মাঝে একটা চিঠি লিখে দেয় ব্যস। নেহাৎ বিয়ে করেছে খেতে পরতেও দিতে হবে তাও সামান্য কিছু দিয়ে নিশ্চিন্ত, নিজে দিব্য স্ফূর্ত্তিতে কাটায়। বীথি এবার স্বামীর কথায় বলিল, হাঁ্যা আমারও মনে পড়েছে মতীর কথা আহা তার কথা ভাবলে সত্যিই ভারী দুঃখু হয়। মিহির খাটের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল; কেন তার বর কি তাকে ভালবাসে না? বীথি মিহিরের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল —ঠিক যে ভালবাসে না—তাত বলতে পারি না তবে তোমার মত কিছুই নয়। মিহির উৎসুক ভাবে বলিল, কেন মতী ত বেশ মেয়ে। সেই যে তোমাদের বাড়ীতে দেখে ছিলাম সেই মেয়েটি ত? বীথি বলিল হাঁ্যা সেই ফর্সা রোগামত মেয়েটী। আহা বেচারা তার বাবা মার কি আদরেরই মেয়ে ছিল অসময় বাবা-মা মারা গিয়ে পর্য্যন্ত ত মতী দুঃখী হয়েই ছিল। আবার বিয়ে হয়েও সে একদিনের জন্য সুখী হতে পাচ্ছে না। মিহির বলিল—অসুখীর কারণটা একটু খুলে বলই না শুনি? বীথি বলিল, সুখী আর অসুখী সমস্তই অদৃষ্টে করে না হ'লে আমিত মতীর চেয়ে কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নই—আমারই বা রূপে গুণে সমস্তদিকে ভাল বর হ'ল কেন আর মতিরই বা হয়েও হ'লনা কেন? তবুত মতীর বাবা যা টাকা কড়ি রেখে গিয়েছিলেন সামান্য খুব না হলেও দু তিন হাজার ত বটেই। সেই সব টাকা ব্যয় করে মতীর বৃদ্ধ ঠাকুর্দ্দা নাতনীর বিয়ে দিলেন আর আমার বিয়েতে ত তোমরা একটা আধলাও নাও নাই, হাঁ্যা বুঝতাম মতীর চেয়ে আমি সুন্দরী তাও ত নয়। মিহির মৃদু হাসিয়া বলিল, মতীর চেয়ে তুমি সুন্দরী কিনা তা আমি জানিনা তবে আমার চোখে বীথির মত সুন্দর আর কারুকেই ঠেকে না। বীথি এবার মিহিরের প্রতি রোষ ভরে তাকাইয়া বলিল, ঠাট্টা হচ্ছে নয়? মিহিরও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করিল ঠাট্টা নয় তোমার গা ছুঁয়ে বলছি আমি যে দিন থেকে তোমায় পেয়েছি আমার ত মনে হয় তোমার মত দেখতে কেউ নয়—রং ফর্সার কথা বলছি না, চেহারার কথা। আমার আজকাল প্রত্যেকের খুঁত্ কাটা স্বভাবে দাঁড়িয়েছে। বীথি লজ্জিত হইয়া বলিল যাও— তুমি ভারি দুষ্টু। মিহির বীথির একটা হাত নিজের বুকের উপর রাখিয়া বলিল, আচ্ছা আমিত চিরকালই দুষ্টু তুমি এখন লক্ষী মেয়ের মত মতীর কথাগুলি বল দেখি? বীথি বলিতে লাগিল মতীর ঠাকুর্দ্দা বুড়ো হয়েছেন বলে যাতে তাড়াতাড়ি মতীর বিয়ে হয়ে যায় তাই কচ্ছিলেন। শেষে দূর দেশে একটী ভাল ছেলে আছে শুনে সেখানেই ঠিক কল্লেন। আত্মীয় বন্ধু কত বারণ কল্লে কিছুতেই শুনলেন না। বল্লেন হলই বা দূরদেশের লোক অমন ভাল ছেলে দেখে দিচ্ছি পয়সাও যথেষ্ট আছে দুই হলেই হ'ল। মতীর

বর ডাক্তার। উপরে যতটা শুনতে ভাল ভেতরে তত মোটেই ভাল নয়। মতীর বর কি একটা যায়গায় প্র্যাকটিস করে, মতী থাকে তার শাশুড়ীর কাছে ফরিদপুর জেলার মধ্যে কি একটা যায়গায়। মতীর শাশুড়ী বুড়ি, তায় রোগা। শোনাইত যায় স্বভাবতঃই রুগীরা রাগী বেশী। মতীর শাশুড়ী দেওয়া-থোয়ার কথা নিয়ে অনেক কথা শুনায়, আবার মতী বাসান মাজা বাটনা বাটা এসব কিছুই জানেনা তারজন্য তার শাশুড়ী গালাগাল আরও কত রকম যন্ত্রণা দিতেও ছাড়ে না, এই ত তার শাশুড়ীর কাছে ব্যবহার। স্বামী তার প্রথম প্রথম বেশ ভাল ব্যবহারই কর্ত্ত, পরে সেও যখন বাড়ী আসে নানা কথায় মতীকে খিট খিট করে বিরক্ত করে বলে—তুমি সৎশিক্ষা যাকে বলে সে সব কখনও পাও নহি এরকম জানলে কি আমি তোমায় কি বিয়ে কর্ত্তাম—কি করে শাশুড়ী প্রভৃতির সেবা কর্ত্তে হয় তাও তুমি এতবড় মেয়ে হয়ে শেখনি ইত্যাদি। আবার মতী যদি বলে, বড্ড তোমার কাছে যেতে ইচ্ছা করে, আমায় নিয়ে যাবে ? তা ওর বর স্পষ্ট মুখের উপর বলে দেয় যে আমার মা ভাই বোনের যত্ন জানে না আর গৃহস্থালীর বিষয় কিছু জানেনা তাকে আমার কাছে নিয়ে গিয়ে আমি লোকের কাছে মাথা হেঁট কর্ত্তে পারবো না। আর যদি এসব না শিখতে পারো তা'হলে তোমার ঠাকুর্দ্দার কাছেও তোমায় এক দিনও পাঠাব না, সেখানে গেলে তোমার শিক্ষা আরও খারাপ হয়ে যাবে। বীথি এই পর্য্যন্ত বলিয়া থামিয়া পরক্ষণে নিজের মনে বলিয়া উঠিল, যাই বলনা বিয়ের পর একেই কারও কথা সহ্য করা যায় না তার উপর স্বামীর শক্ত শক্ত কথা মোটেই সহ্য করা যায় না। যদিও বুঝি মতীর বর সকল বিষয়ে তাদের মনের মত হবার জন্যই ঐ সব বলে, তবুত সে স্বামী ! কেন তুমি যেমন কত মিষ্টি করে আদর করে সব শিখাও তেমন করে কি শেখান যায় না ? ও তা হলে বোধ হয় স্ত্রীর কাছে মান থাকে না শাসনটা ভাল রকম করা হয় না। মিহির বীথির গালটা টিপিয়া বলিল সত্যিই বীথি অনেকে ঠিক ঐ কথাই ভাবে, বৌ ত, কেনা দাসীর সমান। তাকে যত প্রশ্রয় দেওয়া যাবে ততই সে মাথায় চড়ে বসবে। ছিঃ কি ভুল ধারণা তাদের বীথি বলিয়া যাইতে লাগিল, আবার শোন মতীর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা, শরীর খারাপ বলবার উপায় নেই—দুবারের বেশী তিনবার যদি বলে যে শরীরটা বড় খারাপ তা হলে তার রক্ষা নেই, নানান কথা শুনতে হয়। আর একটা কথা শোন মতী যখন যে কাজটা না কর্ত্তে পারল বা কোন একটু অন্যায় কাজ করে ফেল্লো ত সব কথা মতীর বরের কাছে পৌঁছে দেয় তার শ্বশুরবাড়ীর লোক। কি বিশ্রী কাণ্ড ! ছিঃ ভদ্রলোকের বাড়ীতেও যে কত ইতরের মত কাণ্ড আছে তা বলা যায় না। মতী কত কাঁদলে কত দুঃখু করলে। মিহির বলিল, আহা বড় কষ্ট ত বেচারীর। পার্শের ঘরের ঘড়িতে টং টং করিয়া দুইটা বাজাতে মিহির বীথিকে বলিল, বাবাঃ অনেক রাত হয়ে গেল এস এবার শুয়ে পড়া যাক্।

(২)

আজ বীথির বেনারস যাওয়ার দিন। বীথির দাদা লইয়া যাইতে আসিয়াছেন।—মিহির সকাল বেলাতেই কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছিল। বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময় কতকগুলি জিনিষ লইয়া ফিরিয়া আসিলে তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, সকালেই কোথায় বেরিয়েছিলি হিরু ! মিহির বলিল, একটু কাজ ছিল মা। মাতা শুভা দেবী বলিলেন, তোর কি শরীরটা ভাল নেই রে মুখ এত শুখ্নো দেখাচ্ছে কেন ? মিহির মাথা হেঁট করিয়া বলিল শরীর ত বেশ ভালই আছে মা। মা কি ভাবিয়া মৃদু হাসিলেন। মনে পড়িল তাঁহার যৌবনের কথা, ঠিক মিহিরের ন্যায়ই তাঁহার স্বামীও পিত্রালয় যাইবার নাম হইলেই কিরূপ গম্ভীর হইয়া থাকিতেন কত বাধাই না দিতেন, এক মিনিটও তাঁহাকে চক্ষুর আড়াল করিতে পারিতেন না। পুত্রের ভাব দেখিয়া শুভা দেবী বলিলেন, দেখ হিরু আমার মনে হয় বৌমার দাদা ছেলেমানুষ ওর সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়—কি জানি কখন কোন বিপদ ঘটে জিনিষ পত্র সব নিয়ে। আমার ইচ্ছা তুইও সঙ্গে যাস্ কি বল ? সেই সময় মিহিরের বড় বৌদি আসিয়া পড়ায় মিহির কোন উত্তর করিল না। মিহিরের বৌদি'ই উত্তর দিলেন, হ্যাঁ মা ঠাকুর পোর কি এসময় যাওয়া উচিৎ আর শ্বশুর না লিখলে ও কেন যাবে ?—মিহিরের স্নেহময়ী জননী পুত্রের প্রতি চাহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। এবার মিহির উত্তর করিলেন, অসীম ত বলছে পারবে

মা, যদি না পারে আমিও সঙ্গে ষ্টেশন থেকেই ফিরতে পারি—শুভা দেবী পুত্রের মন ভাব বুঝিয়া বলিলেন, দূর পাগল ছেলে যদি সঙ্গে যাস ত বাড়ী যাবি না? নাই বা তারা লিখ্‌ল সব বারে কি লিখতে হবে তবে যাবি—না হলে যেতে নেই? মিহির তাহার বৌদির প্রতি চাহিয়া বলিল তা হ'লে বাধ্য হয়েই আমায় যেতে হবে কি বলো বৌদি'। বৌদি' দেওরের কথায় না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

* * * *

মিহির একটা সুটকেসে নিজের সামান্য কাপড় জামা গুছাইয়া বীথির বড় ট্রাঙ্কটা গুছাইতে আরম্ভ করিল। চারিদিকে একরাশ জিনিষ ছড়াইয়া বসিয়া মিহির দেখিতে লাগিল কোন জিনিষ বীথির নাই। ঠিক সেই সময় বীথি গৃহে প্রবেশ করিয়া মিহিরের মজা দেখিয়া হাসিয়া বলিল এসব কি ব্যাপার? মিহির গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিল, বাঃ তুমি ত দেখছি আস্ত বোকা বেশ ট্রাঙ্ক গুছিয়েছ,—দরকারী জিনিষ ত কিছুই নেই দেখছি। বীথি কোন উত্তর না দিয়া নীরবে স্বামীর কার্য্য দেখিতে লাগিল। মিহির ট্রাঙ্কটা বেশ পরিপাটী করিয়া গুছাইয়া দিয়া বলিল, ছ মাসের জন্য যাচ্ছ তোমার অনেক কিছু জিনিষ দরকার লাগতে পারে, আমায় বলে দাও আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসি। বীথি লজ্জিত ভাবে মাথা হেঁট করিয়া বলিল, আমার কিছুই দরকার নেই আর যা দরকার হবে মা বাবার কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারবো। মিহির একটু হাসিল পরে আপন মনেই বলিল, বীথিটা যে একেবারে বোকা তা জানতাম না, একটুও বুদ্ধি নেই। হাজার মা বাপ দিলেও বিয়ের পর তাঁদের কাছে কিছু চাইতে নেই। তা হলেত স্বামীর অপমান করা হয়ই আর তাঁরাই বা কি মনে করবেন? ভাববেন আমি তোমার কোন খোঁজ রাখিনা। বীথিও স্বামীর কথার-উত্তরে বলিল, তুমি ত এখনও স্বাধীন হও নাই তুমি যে এখনও কলেজ ষ্টুডেণ্ট। মিহির বলিল, বাবাঃ তোমার সঙ্গে কথায় আমি মোটেই পারবো না, আচ্ছা বীথি বলতো আমার কি সাধ যায় না তোমায় কিছু দিতে? যাও ঐ টেবিলের উপর যে জিনিষগুলি আছে নিয়ে এস, এই বড় দুঃখ রইল যে তুমি কখনও কিছু আমার কাছ থেকে চাইলে না। বীথি চট্‌ করিয়া উত্তর দিল, তুমি কি আমার চাইবার মত সময় দাও তার আগেই যে সমস্ত হাজির করো। আচ্ছা বলতে পার নিজে এত কষ্ট করে থেকে হাত খরচের টাকাগুলি সব আমার জন্য খরচ কর কেন? মিহির তাহার বড় বড় সুন্দর চোখ দুটীতে পত্নীর মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, তুমি আর আমি কি প্রভেদ আছে কিছু? বীথি পরাস্ত হইয়া চুপ করিয়া গেল। বীথি মিহিরের কথামত জিনিষগুলি আনিয়া মিহিরের নিকট উপস্থিত করিল। মিহির কাগজের মোড়ক খুলিয়া জিনিষগুলি বাহির করিতে লাগিল। বীথি জিনিষের বহর দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল—প্রায় চল্লিশ টাকার জিনিষ এত টাকা যে কোথা হইতে আসিল? মিহির ত মাত্র পাঁচ টাকা করিয়া মাতার নিকট হইতে হাত খরচ পাইত। শুভাদেবীর স্বামীর মৃত্যুর পরে বিপুল অর্থরাশি তাঁহার হস্তেই পড়িয়াছিল। তিনি টাকাকড়ির বিষয় খুব কড়া ছিলেন একটী পয়সাও বাজে খরচ করিতে দিতেন না—বলিতেন আমার আর কি থাকে ত, ছেলে দুটীরই থাকবে বুঝে চলতে পারলে সাত পুরুষ বসে খেতে পারবে। বীথি দেখিল, মিহির গুছাইতেছে খুব ভাল ভাল আটপৌড়ে সাড়ী, জ্যাকেট সেমিজ ব্লাউজ ইত্যাদি আবার এধারে কোথায় পাউডার সেণ্ট ক্রিম খাম পোষ্টকার্ড যাবতীয় দরকারী জিনিষ। বীথি "থ" হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। হাত বাক্সের ভিতর বাতী দেশালাই হইতে আরম্ভ করিয়া সাবান অবধি গুছাইয়া দিয়া মিহির বলিল, দেখে নাও বীথি আর কিছু দরকার লাগবে কিনা। বীথিত স্বামীর কার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। কই তাহার শ্বশুর বাড়ী আসিবার পূর্ব্বে তাহার মাতাও ত এরূপভাবে গুছাইয়া দেন নাই আর পুরুষ হইয়া কি করিয়া এই সব শিখিলেন? মিহির আবার বলিল, তুমি ত বলবে না জানি এই বাক্সের মধ্যে টাকা দশটা থাকলো যখন যা দরকার লাগে কিনে নিও। বীথি এতক্ষণ পরে বলিল, ভগবান তোমায় কি দিয়ে গড়েছেন বলতে পারো কোনখানে কি এতটুকুও খুঁৎ নেই? মিহির উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাই তুলিয়া বলিল, ওঃ তুমি যে আমায় বড্ড বড় করে তুলছ আমি যে আর তাহলে অহঙ্কারে মাটীতে পা-ই ফেলতে পারবো না।



গ্রাম্য দৃশ্য

শিল্পী—শ্রী নেপালচন্দ্র সেন।

(৩)

আজ মিহিরের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল। মিহির বাড়ী ফিরিয়া বরাবর নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। আজ কেবল তাহার মনে হইতেছিল কতক্ষণে সে বীথির নিকট যাইবে? শুভাদেবী নীরবে আসিয়া বলিলেন, এমন অসময় শুয়ে কেন বাবা একটু বেড়িয়ে এস না গাড়ী ত থামি রয়েছে? মিহির বলিল, না মা আজ আর কোথাও যাবনা শরীরটা বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে। মিহিরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সমীর নাথ আসিয়া গম্ভীর মুখে বলিলেন, কি মিহির কেমন এগ্‌জামিন দিলে—? মিহির উঠিয়া বসিয়া বলিল, ভাল বলেইত মনে হচ্ছে দাদা ?—

সমীরনাথ একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিলেন, তোমার কি শরীর ভাল নেই ?• মিহির উত্তর করিল—হাঁ্যা মাথাটা বড় ধরে উঠেছে। সমীরনাথ তাঁহার শুভ্র বসনা বিধবা মাতার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, মা মনে পড়ে আমার এম্, এ পরীক্ষার পর শরীর কিরূপ খারাপ হয়ে ছিল, আমার মতে হিরু একটা স্বাস্থ্যকর যায়গায় দিনকতক ঘুরে আসুক? মিহির তাহার দাদার কথায় মনে মনে যথেষ্ট অস্বস্তি বোধ করিল—তাহার তখন মনে কেবল বীথির কথাই জাগিতেছিল। আজ দীর্ঘ দু'মাস সে তাহাকে ছাড়িয়া আছে আবার চেঞ্জে যাইতে হইবে? মিহির বলিল, না দাদা তেমন শরীর খারাপ হয় নি চেঞ্জে গিয়ে বাজে পয়সা খরচ করে কি লাভ? শুভা দেবী পুত্রের কথায় মনে মনে হাসিয়া বলিলেন আমার ইচ্ছা হয় সকলে মিলে কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি একঘেয়ে কল্‌কাতা আর ভাল লাগে না মোটেই। সমীর বলিলেন, আমার ত এখন যাওয়া হয় না মা ছেলেদের পরীক্ষার খাতা দেখতে হবে সে নানান ঝঞ্ঝাট। মিহির বলিল, হাঁ্যা অনেক অসুবিধা মা, এখন আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই একেবারে পূজার সময় দেশে গেলেই হবে। মাতা পুত্রের মনোগত ভাব বুঝিয়া কহিলেন বেশ তাই ভাল, কিন্তু সমীর ছোট বৌমাকে আনার কি হবে? তার বাবার ইচ্ছে আর কিছুদিন কাশীতে থাকে।" সমীরনাথ কি ভাবিয়া, হুঁ ভেবে দেখি কি করা উচিৎ বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। মাতাও জ্যৈষ্ঠ পুত্রের অনুসরণ করিলেন। মিহির বিরক্ত হইয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল, ধেৎ কেউ-ই যেন কিছু বোঝে না—মারও ত এমন দিন গেছে, দাদারত কথাই নাই—সকালে বৌদি বাপের বাড়ী গেলে দাদা ছোটেন শ্বশুর বাড়ী বৈকালে বৌ আনতে। মিহির উঠিয়া তাহার বৌদিদির সন্ধানে গেল। এঘর-ওঘর খুঁজিয়া বৌদি কে না দেখিয়া নীচে নামিয়া গেল—ঠাকুর ঘরে যাইয়া দেখিল বৌদি তখন ঠাকুর ঘরে ধূপ-ধুনা জ্বালিয়া সন্ধ্যা বন্দনা করিতেছেন ডাক দিল, বৌদি—? বৌদি নীলা মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন, যাচ্ছি ভাই। মিহির বৌ দিকে সঙ্গে করিয়া একেবারে উপরে গিয়া নিজের ঘরে বসিয়া বলিল, আচ্ছা তোমাদের ব্যাপার কি বলতে পারো? নীলার দেওরের কথায় কিছু আর বুঝিতে বাকি রহিল না। মনে মনে আজকালকার ছেলেদের নির্লজ্জতার জন্য যথেষ্ট বিরক্ত হইয়া সে ভাব গোপন করিয়া বলিল, কেন কি ব্যাপার দেখলে শুনি? মিহির বেশী ভূমিকা না করিয়া স্পষ্টই সোজাসুজি বলিল, বিয়ে যদি দিয়েছই তা'হলে কি বৌকে বাপের বাড়ী ফেলে রাখবার জন্য বুঝি? বৌদি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, কেন বাপু তা বলে কি দুমাসও বাপের বাড়ী থাকতে পারবে না, তোমরা কেবল তোমাদেরই সুখ সুবিধাটা দেখ তাদের দিকেও ত চাইতে হয়? মিহির বিরক্তভাবে বলিল, ও তাই বুঝি দাদাকে ছেড়ে একবেলার বেশী দুবেলা থাকতে পার না অথচ বাপ-মাকে দেখবার সাধও ত মনে মনে যথেষ্ট আছে দেখি। যাক বাজে কথা—বীথিকে আনার দিন কবে ঠিক কচ্ছ বল দেখি? তোমার উপরইত সব ভার কাজেই তোমাকেই বলতে হ'ল। নীলার এখন মোটেই ইচ্ছা নয় যে বীথিকে এই মাসে আনা, তার প্রধান কারণ মিহির যেন দিন দিন বৌ পাগলা হইয়া যাইতেছে বলিয়া, আগে মিহির নাকি বৌদি বলিতে সারা হইত আর বিবাহের পর হইতে মিহিরের বৌদিদির উপর আর কিছুই টান নাই—এই জন্য নীলার মনে বিলক্ষণ বিদ্বেষ ভাব আসিয়া ছিল। ইহা অবশ্য স্বাভাবিকই। এই কারণে নীলার বীথির উপরেই রাগটা বেশী হইয়াছিল, কর্ত্তব্যের খাতিরে ছোট যা বলিয়া লোক দেখান আদরটাও না করিলে নয় তাই বাধ্য হইয়া চুপচাপই থাকিতে হয়। নীলা মিহিরের কথায় ঠাট্টারছলে উত্তর দিল, কেন বীথি না হলে কি তোমার চলছে না? কই আগে ত বীথি ছিল না কেমন করে চলত? মিহিরও ঠাট্টা করিয়া প্রত্যুত্তর

করিল, তখন ত আর ও সবের মর্ম্ম জানতাম না কিনা সেই জন্য। তোমার সঙ্গে খুনসুটী করে তোমাকে বেশ বিরক্ত করে একরকম বাড়ীর মধ্যে দিনগুলো কেটে যেত। এখন ত আর তুমি সে বৌদি নেই, তুমি এখন প্রফেসার গৃহিনী ও পুত্রের জননী হয়ে তোমার আর পাত্তাই পাওয়া যায় না। যাক বাজে কথা বীথিকে যাতে এই কদিনের ভেতর আনা যায় তার ব্যবস্থা কোর ভাই।

(৪)

সংসারে যে কত রকম প্রকৃতির মানুষ জন্মায় তাহার ইয়ত্তাই নেই। এমন কতজন আছে যে নিজে যাহা ভাল মনে করিবে সেটা হাজার খারাপ হইলেও পরের বাধা না মানিয়া তাহাই করিয়া যাইবে, আবার এমনও আছে যে, নিজে যে দোষণীয় কার্য্য করিবে অপরকে তাহা করিতে দেখিলে, তাহাকে তাহার দোষের জন্য তিরস্কার করিতেও ছাড়িবে না। নীলাও ঠিক এই প্রকৃতির মানুষ। মিহিরের কথা শুনিয়া গম্ভীরভাবে স্বামীর নিকট যাইয়া বলিল, শুনছ তোমার ভাই যে পাগল, বলছে যে তার আর দেরী সইছে না বীথিকে এক্ষুনিই এনে দিতে হবে? সমীরনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন এ বয়েসের ধর্ম্মই যে নীনা এইরূপ।" নীলা রাগিয়া বলিয়া উঠিল—তা বলে এতই বা কি বাপু যে দুমাসের বেশী তিনমাস বৌ ছেড়ে থাকলে মাথা ঘুরে যায়? সমীরনাথ সেই একই ভাবে হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, নিজেদের দিক ভেবে কথা বলতে হয় নীলা, আমি মনে করেছি হিরুকেই কাশী পাঠিয়ে দিই ছোট বৌমাকে নিয়ে আসুক। নীলা তাহার গম্ভীর প্রকৃতির স্বামী প্রভুটীকে বিলক্ষণ চিনিত। সহজভাবে এবার সে বলিল, তুমি কিছু বোঝ না এখন বীথিকে আনা আমার মোটেই ইচ্ছা নয়, ছোটঠাকুরপোর দিনকতক কোথাও যাওয়া উচিৎ শরীরও ওর খুব খারাপ হয়েছে। যাক আমি বেশী বলতে চাই না তোমরা যা ভাল বোঝ কোর। সমীরনাথ স্ত্রীর কথায় কোন উত্তর না দেওয়াই ভাল মনে করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। নীলা যে কেন বীথিকে দেখিতে পারে না বিচক্ষণ সমীর নাথ তাহা বুঝিতেন। ধনীগৃহের একটীমাত্র বধূরূপে আসিয়া নীলার যে কত গর্ব্ব ছিল সব বিষয়ে, বীথি আসিয়া তাহার ভাগ লওয়াতে প্রথমত সে খুবই মনক্ষুণ্ন হইয়াছিল, দ্বিতীয়ত তাহার একান্ত প্রিয় দেবরটী তাঁহার অনেক দূরে চলিয়া যাওয়াতে সে অত্যন্ত চটিয়া ছিল বীথির উপরেই। সমীরনাথ স্ত্রীর মন এত সঙ্কীর্ণ দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া কিসে নীলার মন হইতে ঐ সব ঘৃণিত ভাব চলিয়া যায় তাহারই চেষ্টা করিতেন। এমন কত দিন গিয়াছে নীলা বীথির কার্য্যের কত বিষয় খুঁৎ ধরিয়া তাহার নামে স্বামী ও দেবরের নিকট অভিযোগ করিতেও ছাড়ে নাই। যদিও দুইজনে কেহই নীলার কথায় কর্ণপাত করিতেন না! মিহির ত বৌদিদির সম্মুখেই স্পষ্ট হাসিয়া উড়াইয়া দিত, আর সমীর নাথ গম্ভীরভাবে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেন। কত সুখের সংসারে শুধু এই লাগানোর জন্য অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বিদ্বান সমীরনাথের অজানিত নহে! এইজন্য লেখা পড়া-জানা আজকালকার শিক্ষিতা মেয়ে দেখিয়া ভ্রাতার বিবাহ দিয়াছিলেন—রূপও দেখেন নাই অর্থও দেখেন নাই! মাতা তাঁহার স্ত্রীকে যথেষ্ট রূপরাশি ও ধনীর কন্যা দেখিয়া গৃহে আনিয়া ছিলেন কিন্তু ইহা সত্বেও স্ত্রী তাঁহার সব বিষয় মনোমত হয় নাই কেন তাহা তিনিই বুঝিয়া ছিলেন।

* * * *

আজ চারদিন বীথি কলিকাতা আসিয়াছে। মিহিরের ছুটীর দিনগুলো দিব্য স্ফূর্ত্তিতেই কাটিতেছে বীথিকে পার্শ্বে লইয়া। মিহির আজকাল প্রত্যহ স্ত্রী ও ভ্রাতৃজায়াকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হয়, চক্ষু লজ্জার জন্য মাতার নিকটও আব্দার করিয়া বলে, মা তোমাকে একা ফেলে রোজ কি বেড়াতে ভাল লাগে তুমিও চলনা মা? মাতা সস্নেহে পুত্রের মাথায় হাত বুলাইয়া বলেন, তোদের সুখেই আমার সুখ—নেহাত যদি না ছাড়িস্ আমায় সইএর বাড়ীটা একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আয় তারপর তোরা বেড়াতে যা। মিহির কোন দিন সইএর বাড়ী কোন দিন কোন দেবালয় প্রভৃতি দেখাইয়া মাতাকে সুখী করিত। এইরূপে মিহিরের দিন বেশ আমোদেই কাটিতেছে।

আজ সকাল হইতে বীথির শরীর অসুস্থ হওয়ার জন্য মিহির কোথাও যায় নাই। নীচে বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া কাগজ পড়িতেছিল। সেই সময় মিহিরের বন্ধু অজিত আসিয়া উপস্থিত

হইল। অজিত, মিহিরের যে আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না ইত্যাদি বলিয়া ঠাট্টা সুরু করিয়া দিল। মিহির ব্যতিব্যস্ত হইয়া কথা উল্টাইয়া বলিল, আমাদের রেজাল্টের আর কত দেরী বল্‌তো? দুই বন্ধুর কথা হইতেছিল। সেই সময় পিয়ন আসিয়া একটী চিঠি দিয়া গেল। মিহির খামটীর উপরের লেখা পড়িয়া দেখিল, বীথি দেবী। কোন মেয়ের হাতের লেখা। অজিত খামখানা নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, খোল্‌না রে চিঠিটা—নিশ্চয়ই তোর বৌএর কোন ফ্রেণ্ড লিখেছে? মিহির মাথা নাড়িয়া বলিল, উহুঁ বীথির চিঠি সে আগে না খুল্‌লে না পড়লে আমি দেখি না। অজিত বিস্ময় সহকারে বলিয়া উঠিল, কেনরে স্ত্রীর চিঠি স্বামী আগে দেখবে তাতে এত কেন? মিহির বলিল, স্বামী স্ত্রী যে প্রভেদ নয় তা জানি, তবে স্ত্রীবলে কি সে এতই পরাধীন যে নিজের নামের চিঠিটাও সে আগে খুলতে পাবে না। আমি ওসব মোটেই পছন্দ করিনা।

ইহার পর কিছুক্ষণ কথাবর্ত্তার কহিয়া অজিত উঠিয়া গেলে মিহির বীথির নিকট আসিয়া দেখিল, সে শয্যার উপর একলা শুইয়া আছে মুখ তার অত্যন্ত বিষণ্ণ চোখ দুটী খুব লাল। মিহির বীথির কপালে হাত দিয়া বলিল, না জ্বর ত হয় নি, তবে তোমার চোখ এত লাল কেন বলো? বীথি কোন উত্তর না দিয়া উঠিয়া বসিল। মিহির বীথির পার্শ্বে বসিয়া বলিল, কি হয়েছে বলবে না? তুমি কাঁদছিলে নিশ্চয়। ও মা বাবার জন্য মন কেমন কচ্ছে—কই আগে ত কখনও কান্না দেখিনি তবে শরীরে কি কোন কষ্ট হচ্ছে? বীথি লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। কোন উত্তর না পাইয়া ব্যথিত স্বরে মিহির বলিল, আমি কি কিছু দোষ করেছি বীথি? বীথি স্বামীর মুখের প্রতি চাহিয়া কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। মিহির বুঝিল যে কোন বিষয় বীথি গোপন করিতেছে। বীথি স্বামীর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল, না অন্য কিছু কারণ নেই মাথার যন্ত্রণা হচ্ছিল বড় বেশী তাই চোখ লাল হয়েছে। মিহির কিছু না বলিয়া পকেট হইতে বীথির চিঠিটা বাহির করিয়া বলিল, এই নাও তোমার চিঠি পড় আমি এখনই আসছি। মিহির বরাবর মাতার নিকট গিয়া দেখিল, তিনি কুটনা কাটিতেছেন। গম্ভীর ভাবে পুত্রকে নিকটে দাঁড়াইতে দেখিয়া মাতা জিজ্ঞাসু ভাবে চাহিলেন। মিহির এধার-ওধার চাহিয়া মাতার পার্শ্বে বসিয়া বলিল মা তোমার ছোট মেয়েকে কি কোন অন্যায়ের জন্য বোকেছ? শুভাদেবী একটী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—অন্যায়ের জন্য যদি বকি সে হাসি মুখে বলে আর কখনও কেরব না মা, শুধু সইতে পারে না বাপ মাকে কোন কথা বলা। তা বাবা কি করি বল্‌ বড়বৌমার এখনও ছেলেমানুষী বুদ্ধি গেল না যখনই সুবিধা পায় ওর বাপের সঙ্গে ছোট বৌমার বাবার তুলনা দেয়। মিহির মুখে বিদ্রূপের হাসি ফুটাইয়া বলিল ওঃ এই কথা? তুমি কিছু বলনি? তাহলেই হ'ল। ম' তোমার ছোট বৌ এখনও বড় ছেলেমানুষ—বয়সে দিন দিন বাড়লে কি হয় ও সংসারের কিছুই শেখেনি—তুমি ওকে সব শিখিয়ে নিও মা।

(৫)

মিহির উপরে বীথির নিকট আসিয়া দেখিল, সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিতেছে সম্মুখে তাহার একটী খোলা চিঠি। মিহির কোন কথা না বলিয়া চিঠিটা তুলিয়া লইল, দেখিল মতীর চিঠি, সে লিখিয়াছে—

ভাই বীথি

যখন তুমি আমার এই চিঠিটা পাবে আমি তখন অনেক অনেক দূরে পৃথিবীর সহিত দেনা-পাওনা চুকাইয়া কোন এক অজানা পথে শান্তির আশায় ছুটিয়াছি জানি না— আমার অদৃষ্টের শেষ কোথায়? জানি আত্মহত্যা মহাপাপ তবুও আমি সেই কার্য্যে হাত দিলাম। এ পৃথিবীতে আমার দুঃখে সহানুভূতি দেখাবার একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, তাই তোমায় আমার জীবনের দুঃখের কথাগুলো জানিয়ে গেলাম। যদিও জানি তুমি খুবই ব্যথা পাবে আমার শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ পেয়ে। এতদিন সমস্ত কষ্ট নীরবে সহ্য করে এসেছি শুধু বৃদ্ধ দাদুর কথা ভেবে, এ দুনিয়ায় আমি ছাড়া তাঁর কেউ-ই ছিল না বলে। দাদুও চলে গেলেন আমার পথ পরিষ্কার হয়ে গেল। আর কার জন্য এই নিদারুণ যাতনা সহ্য করে বেঁচে থাকবো? কাল আমার স্বামীর কঠোর বাক্যে পূর্ণ এক পত্র পাই। তাতে লেখা, তুমি আমার আশা ছেড়ে দাও আমি কোনদিনই তোমায় নিয়ে সুখী হতে পারবো না—কারণ তোমার গুণ নেই, তুমি এখন শত্রুরূপেই আমার ঘরে আছ, সেই ভয়েই

আমি বাড়ী যাওয়া বন্ধ করেছি। আমার মায়ের আমি এক সন্তান—মা'ও শুধু তোমার জন্যই সন্তানের মুখদর্শনে বঞ্চিত। একদিন ভেবেছিলাম, তোমায় নিয়ে আমি সুখী হতে পারবো কিন্তু তুমি যখন আমার মা ও আত্মীয়স্বজনের সহিত ভাল ব্যবহার না করো তাহা হলে কি প্রকারে আমি তোমায় নিয়ে সুখী হতে পারি ইত্যাদি। যাক ভাই বীথি তবে আর কেন, আমার তুচ্ছ জীবনের জন্য যদি এতগুলি লোক কষ্ট পায় তাহলে কি আমার বেঁচে থাকা উচিৎ? তোমাকে আর একবার দেখার সাধ মনে ছিল কিন্তু না এ পোড়ামুখ আর কারুকে দেখাব না। ভাই পরের মুখের কথা শুনে নিজের স্ত্রীকে না চিনে যে স্বামী স্ত্রীর প্রতি খারাপ ব্যবহার করে তারা কি মনুষ্য নামের যোগ্য? অনেক স্বামীদের এইরূপ মনের ধারণা—নূতন বিবাহের পরেই স্ত্রীরা কেন তাঁদের এবং তাঁদের আত্মীয়স্বজনের মনের মত হয়ে যায় না। একথা তাঁরা বোঝেন না যে তারা বিবাহের আগে বনের পাখীর মতই স্বাধীনভাবে পিতামাতার কোলে মানুষ হয় সংসারের ভাল মন্দ জ্ঞান তাদের হয় না। স্বামীর কি কর্ত্তব্য নয়, স্ত্রীকে আদরের সহিত সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া? মা বা বোন ভাজের উপর স্ত্রীর শিক্ষার ভার দেওয়া কখনই উচিৎ নয়—তাঁরা আগে বৌএর পিতামাতাকে গালি দেবেন পরে তিক্ততার সহিত শিক্ষা দিয়া বলবেন এত বড় মেয়ে করে বাপ মা রেখেছিল শিক্ষা দিতে পারেনি ব্যস ইহাতে কেউ কখনও ভাল শিক্ষা পায় না। মিষ্ট কথায় বনের পশুও বশে আসে। বীথি আমি জানি তুমি যে স্বামীর হাতে পড়েছ তিনি তোমায় সমস্ত অশান্তির হাত হতে উদ্ধার করে চিরদিন নিজের বুক দিয়েই তোমায় রক্ষা করবেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যেন তোমার মত ভাগ্যবতী সকল মেয়েই হয়। এতদিনে আমার চোখের জলের অবসান হ'ল। বিদায়—বিদায় বন্ধু। ইতি—দুর্ভাগিনী তোমার মতী।

মিহির চিঠি পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল এমন ভাগ্য নিয়েও মতী জন্মেছিল। মিহির আপন মনে বলিয়া উঠিল, শুধু মতিই বা কেন? আমাদের দেশে কত শত শত মেয়ে নিরুপায়ভাবে এই পথ অবলম্বন করেছে শুধু এই আমাদের মত অপদার্থ স্বামীর হাতে পড়ে। মিহির দুই হাতে বীথির মাথাটা তুলিয়া নিজের বুকের মাঝে রাখিয়া সান্ত্বনার সহিত বলিল, কেঁদনা বীথি এখন কেবল প্রার্থনা করো যেন সে পরপারে গিয়ে শান্তি পায়। বীথি ধরা গলায় বলিল, মতি যে বড় ভাল মেয়ে ছিল, তাকে তার স্বামী চিনলে না। মিহির বীথির চোখের জল মুছাইয়া বলিল, এ পৃথিবীতে এমন কত লোক আছে যারা ভালর মর্য্যাদা বোঝে না, কি করবে বল, এখন আর কোনই উপায় নেই। সংসার পথ বড় পিচ্ছিল, বড় ভয়ে বড় আস্তে এই সংসারের পিচ্ছিল সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে যেতে হয় তবেই মনুষ্য জীবনের শান্তি। বীথি স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া বলিল, একটা কথা আমার গা ছুঁয়ে বলো হাজার আমার দোষ থাকলেও কখনও আমায় তোমার কাছ ছাড়া করবে না, দোষের জন্য ক্ষমা করবে?

মিহির দুই হাতে পত্নীকে বুকে জড়াইয়া বলিল সেই সত্যই করলাম কখনও তোমায় আমার বুক ছাড়া কোরব না। বীথি মিহিরের হাত ছাড়াইয়া গলায় আঁচল দিয়া ভক্তিভরে স্বামীর পদধূলি লইতে লইতে বলিল, সকল মেয়েরই যেন তোমার মত স্বামী হয়।



জোয়ার-ভাঁটা

শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

সুকুমারের কথা।

খোট্টার দেশে থাকিতাম, ডাল-রুটি খাইতাম, কতরকম কুস্তীর প্যাঁচ শিখিয়াছিলাম, কত বড় বড় পালোয়ানের সঙ্গে লড়াই করিয়াছিলাম, এই সকল কথায় আসরটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। শ্রোতার দলটিও পাইয়াছিলাম ভাল, তাহারা পরম আগ্রহনিবিষ্টচিত্তে বেশ জমাট হইয়া এই সকল কথা শুনিতেছিল। হঠাৎ কে বে-পরদায় ঘা দিল, সরলা বলিয়া উঠিল—আচ্ছা, তুমি কত বড় পালোয়ান দেখি, আমার সঙ্গে পাঞ্জা লোড়্‌বে এস।

কথাটা শুনিয়া ততটা অবাক হইলাম না, যতটা অবাক হইলাম শ্রোতৃবর্গের মুখের দিকে চাহিয়া। এত বড় কথাটায় যে কিছুমাত্র অভিনবত্ব আছে তাহাদের মুখ দেখিয়া তাহা আদৌ বোধ হইল না। সরলা সপ্তদশবর্ষীয়া, তাহাকে যুবতী বলিতে হয় বল, বালিকা বলিতে হয় বল। তাহার বিবাহ হইয়াছিল, স্বামী নিরুদ্দেশ। অপরে বিস্মিত হইল না কারণ তাহারা এ-রূপ ব্যবহারে অভ্যস্ত। আমি দীর্ঘকাল বিদেশে ছিলাম, সুতরাং সরলার ব্যবহার আমার নিকট কেমন ধারা ঠেকিল। কথা বলিয়াই সরলা নিরস্ত হইল না, আমার নিকট অগ্রসর হইয়া তাহার হাতখানা বাড়াইয়া দিল। আমি দুই পা পিছাইয়া আসিলাম। সরলা ছাড়িল না, আমার হাতখানা জোর করিয়া টানিয়া লইয়া তাহার হাতের উপর রাখিল। আমি পাঞ্জা লড়িব কি, আমার পায়ের তলায় মাটী আছে বলিয়া অনুভব হইল না, দাঁড়াইব কোথায়?

এই একদিনের ঘটনা। এমন অনেকদিন অনেক ঘটনা ঘটিল। আর কেহ এরূপ ঘটনায় কুণ্ঠা বোধ করে না। আমি কুণ্ঠিত হই বলিয়াই যেন সরলা দ্বিগুণ উৎসাহে আমাকে লইয়া পড়িল। আমার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়া যাইত—আমি অবশ, আত্মহারা হইয়া পড়িতাম। একদিন সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, আমি তাহাকে কি একটা কথা বলিয়া ফেলিলাম। কেমন করিয়া বলিলাম, তাহা এখন আর মনে করিতে পারি না। সেদিন লজ্জার যে মর্ম্মান্তিক তীব্রতা অনুভব করিয়াছিলাম, জীবনে আর কখনও তাহা করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সে-দিন বুঝিলাম, সরলা বালিকাও নয়, যুবতীও নয়। বালিকার পক্ষে এত বড় সমস্যাটা উপলব্ধি করাই অসম্ভব, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এরূপভাবে তাহার মীমাংসা করা ত দূরের কথা! আর যুবতী হইলে, যৌবনের স্পন্দন কি তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না?

তারপর আমাদের নামে কত কুৎসা রটিল। তাহার কতক আমার কাণে পৌঁছিল। সরলার কাণে কোন কথা পৌঁছিয়াছিল কি না জানিনা, কিন্তু তাহার মুখে কোনদিন সে চিহ্ন দেখি নাই। ইঙ্গিতে একথা তাহাকে জানাইলাম। সে বুঝিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু সাড়া দিল না। স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, একই ফল। আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, আরও পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলাম—যখন আমাদের নামে শুধু শুধু এত বড় একটা কুৎসা রোটেছে, কিছু নয় অথচ শুধু শুধু—

বাধা দিয়া সরলা বলিল—কই, আমাদের কারও গায়ে ত পোকা পড়েনি!

ইহার পর আর কথা চলে না, আমাকে নিরস্ত হইতে হইল।

সরলার কথা

আমার স্বামী ফিরিয়া আসিয়াছেন। দীর্ঘকাল যে তাঁহাকে দেখি নাই, এমন ত মনে হয় না। তাঁহাকে চিরপরিচিতের মত, নিতান্ত আপনার মতই ত বোধ হইল। তাঁহার ব্যবহার পর্য্যন্ত এমন চিরাভ্যস্ত ঠেকিল যে, এতদিন তিনি কোথায় ছিলেন, কেন আসেন নাই, সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে একবারও ইচ্ছা হইল না। আমার স্বামীরও সে সব কথা বলিবার কোন আগ্রহ দেখিলাম না। মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, একথা ভাবিতে ভাবিতে আমার কতবার মনে হইয়াছে, যদি কেহ কখনও সেখান হইতে ফিরিয়া আসে আর আমার সঙ্গে দেখা হয়, আমি তাহাকে স্বর্গের কথা তন্ন-তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু সত্য-

সত্যই কেহ কি তাহা পারে? যদি কাহারও মৃত প্রিয়জন ফিরিয়া আসে, তাহার সহিত প্রাণ খুলিয়া কত কথা কহিবার থাকে, স্বর্গের অলীক কাহিনী কি তখন কাহারও মনে স্থান পায়? আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না, আমার স্বামীও কোন কথা বলিবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করিলেন না, আমাকে বক্ষে তুলিয়া লইতে গেলেন। আমি কালামুখি, স্বামীর বক্ষে স্থান অধিকার করিতে সঙ্কোচ অনুভব করিলাম। বাধা দিয়া বলিলাম—ও কি কর কি?

আমার স্বামী আমার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, তাঁহার চোখে মুখে হাসি। হাসিয়া কহিলেন—কিছুই না, যা কর্‌বার—

আমার মেঘভরা মুখ দেখিয়া তাঁহার আর কথা সরিল না, মুখের হাসি মুখে মিলাইল। আমি বলিলাম—আমার নামে কত কি রোটেছে, শোনোনি কি কিছু?

আমার স্বামী উত্তর করিলেন—না। রটুক্ গে।

তাঁহার অস্বাভাবিক ঔদাসীন্য আমার অন্তরে সজোরে আঘাত করিল। আমি একটু উত্তেজিতভাবে কহিলাম—রটুক্ গে কি? মেয়েমানুষের যার চেয়ে বড় দুর্নাম আর হোতে পারে না—

আমার স্বামী আমার কথায় বাধা দিয়া কহিলেন—লোকের রটানোয় কিছু যায় আসে না। তুমি যা তাই থাক্‌বে।

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমার মুখ দিয়া বাহির হইল—যা রটে, তার কিছুও বটে।

তারপর আমার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে আর চিনিতে পারিলাম না—এ যে আর একজন লোক, ইঁহাকে স্বামী বলিয়া কেমন করিয়া গ্রহণ করিব? একটা মানুষের আবার ক'টা স্বামী হয়?

আর একবার আমার স্বামী লোকের চক্ষে নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। আমি কিন্তু আমার অন্তরে তাঁহাকে হারাই নাই। বাহিরেও তাঁহাকে আবার পাইলাম, কিন্তু তাঁহার বক্ষে আপন স্থান অধিকার করিতে পারিলাম না—কি জানি, যদি তিনি আমার আধখানাকে মাত্র আশ্রয় দেন! আগে তিনি আমার সবটাকে নগ্ন করিয়া দেখুন—যদি ভাল লাগে, গ্রহণ করুন। না হইলে—অতটা ভাবিয়া দেখি নাই!

আবার আমার স্বামী লোকের চক্ষে নিরুদ্দেশ হইলেন, আমার অন্তরেও তাঁহাকে হারাইলাম, বাহিরেও আর কখনও খুঁজিয়া পাই নাই।

সুকুমারের কথা

সে সরলা আর নাই মরা গাঙে বাণ ডাকিয়া গিয়াছে। যৌবনের পরিপূর্ণ জোয়ার তাহার দেহ মনকে প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। কখন বাঁধ ভাঙেভোঙে—আচ্ছা, এই ভরা নদীটাকে কোন রকমে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া আবার পাহাড়ের গর্ত্তে ফিরাইয়া দেওয়া যায় না? যাহা হইবার নহে তাহা হইল না—তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিতে লাগিল। আমার কিছু বলিবার মুখ নাই, একদিন আমিও তাহাকে কতদিক দিয়া আক্রমণ করিয়া ছিলাম। সে হেলায় তাহা প্রতিরোধ করিয়াছিল! আমি কি আমার সর্ব্বাঙ্গের সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকে নিবারণ করিতে পারিব না?

সরলা বলিল—নিন্দেয় যে দেশ ভোরে গেছে।

আমি বেশ নির্ব্বিকারভাবেই উত্তর করিলাম—যাক্ গে। আমাদের কারও গায়ে ত ফোস্কা পড়েনি।

আমার কথায় কোন উত্তেজনা প্রকাশ পাইল না বটে, কিন্তু মনের ভিতর ঝড় বহিতে লাগিল। চাহিয়া দেখিলাম, চারিদিকেই ঝড় বহিতেছে। সরলা উত্তেজিত ভাবে কহিল—ফোস্কা পড়ে নি! বুকের ভিতর যে জোলে যাচ্ছে!

আমি কোনও উত্তর দিলাম না। ভাবিলাম, বুঝিতে চেষ্টা করিলাম, সেদিন কেন ফোস্কা পড়ে নাই, আজই বা কেন বুকের ভিতর জ্বলিয়া যাইতেছে, কিন্তু পরিলাম না।

সেদিন এই পর্য্যন্ত। তার পর যাহা হইল সে আখ্যায়িকাতে কাজ নাই। বহুদিন পূর্ব্বে নারীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হইয়া এক মর্ম্মান্তিক লজ্জা অনুভব করিয়াছিলাম। আজ উপযাচিকা নারীকে প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া তাহার শতগুণ লজ্জা অনুভব করিলাম। আমি জ্বলিয়াছিলাম কিন্তু সরলাকে জ্বালাইতে পারি নাই! পরকে জ্বালাইয়া কি সুখ—সুখ কি দুঃখ—তাহা জানি না। সরলা জ্বলিয়া আমাকে জ্বালাইল। তাহাতে কি সে সুখী হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে, আমার জ্বলিয়াও সুখ। না হইলে, আমার জ্বলার যন্ত্রণা অতি তুচ্ছ যন্ত্রণা।

বাড়বানল

শ্রীপ্রভা দেবী গঙ্গোপাধ্যায়

গল্প

মানুষের অন্তরে থাকে দুটো জিনিষ—জল আর আগুন।...

জোৎস্না রাতে ঝির্‌ঝিরে হাওয়ায় যখন জলের বুকের আঁচলখানায় মৃদু কাঁপন লাগে তখন একটা অপরিসীম আনন্দের, একটা অগাধ শান্তির ঝরণার মুখ যেন আপ্‌না-আপ্‌নি খুলে যায়...মানুষ হয় তখন সৌম্য, শান্ত নিরীহ, নির্লিপ্ত!

মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম ঘটে।

...সহসা কালো মেঘ আকাশের প্রান্তটুকু অবধি গ্রাস ক'রে ফেলে, মাতাল বাতাস সৃষ্টিছাড়া তাণ্ডব সুরু করে দেয়, ঝড় আসে, উত্তাল হয়ে তরঙ্গগুলি ফুলে ফুলে দুলে দুলে ওঠে, আর সে তরঙ্গশীর্ষ থেকে ছিট্‌কে পড়ে আগুনের ফুল্‌কি...মানুষ তখন রূপান্তরিত হয় হিংস্র জানোয়ারে, বন্য শার্দ্দুলে!

ঝরণার বুকে তখন পাবকশিখা লক্‌ লক্‌ করে ওঠে।

—বাড়বানল!...

* * * *

রায় বাহাদুর কে, সি, রায়, আই, সি এসের একমাত্র পুত্র জীবন রায় লাহোরে হোষ্টেলে থেকে বি, এ পড়ে।

বাপের ইচ্ছা ছেলে মেজিষ্ট্রেট হয়, বোনের ইচ্ছে দাদা বড় ডাক্তার হ'য়ে পরের উপকার করে, পাড়া পড়্‌শীর ইচ্ছে ছেলে বাপের মতই বিচারকের আসনে বসে লক্ষ লোকের দণ্ডদাতা হয়...

—কিন্তু বন্ধু অমলের আকাঙ্ক্ষা—জলের বুকে আগুন জ্বলে!

সেদিন জীবনের জন্মদিন। বন্ধু অমলকে সঙ্গে করে সে চট্‌ করে সব গুছিয়ে নিয়ে লাহোর একস্‌প্রেসে চেপে বসে।

জন্মদিনের আমোদের সীমা নেই। হাসি নেই। হাসি ঠাট্টা, গান বাজনা, খাওয়া দাওয়া...অনেক রাত অবধি।

মঞ্জুলা ঠাট্টা করে বলে "বি, এ টা পাশ ক'রে যখন দাদা 'বিয়ে' ক'র্‌বে তখন আবার এম্‌নি আমোদ হবে, তাই না দাদা?'

জীবন হেসে জবাব দেয়, 'কিন্তু ততদিন কি আমার জন্যে তোর সবুর সইবে? ততদিনে তুই..."

"যাও, কি সব ছাই বল যে।" ব'লে মঞ্জুলা বেরিয়ে যায়, যেখানে তার সহপাঠিনীরা ব'সে 'রেডিও' শুন্‌চে, সেইখানে।

প্রতিমা আড়চোখে চেয়ে মুচ্‌কি হেসে জিজ্ঞেস করে, "কি রে মঞ্জু, তুই একা এলি যে? 'তোর' সমীর বাবু এলেন না?"

"তোর সঙ্গে আমি কথা কইতে চাইনে।" ব'লে সে ঝপ্‌ ক'রে কোণের ইজি চেয়ারটাতে ব'সে পড়ে।

সীতা মঞ্জুলার পানে চেয়ে গুন্‌ গুন্‌ স্বরে গেয়ে ওঠে,

ওগো মোর নবীন সাথি,
ছিলে তুমি কোন্‌ বিমানে।...

—সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

এমন সময় জীবন প্রবেশ করে।

নীলিমা জিজ্ঞেস্‌ করে, "আচ্ছা জীবন বাবু, বলুন তো এতে প্রতিমার কি দোষ হয়েছে? শুধু জিজ্ঞেস্‌ ক'রেছে, 'তোর' সমীর বাবু কোথায়, আর অমনি মঞ্জুলা ঝাম্‌টা মেরে বলে কিনা তোর সঙ্গে আমি কথা কইতে চাইনে।—"

"বা বাঃ, কি দরদীরে আমার, তাও তো এখনো 'মালা বদল' হয়নি...

আবার এক পশলা হাসি।

জীবনও এ হাসিতে যোগ দেয়।

—ঝর্‌ণার বুকে চাঁদের হাসি।...

সহসা কোত্থেকে অমল এসে জীবনকে এ কল-কোলাহলের বাইরে টেনে নিয়ে যায়, বাগানটার এককোণে একটা বেঞ্চিতে বসে দুজনে আলাপ হয়।

হ্যাঁ, আলাপ হয়, অনেক কথা হয়...কি কথা কে জানে।

চারিদিকে চেয়ে নিয়ে অমল মাঝে মাঝে জীবনের চোখের পানে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে কি যেন বলে, জীবনের চোখের পলক পড়ে না।

হঠাৎ যেন জীবনের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে, ঝলকে ঝলকে ঠিক্‌রে পড়ে আগুনের হল্‌কা...

কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেই সরল মেয়েলি হাসি, সেই শান্ত নির্ব্বিকার ভাব!

অমল আগুন ছড়ায়, কিন্তু অঞ্জলি ভরা তুষার শীতল জলে সে স্ফুলিঙ্গ তলিয়ে যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে!...

* * * *

বছর দুই পর।

পুলিশের অব্যর্থ সন্ধানে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র ধরা পড়েছে। বোমার একটা প্রকাণ্ড কারখানা আবিষ্কৃত হয়েছে...বিভিন্ন প্রদেশ থেকে তেরোজন বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মারাঠি যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রায় বাহাদুর কে, সি রায়ের এজলাসে আজ তাদের বিচারের প্রথম দিন।

এগারোটা বাজতেই কয়েদীদের গাড়ীখানা কোর্টের দরজায় এসে দাঁড়ালো।...হাতকড়া আঁটা, কোমরে দড়ি বাঁধা, চারিদিকে সশস্ত্র গুর্খাঘেরা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা ধীরে ধীরে গাড়ী থেকে নেমে হাসিমুখে কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালো।

রায় বাহাদুর কয়েদীদের একবারটি দেখে নেবার জন্য স্প্রিংয়ের চশমাটা নাকে তুলে দিলেন।

—ওকে?

পাব্‌লিক প্রসিকিউটর্‌ তখন সোৎসাহে ব'লে যাচ্ছিলেন;......"এই প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র পুলিসের প্রাণান্ত চেষ্টায় ধরা না প'ড়লে যে একদিন এরা গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ ঘোষণা কোরতো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভারতবর্ষের বহুস্থানে এর শাখা-প্রশাখা আবিষ্কৃত হয়েছে...এদের দলের প্রধান নায়ক জীবনচন্দ্র রায় লাহোরে ধরা পড়েছে; সেখানে সে এম, এ পড়ছিলো..."

রায়বাহাদুরের হাতের কলম ঠক্‌ ঠক্‌ ক'রে কাঁপতে থাকে, চোখের সম্মুখে সব ঝাপ্‌সা হ'য়ে যায়...

পাবলিক প্রসিকিউটর্‌ বলে যান,..."আমি সাক্ষী দিয়ে প্রমাণ করিয়ে দেব যে এই জীবন রায়ই অমৃতসরে পুলিস-সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট মিঃ রাইমার্‌কে নৃশংসভাবে হত্যা ক'রেছিলো, এই জীবন রায়ের নেতৃত্বেই এদের দল দিল্লীর ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক লুঠ করেছিল..."

রায়বাহাদুর আর সইতে পারেন না, বুকের ভেতর তাঁর কোথা থেকে যেন খানিকটা বরফ উছলে উঠে, সারা দেহে হিমানী প্রবাহ ছড়িয়ে দেয়..... সংজ্ঞাহারা দেহখানা তাঁর এলিয়ে পড়ে চেয়ারের হাতলের ওপর......

কিন্তু তখনো তুষার শীতল কানের কাছে পাবলিক্‌ প্রসিকিউটরের গলা স্পষ্ট শোনা যায়,......

"এই জীবন রায়ই পুণাতে গভর্ণরের মোটরের ওপর বোমা ছুঁড়েছিল......"

—ঝরণার বুকে আগুন জ্বলে......অনির্ব্বাণ সীতাকুণ্ড!!



নানা কথা

কংগ্রেসে জনসাধারণের অধিকার

মহাত্মার প্রস্তাব

স্বরাজের অর্থ সকলের পক্ষে সমান সুবিধা, সমান অধিকার এবং সমান ব্যবহার। শ্রমিকগণ, কৃষকগণ, রাজাগণ ও সকলে যে ভাবে বুঝিতে পারে, সেই ভাবে স্বরাজের অর্থ বিশ্লেষণ করিতে হইবে। উহাকে আমরা স্বরাজ, ধর্ম্মরাজ, রামরাজ বা খোদাইরাজ যে কোন সংজ্ঞায় অভিহিত করিতে পারি। এই রাজত্ব কি ভাবে চালান হইবে তাহাও আমাদের বুঝা দরকার। উহা যে মাত্র শাসকগণ ও কর্ম্মচারীগণের স্বার্থের জন্য নহে, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। গোলটেবিল বৈঠকে যাইবার পূর্ব্বে আমরা কি ধারা ধরিয়া দাবী পেশ করিব তাহা বুঝাইতে চাহিতেছি। আমি পূর্ব্বেই আমার ১১টী দাবীর মধ্যে তাহা বলিয়াছি। ঐ সব দাবীর মধ্যে যেগুলি বলা হয় নাই সেইগুলিও বর্ত্তমান প্রস্তাবে যোগ করিয়া দিয়াছি। এই গুরুত্বপূর্ণ ও বহু শাখাসমন্বিত প্রস্তাব কি করিয়া আপনাদের কাছে উপস্থিত করা হইল, এই বিষয়ে বিষয়নির্ব্বাচন সমিতিতে অনেক আলোচনা হইয়াছে। অনেকে এই প্রস্তাব সম্বন্ধে ভুলই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা ডেলিগেটদের হাত ধরিয়া কোন কাজ করিতেছি না। আমরা মাত্র তাঁহাদিগকে পথ প্রদর্শন করিয়া কিরূপ সীমার মধ্যে কাজ করিবেন, তাহাই বুঝাইয়া দিতেছি। কেবল আমাদের পথ নির্দ্দেশের জন্যই নহে—আমরা কি চাই এবং আমাদের আদর্শ কি তাহা জগৎকে বুঝাইবার জন্যও এই প্রস্তাবের প্রয়োজন। আমরা কাহাকেও দ্বিধার মধ্যে রাখিব না। আমরা যে সরলভাবে কাজ করিতেছি এই বিষয়ে যাহাতে কাহারও কোন সন্দেহ না হয় সে ভাবে আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। আমাদের বড়লাট বর্ত্তমানে মাসে ২০ হাজার টাকা করিয়া পাইতেছেন। আমরা তাঁহাকে ২ হাজার টাকার বেশী দিব না (হাস্য)। কোন লোককে আমরা ৫ শত টাকার বেশী বেতন দিতে প্রস্তুত নহি। আমরা এই সব দাবী উপস্থিত করিয়া সকলকে এই জন্য জানাইয়া দিতেছি যাহাতে সকলেই স্বরাজ অর্থে আমরা কি বুঝি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। আমরা কাহারও অজ্ঞাতভাবে হঠাৎ কোন কাজ করিতে যাইব না এবং এজন্য তাহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিব না। আমাদের দাবী বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য আমরা তাহাদিগকে যথেষ্ট সময় দিব। আমাদিগকে সকল প্রকারে স্বাধীন হইতে হইবে, এই বিষয় যেন আমরা মনে রাখি।

আমাদের সব চেয়ে বড় সমস্যা হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের সমস্যা। হিন্দুরা সংখ্যায় অধিক এবং মুসলমানেরা তাহাদের ভয়ে খুব ভীত। সুতরাং আমাদিগকে মুসলমানদের ভয় দূর করিতে হইবে। আমাদিগকে এই কথা বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, আমাদের কাছে তাহাদের ভয় করিবার কোন কারণ নাই—কেন না, আমাদের উভয়ের স্বার্থ অভিন্ন। উভয় ধর্ম্মেরই মূলনীতি এক। আমি পবিত্র কোরাণ পাঠ করিয়াছি এবং গীতার মধ্যে যে শিক্ষা যে উপদেশ রহিয়াছে তাহাই কোরাণের মধ্যেও পাইয়াছি। অবশ্য কোন কোন বিষয়ে আমাদের মধ্যে ভেদ আছে। উহা খুবই স্বাভাবিক। তাহারা উর্দ্দু ভাষা বলে। সুতরাং তাহাদিগকে নানা বিষয়ে বুঝাইবার জন্য এবং তাহাদের মনের ভাব বুঝিবার জন্য আমাদিগকে উর্দ্দু ভাষা শিখিতে হইবে। তাহারা ফারসী অক্ষর লিখে, তাহাও আমাদিগকে শিখিতে হইবে। এই সব ক্ষুদ্র ব্যাপারের মধ্যে কোন বাদ-বিতর্ক হইতে পারে না।

আর একটি বিষয় হইতেছে মহিলাদের অধিকার। পুরুষের যে অধিকার আছে মেয়েদেরও তাহা থাকা দরকার। হিন্দু আইনে পুরুষ ও মেয়ের অধিকারের তারতম্য করা হইয়াছে। আমাদিগকে এই আইন বদলাইতে হইবে। আমরা তাহাদিগকে সমান ব্যবহার, সমান সুবিধা প্রদান করিব। যদি মহিলারা মিউনিসিপালিটীতে প্রবেশ করিতে চাহেন তবে তাঁহাদিগকে সেই সুবিধা দিতে হইবে। পুরুষের মত তাহাদেরও সম্পূর্ণ সমানাধিকার দিতে হইবে। বর্ত্তমানে কেবল পুরুষেরাই ভারতের বড়লাট হইতে পারে। ভবিষ্যতে আমরা মেয়েদিগকেও আমাদের বড়লাট করিব। (হাস্য)। কংগ্রেসে কখনও পুরুষ ও মেয়েদের অধিকারে তারতম্য করা হয় নাই। পূর্ব্বে বেসান্তের মত ও সরোজিনী দেবীর মত মেয়েরাও কংগ্রেসের সভানেত্রী হইয়াছেন। পুরুষ ও মেয়ের অধিকারে যত প্রকার তারতম্য আছে তাহার সমস্ত আমরা উঠাইয়া দিতে চাই। আমাদের মেয়েরা গত আন্দোলনে খুব বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের জন্যই অনেকটা এই আন্দোলন সফল হইয়াছে।

মহিলাদের সম্বন্ধে যাহা বলিলাম—বিভিন্ন জাতি সম্বন্ধেও তাহাই বলিতেছি। বিভিন্ন জাতির মধ্যে অধিকারের যত পার্থক্য আছে তাহা দূর করিতে হইবে। সর্ব্বসাধারণের ব্যবহৃত স্থান, দেবমন্দির প্রভৃতি ব্যবহার করিবার সকলের সমান অধিকার থাকিবে। চাকুরী দান ব্যাপারে কোন প্রকার অনুগ্রহ কাহাকেও দেখান হইবে না। কাহারও প্রতি কোন প্রকার পার্থক্যমূলক ব্যবহারও করা হইবে না। চাকুরীতে যোগ্যতাকেই প্রথম স্থান দেওয়া হইবে।

শ্রমিকদের সম্বন্ধে আমি এই বলিতে চাই যে, তাহাদিগকে অন্ততঃ জীবনধারণোপযোগী মজুরী দিতে হইবে। কোন লোক তাহাদিগকে শোষণ করিবে অথবা অন্নবস্ত্র ও গৃহহীন হইয়া তাহারা মারা পড়িবে—উহা আমরা কিছুতেই সহ্য করিব না। তাহাদিগকে কাজ করিয়া

জীবিকা অর্জ্জনের জন্য আমরা সকল প্রকার সুযোগ দিব, কাজের সময় নিয়ন্ত্রিত করিবে। যখন গবর্ণমেন্ট আমাদের নিজস্ব হইবে তখন আমরা আমাদের স্বার্থের জন্য আইন রচনা করিতে পারিব।

এই প্রস্তাবের প্রত্যেকটা অংশ আপনাদের কাছে বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিবার আমার সময় নাই। তবে প্রস্তাবটী এত অধিক ভাবিয়া চিন্তিয়া রচনা করা হইয়াছে যে, উহার মধ্যে এমন কোন কথা নাই যাহার সঙ্গে আপনাদের মতভেদ ঘটিতে পারে। শেষের ধারাটী সম্বন্ধে একটী কথা বলিতে চাই। ইছলামে সুদ গ্রহণ হারাম। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে এমন কোন বিধিনিষেধ নাই। কিন্তু অতিরিক্ত সুদ আদায় করা হিন্দুদেরও ধর্ম্ম নহে। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে পাঠানেরাও অত্যধিক সুদ আদায় করিয়া থাকে। আমি জানি যে, মাড়োয়ারী, গুজরাটি বাণিয়ারাও অত্যধিক সুদ আদায় করে। আপনারা শতকরা বার্ষিক ৬টাকা এমন কি ৮টাকা সুদ আদায় করিতে পারেন। ইহার অধিক সুদ আদায় উচিত নহে। যখন আমি আইন ব্যবসা করিতাম তখন কখনও আমি, যে দলিলে শতকরা বার্ষিক ৮ টাকার উপর সুদের কথা থাকিত, তাহা লিখিতাম না বা উহার মুসাবিদা করিতাম না। আমি এই নীতিকে আদর্শ ধরিয়াই চলিতাম।

এখন জমিদারের কথা বলিতেছি। তাহারা ধনী লোক। কাজেই তাঁহাদিগকে গবর্ণমেন্টকে সাহায্য করিতে হইবে আমরা যাহারা ধনী তাহাদিগকে দরিদ্র করিতে চাই না। তবে সর্ব্বসাধারণের হিতের জন্য যাহাদের বেশী আছে তাহারা অর্থ দিবে, অথবা আমরা তাহাদিগকে অর্থ দিতে বাধ্য করিব। কৃষকদিগকে বাঁচাইতে যাইয়া আমরা জমিদারদিগকে উচ্ছেদ করিব না। যাহাতে উভয়েই প্রীতির সহিত বাঁচিয়া থাকিতে পারে তাহারই আমরা ব্যবস্থা করিব। আমরা কাহারও উপর অবিচার করিব না কিন্তু কাহাকেও ভ্রান্ত আশা পোষণ করিতেও দিব না। কোন লোকের কাছে আমরা আমাদের প্রকৃত আদর্শ কি তাহা ভুল বুঝাইয়া তাহাদিগকে আমাদের দলে টানিতে চাই না। স্বরাজ গবর্ণমেন্টের অধীনে এখনকার মত জমিদারও থাকিবে, কৃষকও থাকিবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে জমিদারেরাও আমাদের পক্ষে আছেন। কেননা আমাদের সংগ্রামে তাঁহারা অনেক সাহায্য করিয়াছেন। গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই প্রস্তাবটি রচনা করা হইয়াছে। উহার মধ্যে ভাষার বা অন্যান্য প্রকার ভুল থাকিতে পারে। কিন্তু আপনাদিগকে উহা উপেক্ষা করিতে হইবে। এই প্রস্তাবের সংশোধনের জন্য এত প্রস্তাব আসিয়াছে যে হয় আপনাদিগকে প্রস্তাবটী সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইবে অথবা উহা বর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু একথা স্মরণ রাখিবেন যে, আমাদিগকে সকল শ্রেণীর লোকের অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে এবং সকলের সম্বন্ধে ন্যায় বিচার করিতে হইবে।

* * * *

রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মূলনীতি সম্বন্ধে বিষয়-নির্ব্বাচনী সমিতিতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে :—

"এই কংগ্রেসের অভিমত এই যে, জনসাধারণের শোষণ বন্ধ করার জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে বুভুক্ষু জনসাধারণের প্রকৃত আর্থিক স্বাধীনতা থাকা চাই। কংগ্রেস স্বরাজ বলিতে যাহা বুঝে জনসাধারণ যাহাতে তাহার মর্ম্মোপলব্ধি করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদের বোধগম্য করিয়া কংগ্রেসের কথা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা বাঞ্ছনীয়। সুতরাং কংগ্রেস ঘোষণা করিতেছে যে, কংগ্রেসের তরফ হইতে যদি কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়, তবে তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি থাকা চাই, অথবা স্বরাজ গবর্ণমেন্টকে সে সমস্ত ব্যবস্থা করার ক্ষমতা দেওয়া চাই :—

(১) সর্ব্বসাধারণের কতকগুলি অবিসম্বাদী অধিকার ঘোষণা যথা—

(ক) সমিতিবদ্ধ হওয়া।

(খ) স্বাধীন মত ব্যক্ত করা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।

(গ) সাধারণের সুনীতি ও শান্তি নষ্ট না করিয়া যাহার যেরূপ অভিরুচি তাহাকে সেরূপ মত পোষণ করিতে এবং ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে দেওয়া।

(ঘ) জাতি, বর্ণ বা ধর্ম্মের জন্য কেহ কোন সরকারী চাকুরী, অধিকার বা সম্মান অথবা কোন ব্যবসায় বা বৃত্তির অনুসরণ করার অনধিকারী বিবেচিত হইবে না।

(ঙ) পুং-স্ত্রী নির্ব্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও বাধ্য-বাধকতা স্বীকার করা।

(চ) সাধারণ রাস্তা, কূপ এবং সাধারণের ব্যবহারোপযোগী সকল স্থান ব্যবহার করিতে সকল লোকের সমানাধিকার।

(ছ) সাধারণের শান্তিরক্ষার্থ গঠিত কতকগুলি নিয়মাধীনে সকলকে অস্ত্র রাখার ও ব্যবহার করার অধিকার দেওয়া।

(২) ধর্ম্ম সম্পর্কে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা।

(৩) শ্রমিকদিগকে জীবনধারণোপযোগী মজুরী দেওয়া। সীমাবদ্ধ সময় খাটান, কর্ম্মস্থলের পবিত্রতা রক্ষা, মালিকের লোকসানে শ্রমিককে ক্ষতি গ্রস্ত হওয়া হইতে রক্ষা করা ; বার্দ্ধক্য, রোগ এবং বেকার অবস্থায় জীবিকার ব্যবস্থা করা।

(৪) দাসত্ব বা প্রায়-দাসত্বের অবস্থা হইতে শ্রমিকদিগকে রক্ষা করা।

(৫) নারী শ্রমিকদিগকে রক্ষা করা এবং গর্ভাবস্থায় তাহাদের জন্য যথোচিত ছুটীর ব্যবস্থা করা।

(৬) স্কুলে যাইবার যোগ্য বালক-বালিকাদিগকে কারখানার কার্য্যে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা।

(৭) নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার অধিকার দেওয়া এবং শ্রমিকে মালিকে মতান্তর হইলে মিটমাটের জন্য মধ্যস্থের ব্যবস্থা করা।

(৮) ভূমির রাজস্ব বিশেষভাবে হ্রাস করা এবং অজন্মা জমির খাজনা যতদিন পর্যন্তে মকুব করা আবশ্যক ততদিন পর্য্যন্ত মকুব করা।

(৯) একটা নির্দ্দিষ্ট আয়ের উপর কৃষি আয়ে ক্রমবর্দ্ধমান আয়কর ধার্য্য করা।

(১০) ক্রমিকহারে উত্তরাধিকার কর।

(১১) প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকার।

(১২) অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(১৩) সামরিক ব্যয় বর্ত্তমান ব্যয়ের অন্ততঃ অর্দ্ধেক করা।

(১৪) দেওয়ানী বিভাগের ব্যয় ও বেতন বহুল পরিমাণে হ্রাস করিতে হইবে। বিশেষভাবে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ ব্যতীত রাষ্ট্রের কোন কর্ম্মচারীই একটা নির্দ্দিষ্ট টাকার বেশী বেতন পাইবে না। ঐ নির্দ্দিষ্ট টাকা সাধারণতঃ মাসিক পাঁচশত টাকার বেশী হইবে না।

(১৫) দেশ হইতে বিদেশী কাপড় ও বিদেশী সূতা বাহির করিয়া দিয়া দেশী কাপড়কে রক্ষা করিতে হইবে।

(১৬) মাদক পানীয় এবং মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

(১৭) লবণের উপর কোন কর থাকিবে না।

(১৮) মুদ্রা বিনিময়ের হার রাষ্ট্র কর্ত্তৃক এরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে, যেন ভারতীয় শিল্পের সহায়তা এবং জনসাধারণের সহায়তা হয়।

(১৯) মৌলিক শিল্প এবং খনিজ সম্পদ রাষ্ট্র কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রণ।

(২০) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কুসিদবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ।

ভারতে বৃটিশ বাণিজ্য

মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্য

"যে সমস্ত বৃটিশ সম্প্রদায় ভারতে বাণিজ্য করিতেছেন এবং যাহারা ভারতে জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বাণিজ্যের অধিকার সম্পর্কে কোন বৈষম্য করা হইবে না—এই নীতি হইতেই আলোচনা উত্থিত হইয়াছিল। এই নীতি খুব নির্দ্দোষ বটে; কিন্তু ইহা দ্বারা একটি গুরুতর বিপজ্জনক অবস্থাকে গোপন রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমানে অবস্থা হইতেছে এই রকম, ভারতবর্ষে কুকুরের লড়াই চলিতেছে এবং যদিও ভারত ভারতবাসীরই, তথাপি তাহারাই এক্ষণে ইংরাজের তলে পড়িয়া আছে। ইংরাজেরা শাসক জাতি বলিয়া জীবনের প্রায় প্রত্যেক পদেই তাহারা একটি সুবিধাজনক স্থান দখল করিয়া আছে। অতিরঞ্জিত না করিয়াও একথা বলিতে পারা যায় যে, ইংরাজের শিল্প ও বাণিজ্য ভারতের ধ্বংসাবশেষের উপরই উন্নতি লাভ করিয়াছে। ল্যাঙ্কাসায়ারের উন্নতি বিধানের জন্য ভারতের কুটীর শিল্পকে ধ্বংস করিতে হইয়াছিল। বৃটিশ জাহাজ ব্যবসায়ের যাহাতে উন্নতি হইতে পারে এই জন্য ভারতীয় জাহাজগুলিকে ধ্বংস করিতে হইয়াছিল। সুতরাং ভারতীয় ও ইউরোপীয়ানদিগের মধ্যে কোন বৈষম্য না করার অর্থ হইতেছে ভারতের দাসত্বকে চিরন্তন করিয়া রাখা। দৈত্য ও বামনের মধ্যে অধিকারের কি প্রকারের ক্ষমতা হইতে পারে? অসমানের মধ্যে সমান অধিকারের কথা বলিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, কি প্রকারে বামনকে দৈত্যের আকার দেওয়া যায়। লক্ষ লক্ষ লোক যখন সমতলক্ষেত্রে বাস করে এবং তাহাদিগকে যখন সিমলার উচ্চ শৈলশৃঙ্গে তুলিতে পারা যায় না, তখন উহার একমাত্র প্রতীকার হইতেছে এই যে, যাহারা সিমলার শৈলশৃঙ্গে আছে, তাহাদিগকে সমতলক্ষেত্রে নামিয়া আসিতে হইবে।"

ভারতের আর্থিক দুরবস্থা

(ভারতীয় বণিক সভার সভাপতি লালা শ্রীরামের অভিভাষণ)

গত বৎসর ভারতের আর্থিক ব্যাপারে বড় দুর্ব্বৎসর গিয়াছে। এদেশে কৃষিজাত পণ্যের মূল অসম্ভবরূপে হ্রাস পাওয়াতে কৃষকদের আর্থিক অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পৃথিবীর কোন দেশে ভারতের মত কৃষিজাত পণ্যের দাম এত কমিয়া যায় নাই। তারপর ভারতের রপ্তানী জিনিষের দাম খুব কমিয়া গেলেও আমদানী মালের মূল্য সেই হারে কমে নাই। এই জন্যই ভারতের আর্থিক দুরবস্থা আরও চরমে উঠিয়াছে। উহার ফলে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের অবস্থাও উহার ফলে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভারতের এই দুরবস্থার জন্য গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপই দায়ী। প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট বাট্টার হার এমন অস্বাভাবিক করিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে কৃষিজাত পণ্যের ক্রমেই দাম কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কৃত্রিম উপায়ে বাট্টার হার নিয়ন্ত্রিত করিয়া এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে দিতেছেন না।

দেশের আর্থিক দুরবস্থার আর একটী প্রধান কারণ, গবর্ণমেণ্টের টাকা ধার করার নীতি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে জিনিষপত্রের দাম সস্তা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টাকার সুদও কমিয়া যাইতেছে, কিন্তু এদেশের গবর্ণমেণ্ট ক্রমেই অধিকতর চড়া সুদে ঋণ লইতেছেন, তাহা খাটাইয়া যদি আয় হইত তাহা হইলে ঋণ দ্বারা ভারতের উপকারই হইত। কিন্তু ঋণের অধিকাংশ টাকারই কোন আয় হইতেছে না। লোক বিপদে পড়িয়া যেভাবে ঋণ লয় ভারত সরকার সেই ভাবেই ঋণ গ্রহণ করিতেছেন।

ভারতের আর্থিক দুরবস্থার আর এক কারণ, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অত্যধিক ট্যাক্স বৃদ্ধি। উহার ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। ১৯১৩-১৪ সনে এদেশে জিনিষপত্রের মূল্য যে প্রকার ছিল এখনও তাহা তদনুরূপই রহিয়াছে। কিন্তু ১৯১৩-১৪ সনে ভারত গবর্ণমেণ্ট ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি শাসন কার্য্যে মোট ১২৪ কোটী ৩৪ লক্ষ ২১ হাজার ২৮০ টাকা ব্যয় করেন। কিন্তু ১৯৩১-৩২ সনে একমাত্র ভারত সরকারের ব্যয়ই ১৩২ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে। ১৯১৩-১৪ সনে ভারতের সামরিক ব্যয় ৩১ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা আর এখন ব্যয়ের বরাদ্দ হইয়াছে ৫১ কোটী টাকা। এই সব অতিরিক্ত টাকা ট্যাক্স বাড়াইয়া সংগ্রহ করা হইতেছে আর তাহার ফলে লোকের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে। অবশ্য ভারত-সরকার এ বৎসর একটী ব্যয় সংক্ষেপ কমিটী বসাইতেছেন, কিন্তু উহাতে কোন ফল হইবে কিনা সন্দেহ। গবর্ণমেণ্টের এই সব কার্য্য কলাপের ফলেই জনসাধারণ দাবী করিতেছে যে, আগামী শাসনতন্ত্রে ভারতের আর্থিক অবস্থা পরিচালনার ভার

ভারতীয় মন্ত্রিগণের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট এতদিন যে প্রকার অযোগ্যতার সহিত আর্থিক অবস্থার পরিচালনা করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের আর একথা বলার জো নাই যে, ভারতবাসীর হাতে এই ভার দিলে তাহারা উহা পরিচালনা করিতে সমর্থ হইবে না। ভারত গবর্ণমেণ্টও তাঁহাদের বিবৃতিপত্রে একথা সমর্থন করিয়াছেন। আর্থিক বিলি-ব্যবস্থার ভার ভারতবাসীর উপর না দিলে তাহারা সন্তুষ্ট হইবে না।

অনেক বৃটিশ ব্যবসায়ী বলিতেছেন যে, ভারতবাসীকে এই অধিকার দিলে তাহারা ব্রিটিশ বণিকদের প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহার করিবে। কিন্তু তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন, ভারতবাসীর হাতে এই ক্ষমতা না আসিলে কিছুতেই ভারতের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি হইয়া ভারতীয় জনসাধারণের দুঃখ ঘুচিবে না এবং কোন আত্মসম্মান জ্ঞানসম্পন্ন স্বদেশ প্রেমিক কোন শাসনপদ্ধতি সমর্থন করিবেন না। আর উহার ফল এই দাঁড়াইবে যে, ইংরাজ ব্যবসায়িগণ যতই শাসনগত অধিকার লাভ করুন না কেন, ভারতে ইংরাজদের বাণিজ্য বিনষ্ট হইবে। সন্তুষ্ট ভারতবাসীই ভারতে ইংরাজদের বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় প্রতিভূ হইতে পারিবে।

ভারতের জাহাজের ব্যবসায় সম্বন্ধে বড়লাট একটা মিটমাট করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু গোল টেবিল বৈঠকে অনেক ধনী ইংরাজ ব্যবসায়ী ভারতবাসীর জাহাজের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগের পথ একেবারে রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, ব্রহ্মা সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত উদ্ধার করিয়াছিলেন। সমুদ্র মন্থনে যে ঐশ্বর্য্যের উদ্ভব হয় তাহা আমরা কিছুতেই বিদেশীয়গণকে লুণ্ঠন করিতে দিব না।

উপসংহারে আমি ভারত সরকার ও বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে ভারতীয় বণিকদের প্রকৃত মনোভাব জানাইতে চাই। বর্ত্তমানে ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা অতি শোচনীয়। এখনও আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। সুখের বিষয়, এখানে সেখানে মেঘ কাটিবার একটু লক্ষণ দেখা যাইতেছে। যদি আগামী গোলটেবিল বৈঠকে একটা মীমাংসা হয়, তবেই আকাশ সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হইবে। কিন্তু যদি মীমাংসা না হয় যদি গবর্ণমেণ্ট দেশের আর্থিক ব্যাপারে লোককে স্বাধীনতা না দেন, তবে দেশের জনসাধারণের কোন উপকারই হইবে না। তাহা হইলে পুনরায় সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। ভগবান সেই দিন হইতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষকে রক্ষা করুন। আমাদের উদ্দেশ্য কি তাহা পরিষ্কারভাবে বলিতেছি। আমরা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসনের বেশী কিছু চাই না; কিন্তু উহা অপেক্ষা কিছু কমে আমরা সন্তুষ্ট হইব না। আমি বড়লাট লর্ড আরুইনকে অনুরোধ করি—তিনি এদেশে যে ভাবে কাজ করিয়াছেন, অবসর গ্রহণের পরেও যেন তিনি ভারতের ন্যায্য অধিকার লাভের পক্ষে প্রযত্ন করেন।

হিন্দু মহাসভার কথা

হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটি শাসনতন্ত্র সংস্কার সম্পর্কে নিম্নলিখিতরূপ বিবৃতি বাহির করিয়াছেন:—

হিন্দুমহাসভা বলিতে চাহেন যে, সাম্প্রদায়িক ব্যাপার সম্পর্কে তাঁহারা বরাবরই সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী। তাঁহাদের বিশ্বাস যে, কোন প্রকার জাতীয়গবর্ণমেণ্টেই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা দ্বারা সমগ্র দেশ ও জাতির কল্যাণ হইতে পারে না। তাঁহারা নিজেরা সম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায় বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত এবং আশা করেন যে, অন্যান্য সম্প্রদায়ও অনুরূপ ভাবে কার্য্য করিয়া এমন একটি পূর্ণ গবর্ণমেণ্ট গড়িয়া তুলিবেন, যাহা একই রাজনৈতিকদলের লোকদ্বারা একযোগে পরিচালিত হইবে।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি হইতে হিন্দু মহাসভার মতামত বুঝা যাইবে— (১) সমস্ত সম্প্রদায় ও ধর্ম্মের ভোটারগণকে লইয়া নাগরিক ও জাতীয়তা বাদী হিসাবে একটি সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সৃষ্টি হইবে। (২) কোন পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা থাকিবে না। (৩) ব্যবস্থা পরিষদে কোন বিশেষ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের জন্য কোন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না। (৪) কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই। (৫) একই প্রদেশে সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে নির্ব্বাচনাধিকার একইরূপ থাকিবে। (৬) কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থাপরিষদের জন্য সমগ্র ভারতে নির্ব্বাচনাধিকার একইরূপ থাকিবে। (৭) সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভাষা, ধর্ম্ম, জাতিগত আচার প্রভৃতি রক্ষাকল্পে আইন করিয়া সাবধানতামূলক ব্যবস্থা রাখা হইবে—তুর্কী প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশে সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। (৮) সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য কোনরূপ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রশ্নই থাকিবে না। (৯) ভাষা, শাসন, অর্থ ইত্যাদি সম্পর্কিত ব্যাপারের অনুসন্ধান না করিয়া প্রদেশ সমূহের বর্ত্তমান সীমা রেখা পরিবর্ত্তন করা হইবে না (১০) সরকারী চাকুরী ব্যবসা ইত্যাদি লইয়া যদি কোন মতবিরোধের সৃষ্টি হয় সেজন্য ভারতের নিজের জন্য প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রে চূড়ান্ত ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টে ন্যস্ত থাকিবে।

মুসলিম সম্মেলনের কথা

মুসলমান সম্মেলনে জিন্নার ১৪ দফার সঙ্গে এই প্রস্তাবগুলিও করা হইয়াছে।

১। ধর্ম্মসংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে মুসলমানেরা ব্যক্তিগত আইনের আমলে থাকিবেন।

২। ব্যবস্থাপক সভায় যদি কোন মুসলমানের ব্যক্তিগত আইনের সম্পর্কে খসড়া উপস্থিত করা হয়, তবে তাহাতে কেবলমাত্র মুসলমানদেরই ভোট দিবার অধিকার থাকিবে

৩। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় শতকরা যে পরিমাণে মুসলমান প্রতিনিধি থাকিবেন, মুসলমান প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য শিক্ষা বিভাগের বরাদ্দে উক্ত পরিমাণ অর্থ ই ব্যয়িত হইবে।

৪। ব্যবস্থাপক সভায় শতকরা যে কয়জন মুসলমান সভ্য থাকিবেন শিক্ষাবিভাগেও উক্ত পরিমাণ মুসলমান সভ্য থাকা চাই।

৫। সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছেন যে, শাসন ব্যাপারে ভারত সরকার ও প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহের অধিকারের সীমা নির্দ্দেশের পর যে ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা প্রয়োগ করিবার অধিকার প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির হস্তে প্রদান করিতে হইবে।

৬। সিন্ধু প্রদেশকে পৃথক করা হউক এবং বেলুচিস্থানকে একটী পূর্ণ অধিকারযুক্ত প্রদেশে পরিণত করা হউক।

৭। এই সম্মেলন পৃথক নির্ব্বাচক মণ্ডলীর এবং বাঙ্গালা ও পঞ্জাবের নির্ব্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য দাবী করিতেছে।

মুসলিম দাবী

কুমারী সফিয়া খাতুন

মুসলমানগণ জাতির মুক্তি সাধনায় এত সামান্য স্বার্থবলি দিয়াছে যে সাম্প্রদায়িক দাবী করিবার তাহার কোনই অধিকার নাই। মিঃ জিন্নার চৌদ্দদফা দাবী কোন জাতীয়তাবাদী মুসলমান সমর্থন করেন নাই। কেননা জাতির স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে, হিন্দুমুসলমানের মিলিত দাবী কার্য্যকরী হওয়াই স্বাভাবিক। স্বাতন্ত্র্য জাতিকে হীনবীর্য্য করিয়া তোলে। কেবলমাত্র 'মুসলমান' হওয়ার সুবিধাটুকু লইয়া, আদুরে খোকার মত বায়না ধরিলে জগতের সম্মুখে মুসলমান উপহাসাস্পদ হইবে। ভিক্ষার অন্নে জীবনধারণ করা অপেক্ষা এতবড় দুর্গতি মানুষের আর কিছু নাই। যোগ্যতা অর্জ্জনে অক্ষমতাই আমাদের মানসিক বৃত্তিকে পশুর অপেক্ষা হেয় করিয়া তুলে। আমরা আজ তাই গুণ্ডামী করে, জোর করে চোখরাঙ্গিয়ে পরের হাতের ক্রীড়নক হয়ে, চৌদ্দদফা ভিক্ষার ভাণ্ড হস্তে অপরের অর্জ্জিত সম্পদে বিত্তশালী হ'তে চাইছি। হজরৎ সামান্য কয়েকজন অনুচর নিয়ে নিজের শক্তিতে আরবের রাষ্ট্র ও সমাজ স্বাধীন ক'রে গড়ে তুলেছিলেন। আজ হজরতের অনুচর বলে নিজেদের পরিচয় দিতে লজ্জা করে। মুসলমান ভিক্ষুক নহে। মুসলমান কথাটার অর্থ হচ্ছে স্বাধীন। জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধে কয়েকজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নিগ্রহ সহ্য করেছেন। হজরতের এই সমস্ত যথার্থ অনুচরগণ যখন পাষাণ কারাগার মধ্যে দিনের পর দিন কাটিয়েছেন, সেই সময় এই সমস্ত চৌদ্দ দফাদার মুসলমানরা খানাপিনা, আমোদ-আহ্লাদ ক'রে "নিউ দিল্লীর" রাজতক্তে সেলাম ঠুকে আনন্দে দিন যাপন ক'রেছেন। বুরোক্রেসীর দল বেশ ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, কংগ্রেসই একমাত্র শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। স্বার্থপর সম্প্রদায় হ'য়ে জগতে বেঁচে থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। মনুষ্যত্বের লেশমাত্র যাহাদের মধ্যে নাই, তারাই চৌদ্দ দফাদার হ'য়ে গুণ্ডামি ক'রে ভিক্ষা লয়। এই দক্ষিণ আফ্রিকায় এসে দেখুন, হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ কেমন অভিন্ন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ ক'রে দেখুন 'মুসলমান' কাকে বলে। ইরাকের হোম সেক্রেটারী সিমি বে, ভগৎ সিংহের শোক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, "এই কেপটাউনে যে সমস্ত ভারতীয় মুসলমান আছেন, তাঁদের সঙ্গে স্বাধীন দেশের মুসলমানদের কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে একদল ভিক্ষুক মুসলমান নীচের মত পরের দ্বারে হাত পাতে। ইত্যাদি"

ডাঃ আলমের অভিমত

আমি দৃঢ়ভাবে এই মত প্রকাশ করিতেছি যে, যে, সমস্ত মুসলমান ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে কিছু কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এই বিষয়ে একমত যে, মিলিত ও স্বাধীন নির্ব্বাচকমণ্ডলির ভিত্তি না করিয়া যদি কোন সাম্প্রয়ায়িক মীমাংসা হয় তবে তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিবেন না। তাঁহাদের মত এই যে, পৃথক নির্ব্বাচক-মণ্ডলী সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় এই উভয় প্রকার স্বার্থের ঘোর বিরোধী। যদি সমস্ত হিন্দু জাতিও পৃথক নির্ব্বাচক মণ্ডলীর দাবী করে, তথাপি ব্যক্তিগতভাবে আমি উহা গ্রহণ করিব না। এই কথা দ্বারা আমি আমার বন্ধু ও সহকর্ম্মীদের মনোভাবই ব্যক্ত করিতেছি। আমার মনে হয় যে, মিলিত নির্ব্বাচক মণ্ডলীই দুর্ব্বল পক্ষের অস্ত্র এবং মুসলমানেরা দুর্ব্বল বলিয়াই তাহাদের সাম্প্রদায়িক সার্থকতার জন্য এই মিলিত নির্ব্বাচক মণ্ডলী প্রথা প্রয়োজন। অনেকের ভুল ধারণা এই যে, মিলিত নির্ব্বাচকমণ্ডলীর ফলে দুর্ব্বলপক্ষের অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। কার্য্যতঃ দুর্ব্বলপক্ষ তাহার স্বার্থরক্ষার জন্য মাত্র এই অস্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা সফলতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারে। যদি অন্যান্য সম্প্রদায় পৃথক নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সমর্থনও করে, তাহা হইলেও আমি উহার বিরুদ্ধে লড়িব"।

জাতীয় দলের মুসলমানদের বহু সমর্থক আছেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারাই সমগ্র মুসলমান সমাজের নেতা। উঁহাদের নেতৃত্বে সমগ্র ভারতে ১২ হাজারেরও অধিক

মুসলমান বিগত আইন অমান্য আন্দোলনে কারাবরণ করিয়াছেন। উহা হইতেই জাতীয় দলের মুসলমানের প্রভাব বুঝা যায়। উহাই চরম নহে। আমাদিগকে আমাদের প্রভাবের আরও পরিচয় হিসাবে একথা প্রকাশ করিয়া দিতে হইবে যে, মুসলমান সমাজ রাজভক্তদের দ্বারা গঠিত তথাকথিত সর্ব্বদল মুসলমান সম্মেলনের সমর্থন না করিয়া আমাদিগকেই সমর্থন করে। যে নীতির ফলে নিজেদের মধ্যে শোচনীয় দাঙ্গা-হাঙ্গামায় ও নিষ্ঠুর রক্ত পাত হইয়া থাকে, তাহার মূল্য কতটুকু তাহা আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই মুসলমান সমাজ বুঝিতে পারিবে এবং এই বিষয়ে মীমাংসা করিবে। ভেদ নীতির ফল-কি তাহা বর্ত্তমানে এত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা বুঝিতে আর বিলম্ব নাই। মুসলমান জনসাধারণ মিলিত স্বাধীন নির্ব্বাচক মণ্ডলী প্রায়ই সমর্থন করে। কিন্তু তাহারা কি ভাবে মনোভাব ব্যক্ত করিতে হয়, তাহা জানে না এবং তাহাদের কথা কেহ শুনিতে পারিতেছে না। যদি তাহাদের সহকর্ম্মিগণ এই বিষয়ে আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করে, তবে তাহারা সুস্পষ্ট ভাষায় নিজেদের মত ব্যক্ত করিতে পারিবে এবং যে সব লোক তাহাদের স্বার্থসাধনের অছিলায় অন্য স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করিতেছে তাহারা তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে।

অভিমান

শ্রীবিমলা দেবী

প্রভাতের আলো, সন্ধ্যা শ্যামলরাত্রি অন্ধকার
ধরণীর ধূলি, শ্যাম কিশলয়, বসন্ত সম্ভার,
ওগো পল্লব চঞ্চল বাহু, নির্জ্জন বনভূমি
দূর নীহারিকা, হে মহা আকাশ নত প্রান্তর চুমি,—
চপল নির্ঝর, প্রবাহিণী ধারা, উন্নত হিমালয়
জনম প্রভাতে তোমাদের সাথে, হ'য়েছিল পরিচয় ;
রুদ্র দুপুরে দুরন্ত বায়ু, ঝঙ্কার কলরোল,
শ্রাবণের গাঢ় স্নেহবারিধারা, বসন্ত চঞ্চল,
বন্ধু যে আমি, সাথী ছিনু সাথে, ভুলে যাবে চিরতরে
মনে জাগিবে না স্মরণ আমার চঞ্চল ব্যথা ভরে ?
ভুলে যাও যদি, ভুলে যেও তবে, কোন ক্ষোভ নাই আর
ঘুম পাড়ানীয়া গান গাবে যবে, মরণের আঁধিয়ার,
সে সুপ্তি মাঝে ক্ষণে ক্ষণে মোর চমকি জাগিবে চিতে
তোমাদের প্রেম—হয়ত সে ভুল ক্ষণিক—আচম্বিতে।





কংগ্রেসে অশান্তি

নওযোয়ান ভারত-সভা ও কোন কোন যুবাদলের অত্যাচারে মহাত্মাকেও বিব্রত হইতে হইয়াছিল। ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসীতেই এইসব যুবদল বিক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং শান্তির প্রতীক মহাত্মার গলায়ও ইঁহারা কৃষ্ণমাল্য পরাইয়াছিলেন ও মহাত্মাবাদ্ নিপাত যাউক্ চীৎকার করিয়াছিলেন। মহাত্মা ইহাঁদের ব্যবহারে অসম্ভব কিছু দেখেন নাই—শান্ত স্থির 'প্রেমভরা' চিত্তে ইহাদের মনের বিক্ষোভ ঘুচাইয়া দেশের সার্ব্বজনীন মঙ্গলকার্য্যে আহ্বান করিয়াছেন। কংগ্রেসে বামপন্থীদের ক্ষীণ প্রতিবাদ উঠিতেই মিলাইয়া গিয়াছে—সর্ব্বত্র মহাত্মারই জয় বিঘোষিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অসহযোগ সংগ্রামের আরম্ভ, দিল্লীর সন্ধির সূচনা, করাচী কংগ্রেসের সকল ব্যাপারে মহাত্মা একাকীই (অবশ্য সকলেরই সহযোগে) পরিচালনা করিয়াছেন, কার্য্যকরী সমিতির সদস্য নিয়োগ পর্য্যন্তও ইনি সবই নিজ দায়িত্বে Dictatorএর মতই করিয়াছেন। ইহাতে কেহ কেহ বিস্মিত হইতেছেন এবং যিনি কায়মনে গণতন্ত্রের সাধক তাঁহাকেই এরূপ করিতে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইতেছেন। সন্ত্রস্ত হইবার কিছু নাই—পুরা গণতন্ত্রের আদর্শ লইয়া বিশ্বে যে সব রাষ্ট্র চালিত হইতেছে তাহার মূলাধার এখন প্রায় সর্ব্ব রাষ্ট্রেই এক একজন ডিক্টেটর। আর যে দেশে পুরা অধীন রাষ্ট্র সেই দেশকে আবার নিজেদেরই সহস্র বিক্ষোভের ভিতর দিয়া একটা স্বাধীনতার রূপ দিবার চেষ্টা হইতেছে—এই স্বাধীনতা মুখে ও মনে উচ্চ আদর্শ হিসাবে অনেকে ভাবিলেও তাহাকে হাতে কলমে বাস্তবে পরিণত করিতে চাহিতেছেন মহাত্মা। সুতরাং জনগণের জন্যই যে তাঁহাকে জনগণ-অধিনায়ক হইতে হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর জনগণ-মন-অধিনায়ক কেহ স্বেচ্ছাচার করিয়া সাজিতে পারে না—জনগণ স্বেচ্ছায়ই কোন ভাগ্যবানকে এই অসীম অধিকার দেয়। মহাত্মার নামেই প্রকাশ তিনি ভারতীয় জনগণের নায়ক হইয়াছেন—করাচী কংগ্রেসের এই অশান্তি আগমে কার্য্যতঃ তিনি আরও প্রমাণ করিয়া দিলেন—যে একমাত্র তিনিই যুগপৎ ভারত মহাসাগরের ভীষণ ঝঞ্ঝাবাৎ, চোরা পাহাড়ের আক্রমণ ও হিমালয়ের হিম প্রবাহকে স্বচ্ছন্দে অঙ্গে ধারণ করার শক্তি রাখেন। নেতৃত্বের দাবী মহাত্মা করেন নাই, ভারতই তাঁহাকে ইহা উদ্ধার পাইবার জন্য দিয়াছে,—কংগ্রেসে ঝটিকা উঠিবে, ওঠে যদি উঠুক—মহাত্মা তাহা ধামা-চাপা দিয়া রাখিতে চাহেন নাই, নির্ভীক সত্যাগ্রহীর মত তাহার সম্মুখীন হইয়াছেন—অপর কেহ হইলে বান-চাল হইয়া যাইত, ভারতও স্বখাত-সলিলে এই মুহূর্ত্তেই হাবুডুবু খাইত—স্বাধীনতার স্বপ্ন বিংশ হইতে ত্রিংশ শতাব্দীতে চলিয়া যাইত। কিন্তু মহাত্মার প্রেমে এ অশান্তি শান্তি আনিয়াছে—আবার সত্যাগ্রহী ভারতের অখণ্ড সত্যের ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া আপন অধিকার বুঝিয়া লইবার অটুট জোর আসিয়াছে।

করাচী কংগ্রেস—বিষয় নির্ব্বাচনে মহাত্মা

এই ইতিহাস বিশ্রুত কংগ্রেসের ৪৫শে অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা ও গোলটেবল বৈঠকে যোগদান সমস্যার আলোচনা প্রথম কথা ছিল। কংগ্রেসের প্রাক্কালে ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসী হওয়ায় একদল দেশবাসী দিল্লীচুক্তি নাকচ করিবারও প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু মহাত্মা তাঁহার অসীম ব্যক্তিত্বে ও যুক্তি প্রভাবে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় কি কর্ত্তব্য ও মঙ্গল তৎসম্বন্ধে প্রতিনিধিদের প্রভাবান্বিত করেন। মহাত্মা বলেন—'পূর্ণ স্বরাজই আমাদের লক্ষ্য।

গোলটেবল বৈঠকে আমাদের যাহা দিবার কথা হইয়াছে তাহা পূর্ণ স্বরাজ এমন কি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারও নহে। কিন্তু আগামী গোলটেবলে পূর্ণ স্বরাজই দাবী করা হইবে। বর্ত্তমানে তাঁহারা আমাদের পরামর্শে আহ্বান করিতেছেন ও আমাদের দাবী তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করিতে বলিতেছেন। আমরা কি চাই, এ কথা বলিতে আপত্তির কোন কারণ দেখি না।' মহাত্মাজীর প্রস্তাবে কেহ কেহ আপত্তি ও উষ্মা প্রকাশ করিলেও অধিকাংশ তাহাতেই মত দেন। সুতরাং এ ক্ষেত্রে গোলটেবল আলোচনায় যদি সুফল পাওয়া সম্ভব হয় তবে তাহা পাওয়া যাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদি গোলটেবলে যোগদান করা হয় তবে সম্ভবতঃ মহাত্মা গান্ধী একাই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সহযোগে কথাবার্ত্তা চালাইবেন।

সভাপতির অভিভাষণ

কংগ্রেস সভাপতি সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের অভিভাষণ সংক্ষিপ্ত ও কাজের কথায় পূর্ণ হইয়াছে। সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল ও মৌলানা মহম্মদ আলির মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া সেই সমস্ত বীরদের প্রতিও সশ্রদ্ধ সমবেদনা জানাইয়াছেন—যাঁহাদের কোন খ্যাতি ছিল না—যাঁহারা খ্যাতির জন্য লালায়িত না হইয়া গত ১২ মাসের অহিংস সংগ্রামে প্রাণ দিয়াছেন।

ভগতসিং প্রভৃতি ফাঁসী

ইহাঁদের ফাঁসীতে দেশময় গভীর ক্ষোভ সঞ্চার হইয়াছে। তাঁহাদের অবলম্বিত পথ আমি সমর্থন করি না, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড আমার মতে অন্যান্য হত্যাকাণ্ড অপেক্ষা কম নিন্দনীয় নয়, কিন্তু তাঁহাদের দেশপ্রীতি, আত্মত্যাগ ও সাহসের প্রশংসা করি। তাঁহাদের প্রাণদণ্ড রদ্ করিবার জন্য সমগ্র জাতির আকুল আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাদের ফাঁসী দেওয়ায় বিদেশী গবর্ণমেণ্টের হৃদয়হীনতার চরম পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমরা যেন ক্ষোভে, ক্রোধে আমাদের অভীষ্ট হইতে বিচ্যুত না হই। সশস্ত্র শক্তির এই ঔদ্ধত্য প্রাণহীন শাসন পদ্ধতিরই পরিচায়ক। যদি আমরা আমাদের সরল সহজ পথ হইতে বিচ্যুত না হই তবে তাঁহাদের কার্য্যে আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।...

অহিংসা স্বপ্ন নহে

ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও কার্য্যতঃ ভারত জগৎকে দেখাইয়াছে—যে, সার্ব্বজনীন অহিংসা স্বপ্ন নহে। ইহা অসীম সম্ভাবনায় পূরিত অতি বাস্তব সত্য। মানব আজ বিশ্বাসের অভাবেই হিংসার ভারে রুদ্ধশ্বাস হইয়া উঠিয়াছে। অহিংস কার্য্যে কৃষক সংঘবদ্ধ হইয়াছে, নারী এবং বালক-বালিকারাও সাহায্য করিয়াছে। অহিংসার দিক্ দিয়া আমাদের সংগ্রাম সমগ্র পৃথিবীর সংগ্রাম বলা যায়। বিভিন্ন জাতি বিশেষতঃ আমেরিকা আমাদের সহানুভূতি দ্বারা সাহায্য করিয়াছে।

গান্ধী আরউইন চুক্তি

এ সম্পর্কে সভাপতি এই মর্ম্মে বলেন—'আমরা যদি এ আপোষ না করিতাম তবে দোষী হইতাম ও গত বর্ষের ত্যাগের সুফল নষ্ট করিতাম। সত্যাগ্রহীর মত বরাবর বলিয়াছি যে আমরা শান্তির জন্য ব্যগ্র, সুতরাং শান্তির পথ উন্মুক্ত দেখিয়া সেই পথই ধরিয়াছি। যুদ্ধ বিরতির সর্ত্তানুযায়ী আমরা পূর্ণ স্বরাজ দাবী করিতে পারিব। দেশরক্ষা, সৈনিকদের উপর এবং অর্থবিভাগ প্রভৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব দাবী করিতে পারিব। আমাদেরই স্বার্থের জন্য কতকগুলি সাবধানতা সংরক্ষণ থাকিবে!' এই ব্যাপারগুলি বিষদভাবে বুঝাইয়া সর্দ্দার বল্লভ ভাই বলিতেছেন—আমরা লাহোরের প্রস্তাব হইতে ভিন্ন প্রস্তাব করিতেছি না। কেননা স্বাধীনতার অর্থ ইংরেজ বা অন্য কোন জাতির সহিত খামখেয়ালীভাবে অসহযোগিতা বর্জ্জন নহে। স্বাধীনতার অর্থ পরস্পরের মঙ্গলের জন্য, সম্পূর্ণ সমান হিসাবে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা ইহাও হইতে পারে। এই সহযোগিতা ইচ্ছা করিলেই যে কোন পক্ষ বর্জ্জন করিতে পারিবে। ভারতকে যদি আলোচনা ও চুক্তির মধ্য দিয়া স্বাধীনতা পাইতে হয় তবে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা স্বাভাবিক।'

ফেডারেশন

যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ চিত্তাকর্ষক হইলেও উহাতে শাসন যন্ত্রে নূতন জটিলতা সৃষ্টি সম্ভব। সামন্তরাজগণ কোন অধীনতার প্রস্তাবে রাজী হইবেন না। কিন্তু ঠিক আদর্শ লইয়া ইহাতে আসিলে তাঁহাদের সাহায্যে গণতন্ত্রের আদর্শ খাটো না হয় তাহাও তাঁহাদের দেখিতে হইবে।

তাঁহারা স্বেচ্ছায় যুগধর্ম্ম পালন করিলেও প্রজাগণকে ভারতের অন্যান্য প্রজাদের সমান অধিকার দিলে যুক্তরাষ্ট্রের সকলের অধিকারই সমান হইবে। সামন্তরাজদের অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে তাহা মীমাংসার জন্য একটি সর্ব্বভারতীয় আদালত গঠন করিতে হইবে।

ব্রহ্ম দেশ

ব্রহ্মদেশ ভারতেই থাকিবে না বিচ্ছিন্ন হইবে এ প্রশ্নের মীমাংসা ব্রহ্মবাসিরাই করিবে। একদল মিলিত থাকিবারই পক্ষপাতি এবং তাহাদের সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িতেছে। এ সম্বন্ধে সমগ্র ব্রহ্মের অভিমত জানার ব্যবস্থা দরকার।

সম্প্রদায়িক সমস্যা

সকল সমস্যার বড় এই সমস্যা। লাহোর কংগ্রেস স্বীকার করিয়াছেন যে সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি যে মীমাংসায় রাজী না হইবেন সে মীমাংসা কংগ্রেস স্বীকার করিয়া লইবেন। যাহারা সংখ্যায় বেশী তাহারা যদি সাহস অবলম্বন করে এবং নিজেরা সংখ্যা লঘিষ্ঠদের স্থান অধিকার করে তবে প্রকৃত একতা হইতে পারে। যে ভাবেই হউক এই একতা না হইলে লণ্ডন সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া কোন লাভ নাই। একতার জন্য কোন চেষ্টার বাকী রাখিলে চলিবে না।

বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন

ইহা না করিলে ভারতের কোটি কোটি লোক না খাইয়া মরিবে। জিনিষ পত্রের অভাবের জন্য নহে কাজ পায়না বলিয়াই ভারতের কোটি কোটি লোক অনাহারে থাকে, যদি দেশী মিলগুলিও খদ্দরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে তবে তাহাদের বিরুদ্ধেও বিলাতী কাপড়ের মতই জনমত সৃষ্টি করিতে হইবে। বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন একটা রাজনীতিক মন্ত্রই নহে, আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য উহার স্থায়ী মূল্য আছে। ভারতকে সাহায্য করিবার ইচ্ছা থাকিলে ব্যবসায়ীদের বিদেশী বস্ত্রের ব্যবসা ছাড়িতে হইবে।

পিকেটিং

এ ব্যাপারে কেহ কোনরূপ জোর জবরদস্তি করিতে পারিবে না। লোককে বুঝাইয়া কাজ করিতে হইবে। এ কার্য্যে মেয়েদের কৃতিত্ব বেশী। ইহাতে তাঁহারা জাতির কৃতজ্ঞতা ও অনশনক্লিষ্ট দেশবাসীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন।

বৃটিশপণ্য

আলোচনা ও মীমাংসা দ্বারা দেশে শান্তি আনিতে হইলে বৃটিশপণ্য বর্জ্জনে ঝোঁক না দিয়া স্বদেশী প্রচারেই মনোযোগী হইতে হইবে। স্বদেশীতে প্রত্যেক জাতিরই জন্মগত অধিকার আছে। দেশে যাহা পাওয়া যায় তাহা দেশীই ব্যবহার করিতে হইবে।

সমানাধিকার

উন্নত ও অবনতের মধ্যে সমানাধিকারের প্রশ্ন উঠিতে পারে না। এরূপ স্থলে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যে বড় তাহাকে একটু নামিয়া ছোটর সঙ্গে মিলিত হইবে। ইংরেজদের তুলনায় ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে আমরা অনেক পশ্চাতে আছি। সুতরাং তাহাদের হাত হইতে যদি আমরা দেশী ব্যবসা-বাণিজ্য রক্ষার অধিকার না পাই তবে আমাদের জাতীয় জীবনের অস্তিত্ব থাকিবে না। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেও ইহা নূতন কিছু নাই। প্রত্যেক উপনিবেশই প্রয়োজনমত এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে।

মাদক বর্জ্জন

দেশের কোটি কোটি লোকের অন্নের জন্য যেমন বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন দরকার তেমনি জাতির নৈতিক উন্নতির জন্য মাদক দ্রব্য বর্জ্জন দরকার। ইহার সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই।

স্বরাজের মূল

কংগ্রেস ঘর্ম্মাক্ত কলেবর কোটি কোটি লোকের স্বার্থের জন্যই কাজ করিতেছে। লোভ বা ক্ষমতার বশবর্ত্তী না হইয়া মানব জাতির সেবার জন্য কাজ করিলে উহা বিপুল শক্তিশালী হইবে। হিন্দুধর্ম্ম অস্পৃশ্যতা দ্বারা মলিন থাকিলে স্বরাজের কোন মূল্য নাই। সভাপতি মহাশয় প্রবাসী ভারতবাসীদের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—ভারত শীঘ্রই তাহার অধিকার ফিরিয়া পাইবে—সুতরাং প্রবাসী ভারতবাসীদের প্রতি সুবিচার করিলে সকল দেশের পক্ষেই মঙ্গলজনক। আমরা স্বাধীন হইলে বিদেশী গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ লোকেরা আমাদের নিকট যে ব্যবহার প্রত্যাশা করেন, তাঁহাদের দেশেও ভারতীয় সেই অধিকারই চায়। ইহা আমাদের বেশী কিছু দাবী নয়।

অভ্যর্থনার অভিভাষণ

কংগ্রেস অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ চৈৎরামের অভিভাষণ অতি সংক্ষিপ্ত সুস্পষ্ট কাজের কথায় পূর্ণ। ইনিও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের উপর বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন —'আমরা কি হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, পার্শী, ইহুদী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন এক বা একাধিক সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি পাইন না, যাঁহারা এই দেশকে স্বীয় মাতৃভূমি বলিয়া মনে করিতে পারেন, যাঁহার বিচার বুদ্ধির পরিপক্কতার উপর ও পক্ষপাতশূন্য দৃষ্টি শক্তির উপর আমরা অবিচলিত বিশ্বাস রাখিতে পারি। এমন লোকের নিকট আমাদের দাবী উপস্থিত করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত স্থির চিত্তে মানিয়া লইয়া এ সমস্যার সমাধান করি।'

নূতন কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি—

এবারকার কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি ইহাঁদের লইয়া গঠিত হইয়াছে :—মহাত্মা গান্ধী, ডাঃ আন্সারী, মৌলনা আবুল কালাম আজাদ, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, এম, এস, এ্যানে, কে, এফ্ নরিম্যান, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং, ডাঃ আলম্, ও পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, জয়রাম দাস, দৌলতরাম, ও সৈয়দ মামুদ জেনারেল সেক্রেটারী ও যমুনালাল বাজাজ কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

নমাজের ছুটি

কোন সাধারণ কাজেও নমাজের সময় ছুটি লইয়া সেকাজ তখনকার মত বন্ধ রাখা মুসলমানদের একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সম্পর্কে বিগত করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য—মৌলানা বলেন—সে দিন নমাজের জন্য সমিতির অধিবেশন স্থগিত রাখার প্রস্তাব করিয়া মৌলানা জাফর আলি সভা ত্যাগ করিয়া যান। তাঁহার দাবী ন্যায় সঙ্গত ছিল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মৌলানার দাবী সভার অধিবেশন স্থগিতের দাবীরই অনুরূপ হইয়াছিল। সভাস্থগিতের দাবী আমার মতে ইস্লাম ধর্ম্ম বিরোধী। ইস্লাম কখনই মুসলমানকে অন্যের কাজে বাধা দিতে প্ররোচিত করে না। বরং, ইশলামের নির্দ্দেশ এই যে অন্যের কাজের সুবিধার সঙ্গে থাপ খাওয়াইয়া প্রার্থনার সময় ঠিক করিয়া লইতে হইবে এবং ঐ প্রার্থনাই পবিত্রতর হইবে। প্রত্যেকের প্রার্থনার সময়ই যদি সভার অধিবেশন স্থগিতের দাবী করা হয় তবে উহা হাস্যোদ্দীপক ব্যাপারই হইবে। মহাত্মার প্রার্থনার সময়ও প্রেসিডেন্টের সভাধিবেশন স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য নহে!

ভগৎ সিং প্রভৃতির প্রাণদণ্ড

১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়া কয়েকজন সদস্য সামান্য আহত হন, এই সম্পর্কে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত গ্রেপ্তার হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হন! ঐ অবস্থায়ই তাঁহারা লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলায় অভিযুক্ত হন। ১৯২৮ সালের ১৭ই ডিসেম্বর লাহোর পুলিশের স্যাণ্ডার্স ও চন্দন সিং গুলিতে নিহত হন। এই সম্পর্কে ১০ই এপ্রিল লাহোরের এক বোমা কারখানায় শুকদেবকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাজগুরুও ধৃত হন গত ৭ই অক্টোবর ইহাঁদের ফাঁসীর হুকুম হয়। এলাহাবাদে পুলিশের গুলীতে নিহত চন্দ্রশেখর আজাদও এই মামলার ফেরারী আসামী ছিলেন। ভগৎ সিংয়ের পিতৃব্য সর্দ্দার অজিৎ সিং ব্রেজিলে নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতেছেন। ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসী না হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়, ইহারই জন্য দেশের জনমত বড় আবেদন নিবেদন করিয়াছিল। ভগৎ সিংয়ের ফাঁসীর কথা শুনিয়া মহাত্মা বলিয়াছেন—"ভগৎ সিংয়ের মত বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের কথা আমি আর কোথাও শুনি নাই।.. তাঁহার মৃত্যুতে আজ বহু সহস্র লোক ব্যক্তিগত বিয়োগ ব্যথা অনুভব করিবেন। এই সব যুবক স্বদেশ প্রেমিকের স্মৃতিতে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদত্ত হইতে পারে তাহার সহিত আমিও যোগ দিতেছি। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ না করিতে আমি দেশের যুবকদের সতর্ক করিয়া দিতেছি। তাঁহাদের আত্মোৎসর্গ, অধ্যবসায় ফলাফলে ভ্রূক্ষেপহীন দুর্দ্দম সাহস অনুকরণীয়। কিন্তু ঐ ক্ষমতাকে তাঁহারা যে ভাবে প্রয়োগ করিয়াছিলেন আমরা যেন তাহা না করি! নরহত্যার পথে এ দেশের স্বাধীনতা কখনই লভ্য হইতেপারে না। ...গভর্ণমেণ্ট এই ব্যাপারে বিপ্লবীদলকে হাত করিবার বড় সুযোগ হারাইলেন। ......কিন্তু জাতির

কর্ত্তব্য সুস্পষ্ট। কংগ্রেস তাহার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা হইতে এতটুকু বিচ্যুত হইবে না ......ক্রোধান্ধ হইয়া আমরা যেন ভ্রান্ত পথে পতিত না হই।' ভগৎ সিং প্রভৃতির ফাঁসীতে প্রবল উত্তেজনার মধ্যেও জাতি মহাত্মা কথিত, ভ্রান্ত পথে পতিত না হইয়া করাচী কংগ্রেসে মহাত্মা-প্রদর্শিত পন্থাই মানিয়া লইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানের দান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব হয় কিনা এই প্রসঙ্গে বাংলা কৌন্সিলে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন—১৯০৬ সন হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দুদের নিকট হইতে ৫০ লাখের উপর টকা পাইয়াছে। অথচ ঐ সময় মধ্যে মুসলমান সমাজ বিশ্ববিদ্যালয়কে দশ হাজার টাকাও দিয়াছে কিনা সন্দেহ। সাধারণ কলেজগুলির ২০,০০০ ছাত্রের মধ্যে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ২,৮০০ মাত্র! হিন্দু বালিকার সংখ্যা ৩০০ মুসলমান বালিকা মাত্র ৫ জন। ডাক্তারী বা আইন কলেজে হিন্দুছাত্র সংখ্যা ৪,৫০০, আর মুসলমান মাত্র সংখ্যা মাত্র ৮০০! ১৬৬ জন এম-বি পাশ করিয়াছে তার মধ্যে ১০ জন মাত্র মুসলমান। ১ জন মাত্র মুসলমান বি-ই পাশ করিয়াছে। কোন মুসলমান ছাত্র বি-কম বা এম-এস্‌-সি পাশ করে নাই।

কানপুর দাঙ্গা

যুক্ত প্রদেশের কয়েকটি সহরে পর পর যে ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়াছে সম্প্রতিকার কানপুরের দাঙ্গা তার মধ্যে সব চেয়ে ভয়াবহ। যে কারণেই এই দাঙ্গার উদ্ভব হউক পরিশেষে ইহা হিন্দু-মুসলমান বিরোধেই রূপান্তরিত হইয়া বহু হিন্দু মুসলমান হতাহত হইয়াছে! এ সব দাঙ্গা কাহারা বাধায় জানি না—কিন্তু যাহারা দাঙ্গা করে তাহাদের চেয়েও ইহারাই বেশী দোষী তাহাতে সন্দেহ নাই। দু'সম্প্রদায়ের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইলেই এরূপ দাঙ্গা বন্ধ হইতে পারে তাহা সত্য কথা—কিন্তু এ হৃদয়ের পরিবর্ত্তনেও যাহারা দাঙ্গা করে তাহাদের চেয়ে অন্তরালে যে সব উস্কানোর জন্য নেতা বিরাজ করেন তাহাদের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন দরকার। কারণ এরূপ দাঙ্গার মূল তাহারাই। এই সব প্রচ্ছন্ন নেতাদের কবল হইতে দু'সম্প্রদায়ের জনসাধারণকেই রক্ষা করিতে হইলে দু'সম্প্রদায়ের সত্য নেতাদের আরো আলোকে আসিয়া দাঁড়ানো কর্ত্তব্য। সম্প্রদায়গত কোন স্বার্থ এইরূপ দাঙ্গা ও খুন জখমে সাধিত না হইলেও ব্যক্তিগত হীন স্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে। দেশের স্বার্থও ডুবানো যাইতে পারে। আর এক কথা এসব দাঙ্গা হাঙ্গামা অবিলম্বে দমন সম্ভব পুলিশ প্রভৃতি দ্বারা—কারণ রাজতক্‌মা তাহাদের আছে—কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গামা জটিল হইবার সময় প্রায়ই তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা হয় না—এ কথা অনেক স্থান হইতেই শোনা যায়। এ সম্বন্ধে সরকারের আরো অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

গনেশশঙ্কর বিদ্যার্থী

কানপুরের দাঙ্গায় 'প্রতাপ' সম্পাদক মহামনা গনেশশঙ্কর নিজ জীবনাহুতি দিয়াছেন। পণ্ডিত গনেশশঙ্কর হিন্দু মুসলমান সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রিয় ছিলেন। দাঙ্গা থামাইতে গিয়া, আততায়ীর ছুরিকাঘাতে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। করাচী কংগ্রেস মণ্ডপ হইতে দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই পণ্ডিতজীর এই আত্মদানে সকলেই অশ্রু বিসর্জন করিয়াছে। গনেশশঙ্করের প্রাণদানে দেশের হিন্দু-মুসলমান এই হীন সাম্প্রদায়িক কলহ মিটাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিলেও তাঁহার আত্মা শান্ত হইবে।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা

সাম্প্রদায়িক সমস্যা লইয়া মহাত্মার মত পূর্ণ আশাবাদী লোকও আশা-নিরাশার মধ্যে দোল খাইতেছেন। করাচীতে জমিয়ৎ-উল-উলেমা-হিন্দের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী মুসলমানদের বলিয়াছেন—সাদা কাগজে তাঁহাদের কি দাবী তাহা লিখিয়া দিলে তাঁহারা তাহাই পাইবেন। উলেমার সভাপতি মৌলানা আজাদও বলিয়াছেন তাঁহারা মহাত্মার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারা বাণী মানিয়া চলিবেন। তারপর দিল্লীতে মুসলিম্ সম্মেলন হইয়াছে মৌলানা সৌকত আলীর সভাপতিত্বে! ইহাতে মিঃ জিন্নার ১৪ দফা সাম্প্রদায়িক দাবী সমর্থিত হইয়াছে ও অনেক উষ্ণ বক্তৃতা হইয়াছে।

মহাত্মাজী এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—গত ৪ঠা তারিখ মুশ্লিম দলের সম্মেলনে কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের নিকট যে প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় তাহা সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে নিম্নদাবী নহে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ বলিয়াছেন—যুক্ত

নির্ব্বাচন প্রথা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ভিত্তির উপর যাহা প্রতিষ্ঠিত নহে আমি তেমন কিছু যেন মানিতে রাজী না হই। খোলাখুলি ভাবে সাম্প্রদায়িকতার উপর ভিত্তি করিয়া সমস্যার যে সমাধান, অথচ তাহাতেও কোন সম্প্রদায়ের সর্ব্বাদিসম্মত সমর্থন নাই, তাহার সঙ্গে আমি কোনরূপে সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারি না।...সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান না হইলে আন্দোলনের পরবর্ত্তী গতি ভিন্ন আকার ধারণ করিতে পারে—কিন্তু লক্ষ্য একই থাকিবে।' ভারতের এই জাতীয়-সঙ্কট-সমস্যার সময় জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ কোনরূপেই কি সম্প্রদায়িকতার ঊর্দ্ধে জাতীয়তাকে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন না ?

ডগলস্ ফেয়ার ব্যাঙ্কস্

প্রসিদ্ধ অভিনেতা ডগলাস্ ফেয়ার ব্যাঙ্কস্ ভারতে আসিয়া সামান্য কিছুদিন থাকিয়া বিপুল অভ্যর্থনা পাইয়া আবার স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। জাহাজে উঠিবার সময় বলিয়া গিয়াছেন এবার সস্ত্রীক আসিতে পারেন।

আর্ণল্ড বেনেট

প্রসিদ্ধ ইংরাজ সাহিত্যেক আর্ণল্ড বেনেট সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি বহু বিখ্যাত উপন্যাসের লেখক ও সংবাদপত্রের নানাবিষয়ের বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল সন্দেহ নাই।

বাঙলায় সবাক্ চিত্র

ম্যাডান কোম্পানী সবাক্ বায়স্কোপ ক্রাউন সিনেমায় দেখাইতেছেন। প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ইহাকে সার্থক বলিতে হইবে এবং ক্রমশঃ ভারতীয় অভিনেতারা সবাক চিত্রে সাফল্য অর্জ্জন করিতে পারিবেন আশা হয়। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত অধ্যাপক সার সি-ভি রমণও প্রথম টকিতে টকির উজ্জ্বল ভবিষ্যত সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন। কবি কাজী নজরুল ইসলাম, শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পেসেন্স কুপার ও দু'একজন পার্শী অভিনেতার ভবিষ্যৎ বিশেষ উজ্জ্বল মনে হইল। টকিতে কণ্ঠের স্বর ও সঙ্গীতে যতটা দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে ভাবাভিব্যক্তির দিকে তেমন দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই—তাই দু'চারজন ছাড়া কাহারও কণ্ঠ শুনিলেও জীবন্ত মনে হয় না। ভবিষ্যতে ম্যাডান কোম্পানী ও অভিনেতৃগণ এদিকে দৃষ্টি দিবেন আশা করি

সাম্প্রদায়িক সমস্যায় সংবাদপত্র

সাম্প্রদায়িক সমস্যা মিটাইবার জন্য অথবা তাহাতে ইন্ধন না দেওয়ার জন্য বাংলার সংবাদপত্র-সেবী-সমিতি সম্প্রতি কতকগুলি প্রস্তাব করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক বা ঐ ধরণের রাজনৈতিক বিষয় বিশেষ বিবেচনার সহিত ধীর ভাবে আলোচনা করিতে হইবে। কোন সম্প্রদায়কে আঘাত করিয়া কোন কথা বলা হইবে না, কোন সম্প্রদায় ভীষণ অপরাধ করিলে তাহা অপক্ষপাত ভাবে আলোচিত হইবে। সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ সংবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহার উপর কোন মন্তব্য করা হইবে না। সংবাদের শিরোনামা সাবধানে দিতে হইবে ইত্যাদি। এই উপলক্ষে হিন্দু-মুসলমান বহু সাংবাদিক একত্র হইয়াছিলেন। বাংলার হিন্দু মুসলমান সাংবাদপত্রগুলির সহযোগিতায় দেশে হিন্দু-মুসলমান সদ্ভাব বর্দ্ধিত হইলে ভাল। সংবাদপত্রসেবী-সমিতিএজন্য ধন্যবাদার্হ।

মেদিনীপুর ম্যাজিষ্ট্রেটের হত্যায় মহাত্মাজী

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ জেমস্ পেডি আততায়ীর গুলীতে নিহত হইয়াছেন। এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্ক মহাত্মাজী বলিয়াছেন—যে সব যুবক এইরূপ নরহত্যা সাধন করে তাহার দেশের কোন উপকার করে না। তাহাদের বুঝা উচিত যে গত অহিংস সংগ্রামে দেশ অসামান্য লাভবান হইয়াছে। যদি কোন হিংসাত্মক কার্য্য ও হিংসা প্রচার না হইত তবে দেশ আরো উন্নতি লাভ করিতে পারিত। যাহারা রাজনীতিক হিংসা কার্য্যে বিশ্বাসী তাহাদিগকে আমি বলি—যতদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেস অহিংস ও সত্যের নীতিতে দৃঢ় থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাহাদের হস্ত সংযত রাখুক। যদি তাহারা অধীর হইয়া উঠিয়া থাকে তবে তাহাদের সময়ের একটা মেয়াদ বাঁধিয়া দিক, তাহারা যেন সেই সময়ের মেয়াদ ধর্ম্ম বিশ্বাস সহকারে মানিয়া চলে।



"সুরের প্রাণ"

(Wynne O Apperley R. I. অঙ্কিত)



৫ম বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ | ২য় সংখ্যা

সঙ্কট-কালে

গত বর্ষে রাজনৈতিক ব্যাপারে ভারত অসামান্য সাফল্য লাভ করিলেও আর্থিক ভাবে তাহাকে সর্ব্বদাই বিশেষ বিব্রত থাকিতে হইয়াছে। সাময়িক সন্ধির সঙ্গে অনেকেই আশা করিতেছে এই সন্ধি যদি স্থায়ী সন্ধি হয় তবে অবস্থাও ক্রমশঃ উন্নত হইবে আর তাহা যদি না হয় তবে ব্যবসায়-বণিজ্য সব তো রসাতলে যাইবেই, ভারতীয়দের অবস্থা তখন এখনকার চেয়েও আরও সঙ্কটাপন্ন হইবে। অবশ্য ভারতে এই রাজনৈতিক অশান্তি-বিক্ষোভ চলাতে ভারতের অর্থ-সঙ্কটের সঙ্গে জাগতিক অর্থসঙ্কটও চলিয়াছে—বিশেষত ইংলণ্ডের যে সব ব্যবসায়-পণ্য ভারতের উপর নির্ভর করিয়াই চলে তাহাদের অবস্থা তো অতি সঙ্কটাপন্ন! কিন্তু তাহা হইলেও ভারতের সঙ্গে সে সব দেশের তুলনা ঠিকমত হয়না—কারণ তথাকার লোকজনের অর্থসঙ্কটে গবর্ণমেণ্টকে যেমন রীতিমত বিব্রত হইতে হয়,—এখানে তেমন মোটেই হইতে হয় না। তাহা ছাড়া অর্থসঙ্কট তেমন ব্যাপকভাবে দেশব্যাপী হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষেই বা কতটা কি করা

দেশে রাজনৈতিক অশান্তির সূত্রপাত হইতে মহাত্মা গান্ধী বারংবার দেশবাসীকে এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলিতেছেন। বিলাস-ব্যসন একেবারে বর্জ্জন করিয়া যাহা একান্ত না হইলে নয় তেমনি ভাবে খাওয়া-পরা চালাইয়া জীবনধারণ করিতে লোককে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু গত রাজনৈতিক সংঘর্ষেই দেখা গিয়াছে যেমন-তেমন ভাবে চলিয়াও অর্থের ভীষণ কষ্ট হইতে অনেকে মুক্তি পান নাই। সুতরাং বর্ত্তমানে এ সম্বন্ধে আরও সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা দেশ-নেতাদের দেওয়া কর্ত্তব্য—যাহাতে ভারতের সকল শ্রেণীই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া এই সংঘর্ষের ভিতরেও চলিতে পারে। অবশ্য কষ্ট আসিবেই কিন্তু তাহাতে ডুবিয়া যাইতে না হয় এই জন্যই নির্দ্দেশ প্রয়োজন।

এবার দেশে অর্থ-সঙ্কটের সঙ্গে প্রয়োজনীয় প্রায় সব রকম দ্রব্যাদির মূল্যই কমিয়া গিয়াছিল—অনেক স্থলে পুরাণো কালের অর্থের পরিবর্ত্তে বিনিময়ে দ্রব্যাদি লওয়াও আরম্ভ হইয়াছিল। ইহাতে ক্ষতির কিছু নাই, এ-দিক দিয়াও আমাদের দেশ আত্মতৃপ্ত থাকিতে পারে। কিন্তু ভূমি রাজস্ব প্রভৃতি না দিয়া তো উপায় নাই—এদিকে কি উপায় অবলম্বনীয় তাহাও বিশেষ চিন্তার বিষয়। বাংলার প্রজা ও জমিদারবর্গের এ-বিষয়ে সম্মিলিত বৈঠক হওয়ার প্রয়োজন, এবং যাহাতে কেহ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়াও বাঁচিতে পারে তাহা দু'য়েরই দেখা কর্ত্তব্য।

রাজনৈতিক আন্দোলন দেশের স্বাধিকার না আসা পর্য্যন্ত চলিবেই—ইহা যদি আপোষে আসে তবে ভাল, যদি না আসে, তবে রাজনৈতিক বিক্ষোভ আরও বিপুলভাবে আসিয়া ভারতকে বিক্ষুব্ধ করিবে সন্দেহ নাই। বিলাসিতা প্রভৃতি বর্জ্জন এদিকে পূর্ণ জোর রাখিতে হইবে—তা ছাড়া অন্যান্য কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে সে সম্বন্ধেও দেশের লোককে প্রতিদিন সতর্ক করা প্রয়োজন।

প্রভাতের আলোক

—গল্প—

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ

শরতের প্রভাত।

তখনও অরুণোদয় হয় নাই। স্নিগ্ধ শুভ্র শিশির তখনও তৃণের উপর ফুলের মত ফুটিয়া আছে; কাহারও চরণের ঘায়ে, রৌদ্রের তাপে গলিয়া মাটিতে লুটায় নাই। বিন্দু বিন্দু শিশির বৃক্ষের উপর দিবসের রৌদ্রতপ্ত কিশলয়কে সারারাত্রি স্নিগ্ধ রাখিয়া প্রভাতে বিদায়ের অশ্রুবিন্দুর মত পত্রপ্রান্তে ছল ছল করিতেছে ও মাঝে মাঝে দুই একটি করিয়া তৃণাস্তীর্ণ মৃত্তিকার উপর নীরবে ঝরিয়া পড়িতেছে।

দেশপ্রাণ দীনদাস গ্রামে গ্রামে পদব্রজে যাইতেছেন। ধনী নির্ধন, অভিজাত কৃষক, বালক যুবা—সকলকে আহ্বান করিয়া দেশ সেবা সম্বন্ধে অতি সরল কথায় দুই একটি উপদেশ দিয়া যাইতেছেন।

সুপ্তিগ্রামে তাই সকলে আজ এত প্রভাতে জাগিয়াছে। গ্রামপ্রান্তে বৃক্ষলতা বেষ্টিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সকলে একত্রিত হইয়াছে।

দীনদাস বলিলেন, "তোমাদের নূতন কথা শুনাইব এমন জ্ঞান আমার নাই। শুধু কয়েকটি পুরাতন কথা তোমাদের বলিতে আসিয়াছি। অলস হইওনা, কাহাকেও অলস হইতে দিও না। মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিও না—যাহাতে কেহই ব্যবহার না করে তাহার জন্য স্নেহের সহিত প্রীতির সহিত চেষ্টা করিবে। তোমার ভাইকে অন্যায় করিতে নিষেধ করিবার অধিকার যখন তোমার আছে, তোমার দেশবাসীর উপরও সে অধিকার তোমার কেন থাকিবে না? তোমার দেশের তাঁতি, দেশের কামার, দেশের মুচি অন্নাভাবে তোমার মুখপানে চাহিয়া আছে। তাহাদের মুখের গ্রাস বিদেশীকে দিওনা। যে দিবে তাহাকে নিষেধ কর।

"অন্যায়ের কাছে মাথা নীচু করিও না। বীরের মত তাহার প্রতিবাদ করিবে। বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া সরল জীবন যাপন কর। দেশের হিতের জন্য প্রতিদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিবে—আন্তরিক প্রার্থনায় সব হয়। প্রতিদিন নিয়ম করিয়া-যত সামান্য ক্ষণই হউক—দেশের কথা ভাবিবে, দেশের কাজ করিবে। আপনার সন্তানদের দেশকে ভালবাসিতে শিখাইবে।

"স্মরণ রাখিও এপথ ত্যাগের পথ, শক্তির পথ, প্রেমের পথ। এপথ মহিমামণ্ডিত হইলেও কুসুমাস্তীর্ণ নহে। এপথে আঘাত সহিতে হইবেই সেজন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিও—হয় ব্রহ্মচারী থাকিয়া দেশের সেবা করিবে, না হয় বিবাহিত হইয়া দেশের কাজ করিবে।

"মরণের ভয় রাখিও না—বাঁচিতে চাহিলেই বাঁচিয়া থাকা যায় না।

সাধারণ উপদেশ—অসাধারণত্ব কিছুই নাই, বাগ্মিতা বা বলিবার কোন আড়ম্বর নাই। তথাপি এমনই আন্তরিকতার সহিত কথাগুলি দীনদাস বলিলেন যে, তাহা সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিল। অনেকেই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন করিয়া হউক তাহারা দেশের সেবা করিবে। কেহ বাড়ী ফিরিয়া তাহা ভুলিল, কেহ কিছুদিন পরে ভুলিল, কেহ বা চিরকাল মনের মধ্যে তাহা গাথিয়া রাখিল

২

সুপ্তি গ্রামের একটি বালকের মনে এই উপদেশ চিরকালের মত গাথা হইয়া গেল। সে বালক ধ্রুব।

ধ্রুবের বয়স ১৬ বৎসর—ইংরাজী স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। পাঠে সে সতীর্থদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সৎকর্ম্মে পরম উৎসাহী, সেবায় সর্ব্বদা উদ্যত।

ধ্রুব মধ্যমাকৃতি, গৌরবর্ণ, শান্ত কিশোর মূর্ত্তি, মুখে সর্ব্বদা দৃঢ়তা ও প্রসন্নতা ফুটিয়া আছে।

ধ্রুব বাড়ী আসিয়া মায়ের কাছে সভার সব বর্ণনা করিয়া বলিল, মা, তুমি যদি অনুমতি দাও আমি দেশের সেবা করিব।'

মাতা পুত্রের গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, 'বাবা, ইহাতে যে বিপদ্ আছে; যদি তোর বিপদ্ ঘটে?

ধ্রুব বলিল, "মা, অলস ও অকৃতজ্ঞ হইয়া বসিয়া থাকিলেও তো বিপদ ঘটিতে পারে। তোমার দুঃখে দুর্দ্দিনে

তোমার সেবা না করিলে যেমন পাপ হয়, দেশের দুরবস্থায় দেশের সেবা না করিলেও তেমনি পাপ হইবে। আমি জানিয়া শুনিয়া এই পাপ করিব?'

মা বলিলেন, 'না বাবা, পাপ করিও না।

সেইদিন হইতে ধ্রুব দেশের কার্য্যে ব্রতী হইল।

বিলাতী কাপড়ের দোকানের সম্মুখে আসিয়া ধ্রুব অবাক্ হইয়া গেল। এত লোক অম্লানবদনে বিলাতী কাপড় কিনিতেছে? কোন কষ্ট ইহাদের মনে হইতেছেনা? [illegible] এই যে সেদিন এত করিয়া বলিয়া গেলেন,—যাহা এখনও তাহার কানে বাজিতেছে—তাহা কি এত সহজে লোকে ভুলিয়া গেল। দেশের শীর্ণ, ক্ষুধার্ত্ত শিল্পিগণ এক [illegible] অন্নের জন্য সতৃষ্ণ নয়নে সকলের মুখের পানে চাহিয়া রহিয়াছে—আর এই রাশি রাশি অন্ন হাসিমুখে সবাই হৃষ্ট-পুষ্ট বিদেশীর বিরাট মুখের কাছে ধরিয়া দিতেছে। একটুও ব্যথা বাজিতেছে না?

ধ্রুবের চোখে জল আসিল। সে সকলের কাছে করযোড়ে বিনয় করিয়া বলিল, লোকের পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া অনুরোধ করিল—বিলাতী জিনিষ তাহারা যেন আর না কেনে।

পরণে মোটা খদ্দরের ধুতি, গায়ে খদ্দরের চাদর জড়ানো, নগ্নপদ, গৌরবর্ণ স্থির অচঞ্চল বালকের ক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া কাহারো কাহারো মায়া জন্মিল। দুই একজন সত্যই স্বদেশী কাপড় কিনিতে সুরু করিল

মদের দোকানে অসম্ভব ভীড়। কতজন আসিতেছে, দোকানে বসিয়া নির্লজ্জভাবে মদ খাইতেছে। তাহারা চলিয়া যাইতে না যাইতে সে স্থান অপরের দ্বারা পূর্ণ হইতেছে। কি তাহাদের মুখ, কি তাহাদের ভাষা, কি তাহাদের বলিবার ভঙ্গী—দোকানের ভিতর প্রবেশ করিবার কি [illegible] দুর্দমনীয় আগ্রহ।

ছেলেরা নিষেধ করিতে বিদ্রূপ শুনিল, হাতযোড় করিতে গালি খাইল। তখন তাহারা পথ যুড়িয়া শুইয়া পড়িল। দুই একজন ফিরিয়া গেল। বেশীর ভাগ লোক ছেলের দলকে ডিঙ্গাইয়া, তাহাদের দলিত করিয়া ব্যাকুল আগ্রহে দোকানের মধ্যে ঢুকিল

ক্রমে দোকানীদের অসহ্য হইয়া উঠিল। ইচ্ছা করিয়া ছেলেদের রাগাইয়া তাহারা একটা গণ্ডগোল বাধাইয়া দিল।

পুলিশ আসিয়া ছেলেদের ধরিয়া লইয়া গেল।

(৩)

বিচার হইল। অনেকেই আর কখন এরূপ করিবে না বলিয়া নিষ্কৃতি পাইল। ধ্রুবও তাহারই মত ৪।৫টি ছেলে এ প্রতিজ্ঞা করিল না। তাহারা হাসিমুখে কারাবাসে গেল।

ছয় মাসের কারাবাসে ছেলেদের সেই নবীন উৎসাহ ও দীপ্ত তেজ ম্লান হইল না। কারাগার হইতে ফিরিয়া আবার তাহারা নূতন উৎসাহে এই কার্য্যে ব্রতী হইল। সহরে যাহাও বা স্বদেশী দ্রব্যাদির সামান্য কাট্তি আছে, পল্লীগ্রামে তাহাও নাই। তাহারা মাথায় স্বদেশী কাপড়ের ছোট ছোট মোট্ লইয়া গ্রামের পথে গাহিতে গাহিতে চলিল

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই,
দীনদুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী তো সাধ্য নাই।"

লোকের দুয়ারে, পথের মাঝে, হাটের মধ্যে, গাছের ছায়ায় সুকুমার কিশোরগুলি এই গান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঘরের সম্মুখে কাপড় পাইয়া কেহবা কিনিল, কেহবা ফিরাইয়া দিল, কেহবা শুধু গান শুনিয়া লইল, কেহবা তাহাও শুনিতে চাহিল না।

আবার তাহারা ধরা পড়িল। আবার কারাগার বরণ করিয়া লইল। ফিরিয়া আসিয়া এবার ধ্রুবের সঙ্গীরা সকলেই একে একে সে পথ ত্যাগ করিল

তখন ধ্রুব একাকী এই পথে চলিল। আপনার সাধ্যমত দুইচারিখানা কাপড় লইয়া সে পল্লীর পথে পথে ঘুরিল, হাটের মাঝে বসিল। যেখানে জনকয়েক লোককে একত্রিত দেখিল, সেখানেই সে তাহাদের ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "দেশকে ভালবাস। দেশের জিনিষ মাথায় কর। দেশের দুঃখ দূর কর। কত মহাপুরুষ দেশের জন্য প্রাণ দিয়াছেন, প্রাণ দিতেছেন—তোমরা একবার চাহিয়াও দেখিবে না?"

অলক্ষ্যে কে তাহার বক্ষে শক্তি দিলেন, কে তাহার কিশোর কণ্ঠে ভাষা দিলেন কেহই বুঝিল না

ধরা পড়িতে ধ্রুবের দেরী হইল না! এবার দুই বৎসরের জন্য তাহার সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

সশ্রম কারাবাসেও ধ্রুবের মুখের হাসি ম্লান হইল না। তাহার মধুর স্বভাবে কঠোরহৃদয় প্রহরী পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল। যাহার সহিত দেখা হইত তাহারই সহিত সে হাসিমুখে কথা কহিত। আপনার কার্য্য শেষ করিয়া প্রহরীর অনুমতি লইয়া—যে পারিতেছে না ধ্রুব তাহার কার্য্য করিয়া দিত। কেহ মাটি কাটিতে কাটিতে হাঁফাইয়া উঠিয়াছে, ধ্রুব তাহার হইয়া মাটি কাটিতে লাগিল। জল তুলিতে তুলিতে কেহ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছে, সে পাত্র লইয়া তাহার বদলে জল তুলিতে লাগিয়া গেল।

জেলখানার বন্দিগণের কদর্য্য আহার, তাহাদের প্রতি প্রহরীগণের হৃদয়হীন ব্যবহার ও সর্ব্বোপরি তাহাদের নিরাশার ভাব ও পাপের প্রসার দেখিয়া ধ্রুবের কোমল হৃদয় অবিরত ব্যথিত হইতে লাগিল।

একদিন এক বৃদ্ধ পীড়িত বন্দীর চোখে জল দেখিয়া ধ্রুব অস্থির হইয়া পড়িল। কারাধ্যক্ষ ধ্রুবকে তাহার মধুর স্বভাবের জন্য ভালবাসিতেন। ধ্রুব তাঁহার নিকট অনুমতি লইয়া পীড়িত বন্দীর শুশ্রূষায় রত হইল।

বৃদ্ধ বলিল যে, তাহার একমাত্র পুত্র বাড়ীতে অসহায় হইয়া পড়িয়া আছে। প্রথমে সে লোভে পড়িয়া চুরী করে; মুক্তি পাইয়া ভাবে আর কখন চুরী করিবে না। কিন্তু দাগী বলিয়া কোথাও চাকুরী না পাওয়ায় অভাবের জন্য আবার চুরি করিয়া জেলে আসে। দুই বৎসর পরে সেবারে মুক্তি পাইল। কিন্তু সেবার চাকুরী দূরে থাক মজুরের কার্য্য পাওয়াও তাহার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল। শেষে রাগে নিরাশায় আবার সে চুরী করে। এইবার পাঁচ বৎসর জেল হইয়াছে। এইবার যেরকম তাহার শরীরের অবস্থা, পাঁচ বৎসর জেল খাটিয়া আর তাহাকে বাড়ী ফিরিতে হইবে না।

ধ্রুবের শুশ্রূষা তুচ্ছ করিয়া বৃদ্ধ পুত্রের কথা ভাবিতে ভাবিতে একদিন মরিয়া বাঁচিল।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে ধ্রুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাহার উপর বৃদ্ধের রোগ ছিল একপ্রকার সংক্রামক। ধ্রুব ক্রমে বৃদ্ধের রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িল। শেষে তাহার আর জীবনের আশা রহিল না।

কারাধ্যক্ষ বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন। একদিন তিনি ধ্রুবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহারও সহিত তোমার যদি দেখা করিবার ইচ্ছা থাকে, কিম্বা কাহাকেও যদি কিছু বলিতে চাও আমাকে বল।

ধ্রুব বলিল, আমি মরিয়া গেলে আমার মাকে সংবাদ দিবেন যে আমি কোন কষ্ট পাই নাই, সুখে মরিয়াছি। বলিবেন, আবার আমি ফিরিব, আবার ঐ মায়ের কোলে জন্মিব; মায়ের কাছে দেশকে ভালবাসিতে শিখিব। শিখিয়া দেশে জন্য মরিব।"

বলিতে বলিতে ধ্রুব উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কারাধ্যক্ষ বলিলেন, "আমি সব কথা বলিব, তুমি শান্ত হও তুমি যদি আরো কিছু আমাকে করিতে বল, তাহাও আমি তোমার জন্য করিব।"

কক্ষের চারিদিকে একবার চাহিয়া ধ্রুব ধীরে ধীরে বলিল, "আমাকে একটু বাহিরে লইয়া চলুন; একটু আলোকে একটু মুক্তির মাঝে মরিতে দিন্।"

কারাধ্যক্ষের আদেশে কক্ষ হইতে শয্যাসহ ধ্রুবকে অতি সাবধানে প্রাঙ্গণে আনা হইল।

প্রাঙ্গণের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীরে ধ্রুবের মুক্তিপ্রয়াসী দৃষ্টি আহত হইয়া ফিরিয়া আসিল। ধ্রুব ক্লিষ্টকণ্ঠে কহিল, এখানেও যে আমি নিঃশ্বাস পাইতেছিনা। যদি একটিবার আমাকে বাহিরে লইয়া যান!—আমি তো আর ইচ্ছা করিলেও বাহিরে পলাইতে পারিব না।"

ইহা নিয়মের বহির্ভূত। কারাধ্যক্ষ একটু ভাবিলেন; পরে আপনি সঙ্গে থাকিয়া ধ্রুবকে বহিরে আনিবার ব্যবস্থা করিলেন।

বাহিরের মুক্ত বায়ু অঙ্গে লাগিতে ধ্রুবের মুখে প্রফুল্লতা ফুটিয়া উঠিল।

মাথার উপর অনন্ত বিরাট নীলাকাশ, পায়ের দিকে স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বতী, পরপারে সুদূর প্রসারিত শস্যশ্যামল প্রান্তর— দূর দূরান্তরে চক্রবালপ্রান্তে রক্তসূর্য্য অস্তপ্রায়।

ধ্রুব একবার মেঘলেশহীন মুক্ত আকাশের পানে চাহিল, একবার দুকূল প্লাবিনী নদীর শুভ্র বারিরাশির পানে চক্ষু মেলিল, একবার পশ্চিমাকাশের শেষ প্রান্তে তরঙ্গায়িত সুবর্ণ সমুদ্রের উপর শেষ দৃষ্টি রাখিল। একবার বলিল, "ভগবান্ আরো আলো, আরো মুক্তি দাও।"

তাঁরপর তাহার স্নিগ্ধ শান্ত নয়নছটি ধীরে ধীরে মুদিয়া আসিল—বুঝি দীপ্ততর আলোক ও প্রিয়তর মুক্তির উদ্দেশে ধাবিত হইল।

সূর্য্য অস্ত গেল। ম্লান সন্ধ্যা ধীরে নামিয়া আসিল। ক্রমে আকাশ, বাতাস, প্রান্তর, নদীতট—সব অন্ধকারে ডুবিয়া গেল।

এই অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশের বক্ষঃ ভেদ করিয়া কতক্ষণে আবার প্রভাতের আলোক ফুটিয়া উঠিবে?

হে আমার কল্পলোক বিলাসী সুন্দর

শ্রীঅমলা দেবী

জীবনের সাথী নহ ক্ষণিক স্বপনে
কখন রাঙালে ওগো আমার গগনে!
হে আমার কল্প লোক বিলাসী সুন্দর
তোমার কল্যাণ হস্ত মোর বাহু পর
কখন রেখেছ ওগো আজো নাহি জানি!
মানস সুন্দর ওগো স্বপনে ধেয়ানী
তোমার অরূপ রূপ। সুদূর গগনে
তোমারি লেখনি যেন কবে আনমনে
কি কথা লিখিয়া দেছে তারকা আখরে।
তোমার আহ্বান ওগো বনে বনান্তরে
বসন্তের মঞ্জরিত শাখায় শাখায়
দু'বাহু বাড়ায়ে যেন খুঁজিছে আমায়।
সন্ধ্যার বিনম্র শান্ত ম্লানিমা আলোকে
গাঁথিছ বসিয়া মালা কোন দূর লোকে
আমার লাগিয়া। বৃথা গাঁথা মালা, শেষে
তাঁরার কুসুম গুলি ম্লান হাসি হেসে
ছিঁড়ে ফেলে দাও এই ধরিত্রীর পানে।
হে চির-বিরহী মোর, বিরহের গানে
এবার সমাপ্তি দাও। আন আর বার
তোমার পরশ খানি শান্ত সান্ত্বনার
নিদ্রাতুর আঁখি। দাও গো নয়নে
চিরতরে মহাঘুম অতি সযতনে।

ক্ষণিকা

শ্রীঅমলা দেবী

সেত নহে অজিকার কালিকার কথা!
কত যুগ যুগান্তের বিস্মৃত বারতা
ভোলা সে কাহিনী। আজ কেন মনে হয়
ঘুরে ফিরে, সেদিনের ক্ষণ পরিচয়
ক্ষণিকের মায়া। বসন্তের সাঁঝে
'হবনা বিস্মৃত তোমা' মিলনের মাঝে
হয়ত বলিয়াছিনু। হে মোর কল্যাণী
তবুত ভুলিয়া গেছি সেদিনের বাণী।
রজনী ঘনায়ে আসে ঘোর অন্ধকার
তোমার কোমল স্পর্শ আজি বার বার
মনে পড়ে! হে মোর ক্ষণিকা
কোন সে সুদূরলোকে তব দীপ শিখা
জ্বালায়ে তুলেছ ওগো। কোন দিন শেষে
নবীন পথিক আমি সে নূতন দেশে
অজানা সে তীর্থে যদি পথ খুঁজে মরি,
তব মন বন মাঝে উঠিবে গুঞ্জরি
ক্ষণিকের পরিচয়? অথবা স্বপন
নিমেষ নিদ্রার কোলে লীলা অগণন
জাগরণে গেছ ভুলে! তাই যদি হয়
আমারো স্বপন মোহ ভাঙিবে নিশ্চয়!

সূচনা

শ্রীবিমলা দেবী

—"পাঠশালা পালায় জানি, স্কুল পালানও শুনেছি, কিন্তু কলেজ অফিস পালানটা তোমারই প্রথম আবিষ্কার" পরিহাস সূচক কণ্ঠে কলহাস্যে বিজলী বল্লে।

স্বামী অপরেশ স্ত্রীর কথার সুরে, অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল, বই খাতাগুলো এলোমেলো ভাবে টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে মৃদুহাস্যে বল্লে "কি আশ্চর্য্য, মাথাটা যে ধরা ধরেছিল তাই চলে এলাম।"

অপরেশ শয্যার উপর বসে পড়ল। বিজলী পাশে এসে দাঁড়াল, "সত্যি! ভাগ্যিস মাথা ধরাটা সম্বন্ধে লোকে প্রমাণ চেয়ে বসে না। কিন্তু ভাবছি, তোমার মাথা ধরার কৈফিয়ৎটা আমার কাছে যতই সহজ সচল হোকনা বাড়ীশুদ্ধ সাবারি কাছে সেটা আড়ষ্ট অচলই হয়ে রইবে, বিশেষ সেজ ঠাকুরঝির যে মুখ!"

আবরণটা খসেই যখন গেল, সেটাকে আর টানাটানি করে, ঢাকা দেবার বৃথা চেষ্টা না করে-অপরেশ হেসে উঠল। বিজলীর একখানা হাতধরে নিজের পাশে আকর্ষণ করে বল্লে "কে মিনু ত? আচ্ছা ঠাট্টা যখন, করবে আমাকে ডাক দিও, আমি অচলকে সচল করে দেব। আমিত মাথা ধরলে বাড়ী আসি, নরেশ শ্বশুর-বাড়ী আসত যে।"

—"আহা কি সচলই হ'ল। যাও!"

—"খুব যে তেজ করছ, যেতে পারিনা যেন! আচ্ছা দেখ।" অপরেশ একটু খানি নড়ে বসল। বিজলী তাড়তাড়ি তার একখানি হাত চেপে ধরে বল্লে—"যাওনা, কেমন যেতে পার—এখুনি এমনি বিষ্টি আসবে।"

অপরেশ এইবার লম্বা হয়ে-বিছানায় শুয়ে পড়ল, হেসে বল্লে—"আচ্ছা সত্যি কথা বলতে তোমাদের এত কষ্ট হয় কেন বলত? স্বামীরা যদি কলেজ অফিস পালায়, স্ত্রীরা তাতে বেশ রীতিমত খুসি হয়ে ওঠে, অথচ বলবার সময় ঠিক উল্টোটি বলে বসে থাক।"

—"তোমরা কোন সত্যি কথা বল!"

—"বলি না!"

—"না"

—"যথা—"

—"যথা তোমার মাথা ধরেনি।"

—"না তাত ধরেইনি—তুমি যে রকম মাষ্টারী করছিলে,—বেচারীর না ধরে উপায়?"

বিকেল বেলায় ভাঁড়ার ঘরে বসে মিনু ফল কাটছিল, বিজলী এসে দাঁড়াল - "আমি কুটবো ঠাকুরঝী!"

—"না থাক আমি কুটে দিচ্ছি, ছোড়দার বুঝি আজো একটা কোন রকম বিপর্য্যয় অসুখ করেছিল?"

কৌতুক হাস্যে মিনু প্রশ্ন করলে।

অপরেশ সেই পথে বাইরে যাচ্ছিল—মিনুর কথায় দ্বারের কাছে এসে দাঁড়াল—"কি জিজ্ঞেস করছেন শুনি?"

অপরেশ হাসলে।

—"তোমার অসুখ করেছিল বুঝি?"

—"হুঁ।"

—"মাকে বলি।" কৃত্রিম ব্যস্ততায় মিনু বলে।

—"আজ্ঞে না মাকে আর বলতে হ'বে না, হয়েছে। তোর ত ভারি বাড় বেড়েছে দেখতে পাই, বলে দেব সেই নরেশের কথাটা?"

মিনু অকস্মাৎ রণে ভঙ্গ দিয়ে উঠে পড়ল—

—"যাও ছোড়দা; কি যেন—হ্যাঁ! ও বৌ ফলগুলো তুলে রেখ ত ভাই।" মিনু হাসি মুখে বেরিয়ে গেল।

নির্জ্জনতার সুযোগে বিজলীর মাথাটী একবার নেড়ে দিয়ে অপরেশ চলে গেল।

২

—"কোথায় যাওয়া হয়েছিল! রাত তেরটা অবধি তোমাদের আড্ডা আর ভাঙ্গেনা।" বিজলী এসে বসল।

অপরেশের তখন তন্দ্রা আসছিল; বল্লে "হুঁ"। বিজলী হাতের পানগুলো টীপায়ের ওপর রেখে একবার বিনিদ্রিত খোকার দিকে, একবার তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বামীর দিকে চাইল; পাশের খোলা জানলা দিয়ে, শীতের বাতাস আর চাঁদের

আলো একসঙ্গে ঘরে ঢুকছিল। বিজলী বল্লে—"তুমি কি কেবলি ঘুমুবে?"

—"না"

—"ওকি রকম হল! আচ্ছা দাঁড়াও না দিচ্ছি খোকাকে জাগিয়ে।"

তন্দ্রা-ব্যস্ত হয়ে উঠল—অপরেশ বল্লে—

"লক্ষ্মীটি না দেহাই তোমার—ভারি ঘুম আসছে।

—"আমার যে আসছেনা, দেখনা কি সুন্দর চাঁদের আলো, কী তুমি!"

শীত করছিল বেশ—অপরেশ লেপটাকে কান অবধি টেনে নিল, চোখ মেলে চাইল,—

—"বুড়ো হয়ে গেছি, কেন আর জ্বালাও? লেপের মধ্যে ঢুকে শুয়ে শুয়ে যত পার চাঁদের আলো দেখ! এখুনি মাতা পুত্রে এমনি যুদ্ধ বাধাবে যে আপনিই ঘুম পালাতে পথ পাবেনা।"

—"আচ্ছা বেশ।"

বিজলী রাগ করে উঠে দাঁড়াল।

অপরেশ চোখ বুজেই বল্লে—"রাগ কোরনা লক্ষ্মিটী, ভারি ঘুম আসছে।"

বিকেলে বিজলীরা কোথায় বেড়াতে যাচ্ছিল; ছোট ননদ রাণী বেরিয়ে এল—"ওমা ওকি, না বৌদি তবে আমিও এমন সং সেজে যাব না। তুমিত বেশ!"

—"নে নে বুড়ো হচ্ছি না, এখন কি তোর সঙ্গে সমান হ'লে মানায়? এই বেশ হয়েছে।"

—"আমি বুঝি খুকি? না বৌদি ওকি ভাই, আমার লজ্জা করছে।"

বিজলী হাসলে—"নতুন বিয়ে হয়েছে না! এখন লজ্জা সজ্জা দুই মানাবে।"

অপরেশ সেই পথে যেতে যেতে একবার বিজলীর দিকে চাইল—"পুরোণতেও বিশেষ বে মানান হ'বেনা।"

—"আচ্ছা থাক হয়েছে; বোক না! তোমার চা ঘরে রেখে এসেছি বুঝলে? আর হ্যাঁ আর আমাকে কিছু টাকা দিতে হ'বে শুনছ?"

—"শুনছি, নাওগে।"

অনেক কাল পরে। রাত্রে অপরেশ আহারে বসেছে—বিজলী এসে বসল—"দীনুর কলেজ খুলতে এখনও ত দেরী আছে, ওর বন্ধুরা সব দল করে পশ্চিমের দিকে বেড়াতে যাচ্ছে দীনুও যেতে চাইছে, যাক না; যাবে?"

অপরেশ মুখ তুলে চাইল—"কে কে যাবে?"

—"তা কি জানি, সন্তোষ, শৈলেশ, মিহির—ওরাও যাবে শুনেছি, তোমার আপত্তি আছে?"

—"না আমার আর—আপত্তি কিসের, যাক।"

—"মাছের ডালনাটা আরটু এনেদি?

দুখানা লুচি আরো নাও, কিছু খাওয়া হ'লনা যে। ও বুলু মিষ্টির রেকাবীখানা নিয়ে আয়ত। বিন্দু ঠাকুঝি, সেদিন বুলুর সম্বন্ধের কথা বলছিল, নিতাই বাবুর ছেলের সঙ্গে, ছেলেটিত ভালই না? বেশ পড়শুনো করছে

প্রশ্নোত্তর বিজলী আপনা আপনিই করছিল। রাত্রের আহারাদি সেরে, বিজলী পান চিবুতে চিবুতে বারাণ্ডায় এসে বসল।

গ্রীষ্মকাল অন্ধকার প্রায় বারাণ্ডা—

ইজিচেয়ারের উপর অপরেশ চুপ করে শুয়েছিল, —"তোমার পান দেয়নি! বুলুকে বল্লাম যে।"

—"দিয়েছে ত।"

—"দেখ মণ্টুটা এমনি দুষ্ট হয়েছে রোজ ইস্কুল পালিয়ে আসে।" চিন্তিত বিরক্ত সুরে বিজলী বল্লে।

অনেক কালের হারান দিনের একটী স্মৃতি অপরেশের মনে পড়ে গেল, ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটে উঠল

—"ছেলে মানুষ এখনও।"

—"হুঁ"

ছেলেমানুষ! এখন থেকে শাসন না করলে শেষে, কোন কালে বুড়ো মানুষ হ'বেনা।"

অপরেশ সশব্দে হেসে উঠল—"হ'বে হ'বে ওর বাপও কলেজ পালাত কিনা! ওটা বুড়েমানুষির সূচনা।"

পাথেয় উপন্যাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৭)

"আচ্ছা দাদা, আসার আগে কি একখানা পত্র দিয়েও আসতে নেই ?"

শশাঙ্ক টেবলের উপর ঝুঁকিয়া ফুলদানিতে রক্ষিত গোলাপ ফুলের তোড়াটা হাতে তুলিয়া লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল, "শোন, হঠাৎ আসায় কি তোমায় কোন অসুবিধা ভোগ করতে হল ?"

তাহার কণ্ঠস্বরে রাগের আভাস পাইয়া মনীষা হাসিল, বলিল, "কি যে বল দাদা, অসুবিধা বিশেষ তো নেই বরং কথা বলবার মত একটা লোক পেয়ে আমি যেন বেঁচে গেলুম মনে হচ্ছে।"

শশাঙ্ক কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "তোমামোদে তোমরা—মেয়েরা যতটা পারদর্শীতা দেখাও ততটা যদি আর কিছুতে দেখাতে, হয় তো একটা কাজের মত কাজ হতো।"

মনীষা তাহার চেয়ে বেশী গম্ভীর হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, ইতিহাসে হয় তো নামও থাকত। ঠাট্টা তামাসা ছেড়ে দাও, বল দেখি কত কাল এখানে এস নি ?"

শশাঙ্ক হিসাব করিয়া বলিল, "তা বছর চার পাঁচ হবে।"

মনীষা বলিল, "বাবা কি কম দুঃখ করেন ! বলেন শশাঙ্ক আমাদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক তুলে দিলে, আর সে আসবেও না, পত্রও দেবে না।"

"আর তুমি কিছু বল নি, কিছু ভাব নি মনীষা ?—শশাঙ্ক কপট গাম্ভীর্য্য ত্যাগ করিয়া হাসিমুখে মনীষার পানে তাকাইল ?

মনীষা বলিল, "বলি বই কি দাদা, তোমার কথা আর মনে হবে না ? আমি তো ভাই নই, আমি যে বোন, বোনের স্নেহ মায়া যে বড় বেশী রকমই হয়। মাঝে একবার একদিনের জন্যে তোমায় পুরীতে দেখেছিলুম, বললে শিগ্‌গীরই এখানে আসবে, তার পরে আর তো এলে না। আজ যদি দিদি বেঁচে থাকতেন, তা হলে কি এমনই করে আমাদের সকলের মায়া কাটাতে পারতে ? আজ দিদি নেই কিনা, সেই জন্যে আমাদের সঙ্গে তোমার আর কোন সম্পর্কই নেই।"

শশাঙ্ক বলিল, "ঠিক তাই নয় মনীষা, অনেক দূরে ছিলুম, এবার আবার ফিরে তোমাদের কাছেই এসেছি, বোধ হয় এবার তোমাদের কাছেই থাকতে পারব। প্রতি সপ্তাহে একবার করে আসবই আর রবিবার দিনটা যে এখানেই কাটাব এ ঠিক কথা।"

মনীষা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় এসেছ ?"

শশাঙ্ক বলিল, "এই খড়্গাপুরে।"

মনীষা আনন্দিত হইয়া বলিল, "বাবা একথা শুনে ভারি আনন্দ পাবেন। বাস্তবিক তাঁর কথা ভাবলে আমার বড় দুঃখ হয়। যাঁর আজ উপযুক্ত ছেলে উপযুক্ত মেয়ে জামাই বর্ত্তমান থাকবার কথা—তাঁর রয়েছে বিধবা পুত্রবধূ—আর রয়েছে জামাই। নিজের যা তা তাঁর কেউই রইল না—রইল কেবল পর।"

অন্যমনস্কভাবে শশাঙ্ক বলিল, "তাই বটে।"

মনীষা বলিল, "নিজে একলাই এলে দাদা, বউদিকে আনলে কি ক্ষতি হতো ? এবার যেদিন আসবে বউদিকে সঙ্গে করে এনো। বাবার তাতে একটু দুঃখ হবে না, বরং আনন্দেই হবে। আর সেখানে নতুন জায়গা, কোথায় এখন রাখবে, এখন দিনকত এখানে আমার কাছে থাক না কেন ?"

শশাঙ্ক চাপা হাসি হাসিয়া বলিল, "তাকেও তো তোমারই মত আদর্শ হিন্দু মেয়ে করে গড়ে তুলবে, অমনি করে পুতুল পূজো শেখাবে ? এর পরে আমি যখন মরব তখন আমার ফটোখানা নিয়ে বসে থাকবে তো ?"

মনীষা মুখ ভার করিয়া বলিল, "ভয় নেই গো ভয় নেই,

তোমার বউকে আমি কিছু শেখাব না, তাকে মেমসাহেব করেই না হয় রেখে দেব। তুমি এক হপ্তা তাকে রেখে দেখ—সে বদলায় কিনা, যদি বদলানোর ভাব দেখতে পাও তাকে নিয়ে যেতে তোমার কতক্ষণ লাগবে ?"

শশাঙ্ক গম্ভীরমুখে বলিল, "হাঁ, ওসব আমি মোটেই ভালবাসি নে, দিব্যি মেমসাহেব হয়ে থাকবে, কেবল ইহকালটাই দেখবে - পরকাল মোটেই দেখবে না—আমি তাই চাই। এখন যে যুগের হাওয়া বইছে, এ হচ্ছে স্ত্রী-স্বাধীনতার যুগ, এ যুগে মেয়েদের মনে দাসত্ব ভাব জাগিয়ে রাখা কোনমতেই উচিত নয়। আমরা শিক্ষিত সংঘ, আমরা ইচ্ছা করি নে—যদিই আমরা মরে যাই, আমাদের স্ত্রী আমাদের ফটো নিয়ে পূজো করে তার জীবন দারুণ ক্লেশে ক্ষয় করবে। আমরা বলি—পুরুষের যেমন পূর্ণ মাত্রায় অধিকার আছে নারীরও তেমনি আছে। স্ত্রী মারা গেলে কয়জন পুরুষ তার ফটো দিনরাত পূজো করে জীবন কাটিয়ে দেয় বল দেখি ? তারা যখন তা করে না তখন নারীই বা কেন করবে ? তাদের মনের বাসনা কামনা বৃত্তিগুলো সমূলে উৎপাটিত করে সংসারে লক্ষ অভাব অনাটন, দুঃখ কষ্টের মধ্যে জোর করে সংযম নিষ্ঠা বজায় রেখে নারীদের আমরা দেবী সেজে থাকতে বলি নে।"

মনীষা বিস্ময়ে শশাঙ্কের পানে তাকাইয়া রহিল, শশাঙ্কের কথা সে বুঝিতে পারিতেছিল না

তাহার মুখের উপর অবিচল দৃষ্টি রাখিয়া, শশাঙ্ক বলিল, "আমি বেশ বুঝেছি তুমি আমার কথা বুঝতে পারনি। কিন্তু আমিও ঐ কথাটা তোমায় স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে চাই। আমাদের দেশে অকালমৃত্যুর সংখ্যা কত বেশী তা তুমি জানো ; অল্পবয়স্ক যে সব ছেলে মারা যায় তাদের মধ্যে অধিকাংশই বিবাহিত। যাদের তারা পেছনে ফেলে রেখে যায়, সেই সব তরুণীদের কথা ভাব দেখি। এদের আশা আকাঙ্ক্ষা কিছুই মেটে না, উন্মেষেই ধ্বংস হয়ে যায়। জোর করে এই সব তরুণীদের দিয়ে ব্রহ্মচর্য্য পালন করালেও সেটা কি প্রকৃত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালিত হয় ? এমনই কত তরুণী বিধবা নিঃশব্দে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে যাচ্ছে শুধু দেশাচারের মর্য্যাদা রাখতে—নিজেদের ধর্ম্ম বা ব্রত বলে নয় এটা বোধ হয় তুমি আজ স্বীকার করবে মনীষা ?"

মনীষা অন্যমনস্কভাবে জানালা-পথে বাহিরের পানে তাকাইয়া ছিল, এইবার মুখ ফিরাইল, বলিল, "কিন্তু সকলেই কি বাস্তবিক দেশাচারের মর্য্যাদা রাখতেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করে যায় দাদা ? আমি যদি আজ জোর করে বলি তুমি ভুলের পথে চলেছ, সত্য পথ দেখতে পাওনি, সত্যকে চিনবার চেষ্টাও করনি, তুমি তর্ক করতে পার ?"

শশাঙ্ক বলিল, "যতক্ষণ না প্রমাণ পাব ততক্ষণ তর্ক করতেই হবে। তুমি বলবে এই সব মেয়েরা বাস্তবিক আন্তরিকতার সঙ্গেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, কিন্তু সে প্রমাণ আজকে দাও নইলে আমি বিশ্বাস করব কি করে, কেমন করে জানব যে তারা কেবল দেশাচার রাখতেই ব্রহ্মচর্য্যে পালন করছে কিনা।"

ক্ষুণ্ণস্বরে মনীষা বলিল, "আমি বলছি বাস্তবিক আন্তরিকতার সঙ্গে একটা কাজ সকলেই করতে পারে না। ধর্ম্ম বিশ্বাস বাবার আছে, তোমার নেই কেন, অবশ্য তোমারও তো থাকা উচিত ছিল কারণ ধর্ম্ম মানুষমাত্রেরই নিজস্ব জিনিস। তা যে রকম নেই, সেই রকম ব্রহ্মচর্য্য নিয়ম পালনের প্রতিজ্ঞা ও সকলের মধ্যে নেই। কিন্তু তাও আবার বলি দাদা শিক্ষিত ছাত্রকে যে বিষয় শিক্ষা দেন সে বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা থাকা চাই, তাঁর নিজেকে দৃষ্টান্তস্বরূপ করা চাই। এতটুকু যে সব মেয়েরা বিধবা হয় তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যে, তাদের সামনে আদর্শ ফুটিয়ে তুলবার জন্যে এখনকার দিনে কয়জন লোক আমার শ্বশুরের মত নিজের ভোগ বিলাস ত্যাগ করে নিস্পৃহ থাকতে পারে বল দেখি ? বিধবাদের মনে এভাব কয় জন লোক জাগিয়ে তোলে ? তারা আর কেউ নয়, তারা দেবতার উৎসৃষ্ট ফুল, তারা মা, তারা সংসারের হিতের জন্যে সৃষ্ট, সংসারের হিতই করে যাবে। আমার মনে হয় অনেক বিধবা কেবল দেশাচারের বশেই তাদের ব্রত পালন করে না দাদা, বাস্তবিক ধর্ম্ম ব্রত জেনেই আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করে যায়। ওদের এই ব্রহ্মচর্য্যের কষ্টের পেছনে যে মহান ত্যাগ আছে তার মধ্যে কতখানি শুভ কামনা নিহিত আছে তা তুমি বুঝতে পারবে না। তবে একদিন হয়'তো বুঝতে চেষ্টাও করবে, সত্য যেদিন তোমার সামনে প্রকাশ হবে সে দিন সবগুলোর আসল মূর্ত্তি দেখতে পাবে।"

শশাঙ্ক খানিক চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "যাক্, এতকাল পরে প্রথম দর্শনেই মনান্তর ঘটে গেল। কিছু মনে করো না মণি, ও সব কথা যেতে দাও এখন অন্য কথা বলা যাক্ এসো।

মনীষা প্রসন্ন মুখে বলিল, "মনান্তর যাই হোক না, তুমি যদি কথাটা বুঝতেও পারতে তোমার মনের ধারণা যদি একটুও বদলে যেত, সত্যিই আমি সুখী হতুম। থাক, ওসব কথা, তা হলে বউদিকে তুমি এখানে আনতে চাও না, আমার কাছে রাখতে চাও না কেমন?"

শশাঙ্ক হাসিমুখে বলিল, "বিয়েই করিনি বউ পাব কোথায়? কেন তোমাদের স্বামী মারা গেলে তোমরা ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে পার আমাদের বউ মরে গেলে আমরা বুঝি ব্রহ্মচর্য্য পালন করতে পারিনে? তবে এটা ঠিক কথা তোমাদের মত তার ফটো সামনে রেখে বসে থাকিনে, পূজোও করিনে, ওগুলো তোমাদের মেয়েদের একচেটে পুরুষের নয়।"

সে প্রচুর হাসিতে লাগিল। মনীষা বিস্মিত হইয়া বলিল, "বিয়ে করনি? তোমাদের পুরুষদের মধ্যে যখন বিয়ে করার নিয়ম আছে।"

বাধা দিয়া শশাঙ্ক বলিল, "ওই দেখ, আবার সেই ভুল করছ। শোন মনীষা, মনে করো না তোমাদের শাস্ত্রগুলো আমি কিছু পড়ি নি—সব উদরস্থ করেছি, বাকি কিছু রাখিনি। সেকেলে যোগী ঋষিরা যে আইন তৈরী করে গেছেন, সেগুলো কেবল যে মেয়েদের জন্যে নয় পুরুষদের জন্যও বটে একথা তো অস্বীকার করতে পারবে না। তখন মেয়েরা বিধবা হলে যার ইচ্ছে হতো বিয়ে করত, অর্থাৎ আজকালকার মত বিধবা বিবাহ সেকালেও প্রচলিত ছিল, পুরুষদেরও তেমনি ছিল, কেউ কেউ আর বিয়ে না করেও জীবন কাটিয়ে গেছে। তুমি ব্রহ্মচর্য্য পালন করে যাচ্ছ, আমার বেলায় কি সেটা দোষের হবে?"

মনীষা একটু হাসিয়া বলিল, "দোষের নয় বরং গৌরবের, কিন্তু যে তুমি একটু আগে এতবড় বক্তৃতাটা দিয়ে ফেললে—"

শশাঙ্ক মাথা দুলাইয়া বলিল, "ঠিক কথাই বলেছি, ওর মধ্যে বেঠিক কিছু পাবে না। আমি যা করি বা করছি তা খুসির খেয়ালে মাত্র, হয় তো কোনদিন আবার বিয়েও করে বসতে পারি—আমার বেলায় সেটা কিছু দোষের নয়, কিন্তু তুমি যদি বিয়ে কর সেটাই বা কেন দোষের হবে? তুমি কি বলতে চাও না তোমার সমাজ তোমার চারিদিকে সংস্কারের বেড়া দিয়ে বাইরে বসে চোখ রাঙিয়ে তোমার পানে চেয়ে নেই, বেড়া ভাঙ্গবার চেষ্টা করলেই সে তোমার গায়ে লাফিয়ে এসে পড়বে না? কিন্তু আমি পুরুষ, আমার জন্যে যদিও আইন আছে তবু সে আইন ভাঙ্গলে কেউ আমায় একটা কথাও বলবে না; দেখ দেখি তোমার আমার মধ্যে কতখানি পার্থক্য আধুনিক সমাজ জাগিয়ে রেখেছে?"

মনীষা কি বলিতে যাইতেছিল, শশাঙ্ক বাধা দিয়া বলিল, "না, আর কথা নয়। বুঝেছি তুমি এখনও জল পর্য্যন্ত খাও নি, তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে। বেলা আড়াইটে বেজে গেছে, যাও খেয়ে এসো।"

মনীষা হাসিল, "ও আমার সহ্য হয়ে গেছে,—জল খাওয়ার জন্যে বিন্দুমাত্র কষ্ট হচ্ছে না।"

শশাঙ্ক মাথা নাড়িয়া বলিল, "হুঁ, তাতো সহ্য হচ্ছে, যাদের মাসে দুটো করে একাদশী করতে হয় তাদের সহ্য না করা ছাড়া উপায় কি? কিন্তু যাও মনীষা, তোমার কোন কথা আর আমি শুনতে চাই নে, আমি ততক্ষণ খানিক বিশ্রাম করি, তুমি খেয়ে এসো।"

সে একখানা সোফার উপর শুইয়া পড়িল।

মনীষা বলিল, "তুমি খেয়েছ?"

শশাঙ্ক বলিল, "তোমার মত পূজো আহ্নিক নিয়ে তো থাকি নে, দশটা না বাজতে অগ্নিদেব জ্বলে ওঠেন, কিছু উদরস্থ করতেই হয়। তোমার গীতাখানা বরং খানিকক্ষণের জন্যে আমায় দিয়ে যাও, একটু নেড়ে চেড়ে দেখি যদি কিছু উদরস্থ করতে পারি,—তাতে বোধ হয় বিশেষ দোষ হবে না।"

মনীষা গীতা আনিয়া তাহাকে দিয়া গেল।

৮

বৈকালে প্রবল বৃষ্টি হইয়া আকাশের ঘনঘটা প্রায় দূর হইয়া গিয়াছিল, এখনও দুই এক খণ্ড মেঘ বাতাসের বেগে আকাশে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। পঞ্চমীর ক্ষীণ চাঁদখানি পশ্চিমের আকাশে ভাসিয়া উঠিয়া পৃথিবীর

গায়ে আলো ছড়াইয়া দিয়াছে। চাঁদের উপর দিয়া মেঘের টুকরা মাঝে মাঝে ভাসিয়া চলিতেছিল, মুহূর্ত্তের জন্য ধরার গায়ে তাহার ছায়া আসিয়া পড়িতেছিল; মেঘ সরিয়া যাইতেই চাঁদের হাসি আবার ভাসিয়া উঠিতেছিল। পৃথিবী ও চাঁদে আজ যেন লুকোচুরী খেলা চলিতেছে, দর্শক পৃথিবীর অধিবাসী এবং চাঁদের রাজ্যে যদি কেহ থাকে তবে এই লুকোচুরীর আনন্দ উপভোগ করিতেছে তাহারাই।

রতিনাথ ছাদে শুইয়া পড়িয়াছিলেন, মনীষা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল। অনতিদূরে শশাঙ্ক বসিয়াছিল, ইউরোপীয়ান পোষাক ছাড়িয়া এখন সে বাঙ্গালীর পোষাক পরিয়াছে।

মনীষা বলিতেছিল, "যাই বল দাদা, যার যা জাতীয় পোষাক তাকে তাতেই মানায়, বাঙ্গালী কেউ যদি ইউরোপীয়ান পোষাক পরে আমার তাই দেখে কথামালার সেই ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের কথা মনে পড়ে।" বলিতে বলিতে সে হাসিয়া উঠিল।

রোষের ভাব দেখাইয়া শশাঙ্ক বলিল, "আমায় তা হলে তুমি তাই মনে কর? তুমি তো তা ভাববেই। তুমি যে সেকেলের ঠাকুরমা, চিরন্তন নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম দেখলে মনে কর—সব গেল, ধর্ম্ম আর রইল না।"

মনীষা একটু হাসিয়া বলিল, "নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেওয়ায় বুঝি পৌরুষত্ব আছে? কি জান দাদা মানুষের বাইরের আবরণটাকে আমরা শুধু খোল্‌স বলে উড়িয়ে দিতে পারি নে, ভেতরের ভাবটাই বাইরে প্রকাশ হয়ে যায় বলে মনে করি। তুমি সন্ন্যাসীর পোষাক পর, ত্যাগের পথে অন্ততঃ ভাণ করেও চল দেখি—তোমার মনের ভাবও আস্তে আস্তে তোমার অজ্ঞাতসারে বদলে যাবেই।"

ব্যঙ্গপূর্ণ কণ্ঠে শশাঙ্ক বলিল, "ও, সেকেলের মুনি ঋষিরা বাইরের ত্যাগ দ্বারা সংযম শিক্ষার জন্যেই তা হলে গাছের বাকল পরতেন, ফল মূল খেয়ে জীবন ধারণ করতেন?

মনীষা শান্ত সুরে বলিল, "সত্যই তাই। আমাদের শাস্ত্রে বলে, তিন রকম ভাব আছে, সাত্বিক, রাজসিক আর তামসিক, খাওয়া-পরা জীবন ধারণ সবাই এই ভাবে চলতো। যাঁরা সাত্বিক ভাবে দিন কাটাতেন তাঁরা গাছের বাকল পরতেন, ফল মূল খেতেন, তা বলে তাঁদের মস্তিষ্ক অনুর্ব্বর হয় নি, বরং তাঁরা যে সব জ্ঞান লাভ করেছিলেন তারই কতকটা আমরা আজ জানতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে যাই। তাঁরা অনেককাল বাঁচতেন, অনেক কিছু তাঁরাই শিখতেন, যা কিছু মানবের হিতকর কাজ তা তাঁরাই করতেন। আজ তোমরা বল যারা মাছ মাংস খায় না তাদের জীবনীশক্তির হ্রাস হয়ে যায়, সেকালের মুনি ঋষিরা রীতিমত গাঁজাখোর ছিল, গাঁজায় দম দিয়ে তাঁরা যাতা লিখে গেছেন—"

শশাঙ্ক বাধা দিল,—"থাম," রতিনাথের পানে তাকাইয়া বলিল," আপনার মত কি বলুন দেখি?"

রতিনাথ মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি ও ওসব বিষয় নিয়ে কোন দিন মাথা ঘামাই নি শশাঙ্ক, যা শুনি তা শুনেই যাই মাত্র, তা নিয়ে কোনদিন ভাবি নি।"

শশাঙ্ক বলিল, "হ্যাঁ, তুমি যা বলছ তা ঠিক তবু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ বলেই আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না।"

কৃষ্ণ আসিয়া খবর দিল মিঃ চক্রবর্ত্তী আসিয়াছেন, শীঘ্র একবার দেখা করিতে চাহেন।

রতিনাথ আড়ামোড়া ছাড়িয়া উঠিলেন, "নাঃ, আমার অদৃষ্টে এতটুকু বিশ্রাম নেই। তোমরা কথাবার্ত্তা বল, আমি চট্ করে আসছি।"

তিনি চলিয়া গেলেন; শশাঙ্ক নির্ব্বাকে আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল! পশ্চিম আকাশের শেষে টুক্‌রা টুক্‌রা মেঘগুলা জমিয়া বিরাটরূপে পরিণত হইতেছিল, চুম্বকের মত ছোট ছোট মেঘগুলাকে টানিয়া লইয়া আরও বড় হইয়া উঠিতেছিল।

মনীষা জ্যোৎস্নাধারায় সিক্ত প্রকৃতির পানে তাকাইয়া ছিল। চাঁদের স্ফুট আলো যাহা কিছু স্পর্শ করিয়াছে তাহাই হাসাইয়া তুলিয়াছে।

"দাদা—"

মনীষার আহ্বানে চমকাইয়া শশাঙ্ক মুখ ফিরাইল; চাঁদের আলো স্ফুটতর হইয়া মনীষার অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানার উপর পড়িয়াছিল।

মনীষা শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমার পরে রাগ করেছ দাদা?'

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া শশাঙ্ক বলিল, "রাগ করব কেন মণি, তুমিত রাগ করবার মত কিছু করনি।"

মনীষা বলিল, "করেছি বই কি, তোমায় অনেক কথা বলেছি। আমি বুঝতে পেরেছি আমার কোন ব্যবহারে বা কথায় তোমার মনের কোনও নিভৃতস্তরে আঘাত করেছে, নইলে যখন এলে তখন তোমার মধ্যে যে সহজ সরল উচ্ছ্বাস ছিল, সে উচ্ছ্বাস চলে গেল কেন ? তুমি বলবে, না, আমি তো কোন আঘাত পাইনি, কিন্তু সে কথা বললে কি আমি শুনি দাদা ? কিন্তু আমি যে তোমার বোন দাদা, যদিই কিছু অন্যায় করি বোন বলে ক্ষমা করবে না ?"

তাহার চোখ হইতে অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল, চাঁদের আলোয় তাহা চকচক করিয়া উঠিল।

"একি মনীষা, কাঁদছ তুমি— ? ছি ছি, একটা সামান্য ব্যাপারে অমনি চোখের জল এল ?"

মনীষা চোখ মুছিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "সামান্য ব্যাপার নয় দাদা, সামান্য হলে তোমার মনের সে সরল উচ্ছ্বাস দূর হয়ে যেত না। কাল সকালেই তুমি চলে যাবে তাই আজকের মধ্যেই আমি এর মিটমাট করে নিতে চাই, নইলে তুমি যে আর আসবে না তা আমি বেশ জানি।"

জোর করিয়া হাসিয়া শশাঙ্ক বলিল, "ক্ষেপেছ মণি, আমি আসব না এমন কথাই হতে পারে না। এবার এসে আগের আলাপ ঝালিয়ে গেলুম, দেখবে প্রতি সপ্তাহ এসে বিরক্ত করব।"

মনীষা খানিক স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "আবার তুমি কবে আসবে ?"

শশাঙ্ক বলিল, "এইতো জুন মাস যাচ্ছে, জুলাইয়ের প্রথম হপ্তা হতে নিয়মিত আসা সুরু করব যাতে তোমাদের বিরক্ত হয়ে উঠতে হবে। এরপরে নিজেই কোন দিন বলবে, বাপ রে আপদটা গেলেই বাঁচি।"

বলিয়া সে অপর্য্যাপ্ত হাসিতে লাগিল। মনীষা একটু হাসিয়া বলিল, "ভগবানের ইচ্ছায় এ রকম মনের ভাব আমার কোনদিনই হয়নি মনে হয়, হবেও না, তুমি যদি বারবাস এখানে থাক তাতেও সত্যি আমি ভারি খুশী হব দাদা।"

"কিন্তু পূজোর সময়ে—"

মনীষা এবার স্পষ্ট হাসিয়া ফেলিল, বলিল "পূজোতে লুকানোর তো কিছুই নেই দাদা, তবে পূজোর সময়ে তুমি থাকলে মুস্কিলই বা হবে কিসে ?"

শশাঙ্ক বলিল "যাক্ ও সব বাজে কথা। তোমার গীতা-খানা অর্দ্ধেকটা পড়ে ফেলেছি, বাকি অর্দ্ধেকটা এইবার গিয়ে পড়তে আরম্ভ করে দেই। আজকের মধ্যেই ওখানা শেষ করা চাই তো—"

মনীষা জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম লাগছে, নিশ্চয়ই রাবিসের মত— ?"

শশাঙ্ক চিন্তিতমুখে বলিল, "কি জানি, এখনও ঠিক বলতে পারিনে, নাস্তিকের মনে প্রত্যয় জন্মানো বড় শক্ত কিনা। হয়তো পড়তুম না কিন্তু তোমার কাছে ও বইখানা কি গুণে এতখানি শ্রদ্ধাভক্তি অর্জ্জন করলে দেখে ওর পরে দারুণ হিংসা হয়েছিল—সেইজন্যেই পড়তে নিয়েছি ?"

মনীষা গম্ভীর মুখে বলিল, "কিন্তু চোখের পড়া আর মনের পড়ায় অনেক পার্থক্য আছে— তা মানো ?"

শশাঙ্ক বলিল, "মানি বই কি ? আমি রীতিমত মন দিয়ে পড়ছি, চোখের পড়া নয়।"

মনীষা জিজ্ঞাসা করিল, "যতটুকু পড়েছ তার মধ্যে কতটুকু কি পেলে আমি তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

শশাঙ্ক বলিল, "আমি আগেই তো বলেছি এখনও আমি সম্যক ধারণা করতে পারি নি। আমি সবখানি পড়ব, তোমার মতের সঙ্গে নিজের মত মিলানোর চেষ্টা করব, তাতে যা ফল হয় তোমায় জানাব। আমার নিজের যে ব্যক্তিত্ব আছে তাকে তো মানতেই হবে—উড়িয়ে দিলে তো চলবে না। আমার নিজের জ্ঞান আমায় যা সত্য বলে দেবে আমি তাই মানব, আর সেই সত্যই অসঙ্কোচে ব্যক্ত করব "

পশ্চিমের কোল বহিয়া সোঁ সোঁ শব্দে ঝড় ছুটিয়া আসিতেছিল, সমস্ত আকাশ তখন নিকষ কালো মেঘে ছাইয়া গিয়াছে, চাঁদ তারা অন্ধকার আকাশে বিলীন হইয়া গিয়াছে। মেঘখানা এত শীঘ্র সারা আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল, অন্যমনস্ক থাকার জন্য কেহই জানিতে পারে নাই।

ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দে চমকাইয়া মনীষা আকাশের পানে চাহিল—"ইস, বড় ঝড় এসে পড়ল যে দাদা, নীচে চল।"

শশাঙ্ক বলিল, "এই তো বেশ আছি মনীষা, ঝড় আমার বড় ভাল লাগে। তুমি নীচে যাও, আমি এখন খানিক সময় এই খোলা ছাদে থাকি।"

মনীষা বলিল, "এখনই বৃষ্টি আসবে যে।"

চোখ ঝলসাইয়া আকাশের এককোণ হইতে আর এক কোণ পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল, সোঁ সোঁ শব্দে একটা ভীষণ দমকা আসিয়া নিমেষে সমস্ত পৃথিবীর বুকে প্রলয়-কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল।

মনীষা শিহরিয়া উঠিল—"দাদা—"

শশাঙ্ক একটু হাসিয়া বলিল, "ওতে আমি ভয় পাই নে। জানতো বিলেতে থাকতে ফ্রান্সের যুদ্ধে গিয়েছিলুম, অনেক গোলাগুলি এড়িয়েও বেঁচে আছি, বাজ বা বিদ্যুৎ ঝলসানি আমার একটী চুলও কাঁপাবে না। তুমি ঘরে যাও মনীষা, এখানে থেক না।"

মনীষা একটু হাসিয়া বলিল, "তোমার জীবনের ভয় নেই, জীবনের ভয় হবে কি আমার মত বিধবার? তবে বস, দুজনেই এখানে থেকে মেঘের খেলা ঝড়ের নাচ দেখি।"

চোখ ধাধিয়া আর একবার বিদ্যুৎ চমকাইয়া গেল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার কড় কড় করিয়া ডাকিয়া উঠিল এবং সম্মুখে একটু দূরে নারিকেল গাছের উপর বজ্র পড়িল। গাছের মাথার উপর শুভ্র বিদ্যুতের রেখা দেখা গেল, তাহারই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুষ্ক পাতা জ্বলিয়া উঠিল।

শশাঙ্ক শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িল, "ঘরে চল মনীষা।"

মনীষা বলিল, "আমার ভয় হয় নি দাদা, বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।"

শশাঙ্ক বলিল, "আর সাহসে দরকার নেই, যথেষ্ট হয়েছে, এখন চল।"

অন্ধকারের বুকে মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল, সেই আলোকে তাহারা অগ্রসর হইল।

(৯)

মিস্ ইরাদাস নিয়মিতভাবে নিজের কাজ করিয়া যাইতেছিল।

সে ঠিক সাড়ে দশটার সময় আফিসে উপস্থিত হইত, কোন দিন তাহার আসার সময়ের এতটুকু এ-দিক ও-দিক হইত না। কাজ শেষ হইতে কোন দিন চারটা কোনও দিন পাচটাও বাজিয়া যাইত, পাঁচটার পরে যতই কেন না কাজ থাক সে আর একমিনিট আফিসে অপেক্ষা করিত না।

যাইবার সময়ও সে নিরঞ্জনকে বলিয়া যাইত, নিরঞ্জন সন্ধ্যার পরে সকলকে বিদায় দিয়া আফিস বন্ধ করিয়া বাসায় চলিয়া যাইত।

নিরঞ্জনের সহিত ইরার বেশ আলাপ হইয়া গিয়াছিল, উভয়েই ছিল গরীব, যদিও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী তথাপি গরীব ছিল বলিয়াই তাহাদের আলাপের মধ্যে এতটুকু সঙ্কোচ জন্মিতে পারে নাই। ইরার সরল মার্জ্জিত আচরণে কথাবার্ত্তায় নিরঞ্জন বড় খুসি হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাকে নিজের ভগিনীর মত ভাবিয়াছিল। নিজের কাজ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতই সময়ান্তে ইরাকে সে গম্ভীরভাবে সংসার সম্বন্ধে, ধনী লোকেদের অদ্ভুত আচরণ সম্বন্ধে সতর্ক হইবার জন্য অনেক উপদেশ দিত।

ইরাও তাহাকে নিজের জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত দেখিত, অসঙ্কোচে তাহার কাছে বসিয়া তাহার উপদেশ শুনিত; যাহা বুঝিতে পারিত না তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত।

ইরার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ সুশীলের হয় নাই। বিশেষ কার্য্যে তাহাকে রেঙ্গুণে যাইতে হইয়াছিল, মাসখানেক পরে সে কলিকাতায় পদার্পণ করিল।

পত্র পাইয়া সন্ধ্যার সময় তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য নিরঞ্জন তাহার বাড়ীতে গিয়াছিল।

স্নানাহার শেষ করিয়া সুশীল তখন বিশ্রাম করিতেছিল, নিরঞ্জনকে দেখিয়া সাগ্রহে তাহাকে পার্শ্ববর্ত্তী চেয়ারে বসাইল।

"তারপর খপর কি, সব ভাল তো?"

নিরঞ্জন মৃদু হাসিয়া বলিল, "মালিক যদি অনুপস্থিত থাকে কি করে সব ভাল হবে বল দেখি?"

সুশীল হাসিল, বলিল, "প্রকৃত মালিক তবু এখনও কিছুই দেখেন নি, আমি তো তাঁর পরিবর্ত্তে মালিক হয়ে রয়েছি। যাক গিয়ে, আফিস ভাল রকম চলছে তো, কাজকর্ম্ম বেশ হচ্ছে?"

নিরঞ্জন বলিল, "বেশ চলছে, সে জন্যে তোমার কোন ভাবনা নেই। কাল আফিসে গিয়ে সব নিজের চোখে দেখতে পাবে, কাজেই আজ বেশী বলা নিষ্প্রয়োজন। আমি তোমায় প্রতি হপ্তাতেই তো পত্র লিখে জানাতুম কখন কি রকম বাজার দর উঠছে নামছে।"

সুশীল ইজিচেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া একটা হাই তুলিয়া বলিল, "হ্যাঁ, কর্ত্তব্য পালনে তুমি কিছুমাত্র অমনোযোগী হও নি, প্রাণপণে যে মনিবের মনস্তুষ্টির চেষ্টা করেছ, এর জন্যে ভারি খুসি হয়েছি—বুঝলে ?"

তাহার কথার ভিতরে যে খোঁচাটুকু ছিল তাহা অতি সহজেই নিরঞ্জন ধরিতে পারিল; কিন্তু সে ধৈর্য্য না হারাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "বুঝেছি, রাগ করেছ। কিন্তু শোন সুশীল, যদিও আমরা বন্ধু কিন্তু সে বন্ধুত্ব আফিস সীমার বাইরে থাকাই শ্রেয়, বলে মনে করি, অফিসের সীমানায় তুমি আমার মনিব, কাজেই আফিস সংক্রান্ত কাজে আমি তোমায় মনিব জেনেই পত্রাদি লিখে থাকি। আমার মতে এ কাজ কখনই খারাপ হয় নি।"

সুশীল খানিকক্ষণ মুখ ভার করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "যাক ও সব কথা, মিস দাস রোজ আসেন, কাজকর্ম্ম কেমন করেন ?"

নিরঞ্জন বলিল, "তাঁর কাজ তিনি রোজই শেষ না করে ওঠেন না, কাজের তাড়া তাঁর এক একদিন এত বেশী হয় যে বাধ্য হয়ে আমাকেই তাঁকে তাড়া দিয়ে উঠিয়ে দিতে হয়। মেয়েটী বেশ, হাসি খুসি সর্ব্বদাই মুখে আছে, কয়দিনের মধ্যে অফিসের সকলকে বাধ্য করে ফেলেছে।"

সুশীলের মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তখনই সে স্বাভাবিক সুরে বলিল, "ভালই হয়েছে। আমি প্রথমটা তাঁকে দেখে ভেবেছিলুম অন্য রকম।"

একটু থামিয়া সে বলিল, "কি কষ্টেই যে এই একটা মাস কেটেছে সেখানে তা আর বলতে পারি নে। ওদের দেশের ভাষাও বুঝি নে—আর এমন নোংরা সব বাড়ী ঘর যে বলা যায় না। কয়েকজন বাঙ্গালীর সহায়তা পেয়েছিলুম, তার পর সাহেবদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল, ওদিকে মিঃ রায় বড় সাহেবকে পত্র দিয়েছিলেন, কাজেই যে কাজে গিয়েছিলুম সে কাজটা শেষ হল।"

নিরঞ্জন বলিল, "মিঃ রায় এখানেও পত্র দিয়েছেন, শুনলুম তিনি এই সেপ্টেম্বর মাসেই দেশে ফিরে আসছেন।"

বিস্মিত হইয়া গিয়া সুশীল বলিল, "কই তাতে ত তিনি কিছুই আমায় লেখেন নি, বরং লিখেছেন—কবে আসতে পারবেন তার কিছু ঠিক নেই।"

নিরঞ্জন বলিল, "হয় তো তোমায় যখন পত্র লিখেছিলেন তখন আসার স্থিরতা ছিল না, কিন্তু রতিনাথ বাবুকে যে পত্র দিয়েছেন—ডাকে সেখানা এসেছে, তাতে লিখেছেন তিনি শিগগীরই কন্যাসহ চলে আসছেন।"

মিঃ রায়ের পরিচয় নিরঞ্জন পাইয়াছিল। মিঃ দেবনারায়ণ রায় সুশীলের পিতার অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, সেই জন্যই অতুলবাবু মৃত্যুকালে তাঁহার একমাত্র পুত্রের ভার মিঃ রায়ের হাতে দিয়া যান। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল মিঃ রায়ের কন্যা ইন্দিরাকে পুত্রবধূ করিবেন, মিঃ রায়েরও বড় ইচ্ছা ছিল, সুশীলের সহিত ইন্দিরার বিবাহ দিয়া তাহাকে একেবারে আপনার করিয়া লইবেন। সুশীল দরিদ্র পিতার পুত্র ছিল, মিঃ রায় তাহার অর্থ সম্পদের দিকে কোনদিন চাহেন নাই; তিনি তাহার সুন্দর শক্তিশালী আকৃতি দেখিয়াছিলেন, তাহার শিক্ষা ও গুণ চাহিয়াছিলেন। অর্থের অভাব তাঁহার ছিল না, কমলা তাঁহার ভাণ্ডারে স্বয়ং বাঁধা ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার বিশাল সম্পত্তি সকলই তাঁহার কন্যা জামাতা পাইবে, সকলেই তাহা জানিত।

সুশীল ইন্দিরা বাল্য হইতে জানিত তাহারা একদিন বিবাহিত হইবে। বাল্য হইতে একত্রে প্রতিপালিত হওয়ায় উভয়েই উভয়কে বড় ভালবাসিত।

মিঃ রায় সুশীলকে আই-এ পর্য্যন্ত পড়াইয়া বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে অত্যন্ত ঝোঁক ছিল, নিজের সামর্থ্যে কিছু হয় নাই, এই ক্ষোভটা তাঁহার মনে জাগিয়া ছিল, সেই জন্যই তিনি সুশীলকে ব্যবসা শিখিতে দিয়াছিলেন। চাকরী করা তিনি ঘৃণা করিতেন, স্পষ্টই বলিতেন চাকরী করিয়াই এ

দেশবাসী উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে, দেশের ধ্বংস হইতেছে।

মিঃ রায় আসিতেছেন শুনিয়া সুশীলের যতটা উৎসাহিত হওয়ার আশা নিরঞ্জন করিয়াছিল, সুশীল ততটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিতে পারিল না। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "সেপ্টেম্বর মাস, তার এখনও অনেক দেরি আছে। আমি ভাবছি তিনি আমায় একখানি পত্র দিয়ে জানালেন না, অথচ রতিনাথ বাবুকে পত্র দিলেন। জানি নে তাঁর মনের ভাব কি—"

নিরঞ্জন বলিল, "হয় তো তোমার পত্র কালই এসে উপস্থিত হবে।

আর খানিক বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়া নিরঞ্জন বিদায় লইল।

পরদিন এগারটার সময় সুশীল অফিসে গিয়া উপস্থিত হইল।

অফিসের কাজ তখন নিয়মিত চলিতেছে। চারিদিক ঘুরিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সুশীলের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে নিরঞ্জনের পিঠ চাপড়াইয়া হর্ষোৎফুল্ল-কণ্ঠে বলিল, "আমি ঠিক বলছি নিরু, তোমায় যদি না পেতুম আমার কাজ এমন সুশৃঙ্খলার সঙ্গে চলতে পারত না। কি সৌভাগ্য যে সেদিনে অভাবনীয় রূপে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল, নইলে আমার কল্পনা কল্পনাতেই মিশিয়ে যেত, সত্য হতে পারত না।"

নিরঞ্জন মৃদু হাসিল, বলিল, "সেটা আমার যোগ্যতা কিনা তাই আগে দেখ তারপর প্রশংসা কোর। এটা সত্যি কথা—কাজ করার উপযুক্ত ক্ষেত্র না পেয়ে আমাদের মত গরীব লোকদের উৎসাহ চিরকালের মতই নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের মাথায় যে বুদ্ধি থাকে আমরা তার চালনা না করতে পারায় তা ধ্বংস হয়। মনে করে দেখ—যদি দিনরাত অন্নের চেষ্টায় হাহাকার করে ঘুরে বেড়াতে হয়, আমাদের শিক্ষা কোন্ কাজে তখন লাগে? গরীব ছেলেরা হয়তো মহৎ হতে পারত—তারা অনেক কাজই করতে পারত যদি তারা উপযুক্ত ক্ষেত্র পেত। তাদের প্রতিভা দাসত্বের যাঁতায় পিষে কাদা হয়ে যাচ্ছে, তারা অবশেষে জানাচ্ছে—শিক্ষার দরকার কেবল মাত্র চাকরীর জন্যে—কোনরকমে ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করার জন্যে—আর কিছুর জন্যে নয়।"

সুশীল একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, বলিল, "ঠিক, তোমার কথাই সত্যি মেনে নিচ্ছি। বনের মধ্যে কত সুন্দর ফুল ফুটে বাতাসে গন্ধ ছড়িয়ে ঝরে পড়ে যায়, সাগরের অতল গর্ভে কত মণি উজ্জ্বল দীপ্তি বিকাশ করে, কিন্তু কেউ তা দেখতে পায় না, আমাদের দেশের ছেলেদের প্রতিভা চাকরীর যাঁতায় কাদা হয়ে যায়, যে অসাধারণ কোন কাজ করবার কল্পনা কোনদিন করেছিল, তার কল্পনা অবশেষে স্বপ্ন হয়েই মিলিয়ে যায়।"

অন্যমনস্ক ভাবে সে নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া কাগজপত্র দেখিতে বসিল; নিরঞ্জন নিজের কাজে চলিয়া গেল।

ঘড়িতে অবিশ্রান্ত টিক টিক শব্দ হইতেছিল, উপরে ফ্যান চলিতেছিল, সুশীল নিবিষ্ট মনে নিজের কাজ করিতে লাগিল।

দরজার পর্দা একটু সরাইয়া ইরা একবার উঁকি দিল, মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কি একবার ঘরে আসতে পারি?"

সুশীল মুখ তুলিল, হাতের কলমটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, "আসুন।"

গৃহে প্রবেশ করিয়া কতকগুলা কাগজপত্র সুশীলের সামনে টেবলের উপর নামাইয়া রাখিয়া ইরা কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আজ অনেক টাইপ করবার কথা ছিল, কিন্তু আমি সব শেষ করতে পারলুম না, মাত্র অর্দ্ধেক করতে পেরেছি। আজ আমায় এখনই বাড়ী যেতে হবে, কাল আমি নটার সময় এসে বাকিগুলো টাইপ করে দিলেই চলবে বোধ হয়।"

সুশীল আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিল, "এই দুপুরে রোদে আপনি বাড়ী যেতে চান? ঘরের মধ্যে রয়েছেন বুঝতে পারছেন না বাইরে কি রকম গরম, কিন্তু একবার—"

ইরা একটু হাসিল, বলিল, "কিন্তু আমার না যাওয়া ছাড়া উপায় নেই মিঃ মুখার্জ্জি। রোদকে অতটা ভয় করতে গেলে কি আমাদের চলে, পরের কাজ করতে গেলে রোদ বৃষ্টি সবই সইতে হয়। যারা পরিশ্রম করে

জীবিকার্জ্জন করে তাদের রোদ বৃষ্টিতে সুখ দুঃখ বোধ করা চলে না মিঃ মুখার্জ্জি—"

তাহার কণ্ঠস্বর বড় করুণ হইয়া উঠিয়াছিল।

সুশীল ক্ষণকাল নীরবে সামনের কাগজপত্রগুলো নাড়াচাড়া করিতে লাগিল, তাহার পর বলিল, "কিন্তু এই দুপুর বেলায় কেন চলে যাচ্ছেন সে কথা শুনতে পাব কি?"

ইরা বলিল, "আমার মায়ের বড় অসুখ সেই জন্যেই যেতে হবে। আজ কয়দিনই তাঁর অসুখ করেছে কিন্তু আজ বড় বাড়াবাড়ি হয়েছে। আগে ভেবেছিলুম আসব না কিন্তু আপনি আসছেন জেনে আসতে হয়েছে। বাড়ীতে আর কেউ নেই, আমি যাব তবে মা ঔষধ পথ্য পাবেন।"

তাহার চোখ দুইটী ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইল।

সুশীল বলিল, "আপনার না আসাই উচিত ছিল মিস দাস, একখানা পত্র লিখে পাঠাইলেই হতো। আমি আপনাকে এখনই ছুটি দিচ্ছি, যে কয়দিন আপনার মায়ের অসুখ থাকবে সে কয়দিন আপনার আসার দরকার নেই। আমি টাইপ জানি, দরকারী কাজগুলো চালিয়ে নিতে পারব।"

অভিবাদন করিয়া ইরা প্রস্থানোদ্যত হইল, সুশীল জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাসা কোথায়? এখান হতে কাছে কি?"

ইরা বলিল, "আমার বাসা কলুটোলায়।"

সুশীল বলিল, "বাসে বা ট্রামে যাবেন তো, এক কাজ করুন, আমার মোটরে যান, আমি শোফারকে বলে দিচ্ছি।"

তাহাকে উঠিতে দেখিয়া মিস দাস ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আপনি বসুন, আমি বাসে সোজা চলে যাব এখন।"

সুশীল বলিল, "আমাকেও এখনি একবার খিদিরপুর ডকে যেতে হবে, বিশেষ দরকার। আপনাকে কলুটোলায় নামিয়ে দিয়ে আমি চলে যাব।"

নিরঞ্জনকে ডাকিয়া দুই একটা কথা তাহাকে বলিয়া দিয়া মিস দাসকে সঙ্গে লইয়া সে মোটরে উঠিল। কলুটোলায় মিস দাসের বাসার সামনে তাহাকে নামাইয়া দিয়া সে বলিল, "নমস্কার, আমি চললুম।"

প্রতি নমস্কার করিয়া ইরা বলিল, "আপনাকে নামতে বলবার যোগ্যতা আমার নেই নইলে—"

বাধা দিয়া একটু হাসিয়া সুশীল বলিল, "বন্ধু হিসাবে যোগ্যতা যথেষ্ট আছে, যদিও মনিব হিসাবে নেই। বাসা চিনে গেলুম, আবার একদিন আসতে বিশেষ কষ্ট করতে হবে না। চাইকি কালও আসতে পারি, সে জন্যে অনুরোধ করতে হবে না।"

শোফার মোটরে ষ্টার্ট দিল।

(১০)

ইরার পিতা এককালে হিন্দু ছিলেন। এক সময়ে তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ তাঁহার কেবলমাত্র ঝোঁকের বশে কিনা তাহা আজ বলিতে পারা যায় না।

ইরার আজও স্বপ্নের মত বাল্যের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে কোন একটী লতায় পাতায় ঘেরা শান্ত পল্লীতে সে মায়ের সহিত আত্মীয় স্বজনের নিকটে ছিল। তাহার পিতা তখন কলিকাতায় ছিলেন এবং সেই সময়েই তিনি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

ইরার মনে পড়ে তখন তাহাদের দিনগুলো কি আনন্দে দশ জনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাটিয়া যাইত। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে পার্শ্বের বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত, অন্য দশ জনের মত সেও তাহার মাও সেখানে যাইত, সমাজের দ্বার তখন তাহাদের সামনে চিররুদ্ধ হইয়া যায় নাই, কারণ ইরার পিতা খ্রীষ্টান হইলেও তাহারা মাতাপুত্রী হিন্দু ছিল।

কিছুদিন বাদে ইরার পিতা গ্রামে আসিয়া যখন স্ত্রী কন্যাকে নিজের কাছে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন, তখন ইরার মাতা সম্মত হন নাই। নিজের আজন্মার্জ্জিত সংস্কার ধর্ম্মজ্ঞান ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান স্বামীর সঙ্গ তিনি চান নাই। ইরার পিতা জোর করিয়া কন্যাকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন, কন্যার ভবিষ্যৎ তিনি এখানে রাখিয়া নষ্ট করিতে চান নাই।

স্বামীকে ছাড়িয়াও স্ত্রী নিজের ধর্ম্মমত লইয়া তফাতে ছিলেন, কন্যাকে ছাড়িয়া মা থাকিতে পারিলেন না, বাধ্য হইয়া তাহাকে সমাজ ছাড়িয়া স্বামীর নিকটে কলিকাতায় আসিতে হইল।

তিনি কলিকাতায় রহিলেন, ধর্ম্মান্তরও গ্রহণ করিলেন, এই পরিবর্ত্তন তাঁহার কেবল মনে নয় আকৃতির উপরও দাগ রাখিয়া গেল। তাঁহার মনের আনন্দ মুখের হাসি সব ঘুচিয়া গেল, নিজের সব বিসর্জ্জন দিয়া তথাপিও তিনি বাঁচিয়া রহিলেন।

স্ত্রীর পরিবর্ত্তন স্বামী লক্ষ্যও করেন নাই, মায়ের পরিবর্ত্তন সন্তান লক্ষ্য করিল, কিন্তু প্রতিবিধানের কোনও উপায় সে পাইল না।

ইরা স্কুলে পড়িতে লাগিল, ম্যাট্রিকে সে উচ্চ প্রশংসার সহিত বৃত্তি পাইয়া উত্তীর্ণ হইতে সেই দিনটিই কেবল সে মায়ের মুখে আনন্দের হাসি বিকসিত হইয়া উঠিতে দেখিয়াছিল।

ইরা পিতার ইচ্ছানুসারে আই এ পড়িতে আরম্ভ করিল, এই সময়ে তাহার পিতা মিঃ দাস হঠাৎ মারা গেলেন।

লোকটী জীবিতাবস্থায় উপার্জ্জন করিয়াছিলেন বড় কম নয়, কিন্তু পানদোষের জন্য এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। পত্নী ও কন্যাকে পথের ভিখারিণী করিয়া তিনি নিজে সরিয়া গেলেন।

ইরা ও তাহার মাতা অকূল পাথারে পড়িলেন। মিঃ দাস যথেষ্ট দেনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পাওনাদারেরা আসিয়া তাঁহাদের ঘিরিয়া ফেলিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া মিসেস দাস মিশনের শরণাপন্ন হইলেন। মিশন হইতে যে সামান্য সাহায্য পাওয়া গেল তাহাতে মিঃ দাসের দেনা কতকটা শোধ হইল।

মিসেস ব্রাউনিং মিশনারী মিশনের কর্ত্রী ছিলেন তিনি ইরা ও তাহার মাকে মিশনারী ছোকে আসিয়া থাকিতে বলিলেন কিন্তু ইরা তাঁহার সে প্রস্তাবে রাজি হইতে পারিল না।

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী হইলেও এককালে সে যে হিন্দু ছিল সে সংস্কার তাহার মন হইতে যায় নাই। খৃষ্টান হইয়াও সমাজ হইতে অনেক দূরে সরিয়া ছিলেন! খৃষ্টানদের আচার ব্যবহার আহার বিহার কিছুই তাঁহারা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

লেখাপড়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ইরা মিশনারী স্কুলে সামান্য বেতনে টিচারের কাজ লইল এবং মিসেস ব্রাউনিংয়ের পরামর্শে সকালের দিকে টাইপ শিখিতে লাগিল। কিছুদিন মধ্যেই টাইপ করা সে বেশ ভাল রকম শিখিয়া ফেলিল, ঠিক এই সময় মিসেস দাস পীড়িতা হইয়া পড়িলেন।

সে ধাক্কা তিনি কোনক্রমে সামলাইয়া উঠিলেন বটে, স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পাইলেন না। ইহার পর প্রায়ই তাঁহার অসুখ হইতে লাগিল, আজকাল তিনি চলচ্ছক্তিবিহীনা হইয়া পড়িয়াছেন। ইরার সাহায্য ব্যতীত তাঁহার কিছু করিবার ক্ষমতা নাই।

একখানি মাত্র ঘর, পার্শ্বে আর একখানি ছোট ঘর আছে, সেখানিতে রন্ধনাদি হয় ও জিনিসপত্র থাকে। দাসদাসী রাখিবার ক্ষমতা ইরার নাই তাহাকে নিজের হাতেই সব কাজ করিতে হয়।

সেদিন সুশীল যখন হঠাৎ গিয়া উপস্থিত হইল তখন ইরা মায়ের পথ্য তৈয়ার করিতেছিল। সদর দরজায় আঘাত ও সুশীলের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া সে তাড়াতাড়ি আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

সুশীল তাহাকে সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তিতে দেখিল। স্নানান্তে ভিজা চুলগুলি এলোমেলো ভাবে পিঠে বুকে লুটাইতেছে; পরণে একটী সাদা সেমিজ ও একখানি সরু কালাপেড়ে ধুতি মাত্র। তাহাকে এই স্বাভাবিক বেশে সত্যই বড় সুন্দর দেখাইতেছিল।

সুশীল একবার মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তখনই চোখ নামাইয়া লইল, একটা নমস্কার করিয়া কুণ্ঠিত হাসিয়া বলিল, "বড় অসময়ে এসেছি, হয় তো বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। কাল বিকেলে আসব ভেবেছিলুম কিন্তু জরুরী দরকারে এণ্ডারসন কোম্পানীর কাছে যেতে হল, ইচ্ছা থাকলেও এখানে আসা হয়ে উঠল না, আজও একটা কাজে এই পথ দিয়ে যেতে মনে হল— সেদিন কথা দিয়ে গিয়েছিলুম আজ সে কথাটা রাখা যাক, আপনিও কয়দিন অফিসে যান নি, আপনার মা কেমন আছেন, সে খোঁজটাও নেওয়া যাবে।"

ইরা সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "মায়ের অসুখ এখনও নরম পড়ে নি, মিঃ মুখার্জ্জী। এমন কেউ নেই যে মার কাছে রেখে কাজে যাই। বাড়ীওয়ালা ভদ্রলোকরা তো ডেকেও সাড়া দেন না, দেখছেন না—মাঝের দরজাটা বন্ধই থাকে

পাছে এদিকে এলে ওঁদের হিন্দুয়ানীর শুচিতা নষ্ট হয়ে যায়, সেটাও তো বড় কম কথা নয়।”

বলিয়া সে হাসিল।

সুশীল বলিল, “যেতে পারেন নি সে জন্যে অত সঙ্কুচিত হওয়ার কারণ তো দেখছি নে মিস দাস। অসুখ-বিসুখ সবারই আছে, আর প্রত্যেকের সে দিকটা বিবেচনা করেও দেখা দরকার। আর ওই যে হিন্দুয়ানীর শুচিতার কথা বললেন ওটা বাস্তবিক সত্য। আমিও নিজের চোখে এরকম ঢের কাণ্ড দেখেছি—যাতে বুঝতে পেরেছি হিন্দুর হিন্দুত্ব বড় কম জিনিষ নয়।”

সে প্রচুর হাসিতে লাগিল।

ইরা বলিল, “ঘরে চলুন, এখানে দাঁড়িয়ে হয় তো এখনই চলে যাবেন।”

সুশীল বলিল, “না, এসেছি যখন তখন আপনার মাকে না দেখে যাচ্ছি নে। আপনি একটা ঝিও রাখেন নি বোধ হয়, কিন্তু আমার মনে হয় একটা ঝি দিনরাতের জন্যে রাখা উচিত। সংসারের কাজ, রোগীর সেবা করে আবার পয়সার চেষ্টায় বাইরের কাজ করতে যাওয়া মানে নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করে ফেলা। আর দেখুন, আপনার মা না সারা পর্য্যন্ত আপনার কাজে যাওয়ার দরকার নেই। কাজের জন্যে গোলমাল হবে না, আমি অস্থায়ী ভাবে আর একজন টাইপিষ্ট রেখে চালিয়ে নেব এখন। আপনার বেতন তা বলে কাটব না যেমন সম্পূর্ণ বেতন পান তেমনই পাবেন।”

ইরা মাথা নত করিয়া বলিল,—“ধন্যবাদ, ঘরে আসুন।”

সামান্য এই একটী “ধন্যবাদ” কথার মধ্যে তাহার অন্তরের যে উচ্ছ্বাস ঝরিয়া পড়িল তাহা অনেকখানি কৃতজ্ঞতা ভাষার প্রকাশের চেয়েও বেশী।

ইরা সুশীলকে গৃহমধ্যে লইয়া গেল।

একখানি ক্যাম্পখাটে রোগিণী মিসেস দাস শুইয়া পড়িয়াছিলেন। ঘরখানি যদিও ছোট তথাপি বেশ পরিষ্কার, ঝর ঝরে, কোথাও এতটুকু ময়লা নাই, ছোট এই ঘরখানির পানে চাহিলে গৃহস্বামিনীর সুরুচির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। একপার্শ্বে একটী ছোট গোল টেবল, তাহার উপর খানকত বই, দোয়াতদানি, প্যাড প্রভৃতি, নিকটে একখানি মাত্র চেয়ার। তাহারই পার্শ্বে একটী আলমারি, তাহাতে বই ঠাসা রহিয়াছে; ইহাতে বুঝা যায় গৃহস্বামিনীর পাঠে অনুরাগ আছে।

চেয়ারখানা সরাইয়া দিয়া ইরা বলিল, “বসুন”—তাহার পর মায়ের কাছে সরিয়া গিয়া তাঁহার কানে কানে কি বলিল।

মিসেস দাস উঠিবার চেষ্টা করিলেন,; সুশীল ব্যস্তভাবে বলিল, “না না, আপনাকে উঠতে হবে না, আপনি শুয়ে থাকুন, আমি বসছি।” চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া সে মিসেস দাসের সম্মুখে বসিল।

শীর্ণ হাত দুখানা কপালে উঠাইয়া মিসেস দাস ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিলেন, “আমার বড় সৌভাগ্য যে আপনি আমার বাড়ীতে এসেছেন। ইরার কাছে আপনার যে পরিচয় পেয়েছি তাতে শুনেছি আপনার হৃদয় অতি উচ্চ, কিন্তু আমার—” তিনি থামিয়া গেলেন, দুর্ব্বলতায় হাঁফাইতে লাগিলেন।

ইরা বলিল, “একটু আস্তে আস্তে কথা বল মা, জান তো, ডাক্তার তোমায় বেশী কথা বলতে বারণ করেছেন, ওতে তোমার হাঁপানি আরও বাড়বে।”

সুশীলের পানে তাকাইয়া সে বলিল, “ক্ষমতায় কুলায় নি বলে বেশী ঘরও নিতে পারি নি মিঃ মুখার্জ্জি, একটী ছাড়া আর ঘর নেই বলেই আপনাকে এঘরে আনতে ইতঃস্ততঃ করছিলুম রোগীর ঘরে রোগীর কাছে—”

সুশীল একটু হাসিয়া বলিল, “সে জন্যে আপনাকে এতটা কুণ্ঠিত হয়ে উঠতে হবে না—মিস দাস আমি আপনার অবস্থা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছি। জগতে সবাই কিছু ধনীর ঘরে জন্মায় না, সবাই অট্টালিকায় বাস করে না। আমিও আপনারই মত দরিদ্রের সন্তান, ভাগ্যবলে বিপুল ঐশ্বর্য্যলাভ করলেও দারিদ্র্যের স্মৃতি মন হতে মুছে যায় নি। আমি দরিদ্র ছিলুম বলেই দরিদ্রের কষ্ট বুঝি, নইলে হয় তো বুঝতুম না।”

ইরা বলিল, “কিন্তু অনেকের সংসারিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনের অবস্থাও পরিবর্ত্তন হয় এটা বোধ হয় জানেন?”

সুশীল বলিল, “খুব জানি, কিন্তু আমায় যেন তাদের দলে কোনদিন ফেলবেন না; বিপুল সম্পত্তি আমার হাতে

এলেও আমি জানি এর কিছুই আমার নয়। একটা শাপ আছে জানেন পরের সম্পত্তিতে কোটিপতি হওয়া ভাল নয়, পরের প্রাসাদে বাস করাও শান্তিপ্রদ নয়, যতটা শান্তি পাওয়া যায় নিজের কুঁড়ে ঘরে বাস করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকার্জ্জন করতে পারায়। যারা মানুষ তারা প্রার্থনা করে আমরা যেন মানুষ হয়েই যেতে পারি—আমরা যেন নিজে খেটে খাই, পরের ধন নিয়ে বড়মানুষ না হই। আপনি কায়িক পরিশ্রম করে যে উপার্জ্জন করছেন তাতেও আপনি সুখী মিস দাস, আর আমি—আমার কথা ভাবলে আমার কষ্টের শেষ থাকে না। জীবনটাকে স্বেচ্ছায় পরের হাতে তুলে দিয়েছি, নিজের এরপর কিছুমাত্র অধিকার নেই।"

তাহার কথার মধ্যে এমন এমন একটা সুর বাজিয়া উঠিল যাহা অতি সহজে ইরা—এমন কি রুগ্না ইরার মাও ধরিতে পারিলেন। পীড়িতা নারী বিস্ফারিত নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন।

ইরা খানিক সুশীলের পানে তাকাইয়া থাকিয়া চক্ষু ফিরাইল, বলিল, "একটু বসুন মিঃ মুখার্জ্জি, আমি চট করে মার খাবারটা নিয়ে আসি।"

তাড়াতাড়ি সে বাহির হইয়া গেল। মায়ের দুধ উনানে বসানো ছিল, উথলাইয়া পড়িয়া গিয়াছে সেই বিশ্রী দুর্গন্ধটা ও ঘর পর্য্যন্ত গিয়াছিল। তাড়াতাড়ি দুধ নামাইয়া জলন্ত উনানে ভাতের হাঁড়ি বসাইয়া দিয়া দুধ সাগু লইয়া বাহির হইল।

ফিরিয়া দেখিল মিসেস দাস ও সুশীল তাহাদেরই পারিবারিক কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া সুশীল বলিল, "আপনার এখনও রান্না হয় নি শুনলুম, আমার জন্যে আপনার কাজের অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে তো?"

মায়ের পাশে বসিয়া চামচে করিয়া তাঁহাকে দুধ সাগু খাওয়াইয়া দিতে দিতে ইরা বলিল, "কিছু ক্ষতি হয়নি—আমি রান্না চড়িয়ে দিয়ে এলুম, ভাত হতে অনেকটা দেরী লাগবে।"

সুশীল বলিল, "আপনি একটা কাজ করুন মিস দাস, একটা ঝি রাখুন, নইলে এত খাটলে শীগগিরই বিছানায় পড়বেন এ আমি ঠিক বলে দিচ্ছি।"

মিসেস দাস একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আমি বারবার ওকে সে কথা বলছি বাবা, নইলে কি করে চলবে?"

সুশীল বলিল, "ওঁর কথা শুনুন মিস দাস—"

ইরা বাধা দিয়া বলিল, "আমায় ইরা বলে ডাকবেন।"

উঠিতে উঠিতে সুশীল মৃদু হাসিয়া বলিল, "সেই ভাল কথা। আজ আমি যাচ্ছি, পারি যদি আবার একদিন আসব, সে দিন যেন দেখতে পাই কাউকে কাজে রেখেছেন

(ক্রমশঃ)

ব্যর্থতা

—কবিতা—

জেবুন্নেসা খাতুন

তোমার তরে-দুয়ার খুলি-
রাখিনু-সারারাতি-।
তোমারই-তরে-আঁধার ঘরে
জালিয়ে ছিনু বাতি-
সদ্য ফোটা যুঁয়ের রাশে-
ভরানু-গৃহ-কোণ-
তাহারই-মাঝে-পাতিনু তব-
স্বর্ণ-সিংহাসন-।
উঠিল শত ধূপের ধোঁয়া-
সারাটি-গৃহমাতি-
কনক মণি পাত্র পুটে-
জালিনু শত বাতি-।
নিশীথরাতে কীচকবন
মর্ম্মরিয়া উঠে—
তোমার পায়ের নূপুর শুনি'
চলিনু আমি ছুটে।
গহীন রাতে একতারাতে
বাউল গাহে যেন—
"দুয়ারে তব বাজিছে বাঁশী
শুনিছ নাকো কেন?"
ছুটিয়া দেখি শূন্য দ্বার
গুমরে আকুলতা।
বুকের পরে আছাড়ি মরে
হিয়ার যত ব্যথা।
হৃদয় মাঝে আশার দীপ এখন নিবু নিবু
ব্যর্থ আমার সকল সাজ আসিলে না গো প্রভু।

বিজয় সিংহ

অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল

—ইতিহাস—

বিজয় সিংহ লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন এ কথা সত্য, তবে তিনি বাঙ্গালার বীর বিজয় সিংহ না সিন্ধু দেশের বিজয় সিংহ ছিলেন তাহা লইয়া কথা উঠিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, যে, লঙ্কা-বিজয়ী বিজয় সিংহ সিন্ধু দেশের অধিবাসী ছিলেন। আবার অধিকাংশ ঐতিহাসিক বলেন যে, বিজয় সিংহ কলিঙ্গ দেশের রাজকন্যা এবং বাঙ্গালার রাজা সিংহবাহুর পুত্র ছিলেন এবং তিনি বাঙ্গালা হইতে জাহাজে চড়িয়া গিয়া লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণের এই দ্বৈত মতের সমাধান এখনও হয় নাই।

দ্বিতীয় কথা কোন্ সময় বিজয় সিংহ লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন, তাহার তারিখ লইয়া নানা গোল যোগ বাধিয়াছে। নানা মুনির নানা মত। কোনটা মানিব আর কোনটা মানিব না এই হইল বিষম সমস্যা। মিষ্টার রোলিনসন বলেন যে, বিজয় সিংহ খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা বলে যে, খৃঃ পূঃ ৪৪৩ অব্দে বিজয় সিংহ লঙ্কা জয় করেন। কানিংহাম সাহেব বলেন যে খৃঃ পূঃ ৪৪৩ অব্দে যে দিন ভগবান বুদ্ধ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া যান সেই দিন বিজয় সিংহ লঙ্কা যাত্রা করেন।

বিজয় সিংহ সম্বন্ধে নানা মত আছে। কানিংহাম বিজয় সিংহ কোন দেশের রাজা ছিলেন তাহা উল্লেখ করেন নাই। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা বলেন, তিনি বঙ্গ দেশের রাজা ছিলেন। রোলিনসনও বলেন যে তিনি বাঙ্গালারই রাজা ছিলেন।

"In the story of the invasion of Ceylon probably in the Sixth centruy B. C. by the Bengal king Vijaya and his followers, we hear of a ship large enough to hold over seven haudred people.

বিজয় সিংহের লঙ্কা জয়ের ঘটনা যে সকল পুস্তকে উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে সিংহলী পুস্তকই প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে খুব কম বই-ই আছে। এত দিন সকল ঐতিহাসিকই সিংহলের প্রাচীন গ্রন্থ মহাবংশের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। এখন অন্য একখানা পুস্তকের বিশেষ সাহায্য লওয়া হয়। ইহার নাম "রাজা বলিয়া" পুস্তকখানা কখন লেখা হইয়াছে তাহা লইয়া মত ভেদ আছে। কেহ বলেন যে, এই পুস্তক প্রাচীনকালে কোন এক খৃষ্টান দ্বারা লেখা হইয়াছিল; কিন্তু ইহার কোন মৌলিকতা নাই। তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, মহাবংশের তুলনায় পুস্তকখানি নূতন। নূতন হইলেও ইহাতে অনেক মূল্যবান তত্ত্ব সংগৃহীত আছে। বিজয় সিংহ সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক পুস্তকে সংবাদ পাওয়া যায় সত্য: কিন্তু তাহা কোন কার্য্যেই আসে না—মহাবংশে সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস যেখানে অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, 'রাজাবলি'তে তাহার স্পষ্ট চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিজয় সিংহ কে ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম কি, কেন তিনি লঙ্কায় গেলেন, তাহার লঙ্কায় পদার্পণ করিবার সময় ইত্যাদি দুই পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। দুই পুস্তকের মধ্যে বিশেষ কোন বিভিন্নতা না থাকিলেও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বিজয় সিংহের পূর্ব্ব পুরুষগণ কেমন করিয়া বাঙ্গালা দেশে আসিলেন, কেমন করিয়া তিনি পিতার বিরাগভাজন হইলেন এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় পরিষ্কার ভাবে রাজাবলিতে দেওয়া আছে। কিন্তু যে সকল ঘটনা রাজাবলিতে বর্ণনা করা হইয়াছে, আজ কাল তাহা কেহ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। সত্য হওয়া যে একেবারে অসম্ভব তাহাও নহে; তবে যাহাই হোক—অর্থাৎ রাজাবলিতে বর্ণিত ঘটনা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক সে বিচার করিব না। আমরা দেখিব যে, এই সকল ঘটনার মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য আছে। মোট কথা এই সকল ঘটনার মধ্যে যে ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহা আমরা দেখাইবার পূর্ব্বে ঘটনাগুলি বলিতে চাই। আমাদের মনে হয়, এই সকল ঘটনা হইতে এমন সব ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যাইবে যাহা হইতে প্রমাণ হইবে যে বিজয় সিংহ বাঙ্গালার রাজকুমার ছিলেন, তিনি লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন ইত্যাদী। ইহা ভিন্নও বিজয়ের পূর্ব্বপুরুষগণের অবস্থাও সম্যক উপলব্ধি করিব।

কলিঙ্গ দেশে শকভীতি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কন্যাকে বঙ্গের এক রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দেন। এই রাজকুমারীর গর্ভে এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করে। কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে জ্যোতিষগণ বলিলেন যে, এ কন্যার সহিত এক সিংহের বিবাহ হইবে। লোহার পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও তাহাকে এই বিবাহ হইতে বাঁচান যাইবে না। কন্যার রাশি নক্ষত্র দেখিয়াই পণ্ডিতগণ এই কথা বলিলেন।

ধীরে ধীরে কন্যা বড় হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলে পিতা মাতা মহা চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। তাহাকে সাত তালা দালানে রাখা হইত এবং চারিদিকে উপযুক্ত রক্ষকগণ পাহারায় নিযুক্ত থাকিত। একদিন রাত্রিতে রাজকন্যা কামাতুর হইয়া সাত তালা হইতে পালাইয়া আসিয়া একদল বণিকের সহিত মিলিত হইল। রাজ বাড়ীর কেহই একথা জানিতে পারিল না। অবশেষে রাজকন্যা বণিকদের সহিত যখন লাতা নামক বনে প্রবেশ করিল, তখন এক সিংহ বণিক দলকে আক্রমণ করে। বণিকের দল ভীত হইয়া রাজকুমারীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। সিংহ রাজকুমারীকে হত্যা না করিয়া তাহার আবাসে লইয়া আসে। তাহার পর হইতে রাজকন্যা সিংহের সহিত একত্রে বাস করিতে থাকে। এই ভাবে কিছুদিন বাস করিবার পর সিংহের ঔরসে রাজকন্যার দুইটী সন্তান হয়, একজন বালক ও একজন বালিকা। সিংহের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেও রাজকুমারীর সন্তানদ্বয় দেখিতে মানুষের মত হইয়াছিল। সিংহের পুত্র বলিয়া এই রাজকুমারের নাম হইল সিংহব। আস্তে আস্তে রাজকুমার ও রাজকুমারী বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। রাজকুমারের শরীরে সিংহের মত বল হইল। একদিন সিংহ শীকার অন্বেষণে প্রায় পঞ্চাশ যোজন দূরে চলিয়া যায়, তখন সিংহব তাহার মাতা ও ভগ্নিকে পিঠে তুলিয়া লইয়া বঙ্গ রাজ্যে চলিয়া আসে। তথায় আসিয়া দেখিল যে, তখন তাহার মামা সে দেশে রাজত্ব করিতেছেন। রাজা ভগ্নীর সন্তানগণকে উপযুক্ত উপহার দিয়া সহরে বাস করিতে অনুমতি দিলেন! সিংহব মাতা ও ভগ্নীকে লইয়া তথায় বাস করিতে লাগিল।

সিংহ শীকার হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যা কেহই সেখানে নাই। সে দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভয়ানক রাগও হইল। সে বনের চারিদিক ঘুরিতে লাগিল এবং যাহাকে পাইতে লাগিল তাহাকে মারিতে লাগিল। এইভাবে বহু জনপ্রাণীর প্রাণ নাশ করিয়া বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল। বঙ্গে আসিয়াও সে ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিল এবং লোক জন মারিতে লাগিল। অনেকেই বহু চেষ্টা করিল কিন্তু সিংহকে কেহই মারিতে পারিল না বরং যাহারা মারিতে গেল তাহারা আর ফিরিয়া আসিল না। রাজা প্রজাদিগের বিপদ দেখিয়া চিন্তাকুল হইলেন। নানা চিন্তার পর সহরে প্রচার করিয়া দিলেন যে, যে সিংহ মারিতে পারিবে সে রাজ্যের এক অংশ পাইবে।

সিংহব রাজার ঘোষণা শুনিয়া তীর ধনুক লইয়া সিংহকে বধ করিতে বাহির হইল। বনে গিয়া সিংহকে দেখিতে পাইল এবং এস বলিয়া সিংহকে আহ্বান করিল। সিংহ তাহার পুত্রকে দেখিতে পাইয়া যেন সুধাভাণ্ড হাতে পাইল, সে আনন্দে গদ গদ হইয়া পুত্রের দিকে ছুটিয়া চলিল। কিন্তু পুত্র তিনটী বাণ সিংহের প্রতি নিক্ষেপ করিল, বাণের অগ্রভাগ বক্র থাকাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মাটীতে গিয়া বিদ্ধ হইল চতুর্থ বাণ নিক্ষেপ করাতে তাহা সিংহের মস্তক বিদীর্ণ করিয়া দিল। সিংহ গর্জ্জন করিতে করিতে মাটীতে পড়িয়া গেল। অবশেষে সিংহব পিতার নিকট গমন করিলে সিংহ পুত্রের কোলে মাথা রাখিয়া স্ত্রী ও কন্যার কথা শুনিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সিংহ প্রাণত্যাগ করিলে সিংহব তাহার মস্তক কাটিয়া আনিয়া রাজাকে উপহার দিল

রাজা তাঁহার প্রতিজ্ঞামত লাতা নামক দেশ সিংহবকে ছাড়িয়া দিলেন! সিংহব সেখানে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিল! সে সিংহওয়ালী নাম্নী এক রাজকুমারীকে বিবাহ করে তাহার গর্ভে বত্রিশ জন রাজকুমার জন্মগ্রহণ করে। ইঁহাদের মধ্যে বিজয় সিংহ ছিলেন জ্যেষ্ঠ। কথিত আছে যে বিজয়ের জন্মদিনে আরও সাত শত বীর জন্মগ্রহণ করে। পরে এই সকল বীর বিজয়ের সৈন্য ও সহচর হইয়াছিল।

বিজয় সিংহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। যে সাত শত লোক তাঁহার জন্মের দিনে সেই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাও আসিয়া বিজয়ের

সহিত মিলিত হইল। তাহারা বিজয়ের নায়কত্তায় রাজ্যে নানা প্রকার উপদ্রব করিতে লাগিল। রাজ্যের লোক বিজয় সিংহের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া রাজার কাছে গিয়া নালিশ করিল যে, যুবরাজ এরূপ করিলে তাহারা দেশে থাকিতে পারে না। রাজা সিংহব যুবরাজের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন।

ভগবান বুদ্ধ যখন কুশীনগরে দেহ রক্ষা করিলেন তাহার সাতদিন পর বিজয় তাঁহার সাত শত সহচর লইয়া সমুদ্র যাত্রা করিলেন। জাহাজ চলিতে চলিতে এক দ্বীপে আসিয়া লাগিল, এই দ্বীপের নামই লঙ্কা দ্বীপ। তাহারা সিংহলের "তাম্বন্নট্টা" নামক স্থানে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া এক অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সে দেশ সবুজ বৃক্ষে পূর্ণ, শীতল ছায়ায় ঢাকা, নিবিড় বনে আচ্ছন্ন, লতায় পাতায় ঘেরা, জমি উর্ব্বর এবং ফল মূল যথেষ্ট পাওয়া যায় বলিয়া তথায় "কলোনী" করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। যখন বিজয় সিংহ লঙ্কায় পৌছিয়াছিলেন তখন দ্বীপটী ভূত প্রেত রাক্ষস প্রভৃতিতে পূর্ণ ছিল। সেখানে কোন মানুষ বাস করিত না। রাম রাবণের যুদ্ধ এবং বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক হাজার আট শ চুয়াল্লিশ (১৮৪৪) বৎসর পর্য্যন্ত লঙ্কা রাক্ষস রাজত্ব ছিল।

ভগবান বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পর তিনবার লঙ্কা ভ্রমণ করিয়াছেন। প্রথম বুদ্ধত্ব লাভ করিবার দিন, দ্বিতীয় বুদ্ধত্ব লাভ করিবার ছয় বৎসর পর এবং তৃতীয় বার বুদ্ধত্ব লাভ করিবার নয় বৎসর পর। সেখানে গিয়া তিনি অলৌকিক শক্তি দেখাইয়া লঙ্কার রাক্ষসদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের ঝগড়া মিটাইয়া দিয়াছিলেন।

যখন চতুর্থ তীথিতে ভগবান বুদ্ধ কুশী নগরে দেহ রক্ষা করেন, তখন তাঁহার বন্ধুগণকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, মহেন্দ্র নামে এক ব্যক্তি সিংহলে "বৌ-বৃক্ষ" স্থাপন করিবে। বুদ্ধদেব তখন শক্কালা নামক এক ব্যক্তিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার উপর লঙ্কার ভার অর্পণ করেন। এবং কথিত আছে যে, বিজয় সিংহকে তাঁহার সহায়তা করিবার জন্যই নিযুক্ত করেন এবং বিজয়কে "রক্ষা জল" ও "রক্ষা-সূত্র" দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। সিংহল সেই সময় 'উপলবন' নামক দেবতার তত্ত্বাবধানে ছিল।

রাজকুমার বিজয় সিংহ যখন অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বসিয়া বিশ্রাম করিতে ছিলেন, তখন উপলবন নামক দেবতা ঋষির বেশে আসিয়া বিজয়কে "রক্ষাসূত্র" পরান এবং তাঁহাকে ও তাঁহার সহচরগণকে 'শান্তি জল' ছিটাইয়া দেন। বিজয়ের আগমনে নিকটস্থ দানব দৈত্য প্রভৃতি পালাইয়া অন্য বনে গমন করেন।

কুবেনী নাম্নী এক সুন্দরী দৈত্যকন্যা তখন সিংহলে বাস করিত। তাহার বুকে তিনটী স্তন ছিল। এই তিনটী স্তনের জন্য তাহার বুকের সৌন্দর্য্যের অনেকখানি হানি হইয়াছিল। কিন্তু সে দেশের বৃদ্ধরা বলিত যে, যদি কোন দিন তাহার কোন বর আসে এবং সে আসিয়া তাহার বুকের মধ্যম স্তনটী স্পর্শ করে তাহা হইলে তাহা অদৃশ্য হইয়া যাইবে। বিজয় সিংহলে পদার্পণ করিলে পর কুবেনী মনে করিল যে, সেই তাহার বর। সেই অনুমানের বশবর্ত্তী হইয়া যাদু মন্ত্র দ্বারা সে নিজে একটী কুত্তা সাজিয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে বিজয়ের পায়ে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। কুকুর দেখিয়া বিজয় মনে করিলেন যে, লঙ্কায় মানুষ থাকা অসম্ভব নহে। তাঁহার সহচরদিগকে তিনি সংবাদ লইতে বনের মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা একটী পুকুরের নিকট আসিলে কুবেনী মন্ত্রবলে পুকুরের পদ্ম পাতার নীচে তাহাদিগকে লুকাইয়া রাখিল। সারাদিনের মধ্যেও যখন তাহারা ফিরিয়া আসিল না, তখন বিজয়ের মনে সন্দেহ হইল। তিনি বনের মধ্যে সেই পুকুরের নিকট গিয়া দেখিলেন যে, মানুষ, জলের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে তাহার পদ রেখা দেখা যায় কিন্তু উঠিয়া আসিবার কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ইতিমধ্যে তিনি কুবেনীকে দেখিতে পান এবং তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া অপমান করিবার ভয় দেখান। কুবেনী বলে যে যদি বিজয় তাহাকে বিবাহ করিয়া রাণী করে তবে তাঁহার সাত শত সহচরকে মুক্তি দিবে। কুবেনীর কথায় বিজয় সিংহ রাজী হইলেন। কুবেনীর অনুরোধে তাহার বুকের মধ্যস্থিত স্তন স্পর্শ করিলেন; ফলে স্তনটী অদৃশ্য হইয়া গেল। কুবেনী বিজয়ের সাত শত সহচরকে মুক্তি দিয়া বিজয়ের রাণী হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এক দিন রাত্রিতে হঠাৎ কিসের একটা গণ্ডগোলে বিজয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি কুবেনীকে জিজ্ঞাসা

করিলে কুবেনী বলিল যে, এক দৈত্য কন্যার বিবাহ। আরও বলিল যে এই সকল দৈত্যদের মধ্যে বিজয়ের বাস করা ঠিক নহে। এই সকল দৈত্যদিগকে মারিতে পারিলে আর কোন ভয় নাই। অবশেষে কুবেনী ঘোড়া সাজিল, বিজয় তাহার পিঠে চড়িয়া দৈত্য ধ্বংস করিতে চলিলেন, এবং তাঁহার সাত শত সহচর তাঁহার সহিত চলিল। তাহারা অনেক দৈত্য বধ করিয়া নিরাপদে বাস করিতে লাগিল এবং কুবেনী তাহাদের জন্য চাউল প্রভৃতি খাদ্য আনিয়া দিল।

সমস্ত ঠিক হইলে বিজয়ের সহচরগণ বিজয়কে রাজমুকুট পরিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু কুবেনীকে রাণী করিয়া রাজমুকুট পরা চলিবে না। অনেক পরামর্শ করিয়া পিণ্ডিদেশের রাজাকে এক বহুমূল্য মণি উপহার পাঠাইয়া দিলেন এবং রাজার নিকট এক রাজকুমারী, সাতশত পরিচারিকা এবং পাঁচ প্রকার বণিক পাঠাইতে প্রার্থনা করিলেন। শীঘ্রই পিণ্ডিদেশের রাজকুমারী সাত শত সহচরী ও পাঁচ প্রকার বণিক লইয়া লঙ্কায় আসিলেন। বিজয় রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া সিংহলের রাজা হইলেন এবং রাজকুমারীর সাতশত সহচরীকে তাঁহার সাতশত সহচরের নিকট বিবাহ দিলেন। এবং কুবেনীকে তাড়াইয়া দিলেন। ইহাতে কুবেনী ক্রোধিত হইয়া রাজাকে আক্রমণ করিতে আসিল কিন্তু দেবতাদের আশীর্ব্বাদে বিজয় তাহাকে পরাজিত করিলেন। দেবতাদের চক্রান্তে কুবেনী পাষাণ মূর্ত্তি হইয়া রহিল। বিজয় সিংহ সিংহলে আটত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

আমরা বিজয় সিংহের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলাম। যেখানে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক মনে করি নাই সেখানে সংক্ষেপে ঘটনা বর্ণনা করিয়াছি। এখন আমরা এই বৃত্তান্তের ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিব। তবে আমরা এখানে বিজয় সিংহের যে কাহিনী বর্ণনা করিলাম তাহা ভিন্ন পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা যায়। তবে সে বিভিন্নতা তেমন বেশী নয় এবং এই অল্প বিভিন্নতার জন্য কাহিনীর ঐতিহাসিক সত্য নষ্ট হইবে না।

প্রথমতঃ কাহিনী পড়িয়া অনেকেই মনে করিবেন যে, ইহার কোন মূল্য নাই। কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করিব না। একজন রাজকুমারীর সিংহের সহিত বিবাহ হওয়া যেন উপকথার পাতালপুরীর রাজকুমারীর ঘুমভাঙ্গান কাহিনীর মত মনে পড়ে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, অনেকেই জীব-জন্তুর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং অনেকেই অনেক পশু প্রসব করিয়াছেন ; কাজেই এদিক দিয়া কথাটা অবিশ্বাস যোগ্য নহে। দ্বিতিয়তঃ রাশী নক্ষত্রের একত্র সমাবেশ যে মানুষের চরিত্রের উপর অনেক খানি প্রভাব বিস্তার করে তাহা বলাই বাহুল্য। কাজেই এদিক দিয়া আমরা কাহিনীর সত্যতা দেখিতে পাই কাহিনীর ভিতর ঐতিহাসিক সত্য ভিন্ন আরও অনেক সত্য নিহিত আছে ; কিন্তু আমরা তাহার বিচার না করিয়া কেবল ঐতিহাসিক সত্যটুকুই বাহির করিয়া আনিবার চেষ্টা করিব।

এই গল্প হইতে আমরা একটা নূতন সত্য বাহির করিতে পারি। গল্পের একস্থানে লেখা আছে যে, বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের সময় হইতে এক হাজার আটশত চুয়াল্লিশ (১৮৪৪) বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র লঙ্কায় গিয়াছিলেন।

After the war of Ravana, and before the attainment of Budhahood by our Budha, the teacher of the three world, lanka had been the abode of demons for the space of 1844 years"—"Rajavaiiya"

কথাটা একটু ভাবিবার বটে। রামায়ণের কাল নির্ণয়ের জন্য এই তারিখ আমাদিগকে সাহায্য করিবে বলিয়া মনে হয়। পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনা করিলে বোধ হয় অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিবেন। এই তারিখ লইয়া যদি আমরা বিচার করিয়া দেখি, তাহাহইলে বোধহয় রামায়ণের কাল নির্ণয় করিতে পারিব এবং হয়ত তাহাই রাম রাবণের যুদ্ধের ঠিক তারিখ। বুদ্ধদেব ৫৫৫ খৃঃ পূঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। চল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি সিদ্ধি লাভ করেন অর্থাৎ তখন খৃঃ পূঃ ৫১৫ অব্দ। ইহার সহিত যদি আমরা ১৮৪৪ বৎসর যোগ করিয়া দেই, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, রামচন্দ্র খৃঃ পূঃ ২৩৫৯ অব্দে লঙ্কায় গিয়াছিলেন। কথাটা উড়াইয়া দিবার মত নহে। মহাভারতের অনেক পূর্ব্বে রামায়ণের কাল। পণ্ডিতগণ

পৃথিবীতে পুরুষগুলো কেবল স্বার্থপর। মেয়েরা তাদের কাছে সুলভ ব'লেই, তারা মেয়েদের বাপের ওপর জুলুম করবার সুযোগ পায়। কেন, মেয়েদের কি কোনো আত্ম-মর্য্যাদা নেই? তাদের কি কোনো মূল্য নেই—হোকনা তাদের বাপ গরীব? অরুণা, নিজেকে সুলভ করিস্‌নি! তোর আত্ম-সম্মান রক্ষার গৌরব যেদিন অর্থ-লোলুপ পুরুষ-সমাজকে পদাঘাত ক'রতে পারবে, ঘৃণা ক'রতে পারবে, সেইদিন স্বার্থপরেরা তোর মূল্য বুঝবে। তোমার রুদ্ধ অভিমান সেইদিনের অপেক্ষায় যেন ঈশ্বরের কাছে শক্তি চায়!...অরুণা, আজ দেশের জাতীয় যুদ্ধে ঘরের বাইরে কত নর-নারী আত্মবলি দিচ্ছে, জান? এ-বিষয়ে ঘরের ভেতরে তোমাদের কাছে,—বিশেষ ভাবে তোমার কাছে আমাদের গরীব দেশ কি কিছুমাত্র আশা ক'রতে পারে না? আজ গ্রামে-গ্রামে পল্লীতে-পল্লীতে কত মেয়ের মতো তুমিও দেশকে সাহায্য করো। চর্‌কা কাটো! বাড়ী শুদ্ধ সবাইকে খদ্দরের পূজা ক'রতে বলো! মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চেয়ে বর্ত্তমানে এইকায-ই বেশী দরকার হ'য়ে প'ড়েছে। আমাদের-ই এই গ্রামের দিকে চেয়ে ছাখো! তোমাকে সাহায্য করবার মতো ঘরে-ঘরে এমন অনেক মহিলা আছেন, যারা ইতিমধ্যেই দেশের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। সাড়া দাওনি কেবল তোমরা এবং তুমি! তোমার বিয়ে হচ্ছে না ব'লে, তুমি আত্মহত্যা ক'রতে গিয়েছিলে। যদি জানতুম, দেশের কাজ ক'রতে না পারার জন্যে অভিমানে তুমি আত্মহত্যা ক'রতে গিয়েছিলে, তা হ'লে আমি সুখীই হতুম!..."

বিমল-দার চোখে-মুখে কী এক পুণ্যোজ্জ্বল তেজ-দীপ্তি ফুটে উঠলো। তার সামনে শ্রদ্ধায় আমার মাথা যেন আপ্‌নি-ই নুয়ে প'ড়লো।

* * * *

কখন পুকর-ঘাটে এসেছি মনে নেই—সন্ধ্যার অন্ধকার গাছে-গাছে নেমে এসেছে হুঁস্ নেই। পিছন থেকে হঠাৎ কে গায়ে হাত দিলে। ফিরে দেখি বউদিদি দাঁড়িয়ে। তিনি আমার হাতটা ধরে বল্লেন "একি অরুণা! এই ভরা-সন্ধ্যায় তুমি এখানে দাঁড়িয়ে—এই পুকুর ঘাটে? আর তোমাকে সারা গা খুঁজে বেড়ান হচ্ছে। এক মনে কি অত ভাবা হচ্ছিল, শুনি?" একটু নীরব থেকে গম্ভীরভাবে আমি বল্লুম "বউদিদি, দেশকে সাহায্য ক'রতে হবে। আজ, থেকে আমার কর্ত্তব্য—চরকার পূজো করা। এর দ্বারা বাবা-ও মুক্তি পাবেন। তোমরা আমার সঙ্গী হবে ত?" বউদিদি আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলেন না। বল্লেন "তার মানে?" বৌদির একখানা হাত ধ'রে রুদ্ধ স্বরে কম্পিত গলায় আমি বললুম, "চরকাই যে গরীবের বন্ধু, বৌদি! আমার জন্যে তোমরা কেউ ভেবো না!"

কষ্টি-পাথর

(গল্প)

শ্রীগোপেন্দ্র বসু

দার্জ্জিলিংয়ে সকাল সাতটারও অনেক পর—প্রায় আট ঘটিকা।

মাউণ্ট প্লেসেণ্ট্ রোডস্থিত নব-বিলাত প্রত্যাগত মিষ্টার এ, কে, সেন, বার-এট-ল, পূরানাম শ্রীঅশোক কুমার সেনের প্রাতঃকালীন চা পান প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, রঙ্গিন খদ্দরের একখানি পুরু চাদর আবক্ষ জড়াইয়া কুমারী উর্ম্মিলা চায়ের টেবিলের নিকট আসিয়া একখানি গদি আঁটা চেয়ারে বসিতেই অশোক হাস্য করিয়া কহিল, "Beware of tea। টেবিলের অত কাছে বস্‌লে দেখো ছোঁয়া না লাগে।" অশোকের কথায় চা-পানরতা উর্ম্মিলার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী প্রতিমা দেবীও হাস্য করিল।

উর্ম্মিলা চা পান করে না। সেইজন্য অত্যধিক চা-প্রিয়

অশোক প্রায়ই এইরূপ বিদ্রূপ করিয়া থাকে। পরপর দু'কাপ চা পানান্তে অশোক উর্ম্মিলাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল "By jove, কাল তোমার জন্যে যে সব জিনিষগুলো এনেছিলাম সব পছন্দ হয়েছে ত? সব একেবারে খাঁটি স্বদেশী।" মৃদু হাস্য করিয়া উদ্ভিন্ন যৌবনা উর্ম্মিলা বলিল, একটু ত্রুটি আছে।" আর এক কাপ চা'র জন্য আদেশ করিয়া অশোক কহিল 'may I have the fortune to hear যথা', উর্ম্মিলা হাস্য করিয়া কহিল, যথা একটি একটি হারমোনিয়াম ও একটি স্কুটার আন্‌তে ভুল হয়েছিল।' অশোক কি বলিতে যাইতেছিল, তাহার ঠিক পার্শ্বের অপর একটি চেয়ার হইতে তাহার স্ত্রী প্রতিমা বলিয়া উঠিল 'কাল তুমি কতকগুলো ক্রেকার এনেছ তাই বোনটির আমার মান্যের হানি হয়েছে।' ভগ্নীর কথায় উর্ম্মিলা ঠোঁট ফুলাইয়া অভিমানের স্বরে কহিল 'মান্যের হানি হবে নাত কি? আমি বুঝি এখনও কচি খুকিটি আছি যে ঐ ক্রেকার নিয়ে সারাদিন পট্ পট্ করবো?' মুখগহ্বরস্থিত পাইপটীকে দাঁত দিয়া চাপিয়া মৃদু হাস্য করিতে করিতে অশোক কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল 'Here you are, আমারি ভুল হয়েছিল তা Pretty miss, I should apologise first of all, কিছু মনে করো না বুঝলে উর্ম্মিলা। আমার খেয়াল ছিল না যে তুমি বড্ড বড় হয়েছ এবং ক্রেকার নিয়ে খেলতে তোমার মন বস্‌বে না। It is very natural, যাক্ তুমিই যখন মনে করিয়ে দিয়েছ তখন তোমার যাতে মন বসে তার ব্যবস্থা শীঘ্রই কর্চ্ছি, অভয় দাও ত এই আশ্বিন মাসেই হিন্দু সমাজে বাধা থাকলেও 'Oh what a fool I have been,' ভগ্নিপতির কথায় উর্ম্মিলা বিশেষ কুপিত হইয়া প্রতিমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনুযোগের স্বরে কহিল, 'দেখ্‌লে দিদিমণি আমি যেন সেই ভেবে বলেছিলুম", অশোক পাইপ পরিষ্কার করিতে করিতে কহিল 'স্পষ্ট করে বলনি বটে but the cat is out আর white wash করলে হবে না'। প্রতিমা উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল, রাগান্বিতা উর্ম্মিলা যৌবন পুষ্পিত দেহলতাটি লীলায়িত করিয়া দ্রুতপদে কক্ষত্যাগ করিল। প্রতিমা ও অশোকের সম্বোধনে কোন উত্তর সে দিল না।

দুই

উর্ম্মিলা চলিয়া যাইলে অশোক প্রতিমাকে কহিল, "ঠিক কথা, তোমার বোনটির কি ব্যবস্থা করলে সত্যই ত বয়স হতে চল্ল। she is no more within her teens'। প্রতিমা কহিল "ব্যবস্থা ত তোমার হাতেই'। অশোক ধূম ত্যাগ করিয়া বলিল 'ব্যবস্থা ত আজই কর্ত্তে পারি কিন্তু তুমি যে বলছিলে উর্ম্মিলা betrothedকে একজন মুনসেফের নিকট বাগদত্তা'। প্রতিমা মৃদু প্রতিবাদ করিয়া কহিল, বাগদত্তা ঠিক নয় তবে বাবা বেঁচে থাকতে তার সঙ্গে কথাটা অনেক দূর এগিয়েছিল, ছেলেটির নাম অসীম চৌধুরী—গেল বছরে ল পাশ করে মুনসেফ হয়েছে। বাপের সম্পত্তিও অনেক সে পেয়েছে, তার বড্ড ইচ্ছে উর্ম্মিলাকে বিয়ে করে—উর্ম্মিলারও তার প্রতি খুব টান। অসীম এই কিছুদিন আগেও আমাকে চিঠি লিখেছে। উর্ম্মিলাকে তার না হলে প্রাণে বাঁচবে না...শুধু চক্ষের নেশা নয় হৃদয় দিয়ে সে উর্ম্মিলাকে ভালবেসেছে ইত্যাদি। আর কতকি কাব্য-ফাব্য আমি ভাল বুঝি না—তাই সব লিখেছে," রাবার পাউচ হইতে মিক্সচার বাহির করিতে করিতে অশোক বলিল 'তবে আর কি? পাত্র যখন ভাল আর উর্ম্মিলাও যখন তাকে ভালবাসে তাহলে শুভস্য শীঘ্রং। প্রতিমা কহিল "উর্ম্মিলা যে তাকে কিছু কিছু ভালবাসে সে কথা ঠিক, তবে ও দোটানায় পড়েছে'। অশোক মুখ হইতে পাইপ বাহির করিয়া আগ্রহান্বিত হইয়া কহিল 'দোটানায় কি রকম?" টেবিল ক্লথ গুছাইতে গুছাইতে প্রতিমা বলিল 'তোমাকে বুঝি এর আগে শৈলেশের কথা বলিনি? শৈলেশ উর্ম্মির বাল্য বন্ধু বললেও হয়—দুজনে এককালে খুব ভাব ছিল। তখন ওরা দুজনেই ছোট, তার কথা ও প্রায়ই ভাবে। তার প্রভাব ওর জীবনের উপর খুবই বিস্তার করেছে। তাই ও চা খায় না, বিলাতী জিনিষ ছোঁয় না। শৈলেশ লোকটা খুব বিদ্বান ও দেশপ্রেমিক হলেও কেমন একটু খামখেয়ালী। দুবিষয় এম এ তে ফার্ষ্ট, দ্বিতীয় বার এম এ পাশ করবার পর যখন কি একটা বিষয় নিয়ে থিসিস লিখছিল সেই সময় তার মামা কোথাকার এক সরকারী কলেজের প্রফেসারী তার জন্যে ঠিক কর্লে, কিন্তু তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গভর্ণমেণ্টের গোলামী সে কখনই করবে না, তাই নিয়ে মামার সঙ্গে মনোমালিন্য হয়ে মামার অগাধ সম্পত্তি ও সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে কোথায় গিয়ে খবরের কাগজ বার কল্লে।"

অশোক দাঁত দিয়া পাইপটাকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল "how strange!" প্রতিমা দেবী বলিতে লাগিল 'শৈলেশের মামা ছিলেন বাবার বন্ধু, শৈলেশের মামার অন্য কেহ ছিল না শৈলেশ ছিল তার সকল সম্পত্তির একমাত্র ভাবী উত্তরাধিকারী। সেই জন্যই বাবা মনে মনে শৈলেশকেই উর্ম্মিলার যোগ্য পাত্র বলে ঠিক করেছিলেন। শৈলেশের আমাদের বাড়ীতে অবাধগতি ছিল। সেই সময় উর্ম্মিলা ও শৈলেশে খুব ভাব হয়, কিন্তু মামার সঙ্গে মনোমালিন্য ও সকল সম্পর্ক রহিত হবার পর বাবা তাকে আমাদের বাড়ী আসা বন্ধ করে দেন। তারপর অনেকদিন আর তার দেখা নেই—কোন খবরও তার পাইনি, গেল বছরে বাবা মরে যাবার পর উর্ম্মিলার যখন টাইফয়েড হয় তখন একদিন হঠাৎ ঝড়ের মত এসে হাজির—বল্লে, উর্ম্মির টাইফয়েড শুনে লাহোর থেকে ছুটে এসেছে শুধু উর্ম্মিলাকে চক্ষে দেখতে চায়, তারপর দুদিন থেকে উর্ম্মিলাকে একটু ভাল দেখেই আবার চলে গেল, যাবার সময় অনেক জিজ্ঞাসা করে জানা গেল যে সে লাহোর ট্রিবিউন কাগজে সাব-এডিটারি করছে—মাইনে দুশ টাকার কিছু বেশী পায়, ব্যাস্ তারপর আর কোন খোঁজ নেই তার এই পুরো এক বছর। মনে হয় উর্ম্মিলাকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, উর্ম্মিলাও যে তাকে কম ভাল বাসে না তা নয়, তবে ও খুব ভাব-সংযমী খুব চাপা শৈলেশের উপহার দেওয়া বইগুলোও কি যত্নেই না রাখে। ওর কাছে সেগুলো যেন এক একটা কহিনুর।" প্রতিমা চুপ করিল। অশোক কেশ হইতে একটী সিগার বাহির করিয়া টেবিলের উপর ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল 'শৈলেশের কথা শুনলুম। তুমি বল্‌ছিলে অসীমের সঙ্গেও ওর খুব ভাব হয়—'প্রতিমা কহিল, "হাঁ উর্ম্মিলা তার গানের একজন বড় ভক্ত। লোকটীর সব গুণ আছে। এদিকে মুনসেফ্, আবার গানের গলাও খুব চমৎকার পিয়ানোও খুব ভাল বাজায়; বাবার সঙ্গে সেবার পুরী গিয়ে ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়, উর্ম্মির গানের ঝোঁক চিরকাল বেশী তাই ওদের দুজনে খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভাব হয়, বাবা শেষে এই পাত্রই মনোনীত করেন কিন্তু তুমি তো জান কিরূপ হঠাৎ তিনি পরলোকে চলে যান, সেই থেকে সব কথা চাপা পড়ে আছে, উর্ম্মিলা বেচারী বড় দোটানায় পড়েছে"। অশোক কহিল 'তাইত কঠিন সমস্যা। এ দুজনের কাকে পেলে ওযে বেশী সুখী হবে আর কে যে ওকে বেশী ভালবাসে তা উর্ম্মিলাও জানে না। সত্যই ও দোটানায় পড়েছে। যাকে বলে parallelogram of forces'। প্রতিমা মৃদু হাস্য করিয়া বলিল—'মীমাংসা কর দেখি কি রকম ব্যারিষ্টার সাহেব বোঝা যাবে'। অশোক উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল 'হাজার গিনি ফি দিতে হবে।" কটাক্ষ করিয়া প্রতিমা বলিল 'তোমাদের না ফি নিতে নেই'। অশোক একটী সিগার ধরাইয়া বলিল 'যাক্ এক্ষেত্রে ফি নোবো না শুধু তোমার শ্রীহস্তের এক কাপ ভাল রকম চা পেলেই' বাধা দিয়া প্রতিমা কহিল, 'ভাল রকম চা মানে খুব বেশী চিনি দিয়ে' অশোক হাস্য করিয়া কহিল "চিনি! তুমি যদি নিজের হাতে কর ত তাতে চিনি মোটেই দিতে হবে না, সেদিন সেই novelটাতে পড়েছিলুম না when lovely Susi sits by my side, I want no sugar in my tea"

হাঃ হাঃ! অশোক হাস্য করিতে লাগিল। প্রতিমা কহিল 'চা দেবো কিন্তু সে বিষয় কি করবে?" হাস্য থামাইয়া অশোক কহিল 'আচ্ছা অসীম বা শৈলেশ কতদিন তোমাদের খবর পায়নি?" প্রতিমা উত্তর দিল 'তুমি land করবার পর অর্থাৎ দুই তিন মাস মধ্যে তারা কেউ কোন খবর পায় নি অন্ততঃ আমাদের দিক থেকে' অশোক কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিল 'আচ্ছা ব্যবস্থা হবে।'

* * * *

তিন

সত্যব্রত রায়, স্বীয় চেষ্টায় ও পরিশ্রমে অতি সামান্য অবস্থা হইতে বিশেষ ধনী হইয়া উঠিয়াছিলেন, অশ্বিনী কুমার মজুমদার ও তিনি একত্রে বিগত মহাযুদ্ধের কালে কাট চালানের ব্যবসায় অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। এই ব্যবসার বহুপূর্ব্ব হইতেই অশ্বিনী বাবুর সহিত সত্যব্রত বাবুর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। শৈলেশ এই অশ্বিনী বাবুর ভাগিনেয়। সত্যব্রত বাবুর পুত্র ছিল না। প্রতিমা ও উর্ম্মিলা তাহার দুই কন্যা, তিনি কন্যাদ্বয়কে বিশেষরূপে শিক্ষা দিতেন। অশোক সত্যব্রতবাবুর এক দরিদ্র বন্ধুর পুত্র, তিনি বন্ধু পুত্র অশোকের সহিত স্বীয় কন্যা প্রতিমার বিবাহ দিয়া তাহাকে বিলাতে ব্যারিষ্টার

হইবার জন্য পাঠান। সত্যব্রতবাবু প্রথমা কন্যার বিবাহের পর দ্বিতীয় কন্যা উর্ম্মিলার জন্য বহুদিন যাবৎ মনে মনে শৈলেশকেই পাত্র ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু মাতুলের সহিত শৈলেশের সম্পর্ক রহিত হইবার পর সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া পুরীতে পরিচিত মুনসেফ অসীম চৌধুরী নামক একটি যুবকের সহিত সে বিষয় কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে নব বিলাত প্রত্যাগত জামাতা অশোকের উপর সাংসারিক যাবতীয় ভার অর্পণ করিয়া অকস্মাৎ ওপারে তাহাকে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল। অসুস্থতার জন্য অশোক এখনও প্রাকৃটিস আরম্ভ করে নাই এবং সেই জন্যই স্ত্রী প্রতিমা ও প্রতিমার ভগ্নী উর্ম্মিলাকে লইয়া দার্জ্জিলিং আসিয়াছে। উর্ম্মিলা মার্টিনেয়ার হইতে এবার সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পরীক্ষা দিয়াছে।

*　　*　　*　　*

পরদিন অশোক কুমার দুইখানি পত্র লিখিল, পত্র দুটির ভাব ও ভাষা একই।

মাননীয় মহাশয়—

আপনি বোধ হয় আমাকে চিনিতে পারিবেন না আমি স্বর্গীয় সত্যব্রত রায়ের প্রথম জামাতা, অদ্য আমার স্ত্রী প্রতিমা দেবীর বিশেষ ইচ্ছায় আপনাকে এই পত্র দিতেছি। আমার শ্বশুর মহাশয়ের জীবিতকালে উর্ম্মিলার সহিত আপনার বিশেষ ভাব হয় শুনিয়াছি—আপনাদের উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রীতির সঞ্চার হইয়াছিল। সেই হেতু আজ আপনাকে একটী অনুরোধ করিতে সাহসী হইলাম। গত মাসে উর্ম্মিলা ভীষণ বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়, আমরা তাহার আশা এক প্রকার ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, বহু ভাগ্যক্রমে বহু অর্থব্যয়ে, সুচিকিৎসায় ও শুশ্রূষায় তাহার প্রাণ অতিকষ্টে ফিরাইয়া পাওয়া গিয়াছে কিন্তু ঐ দুষ্ট রোগে তাহার সকল বাহ্য সৌন্দর্য্য চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষেত্রে উর্ম্মিলার অন্য কোন উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ দেওয়া একেবারে অসম্ভব। অপর কোন সুপাত্র উহাকে স্ত্রী করিতে স্বীকৃত হইবে না। তবে আপনার কথা অন্য, যেহেতু আপনি উর্ম্মিলাকে ভালবাসিয়াছেন। শুনিয়াছি প্রেমিকের চক্ষে বাহ্য সৌন্দর্য্য কিছুই নহে যেহেতু তাহারা চখের নেশা দিয়া ভালবাসে না—তাহাদের প্রেম অন্তর লইয়াই কারবার করিয়া থাকে, যাহা হউক আমরা উর্ম্মিলার বিবাহের কথাবার্ত্তা এই মাসেই স্থির করিতে ইচ্ছা করি, আপনার মতামত সত্বর জানাইলে বাধিত হইব। আপনার পত্রের অপেক্ষায় আমরা সকলেই বিশেষ আগ্রহান্বিত চিত্তে রহিলাম, আপনি বিবেচক ও প্রেমিক। আপনার নিকট হইতে আনন্দজনক উত্তর পাইব ইহা আশা করি। ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

শুক্রবার　　　　বশংবদ
দি টাওয়ার　　　　শ্রীঅশোক সেন
মাউন্ট প্লেসেন্ট রোড

পত্র দুটি লেখা হইলে অশোক প্রতিমাকে দেখাইল। প্রতিমা উহা পড়িয়া বলিল এতও মিথ্যে কথা বানাতে জান, কোথায় বসন্ত রোগ আর কোথায় বাহ্য সৌন্দর্য্য আরও কত কি! তুমি shine করবে শীগগিরই। বল্‌তে নেই উর্ম্মিলার সেই বড় অসুখটার পর হোটেলে থাক্‌লেও এই এক বছরে কোন দিনের জন্যও জ্বর হয় নি আর দেখতেও কেমন নিখুঁত সুন্দরী হয়েছে। যাক্ এতে আসল প্রেমিক কে ধরা যাবে।

সিগার টানিতে টানিতে অশোক বলিল 'The idea'!

চিঠি দুটিখানা খামে আঁটিয়া প্রথম খানিতে অশোক কুমার ঠিকানা লিখিল।

Mr Sailaish Sen Gupta M. A.
Sub-Editor The Tribune
Third Road
Lahore
The Punjab.

অন্য খানির বহির্নামাতে লিখিল—

Mr. Asim Chowhury, Munsiff
P 302/3 Lake Road
Ballygaunge
Calcutta.

পত্রদুটি পাঠাইবার এক সপ্তাহ মধ্যেই উভয় পত্রের উত্তর আসিল। অশোক কলিকাতা হইতে আগত পত্রটি প্রথমে খুলিয়া পড়িতে লাগিল:—

মহাশয়,

আপনার পত্র পাইয়া মর্ম্মাহত হইলাম। সামান্য কয়দিনের আলাপে কুমারী উর্ম্মিলা দেবীকে যে কিরূপে

ভালবাসিয়া ছিলাম তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা আমার জানা নাই, সেই সময় হইতেই উর্ম্মিলাকে পাইবার জন্য আমার প্রাণ মন বিশেষ আগ্রহান্বিত কিন্তু এ বিবাহে আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর আপত্তি আছে। জগতে এই ভগ্নীটি ব্যতীত, আর আমার কেহ নাই, অতএব তাহার একান্ত অনিচ্ছায় নিজের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্বেও এস্থলে মত দিতে পারিলাম না। আশা করি আপনারা সকলেই আমাকে ক্ষমা করিবেন। একটু বিশেষ চেষ্টা করিলে ও অধিক অর্থের লোভ দেখাইলে উর্ম্মিলার জন্য আপনারা সুপাত্র পাইবেন।

ইতি

আপনাদের চিরবন্ধু অসীম চৌধুরী

অশোক প্রথম পত্রটি পাঠ সমাপ্ত করিয়া মনে মনে হাস্য করিতে করিতে একটি সিগার মুখে দিয়া লাহোর হইতে আগত পত্রটি খুলিল,

পূজনীয় অশোক বাবু,

সবই জ্ঞাত হইলাম, তথাপি উর্ম্মিলাকে পাইলে আমার এ জীবন সার্থক বলিয়া জ্ঞান করিব। আপনারা আমার মত নিঃস্বব্যক্তির হস্তে তাঁহাকে দিবেন কিনা জানিনা, যাহা হউক আপনাদের নিকট হইতে দ্বিতীয় পত্রের আশায় বিশেষ আগ্রহান্বিত রহিলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র উত্তর দিবেন। ইতি— আপনাদের

শ্রীশৈলেশ চন্দ্র সেন গুপ্ত

সম্পূর্ণ

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

'তোমারে বাসিনু ভালো' এইটুকু এতটুকু শুধু
পূর্ণ করে ছিল প্রাণ মর্ম্ম মাঝে সঞ্চারিয়া মধু—
আলোকে আঁকিল হাসি অন্ধকারে অপূর্ব্ব বিরাম
দিনেরে সৃজিল লিখি নব নব পরিচ্ছেদ নাম।
ঋতুর নূপুর হ'তে ঝরে পড়া কুসুমে পল্লবে,
মধুর মৃদঙ্গ রবে, মর্ম্মর গুঞ্জিত কলরবে,
শুনায়ে সঙ্গীতে সুরে, সম্ভাষণ কথা কত বার,
ত্রিভুবন ভরি মোরে অপরূপ পরিচয় তার।
কখন বারতা এলো হয়ে গেছে সারা সে সঞ্চয়
এবারে ফিরিতে হবে, এবারে নূতন পরিচয় ;
কোটী গ্রহ নক্ষত্রের আঁকা বাঁকা আলো-ছায়া পথ,
নন্দাতিথি হারায়েছে ; রিক্ত যাত্রা এবারের কত,—
সে দিবস সাঙ্গ হ'ল, এবারে নূতন অহরহে,—
স্বপনে চিনিতে হবে, মূক স্তব্ধ একান্ত বিরহে ;
মৃত্যুতে চিনিতে হবে, বিচ্ছেদে বাসিতে হবে ভালো
অজানা সীমান্ত চাহি পথপ্রান্তে জ্বালি সন্ধ্যা আলো।

নামহীন এদিনের ঋতু পত্রে আজ লিখে রাখি,
সেদিনের ভালবাসা এদিনের বিরহেতে আঁকি ;—
—মধুর বিন্দুর চেনা, নাম নাই সীমা নাই যার—
'নন্দা' রিক্তা পূর্ণ যাত্রা অপরূপ সম্পূর্ণ আমার।

রক্তদগ্ধা

শ্রীপ্রমীলা রায়

উপন্যাস

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

(৫)

প্রভাতের চিঠিটা পড়তে খুব বেশী সময় লাগেনি। কিন্তু পড়ে প্রকৃতিস্থ হতে তার একটু সময় লাগ্‌ল। মাথার ওপরে পাখাটা খোলা থাকা সত্বেও তার চোখ মুখ দিয়ে অসম্ভব গরম বের হয়ে, সমস্ত মুখখানাকে সিন্দুর করে তুলেছিল।

খোলা চিঠিখানা সামনের টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে সে কাছাকাছি একটা সোফায় বসে পড়ল। ভাবতে লাগ্‌ল, কোথা থেকে কিসের সংঘটন! সে তো বিয়ের কোন কথা এখনও মনেও আনতে পারেনি। তার ওপর পিতার কথায় তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে যদি বিয়ে করতেই হয় তো সে কি এই মীনার মত মেয়ে! যে শুধু বোর্ডিংএ থেকে পড়াশুনো ও আদব কায়দাই শিখেছে! এ কি তার বাবাকে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত তৃপ্তি বা শান্তি দিতে পারবে? একি তার মাতৃহীন ছোট ছোট ভাই কটীকে 'ভাই' বলে টেনে নিতে পারবে? উদ্যানলতা কি বনলতা হতে পারে? একে ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখা চলে, শিউলী, অতসী কুন্দর মত একে যেখানে সেখানে রাখা চলে না—ভাবনা তো অনেক। মনে মনে হেসে বল্‌লে "ছিলাম কল্‌কাতায়, মার্চ্চেন্ট আপিসের বড়বাবু, দশটা, চারটা আফিস করি। চার দিনের ছুটি পেয়ে আর ৮ দিন আদায় করে বেড়াতে এলাম এখানে। দামোদরের উৎপত্তি দেখ্‌ব বলে। 'রাজরাপ্পায়' গেলাম, ফিরতে পথে মোটর ভেঙে কি দুর্ভোগেই পড়েছি! অতিথি হয়ে এদের বাড়ী এসে, অতিথির সৎকার তো যতদূর হবার হলো, বিদায়কালে দক্ষিণারও দেখ্‌ছি ভাল রকম ব্যবস্থা হচ্ছে—একেবারে কন্যাদান! এ যে রীতিমত আরোব্যপন্যাস!

প্রভাত যখন এই রকম ভাবনায় ভোর, বন্ধ দরজা ঠেলে রমাপতিবাবু ঘরে ঢুকে পেছনে দরজাটা বন্ধ করে এসে প্রভাতের সামনে একটা চেয়ার সরিয়ে বস্‌লেন। তাঁর এসে বসায় এবং পরের কথাগুলি কি হবে তাই ভেবে সে নিজেকে প্রস্তুত করছিল। চেয়ারে বসে বিনা ভূমিকাতে তিনি বল্‌লেন "তোমার বাবার চিঠিখানা কি পড়েছ প্রভাত?"

মাথা নীচু করে সে বললে 'হাঁ'।

"তোমার কি মতামত এ সম্বন্ধে? আমার মেয়েকে তো দেখ্‌লেই—পড়াশুনা সে আই,এ পর্য্যন্ত করেছে। আর আচার-ব্যবহার—তা সে কথা তো ঘরে না নিলে বুঝ্‌তে পারবে না বাবা। ওর মন যে কত কোমল ও কত দৃঢ় তা একমাত্র আমিই জানি—আর জানি বলেই আমার সঙ্গে ওর যত বনে, এত ওর মায়ের সঙ্গেও বনে না। আর তুমিও তো ক'দিন ধরে ওকে দেখ্‌ছ বাবা" প্রভাতের হাসি এল। ভাব্‌লে, বলে যে 'কতটুকু আর কিই বা আমি দেখেছি?' কিন্তু কিছু না বলে চুপ করেই রইলো। তার কাছে কোনো সম্মতির কথা না পেয়ে রমাপতিবাবু হঠাৎ যেন কি আবিষ্কার করলেন, এইভাবে বললেন "তবে হ্যাঁ, তুমি যদি আর কোথাও বিবাহ করতে ইচ্ছা করে থাক বা বাগদত্ত হয়ে থাক, তবে আমি তোমাকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে মনস্তাপ পেতে দেবো না। আমাকে তুমি, তোমার বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী বলেই জেনো।" তাঁর কথার সুরে বিচলিত হয়ে প্রভাত বললে "না, না, ওসব কোনো কথা নয়। আসলে আমি বিয়ে সম্বন্ধে এতদিন কিছুই ভাবিনি—হঠাৎ সেটা অপ্রত্যাশিত রকমে আসন্ন হয়ে পড়ায় একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছি মাত্র। আর কিছুই নয়।"

হো হো করে হেসে রমাপতিবাবু বল্লেন "এইতো বাবা বুদ্ধিমান হয়ে বোকার মত কথাটা বল্লে! পাগল ছেলে! বড় হয়েছ, পয়সাকড়ি ঘরে আন্‌ছ—আর বিয়ে করবার কথাটা মনে করনি তাই কখনো হয়? আমার মেয়ে কে বিয়ে

করবে তা না হয় ভাবোনি—কিন্তু কারো না কারো মেয়েকে বিয়ে করে তোমাকে সংসারী হতে হবে, তা ভাবা তো উচিত ছিল।

প্রভাত নতমুখে বসে রইলো।

রমাপতিবাবু বলেই যেতে লাগলেন—"তারপর তোমার বাবার যখন এতে বিশেষ সম্মতি আছে, উপযুক্ত ছেলে তুমি, তোমার কি তাঁর ইচ্ছামত কাজ করা উচিত নয়? বিশ্বাস করো আমি কথা দিচ্ছি, আমার মেয়ে তোমাকে কখনো দুঃখ দেবে না। কি বল বাবা, তোমার মত আমাকে জানতে দাও"—বলে তিনি প্রভাতে হাতদুখানি চেপে ধরলেন।

প্রভাত একটু বিব্রত হয়েই বললে 'বাবার ইচ্ছায় ইচ্ছা—তিনি দুঃখ পাবেন বলে এ পর্য্যন্ত তাঁর অমতে কোনো কাজই করিনি। কিন্তু মতটা যে একলা আমার হলেই হ'বে না—আপনার মেয়েরও মতটা জানা দরকার। তিনি উচ্চ শিক্ষিতা, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করবার ইচ্ছা বা অধিকার তাঁকে আপনার দেওয়া উচিত। এতো নিরক্ষরা পল্লীবালিকা নয় যে যাকে ধরে আপনারা বিয়ে দেবেন, তাকেই সে খুসীমনে মানিয়ে নেবে!"

রমাপতিবাবু প্রভাতের সম্মতি পেয়ে এবারে জোর গলায় হেসে উঠলেন। বল্লেন, 'মেয়েকে উচ্চ শিক্ষাই দিই আর যাই করি, হিন্দু নামটা তো আর মুছে ফেলতে পারছিনে!—তাই বাইরে যতই অহিন্দুয়ানী করি ভেতরটা আমার ঠিক আছে। ছেলেমেয়ের বিয়েথাওয়া সবই আমার মতে থাকে। একি সাহেব বাড়ী, যে বিয়ের আগে 'কোর্টশিপ' চাই, 'প্রোপোজ' চাই তারপরে 'এনগেজড' হয়ে তখন মা বাবা জানতে পারবেন"—না, না তুমি ওসব কিছুই মনে কর না। তোমাকে স্বামী পেয়েও যদি মনে সুখী না হতে পারে তবে বুঝবে সেটা তার কপালের দোষ। তার অদৃষ্টে সুখ ভোগ নাই তাহলে। লোক চেনার ক্ষমতা আমার আছে। তাইতে প্রথম তোমাকে দেখেই আমার মাথায় যে প্ল্যানটা এসেছিল তা প্রায় শেষ করে এনেছি। কুলি মজুর খাটাই বলে বুদ্ধিটাও আমার তাদের মত মোটা নয়, বুঝলে?" বলে তিনি আবার তাঁর সেই সরল হাসি হাসলেন।—

প্রভাত ধীরে ধীরে বললে "আপনাদের সকলের মতে আমি যদি একান্ত সুপাত্র হয়ে থাকি তবে আমার নিজের আর কোন আপত্তি নাই।"

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রমাপতি বাবু বল্লেন "বড় নিশ্চিন্ত করলে আমায়। যাই এখনও কাউকে জানানো হয়নি। সবাইকে সুখবরটা জানাইগে। প্রভাত তুমিও এস।"

"যাচ্ছি একটু পরে।" রমাপতি বাবু তাড়াতাড়ি ঘর থেকে চলে গেলেন।

প্রভাত তাঁর পরিত্যক্ত চেয়ারখানায় বসে পড়ে ভাবতে লাগল, তার অদৃষ্ট তাকে কোন্ পথে নিয়ে যাচ্ছে। বিয়ের কথায় বিশেষ আপত্তি তো সে করল্না, কেন? পাত্রী মীনা বলে? না, তাই বা কেন? মীনাকে সে ক' মুহূর্ত্তই বা দেখেছে? তার কতটুকু কথাই বা সে জানে? তবে, বলা নেই, কওয়া নেই, হঠাৎ বিয়ে করতে রাজী হওয়ার কি কারণ? পিতৃভক্তি না নিজের দুর্ব্বলতা? সে যাই হোক; ভাগ্যে বিষ বা অমৃত যাই থাক নীলকণ্ঠের মত তা পান করতেই হবে।

প্রভাতের এই ভাবনায় বাধা দিয়ে, শুভ্রাংশু স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। একলা তাকে বসে থাকতে দেখে বল্লেন "একি আপনি যে এখানে একলা! অথচ আপনাকে কেন্দ্র করেই আজকের নিমন্ত্রণটা হয়েছে! স্বরটা কিছু স্নেহের বলেই প্রভাতের মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়্ল যে মাত্র কিছুক্ষণ আগেই সে এবাড়ীর বিশেষ আত্মীয় হবে বলে প্রতিশ্রুত হয়েছে, আর শুভ্রাংশু নিশ্চয়ই সেই আত্মীয়তার দাবী করতে এসেছেন। পুরুষ হলেও নতুন বিয়ের কথাটা মনে করতেই তার সারা দেহ মনে একটা শিহরণ চলে গেল। শুভ্রাংশু তার এই বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করে বল্লেন "চলুন, চলুন, বাবা ডাকছেন আপনাকে কার সঙ্গে যেন আলাপ করিয়ে দেবেন।"

এ আহ্বানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বুঝতে প্রভাতের একটুও দেরী হল না। ভবিষ্যতের ভাবনা ঝেড়ে ফেলে সে এখন বর্ত্তমানকেই নিতে চল্ল।

শুভ্রাংশুর সঙ্গে প্রভাতের ঘরে ঢোকা মীনার চোখ এড়াল না। তার গান তখন চল্ছে—

একলা চলা পথটী আমার করব রমণীয়
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশ খানি দিও

অনেক দূরে সকলের আড়ালে, নিজেকে লুকিয়ে প্রভাত বসে পড়ল। গানের লাইন দুটী তার মনে যেন গভীর দাগ দিয়ে যাচ্ছিল। এ গান তো সে আগে আরো কতবারই যে পড়েছে, কিন্তু তার ভিতরের রূপটা তো এমন করে তখন ধরা পড়েনি। নিজের মনের ভাবান্তর হয়েছে বলে কি গানের কথাগুলি ধরা দিচ্ছে? হবেও বা। মীনা গেয়েই চল্ল—

হৃদয় আমার চায় যে দিতে কেবল নিতে নয়
বয়ে বয়ে বেড়ায় সে, তার যা কিছু সঞ্চয়।
হাতখানি ওই বাড়িয়ে আনো, দাও গো আমার হাতে।
ধরবো তারে, ভর্‌বো তারে, রাখবো আমার সাথে।
একলা পথের চলা, আমার করব রমণীয়।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশ খানি দিও।

প্রভাত দুই কাণ ভরে শুনেই যেতে লাগল। গান শেষ হলে মীনা বাজনাটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। রমাপতি-বাবু প্রভাতের হাত ধরে সামনে এনে বল্লেন "এই প্রভাত আমার সতীর্থ ও বাল্যবন্ধুর ছেলে। এম, এ পাশ করে মার্চ্চেণ্ট আফিসে বেরোচ্চেন—শীগ্‌গীরই চাকরীটা পাকা হয়ে যাবে। এঁরই সঙ্গে আমি মীনার বিয়ের ঠিক করেছি। পাত্রের রূপ তো আপনারা দেখছেন, গুণও শুন্‌লেন। আশীর্ব্বাদ করুন যেন মীনা কোনও দিন অসুখী না হয় বা এঁদের অসুখের কারণ না হয়। হঠাৎ বিয়ের কথা শোনায় সবাই প্রথমে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন; তার পর দেখ্‌লেন 'ভোলানাথ' রমাপতি বাবু বেশ সস্তায় ও অনায়াসে একটী সুপাত্র বের করেছেন। মনে যাঁর যাই থাক্‌—বাইরে কিন্তু আশীর্ব্বাদ ছাড়া, করবার তাঁদের আর কিছু রইল না।

এই কথা শোনার পরে মীনার সেখান থেকে চলে যাওয়া বা থাকা দুইই সমান অসুবিধা বলে মনে হচ্ছিল; কিন্তু যায়ই বা কি করে? এখন যে ঘরের সব লোকগুলিরই চোখ তার উপরেই আছে, এই সামান্য কথাটা সে চোখ না তুলেই বুঝ্‌তে পারছিল। প্রভাতের অবস্থা আরও শোচনীয়। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, সে যেন মীনার কাছে, ছোট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু উপায় কি? এই সঙ্কট থেকে তাদের মুক্তি দিলেন রমাপতি বাবু। এক হাতে প্রভাতের হাত অন্য হাতে মীনার হাত নিয়ে তিনি বল্‌লেন, "মীনা, আমি তোমার পিতা ও প্রভাতের পিতৃ-স্থানীয়। আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান তোমাদের মিলিত করে সুখে ও শান্তিতে রাখুন। দুঃখ, দারিদ্র্য, অভাব, অনটন কিছুই যেন তোমাদের আত্মাকে মলিন না করে।" মীনা ধীরে ধীরে তার বাবার হাত ছাড়িয়ে মাথাটা নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রভাতের অজ্ঞাতে তার চোখ দুটী মীনার গমন পথে চেয়ে দেখলো। হঠাৎ অনেক দিনের পুরোণো কথা একটা তার মনে এল "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব" কথাটা কবিরা ঠিকই বলেছেন।

৬

বিয়ের কথা পাকাপাকি হবার পরে প্রভাত সেখানে আর কিছুতেই থাক্‌তে চাইল না। রাত্রেই যদি যাওয়ার সময় থাক্‌তো, তবে সে চলেই যেত। কিন্তু ট্রেণের সময় না থাকায় বাধ্য হয়ে সে-রাত্‌ অপেক্ষা কর্‌তেই হল. একে তো নিজের লজ্জাকর অবস্থার জন্য সে বিশেষ অস্বস্তি ভোগ কর্‌ছিল, তার ওপর সকলের সসম্ভ্রম 'জামাই বাবু' সম্বোধন তাকে আরো লজ্জিত করে তুল্‌ছিল।

যে ঘরটায় সে থাকৃত সেটা বাইরের বাগানের গা ঘেঁষেই ছিল। দুদিন আগে কোজাগর পূর্ণিমা হয়ে গিয়েছে। শরতের ধব্‌ধবে্‌ জ্যোৎস্নায় সারা আকাশ ভেসে যাচ্ছে। তারই ছায়া পৃথিবীর, মাটী, গাছপালা, ফল-ফুল, বাড়ী-ঘরের ওপরে পড়ে তাকে যেন মায়াপুরী করে তুলছিল। প্রভাত আজ আর ঘরে থাক্‌তে পার্‌ছিল না। সন্ধ্যার সমস্ত ঘটনাগুলি, একে একে বায়স্কোপের ছবির মত তার মনের ভিতর ঘুরে চল্‌ছিল। কোথায় ছিল সে, আর কোথায় ছিল এই মীনা! কি সূত্র অবলম্বন করে যে বিশ্বশিল্পী এই ফুল দুটী গাথ্‌ছেন তিনিই জানেন।

ঘরের সব জানালা ক'টী খুলে দিয়ে, সে বেড়াতে আরম্ভ কর্‌ল, তার আর শেষ নাই। জানালার ফাঁক পেয়ে জ্যোৎস্না যেন হাসিমুখে, তার বিছানায়, ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়্‌ল। মনের পূর্ণতায় সে যেন অধীর হয়ে উঠ্‌ল—এত আবেগ তার মনে আর ধর্‌ছিল না। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে আলনা থেকে সবুজ রংয়ের আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে বাহিরে বাগানের জ্যোৎস্না সমুদ্রে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রমাপতিবাবু কনট্রাকটারী করেন; পয়সার কোনো

অভাব নাই। বাগানখানি এমন করে সাজিয়েছেন যে, যে-কোন লোকেরই সেখানি দেখে লোভ হয়। হাজারিবাগের মত জায়গায় পাহাড় কেটে যেন নন্দন কানন তুলে এনে বসিয়েছেন। বাগানের মধ্যে যে পাথরের মূর্ত্তিগুলি ছিল, তার ওপরে জ্যোৎস্না পড়ে সে গুলোকে যেন আরও শাদা করেছে। অন্যমনস্ক হয়ে তারই একটার নীচে সে বসে পড়ে ফের গোড়া থেকে সন্ধ্যার ঘটনাগুলি মনে কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লে। মীনা কি এসব জান্‌ত? জান্‌লে কি আর আস্‌তে পার্‌তো? কিংবা এদের সাহেবী কায়দায় হয়তো বাধে না। কিন্তু মেয়েটী যে কেমন তাতো একটুও বোঝা গেল না। সুন্দরী, তা তো দেখাই গিয়েছে—তার ওপর সযত্নে পরা হেলিওট্রোপ শাড়ী, মুক্তার মালা ও নীল মীনাকরা চুড়ি দুটীতে তার সৌন্দর্য্য যেন আরো ফুটে বেরোচ্ছিল। আচ্ছা, হেলিওট্রোপ না পরে যদি অন্য রংএর শাড়ী পর্‌ত, তা হলেও কি এ রকম সুন্দর দেখাত? দেখাত বোধহয়, যে সুন্দর তাকে সব জিনিষেই সুন্দর দেখায়। চোখের কোণের টানটী, ঠোঁটের বাঁকান ভাবটী, ঘাড়ের ওপর এলিয়ে পড়া এলো খোপা, তার ফাঁক দিয়ে আধ ফুটন্ত গোলাপের কলিটী, চাঁপার কলির মত লতানে আঙুলে এঁটে বসা আংটীটী, বাঁ হাতের ঘড়িটী সবই তার মনে এখন রং ধরিয়ে দিচ্ছিল। মুহূর্ত্তের দেখায় প্রভাত এতটাই দেখে ফেলেছিল। কাপড় পরার ভঙ্গি, পায়ের লাল ভেলভেটের উপর রূপালী কাজের শ্লিপার, কাণের, অশ্রু বিন্দুর মত টলটলে মুক্তা দুটী তার মনে মায়াজাল বিছিয়ে দিচ্ছিল। চারদিক নিস্তব্ধ, মাথার ওপরে আকাশে জ্যোৎস্না ঢলঢল, চারি পাশের যতদূর চোখ যায় সব সাদা ফোয়ারার জলে লক্ষ লক্ষ হীরার কুচি, প্রভাত ভাব্‌লে অতি সন্তর্পণে একবার অক্ষর দুটি ব'লে দেখি নিজের কানে কেমন শুনতে লাগে! বলেই ধীরে ধীরে 'মীনা' 'মীনা' বল্‌তে চারিদিকে একবার দেখে নিলে কেউ শুনেছে কিনা। তারপর হেসে বল্‌লে "আমার আজ হল কি! পাগল হলাম নাকি?—"

বাগানে একটা 'সামার হাউসও' ছিল তার ভিতরে দুখানি হেলান বেঞ্চি ফেলা ছিল। অন্য মনে সেই "সামার হাউসের" দিকে যেতে যেতে প্রভাত দেখলে যে একটা পাথরের মূর্ত্তি যেন বড়ই শাদা দেখাচ্ছিল। ভাল করে চোখ মুছে দেখ্‌লে যে, সেখানে মানুষের মত একটা কি ছায়া ও আলোতে মিশে সেই মূর্ত্তিটাকে আরো শাদা করে তুলেছে। একবার দেখেই সে মুহূর্ত্তে পিছন ফির্‌লে। ভাব্‌লে বোধ হয় অন্তঃপুরের সীমানায় এসে পড়েছে। বাড়ীর মেয়েদের কারো বোধহয় জ্যোৎস্নায় এই অপরূপ মায়ালোকে, তারই মত বেড়াতে সাধ হয়েছে। ছি! ছি! তার আজ হলো কি? মনের আবেগে সে সীমানার বাইরে চলে এসেচে? যদি ওই নারী, কারণ তা ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভব নয়, তাকে দেখে থাকেন তো না জানি কি মনে কর্‌ছেন। আত্মগ্লানিতে মন তার পূরে উঠ্‌ল।—

দু এক'পা যেতে না যেতেই সে পিছন থেকে মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ আহ্বান শুন্‌লে। শোনার ভুল মনে করে সে এগিয়েই যেতে লাগল। আবার সেই আহ্বান "একটু শুনুন।"—এবারে আর ভুল নয় বুঝে সে ফিরে প্রশ্নকারিণীর দিকে গেল। চাঁদের উপর তখন একটুক্‌রো কালো মেঘ এসে তার জ্যোতিকে ঢেকে ফেল্‌ছিল। কাছে গিয়ে দাঁড়াতে সে শুন্‌লে; কে বল্‌ছে, "আপনার সঙ্গে কথা বল্‌ছি বলে আমাকে প্রগল্‌ভা ভাববেন না; খুব দায়ে পড়েই আমি এরকম করতে বাধ্য হয়েছি জান্‌বেন। আর কাউকে দিয়ে একাজ হতে পার্‌লে আমি আর নিজে এ লজ্জা ভোগ কর্‌তাম না।"

কথার স্বরে প্রভাত বুঝ্‌লে যে মীনাই এখানে আছে। যে মীনার চিন্তায় তার এতক্ষণ কাট্‌ছিল যে মীনাকে দুদিন পরেই একান্ত আপনার বলে মনে কর্‌তে পারবে সেই মীনাকে হঠাৎ এই নির্জ্জনে নিজের এত কাছাকাছি দেখে সে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল। ভয়ও যে না হল তা নয়। বিয়ে তো হয়নি এখনও, মীনার কাছে এখনও সে পর মাত্র—এই নিশীথ নির্জ্জনে যদি কেউ তাদের দেখে? কোনো কথা শোনার আগেই দোষের ভাগী হতে হবে। একবার সে ভাবলে চলে যাই। আবার ভাব্‌লে ভয়ই বা কি? দুদিন পরে যাকে বিয়ে করব বলে প্রতিশ্রুত হয়েছি, তার সঙ্গে যদি নির্জ্জনে দুটো কথা বলি, তাতে দোষ এমন কি হবে? হিন্দু সমাজ ছাড়া, আর সব সমাজেই তো এই-ই নিয়ম। কেউ যদি কিছু ভাবে বা দেখে, দেখুক—মীনা কি বল্‌তে চায় আমাকে, সেটা আমার শোনা কর্ত্তব্য। মেঘের ছায়াটা চাঁদের ওপর

থেকে সরে গিয়ে চারিদিক আবার শাদা জ্যোৎস্নায় ভরে উঠ্‌ল। প্রভাত মীনার দুহাত তফাতে দাঁড়িয়ে বললে, "বলুন"। উত্তর শুনে মীনার হাসি এল। ভাবলে ঠিক্ আর্য্য প্রথামত আলাপ চল্‌বে নাকি! হাসিটা সাম্‌লে নিয়ে সে বল্‌লে "বাবার কাছে, আমার সম্বন্ধে বোধহয় অনেক আজগুবী কথা শুনেছেন, কিন্তু আসলে আমি তা নই। আমার কথা বাবা বড় বেশী করেই বলেন! আমি যা, তা আমি নিজেই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি। আর বছরে ম্যাট্রিক পাশ করেছি, ছোটবেলা থেকে বোর্ডিংএ থেকে থেকে সাংসারিক বুদ্ধি বা কর্ম্ম-প্রবৃত্তি আমার মোটেই নেই। সকলের কাছে যত্ন পেয়ে পেয়ে অন্যকে যত্ন করাটা আমার আদৌ আসে না। এরকম সব গুণ থাকাতে কি আপনাদের সংসারে আমাকে চল্‌বে? তারপরে আমি মনে করেছি, অন্ততঃ বি-এ পর্য্যন্ত পড়ে নামের পাশে একটা ডিগ্রী বসাব। কিন্তু বর্ত্তমানে যে অবস্থায় পড়েছি এবং ভবিষ্যতে যে অবস্থায় পড়ব, তাতে করে আমার কিছুই হবে না।"

"কিছুই হবেনা বল্‌ছেন কেন? ভবিষ্যতে আপনি যেভাবে থাক্‌লে খুসী হবেন, আমরা আপনাকে সেইভাবে রাখার চেষ্টা কর্‌বো। কিন্তু এতো সামান্য কথা—এইটাই এত বড় বলে মনে কর্‌ছেন কেন?—"

"না, এর পরেও আমার আরো কথা আছে। বিয়ে করাটাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়—এ ছাড়াও করবার আরো ঢের কাজ আছে। আপনি শিক্ষিত ও কৃতী; কিন্তু ভেবে দেখুন তো বিয়েটা কি সকলের পক্ষে দরকারী? আপনার হয়তো দরকার, কিন্তু আমার চেয়েও সর্ব্বাংশে ভাল মেয়ে আপনি খোঁজ করলে ঢের পাবেন।"

গম্ভীর স্বরে প্রভাত বল্‌লে "তা হয়তো যেতে পারে। কিন্তু দেখুন, যে জিনিসটা আপনার বাবা ও আমার বাবা দুজনে মিলে ঠিক বলে মেনে নিয়েছেন, সেটার ভিতরে যে কিছু না কিছু সু ও শুভ আছেই এটা আমি অস্বীকার করতে পারছি না। যে বন্ধন মানুষ থেকে আরম্ভ করে সামান্য পশু, পাখী পর্য্যন্ত স্বীকার করে নিচ্ছে স্বেচ্ছায়, তাতে আপনার এত আপত্তি কেন?"

"কারণ তো আপনাকে বলেইছি। দূর থেকে যে জিনিস ভালো দেখায় কাছে গেলে তখন আর তত ভাল দেখায় না।—"

"আচ্ছা, ধরুন, আপনার যা' কিছু অসুবিধা তা যদি দূর করে দেওয়া যায়, তা হলেও কি আপনার মত বদলাতে পারে না?"

"হাঁ, পারে। কিন্তু কেনই বা আপনি এত করবেন? চেষ্টা কর্‌লেই তো ভাল মেয়ে পেতে পারেন।—"

আকাশে কোথাও আর মেঘের ছায়া ছিল না। হেনার গন্ধ চারিদিকের বাতাসকে ভারী করে তুল্‌ছিল। প্রভাত দেখলে মীনা তখনও তার সেই সন্ধ্যার সাজ খোলে নি। কাণের মুক্তা দুটী ও গলার মালাটী চাঁদের আলোয় ঝলমল করে উঠ্‌ল। একবার মীনার দিকে দেখেই আত্মহারা হয়ে হঠাৎ সে বলে ফেল্‌লে "বারে বারে—তুমি আমাকে সরিয়ে দিও না মীনা। মন যাকে একাগ্র হয়ে পেতে চাইছে, মিথ্যা ছলনায় তাকে আর ঘুরিও না। তোমার বাবার যখন সম্মতি পেয়েছি, তখন পৃথিবীর আর কোনো বাধাই আমি মান্‌বো না। পাহাড় ধ'সে যখন ঢল নামে তখন তার গতি রোধ কর্‌তে পারে, এমন কিছু পৃথিবীতে নেই—আপন গতি বেগে, পথে-বিপথে সে পথ করে চলে। আমার মনের যে সুপ্ত বৃত্তিকে তোমার বাবার সাহায্যে জাগিয়েছি, সে আর নিবৃত্তি হবেনা—সুবিধা পাই তো দেখিয়ে দেব। তোমাকে ফুলই দেব মীনা, কাঁটা দেবনা।"—

"কিন্তু কেন?—কেন আপনি আমার জন্যে এত অসুবিধা ভোগ করবেন?—"

"কেন করব? কেনই বা কর্‌বনা? বিজয়-যাত্রা করে বেরিয়ে ছিলাম, জয়শ্রী সঙ্গে নিয়ে ফিরব। এখানে আসা আমার সার্থক হলো। আমি সুখী হব—কিন্তু তুমি তো —"

একটু এগিয়ে এসে মীনা বল্‌লে "মাপ কর্‌বেন। আমি আপনাকে পরখ কর্‌ছিলাম। জানেন না কি যে হিন্দু মেয়ের বিয়ের কোনো কথায় থাক্‌তে নেই—মা, বাবা ও অভিভাবকে যা করেন তাই শিরোধার্য্য!—দেখ্‌ছিলাম যে দায়ে পড়ে বিয়ে না অন্য কিছু!—কলেজেই পড়ি আর বোর্ডিং এই থাকি, বাবার আদেশেই আমার সব চেয়ে বড়।

আপনার ঘরেই আমার শেষ আশ্রয় তা ভাল করে জেনেই কথা বলতে এগিয়েছি—না হলে বল্‌তাম না।—"

"মীনা, এতক্ষণ তুমি ছলনা করছিলে?—কিন্তু দরকার ছিল কি?—"

"না, কিছুই না। শুধু একটা খেয়াল।" বলে উঠে দাঁড়িয়ে সে বাগানের পথ ধর্‌ল। সরে দাঁড়িয়ে তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে প্রভাত বল্‌লে "একটা কথা; কালই আমি চলে যাচ্ছি। আবার ঠিক সেই সময়ে হাজির হব। গত কাল যা মনেও কর্‌তে সাহস করিনি, আজ তা ঘটে গেল, আগামী কাল এমন সময়ে আমি ট্রেনে যাচ্ছি। একটু কিছু চিহ্ন তোমার দেবে না মীনা, যাতে করে এই প্রতীক্ষার দিনগুলো আমার কেটে যায়!"

চল্‌তে চল্‌তে মীনা ফিরে দাঁড়াল। একটু কি ভাব্‌লে তারপর হাতের আঙুল থেকে মীনার অক্ষরে 'মীনা' লেখা আংটীটা খুলে হাতে ধরে বল্‌লে "এটা ছাড়া দেবার মত আমার আর কিছু নেই।—আর কিছু দিলে জানা-জানি হবে।"—

লোভীর মত প্রভাত তার সবুজ আলোয়ানের ভিতর থেকে হাত বের করে বল্‌লে "তুমি পরিয়ে দেও।—"

মীনা লজ্জায় ও সঙ্কোচে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো প্রভাত আরার বল্‌লে "আজকের রাতের স্মৃতি স্বর্ণাক্ষরে আমার মনে লেখা থাক্‌বে—দাও মীনা পরিয়ে তোমার দান, আমি মাথায় করে রাখবো।" প্রভাতের উচুঁ করে তুলে ধরা আঙুলের মধ্যে—আংটীটা গলিয়ে দিয়েই মীনা পিছন ফিরল। প্রভাতের গায়ের রংএ আংটীর সোনার রং বুঝি মিশে গেল।

প্রভাত বল্‌লে "যে ক'দিন ঘুরে না আস্‌ছি—চিঠি লেখায় কি তোমার আপত্তি হবে?

"না, না, সে কি?—সে বড় বিশ্রী হবে।" বলেই মীনা একরকম ছুটে পালিয়ে গেল।—

প্রভাত ধীরে ধীরে তার এই ভাগ্য পরিবর্তনের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঘরে চলে গেল।—

বাগান পার হয়ে বারান্দায় উঠতেই সিঁড়ির মুখের দরজা খুলে মলিনা বের হয়ে এসে মীনাকে বল্‌লে "এস, এস, অভিসারিণী! বিয়ের-নামে-জলে-উঠুনী। চুরি-বিদ্যে-ধরা-পড়্‌নী!—তোমার জন্যে দরজা খুলে আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি। দুঘণ্টা ধরে কথাই ফুরোয় না! কিসের এত কথা রে!—আমরা তো ফুল-শয্যার দিনেও এত কথা বলিনি তুই আজ যত বল্‌লি!—"—

"বড়দা বুঝি আজ শুতে আসেনি এখনও?—"—

"আস্‌বেন না কেন?—তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছি। রাত কি কম হল?—তোমার কি সে হুঁস আছে? মীনু, বল্‌বিনে ভাই কি কথা বল্‌ছিলি?"—

সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে মীনা হেসে বল্‌লে "কিছুই নয় ভাই বৌদি' তুই শুতে যা।—মানুষটাকে একটু যাচাই কর্‌ছিলাম।"—

মলিনা তার ঘরে চলে গেল। মীনা গুন্ গুন্ করে গাইতে গাইতে গেল।

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।'

৭

যতীশ্বর ছিল রমাপতি বাবুর স্বজাতি। গরীবের ঘরে জন্মালেও অনেক লোকের যেমন উঁচু দিকে নজর থেকে যায় যতীর ছিল ঠিক তাই। দেশ থেকে যখন যতীকে সঙ্গে করে তিনি হাজারিবাগে ফির্‌লেন, তখন সন্তুষ্ট হওয়ার চেয়ে অসন্তুষ্টই হয়েছিল সকলে বেশী। রমাপতি কিন্তু বাড়ীর সকল লোকের সঙ্গে বিদ্রোহ করেই—যেন এই অনাথ ছেলেটীর ওপর খুব মনোযোগ দিলেন। এই মন দেওয়াই হল সকল অনিষ্টের মূল। ফলে, তিনি যখন বাড়ী থাক্‌তেন যতীর আদরটা তখন সকলের কাছের বেশী হ'ত আর না থাকার সময়ে ঝি চাকরেও তাকে গ্রাহ্য কর্‌ত না।

যতীর নিজের, কিন্তু এসবে কোনও ক্ষতি হত না, ঝি-চাকরের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য সে গ্রাহ্যই করত না। কর্‌লেও এসব নিয়ে কোনো হাঙ্গামা করা তার আদৌ আস্‌ত না।—

রমাপতি বাবু নিজের সঙ্গে রেখে রেখে, যতীকে তাঁর কাজের অংশীদার করে তুললেন। বুদ্ধিমান্ যতীও নিজের ভাগ্য ফেরাবার একটা পথ এতদিনে যেন খুঁজে পেল। শতদলের কাছে প্রথম যেদিন তিনি বললেন যে মীনার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যেই তিনি যতীকে এমন করে হাতে গড়ে মানুষ করেছেন; সেদিন শতদল অবাক্ হয়ে বল্‌লেন, "সেকি? কোথাকার কোন্ হাঘরের ছেলে নিজের বুদ্ধি ও ভাগ্যের জোরে একটু পায়ের ভর করে দাঁড়িয়েছে বলেই

সে কি মীনুর যোগ্য স্বামী হল? দিনরাত্ মিস্ত্রী খাটিয়ে খাটিয়ে বুদ্ধিও তোমার সেই রকম হয়েছে!"—

বাধা দিয়ে রমাপতি বল্লেন "আহা! বুদ্ধির দোষ আর আমাকে দিওনা। তা হলে এই হাজারিবাগের মত জায়গায় আর ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো জল্‌ত না। কেন, যতী, পাত্র হিসেবে মন্দ কি?—পুরুষের শ্রী হল বুদ্ধি, কর্ম্মপ্রবৃত্তি, সুস্থ সবল দেহ। তাদের দুএক পোঁচ গায়ের রং ফরসা কালোতে কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয়না বুঝলে? সে ধরতে গেলে যতীর মত সুপাত্র কোথায় পাব?—"

হ্যাঁ তোমার এক কথা; জন্মে কখনও মেয়ে শ্বশুরঘরে যাবে না। ঘরজামাই হয়ে জামাই চিরকাল এখানে থাক্‌বে—মেয়ের মন তাতে থাক্‌বে না। যে মেয়ে বিয়ের পরে বাপের বাড়ীতেই বেশী থাকে, বাপের বাড়ীর লোকের কাছে তার আর কোন সম্মান থাকে না বুঝ্‌লে? যতীর সঙ্গে বিয়েতে মীনুর আমার সেই অবস্থা হবে। যে অভিমানী! ও যে অমনি করে ঘর-জামাইএর বৌ হয়ে মুখ কালি করে বেড়াবে তা আমি এই চোখে দেখ্‌তে পার্‌বো না। তার চেয়ে ওর বিয়েই দিও না।"

"শোন, শোন, তুমি যে চটেই খুন হলে!—'স্ত্রীণাম চরিত্র পুরুষস্য ভাগ্যম্, দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যা"—বলে একটা প্রবচন আছে জানো? কে বলতে পারে যে, এই কুড়িয়ে আনা যতীশ্বরই একদিন অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হবে না?"—

একটু নরম সুরে শতদল বল্লেন "তা, হয়তো, হতে পারে। কিন্তু মীনু আর যতীতে মোটে বনে না। বিয়ে হয়েই কি আর বন্‌বে।"—

"ও সব মিটে যাবে বুঝ্‌লে গিন্নী! বিয়ের আগে আমাদের তো কই আধুনিক প্রথামত 'কোর্টশিপ' 'লভ্' কিছুই হয়নি! দিন কি মন্দ কাট্‌ছে? সময়ে ওসব ঠিক হয়ে যাবে।—একটা কথা আছে না—

'নূতন প্রেমে, নূতন বঁধু, আগা গোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল মধুর, একটু ঝাঁঝালো।—"—

ঠিক তাই। মীনা এখন জানে, যতী একজন চাল-চুলাহীন কুড়োনো ছেলে। কাজেই খুব কর্ত্রীত্ব করে; আর যদি জানে যে ওর ভাবী স্বামী; তবে দেখ্‌বে যতীর কোনো খুঁতই আর ওর চোখে ঠেকবে না। সংসারের নিয়মই এই। "কাহারো এমন পড়িল না চোখে আমার যেমন আছে"—এই হল সংসারের বীজ মন্ত্র।—"—

"জানিনে বাপু, তোমার যা ইচ্ছে হয় কর। মেয়েটা কষ্ট না পেলেই হল।—"—

"বেশ, বেশ, পথে এস। মীনু কষ্ট পেলে কি সেটা আমারও বাজ্‌বে না? আমি কথা দিচ্ছি, যতী, তোমার মেয়ের সকল অভাব দূর করবে। এর চেয়ে বেশী প্রমাণ আর কিছু আমি জানিনা।"—

সেদিন এই পর্য্যন্ত হয়েই রইলো।

যতীর নিজের কিন্তু এসব নিয়ে কোনো ভাবনাই ছিল না। মীনা সব সময়ে বাড়ীতে থাকে না—যখন বোর্ডিং থেকে আসে, তখন অবিশ্যি যতীর কাজ-কর্ম্মের মধ্যেও তার অসঙ্গত আবদার পূরোতে হ'ত। কারণ দীর্ঘকাল ধরে মীনাদের বাড়ী থেকে সে এটুকু বুঝেছিল যে রমাপতি বাবুকে সন্তুষ্ট রাখ্‌তে গেলে মীনাকে চটানো হবে না। তাই সে বোর্ডিং থেকে বাড়ী এলেই নিজের বিশ্রামের সময়টুকুও যতীর জুটতো না।—

ধনবান পিতার একমাত্র কন্যা হয়েও বরাবর সকলের কাছে প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে খেয়ালেরও তার শেষ ছিল না। হঠাৎ আচমকা কোনদিন বলে বস্‌ল "চল রাজ রূপায় বেড়াতে।"—প্রায় সমস্ত দিনের ধাক্কা। কিন্তু 'না' বলারও যো ছিলনা; কারণ রমাপতি বাবুর ঢালা হুকুম ছিল যে মীনা যেন তার যা' ইচ্ছা, তাই করতে পায়। বাড়ীর কেউ তো নয়ই, এমন কি স্বয়ং শতদলেরও এ নিয়ে কোন কথা বলার উপায় ছিল না।

মীনার বাবা ভাব্‌তেন যে শেষ পর্য্যন্ত যখন দুটীকে একসঙ্গে গাঁথতেই হবে, তখন পরস্পরে যত কাছাকাছি এসে পড়ে, পড়ুক, আরও জানাজানি হোক। মীনাকে নিয়ে যতী এ পর্য্যন্ত কোনই কথা ভাবেনি, বাগানে ভাল ফুল ফুট্‌লে যেমন সকলেই সেটা দেখ্‌তে বা গন্ধ পেতে ইচ্ছে করে, মীনার সম্বন্ধে এর বেশী কোন কথা তার মনে হয়নি। তা ছাড়া, ছোটবেলা থেকেই একসঙ্গে এক বাড়ীতে থাকায় তার ওপর যতীর একটা সরল ও সহজ সস্নেহ ভাব এসে পড়েছিল। কিন্তু যখন থেকে রমাপতিবাবু তাকে ভাবী সম্বন্ধের আভাস দিলেন, তখন থেকে সে আর একটু ভাব্‌তে আরম্ভ করল যে শেষ পর্য্যন্ত যদি মীনা আমাকে বিয়ে করে,

তা হলে বুঝ্‌তে হবে যে আমার ভাগ্য আমাকে তার চরম পুরস্কার দিয়েছে। সাহস করে সে মনে আন্‌তে পারলে না যে মীনাকে বিয়ে করতে তার দিক থেকে কোন আপত্তি থাকতে পারে।

শতদলের স্নেহ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। সুভ্রাংশুও সময়ে অসময়ে তার ঘরটীতে গিয়ে গল্প জুড়ে দেন। মীনার আর দুটী ভাই সুধাংশু ও হিমাংশু যারা ঐখানেই স্কুলে পড়ছিল তারা সময়ে অসময়ে তাকে জামাইবাবু বলে ক্ষেপায়, লজ্জায় তার কাণ লাল হয়ে উঠে। কাছে এসে বলে "ছিঃ! ও বল্‌তে হবে না আমি তোমাদের যতীদা।"

দিন যখন এমনি কাটছে তখন প্রভাত এলো সমস্ত উল্টে গেল।

স্থির হয়ে সে সমস্ত দেখে গেল। বিরুদ্ধে একটী কথাও বল্‌লে না। মনে মনে কিন্তু ঠিক করে ফেল্লে যে এখানের পাততাড়ি এবার গুটাতে হবে এরপরে আর থাকা চলে না।

নিজের ঘরে বসে প্রায় ষোল বৎসর পরে সে আপনার ভাগ্যের কথা ভাবছিল। এতদিন যেন তার এ অবসরও মেলে নি। ভাবলে সে যদি গরীব না হয়ে কিছু পয়সা-ওয়ালা হতো তা হলেও কি মীনার বাবা তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন? এক পয়সা ছাড়া কিসে প্রভাত তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ! নিজের ব্যায়াম পুষ্ট কর্ম্মীষ্ঠ দেহখানার দিকে একবার দেখে সে বল্‌লে "না, এ অপমানের পরে আর থাকা চলে না এখন আমি যেমন করে হোক নিজের ভাত করতে পারব। অসময়ে এঁর আশ্রয়ে এসেছিলাম, খুব দয়া পেয়েছি, প্রভু যিনি, তিনি চিরদিন প্রভুই থাকুন। অন্য সম্বন্ধ তাঁর সঙ্গে করতে যাওয়াই ভুল।" বলেই হেসে বল্‌লে "কিন্তু কেনইবা গাছে তুলে মই কাড়লেন? আমার আশার যা অতীত ছিল, তা কেন আমার চোখের সামনে ধরলেন?—"

প্রভাত যে রাত্রে গেল, সে রাত্রে যতী তার নিজের ঘরে বসে এই রকম নানা চিন্তায় ডুবে ছিল। সে আগের রাত্রে প্রভাত ও মীনার বাগানে কথা বলা শুনেছে, এখন সেইগুলো তার মনে আরো জ্বালা ধরিয়ে দিলে।

ভেবে ভেবে সে ঠিক করলে যে, যেতেই হবে, এটা ঠিক! চুপি চুপি যেতে হবে, কাউকে জানিয়ে যাওয়া হবে না। নিঃসম্বল হয়েই সে তো এদেশে এসেছিল, এখন তো তাও অর্থকরী একটা বিদ্যা তার সম্বল রইলো। নিজের সামান্য যা দু' চারখানি কাপড় ছিল, সেগুলি গুছিয়ে রেখে রমাপতিকে একটা চিঠি লিখলে এই মর্ম্মে যে একটু দূরে একটা কাজ পাওয়ায় সে যাচ্ছে—অসময়ে খবর পাওয়াতে তাঁকে কিছু বলতে পারেনি। কবে ফিরবে তার ঠিক নেই। মীনার বিয়ের জন্যে সে শীগ্‌গীর ফিরবার চেষ্টা করবে। চিঠি লেখা হলে, ব্লটিং ছেপে সেখানার ওপর ঠিকানা লিখে একটা পেপারওয়েট চাপা দিল।

অনেকক্ষণ ধরে এই সব চিন্তা করায় তার মাথাটা গরম হয়ে উঠলো। ঠিক আগের দিনে প্রভাত নিজের আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে, বাগানে পায়চারী করতে বেরিয়েছিল, যতীও নিজের বিরূপ ভাগ্যের চাপে পিষে গিয়ে, অবসন্ন মন ও দেহ নিয়ে বাগানে বেরিয়ে পড়ল।

বেরিয়ে দেখলে মীনাও তত রাত্রে বাগানে এসে আছে। সে নিজের ভাবে এত তন্ময় যে তার আসা-যাওয়া কিছুই লক্ষ্য করলে না। একটা গানের দু চার লাইন ঘুরে ফিরে তার কাণে আসতে লাগ্‌ল।

রঙিয়ে দিয়ে যাও, এবার যাবার আগে,
আপন রাগে, গোপন রাগে,
তরুণ হাসির অরুণ রাগে, অশ্রুজলের করুণ রাগে;
রং যেন মোর মর্ম্মে লাগে,
আমার সকল কর্ম্মে লাগে,
সন্ধ্যা-দীপের আগায় লাগে
গভীর রাতের জাগায় লাগে॥

যতী চোরের মত নিঃশব্দে নিজের ঘরে গেল। বাগানে বেড়ান তার আর হোল না। ঘরে বসেও সে মীনার গানের কথাগুলি শুন্‌তে পাচ্ছিল। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি কাণে লাগিয়ে দিয়ে সে শুন্‌তে লাগ্‌ল, মীনা বল্‌ছে—

"যাবার আগে যাওগো আমায় জাগিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমার, চরণ-দোলা লাগিয়ে দিয়ে।
আঁধার নিশার বক্ষে যেমন তারা জাগে,
পাষাণ গুহার কক্ষে যেমন নিঝর-ধারা জাগে,
মেঘের বুকে যেমন মেঘের মন্দ্র জাগে
বিশ্ব নাচের কেন্দ্রে যেমন ছন্দ জাগে,

তেমনি আমায়, দোলা দিয়ে যাও, যাবার পথে,
আগিয়ে দিয়ে।
কাঁদন বাঁধন ভাসিয়ে দিয়ে॥"

দুবার তিনবার ফিরে ফিরে মীনা একই সুরে এই গান গাইলো। যতী দুহাতে নিজের কাণদুটো চেপে তার বিছানায়শুয়ে পড়ল। সারাদিনের অবসাদ ও মনের ক্লান্তি তাকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে দিলে।

পরদিন ঘুম ভেঙে যখন উঠল, দেখলে ঘরে রোদের ঢেউ খেলে যাচ্ছে, আর হাস্যমুখী মীনা তার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বলছে। "যতীদা, তুমি কি আজ কুম্ভকর্ণের চেলা হয়েছ নাকি? লোক পাঠিয়ে পাঠিয়ে হয়রাণ, শেষে নিজেই এলাম। বাবা বললেন, তোমার শরীর ভাল নেই, সত্যি নাকি যতীদা?"

যতী কিছু বলতে পারলে না—বিছানায় থেকে উঠেই সে বরাবর টেবিলের কাছে গেল—দেখলে পেপারওয়েট কাৎ হয়ে গড়াচ্ছে, চিঠিটা সেখানে নাই।

রেশমী

গল্প

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

রেশমীর স্বামী ফয়জাবাদে চাকরী করে। দুষ্ট লোকে বলে, সে দরওয়ানী করে। রেশমী বিশ্বাস করে না; প্রতিবাদ করিয়া কহে, "কক্ষণ না, কক্ষণ না। সে——" বলিয়া হঠাৎ চুপ করিয়া যায়। আর বলিতে পারে না। সে নিজেও জানে না, স্বামী কি কাজ করে।

শ্বশুরবাড়ীতে কেউ নাই। আছে শুধু একখানি মেটে অতি জীর্ণ ঘর। তাও নাকি আবার সবিনয়ে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছে। তাই, রেশমী বাপের কাছে থাকে। বাপের বাড়ী গোগা।

গ্রামের উত্তরে ছোট নদীটিতে রোজ রেশমী বিকালে কলসী হাতে গা ধুইতে যায়। ফিরিতে বড় দেরী হয়। মা রাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, "তুই কি নদী খুঁড়ে জল আনছিলি নাকি যে এত দেরী?"

রেশমী কাঁকের কলসী নামাইয়া রাখিয়া মুখ টিপিয়া হাসে। কি যেন একটা উত্তর ঠোঁটের কোণে আসে; কিন্তু কিছু বলে না।

মা আরও রাগ করিয়া কহে, "তোর ঢং দেখে আর বাঁচিনে। কথাব গ্রাহ্যিই নেই। ধাড়ী মেয়ে গাঁয়ের পাঁচটা লোক——" বলিয়া বিড় বিড় করিতে করিতে কাজে চলিয়া যায়। মায়ের রকম দেখিয়া বড় হাসি পায়; কিন্তু সুমুখে হাসে না। ছেলেবেলাকার মীরধরের কথা এখনও সে ভোলে নাই। আর সেদিন নাকি তাহার গালের উপর কি একটা ঘটিয়া গিয়াছিল।

রেশমী অবশ্য তা স্বীকার করে না। পাশের বাড়ীর বিন্টুর কিন্তু রেশমীর উপর বড় লোভ। সেদিন কি একটা রসিকতা করিতে আসিয়া রেশমীর কাছে ধমক খাইয়া সে এখন আড়ালে আবডালে উঁকি মারে; কিন্তু সামনে আসিয়া কিছু বলিতে সাহস করে না।

বিকালবেলা নদীর ঘাট যখন প্রায় শূন্য হইয়া আসে, রেশমী তখন একলাটি চুপ করিয়া বসিয়া পশ্চিমের রাঙ্গা মেঘের দিকে চাহিয়া থাকে। চাহিয়া চাহিয়া ভিতরটা হয়ত তাহার তেমনি রাঙ্গা হইয়া ওঠে। হঠাৎ চোখে জল আসিয়া পড়ে। আশ-পাশের লোকের কথা ভুলিয়া যায়। চোখের জল তেমনি ধারা বহিয়া নদীর বুকে পড়িতে থাকে। বিন্টু লুকাইয়া রেশমীর মুখের পানে একমনে চাহিয়া থাকে। তারপর রেশমীর চোখের জল দেখিয়া তাহারও চোখে জল আসিয়া পড়ে; কিন্তু ভরসা করিয়া কাছে আসিয়া কিছু বলে না। রেশমীর বড় রাগ। তাই, সে দূরে দূরে থাকে।

সন্ধ্যা যখন নামিয়া আসিয়া নদীর বুক কালো করিয়া দেয়, তখন রেশমীর চমক ভাঙ্গে। চাহিয়া দেখে চারিদিক তেম্‌নি ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে।

তাড়াতাড়ি গা ধুইয়া, কলসী কাঁকে লইয়া বাড়ীর দিকে ফিরে। বিন্টু অলক্ষ্যে পিছু পিছু আসে। আর সন্ধ্যার আঁধারে ভিজা কাপড়ের ভিতর দিয়া রেশমীর যে রূপের আলোটুকু বাহির হইয়া আসে, তাই যেন সে দু'চোখ দিয়া পান করিতে থাকে।

বাড়ী ফিরিয়া রেশমী আবার মায়ের গালি-মন্দ খায়। গভীর রাত্রে ছোট জানালার বাহিরে অন্ধকারের ভিতর দিয়া খোলা মাঠের দিকে চোখ মেলিয়া থাকে। কি যেন দেখিতে চায়, কিন্তু পায় না। বুকের ভিতরটা হা হা করিতে থাকে! তারপর চোখ মুছিয়া, বুকে হাত রাখিয়া সে এক সময় ঘুমাইয়া পড়ে।

(২)

চিঠি আসিয়াছে, রেশমীর স্বামী ৭ দিন পরে আসিবে। লুকাইয়া চিঠিখানা সে একশবার পড়িয়াছে। তবু যেন পড়া শেষ হয় না; যেন অফুরন্ত কত মধু, কত রস তাতে রহিয়াছে।

সে দিন গুণিতে আরম্ভ করিয়াছে। পাছে ভুলিয়া যায়, তাই খড়ি দিয়া দিনের শেষে একটি করিয়া দাগ অতি গোপনে কাটিয়া রাখে।

আজ ৭ দিন পূর্ণ হইয়াছে। রাত ৭টার গাড়ীতে স্বামী আসিবে। সকাল হইতেই রেশমীর বড় কাজ পড়িয়া গেল। নিজের হাতে কখনও ঘর ঝাঁট দেয় না, নিকায় না, গরুকে খড় দেয় না—কিছু করে না। আনে শুধু বিকালবেলা এক কলসী ছোট নদীর মিষ্টি জল। তাও আবার আনিতে রাত হইয়া যায়।

আজ সকালে উঠিয়া সে নিজের হাতে ঘর ঝাঁট দিল, উঠান মুছিল, গরুর খোঁজ-খবর নিল। পিতাকে তামাক কাটিয়া 'খৈনি' প্রস্তুত করিয়া দিল। এবং শেষে রান্নাঘরে গিয়া উনান জ্বালিয়া বসিল।

মা গোবর হাতে ঘুঁটে দিতেছিল। বেড়ার ফাঁকে হঠাৎ আলো আর ধোঁয়া দেখিয়া রান্নাঘরে উঁকি মারিয়া অবাক হইয়া গেল। তারা জানে না, আজ কে আসিবে। রেশমী নিজে গ্রামের ছোট পোষ্টআফিসে গিয়া চিঠি লইয়া আসিয়াছে। রেশমী একটু আধটু লিখিতে জানে। চিঠির কথা তো কাহাকে কিছু বলে নাই—মাকেও নয়। বিন্টুর চোখে কিন্তু সে ধূলা দিতে পারে নাই। সে রেশমীর কাণ্ড দেখিয়াছে। রেশমীর হাতে চিঠি দেখিয়া তাহার বুক শুকাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এতদিনেও যখন কেউ আসিল না, কিছু ঘটিল না, তখন সে একথাটা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। নিজের জানালার ফাঁক দিয়া সে রোজ সকালে চোখ মেলিয়া থাকে। রেশমীর চলা-বলার ভঙ্গী দেখিয়া তাহার বুকের ভেতরটা যেন কেমন করিতে থাকে। ইচ্ছা হয় এখনি কাছে যায়। কিন্তু সাহস হয় নাই। মনকে বলে, "যাক্ না ক'দিন! যাবে কোথায়। আস্‌তে বয়ে গেছে ঝিমনের। সে বিদেশে চাকরী কচ্ছে না ছাই কচ্ছে।

বিন্টু কার কাছে যেন শুনিয়াছিল, ঝিমন দেশ ছাড়িয়া যাওয়ার সময় রামটহলের মেয়ে বিনিকে ফুস্‌লাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাই তার মনে মনে বেশ একটা জোর ছিল।

কিন্তু, আজ সকালে রেশমীর ব্যাপার দেখিয়া বিন্টুর মুখ শুকাইল, বুক শুকাইল, চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল। তবু সে চুপ করিয়াই রহিল।

এখন রেশমীর মার বিস্মিত মুখের দিকে চাহিয়া একটু সাহস করিয়া আসিয়া কহিল, "জান না মাসী, আজকে আসবে? আজ যে——" বলিয়া সহসা সে 'হা হা' করিয়া হাসিয়া উঠিল। কিন্তু, সে হাসি যেমন রুক্ষ তেমনি ব্যথায় ভরা।

মাসী আরও অবাক হইয়া, গোবর হাতে বিন্টুকে প্রায় ধরিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বল্‌না বাছা, কে আস্‌বে?

"তোমার জামাই গো—রেশমীর বর।" বলিয়া বিন্টু আবার তেমনি শুক্‌নো হাসি হাসিতে লাগিল।

রান্নাঘরের ভিতর বসিয়া রেশমী সব শুনিল; কিন্তু কিছু বলিল না। শুধু একটা কাঠ রাগ করিয়া উনানের মধ্যে জোর করিয়া ঠেলিয়া দিয়া ধপ্‌ করিয়া ভাতের হাঁড়িটা উনানে চড়াইয়া দিল। ভাগ্যি ভাল হাঁড়িটা ভাঙ্গিল না।

খবর শুনিয়া রেশমীর মা শুধু "হুঁ" বলিয়া আবার ঘুঁটে দিতে সুরু করিল। খুসি হইল, কি রাগ করিল, বোঝা গেল না। বিন্টু মাসীর এই উদাসীনতায় একটু আশ্চর্য্য হইল। মাসী আর কথা কয় না দেখিয়া তাহার মনে বড়

রাগ হইল। কতকটা যেন সে নিজের মনেই বলিতে লাগিল, "বর আসবে না ছাই আস্‌বে।"

মাসী মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

তখন সে একগাল হাসিয়া কহিল, "শোন নি বুঝি মাসী ?"

তাহার এই হাসি দেখিয়া মাসী শুধু হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কি বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। মাসীর মুখ দেখিয়া বিণ্টু মনে মনে খুসী হইল! এবং ফলাও করিয়া বলিতে লাগিল, "মাসী তুমি এত খবর রাখ; শুধু এ-টাই জান না। বলি রামটহলের মেয়ে বিবি কোথায়? কে-না জানে করিয়া তাকে—" হঠাৎ তাহার চোখ রান্না ঘরের দ্বারের উপর পড়িতেই—বিণ্টুর মুখ যেন চড় খাইয়া বন্ধ হইয়া গেল।

রেশমীর অগ্নিদৃষ্টির সুমুখে সে আর মাথা তুলিতে পারিল না। একদৌড়ে পাশের বাঁশ ঝাড়টা ঘুরিয়া নিজের ঘরের মধ্যে গিয়া লুকাইল।

রেশমীর মা সে কথা জানিত। লজ্জায়, অপমানে সে মুখ নীচু করিয়া মনের ভুলে, এই এতটুকুর বদলে, এই এত বড় বড় ঘুঁটে দিতে লাগিল।

রেশমী রাগে, ক্ষোভে কাঁদিয়া ফেলিল, "কখ্‌খন না, কখ্‌খন না। সব মিছে কথা। তুমি ওকথা শুনোনা।" বলিয়া পুনঃ উনানের সামনে গিয়া বসিল; কিন্তু চোখ দিয়া তাহার তেমনি জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

আজ বিকালে নদীতে আসিয়া রেশমী গায়ে সাবান দিল, হাত-পা ভাল করিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিল। তারপর বেশ করিয়া গা ধুইয়া কলসী কাঁকে সকাল সকাল বাড়ী ফিরিয়া আসিল। পশ্চিমের সোনার আকাশ আজ আর তাহাকে স্পর্শ করিল না। নিজের ভিতরে আজ তাহার অনেক সোনা গলিয়া, বহিয়া যাইতেছে। বাহিরের সোনা, বাহিরেই পড়িয়া রহিল।

বাড়ী ফিরিয়া, সে যুঁই ফুলের তেল মাখিল এবং ছোট আরসি সাম্‌নে রাখিয়া চুল বাঁধিল। শেষে আয়নায় নিজের মুখের দিকে চাহিয়া একটু মুখ টিপিয়া হাসিল।

সন্ধ্যার পর নিজে রাঁধিতে বসিল; কিন্তু বড় ভয় পাছে হাত খারাপ হইয়া যায়, মুখ কালি হইয়া ওঠে এবং চুল শুকাইয়া আসে।

রাত ৭টা বাজিয়া গিয়াছে। এইবার স্বামী আসিবে। রেশমী বাহিরের দিকে কান পাতিয়া রান্নাঘরে বসিয়া নিজেকে কোন মতে স্থির রাখিয়াছে। অদূরে কুকুর 'ঘেউ ঘেউ' করিয়া উঠিল। বাঁশ কাঁঠাল পাতার মড় মড় শব্দ—এই বার নিশ্চয় সে আসিয়াছে। রেশমী তাড়াতাড়ি দুয়ারে আসিশা অন্ধকারে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল—কৈ কেউ না। ফস্ করিয়া কে একজন যেন চলিয়া গেল। রেশমীর মনে হইল বিণ্টু। ঠিক বলিতে পারিল না; বাইরে বড় অন্ধকার।

রেশমী নিশ্বাস ফেলিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া রাঁধিতে লাগিল। আঁচলে ঘন ঘন চোখ মুছে। আবার জল আসে আবার মোছে।

রাত ৮টা, ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। রেশমীর আর রাঁধিতে ভাল লাগিল না।

সকাল হইতেই রেশমীর মার মন ভাল ছিল না। বিণ্টুর কথা শুনিয়া আরও তাহা বিগড়াইয়া গেল। অবশ্য বিণ্টু প্রায়ই সত্য কথা বলে না। অথচ অনেক সময় তা মিথ্যাও হয় না। তারপর রেশমীর মা ত মনে মনে সব বোঝে। নিজেও ত রেশমীর বাপের সঙ্গে স্বামী ছাড়িয়া নাথ নগর হইতে পলাইয়া আসিয়া এখানে বাস করিতেছে। লোকে জানে, স্বামী-স্ত্রী। কিন্তু, নিজের কাছে ত নিজের লজ্জার সীমা থাকে না। শেষে জামাইএর এই কাণ্ডে প্রথম যৌবনের সেই তাহার লজ্জার কথা মনে পড়িয়া একেবারে মরমে মরিয়া গিয়া চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। আজ তাহার বয়স হইয়াছে। তাই, তাহার অশান্ত যৌবনের সেই রস, আনন্দ এখন শুধু লজ্জায় পরিণত হইয়াছে।

রেশমীর মা আর থাকিতে পারিল না। সমস্ত রাগটা পড়িল গিয়া রেশমীর উপর। দুম্ দুম্ করিয়া রান্না ঘরে ঢুকিয়া রেশমীর পিঠের উপর সজোরে এক কিল বসাইয়া দিল। বাঁধা চুল টান মারিয়া খুলিয়া দিয়া, তাহাকে রান্না ঘর হইতে ধাক্কা মারিয়া বাহির করিয়া দিল।

রেশমী তাহার ছোট্ট ঘরের মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্তে

কাহারও খাওয়া হইল না। বাপ শুধু 'খৈনি' আর তাড়ি খাইয়াই বেহুঁস হইয়া রহিল।

(৩)

কিছুদিন কাটিয়া গিয়াছে। রেশমী আর নদীতে যায় না। কাহারও সঙ্গে মিশে না, কথা কয় না। বিণ্টু তেম্‌নি তাহার জানালা দিয়া চোখ মেলিয়া থাকে। আগের মত আর সব সময় রেশমীর দেখা মিলে না। তাহার বড় দুঃখ হয়। সে-ই ত সব প্রকাশ করিয়া দিয়া, রেশমীকে দুঃখী করিয়াছে। একথা মনে করিয়া তাহার চক্ষে জলে আসিয়া পড়ে।

এক একবার বিণ্টুর ইচ্ছা হয়, রেশমীর কাছে মাপ চাহিয়া আসে; কিন্তু সাহসে কুলায় না। তাই, ঘরের ভিতর বসিয়াই শুধু নিশ্বাস ফেলে আর চোখ মোছে।

সেদিন দুপুর বেলা বাপ মাঠে গিয়াছে। মা মুড়ি বিক্রী করিতে গাঁয়ে বাহির হইয়াছে। রেশমী একা। মাঝে মাঝে বিণ্টুর কথা মনে পড়ে। বড় 'দুষ্টু' ছোঁড়া সে। তবুও দেখিতে বেশ। কথাও মন্দ কয় না। কিন্তু তাহার যে স্বামী রহিয়াছে। তাই, বিণ্টুর কথা মনে হইলেই লজ্জায় মরিয়া যায়। মনে মনে 'ছি ছি' করিতে থাকে। তবুও বিণ্টুর মুখখানি মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি মারে। আজ দুপুর বেলা তাহার আর কিছুই ভাল লাগিল না। আস্তে আস্তে বাহির হইয়া একটু দূরে একটা কাঁঠালের ছায়াতলে বসিয়া চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

বিণ্টু সব দেখিয়াছে। কিন্তু যেন কিছুই জানে না, এম্‌নি ভাবে ও দিকের মাঠ ঘুরিয়া সহসা কাঁঠালতলায় আসিয়া যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ইতিমধ্যে বিণ্টুর কিছু সাহস বাড়িয়াছিল।

তেমনি বিস্ময়ের ভান করিয়া কহিল, "আরে, রেশমী যে? দুপুর বেলা কাঁঠাল তলায় বসে কি কচ্ছিস? যা যা, বাড়ী যা, রোদে মাথা ধরবে।"

রেশমী আজ আর বিণ্টুকে দেখিয়া রাগ করিল না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "রোদ কোথায়? ছায়ায় ত বসে আছি। তুমিই ত রোদে ঘুরে এলে। একটু জিরিয়ে বাড়ী যাও।"

বিণ্টু যেন হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল। আনন্দের আবেগে কিছুক্ষণ কথাই বলিতে পারিল না। ছেলে বেলায় রেশমী এমনি কথা বলিত বটে; কিন্তু আজ সে অনেক দিনের কথা। সে তা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। এই কাঁঠাল তলায়ই তাহার খেলিত, মারা-মারি করিত। পরদিন আসিয়া আবার ভাব করিত। তারপর এক দিন রেশমীর বিবাহ হইয়া গেল। বিণ্টুও পাট-কলে চাকরি করিতে গেল। পাঁচ বছর পরে ফিরিয়া দেখিল, রেশমী আর সেই ছোট রেশমী নাই। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া রূপ ঝরিয়া পড়িতেছে। আর রেশমী দেখিল, বিণ্টু টেরি কাটে, শিস্ দেয়, আর রাত্রে তাড়ি খাইয়া ফিরিয়া আসিয়া গান সুরু করে।

বিণ্টুর টেরি কাটা, শিস্ দেওয়া রেশমীর ভাল লাগিত, কিন্তু তাড়ি-টাড়ি সে পছন্দ করিত না। তা ছাড়া, তাহার যে স্বামী রহিয়াছে। কাজেই সে ভাল করিয়া বিণ্টুর সঙ্গে কথা বলিত না। বরঞ্চ বিণ্টুর যা-তা পরিহাসে তাহার রাগই হইত।

আজ বিণ্টুর ছেলে বেলাকার কথা মনে পড়িয়া গেল। রেশমীও বোধ হয় তেমনই কিছু ভাবিতেছিল।

বিণ্টুর গলা ধরিয়া আসিল। কহিল, "তোর কাছে একটু বসব রেশমী? রাগ করবিনে ত?"

রেশমী শুধু একটু সরিয়া বসিল; উত্তর দিল না।

বিণ্টু আসিয়া পাশে বসিল।—তারপর আস্তে আস্তে রেশমীর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া রেশমীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

রেশমী কিছু আপত্তি করিল না, কথা বলিল না।

কিছুক্ষণ পরে বিণ্টু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "রেশমী তুই কি আমায় ভুলে গেছিস্?"

রেশমী নিরুত্তরে মুখ নত করিয়া রহিল।—ক্ষণকাল পরে বিণ্টু আবার ডাকিল, "রেশমী?"

রেশমী ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, "কেন?"

"তুই কি আমায় ভুলে গেছিস্?"

"না।"

"তা হলে তুই আমার সঙ্গে কথা বলিস্‌নে কেন, দেখা করিস্ নে কেন?"

"আমার যে স্বামী আছে।"

"ওঃ।" বলিয়া বিণ্টু চুপ করিল।

রেশমী এক মুহূর্ত্ত বিণ্টুর শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়াই

মুখ নীচু করিল। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে কহিল, "তুমি তাড়ি খাও কেন ?"

"না খেয়ে কি করব ? আমার ত কেউ নেই।"

"কেউ না থাকলে বুঝি তাড়ি খেতে হয় ?"

বিন্টু শুধু নিশ্বাস ফেলিল। সে কেমন করিয়া বুঝাইবে, কেন সে তাড়ি খায়। যাহার আছে, সে বুঝিতেও পারে না, বুঝিবার দরকারও হয় না। তাই, বিন্টু চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ মাঠের তপ্ত হাওয়ার সোঁ সোঁ শব্দ ছাড়া উপরের পৃথিবীশুদ্ধ পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ।

রেশমীর একটা কথা মুখে আসিয়া আসিয়া ফিরিয়া যায় বলিতে পারে না। অতি কষ্টে রেশমী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তাড়ি ছাড়তে পার ?"

বিন্টু আগ্রহে প্রশ্ন করিল, "কেন বল্‌ত ?"

"আমার ইচ্ছে। কেন, মনে নেই, ছেলে বেলায় আমার ইচ্ছেয় তুমি অনেক কাজ করতে ?"

বিন্টুর মনে পড়িল। কহিল, "পারি। নিশ্চয় পারি।"

"ঠিক ?"

"ঠিক।"

"আমাকে আর যা-তা পরিহাস করবে না ?"

"না।"

তারপর দুজনেই চুপ চাপ। রেশমী যেন কি ভাবিতে ছিল। সহসা তাহার চোখের কোণ বহিয়া এক ফোঁটা জল নীচে পড়িয়া গেল।

বিন্টু তাড়াতাড়ি নিজের হাতে রেশমীর চোখ মুছিয়া দিয়া বুকের কাছে টানিয়া আনিল। রেশমী কিছু বলিল না। বিন্টু আস্তে আস্তে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিল। রেশমী তেমনি নীরবে তাহার বুকে মুখ লুকাইল। তারপর চারিদিকে চাহিয়া সহসা মুখ নীচু করিয়া একটা চুমা খাইল। রেশমী বাধা দিল না, কথা কহিল না ; শুধু চোখ দিয়া তাহার অনেক অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কিছুকাল পরে বিন্টু বলিল, "চল্ রেশমী, আমরা গাঁ ছেড়ে যাই।"

রেশমী মুখ তুলিয়া চক্ষু মুছিল। তারপর কহিল, "না বলে-কয়ে কি করে যাবে ?"

"কেন পালিয়ে ?"

"ছিঃ।"

"পারবে না তুমি ?" বলিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয় এক করিয়া বিন্টু রেশমীর মুখের উপর ব্যাকুলদৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

রেশমী ভাবিতে লাগিল।

বিন্টু আবার জিজ্ঞাসা করিল, "যাবে না রেশমী ?"

রেশমী তেম্‌নিই চুপ করিয়া রহিল। তারপর অতি অস্ফুটে জিজ্ঞাসা করিল, "কখন যাবে ?"

বিন্টু আবার তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া চুমা খাইয়া কহিল, "কাল রাত্রে।"

রেশমী চক্ষু বুজিয়া কহিল, "আচ্ছা।"

"সত্য ?"

প্রত্যুত্তরে রেশমী শুধু একটা চুমা ফিরাইয়া দিল।

(৪)

পরদিন ভোরবেলা উঠিয়া বিন্টু ভিন্ন গাঁয়ে গিয়া নিজের ঘরের সমস্ত বিক্রী করিয়া ২০৲ টাকা সংগ্রহ করিল। একটা ছোট টিনের বাক্সে খান দুই কাপড়, একটা জামা, আর খান দুই ছবি বাক্সে বন্ধ করিয়া সন্ধ্যার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। আজ আর জানালায় বসিয়া সে চোখ পাতিয়া রহিল না। রেশমী সন্ধ্যার পর আসিবে, তাহা নিশ্চয়।

বেলা যতই পড়িয়া আসিতে লাগিল, ততই বিন্টু ঘরের ভিতর ছটফট করিতে লাগিল। সন্ধ্যার আর বড় বাকী নাই। বিন্টু একবার বসে, একবার ওঠে, একবার বাইরের সন্ধ্যাকাশের দিকে চাহিয়া দেখে। তারপর নিজের ছোট বাক্সটি কোলে করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

বিন্টু বাক্স কোলে করিয়া মাঠের দিকের জানালার বাহিরে আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। সহসা একটু ক্ষীণ পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, রেশমী বড় সন্তর্পণে, এদিক-ওদিক চাহিয়া ঘরে ঢুকিতেছে।

বিন্টু তাড়াতাড়ি বাক্স ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়া আবেগে রেশমীকে ধরিতে গেল। রেশমী একটু সরিয়া দাঁড়াইল। বিন্টুর ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইল, ভয় পাইল, স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

রেশমী ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া গড় হইয়া বিন্টুর

পায়ের কাছে নমস্কার করিল। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে কহিল, "আজ যাচ্ছি।"

"সে কথা তো জানি গো।" বলিয়া আনন্দের আবেগে বিণ্টু রেশমীকে বুকের মধ্যে লইতে যাইতেছিল।

রেশমী আবার সরিয়া দাঁড়াইল। বিণ্টু আবার আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ যাবে না ?"

"হাঁ, যাব বৈকি।"

"কখন ? সন্ধ্যার পর ত ?"

রেশমী বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অস্ফুটে কহিল, "হ্যাঁ, সন্ধ্যার পরেই ; কিন্তু—" বলিয়া থামিয়া গেল।

"কিন্তু কি ?" বলিয়া বিণ্টু বিস্ময়ের ব্যথায় অস্থির হইয়া উঠিল।

রেশমী আরও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "কিন্তু তোমার সঙ্গে নয়। আমার স্বামীর সঙ্গে। সে এসেছে।" বলিয়া তাড়াতাড়ি আর একবার বিণ্টুর পায়ের সুমুখে ভূমিতলে মাথা ঠেকাইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

অগ্নিধারা

শ্রীহাসিরাশি দেবী

একাঙ্ক নাটিকা

রাঘব	গুরু
রঞ্জিৎ	প্রিয় শিষ্য
অগ্নি	রাঘবের পালিতা কন্যা

আশ্রমবাসিনিগণ, শিষ্যগণ, রাজা—প্রতিহারী ইত্যাদি

পুষ্পোদ্যান

প্রভাতের আলোক স্পষ্ট হইয়াছে ;—বহুদূরে—আশ্রমে সকলে জাগিয়াছে। পুষ্প আহরণোদ্যতা অগ্নি।

রঞ্জিতের প্রবেশ।

রঞ্জিৎ—অগ্নি !

অগ্নি (চমকিয়া)—কে ? রঞ্জিৎ ?

রঞ্জিৎ—হ্যাঁ—

অগ্নি—এমন সময়ে তুমি এখানে কেন ? জান আশ্রম বালিকারা যখন বাগানে আসবে তখন এখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ ? গুরুর আদেশ !

রঞ্জিৎ—জানি।

অগ্নি—তবে ?

(রঞ্জিৎ নীরব)

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? উত্তর দাও।

রঞ্জিৎ—কি উত্তর দেব ?

অগ্নি—যা তোমার ইচ্ছা।

রঞ্জিৎ—ইচ্ছার উপরে কি সমস্তই নির্ভর করে অগ্নি ?

অগ্নি—আজকে তোমার কথাগুলো শুনতে যেন কি রকম বোধ হচ্ছে। স্পষ্ট করে বল রঞ্জিৎ।

রঞ্জিৎ—স্পষ্ট ক'রেই তো ব'লছি অগ্নি, ইচ্ছার পরেই কি সমস্ত নির্ভর করে ? তাহ'লে—

অগ্নি—তাহ'লে কি ? চুপ করলে কেন ? বল—বল—

রঞ্জিৎ—ব'লছি তুমি ফুল তুলতে এসেছ ?

অগ্নি—হ্যাঁ।

রঞ্জিৎ—আর সব আশ্রম বালিকারা কোথায় ?

অগ্নি—তার প্রত্যেকেই যে এক একটা কাজে ব্যস্ত আছে সে কথা কি ভুলে গেছ ? এক একদিন এক এক জনের ওপর ফুল তুলবার ভার পড়ে এ নিয়মও কি তোমার মনে নেই ?

রঞ্জিৎ—আছে।

অগ্নি—তবে ?

রঞ্জিৎ—কিছু নয়। (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া) না, আমায় কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না অগ্নি, কোর' না কোর'

না—; আর করলেও সে উত্তর আমি দেব না। ইচ্ছা করেই উত্তর দেব না।

অগ্নি—তবে এখন এ ফুল বাগানে এসেছিলে কেন?

রঞ্জিৎ—ব'লেছি তো, উত্তর দিতে পারব' না, দেব না।

অগ্নি—তবে গুরুকে এসংবাদ জানাব কিন্তু তা'হলে কি কঠিন শাস্তি পাবে তা কি একটিবার ভেবে দেখেছ রঞ্জিৎ?

রঞ্জিৎ—ভেবেছি,—নির্ব্বাসন। ভাল সেও আমার পক্ষে ভাল। যদি তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলতে পাই, এই নির্জ্জনে এই লতাকুঞ্জে—

অগ্নি—একি? তোমার কথাগুলো আজ এমন শুনতে লাগছে কেন? তোমার মুখই বা আজ অমন কেন?—কেন—কেন? রঞ্জিৎ।

রঞ্জিৎ—ডাক, আজ আবার আমায় ডাক অগ্নি, ডাক। মরুভূমিতে একটু ছায়া, একটু জল যে কতখানি ক্লান্তি দূর করে পথ চলবার উৎসাহ শক্তি বাড়িয়ে তোলে তা তুমিও জান না অগ্নি। কিন্তু আমি জানি। ডাক, তুমি আমায় ডাক অগ্নি, আমি চুপ করে শুধু তোমার ডাক শুনি।

অগ্নি—পথ ছাড় রঞ্জিৎ, আমি আশ্রমে যাব; গুরু ফুলের খোঁজে লোক পাঠাবেন, সরো পথ ছাড়।

রঞ্জিৎ—কোথা যাবে অগ্নি?

অগ্নি—আশ্রমে।

রঞ্জিৎ—না।

অগ্নি—তুমি আমায় বাধা দেবার কে?

রঞ্জিৎ—কেউ নই।

অগ্নি—তবে?

রঞ্জিৎ—(অগ্নির সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া) প্রার্থনা, অনুরোধ, দাবী।

অগ্নি—রঞ্জিৎ! রঞ্জিৎ!! তুমি কি পাগল হয়েছো? ওঠ, পথ ছাড়, আমি যাই।

রঞ্জিৎ—না, না যেও না, যেও না; ভগবান যদি এমন সময় মিলিয়ে দিয়েছেন তবে একটা কথা, শুধু একটা কথা শুনে যাও।

অগ্নি—উঃ! রঞ্জিৎ তোমার চোখে ওকি দৃষ্টি? বুকেও কোন কথা লেখা দেখতে পাচ্ছি? আমার মুখের দিকে অমন করে চেয়ে আছ কেন? উঃ, চোখ যে ঝলসে গেল।

রঞ্জিৎ—অগ্নি! অগ্নি!! আমি তোমায় ভালবাসি।

অগ্নি (চমকিয়া) রঞ্জিৎ—

রঞ্জিত—কোনও কথা নয়; আমি তোমায় ভালবাসি, তোমার রূপকে ভালবাসি। অগ্নি! তোমার ঐ ভুবন ভুলান রূপকে ভালবাসি।

অগ্নি—রঞ্জিৎ! মনে কর গুরুর দণ্ডাদেশ।

রঞ্জিৎ—করেছি। নির্ব্বাসন তারপরে মৃত্যুদণ্ড।

অগ্নি—নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করবে?

রঞ্জিৎ—তা হোক; মরণকে বরণ করেও তাকে জয় করা যায়।

(নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি)

অগ্নি—(সভয়ে) ঐ বুঝি সকলে আসছে। রঞ্জিৎ পালাও, পালাও।

রঞ্জিৎ—কিন্তু, পালাবার ফল?

অগ্নি—পালাতে চাও না? তবে সর, আমায় পালাতে দাও।

রঞ্জিৎ—ভয় করছে?

অগ্নি—হ্যাঁ।

রঞ্জিৎ—তবে যাও।

অগ্নি—কিন্তু—তুমি?

রঞ্জিৎ—আমার যাওয়ার দরকার নেই। তুমি যাও।

অগ্নি—তুমি যাবে না? তবে আমি একাই যাই। গুরুর দণ্ডাদেশ মনে পড়ে। উঃ! কি ভয়ঙ্কর। পালাই পালাই।

(দ্রুতপদে প্রস্থান ও অন্য দুয়ার দিয়া অন্যান্য আশ্রম বালিকাগণের প্রবেশ।)

১ম বালিকা—গুরুর পূজার সময় হয়ে এল, কই? যে পূজার ফুল তুলতে এসেছিল? (চারিদিকে অন্বেষণ) না—বোধ হয় চ'লে গেছে (সহসা রঞ্জিতের উপর দৃষ্টি পড়িতে) একি এখানে কে ব'সে? রঞ্জিৎ?

রঞ্জিৎ—হ্যাঁ, আমি রঞ্জিৎ।

২য়া বালিকা—এখানে এমন সময়ে কেন? জান এসময়ে আশ্রম বালিকারা ফুল তুলতে আসে?

রঞ্জিৎ—জানি।

৩য়া বালিকা—গুরুর দণ্ডাদেশ?

রঞ্জিৎ—জানি।

১মা বালিকা—তবে।

রঞ্জিৎ—প্রশ্ন কোর না ভগিনীরা, যাও আশ্রমে ফিরে যাও।

৩য়া বালিকা—কিন্তু।

রঞ্জিৎ (হাসিয়া)—শাস্তির কথা আমার বেশ মনে আছে, দণ্ড নেবার জন্যে আমি প্রস্তুত হ'য়ে আছি, একথা গুরুকে জানাও গে।

১মা বালিকা—তবে তাই চল সকলে। ভাই! আজ প্রভাতের নমস্কার গ্রহণ কর।

(প্রস্থান)

রঞ্জিৎ—আমি উঠি, যাই। শাস্তি নেবার আগে সকলের সঙ্গে একবার দেখা করিগে। না, আমার মন এতটুকু খারাপ হয়নি, হয়নি, নীরব পূজা আজ আমার ব্যক্ত, আজ সার্থক।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাঘবের কক্ষ

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। রঞ্জিতের প্রবেশ।

রঞ্জিৎ (প্রণাম করিয়া)—দাসকে স্মরণ করেছেন প্রভু?

গুরু—হ্যাঁ বৎস। উপবেশন কর।

(রঞ্জিৎ বসিল; কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব)

গুরু—বৎস রঞ্জিৎ!

রঞ্জিৎ—প্রভু।

গুরু—আমি তোমায় শিশুকাল হ'তে পালন করেছি; পুত্রের অধিক স্নেহ করেছি, ভালবেসেছি; কিন্তু আজ তোমার নামে একি কথা শুনছি বৎস? একি সত্য? সত্যই কি তুমি—

রঞ্জিৎ—প্রভু—

গুরু—কি বলছিলে রঞ্জিৎ? নীরব হ'লে কেন? বল, বল, একি সত্য?

রঞ্জিৎ—সত্য।

গুরু (কতক্ষণ নীরব থাকিয়া) আমি কিন্তু একথা সত্য ব'লে বিশ্বাস করতে পারিনি।

রঞ্জিৎ (জানু পাতিয়া) দেবতা! শাস্তি চাই।

গুরু (স্বগত) শাস্তি দেবার কে আমি? আমিই কি কোনও দিন কোনও পাপ করিনি? (প্রকাশ্যে) শাস্তি? শাস্তি?

রঞ্জিৎ—হাঁ, প্রভু শাস্তি। আপনার আদেশ অবমাননা-কারীর শাস্তি।

গুরু (কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া আসিয়া হাত ধরিলেন) বৎস রঞ্জিৎ!

রঞ্জিৎ—আদেশ করুন গুরু।

গুরু—তোমায় ক্ষমা করেছি বৎস, ওঠ।

রঞ্জিৎ (চমকিয়া) ক্ষমা?

গুরু—হ্যাঁ, ক্ষমা।

রঞ্জিৎ—কিন্তু ক্ষমা তো আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করিনি, গুরু।

গুরু—ক্ষমা তো কারও মতামতের অপেক্ষা রাখে না। ওঠ, মন্দিরে চল, আজ মন্দিরে আমার একজন সম্মানীয় অতিথি আসবেন। তোমরা তাঁর অভিভাষণ পাঠ করবে, আর আশ্রম বালিকারা তাঁর বরণের মঙ্গলগীতি গান করবে। চল দেবারতির সময় হয়ে এসেছে, এখনি তিনি আসবেন।

রঞ্জিৎ—আশ্রমে বালিকারা বরণের মঙ্গলগীতি গান করবে। অগ্নিও সেখানে উপস্থিত থাকবে।

গুরু—হাঁ চল, চল, আর বিলম্ব নয়।

রঞ্জিৎ—তবে চলুন।

(প্রস্থান)

দেব মন্দির। রাজা আসীন, পার্শ্বে গুরু রাঘব। চতুর্দ্দিকের উজ্জ্বল আলোকে রাজার বহুমূল্য মুকুট ঝক ঝক করিতেছে। চতুর্দ্দিকের চামর দুলিতেছে ও মন্দিরের চতুষ্পার্শের মৃদু মৃদু ধ্বনী শুনা যাইতেছে।

(শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা অভিভাষণ পাঠ শেষ হইবার পরে বরণডালা হস্তে প্রথমে রক্ত বস্ত্র পরিহিত অগ্নি ও তৎপশ্চাৎ আশ্রমবালাগণের প্রবেশ)

গান

এস হে এস, এস হে এস এসহে সুন্দর—
এস হে নব কল্যাণ! ওগো এসহে মনোহর।
মোরা এনেছি বরণ ডালা,
এনেছি কুসুম মালা,

এনেছি দেব আশীষ বহিয়া যতনে হে ধর ধর।
আজিকে এ শুভ লগনে
কার আঁখি জাগে গগনে,
আশীষের মালা ঝরিয়া পড়িছে যতনে হে পর পর।
এসহে এস! এসহে এস! এস হে সুন্দর।

(বালিকাগণের রাজার চতুস্পার্শে ঘুরিয়া বরণ ডালা নামাইয়া প্রণাম)

রাজা—(স্বগতঃ) রক্তবস্ত্র পরিহিতা ওকে? উঃ কি রূপ, চোখ যেন ঝলসে যেতে চায়!—অথচ তাকিয়েও আশা যেন মিটতে চায় না। কে, এ বালিকা কে?

রঞ্জিৎ—(স্বগত) রাজার চোখে ও কি ভীষণ দৃষ্টি! অগ্নির দিকে ও কী ভীষণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

গুরু—বৎস রঞ্জিৎ, এবার তুমি তোমার আশ্রম ভ্রাতাদের বিশ্রামের জন্য নিয়ে যেতে পার।

রঞ্জিৎ—(স্বগতঃ) ভেবেছিলাম দেবীকে পূজা নিবেদন করেই বুঝি ভক্তের সব আশার সব আকাঙ্ক্ষার সমাধা হয়ে যায়। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, তা হয় না। মনের মধ্যে কে যেন ধীরে ধীরে হিংসার আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে! রাজার চোখে ও কী দৃষ্টি? ও কিসের শিখা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি? অগ্নি! অগ্নি!!—

গুরু—রঞ্জিৎ, রঞ্জিৎ।

রঞ্জিৎ—গুরু!

গুরু—তোমার আশ্রম ভ্রাতাদের সঙ্গে বিশ্রাম করতে যাও।

রঞ্জিৎ—যাই।

(গুরুর পদবন্দনা করিয়া শিষ্যগণের প্রস্থান)

রাজা—(অগ্নির হাত ধরিয়া) বালিকা।

গুরু—(ব্যস্তভাবে) রাজা! ও আশ্রমবাসিনী।

রাজা—তাহোক। একে আমার চাই, গুরু। এর রূপ আমায় পাগল করেছে, আমায় উন্মত্ত করেছে।

গুরু—(চীৎকার করিয়া) অগ্নি! অগ্নি!!

রাজা—বল গুরু কিসের বিনিময়ে একে আমি পাব? বল, বল—এর রূপ আমায় পাগল করেছে।

গুরু—তোমার ঐ অমূল্য মুকুট চাই।

রাজা—যা চাও তাই পাবে। (মুকুট খুলিয়া দিতে উদ্যত ও অগ্নির বাধাপ্রদান)

অগ্নি—রাজা কি করছো?

রাজা - তোমায় আমার চাই—। তার বিনিময়ে সব দিতে পারি।

অগ্নি—প্রাণ?

রাজা—প্রাণও।

অগ্নি—গুরু! গুরু! আদেশ দাও—আদেশ দাও।

গুরু—রাজা! আজ তুমি শ্রান্ত, চল, পৌঁছে দিয়ে আসি।

রাজা—পৌঁছে দিয়ে আসবে গুরু? কিন্তু অগ্নি... অগ্নিকে যে আমার চাই-ই।

গুরু—চাই-ই?

অগ্নি—চাই।

রাজা—চাই-ই—আমার চাই-ই।

গুরু—চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

রাজা—অগ্নি?

গুরু—ফাল্গুন পূর্ণিমার দিনে তাকে পাবে।

অগ্নি—(আর্ত্তস্বরে) পিতা! গুরু! পিতা।

গুরু—(স্বগত) একী? মন কেঁপে উঠে কেন? (প্রকাশ্যে দৃঢ়স্বরে) না কোনও কথা শুনতে চাইনে, ফাল্গুন পূর্ণিমা আগত প্রায়, ঐ দিনে তুমি রাণী হবে। যাও, বিশ্রাম করতে যাও। রাজা! চল—।

(রাজাকে লইয়া গুরুর প্রস্থান ও অন্য দুয়ার দিয়া আশ্রমবালিকাগণ সহ ধীরে ধীরে অগ্নির প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

গভীর রাত্রি। গুরু রাঘবের বিশ্রাম কক্ষ।
ধীরে ধীরে অগ্নির প্রবেশ।

অগ্নি—পিতা! কন্যাকে স্মরণ করেছেন?

গুরু—(স্বগত) মন এত চঞ্চল হও কেন? পিতা! পিতা! এ ডাক তো আর কখনও শুনিনি। না, ও ডাক শুনতে চাইনে—আর ও ডাক শুনতে চাইনে।

(প্রকাশ্যে)

বৎসে!—উপবেশন কর।

অগ্নি (উপবেশন করিয়া)

পিতা!—কন্যাকে স্মরণ করেছেন?

গুরু (স্বগত) মন! স্থির হও। (প্রকাশ্যে) হাঁ বৎসে। (স্বগত) পিতা! এ ডাকে মন দোলে কেন?

আমি গুরু, এই আশ্রমের মালিক, এই আশ্রমবাসিদের হর্ত্তা কর্ত্তা—জীবনে কোনও পাপ করিনি। পাপ করিনি? কে বল্‌লে? যে দিন সেই বিধবা পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ব'লেছিল ও আমার—আমার কন্যা...উঃ, না, না। ও দেবতার কন্যা, রূপের কন্যা! আর আমি, আমি জিতেন্দ্রিয়, আমি সাধু।—

(প্রকাশ্যে) বৎসে!

অগ্নি—আদেশ করুন পিতা।

গুরু—রাজার রাণী হতে তোমার আপত্তি আছে?

অগ্নি—আপত্তি না, কিছুমাত্রও না।

গুরু—তুমি ফাল্গুনি পূর্ণিমার দিন রাণীর আসনে ব'সবে।

অগ্নি—এ আদেশ শিরোধার্য্য।

গুরু (উঠিয়া)—আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর কন্যা। (আশীর্ব্বাদ শেষে) এইবার তুমি যাও আর আমার সম্মুখে দাঁড়িও না—দাঁড়িও না।—

অগ্নি—পিতা!

গুরু—ডেক না! তুমি যাও, তুমি যাও।

(অগ্নির ধীরে ধীরে প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

পদ্মানদীর তীর জ্যোৎস্না রাত্রি চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ অগ্নি উপবিষ্টা।

রঞ্জিতের প্রবেশ

রঞ্জিৎ—ডেকেছ অগ্নি?

অগ্নি (চমকিয়া)

কে রঞ্জিৎ?—ব'স

রঞ্জিৎ (তৃণদলের উপরে বসিয়া)

ডেকেছ অগ্নি?

অগ্নি—খবর শুনেছ বোধ হয়, কেমন রঞ্জিৎ?

রঞ্জিৎ—খবর কই না?

অগ্নি (হাসিয়া) সেকি? এতবড় খবরটা তোমায় কেউ দিলে না? আশ্চর্য্য তো!

রঞ্জিৎ—না, আমি কিছু শুনিনি।

অগ্নি শোননি? তবে শোন আমি শীঘ্রই রাজার রাণী হ'তে চ'লেছি।

রঞ্জিৎ (কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া) এই কথা শোনবার জন্যে ডেকেছিলে?

অগ্নি—হ্যাঁ।

রঞ্জিৎ—কিন্তু আশ্রম বালিকাদের নিয়ম তো তা নয় অগ্নি!

অগ্নি (হাসিয়া) নিয়ম আর সকলের বেলাতেও উল্টে যেতে পারে—যদি কেউ রাজার মত—

রঞ্জিৎ—রাজার মত কি অগ্নি?

অগ্নি—অমূল্য কিরীট উপহার দেয়।

রঞ্জিৎ—রাজা দিয়েছেন?

অগ্নি—হ্যাঁ, রাজা আমার বিনিময়ে মুকুট দিয়েছেন।

রঞ্জিৎ—তবে তুমি রাণী হ'তে চলেছে।

অগ্নি—হ্যাঁ।

রঞ্জিৎ—আনন্দের সঙ্গে।

অগ্নি—আনন্দের সঙ্গে।

রঞ্জিৎ—(কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল) না, তোমার সে আনন্দ আমি চূর্ণ ক'রবো অগ্নি, আমি তোমায় রাণী হ'তে দেব না।

অগ্নি (হাস্য) হা হা হা হা। পাগল!

রঞ্জিৎ (শিহরিয়া) কী ভীষণ হাসি! কী সুন্দর হাসি!

অগ্নি—শিউরে উঠছো? হাসি শুনে শিউরে উঠছো?

রঞ্জিৎ—হ্যাঁ, তুমি বড় ভয়ানক।

অগ্নি—আর?

রঞ্জিৎ—সন্ধ্যা।

অগ্নি—পতঙ্গ আগুনকে সুন্দর দেখেই পুড়ে মরে। তুমিও পুড়ে মরতে চাও কেমন?

রঞ্জিৎ—সে পোড়াতে সতর্কতা আছে।

অগ্নি—আচ্ছা, পুড়বে, তুমিও পুড়বে। কিন্তু রঞ্জিৎ, ও কি? সরে আসছ কেন?

রঞ্জিৎ—স্পর্শ করবো, একবার তোমায় স্পর্শ ক'রব।

অগ্নি—পাগল! পাগল!!

রঞ্জিৎ—সরে যাচ্ছ? দূরে স'রে যাচ্ছ? অগ্নি সরে এস, ধরা দাও, আজ নিবিড়ভাবে ধরা দাও।

অগ্নি—পাগল! পাগল!

(নদীকূল দিয়া অগ্রে অগ্নি ও তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ রঞ্জিৎ

ছুটিতে লাগিল। অগ্নি দৌড়াইতে দৌড়াইতে রাজতোরণের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল) (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) কে আছ? কে আছ?

(দ্রুতপদে এক বর্ম্মাবৃত পুরুষ মূর্ত্তির প্রবেশ)

মূর্ত্তি—আমি আছি।

অগ্নি—আশ্রয় চাই।

মূর্ত্তি—আমার কাছে?

অগ্নি—হাঁা,, তোমার কাছে।

মূর্ত্তি—তবে এস!

(পুরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া চলিতে চলিতে একটি সুসজ্জিত কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়া মূর্ত্তি বর্ম্ম খুলিয়া ফেলিতেই অগ্নি চমকিয়া উঠিল)

অগ্নি—এ কি? রাজা?

রাজা—হ্যাঁ, আমি রাজা।

অগ্নি—তোমার প্রহরীবৃন্দ কোথায় গেল?

রাজা—তাদের আজ ছুটি দিয়েছি, তুমি আসবে বলে।

অগ্নি—আমি আসব, তা জানতে?

রাজা—গুরু খবর দিয়েছিলেন।

অগ্নি—উঃ—

রাজা—কাল প্রভাতেই তুমি রাণীর আসনে বসবে।

অগ্নি—স্মরণীয় দিন। কিন্তু তুমি আমায় কি উপহার দেবে রাজা?

রাজা—কি চাও তুমি?

অগ্নি—যা চাই, তা পাব?

রাজা—তাই পাবে।

অগ্নি—তাই পাব? তবে শোন রাজা, আমি আমার স্মরণীয় দিনে উপহার চাই—

রাজা—কি?

অগ্নি—চাই গুরু রাঘবের ছিন্ন শির।

(রাজা চমকিয়া উঠিলেন)

অগ্নি—চমকিও না রাজা, চমকিও না। চাইই, রাঘবের ছিন্ন শির আমার চাই, ওই আমার একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপহার। কাল প্রভাতে রাণীর অভিষেকের পরেই আমি দেখতে চাই গুরুর ছিন্ন শির। বল রাজা, পাব? পাব?

রাজা (অভিভূতভাবে অগ্নির চোখের দিকে চাহিয়া)

অগ্নি—পাব?

রাজা—পাবে।

অগ্নি—(হাস্যে) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ কাল আমার জীবনের স্মরণীয় দিন—স্মরণীয় দিন!

রাজা—অগ্নি! অগ্নি!!

অগ্নি—চুপ করো রাজা; চুপ কর। আমি আমার অভিষেকের বাজনা শুনতে পাচ্ছি, আর শুনতে পাচ্ছি কি জান?

রাজা—না!

অগ্নি—শুনতে পাচ্ছি গুরুর কাতর ক্রন্দন। রাজা! রাজা!! চল বাগানে যাই, জ্যোৎস্নার আলোয় যাই, এ বন্ধ ঘর আর ভাল লাগছে না! চল, চল।

(হাত ধরাধরি করিয়া উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

পরদিন প্রভাত। রাণীর বেশে অগ্নি সিংহাসনে উপবিষ্টা। ক্রোড়ে স্বর্ণপাত্রে রঘুনাথের ছিন্ন শির।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতিহারী—(অভিবাদন করিয়া) মহারাণী! এক রমণী আপনার সাক্ষাৎ প্রত্যাশী।

অগ্নি—নিয়ে এস।

(প্রতিহারীর সহিত নারীসাজে রঞ্জিতের প্রবেশ ও প্রতিহারীর প্রস্থান। রঞ্জিৎ অগ্নির ক্রোড়স্থিত গুরুর ছিন্ন শিরের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল)

অগ্নি—(হাসিয়া) চিনতে পারব না ভেবেছিলে, নয় রঞ্জিৎ?

রঞ্জিৎ—হ্যাঁ।

অগ্নি—তাই নারীবেশে এসেছেন? কিন্তু দেখছো আমার কোলে এটা কি? আজ আমি কে! আর আমার একটা কথায় আজ কি হতে পারে?

রঞ্জিৎ—(ঘৃণা ভরে) জানি, আজ তুমি রাণী আর—

অগ্নি—(হাসিয়া) ঘৃণা হচ্ছে? আর কি?

রঞ্জিৎ—পালক হন্ত্রী, বিশ্বাসঘাতিনী।

অগ্নি—(সক্রোধে) জান, তোমারও এই মুহূর্ত্তে গুরুর দশা হ'তে পাবে?

রঞ্জিৎ—জানি। কিন্তু তার আগে তোমাকেও ক্ষমা করতে পারিনে। (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গেল, অগ্নি নড়িল না, মৃদু হাসিল মাত্র)-

শোধ নেব অগ্নি, প্রস্তুত হও।

অগ্নি—(রক্ষাবস্ত্র উন্মোচিত করিয়া) এই যে।

(রঞ্জিতের হাত কাঁপিয়া অস্ত্র গালিচার উপর পড়িয়া গেল)

রঞ্জিৎ—(চীৎকার করিয়া) অগ্নি! অগ্নি!!

অগ্নি—ছিঃ এত দুর্ব্বল চিত্ত তোমার? রঞ্জিৎ! তুমি না পুরুষ? তুমি না গুরু-হত্যার প্রতিশোধ নিতে এসেছিলে? তবে পিছিয়ে পড় কেন? অস্ত্র নাও, আমায় খুন কর, আমি বাঁচি; পিতৃহত্যার পাতক থেকে আমায় বাঁচাও, আমায় এ যন্ত্রণা হতে মুক্তি দাও।

(কাতরভাবে রঞ্জিতের হাত জড়াইয়া ধরিতেই রঞ্জিৎ শিহরিয়া সরিয়া দাঁড়াইল)

রঞ্জিৎ (সগর্জ্জনে) রাক্ষসী! পিশাচি!

অগ্নি—হ্যাঁ, আমি তাই। একদিন না একদিন পুড়ে মরতে চেয়েছিলে? ভুলে গেছ?

রঞ্জিৎ—হাঁ, ভুলেছি। অগ্নিকেও আর মনে পড়ে না।

অগ্নি—তবে তোমার সম্মুখে ব'সে কে?

রঞ্জিৎ—রাণী! আজ আমার সম্মুখে ব'সে আছে এক রাক্ষসী, সর্ব্বনাশী নারী।

অগ্নি—তাকেই আজ তুমি খুন করতে এসেছিলে।

রঞ্জিৎ—ভুল করেছিলাম। পালাই, পালাই; এখনি কেউ দেখতে পাবে।

দ্রুতপদে প্রস্থান

অগ্নি—(রুদ্ধস্বরে) রঞ্জিৎ! রঞ্জিৎ!!

সপ্তম দৃশ্য

রাজার শয়ন কক্ষ। রাজা বহুমূল্য পালঙ্কে নিদ্রিত; সম্মুখে শূন্য গরলাধার হস্তে দাঁড়াইয়া অগ্নি।

রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। নহবৎ বাজিতে সুরু করিয়াছে; পুরবাসী তখনও কেহ জাগে নাই।

অগ্নি—(হাসিয়া) ঘুমাও রাজা, সুখে ঘুমাও; এ ঘুম আর তোমার কেউ ভাঙ্গাতে পারবে না। নহবৎখানায় নহবতে সুরের নানা হেরফের চলছে, তুমি ঘুম ভেঙ্গে শুনবে ব'লে, কিন্তু আজ আর তুমি শুনতে পাবে না। আগুনের ধারার মত ব'য়ে চলেছি। রাজা! রাজা!! ঘুমাও, ঘুমাও!! তোমার রূপের রাণী আজ যে তোমায় ঘুম পাড়িয়েছে। সে ঘুম আর কেউ ভাঙ্গাতে পারবে না। গুরুকে ঘুম পাড়িয়েছে, তোমায় ঘুম পাড়িয়েছি, আর এক জনের ঘুমের অভিসারে চলেছি।

অনেক কাজ, আজ আমার অনেক কাজ' যাই তবে, ঘুমাও রাজা, ঘুমাও।

(কক্ষ হইতে বাহির হইয়া রাজপুরীর বাহিরে পড়িল ও চলিতে চলিতে পূর্ব্বের আশ্রমের নিকটবর্ত্তী একটা কুটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিয়া) রঞ্জিৎ। দুয়ার খোল। (ভিতর হইতে দুয়ার খুলিয়া রঞ্জিৎ বাহিরে আসিল।)

রঞ্জিৎ—(চমকিয়া) রাণী তুমি?

অগ্নি—হ্যাঁ, আমি রাণী। তোমার সঙ্গে কথা আছে রঞ্জিৎ

রঞ্জিৎ—আমার সঙ্গে কথা আছে—তোমার?

অগ্নি—হ্যাঁ, আমার।

রঞ্জিৎ—বিশ্বাস হয় না।

অগ্নি—অবিশ্বাস হবার তো কোনও লক্ষণ দেখি না' যাক্ আর কাউকে জানিয়ে কাজ নেই; পদ্মানদীর কূলে চল, দেখবে নদীতে কেমন ভাঙ্গন ধরেছে, আর ঢেউয়ের কি তাণ্ডব নৃত্য।

রঞ্জিৎ—সে আমি দেখেছি।

অগ্নি—ভাল কোরে দেখেছ?

রঞ্জিৎ—ভাল করে দেখেছি।

অগ্নি—তা হোক চল রঞ্জিৎ, শুধু আজকের এই রাতের অন্ধকারটি যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ; তারপরে তুমি ফিরে এস, আমি বারণও করব না, চল।

রঞ্জিৎ—তোমার সঙ্গে আমার যাওয়া সাজে না, তুমি রাণী

অগ্নি—তোমায় রাজা সাজাব ব'লেই তো নিয়ে যাচ্ছি রঞ্জিৎ।

রঞ্জিৎ (চমকিয়া) কি? কি ব'ললে?

অগ্নি—না, কিছু নয়। তুমি যে রঞ্জিৎ, আর দেরী নয়, এখনই সূর্য্য উঠবে। ঐ শোন, পাখীদের অস্ফুট কাকলী শোনা যাচ্ছে। রাজবাড়ীর নহবতের রাগরাগিণীও থেমে এসেছে।

রঞ্জিৎ—(অগ্রসর হইতে হইতে) তবে চল কিন্তু তুমি যে

রাজবাড়ী থেকে চলে এলে রাণী! নহবতের রাগরাগিণী শুনছে কে?

অগ্নি—(হাসিয়া) রাজা।

রঞ্জিৎ—উঃ, রাণী আজ তোমার হাসিটাও অত ভীষণ দেখাচ্ছে কেন? এমন তো আমি কোনও দিনই দেখিনি!

অগ্নি—যেদিন গুরুর ছিন্ন শির লয়ে বসেছিলাম, সেদিনও নয়?

রঞ্জিৎ—ঠিক মনে পড়ে না, সে প্রায় এক বৎসর আগের কথা।

অগ্নি—হ্যাঁ, আজ আবার এক বৎসব পরে সেইদিন ফিরে এসেছে। আর ফিরে এসেছে সেইদিনটি, যেদিন বলেছিলে আমি তোমায় ভালবাসি• অগ্নি, তোমার ভুবন-ভোলান রূপকে ভালবাসি! (কথা কহিতে কহিতে উভয়ে পদ্মানদীর তটে আসিয়া দাঁড়াইল)

নীরব কেন রঞ্জিৎ, উত্তর দাও, একদিন ব'লেছিলে মরণকে বরণ করে অমর হ'তে চাও, আজ তা পারবে।

রঞ্জিৎ—একথা আজ কেন?

অগ্নি—উঃ, অনেকদিন হ'য়ে গেছে নয়? দিনের পর দিন গত হ'লে প্রবৃত্তি যে একরকম থাকে না, তুমিই তার জলন্ত প্রমাণ, কি করব? নীরব কেন রঞ্জিৎ?

রঞ্জিৎ—বল।

অগ্নি—(শাণিত কৃপাণ হস্তে অগ্রসর হইয়া আসিয়া) প্রস্তুত হও রঞ্জিৎ; সেদিন তুমি আমায় যা দান করতে পারনি, আজ আমি তাই তোমায় দান ক'রবো। যদি ভগবানকে কোনওদিন মেনে থাক, তবে তাঁকে স্মরণ কর, না হ'লে—

রঞ্জিৎ—না হ'লে কি?

অগ্নি—যদি কাউকে কোনওদিন ভালবেসে থাক তাকে ভাব।

রঞ্জিৎ—(হাসিয়া ঘৃণাপূর্ণ স্বরে) ভয় পাব' ভেবেছ? কিছু না। ভগবান আছেন কি না জানি না; কিন্তু ভালও আমি কাউকে বাসিনি।

অগ্নি—কোনওদিন না?

রঞ্জিৎ—না, কোনওদিন নয়।

অগ্নি—তবে আমায় মিথ্যাকথা বলেছিলে?

রঞ্জিৎ—হ্যাঁ।

অগ্নি—(রুদ্ধস্বরে) উঃ এতদিন—এতদিন পরে আমায় কাঁদালে? রঞ্জিৎ,—রঞ্জিৎ—

(রঞ্জিৎ উত্তর দিল না, অগ্নির হস্ত হইতে অস্ত্র লইয়া আপনার বিশাল বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় লুটাইয়া পড়িল)

অগ্নি—(চীৎকার করিয়া) রাজা, রাজা আমার!!

(উভয়কে লইয়া খানিকটা স্থান মহাশব্দে পদ্মাবক্ষে ভাঙ্গিয়া পড়িল)

নানা কথা

লক্ষ্ণৌ মুস্লিম জাতীয় সম্মেলনে সভাপতি স্যার আলী ইমামের বক্তৃতা

অদ্যকার এই বিপুল জনসমাবেশ দেখিয়া পার্লামেন্টের শাসন-সংস্কার যুগের কথা আমার মনে হইতেছে। তৎকালে মিশ্র নির্ব্বাচন প্রথার সমর্থকের সংখ্যা বোধ হয় অঙ্গুলীতে গণিয়া শেষ করা যাইত। যাঁহারা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-প্রথার প্রবল সমর্থক ছিলেন, আমি নিজেও সেই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, এবং প্রকৃত পক্ষে গত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টোর সঙ্গে ঐ সম্পর্কে যে ডেপুটেশন সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, আমি সেই ডেপুটেশনের একজন সদস্যও ছিলাম। কিন্তু ১৯০৫ এবং ১৯০৯ সালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে আমি ঐ প্রশ্ন সম্বন্ধে বিশেষভাবে পর্য্যালোচনার অবসর লাভ করি এবং সুনিশ্চিতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-প্রথা শুধু ভারতের জাতীয়তারই বিরোধী নহে, উহা নিঃসংশয়িতরূপে মুস্লিম সমাজের পক্ষেও ক্ষতিকর। ১৯০৯ সালেই এই স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থিত করি, কিন্তু তৎকালে মুসলমানেরা প্রায় সকলেই সংবাদপত্রে এবং জনসভায় আমার মতের নিন্দাবাদ করেন।

২২ বৎসর পরের অবস্থা

তৎপরে ২২ বৎসর কাল কাটিয়া গিয়াছে, এই ২২ বৎসর পরে, আমি আমার সম্মুখে শুধু ভারতের সকল প্রদেশের মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিদিগকে মাত্র নহে পরন্তু কয়েকটী শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদিগকে এবং প্রকৃতপক্ষে সমগ্র শিক্ষিত মুসলমানসমাজের প্রতিনিধিদিগকে সমবেত দেখিতে পাইতেছি। অদ্যকার এই সভায় মুস্লিম ন্যাশনালিষ্টগণ, অন্য কথায় যাহারা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচননীতির অনুরাগী নহেন, তাঁহাদের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়াছেন। গত ২০ বৎসরে অভীষ্টপথে আমরা অভাবনীয়রূপে অগ্রসর হইয়াছি। এই সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতিরূপে আমি ভারতের সকল অংশ হইতে এবং বিভিন্ন নেতৃগণের নিকট হইতে অসংখ্য বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহারা সকলেই মিশ্র নির্ব্বাচন প্রথার দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়াছেন। ঘটনাচক্রের এই যে গতি, ইহা খুবই আনন্দের বিষয়, এবং এতদ্দারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সঙ্ঘবদ্ধ এবং সম্মিলিত ভারতীয় জাতীয়তার পতাকা উর্দ্ধে ধারণ করিতে ভারতের মুসলমানগণ অপর কোন সম্প্রদায় অপেক্ষা পশ্চাদ্‌বর্ত্তী নহেন।

অদম্য শক্তি

আমি আপনাদের নিকট সাহস করিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি যে, ভারতের মুসলমানদের এই আন্দোলন, উত্তরোত্তর শক্তিশালী হইয়া উঠিবে এবং জগতের কোন শক্তিই তাহাকে রুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে না। নিরাশার কোনই কারণ নাই। কালের গতি আমাদেরই অনুকূলে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমান

ভারতের বর্ত্তমান স্বাধীনতা সংগ্রামে গত দুই বৎসর কাল মুস্লীম ন্যাশনালিষ্টগণ যে সব দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া লইয়াছেন, শুধু তাহা লক্ষ্য করিলেই কালের গতি কোন্ দিকে বুঝিতে পারা যাইবে। অদ্যকার এই মহতী সভায় এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা অদম্য দৃঢ়তার সহিত এবং প্রফুল্লচিত্তে অন্যান্য স্বদেশ প্রেমিকগণকে যে সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে, তাঁহারাও তৎসমুদয় সহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের এই আত্মত্যাগ কখনই বৃথা যাইতে পারে না।

যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, ভারতের জাতীয়তার প্রতি আমার এইরূপ অবিকল শ্রদ্ধা কেন, তদুত্তরে আমি বলিব উহা ব্যতীত ভারতের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অসম্ভব। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচননীতি জাতীয়তার অভাবেরই দ্যোতক। রাজনীতিক সমস্যাসমূহ সামাজিক নীতিসমূহের প্রতিঘাত ব্যতীত অন্য কিছু নহে। আপনারা যদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি লোহার প্রাচীর তুলেন, তাহা দ্বারা আপনারা সমাজের সংস্থানসূত্রকেই ধ্বংস করিবেন। আপনারা যদি রাজনীতিক ব্যবধান সৃষ্টির উপর জোর দিতে থাকেন, দিন দিন আপনাদের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিবে। রাষ্ট্র শাসনতন্ত্রে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শ্রেণীর গণ্ডী নির্দ্দেশের তাৎপর্য্য কি বিবেচনা করিয়া দেখুন।

তৃতীয় পক্ষের শক্তি বৃদ্ধি

স্বতন্ত্র নির্ব্বাচননীতির পক্ষে এই যুক্তি দেখান হইয়া থাকে যে মুসলমানেরা সংখ্যায় কম, শিক্ষায় পশ্চাৎবর্ত্তী এবং আর্থিক হিসাবে অনুন্নত। এই যুক্তি দৃঢ় করিবার জন্য বলা হয় হিন্দুদের প্রবল বিরুদ্ধতার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহারা কখনই নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে জয়লাভে সক্ষম হইবে না ইহাতে ইহাই স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, প্রত্যেক হিন্দু মুসলমানদের চিরশত্রু। আমি এই সংজ্ঞা নির্দ্দেশে বিশ্বাস করি না, কিন্তু যদি ঐগুলি সত্য বলিয়াও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইতে কি সিদ্ধান্ত আসে? প্রথমে এই কথা স্বীকার করিয়া লওয়া হয় যে, মুসলমানেরা অত্যন্ত দুর্ব্বল, নিজেদিগকে রক্ষা করিবার শক্তি তাহাদের নাই। দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের শত্রুস্বরূপ হিন্দুরা অতি নিষ্ঠুর এবং দুর্দ্দমনীয় এবং পরিশেষে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

ঐ সব সংরক্ষণ ব্যবস্থার পশ্চাতে যদি কোনরূপ শক্তি না থাকে, তাহা হইলে ঐ গুলির দ্বারা যে বাস্তবিক পক্ষে স্বার্থ সংরক্ষিত হইতে পারে, আমি ইহা বিশ্বাস করি না। মুসলমানেরা যদি নিজদিগকে রক্ষা করিতে না পারে এবং হিন্দুরা তাহাকে রক্ষা না করে, তাহা হইলে সে শক্তি নিশ্চয়ই তৃতীয় পক্ষের হাতে গিয়া বর্ত্তিবে। ইহা কি জাতীয়তার বিরোধী নহে? ইহাতে কি ইহাই প্রতিপন্ন হয় না যে, এ দেশে যে সমর্থন পাওয়া যাইতে পারে না, সেই সমর্থনের উপরই স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনবাদীদের ভরসা? ইহার অর্থ চিরন্তন শিক্ষানবিশীতে অবস্থান করা। ন্যাশনালিষ্ট মুসলমানগণ, স্বাধীনতার আশা অন্তরে পোষণ করেন, এমন অবস্থায় তাঁহারা যে শাসনতন্ত্রে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচননীতির প্রবর্ত্তন করিতে ঘৃণা বোধ করিবেন, ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়? একদল লোক আছেন যাঁহারা যুক্ত-নির্ব্বাচন প্রথার সহিত কতকগুলি সর্ত্ত বরাদ্দ করিয়া দিতে ইচ্ছুক। আইন সভার আসন 'রিজার্ভ' বা স্বতন্ত্র রাখিবার দাবী প্রভৃতিতে তাঁহাদের মত অভিব্যক্ত হইয়াছে।

ফাঁদে পড়িবেন না

এ সম্বন্ধেও আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, ঐগুলি ফাঁদস্বরূপ এবং বিশেষভাবে ঐগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, বাহিরের কোন শক্তির উপস্থিতির আবশ্যকতাই উহার ফলে অনিবার্য্য প্রতিপন্ন হইবে। কোনরূপ সর্ত্ত বা বাধা-নিষেধ বিনির্ম্মুক্ত অবিকৃত যুক্তনির্ব্বাচননীতিকে সোজাসুজিভাবে সমর্থন করাই আজ একান্ত আবশ্যক; ইহাই আপনাদের নিকট আমার নিবেদন। স্বার্থ সুবিধা লুঠের ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানদের ভাগবাঁটোয়ারা সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, কোন বিধি-বিধানের দ্বারা যে, এই ভাগ বাঁটোয়ারা স্থিরীকৃত হইতে পারে, এ বিশ্বাস আমি করি না। ভারতের স্বাধীনতা লাভ করিতে এবং সে স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে মুসলমান সমাজের অবদানের অনুপাতেই মুসলমান-সমাজ ঐ সব সুখ সুবিধার ভাগী হইবে। মুসলমানদের ভয় করিবার কিছুই নাই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বীর মুসলমানগণ, বাঙ্গলা এবং পূর্ব্ব-সীমান্তের

মুসলমানদের সংখ্যাবাহুল্য স্বাধীন ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়ের নির্বিঘ্নতার পক্ষে অধৃষ্যশক্তিস্বরূপ থাকিবে। ভবিষ্যৎ ভারতে হিন্দুরাজ অথবা মুসলমানরাজ বলিয়া কোন কিছুর স্থান হইবে না। স্বদেশ প্রেমের উদার ভিত্তির উপর ভারতের জনগণের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্ক-কালিমার স্পর্শ তাহাতে থাকিবে না। ভারতের তেমন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই আপনাদের লক্ষ্য হউক এবং সেই লক্ষ্য সাধনে আপনারা আত্মত্যাগে অগ্রসর হউন।

উত্তর পশ্চিম সীমান্তে জাগরণ

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অধিবাসীদের মধ্যে রাজনীতিক নব জাগরণ সুস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভারতের জাতীয় সংহতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে, উহা তাহার সু-নিশ্চিত লক্ষণ। আশার আর একটি কারণ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়, বণিকসভা প্রভৃতি যে সব স্থলে গণ্ডীবদ্ধভাবে যুক্তনির্ব্বাচনপ্রথা প্রচলিত আছে, সে সব স্থানেও সাম্প্রদায়িক বিরোধ ক্রমশঃই বিলোপ হইয়া যাইতেছে। আমার নিজের প্রদেশে—বিহারে মৌলবী আবদুল হাফীজ এবং মিঃ আলী মনজার সম্প্রতি নির্বাচন দ্বন্দ্বে জয়লাভ করিয়াছেন। তাহা হইতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সদস্যপদপ্রার্থীদের চরিত্র এবং যোগ্যতার বিবেচনা সাম্প্রদায়িক সংস্কারকে পরাভূত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার এবং অপর ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে হিন্দুদের বিপুল সংখ্যাধিক্যের ভোটের জোরে প্রভাবশালী হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বীগণকে পরাস্ত করিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। যুক্তনির্ব্বাচনপ্রথা একবার প্রবর্ত্তিত হইলে সদস্যপদপ্রার্থীদের চরিত্রবল, যোগ্যতা এবং ব্যক্তিগত প্রভাব নিশ্চয়ই সাম্প্রদায়িক সংস্কারের ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবে। জগৎ অনেকটা আগাইয়া গিয়াছে, এখন রাজনীতিতে অন্য কোন বিচার আর চলিতে পারে না।

ইহা সত্য যে, এই সেদিন বেনারস, মীর্জাপুর, আগ্রা এবং কাণপুরে ভীষণ শোচনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছে। অনেকে আছেন, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস যে, এজেন্ট প্রভোকেটর বা প্ররোচক গুপ্তচর দ্বারা ঐ সব হইতেছে।

অন্যেরা বিশ্বাস করেন যে, উভয় সম্প্রদায়ের গুণ্ডাশ্রেণীর লোকেরাই এই সমস্ত দাঙ্গা বাধায়। এই সমস্ত সর্বনাশকর আত্মকলহের মূল কি, তাহা এখানে স্থির করা সম্ভবপর নহে। আমি সাগ্রহে আশা করি যে, এই সমস্ত দুর্ঘটনা অতীতের বিষয়ই হইবে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কেহ কেহ এই সমস্ত দাঙ্গাগুলিকে রাজনৈতিক কুমতলব সিদ্ধির জন্যই প্রয়োগ করার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাহাতে না হয় এবং উভয় সম্প্রদায়ের মনোমালিন্য যাহাতে দূরীভূত হয় তজ্জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিতে হইবে। এক্ষণে ভারতের পরমসন্ধিক্ষণ—কাজেই সমস্ত ভারতবাসীর একমাত্র কর্ত্তব্য সাম্প্রদায়িক মিলন দৃঢ় করা এবং চার্চ্চিলের দলকে ভবিষ্যৎ শাসন-সংস্কারে বাধা দেওয়ার সুযোগ না দেওয়া।

ডাঃ আনসারী

আমরা যে সমস্যার সমাধান করিতে এস্থলে সমবেত হইয়াছি, তাহার উপর ভারতের ভাগ্য এবং মুসলমানদের সভ্যতাগত অধিকার জড়িত রহিয়াছে। স্বাধীনতার জন্য ভারত যে অহিংস সংগ্রাম করিয়াছে, তাহা জগতে অতুল, এই সংগ্রামে প্রথম স্তরে সে জয়লাভ করিয়াছে, কিন্তু ইহা প্রাথমিক স্তর মাত্র। স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ আমাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করিয়া ঐ সংগ্রামের ফল হইতে ভারতভূমিকে বঞ্চিত করিতে চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছে। একথা এখন আর চাপা নাই যে, স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এই কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। কিছুর মধ্যে কিছু না এমন অবস্থাতেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটিতেছে। বিপজ্জনকভাবে আজ অনেক লোকের ভাবোচ্ছ্বাসের ছড়া-ছড়ি আরম্ভ হইয়াছে। এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হইতেছে, যাহাতে হিন্দু-মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী এবং সহযোগিতা সম্ভব না হয়, ভারতের সমস্যা দিন দিনই জটিল আকার ধারণ করিতেছে। যাহাতে ভারতের এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকিতে পারে, সেজন্য জাতীয়তাবাদী মুসলমান সমাজের বিভিন্ন মতাবলম্বী রাজনীতিকদের সঙ্গে একটা মীমাংসায় পৌঁছিতে চেষ্টা করিতেছেন।

দেশ ও সমাজ :—

দেশ এবং সমাজ এই দুইটি বিষয়ের উপর আমি বিশেষ জোর দিতে চাই। কারণ এক দল লোক নিতান্ত ধৃষ্টতাসহকারে এই অভিযোগ করিতেছে যে জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ ইস্লামের স্বার্থ দেখেন না। তাঁহাদের ঐ অভিযোগ যে কতদূর মিথ্যা, আমি তাহা দেখাইতে চাই। যাঁহারা এই অভিযোগ করেন, ইস্লামের আধ্যাত্মিক উদারতার কথা তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত; ইস্লাম জগতের মানব-সৌভ্রাত্রের আদর্শকে ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়াছে এবং তাহাকে এই শিক্ষা দিয়াছে যে, সেই সৌভ্রাত্রের স্থান সর্ব্বদা সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামীর উপরে। দেশের জন্যই হউক, আর সমাজের জন্যই হউক, জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণের দবী ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেক্ষেত্রে জাতির এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থে যে সঙ্ঘাত কোথায়, আমি বুঝিতে পারি না। জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ অন্যান্য রাজনীতিক মতাবলম্বী মুসলমানদের সঙ্গে আপোষ-নিষ্পত্তি করিতে বারংবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা অপর দলের মত কতকটা মানিয়া লওয়া সম্ভব বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নির্ব্বাচননীতি সম্পর্কিত প্রস্তাব লইয়া ঐ আলোচনা ফাঁসিয়া গিয়াছে। ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তা গঠনের পক্ষে যুক্তনির্ব্বাচন প্রথার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিবার যে কোন আবশ্যকতা আছে, তাহা আমি মনে করি না। বিশিষ্ট মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই উহার অনুকূল মতাবলম্বী। রাজনীতির দিক হইতে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথা যে সাম্প্রদায়িক ভেদবিদ্বেষ এবং বিরোধকে চিরস্থায়ী করিবার একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৌশল, একথা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। যে প্রদেশের মুসলমানেরা সংখ্যায় লঘিষ্ঠ, সেই সব স্থান এবং মোটের ওপর সমগ্র ভারতে তাহারা

যে অযোগ্য এবং অক্ষম, ঐ প্রথাতে তাহাই স্বীকার করিয়া লওয়া হয় এবং উহার ফলে বিদ্বেষভাব এবং নৈতিক অধোগতি অনিবার্য্য।

সভ্যতার দিক হইতেও ঐ প্রথা দারুণ অনিষ্টকর। মুসলমানগণ ঐ স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথার প্রাচারের দ্বারা নিজদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে ভ্রান্ত নির্বিঘ্নতার একটা বিশ্বাসে তাহাদের সভ্যতার অন্তর্হিত তেজোবীর্য্য নষ্ট হইয়া পড়িবে। স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনবাদী পুরাতত্ত্ব রাখিবার যাদুঘরে মুসলমান সভ্যতাকে রাখিতে চাহিতেছেন। আমি নিজে এই বিশ্বাস করি যে, ভারতের মোস্লেম সভ্যতা এক প্রাণবান জিনিষ, জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ এই স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনকে ভারত এবং মুসলমানসমাজ উভয়ের পক্ষেই দারুণ ক্ষতিকর মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা কিছুতেই ইহার সমর্থন করিতে পারিবেন না।

বোম্বাই করপোরেশন ও মহাত্মা

কর্পোরেশনের অভিনন্দন

এক বৎসর পূর্ব্বে আপনি জাতীয় জীবনে যে উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছেন উহা অপূর্ব্ব এবং অদম্য শক্তিশালী। গত এক বৎসরের রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থানে জগতের সমক্ষে ইহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, ভারতকে আর জগতের জাতিসঙ্ঘে স্বাধীনতা ও আত্ম-সম্মানের আসন হইতে বঞ্চিত রাখিতে পারা যাইবে না। আপনি জগতকে যে অহিংসার মন্ত্র দিয়াছেন, উহা আজ দিকে দিকে মানবতার বহুধা কল্যাণ সাধন করিতেছে। এতদ্দেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য আপনার মহনীয় উদ্যমের মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া আমরা কৃতজ্ঞতায় শির নত করিতেছি। আমাদের প্রিয় জন্মভূমির সমৃদ্ধি ও উন্নতির পক্ষে নিপীড়িত অস্পৃশ্য সমাজের উন্নয়ন প্রচেষ্টা হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধান প্রচেষ্টা অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। যাহাতে ভারতের প্রতি সন্তান, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অধিকার ভোগ করিতে পারে এজন্য আপনার মহান প্রচেষ্টার আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সাফল্য কামনা করিতেছি।... ...

মহাত্মার উত্তর

'আমি চিরদিনই দরিদ্র নারায়ণের প্রতিনিধিত্বের দাবী করিয়া থাকি, আমার কাছে স্বরাজের অর্থ হিন্দুস্থানের ৭ শত পল্লীর অধিবাসী জনসাধারণের উন্নতি বিধান, নগরগুলিকে যদি তাহাদের নিজেদের অস্তিত্বের যুক্তিযুক্ততা সপ্রমাণ করিতে হয় তাহা হইলে নগরসমূহকে দারিদ্র্য-পীড়িত পল্লীবাসীদের অবস্থার উন্নতি করিয়া দিতে হইবে লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত্তের অন্ন সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে—উহাই হইতেছে পূর্ণ স্বরাজ। অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, উহা হিন্দুধর্ম্মের কলঙ্ক। উহা অপসারিত না করা পর্য্যন্ত আমরা স্বরাজের যোগ্য হইতে পারিব না। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, এই সমস্যা সমাধান সম্পর্কে যে কর্ত্তব্যভার আমি বরণ করিয়া লইয়াছি, উহা এক আমার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব, আমি এজন্য সকলের সাহায্য প্রার্থনা করি। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, শিখ, খ্রীষ্টান সকলের সাহায্য চাই এবং উহাদের সকলকেই নিজকে সর্ব্বাগ্রে ভারতীয় বলিয়া ভাবিতে শিখিতে হইবে।"

নারী সম্মেলনে

সরলা দেবী চৌধুরাণীর অভিভাষণ

বাংলার নারীদের জন্য একটি পৃথক কংগ্রেসের কি প্রয়োজন ছিল—এই প্রশ্ন আজ চারিদিক হইতে জিজ্ঞাসিত হইতেছে। আমি যতদূর বুঝিতে পারি, তাহাতে মনে হয়, এই কংগ্রেস বঙ্গনারীর আত্মচেতনার মূর্ত্ত বিকাশ, বাঙ্গালার পুরুষের আত্মচেতনার সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। বাংলার নারী তাহার জীবনের বিভিন্ন বিভাগে যে বৈষম্যমূলক ব্যবহার পাইয়া আসিয়াছে, তাহার ফলেই এই আত্মচেতনার উদ্ভব। সামাজিক আচার-নিয়ম তাহার আত্মবিকাশের পরিপন্থী, গার্হস্থ্য নীতির আদর্শ পুরুষের পক্ষে একরূপ, নারীর পক্ষে অন্যরূপ এবং উত্তরাধিকারের আইনগুলি চিরকালের জন্য তাহাকে পুরুষের মুখাপেক্ষী করিয়া রাখিয়াছে।

পরস্পর প্রয়োজন :—

জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীর পরস্পর প্রয়োজন আছে। কিন্তু পুরুষ তাহার নিজ স্বার্থোদ্দেশ্যেই নারীকে ব্যবহার করিয়াছে—নারীর নিজ প্রয়োজন পূরণ করিতে বিশেষ কোন সাহায্যই সে করে নাই। সমাজের বুকে নিজেদের স্থান প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বাঙ্গলার নারীগণ আজ ভারতের এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নারীদের সহিত সমভূমে দণ্ডায়মান হইয়াছে।

পুরুষের উৎপীড়ন :—

এক শতাব্দী পূর্ব্বে মার্কিণ রমণীরা তাহাদের 'মনোভাবের' বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন যে, মানবজাতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, পুরুষ চিরদিনই নারীকে তাহার অধিকার হইতে পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে; পুরুষের মূল লক্ষ্য ছিল নারীর উপর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করা; সে যত প্রকারে পারিয়াছে নারীর আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নষ্ট করিতে, তাহার আত্মসম্মান খর্ব্ব করিতে এবং তাহাকে পরাধীন ও ঘৃণিত জীবন যাপনে রাজি করিতে চেষ্টা করিয়াছে।

ক্রমশঃ অধিকার প্রতিষ্ঠা :—

তথাপি পাশ্চাত্যের নারীগণ দীর্ঘদিনের মোহ নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামের পর তাঁহাদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। সহস্র অত্যাচার, অনাচার ও বঞ্চনার সহিত সংগ্রাম করিয়া আজ তাঁহারা জয়লাভ করিয়াছেন। তাহার ফলে আমাদের, অর্থাৎ ভারতীয় নারীদিগের পক্ষে প্রত্যেকবার নূতন শাসন সংস্কারে কোন-না-কোন প্রদেশের মিউনিসিপ্যালিটি, সিনেট, আইনসভা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়াছে। ভারতে সামাজিক জীবনে পুরুষের সহযোগীরূপে নারীর যে মূল্য তাহা পুরুষদের

প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণ ভাবে মানিয়া লইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নারী পিকেটিং-এর কার্য্যে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করিয়াছেন, কিন্তু নারীকে এখনও বহু দুর্গ সম্মুখসমরে জয় করিতে হইবে, পুরুষ এই সকল দুর্গের চাবি আজিও দৃঢ় মুষ্টিতে আপন করায়ত্ত রাখিয়াছেন। নারীরা বুঝিয়াছেন যে, ভারতের উন্নতির প্রতিপদক্ষেপে নারীর সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয়। নারী-শক্তি যাহাতে জাতীয় উন্নতির কার্য্যে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে হইবে। জাতীয় মহাসভা অদ্যাবধি নিজেদের কর্ম্মসমিতি প্রভৃতি শুধু পুরুষের দ্বারাই গঠিত করিয়া চলিয়াছেন, যদিও বহু ক্ষেত্রে এই সকল পুরুষ অনেক নারী অপেক্ষা কার্য্যক্ষমতায় ও বুদ্ধিতে হীন।

নারীর আর্থিক দুর্দ্দশা :—

জাতির মঙ্গলের জন্য যদি বিশেষ কাহারও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন হয়, তবে সে নারীর। স্ত্রীলোকের নীতিবিগর্হিত বৃত্তি গ্রহণ অথবা দুর্নীতিপরায়ণ জীবনযাপনের মূল কারণ আর্থিক দুর্দ্দশা। পুরুষের বেকার-সমস্যা অপেক্ষা নারীর বেকার-সমস্যা আরও গুরুতর। আর্থিক স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত স্ত্রীলোক অনেক সময়ই পুরুষের লালসা-বহ্নিতে পতিত হয়—ইহার ফল ব্যভিচার, ইহার ফল বেশ্যালয়। সুতরাং কোন আদর্শ রাষ্ট্রে একজন বেকার কিম্বা জীবিকাহীন স্ত্রীলোক থাকিবে না ; আদর্শ সমাজে পুরুষ যদি কোন নারীকে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া যায়, তবে আইনানুসারে তাহার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকিবে।

ব্যভিচার দোষ দূর :—

শৌণ্ডিকালয়গুলি পুরুষের পক্ষে অনিষ্টকর, কিন্তু বেশ্যালয়গুলি নারী-জাতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অপমানজনক। বিগত শীতকালে লাহোরে নিখিল ভারত এবং নিখিল এসিয়া নারী-সম্মিলনী নামক দুইটি মহিলা সভার প্রত্যেকটিতেই মদ্য নিবারণের দাবী উপেক্ষা না করিয়াও বেশ্যালয় ধ্বংসের প্রচেষ্টাকেই কার্য্যসূচীর একটী প্রধান বিষয় বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু কংগ্রেস মদ্য নিবারণের প্রয়োজনীয়তা পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিলেও বেশ্যালয়গুলি রাখার কুফল সম্বন্ধে এতটুকুও দৃষ্টি দেয় নাই। পুরুষচালিত গবর্ণমেণ্ট যখন বেশ্যালয়ের লাইসেন্স দিয়া নিজ তহবিল পূর্ণ করে, আর পুরুষদের পরিচালিত ভারতের জাতীয় মহাসভা যখন তাহাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ বাণীও উচ্চারণ করে না, তখন ভারতের নারীদের উচিত অবিলম্বে উদ্বুদ্ধ হইয়া মিলিত চেষ্টায় চৈনিক কবি ডাঃ লিউয়ের প্রস্তাবিত একটি নিখিল-বিশ্ব গণতন্ত্র সভা গঠন করা। পৃথিবীর পবিত্রতা এবং শান্তি রক্ষার জন্য এই গণতন্ত্রের পরিষদ সমূহে নারীরই থাকিবে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা।

স্বরাজের মর্ম্ম ও নারী :—

বাঙ্গালার নারীগণ এই মহিলা-কংগ্রেসে সমবেত হইয়া ঘোষণা করিতেছে যে, ভারতীয় জাতীয় মহাসভা যে রাষ্ট্রতন্ত্রেই সম্মত হউক না কেন তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকিবে অথবা সেগুলির ব্যবস্থার জন্য স্বরাজ গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা দেওয়া হইবে

নারীর মূল অধিকার :—

১। স্ত্রীলোকদের মূল অধিকার, যথা—

(ক) সধবা অবস্থায় স্বামীর আয়ে সমান অংশ এবং বৈধব্যের পর স্বামীর সম্পত্তিতে সন্তানসন্ততিদের সহিত সমান উত্তরাধিকার।

(খ) পিতামাতা, ভ্রাতা অথবা ভগ্নীদের সম্পত্তিতে পুত্র এবং ভ্রাতাদের সহিত কন্যা এবং ভগ্নীদের সমান উত্তরাধিকার।

(গ) সন্তানসন্ততির উপর মাতার সমান অভিভাবকত্বের অধিকার।

(ঘ) বিচার, শাসন, চিকিৎসা, আইন, শিক্ষা, বিমান, নৌ এবং অন্যান্য বিভাগে চাকুরী পাইতে অথবা ব্যবস্থাপরিষদ সভা, মিউনিসিপ্যালিটি এবং জেলা বোর্ডে সদস্যপদ পাইতে কিম্বা মন্ত্রীপদ, শাসন-পরিষদের সদস্যপদ অথবা গবর্ণর পদ প্রাপ্তিতে স্ত্রীলোকের স্ত্রীলোক বলিয়াই কোন অনধিকার থাকিবে না।

(ঙ) সমস্ত প্রকার নাগরিক বিষয়ে সমান অধিকার এবং সমান বাধ্যবাধকতা। স্ত্রীলোক বলিয়া কোন বাধা থাকিবে না।

২। লাম্পট্য, বেশ্যাবৃত্তি, স্ত্রীলোক সংগ্রহ এবং তাহাকে প্রলুব্ধ করা—আইনে তুল্যরূপে দণ্ডার্হ হইবে।

৩। বেশ্যালয়গুলি সমস্ত বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

৪। উত্তরাধিকার পত্র না লিখিয়া মৃত এমন বেশ্যার সম্পত্তির মালিকানা দাবী করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহার আয় বাড়াইতে পারিবে না।

৫। (ক) স্ত্রীলোক-মজুরের ভালরূপ জীবিকা-উপযোগী বেতন।

(খ) কাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবস্থা।

(গ) কাজের জন্য স্বাস্থ্যকর এবং নৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি।

(ঘ) বৃদ্ধ বয়স এবং পীড়িতাবস্থায় আর্থিক কষ্ট হইতে রক্ষার ব্যবস্থা।

(ঙ) প্রসূতি অবস্থায় বেতনসহ ছুটীর বিশেষরূপ ব্যবস্থা।

৬। স্ত্রীলোকদের বেকার অবস্থা এবং আর্থিক দুর্দ্দশা হইতে তাহাদের রক্ষার জন্য রাষ্ট্র হইতে বিশেষ ব্যবস্থা।

৭। বালিকাদের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা।

৮। বয়স্কা স্ত্রীলোকদের শিক্ষার সুবিধা।

৯। যে সমস্ত স্কুলে ছেলে ও মেয়ে উভয়েই পড়ে, তথায় শিক্ষক এবং কমিটির সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক স্ত্রীলোকের স্থান রাখা।

১০। পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার।

নারীর কর্ত্তব্য :—

এতক্ষণ আমরা ভারতের নারীদের অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। এখন আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমরা ভারতের নারীগণ এক মহান সভ্যতার উত্তরাধিকারিণী। আমরা তাহার আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক কৃষ্টি উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছি। আর্থিক এবং রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার তুমুল ঝড়ের মধ্যে বসিয়া ভারতের নারীকে আজ সমাহিত চিত্তে চিন্তা

করিতে হইবে এবং বলিতে হইবে—"যেনাহং অহতো ন স্যাম্ তেনাহং কিম্ কুর্য্যাম" যাহা আমাকে অনন্ত জীবন দান করে না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? বন্দেমাতরম

হিন্দুদের আত্মসমর্পণ জাতির কল্যাণকর হইবে কি?

মহাত্মা গান্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে হিন্দুমুসলমান সমস্যার সমাধান সম্পর্কে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সে সম্বন্ধে শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:—

"মহাত্মা গান্ধী 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে লিখিয়াছেন—'সত্যাগ্রহী স্বরূপে পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের ফলোপধায়কতায় আমি বিশ্বাস করি। সংখ্যার দিক হইতে হিন্দুদের প্রাধান্য রহিয়াছে। মিশরের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় কি করিয়াছে, সে কথা না তুলিয়া তাঁহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় যাহা চাহে, তাহাদিগকে তাহা দিতে পারেন ;কিন্তু হিন্দুরা যদি সংখ্যালঘিষ্ঠও হইতেন, তাহা হইলেও আমি একজন সত্যাগ্রহী স্বরূপে, একজন হিন্দু হিসাবে বলিতাম পূর্ণ আত্মসমর্পণের জন্য পরিণামে হিন্দুদের কোন ক্ষতিই ঘটিবে না।

"আমি যে আত্মসমর্পণের কথা বলিতেছি, তাহা মানমর্য্যাদার ক্ষেত্রে নহে, পার্থিব বিষয়ে। আইন সভার আসন, প্রতিপত্তি, অথবা চাকরী প্রভৃতির বেলায় আত্মসমর্পণ করাতে মর্য্যাদার হানি ঘটে না।"

মহাত্মাজী হিন্দুদিগকে পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে এই আশ্বাস দান করিয়াছেন যে, ঐ ভাবে আত্মসমর্পণ করিলে, পরিণামে তাহাদিগকে কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। এইভাবে আত্মসমর্পণে হিন্দুদের কোন ক্ষতি হইবে কিনা সে সম্বন্ধে বিবেচনা করা আমি আবশ্যক মনে করি না। ঐরূপ আত্মসমর্পণের ফলে সমগ্র দেশের ও জাতির কি লাভ বা ক্ষতি হইবে, সেই বিষয়ের বিবেচনাতেই আমার আগ্রহ অধিক।

আব্রাহাম লিঙ্কন বলিয়াছেন—

"অপর দেশ শাসন করিবার মত যোগ্যতা কোন জাতিরই নাই; সেইরূপ একথাও বলা যাইতে পারে, কোন একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উপর কর্তৃত্ব করিবার যোগ্যতা অপর একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নাই।" কাজেই সমগ্র জাতির কল্যাণ দেখিতে হইলে, সকল সম্প্রদায় এবং সকল শ্রেণীর ভিতর যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য এবং জনহিতপরায়ণ, তাহাদের হস্তেই দেশের শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত রাখা উচিত। এক সম্প্রদায় অপর এক সম্প্রদায়ের কাছে আত্মসমর্পণ করিলে, এই ফললাভ করা যাইতে পারে না।

মহাত্মাজী সত্যই বলিয়াছেন—আইন সভার আসন, চাকুরী প্রভৃতি ছাড়িয়া দেওয়াতে মর্য্যাদার হানি ঘটে না; কিন্তু তাহাতে কার্য্যকারিতার হানি ঘটে, কর্ত্তব্য পালন এবং দেশসেবার অধিকার ত্যাগের জন্য ক্ষতি ঘটে। বর্ত্তমানের অবস্থা যেমনই থাকুন না কেন, স্বরাজের অধীনে আইন সভা এবং অপরাপর প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সদস্যগিরি, ছোট বড় চাকুরী বিভিন্নরূপে দেশসেবারই সুযোগ রূপে গণ্য হইবে। দেশসেবার কর্ত্তব্য, অধিকার এবং সুযোগ হইতে কোন সম্প্রদায়কেই বঞ্চিত করা কর্ত্তব্য নহে।

অন্যান্য প্রদেশের কথা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু বাঙ্গালার সম্বন্ধে এই কথা বলিব যে, এই প্রদেশে ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা, ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থনীতি, স্বাস্থ্য বিধান এইরূপ দিক দিয়া যে উন্নতি ঘটিয়াছে, তৎসমুদয় বলিতে গেলে সবই করিয়াছে হিন্দুরা। এই প্রদেশে দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ভূমিকম্প, মহামারী প্রভৃতিতে যাহারা বিপন্ন হইয়াছে, হিন্দুরাই জাতিধর্ম্ম-বর্ণনির্ব্বিশেষে তাহাদের দুঃখকষ্ট লাঘব করিবার নিমিত্ত স্বার্থত্যাগ করিয়াছে, অর্থ, সময় এবং উৎসাহ এবং মস্তিষ্কের শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। বাঙ্গলাদেশের মুসলমানেরা শিক্ষার দিক হইতে হিন্দুদের ন্যায় উন্নত নহে এবং হিন্দুদের ন্যায় তাহারা সকল সম্প্রদায়ের কল্যাণকল্পে বিনা পয়সায় জনহিতকর কার্য্য করিতে অভ্যস্তও নহে।

নিজেদের বড়াই করা কিংবা বাঙ্গলার মুসলমানদিগের মনে কষ্ট দান করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এতদ্দ্বারা আমি শুধু এইটুকু দেখাইতে চাই যে, বাঙ্গলাদেশের কল্যাণের জন্য বিনা পয়সায় এবং পয়সা লইয়া যে সব কাজ দরকার, একা মুসলমান সম্প্রদায়ের দ্বারা সেগুলি সুদক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। কাজেই অবিসংবাদিত চিত্তে গান্ধীজীর পরামর্শ মানিয়া চলিলে বাঙ্গলার কল্যাণ হইতে পারে না, অন্যান্য প্রদেশে এবং সমগ্র ভারতের বেলায়ও তাঁহার ঐ উপদেশ সর্ব্বোত্তম হিত বিধায়ক হইতে পারে কিনা এ বিষয়েও সন্দেহ আছে।

ডগলাস্ ফেয়ার ব্যাঙ্কস্

—অভিনেতাকাহিনী—

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

আমেরিকার "কোলোরাডো" রাজ্যের রাজধানী "ডেন্‌ভার" সহরে ডগ্‌লাস্ প্রথম পৃথিবীর আলো-বাতাসের সঙ্গে পরিচিত হন তেইশে মে, আঠারো-শো-তিরাশী সালে। ছেলেবেলায় পড়াশুনার দিকে এঁর মন ছিল। "ডেন্‌ভার সিটি স্কুলে" পড়াশুনা শেষ করে ইনি "কোলোরাডো স্কুল অব্ মাইন্স"এ ভর্ত্তি হন খনিজ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করবার জন্য কিন্তু পড়াশুনা বেশী দূর অগ্রসর হোল না।

এক বন্ধু এঁকে নিমন্ত্রণ করলেন—তাদের আমেচার ক্লাবে থিয়েটার দেখবার জন্য। সেই প্রথম এঁর থিয়েটার দেখা

থিয়েটার দেখে এঁর মনের মধ্যে এমনি একটা বিপর্য্যয় ঘটে গেল যে কয় রাত্রি তাঁর কেটে গেল বিনিদ্র অবস্থায়। তারপর অভিভাবকদের লুকিয়ে ইনি অভিনয় করতে সুরু করে দিলেন—এর আগে ইনি কোনদিন কল্পনাও করেন নি যে অভিনেতা হবেন।

কিছুদিন অভিনয় করবার পর এঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল জনসাধারণের মুখে মুখে—তখন এঁর বয়স কুড়ি বছরও পেরোয়নি। কিন্তু রাত জেগে অভিনয় করবার কালে পড়াশুনায় অসুবিধা হতে লাগলো অত্যন্ত, কাজেই পড়াশুনা ছেড়ে দিতে ইনি বাধ্য হলেন। কিন্তু অভিনয়ের বৈচিত্র্যহীনতা এঁকে আকৃষ্ট করতে পারলে না বেশীদিন, ইনি রঙ্গালয় ছেড়ে দিয়ে আবার 'স্কুল অব্ মাইন্সে' ভর্ত্তি হলেন।

কিন্তু পড়াশুনাও বেশীদিন চললো না, আবার ঢুকলেন রঙ্গালয়ে—এই হোল এঁর প্রথমবার রঙ্গালয় ছাড়বার ইতিহাস।

এমনিভাবে ইনি তিনবার রঙ্গালয় ছেড়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। বিদ্যাশিক্ষা করবার জন্য কিন্তু শেষবারও—যদিও খুব দৃঢ়তার সঙ্গে ইনি রঙ্গালয় ত্যাগ করলেন—তবু আবার এঁকে ফিরে আসতে হোল রঙ্গালয়ে—কেন না ছ'মাস একাগ্রচিত্তে পড়াশুনা করবার মত মনের অবস্থা

(ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্ক ও বিলি ডভ্—"ব্ল্যাক্ পাইরেটের" দৃশ্য)

তখন এঁর ছিল না—অতনু স্বপ্নকে রূপ দেবার নেশা, অপূর্ব্ব কল্পনাকে অভিব্যক্তি দেবার কামনা, এঁর রক্ত তখন চঞ্চল করে তুলেছিল।

ইনি এই সময়ে সেক্সপীয়রের কয়েকখানি নাটক অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেন যথেষ্ট, তারমধ্যে "ট্রু লিটল্ অরফ্যান বয়েজ্," "মেসার্স জ্যাক্" ও "দি স্পিট"— এই তিনখানির নামই উল্লেখযোগ্য। তার পর সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা 'হারি ক্যারে'র লেখা "ম্যাণ্টন" নামক নাটকে অভিনয় করতে করতে ইনি অভিনয় ছেড়ে দিলেন দালালি করবার ঝোঁকে।

দালালিতে ইনি বিশেষ কিছু সুবিধা করে উঠতে পারলেন না। কেননা এ ব্যবসায় তাড়াতাড়ি সুনাম হয় না—যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ। ক দিন পরে নিজের চেষ্টায় একটি লৌহ ফ্যাক্টরীর প্রধান সাহায্যকারীর পদ পান, কিন্তু তাতেও ইনি বিশেষ কিছু সুবিধ করে উঠতে পারলেন না। কাজেই এঁকে আবার ফিরে আসতে হোল অভিনয়-জীবনে,—এর দ্বিতীয়বার অভিনয় জীবন ছাড়বার ইতিহাস এইটুকুই।

ইনি তৃতীয়বার পাদপীঠ ছেড়ে চলে আসেন ওকালতী করবার জন্য কিন্তু ওকালতী ব্যবসায় এঁর প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খেলেনা, ইনি আবার ফিরে এলেন রঙ্গমঞ্চে—দৃঢ় সঙ্কল্প করে যে এবার হতে অভিনয়ই এঁর জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপায় হবে।

এই তৃতীয়বার পাদপ্রদীপের তলে দাঁড়িয়ে দর্শকদের নমস্কার জানাবার কিছুদিন পরে ইনি বিয়ে করেন "বেথ্ সালী"কে—এঁরই গর্ভে কনিষ্ঠ (জুনিয়র) ডগ্‌লাস্ ফেয়ার ব্যাঙ্কসের জন্ম হয়। কনিষ্ঠ ডগ্‌লাস্ও আজ অভিনয় জগতে যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জ্জন করেছেন—পিতারই পুত্র তো! কনিষ্ঠ ডগ্‌লাসের জন্মদিন হচ্ছে উনিশ-শো-দশ সালের নয়ই নভেম্বর।

স্বনামধন্য প্রযোজক "ডি, ডব্লু গ্রিফিথ"এর নাম আজ চিত্রজগতে কারুরই অজ্ঞাত নয়। এঁর বিচক্ষণ দৃষ্টি যে ক'জন নট-নটীর উপর পড়েছে, এঁর সুশিক্ষার কল্যাণে তাঁরা প্রত্যেকেই আজ চিত্রজগতে প্রথিতযশা। এই গ্রিফিথ সাহেব সেই সময় অনেক অর্থব্যয় করে "ইনটলারেন্স্" নামক একখানি ফিল্ম তুলছিলেন। অনেক ছোটখাটো অভিনেতা অভিনেত্রী এসে জড় হন এই ছবিখানির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করবার আশায়—তাদের মধ্যে গ্রিফিথ সাহেবের শ্যেনচক্ষু ডগ্‌লাসকেই পছন্দ করেন। এই বইখানিতে এক বেবিলোনবাসী সৈনিকের ভূমিকায় ইনি



(ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস্ ও মেরী এষ্টর)

নামেন গ্রিফিথ্ সাহেবের প্রযোজনায়। এই ছবিখানিতে ইনি তিন সপ্তাহ উপরি-আর্টিষ্ট হিসাবে অভিনয় করেন দৈনিক এক পাউণ্ড বেতনে।

চিত্রাভিনেতা রূপে এঁর জীবন সুরু হয় উনিশ শো-চোদ্দ সালের গ্রীষ্মকাল হতে। এই সময়ে ইনি প্রথম নামেন "দি ল্যাম্ব্" ছবিতে গ্রিফিথ সাহেবের প্রযোজনায়। পরপর আরো কয়েকখানি ছবিতে ইনি গ্রিফিথ সাহেবের

প্রযোজনায় অভিনয় করেন—সেগুলির মধ্যে "হিজ পিক্‌চর্স ইন্ দি পেপার্স," "ডবল্ ট্রাবেল্" "দি আমেরিকানো" "রেজ্ঞী মিক্‌সেস্," "হেবিট্‌স্ অব্ হ্যাপিনেস্"—প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

কিছুদিন্ পরে ইনি "ট্রাঙ্গস্ ফিল্ম কোম্পানীতে" যোগ দেন এবং তাদের হ'য়ে তিনখানি ছবিতে অভিনয় করেন"—"এগেন্ আউট্ এগেন্," "ডাউন্ টু দি আর্থ", "ওয়্যাল্ড্ উলী ."

"ওয়াইল্ড্ উলীতে" অভিনয় করবার পর ইনি "ফেমাস্ পিক্‌চার্স" এর চুক্তি সই করেন। তারপরে "থি মাস্ কেটিয়ার্স," "মিষ্টার কিক্‌স্ ইট্," "নিকার বুকার বারকারু" এই তিনখানি ফিল্মে ইনি অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন—চিত্রনট বলে এঁর যশ তখন ছড়িয়ে পড়ে সারা ছায়াজগতের বুকে।

'মেরী পিক্‌ফোর্ড' ও সেই সময়ে 'ফেমাস্‌পিকচার্সের' দলভুক্ত ছিলেন। সু অভিনেত্রী বলে খ্যাতিও অর্জ্জন করেছিলেন। তখনও ইনি ছিলেন বিবাহিতা, এঁর প্রথম স্বামীর নাম "ওয়েন মূর"

কেউ তখন ভাবেওনি যে এঁদের দুজনের মধ্যে প্রেমের অঙ্কুর ধীরে ধীরে পরিণতি লাভ করছে তবে অনেকেই জানতো এঁরা দুজন খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু, কেন না অবসর সময়ে প্রায়ই এঁদের দুজনকে একত্রে দেখতে পাওয়া যেত 'লস এঞ্জে লেস' সমুদ্র-তীরে।

হঠাৎ যেদিন ডগ্‌লাস তাঁর স্ত্রী "বেথ সালী"কে 'ডাইভোর্স' করলেন সেদিন হতে হোলিউড বাসীদিগের সজাগ দৃষ্টি পড়ল এই দুই 'নক্ষত্রর উপরে। কিন্তু এই ডাইভোর্সের সময় থেকে কিছুদিন আর এই দুটী চিত্রনট নটীকে একত্রে দেখতে পাওয়া গেল না—কাগজে দীর্ঘ দীর্ঘ আলোচনা বেরুতে লাগলো এঁদের দুজনের ভবিষ্যত আশা নিরাশার কথা নিয়ে।

পূর্ব্বের ঘটনাই পরবর্ত্তী ভবিষ্যতের সূচনা করে যা' জল্পনা কল্পনা-চলছিল, তাই ঘটলো—পিকফোর্ড তাঁর স্বামীকে ডাইভোর্স করলেন।

দুজনের বিয়ে হোল উনিশশ-কুড়ি সালের আটাশে মার্চ্চ।

বিবাহের পরে এঁরা "ইউনাইটেড আর্টিস্ট্ কর্পোরেসন্" নামে একটী ফিল্ম কোম্পানী খোলেন—চার্লি চ্যাপলিনের সহযোগীতায়। চার্লি এই কোম্পানীর একজন প্রধান অংশীদার। যতগুলি ভাল আমেরিকান ছবি অবিমিশ্র খ্যাতি অর্জ্জন করেছে, তার অনেকগুলো এই কোম্পানীর তোলা—সেই কারণে 'ইউনাইটেড্ আর্টিস্ট্' আজ সাফল্য অর্জন করেছে যথেষ্ট।

ডগলাস সে কয়খানি ফিল্ম অভিনয় করে অবিমিশ্র সুখ্যাতি লাভ করেন, সেগুলির মধ্যে "দি নট" "মোলী কড্‌ল্" "হোয়েন ক্লাউডস্ বোলড্ বাই," "এ্যামেরিকানস্," "এ্যামেরিকান্ এ্যারিষ্টোক্রেসী," "সিন্দবাদ দি সেলার," "থিফ্ অব্ বাগ্‌দাদ," "মার্ক অব জোরো," "সান্ অব জোরো," "ব্লাক পাইরেট," "দি থ্রি মাস্কেটীয়ারস্," "গোচো," "দি আয়রণ মাস্ক"—সব কখানিই এঁর নিজের কোম্পানীর তোলা। এঁর এই সব ছবির পরিচয় আজ নতুন দেবার কিছু নেই, যাঁরা এঁর ছবি একবার দেখেছেন এঁর অসামান্য অভিনয় নৈপুণ্যের প্রশংসা করেছেন একবাক্যে। এঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন একটা আকর্ষণী আছে, যা দর্শকদের আকৃষ্ট করে প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত ভাবে।

এঁর প্রথম সবাক ছবি হচ্ছে "টেমিং অব দি শ্রু." এর নায়িকার ভূমিকায় নামেন 'মেরী পিকফোর্ড'। মুখর ছবিতেও এঁর অভিনয় যে অসামান্য সাফল্য অর্জ্জন করবে তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই ছবিখানিতে।

মেরীকে বিয়ে করবার পর মধুযামিনী যাপন করবার সময় ইনি ভারতে এসেছিলেন বেড়াতে কিন্তু নানা কারণে সেবার তাড়াতাড়ি এদেশে থেকে তাঁদের ফিরে যেতে হয়। এই ক সপ্তাহ হোল তিনি আবার ভারতে এসে গেছেন। এখানে বিশেষভাবে কোলকাতায় তিনি যে সম্বর্দ্ধনা পেয়েছেন তা তাঁর পক্ষে গৌরবের—গর্ব্বের বিষয় একথা তিনি নিজেই বলেছেন সংবাদপত্রের মারফৎ। কোলকাতায় কদিন থেকে দর্শন লিপ্সু সহরবাসীদের আকাঙ্ক্ষা মিটাবার আগেই ইনি কুচবিহারে চলে গেলেন শীকার করবার আনন্দ উপভোগ করবেন বলে। কুচবিহারের জঙ্গলে ইনি কটা বাঘ শীকার করেছেন।

ইনি বলেন—যতগুলি দেশ আমি বেড়িয়েছি ভারতবর্ষ তাদের সকলের চেয়ে সুন্দর। প্রাকৃতিক শোভায়

সভ্যতার আদর্শে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের তুলনা হয় না !

ইনি দৈর্ঘ্যে পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি। চোখ দুটো এঁর কটাশে হলেও চুলগুলো মিশ্ কালো, স্বাস্থ্যবান বললেই সব বলা হোল না—শক্তিও এঁর দেহে আছে সুপ্রচুর পরিমাণে। এঁর দেহের ওজন এক-শো-পঁয়ষট্টি পাউণ্ড।

ভারতবর্ষ থেকে ফিরে গিয়ে ইনি "রিচিং টু দি মুন্" নামে একখানি মুখর চিত্র অভিনয় করবেন' 'বিবি দানিয়েল্‌সে'র সঙ্গে—এই ছবিখানির জন্য ইনি সপ্তাহে পাঁচ হাজার ডলার করে পাবেন ইউনাইটেড্ আর্টিষ্টস্ কর্পোরেশনের কাছ থেকে। এই ছবিখানিতে ইনি প্রাতীচ্যের অনেক নতুন বিষয় দর্শকদের দৃষ্টির সামনে মেলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন। এঁর এই অভিযান সফল হোক—

মোগলের প্রাসাদে ও শ্মশানে

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ভ্রমণ স্মৃতি

উত্তর পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করিতে গিয়া মুসলমান রাজাদের অনেক কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়াছি। বহু স্থানেই মসজিদ ও সমাধি মন্দিরের বৈচিত্র্য ও বিরাটত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। মোগলদের এসব জিনিষের প্রশংসা করিলে কোন কোন বন্ধু মত প্রকাশ করিয়াছেন—মুসলমানদের মসজিদ আর সমাধি মন্দির ছাড়া আর কি-ই বা আছে। আর কিছু থাক বা না থাক, দীর্ঘ-কাল-জয়ী হইয়া যাহা এতকাল সগৌরবে বিশ্বের বিস্ময়রূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার গৌরবও তো সামান্য নহে।

তাজ-তোরণ

লাহোরের জাহাঙ্গীর বাদশাহের সমাধিও যেমন অপূর্ব্ব, সালিমার বাগানও তেমনি বিস্ময়ের। আবার মসজিদটিও সামান্য নহে। লাহোরের দুর্গটিও মুসলমান আমোলেরই—এ দুর্গটি আধুনিক উন্নত ধরণের দুর্গের পর্য্যায়ে পড়িতে পারে কিনা জানি না, কিন্তু এখনো এখানে বৃটিশ সৈন্যেরা আরামে নিশ্চিন্ত মনে বাস করে এবং দুর্গ নামেই ইহাকে অভিহিত করা হয়। আর এই দুর্গটিকে রাবী নদের ধ্বংসলীলা হইতে যে ভাবে মোগল যুগে রক্ষা করা হইয়াছিল, তাহা আজিকার উন্নত যুগের ইঞ্জিনিয়ারদেরও বিস্ময় উৎপাদন করিবে।

সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান বাদসাহ জাহাঙ্গীরের কবর নিজে পছন্দ করিয়া সাজাইয়াছিলেন। বাদসাহ সাজাহান সালিমার বাগ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সালিমারের মত একটি বাগান নাকি মোগল সম্রাটদের গ্রীষ্মাবাস ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরে আছে; আর কোথাও আছে কিনা জানিনা। অতীতের একেবারে ধ্বংসাবশেষে পরিণত না হইলেও সম্পদ-হারা এই বাগান এখনো বিস্ময়ে বিমুগ্ধ করিয়া দর্শকদের আনন্দ দেয়। যে বাদশাহ সাজাহান তাজমহল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, মতি মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন—তিনিই এই বাগানও তৈরী করাইয়াছিলেন। সাজাহানের সৌন্দর্য্য-বোধ আজ বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য্য তাজমহলরূপে যেমন পরিচিত, তাঁর মতি মসজিদ, সালিমার বাগানও তেমনি আশ্চর্য্যই বটে। আরো একটী জিনিষ সাজাহান যাহা তৈরী করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ

হইলে কত সুন্দর যে হইত কে বলিবে! শ্বেত মার্ব্বেলের সমাধিতে তিনি প্রিয়তমা তাজকে শয়ন করাইয়া নিজে



'দেওয়ানী খাস' অদূরে তাজ

কৃষ্ণ মার্ব্বেলের অমনি সমাধিতে তাজের ছায়া হইয়া থাকিতে চাহিয়াছিলেন---এতখানি সৌন্দর্য্য রসজ্ঞ মানুষ বিশ্বের ইতিহাসে আর ক'জনা আছে ?

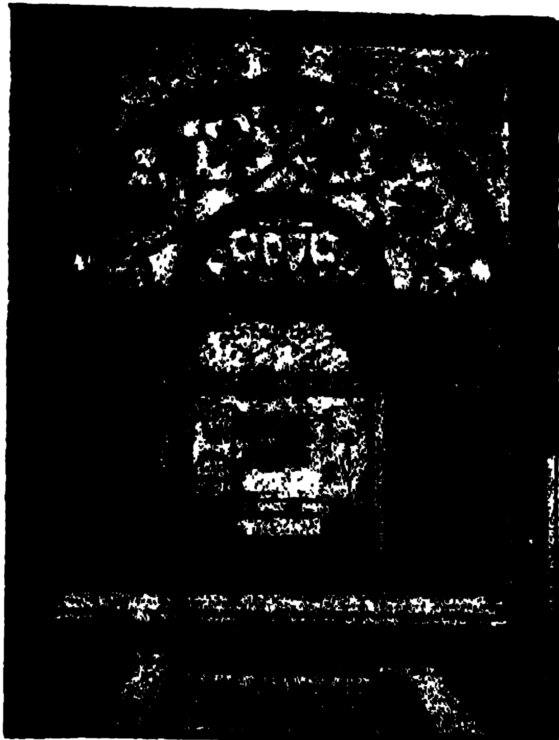
লাহোর অঞ্চলে মোগল বাদসাহের কবর, মসজিদ ও বাগান দেখা গেল বটে, কিন্তু যে বাগান একদিন সম্রাটের প্রমোদ উদ্যান ছিল- আজ সেথায় যে সব প্রাসাদে সম্রাট সম্রাজ্ঞীরা জীবন উপভোগ করিতেন, তাহার সন্ধান মেলে না।

দেখিবার আমার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। লাহোর তো মোটেই নয়— দিল্লীও আমার সে ইচ্ছা যেন পুরাইতে পারিল না।

দিল্লীর জুম্মা মসজিদ পার হইয়া আগে প্রাসাদ বা ফোর্ট দেখিতেই গেলাম, কিন্তু বেলা দশটা বাজিয়া গেছে—ফোর্টের দ্বার বন্ধ, দ্বারে বৃটিশ সৈন্য পাহারা দিতেছে, অসময়ে প্রবেশ নিষেধ। তিনটার পর দর্শনের অনুমতি। প্রাসাদের পরিবর্ত্তে মসজিদই আগে দেখিতে হইল ;—প্রকাণ্ড চত্বর, উপাসনা স্থান যেমন দীর্ঘ তেমনি প্রশস্ত।—কি বিচিত্র গঠন কৌশল, এ যেন কালজয়ী বিরাট বিচিত্র সৌধ। জুম্মা মসজিদ হইতে মোগলের প্রাসাদ দেখা যাইতেছে—এ মসজিদের সম্মুখের একটা ভাগ সিপাহী বিদ্রোহের সময় শান্তি স্থাপনের জন্য কামানে দাগা হইয়াছিল।

মসজিদ হইতে ক্রমাগত সমাধিস্থানের দিকেই যাইতে হইল। প্রথমেই দেখিলাম 'খুনীকা গেট', এখানে নাকি এখনো সন্ধান করিলে ঔরংজেবের ভ্রাতৃবধের রক্তধারার সন্ধান মেলে।

—পাণ্ডবের শ্মশান হস্তিনাপুরী সেও এই দিল্লীতেই।



'বিচার বেদী' দিল্লী



'দেওয়ানী খাস' ভিতরের দৃশ্য

মোগল সম্রাটদের প্রাসাদ কক্ষগুলি কেমন ছিল, তাহাদের শয়ন ঘর,বসিবার ঘর,পাঠ কক্ষ কেমন ছিল, তাহা

এ শ্মশানেও পাঠান-মোগলের মসজিদ উঠিয়াছে, তবে দ্রৌপদীর পাতাল-স্নানের নিদর্শন ও কুন্তীদেবীর মন্দির এখনো আছে। ময়দানবের নির্ম্মিত অপূর্ব্ব পুরীর চিহ্ন স্বরূপ আজ ভগ্নাবশেষ প্রশস্ত প্রাচীর ও গেটগুলিই দেখা যায়। ইট-পাথরের কীর্ত্তি, মানুষের শিক্ষা-সভ্যতা-জ্ঞানের

কয়েক মিনিট পরে।

লক্ষ্মী বলে—একটু বস্‌বে ?

পাণ্টা প্রশ্ন আসে—কেন ? কোথাও যাবে নাকি ?

জবাব আসে—ডলিটাকে নিয়ে আস্‌বো।

প্রতিবাদের অবসরমাত্র না দিয়া ঘরের বাহির হইয়া যায়।

বেচারী হরবিলাস !

একা বসিয়া ঘরের কড়িকাঠ গণিতে তার ভালো লাগে না। সাম্‌নের কাচের আলমারীতে যে সব চীনা-মাটীর বাসন ও পুতুল, তাও দু'মিনিটেই পুরাণো হইয়া যায়।

দেয়ালের ছবিগুলো সবই ঠাকুর-দেবতার। বৈচিত্র্য-হীন। লক্ষ্মীর নিজ হাতে তৈরী কালো কাপড়ের ওপরে ঝিনুকের অক্ষরে লেখা "শিব-দুর্গা"—তাও দু দণ্ড ধরিয়া দেখিবার মতো নয়।

দেয়ালের ঘড়ীতে টং করিয়া একবার বাজিয়া ওঠে— সাড়ে আটটা। হরবিলাস মনে মনে বলে—একটা কুকুর নিয়ে এত ! তাহ'লে দোকান সাজিয়ে বসা কেন বাপু ?

সে উঠিয়া দাঁড়ায়। গলি ছাড়াইয়া বড় রাস্তায় গিয়া পড়ে।

ডলিকে লইয়া ওদিকে লক্ষ্মী ঘরে ফিরিয়া আসে। আসিয়া দেখে—খালি ঘর। কেহ নাই। অপেক্ষা করিয়া হরবিলাস চলিয়া গিয়াছে। দুয়ার আগ্‌লাইয়া বসিয়া তার 'মকর' হরিমতি। হরিমতি বলে—ঘর খালি রেখে কোথায় চলে গিয়েছিলি ? কি বলিস্‌ ? ঘর খালি ছিল না ? মানুষ ছিল ? বাবুটীকে একা ঘরে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে গিয়েছিলি বুঝি ? বসে বসে বাবুটী চলে গেলেন ? যাবেন না ? ডলিকে নিয়ে যা ঢলাঢলি সুরু করেছিস্‌—কাউকে রাখ্‌তে পার্‌বি নে। নৈলে আর দুঃখ ছিল কি ? রাজরাণীর হালে থাক্‌তিস্‌—এত অভাবে পড়্‌বি কেন ?

হরিমতির কথাগুলির কোনটা ওর কানে যায় আর কোনটা যায় না বলা শক্ত। মনে পড়িয়া যায়—এখনি বাড়ীওয়ালী আসিবে ভাড়ার টাকা চাহিতে। চৌদ্দ টাকার জোগাড়, দু'টী টাকা হরবিলাসের কাছে পাইত—ভাড়াটা চুকাইয়া দিতে পারিত। রাগের মাথায় ডলিকে মারিতে যায় ; হাত কি আর ওঠে ? উল্টা ডলিকে বুকে চাপিয়া ধরে।

ডলি জানাইয়া দেয় তার ক্ষুধা পাইয়াছে। ডলির জন্য বিশেষ করিয়া রাঁধা টুক্‌রা টুক্‌রা মাংসের ঝোল আর ভাত লইয়া হেঁসেলের দিকে যায়।

সদর হইতে মেয়েরা এক সঙ্গে ডাকিয়া ওঠে—লক্ষ্মী !

হেঁসেল হইতেই উত্তর আসে—যাচ্ছি।

ওরা আবার ডাকে—লক্ষ্মী !

লক্ষ্মীর 'মকর' নিজে চলিয়া আসে ; বলে—ডলি নিজেই খাবে'খন। শীগ্‌গীর আয়, সেই চক্‌দিঘীর বাবু।

লক্ষ্মী বলে—বাবুকে ঘরে বস্‌তে বল ভাই, আমি যাচ্ছি এখ্‌খুনি।

যাচ্ছি যাচ্ছি করিয়াও গোটা পাঁচেক মিনিট কাটিয়া যায়। সদরে যাইতেই মেয়েরা একসঙ্গে বলিয়া ওঠে— এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড দেখিনি বাপু। ঐ এক কুকুরের জন্যে সব খোয়ালে। চক্‌দীঘির বাবু মোটর নিয়ে এসেছিল, দশ-বিশ টাকা কোন না পেতে ? বস্‌লে তো হারিয়ে ? ঐ দেখ মোটর আঠারো নম্বরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন দেয়ালে কপাল ঠুকে মর আর কি ?

মনে যাই থাক্‌, মুখে লক্ষ্মী বলে—কপাল ঠুকে মর্‌তে যাব, গরজ ? পাঁচটা মিনিট যার সবুর সয় না, তাকে বেঁধে রাখ্‌বার প্রবৃত্তিও আমার নেই, রাখ্‌তে চাইনেও তা।

শুধু এই নয়—আঠারো নম্বরের উদ্দেশে আরো দু'চারিটা কটু উক্তি করিয়া ঘরে ঢুকিয়া গুম্‌ হইয়া বসিয়া থাকে। ইলেক্‌ট্রিকের বাল্‌ব তার চোখের সুমুখে আগুনের গোলাগুলি বর্ষণ করে যেন। সুইচ্‌ টিপিয়া বাতিটা নিভাইয়া দেয়।

বাড়ীওয়ালী আসে ভাড়ার টাকার তাগাদায়—দু' চারিটী বক্র উক্তি করিয়া দু' টাকা বাকী রাখিয়াই ফিরিয়া যায়।

পরদিন হাঁড়িতে হাত দিয়া দেখে—চাল বাড়ন্ত। মুদি আর ধারে দিতে চায় না। পাওনা-গণ্ডা তো আর কম নয় ?

—চার—

সেদিনও কিন্তু জোটে না—সাড়ে দশটা অবধি এক ঠাঁই বসিয়া বসিয়া কোমরটা কন্ কন্ করিয়া ওঠে। তারপর দেখা হয় হরবিলাসেরই সঙ্গে। মিনতির চোখে তাকে তাকে, সে সদরে আসিয়া দাঁড়ায়। বলে—এসে আর কি করবো? তোমার তো আর মানুষকে দিয়ে প্রয়োজন নয়! মরে আবার কুকুর হ'য়ে জন্মাতে পারতুম, তা'হলে তোমার কাছে কিছু যত্ন-আত্তি পেতুম। কিন্তু কপালের দোষে যখন মানুষ হয়েই জন্মেছি, তখন—

হরবিলাসের কথায় আর আর মেয়েরা হাসিয়া ওঠে। ওর চোখের কোণে আগুনের শিখা দেখা দেয়। বলে—মরণ আর কি?

হরবিলাস চলিয়া যায়। আর আর মেয়েরাও যে যার ঘরে যায়। একা সদরে বসিয়া থাকে লক্ষ্মী· কিছু রোজগার তার করা চাই।

দুইটী টাকা এবং গণ্ডা তিনেক পয়সা আঁচলে বাঁধিয়া ওপরে খাটের বিছানায় নয়—নীচের চিকণ মাদুরে ঢাকা তোষকে নয়—ঘরের মেজেতে লুটাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে রাত প্রায় দু'টায়।

এমন করিয়া দিন আর চলে না।

শনিবারের বাবুকে সব কথা খুলিয়া বলে। ছ'দিন নির্ব্বান্ধব লইয়া ঘাঁটাঘাঁটির পরে বান্ধবের সাক্ষাৎ পায় এই এক‍ই দিন। মনের কথা খুলিয়া বলা চলে তাঁর কাছে—পরামর্শ দিতেও তিনিই। তিনি বলেন—সব্ চেয়ে ভালো হ'ত যদি ওকে বিদেয় করে দিতে পারতে।

লক্ষ্মীর বুকের ভেতরটায় ছাঁৎ করিয়া ওঠে। ভাব দেখিয়া বাবু বলেন— কিন্তু সত্যি তো আর তা পারছ না! দিন-রাত যে অকারণ ওকে নিয়ে মাতামাতি করছো, সেটুকু একটু কমিয়ে নাও।

বাবুটীর পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া শুধায়—তার মানে?

বাবু বলেন—মানে আর কিছুই নয় লক্ষ্মী, সারা দিন তোমার ছেলেকে নিয়ে যা খুশী কর; রাতটা শুধু অন্যদিকে মন দাও। দেখছোই তো আমার আজকাল বড্ড টানাটানি, তবু তো পাঁচটাকা বাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু তা নিয়ে তো আর চলবে না তোমার? অন্তত গোটা ত্রিশেক টাকা এদিক-সেদিক করে জোগাড় করতে হবেই।

লক্ষ্মী শুধায়—তা ওকে রাখি কোথায়?

বাবু বলেন—সন্ধ্যে থেকে ভেতরের দাওয়ায় বেঁধে রাখলেই পার?

ও বলে—ছেলে আমার তেমনি বটে! দাওয়ায় নোংরার মধ্যে এক দণ্ড টিকে থাকতে পারলে তো! ধব্‌ধবে বিছানাটী নইলে ওর ঘুম হবে, না একটু বসবেই? মাঝে মাঝে নীচের বিছানাটা তুলে রাখি দিনের বেলায়, ও ওপরে উঠে শোয়।

বাবু বলেন—কিন্তু সত্যি যদি তোমার পেটের ছেলে-মেয়েই কিছু থাকতো, তাকেও তো দূরে রাখতে হ'ত?

লক্ষ্মী দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়ে। তার মনে পড়িয়া যায় অনেক কথাই। সে কথা সে শনিবারের বাবুর কাছেও খুলিয়া বলে না।

পাঁচ

কিন্তু আমরা কথাটা জানি এবং তা এই—

বছর পাঁচেক আগে লক্ষ্মী যখন বজবজের কাছাকাছি কি-একটা-গ্রামে মণ্ডলদের ঘরের বৌ ছিল, এ তখনকারই কথা। স্বামী তার কলিকাতা কোন বড় লোকের বাড়ীর মোটর ড্রাইভার—আয় খুব বেশী না হইলেও দেশে যখন যাইতেন, খুব চালের উপরই যাইতেন। যে ফুটফুটে কন্যাটী তাঁর ঘরে জন্ম গ্রহণ করিল, তার নাম রাখিলেন—ডলি।

বাপের তাঁর তেজারতির কারবার, শ্বশুরের মুদি-দোকান। নামটা শুনিয়া পাড়া-প্রতিবেশী তো বটেই মণ্ডল পরিবারেরও সকলে হাসিয়াছে—ডলি! এ আবার কি নাম গো।

কিন্তু ঠাট্টা টিটকারীতে বিচলিত হ'বার লোক তো নয়—যে বাঙালী সাহেবের বাড়ীর মোটর চালাইতেন, তাঁরই ছোট নাত্নীটীর নাম নাকি ডলি এবং কন্যা-সন্তান জন্মিলে নাম রাখিবেন ডলি এ তাঁর বহুদিনের সাধ।

মানুষের কোন্ সাধ ভগবান পূর্ণ করেন এবং কোন্ সাধ করেন না, মানুষ তা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অভিপ্রেত কন্যাসন্তান জন্মিল, অভিপ্রেত নামও রাখা হইল—কিন্তু কন্যার যিনি জনক তিনি এক অশুভ অবসরে সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

লক্ষ্মীর হাতের নোয়া খসিল, সিঁথির সিঁদুর মুছিল, কিন্তু মাছ আর বিকেলের খাওয়া ঘুচিল না। এ অঞ্চলে

পাড়া-গাঁয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা হয়, লক্ষ্মীর বরাতে তার চেয়ে বেশী কিছু হইল না—বাপের বাড়ীতে ভাই, ভাইএর বৌর অনাদর ও তাচ্ছিল্যের মধ্যে আশ্রয় পাইল।

ওর শক্ত হাড়—ঝঞ্ঝাবাতেও টিকিয়া গেল। টিকিল না মেয়েটী—ঠাণ্ডা লাগিয়া ব্রঙ্কাইটিশ এবং একরকম বিনা চিকিৎসাতেই মৃত্যু।

স্বামী হারাইয়া লক্ষ্মী কাঁদে নাই স্বামীকে চিনিবার অবসর তার হয় নাই। স্বামীরও উপসর্গ জুটিয়াছিল বহুৎ—দেশে কম যাইতেন, গেলেও লক্ষ্মীর সঙ্গে যে রকম ব্যবহারটা করিতেন লক্ষ্মীর স্মৃতির কোঠায় তা খুব উজ্জ্বল নয়।

কিন্তু মেয়েকে দিয়া হয়তো স্বামীকে সে ফিরিয়া পাইত, কারণ মেয়ের ওপর তাঁর টান পড়িতেছিল। কিন্তু এমনি সময়ে পরকালের ডাকে জবাব দিতে তিনি চলিয়া গেলেন।

মেয়ে হারাইয়া লক্ষ্মী কাঁদিল—খুবই কাঁদিল। শেষে চোখের জল চোখে মিলাইল—মনের দাগ মিলাইল কি কে জানে?

স্বামী থাকিতেই পতন ঘটিয়াছিল, বাপের বাড়ী আসিয়া আরো বাড়িল। দ্বিতীয় সন্তান যখন তার উদরে তখন দাদার এক বন্ধু তাকে কলিকাতায় রাখিয়া যান—কেরাণী বাগানের এই বাড়ীতে এই ঘরেই।

এখানে আসিয়া অল্পদিনেই নিজেকে নতুন করিয়া গড়িয়া লইয়াছে। নতুন? তা নতুন আর কতটুকু? সতীত্বের সংস্কার তো কবেই লুপ্ত হইয়াছে—মদের নেশাটা নতুন বটে। পতিতা জীবনের প্রথম দু'বছরে তার যা আয়, সঞ্চয় করিলে হয়তো একটা জীবন কাটাইয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু মদের নেশায় সব যে উপিয়া গিয়াছে।—

সুদিনের অংশ গ্রহণ করিতে তার ভাইএরা ছাড়ে না; সবচেয়ে ছোট ভাই মাঝে মাঝে দিদির কাছে আসে, টাকা কড়ি জিনিষ-পত্তর কিছু কিছু লইয়া যায়।

এখনো ওর মনে জাগে ছোট্ট মেয়েটীর স্মৃতি। ডলির ওপরে ওর যা আকর্ষণ তার পুর্ব্বেতিহাস এই।

—ছয়—

লক্ষ্মীরই এক বাবু—আসল নামটা প্রকাশ করা চলেনা, নকল না-হয় ধরিয়া লইলাম—প্রকাশ, শনিবারের বাবু যখন আসিয়া জুটেন নাই, তখন তিনিই ছিলেন "ইনার সার্কেল্"এর।

প্রকাশ বাবু ইণ্ডিয়া-গবর্ণমেণ্টের "আর্ম্মি" ডিপার্টমেণ্টে কেরাণী—কলিকাতা হইতে বদ্‌লী হইয়া যখন দিল্লী যান, কাচের আলমারীটা, আবলুস কাঠের সো-কেশটা আর অর্গান-টিউন হারমোনিয়মটার সঙ্গে ডলিকে রাখিয়া যান লক্ষ্মীর ঘরে।

আরো দু'তিন মাস আগেকার কথা। বাবুর সহিত ডলি আসে লক্ষ্মীর বাড়ীতে। ওকে দেখিয়া লক্ষ্মীর যতটা না ভাবান্তর ঘটে, তার বেশী ঘটে ওর নাম শুনিয়া। প্রথম দিন বাবু যখন বলেন, ওর নাম ডলি, লক্ষ্মীর বুকের ভেতরটা কাঁপিয়া ওঠে। ডলি! আহা! সেই একটু খানি মেয়ে গো!

ডলি! ডলি! আঃ—

কুকুরটাকে বুকে চাপিয়া ধরে, আদরে ডলি এলাইয়া পড়ে। বাবুকে বলে—ওকে আমায় দেবে?

বাবু বলেন—পাগল! ও আমাদের ছেড়ে থাক্‌তে পারে কখনো?

কুকুরটার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চায়। বাবুর হাত ধরিয়া বলে—একটা কথা রাখবে?

বাবু বলেন—কি কথা? হ্যামিণ্টনের—

ও বলে—না গো না হ্যামিণ্টনের দোকানে নতুন গয়নার বায়না দিতে হবে না। আমি বুঝি সেই আবদারই শুধু করি?

বাবু শুধান—তবে?

বলে—ওকে কাল নিয়ে আস্‌বে তো?

বাবু বলেন—আস্‌বো।

আবার বলে—পরশু?

বাবু বলেন—আস্‌বো

বলে—রোজ নিয়ে আস্‌বে?

বাবু হেসে বলেন—আচ্ছা ফন্দীবাজ তো তুমি লক্ষ্মী! ওকে নিয়ে আসার ছলে আমাকেও রোজ টেনে আন্‌তে চাও?

আহত হইয়া লক্ষ্মী বলে—তা বলিনে। তুমি যেদিন যেদিন আস্‌বে, ওকে নিয়ে তো আস্‌বেই; যেদিন না আস্‌বে—সেদিনও পাঠিয়ে দেবে। কি বল?—

বলেন—অর্থাৎ আমার চেয়েও ওকে দিয়ে তোমার বেশী প্রয়োজন ?

হরবিলাস তো এই কথাটারই পুনরুক্তি করিয়াছিল মাত্র। আরো কতজনে যে এই কথাটাই বলিয়াছে, তার কি হিসাব আছে ? তবে কথাটা প্রথমে লক্ষ্মী কানে তোলে এই। মনে একটু খচ্ করিয়া ওঠে—কিসের যেন কাঁটা বিঁধে।

ওর কালো মুখ বাবু সহিতে পারেন না। আবার বলেন—আচ্ছা, দেব পাঠিয়ে—নিশ্চয় দেব।

এর বেশী লক্ষ্মী আশা করে না। নিজেরটাই সে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই—ওতো পরের।

রোজ যখন বাবুর সঙ্গে আসে, ডলিকে সে খাবার দেয়। আদর করে কত। থাকিয়া থাকিয়া বুকে চাপিয়া ধরে।

অবশেষে একদিন ডলিকে সে আপনার করিয়া পায়।

প্রকাশবাবুর ওপরে অনেকটা নির্ভর করে সে, তাঁর বদলীতে আসন্ন আর্থিক ক্ষতির সান্ত্বনায় দুঃখিত হইবার অবকাশ পর্য্যন্ত পায় না—ডলিকে লইয়া এতই মত্ত।

প্রথম প্রথম ডলি বলিয়া ডাকিতে বুকে তার বেদনার চোরকাঁটা বিদ্ধ হয় ; শেষে আর হয় না।

মানুষ-ডলির স্মৃতিটুকুও কি কুকুর-ডলির মধ্যে তলাইয়া যায় ? অন্তরে বাহিরে ফাঁকী দিয়াই নিজেকে ভরিয়া তোলা যাহাকে বলা হয়, একি তাই ?

তারপর ?

তারপর সে আর একটা মানুষ।

ডলিই তাকে মদ ছাড়ায়। কবে মাতাল হইয়া ডলিকে লাথী মারে, ডলির আর্ত্তনাদেই নেশা টুটিয়া যায়—আর মদ খায় না।

যে-সব পুরাণো বন্ধু মদ খাইতে ভালবাসে, ঠাঁই না পাইয়া তারা ফিরিয়া যায়। শনিবারের বাবু মদ খান না, তাই। নৈলে তাঁকেও হয়তো হারাইত !

আগন্তুকের সংখ্যা কমিয়া আসে।

—সাত—

মকর আসিয়া বলে—বীণাকে তো আর ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারিনে ভাই।

লক্ষ্মী চুপ করিয়া থাকে।

মকর বলে—বছর ঘুরে এল, এক পয়সা সুদের পেল না। বলে, সাম্‌নে চৈত্ সংক্রান্তি, এর মধ্যে সুদের টাকাটা অন্তত দিয়ে দিক্ সব, নইলে জবাব দিক্।

লক্ষ্মীর বুকটা কাঁপিয়া ওঠে—নতুন হার ছড়া ! ছ'মাস সে পরিতে পারে নাই।

মকরকে শুধায়, সংক্রান্তির আর ক'দিন ?

মকর বলে—আজ সতেরোই, আর তের দিন।

লক্ষ্মীর মুখে আঁধারের কালিমা ঘনাইয়া আসে—সতেরো ? আর তো তের দিন বাকী, এরই মধ্যে কি করিয়া সে জোগাড় করিবে ? সুদের টাকা তো কম নয়, কম হইলেও সাতাশ টাকা। মকরকে বলে—তুই-ই বল্ না ভাই, কি করি ?

মকর ভাবিয়া পায় না।

ও বলে—শনিবারের বাবুর টাকাটা ওবেলায় পাব। কিন্তু তা যে মুদিকেই দিতে হবে।

মকর বলে—চক্‌দিঘির বাবুর কাছে একটা চিঠি লিখে দেনা।

বলে—তা কি আর দিইনি। দু'তিন খানা চিঠি দিয়েছি।

মকর শুধায়—জবাব পেলি কিছু ?

উত্তর আসে—দু'খানার তো জবাবই নেই। শেষের-খানির ছোট্ট একটা জবাব পেয়েছি। তাও দু'ছত্র—

মকর আবার প্রশ্ন করে—কি ?

উত্তর দেয়—সময় আর সুযোগ হ'লেই আস্‌বে, এই মাত্র।

মকর বলে—তার মানে—আস্‌বে না। স্পষ্ট জবাব। তা এখন কি কর্‌বি ?

বলে—সো-কেশটাই বেঁচে ফেল্‌বো অর্দ্ধেক দামে দিলেও গোটা ত্রিশেক টাকা হবেই। তা থেকে সুদের টাকাটা তো দিয়ে দেই—

বলিয়া আর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে। সো-কেশটার পানে ফিরিয়া চায়—কত দিনের কত প্রসাধনের, বিকশিত যৌবনের বিজয়াভিসারের সাক্ষী ঐ সো-কেশটা। আঃ—

আর একদিনের কথা—

লক্ষ্মীদের বাড়ীতে সাড়া পড়িয়া যায়, বড় বাজারের এক ভাটিয়া বাবু পাইক পাড়ায় গার্ডেন পার্টি দিবেন ! লক্ষ্মীদের বাড়ীর চারিটী মেয়ের নিমন্ত্রণ—লক্ষ্মীরও।

প্রত্যেকের জন্য নতুন বেনারসী শাড়ী, এক একছড়া সরু হার আর নগদে পঁচিশ টাকা বরাদ্দ। মকর বলে—ওলো, তোর সো-কেশটা এবারে রক্ষা পেল।

লক্ষ্মী খুসী হইয়া বলে—আমার ডলির ভাগ্যি।

আর আর মেয়ে আগে থাকিতে মোটরে উঠিয়া বসে। ডলিকে মাজিয়া ঘষিয়া রূপার ঘুঙুর আর দামী বগ্‌লাস্‌টা গলায় দিয়া লক্ষ্মী ডলিকে লইয়া যায় মোটরে।

বাবুর ড্রাইভার অবোধ্য হিন্দিতে যা বলে, তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে— বিবিজান্ একা গিয়া মোটরে উঠুন, কুকুরকে নেওয়া চলিবে না।

লক্ষ্মী শুধায়—কেন?

ড্রাইভার বলিয়া যায়—বাবুকে একবার কুকুরে কাম্‌ড়াইয়া প্রায় ছ'মাস ভোগাইয়াছিল, সেই জন্য বাবুর কড়া নিষেধ—মেয়েমানুষের সঙ্গে কুকুর কিছুতেই তার বাগান বাড়ীতে ঢুকিতে পারিবে না।

লক্ষ্মীর মুখে উদ্বেগের চিহ্ন দেখা দেয়। মেয়েরা বলে—কুকুরটাকে বাড়ীতেই রেখে আয় না লক্ষ্মী?

হরিমতি মোটর হইতে নামিয়া আসে—ডলির গলা ধরিয়া আদর করিয়া বলে—লক্ষ্মী ডলি, তুমি আজ ঘরে থাক। তোমার মা বেড়িয়ে আসুক একটু।

লক্ষ্মীর হাত হইতে শিকলটা ছিনাইয়া লয়। লক্ষ্মী দুয়ার খুলিয়া দেয়, হরিমতি জানালার শিকের সঙ্গে শিকলটা বাঁধিয়া দেয়। বলে—চল্ মকর।

লক্ষ্মীকে ঠেলিয়া আনিয়াই মোটরে উঠায়। ড্রাইভার তখন হাঁটু গড়িয়া মাটীতে বসিয়া পাম্প্ দিতেছে, বলে—এই তো ভালো বিবিজান, কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়ে কি হবে?

লক্ষ্মী একপাশে চুপ্ করিয়া বসে—

ঘরের মধ্যে হইতে ডলির কান্না শুনা যায়। দারুণ আর্ত্তনাদ—

একটী মেয়ে বলে—আঃ ডলি কী কান্নাটাই না

আর একটী মেয়ে বলে—কেঁদে কেঁদে যে ম'লো।

ড্রাইভার তখন ষ্টার্ট দেয় কেবল। লক্ষ্মী বলে—থামাও।

মেয়েরা চমকিয়া ওঠে। হরিমতি বলে—কেন?

ও বলে—আমি নেমে যাব।

সকলকে বিস্ময়ের চরমে তুলিয়া দিয়া ও নামিয়া আসে। ঘরের দরজা খুলিয়া ডলিকে গিয়া জড়াইয়া ধরে।

ডলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া শান্ত হয়।

সে রাত্রে আর খাওয়া-দাওয়া হয় না, মায়েরও না—, ছেলেরও না।

—আট—

পরদিন সকাল আটটা আন্দাজ।

লক্ষ্মীর মহাজন বীণাই আসে ফার্ণিচারওয়ালাকে লইয়া। দুইটা কুলী সো-কেশটা ধরিয়া ঘরের বাহির করে। সো-কেশ সহ কুলীরা যখন সদরের ফটক পার হইয়া নীচে নামিবার উদ্যোগ করে, বাধা পায় তারা—সাম্‌নেই ভাটিয়া বাবুর মোটর আসিয়া দাঁড়ায়।

মোটর হইতে নামে হরিমতি এবং আর আর মেয়েরা। প্রত্যেকের পরণে নতুন বেনারসী, গলায় সরু সোনার হার—কেহ ভাঁজ করিয়া গলায় দিয়াছে, কেহ বা সখ করিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া রাখিয়াছে।

হরিমতি সরাসর লক্ষ্মীর ঘরে ঢোকে। ডাকে—মকর!

লক্ষ্মী চুপ করিয়া বসিয়া—চোখ দু'টী তার জবা ফুলের মতো লাল। যেখানে সো-কেশটা ছিল, সেই খালি জায়গাটীরই পানে চাহিয়া সে।

মকরের পানে ফিরিয়া চায়—চোখের আগে ঝল্‌সাইয়া ওঠে নতুন বেনারসী আর সরু হার ছড়াটা।

মকর আবার ডাকে—লক্ষ্মী!

ও উঠিয়া দাঁড়ায়। মকরের কাঁধে হাত রাখিয়া বলে—নতুন শাড়ী আর নতুন হার দেখাতে এসেছিস্ বুঝি ভাই?

হরিমতি হা করিয়া চাহিয়া থাকে। ও আবার বলে—বেশ ভাই, বেশ। ভারী সুন্দর মানিয়েছে তোকে। কিন্তু তা বলে দেমাকে মাটীতে পা ফেল্‌তে পারিস্ যেন।

হরিমতি আহত হইয়া চলিয়া যায়।

সারাদিন আনমনা বসিয়া ভাবে।

রাত্রে দু'তিনজন লোককে ফিরাইয়া দেয়।

—নয়—

গ্রীষ্ম যায়, বর্ষা আসে।

বারনারীদের সব চেয়ে দুঃসময় নাকি এইটেই।

বাইরে জলের ঝাপ্‌টা পড়ে, ডলিকে এক দণ্ড বাইরে

রাখিতে পারে না—দিন-রাত থাকে সে ঘরেই। মেঘের ডাকে ডলি চম্‌কাইয়া ওঠে—বিদ্যুতের ঝলকে লাফালাফি করে। এ কীরকম মেজাজ তার!

একে বাদ্‌লার লোকে পথে বাহির হয় না, গলিতে সাঁঝের যাতায়াত নাই বলিলেই চলে। তার ওপর ডলির উৎপাৎ। সাথে সাথে লক্ষ্মীও যেন ক্ষেপিয়া যায়।

দু'দিন অপেক্ষার পরে একটী অতিথ্ জুটিয়া যায়। ভদ্রলোক ডলির চীৎকারে অতিষ্ঠ। লক্ষ্মীকে বলেন—ওকে বাইরে রেখে এস।

লক্ষ্মী বলে—বিষ্টিতে যাবে কোথায়?

লোকটী বলেন—কিন্তু অমন বিদিকিচ্ছি চীৎকারও সইতে পরি নে বাবু।

শেষে বাবুটীই উঠিয়া যান—

দুয়ারের কাছে গিয়া লক্ষ্মী তাঁর হাতখানি ধরে—টাকা?

ঝনাৎ করিয়া একটা টাকা ফেলিয়া দিয়া বাবুটী চলিয়া যান। লোকটাকে এক রকম সেই তাড়াইয়া দিল, এক টাকার বেশী দাবী করে কি করিয়া?

বাড়ীওয়ালী আসে ভাড়ার টাকার তাগাদায়। দু'মাসের ভাড়া জমিয়াছে—একত্রে বত্রিশ টাকা কি করিয়া দেয়! তাহা ছাড়া ইলেক্‌ট্রিক চার্জও দু'মাসে পাঁচ টাকা—সাঁইত্রিশ। বাড়ীওয়ালী গালাগালি করে; শেষে বলে—ভাড়ার টাকা দেওয়া সামর্থ্য যার নেই, সে আবার হাতে তাগা পরে কেন?

হাড় হুড়াটা জন্মের শোধ গিয়াছে, তাগা জোড়ার ওপরে বাড়ীওয়ালীর বড় সাধ। হয়তো হাত হইতে খুলিয়া উহাকেই দিতে হইবে। ভাবিয়া আঁত্‌কাইয়া ওঠে। বলে—আর দু'চারদিন দেখ, শেষ আদায়ের উপায় তো আছেই।

ডলির জন্য আর মাংস কেনা হয় না, গয়লাকেও জবাব দেওয়া হয়—ডলি খালি ভাত বা ডাল-ভাত খাইতে পারে না—প্রায় উপোসী থাকে—

সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীও। ছেলেকে না খাওয়াইয়া মা কি খাইতে পারে? একি রাক্ষসী—পেটে পুরিলেই হইল?

শরীরটা শুকাইয়া কাঠ। পাণ্ডুর মুখে পাউডার ঘসিতে বসে—আয়নায় নিজের মুখ দেখিয়া শিহরিয়া ওঠে—নিজেকে নিজে চিনিতে পারে না যেন।

শনিবার রাত্রে আসিয়া বাড়ীওয়ালী টাকা চায়—লক্ষ্মী জানে না, তার মকরের শিক্ষা এ।

নিজের দৈন্যের কথা এমন করিয়া পালার বাবুর কাছে প্রকাশ করিতেও তার বাধে, দরজার কাছে আসিয়া বাড়ীওয়ালীর হাতে তাগা জোড়া খুলিয়া দেয়। আগুনের হল্‌কার মতো দৃষ্টি হানিয়া চাপা গলায় বলে—আর বোকোনা, চুপ কর।

কথাটা বাবুর কানে যায়। হাতের দিকে চাহিয়া বাবু বলেন—তাগা!

সব কথা খুলিয়া বলিতে হয়। বাবুর মুখ গম্ভীর হইয়া ওঠে। ওর অসাক্ষাতে বাবু আসিয়া হরিমতির সহিত পরামর্শ করেন। হরিমতি বলে—কুকুরটাকে না তাড়ালে ও শোধ্‌রাবে না।

বাবু বলেন—কিন্তু তাড়াইবা কি করে মকর?

হরিমতি বলে—আমি একদিন না হয় ছেড়ে দেব, আপনি যদি ধরে নিয়ে যান্।

বাবু সায় দেন। আরো পরামর্শ চলে।

—দশ—

অবশেষে একদিন সত্যই লক্ষ্মী ডলিকে খুঁজিয়া পায় না। দু'দিন দু'রাত যায়, কত খোঁজাখুঁজি—কিছুতেই ডলির সাক্ষাৎ মেলে না।

লক্ষ্মী এ দু'দিন উপোসী, নির্জ্জলা উপোসী—ডলিকে না পাইয়া সে জল-গ্রহণ-করিবেনা, এ তার ধনুর্ভঙ্গ পণ

বাবুর কাছে খবর যায়, বাবু আসেন—খোঁজেন এবং জবাব দেন—পাওয়া গেল না,

সন্ধ্যার সময় একগাল হাসি হাসিয়া বাড়ীওয়ালী তাগা-জোড়া আর দু'মাসের ভাড়ার রসিদ্ দিয়া যায়। ও অবাক্ হইয়া প্রশ্ন করে—টাকা দিলে কে?

জবাব পায়—বাবু।

আঙুল নির্দ্দেশে বাড়ীওয়ালী শনিবারের বাবুকেই দেখায়।

ও বলে—তুমিই টাকা দিয়েছো?

বাবু বলেন—দিয়েছি আমিই।

বলে—অতোগুলো টাকা দিলে, ধার করে বুঝি?

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বাবু বলেন—না লক্ষ্মী, ধার করে দিইনি।

শুধায়—তবে ?

বাবু মুচ্‌কি হাসি হাসেন। বলেন—ধার করে দিয়েছি কি ঘর থেকে এনে দিয়েছি, সে খবরে তোমার কাজ কি লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মী ভাবে কি মনে মনে।

খানিকপরে পান-বিড়ী আর সোডাওয়াটারওয়ালা পরমেশ্বর আসিয়া বলে—মাঈজী, সব টাকা পেয়েছি।

তারপর বাবুর দিকে ফিরিয়া বলে—বাবু যখন আছেন, তখনকি আর টাকার জন্যে ভাবনা করি ?

পরমেশ্বর চলিয়া গেলে লক্ষ্মী বাবুকে শুধায়—ওর পাওনা ছিল সাড়ে সাত টাকা, তাও তুমি দিয়েছো ?

বাবু হাসি গোপন করিয়া বলেন—দিয়েছি।

হরিমতি হাসিয়া হারছড়াটা ছুঁড়িয়া ফেলে ওর গায়। বলে বীণা এসে দিয়ে গেল।

ও বলে—তার মানে ?

হরিমতি বলে—মানে আর কি ? সুদে আসলে সব টাকা বুঝে পেয়েছে সে, হার দেবে না ?

হরিমতি চলিয়া যায়। ও বাবুকে বলে—এটাকাও তাহলে তুমি দিয়েছো ?

বাবু বলেন—দিয়েই যদি থাকি লক্ষ্মী, তাহলে কি অন্যায় করেছি ?

বলে—কিন্তু এত টাকা পেলে কোথায় ?

বাবু কোন জবাব দেন না—পাশ ফিরিয়া শুইয়া থাকেন।

ও ঝড়ের মতো বাহির হইয়া যায়। হরিমতি তখন নিজের ঘরে মেয়েদের শুধায়—তোরা কিছু জানিস্ ?

একটী মেয়ে হরিমতির নামে জ্বলিয়া উঠে, বলে—কি জানি ভাই! তবে দেখছি তো ক'দিন ধরে হরিমতির সঙ্গে ফিসির ফিসির করে কি বলছেন।

হরিমতির ঘরের দরজা ঠেলিয়া তীক্ষ্নস্বরে ডাকে—মকর!

এমনি শক্ত করিয়া ধরে যে হরিমতি কথাটা অস্বীকার করিতে পারেনা।

ঘরে ফিরিয়া বাবুকে বলে—বাবু!

বাবু বলেন—কেন ?

বলে—আমার ভলিকে বেচে আমার সাহায্য করছো ? এমন সাহায্য তোমার কাছে কখ্‌খনো চাইনি তো।

বাবু বলিতে যান—লক্ষ্মী, চুপ কর, কথাটা শোন—

কিন্তু কোন কথাই আর শুনিতে চায় না। বলে—কোন কথা শুনতে চাইনে আমি আমার ছেলেকে পর করে দিয়ে আমাকে হাতে রাখবার চেষ্টা! তা নইলে; হবে কেন ?—বলিয়া দু'একটা অশ্রাব্য কথাই বলিয়া ফেলে। বাবু কানে আঙুল দেন।

আবার বলে—কারু সাহায্য চাই নে আমি, তোমরা কেউ এসো না আর।

বাবু হাসিতে হাসিতে বলেন— আর না-হয় আস্‌বো না কিন্তু আজকে ?

বলে—আজ কি ? একটা দিনও থাক্‌তে পার্‌বেনা আমার ঘরে, এক দণ্ডও না—যাও বেরোও—

বাবু বলেন—মদ না খেয়ে—

বলে—মদ না খেয়ে এমন মাতাল কেউ হয়, এ তোমার অজানা ? বেশ তাই হয়েছি আমি। নেশা যদি মনে কর তবে তাই। কিন্তু আমার এ নেশা আজ বাদে কাল ভাঙ্‌বে বলে যদি আশা কর তবে ভুল। আমার ছেলেকে যে বিক্রী করে, তাকে আমি কোনো কালেই আমার ঘরে ঠাঁই দো'বো না। যাও বেরিয়ে যাও।—

একটু থামিয়া আবার বলে—যাও। নইলে পুলিশ ডাক্‌বো।

লক্ষ্মী যদি মদের ঝুকিতে এ ধরণের কথা কহিত বাবু অবশ্যই তা গায়ে মাখেন না। কিন্তু সজ্ঞানে দৃঢ়স্বরে যখন এ আদেশ করে—বিশেষতঃ রাগের মাথায় পুলিশ ডাকিলে কেলেঙ্কারী কোথায় গিয়া দাঁড়ায় তার তো ঠিক নেই, তাই বাবু উঠিয়াই পড়েন

সদর হইতে নামিলে লক্ষ্মী শুধায়—কার কাছে বেচেছো ? সেই পার্শী সাহেবের কাছে ?

একটীমাত্র কথা শোনা যায়—হ্যাঁ।

খালি ঘরে বসিয়া সেই অর্দ্ধশিক্ষিত মেয়েটী যা ভাবে, শুদ্ধ ভাষায় গুছাইয়া বলিলে তা দাঁড়ায় এই—

আর নয়! আর নয়! পতিতা গৃহের বিষাক্ত বাতাস যেভাবে আমার প্রতি মুহূর্ত্তের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে, তাহাতে আর এখানে তিলার্দ্ধও অপেক্ষা

করিতে পারি না। যেখানে ছেলের ওপর মায়ের আর মায়ের ওপর ছেলের আকর্ষণ অপরাধ বলিয়া গণ্য, নির্ম্মম নৃশংস রাক্ষস-রাক্ষসীদের বিদ্রূপ ও টিটকারীর বিষয়, সেখানে মন টিঁকাইয়া থাকিতে আর যেই পারুক, আমি পারিব না। আমার কোল হইতে আমার ছেলেকে কাড়িয়া লইয়া তুচ্ছ অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করিবার স্পর্দ্ধা পর্য্যন্ত যাহারা রাখে, তাহাদের মন জোগাইয়া চলিতে, তাহাদের তৃপ্তির জন্য নিজেকে সু-সজ্জিত করিয়া, নিজের রূপ-যৌবন উন্মুখ ও অনাবৃত করিয়া রাখিতে আমি পারিব না—পারিব না—পারিব না।

—দশ—

পরদিন সকালে উঠিয়াই লক্ষ্মী পরমেশ্বরকে দিয়া ফার্ণিচারওয়ালাকে ডাকে। ডাকিয়া বলে—এই ঘরের খাট, আলমারী, বিছানা-পত্র, আলনা, ছবি—মায় পেতল ও রূপার বাসনগুলোর জন্যে কত দেবেন আপনি?

ফার্ণিচারওয়ালা কোন কথা না বলিতেই ঘরের মধ্যে ঢুকিল হরিমতি। সে বলে—আপনি সত্যই এসবের দর কর্‌বেন না দাশুবাবু, ও পাগল হয়েছে।

জিনিষগুলি দেখিয়া দেখিয়া দাশুবাবু লুব্ধ হইয়া উঠেন। হরিমতির কথায় বিদ্রূপের ভঙ্গীতে তিনি বলেন—তাই তো ভাবি, এত বৈরাগ্য এল কবে!

শুনিয়া ও আরো জ্বলিয়া ওঠে। বলে—না দাশুবাবু, আমি পাগল হইনি। সত্যই আমি সব বিক্রী কর্‌বো। আপনি কত দিতে পার্‌বেন বলুন?

দাশুবাবু ছুঁতা-নাতা না করিয়া সময় কাটাইয়া দেন। হরিমতি ঘরের বাহিরে গেলে চুপি চুপি বলেন—জিনিষ-গুলো পুরাণো, আলাদা আলাদা করে দর কর্‌লে হয় তো কমই পড়্‌বে। তা তোমার টাকার দরকার, আড়াইশো টাকাই না-হয় নিও।

ও উৎফুল্ল হয়—ডলির দর কি আর আড়াইশো টাকার বেশী হইয়াছে? সকল জিনিষের তালিকা লিখিয়া তার নীচে লক্ষ্মীর নাম সই করিয়া লইয়া দাশুবাবু আড়াইশো টাকার নোট তার হাতে গুঁজিয়া দেন।

লক্ষ্মী বাড়ীর বাহির হইয়া পড়ে—এক বস্ত্রে। বড় রাস্তায় পড়িতেই গয়নার দোকান। হার, তাগা, রুলী, আংটী এবং অল্প-স্বল্প আর যা গয়না ছিল, একত্র করিয়া দোকানদারের হাতে তুলিয়া দেয়। বলে—এই গয়না নিয়ে কত টাকা দিতে পার্‌বে?

দোকানী গয়নাগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলে—শ' চারেক।

আচ্ছা, তাই দাও—বলিয়া টাকা লইয়া লক্ষ্মী আগাইয়া যায়। নেবুতলার মোড়ের ওপাশে সেই পার্শীর বাড়ী—যে একদিন ছ'শো টাকা দিয়া ডলিকে কিনিতে চাহিয়া-ছিল। সাহেব বাড়ীতেই ছিলেন, লক্ষ্মী গিয়া বলে—আমার কুকুরটা ফিরিয়ে দিন।

সাহেব বলেন—ফিরিয়ে দেব, সেকি? ওটাকে কত টাকা দিয়ে কিনেছি তা জান?

সাড়ে ছ'শো টাকার নোট সাহেবের সুমুখে ছড়াইয়া ধরিয়া লক্ষ্মী বলে—এর বেশী দিয়ে নিশ্চয় নয়। এগুলো সব নাও, আমার ছেলেকে দাও।

সাহেবের মেয়ে ডলিকে আনিয়া দেয়, ডলি লক্ষ্মীকে পাইয়া হাতে হাতে স্বর্গ পায় যেন—লক্ষ্মীই কি তার কম? নোটগুলি ড্রয়ারে ভরিয়া সাহেব চাহিয়া দেখেন—মায়ে ছেলেতে মনের আনন্দে রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। কি ভাবিয়া মেয়েকে দিয়া সাহেব একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট পাঠাইয়া দেন।

লক্ষ্মী ছল ছল চোখে বলে—ও নোট আমি নিতে পার্‌বো না। যেখান থেকে এসেছি, সেখানকার কোনো স্মৃতিই আর রাখ্‌বো না। মায়ে-বেটায় নতুন করে সংসার পাত্‌বো।

ডলিকে আদর করিয়া বলে—কি বলিস্ ডলি, পার্‌বিনে আমার সঙ্গে কষ্ট করে থাক্‌তে?

নারীর পুরস্কার

—গল্প—

ডাক্তার শ্রীঅমূল্যধন ঘোষ

আমার নাম সুধাহাসিনী। শুনিয়াছি নামের সঙ্গে মানুষটার অনেক সময়ে অনেক মিল থাকে। আমার ভাগ্যে কিন্তু তাহার কিছুই হয় নাই। চিরজীবনটা যাহাকে কাঁদিয়া কাটাইতে হইবে, তাহার নামকরণের সময় ভগবান আমার পিতার মনে এমন বিপরীত নামটা কেন যে জোগাইয়া দিয়াছিলেন তাহা আজও বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমার দুরদৃষ্টের উপর করুণাময় বিধাতারও কি নিষ্ঠুর পরিহাস ছিল?

চিরকাল ধরিয়া এই প্রবাদবাক্য শুনিয়া আসিতেছি, "দুঃখের কপালে সুখ নেই।" আমারও দুঃখের কপালে সুখ হইল না। অথচ এই দুঃখের কপালটাকে পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিবার জন্য আমি নিজে যথেষ্ট চেষ্টাই করিয়াছি। অদৃষ্টের সঙ্গে পুরুষকারের নিত্য যে লড়াই হইয়া থাকে তাহা কেবল পুরুষেরই জীবনে ঘটে। নারী নিজের অদৃষ্ট নিজে গড়িয়া তুলিতে পারে না, সারাজীবন পরের অদৃষ্টের উপরই তাহাদের নির্ভর করিয়া চলিতে হয়। আমি তবুও নিজের অদৃষ্ট গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে ছাড়ি নাই।

সে সকল কথা পরে বলিব,—এখন আগের কথা আগে বলি। যখন একঘর ছেলেমেয়ে হারাইবার পর, বৃদ্ধ বয়সে, সন্তান লাভের বয়স প্রায় অতিক্রম করিয়া, আমার পিতামাতা আমায় লাভ করিলেন, তখন বড় আদরে আমার নাম রাখিলেন,—সুধাহাসিনী। তারপর আমার ছয়মাসমাত্র বয়সে আমার বাপ মা দুজনেই এক দিনে কলেরা রোগে মারা গেলে, জগতে আমার আপনার লোক রহিলেন, শুধু হারা মরার অবশিষ্ট, বড় দাদা।

বড়দাদার বয়স তখন একুশ বৎসর মাত্র। হারা-মরার ধন বলিয়া বাবা তাঁহাকে লেখা পড়া সেখান নাই। সঙ্গতিহীন কায়স্থ ঘরের মূর্খছেলে দাদা আমার, পিতৃহীন হইয়া দারুণ কষ্টে পড়িলেন বটে, কিন্তু তাহার কষ্ট বাড়াইবার মূল কারণ হইলাম, আমি। তখনও দাদার বিবাহ হয় নাই। পিতামাতা তাহাকে আদর করিয়া মূর্খ করিয়া রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সকাল সকাল বিবাহ দিয়া আরও বেশী আদর দেখাইয়া যান নাই। কিন্তু বাপ-মা মরিতে না মরিতেই আমারই জন্য দাদাকে বিবাহ করিতে হইল। গরীব বাবা দাদার জন্য যদিও কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, তবুও একা দাদা যে কোনও উপায়ে সহজেই নিজেকে চালাইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু, আমাকে মানুষ করিবার জন্য পাঁচজনের পরামর্শে দায়ে পড়িয়া দাদাকে বিবাহ করিতে হইল। গ্রামেরই একজন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তি দাদাকে তাহার অধীনে সামান্য বেতনে একটা চাকুরি দিয়া তাহার বাড়ীর পাচিকার একমাত্র অরক্ষণীয়া কন্যার সঙ্গে দাদার বিবাহ দিয়া, একদিকে আমার বাঁচিবার ও অপরদিকে অসহায়া বিধবার কন্যাদায় উদ্ধারের উপায় করিয়া দিলেন।

জগতের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে দাদার লক্ষ্মীভাগ্যের অভাবে ষষ্ঠভাগ্যটা খুব প্রবল হইয়া উঠিল। এদিকে আমিও বড় হইয়া উঠিলাম। আমার বিবাহের চেষ্টা চলিতে লাগিল। একটু ভালঘরে বিবাহ না দিলে চিরকালই আমায় টানিয়া বেড়াইতে হইবে, এই আশঙ্কা করিয়াই দাদা অনেক সন্ধানের পর অতিকষ্টে বেশ ভাল ঘরে আমায় পার করিলেন।

কপালগুণে দুই বৎসরের মধ্যেই আমি বিধবা হইলাম। শ্বশুরের তখনও পাঁচ ছেলে বর্ত্তমান। শাশুড়ী অল্পকালের মধ্যেই শোক ঝাড়িয়া ফেলিয়া ছেলে কয়টীর উপায় করিবার জন্য বিষয়ের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। আমি শ্বশুরের বিষয় লাভে বঞ্চিত হইলাম।

কিন্তু, স্বামী হারাইয়াও যেমন, বিষয় হারাইয়াও তেমনই, কোনওটাতেই আমার বিশেষ দুঃখবোধ হইল না। আমি বেশ স্বচ্ছন্দমনে দাদার কাছে ফিরিয়া আসিলাম।

আমার বুদ্ধিহীনতার এবং হৃদয়হীনতার কথা শুনিয়া

কেহ যেন আশ্চর্য্য হইও না। স্বামীগৃহের কতটুকু আমার ছিল? স্বামীপ্রেমের কতটুকু আমি পাইয়াছিলাম, একটা মস্ত গৃহস্থালী আমার হাড়ভাঙা খাটুনির অপেক্ষায় বে-বন্দোবস্ত হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। সে বাড়ীতে একমাত্র স্ত্রীলোক ছিলেন, আমার শাশুড়ী। আমাকে বধূর ক'নে লইয়া গিয়াই তিনি আমার ঘাড়ে সমস্ত ভার চাপাইয়া দিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন! তাঁহারই বা দোষ দিব কি! তিনিও নয় বৎসর বয়সে সেই যে আসিয়া সেখানে ঢুকিয়াছিলেন, সেই অবধি একটা মুহূর্ত্তের জন্য রোগে শোকেও তাঁহার খাটুনির বিরাম ছিল না। ত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার গালের হাড়গুলি এমন উঁচু হইয়াছিল যে সহসা তাঁহাকে তেষট্টি বৎসরের বুলিয়া মনে হইত। আমি তবু সেখানে গিয়া পেটভরা অন্নের সংস্থান দেখিতে পাইয়াছিলাম;—শুনিয়াছি তিনি যখন আসিয়াছিলেন, তখন অর্দ্ধেক দিন তাঁহাকে উপবাসে কাটাইতে হইত। আমার দেহে তবু শীত বর্ষা ছেঁড়া নেকড়ার উপর দিয়া কাটে নাই! কাজেই আমাকে পাইয়া তাঁহার একেবারে হাত পা ছাড়িয়া দেওয়ার অপরাধ কি?

যাহা হউক স্বামীগৃহে আমার এই অধিকার ছিল! স্বামীপ্রেমে আমার অধিকারের দাবি যে কতটুকু, তাহা আমি সে বয়সে ঠিক জানিতাম না। তবে যেটুকু পাইয়াছিলাম, তাহা কেবল মাঝে মাঝে আমার কাজের খুঁত ধরিয়া নেপথ্যে তিরস্কার ও মায়ের কাছে অভিযোগ!

এরূপ স্থলে শ্বশুরবাড়ীর সৌভাগ্য হারাইয়া দুঃখিত না হওয়া কি এতই অস্বাভাবিক?

দাদার নিজের অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি ভাল ঘরে আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু, সে ভাল ঘরে আমার ছিল কি? দিন রাত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া, ধান ভানিয়া, দাল কাঁড়িয়া, জনমজুরের জন্য পর্য্যন্ত কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত তরকারি রাঁধিয়া,—সামান্য মোটা ভাত মোটা কাপড়ের সংস্থান! আরাম উপভোগের জিনিস সেখানে কিছুই ছিল না। আমার শ্বশুরবাড়ীর সকলে যখন গর্ব্ব করিতেন যে, পরের চাকুরি না করিয়া, পরের দোরে না গিয়া, তাঁহাদের রাজার হালে চলিয়া যায়,—তখন আমার গা জ্বালা করিত। পুরুষরা চাষের কাজে হাড় মাটি করিবে, আর স্ত্রীলোকেরা ঘরের কাজে গতর জল করিবে,—অতটা পরিশ্রমের দাম কি শুধু পেটের জন্য কয়টি অন্ন ও বৎসরে এক জোড়া কাপড়? অতটুকু পাইবার জন্য কতটুকু পরিশ্রমের দরকার হয়?

পরিশ্রমে আমি কখনও কাতর ছিলাম না। দাদার ঘরেও অনেক পরিশ্রম করিতাম, পরের ঘরে অতটা পরিশ্রম করিলে যে আমি অতি সহজেই অনেক বেশী উপার্জ্জন করিতে পারি, এ বিশ্বাস আমার খুবই ছিল। তবে দাদার ঘরে আমার খুব একটা স্নেহের বন্ধন ছিল, তাই সেখানে আমার খাটুনির পরিমাণ হিসাবে দাম পাইবার কথা আমার মনে হইত না। কিন্তু, স্বামীগৃহে আমার কোনও আকর্ষণ না থাকায় আমার উৎকট পরিশ্রমের পরিমাণানুযায়ী কিছুই পাইতাম না বলিয়া হতাশায় বড়ই ম্রিয়মানা হইয়া থাকিতাম।

বিধবা হইবার কিছুকাল পরে একদিন নিজেই চেষ্টা করিয়া আসিয়া দাদার কাছে হাজির হইলাম। শাশুড়ী বিশেষ কোনও আপত্তি করিলেন না। আমার স্বামীই ছিল তাহার বড় ছেলে। সে মারা যাওয়াতে মেজর বিবাহের জন্য একটু তাড়াতাড়ি আয়োজন হইতেছিল। শীঘ্রই সংসারে আর একটি খাটিবার লোক পাইবার আশায় বোধ করি, শাশুড়ী আমায় রাখিবার জন্য বেশী টানাটানি করিলেন না।

দাদা আমায় দেখিয়া একেবারে বসিয়া পড়িলেন। খানিকক্ষণ গালে হাত দিয়া চুপ করিয়া থাকিবার পর যেন দারুণ দুঃখে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বলিলেন, 'জানিস্ ত' সুধা, আমার অবস্থা—ভাব্‌ছি—"

আমি তাড়াতাড়ি উৎসাহের সহিত উত্তর দিলাম "কোনও ভাবনা নেই, দাদা তোমার। আমি নিজের পেটের ভাত নিজে যোগাড় ক'রে নিতে পারবো। আমি চরকায় সুতো কেটে আমার খরচ খুব চালিয়ে নিতে পার্ব্বো।"

কথাটা, বোধ হয়, দাদার তেমন যুক্তিযুক্ত মনে হইল না, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন! আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন চরকার ততটা প্রচলন ছিল না। তখন গান্ধী মহাত্মার দিন আসে নাই, সবে সুরেন্দ্রবাবুর দিন সুরু হইয়াছিল। তখনও কেহই লজ্জা নিবারণের উপায় ভাবিয়া চরকা ধরে নাই—তখন শুধু আমাদের জিনিস

বলিয়াই যেন কেহ কেহ অতি অকিঞ্চিৎকর বুঝিয়াও চরকার আদর করিতেছিল। কিন্তু, আমাদের মত অবস্থার লোক সেরূপ আদর করিতে পারিত না। যাহারা দেশের অতীত গৌরবের কথা লইয়া কবিত্ব হিসাবে বড় বড় কথা কহিতে পারে, তাহারাই শুধু ওরূপ জিনিসের আদর করিতে পারে। দাদা বুঝিতেন যে উহাতে পেট ভরিবে না। তাই তিনি আমার উপর উৎসাহপূর্ণ আশ্বাসবাক্যে খুসী হইতে পারেন নাই। আমি, কিন্তু প্রাণপণে চরকা চালাইয়া পেট ভরিবার উপায় করিয়া ফেলিলাম।

আমার নিজের ক্ষুদ্র পেটের জন্য যতটুকুর দরকার সময়মত কাটনা কাটিয়া তাহা অতি সহজেই সংগ্রহ হইতে লাগিল। তাহার উপর আরও বেশী করিয়া কাটিয়া আমি কিছু বেশীও উপায় করিতে লাগিলাম। পুকুরের কল্‌মি শাক তুলিয়া, উঠানে তরি তরকারির গাছ পালা দিয়া ঘরে একটা গরু পুষিয়া সংসারের কিছু খরচও বাঁচাইতে লাগিলাম।

দাদা সংসারের খবর কিছুই রাখিতেন না। যাহা কিছু রোজগার করিতেন, সমস্তই বৌদিদির হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। তাঁহার যাহা আয় তাহাতে অতিকষ্টে তাঁহার সংসার চলিয়া যাইতেছিল, ইহাই তিনি জানিতেন। আমি আসিয়া ভার বাড়াইলে নিশ্চয়ই তাহার দেনা হইয়া পড়িবে এই ভয়েই তিনি অস্থির হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে কোনও দেনার সংবাদ তাঁহার কানে উঠিল না,—তখন আবার নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। কিসে যে কি হইতেছে, তাহার কিছুই খোঁজ রাখিলেন না।

বৌদিদি আমার মায়ের মত ছিলেন। তিনি যখন তখনই বলিতেন, সুধা অত খাটিস্‌নে—ভগবান আমাদের অবিশ্যি চালিয়ে দেবেন। অত খাটলে মারা যাবি—'

মারা যাইবার ভয়েতে আমার ঘুম হইতেছিল না! আমি মনে মনে ভাবিতাম, আমি মরিলেই বা কাহার কি ক্ষতি? কিন্তু, যতই খাটি, যতহ কষ্ট পাই, আর যতই যাহা মনে করি, ইহাও আমার মনে হইত যে, আর কাহারও জন্য না হউক, দাদার ছেলে মেয়েদের জন্য আমার বাঁচিবার ও আরও পরিশ্রম করিবার আবশ্যক আছে। সারাদিন পরিশ্রমের পর একএকদিন রাত্রি' জাগিয়া পাট কাটিয়া হয়ত তাহাদের জন্য সামান্য গোটাকতক মুড়্‌কি কিনিয়া দিতে পারিতাম,—তাহাই পাইয়া তাহারা যেরূপ আমোদ করিত, তাহাতে আমার বুকের মধ্যে তাহাদের জন্য দারুণ অভাব বোধ হইত। মনে হইত, যদি কোনও উপায়ে তাহাদের নিত্য ভাল ভাল খাবার জিনিস কিনিয়া দিতে পারিতাম! জগতে তাহারাই ত' আমার যা' কিছু! পরিশ্রমে আমার কষ্ট বোধ হওয়া দূরে থাকুক তাহাদের মুখের পানে চাহিলেই আমার মনে হইত আরও আমি পরিশ্রম করিতে পারিতাম।

গরীবের ঘরের বিধবা মেয়ে আমি, দাদার ঘাড়ে বোঝা হইয়া যে পরিশ্রম করিতাম তাহাতে লোকের কাছে আমার কিছু বাহাদুরী ছিল না। আমারও পরিশ্রম যখন আমার অভাব সম্পূর্ণ মোচন করিতে পারিত না, তখন আমিও সেরূপ বাহাদুরী পাইবার প্রত্যাশা করিতাম না। কিন্তু একদিন গিরীন্‌দা আসিয়া আমার সুখ্যাতি গাহিয়া আর বাঁচে না!

গিরীন দা' আমাদেরই গ্রামের ছেলে। কয়েক বৎসর হইল তাহারা কলিকাতায় গিয়া বাস করিয়া আছেন। এখন দেশ-ঘর বড় মাড়ায় না। গিরীন্‌-দা এবার বি-এ পরীক্ষা দিয়া বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন। আমি ছোট বেলায় তাহার সহিত কত খেলা করিয়াছি। কিন্তু, সেদিন আমার ষোল বৎসর বয়সের কোথাকার প্রচ্ছন্ন লজ্জা হঠাৎ বয়ঃপ্রাপ্ত গিরীন-দা'র সম্মুখে কিছুতেই আমায় অগ্রসর হইতে দিল না। আমি নিজের ঘরের ভিতর লুকাইয়া বসিয়া রহিলাম। অথচ গিরীন্‌-দা' কেমন সহজে নিঃসঙ্কোচে আমার সঙ্গে কথা কহিয়া আমার সে লজ্জা ঘুচাইয়া দিলেন! বৌদিদির কাছে আমাদের সংসারের সুখ দুঃখের পরিচয় লইতে লইতে আমার সম্বন্ধে সমস্ত পরিচয় পাইয়া তিনি মড় মড় করিয়া আমার ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কইরে, সুধা, তোর চরকা কাটা দেখি।"

অগত্যা দেখাইতেই হইল। তিনি দেখিয়া বৌদিকে বলিলেন, 'বাঃ সুধা ত অল্পবয়সে শিল্পকলা বেশ শিখিয়াছে!'

ওমা কে জানিত যে ইহারই নাম আবার শিল্পকলা!

আমি পেটের দায়ে গরু চরাই, ঘুঁটে দিই, 'কাটনা কাটি,' 'বেটে কাটি',—শিল্পকলার কি ধার ধারি? এখন জানিলাম যে ইহার মধ্যেও শিল্পকলা থাকিতে পারে। শুধু তাই নহে,—তাহাতে আমার আমার নৈপুণ্যও নাকি জন্মিয়াছে!

কিন্তু, এই জানাই আমার কাল হইল। এতদিন গোবর মাখিয়া, কাদা ঘাঁটিয়া, রাত্রি জাগিয়া চরকা ঘুরাইয়া, দাদার সংসারে দিনরাত্রি খাটিয়া, অবসাদ আসিলে প্রায়ই যে মনে করিতাম, পৃথিবীতে আমার বাঁচিয়া কোনও ফল নাই,—আজ গিরীনদা'র মুখের প্রশংসাটুকুতে সে চিন্তা ফিরিয়া দাঁড়াইল। ভাবিতে লাগিলাম, আরও বাঁচিয়া আরও ভাল করিয়া আরও সব শিল্পকলা অভ্যাস করি না কেন?

সে অবধি গিরিন্‌দা প্রায়ই আমাদের বাড়ী আসিয়া শুনাইতে লাগিলেন যে আরও অনেক প্রকার শিল্পবিদ্যা আছে যাহা শিখিয়া কলিকাতায় অনেক স্ত্রীলোকে খুব সহজে স্বাধীনভাবে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বেশ সুখ ভোগ করিতেছে! কথাটা শুনিয়া শুনিয়া সেই সব বিদ্যা শিখিবার জন্য আমার লোভ জন্মিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম, আমার দুঃখের কপালে আমি নিজের কোনও সুখের প্রত্যাশা না করিলেও চেষ্টা করিলে ছেলেমেয়ে কয়টাকেও সুখে রাখিতে পারি।

কিছুদিন পরে কলিকাতায় যাইবার সময়, গিরীন্‌দা' আমার তৈরী সূতা খানিকটা চাহিয়া লইয়া গেলেন! তারপর আবার দেশে ফিরিয়া আসিয়া আমায় বলিলেন যে, তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হয় যে আমি নিজে হাতে তাঁহাকে বেশ সরু সূতা কাটিয়া দিই, তিনি তাহার কাপড় তৈরী করাইয়া পরিয়া পাঁচজনকে দেখান।

আমি পেটের দায়ে সূতা কাটিয়া বেচিতাম, তাহাতে কেমন কাপড় হয়, কে তাহা পরে, এসব কথা একদিনও ভাবিয়া দেখি নাই। আজ গিরীন্‌-দার এই প্রস্তাব শুনিয়া আমার মনে হইল, তবে আমার এই সূতাকাটারও সার্থকতা আছে! আমার তৈরী সূতার নির্ম্মিত কাপড় তাঁহাকে পরিতে দেখিয়া আমি আমার চরকা ঘুরাণো সার্থক বোধ করিতে পাইব!

গিরীন্‌-দার জন্য আমি প্রাণপনে ভাল সরু সূতা কাটিতে লাগিলাম। হায়! আমি মোটা সূতা বেচিয়া মোটা ভাত রোজগার করিতেছিলাম,—সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের মোহে ডুব দিলাম কেন? চরকা বিদ্যা আমার অভাব মোচনের অবলম্বন ছিল, আমি তাহাকে সখের শিল্প-কলা বলিয়া জানিলাম কেন?

শীঘ্রই আমি গিরীন্‌-দাকে একজোড়া কাপড়ের মত সূতা কাটিয়া দিলাম। সূতা দেখিয়া তাঁহার আমোদ দেখে কে? আমায় দাম দিতে আসিতে তাঁহার লজ্জা বোধ হওয়ায় অনেকবার ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বৌ'দির কাছে গেলেন। বৌ'দি কিছুতেই দাম লইতে রাজী হইলেন না। গিরীন্‌-দার একান্ত পীড়াপীড়িতে শেষে বলিয়াদিলেন দাম যদি দিতেই হয় তবে সুধার কাছে দিবেন।

খুব চেষ্টায় গিরীন্‌-দা আমার কাছে একবার দামের কথা তুলিতেই, আমি বলিয়া ফেলিলাম "গিরীন্‌-দা' আপনি কি আমাদের এতই পর মনে করেন?"

গিরীন্‌-দা' লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিলেন। কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার বি-এ পাশ করা বুদ্ধিতে এ উত্তর জোগাইল না, সত্যই ত তুমি আমার পর। তুমি মজুরি করিয়া দিনপাত কর, তোমার একি অন্যায় বদান্যতা!

এসব কিছুই না বলিয়া তিনি শুধু আমার মুখের পানে একবার চুপ করিয়া রহিলেন মাত্র।

ফিরে বারে কলিকাতা হইতে আসিবার সময় তিনি আমার জন্য ভাল একজোড়া সরুপেড়ে মিহি কাপড় কিনিয়া আনিলেন। বিধবা হইলেও তখনও আমি থান পরিতে আরম্ভ করি নাই। পাড়ওয়ালা ধুতি পরিতাম, মাঝে মাঝে সরুপেড়ে শাড়ীও পরিতাম। আবশ্যক হইলে কখনও কখনও বৌদির চওড়াপেড়ে কাপড়ও পরিয়াছি। কিন্তু এই গিরীন্‌-দার দেওয়া এই সরুপেড়ে ধুতি কোনওমতে লজ্জায় পরিলাম না অথচ এই কাপড় পাইয়া আমার এত আমোদ বোধ হইল যে, তাহা আমার প্রদত্ত সূতার মূল্য-স্বরূপ জানিয়াও, আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না।

তারপর হইতে গিরীন্‌-দার পরামর্শমত আমি মিহি সূতাই কাটিতে লাগিলাম। বরাবর আমি মোটা সূতা

কাটিয়াই বেচিয়া আসিতেছিলাম, সরুসূতায় কিরূপ লাভ দাঁড়াইবে জানিতাম না। তবু গিরীন্-দা' যখন বলিলেন যে, তাহা কলিকাতায় তিনি খুব বেশী দরে বিক্রয় করিয়া দিতে পারিবেন তখন তাহাই বিশ্বাস করিলাম। তাঁহার কথায় আমার খুবই বিশ্বাস ছিল। ফলে প্রকৃতই তিনি আমার অসম্ভব লাভ দাঁড় করাইয়া দিলেন। কিন্তু, অত দিয়া কে যে তাহা কেনে, এবং কেন যে কেনে, একদিনও তাহা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতাম না।

অনেকদিন ধরিয়া এইরূপ চলিল। আমার অভাবও ঘুচিল। তারপর একদিন গিরীন্-দা' কলিকাতা হইতে আসিয়া বলিলেন, 'সুধা তোর সূতাগুলো পেয়ে আমার বন্ধুরা বড়ই খুসি হ'য়েছে, সমস্তটা তা'রাই কিনে নিচ্ছে

কাহারা যে গিরীন্-দা'র বন্ধু,—তাঁহারা যে কেমন,—কিছুই আমি জানিতাম না। তবুও তাঁহাদের অপরিচিত মুখে আমার সুখ্যাতির কথা শুনিয়া আমার বড়ই আমোদ হইল। আমি ত' আমার জীবনে কোনও কাজের জন্য কখনও কাহারও কাছে কোনওরূপ সুখ্যাতি পাই নাই! ইদানিং কোনও কাজে গিরীন্দা'র কাছে সুখ্যাতি পাইলেই আমার সকল শ্রম সফল মনে হইত। কর্ম্মময় এই বিশ্ব-জগতের কোনও কাজ যেদিন আমার অস্তিত্বটুকুরও আমি সন্ধান পাই নাই, সেদিন গিরীন্-দার চোখের দ্বারাই আমি আমাকে খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম। আজ সেই গিরীন্-দার বন্ধুদের মুখে আমার সূতার সুখ্যাতির কথা শুনিয়া কি জানি কিসের উৎসাহে আমি সহসা বলিয়া উঠিলাম, 'গিরীন্-দা, আপনি যে আরও সব শিল্পবিদ্যার কথা বলে ছিলেন; সেগুলো কি আমি অভ্যাস করতে পারি না?

গিরীন্-দা'র কৃপায় সূতা বেচিয়াই তখন আমার অভাব বেশ দূর হইয়াছিল, তবুও কেন যে আবার নূতন বিদ্যা শিখিবার সখ হইল, বলিতে পারি না। গিরীন্-দা'র মুখেও ত' ও-কথা সেই গোড়ায় গোড়ায় শুনিয়াছিলাম, ইতিমধ্যে ত' আর একদিনও শুনি নাই। তবে আজ হঠাৎ নূতন করিয়া সে কথা মনে পড়িল কেন? আমার প্রাণের ভিতর কি তবে ও-চিন্তা সেই অবধি নিত্যই লুকাইয়া খেলা করিতেছিল? কই আমিত' সে সন্ধান জানিতাম না।

যাহাহউক, নূতন নূতন বিদ্যাভ্যাসে আমার উৎসাহ দেখিয়া গিরীন্-দা' বড়ই খুসি হইলেন। মহা উল্লাসে স্ফীত হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'এই ত' চাই! এই উৎসাহের অভাবেই ত' আমাদের শিল্পের আজ এতদূর অধঃপতন হইয়াছে!' একটা ইংরাজী পদ মুখে মুখে আবৃত্তি করিতে করিতে বলিলেন, "কত ভাল ভাল ফুল বনে আপনি ফুটে আপনিই শুকিয়ে যাচ্ছে, কেউ তার খোঁজ রাখছে না! আমাদের দেশেও যেসব মেয়ে জন্মায় তা'দের দিয়ে শুধু ভাত রাঁধিয়ে না নিয়ে, যদি তা'দের কিছু কিছু শিল্প-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হ'ত, তা'হলে আজ আমাদের জাতীয় শিল্পের এতদূর অধঃপতন হ'ত না।'

জন্মদুঃখিনী আমি যে আজ চেষ্টা করিলে দেশের বিনষ্ট শিল্পের অন্ততঃ খানিকটা উদ্ধার করিতে পারি, গিরীন্-দা'র হিসাবে যে আমি এত বড়,—একথা মনে করিতে আমারও মনে একটু গর্ব্ব আসিল। আমি উৎসাহের আবেগে মুখরা হইয়া গিরীন্-দা'র কাছে ও-সম্বন্ধে অনেক খোঁজ লইলাম। যে সকল মেয়েরা শিল্পবিদ্যাবলে স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জন করিয়া সুখ ভোগ করিতেছে, তাহারা কেমন, তাহাদের আহার-বিহার কিরূপ, তাহারা একএকজন কত টাকা করিয়া উপার্জ্জন করে—এই সকল বিষয়ে খোঁজ করিয়া আমি যাহা জানিলাম, তাহার আমি হাতে হাতেই গিরীন্-দা'র কাছে আমার মত প্রকাশ করিলাম, তাহারা ত' বেশ! আমাদের মত হাত-পা থাকিতে খোঁড়া হইয়া পরের ঘাড়ের বোঝা হইয়া না থাকিয়া বেশ স্বাধীনভাবে নিজের জোরে, নিজেও সুখে থাকিতে পারে, অপর পাঁচজনকেও সুখে রাখিতে পারে।'

আমার উৎসাহ দেখিয়া গিরীন্-দা আমার দাদাকে সকল কথা জানাইলেন। সে সকল শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে যে আমার কলিকাতায় থাকিবার আবশ্যক হইবে। একথা গিরীন্-দা আমাকেও বলিলেন, দাদাকে জানাইলেন। আগে এমন কথা কেহ আমায় বলিলে, আমি মনে করিতাম যে হয়ত সে আমায় গালি দিতেছে; কিন্তু আজ আমি ইহাতে খুব রাজী হইলাম।

দাদারও কোন আপত্তি হইল না। গিরীন্-দা'র মতেই দাদার মত! তাঁহার উচ্চ-শিক্ষার উপর দাদার একটা

শ্রদ্ধা ছিল। তা'ছাড়া, গিরীন্-দার পিতাকে আমরা জ্যেঠা মহাশয় বলিয়া ডাকিতাম এবং ছেলেবেলায় তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল ও অনেকদূর টানিলে একটু জ্ঞাতিত্বও ছিল। তাঁহারা বড়লোক। কলিকাতায় একটু উন্নত ধরণে বাস করেন,—এই কারণে দেশে সকলে হিংসা করিয়া তাঁহাদের ব্রাহ্ম বলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মেলা-মেশা বন্ধ করিয়াছিল। কেহ কেহ বলিত, সত্যই তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা যাহাই হউক না কেন যখন গিরীন্-দা'র মা পর্য্যন্ত দাদাকে পত্র লিখিয়া আমাকে তাঁহার বাড়ীতে রাখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন দাদা বলিলেন, 'সুধার ত' ছেলেমেয়ে নেই, যে আমাকে এনে তাদের বিয়ে দিতে হ'বে, ওর যদি আখেরের উপায় হয়ত' ও স্বচ্ছন্দে সেখানে যাক্।'

বৌদিদি অনেক আপত্তি করিলেন। কিন্তু দাদার এ বিষয়ে এত উদার হওয়ার একটা কারণ ছিল। তিনি যখন তখন দুঃখ করিয়া বলিতেন যে আমাদের ঘরের মেয়েরা যদি এমন কিছু শিক্ষা পাইত যে দরকার হইলে পরের বাড়ীতে রাঁধুনী বৃত্তি না করিয়াও কিছু রোজগার করিতে পারিত, তাহা হইলে অনেক গরীবের উপায় হইত। গিরীন্-দা'ও এ বিষয়ে দাদার সহিত একমত ছিলেন। তিনি দাদাকে সঙ্গে করিয়া আমায় কলিকাতায় লইয়া গেলেন।

যাইবার সময় বাড়ীর সকলের জন্যই আমার মনটা খারাপ হইয়া গেল। কিন্তু মনকে বুঝাইলাম আমি ত তাহাদেরই সুখের জন্য যাইতেছি। সেখানে গিরীন্-দা'র কাছে থাকিয়া কত ভাল উপদেশ পাইব, দেশের কাজে লাগিতে পাইব, এ আশায় আমার একটু অবসাদও হইতে লাগিল।

গিরীন্-দা'র বাড়ীতে পৌঁছিয়া আমি চোখের উপর অনেক নূতন জিনিস দেখিতে পাইলাম। মাঝে মাঝে আমার অনেক পুরাতন মত বদলাইয়া যাইতে লাগিল। আমরা গরীবের ঘরের মেয়ে,—অভাবের পীড়নে আমাদের এত করিতে হয় যে, সেই খাটুনীর জন্য অনেক সময়ে আমরা মনে করি, এ জীবনে আর দরকার নাই,—অনেক সময়ে মনে করি যে যদি আমাদের ভাল অবস্থা হইত ত' দিনরাত শুইয়া থাকিয়া গল্প করিয়া জীবনটা উপভোগ করিয়া লইতে পারিতাম কিন্তু, গিরীন্-দা'র ছোট বোন সুকুমারীকে দেখিয়া আশ্চর্য্যবোধ করিলাম। এত বড় লোকের মেয়ে সে রাত্রিদিন এতটা পরিশ্রম করে যে তাহা দেখিয়া তাহার উপর আমার একটা শ্রদ্ধা জন্মিল।

সুকু' আমারই সমবয়স্কা ছিল। তখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। আমরা চিরকালই জানি যে বড়লোকের মেয়েরা বাপের বাড়ীতে, বিশেষ বিয়ের আগে, একেবারে নড়িয়া বসে না। কিন্তু, সুকু' রাত্রি জাগিয়া পড়ে, দেশের উন্নতির জন্য মাথা ঘামাইয়া কত প্রবন্ধ লেখে, আবার মহিলা-সভার বক্তৃতা দিবার জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সেগুলি মুখস্থ করে। সারাদিন আলমারি সাজাইয়া কাপড়-চোপড় গোছাইয়া, নিজের বেশবিন্যাস করিয়া, সাবান ও পাউডার মাখিয়া, জুতা পালিস করিয়া, সে সর্ব্বদা একটা-না একটা কাজে এমনই ব্যস্ত থাকে যেন কাহারও কাছে তাহার সারাদিনকার কাজের কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। একটা ছুঁচের, কিম্বা একটা উলের কাজে সে অনেক সময় এমন নিবিষ্ট থাকে যে হয়ত ঘাড়-পিঠ টন্‌টন্ করিতেছে, বাড়া ভাত শুকাইয়া যাইতেছে, ঝি আসিয়া খাইবার জন্য ডাকাডাকি করিতেছে, তবুও কোনও দিকে তাহার ভ্রূক্ষেপই থাকে না।

সখের ব্যসন কাহাকে বলে, তখন তাহা জানিতাম না। সুকুর আদর্শে নিজেকে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রাণে উৎকট আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। সুকুর সঙ্গে ভাব করিয়া, আমি তাহার শেখাবিদ্যা নিজে আয়ত্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সেও আমাকে বেশ যত্ন করিয়া শিখাইতে লাগিল। বোধহয় তাহার প্রতি গিরীন্-দার এইরূপ উপদেশ দেওয়া ছিল। কিন্তু যতই আমি তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া যাইতে চেষ্টা করি না কেন, আমার মনে হইত, আমাদের উভয়ের মাঝখানে কি-একটু যেন ব্যবধান থাকিয়া যাইতেছে। সে ব্যবধানটুকু সে যে ইচ্ছা করিয়া সৃষ্টি করিতেছে, এরূপ সন্দেহ না করিয়া আমি তাহার সঙ্গে সমানভাবে চলিতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু তবুও আমার মনে হইত যে কিছুতেই আমি তাহার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

শীঘ্রই ইহার একটা কারণও আমি বুঝিয়া ফেলিলাম। জ্যেঠাইমা (গিরীন্-দার মা) আমাকে যথেষ্ট যত্ন করিতেন।

সেই পরিমাণে ভালবাসিতেন কি না জানি না। তবে পাড়াগেঁয়ে মেয়ে আমি যত্ন ও ভালবাসা, এদুটী জিনিসকে কখনও পৃথকভাবে ভাবিতে পারিতাম না। যাহা হউক, খাওয়া-পরার বিষয়ে তিনি নিজের মেয়ের মতই আমাকে যত্ন করিতেন। অতটা যত্ন আমি স্বচ্ছন্দে ভোগ করিয়া যাইতে পারিতাম না। একটা ভাল জিনিস মুখে তুলিতে গেলেই আমার মনে হইত যে দাদা, বৌদি' ও ছেলেপিলেরা এমন জিনিস কখনও চোখেও দেখিতে পায় না। ভাল কাপড়-চোপড় পড়িতেও আমার লজ্জা ও কষ্টবোধ হইত, বাড়ীতে আমাদের অনেক সময় ভিজা গামছা পরিয়াই কাটে। কাজেই আমি যতটা সম্ভব নিজের দৈন্য লইয়া কাটাইতে চাহিতাম কিন্তু, এক্ষণে সহজেই লক্ষ্য করিলাম যে আমার ওরূপ ভিখারিণীর চাল-চলন লইয়া আমি যে সুকুর সঙ্গে সমানে চলিতে চেষ্টা করিতেছি, ইহাতে বাড়ীর দাসদাসীগণ পর্য্যন্ত সর্ব্বদা আমার প্রতি বিদ্রূপ কটাক্ষ করে। ক্রমশঃ জ্যেঠাইমাও বলিতে লাগিলেন যে কলিকাতায় অমন পাড়াগেঁয়ে অসভ্য চালে থাকিলে লোকে বড়ই ঠাট্টা করে। একটু সভ্যভাবে চলিবার জন্য তিনি আমায় বিস্তর জেদও সুরু করিলেন। কাজেই আমি বুঝিলাম যে সুকুমারীর সঙ্গে সমানে চলিতে হইলে, আমার তদনুযায়ী বাহ্যিক পরিবর্ত্তনও করিয়া লইতে হইবে।—নচেৎ লোকেও উপহাস করিবে এবং সুকুমারীও ঠিকভাবে ঘেঁসিতে দিবে না।

দেশে যেভাবে বাস করিতাম, লোকে তাহাতে আমায় নিন্দা বা বিদ্রূপ করিবে না,—বরং এখানকার মত চাল চলন দেখিলে অবশ্য যথেষ্ট নিন্দা ও বিদ্রূপ করিতে পারিবে, সেখানে এমন চালে চলিবার মত অবস্থাও আমাদের ছিল না। কিন্তু, এখানে জ্যেঠাইমার কাছে যখন সহজেই সমস্ত পাইতেছিলাম, তখন অনর্থক লোকাচার বহির্ভূত কাজ করিয়া নিজের ক্ষতি করি কেন? নিজের হীনাবস্থা ছাড়া কোনও নিষ্ঠার বশে আমি দীনতা অবলম্বন করি নাই লোকের উপহাসকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নিজের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া চলিতে পারি, এমন শিক্ষাও "আমার জীবনে কখনও হয় নাই। কাজেই আস্তে আস্তে পরিবর্ত্তনের দিকে নিজেকে ফিরাইতে বাধ্য হইলাম।

কিন্তু, মন একবার ফিরিল, অমনি দ্রুতগতিতে আবার পরিবর্ত্তন চলিয়া শীঘ্রই এতদূর পূর্ণতা লাভ করিল যে যাহারা চিরকাল ধরিয়া সহরে চাল-চলনে মানুষ হইয়াছে তাহারাও সর্ব্বদা আমার মত খুঁটিনাটি ঠিকমত বজায় করিয়া চলিতে পারিব না।

বৎসরখানেক পরে দাদা আমায় দেখিতে আসিয়া সহসা ত' চিনিতেই পারেন না। এতদিন আমায় না দেখিতে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, দাদা দুঃখিতভাবে আমায় জানাইলেন যে আমি গিরীন্-দার বাড়ীতে আসিয়া থাকায় দেশের সমাজে আমার স্থান ঘুচিয়াছে, এবং আমার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাতের কথা জানিতে পারিলে তাঁহারও দুর্গতির সীমা থাকিবে না, এই ভয়ে গোপনে তিনি আমায় দেখিতে আসিয়াছেন। আমার সম্বন্ধে আরও এমন সব নিন্দা সেখানে রটিয়াছে যাহা দাদা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিলেন না,—আমি আভাষে বুঝিয়া লইলাম।

আগে হইলে এ সংবাদে আমি লজ্জায়-ঘৃণায় মরিয়া যাইতাম। কিন্তু, আজ আমার সম্মুখে যে জীবনটার আস্বাদ আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম, সামান্য লোকনিন্দা তাহার কাছে কিছুই নহে।

দাদা আমার উন্নতি দেখিয়া খুব খুসি হইলেন। জ্যেঠাইমা'র কাছে থাকায় একে ত' নিজে দাদার ঘাড়ের উপর বোঝা হইতেছিলাম না, তাহার উপর আবার ছেলেদের জলখাবারের খরচ বলিয়া জ্যেঠাইমা মাসে মাসে গোটাচারেক করিয়া টাকা দাদাকে পাঠাইতেছিলেন। দেশে যথেষ্ট খাটিয়াও দাদাকে মাসে চার টাকা করিয়া নগদ হাতে দিতে পারিতাম না। অথচ এখানে ত' আমার কোনও খাটুনিই ছিল না। যা' দুই একটা কাজ আমায় করিতে হইত, তাহাকে আমরা কাজই বলি না। এই সামান্য কাজের জন্য জ্যেঠাইমা আমায় রাখিয়াছিলেন এবং মাসে মাসে আমার জন্য অত টাকা খরচ করিতেছিলেন।

দেশে অত পরিশ্রম করিয়াও আমার কি উন্নতি ছিল? এখানে গোড়াতেই এই,—আবার পরে আরও অনেক উন্নতির আশা ছিল। তবে অবশ্য এখানে আমার খাটুনি না থাকিলেও বুঝিতাম যে এটা আমার চাকুরি। চাকুরি? হাঁ, চাকুরি বই কি! তবুও চাকুরি সম্বন্ধে আমার বরাবর যে ধারণা ছিল যে, নিজের স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে, মনিবের মতলব মত, নাকে দড়ি দেওয়া খাটুনির নাম চাকুরি এবং

তাই দেশে খাটিয়া খাটিয়া কখনও কখনও বিরক্ত হইয়া যে বলিতাম, 'ভাল চাক্‌রি হয়েছে, আমার?'—এখানে চাকুরির উপর আমার সে ধারণা উল্টাইয়া গিয়া একটা শ্রদ্ধাই জন্মিয়াছিল।

যাহা হউক, দাদা বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। অনেকদিন কাটিয়া গেল। আমি মন দিয়া অনেক প্রকার শিল্পবিদ্যা অভ্যাস করিলাম। কিন্তু, তখনও আমার লেখাপড়া শেখা হইল না। তবুও শিক্ষিতা মেয়েদের চালচলনে আমি নিজেকে এমনই অভ্যস্ত করিয়া লইয়াছিলাম যে আমায় দেখিয়া সহজে কেহই বুঝিতে পারিত না যে আমিই সেই পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিতা মেয়ে সুধাহাসিনী নিজেকে পাড়াগেঁয়ে বলিয়া পরিচয় দিতেও আমি লজ্জাবোধ করিতাম। মাঝে মাঝে আমার ম্যালেরিয়া জ্বর হইত। সকলেই সহানুভূতি করিয়া বলিত, 'পাড়াগাঁয়ে অমন হয়,—এখানে থাক্‌তে থাক্‌তে সেরে যাবে।'—আমি আপ্যায়িত হইয়া যাইতাম। কিন্তু, আজকাল আমার জ্বর হইলে যদি কেহ তাহাকে ম্যালেরিয়া বলিত, তাহা হইলে রাগে ও লজ্জায় আমি খুন হইয়া যাইতাম,—কিছুতেই ম্যালেরিয়া বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিতাম না।

গিরীন্‌দা' বরাবরই আমার পক্ষপাতি ছিলেন এবং আমার সকল আচরণই প্রশংসার চক্ষে দেখিতেন, 'সুধা ঠিক কল্‌কেতার শিক্ষিতা মেয়েদের মতন হয়েছে।' তাঁহার এরূপ প্রশংসাবাদে আমি আহ্লাদ ও গর্ব্বে ফাটিয়া যাইতাম। কিন্তু, ইদানিং একদিন তিনি ঐরূপ সুখ্যাতি করিলে সহসা আমার প্রাণে কষ্ট হইল। 'ঠিক কল্‌কেতার শিক্ষিতা মেয়েদের মতন।'—কথাটায় যে স্পষ্ট করিয়া বলা হয় যে, 'ঠিক তাহাই নহে'! এতকালের প্রশংসাবাদটা আজ হঠাৎ অপবাদ মনে করিয়া গৌরবের পরিবর্ত্তে দারুণ লজ্জাবোধ করিলাম।

সেইদিনই এক সময়ে গিরীন্‌দা'কে বলিলাম, 'গিরীন্‌-দা, আমায় যে লেখাপড়া শেখাবেন ব'লেছিলেন, তা'র কি ক'র্‌লেন?'

গিরীন্‌-দা' একটু বিস্মিত ভাবে আমার মুখ পানে চাহিয়া বলিলেন, 'কই, তুমি ত' এতদিনের মধ্যে একবারও আমায় ওকথা মনে ক'রে দাওনি।—আজ হঠাৎ যে তোমার ও ইচ্ছা হ'ল!'

আমি বলিলাম, 'লেখাপড়া না শিখলে আমার উন্নতি হবে কিসে?—আপনি যে বলেছিলেন, লেখাপড়া শিখলে বেশ ভাল চাক্‌রি হ'তে পারে!"

গিরীন্‌-দা' একটু হাসিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা তোমায় এইবার লেখাপড়া শেখাবো।"

তাঁহার হাসির অর্থটা ঠিক বুঝিলাম না। হয়ত তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'এত উন্নতিতেও তোমার হচ্চে না! কিম্বা হয়ত মনে মনে বলিয়াছিলেন, 'তোমার আবার লেখাপড়া!'

যাহাই কেন ভাবুন না তিনি, আমি ছাড়িব কেন? দেশে আমার নিন্দা রটিয়াছে, রটুক,—আমি তাহা সার্থক করিয়া না লইব কেন? আমি আমার উন্নতির পথ ছাড়িব কেন? যে উন্নতির প্রথম সোপানে উঠিতেই গিরীন্‌-দা' আমায় 'তুই' ছাড়িয়া 'তুমি' বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে উন্নতির চরমটা দেখিতে ছাড়িব কেন? ঘনিষ্ঠতায় 'তুমি', 'তুই' হইয়া দাঁড়ায়—কিন্তু যাহাতে 'তুই' 'তুমি' হইয়া দাঁড়ায়, তাহা ত' ঘনিষ্ঠতা নয়,—তাহা নিশ্চয়ই আমার উন্নতির সম্ভ্রম!

খুব উৎসাহের সহিত গিরীন্‌-দা'র কাছে লেখাপড়া শিখিতে লাগিলাম। অল্পকাল মধ্যে শিখিলামও অনেক। গিরীন্‌-দা' আশা দিলেন যে, কিছুকাল এইরূপে শিক্ষা করিলেই, শীঘ্রই একটা মেয়ে স্কুলে মাষ্টারি করিবার উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারিব।

কিন্তু, অল্পদিনেই যখন লক্ষ্য করিলাম যে গিরীন্‌-দা' আমাকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন তাঁহার কাছে পড়ার আর তেমন সুবিধা হইতে লাগিল না।

গোড়ায় গোড়ায় গিরীন্‌-দা'কে যেরূপ ভয় ও ভক্তি করিতাম, ইদানিং তাহা খুব কমিয়া গেল। ভুলিয়া দুই একবার তাঁহাকে 'তুমি' বলিয়া ফেলিতেও লাগিলাম। আগে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া পড়া জানিয়া লইতে পারিতাম না। এখন পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া পড়া বুঝিতে বুঝিতে প্রায়ই কখন বাজে কথা আসিয়া পড়ে, পড়া থামিয়া যায়, হয়ত সব কথাই থামিয়া যায়, শুধু মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া কতক্ষণ যেন একটা ঘোরে কাটিয়া যায়;—তারপর হঠাৎ এক সময় কিসের লজ্জায় সজাগ

হইয়া দু'জনেরই মাথা নিচু হইয়া পড়ে,—তখনকার মত পড়া বন্ধ করিয়া দু'জনেই পলাইয়া বাঁচি।

অল্পদিনের মধ্যেই জ্যেঠাইমা' বিশেষ চেষ্টা করিয়া আমার জন্য একটা মেয়ে স্কুল শিক্ষয়িত্রীর কাজ যোগাড় করিলেন। পূর্ব্বে অনেকবার তাঁহারই কাছে শুনিয়াছিলাম যে বোর্ডিংয়ে থাকিয়া 'গুরু-মা'-গিরি করা তিনি পছন্দ করেন না। অথচ ঠিক এইরূপ একটা চাকুরিতেই তিনি জোর করিয়া আমায় ঢুকাইলেন।

বেতন যদিও আমার আশাতীত বেশী ছিল, এবং এইরূপ চাকুরির আশাই আমি করিতাম,—তবুও জ্যেঠাইমা'র বাড়ী ছাড়িয়া সেখানে গিয়া থাকিতে আমার এখন আর আদৌ উৎসাহ ছিল না।

গিরীন্-দা'র সঙ্গেই গিয়া কাজে ভর্ত্তি হইলাম। সেখানে কেহ কেহ গিরীন্-দা'র কাছে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর দিলেন, 'আমাদের দেশের একটী বিধবা মেয়ে—আমাদের আশ্রিতা!'

পরিচয়ের বহর শুনিয়া গিরীন্-দা'র উপর আমার ভারি রাগ হইল। ছিঃ ছিঃ, এই কি আমার পরিচয়? গিরীন্-দা'র সঙ্গে এই কি আমার সম্বন্ধ? সেখানে কে আমায় চিনিয়া রাখিয়াছে?—গিরীন্-দা কি আর কিছু বলিতে পারিতেন না?

কিন্তু, কি পরিচয় দিলে ঠিক হইত, তাহা আমি বলিতে পারি না। তবুও আজও আমার মনে হয় যে তিনি আমায় খাটো করিয়া দিয়াছিলেন।

যাহা হউক চাকুরিতে ঢুকিয়া আমার এত টাকা রোজগার হইতে লাগিল যে দেশে তাহা হইলে অমন পাঁচটা দাদার সংসার একলা চালাইতে পারিতাম। খবর পাইয়া দাদার খুব আনন্দ হইল। তিন চারি মাস আমি দশ বারো টাকা করিয়া দাদাকে পাঠাইলাম। পত্র লিখিলাম যে নূতন স্থানে সমস্ত নূতন করিয়া কিনিয়া গোছ বিলি করিতে হইতেছে বলিয়া উপস্থিত বেশী পাঠাহতে পারিলাম না, শীঘ্রই আরও বেশী পাঠাইতে পারিব।

কিন্তু, ক্রমশঃ আমার নিজেরই খরচ এত বাড়িয়া উঠিতে লাগিল যে আমি প্রায় আর কিছুই পাঠাইয়া উঠিতে পারিলাম না।

নিজের জন্য নূতন নূতন পোষাক পরিচ্ছদ কিনিতে সভ্য ফ্যাসানের বিছানাপত্র করাইতে, ও দাদার ছেলেপিলেদের জন্য গোটাকয়েক জামা কিনিতে, আমার যাহা দেনা হইয়া গেল, তাহাই শোধ করিতে আর ছয় মাসের মধ্যে দাদাকে কিছুই পাঠাইতে পারিলাম না।

তার পর হইতে যখন কোনও মাসে হয়ত দুই টাকা কোনও মাসে হয়ত পাঁচ টাকা হাতে থাকিত, তখন ভাবিতাম, 'এই সামান্য টাকা কেমন করিয়া দাদাকে পাঠাই? ফিরে মাসে হাতে আর কিছু হইলে একেবারে পাঠাইব।' কিন্তু, আর কিছু হাতে হওয়া দূরে থাকুক, হয়ত এমন একটা খরচ পড়িয়া যাইত যে উপরন্তু আরও কিছু দেনা দাঁড়াইয়া যাইত।

যখন দেশে ছিলাম তখন আমার নিজের জন্য কিইবা খরচ ছিল? যখন জ্যেঠাইমার কাছে ছিলাম, তখন আমার সমস্ত খরচ তিনিই চালাইতেছিলেন। উপরন্তু, দাদার জন্য মাসিক চার টাকা তিনি নিজেই পাঠাইয়া দিতেন,—আমার হাতেও তাহা আসিত না। কিন্তু এখানে আমার খরচ অনেক। আমার পদের মর্য্যাদা ত' আমায় রাখিয়া চলিতে হইবে!—কত লোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসে, কত লোকের সঙ্গে আমায় আলাপ রাখিতে হয়,—কত জায়গায় আমায় যাইতে হয়!

সকল রকমেই আমার বিস্তর খরচ।—দাদাকে পাঠাইবার মত আমার কিছুই থাকে না। একটা চাঁদার খাতায় আমি পাঁচ টাকার কম সই করি না—আমি নিজের দাদাকে পাঁচ-সাত টাকা পাঠাই কেমন করিয়া? আমার মনে হইত, এই সামান্য টাকায় দাদার কি বা উপকার হইবে এবং তিনি ইহা পাইয়া মনেই বা করিবেন কি? যখন দাদার ছেলেদের জামা পাঠাইয়াছিলাম, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন, ছেলেরা ত' জামা কখনও পরেই না। অনর্থক এত টাকা নষ্ট করিয়া এত ভাল ভাল জামা পাঠাইয়াছ কেন? আমি তাঁহার পত্র পড়িয়া ভাবিয়াছিলাম, পাড়াগাঁয়ে থাকিলে মানুষের অমন বুদ্ধি-শুদ্ধিই হয় বটে! ইহাকে কি টাকা নষ্ট করা বলে? জামা না পরিলে কি ছেলেপিলেদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে? আর ও-জামার চেয়ে আরও কিরূপ জামা ভদ্রলোকের ছেলেরা পরিতে পারে? এবং পরিলেই বা আমি এখানে লোকের সামনে তাহা পাঠাই কেমন করিয়া?—এই যে এখানে আমি কত

ভাল ভাল পোষাক-পরিচ্ছদ পরি, তবুও যে কত লোকে তাহার কত দোষ ধরে।

যাহা হউক, সেই অবধি দাদার ছেলেদের আর জামা কাপড়ও পাঠাইতে পারি নাই। পূজার সময় কিছু দিবার জন্য ঝুঁকিয়াছিলাম; কিন্তু টাকায় কুলাইতে পারিলাম না। খুকুকে একটা সাঁচ্চা জরির জামা উপহার দিতেই আমার এত বেশী খরচ হইয়া গেল যে, আমার হাতে অতি সামান্য টাকাই রহিল। যে টাকা ছিল, তাহাতে একটু সামান্য রকম পোষাক কিনিয়া ছেলেদের দেওয়া চলিতে পারিত। কিন্তু সেরূপ পোষাক আমার সঙ্গিনীদের মধ্যে কেহ পছন্দ করিলেন না, আমারও পাঠাইতে লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। খুকুর জামাটা পূজার মধ্যে না দিলে খারাপ দেখায়, কিন্তু ঘরের ছেলেদের দু'দিন পরে দেওয়া চলে। এই ভাবিয়া আগে বাহিরের মান বজায় রখিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আর ঘরের ছেলেদের কিছুতেই দিয়া উঠিতে পারিলাম না।

আজও মনে আছে যে বাড়ীতে থাকিতে দ্বাদশীর দিন দু'খানা বাতাসা খাইয়া জল খাইবার সময় যদি একটা ভাইপো কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ত' তাহার হাতে একখানা দিয়া নিজে একখানা খাইয়াছি। কিন্তু এখন কলিকাতায় আসিয়া মাসে পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইয়াও কদাচিৎ দু'টাকার খাবারও তাহাদের পাঠাইতে পারি না। এখন মান রক্ষার জন্য যতটা ব্যস্ত হইয়াছি তখন প্রাণ রক্ষা করিবার জন্যও তাহার সিকি পরিমাণ ব্যস্ত ছিলাম না। লোকে আমাকে কত দরের মনে করে তাহা ঠিক মত খতাইতে না পারিয়া আমি নিজের দরটা এত বেশী করিয়া ধরিয়া আনিয়াছি যাহার কল্পিত সম্ভ্রম বজায় রাখিতে গিয়া আমি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছি। আমার রোজগারের হাত যত শীঘ্র যে পরিমাণে বাড়িয়াছে,—খরচের হাত তাহা অপেক্ষা অনেক দ্রুত, অনেক বেশী পরিমাণে বাড়িয়াছে। গরীব ভাইপোদের কথা মনে ছিল না। যদি তাহারা নিজের গর্ভজাত সন্তান হইত তাহা হইলে কখনই এমনটা হইত না।

যাহা হউক, এখন বৃথা আক্ষেপে ফল নাই। এখন আমার কাহিনীটাই বলি। যখন বোর্ডিংয়ে আসিয়া থাকিলাম, তখন আশা করিয়াছিলাম গিরীন্-দা' মাঝে মাঝে আমায় দেখিতে না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না। কিন্তু অনেকদিন কাটিয়া গেলেও তিনি বা তাঁহাদের বাড়ীর কেহই আমার কোনও খোঁজও লইলেন না। আমায় ভর্ত্তি করিয়া দিবার সময় গিরীন্-দা আমার যে পরিচয় দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে আমার মনের মধ্যে অনেকটা অভিমান থাকায় আমিও তাঁহাদের কোনও খোঁজ লই নাই। শেষে নিজেই জ্যেঠাইমাকে একখানি পত্র লিখিয়া অনেক খোঁজ জানাইয়া গিরীন্-দাকে একবার পাঠাইতে অনুরোধ করিলাম।

অনেক পরে পত্রের উত্তর আসিল যে বোর্ডিংয়ে আমাকে দেখিতে আসা তিনি নিন্দনীয় মনে করেন বলিয়া গিরীন্-দা'কে পাঠাইতে পারেন না, বরং আমি যেন তাঁহাদের বাড়ী গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করি।

এই উত্তরের মর্ম্ম আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। কাহার পক্ষে নিন্দনীয়? আমার পক্ষে না, গিরীন্-দার পক্ষে? কেনই বা নিন্দনীয়? এমন অনেক ত' অনেকের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেছে!

নিজে যাওয়াই সাব্যস্ত করিলাম। আমাদের পরস্পরের অবস্থার পার্থক্যই গিরীন্-দা'র এখানে আসিবার আপত্তির কারণ মনে করিয়া, আমি খুব জাঁকালো রকমের সাজ-সজ্জা করিয়া বেড়াইতে গেলাম যে আমার অবস্থা এখন আর হীন নহে।

বাড়ীতে ঢুকিয়া প্রথমেই গিরীন্-দা'র সহিত সাক্ষাৎ হইল। নিজের সাজ-সজ্জার জন্য একটু লজ্জা বোধ হওয়ায় একটু হাসিয়া ফেলিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতেই তিনি গম্ভীরভাবে দুই একটা জবাব করিয়াই, কি কাজের জন্য, (তাচ্ছিল্য করিয়া কি না জানি না) বাহিরে চলিয়া গেলেন। আমার পূর্ব্ব পরিচিত একটা সঙ্গী আমায় দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া সরিয়া গেল। আমি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া গেলাম। জ্যেঠাইমাকে দেখিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি শুধু 'কিরে সুধা, ভাল আছিস ত?' এই কথাটুকু জিজ্ঞাসা করিয়া পার্শ্বের ঘরে ঢুকিয়া যাইতেই সেই দাসীটা কোথা হইতে আসিয়া আমার গায়ের উপর ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে আমার জামা-কাপড়-গুলিতে হাত দিয়া দেখিতে দেখিতে, আমার ব্রোচটা হাতে করিয়া ধরিয়া বলিল, "হ্যাঁগা, এটা বুঝি গিল্টি করা?"

আমি বড়ই লজ্জিত হইলাম। ব্রোচটা প্রকৃতই রোল্ড-গোল্ডের ছিল। যদিও দাসীটার উপর আগে হইতেই যথেষ্ট রাগ হইয়াছিল এবং তাহার কথার উত্তর দিতেই ইচ্ছা হইতেছিল না, তবুও লাজ-লজ্জা চাপা দিবার জন্য প্রকৃত কথাই স্বীকার করিয়া ফেলিলাম। ফিরিয়া আসিয়াই এমন একটা ব্রোচ্ গড়াইতে দিলাম যে সুকুমারীরও তেমন একটীও নাই। এই ব্রোচ্ গড়াইতে আমার যে টাকা দেনা হইল তাহা শোধ করিতে প্রায় এক বৎসর আমার খোরাকে টান পড়িল।

এইভাবে দিন কাটিতে লাগিল। মাঝে মাঝে গিরীন্-দা'র বাড়ীতে যাই। ক্রমে বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহারা আজও আমাকে আমার অবস্থার এত উন্নতিসত্ত্বেও সেইরূপ হীন মনে করেন। আমিও সাধ্যমত তাঁহাদের দেখাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম যে এখন আমি আর সেরূপ হীন নাই। কিন্তু, ফলে আমারই খরচ বাড়িয়া যাইতে লাগিল, আর কিছুই হইল না।

এমন সময়ে গিরীন্-দা'র বিবাহ উপস্থিত হইল। আমার নিমন্ত্রণ হইল। আমি আগে হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে এই বিবাহে এমন সব উপহার দিব যে নিমন্ত্রিত সকলের মধ্যে আমার বেশ একটু বিশেষত্ব দাঁড়াইবে।

সেই মত আয়োজন করিয়া খুব জাঁকজমকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম। পূর্ব্বোক্ত সেই দাসীটা আমায় গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া গেল। আমার উপরহারগুলি সেই দাসীটাই অতি সামান্য জিনিসের মত ঘরের কোণে লইয়া গিয়া রাখিল। কেহই উৎসুক হইয়া তাহা দেখিতে আসিল না। আমার বড় ইচ্ছা ছিল, আমি স্বহস্তে সর্ব্বসমক্ষে সেগুলি সভার মাঝখানে ধরিয়া দিব; কিন্তু দসৌটা যেন সেগুলি আমার হাত হইতে একপ্রকার কাড়িয়াই লইয়া গেল,—আমিও লজ্জায় আর তাহা কাড়াকাড়ি করিতে পারিলাম না।

বাড়ীর একজন নিকট আত্মীয়া জিনিসগুলি তুলিতে আসিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া, নিকটস্থা সুকুমারীকে আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেই, পার্শ্বস্থিতা সেই দাসীটা তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "সেই যে, পিসীমা, তিনি দিদি-মণির কাছে আগে ছেলে, এখন স্কুলে চাক্‌রি করে।—" তারপর তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসিয়া আমার নূতন ব্রোচটায় হাত দিয়া বলিল, 'হ্যাগা, এইটা বুঝি দিদিমণির দেখাদেখি এবার গড়িয়েছে?"

আমি মাথা তুলিতে পারিলাম না। সুকু দাসীটাকে ধমক দিয়া বলিল, 'তুই নিজের কাজে যা।'

সেই অবধি আর গিরীন্-দা'র বাড়ীতে যাই নাই। গিরীন্দা'র বাড়ীতে থাকিতেই তাঁহার অনেক বন্ধুর সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল। তাঁহাদের অনেকেই মাঝে মাঝে বোর্ডিংয়ে আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বিজলী-দা'র সঙ্গে ইদানিং আমার খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। আমার মনে হইত যে, তিনি আমায় খুব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। গিরীন্-দা'র সম্পর্কে পদে পদে অপমান লাভ করিয়া তাঁহার উপর হইতে আমার মন সরিয়া আসিয়া বিজলী-দা'র কাছে তাঁহার শ্রদ্ধার মূল্যে বিক্রিত হইতে চাহিল। বিজলী-দা'কে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতেও আমি কুণ্ঠিত হইলাম না। আমি স্বেচ্ছায় আমার রোজগারের অনেক পয়সা তাঁহার জন্য ব্যয় করিতে লাগিলাম। তিনিও সদাসর্ব্বদা আসিয়া আমার সঙ্গে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে লাগিলেন।

ক্রমে আমার অবৈধ আলাপনের সংবাদ স্কুলকর্ত্তৃপক্ষের কাণে উঠিল। আমার কৈফিয়ৎ তলব হইতেই আমি বিজলী-দা'র সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় সম্বন্ধের দোহাই দিয়া পার পাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু যখন তাহা সমর্থন করিবার জন্য বিজলী-দা'কে হাজির করিয়া দিবার হুকুম হইল, তখন আর কিছুতেই তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম না। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন; তাই ভিতরে ভিতরে খবরটা পাইয়াই, হিন্দু ললনার সঙ্গে আত্মীয়তা স্বীকার করিবার ভয়ে সরিয়া পড়িয়াছিলেন।

অসচ্চরিত্রের অপবাদে আমার চাকুরি গেল। চরিত্র সম্বন্ধে আমি যে খুব সাঁচ্চা ছিলাম, এমন কথা যদিও শপথ করিয়া বলিতে পারি না, তবুও আমার সহযোগিনী অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীদিগের চরিত্র যে আমার চেয়েও অনেক বেশী কলুষিত ছিল,—তাহা আমিও জানিতাম, কর্ত্তৃপক্ষও জানিতেন। কিন্তু, সে অপরাধে তাঁহাদের চাকুরি না যাইবার কারণ এই ছিল যে, বাহিরে তাঁহাদের কোনওরূপ ধরা-ছোঁয়ার উপায় ছিল না।—যাঁহাদের সহিত তাঁহারা

আলাপ করিতেন, তাঁহাদের কেহই তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা না একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকার করিয়া লইতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না।

আমি হিন্দু ঘরের দরিদ্রা বিধবা,—নিজে যাহা নহি তাহা সাজিয়া, যাহাদের আমি কেহই নহি, তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া,—ভাবিয়াছিলাম যে আমিও তাহাদের একজন হইয়াছি, ভাবিয়াছিলাম তাহারাও আমার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে! আমার ভুল এতই শক্ত ছিল যে গিরীন্-দা'-দিগের আচরণ চক্ষের উপর দেখিয়াও তাহা ভাঙ্গিল না। বারে বারে একই ভুল করিলাম। আমার দাদা আমার ব্যবহারে আমার উপর চটিয়া গিয়াছিলেন,—তাঁহার স্নেহ ফিরিয়া পাইতে কিন্তু আমি কোনও চেষ্টাই করিলাম না।

আজ দশ বৎসর কলিকাতায় আসিয়া আছি। ইহার মধ্যে আমার জাতি গিয়াছে, কলঙ্ক রটিয়াছে, নিজের সমাজে আমার স্থান গিয়াছে, যাহাদের সঙ্গে মিশিতে এত চেষ্টা করিয়াছি, তাহাদের সমাজে আমার জন্য শুধু উপহাস ও ঘৃণা মাত্র আছে, আমার আপনার যাহারা তাহারা আমায় ত্যাগ করিয়াছে। বনের পশুর মত মানুষ কি সমাজ ছাড়া হইয়া থাকিতে পারে? সমাজে ঢুকিয়া আমার কোনও ক্রিয়া-কলাপ করিবার আবশ্যক নাই বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেও, সমাজের জন্য আমার প্রাণ কাঁদে। এখনও সেই সমাজে ফিরিয়া গিয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিতে পাইবার জন্য আমার প্রাণ অধীর হইয়া উঠে। সেই সব প্রতিবেশী, যাহারা আমার মত সামান্য প্রাণীরও নিত্য খবর রাখিত,—আমার নিজের ঘরে আমার সেই সব আপনার জন, যাহারা আমার তুচ্ছ জীবনের মায়ায় আমার সামান্য একটু পীড়া হইলেও মুখের উপর মুখ রাখিয়া পড়িয়া থাকিত,—সেই তাহাদের স্নেহ যত্ন রচিত নীড়ে ফিরিয়া যাইবার জন্য আমার প্রাণ আকুল হইয়া উঠে।

স্বাধীন জীবিকা আমি এখানে অর্জ্জন করিতেছি, সেখানেও করিতাম। এখন চাকুরি যাওয়ায় শিল্পকলা ফলাইয়া খাইতেছি, পরিতেছি; সেখানেও চরকা ঘুরাইয়া খাইতাম পরিতাম।—তবে পার্থক্য এই যে, নিজের খরচপত্র এত বাড়াইয়া ফেলিয়াছি যে আগেকার চেয়ে এত বেশী টাকা রোজগার করিয়াও আমার ব্যয় সঙ্কুলান হয় না, দেনা হয়। গিরীন্-দা'র বিবাহে অনর্থক চাল দেখাইয়া নিজের সম্ভ্রম বাড়াইতে গিয়া যে দেনা করিয়াছি, আজও তাহা শোধ হয় নাই। অথচ সেখানে আমার পরিচয়, সেই 'পুরাতন দাসী' ছাড়া আর কিছুই বাড়িল না।

দেশে সামান্য রোজগার করিয়াও নিজের অভাব ত' দূর হইতই, সঙ্গে সঙ্গে অন্যের জন্যও কিছু খরচ করিতে পারিতেছিলাম। তাহাতে আমার এত তৃপ্তি ছিল যে, কখনও নিজের জন্য অভাব বোধ করিতাম না। যাহাদের জন্য অভাব বোধ করিতাম, এবং যে অভাব দূর করিবার আশায় নূতন উপায় অবলম্বন করিয়াছিলাম—তাহাদের সে অভাব ঘুচাইতে পারা ত' দূরের কথা, সে চিন্তা পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম, বরং নিজের জন্য নিত্য নূতন অভাবের সৃষ্টি করিয়া বসিলাম।

সম্প্রতি একদিন আমার একজন শিক্ষিত বন্ধুর সঙ্গে এইরূপ আক্ষেপ করিতেছিলাম। তিনি আমায় বুঝাইলেন যে, মানুষ নিত্য নূতন অভাব অনুভব না করিলে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করে না। সামান্য পাইয়া যথেষ্ট পাইয়াছি মনে করিয়া তৃপ্ত থাকাও ঘোর অজ্ঞানতার পরিচায়ক। শিশু যে এক পয়সা দামের একটা পুতুল পাইলে একশত টাকা দামের একটা নোটকে সামান্য কাগজ মনে করিয়া ফেলিয়া দেয়,—তাহাও ঐ নোটের মূল্য সম্বন্ধে তাহার অজ্ঞতার কারণে।

আজ কিন্তু, আমি সেই অজ্ঞতাকেই বরণ করিয়া লইয়া পরিতৃপ্তি লাভের কামনা করিতেছি। আজ আমার এমন বন্ধু কে আছে যে আমার কাগজের দামি নোটখানা কাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আমার সেই সস্তার ভালবাসার পুতুল ফিরাইয়া দিবে?

অনেকদিন পূর্ব্বে আমার সমাজের জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখ করিয়াছিলাম বলিয়া আমার নব্যতন্ত্রের সেই বন্ধুটী আমায় বলিয়াছিলেন, 'আপনার সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ত' শুধু ঘাড়ে করিয়া গঙ্গায় দিবার জন্য!—তা' মরিয়া গেলে যে যেমন করিয়া যেখানে ইচ্ছা ফেলিয়া দিউক না কেন, তাহাতে কি আসে যায়?'

তখন বুঝিয়া দেখিয়াছিলাম যে, কথাটা কতকটা ঠিক বটে! কিন্তু, আজ আমার মনে পড়ে যে, যখন আমারই মত কাহারও মৃতদেহ আমাদের গ্রামের প্রান্তস্থিত শ্মশানে আসিত, এবং পথের যত লোক বলিতে বলিতে যাইত,

'আহা, অমুকের বিধবা বোনটীকে ঘাটে এনেছে!'—তখন আমিও মনে মনে বলিতাম, 'আহা, আমায় কবে অমন করে ঘাটে নিয়ে যাবে?'

আমার একান্ত আশাহীন জীবনেও 'অমন' করিয়া ঘাটে যাওয়ার আশা আমি মনে মনে পোষণ করিতাম। অথচ সে 'অমন', যে কেমন, তাহা ভাবিয়া বুঝিয়া সে আশা করিতাম না। যদিও তেমন মৃত্যুতে কোনও ঘটা ছিল না, তবুও আজ বুঝিতেছি যে, সে তেমনি করিয়া, তাহাদের রাখিয়া, তাহাদের কাঁধে চড়িয়া ঘাটে যাওয়া, যাহারা আমাকে চেনে, আমার খবর রাখে, আমার মৃত্যুতেও একবার 'আহা' বলে, আমার তুচ্ছ মৃতদেহটা কাঁধে করিয়া গঙ্গায় দেওয়া পুণ্য কাজ মনে করে।

তেমন করিয়া ঘাটে যাওয়ার আশায় বঞ্চিত হইয়া, আমার প্রাণে মরণের জন্য আর সে উৎসাহ নাই। আজ যদি আমি সোণা দিয়া পেট ভরাই, রত্নখচিত পরিচ্ছদ পরিধান করি, তবুও আমার মরণে আর তেমন জিনিস কখনও ঘটিতে পারে না। যুক্তি দিয়া মনকে যতই বুঝাইতে চেষ্টা করি যে, মরণের পর আর কিছুরই সঙ্গে সম্পর্ক নাই, তবুও মন তাহা বুঝে না। যে পাশ্চাত্য দেশের আলোক পাইয়া আজ এরূপ যুক্তি মনে আনিতে সক্ষম হইতেছি, পুস্তক পড়িয়া বুঝিতেছি যে সে দেশের লোকেরাও মনের মত মরণ মাগিয়া মরে।

পথহারা

শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম-এ বি-এল

তরুণী কিশোরী, তোমার জীবন যে-জন ভরেছে লাজে,
ছিঁড়িয়া লতিকা, দলি পদতলে, ফেলে গেছে পথমাঝে,
সরল হৃদয়ে তুমি তারে হায়! বেসেছিলে বড় ভালো,
ভেবেছিলে তুমি, হবে বুঝি সেই, তোমার নয়ন আলো!
অবোধ বালিকা, কেন করেছিলে, এত বড় মহাভুল,
কেন দিয়েছিলে' তনুমন তব, নাহি যার সমতুল?
দস্যু-অধম, ঘৃণিত সেজন, তোমারে ভুলাল হায়!
লোকালয়ে তবু, আছে তার ঠাঁই, সমাজ ঠেলেনা তায়;
জগতের চোখে, দোষ নাহি তার, দোষ শুধু অবলার,
কঠোর বচনে, তোমারে শাসায়, করি শুরু অবিচার!
অনাবিল প্রেমে, তোমার জীবন, দিল নাত' কেহ ভরি,
এসেছিল যারা, লয়ে গেল শুধু, মধুটুকু সব হরি'!
সোনার স্বপন, এল নাক আর, তোমার জীবন মাঝে,
উষা না উদিতে, ঘেরিল তোমায়, আলোক বিহীন সাঁঝে!
যদিও হেথায়, অবহেলা শুধু, তোমার পাথের সার,
তোমার গলায়, পাতকীর হরি, দুলাবে কুসুম হার!
একদিন আসি, মৃদু মধু হাসি, দিবেই সে তোরে দেখা,
তাঁহার মধুর, কোমল পরশ, হরিবে কালিমা লেখা!



ভারতবর্ষ—বৈশাখ—১৩৩৮

শরৎবাবুর "শেষ প্রশ্ন" এবার শেষ হইল, বাকী কেবল "বিপত্তি"। কিন্তু ইহার শেষ কোথাও সহসা দেখা যায় না ; একবার ঘটলেই মুস্কিল।

এ সংখ্যায় ছোট গল্প আছে মাত্র দু'টি। প্রথম গল্প শ্রীপ্রণব রায়ের "মর্ম্মর"। এক আঠাশ বছরের বিগত যৌবনা নারীর চরিত্র বর্ণনা—কারুণ্য ও শ্লেষ ইহাতে পরিস্ফুট। তবে রচনাটিকে গল্প না বলিয়া চিত্র বলিলে ঠিক মানায়। আর বিদেশী গল্পের একটু তীব্র গন্ধ ছাড়িলেও গল্পটি বেশ হইয়াছে! কিন্তু যে সংসারে ভাত কাপড়ের দুঃখটা তেমন নাই ও যে নারীর সন্তান-সন্ততির সংখ্যা মাত্র তিনটিতে কায়েমী থাকে মাত্র বারো বৎসরে তার দেহের সকল সৌন্দর্য্য ও শ্রী এবং মনের সবটুকু রস যে নিঃশেষিত হইয়া মাত্র রিক্ত, রুক্ষ, কঠিন পাত্রটিকে রাখিয়া যায়, এ কথা অনভিজ্ঞতা দিয়া বলা গেলেও, অভিজ্ঞতায় অন্যরূপ দাঁড়াইবে। নারী যখন আপনাকে বৃদ্ধা ভাবে, তখনই তার নারীত্বের মৃত্যু। আর এই কথাটা সে সহজে স্বীকার করিতে চাহে না। আয়ুষ্মতী বৃদ্ধার সযত্ন প্রসাধনই তার সাক্ষ্য।

গল্পটি কলিকাতারই চলিত ভাষায় লিখিত এবং কয়েকটি ক্রীয়ার বানানে এমন খাস "কোলকাতাই" রূপ আছে যে সোণা মুগ আর মটর দালের মিশ্রণের মত অদ্ভুৎ দেখায়! যেমন "গ্যালো, গ্যাচে, ত্যাখে" ইত্যাদি। উচ্চারণই যদি এগুলির আগুক্ষরের য ফলার বেণী ও আকারের যষ্ঠী ধারণের ভিত্তি হয়, তাহা হইলে "বল্‌লে", "চল্‌ল", "কর্‌ব" প্রভৃতি ওকার চক্রে বন্দী না হইয়া উচ্চারণের আশায় ভূমিসাৎ হইয়া থাকিবে কেন? এবং "ছিল", "করছিল",—প্রভৃতি "ছেল", "কোরছেল" হওয়াই স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের "বড় বাবুর বিপত্তি।" একটী অর্থলোলুপ পুরুষের চরিত্র কথা। ইঁহারও মনের সবটুকু রস খামোখা উড়িয়া যায়, যার ফলে তাঁর তরুণী স্ত্রী সোহাগরসাভাবে শুষ্ক, শীর্ণ ও ক্লীষ্ট হইয়া উঠে। পরিশেষে ভদ্রলোকটীর শ্যালক-পত্নী বি-এ পাশ স্ত্রী এণার বাক্-চাতুর্য্যে মুগ্ধা হইয়া গৃহিণী তার কথামত কাষ করে এবং গঙ্গার ঘাট হইতে ঘরে ফিরিয়া স্বামীকে তার হাতের নূতন সোণার চুড়ী ও গলার হার দেখাইয়া বুঝাইয়া দেয় যে "পয়সাকে একমাত্র ধ্যানের বস্তু না করে আমার পানে একটু চেয়ো গো...মন আমার সত্যি আজও মরে যায় নি!"

ইহার উত্তরে "বড়বাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাকিয়াটা টানিয়া তাহাতে হেলান দিয়া শুইয়া পড়িলেন।" এই নিশ্বাসটা "বিরক্তি", "দুঃখ" কি "তৃপ্তির" সে কথা রসগ্রাহী পাঠক অনুমান করিবেন। গল্পটী উপেক্ষিতা তরুণী ভার্য্যার অর্থলোলুপ কৃপণ স্বামীগণের অবশ্য পাঠ্য। রচনাটিতে নূতনত্ব কিছুই নাই ; "সৌরীন্ বাবুর" হাত হইতে না বাহির হইলেই ভাল হইত। ইহার মধ্যে তাঁর লিপিকুশলতা ও সহজসিদ্ধ রস খুঁজিলে তবে মেলে ; পাঠককে তা আপনা হইতেই অভিসিঞ্চিত ও তৃপ্ত করে না।

বড়বাবুর গৃহিণীর মুখে দু'একটা পরিষ্কার ইংরাজী শব্দ ও চমৎকার বাংলা শোনা যায়। কিন্তু শ্রীমতী এণার বিদ্যার দৌড় দেখাইয়া গৃহিণীর সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই যাতে বোঝা যায় তার মুখের এই শব্দগুলির পিছনে আছে আধুনিক ইংরাজী বিদ্যায়তনের শিক্ষা।

মনে হয় সৌরীনবাবু গল্পটি মন দিয়া লেখেন নাই।

এ সংখ্যায় রঙিন ছবি আছে তিনখানি। প্রথম ছবি শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার রায়ের "গায়ত্রী"। ব্রহ্মার মুখখানি

অবশ্য চৈনীক; দক্ষিণ পদের পল্লবখানি চীনা নারীরই মত এবং বাহনটিও কুক্কুট, শ্যেন ও হংসের সংমিশ্রণ। তবে ছবিখানিতে ভাবের দ্যোতনা আছে।

দ্বিতীয় ছবি তারাস্বামী আসারীর "শিবদুর্গা"। (পর্ব্বতগাত্রে) মন্দ লাগে নাই।

তৃতীয় ছবি শ্রীচিত্রসেন বড়ুয়ার "ভজন।" শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের সম্মুখে এক বৈরাগিণী ভজন গাহিতেছেন। তাঁর বাম হাতে তানপুরা, দক্ষিণ হাতে খঞ্জনী। হাত দুটির গতি আছে, কিন্তু ভজন তো কেবল বাজাইলেই গাওয়া হয় না, কণ্ঠস্বরও নিঃসৃত হওয়া চাই। ছবিতে বৈরাগিণীর অধর দুখানি অবশ্য পরস্পর সংলগ্ন দেখা যাইতেছে। ইহাতে মনে হয়, তালের ফাঁকে গায়িকা একটু দম লইতেছেন। ছবিখানি ভাল লাগিল না।

প্রবাসী—বৈশাখ—১৩৩৮

এ সংখ্যার অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে; সেগুলির মধ্যে প্রমথবাবুর "পাঠান-বৈষ্ণব রাজপুত্র বিজুলী খাঁ" সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের "আমাদের দেশে প্রথম সংবাদপত্র" পাঠে সংবাদপত্রের ক্রমোন্নতির সূত্র ও একটী নূতন কথা পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহার "সমাজ ও সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধটি দেখিতেছি "কাশীপুর ইনষ্টিটিউটে পঠিত" লেখা আছে। কিন্তু লোক পরম্পরায় শোনা গেল, লেখক ইহা রবিবাসরের একটী অধিবেশনে বিশেষ করিয়া রবিবাসরের জন্য লিখিত বলিয়াই পাঠ করিয়াছিলেন। ইহা ছাপার ভুল না শ্রোতাগণকে ঠকাইবার বক্তাগণের স্বভাবসিদ্ধ চালের একটী?

এ সংখ্যায় দুইখানি উপন্যাস আছে। একখানি পূর্ব্বের সেই "অপরাজিত"; অন্তর্দ্ধানের কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না, অপরখানি শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের "পোর্ট আর্থারের ক্ষুধা"—জাপানী গ্রন্থের অনুবাদ।

ছোট গল্পও আছে চারিটি। প্রথম গল্প শ্রীসীতাদেবীর "বিষে বিষক্ষয়।" স্ত্রীর প্রতি শাশুড়ী ও স্বামীর অত্যাচার কাহিনী।

স্বামী মাত্র আই-এ পাশ করিয়া "দুশো" টাকা মাহিনার চাকরী করিতে করিতে যখন সর্ব্বগুণভূষিতা ম্যাট্রিক-ক্লাস-অবধি-পড়া সপ্তদশী তরুকে বিবাহ করিয়া নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করে, তখন তার বয়স পঁয়ত্রিশ। পুরুষজাতি স্বভাবতই আরাম প্রিয়। কাজেই স্বামী বিবাহের অব্যবহিত পরেই দস্তুরমত স্ত্রীর প্রতি সোহাগ-ভালবাসা চালিয়া দিলেও তিন বৎসর যাইতে না যাইতে আত্ম-স্বভাব প্রকট করিতে থাকেন। স্ত্রীর মনেও উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব ছিল না—"সে খানিকটা নিরাশ হইল বটে, তবে মর্ম্মান্তিক বেদনা কিছু পাইল না। যেমনই হউক, ইহাকে লইয়াই তাহার চিরদিন ঘর করিতে হইবে, অতএব স্বামীকে ভালবাসিতে সে যথা সম্ভব চেষ্টা করিতে লাগিল।" তার চেষ্টা বোধহয় তখনও চলিতেছিল, শেষ অবধি সে বোধহয় স্বামীকে ভালবাসিতও কিন্তু "তরুর প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। সারাদিন কাজ আর শাশুড়ীর খোঁটা। * * * স্বামী যদি আগের মতই থাকিতেন, তাহা হইলে তরু কোনোমতে সহিয়া যাইত, তাঁহার জ্বালা জুড়াইবার একটা স্থান থাকিত। কিন্তু * * * এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায়, অর্থাৎ এই বিষের জ্বালা জুড়াইতে তরু আর এক বিষ পান করিল—সে গেল জেলে। প্রিজন্-ভ্যানে উঠিবার সময় সাহেব-ঘেঁষা অত্যাচারী স্বামীকে কহিল "স্বামিত্বের দাবী যত বড়ই হোক, পুলিসের দাবী তার চেয়েও কড়া।" ইহাই গল্প।

কিন্তু জেলে যাওয়াটা স্বামীর ও শাশুড়ীর হাত হইতে নিস্তার পাইবার একটা উপায়স্বরূপ না করিয়া সত্যই দেশের কাজকে উপলক্ষ্য করিলে তাহা সঙ্গত হইত নিশ্চয়। যাঁদের স্বামী ভালবাসে, শাশুড়ী স্নেহ করে, তাঁদের পক্ষে জেলে যাওয়া অবিবেচনার কাজ কি? ইহাই কঠিন এবং মহৎ। আর সেই কারণেই ভারতের নারীগণ আজ যে শ্রদ্ধা কুড়াইতেছেন, নিজেদের যথার্থ অধিকার ও আসন গ্রহণ করিতেছেন, তাহা আধুনিক কালের ইতিহাসে অভিনব। নতুবা ঐভাবে যা লাভ করা যায় তার পিছনে শ্রদ্ধা থাকে না, সম্মান থাকে না এবং আন্তরিকতার অভাবটাও হইয়া পড়ে প্রকাণ্ড। তবে আশা করা যায়, এই ক্ষুদ্র আদর্শটিকে সহসা কেহ গ্রহণ করিবেন না এবং এই রচনাটি শেষের দিকে এত তরল ও লঘু যে মনের উপর একটী আঁচড়ও ফেলিবে কিনা সন্দেহ।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীশান্তাদেবীর "মোটবাহী।" গল্পটি বড় করুণ। সমগ্র রচনাটির মাঝে একটী গভীর অনুভূতি

সুস্পষ্ট। শতপাকে বন্দিনী এক অসহায় নারীর গভীর অন্তর বেদনা এমন সংযত বাক্যে ও স্বাভাবিক রঙে ব্যক্ত হইয়াছে যে মনকে অশ্রুসিক্ত করিয়া তোলে। তারপর, একখানি চিত্র ইহাতে এমন ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, যা নিপুণতায় উজ্জ্বল। নিশীথে চোর স্বামীর সহিত স্ত্রীর অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ—স্বামী স্ত্রীর পিতৃগৃহেই চুরি করিতে আসে—তার সহিত স্ত্রীর কথোপকথন এবং পরদিন সকলের কাছে পরপুরুষাসক্ত কুৎসায় স্ত্রীর অপমানিত হওয়া, একটা প্রকাণ্ড Tragedy! নারীর সহনশীলতার আশ্চর্য্য রূপ ইহাতে সুপরিস্ফুট।

তৃতীয় গল্প শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের "অজানা"। গল্পটিতে সুরু হইতে শেষ অবধি বেশ জমাট ভাব আছে; গতিও বেশ সহজ, স্বচ্ছন্দ ও বেগবতী। গল্পটি মনের উপর একটু ছাপ রাখিয়া যায়। সুন্দরী তরুণী "শেয়াস্তি দেবী" বা শান্তি দেবীকে কেন্দ্র করিয়া যে রস সৃষ্টি হইয়াছে, তা অতি উপাদেয়। কিন্তু গোয়ালার ছেলে বদ্‌রিকে সময় সময় মনে হয় যেন ঝুমঝুমিওয়ালার বেশে এক "নব্য কবি।" সে মানস-লোকের স্বপ্নময় পথে বিচরণকালে এই সুদূর পঞ্জাববাসিনী টাটানগর যাত্রিণীকে চকিতে চলিয়া যাইতে দেখে, তার রূপের সুষমা বদ্‌রির চোখে অঞ্জন-রেখা আঁকিয়া দেয়। তাই এই অজানা তরুণীকে সে "চিনি" বলে। কল্পনার এমন মোহন দীপ্তিতে কি সত্যই "গাঁওয়ার" তরুণের মন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে? এইখানে সত্যদৃষ্টির অভাব ঘটিয়াছে।

চতুর্থ গল্প শ্রীমনোজ বসুর "বাঘ।" গল্পটি মন্দ নয়—ইহার সমপদী একটী গল্প আছে—ডডের Mistrie's of Cornie

এ সংখ্যায় রঙীন ছবি আছে তিনখানি। প্রথম ছবি শ্রীকনু দেশাইয়ের "রামচন্দ্র ও কাঠবেড়ালী।" কিন্তু কাঠবেড়ালীটা হইয়াছে খরগোসের মত। হয়ত গুজরাতের কাঠবেড়ালী এমনিই দেখিতে।

দ্বিতীয় ছবি শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের "গালার কাজ।" গালার মিস্ত্রী তার সামান্য যন্ত্র-পাতি লইয়া খেলনা ও পুতুল গড়িতেছে।

তৃতীয় ছবি শ্রীইন্দুভূষণ রক্ষিতের "চাষীর ঘর।" একেবারে অন্দর মহল। কিন্তু ছবিখানিতে বেশ একটা শ্রী আছে। বাংলার নিরালা পল্লীকে মনে করাইয়া দেয়।

বসুমতী—চৈত্র—১৩৩৭

বসুমতীর পঞ্চ উপন্যাসের বিপুল যজ্ঞ যথারীতি চলিতেছে।

এ সংখ্যায় ছোট গল্পও আছে পাঁচটি। প্রথম গল্প শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর "ঝাঁপান খেলা।"

দ্বিতীয় গল্প শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্যের "সত্য ও মিথ্যা।" গল্পটি বেশ; কিন্তু মাণিকবাবুর সবটুকু রচনা-বৈশিষ্ট্য ইহাতে নাই। মানুষ বাহিরের সত্তাকে বজায় রাখিতে গিয়া অন্তরের সত্যকে ক্ষুণ্ণ করে ইহাই গল্পটির ভিত্তি।

তৃতীয় গল্প শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের "সুখে-দুঃখে।" গল্পটি বড় চমৎকার কিন্তু মার্কিন গাল্পিক O' Henryর একটী গল্পের মাল-মশলা ও ছাপ ইহাতে এত বেশী যে পাদটীকায় তাঁরই রচনা বলিয়া স্বীকারোক্তি করিলে শোভন হইত। অবশ্য ইহাও হইতে পারে যে "Great minds think alike" কিন্তু O' Henryকে অন্ততঃ Great mind বলা চলে না। তা ছাড়া তিনি সৌরীন্‌ বাবুর এই গল্পটি লেখার বহু পূর্ব্বে গল্পটি রচনা করেন।

চতুর্থ গল্প শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "সহধর্ম্মিণী।" লেখক ইঁহাতে একটা বড় সত্য কথা বলিয়াছেন—"মিস্ রায় আপনাদের সমাজের একটা প্রধান দোষ দাঁড়িয়েছে এই যে, কোন একটা বিষয়ে বেশীক্ষণ চিন্তা করবার ক্ষমতা সকলের থাকছে না। প্রজাপতির মত একটা চঞ্চল অস্থিরতা তাঁদের মন ছেয়ে ফেলেছে।" সমাজের পক্ষে, জাতির পক্ষে ইহা যে বড় ভয়ের কথা।

গল্পের বিষয়টুকু নূতন না হইলেও বলিবার ভঙ্গিমায় মন্দ লাগে না।

পঞ্চম গল্প কুমার শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের "নবগ্রহ।" গল্পটিতে হাসি কান্না-শ্লেষ-রঙ্গের উপাদান যথেষ্ট আছে। কিন্তু রচনাটি এত দীর্ঘ যে সুরু হইতে শেষ অবধি পাঠে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। ফলে মনে যে ভাবটুকু টানিয়া আনে তা অবশ্য তৃপ্তি নয়। লেখনী সংযমে রচনা সুন্দর, উপাদেয় ও চিত্তগ্রাহী হইয়া উঠে।

ইহা ছাড়া স্থানে স্থানে লেখকের অলসতা দেখা যায় এবং গল্পের সুরুতেই তার সূত্রপাত। রমেন কৃপণ পিতার পুত্র—সে পিতার "কড়া শাসন" ও "যথেষ্ট চেষ্টায়"

বিদ্যায়তনের তৃতীয় শ্রেণীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না ; ফলে, তার লেখাপড়া এইখানেই শেষ হয় ! "সে পিতৃ-বন্ধুর দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইলে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিত যে, সে সৃষ্টি করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সৃষ্ট হইতে আসে নাই।" রমেনের এই উত্তর, টুকুর অর্থ আশা-করি পাঠকগণ কুভাবে ধরিবেন না। তারপর "সৃষ্টি-ক্ষমতা প্রতিভার মারফতেই আসিয়া থাকে, এমন কথার উল্লেখ কেহ করিলে, রমেন নজীর দেখাইয়া বলিত রবীন্দ্র নাথ, অমৃতলাল প্রকৃতির বরপুত্র ! ইত্যাদি।" এতবড় নজীর দেখাইবার বুদ্ধি তার ছিল ; সে কবিতাও লিখিত, কিন্তু "দারুণ গ্রীষ্মে শাল, কম্ফর্টার ও মোজা ব্যবহার করিত" কোন্ নিতান্ত গ্রাম্য বুদ্ধির বলে যা হউক, রচনাটি সংযত হইলে, চমৎকার হইত।

শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রকুমার রায় একটা শিকার কাহিনী অনুবাদ করিয়াছেন। কাহিনীটি মিঃ আস্ সমারভিল্লহেগ কর্ত্তৃক রচিত ও বিলাতের কোন প্রসিদ্ধ মাসিকে প্রকাশিত। কিন্তু খুব লোমহর্ষকভাবে কাহিনীটি রচিত নয় এবং অনেক আজগুবি কথাও ইহাতে আছে। সেজন্য ইহাতে সত্য যে কতখানি আছে পাঠক তাধরিতে পারিবেন এদেশীয় নরনারী সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাঁর কতখানি তাও জানা যাইবে। তার আরও এক নিদর্শন ছবিতে নৌকার বাঙালী আরোহী দুটির চেহারা। কাহিনীটিকে Adapt করিলে বোধহয় ভাল হইত।

এ সংখ্যায় রঙীন ছবি আছে তিনখানি। প্রথম ছবি শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মজুমদারের "সিক্তা কুসুম"। কুসুম কথাটি অবশ্য ক্লীবলিঙ্গ। জলে ভিজিয়া বোধকরি লিঙ্গ পরিবর্ত্তন করায় "সিক্তা" হইয়াছে। ছবিখানি অনেকেরই ভাল লাগিবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবি শ্রীচারুচন্দ্র সেনগুপ্তের "ওমর-খৈয়াম" ও "পূজার ফুল।" দুইখানি পট; অবশ্য কালিঘাটের নয়, জগন্নাথের নয়, বৃন্দাবনেরও নয় বহুবাজারের বসুমতী কাগজের চৈত্রসংখ্যার পটেরও শ্রী আছে। ইহাও শ্রীহীন নয়—রঙে রঙে রামধনু।

রবীন্দ্র প্রশস্তি

৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

নমস্কার ! করি নমস্কার !
কবিতা-কমল-কুঞ্জ-উল্লসিত আবির্ভাবে যার,
আনন্দের ইন্দ্রধনু মোহে মন যাহার ইঙ্গিতে,
আত্মার সৌরভে যার স্বর্গনদী রহে তরঙ্গিতে,
কূজনে গুঞ্জনে গানে মর্ত্ত হ'ল স্ফূর্তি-পারাবার
অন্তরের মূর্তিমন্ত ঋতুরাজ বসন্ত সাকার,—
নমস্কার ! করি নমস্কার !
ফটিক জলের তৃষ্ণা যে চাতক জাগাইল প্রাণে,
অমর করিল বঙ্গে মৃত্যু-হরা মৃত্যু-হারা তানে ;
ছাতারে-মুখর যুগে গাহিল যে চকোরের গান,—
করিল যে করা'ল যে জনে জনে চন্দ্র-সুধাপান ;
তত্ত্বের নিখরে যেবা বিথারিল রসের পাথার,—

নমস্কার ! করি নমস্কার !
চন্দন তরুর বনে বাঁধিল যে বাণীর বসতি,
দুর্লভ চন্দন-কাঠে কুঁড়ে বাঁধা শিখেছে সম্প্রতি—
আকিঞ্চন কবিজন গৌড়ে বঙ্গে আশীর্ব্বাদে যার,
বেণু বীণা জিনি মিঠা বাণী যার ধনি সুষমার,
চিত্ত প্রসাধনী পরী দিল যারে নিজ কণ্ঠহার,—
নমস্কার ! করি নমস্কার !
প্রতিভা-প্রভায় যার ভিন্ন তমঃ অভিচার নিশি,
আবেদনে আস্থাহীন, 'আত্মশক্তি' মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি,
ভীরুতার চিরশত্রু, ভিক্ষুতার আজন্ম অরাতি,
শোণিত নিষেক-শুভ্র নৈযুজ্যের নিত্য-পক্ষপাতী,
বঙ্গের মাথার মণি, ভারতের বৈজয়ন্ত হার,—

নমস্কার! করি নমস্কার!
রুদ্ধ-কণ্ঠ পাঞ্জাবের লাঞ্ছনার মৌনী অমারাতে
নির্ভয়ে দাঁড়াল একা বাণী যার পাঞ্চজন্য হাতে
ঘোষিল আত্মার জয় কামানের গর্জ্জন ছাপায়ে
অতিচারী ফিরিঙ্গীর ঘাঁটা-পড়া কলিজা কাঁপায়ে
তুচ্ছ করি' রাজ-রোষ উপরাজে দিল যে ধিক্কার,
নমস্কার! করি নমস্কার!

দাঁড়ায়ে প্রতীচ্যভূমে যে ঘোষে অপ্রিয় সত্য কথা,—
"জঘন্য জন্তুর যোগ্য পশ্চিমের দস্তুর সভ্যতা।"
ছিন্নমস্তা ইয়োরোপা শোনে বাণী স্বপ্নাহত-পারা
ছিন্নমুণ্ডে শিবনেত্র, দেখে নিজ রক্তের ফোয়ারা—
শিহরি' কবন্ধ মাগে যার আশে শান্তিবারি-ধার—
নমস্কার! তারে নমস্কার!

স্বদেশে যে সর্ব্বপূজ্য, বিদেশে যে রাজারও অধিক,
মুখরিত যার গানে সপ্ত সিন্ধু আর দশদিক্,—
বিশ্বকবি-ছত্রপতি, ছন্দরথী, নিত্য বন্দনীয়,
বিতরে যে বিশ্বে বোধি,—বিশ্ববোধিসত্ত্ব জগৎপ্রিয়,
নিত্য তারুণ্যের টীকা ভালে যার, চিত্ত চমৎকার,—
নমস্কার! তারে নমস্কার!

ঘাটের পাটনে এসে দেশে দেশে বরযাত্রা যার,
নিশীথে মশাল জ্বেলে যার আগে নাচে দিনেমার,
ওলন্দাজ খুলি' তাজ যার লাগি কাতারে কাতারে
শীতে হিমে রাজপথে দাঁড়াইয়া ছবি প্রতীক্ষার
ছন্দতুলি "হুণ" "গল্" যার লাগি রচে অর্ঘ্যভার
নমস্কার! তারে নমস্কার!

নয়নে শান্তির কান্তি, হাস্য যার স্বর্গের মন্দার,
পক্ক কেশে যে লভিল বরমাল্য রম্যা অরোরার;
বুদ্ধের মতন যার 'আনন্দ' সে নিত্য সহচর,
সর্ব্ব ক্ষুদ্রতার ঊর্দ্ধে মেলে পাখা যাহার অন্তর,
বিশ্ব যোগে যুক্ত যে গো "বাণী-মূর্ত্তি স্বদেশ আত্মার"—
বারম্বার তারে নমস্কার!

চারি মহাদেশ যার ভক্ত, করে ভক্তি নিবেদন,
গুরু বলি' শ্রদ্ধা সঁপে উদ্বোধিত আত্মা অগণন,
ভাবের ভুবনে যার চারি যুগে আসন অক্ষয়,
যার দেহে মূর্ত্তি ধরে ঋষিদের অমূর্ত্ত অভয়,
অমৃতের সন্ধানী যে ধ্যানী যে নির্ব্বন্ধ সাধনায়—
নমস্কার! নমস্কার! বারম্বার তারে নমস্কার!

গান

—শ্রীমনোমোহন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ

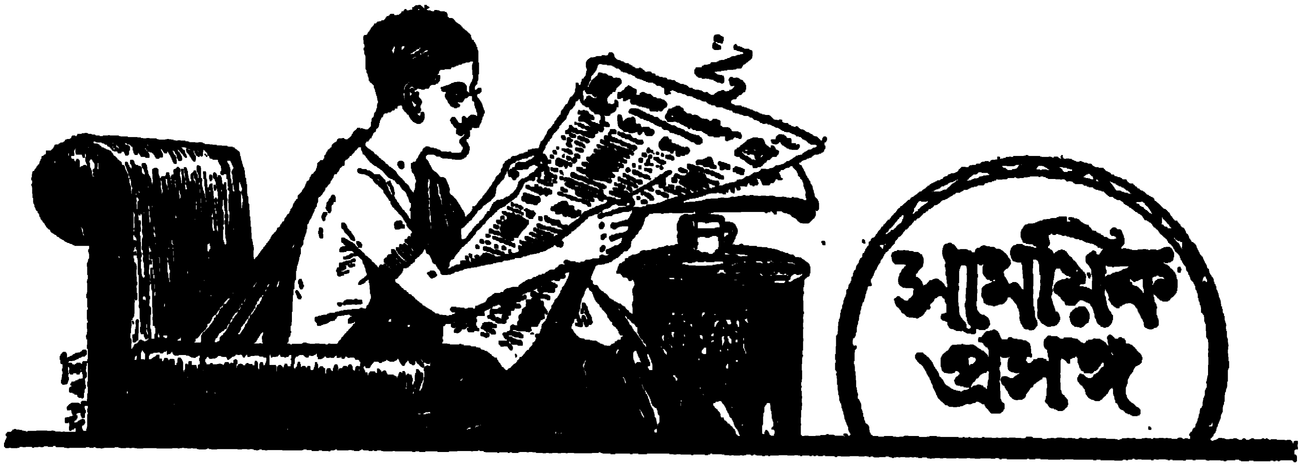
নতুন করে গাইব আজি গান!
দুখের ধুলো ঝেড়ে ফেলে, সুখের সুরে—
(আমার) বাঁধব বীণাখান॥
আলোকের এই বিমল বিভায়,
কিশলয়ের রঙীন শোভায়,
অজানা-মোর কোন্ প্রেয়সী আনলে পুলক বাণ॥
আকাশ আজ দেখে চাঁদে
তারে স্মরেই পরাণ কাঁদে,
গানের চুমায় ভাঙব তার আজ সকল অভিমান॥

"পান্থ"

শ্রীসুধীর কুমার সেন

আমার হৃদয় দুয়ারখানি রেখেছি খুলিয়া,
এতকাল পরে পান্থ; তোমারি লাগিয়া;
নৈরাশ্যের কশাঘাতে পড়ি আঁখিলোর,
বিধৌত করেছে এই কুঁড়ে ঘর মোর।

গাঁথিয়াছি ফুলমালা তব অনুরাগে,
পরাব তোমার গলে কতই সোহাগে;
এস তুমি প্রিয়তম! ললিত নর্ত্তনে—
প্রাণ মন বিকাইব, তব ও চরণে।



রবীন্দ্র জয়ন্তী

গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মতিথি গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ভারতের কবি হইয়াও বিশ্ব-কবিরূপে সম্মান অর্ঘ পাইতেছেন—স্বাধীন, অ-স্বাধীন সকল দেশেরই শ্রেষ্ঠ কবি, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদ্ সকল স্তরের গুণীরাই কবিকে শ্রদ্ধা অর্ঘ দিয়া ধন্য হইতেছেন—তাঁহার সহিত নিজেদের মত সামঞ্জস্য করিয়া লইতেছেন। সাহিত্যের সাধনার মধ্য দিয়া নিজের বাণীকে কতটা মূর্ত্ত করা যাইতে পারে রবীন্দ্রনাথ তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীরও প্রায় মধ্যভাগ পর্য্যন্ত দেশের চিন্তা ও ভাবধারা লইয়া বিশ্বব্যাপী যে খেলা খেলিয়া যাইতেছেন তাহাতে বিশ্বের চিন্তা-জগতে নূতন সুর আসিতেছে—চলিত মানব-সভ্যতার ধারায়ও একটা বিবর্ত্তনের সূচনা দেখা যাইতেছে। অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রবীন্দ্রনাথ চিরদিন তাঁহার ব্যক্তিত্বকে আড়ালে ফেলিয়া ভাব-মূর্ত্তিকেই উজ্জল করিয়া ধরিয়াছেন। কবি নিজে বেশী ধরা ছোঁয়ার মধ্যে না গিয়া—এক স্তর উর্দ্ধেই চলিয়াছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য তাঁহার অবিনশ্বর কীর্ত্তি—কাব্যে-উপন্যাসে গল্পে ভাবধারার বিন্যাসে তাহা অতুলনীয়। শান্তি-নিকেতনে কবি তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শকে রূপময় করিতে চাহিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের তুলনা রবীন্দ্রনাথই—অপর কাহারও সহিত তাঁহার তুলনা চলে না, এমনি অতুলন মানব তিনি। রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর গৌরব। জীবনের সত্তর বৎসর চলিয়াছে কবি এখনও নবীন—যেমন চির-নবীন তিনি চিরদিনই রহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে জগৎ এখনও অনেক আশা রাখে—জাগতিক সভ্যতার যোগাযোগে তাঁহার দান যে অমূল্য। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দুই বিভিন্নমুখী সভ্যতা জগতে একটা মহামারী কাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। সভ্যতার নামে মানবের হাহাকার বাড়িয়া যাইতেছে—মানুষ অমানুষিক কাণ্ড করিতেছে, রবীন্দ্রনাথের মত ক্ষণজন্মা প্রতিভাই ইহার যোগাযোগে সক্ষম—অন্ততঃ ইঁহাদের সভ্যতার বাণীতেই তাহার ভিত্তি গড়িয়া উঠিবে—তাই রবীন্দ্রের বাণী শুনিতে বিশ্বজগৎ উন্মুখ। বাংলার গৌরব, বিশ্বের গৌরব কবি রবীন্দ্র আরো দীর্ঘকাল সুস্থদেহে বাঁচিয়া থাকিয়া জগতকে অমৃতের সন্ধান দিন—

অনুন্নতদের প্রতি মহাত্মা

বোচাসাল গ্রামে বাড়িয়া নামক অনুন্নত শ্রেণীর একটি বিদ্যালয় স্থাপনকালে মহাত্মা বলিয়াছেন—"আমি আশা করি সাময়িক এই যুদ্ধ-বিরতির মেয়াদের পর আমরা পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিব এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু সে স্বরাজ সকল সম্প্রদায়ের এমন কি ভাঙ্গিদের ও মেথরদেরও স্বরাজ হইবে। সকল সম্প্রদায় যে স্বরাজে যোগ দিবে না, সে স্বরাজ স্বরাজই নহে।" সাময়িক যুদ্ধ বিরতিতে মহাত্মা কি আশা করেন এবং পূর্ণ স্বরাজে সকল শ্রেণী সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে তাহা এই উক্তিতে সুস্পষ্ট।

খৃষ্টধর্ম্ম ও মহাত্মা

সর্ব্বধর্ম্মে সম আস্থাবান মহাত্মা ভারতে খৃষ্টানী-প্রচার সম্বন্ধে মন্তব্য করায় কোন কোন মিশনারী উদ্ব হইয়াছেন—

উত্তরে মহাত্মা বলিয়াছেন—'খৃষ্টধর্ম্মই একমাত্র সত্য এবং অন্যান্য ধর্ম্ম মিথ্যা এ দাবী আপত্তির বিষয়। খৃষ্টধর্ম্ম ব্যতীত ভারতের প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম্মও খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা অসত্য নহে। ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের প্রণালীর আলোচনা করা সত্ত্বেও মিশনারীরা জানেন খৃষ্টানদের মধ্যেও আমার চেয়ে বড় বন্ধু তাঁহাদের কেহ নাই।'

অহিংসার শক্তি

মহাত্মা লিখিয়াছেন—"অহিংসায় যদি আমাদের অবিচলিত বিশ্বাস থাকে তবে ইহা ক্রমে সমগ্র জগৎ প্লাবিত করিবে। অহিংসার প্রসার জগতে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রচার কার্য্য করিবে। সময়ের গতির সঙ্গে আমরা বুঝিতে পারিব, অহিংসা ব্রহ্ম-শক্তির উৎস।'

কানপুরের দাঙ্গা

কানপুরের অতি শোচনীয় দাঙ্গায় বহু হিন্দু-মুসলমান খুন জখম হইয়াছে, মন্দির-মসজিদ ধ্বংস হইয়াছে, গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে—এসব হইবার পর দাঙ্গার ব্যাপার সম্বন্ধে যে তদন্ত হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে শান্তি রক্ষায় নিয়োজিত সরকারী কর্ত্তৃপক্ষেরা দাঙ্গা বন্ধ করিবার চেষ্টা করেন নাই—পুলিশ প্রভৃতি নির্লিপ্ত দর্শকের মত এই বীভৎস তাণ্ডব দেখিয়াছে। ঢাকায় যেমন হইয়াছিল কানপুরেও তেমনি উচ্চ রাজকর্ম্মচারীরা সাহায্য প্রার্থীদের গান্ধীর কাছে যাইয়া সাহায্য চাহিবার উপদেশ দিয়াছেন। দাঙ্গা নানা প্ররোচনায় স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাহাদেরও দ্বারা ঘটিতেও পারে—যতটা সম্ভব এ তদন্তে তাহার উদ্ধারও সম্ভব—দাঙ্গা হিন্দু-মুসলমান যাহারা করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ নিজেরা করিয়াছে তাহারা অতি দুর্ভাগ্য সবই সত্য—কিন্তু যাহাদের উপর দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ন্যস্ত, যাহাদের হাতে শক্তি প্রয়োগের সম্পূর্ণ সুবিধা রহিয়াছে, তাহাদেরও দেশবাসীর সর্ব্বনাশ চোখের উপর দেখিয়াও এরূপ ঔদাসিন্যে, কি মনে হয়? ভারতে এরূপ সম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখিয়া রাজপুরুষেরা কেহ স্বরাজের আমলের ভয়াবহ অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের চোখে আঙুল দিয়া সজাগ করিতে পারেন, আমরা স্বরাজের যোগ্য নহি বলিয়া হিতোপদেশ দিয়া নিজেদের সু-বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন, কিন্তু এসব ভারতহিতৈষীদের নিজেদের নয়ন ও মনের দুয়ার একটু সরলভাবে খুলিয়া বোঝা উচিত যে এসব হাঙ্গামা স্বরাজ-রাজ্যে ঘটিতেছে না—ঘটিতেছে বৃটিশ-রাজেই—ভারতীয় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই যাহারা ভারতীয় রাজস্বের শ্রেষ্ঠ অংশ সৈন্য ও পুলিশেই ব্যয় করিয়া আসিতেছেন তাহাদের রাজ্যেই।—এরূপ শোচনীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারতীয়দের স্বরাজ-প্রাপ্তির অন্তরায়, তাহাদের ধন, প্রাণ, মান সব বিসর্জ্জন দিবার পথ তাহা সত্য—এবং এ সত্য কঠোরতম ভাবে হিন্দু-মুসলমান দু'য়েরই উপর কতবার আপতিত হইবার পরও যে এখনও তাহাদের তেমন চৈতন্য হইল না, ইহা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়। কানপুরের দাঙ্গার তদন্ত এ সম্বন্ধে দেশের হিন্দু-মুসলমানকে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে আরও সজাগ করিতে পারে বলিয়া আশা করা যায়। এই দাঙ্গার পর 'ইদের' সময়ও অনেক স্থানে দাঙ্গার আশঙ্কা করা গিয়াছিল, কিন্তু 'ইদে'র পূর্ব্ব হইতেই কানপুর দাঙ্গার তদন্তে যে সব মজার রহস্য প্রকাশ পাইতে লাগিল, তাহাও বোধহয় দাঙ্গার ছোঁয়াচ অনেকটা নিবারণ করিতে পারিয়াছিল। এই সব আত্মঘাতী ব্যাপারের পর হিন্দু-মুসলমানকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—কোন স্বার্থপর প্ররোচকের উত্তেজনায়ই যেন দাঙ্গা করিয়া সাম্প্রদায়িক প্রভুত্ব বাড়াইতে যাইও না—তাহাতে নিজেরাই মরিবে—প্ররোচক তখন দূরে দাঁড়াইয়া হাসিবে ও নিজের স্বার্থ বুঝিয়া লইবে। এসব দাঙ্গা ক্রমাগত দেখিয়া আরো একটা কথা জোর করিয়া বলা যায় যে ভারতের আভ্যন্তরিণ শাসন-ব্যবস্থার ভার অবিলম্বে ভারতবাসীর হাতে আসা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে এরূপ শোচনীয় দাঙ্গা আর বিস্তারলাভ করিতে পারিবে না সম্ভব।

সাম্প্রদায়িক সমস্যায় সংবাদপত্র

বাংলার সাংবাদিক সংঘ 'Indian Journalists Association' এই সমস্যা সমাধানের জন্য যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। হিন্দু-মুসলমান প্রায় সকল সংবাদপত্রসেবীই 'ইদে'র দুই দিন পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্তের ভবনে সমবেত হইয়া এই সমস্যার আলোচনা করিয়াছিলেন এবং সকলে মিলিয়া

হিন্দু-মুসলমান সব সংবাদপত্রেই দু' সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি রক্ষার আবেদন জানাইয়াছিলেন। কোন সম্প্রদায়কে উস্কাইবার জন্য কাগজে উত্তেজক লেখা যাহাতে না বাহির হয় সেজন্যও 'সাংবাদিক সঙ্ঘ' চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহা ফলপ্রদও হইতেছে। সাংবাদিকগণ সংবাদপত্র দ্বারা দেশের হিতকর অনেক কিছুই করিতে পারেন—এবিষয়ে সংবাদিক সংঘ যে সব কার্য্যে এখন হাত দিতেছেন তাহাতে দেশের পূর্ণ সহানুভূতি তাঁহারা পাইবেন সন্দেহ নাই।

জাতীয় মুসলমান সম্মেলন

দিল্লীর মুসলেম সম্মেলনের মনোভাব দেখিয়া হতাশা আসিতেছিল ; লক্ষ্ণৌ জাতীয় মুসলেম সম্মেলনের মনোভাবে আবার আশার সঞ্চার হইতেছে। এই সম্মেলনের সভাপতি সার আলী ইমাম ভারত বিদিত ব্যক্তি—ইনি বলেন 'স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন নীতি জাতীয়তার অভাবেরই দ্যোতক।··· মুসলমানেরা যদি নিজেদের রক্ষা করিতে না পারে এবং হিন্দুরা তাহাদের রক্ষা না করে, তাহা হইলে সে শক্তি নিশ্চয়ই তৃতীয় পক্ষের হাতে বর্ত্তিবে। ইহা কি জাতীয়তার বিরোধী নহে—ইহাতে কি ইহাই প্রতিপন্ন হয় না যে এ দেশে যে সমর্থন পাওয়া যাইতে পারে না তাহার উপরই স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনবাদীদের ভরসা ? ইহার অর্থ চিরন্তন শিক্ষানবিসিতে থাকা। জাতীয় মুসলমানগণ স্বাধীনতার আশা পোষণ করেন---এ অবস্থায় যে তাঁহারা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনে ঘৃণা বোধ করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই।··· কোনরূপ সর্ত্ত বা বাধা নিষেধ ছাড়া অধিকৃত যুক্ত নির্ব্বাচননীতি সমর্থন করাই একান্ত আবশ্যক।···স্বার্থ সুবিধা লুটের ব্যাপারে ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ-বাটোয়ারা সম্বন্ধে অনেক কথা হইয়াছে। কোন বিধানের দ্বারা যে এই বাটোয়ারা স্থির হইতে পারে এ বিশ্বাস করি না। ভারতের স্বাধীনতা লাভে এবং রক্ষাকল্পে মুসলমানদের দানের অনুপাতেই তাহারা সে সুখ সুবিধার ভাগী হইবে।··· ভবিষ্যৎ ভারতে হিন্দু বা মুসলমান রাজ বলিয়া কিছুর স্থান হইবে না। স্বদেশ প্রেমের উদার ভিত্তির উপর ভারতীয় জনগণের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্ক স্পর্শ তাহাতে থাকিবে না।'

যুক্ত নির্ব্বাচন ও পৃথক নির্ব্বাচন এই ব্যাপারই এখন মুসলমানদের মধ্যে মহা সমস্যার বিষয়। সুতরাং যুক্ত নির্ব্বাচন সম্বন্ধে স্যর আলি ইমামও যেমন বলিয়াছেন ডাক্তার আনসারীও তেমনি বলিয়াছেন—'রাজনীতির দিক হইতে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রথা যে সাম্প্রদায়িক ভেদবিরোধ চিরস্থায়ী করিবার একটি সর্ব্বোত্তম কৌশল এ কথা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।' ডাঃ সৈয়দ মামুদও এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন উল্লেখ যোগ্য—তিনি বলেন "কতিপয় মুসলমান গৃহে আরাম কেদারায় শয়ন করিয়া মুসলমানের অধিকার গেল বলিয়া চীৎকার করিতেছেন বটে কিন্তু হাজার হাজার প্রকৃত কর্ম্মী মুসলমান জাতীয়-সংগ্রামে মৃত্যু ও কারা-যন্ত্রণা বরণ করিয়া লইয়াছেন।···ভারতীয় মুসলমানেরা ভারতকেই মাতৃভূমি মানিয়া লইয়াছে। এবং তাহারা বুঝিয়াছে মাতৃভূমির মঙ্গলের সহিতই তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল জড়িত'। ভারতের কোন সম্প্রদায় কাহাকে ছাড়িয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে না। সমবেত উন্নতি প্রচেষ্টা দ্বারাই সকলের উন্নতি সম্ভবপর।···" জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের স্বদেশিকতা ও ভারতীয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির উদার অভিমতের কাছে সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থতন্ত্রবাদ যে অদূর ভবিষ্যতেই পরিম্লান হইয়া যাইবে তাহাতে সন্দেহ কিছু নাই।

নারী সম্মেলনের প্রস্তাবাদি

কলিকাতা টাউনহলের এই সম্মেলনে নারীরা কতকগুলি প্রস্তাব করেন, তাহার কয়েকটি গৃহীত ও কয়েকটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। নারীরা ভাবী রাষ্ট্রতন্ত্রের নির্ব্বাচনে পুরুষদের সমান ভোটাধিকার চাহিয়াছেন। এ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। নিখিল বঙ্গ-নারী-প্রতিষ্ঠান ও সেবিকাদল গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্তা বাসন্তী মজুমদার প্রস্তাব করেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা ও আদান-প্রদান আবশ্যক। এজন্য ভিন্ন জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহে বাধা না দেওয়া হয়। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী বলেন অস্পৃশ্যতা নিবারণে আপত্তি করিবার কিছু নাই কিন্তু বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহে বাধা না

দেওয়ার যে কথা বলা হইয়াছে উহার কোন প্রয়োজন নাই। কেন না কেহ ঐরূপ বিবাহ করিলে কার্য্যতঃ কেহই তাহাতে বাধা দেয় না। ভোটে দিলে অনেকেই বলেন 'আমরা ঐরূপ বিবাহের পক্ষপাতিনী নহি।' শ্রীমতী শান্তি দাস এই প্রস্তাবের সমর্থনে এই মর্ম্মে বলেন যে, 'এ সমস্যাটি সাধারণ ও ক্ষণস্থায়ী নহে। যাহারা সবদিক বিবেচনা করিয়া অপর সম্প্রদায় হইতে সঙ্গী বা সঙ্গিনী গ্রহণ করিতে চান ইহাতে তাহাদের সেই স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে। এরূপ স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন হইয়াছে, কারণ সামাজিক উৎপীড়নের ভয়ে ইচ্ছামত বিবাহ করিতে না পারিয়া অনেকের জীবন দুঃখময় হইতেছে, আরও একটি কারণ আছে—বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির নরনারীর রক্তের মিশ্রণের ফলে শক্তি ও সাহস সম্পন্ন বংশধরের সৃষ্টি হইতে পারিবে এবং এই সব নরনারী সমগ্র দেশকে সম্প্রদায়ের ও জাতিভেদের ঊর্দ্ধে ভাবিতে সক্ষম হইবে। সুতরাং এই ভাবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রতিকার হইবে। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ইহার উত্তরে বলেন—হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বিবাহ হইলেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিল হইবে এমন নহে। এভাবে মিলন করিতে গেলে হয়ত সমস্ত হিন্দুকে মুসলমান হইতে হইবে নয় সমস্ত মুসলমানকে হিন্দু হইতে হইবে কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। কিন্তু কেহ এরূপ বিবাহ করিলেও কেহ বাধা দেয় না সুতরাং ঐরূপ আইনের কোন প্রয়োজন নাই। শ্রীযুক্তা অনুরূপার সংশোধন প্রস্তাবের পক্ষে ৮০ ও বিপক্ষে ১৪ ভোট হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা প্রতিভা রায় তাঁহার প্রস্তাবে বহু বিবাহপ্রথা রোধ, বিধবা বিবাহ প্রচলন পর্দ্দা ও পণপ্রথা তুলিয়া দেওয়া ও অবস্থা বিশেষে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার সাব্যস্তের কথা বলিয়াছেন। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ইহারও সংশোধন করিয়া বলেন—অবস্থা বিশেষে হিন্দুনারীর অধিকার সাব্যস্তের কথা বর্জ্জন করা হউক। ইহা আমাদের সনাতন ধর্ম্মের বিরোধী, দুশ্চরিত্র হইলেও আমরা যেমন পিতা ও ভ্রাতা ত্যাগ করিতে পারি না তেমনি স্বামীকেও পারি না। শ্রীযুক্তা অনুরূপার সংশোধন গৃহীত হয়। নারী সম্মেলনের সামাজিক বিষয়ে বিশেষ করিয়া দাম্পত্য-ব্যাপারে যে মনোভাব পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা বিদ্রোহের ভাব বিবেচিত হইলেও এ সম্বন্ধে পুরুষের ভাবিবার কথা আছে সামান্যই। আর এই ছোটখাট মহিলা মজলিসের কতিপয় ১২।১৪ জন মহিলামাত্র এই সব সম্পর্কে যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তাহা যে অন্ততঃ বাংলার নারীদের মনোভাব নহে তাহাতে সন্দেহ মাত্রও নাই। ঘরোয়া ভাবে বা ব্যক্তিগত ভাবে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনে যাহার যেমন মনোভিলাষই থাকুক না কেন তাহা এ ভাবে কোন বৈঠকে বিশেষতঃ বাংলার নারী মহাসম্মেলন নামে যাহা চালান হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ করা সঙ্গত হইয়াছে কি? ব্যক্তিগতভাবে কাহারও যদি ভিন্ন ধর্ম্মীকে বরণ না করিলে জীবন একান্ত দুঃখময়ই হইয়া ওঠে তবে স্বচ্ছন্দে তিনি তাহা করিতে পারেন—তবে সে জন্য হিন্দু সমাজ তাহাকে নাও নিতে পারে এজন্য আক্ষেপ করিবারই বা কারণ কি? বাঙ্গালীর মধ্যে সাহসী ও শক্তিসম্পন্ন লোকের অভাব আছে একথা সত্য নহে—আর ভিন্ন ধর্ম্মে বিবাহ করিলেই যে তজ্জাত সন্তান এই সব গুণসম্পন্ন হইবে একথা যে নারী একান্ত বিশ্বাস করেন ও বীর জননী হইবার যাহার একান্ত সাধ তিনি ভিন্ন ধর্ম্মীকে বিবাহ করিয়া বীর-জায়াও হইতে পারেন! নারীর আর্থিক স্বাধীনতা অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং ইহা না থাকাতেই নারীর যতপ্রকার দুর্দ্দশা আসা সম্ভব আসে, তাহাও সত্য কিন্তু আর্থিক স্বাধীনতা কি ভাবে পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে কেহ কোন বিশেষ আলোচনা করেন নাই। সভানেত্রীর বক্তৃতায় পুরুষের উপর আক্রোশের ভাব সমধিক দেখা যায়—কিন্তু ইহার সঙ্গত কোন কারণ পাওয়া যায় না পুরুষ ও নারীর পূর্ণ সহ-যোগেই সুখের সংসার-জীবন সম্ভব—রাজনৈতিক বিষয়ে নারীরা যে সব অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা ধীরে ধীরে কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপ ফল প্রসব করে দেখা যাইবে।

মইমনসিং গুণ্ডামী

মইমনসিংহে দেশনেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের উপর আক্রমণ হইয়াছিল। প্রকাশ কংগ্রেসী দলাদলির জন্যই এরূপ হওয়া সম্ভব হইয়াছিল। দেশোদ্ধারের জন্য যখন অহিংস সংগ্রাম চলিয়াছে এবং কংগ্রেসই যখন তাহা চালাইতেছে তখন একজন কংগ্রেস নেতার উপর কংগ্রেস উপলক্ষেই এ আক্রমণ দেখিবার মত বটে!

সাময়িক শিক্ষা

আমাদের সাময়িক শিক্ষা পাওয়া এবং সমর বিভাগে অধিকার থাকা যে অতি প্রয়োজন সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্রও নাই, ডাঃ মুঞ্জে এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, সম্প্রতি কলিকাতায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—বাংলায় সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন ৩ লাখ টাকা হইলেই হইতে পারে এবং জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ এ ভার লইতে পারেন।

মহাত্মা কটিবাস কেন পরেন ?

খদ্দরের অত্যধিক মূল্য জানিয়া মহাত্মা প্রমাণ ধুতি ত্যাগ করিয়া কটিবাস গ্রহণ করেন। মহাত্মা বলেন—কটিবাস পরিধানে ভারতীয় সভ্যতার সরল জীবন আনয়ন করে। অভাবের প্রাবল্যের জন্যই আজ মানবজাতির এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি এই তীব্র আকাঙ্ক্ষার দরুণই আজ মানব সমাজ এমন দোষ দুষ্ট হইয়াছে। ইওরোপ ঐহিক ঐশ্বর্য্যের মোহ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া আবার তাহার সমাজকে নূতন করিয়া গড়িতে বাধ্য হইবে। ভারতের পক্ষে স্বার্থের পেছনে ধাবমান হওয়া আর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা একই কথা। এই দারুণ অভাবের দিনে মহাত্মার বাণী লোককে হৃদয়ঙ্গম করিতেই হইবে।

কলিকাতায় খুন জখমের প্রাবল্য

রাজধানী কলিকাতায় কয়দিন হইতে খুনের বেশী প্রাবল্য হইয়াছে। অর্থ লোভে দুইজন সম্ভ্রান্ত মহিলা খুন হইয়াছেন—তারপর দিবা দ্বিপ্রহরে কলেজ ষ্ট্রীট এলবার্ট হলের প্রসিদ্ধ পুস্তক ব্যবসায়ী সেন ব্রাদাসের ভোলানাথ সেন ও দু'জন কর্ম্মচারী একসঙ্গে ছোড়ার আঘাতে দোকানের মধ্যে নিহত হইয়াছেন। দু'জন মুসলমান এই সম্পর্কে ধৃত হইয়াছে। এমন ভয়াবহ কাণ্ড কি উপায়ে বন্ধ করা যাইতে পারে সে সম্বন্ধে কলিকাতা পুলিশ বিশেষ তৎপর হইতেছেন এমন আশা করিতে পারি।

নারী ফিল্ম পরিচালিকা

ইংলণ্ডের চলচ্চিত্র জগতে কুমারী ডায়না সারেই একমাত্র মহিলা পরিচালিকা। ইনি এইচ-ভি এসমণ্ডের সেক্রেটারী থাকা কালে তাঁর নাট্যগুলির ফিল্ম অভিনয়ের বন্দোবস্ত নানা ফিল্ম কোম্পানীর সঙ্গে করিতেন। তারপর এসমণ্ডের মৃত্যু হইলে তিনি ফিল্মকেই ব্যবসায় হিসাবে গ্রহণ করতে দৃঢ় সঙ্কল্প করেন—এইভাবে ইনি বৃটানিয়া ফিল্মস্ লিমিটেড নামে নিজের কোম্পানী গড়িয়া তোলেন। আধুনিক ধরণে ফিল্ম তুলিবার খরচা অনেক তাই অর্থের বন্দোবস্ত করিতে তাঁকে অনেক ভুগিতে হইলেও এখন ধনী পৃষ্ঠপোষকের সহায়তায় তিনি ফিল্ম ব্যবসায় দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিতে পারিয়াছেন।

'Every mother's Son' ও 'Second to None' তাঁর অন্যান্য ফিল্মগুলির মধ্যে খুব নাম পাইয়াছে। এঁর 'carry on' জল যুদ্ধ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় চিত্র। ইনি শুধু যে নিজ কোম্পানীর চিত্র পরিচালনই করেন তা নয় অধিকাংশ 'সিনারিও' ইনিই লিখিয়া থাকেন।

বার্ণার্ডশ ও অভিনেতা

জগৎপ্রসিদ্ধ লেখক বার্ণার্ডশ তাঁর অদ্ভুত ব্যবহারের জন্যও অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন, এই খেয়ালী প্রতিভার সঙ্গে আবার একজন অভিনেতা কেমন খেয়ালে চলে বাজিমাৎ করিয়াছিলেন শুনুন—একজন অভিনেতার ভারি ইচ্ছা যে তিনি শ'র you never can Tell' অভিনয় করেন, কি বন্দোবস্তে অভিনয় হইতে পারে সে সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে তিনি গেলেন বার্ণার্ডশ'র বাড়ীতে। নানা কথাবার্ত্তার পর শ' এমন টাকা চেয়ে বসিলেন যে অভিনেতা একেবারে হতভম্ব, তিনি ভাবিতেই পারেন নাই যে এত টাকার কথা উঠিতে পারে তাই অভিনেতা নিরাশ হয়ে বেড়িয়ে এলেন।

বাইরে এসে ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁর মাথায় কেমন খেয়াল চাপিল তিনি পোষ্টাফিসে গিয়ে শ'র কাছে 'তার' পাঠালেন—

'নাটকখানা আমায় অমনি দিন না কেন ?'

এই তারখানা পেয়ে বার্ণার্ডশ তো একেবারে 'থ' হয়ে গেলেন।

এই অবাক্ বিস্ময়ের মধ্যেই শ' তাকে তার করে দিলেন যে সেই বন্দোবস্তেই তিনি রাজী।

এই অভিনেতা হচ্ছেন বিখ্যাত James Welch।

স্পেন রাজের রাজ্য ত্যাগ

স্পেন রাজ আলফান্সো রাজ্য ছাড়িয়া ফ্রান্স হইয়া ইংলণ্ডে গিয়াছেন। স্পেনে সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হইয়াছে। স্পেনের রাজতন্ত্রের পতন বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। রাজা সময়ে জন-মত মানিয়া লইলে তাঁহার স্বৈরাচার সংযত করিতে হইত কিন্তু হয়তো সিংহাসন হারাইতে হইত না।

বাংলায় অন্নাভাব

অর্থাভাবে বাংলা এখন বিশেষ বিব্রত। অন্নাভাবও এখন এমন প্রকট হইয়াছে যে প্রায়ই কোননা কোন স্থান হইতে অনাহার মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এখন হইতে জনসাধারণ ও সরকারের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

নূতন মেয়র

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবার কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রত্যেকবারই মেয়রের কাছে কলিকাতা বাসীরা এই নিবেদন করে যে তাঁহার আমোলে যেন কর্পোরেশনে দলের স্বার্থের চেয়ে কলিকাতার জনসাধারণের স্বার্থই বিশেষ করিয়া দেখা হয়। এবারেও অবশ্য কলিকাতা বাসীরা তেমন ইচ্ছাই করিতেছে। মেয়র ডাক্তার রায়কে আমরা স্বাগত অভিনন্দন জানাইতেছি।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের অভ্যর্থনা

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র করপোরেশনে অভিনন্দিত হইয়াছেন—ইহা অতি আনন্দের কথা।

রবীন্দ্র সম্বর্দ্ধনা

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি জানাইতেছেন—'২৫শে বৈশাখ কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হইল। আমরা মনে করি যে এই শুভ ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে, কলিকাতা নগরীতে তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা এবং একটী আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ঐ সংবর্দ্ধনা ও তাহার আনুষঙ্গিক উৎসব-অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য, আগামী ২রা জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় কালিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট গৃহে একটি পরামর্শ সভার অধিবেশন হইবে।

গ্রন্থ-পরিচয়

বৈজয়ন্তী—শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব মণ্ডল প্রণীত; রঘুনাথ পুর, বসিরহাট হইতে শ্রীযুক্ত সুধাংশু শেখর মণ্ডল কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন, ষোড়শাংশিত ১০৪ পৃষ্ঠা—মূল্য একটাকা। প্রকাশকের নিকট এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শ্রীযুক্ত বিজয়মাধব মণ্ডল 'মাসিক বসুমতী' ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় কবিতা লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। 'বৈজয়ন্তী' তাঁহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতা সমষ্টি। ইহাতে তাঁহার প্রায় ৪০টি স্বরচিত কবিতা স্থান পাইয়াছে।

বিজয় বাবু শক্তি শালী কবি—তাঁহার কাব্য আবেগ-প্রধান এবং তাঁহার বলিবার ভঙ্গীটি বলশালী। 'বৈজয়ন্তী'তে তাঁহার নানা শ্রেণীর কবিতা স্থান পাইয়াছে। ঠিক একটি সুরকে ইহার মধ্যে হইতে পাওয়া যায় না—অনেকগুলি তারে আঘাত করিয়া কবি তাঁহার বীণা বাজাইয়াছেন। কাব্যামোদী পাঠক বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়া নানা সুরের ঝঙ্কারে মুগ্ধ হইবেন। বিজয় বাবুর এই শ্রেণীর দুই একটি কবিতার নমুনা এখানে তুলিয়া দিতেছি—

"ফুলটি বড়ই ভালো বাসো নাকি—
এনেছি তাই ফুলশয্যার ফুল,
দিতে পার—কি তুমি এর লাগি—
এমন কুসুম—পরশ তৃষাকুল?"
—ফুলের মূল্য

"আজি পহেলা আষাঢ়!
নীলমেঘ মন্থর ধূসরিত অম্বর

গম্ভীর চেয়ে দূরে ধূসর পাহাড়—
আজি পহেলা আষাঢ়!

* * * *

কৈলাসে বিরহিণী ওগো বিধুরা—
যক্ষ দয়িতা তুমি কোথা আতুরা!
গবাক্ষে দেখ চেয়ে এনেছে অকাশ বেয়ে
'রাম গিরি' হতে দূত সংবাদ কার—
আজি- পহেলা আষাঢ়!"
—পহেলা আষাঢ়

"ওপরে ঝরিবে চাঁদের তারার কিরণ-অলকানন্দা,
মৃদুমন্থর লুটাবে সমীর, মদির সুরভি ভারে—
আমি প্রেমালোকে তারি মাঝখানে ফুটিব রজনীগন্ধা,
নিশি ভোরে হিয়া রিক্ত করিয়া দিয়ে যাব দেবতারে!"
—অভিশাপ

"আঁধার সাগরে তব বিশ্বব্যাপী আসে যে জোয়ার,
মিলনের সেতু কাল অলক্ষেতে রচে তার বুকে;
মিলনের মহালয়া। মর্ত্ত্যে নর অর্পে তোর-ধার;
ঊর্দ্ধ স্বর্গে পিতৃলোক ছায়া পথে ফিরে তৃপ্তসুখে।
—অমাতিথি

উদ্ধৃত কবিতাংশ কয়টি হইতে পাঠক সহজেই তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইবেন। ভাষা ও ছন্দে কবির অধিকার আছে একথা নিঃসন্দেহ;—কাব্যে আবেগ-আন্দোলিত কবি হৃদয়ের পরিচয়ও যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু সেই আবেগই যেন তাঁহাকে কয়েকটি সুন্দর কবিতার পথ ভ্রষ্ট করাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভাষা বিন্যাসের সংযত রূপ সত্ত্বেও যেন তাঁহার কয়েকটি ভালো কবিতার শেষ-রক্ষা হয় নাই।

বিজয় বাবু অনেকটা প্রাচীন রীতির পথানুসারী; তাঁহার অক্ষর বৃত্ত ছন্দের কবিতাগুলি পড়িলে কবি নবীন সেনের কবিতার পদগুলি মনে আসে—

"লক্ষ্মী পূর্ণিমার উষা ধীরে ধীরে ধীরে—
...প্রভাসের তীরে বসি কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়
শিলাসনে ধ্যানমগ্ন।"

বাংলা কাব্য সাহিত্যের পূর্ব্বাকাশে যে নবারুণ-রশ্মি দেখা যাইতেছে, যে দুঃসাহস ও উৎসাহের আভাস দেখা যাইতেছে বিজয় বাবু বোধহয় তাহা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন।

উৎকৃষ্ট কাব্য-পাঠের অনুশীলন করিতে করিতে অবহিত সাধনায় কবি বিজয়মাধব উত্তর কালে নিঃসংশয়ে যশস্বী-হইবেন-একথা আমরা তাঁহার বৈজয়ন্তী পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি।

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

ভ্রমণের নেশা - শ্রীমণীন্দ্র নাথ মুস্তফী। প্রকাশক মেসার্স এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স্ কলিকাতা।

বাঙালীর ছেলেদের যে Adventure স্পৃহা কতখানি, ঘোর বিপদের মাঝেও তাঁরা যে চিত্তের স্থৈর্য্য, সাহস ও বুদ্ধি হারান না; সর্ব্বোপরি পরিহাস-রস-পিপাসা যে তাঁদের মনে পরিপূর্ণ-রূপে উচ্ছ্লিত থাকে, পুস্তকখানি তার একটী চমৎকার উদাহরণ।

কয়েকটি বাঙালীর ছেলে বাইসাইকেলে কলিকাতা হইতে চিল্কা, পুরী, দার্জ্জিলিং, বারাণসী, ভারতের সুদূর উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত ও কাশ্মীর ভ্রমণ করেন। ইহাতে ভ্রমণের আনন্দটুকু যেমন পরিপূর্ণ ভাবে ইঁহারা ভোগ করিয়াছিলেন, তেমনি আবার বিপদ ও বিপত্তির মাঝেও পড়িয়া ছিলেন কম নয়। পুস্তকে পথের ও বনের সৌন্দর্য্য বর্ণনায় মন যেমন উধাও হইয়া চলে তেমনি আবার আঁধার রাতে বাঘের জ্বলন্ত চোখ, বনের ধারে মত্ত করীর দল ও গাছের ডালে দোদুল্যমান অজগরের কথায় থমকিয়া দাঁড়ায়। বর্ণনা-ভঙ্গী ও দৃশ্য-বৈচিত্র্যে পুস্তকখানি বার বার পড়িয়াও আশা মিটে না।

এই-তো গেল এক দিক। আর একটী দিক, যেটিকে আমরা বাঙালীরা উপেক্ষা করিয়া চলি—ইঁহাদের নিয়মানুবর্ত্তিতা। এই গুণটি যে সকল কাজের ধারা সুনিয়ন্ত্রিত করে, এই-কথাটি সম্যক বুঝিয়া ইঁহারা কয়েকটি অতি সাধারণ ও সহজ নিয়মে নিজেদের সুশৃঙ্খলিত করিয়া চলিয়াছিলেন। সেই কারণেও বোধ করি ঘোর বিপদ ও বিপত্তি ইঁহাদের পক্ষে কাটাইয়া উঠা সম্ভব হইয়াছিল। পুস্তক-শেষে যে পথ ধরিয়া ইঁহারা ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তার চমৎকার একখানি মানচিত্র আছে যাহা পদ-চারী বা মোটর-চারী-সকলের পক্ষেই বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। পথের বিশেষ বিশেষ স্থানের অনেকগুলি ছবিও আছে।

পুস্তকখানি বিশেষ করিয়া প্রত্যেক কিশোর ও যুবকের পাঠ করা উচিত। এবং ইহা ঘরে রাখিবার মত সামগ্রী। ছাপা ও কাগজ ভাল; কাপড়ে বাঁধা প্রচ্ছদ পটে ভ্রমণকারীদের সঙ্কের—ক্যালকাটা হুইলার্স—একটী নিদর্শন আছে। মূল্য মাত্র দেড় টাকা।



মিলন

"বিদ্যাসুন্দর"
শিল্পী- চারু সেনগুপ্ত



৫ম-বর্ষ | আষাঢ়, ১৩৩৮ | ৩য় সংখ্যা

মহাত্মা গান্ধী ও বর্ত্তমান সভ্যতা

—প্রবন্ধ—

শ্রীভারত কুমার বসু

মহাত্মা গান্ধী ভারতের বস্তুতান্ত্রিকতার একান্ত বিরোধী; অর্থাৎ, তিনি মোটেই চান না যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা অন্ধ হ'য়ে ভারতবর্ষ তার প্রাচীন সভ্যতাকে হারায়। তাই তিনি বলেন, "মিল্," রেলপথ, মোটর ইত্যাদি ইত্যাদির কোনোই দরকার নেই এখানে। এস্থলে এই রকম প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক যে, মোটর-ইত্যাদির দ্বারা ভারতবাসীদের তা হ'লে কি কোনোই সুবিধা-স্বাচ্ছন্দ্য হচ্ছে না? এর উত্তরটি-ই আলোচনা করা হবে:—

প্রথমতঃ জানা উচিৎ, মোটর-ইত্যাদি প্রধানতঃ কাদের সুবিধার জন্য সৃষ্ট হ'য়েছে?—নিঃসন্দেহে ধনীদের জন্য; —গরীবদের জন্য নয়। মহাত্মা গান্ধী বার্‌বার্ এই গরীবদের কথাই উল্লেখ করেন। বর্ত্তমান-সভ্যতা আমাদের দেশকে যে কত উন্নত ক'রেছে, তার প্রকৃত পরিচয় পেতে হ'লে, প্রত্যেক দরিদ্র-পল্লীতে ভাল ক'রে ঘুরে আসা দরকার। মহাত্মা গান্ধী তাঁর জীবনের অনেকগুলি দিন এই দরিদ্র-পল্লীতে কাটিয়ে যথেষ্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রেছেন। তিনি গরীবের চির-বন্ধু। গরীবদের জন্য তাঁর গৃহ-দ্বার সদাই উন্মুক্ত। এইজন্যই, গরীবের ব্যথা কোথায়, ধনীরা তা না জানলেও, মহাত্মাজীর কাছে তা অজানা নেই। তিনি আরও জানেন যে, ভারতবর্ষে ধনীর চেয়ে গরীবের সংখ্যাই বেশী। সুতরাং গরীবদের উন্নত করা মানেই ভারতের উন্নতি করা।

বর্ত্তমান সভ্যতা হয়ত আপত্তি তুলে ব'লতে পারে যে, মোটর-ইত্যাদি এখানে চ'লবে না কেন? কিন্তু এর উত্তরে, কোটি-কোটি অভাব-ক্ষুণ্ণ অর্দ্ধোপবাসী গরীবের কণ্ঠ সাড়া দেবে, "আগে আমাদের অনাহার থেকে বাঁচাও! তারপর তোমার বিলাসিতা!"—নিরন্ন দুঃখীর আত্মা যেখানে অশ্রু ফেলছে, সভ্যতার ধনিক-বাদ সেখানে কতখানি অপরাধী, সে-কথা একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে। এবং যত দিন পর্য্যন্ত এই ধনিক-বাদ দেশে বর্ত্তমান থাকবে, গরীবের দুঃখও ততদিন একটুও ক'মবে না; রাস্কিন, টলষ্টয়, রোমাঁ রোলাঁ, এইচ্. জি. ওয়েলস্,

আনাটোল্ ফ্রাঁস্ প্রভৃতি চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরও এই ধারণা এবং বিশ্বাস।......

বর্ত্তমানে পৃথিবীর যে-কোনো দেশের বিষয় আলোচনা ক'রতে গেলে, কেবল যে এই জানতে পারা যাবে যে, ধন-তান্ত্রিক সভ্যতা সেই দেশে যথেষ্ট গোলযোগের সৃষ্টি ক'রেছে, তা নয়। জানতে পারা যাবে যে, উক্ত সভ্যতা একমাত্র বিংশ শতাব্দীতেই জন্ম গ্রহণ করেনি;—তা ক'রেছে বহু—বহু বছর আগেই। ক্ষয়, ধ্বংস এবং মৃত্যুকে পিছনে-আনা রোগের মতো উক্ত সভ্যতা এক কালে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। মিশর-দেশের ফ্যারাও-'সভ্যতা' ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এই সভ্যতা একদিন যখন মিশরের নির্দ্দিষ্ট কতিপয় ব্যক্তির জন্য স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতার পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছিল, সেই সময়ে সেই-খানকার-ই অবিশিষ্ট অসংখ্য লোক জীবিকার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলতো এবং প্রত্যহ প্রায় অনাহারেই থাকতো। এই সময়েই সেখানে অভ্যুত্থান হয়েছিল—গরীবের বন্ধু এক মহাপ্রাণ ব্যক্তির। নাম তাঁর মুশা (Moses)। ফ্যারাও-রাজতন্ত্রের প্রতি অসাধারণ ঘৃণা নিয়ে তিনি তথা-সভ্যতা'র বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। উৎপীড়িত হিব্রুদের উন্নতি ও মুক্তি বিধান করাই তাঁর জীবনের এক-মাত্র উদ্দেশ্য হ'লো। এইজন্যই, বর্ত্তমান কালে ফ্যারাও-দের নাম বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে গেলেও, আজও পর্য্যন্ত কি-খৃষ্টান, কি-মুসলমান—উভয় ধর্ম্মাবলম্বীদের-ই কাছে ঈশ্বরের প্রেরিত ব'লে এক ব্যক্তি যার-পর-নাই শ্রদ্ধা ও সম্মান পান। বাইবেলে এই পুণ্যাত্মার-ই সম্বন্ধে লেখা আছে:—

"বয়স্থ হবার পর মুশা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে ফ্যারাও-র দৌহিত্র ব'লে অভিহিত হ'তে চাইলেন না। পাপের আনন্দ উপভোগ করার চেয়ে তিনি বরং ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষদের সঙ্গে অনাচার সইতে চাইলেন। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে তিনি মিশর ত্যাগ ক'রলেন। রাজার ক্রোধের জন্য তিনি ভয় ক'রলেন না, কারণ, যে-মহাপুরুষ লোক-লোচনের অন্তরালে অবস্থান ক'রছেন তাঁর-ই দেখা পাবার জন্য তিনি ধৈর্য্য ধ'রেছিলেন।"

আর-একটী দৃষ্টান্ত ধরা যাক। দরিদ্র প্রজাদের প্রতি অবহেলা করার জন্য রোম্যান্ সাম্রাজ্যের পতন হ'য়েছিল। এবং এ-পতনের একমাত্র কারণ, ব্যাবিলন্ ও মিশর-দেশের সভ্যতার মতো উক্ত সাম্রাজ্যের সভ্যতা-ও অসংখ্য শ্রমিক ক্রীতদাসের অশ্রু এবং রক্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। রোম্যান্ সাম্রাজ্যে অল্প-সংখ্যক লোক-ই স্ফটিক-ভবনে বিভিন্ন প্রকারের আমোদ-সুখ উপভোগ ক'রতো। ক্রীতদাসেরা তাদের হাতের কাছে রাতদিন-ই থাকতো—আদেশের অপেক্ষায়। কিন্তু সেই সময়ে সাম্রাজ্যের দরিদ্র ব্যক্তি যারা, তাদের রুটির টুকরো খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হ'তো। নেপল্স্-উপসাগরের তীরে পম্পিয়াই ও হার্‌কিউলেনিয়ামের সমুদ্র-তীরস্থ ভবনে প্রাচীন রোমের লক্ষপতিরা সম্পদ ও পাপ-কার্য্যের জাঁক-জমকে ফেটে প'ড়তো। ঠিক এই সময়েই দূরস্থ জুডা-প্রদেশে একটি মহা-মানব কৃষকের অভ্যুত্থান হয়। নাম তাঁর যিশু,—নাজারেথের যিশু। গ্যালিলি-সাগরের তীরে ধন-গর্ব্বিত গ্রীসো-রোম্যান্ সহরগুলির মধ্যে মনুষ্যত্ব-ধ্বংসকারী এই সভ্যতার পরিচয় পেয়ে, তিনি তাঁর দুঃখ এইভাবে জানালেন:—

"হায় বেথ্সাইদা! হায় কেপার্নেয়াম্! আকাশ-স্পর্শী প্রাসাদ নিয়ে তোমরা কি উন্নত হ'য়েছ? নরকে তোমাদের অধঃপতন হবে!"

স্বর্ণ, স্ফটিক, বিলাসিতা এবং উৎসব-প্রধান দেশগুলির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে যিশু শেষে গরীবদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও শান্তির বাণী দিলেন:—

"এস, যত শ্রমিক! এস যত ব্যথাতুর! এস আমার কাছে! আমি তোমাদের শান্তি দেবো! তোমরা আমার ভার নাও এবং আমার কাছে দীক্ষা নাও! আমার অন্তঃকরণ সরল ও বিনম্র। তোমরা অন্তরে শান্তি পাবে।"

যিশুর এই বাণীতে দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের ইঙ্গিত ছিল না;—ইঙ্গিত ছিল—আত্মিক আনন্দের। যিশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, তারা যেন ঈশ্বরের পূজা করবার সুযোগ খোঁজে এবং অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে "ম্যামনকে" অর্থাৎ, উপরোক্ত সম্পদ-গর্ব্বিত বিলাসী সহরগুলির আরাধ্য ধন-দেবতাকে। অক্ষুন্ন মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে যিশুর যা-আদেশ, তা তিনি বুঝিয়ে দিলেন এই কটী বাণীর সাহায্যে:—

"মাঠের ওই পদ্মফুলগুলি কি-ভাবে জ'ন্মেছে, সে-কথা একবার ভেবে দেখ'! তারা পরিশ্রম করে না, সুতা-ও কাটে না। তবুও আমি তোমাদের ব'লছি যে, সুলেমন

(Solomon) তার সমস্ত গৌরব নিয়ে থাকলেও, ওদের একটার মতন-ও তার পরিচ্ছদ ছিল না। সুতরাং, ঈশ্বর যদি মাঠের তৃণকে ওই রকম পরিচ্ছদ দেন, যে-তৃণ আজ আছে, কিন্তু কাল-ই উনুনের মধ্যে যাবে, তা হ'লে, হে নাস্তিকের দল! তিনি তোমাদের আর কত বেশী পরিচ্ছদ দেবেন? সুতরাং, আমরা কি খাবো, কি পান ক'রবো, অথবা, কোথা থেকে পরিচ্ছদ পাবো, এ-সব কথা ব'লে ব্যস্ত হ'য়ো না!...ঈশ্বরের রাজত্বের খোঁজ করো! তাঁর ন্যায়-নিষ্ঠার অনুসন্ধান করো! তা হ'লেই, উক্ত জিনিষগুলি তোমরা পাবে!"

—যিশুর মুখ থেকে এই কথাগুলি উচ্চারণ হবার কিছুদিনের মধ্যেই রোম্যান্-সাম্রাজ্য ধূলিতে মিশিয়ে গেল। বড়-বড় রোম্যান্ সম্রাটদের নাম আজকাল বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছে। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত সেই সময়কার এক ব্যক্তির নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল অক্ষরে ফুটে আছে—অমর হ'য়ে। পৃথিবীর এ-পার হ'তে আরম্ভ ক'রে ও-পার পর্য্যন্ত প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক লোক-ই তাঁকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করে, সম্ভ্রম করে, ভক্তি করে—দেবতার মতো। দেবতাত্মা এই মহা-মানব-ই ছিলেন—নাজারেথের সেই দরিদ্র-বন্ধু কৃষক—খৃষ্ট,—যিশু খৃষ্ট। মানুষের কাছে তিনি-ই ঈশ্বরের অভিপ্রায় প্রচার ক'রেছিলেন।...

আর-একটী দৃষ্টান্ত ধরা যাক :—

বাইজ্যান্‌টাইন্-সাম্রাজ্যও "সভ্যতা"র চরমে উঠেছিল। এর রাজধানী ছিল আড়ম্বরপূর্ণ সহর কন্‌ষ্ট্যান্টিনোপ্‌ল্। এর বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল এ্যালেক্‌জেণ্ড্রিয়া ও এ্যাণ্টিয়ক্-নামক স্থানে। এক-হাতে সম্পদ এবং আর-এক হাতে গরীবের রক্ত নিয়ে এই সাম্রাজ্যের "সভ্যতা" গ'ড়ে উঠেছিল। ঠিক এই সময়েই সুদূর আরব্যে এক মানব-ঋষির অভ্যুত্থান হয়। প্রকৃতির উন্মুক্ত হাওয়ার মধ্যে দারিদ্র্যকে বন্ধু ক'রে সমস্ত প্রকার বিলাসিতাকে তিনি দূরে রেখেছিলেন। ত্যাগী ফকির এই মহাত্মার নাম-ই মহম্মদ,—ইস্‌লাম্-ধর্ম্মের হজরৎ মহম্মদ। অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ ক'রে থাকেন যে, সিরিয়া ও মিশর-বিজয়ের জন্য আরবেরা অত চমৎকারভাবে তাদের অভিযান সুরু ক'রেছিল কি ক'রে! কিন্তু এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ, তাদের জীবনের সারল্য, পরিশ্রমের সময়ে হাসি-মুখে তাদের সহগুণ, ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে তাদের পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব, বাইজ্যান্‌টাইন্-সভ্যতার বিলাসিতা হ'তে তাদের বিরতি এবং দরিদ্র-পীড়নের অনিচ্ছা—এই জিনিষগুলির মধ্যেই তাদের চরিত্র-গত বিশেষত্ব এবং আদর্শের পবিত্রতা লুকিয়ে ছিল। তারা সিরিয়া ও মিশর জয় ক'রলে। কিন্তু জয় ক'রলে—দেশ-শাসন ক'রতে নয়,—দেশের লোককে মুক্তি দিতে।

সমস্ত পার্থিব সাহায্য ও আশা থেকে বঞ্চিত হবার পর হজরৎ মহম্মদ গুহার ভিতরে ধর্ম্মপ্রাণ আবু বকর্-এর সঙ্গে একদিন যা কথা ক'য়েছিলেন, তা মনে রাখবার উপযুক্ত :—

আবু বকর্ হজরত্‌কে বললেন, "আমরা দুজনে এক পাশে প'ড়ে রইলুম।"

হজরৎ মহম্মদ বললেন, "না, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন। তিনিই তৃতীয় ব্যক্তি।"

মহম্মদ ব'লতে চেয়েছিলেন যে, মানুষের সত্যকার শক্তি পৃথিবীর জড়-সম্পদের মধ্যে থাকতে পারে না। তা থাকে—অ-পার্থিব আশীর্ব্বাদের মধ্যে, যে-আশীর্ব্বাদ ঈশ্বর নিজের হাতে সর্ব্বদাই বর্ষণ ক'রছেন। মানুষের সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের দূরে, পরমেশ্বরের পূজার মধ্যে এমন একটী বড় সম্পদ আছে, যা বাইরেকার কোনো জিনিষই এনে দিতে পারে না। বাহ্যিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যেদিন বিদায় নেবে এবং মানুষের আত্মা যেদিন মুক্ত হবে, সেদিন মানুষ যে কী পবিত্র বায়ু নিঃশ্বাসে গ্রহণ ক'রবে, বর্ত্তমান সভ্যতার স্বাচ্ছন্দ্যের আবহাওয়ার মধ্যে তা ধারণা করা যায় না। 'বোধি'-বৃক্ষের তলে বুদ্ধের ত্যাগ,—গুহার মধ্যে মহম্মদের সাধনা,—এগুলি দ্বিতীয় বারের জন্য পৃথিবীতে আত্ম-প্রকাশ করে খুব কম। এবং এই প্রকাশের মধ্যে যে-প্রেরণা, যে-শক্তি ঘুমিয়ে থাকে, তা অনন্ত।...

এরই অন্তর্নিহিত সত্যটাকে মহাত্মা গান্ধী চিনেছেন এবং তারই কথা তিনি প্রচার ক'রছেন—সম্পূর্ণ এক অশ্রুতপূর্ব্ব উপায়ে। নাজারেথের যিশুর মতোই যেন তাঁর বাণী সমান গাম্ভীর্য্যে ফুটে উঠছে,—"তোমরা ঈশ্বর এবং ম্যামনের (ধন-দেবতার) পূজা ক'রতে পারবে না!" —"ঈশ্বর ত আমাদের সঙ্গেই আছেন।"—"আগে ঈশ্বরের রাজ্যের অনুসন্ধান করো।"—ধর্ম্ম-নিষ্ঠার প্রত্যেক যুগই

সত্যের এই স্বর্গীয় বাণীকে জাগ্রত শক্তির দ্বারা মানুষের অন্তরের কাছে এনে দেয়। যাঁরা সমস্ত জিনিষ ত্যাগ ক'রে এই সত্যের বাণীকে একান্তভাবে গ্রহণ করেন, তাঁদের প্রায়ই 'উন্মাদ' ব'লে উপহাস করা হ'য়ে থাকে। স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগী জগতের কাছে যারপর নাই "নির্ব্বোধ" ব'লে তাঁরা আখ্যা পান। কিন্তু তাঁদেরই এই "নির্ব্বুদ্ধিতা" ঈশ্বরের সেই "নির্ব্বুদ্ধিতার" সঙ্গে সমান, মানুষের বুদ্ধির গর্ব্বকে যা ধূলির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে। এবং তাঁদের "দুর্ব্বলতা," ঈশ্বরের সেই "দুর্ব্বলতার" সঙ্গে সমান, মানুষের দাম্ভিকতার তেজকে যা ধ্বংস ক'রে দিতে পারে। মহাত্মা-সাধুদের সম্বন্ধে প্রত্যেক জাতিরই ধর্ম্ম-পুস্তকে লেখা আছে:—"ঈশ্বরের প্রতি তাঁরা বিশ্বাস রাখেন।···ঈশ্বরই তাঁদের শক্তি।"—লোক-লোচনের অন্তরালে সেই পরম-পুরুষের সাক্ষাৎ পাবার জন্যই এই মহাত্মারা কী কষ্টই না সহ্য ক'রে থাকেন!···এইতেই ভগবদ্ভক্তি প্রকাশ পায়। মহাত্মা গান্ধী, কথার দ্বারা নয়, কাজের দ্বারা এই পবিত্র ভক্তির বাণীই প্রচার ক'রছেন,—"ঈশ্বরের অস্তিত্বকে স্বীকার করো! তাঁর উপর নির্ভর করো! তাঁকে বিশ্বাস করো!"—এই বিশ্বাসের দ্বারাই মুশা, মহম্মদ, বুদ্ধ কিম্বা যিশুকে শ্রদ্ধা ক'রতে পারা যাবে, এবং তাঁদের কার্য্যকে আর "উন্মত্ততা" ব'লে অপমান করা যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে থাকবে যে, পৃথিবীর ইতিহাস তাঁদের 'উন্মত্ততা'কেই সার সত্য ব'লে প্রমাণ করে দিয়েছে!···

রোম-দেশের মতো গরীবের রক্তলেহী সভ্যতার অস্তিত্ব ভারতে থাকা মনেই, রোমের সেই স্মরণীয় দুরদৃষ্টের সম্ভাবনা এখানে আশা করা নয় কি?···এইজন্যই, কৃত্রিমতা-পুষ্ট বর্ত্তমান যুগের বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে মুক্তি পাবার জন্য ঋষি-গান্ধীজীর পুণ্যাত্মা যেন ছুটে যেতে চাইছে ঠিক সেইখানে, যেখানে মরুভূমির উন্মুক্ত বাতাস—মহম্মদের সারল্য ও দেব-ভক্তিকে সযত্নে গ'ড়ে তুলেছিল;—যেখানে উদার আকাশের তলে গ্যালিলির মাঠের তৃণকে ধন্য ক'রে নাজারেথের যিশু তাঁর প্রথম-শিষ্যদের কাছে ঈশ্বরের মানব-প্রীতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন;—যেখানে প্রাচীন ভারতের তপোবন-আশ্রমে মানবের অন্তরে সত্যকার আত্ম-প্রকৃতির বিকাশ হ'য়েছিল;—যেখানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মঠে লোকেরা শিক্ষা ক'রতো—অনিষ্টের প্রতিদানে ইষ্ট দিতে এবং ঈশ্বরের সৃজিত সকলেরই প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হ'তে।

বর্ত্তমান-ভারতের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতায় মানুষ কি শিখছে? শিখছে কেবল কতকগুলি কু-আদর্শ। শিখছে কেবল গরীবের রক্ত-শোষণ করবার ঘৃণ্য কৌশল। এই শিক্ষার দ্বারা সরলতা, কোমলতা এবং সত্যের অপমান হচ্ছে, ক্ষয় হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে।

বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার সাড়ম্বর বিলাসিতা যখন সুপ্রচুর মূল্যে এখানে ক্রয় করা হচ্ছে, অভাগা এই দেশের কত গরীব যে তখন নিরন্ন হ'য়ে ঈশ্বরের কাছে তাদের অশ্রু-সজল প্রার্থনা নিবেদন ক'রছে, কে তার গণনা ক'রবে? গরীবের বন্ধু মহাত্মা গান্ধী তা গণনা ক'রেছেন। এবং তা ক'রে রক্ত-লোলুপ উক্ত সভ্যতার প্রতি দারুণ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে, অসহায়ের আশ্রয় সেই পরম-পিতার কাছে অ-মনুষ্যত্ব-ধ্বংসকারী ঐশ্বরিক শক্তির সাহায্য চাইছেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যিশু-জননী মেরীর মুখ থেকে যে-কথা একদিন গঙ্গাজলের মতোই পবিত্র প্রেরণায় উচ্চারণ হ'য়েছিল, গান্ধীজীর সারা অন্তর যেন তারই পুনরাবৃত্তি ক'রে ব'লছে,—"আমার আত্মা সেই পরম-পিতার প্রশংসায় মুখর। আমার প্রাণ, আমার পরিত্রাতা পরমেশ্বরের ধ্যানে আনন্দ-বিভোর। তিনি আমার ক্ষুদ্রত্বকে মর্য্যাদা দিয়েছেন। তাঁর বাহুর দ্বারা তিনি শক্তি দেখিয়েছেন। গর্ব্বিত ব্যক্তিদের অন্তরের কল্পনাকে তিনি বিক্ষিপ্ত ক'রে দিয়েছেন। ক্ষুধার্ত্তদের তিনি সুখাদ্য দিয়েছেন, এবং ধনীদের তিনি ক'রেছেন নিঃস্ব!"

বিগত 'সভ্যতা' ও সাম্রাজ্যগুলির পতনের কারণ জানতে পারার জন্য, এবং উক্ত 'সভ্যতার' সেই প্রাচীন-পন্থী অসাধুতাকে বর্ত্তমান জগতে জয় করার জন্য, এবং প্রকৃতি-অনুগত মানব-জীবনের সরলতা ও সত্যকে চিনতে পারার জন্য, মহামানব গান্ধী আজ ভারতকে নবীন আশায় উদ্দীপিত ক'রেছেন। শক্তি তাঁর, আত্ম-বিশ্বাস! বন্ধু তাঁর—ভক্তির ভগবান!···

মহাত্মা গান্ধী-প্রার্থিত সরল এবং স্বাভাবিক জীবন একদিন অতীত-ভারতেরই সকলের চেয়ে বড় সম্পদ ছিল। তখনকার লোকেরা এই জীবনকেই ভালবাসতো,—বড় ভালবাসতো, এবং এর মধ্যেই সুখ পেতো, আনন্দ পেতো,

শান্তি পেতো। আক্রমণের ঝড় তাদের মাথার উপর দিয়ে যতই ব'য়ে যাক না কেন, তারা আবার এই শান্তিময় জীবনের মধ্যে ফিরে আসতো। দেশের প্রত্যেক নদী, সরোবর এবং পর্ব্বতকে তারা সশ্রদ্ধ প্রীতির চোখে দেখতো। জন্মভূমির মাটী তাদের কাছে কী পবিত্রই না ছিল। কত বিজেতা রাজাই তাদের দেশকে উপর্য্যুপরি বিধ্বস্ত ক'রে দিয়ে যেতো। কিন্তু তারা বরাবরই তাদের একান্ত-প্রিয় সারল্য-ভরা জীবন অবলম্বন ক'রে সুখী হ'তো, প্রীত হ'তো।...কিন্তু তাদেরই দেশ এই ভারতবর্ষ যেদিন থেকে পাশ্চাত্যের প্রভাবাধীন হ'য়ে প'ড়লো, সেইদিন থেকেই তাদের কোমল এবং সারল্যভরা জীবন আহত হ'য়ে প'ড়লো। এইজন্যই, আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক শক্তির দ্বারা প্রাচীন ভারতের হাতে-তৈরী যে-বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হ'তে চ'লেছে, তাকে রাহু-গ্রাস থেকে বাঁচাবার জন্য মহাত্মা গান্ধী যে রকম আ-প্রাণ চেষ্টা ক'রছেন, ঠিক সেই রকমই তিনি চেষ্টা ক'রছেন—আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক শিক্ষার দ্বারা প্রাচীন ভারতের প্রায়-ধ্বংসলীন কোমল ও সরল জীবনকে বাঁচিয়ে তোলবার জন্য। তাঁর এই পবিত্র প্রচেষ্টাকে, ঘৃণ্য মনোবৃত্তিযুক্ত কোনো কোনো লোক যে অবাঞ্ছনীয় স্পর্দ্ধায় উপহাস ক'রছেন না, তা নয়। তাঁরা "গান্ধী টুপী"কেও আক্রমণ ক'রতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। এমন কি, তাঁদের মধ্যে এক ব্যক্তি (ব'লতে ঘৃণা হয় যে, ইনি ভারতের বুকে জন্মগ্রহণ ক'রে, ভারতেরই অন্নজলে বর্দ্ধিত এবং পুষ্ট হ'য়েছেন। ইনি হিন্দু এবং ডাক্তার।) এ রকম কথাও লিখতে (১৯২১ সালের একখানি ইংরাজী পত্রিকায়) কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন নি যে, "গান্ধীর সাধারণ-তন্ত্রের জগৎ হচ্ছে টলষ্টয়ের সাধারণ-তন্ত্রের জগতের মতো। তার মধ্যে প্রত্যেক লোক, জঙ্গলের সুখী, বুনো জন্তুর মতো প্রকৃতির অবস্থায় বসবাস করে।"

"জঙ্গলের সুখী, বুনো জন্তুর মতো"—এই ঘৃণ্য কথাগুলো ভারতবাসীর পক্ষে অত্যন্ত অপমানকর। এই অপমানকর কথাগুলোর সার্থকতা কোথায়, তা বিচার করবার প্রয়োজন এখানে নেই। উক্ত শ্রেণীর লেখকদের কাছে, মহাকবি গ্যেটের দ্বারা উচ্চ-প্রশংসিত কালিদাস-লিখিত "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্"-এর তপোবন-আশ্রমের পবিত্র, স্নিগ্ধ চিত্র কি-রকম বরদাস্ত হবে, তা জানবারও দরকার নেই। এখানে শুধু এইটুকু ব'ললেই যথেষ্ট হবে যে, লক্ষ্মণকে সঙ্গী ক'রে, সীতাকে নিয়ে অরণ্যের মধ্যে রামের নির্ব্বাসিত জীবনের কাহিনী, প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রাণে বন-আশ্রম-জীবনের যে-মধুর আদর্শটিকে এনে দেয়, তা অতুলনীয়। এই আদর্শকেই মহাত্মা গান্ধী ভালবাসেন। এ-ভালবাসাকে তিনি কাজের দ্বারা গৌরবান্বিত ক'রতে চান। এদিক দিয়ে তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা—দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেস্‌বার্গ্‌ থেকে একুশ মাইল দূরস্থ একটী স্থানে তাঁর প্রতিষ্ঠিত "টলষ্টয়-আশ্রম"। বাস্তবিকই এই আশ্রম যেন টলষ্টয়ের-ই চিন্তা-ধারার অনুপ্রেরণায় উদ্দীপিত ছিল। সরল জীবন-যাত্রা এবং উন্নত চিন্তাই ছিল এই আশ্রমের আদর্শ। মহাত্মা গান্ধী তখন জোহানেস্‌বার্গে আইন-ব্যবসা ক'রতেন। কিন্তু আধুনিক সহরের তথা-কথিত সভ্যতা তাঁর কাছে স্রেফ্‌ ফাঁকা এবং মূল্যহীন ব'লেই প্রতিপন্ন হ'লো, এবং হিন্দুর আদর্শ অনুযায়ী, সে-সভ্যতাকে তিনি অপরাধী ব'লেই মনে ক'রলেন। এরপর-ই তাঁর কর্ত্তব্য সুরু হ'লো। দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক উচ্চ-শিক্ষিত এবং স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগী ব্যক্তিরা পর্য্যন্ত এসে, "টলষ্টয়-আশ্রমে" তাঁর সঙ্গে লাঙ্গল ধ'রলেন এবং জমি চাষ ক'রতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সকলেই রেল ও অন্যান্য বিলাসিতা-ও বর্জ্জন ক'রলেন।

মহাত্মা গান্ধী তাঁর দ্বিতীয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন—নেতালের মধ্যে ফিনিক্স-নামক স্থানে। চারিদিকে সুন্দর পাহাড়-ঘেরা এই আশ্রমটীর কাছেই সাগর ব'য়ে গেছে। বাণিজ্য-প্রধান আধুনিক সহর ডারবানে-র কর্ম্ম-কোলাহল হ'তে প্রায় ১৭ মাইল দূরে, ধ্যান-মগ্ন তপস্বীর মতো শান্তি ও সুচিতা ছড়িয়ে এই আশ্রমটী অবস্থিত। আশ্রমটীর সীমানার মধ্যে অত্যন্ত সাধারণ কতকগুলি বাস-ভবন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। প্রত্যেক বাড়ীর সঙ্গে চাষের জন্য জমি সংযুক্ত। মাঝখানকার বাড়ীটী কেবল সৎ গ্রন্থের পাঠাগার। এই পাঠাগারের মধ্যে উপাসনার কাজও হ'য়ে থাকে। কিন্তু এ-আশ্রমের সকলের চেয়ে সুন্দর এবং পবিত্র জিনিষ—সাম্য-ভাব !...শ্বেতাঙ্গী না হওয়ার জন্য নেতালের "জুলু"-মেয়েরা খৃষ্টীয় গির্জ্জায় প্রবেশাধিকার পেতো না। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর আশ্রম ছিল শান্তি ও প্রেমের স্বর্গ। সেখানে মানুষ এক। জাতিগত কিম্বা

ধর্ম্মগত পার্থক্য সেখানে নেই। "জুলু"-মেয়েদের জন্ত সে-আশ্রমের দুয়ার নিত্য-উন্মুক্ত থাকতো।

মহাত্মা গান্ধীর তৃতীয় আশ্রম—সবরমতি। কারখানার ধোঁয়ায়-ভরা, কর্ম্ম-কোলাহল-মুখর আধুনিক সহর আমেদাবাদের অনতিদূরেই এই আশ্রমটী প্রতিষ্ঠিত। এইখানে দুটী পরস্পর-বিরোধী জিনিষ লক্ষ্য করবার মতো। একদিকে নিষ্ঠুর কারখানা-দানবের কবলে কত-শত পুরুষ ও নারী জীবন্মৃত হ'য়ে নিরানন্দ দিনগুলি কাটাচ্ছে;—আর একদিকে, স্নিগ্ধ, পবিত্র, শীতল-সলিলা সবরমতি-নদীর তীরে হাতের সাহায্যে কত নীরবে সুশৃখলার সঙ্গে চরকায় সুতা-কাটা চ'লেছে—কী স্বাভাবিক এবং আন্তরিক আনন্দের অনুপ্রেরণার ভিতর দিয়ে। এই সবরমতি-আশ্রমে লোকে কৃষি, মাতৃভাষা, হিন্দী-ভাষা ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষা পায়। উপাসনার সময়ে "গীতা"র গুঞ্জন প্রত্যহ এখানকার আকাশ-বাতাসকে পবিত্র করে, ধন্স করে। এখানেও প্রেমের সেই সাম্য ভাব, এবং সারল্য ও শ্রম-মর্য্যাদার প্রতি বিশ্বাস অটল হ'য়ে আছে। এখানেও প্রকৃতির সান্নিধ্যে জীবন-যাত্রা অভিপ্রেত, এবং সমস্ত প্রকার বিলাসিতা পরিত্যজ্য। তার একমাত্র কারণ, প্রকৃতি দেয় আত্মিক শিক্ষা, কিন্তু বিলাসিতা দেয়—মানুষের কাছ থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করবার এবং সত্যকার ভ্রাতৃভাবকে বিনষ্ট করবার কু-শিক্ষা।...

অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত সবরমতি-আশ্রমের অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর উপরি-উক্ত পবিত্র আদর্শকে যাঁরা "জঙ্গলের সুখী, বুনো জন্তুর" জীবনের সঙ্গে তুলনা করেন, অর্থাৎ বিদ্রূপ করেন, তাঁদের এই ঘৃণ্য জঘন্ত বিদ্রূপের কি-রকম বিচার হওয়া উচিৎ? তাঁদের ওই বিদ্রূপ কি একান্তভাবেই বিদ্বেষ, অথবা, গাত্রদাহ, অথবা, মনুষ্যত্বহীনতা, অথবা, নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক নয়? প্রকৃতি-জীবনের সঙ্গে যে বন্স-জন্তুর জীবনের আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে, তা সত্তজাত শিশু পর্য্যন্ত-ও জানে।...গান্ধীজীর উক্ত প্রকৃত প্রকৃতি-জীবনের মধ্যে দুঃখ নাই,—আছে ত্যাগের আনন্দ, ধ্যানীর সুখ, আত্মিক তৃপ্তি।...গান্ধীজীর আদর্শ ধ্বংসকারী নয়,—তা রক্ষা করে। তাঁর আদর্শ ফাঁকা, অলীক স্বপ্ন নয়;—তা নূতন এবং পবিত্র এক জীবনের সাড়ায় শক্তিমান। এই নূতন জীবন আধুনিক সভ্যতাকে ঘৃণা করে, তার কাছ থেকে দূরে থাকতে চায় এবং ঈশ্বরের কাছে মনুষ্যত্বের প্রার্থনা করে। ...

আজ থেকে বহুদিন আগে ভারতের-ই এক শ্রেষ্ঠ মানব, ত্যাগী তপস্বী—স্বামী বিবেকানন্দ-ও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ঘৃণা ক'রতেন। তাই তিনি তাঁর মূল্যবান বাণী দিয়েছিলেন:—

"একদিকে, নব্য ভারত ব'লছেন, 'পাশ্চাত্য ভাব, ভাষা, আহার, পরিচ্ছদ ও আচার অবলম্বন ক'রলেই, আমরা পাশ্চাত্য জাতিদের মতো বলবীর্য্যবান হবো।'—অপর দিকে, প্রাচীন ভারত ব'লছেন, 'মূর্খ! অনুকরণের দ্বারা পরের ভাব নিজের হয় না। অর্জ্জন না ক'রলে, কোনো জিনিষ-ই নিজের হয় না। সিংহের চর্ম্মে ঢাকা হ'লেই কি গর্দ্দভ সিংহ হয়?'—একদিকে, নব্য ভারত ব'লছেন, "পাশ্চাত্য জাতিরা যা করে, তা-ই ভাল। ভাল না হলে, তারা এত প্রবল হ'লো কি করে?'—অপর দিকে, প্রাচীন ভারত ব'লছেন, 'বিদ্যুতের আলো অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী। বালক! তোমার চক্ষু প্রতিহত হচ্ছে, সাবধান!'—"

পাশ্চাত্য "সভ্যতার" কৃত্রিম আলোয় ভারতের স্বাভাবিকতা, ভারতের বৈশিষ্ট্য যাতে না আহত হয়, মহাত্মা গান্ধীও তাই ব'লেছেন, "এখনও সময় আছে, সাবধান!" —আত্মরক্ষার জন্ত এই উপদেশ, শুধু ভারত কেন, অবনতির পথে নেমে-যাওয়া পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের কাছেই অমূল্য।

লীলাশেষ

—গল্প—

শ্রীযতীন্দ্র নাথ মিত্র এম্-এ

ভাদ্র মাস। পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্র ভাসা ভাসা মেঘের উপর এক এক বার আত্ম-প্রকাশ করিতেছিল এবং পর মুহূর্ত্তেই ত্রস্ত-পদা হরিণীর ন্যায় মেঘরাশির মধ্যে আত্ম-গোপন করিয়া ফেলিতেছিল। মর্ম্মর প্রস্তরের প্রাসাদস্থিত কেলিগৃহে সম্রাট স্বর্ণ-পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট থাকিয়া নব-বিবাহিতা সম্রাজ্ঞীর রূপ-রাশির হিল্লোল দর্শন করিতেছিলেন। তখন রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। নিশাচরগণ ব্যতীত পৃথিবীর তাবৎ প্রাণীই নিদ্রা-দেবীর শান্ত-শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিভোর। সম্রাটের চক্ষে কিন্তু নিদ্রার লেশ নাই। আজ কয়েক দিন হইল সারা বিশ্ব মন্থন করিয়া যে অনিন্দ্য-সুন্দরীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল, সম্রাট তাহাকে দাম্পত্য-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার স্বর্ণ বিমণ্ডিত প্রাসাদের জয়ধ্বজা হিসাবে বরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। কয়েক দিবস গত হইয়াছে, কিন্তু মোহের এখনও অবধি কোনই নিবৃত্তি হয় নাই। সুরার আবেশ আসিলে সমস্ত পৃথিবীকে যেমন রঙ্গিন্ করিয়া দেয়, এই রূপসীর রূপ সম্রাটের নিকট সেই-রূপ এক নব-সৌন্দর্য্যের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছিল। সে সমস্ত রত্ন-রাজী তাঁহার নিকট অর্থহীন হইয়া ভারবহ-রূপে প্রতীয়মান হইতেছিল সেই সমস্ত রত্ন হঠাৎ কেমন মন-মাতানো আকর্ষণে সম্রাটের দেহ ও মন উভয়ই আকর্ষণ করিতে লাগিল। যে প্রাসাদ মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার নিকট একরূপ অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল, সেই প্রাসাদেই কে যেন মন্দার পুষ্পের গন্ধ বহিয়া আনিয়া তাকে পরম উপভোগ্য বস্তুতে পরিণত করিয়া দিল। যে সমস্ত সহচর তাঁহার নিকট বিদূষক মাত্র জ্ঞানে ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিতেছিল, তাহারা যেন হঠাৎ কি সম্মোহন মন্ত্রে পুনরুজ্জীবিত হইয়া পূর্ব্বকার পরমাত্মীয়ের সিংহাসন দখল করিয়া বসিল। কয়েকদিন হইতে রাজধানীতেও অবিশ্রান্ত উৎসব-স্রোত বহিয়া যাইতেছিল। রাত্রে প্রত্যেক গৃহ হৈম দীপে দীপান্বিত হইয়া অপূর্ব্ব আকার ধারণ করিতেছিল। নানা প্রকার পুষ্পদাম দিয়া নগরের তোরণ দ্বার-গুলি বিভূষিত হওয়ায় সমস্ত সহরে অমরাবতীর দেব-দুর্লভ সুগন্ধ উদ্ভাসিত হইয়া যাইত। নাগরিকগণের উচ্চহাস্যে, বিলাসিনীগণের বিবিধ সঙ্গীত আলাপনে, সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই সমস্ত নগর এক বিরাট কেলিগৃহে পরিণত হইয়া পড়িত।

সম্রাট দেখিতেছিলেন তাঁহার প্রিয়ার রূপ। তাঁহার মনে হইল যেন দেব-কল্পিত তিলোত্তমা আর কবির কল্পনার সামগ্রী নাই, মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার ভোগের জন্য সশরীরে অবতীর্ণা হইয়াছেন। সম্রাটের স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিল যে শতদলবাসিনীর শ্বেত শুভ্র বর্ণের সহিত, বিষ্ণু-প্রিয়ার নিরবদ্য মুখ মণ্ডলীর অপূর্ব্ব সংযোগে এই অভিনব রূপের উৎস সৃষ্ট হইয়াছে। পদ-যুগলের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় তাঁহার মনে হইল এই যে সুন্দরী এখন শায়িতা ও নিদ্রিতা কিন্তু ইতিপূর্ব্বে সে যখন নৃত্য করিতেছিল তখন তাহার হাব-ভাবের নিকট যে কোন সুর-সুন্দরী পরাস্ত স্বীকার করিত। মৃদুমন্দ পবন-তাড়িত অলক-রাজির দিকে দৃষ্টি পড়ায় সম্রাট স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। সুন্দরীর কুন্তল দাম তাঁহার মনে হইল ভ্রমরের বর্ণ অপেক্ষাও কৃষ্ণ এবং বহুমূল্য রেশম অপেক্ষাও কোমল। ভুজ বল্লরী দুইটী বিবিধ রত্না-ভরণে সুশোভিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল—তাহার যথার্থ রূপ প্রকাশের ভাষা না পাইয়া সম্রাট আত্ম-হারা হইয়া পড়িতেছিলেন। রূপ এবং ভোগ সম্রাটের নিকট মূর্ত্তিমন্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল।

কেলি-গৃহটী ক্ষুদ্র হইলেও বেশ প্রশস্তই ছিল। উহারই সন্নিকটে একটী গোলাপ জলের ফোয়ারা অনবরত বহিয়া যাইতেছিল। কেলি গৃহের বাহিরে রাণীর বয়স্যারা দণ্ডায়-মান হইয়া প্রবল বেগে ব্যজনী সঞ্চালন করিতেছিল তাহাতেই কেলিগৃহ মধ্যে বাতাসের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ উদ্ভ্রান্ত চিত্তে সম্রাট সম্রাজ্ঞীকে বাহুপাশে

আবদ্ধ করিয়া মুখ চুম্বন করিলেন। প্রেমিকের দীর্ঘ নিশ্বাসে মহারাণীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। আপনাকে সম্রাটের বাহুপাশ মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজনী কয় প্রহর হইয়াছে ?' লজ্জিত সম্রাট একটুখানি সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, 'মহারাণী মাপ করিও, তোমার নিদ্রাভঙ্গ করিলাম। এখনও রজনী গাঢ়ই আছে, এইমাত্র এক প্রহর অতীত হইয়াছে।" রাণী একটুখানি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ কি তবে জাগ্রতই আছেন ?" সম্রাট একটু আত্ম-হারা ভাবে উত্তর করিলেন, "সত্য মহারাণী, তোমার রূপ আমাকে পাগল করিয়াছে, যতই ভোগ করি, ততই আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায়, দিবাভাগকে যদি রাত্রিতে পরিণত করিতে পারিতাম তা হইলে হয়ত আরও কত সুখী হইতাম। রজনী প্রভাতে আবার কার্য্য, চিন্তা, কর্ত্তব্য, কতকগুলা বিসদৃশ্য দৃশ্য আসিয়া দেখা দিবে, অপেক্ষা করিতে হইবে এই মধুর রজনীর জন্য। কিন্তু রজনীর ঘণ্টাগুলি দিনমান অপেক্ষা কত অল্প'।

মহারাণী হাসিলেন, কিন্তু কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। তিনি রাজার চক্ষের উপর চক্ষু রাখিয়া দেখিলেন, সমগ্র ধরিত্রীর সম্রাট তাঁহার নিকট আজ কেমন ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় সমাসীন হইয়া আছেন। নয়নে দারুণ ক্ষুধা, হৃদয়ে ভীষণ আকাঙ্ক্ষা, তাই মস্তিষ্কের কোন সত্বা পাওয়া যাইতেছে না। মহারাণীকে নির্ব্বাক থাকিতে দেখিয়া মহারাজ বলিলেন, 'মহারাণী তুমি কত সুন্দর। আমি এই মাত্র ভাবিতেছিলাম তিলোত্তমা সুন্দরী ছিল সত্য, কিন্তু তাহা বোধহয় কবির কল্পনা মাত্র। কিন্তু তোমার দেহে সরস্বতীর রং, লক্ষ্মীদেবীর মুখ-গরিমা, স্বর্গ-বিলাসিনিগণের মত্ততা, সব একত্রে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমার এই রাজ্যে এমন কোন চিত্রকর নাই যে, তাহার নিপুণ তুলিতে তোমাকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে, এবং এমন কোন ভাস্করও নাই যে সে পাথরে তোমার আদর্শকে খোদিত করিয়া অমরত্ব দান করিতে পারে। মাত্র কোন মহাকবির লেখনীর মুখে তোমার রূপ ব্যাখ্যাত হইতে পারে, অন্যভাবে হওয়া অসম্ভব। দেখ দেখ, তোমার স্বর্ণখচিত নীলাম্বরী মৃদু মৃদু বাতাসে ঈষৎ চালিত হইয়া তোমার মুক্ত কেশদামের উপর পড়ায় কি সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে।' মহারাণী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মহারাজার বাহুপাশে আবদ্ধ থাকিয়াই বলিলেন, "কিন্তু মহারাজ যাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবেন না জানিতেছেন, তাহাকে আরও ব্যগ্রতার সহিত ধরিতে যাওয়া কি উন্মাদের কার্য্য নয়। মাটীর মানুষ রূপে রসে গন্ধে ফুটিয়া উঠে ঐ বাগানের পারিজাতেরই মত, ঐ ফুলও একদিন ঝড়িয়া পড়বে মাটীরই উপর, মিশাইয়া যাইবে ঐ মাটিরই সহিত ; আমিও ত তাই যাইব, মহারাজ।" একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মহারাজ বলিলেন, "সাম্রাজ্যের বিনিময়ে যদি তোমাকে অমর করিতে পারি, তাহাতে আমি রাজী আছি, কিন্তু তাকি সম্ভব।' সম্রাট-রমণী একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "যদি সম্ভবই হয়, তাতে কি ভোগ বাসনা মাখানো থাকতে পারে। সমস্ত জিনিষের জন্ম, বিকাশ, ঝড়িয়া পড়া ও মৃত্যু আছে। রমণী জন্মায় পিতৃগৃহে, ভরা যৌবন লইয়া আসে স্বামীর ভোগের জন্য, যৌবনান্তে পুত্রের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া, ঐ পারিজাতেরই মত ঝরিয়া পড়ে। মদিরায় নেশা আনয়ন করে, নেশা কাটিয়া গেলে অন্তরে বিষাদ টানিয়া আনে। ভোগে আশঙ্কা বৃদ্ধি করে মাত্র—ভোগের দ্বারা উহার নিবৃত্তি করিতে গেলে, বাসনার বৃদ্ধি হয় ; ত্যাগই মুক্তির পথ দেখায়,—মানুষকে অনন্ত সৌন্দর্য্য ও চির যৌবনের মধ্যে লইয়া যায়।' মহারাজ বলিলেন, 'রাণী, তোমার বাক্যগুলা আজ আমার নিকট কেমন বিসদৃশ বলিয়াই বোধ হইতেছে। তোমার সহিত বাক্য-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আমার কোন ইচ্ছা নাই ; চল ঐ জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত উদ্যান বাটিকায় যাই। ঐ ফোয়ারার ধারে বসিয়া তোমার অপ্সরী-নিন্দিত কণ্ঠে একটী গান গাহিবে চল'। মহারাণী বলিলেন, 'চলুন, মহারাজ'।

কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। রাজদম্পতীর উৎসবময় দিনগুলি বেশ সুখেই অতিবাহিত হইল। মহারাণী এখন আর মাত্র বিলাসের সামগ্রী ন'ন, তিনি রাজার উপদেষ্টার পদও অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। রাজ্যের তাবৎ সুখ-দুঃখের কথা এবং পরামর্শ মহারাজ মহারাণীর সহিত নিয়মিত ভাবে করেন। একদিন দ্বিপ্রহরের ভোজনান্তর মহারাজ শয়ন কক্ষে শায়িত আছেন, মহারাণী সন্নিকটে বসিয়া তাঁহাকে ব্যজনী সঞ্চালনে হাওয়া করিতেছেন, তখন মহারাণী মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ

তোমার সাম্রাজ্যটা আমি একবার পরিদর্শন করিতে চাই।" রাণীর কথার উত্তরে মহারাজ একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিলেন, 'সে ত একটা বিরাট কারখানা মাত্র, সেখানে ভোগের দ্রব্য সৃষ্টি হইতেছে, সেখানে কোন সৌন্দর্য্য নাই, কোন গীত নাই, কোন তাল নাই, আছে খালি কাজ, নির্ম্মম কাজ, হৃদয়হীন কর্ত্তব্য এবং রক্ত শীতলকারী উৎসাহ। সেখানে তুমি গমন করিলে, তোমার বিশেষ কষ্ট হইবে, মহারাণী।' মহারাজের কথার কোন উত্তর না দিয়া মহারাণী বলিলেন, 'আমি চাই তাদেরই দেখিতে, যারা আমাদের এই ভোগের দ্রব্যগুলা সৃজন করিতেছে। আমি চাই একবার তাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে। সাম্রাজ্যের মহারাণী তাহার পুত্র সম প্রজাদের সযত্নে নির্ম্মিত বিবিধ ভোগ করিবার সামগ্রী উপভোগ করিয়া আসিতেছি, আমি এই প্রাণ-প্রিয়তম প্রকৃতিপুঞ্জকে একবার দেখিতে চাই।' মহারাজ একটুখানি বিব্রত হইয়া বলিলেন, তাহাই হইবে ; কল্যই তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিব। কিন্তু আমি বলিতেছি মহারাণী সে রাজ্যে আলো নাই, হাওয়া নাই, গন্ধ নাই, রূপ নাই ; সত্যই সে একটা বিরাট কারখানা ; সুতরাং তোমার শরীর ও মনের স্বচ্ছন্দতা রক্ষার জন্য যে সমস্ত দ্রব্যের প্রয়োজন অনুভব করিবে, তাহাদের সকলগুলিই সঙ্গে লইও ; কোনটী লইতে ভুলিলেই কষ্ট হইবে এবং তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবার প্রবৃত্তি আসিয়া দেখা দিবে।' মহারাণী মহারাজার দিকে মুখ রাখিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'প্রয়োজন বোধ করি ত সঙ্গে লইব।'

পরদিন মহারাণী তাঁহার যন্ত্রকলা ও সোমলতা নামক সখীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া রাজ-প্রহরী প্রদর্শিত পথে পদব্রজে চলিলেন। মহারাজার আদেশ ছিল যে, মহারাণী যেরূপ আদেশ করিবেন রাজভৃত্য তাহাই পালন করিবে, তাই মহারাণীর ইচ্ছানুযায়ী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাজ-প্রহরী একটা প্রকাণ্ড লৌহ-দরজার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। এই দরজার বিশালতা যেমন ভয়াবহ, উহার আকৃতিও সেইরূপ ভীতি-প্রদ। রাজ-ভৃত্যের আদেশে মুহূর্ত্তের মধ্যে দ্বার আপনা-আপনি সরিয়া যাইয়া উন্মুক্ত হইয়া গেল, সম্মুখেই এক প্রশস্ত রাজপথ নয়ন-পথে ভাসিয়া আসিল। মহারাণী প্রহরীকে সঙ্গে লইয়া সখী দ্বয়ের সহিত সিংহ দ্বার অতিক্রম করিয়া প্রশস্ত রাজপথে পড়িলেন। এই রাজপথের দুই ধারে বড় বড় কারখানা ভীষণ গর্জ্জন করিয়া অনবরত ধূম বর্ষণ করিয়া চলিয়াছে। রাণী প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গৃহগুলি কিসের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে ? প্রহরী উত্তর করিল উহারাই কারখানা গৃহ। কোথাও বা লৌহ তৈয়ারী হইতেছে, কোথাও বা ঘানি হইতে তৈল উত্তোলন করা হইতেছে, আবার কোথাও বা পরিধেয় বস্ত্র ও পাদুকা নির্ম্মিত করিতেছে।' প্রহরীর কথায় রাণীর কৌতূহল উত্তেজিত হইয়া উঠায় তিনি বলিলেন, "দৌবারিক আমাদিগকে ঐ একটী গৃহের মধ্যে লইয়া চল।' কারখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহারাণী দেখিলেন দানব-তুল্য কতকগুলা যন্ত্র কি এক ভীষণ আর্ত্ত-নাদ করিয়া অনবরত প্রদক্ষিণ করিয়া যাইতেছে। কতকগুলা মানব কালিমষি মাখিয়া তাহারই সন্নিধানে কি টানিয়া লইতেছে এবং টানিয়া দিতেছে। একটু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, এই যন্ত্রগুলা কেবলই কাপড় বয়ন করিয়া তাহার গাঁট বাঁধিয়া বাঁধিয়া বস্ত্রের কৃত্রিম পাহাড় রচনা করিয়া যাইতেছে। সেখান হইতে বহির্গত হইয়া অন্য কারখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পৃথিবীকে মথিত করিয়া কি এক যন্ত্রে অনবরত তৈল উত্তোলন করা হইতেছে, এই কার্য্যে স্বয়ং ধরণী দেবী যেন এক অব্যক্ত শব্দে ভীষণ চীৎকার করিতেছেন, কিন্তু বিরাট দেহ দানবগুলা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই তাহাকে মন্থন করিয়া চলিয়াছে। যেখান হইতে নির্গত হইয়া রাণী আর তাঁহার সখিদ্বয় অন্য কারখানায় প্রবেশ করিয়াই ভীষণ চমকাইয়া উঠিলেন। শত সূর্য্যের তেজকে অগ্রাহ্য করিয়া এক ভীষণ অগ্নুৎসব চলিয়াছে। লৌহ গলিত হইয়া জলের ন্যায় বহির্গত হইয়া আসিতেছে। কর্ম্ম-নিরত মানবগণ তাহা হইতে বিবিধ সামগ্রী উৎপন্ন করিতেছে। রাণী এই দারুণ গরমে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়া সখীদিগকে চামর দুলাইয়া তাঁহাকে হাওয়া করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সন্নিকটে একজন কর্ম্মচারী রাণীকে এইরূপ বিপদগ্রস্তা দেখিয়া একজন সঙ্গিকে ইঙ্গিত করিয়া তাঁহা-দিগকে 'হাওয়া-ঘরে' লইয়া যাইতে আদেশ করিল। উক্ত সঙ্গি অভিবাদন করিয়া রাণী এবং তাঁহার সখীদের লইয়া হাওয়া ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাণীর মনে হইল,

তিনি যেন সহসা বরুণের রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পৃথিবীর তাবৎ হাওয়াই যেন এখানে একত্রে বিশেষ করিয়া স্তূপীকৃত করা হইয়াছে। মহারাণী কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর প্রহরীকে মহারাজ যেখানে অবস্থিত সেখানে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিলেন। প্রহরী আদেশ প্রাপ্তিমাত্রই মহারাণীকে সঙ্গে লইয়া মহারাজার বিরাট কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাণী দেখিলেন, সমস্ত কক্ষটা বিবিধ অংশে বিভক্ত এবং মহারাজ উহারই একটী অংশে একটী প্রকাণ্ড টেবিলের সম্মুখে একটী সিংহাসনে উপবিষ্ট। টেবিলের উপর স্তূপাকারে বিবিধ কাগজ সাজান আছে। তাঁহার কর্ম্মচারীরা অনবরত মনোযোগ সহকারে রাজাদেশ লিখিয়া লইতেছেন। রাণীকে হঠাৎ তাঁহার কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া রাজা কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাঁহার কার্য্য করিয়া চলিলেন। রাণী ধীরে ধীরে রাজার আসনের নিকট আসিয়া তাঁহার স্কন্ধোপরি হস্ত দিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা রাণীর প্রতি সপ্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'একটু অপেক্ষা করিতে হইবে, মহারাণী।' নিকটেই একটী আসন দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, 'ঐখানে বস; আমাকে এই পত্রগুলি শেষ করিতে দাও।' বিনা বাক্যব্যয়ে রাণী ও তাঁহার সখীরা রাজারই সন্নিধানে এক একটী আসনে উপবেশন করিয়া দেখিতে লাগিলেন রাজার কাজের শেষ নাই। মস্তবড় এক একটী আধারে নানা প্রকার কাগজ তাঁহার টেবিলে আসিয়া স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতেছে এবং মহারাজ একে একে সে সমুদায়ই পরীক্ষা করিয়া ও তাহাদের উপর আপনার আদেশ লিখিয়া দিয়া আবার ঐ আধারেই নিক্ষেপ করিতেছেন। এক একটী আধার আবার কাগজে ভরিয়া উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। মহারাণী কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থকিবার পর একটু বিরক্তা হইয়া আবার উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া মহারাজ বলিলেন, "মহারাণী আমার এই বিশেষ অমাত্যকে তোমার সহিত দিতেছি এখনও যে সমস্ত স্থল পরিদর্শন করিতে তোমার বাকী আছে ইনি সেইগুলি তোমাকে দেখাইয়া দিবেন। তুমি একটু ঘুরিয়া আইস, তাহার পর উভয়ে একত্রে যাত্রা করিব।' মহারাণী এই কথার কোন উত্তর না দেওয়ায় মহারাজের আদেশানুযায়ী তাঁহার অমাত্যশ্রেষ্ঠ রাণীর অনুগমন করিল। সভাগৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া মহারাণী মন্ত্রীবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই যে লোকগুলা কার্য্য করিতেছে, এরা কোথায় বাস করে? ইহাদের কি গৃহ নাই; স্ত্রী-পুত্র পরিবার নাই? অমাত্যবর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, উহারাও যখন মানুষ তখন উহাদেরও গৃহাদি না থাকিবে কেন? মহারাজ তাহার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন। সে স্থান যদি দেখিতে চাহেন ত তথায় আপনাকে লইয়া যাইতে পারি।' ঈষৎ মস্তক হেলাইয়া তথায় যাইবার অভিলাষ জানাইলে অমাত্যবর মহারাণীকে সঙ্গে করিয়া এক সুরঙ্গ পথে পাতাল পুরীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে চন্দ্র সূর্য্য উদিত হয়না সত্য, কিন্তু সেখানে আলোকের ও বাতাসের কোন অভাব নাই। হাওয়া কোথা হইতে আসিতেছে জিজ্ঞাসা করায় অমাত্যবর উত্তর করিলেন উপরে যে হাওয়া ঘর আছে সেইখান হইতে এখানে বাতাস সঞ্চালন করা হইতেছে। রাণীকে অমাত্যবরের সহিত প্রবেশ করিতে দেখিয়া কতকগুলা অস্থিচর্ম্মসার বালক-বালিকা দৌড়াইয়া আসিয়া কেমন হতভম্বভাবে মহারাণীর দিকে তাকাইয়া রহিল। পুত্রস্বাদ বিবর্জ্জিতা মহারাণী তাহাদের একজনকে কোলে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের মা কোথায়?' ভীত-বালক মহারাণীর ভাষা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া কেমন যেন এক যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিল। মহারাণীও তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া বালককে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিলেন। বালকটীও যেন ভয় পাইয়া দ্রুতপদে পলাইয়া গেল। তাহার ভীতিভাব দেখিয়া অপরাপর বালক-বালিকারাও দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল। বিস্ময়-বিহ্বলা মহারাণী অত্যন্ত কাতর ভাবে অমাত্যবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বালক তাঁহার সহিত কথা কহিলনা কেন

অমাত্যবর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, মহারাণী উহারা মানব হইলেও উহাদের ভাষা বিভিন্ন। যাহারা আমাদের সহিত অনবরত মেলমেশা করে তাহারাই আমাদের ভাষা কিছু কিছু বুঝিতে পারে। উহারা বালক, আপনার ভাষা কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় কিছু ভীতই হইয়াছিল সুতরাং উত্তর কি দিবে।'

রাণী একটুখানি আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, 'উহারা সকলেই অত ত্রস্তপদে পলায়ন করিল কেন?' অমাত্য শ্রেষ্ঠ উত্তর করিলেন, 'মহারাণী, উহারা মানব-শিশু সত্য, সকলেই জননীর সন্তান তাহাও ঠিক, কিন্তু উহারা মাতার ক্রোড় কি তাহা জানে না। অতি শৈশবে মাতৃ-স্তন্য পান করে সত্য, তাহা শয্যায় শয়ন করিয়া। কাজেই মাতৃ-প্রেমে আত্মবিহ্বলা যখন আপনি উহাদেরই একজনকে ক্রোড়ে করিলেন, তখন সে দৃশ্যে উহারা সম্ভবতঃ ভয়ই পাইয়াছিল, তাই আপনার ক্রোড়স্থ বালকটীকে মাটীতে অবতরণ করাইয়া দিলেই সকলেই দলবদ্ধভাবে পলাইয়া গেল।' মহারাণী একটুখানি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'উহাদের জননীরা কোথায়?'

অমাত্যশ্রেষ্ঠ বলিলেন, 'এখন তাহারা সকলেই ঐ উপরের কারখানাগুলিতে গিয়াছে। সন্ধ্যার পর কারখানা ছুটি হইলে তাহারা আবার আসিবে।' মহারাণী এই মন্তব্যে একটুখানি শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'চলুন বাহিরে যাই, যেখানে আপনাদের সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য একত্রিত হইতেছে সেইখানে লইয়া চলুন'।

শীঘ্রই অমাত্যবরের সহিত মহারাণী এক বিস্তৃত ময়দানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় নানা প্রকার স্তূপীকৃত দ্রব্য একত্রিত ভাবে সজ্জিত দেখিয়া বলিলেন, 'এই সমস্ত দ্রব্যের কিরূপে বণ্টন হইবে।' মহারাণীর প্রশ্নের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অমাত্যবর বলিলেন, "মহারাজই তাবৎ দ্রব্যের একমাত্র মালিক। যে সমস্ত মজুর এই সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন করিতেছে, তাহারা তাহাদের ভরণ-পোষণ পাইতেছে। মহারাজের কারখানা না থাকিলে পৃথিবী হইতে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইত। মহারাজ স্বয়ং ভগবানের ন্যায় তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।' মহারাণী বলিলেন, 'তা হইলে ঐ লোক গুলাকে আপনারা খাটাইতেছেন—ঐ একজন মহারাজের সেবার জন্য।' অমাত্য স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, "লোকগুলা একমাত্র মহারাজের অনুগ্রহেই জীবন ধারণ করিয়া এখনও জীবিত আছে।"

রাত্রে মহারাজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মহারাণী দক্ষিণের দরজা খুলিয়া দিয়া কেমন একটু অন্যমনস্কভাবে বসিয়া আছেন। আজ তাঁহার বেশ-বিন্যাসের পারিপাট্য নাই। সামান্য একখানি ঈষৎ গোলাপা রঙের সাড়ী পরিধান করিয়া, অযত্ন-বদ্ধ চিকুররাশি গ্রীবার উপর দিয়া বক্ষোপরি ও পৃষ্ঠদেশে ছড়াইয়া দিয়া আনমনে বাহিরে কি যেন দেখিতেছিলেন। মহারাজ ধীরে ধীরে নিঃশব্দে মহারাণীর নিকট আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে হস্ত স্থাপন করিলেন। চকিতা মহারাণী পশ্চাৎ ভাগে চাহিয়া কান্তের প্রেমপূর্ণ দৃষ্টির সহিত তাঁহার দৃষ্টি বিনিময় হইয়া যাওয়ায় একটুখানি সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, 'দেখুন মহারাজ, ঐ দূর আকাশে মেঘগুলার উপর চন্দ্রের জ্যোৎস্নারাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। আরও দেখুন, ঐ নক্ষত্রগুলা গগনমার্গে বিকশিত থাকিয়া কেমন মনোরম আকার ধারণ করিয়াছে।' মহারাজ দেখিলেন, দৃশ্যটা সামান্যই। অপরাপর দিন ইহা অপেক্ষাও অধিক মনোরম দৃশ্য আকাশপটে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে; রাণীর মনোভাব খানিকটা যেন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াই সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, 'আরও কত সুন্দর তুমি আমার প্রিয়া। সারা আকাশটা যেন চাঁদ ও নক্ষত্ররূপ শত শত চক্ষু বাহির করিয়া তোমাকে অবিশ্রান্ত দেখিয়া চলিয়াছে, যেন এ দেখার বিরাম নাই, এ ভোগ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই, এ মোহের নিবৃত্তি নাই। আরও দেখ, সঙ্কুচিত পবন কেমন ধীরে ধীরে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমার কেশদামগুলিকে নাচাইয়া নাচাইয়া তোমার গ্রীবার ও স্কন্ধের উপর ফেলিয়া দিয়া অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিতেছে। এ সৃষ্টির কল্পনা করিতে গেলে আদিম নরের চক্ষে নগ্ন-দেহা আদিম নারীর যে মূর্ত্তি ভাসিয়া আসিয়াছিল তাহাকেই রূপ দিতে হইবে।" মহারাণী মহারাজার নিকট আত্মপ্রশংসা শুনিতে বেশই অভ্যস্তা ছিলেন। অন্যদিন হইলে কৃত্রিম বিরক্তিও হয়ত প্রকাশ করিতেন; কিন্তু অদ্যকার এই বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে তিনি মহারাজের হৃদয়ের এক অভূতপূর্ব্ব সরলতার আভাষ পাইয়া বলিলেন, 'মহারাজ আপনার রাজ্যের তাবৎ প্রজাই যদি আমাদের মত সুখী হইত, তাহা হইলে এই পৃথিবী কত সুখের হইত।' মহারাজ রাণীর এই বাক্যে ঈষৎ চমকাইয়া বলিলেন, 'সুখী সকলেই, ভোগজ্ঞানের তারতম্য আছে মাত্র। তুমি

যাহাতে সুখ অনুভব কর, অপর কেহ তাহাতে সুখের সন্ধান না পাইতে পারে; সুখ ও সৌন্দর্য্য চর্চ্চাই মানব-জীবনের ধ্রুবতারা দেবী, এক অনাদিকাল হইতে ইহারই পিছনে সমগ্র মানবজাতি ছুটিয়া আসিতেছে।” রাণী আপনার অলকদাম গ্রীবার উপর হইতে সরাইয়া লইয়া অশ্রুপূর্ণ ভাসা ভাসা চক্ষু মহারাজের উপর স্থাপন করিয়া বলিলেন, ‘আমাকে অনুমতি দিন মহারাজ, আপনার রাজ্যের তাবৎ প্রজামণ্ডলীকে আমি সুখের সেবা করিতে ও সৌন্দর্য্য-চর্চ্চায় অভ্যস্থ হইতে শিক্ষা দিব।’ মহারাজ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “রাণী তোমার ছাঁচে যদি জগৎটাকে গড়িতে দাও, তবে নিশ্চয় জানিও শৃঙ্খলার স্থলে বিশৃঙ্খলাই আসিয়া দেখা দিবে, শান্তির জায়গায় অশান্তি আসিয়া আপন শাসন প্রতিষ্ঠিত করিবে।’ মহারাণীও রাজার কথায় একটু হাসিয়া বলিলেন, ‘সেই ভাল মহারাজ; অশান্তির মধ্যে যদি অমৃতভাণ্ড পাওয়া যায় তাহা হইলে কি ভোগের চূড়ান্ত হইবে না, এবং কলহের মধ্যে যদি তিলোত্তমা আত্মপ্রকাশ করে তাহা হইলে কি সেই সৌন্দর্য্য চর্চ্চার শেষ হইবে না?’ মহারাজ একটু বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, ‘তোমাকে অদেয় আমার কিছু নাই। তোমার যাহা অভিরুচি তুমি তাহাই করিতে পার, কিন্তু স্থল-বিশেষে যদি প্রয়োজন বোধ কর ত আমার পরামর্শ গ্রহণ করিও।’

মহারাণী তাঁহার কল্পনানুযায়ী কার্য্য করিয়া চলিলেন। যে সমস্ত মানব অন্ধকারময় পাতাল-পুরীতে বাস করিত তাহাদিগকে তথা হইতে আনয়ন করিয়া রাজধানীতে সুরম্য আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তাহাদের পুত্রকন্যাগণের শিক্ষার জন্য বিবিধ পাঠশালা স্থাপন করিলেন। সন্তানের জননীরা যাহাতে সন্তানগণের তত্বাবধান করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করাইলেন। ক্রমশঃ শীর্ণকায় মানবগুলি স্থূল কলেবর বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত জন-সমাজে পরিণত হইয়া আসিল। ভীত ও সচকিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব শিশুগুলি শান্ত ও ধীর অধ্যয়নশীল বালকে পরিণত হইল। ভগ্ন-হৃদয় জননী তাহার সন্তানের সেবা করিতে যাইয়া ক্রমশঃই উৎফুল্ল-বদনা হাস্যময়ী রমণী মূর্ত্তিতে বিকসিত হইয়া উঠিল। অন্ধকার ও দরিদ্রতা দূর হইয়া গিয়া আলোক ও স্বচ্ছলতা আসিয়া দেখা দিল। সমগ্র রাজধানী একটা বিরাট জনসমাবেশে হাস্যমুখরিত হইয়া নাট্যশালায় পরিণত হইল।

একদিন মহারাণী মহারাজকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিলেন, ‘দেখুন ত মহারাজ আপনার প্রজামণ্ডলী কত সুখী হইয়াছে। তাহাদের হাস্যময় মুখ দেখিলে কি আপনার আনন্দ হয় না? আপনি পূর্ব্বে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে এই এতগুলা লোকের সুখ-স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে গেলে আমাদের নিজেদের সুখ স্বচ্ছন্দতার অনেকটা হ্রাস হইবে, কই আমারত তাহা মনে হয় না’। মহারাজ সপ্রেম দৃষ্টিতে প্রিয়ার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “স্বর্গ সৃষ্টি করিতে গেলে দেবতা সংগ্রহ করা প্রয়োজন; নরক সৃজন করিতে গেলে, পাতকীর দরকার, মর্ত্ত্যলোকে মানবেরই আবশ্যক; তুমি স্বর্গ রচনা করিতে চাহিতেছ দেবী, স্বর্গ মর্ত্ত্যে কিন্তু কখনই সৃষ্টি হইবে না।’ মহারাণী হাসিয়া বলিলেন, ‘মানবই দেবতা হয় তুমি একথা জাননা মহারাজ’। মহারাজ বলিলেন, ‘দেবতা যাঁহারা তাঁহারা দেবতা বলিয়াই জানিতাম’। মহারাণী বলিলেন, তোমার ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দিব, আর একটু অপেক্ষা কর মানবগুলাকেই দেবতায় পরিণত করিব।’

ক্রমশঃ কারখানার কলগুলা বিগড়াইয়া আসিল। সন্তুষ্ট জনমণ্ডলী পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য্য করিতে লাগিল সত্য কিন্তু আশানুযায়ী ফল পাওয়া যাইতে লাগিল না। মহারাজ বিশেষ চিন্তিত হইয়া স্বয়ং ইঞ্জিন ঘর, ও কারখানার সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়া বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলেন কিন্তু কোথায় যে কলটা বিগড়াইয়া গিয়াছে তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া আসায় জনমণ্ডলীর বিশেষ অসুবিধা হইতে লাগিল। মহারাণী আপনাদের তাবৎ অনাবশ্যক বিলাস-ব্যসন কমাইয়া দিলেন। প্রতি ঘরে ঘরে গমন করিয়া জনমণ্ডলীকে উপস্থিত বিপদে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। মহারাণীর আশ্বাস বাক্যে সকলেই বিপদকে জাপটাইয়া ধরিয়া তাহার সহিত লড়াই করিয়া চলিল। এদিকে মহারাজের কার্য্যের বিরাম রহিল না। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত গলদ ঘর্ম্ম পরিশ্রম করিয়াও তাঁহার প্রজামণ্ডলীর তাবৎ আবশ্যকীয় দ্রব্য উৎপাদন করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে একদিন হতাশ

হইয়া মহারাণীকে বলিলেন, 'মহারাণী, আমার মনে হয় এই সমস্ত সাম্রাজ্য প্রকৃতিপুঞ্জের হস্তেই অর্পণ করিয়া আমাদের বানপ্রস্থ গমন করার সময় আসিয়াছে।' মহারাণী একটুখানি সপ্রেম হাস্য মুখমণ্ডলে বিকসিত করিয়া বলিলেন, "মহারাজ আমি জনমানবের সহিত মরিতে চাই, তাহাদের নিকট হইতে দূরে গিয়া স্বর্গও চাহি না।'

ক্রমশঃ বিদ্রোহ ভাব দেখা দিল। কারখানার মজুররা তাহাদের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের সহিত সমানভাবে সুখ-সাচ্ছন্দ্য বণ্টন করিয়া লইবার অধিকার জ্ঞাপন করিল। চির ভোগ সুখে লালিত পালিত উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর দল এই বিদ্রোহ মূর্ত্তি দেখিয়া বেশ শিহরিয়া উঠিল। তাহারাও ক্রমশঃ আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। রাজধানী হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া লইয়া আবার পাতাল-পুরীতে পুরিল। বিদ্যালয় গৃহ উঠাইয়া দিয়া শিক্ষা-প্রদান বন্ধ করিয়া দিল। নির্দ্দিষ্ট ভরণপোষণমাত্র দিয়া তাহা-দিগকে আবার কলের সহিত গাঁথিয়া দিল। কলগুলাও যেন নূতন উৎসাহে পূর্ব্বকার তেজ ফিরিয়া পাইল। তাহারা স্ফীত বক্ষে অনর্গল ধূম উদ্গীরণ করিয়া আবার আবশ্যক দ্রব্য উৎপন্ন করিয়া চলিল। রাজধানীতে পূর্ব্ব সুখ-শান্তি ফিরিয়া আসিল, কিন্তু পাতালপুরীতে অশান্তি ও অত্যাচার স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতে লাগিল।

মহারাণী কেমন একটু হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি চাহিতেছিলেন মানবকে দেবতায় পরিণত করিতে, অগ্রসরও অনেকটা হইয়াছিলেন; কিন্তু হঠাৎ তাঁহার আশা কেমন করিয়া নিরাশায় পরিণত হইল তাহা তিনি বুঝিয়াই উঠিতে পারিলেন না। মহারাণী একদিন নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, 'তবে তাহাই কি সত্য। স্বর্গ দেবতার জন্য; মর্ত্ত্য মানব জাতির জন্য সৃষ্ট। মহারাণী বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন, কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া অবশেষে স্থির করিলেন, তিনি পাতালপুরীতে গিয়াই বাস করিবেন। যেখানে পাপ পুঞ্জিকৃত হইয়া গগনস্পর্শী হইয়া উঠিতেছিল, সেখানেই তাঁহার বাসস্থান হওয়া উচিত স্থির করিয়া তথায় গমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সমস্তদিনের কার্য্য শেষ করিয়া মহারাজ তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, 'মহারাণী, আবার কলগুলা পূর্ব্বকার মতই চলিতেছে, হারাণ শান্তি আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।' মহারাণী বলিলেন, 'সে ত স্তূপীকৃত অশান্তি সৃজন করিয়া, পাপের বোঝা অসম্ভব রূপ বাড়াইয়া।' মহারাজ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'পৃথিবীর দিকে চাহিয়া দেখ রাণী, ধ্বংসেরই উপর মানব সমাজ প্রতিষ্ঠিত, অনেক সময় শ্মশানই বাসর-ঘর রচনা করিয়া দেয়।

অবশেষে একদিন অতি ভীষণ ভাবে বিদ্রোহ আত্ম-প্রকাশ করিল। তাহার কারণ যে কি, তাহা নির্ণীত হইতে না হইতেই মহারাণী দেখিলেন, কারখানা গৃহগুলিতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া বিরাট জনতা তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছে। মহারাজ এই অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তাঁহার সহচরেরা একে একে সকলেই অগ্নি-কুণ্ডে পড়িয়া আত্মবিসর্জ্জন করিতে লাগিল; উত্তেজিত জনতা তাহাদের মৃতদেহগুলি লইয়া নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আকাশের উপর মৃত্যুর নগ্নমূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। জলের মধ্যে তাহারই প্রতিবিম্ব পড়িয়া বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিল। গৃধিনী, শকুণী প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষী-কুল মনের আনন্দে নর-মাংস ভোজন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ, বেলা অবসানের সহিত রজনীর গাঢ় অন্ধকার মূর্ত্তি গাঢ়তম হইয়া আসিল কিন্তু প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য সমান ভাবেই চলিল। কারখানা গৃহগুলি ক্রমশঃ ভস্মীভূত করিয়া দিয়া উদ্ধত জনতা রাজধানীতে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে প্রত্যেক নাগরিকের গৃহ জ্বলিয়া উঠিল। উভয় দলে ভীষণ সংগ্রাম বাধিয়া গেল। বিশিষ্ট কর্ম্ম-চারীরা অস্ত্রহীন মজুরদলকে বিনাশ করিয়া চলিল। কিন্তু কর্ম্মচারীদের সংখ্যা তাহাদের তুলনায় মুষ্টিমেয় মাত্র। কাজেই মজুরদল ক্রমশঃ প্রবল হইয়া কর্ম্মচারীদের বংশ সবংশে নির্ম্মূল করিয়া দিল। প্রসাদ ভস্মীভূত হইয়া ধূলার উপর লুটাইয়া পড়িল। রঙ্গালয় নিমিষে ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া গেল। মানব মানবকে দেখিয়া বন্য জন্তুর ন্যায় বধ করিয়া চলিল। অগ্নি তাহার বহুদিনের বুভুক্ষা জ্বালা মিটাইবার জন্য তাবৎ সৃষ্ট পদার্থের উপরই লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিল।

উদ্যান বাটিকার একটী গৃহে দাঁড়াইয়া মহারাণী দেখিলেন এই ভীষণ প্রলয়ে সকলেই ধ্বংস পাইতেছে। মহারাজ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন সত্য কিন্তু ক্ষিপ্ত

জনতা তাঁহার কোন বাক্যেই কর্ণপাত করিতেছে না। ক্লান্ত দেহ মহারাজ অবশেষে অগ্নিকুণ্ডে ঢলিয়া পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন। মহারাণী তাহা স্বচক্ষে দেখিলেন। এই দৃশ্য দর্শনান্তর তিনি হঠাৎ জ্ঞান হারাইয়া মাটীতে লুটাইয়া পড়িলেন। হত্যা ও ধ্বংস কার্য্য সমান ভাবেই চলিতে লাগিল।

মহারাণীর যখন জ্ঞানোদ্রেক হইল, তখন চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন সমস্ত সাম্রাজ্যটা এক বিশাল ভস্মের সাহারায় পরিণত হইয়াছে। তথায় মানবের কোন সাড়া শব্দ নাই। কোন জীবিত প্রাণী পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। মধ্যে মধ্যে এক বিরাট ঘূর্ণী বায়ু প্রকৃতির দীর্ঘ-নিশ্বাসের মত বালুকাস্তূপ উড়াইয়া বহিয়া যাইতেছে। মহারাণী ক্রমশঃ প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলেন, যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূরই ভস্ম ও ভস্ম এবং নরকঙ্কালের স্তূপ। প্রাণী নাই, স্মৃতি নাই; মূর্ত্তিমান ধ্বংস অট্টহাস্যে হাহাকার করিতেছে। প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ বহুক্ষণ নির্ব্বাক ও নিশ্চল থাকিবার পর মহারাণী দেখিলেন, কোন অমাত্য এক সামান্য কুলির সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে ভীষণ ভাবে জাপটাইয়া ধরিয়াছে। কুলীটাও তাহার বংশগত হীনতা ভুলিয়া অমাত্যকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করিল। মহারাণী চক্ষু মুছিয়া দেখিলেন, এই বিরাট শ্মশানে কচিৎ দুই একটা মনুষ্য দেখা যাইতেছে এবং তাহারা পরস্পরকে দেখিলেই এমনভাবে জাপটাইয়া ধরিতেছে যেন, বহুদিন তাহারা কোন মানবের মুখদর্শন করে নাই। ক্লান্ত দেহ ও ভগ্ন-মন লইয়া মহারাণী ভাবিলেন, স্বর্গ কি তবে ভস্মেরই উপর নির্ম্মিত হইব; ধ্বংসের মধ্যেই কি মাহমানব অমৃতের আস্বাদ পাইবে? ক্রমশঃ জ্ঞানহীন হইয়া তাঁহার শরীর সেই বালুস্তূপের উপর ঢলিয়া পড়িল।

"মিলন"

শ্রীমতী রাণু দেবী

অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভায় মুক্ত বনপথ আলোকিত, সন্ধ্যার আগমনে আকাশের প্রান্তসীমায় একদল বলাকা শুভ্র রেখার মত উড়িয়া যাইতেছিল। গাছে গাছে যেন আবির মাখিয়ে দিয়েছে। তারই একটী গাছের ডালে পরম নিশ্চিন্তে দুটী পাখী মধুর আলাপনে পরস্পরের তৃপ্তি সাধন করছে। তাদের মধুর গুঞ্জন, পরস্পরকে সুখী করবার কি আকুল আগ্রহ, সুখে তারা মাতোয়ারা, এই পরম সুখ-সম্মেলনে বাধা পড়তে পারে আনন্দের আতিশয্যে তারা ভুলে গেছে।

সমস্ত দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে, নিষ্ফল ব্যাধ যখন রিক্ত হস্তে গৃহে ফিরছিল তখন দূরে গাছের ডালে একজোড়া পাখী দেখে লোভে তার চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। না ভেবেই সে শর ক্ষেপণ করলে, চকিতে মিলন-সুখরত পাখী সাবধান হবার আগেই তীর বিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ল, তার বুকের সমস্ত লাল রক্ত, অস্তাচলগামী সূর্য্যের আরক্ত আভাকে অভিনন্দিত করল। বেদনার ভারে ব্যথিত দিবাকরও লজ্জায় মুখ লুকালেন।

প্রিয়র মৃত্যুতে কাতরা, আর তার মরণের ভয় নেই, করুণ বিলাপে দিগন্তে প্রতিধ্বনি তুলে, ব্যাধের চারিপাশে ঘুরতে লাগল, বিলাপের মূর্চ্ছনায় ইহাই সে ব্যক্ত করতে লাগল, ওগো দাও আমায়ও শেষ করে দাও, আমরা নিরীহ প্রাণী কি তোমার ক্ষতি করেছিলাম যে আমাদের এই মিলন সুখের এমনি পরিণতি করিলে।

অভিভূত ব্যাধ ছুটে চলে এলো, সমস্ত রাত তার কুটীরখানিতে প্রিয়হারা পাখীটির বিলাপের ধ্বনি যেন দূর অতি দূর হতে ভেসে আসতে লাগলো। সে যন্ত্রণা অনুশোচনায় ছটফট করতে লাগলো।

স্তব্ধ জমাট অন্ধকার ভেদ করে বিরহিণীর মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে জগত মুখরিত করছে।

রাতের জাগরণে, অনুতাপে অতিষ্ঠ হয়ে ভোর হতে না হতেই ব্যাধ নিজের অজ্ঞাতে বনের সেই গাছতলায় এসে দেখলে, নিষ্ফল বিলাপে কাতরা, তার সেই প্রিয়র প্রাণহীন বুকে চির মিলন উদ্দেশ্যে চলে গেছে।

মহান প্রেমের-মিলনে নির্দ্দয় ব্যাধের চোক দিয়ে দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ল। সে তার ধনুর্ব্বাণ ফেলে বনের পথে অদৃশ্য হলো।

পাথেয় উপন্যাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১১

জরুরী কাজের জন্য দিন দশেকের জন্য সুশীলকে ডায়মণ্ড হারবারে আসিতে হইয়াছে।

কাল সকালেই সে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে, এখানকার কাজ সারাদিন কঠিন পরিশ্রম করিয়া শেষ করিয়াছে।

প্রথমে সে এখানে নিরঞ্জনকে পাঠাইবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু নিরঞ্জনের পিতৃবিয়োগ হওয়ায় সে আসিতে অসমর্থ হইয়াছিল, অগত্যা সুশীলকেই আসিতে হইয়াছে।

সুন্দর জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি, যতদূর দেখা যায় সব চাঁদের আলোয় ভরিয়া গিয়াছে। দূরে সমুদ্র সৈকতে সর্ব্বাঙ্গ চাঁদের আলো মাখিয়া বাতাসে দোলা খাইতেছে।

সারাদিনের পরিশ্রমে শ্রান্ত সুশীল বিশ্রাম লাভাশায় ডাকবাংলোর খোলা বারাণ্ডায় চাঁদের আলোয় একখানা চেয়ারে বসিয়াছিল।

সুশীলের মনটা কখনও কলিকাতায় একটী অপরিচ্ছন্ন গলিতে একটী বাড়ীর ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

কলিকাতায় আছে ইরা, জাপানে আছে তাহার ভাবী বধূ ইন্দিরা।

কোনদিন যে ইন্দিরার সঙ্গে কাহাকেও একই পর্য্যায়ে রাখিয়া মিলাইয়া দেখিতে হইবে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। যাহা জীবনে কোন দিনই করে নাই আজ সে তাহাই করিতেছিল।

জীবনের মধ্যে অনেক সময়ই তাহাকে অনেক সুন্দরী তরুণীর সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছে, তাহাকে স্বামীরূপে পাইবার জন্য কেবলমাত্র ভারতীয় মেয়েরাই নহে অনেক সুন্দরী ধনবতী ইউরোপিয়ান মহিলাও উৎসুক ছিলেন, সে চিরচিদনই এই সব মেয়েদের অবহেলা করিয়াই আসিয়াছে ইহাদের পানে চাহিয়া হাসিয়াছে। কোনদিন কাহারও কথা ভাবিতে গিয়া ইন্দিরার অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানিই তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে, সে আর কাহারও নহে—সে ইন্দিরার, এই কথাটা ভাবিতে তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

মাঝখানে ইরা কোথা হইতে কেমন করিয়া ভাসিয়া আসিল কে জানে, কেমন করিয়া সে যে সুশীলের অন্তরে স্থান পাইল, কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সেখানে নিজের প্রতিষ্ঠা করিল তাহা আজ সুশীল ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না।

সুশীল অস্থির হইয়া উঠে, ইরার কথা ভুলিয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করে, কিন্তু তবু তাহার কথাই মনে জাগে।

সে যে তাহার অন্তরে এতখানি স্থান দখল করিয়া বইয়াছে তাহা কলিকাতায় থাকিতে সুশীল জানিতে পারে নাই। কলিকাতা ত্যাগ করিবার দিনে সে বুঝিতে পারিল ইরাকে সে ভালবাসে, ইরাকে ছাড়িয়া কোথাও যাওয়া তাহার পক্ষে যেন অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

এই কয়েকটা দিন হাজার কাজের মধ্যে ইরার কথাই তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে, তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া সে কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে।

একটা কথা আছে করুণা সহানুভূতি প্রভৃতি বৃত্তিগুলি হইতে অনেক সময় প্রেমের উদ্ভব হয়। একি তাহাই, সুশীল তাহা বুঝিতে পারে না। সে মনকে প্রশ্ন করে সত্যই কি সে ইরাকে ভালবাসিয়াছে? কিন্তু ইহাই বা কিরূপে সম্ভব হইবে, ইরাকে ভালবাসার মত কিছু কি ইরার মধ্যে আছে? মানুষ প্রথমেই যাহা দেখিয়া মুগ্ধ হয় সেই রূপ তাহার কোথায়? ইরা সাধারণ একটী মেয়ে

মাত্র, নিসর্গ সুন্দরী সুশিক্ষিতা ইন্দিরার পার্শ্বে দাঁড়াইবার যোগ্যতা তাহার কতটুকু আছে? তাহার উপরও যদি তাহার অর্থ থাকিত,—কিন্তু সে তো দরিদ্রা, নিজের জীবিকার্জ্জনের জন্য তাহাকে বেড়াইতে হয়। আর ইন্দিরা, সে প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালিনী, সে তাহার ঐশ্বর্য্য দিয়া সুশীলকে ধনবান করিয়াছে।

কিন্তু কে ইহা চাহিয়াছিল? সুশীল পরের ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালী হইতে চাহে নাই, সে চাহিয়াছিল যেন সে দরিদ্র পিতার সন্তান রূপেই পরিচিত হয়, যেন সে নিজের জীবিকা নিজেই অর্জ্জন করিতে পারে। সেই অশুভ মুহূর্ত্তে তাহার পিতা তাহার ভার মিঃ রায়ের হাতে দিয়া গিয়াছেন, আজ সুশীল ভাবে—তিনি তাহার কেবল বাহিরের দিকটাই দেখিয়া গিয়াছেন, তাহাকে যে চির দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া গেলেন তাহা তিনি ভাবেন নাই।

সে ইরার এই দিকটাই কেবল দেখিয়া ছিল। দারিদ্র্য-দুঃখ তাহাকে কষ্ট দিলেও সে স্বাধীন; দৃঢ়ভাবে সে দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজেকে অটুট রাখিতে পারিয়াছে। সে ইরার ঐশ্বর্য্য, রূপ কিছুই দেখে নাই, সে শুধু দেখিয়াছিল ইরার সাহস, শক্তি, দৃঢ়তা।

এই দৃঢ়তা, সংসারের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রাখিবার শক্তি, ইহাই সুশীলকে তাহার পানে আকর্ষণ করিয়াছিল। সুশীল এ কয়দিন অবিরত নিজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে; নিজের মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে ইন্দিরার প্রতি অবিশ্বাসী হওয়াটাই শুধু মহা পাপ নয়, ইহাতে ইন্দিরার পিতার নিকটও কৃতঘ্ন হইতে হইবে। কেবল মাত্র এই একটা আশা লইয়াই তিনি তাহাকে মানুষ করিয়াছেন, তাহার হাতে সব ছাড়িয়া দিয়াছেন। আজ সে যে কৃতঘ্নতা করিল, ইহার জবাব সে কি দিবে?

কিন্তু মন তো মানে না। অন্তরে কে আঘাত দেয়, কে বলে—পরের অর্থে ধনবান হইয়া থাকা পুরুষের কাজ নয়, পুরুষ আত্মবিক্রয় করিয়া এত হীন হইয়া থাকিতে পারে না। সে যখন নিজের হীনাবস্থা বুঝিয়াছে তখন মুক্ত হইবার চেষ্টা করিবে না কেন?

মিঃ রায়ের যে পত্র কলিকাতা হইতে রিডাইরেক্ট হইয়া এখানে আসিয়াছে তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন, তিনি আগামী বুধবার কন্যাসহ কলিকাতায় আসিবেন, মাসখানেক পরে তাহার হাতে ইন্দিরাকে সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন।

আজও সে ইন্দিরাকে ভালবাসে, ইন্দিরার জন্য সে নিজের জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারে। আজও তাহার মনটা সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী জাপান দ্বীপে ঘুরিয়া বেড়ায়, দিনের মধ্যে শতবার ভাবে—এতক্ষণ ইন্দিরা কি করিতেছে, সেও কি তাহার মত তাহার কথা ভাবিতেছে?

কোথা হইতে আসিল ইরা, কেমন করিয়া ইন্দিরার স্থান খানিকটা চুরি করিয়া সে দখল করিয়া বসিল?

ইরার উপর সে রাগ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু রাগ করাও তো যায় না, ইরার আর্ত্ত মুখখানা মনে জাগিয়া উঠে, মনে পড়ে, প্রত্যহ সে কুণ্ঠিতভাবে আসে, কাজ করে—চলিয়া যায়। নিরঞ্জন একদিন তাহার কাজের মধ্যে এতটুকু ত্রুটী পাইয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিল, তাহার পর হইতে সে যে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া উঠিয়াছে।

ইদানীং সে সুশীলের সঙ্গ এড়াইয়া চলিতে চায়, তাহা সুশীলও বুঝিয়াছিল। সেও সতর্ক হইয়াছিল, ইরাকে এড়াইয়া চলার চেষ্টা করিত, নিতান্ত আবশ্যক না হইলে ইরার সম্মুখে আসিত না।

সুশীল অন্তর যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিতেছিল,—সে ইন্দিরার নিকট অবিশ্বাসী হইয়াছে। আজ এই জ্যোৎস্নালোকিত প্রকৃতির পানে চাহিয়া সে ভাবিতেছিল—ছি ছি, সে করিয়াছে কি,—ইন্দিরা যে তাহাকে বই জানে না, সেও যে ইন্দিরাকে প্রাণ মন ঢালিয়া ভালবাসিত, আজ সে এ কি করিতেছে?

সুশীল আর্ত্তভাবে দুই হাতে বুকখানা চাপিয়া ধরিল—ইন্দিরা, যত শীঘ্র পার তুমি এসো, তোমার স্বামীকে রক্ষা কর, পাপপঙ্ক হইতে টানিয়া তোল.

যদি ইন্দিরা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে, সুশীলের অন্তর কলুষিত হইয়াছে, সে ইরাকে ভালবাসিয়াছে, সে কি তাহাকে ক্ষমা করিবে?

না, সে ক্ষমা করিবে না। সুশীল ইন্দিরাকে চেনে, তাহার অভিমানকে চেনে, সে কিছুতেই সুশীলকে ক্ষমা করিতে পারিবে না তাহাও সে জানে।

সুশীল মুহ্যমান ভাবে পড়িয়া রহিল, তাহার মনের মধ্যে তখন ইন্দিরার দৃপ্তমূর্ত্তিখানা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

১২

কলিকাতায় ফিরিয়াই সে নিরঞ্জনকে জানাইল মিঃ রায় কন্যাসহ আগামী কাল এখানে আসিয়া পৌঁছাইবেন। নিরঞ্জনকে আজ একবার সন্ধ্যার দিকে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে হইবে, সুশীলও সেখানে থাকিবে, উভয়ে মিলিয়া বাড়ীটিকে সুসজ্জিত করিবার ব্যবস্থা করিবে।

সারাটা দিন এদিক-ও দিক ঘুরিয়া সুশীল সন্ধ্যার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ইরার বাসায় গিয়া পৌঁছাইল। নিজেকে সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, ইরার নিকটে সে সব কথা বলিয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়।

ইরা দ্বার খুলিয়া দিয়া সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিল, "আসুন।"

মিসেস দাস উপস্থিত কতকটা সামলাইয়া লইলেও এখনও উঠিতে পারেন না। ডাক্তার থাইসিসের আশঙ্কা করিয়াছেন। দু' পাঁচ দিন একটু নরম থাকিলেও যে কোন মুহূর্ত্তে ব্যারাম আবার বাড়িয়া উঠিতে পারে, তিনি একথা বলিয়া দিয়াছেন।

সুশীল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া একটা নমস্কার করিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "আজ আবার এসেছি মা, সেদিন আপনার চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ নিতে পারিনি, এর জন্যে বড় লজ্জা পেয়েছি।"

মিসেস দাস বলিলেন, "তার জন্যে আমি কিছুই মনে করি নি বাবা, তোমার চাকর বলে গেল কাজেই আমি আর কোনও উদ্যোগ করি নি। বড় ইচ্ছা ছিল মায়ের মত তোমায় একদিন সামনে বসিয়ে খাওয়াব, কিন্তু সে আশা যে মিটবে সে আশা আমি করিনে। তুমি নিজে জোর করে চা খেয়েছ, কোন কুসংস্কার মানো না বলে সেই সাহসেই তোমায় চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলুম।"

সুশীল বলিল, "এর পর একদিন এসে নিশ্চয়ই খাব মা, খাওয়া তো পালাবে না আমিও পালাব না। আপনার যেদিন খুসি সেইদিন আমায় খাইয়ে দেবেন, আজ চা পেলেও হয়।"

ইরা বলিল, "একটু বসুন, আমি এখনি চা করে নিয়ে আসছি।"

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া সুশীল বলিল, "থাক, আর এখন চা দিতে হবে না। এর জন্যে তোমায় এত ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই, আমি চা খেয়ে এসেছি।"

সে আর আপনি বলিত না, তুমি সম্বোধন করিত।

ইরা বলিল, "এক কাপ চা তৈরী করতে আমার একটুও কষ্ট হবে না; আপনি একটু বসুন, আমি এখনই আসছি।"

সুশীল আর বাধা দিল না, ইরা চলিয়া গেল।

কে বলিতে পারে আজই এখানে আসা এবং চা খাওয়া শেষ হইল কিনা। মনের মধ্যে আশঙ্কা জাগিতেছিল, হয়তো আজ রাত্রিটা মাত্র সে স্বাধীন আছে, কাল সকাল হইতে সে পরাধীন হইয়া পড়িবে।

ইরা রন্ধনগৃহে গিয়া তাড়াতাড়ি ষ্টোভ ধরাইয়া তাহার উপর কেটলী বসাইয়া দিল। ষ্টোভের সোঁ সোঁ শব্দে ও ঘরের কোন কথা আর তাহার কানে আসিয়া পৌঁছাইল না।

হঠাৎ পিছনে দরজার উপর শব্দ শুনিয়া সে সন্ত্রস্তে মুখ ফিরাইল বিস্মিত চোখে চাহিয়া দেখিল দরজার উপর দাঁড়াইয়া সুশীল।

তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সুশীল যে এই ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইবে ইহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর। আজ হঠাৎ তাহাকে এই অপরিষ্কার ঘরে আসিতে দেখিয়া ইরা বাস্তবিকই বিস্মিত হইয়া গেল।

বিস্মিত কণ্ঠে সে বলিল, "আপনি এ ঘরে এলেন যে, ও ঘরে বসতে না পারেন বারাণ্ডায় বসবেন চলুন, আমার চা হয়ে এল বলে।"

শান্তকণ্ঠে সুশীল বলিল, "যাচ্ছি ও ঘরে। রোগীর কাছে বসতে পারিনি বলে যে এ ঘরে এসেছি তা নয়, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা বলার আছে ইরা। ওঘরে মায়ের সামনে সে সব কথা বলা চলে না বলেই এ ঘরে এসেছি, আফিসে নির্জ্জনতা খুঁজে ছিলুম পাইনি, সেইজন্যে আজ ওদিকে অনেক কাজ থাকা সত্ত্বেও এখানে এসেছি।"

বিস্মিত চোখ তুলিয়া ইরা তাহার মুখের পানে মুহূর্ত্তের জন্য তাকাইয়াই দৃষ্টি নামাইল; তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সুশীল কি বলিবে তাহা যেন সে অনুভবে

কতকটা বুঝিতে পারিল। মৃদুকণ্ঠে বলিতে গেল, "এই অপরিষ্কার ঘরে আপনি—"

"তা হোক অপরিষ্কার ইরা, তাতে কিছু এসে যাবে না। আমি এইখানেই বসছি, আমার কথাটা শেষ করে এখনি চ'লে যেতে চাই, সন্ধ্যার পরে আমার অন্য অনেক কাজ আছে।"

সুশীল দরজার উপরই বসিয়া পড়িল। অত্যন্ত সচকিত হইয়া উঠিয়া ইরা বলিল, "ওখানেই বসে পড়লেন, এই আসনখানা পেতে দিচ্ছি, এর পরে না হয়—"

সুশীল মাথা নাড়িয়া বলিল, "তোমার অত ব্যস্ত হয়ে উঠতে হবে না ইরা, আমি নিজে ইচ্ছা করেই এসেছি, ইচ্ছা করেই বসছি, তুমি তো আমায় নিমন্ত্রণ করে আন নি যে এতে লজ্জা পাবে।"

জল ফুটিতেছিল, ইরা জল নামাইয়া তাহাতে চা দিল।—

সুশীল বলিল, "চা ততক্ষণ হোক, আমি, তোমায় ততক্ষণ যা বলবার আছে বলে যাই।"

ইরা জিজ্ঞাসুনেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল, সুশীল খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি একটা দারুণ ভুল করে ফেলেছি ইরা, সেই ভুলটা সুধরাবার জন্যে এখন অস্থির হয়ে পড়েছি। জানিনে সে ভুল আর সুধরানো যাবে কিনা, আর এখন সুধরাতে গেলেই বা তুমি কি মনে করবে, কিন্তু তবু—তুমি যাই মনে করনা কেন, আমার তা না করা ছাড়া আর উপায় নেই।"

ইরা ঘামিয়া উঠিল, এত ভূমিকা কিসের জন্য তাহা সে বুঝিতে পারিল না, কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, "কি ভুল করেছেন?"

সুশীল একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, তাহাতে তাহার মুখখানাই বিকৃত হইয়া উঠিল মাত্র, সে বলিল, "আমার মনে হচ্ছে, কেবলমাত্র সাময়িক একটা ঝোঁকের বশে তোমাদের সঙ্গে এতটা মেলামেশা করা আমার উচিত হয়নি। ভবিষ্যতে যখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় দিতে গেলে কেবলমাত্র প্রভু কর্ম্মচারী ছাড়া আর কিছুই বলা চলবে না, তখন হঠাৎ মাঝখানে কয়দিনের জন্যে এই আত্মীয়তা করে যাওয়া কি আমার পক্ষে উচিত হল?"

ইরার মুখখানা শবের মুখের মতই মলিন হইয়া উঠিল। সুশীল তাহার মুখে একটি কথা শুনিবার প্রত্যাশায় রহিল, কিন্তু ইরা তাহার পানে চাহিল না, নতমুখে থাকিয়া নিঃশব্দে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িল।

সুশীল বলিল, 'তুমি বলতে চাও আগেই তুমি এ জানতে, অর্থাৎ ধনী ও দরিদ্রের মিলতে গেলে শেষটায় যে এমনই একটা ব্যাপার ঘটে তা জানা কথা। কিন্তু না কথাটা সে ভাবে ধরো না ইরা, কেবল এইটুকু ভাব আমার নিজের 'পরে নিজের কোন অধিকার নেই, আমার দরিদ্র বাপ আমার স্বাধীনতা চিরকালের মতই বিক্রী করে গেছেন, সেই জন্যেই আমি ধনীর জাঁকজমক সহ্য করতে পারিনে, প্রাসাদে বাস করা আমার কাছে অভিশাপ বলেই মনে হয়।"

ইরা চায়ের কাপে চা ঢালিতে ঢালিতে একবার চোখ তুলিয়া তাকাইতে তাহার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের উপর যন্ত্রণার যে ছাপটা পড়িয়াছে তাহা স্পষ্টই সে দেখিতে পাইল।

অধীরভাবে সে বলিল, "আপনার মোট কথাটাই আপনি বলুন যে আপনি ভবিষ্যতে আর এখানে আসবেন না আর আমার সঙ্গে আপনার যে বন্ধুত্ব আছে বা ছিল সে যেন আর কেউ না জানতে পারে কেমন, এই তো?"

হঠাৎ তাহার রূঢ় কণ্ঠস্বর সুশীলকে যেন বড় বেশী রকমই আঘাত দিল। ইরা যতখানি রূঢ়তা প্রকাশ করিয়াছিল, সে ততখানি নরম হইয়া বলিল, "কতকটা তাই বটে।"

ইরার যেন বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে ছিল, সুশীল যে এমনভাবে তাহাকে অপমান করিবে তাহা সে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবে নাই। সুশীল নিজেই সাধিয়া আসিয়া তাহাকে বন্ধু বলিয়াছে, সে চা দিতে চায় নাই, সুশীল জোর করিয়া কেবল চা নয়, তাহার হাতে লুচি তরকারী পর্য্যন্ত খাইয়া গেছে, আজ সেই কিনা জানাইতে আসিয়াছে তাহার সহিত একদিন সে খেয়াল মত বন্ধুভাবে চলিয়াছিল, তাই বলিয়া সে যে তাহাকে বরাবর বন্ধু বলিবে তাহা হইতে পারে না। ইরাকে মনে রাখিতেই হইবে, ইরা কর্ম্মচারী সুশীল তাহার মনিব—প্রভু।"

বেদনা ভরা সুরে ইরা বলিল, "কিন্তু আমি একটা কথা জানতে চাই মিঃ মুখার্জ্জী, আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করেননি আপনি দয়া করে আমায় বন্ধু বলে ভাবলেও আমি কোনদিন আপনাকে মনিব ছাড়া ভাবিনি? আপনি দয়া করে আমার বাড়ীতে এসেছেন, আমার মাকে মা বলেছেন, আমার তৈরী চা খেয়েছেন আপনি হয়তো এ ব্যবহারগুলোকে আপনার বন্ধুত্বের নিদর্শন ভেবে খুসী হয়ে উঠেছেন। কিন্তু আমি বা আমার মা আপনার এ ব্যবহারগুলোকে কেবলমাত্র দয়ার দান বলেই জেনে নিয়েছি।"

বিস্ফারিত চোখে তাহার পানে তাকাইয়া সুশীল বলিল, "দয়ার দান—?"

বড় দুঃখেও মানুষ হাসে, তাই ইরাও হাসিল, "তা নয় তো কি মিঃ মুখার্জ্জী? আপনি বন্ধুত্ব করতে এলেই আমরা কি তত সহজে আপনার মত লোককে নিতে পারি? আমরা কি জানি না ধনী দরিদ্রে প্রভেদ কতখানি? আপনি যে জানেন না তা নয়, আর তা জানেন বলেই না আজ আমায় এমনভাবে অপমান করতে পারছেন?"

হঠাৎ তাহার চোখ ছাপাইয়া দুই ফোঁটা জল পড়িয়া গেল, লজ্জিতা হইয়া তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইল।

"অপমান—তোমায় অপমান করতে এসেছি—?

আত্মবিস্মৃত সুশীল ইরার একখানি হাত চাপিয়া ধরিল, "না, না অপমান করতে আসি নি ইরা সেকথা যদি ভেবে থাকো জেনো বিষম ভুল করেছ। কিন্তু আমার অবস্থা যদি জানতে ইরা, যদি বুঝতে—আমার বেতন-ভোগী কর্ম্মচারী হয়েও তুমি কতখানি স্বাধীন, কতখানি মুক্ত, তার তুলনায় আমি কতখানি পরাধীন তাহ'লেও ঐ রকম কথা বলতে পারতে না।"

ইরা আস্তে আস্তে হাতখানা ছাড়াইয়া লইল, চায়ের কাপ সামনে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "অধৈর্য্য হবেন না, চা খান।"

সুশীল বলিল, "খাচ্ছি, কিন্তু শোন ইরা, তুমি বুঝতে চেষ্টা কর আমি কতখানি অসহায়। আমি তোমায় একথা কেন বলছি, সেটা এখন তুমি শোননি। কাল সকালে মিঃ আর মিস রায় আসছেন আমার বিয়ের কথা ঠিক হয়ে আছে, আর সেইজন্যেই মিঃ রায় আমার হাতে লক্ষ লক্ষ টাকার ভার দিয়েছেন। তাঁরা এসে যদি শুনতে পান তোমার সঙ্গে আমার—"

এক মুহূর্ত্তে সুশীলের অসহায় অবস্থাটা ইরার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল, সে গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বুঝেছি।"

সুশীল শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "মুখের কথায় বুঝো না ইরা, অন্তর দিয়ে বুঝো। আমার কোন কথাই বোধ হয় তোমার কাছে অজানা নেই, তাই বলছি আমায় ওঁদের সামনে অকম্পিতপদে দাঁড়াতে দিয়ো। আজ আমি উঠলুম, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, নিরঞ্জন এখনিই আসবে।"

শূন্য চায়ের কাপ নামাইয়া সুশীল উঠিয়া পড়িল।

সে চলিয়া গেল, ইরা আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া তাহার পথের পানে তাকাইয়া রহিল।

সে কি কাজ ছাড়িয়া দিবে? সুশীল যেখানে আছে সেখানে তাহার আর না যাওয়াই ভাল, হয়তো তাহাকে দেখিয়া মিস রায় কি বলিবেন। সে সব সহ্য করিতে পারিবে, মিস রায়ের কথা সহ্য করিতে পারিবে না।

কিন্তু এখনই তো কাজ ছাড়া চলে না, নিজের জন্য তাহার ভাবনা নাই, রুগ্না জননীর ঔষধ পথ্য সে যোগাড় করিবে কি করিয়া?

ও ঘর হইতে মায়ের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল,—"ইরা—"

ইরা তাড়াতাড়ি মুখে চোখে জল দিতে দিতে উত্তর দিল—"যাই মা—"

(১৩)

পরদিন নিয়মিত সময়েই ইরা অফিসে গিয়া পৌঁছাইল ব্যাগ্র চোখে সে একবার চারিদিকে চাহিল কিন্তু সুশীল বা নিরঞ্জন কাহাকেও দেখিতে পাইল না। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে নিজের ঘরে গিয়া বসিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিল।

দেয়ালের ঘড়িতে যখন টুং টুং করিয়া বারটা বাজিল, তখন সে শ্রান্তভাবে হাত তুলিয়া লইল মুখ ভাসাইয়া ঘামের স্রোত ছুটিতেছিল, রুমালে ঘাম মুছিতে মুছিতে সে কান পাতিয়া শুনিল বাহিরে কয়েকজন লোকের কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে সুশীলের কণ্ঠস্বরই তাহাকে বেশী রকম আকৃষ্ট করিল।

দরজার সামনে কাহারা আসিয়া দাঁড়াইল, সুশীল পর্দা সরাইয়া দিয়া বলিল, "আসুন--"

ইরা তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল।

সুশীলের পশ্চাতে ছিলেন সৌম্যমূর্ত্তি একটি বৃদ্ধ, তাঁহাকে দেখিলে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে অন্তর পূর্ণ হইয়া যায়। তাহার পার্শ্বে একটী তরুণী দাঁড়াইয়া, তাহার পানে তাকাইয়া ইরা চোখ ফিরাইতে পারিল না।

জীবনে সে অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখিয়াছে, কিন্তু এমন সুন্দরী সে বোধহয় আর দেখে নাই। ইরা মুগ্ধ নয়নে এক পলকের দৃষ্টিতে তরুণীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত দেখিয়া লইল, যেন একখানি নিখুঁত ছবি।

সুশীল পরিচয় দিল, "মিস দাস ইনিই মিঃ দেবনারায়ণ রায় আর ইনি মিস ইন্দিরা রায় মিঃ রায়ের মেয়ে।"

মিঃ রায়ের পানে ফিরিয়া সে বলিল, "ইনি আমাদের টাইপিষ্ট মিস ইরা দাস।"

মিঃ রায় কন্যার পানে তাকাইয়া কি বলিলেন ইরা তাহা বুঝিতে পারিল না। সুশীল মৃদুকণ্ঠে কি বলিল তাহাও ইরা বুঝিতে পারিল না।

মিঃ রায় বলিলেন, "ওঁকে এত ছোট বদ্ধ ঘরে দেওয়াটা উচিত হয়নি সুশীল, একটা কোন বড় ঘরে দিলেই ভাল হোত। এ ঘরে ভয়ানক গরম, যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

সুশীল বলিল, "ওদিকার সব ঘরগুলোতে অনেক পুরুষ কাজ করে, সেইজন্য ওঁকে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করে দেওয়া হয়েছে। উনি ভদ্রলোকের সামনে কাজ করতে রাজী নন, নিজেই এন ঘরটা বেছে নিয়েছেন।

ইন্দিরার অনিন্দ্যসুন্দর মুখে একটু হাসির রেখা মুহূর্ত্তের তরে জাগিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল, সে সুশীলের হাতটা ধরিয়া টানিয়া বলিল, "ও ঘরে চল, এই ছোট ঘরে আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।"

তাহারা প্রবেশ করিবার সময় সুন্দরী ইন্দারার পানে তাকাইয়া ইরা অভিবাদন করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, যাওয়ার সময় সে অভিবাদন করিল। মিঃ রায় প্রত্যভিবাদন করিলেন কিন্তু গর্ব্বিতা ইন্দিরা কেবল মাথাটা একটু নত করিয়া সুশীলের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

ইরা স্থানুর মত দাঁড়াইয়াছিল, কতক্ষণ পরে যখন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন সে ব্যস্তভাবে আবার টাইপ করিতে বসিল।

কিন্তু আজ সকল কাজেই গোলমাল হইতেছিল। ইরা খানিক চেষ্টা করিয়া অবশেষে কাজ ছাড়িয়া দিয়া অবসন্নভাবে টেবলে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া ভাবিতে লাগিল।

এত সুন্দর—এত সুন্দর কখনও মানুষে হয়? ওই সদ্য প্রস্ফুটিত স্থলপদ্মের বন, ভ্রমরকৃষ্ণ কুঞ্চিত চুলগুলি, কি সুন্দর চোখ ভ্রূ, নাক, ঠোঁট, এত সুন্দর মানুষ হয়? সে যে হাতখানা দিয়া সুশীলের হাত খানা ধরিয়া টানিল সে হাত খানিই বা কি সুন্দর, সে আঙ্গুলগুলি কি চমৎকার। তাহার কানে দুইটা সবুজ পাথরের ইয়ারিং, আঙ্গুলে সবুজ পাথরের আংটী, হাতের তিনগাছি করিয়া চুড়িতে সবুজ পাথর বসানো; পায়ে সবুজ সু, পরনে সবুজ সাড়ি,—পরিচয় দিতেছিল, এই মেয়েটি সবুজ রংটাই বেশী পছন্দ করে।

কিন্তু কি সুন্দর দেখাইতেছিল যখন সে সুশীলের পানে চাহিয়াছিল, সুশীল তাহার পানে চাহিয়াছিল।

জগতে সে সুশীলের—সুশীল তাহার, সুন্দর সুন্দরের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, অসুন্দরের জন্য নয়।

সুশীল মিঃ রায় ও ইন্দিরাকে নিজের প্রশস্ত অফিস রুমে লইয়া গিয়া বসাইয়াছিল। শ্রান্ত ভাবে বসিয়া পড়িয়া একগ্লাস লেমনেডজল খাইয়া কতকটা সুস্থ হইয়া মিঃ রায় বলিলেন, "আফিসের কাজ চলছে ভাল, সে খবর আমি বম্বেতে থাকতেই আগরওয়ালার কাছে শুনেছি। তবুও বলি আমি যে প্ল্যান করে দিয়েছিলুম যদি সেই ভাবে কাজ করতে হয় তো আরও উন্নতি হতো। কতকগুলো নিয়মের ব্যতিক্রম দেখতে পাচ্ছি, যেটা একেবারেই অস্বাভাবিক বলে বোধ হয়। দেশবিদেশের সঙ্গে আমাদের ব্যবসা চালাতে হবে, দেশবিদেশের লোক অফিসের কাজে রাখা চাই; কিন্তু তুমি তা না করে কেবল ভারতীয়দেরই কাজে রেখেছ। এই সব ভারতীয় কর্ম্মচারী রেখে জগতের প্রত্যেক জাতির সঙ্গে ভাবের বা কাজকর্ম্মের আদান-প্রদান চলতে পারে কি তাই জিজ্ঞাসা করি?"

সুশীল খানিক চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "কেন চলতে পারবে না? ভারতীয়েরা এমন কোন কাজ

আছে যে কাজে অপারগ হবে ? আমি দেখছি যত বা কিছু কারবার ব্যবসা বাণিজ্য সবই বিদেশীরা নিজেদের একচেটে করে নিয়েছে, ভারতীয়দের মধ্যে আমাদের নিজের জাতি বাঙালীরা এর মধ্যে, এতটুকু অধিকার পায়নি, অধিকার পাওয়ার যোগ্যতাও তাদের নেই—কিন্তু ওদের শিখিয়ে দিতে হবে তো ! আমরা পয়সা খরচ করে বিলাত হতে অনেককিছু শিখে এসেছি, আমাদের গরীব দেশের গরীব ছেলেরা অত পয়সা ব্যয় করে শিখতে যেতে পারবে না ; কাজেই আমরা যেটা শিখে এসেছি, সেটা যদি ওদের শিখাই তা হলে অন্যায় কিছু হবে না বলেই আমি মনে করি। আমি যা শিখতে পেরেছি তা আপনার দয়ায়, কিন্তু আমার মত গরীব ঢের ছেলেও তো আছে যারা লেখাপড়া শিখছে, কিন্তু শেষকালটায় তাদের অদৃষ্টে চাকরী করা ছাড়া আর কিছুই জুটছে না। আজ আমি যদি আমার জাতি—এই বাঙ্গালীদের মানুষ করে গড়ে তুলতে চাই, সেটা কি আপনার মতে খারাপ বলে প্রতিপন্ন হবে ?"

ইন্দিরা জোর করিয়া বলিল, "বাবার কথার উত্তর আমি দিচ্ছি, তাতে খারাপই হবে।"

সুশীল ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যদি জানতে চাই কেন খারাপ হবে—তার উত্তরটাও বোধ হয় পেতে পারি ?"

ইন্দিরা বলিল, "উত্তর সোজা, যেহেতু বাঙ্গালী বড় নেমকহারাম জাত, ওদের মত হিংসুক পরশ্রী কাতর জাত দুনিয়ায় আর নেই।"

সুশীল তাহার মুখের উপর শান্ত চোখের দৃষ্টি তুলিয়া ধরিল, পূর্ব্বের মতই ধীর কণ্ঠে বলিল, "একথা বলবার আগে নিজের দিকেও তাকাতে হয় ইন্দু, মনে করতে হয়—পরিচয় দিতে গেলে নিজেকে বাঙ্গালী ছাড়া আর কিছুই বলতে পারবে না। কোনও ইউরোপীয়ানের সঙ্গে কথা বলবার সময় জানিনে—তুমি বাঙ্গালীর সম্বন্ধে এই মন্তব্য কোনদিন প্রকাশ করেছ কিনা, আর তোমার এই মন্তব্য শুনে তাঁর মনের ভাবটা কি রকম হয়েছিল তাও বলতে পারি নে। যাক সে কথা, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি কি করে তুমি জানলে বাঙ্গালী পরশ্রী-কাতর, হিংসুক, বিশ্বাস-ঘাতক ? কোন বাঙ্গালী তোমার সঙ্গে কোনদিন এরকম কোন ব্যবহার করেছে কি ?"

ইন্দিরা বলিল, "হয় তো করে নি, কিন্তু তুমিই কি জোর করে বলতে পার বাঙ্গালী বিশ্বাসঘাতক নয় ?"

সুশীল বলিল, "হ্যাঁ, হাজারে একজন থাকতে পারে। তুমি কি বলতে পার ইন্দু, যে সব সভ্যদেশে তুমি বেড়িয়ে এলে, সে সব দেশে কেউ কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করে নি ? তা যদি হতো—তা হলে রোমের ধ্বংস হতো না, আরও অনেক দেশ আছে—"

বাধা দিয়া মিঃ রায় বলিলেন, "আঃ, যেতে দাও ওর কথা ; ছেলেমানুষ, বুঝতে না পেরেই একটা কথা বলে বসে, ওর কথা ধরতে গেলে কি চলে ?"

শান্তকণ্ঠে সুশীল বলিল, "না, ওঁর কথা আমি ধরছি নে, তবে নিজের জাতের সম্বন্ধে এই ভুল ধারণাটা আমি নষ্ট করে দিতে চাই। একথা—বলতে পার তুমিই ইন্দিরা, আর বলতে পারে তারাই যারা বিদেশের বাহ্যিক আড়ম্বর দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে, নিজেদের ব্যক্তিত্ব বোধ, জাতিত্বজ্ঞান যারা বিসর্জ্জন দিয়েছে। আমি জানি—যতই কেন শিক্ষা পাওনা তবু নিজের মনের মধ্যে জাতীয়তা জাগিয়ে রেখে দেওয়া সকলেরই উচিত, আর সেইটাকেই মনুষ্যত্ব বলে।"

উত্তেজনাবশে তাহার সুন্দর মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছিল। ইন্দিরা কি বলিবার জন্য উদ্যোগ করিতেই মিঃ রায় বাধা দিলেন, "চুপ, যাক ইন্দু, বেশী কথা বলবার দরকার নেই, এর পর এ সব নিয়ে কথাবার্ত্তা চলবে আমি দুদিন থেকে ব্যাপার সব দেখি শুনি, তারপর যা হয় বিবেচনা করা যাবে।"

একটু নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, "আর দেখ, এত বড় অফিসটাতে একজন মেয়ে টাইপিষ্ট, তার ওপর সেও বাঙ্গালী—রাখাটা ঠিক হয় নি। আমাদের দেশে আজকাল ইউরেশীয়ান, ইউরোপীয়ান টাইপিষ্টের অভাব তো নেই কাজেই-

নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে সুশীল বলিল, "আপনি তা বিবেচনা করবেন।"

মিঃ রায় একটা আড়ামোড়া ছাড়িয়া বলিলেন, "অবশ্য আমি যে মেয়েদের শিক্ষা বা কাজের পক্ষপাতী নই তা নয় ; তবে এ যে আমাদের দেশ। যে দেশে ছেলেরাই অনেক পেছিয়ে পড়ে আছে সে দেশে মেয়েরা

যে কতটা এগিয়েছে তাই হচ্ছে ভাব্‌বার কথা। আমি ওকে পরীক্ষা করে দেখব, যদি দেখি কাজের উপযুক্ত, তা হলে থাকবে, নইলে একটা মেম রাখা যাবে। কি বলিস ইন্দিরা ?"

ইন্দিরা সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ঘড়ির পানে তাকাইয়া বলিল, "এবার ওঠো বাবা, বেলা ছটো বাজল।"

মিঃ রায় সোজা হইয়া বসিলেন, বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এবার উঠতে হবে বটে। বিকেলের দিকে আমার ওখানে যেয়ো সুশীল, তোমার চা খাওয়া ওখানেই হবে। কয়েকটা কাজ আছে, যাওয়া চাই-ই।"

তিনি উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরাও উঠিল।

১৪

সেদিন রবিবার ছিল।

ছুটি পাইয়া রতিনাথ ছপুর সময়ে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতে করিতে একটু দিবা-নিদ্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

তিনি ঘুমাইয়াছেন ভাবিয়া মনীষা আস্তে আস্তে দরজার পরদা সরাইয়া উঁকি দিল, তাহার পায়ের শব্দ পাইয়া রতিনাথ চাহিয়া দেখিলেন, তিনি জাগিয়া আছেন দেখিয়া মনীষা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।

"আপনি ঘুমোচ্ছেন বাবা ? আমি উঁকি দিয়ে দেখছিলুম—জেগে আছেন কিনা।"

একটা আড়ামোড়া ছাড়িয়া রতিনাথ আলস্য জড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "ভেবেছিলুম ঘুমোব, তা আর হয়ে উঠল না দেখছি।"

তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া মনীষা বলিল, "থাক, দিনের বেলা ঘুমিয়ে আর দরকার নেই। এই তো বলে থাক দিনের বেলা ঘুমোলে তোমার অসুখ করে, চোখে দেখতেও পাই তাই।"

রতিনাথ হাসিমুখে বলিলেন, "কি দেখতে পাও মা জননী ?"

মনীষা বলিল, "বাঃ, কিছু দেখতে পাইনে ? আমি যে আপনার মা, আপনি আমার ছেলে, ছেলের প্রকৃতি মায়ের জানতে কি কিছু বাকি থাকে বাবা ? বিশেষ যে ছেলে মায়ের ওপরই সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে, কোন সময়ে তাকে খেতে হবে, কোন সময়ে ঘুমাতে হবে, কোন সময়ে বেড়াতে যেতে হবে এ সব যে মায়ে ঠিক করে দেয়, সে মা ছেলেকে চিনবে না ?"

রতিনাথ গম্ভীর মুখ করিয়া বলিলেন, "তা বটে, আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে আবার আমার ছোটবেলা ফিরে এসেছে, আবার আমি মায়ের কোলে ছোট্ট খোকা হয়েছি। তবে উঠেই বসি—কি বল মা, শুলে আবার মাথা ভার হয়ে উঠবে।"

কর্ত্তৃত্বের ভাবে মনীষা বলিল, "না, খানিকটা বরং শুয়ে থাকুন, ওতে শরীরটা বেশ ঝরঝরে বোধ হবে। শুয়ে বরং খানিক গল্প করুন, মনটাও ভাল থাকবে।

রতিনাথ কেবল হাসিতে লাগিলেন।

মনীষা তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, খানিক নীরবে থাকিয়া বলিল, "একটা কথা আছে বাবা—"

রতিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল মা যা বলতে সঙ্কোচ বোধ করছ ?"

মণীষা বলিল, "আমি একটা কাজ করব ভাবছি, আপনি এতে আপত্তি করবেন কি না তাই ভাবছি।"

হাতের কাগজখানা পাশে ফেলিয়া রতিনাথ বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, "বিলক্ষণ, এমন কি কাজ করবে যাতে আমি আপত্তি করব ?

সঙ্কোচের সহিত মনীষা বলিল, "আমি বাংলার মেয়েদের জন্যে একটা সংঘ গড়ে তুলতে চাই এতে আপনার অনুমতি চাই।"

রতিনাথ আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

মনীষা দৃঢ়তার সহিত বলিল, "আমি জানি আমার এ উদ্দেশ্য মহৎ জেনেই আপনি এতে অমত করবেন না, সেই জন্যে ওদিককার ব্যবস্থাও সব ঠিক করে ফেলেছি।"

রতিনাথ বৃথাই হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "যদি ঠিকই করে ফেলে থাক মা তবে আবার আমায় জিজ্ঞাসা করতে এসেছ কেন বল দেখি ?"

মনীষা এবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল, বাঃ, আপনাকে জিজ্ঞাসা করব না তো জিজ্ঞাসা করতে যাব কি পথের লোককে ? আপনি মত দেবেন তবে তো কাজ করতে পারব, যদি মত না দেন তবে—"

সে কথা শেষ না করিয়া ব্যগ্রদৃষ্টিতে রতিনাথের পানে চাহিল।

রতিনাথ মাথা দুলাইয়া বলিলেন, "ধর, আমি মত দেব না।"

মনীষা বলিল, "আমি কৈফিয়ৎ চাইব কেন মত দেবেন না।"

রতিনাথ বলিলেন, "দেব না এই জন্যে, আমি এক নম্বর স্বার্থপর লোক—তাই। আমি আমার মায়ের একটী মাত্র ছেলে, আমি চাই আমার মা আমাকেই খাইয়ে পরিয়ে, ঘুম পাড়িয়ে খেলা দিয়ে শান্তি পাবে, বাইরের পানে চাইবে কেন? মা যদি বাইরের দশটা কাজে হাত দেন, আমার পানে চাইবে কে, আমায় দেখাশোনা করবে কে?"

কথাটা সমাপ্ত করিয়া তিনি প্রচুর হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু সে হাসির মধ্যে প্রকৃত আনন্দ যেন ছিল না, অন্তরের জমাট ব্যথা যেন সেই হাসির মধ্যে গলিয়া পড়িতেছিল।

মনীষা হাসিতে গিয়া হাসিতে পারিল না, মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিল, "আমি বাইরের কাজ নিলে আপনার কথা ভুলে যাব এইটেই কি আপনি ধরে নিয়েছেন বাবা?"

হাসি থামাইয়া রতিনাথ বলিলেন, "ধরে যে নিতেই হয় মা, প্রায়ই যে এই রকমই হয়। মেয়ে পুরুষ সবাই যদি বাইরের কাজ নিয়ে থাকে, ঘরের কাজ কে করবে বল দেখি? যদি তুমি আর আমি দুজনেই কর্ম্মক্লান্ত দেহভার কোন রকমে বয়ে একই সময়ে বাড়ীতে ফিরে আসি, কে কার শ্রান্তি ঘুচাতে ছুটবে বল দেখি?"

মনীষা মুখ নত করিয়া কি ভাবিতে লাগিল, তাহার পর ধীর কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু বাবা, আমার দিন যে কাটতে চায় না। এই যে সারাদিনই আপনি বাইরে থাকেন, আমি কেবল সেলাই নিয়ে বই পড়ে কি করে দীর্ঘ দিনগুলো কাটাব?"

হঠাৎ যেন রতিনাথকে কে আঘাত করিল, অত্যন্ত সচকিত হইয়া উঠিয়া রতিনাথ একবার বিস্ফারিত চোখে মনীষার পানে তাকাইলেন।

সত্যই তো,—কি আত্মসুখী লোক তিনি, নিজের আরাম ও শান্তির আশায় অন্ধ হইয়াছেন, আর একজন যে তাঁহার সেই আনন্দ পাওয়ার মূলে নিজের সুখ আনন্দ নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়া নিঃস্ব হইতেছে, তাহা তো তিনি একদিনও ভাবিয়া দেখেন নাই।

সত্যই তো, সমস্ত দিনমানটা তাঁহার বাহিরে কাটিয়া যায়, এই এতবড় বাড়ীটার মধ্যে কেবল মাত্র কয়েকটা দাস দাসীর সাহায্যে মনীষার দীর্ঘ দিন কাটিবে কি করিয়া?

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "বড় স্বার্থপরের মত কাজ করছি—না মা? তোমার বিশ্বের উপর ছড়ানো স্নেহ গুটিয়ে এনে একটার মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চাই। না মা, আমি যতদিন তোমার বেদনা বুঝি নি, তোমায় বদ্ধ করে রেখেছি, এবার তোমায় মুক্তি দেব। তুমি যাতে শান্তি পাও কল্যাণি—তাই কর।"

মনীষা মাথা নাড়িল, "না বাবা, আর যাব না।"

রতিনাথ বিস্মিত হইয়া গিয়া বলিলেন, "কেন?"

মনীষা বলিলেন, "এ কথা সত্যি যে বাইরের কাজে হাত দিলে ভেতরের কাজ কিছু করতে পারব না। তার চেয়ে আমি যেমন আছি তেমনই থাকি।"

স্নেহভরে তাহার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া রতিনাথ বলিলেন, "পাগলী মা, অমনি রাগ হয়ে গেল? না হয় আমি যতক্ষণ বাড়ী থাকব ততক্ষণ তুমিও বাড়ী থাকবে, আমি যখন বার হব তখন তুমিও বার হবে, তা হলে আমার তো কোন ক্ষতিই হবে না।"

একটু থামিয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু এই নারীসংঘের ব্যাপারটা কি আমায় একটু বুঝিয়ে দাও দেখি মা, তোমার কাজটা কি রকম চলবে একটু দেখা যাক। শেষটায় যেন খুব আড়ম্বর করে দশজনকে জানিয়ে কাজে নেমে যেন লোক হাসিয়ো না; এর পর দশজনে যে তোমায় ঠাট্টা বিদ্রূপ করবে সে কিন্তু আমি সহ্য করতে পারব না।"

মনীষা উৎসাহিতা হইয়া বলিল, "না বাবা, আপনি দেখে নেবেন এ কাজ আমি দশজনকে জানিয়ে করব না, চুপি চুপি আরম্ভ করব, পরে যদি ভাল ফল হয় তখন সকলেই জানতে পারবে। এ যে দরিদ্র মেয়েদের নিয়ে কাজ বাবা, ওরা আড়ম্বর করবে কি করে?"

"দরিদ্র মেয়েদের—মানে?"

মনীষা বলিল, "আপনি বুঝি ভাবছেন বাবা আমি বড়লোকদের নিয়ে কাজ করব, কিন্তু তা নয়, আমি গরীব অসহায়া মেয়েদের জন্যেই এই আশ্রমটা গড়ে তুলব।

যাদের দেখতে কেউ নেই, একদিন যারা সমাজের মধ্যে স্থান পেয়ে আজ হয় তো পরের অত্যাচারে কিম্বা নিজেদের সামান্য ভুলে পথ হারিয়ে ফেলায় সমাজ যাদের তাড়িয়ে দিয়েছে, যাদের আত্মীয় স্বজন কেউ থেকেও নেই, আমার এই প্রতিষ্ঠান কেবল তাদের জন্যেই হবে। যে সব ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বিশ্বের ঘৃণিত ত্যক্ত, যাদের জীবন কেবল অন্ধকারেই থাকবে বলে ভাবা যায়, যারা কোন দিন সৎ হবে আশা করাও ভুল বলে মনে হয়—আমার এ আশ্রমে সেই সব অভাগা ছেলে মেয়ে আশ্রয় পাবে। তারা জন্মেছে এই মাত্র তাদের অপরাধ, তাদের মা বাপের পরিচয় তারা জানে না, এ প্রতিষ্ঠান তাদের জন্যেই তৈরী হবে। বাবা, আপনি চিরদিন উঁচু দিকে নজর রেখেছেন, একবার ঘৃণা না করে এদের দিকে চান দেখি। একদিন হয় তো ওরাই মানুষের মত কাজ করবে, ওদের মধ্যে হয় তো এমন প্রতিভা আছে যাতে তারা বিশ্ববাসীকে চমকে দিতে পারবে, তাদের কি ভাবে ধ্বংস করা হয় দেখুন দেখি। এদের মত হতভাগা দুনিয়ায় আর নেই; এদের জীবন এরা নিতান্ত দুর্ব্বহ বলে মনে করে, ভালো হওয়ার কল্পনা এরা মনেও আনতে পারে না। আবার এরাই এই রকম কতগুলি ঘৃণিত জীবকে জগতে টেনে আনে, এমনি করে দেশ যে ক্লেদে ভরে উঠছে। আমি ওদের ওই ছন্নছাড়া জীবনগুলোকে একটা সুতোয় গেঁথে ফেলতে চাই, ওদের সৎ করতে চাই, ওরাও যে মানুষ, জগতে ভাল কাজ করবার অধিকার যে ওদেরও আছে সেই শিক্ষা ওদের দিতে চাই।"

ধীরে ধীরে রন্তিনাথের মুখখানা দৃপ্ত হইয়া উঠিল, চোখ দুইটী নিজের অজ্ঞাতে কখন অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া উঠিল; অতি গোপনে কখন তিনি তাহা মুছিয়া ফেলিলেন, মনীষা তাহা দেখিতে পাইল না।

তেমনই গোপনে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রতিনাথ বলিলেন, "তোমার উদ্দেশ্য অতি মহৎ; আশীর্ব্বাদ করছি সফলতা লাভ কর।

আহ্বান

শ্রীবাণী রায়

তোমার আহ্বান
অশান্ত সাগর বক্ষে ঝটিকার গান
বিদ্যুৎ চকিত দৃষ্টি,
ধ্বংসের মাঝারে সৃষ্টি;
কৃপণের সব দেওয়া মহিমার দান
তোমার আহ্বান।

তোমার আহ্বান,
কিশোরীর সহসা সে জেগে ওঠা প্রাণ।
বালিকার লাজ হাসি
পথিকের ভাঙ্গা বাঁশী
কোয়েলার সকরুণ মুখরিত তান
তোমার আহ্বান।

তোমার আহ্বান
দূর হতে ভেসে আসা পুণ্য অবদান।
ভয়ে ভয়ে থাকি কাছে
আমার যা কিছু আছে
বিলাইয়া তব পদে হব অবসান
শুনি ও আহ্বান।

বিশ্রাম

শ্রীঅমলা দেবী

সুদূর নীলিমা তল দিগন্ত বিস্তারি
সজল কাজল মেঘে গেছে আজ ভরি।
চমকে বিজলী ঘন উতলা পবন।
ঘুমাও ঘুমাও ওগো শ্রান্ত প্রাণ মন।
যতনে উজল করা সন্ধ্যা দীপ খানি
বাতাসে নিভিয়া গেছে। উতলা শ্রাবণী
নিশীথ গগন তলে দেছে ফেলে তার
দিগন্ত বিস্তার করি কালো কেশ ভার।
সাথী হীন শূন্য গৃহ শুধু পথ দেখি—
ঘুমাও ঘুমাও ওগো ক্লান্ত দুই আঁখি।

"প্রথম দান"

রাণী শ্রীসুরুচি বালা চৌধুরাণী

কেগো তুমি, এলে আজি, তরুণ সুন্দর!
অজানা অচেনা মোর নবীন অতিথি,
দ্বারে এসে দাঁড়াইলে বুকে ল'য়ে ব্যথা,
তুলিয়া নূতন সুরে গাও মধু গীতি?

হে নবীন! নিদ্রালস আঁখি-কোণে তব
এখনো জড়ায়ে আছে স্বপন মাধুরী,
মুছাইতে চাও কেন আধ ঘুম ঘোর
এনেছ কি ওই তব পাত্রখানি ভরি?

অথবা কমল-করে শুধু ডালি লয়ে
কি দান দিবার ছলে হে চির-ভিখারী,
লুটিয়া ল'বে কি মম জীবনের সার,
নিঃস্ব করিয়া মোর এ বুক নিঙারি?

সাথে লয়ে ফাগুনের মদির জীবন
এসেছো কি দিতে মোরে নবীন আশ্বাস,
খুলিয়া কি এ দুয়ার করিব বরণ।
মিটাবে কি পরাণের অসীম তিয়াস?

কিবা আশা আধ সুরে জাগায়ে তুলিলে,
গোপন কথায় কও আধ পরিচয়
আধ খোলা দুয়ারের আলো-ছায়া পথে,
কি মোহন রূপে আজি তোমার উদয়?

মরমের আধ ভাঙা তারে তুলি তান
কি নব আবেশে মোর হরিলে হে চিত,
ভাঙিলে স্বপন জাল এক লহমায়
কিসের পিয়াসী তুমি হে অপরিচিত?

জানো কিহে এ জীবনে কত সুধা বহি,
কত ভাব কত ভাষা নাহি তার শেষ
আকুল এ হিয়া মাঝে কত আছে গান
জানাতে কাহারে চাই বেদনা অশেষ?

যুগ যুগ ধরি' প্রিয় কাহার লাগিয়া
জীবনের অনুরাগ যত মাধুরিমা,
বিরহের ব্যথা ভরা অপূরিত আশা,
[illegible]লন মাগিয়া কভু পায় নাই সীমা?

ওগো সখা! কৌমার্য্যের পীত বাস পরি,
আজি কি এ শুভ লগ্নে দিলে মোরে দেখা।
কে বাজালো শঙ্খে ওই শান্ত উলু ধ্বনী
সাজাইয়া দীপ দেয় আলিপনা রেখা?

হে কুমার! তোমারি ও মোহময় আঁখি
প্রথম মিলন কি সে যাচে মোর সনে,
মিলনের মধুমাখা এ সুখের স্মৃতি
র'বে কি উজল সদা তোমারি ও মনে?

তোমার অরুণ রঙে আমারে রাঙায়ে
প্রথম সোহাগ হার পরাইলে গলে,
প্রথম তিলক সাথে, বরণ-মালায়
অভিষেক করিলে কি নয়নের জলে?

চাইনা তোমার কিছু লও মোর দান,
শূন্য হোক মোর এই ভরা ঘর খানি,
তোমাতেই মিশাইয়া যত কিছু মম
ফুটাইব চির মধু প্রণয়ের বাণী।

তোমার হিয়ার পাতে প্রথম লিখন,
লিখিনু উজাড় করি সব ভাষা মোর,
তোমারই বীণার তারে প্রথম রাগিণী
বাজাইনু প্রিয়তম! মুছি' আঁখি লোর

সুধা

শ্রীহরিপদ গুহ — গল্প —

এক

স্বামী-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল।

স্ত্রী মন্দাকিনী বলিল—'আর কতদিন মেয়েকে এমন করে পুরুষের সাজে রাখ্‌বে? এদিকে যে সুধার বারো বছর বয়স হতে চল্‌ল, সে খেয়াল কি তোমার আছে? মেয়ের যা বাড়ন্ত গড়ন, চৌদ্দয় বে দিতেই হবে;—আর মেয়েই বা কি, ওতো কিছুতেই শাড়ী-সেমিজ পর্‌তে চাইবে না!'

স্বামী হেমেন্দ্রনাথ হাসিল।

বলিল—'ভালই তো; ঠিক্‌ই তো কর্‌ছে ও। তুমি ওকে মেয়ে মনে কর্‌ছ কেন? ধরেই নাওনা কেন—ও আমাদের ছেলে। আমি তো কিছুতেই ভাব্‌তে পারি না যে, সুধা আমার মেয়ে। ছেলেতে-মেয়েতে কিছু প্রভেদ আছে বলে তো আমার মনে হয় না। আমরা জোর করে মেয়েদের কতকগুলি গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখি বলেই না তারা মেয়ে! আমি সুধাকে দিয়ে সেটা দেখাতে চাই।—'

মন্দাকিনী আশ্চর্য্য হইয়া দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল—'সে কী গো? লোকে তা' হলে বল্‌বে কি? সুধার বে দেবে না?'

হেমেন্দ্রনাথ হাসিল; বলিল—'আমি তো বলিনি যে, সুধার বে দেবো না!'

মন্দাকিনী আগ্রহ ভরে ব্যগ্রস্বরে বলিল—'দেবে? কার সঙ্গে? ছেলে, না মেয়ে?'

হেমেন্দ্রনাথ সহাস্য বদনে বলিল—'ধর যদি মেয়েই হয়; কেমন হয় তবে?'

মন্দাকিনী এইবার হো-হো শব্দে উচ্চহাস্য করিয়া বলিল—'বেশ হয়। শীগ্‌গিরই তবে নাতির মুখ দেখ্‌তে পাবে।'

হেমেন্দ্রনাথ গম্ভীর স্বরে বলিল—'তা আর আশ্চর্য্য কি। তোমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ রামায়ণে ভগীরথ যখন একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে।—'

সহসা সুধা সেখানে উপস্থিত হওয়ায় আলোচনাটা চাপা পড়িয়া গেল।

সুধা বলিল—'বাবা, এক্ষুণি আমার বাইকের ব্রেক্ ঠিক্ করে দাও। ওটা একেবারে বেঁকে গেছে।'

হেমেন্দ্রনাথ বলিল—'সে কীরে সুধা, নতুন সাইকেল, এরি মধ্যে ব্রেক বেঁকে গেছে কীরে? পড়ে গিয়েছিলি বুঝি?'

সুধা কহিল—'না বাবা, আমি পড়্‌ব কেন, অত আনাড়ী তোমার সুধা নয়! পড়ে গেছে রায়েদের শিবু। আমি কত বারণ কর্‌লুম;—ও তা শুন্‌লে না, বল্‌লে—'দে ভাই, একটিবার চড়ি!' তারপর যেই দিয়েছি,—ওই মোড় থেকে ফিরে আস্‌বার সময় মার্‌লে এসে গ্যাস্‌পোষ্টে এক ধাক্কা। হুড়মুড় করে সাইকেল নিয়ে সে পড়ে গেল। ছুটে গিয়ে দেখি—ব্রেকটা একেবারে বেঁকে গেছে আর ইুপিড্‌টার কাপড় ছিঁড়ে হাতটা অনেকখানি ছড়ে গেছে।'

হেমেন্দ্রনাথ প্রশংসমান-দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া চাকর নিধেকে ডাকিয়া দিল—তখনই যেন সে ব্রেক্‌টা ঠিক করিয়া আনিয়া দেয়।'

দুই

হেমেন্দ্রনাথ ধনীর সন্তান। পিতা খুব অল্প বয়সেই মন্দাকিনীর সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাহার পর সংসারের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

স্নেহময় পিতা এবং মাতা উভয়েই পুত্রের মায়া কাটাইয়া ধরণীর এই পান্থশালা হইতে বিদায় লইয়া নূতন জগতে সংসার পাতিয়া বসিয়াছেন।

মন্দাকিনী অনেকদিন পর্য্যন্ত নিঃসন্তান ছিল। একটি

সন্তানের জন্য স্বামী-স্ত্রীতে কী আকুল প্রার্থনাই না করিয়াছিল! ব্রত, উপবাস, কবচ ধারণ যে যখন যাহা বলিয়াছে, মন্দাকিনী তখনই তাহা করিয়াছে। কিন্তু কোন ফলই ফলে নাই। মন্দাকিনী নিজে তো একেবারেই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

সকলে যখন বলিতেছিল যে, সন্তান হইবার আর কোন আশা নাই, ভগবানের এমন লীলা,—ঠিক্ তখনই কিন্তু আশার লক্ষণ দেখা গেল। অধিক বয়সে মন্দাকিনী সন্তান-সম্ভাবিতা হইল। তাহার সমস্ত দেহে এক নূতন লাবণ্য দেখা দিল। মাতৃত্বের বিকাশের সূচনা হইল।

স্বামী-স্ত্রীর মনে আনন্দ আর ধরে না। তাহারা রাতদিন কত জল্পনা-কল্পনা করিত; কত ভাঙিত, কত গড়িত!

কি সন্তান হইবে তাহা লইয়া দুইজনে বাদানুবাদ চলিত।

হেমেন্দ্রনাথ বলিত—'ছেলে।'

মন্দাকিনী বলিত—'মেয়ে।'

তখন্ হইতেই এই অনাগতের জন্য দুই সেট্ করিয়া সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত আরম্ভ হইয়া গেল।

তারপর সেই শুভ আসন্ন কালের জন্য এক বুক আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া উভয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ইহার কিছুদিন পর তাহাদের চির আকাঙ্ক্ষিত ধন সুধার জন্ম হইল। অনেকেই ভয় দেখাইয়াছিল যে, অধিক বয়সের সন্তান, প্রসবের সময় আশঙ্কা আছে। কিন্তু মন্দাকিনীর খুব সু-প্রসবই হইয়াছিল।

সুধা ছিল একাধারে তাহাদের ছেলে এবং মেয়ে। এক মুহূর্ত্তও তাহারা তাহাকে চোখের আড়াল করিত না। শিশুকাল হইতেই হেমেন্দ্রনাথ সুধাকে ছেলের মতো পোষাক পরাইয়া ছেলের মতোই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। সুধার মুখখানিও ছিল অবিকল পুরুষের ছাঁচে ঢালা। সে কোন দিনও মেয়েদের মতো বউ-বউ কিম্বা ঘর-সংসার পাতিয়া পুতুল লইয়া কোন খেলা খেলে নাই। মার্বেল, লাট্টু, ফুটবল ইত্যাদি ছিল তাহার ক্রীড়নক, আর খেলার সাথী ছিল পাড়ার যত ছোট ছোট ছেলেরা। তাহার বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার, ঘোড়ায় চড়া, সাইকেল, হাইজাম্প লঙ্ জাম্প ইত্যাদিও শিখিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার চলাফেরা, কথাবলার মধ্যেও পুরুষালী ভাব্টা এমন প্রবল ছিল যে, কোন অপরিচিতের পক্ষে তাহাকে মেয়ে বলিয়া অনুমান করা বড়ই কঠিন।

শৈশবে মন্দাকিনী কয়েকবার কন্যার নাক-কান ফুঁড়িয়া তাহাকে গহনা পরাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সুধার চীৎকারে ও হেমেন্দ্রনাথের আপত্তিতে তাহা কাজে লাগাইতে পারে নাই। মাথায় মেয়েদের মতো বড় চুল রাখিতেও সুধার ঘোর আপত্তি। প্রথম প্রথম বব্ড ছিল, এখন দশ আনি ছ' আনি করিয়া ছাঁটা।

প্রতি ঘটনাতেই বাপ ও মেয়ে একদিকে আর মা একা একদিকে থাকিত। কাজেই মন্দাকিনী কোনটাতেই বিশেষ সুবিধা করিতে পারিত না। তাহার কোন যুক্তি-তর্কই টিকিত না। ইদানীং তাই সে প্রায় একেবারে নীরবই থাকিত।

তিন

বছর খানেক পরেই কিন্তু হেমেন্দ্রনাথের মতের পরিবর্ত্তন ঘটিল।

সুধার দেহ-লতা বর্ষার নদীর মতো কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে। এখন সুধার নিজেরও ছুটাছুটি করিতে সময় সময় কেমন একটু লজ্জা করে। মন্দাকিনী তো প্রায় সকল সময়ই তাহার উপর খড়্গ হস্ত। বাহিরের ছেলেদের সহিত খেলা তো একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাকে শাড়ী-সেমিজ-জ্যাকেট পরাও অভ্যাস করিতে হইতেছে। এমন কি কানে এক জোড়া দুল পর্য্যন্ত পরিতে হইয়াছে। এত করিয়াও কিন্তু মন্দাকিনী তাহার দেহে নারীর মাধুর্য্যটুকু ফিরাইয়া আনিতে পারে নাই। শাড়ী-সেমিজ পরিলে কি হয়, তাহার চলা এখনও ঠিক্ পুরুষের মতো। গলার স্বরে, মুখের হাসিতে, চোখের চাহনিতে রমণীসুলভ কমনীয়তা-টুকুর একান্ত অভাব।

হেমেন্দ্রনাথ আজকাল মধ্যে মধ্যে সুধাকে সতী, সীতা, সাবিত্রীর উপাখ্যান পড়িয়া শোনাইয়া বলে—'তুমিও ওদের মতো স্বামীকুল উজ্জ্বল করে নারীর গৌরব অটুট রেখো কিন্তু।'

সুধা হাসিয়া বলে—'বিয়ে করলে তো! বয়ে গেছে।

মন্দাকিনী ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া ওঠে—'বে করবে কেন? বি-এ, এম্-এ পাশ দিয়ে বিলেত যাবে।—'

হেমেন্দ্রনাথ বাধা দেয়। বলে—'তুমি চুপ কর না।' তারপর সুধাকে কাছে টানিয়া আনিয়া উপদেশ দিতে থাকে। বলে—'তুমি তো এখন বড় হয়েছ সুধা! ছেলেদের সঙ্গে আর খেলতে যেও না! তোমাকে এক সেট্ ভাল পুতুল এনে দেবো, তাই দিয়ে খেলো। সঙ্গে সঙ্গে মার কাছ থেকে ভাল করে রান্না-বান্নাটাও শিখে নিয়ে আমাকে দিন কতক রেঁধে খাওয়াও দেখি! তোমার মার হাতের রান্না খেয়ে খেয়ে একেবারে অরুচি ধরে গেছে!'

সুধা কোন কথা কহে না মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকে।

চার

পূর্ণোদ্যমে ঘটক লাগিয়া গিয়াছে।

নানাস্থান হইতে দুই-একটি করিয়া সম্বন্ধও আসিতে লাগিল। মেয়ে দেখিয়া পছন্দ না হওয়ায় আবার ফিরিয়াও যাইতে লাগিল। আবার নূতন সম্বন্ধ আসিতে থাকে।

সুধাকে সু-সজ্জিত করিয়া আসরে আনিয়া বসাইয়া দিলে বরপক্ষ যখন তাহাকে কোন প্রশ্ন করে,—সে তখন হয় দুলিতে থাকে, না হয় শিস্ দেয়, কিম্বা আশেপাশে পরিচিত কোন সখীকে দেখিতে পাইলে—'হাঁ করে দাঁড়িয়ে তোরা এখানে কী দেখছিস্?' বলিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে।

বরপক্ষ পরক্ষণেই পলাইবার পথ খুঁজিতে থাকে।

হেমেন্দ্রনাথ বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িল। সুধাকে এতো করিয়া বুঝাইয়াও কোন ফল হইল না। সে কিছুতেই বালক-সুলভ চপলতা ছাড়িতে পারিল না।

মন্দাকিনী তর্জ্জন করিয়া বলিল—'কেমন, তখনই বলেছিলুম না,—এখন ঠ্যালা সাম্‌লাও!'

হেমেন্দ্রনাথ কোন উত্তর দিল না।

* * * *

প্রজাপতির খেলা; ফুল ফুটিলে নাকি বিবাহ হইবেই। সুধার বিবাহ সম্বন্ধে যখন সকলেই একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে, তখন অন্তরীক্ষে দেবতা হাসিলেন। শীঘ্রই একটা সম্বন্ধ আসিল। বড় লোকের একমাত্র মেয়েকে দেখিয়া খুব সহজেই পছন্দ হইয়া গেল।

পাছে এমন দাঁও হাত ছাড়া হইয়া যায়, তাই বরপক্ষ তখনই পাকা-পাকি বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

হেমেন্দ্রনাথ কিন্তু চট্ করিয়া তাহাতে রাজী হইতে পরিল না। বলিল—'বেশ তো ভেবে-চিন্তে দেখি, উভয় পক্ষের মত হলে পরে একটা ভাল দিন ঠিক্ করে পাকা দেখ্‌লেই চলবে'খন!' অগত্যা বরপক্ষ আর কি করেন! তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া উঠিয়া পড়িলেন।

পাঁচ

মন্দাকিনী হেমেন্দ্রনাথকে ধরিয়া বসিল—'অমত করো না, এখানেই সুধার বিয়ে দাও! যাহোক, ছেলেটি তো ভাল; এবার বি-এ দিয়েছে। জমীদারীর অবস্থা খারাপ;—তার আর কি করবে বল? সুধার অদৃষ্ট তো কেউ আর নিতে পারবে না! আমাদের আর কেই বা আছে? যা আছে, তা তো ওরাই পাবে। ছেলেটি বি-এ পাশ দিয়ে আর কোন্ বড় কাজ-টাজ না করবে। এদিকে মেয়ে যা গুণবতী; এখানে যদি না দাও, তবে জেনো ওর বরাতে আর বিয়ে নেই!'

হেমেন্দ্রনাথও এই বিষয়টা খুব ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতেছিল। কয়েকদিন চিন্তার পর সে মত করিয়া পাত্রের পিতার নিকট এক পত্র দিল।

তাঁহারা একটা দিন ঠিক্ করিয়া একদিন পাকা-দেখা করিয়া সুধাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল।

* * * *

বৈশাখের এক শুভ দিনে নলিনী মোহন চৌধুরীর সহিত শ্রীমতী সুধার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পূর্ব্বে সুধা বায়না ধরিয়া বসিল—সে বড় করিয়া ঘোম্‌টা দিতে পারিবে না কিন্তু!

মন্দাকিনী হাসিয়া বলিল—'অত বড় করে তোমাকে

ঘোম্‌টা দিতে হবে না। মাথার কাপড়টা সামনের দিকে একটু টেনে দিলেই চল্‌বে'খন!'

পরদিন হেমেন্দ্রনাথ বৈবাহিককে ডাকিয়া বলিল—'দেখুন, আমাদের একটি মাত্র সন্তান সুধা, বড় আদরের। একে তেমন করে শিক্ষা দিতে পারি নি। বড় অভিমানী সে, পদে পদে হয় তো ভুল কর্‌বে;—দয়া করে সব ক্ষমা করে সংশোধন করে নেবেন!'

বৈবাহিক নরেন্দ্রবাবু জোর করিয়া হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন—'তা তো বটেই। তা নেব বৈকি। সব জেনে, দেখে-শুনেই তো বধূমাতাকে ঘরে নিলুম। আপনি সে জন্য কোন চিন্তা কর্‌বেন না!'

বৈকালে অশ্রুর বন্যা বহাইয়া জনক জননী স্নেহের দুলালীকে বিদায় দিল। সুধাও আজ অশ্রু রোধ করিতে পারিল না।

ছয়

নলিনী খুব আপ-টু-ডেট্ ছেলে। সুধাকে খুব ফরওয়ার্ড দেখিয়া তাহার বেশ ভালই লাগিল। সে তাহাকে চট্ করিয়া ভালবাসিয়া ফেলিল। সে যে জিনিষটা পছন্দ করিল, বাড়ীর অন্যান্য লোকেরা ঠিক্ সেটাকেই বেয়াদপি ও লজ্জাহীনতা আখ্যা দিয়া বসিল।

নলিনী মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রিকায় লিখিয়া থাকে। স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে সে কয়েকটি প্রবন্ধও লিখিয়াছিল। তাহাতে সে দেখাইয়াছে যে, এদেশের মেয়েরা কাপড়ের বস্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে; নিজের কোন সত্বা নাই। কাজেই সে সুধাকে পাইয়া সুর ফেরতা ধরিল এবং মনে মনে খুব গর্ব্ব অনুভব করিল। এখন হইতে সে নূতন উদ্যমে প্রবন্ধ লিখিয়া নীচে নাম সহি করিতে লাগিল—শ্রীসুধানলিনী চৌধুরী বি-এ।'

বন্ধু-মহলে এই যুগল নাম লইয়া খুব হাসি-তামাসা চলিতে লাগিল।

* * *

নলিনীর মা এবং বড়দিদি সুধাকে বিষ-দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল। বড়লোকের মেয়ে বলিয়াই হোক্ বা অন্য যে কোন কারণেই হোক প্রথম প্রথম সুধাকে কিছু বলে নাই। কিন্তু, যখন তাহারা দেখিল—নলিনী তাহার বড় অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে;—নিজের ছেলে পর হইয়া যায়—তখন যত রাগ গিয়া পড়িল কালনাগিনী ধিঙ্গী মেয়ে সুধার উপর। সুযোগ পাইলে তাহাকে তাহারা কুট্ কুট্ করিয়া কামড়াইতে লাগিল। তাহার পিতামাতার নিন্দা করিতে লাগিল।

সহ্য করিবার মেয়ে সুধা নয়। তবুও বিদায়কালীন মায়ের অনুরোধ স্মরণ করিয়া অনেক দিন সে নীরবে সহ্য করিয়াছে; কিন্তু, ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে। একবার বাঁধ ভাঙিয়া গেলে, তাহাকে আর আটকান যায় না।

একদিন মা-বাপ তুলিয়া গালি-গালাজ করাতে সুধাও তাহাদের কড়া-কড়া দুই কথা শুনাইয়া দিল। ইহাতে তাহার শাশুড়ী ও ননদ কাঁদিয়া-কাটিয়া একেবারে বিভ্রাট বাধাইয়া ছাড়িল। পাড়ার আশে-পাশের বাড়ীতে সত্য-মিথ্যা নানা কথা বলিয়া সুধাকে সকলের কাছে একেবারে হেয় করিয়া দিল।

সুধা তাহার মাকে সমস্ত ঘটনা লিখিয়া জানাইল। মন্দাকিনী মেয়ের লাঞ্ছনার সংবাদে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। হেমেন্দ্রনাথকে ধরিয়া বসিল—'কিছুদিনের জন্য সুধাকে এখানে নিয়ে এসো!'

হেমেন্দ্রনাথ বৈবাহিককে পত্র দিল—যে, একটা ভাল দিন দেখিয়া সুধাকে দিন কতকের জন্য এখানে লইয়া আসিবে।

নরেন্দ্রবাবু পত্রোত্তরে জানাইলেন—'বধূমাতা সন্তান সম্ভাবিতা; এই অবস্থায় এখন পাঠান অনুচিত।'

হেমেন্দ্রনাথ মন্দাকিনীকে ডাকিয়া শুভ-সংবাদটা শুনাইয়া বলিল—'দেখো, এইবার কেউ আর সুধার কোন নিন্দা কর্‌তে পার্‌বে না। মাতৃত্বেই নারীর পূর্ণ বিকাশ!'

মন্দাকিনী স্বামীকে পূর্ব্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিল—'তুমিই কিন্তু একদিন এর বিরুদ্ধে বলেছিলে।'

সাত

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। মন্দাকিনী সুধার ছেলের জন্য একখানি নক্সী-কাঁথা শেলাই করিতেছিল।

সহসা চির-পরিচিত কণ্ঠের ডাক আসিল—'মা!'

তারপরই সে ঘরে প্রবেশ করিল সুধা; কোলে ফুলের মতো ফুটফুটে একটি সুকুমার শিশু।

মন্দাকিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া খোকাকে কোলে তুলিয়া নিল। সুধা মাতার পদধূলি লইয়া বলিল—'কতদিন তোমাদের দেখিনি, আমার মন কেমন কর্‌ছিল তাই কোন খবর না দিয়েই হঠাৎ চলে এলুম। ওঁরা এখন আমাকে খুব ভালবাসে। সেই সুধা আর এখন নেই মা, একেবারে বদ্‌লে গেছি!'

মন্দাকিনীর মুখ খুসীতে ভরিয়া উঠিল।

নলিনী আসিয়া মন্দাকিনীকে প্রণাম করিতেই, সুধা ঘোম্‌টা টানিয়া দিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল

সত্য সত্যই সুধার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সমস্ত দেহে তাহার এমন একটা লালিত্য আসিয়াছে, যাহা অতি সহজেই সকলে মুগ্ধ করে। তাহার সেই রূঢ় ভাবও আর নাই। এখন সে একেবারে শান্ত, অনেক কিছু সে এখন সহ্য করিতে পারে! যেন কোন সোনার কাঠির স্পর্শে তাহার নূতন জীবন লাভ হইয়াছে।

হেমেন্দ্রনাথ সস্নেহে কন্যাকে পাশে বসাইয়া হাসিয়া বলিল—'ওরে সুধা, তোর সেই সাইকেলটায় একবার চাপ্‌বি না?'

সুধা—'যাও।' বলিয়া হাসিতে লাগিল।

দৈবাৎ

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল, [দৃশ্য গল্প]

পরিচয়

পরিতোষ বাবু—ভদ্রলোক, অবস্থাপন্ন,
বিপত্নীক, নিঃসন্তান।
শৈলেন—যুবক, উচ্চ শিক্ষিত, মাতৃ পিতৃহীন,
মাতুল পরিতোষ বাবু কর্ত্তৃক পুত্রবৎ পালিত।
ঊষা—শৈলেনের কনিষ্ঠা ভগিনী।
ফটিক—বালক ভৃত্য।
ভাগিনেয়—আগন্তুক

সকলেই বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দেওঘরে আসিয়াছেন।

প্রথম দৃশ্য

জসিডি জংসন। ডিগরিয়া পাহাড়ের প্রায় পাদমূলে। সন্ধ্যা হইয়াছে; বৃষ্টি হইতেছে, জোরে ঝড় বহিতেছে। কিছুই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না। কেবল মাঝে মাঝে বৃষ্টির জল জমিয়া একটা মলিন শ্বেতাভার সৃষ্টি হইয়াছে।

ঊষা অতি সাবধানে পা ফেলিয়া পাহাড়ের দিক হইতে প্রবেশ করিল। তাহার গা ওয়াটার প্রুফে ঢাকা—পায়ের শাদা চাম্‌ড়ার জুতা জল ও কাদায় অত্যন্ত ভারী হইয়া উঠিয়াছে। উহাকে দেখিয়া মোটেই ভীত বা উৎকণ্ঠিত বোধ হইতেছে না। বরং সে যেন এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পথ হারাইয়া যাওয়ার ব্যাপারটাকে বেশ উপভোগ করিতেছে।

বিদ্যুৎ চমকিল এবং পরক্ষণেই বজ্রের একটা বিকট আর্ত্তনাদ উঠিল।

ঊষা হঠাৎ ভয় পাইয়া চেঁচাইয়া উঠিল;—'মামা—মামা—'

পাহাড়ের দিক হইতে সাহেব বেশধারী এক ব্যক্তি প্রবেশ করিল। পিচ্ছিল জমির উপর পা হড়্‌কাইয়া পড়িতে পড়িতে দু'বার সামলাইয়া লইল। কিন্তু তৃতীয়বার আর পারিল না—হঠাৎ তিন চার হাত দূর পর্য্যন্ত পিছ্‌লাইয়া গিয়া কাদার মধ্যে উপুড় হইয়া

পড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে তাঁহার মাথার টুপীটা দম্‌কা হাওয়ায় উড়িয়া গিয়া ব্যোম-পথে অদৃশ্য হইল।

উষা অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করিতে না পারিয়া ছুটিয়া কাছে আসিয়া ডাকিল ;—'মামা—'

সে ব্যক্তি উঠিয়া বসিল। নাসিকার অগ্রভাগ হইতে কর্দম মুছিয়া ঝাড়িয়া ফেলিল। তারপর বলিল ; 'আমি মামা নই—আমি ভাগ্নে।'

উষা অবাক হইয়া গেল।

উষা।—ভাগ্নে ?

ব্যক্তি। হ্যাঁ—ভাগ্নে। কিন্তু মামা আমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন নি। আমাকে এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ফেলে তাঁর অন্ত যাওয়া মোটেই উচিৎ হয়নি।

উষা।—আপনার মামা কে ?

সে ব্যক্তি উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যক্তি।—আমার মামা—সুয্যি মামা।

কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকিয়া উষা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

উষা।—সুয্যি মামা—(হাসি)

সুয্যিমামার ভাগ্নে ঘাড় বাঁকাইয়া বীরদর্পে দাঁড়াইল। চক্ষু পাকাইয়া বলিল ;—হাসি ! এই ঝড় বৃষ্টির সময় হাসি ! আমি পা পিছ্‌লে কাদার মধ্যে হেঁডেডুডু খেল্‌ছি আর হাসি ! (পদদাপ)

পদদাপ করিতে গিয়া আবার পদস্খলন ও চিৎ হইয়া পড়ন। উষার উচ্চ হাস্য। সে ব্যক্তি শয়ান অবস্থাতেই হস্তভঙ্গী করিয়া ক্রুদ্ধভাবে কহিল ;— 'হাসি ! ফের হাসি ! আমি পড়ে গেছি তাই— তুম্ কোন হ্যায় ? কে তুমি ? তোমার বাড়ী কোথায় ? তুমি বাঙালী কি বেহারী কি মারাঠী কি গুজ্‌রাটী কি উড়ে—

উষা।—আমি বাঙালী।

সে ব্যক্তি অর্দ্ধোপবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিল।

ব্যক্তি।—বাঙালী ? ঠিক ! বেহারী কিম্বা উড়ে হলে 'মামা' না বলে 'মামু' বলতে।—কিন্তু তোমার অত হাসি কিসের ? তুমি কি জাতি ?

উষা।—আমি স্ত্রীজাতি।

সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্যক্তি।—স্ত্রীজাতি ? আপনি বাঙালী স্ত্রীজাতি ! (টুপী তুলিবার জন্য মাথায় হাত দিয়া) আমার টুপী কোথায় ?

উষা।—আমি তাকে উড়ে যেতে দেখেছি।

সহসা সে ব্যক্তি ভীষণ চটিয়া উঠিল।

ব্যক্তি।—কি ! আমার টুপী উড়ে যেতে দেখেছ ? (আত্মসম্বরণ করিয়া) ওঃ আপনি বাঙালী স্ত্রীজাতি ! তা—ইয়ে হয়েছে—আপনি এখানে কি মনে করে।

উষা।—আমি আর আমার মামা পাহাড়ে বেড়াতে এসেছিলুম। তারপর এই দুর্য্যোগে মামাকে আর খুঁজে পাচ্ছিনা।

ব্যক্তি।—আপনার মামা—ই'য়ে—তাঁকে আর খুঁজে পাবেন না।

উষা।—অ্যাঁ ! সেকি !

ব্যক্তি।—দিঘরিয়া পাহাড়ে ভয়ানক বাঘ—আপনার মামা বোধ হয় তাদের সঙ্গেই রাত্রি যাপন করবেন।

উষা।—[ব্যাকুলভাবে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া] অ্যাঁ।—না না—মামা মামা—

ব্যক্তি।—[নিজমনে] হাসি ! হাসি ! আমি কাদার আছ্‌ড়া পি্‌ছড়ি খাচ্চি আর হাসি ! [উষার নিরুপায় ভাব লক্ষ্য করিয়া] না—এটা উচিৎ হচ্চে না—নেহাত বর্ব্বরতা হচ্ছে।—[প্রকাশ্যে] ই'য়ে—তা কোনো ভয় নেই। বাঘেরা আপনার মামার সন্ধান নাও পেতে পারে।

উষা নীরব মিনতির চক্ষে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

ব্যক্তি।—দেখছেন না এই পেছলে বাঘ কখনো বেরুতে পারে ? আর যদি বা বেরোয় আর কোথাও যেতে পারবে না সড়াৎ করে এইখানে এসে হাজির হবে।

উষা।—কিন্তু কৈ এসে হাজির হচ্ছে না ত !

ব্যক্তি।—তার মানে তারা বেরোয়নি। আমাদের চেয়ে তাদের অভিজ্ঞতা বেশী।

উষা।—কিন্তু মামা—

ব্যক্তি।—তিনি ত নিশ্চয় বেরোন নি নিরাপদেই আছেন। অথবা হয়ত আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে গেছেন।

উষা।—ষ্টেশন কোন দিকে ?

ব্যক্তি। সেটা দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের অভাবে বলা শক্ত। খুঁজে নিতে হবে।

উষা। তাহলে—

ব্যক্তি।—হ্যা—ভিঘ্‌ড়িয়া পাহাড়কে পেছনে রেখে যেদিকে হোক এগোনই ভাল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজলে নিউমোনিয়া হতে পারে হাঁটলে সে ভয় কম।

সে ব্যক্তি অগ্রসর হইল। একাকিনী দাঁড়াইয়া থাকা অপেক্ষা ইহার সঙ্গে যাওয়া শ্রেয় বিবেচনা করিয়া উষা তাহার অনুসরণ করিল।

ব্যক্তি [যাইতে যাইতে সহসা থামিয়া] মাফ্ করবেন— [ইতস্ততঃ] ওর নাম কি—

উষা।—আমার নাম উষারাণী দত্ত।

ব্যক্তি। না না সে কথা নয়। আপনি কি জংসনেই থাকেন?

উষা। না। দেওঘরে বম্পাস টাউনে। আপনি?

ব্যক্তি। আমিও।

উষা। [সাগ্রহে] বম্পাস টাউনে!

ব্যক্তি।—হুঁ।

উষা। আপনার নাম?

ব্যক্তি। আমার নাম [মাথা চুলকাইয়া] শ্রীভাগিনেয় বসু।

এই বলিয়া বড় বড় পা ফেলিয়া প্রস্থান। উষার অনুগমন। উভয়ে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

পাহাড়ের দিক হইতে সাহেব বেশধারী আর এক-জনের প্রবেশ। প্যান্টালুন কর্দমাক্ত, মাথার টাকের উপর হইতে বৃষ্টির জল চারিদিকে গড়াইয়া পড়িতেছে। ইনি উষার মামা পরিতোষ বাবু।

পরি। ঘোড়ার ডিম! ভারী পেছল। [পা পিছ্‌লাইল] উঃ ঘোড়ার ডিম—গিয়েছিলুম আর একটু হলে। উষা—উষা! [হতাশভাবে] ঘোড়ার ডিম! [দাঁড়াইয়া টাক হইতে জল মুছিলেন] কোথায় গেল মেয়েটা! কেন তাকে একলা ছেড়ে দিলুম! ঘোড়ার [উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন] ঐ যে কে 'মামা' 'মামা' করে ডাকছে! কিন্তু ওত উষার গলা নয়। ঘোড়ার ডিম—আরও মামা এখানে আছে নাকি!

দূর হইতে শব্দ হইল—'মামা'—'মামা' পরে। ঐ যে উষার গলা! উষা—উষা কিছু দেখবার যো নেই। ঘোড়ার ডি—বিদ্যুৎ চমকিল।

পরে। ঐ যে সামনে কিছু দূরে দুজন লোক দেখলুম না! একজন ওয়াটার প্রুফ পরা উষা বলেই বোধ হল। ঘোড়ার ডিম—বিদ্যুৎ আর একবার চম্‌কালে হত যে। একে পেছল তায় অন্ধকার ঘোড়ার ডিম—(নিষ্ক্রান্ত হইলেন।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

দেওঘর। বম্পাস টাউনে একটি সুদৃশ্য কুটির। নাম—প্রেম কুটির। তাহারে পাচিল ঘেরা বাগানের মধ্যে বাঁধানো চাতালের উপর টেবিল-চেয়ার প্রভৃতি সজ্জিত। সূর্য্য এই মাত্র অস্ত গিয়াছে—আকাশে বৃষ্টির কোনও লক্ষণ নাই। হাওয়া ঝরঝরে।

পরিতোষ বাবু একটি বেতের মোড়ায় বসিয়া একটি চুরোটের অতি ক্ষুদ্র শেষাংশ চুষিতেছিলেন। পরিধানে কোঁচানো ধুতি ও পিরান কিন্তু গলায় উলের গলাবন্ধ, পায়ে মোজা এবং চটিজুতা।

পরিতোষ বাবুর মোড়ার পিছনে দাঁড়াইয়া তাঁহার বালক ভৃত্য ফটিক নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে। সে কিছু হৃষ্টপুষ্ট—গালদুটি উচু হইয়া নাসিকার বিশেষ খর্ব্বতা সাধন করিয়াছে। কপাল নাই বলিলেই হয়। বর্ণ নিকষকৃষ্ণ।

অন্য কেদারায় বসিয়া একটি যুবক;—সান্ধ্য ভ্রমণের উপযুক্ত সাজ—চেহারা সুশ্রী ও গম্ভীর কিন্তু অধরোষ্ঠ ঈষৎ চপলতার পরিচায়ক। সে নিবিষ্ট মনে সংবাদ-পত্র পাঠ করিতেছিল।

বাড়ীর ভিতর হইতে বাদ্য সংযোগে সঙ্গীতের আওয়াজ আসিতেছিল। উষা গাহিতেছিল;—

'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ'—যে যুবকটি সংবাদ পত্র পাঠ করিতেছিল তাহার নাম শৈলেন। সে উষার দাদা।

পরিতোষ বাবু চুরোটের দগ্ধাবশেষ হইতে আর কিছুমাত্র ধূম বাহির করিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া সেটা ফেলিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে বলিলেন;—'আজ্‌কের খবর পড়লে?'

শৈলেন।—(কাগজখানা মুড়িয়া রাখিয়া) হ্যাঁ।

পরি।—জাপানের ব্যাপারখানা দেখেছ?

শৈলেন।—(একটু হাসিয়া) হুঁ্যা।

পরি।—এমন ফন্দিবাজ জাত আর পৃথিবীতে নেই—ঘোড়ার ডিম—ওরা ভয়ানক ধূর্ত্ত। এই যে জাহাজের পর জাহাজ তৈরী করছে সেকি মিছিমিছি? ঘোড়ার ডিম—মোটেই নয়। ভারতবর্ষ যদি না জাপানীরা আক্রমণ করে ত বোলো তখন। ওই যে সব জাপানী ফিরিওয়ালা বস্তা ঘাড়ে করে দেশময় ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা কি সাধারণ লোক মনে করেছ। ওরা সব ঘোড়ার ডিম—সিপাই—দেশের প্ল্যান করে বেড়াচ্ছে। সুবিধে পেলেই আক্রমণ করবে।

শৈলেন। তা যদি করে আমাদের বেশ সুবিধে আছে—ওদের বস্তাগুলো কেড়ে নিলেই হবে।

পরি।—তারা কি ঘোড়ার ডিম—বস্তা নিয়ে লড়াই করতে আসবে? সঙীন উঁচিয়ে—কামান দাগ্‌তে দাগ্‌তে এসে হাজির হবে।

'ওঃ' বলিয়া শৈলেন এমনভাবে স্তব্ধ হইয়া রহিল যেন এ সম্ভাবনা সে কল্পনাই করে নাই।

উষার প্রবেশ।

উষা।—কৈ, মিঃ বোস এখনো এলেন না?

পরি।—ফটিক! ফটিক! ঘোড়ার ডিম—ঘুমিয়ে পড়েছে। (উচ্চ কণ্ঠে) ফটিক!

জাগরণের চিহ্নস্বরূপ ফটিক প্রথমে বাম চক্ষু পরে দক্ষিণ চক্ষু সাবধানে উন্মীলন করিল এবং পরক্ষণেই কাঁদিয়া ফেলিল।

পরি। গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াগে যা। একটি বাবু আস্‌বেন, এইখানে নিয়ে আস্‌বি।

চক্ষু মুছিতে মুছিতে ফটিকের প্রস্থান। উষা অন্যমনস্কভাবে আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; একটা স্ফুটনোন্মুখ গোলাপের কুঁড়ি ছিঁড়িয়া একবার তাহার আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া চুলের মধ্যে গুঁজিয়া রাখিল। শৈলেন আড় চোখে তাহাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া খুব গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া বলিল;—'উষা, কালকের ঘটনাটা কবিতায় লিখে ফেল্—তারপর সেটা 'মন্দাকিনী'তে পাঠিয়ে দিলেই হবে। একে তোমার লেখা, তার ওপর নায়কের নামটি যে রকম চিত্তাকর্ষক—

উষা দাদাকে লক্ষ্য করিয়া ভ্রূকুটি করিল তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

পরি।—কেন শৈলেন তুমি ওকে ক্ষেপাও। ওর বাস্তবিক লেখবার ক্ষমতা আছে—তুমি ঘোড়ার ডিম—তুমি ওর 'অস্ফুট' পড়ে যতই হাসো না কেন, তার বুঝ্‌বে কি? তার মধ্যে বাস্তবিকই ভাল কবিতা আছে। এই ধরনা কেন 'প্রার্থনা', 'আশ্রয় বাঞ্ছা,—এগুলো ঘোড়ার ডিম উৎকৃষ্ট রচনা। ওইটুকু মেয়ের হাত থেকে অমন লেখা বেরোন কি যে-সে কথা! তুমি হাজার চেষ্টা করলেও অমন একটা পদ্য লিখতে পারবে না।

শৈলেন।—'মন্দাকিনী'তে তার যে রকম প্রশংসা বেরিয়েছিল তাতে সে রকম লেখবার উচ্চাশা আমার বড় একটা—

উষা আসিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। ছেলে বেলার প্রথম লেখা ছাপানোর লজ্জাকর অধ্যায়টা এমনিই উষাকে ত্রস্ত-সঙ্কুচিত করিয়া রাখিত,—তার উপর শৈলেন যখন সেই কথা লইয়া তাহাকে বিঁধিতেও ছাড়িত না তখন তাহার দাদার প্রতি রাগ ও নিজের বিগত নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য লজ্জার সীমা পরিসীমা থাকিত না। এক এক সময় শৈলেনের জ্বালায় সত্য সত্যই তাহার লোক-সমাজে মুখ দেখানো ভার হইয়া উঠিত।

উষার বয়স এখন উনিশ; তাই সে পনেরো বছর বয়সে লেখা নিজের কবিতায় মধ্যে অক্ষমতা ও ছেলে-মানুষী ভিন্ন আর কিছুই খুঁজিয়া পায় না, এবং লজ্জায় মরিয়া গিয়া ভাবে—কেন মরিতে এগুলাকে ছাপিতে গিয়াছিলাম!

ভাগিনেয় বোসের প্রবেশ ও সকলের পরস্পর অভিবাদন। পরিতোষ বাবু মোড়া ছাড়িয়া উঠিবার উদ্যোগ করিয়া আবার বসিয়া পড়িলেন। শৈলেন আগন্তুককে কিছুক্ষণ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া কি একটা বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। উষা পূর্ব্বদিনের সেই কাদা মাখা অদ্ভুত জীবটির পরিবর্ত্তে এই সুবেশ সুশ্রী অতিথিটিকে দেখিয়া সহসা সম্ভাষণ করিবার মত উপযুক্ত কথা খুঁজিয়া পাইল না এবং মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সকলে উপবিষ্ট হইলেন।

ভাগিনেয়।—আপনাদের গেটের কাছে একটি বালক দেখলাম যার প্রকৃতি কিছু অস্বাভাবিক বলে বোধ হল। আমাকে দেখেই সে কেঁদে ফেল্লে; তাই দেখে আমার মনে দয়া হল, আমি তার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। পরক্ষণেই দেখি সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরি।—ওটি আমার বেয়ারা ফটিক!

ভাগি।—ভারি আশ্চর্য্য! বাস্তব জগতে ফ্যাট্ বয়্ এবং যব্ ট্রটারের এমন অপূর্ব্ব সংমিশ্রন বোধহয় আর কোথাত নেই। ওকে যাদুঘরে পাঠিয়ে দিন:—(উষার দিকে ফিরিয়া) কাল আপনার সঙ্গে আমি সদ্ব্যবহার করিনি। সে জন্যে মাপ চাইছি। মনুষ্য সমাজে যে ব্যবহার একেবারে অমার্জ্জনীয় ডিঘরিয়া পাহাড়ের ধারে হয়ত ততদূর নাও হতে পারে এই মনে করে এই দুষ্প্রাপ্য জিনিষ চাইতে সাহস কর্চ্ছি।

উষা।—(সস্মিত মৃদুস্বরে) সাহসের বলে মানুষ অনেক জিনিষ লাভ করে—আপনিও করলেন।

ভাগি।—আমাকে বেশী সাহসী মনে করবেন না। প্রথমতঃ আমি বাঙালী, সুতরাং বিখ্যাত সাহিত্যিকদের মতে আমার ভীরু হওয়া একটা জাতীয় কর্ত্তব্য; দ্বিতীয়তঃ—

শৈলেন।—কিন্তু আপনার নামটি অসম সাহসিকতার পরিচয় দিছে।

ভাগি।—কি ভাবে?

শৈলেন।-নাম করণ সম্বন্ধে সামাজিক বিধি বাঁধন গুলোর বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করে।

ভাগি—(কিয়ৎ কাল ভাবিয়া) দেখুন—আমার নামটা একটা মহামুহূর্ত্তের প্রেরণার ফল। ওটির জন্য আমাকে ঈর্ষা করবেন না।

উষা।—আচ্ছা ভাগিনেয় বাবু, এ নামটি আপনার কে রেখেছিল?

ভাগি।—আমি স্বয়ং। ছেলেবেলা থেকেই মামাদের প্রতি আমার একটু পক্ষপাত আছে।

শৈলেন।—তাই নিঃসংশয়ে পৃথিবী সুদ্ধ লোকের ভাগ্নে হয়ে বসে আছেন। কিন্তু এতে কোন কোনও লোকের কিছু অসুবিধা হওয়া সম্ভব।

ভাগি।—কি করে?

শৈলেন।—(ইতস্ততঃ করিয়া) আপনার মহিলা বন্ধুরা সকলে এ সম্বন্ধ স্বীকার করতে রাজি না হতে পারেন।

ভাগি।—আমার জানিত একটি লোক আছেন—তাঁর নাম প্রাণেশ্বর! তাঁর বান্ধবীরা, তাঁকে প্রাণেশ্বর বলে ডাক্‌তে দ্বিধা করেন না।

সকলে স্তব্ধ। পরিতোষ বাবু অভিভূত, শৈলেন পরাজিত, উষা লজ্জাহত।

সন্ধ্যা হইয়াছিল। পরিতোষ বাবু দু' একবার কাশি চাপিবার চেষ্টা করিয়া শেষে বলিলেন;—'ঘোড়ার ডিম—কাল জলে ভিজে ঠাণ্ডা লেগে গেছে। আর বাইরে থাকা ঠিক নয়। উষা, তোমারও ত—

উষা। না মামা, আমার কিছু হয়নি। তুমি বরং ভেতরে যাও আমরা আর একটু পরে—

পরি। আচ্ছা। ভাগিনেয় বাবুকে ছেড়ে দিও না। আমি তোমাদের জন্যে ড্রইং রুমে অপেক্ষা করব। উষা, একবারটি শুনে যাও।

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত

শৈলেন। [উত্তেজিত ভাবে] বিজন তুমি—?

ভাগি। চুপ—ব্যস্। আমি ভাগিনেয়। সব মাটি করে দিও না। পরিতোষ বাবু তোমার—?

শৈলেন।—মামা।

ভাগি।—মেয়েটি?

শৈলেন।—বোন।

ভাগি।—[উৎকণ্ঠিত] 'অস্ফুট'র—?

শৈলেন:—লেখিকা!

ভাগি। [মাথায় হাত দিয়া] উঃ—চুপ!

উষার প্রবেশ

উষা।—মামা বল্লেন আজ আমাদের সঙ্গে ডিনার খেয়ে তবে বাড়ী যেতে পাবেন। কিন্তু ডিনারের এখনো ঢের দেরী আছে। ততক্ষণ না হয় এখানে বসে—

শৈলেন। কাব্য আলোচনা করা যাক। কি বলেন ভাগিনেয় বাবু? আপনি বোধ হয় জানেন না, আমার ভগিনী খুব একজন উচুদরের—

উষা। আঃ দাদা—চুপ কর।

শৈলেন।—কবি। বাঙলা ভাষার সঙ্গে যদি আপনার পরিচয় থাকে, এমন কি মুখ দেখা-দেখিও থাকে তাহলে নিশ্চয় আপনি 'অস্ফুট' নামক অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থের নাম শুনেছেন। তার মধ্যে 'প্রার্থনা' 'আশ্রয় যাচ্ঞা' প্রভৃতি যে সব উচ্চ অঙ্গের কবিতা আছে তা পড়লে চোখের জল সজোরে বেরিয়ে পড়ে। অন্ততঃ আমার পড়ে। আপনি বল্‌বেন ভগিনীর কাব্য সম্বন্ধে ভ্রাতার মনে একটু দুর্ব্বলতা থাকা সম্ভব। প্রত্যুত্তরে আমিও বল্‌তে পারি যে ফটিক উষার ভাই নয় তথাপি সেও কেঁদে ফেলেছিল।

উষা।—দাদা—তুমি—

শৈলেন। আমি কিছুমাত্র অত্যুক্তি করছি না। দরকার হয় আমি এখনি ফটিকের ঘুম ভাঙিয়ে তার সামনে তোমার একটা কবিতা আবৃত্তি করে একথা প্রমাণ করে দিতে পারি। তাছাড়া 'মন্দাকিনী'র সম্পাদক বিজন বোস এই কাব্যখানির যে মর্ম্মস্পর্শী সমালোচনা করেছিলেন—

উষা। তবে যাও— [প্রস্থানোদ্যতা]

ভাগি। ওর নাম কি—যাবেন না। দশানন সীতা-হরণ করেছিল সেই অপরাধে সাগরের বন্ধন হল। আপনার দাদার ধৃষ্টতার জন্যে আপনি আমাকে শাস্তি দিয়ে চলে যাচ্ছেন কেন ?

উষা।—[ফিরিয়া আসিয়া চেয়ারে বসিয়া] বেশ যত ইচ্ছে বল। আমি ওসব গ্রাহ্য করি না।

ভাগি। এই ত চাই! সমালোচনা গায়ে মাখ্‌তে নেই; সমালোচককে জব্দ করবার ঐ একমাত্র উপায়।—আমার যখন বয়স অত্যন্ত কম তখন একবার নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে একটা আস্ত ডিম খোলাসুদ্ধ কচ্‌মচিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছিলাম। তার পর থেকে আমার সামনে ডিমের নাম উচ্চারণ করলেই আমার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করত এবং নিজের মাথাটা দেয়ালে ঠুকতে ইচ্ছে করত। কিন্তু এখন দেখুন, আমার চোখের সামনে লক্ষ লক্ষ মুর্গী এবং হাঁস অনবরত ডিম পাড়তে থাক্‌লেও আমি অবিচলিত হয়ে তা দেখতে পারি। আমার মনে কোনও বিকার উপস্থিত হয় না।

শৈলেন।—আচ্ছা উষা, বিজন বোসের সঙ্গে যদি তোমার দেখা হয় তাহলে তুমি কি কর ?

উষা কুঞ্চিত ভ্রূ, নীরব।

ভাগি।—একথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে সে ব্যক্তি যত বড় দুর্ব্বৃত্তই হোক না কেন উনি তাকে ক্ষমা করবেন।

উষা। কখ্‌খনো না—কখ্‌খনো না। আমি আপনাকে বলছি ভাগিনেয় বাবু। দাদা যদি রাতদিন এই কথা নিয়ে আমাকে জ্বালাতন না করতেন তাহলে হয়ত আমি এই বিজন বাবুকে ক্ষমা করতে পারতুম। কিন্তু—শুনেছি বিজন বাবু দাদার বন্ধু—এঁরা দুজনে মিলে আমাকে পাগল করে দেবেন।

উষা রোদনোন্মুখী।

ভাগি। [উষার পাশে চেয়ার টানিয়া লইয়া] আপনার দাদা যখন সেই নরাধমের বন্ধু তখন আপনার দাদার সম্বন্ধেও আমার ধারণা বদলে গেল। বুঝ্‌লাম, উনিও একজন পাষণ্ড। কিন্তু পাপী এবং পাষণ্ডদের ক্ষমা করাই হচ্ছে ধর্ম্ম। ভেবে দেখুন, ইংরেজদের যীশুখৃষ্ট পর্য্যন্ত ঐ কথা বলে গেছেন।

উষা। যীশুর উপদেশ ইংরেজরা যেমন মানে আমিও তেমনি মানব।

ভাগি। সেটা কি ভাল দেখাবে? আপনি একজন খাঁটি আর্য্যনারী, নিমাই নিতাই শুক সনকের দেশে আপনার জন্ম। আপনিও যদি কতকগুলো অস্পৃশ্য কদাকার ইংরেজের দেখাদেখি যীশুকে অবহেলা করেন—তাহলে প্রভু নিত্যানন্দ কি মনে করবেন এবং আমাদের এই সনাতন উদার হিন্দুধর্ম্মেরই বা কি গতি হবে ?

উষা।—হয়ত সদ্গতি হবে না; কিন্তু সেজন্য আমি চিন্তিত নই। আমি চিন্তিত হচ্চি, আপনি এদের জন্য এত ওকালতি কর্চ্ছেন কেন ?

ভাগি। নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করার যে মহৎ আনন্দ আমি তাই উপভোগ করছি। যে হতভাগ্য নরপিশাচ আপনার কবিতার নিন্দা করে তার লেখনীর মুখ কালিমালিপ্ত করেছে তার ইহকাল এবং পরকালের অসীম দুর্গতির কথা ভেবে আমি আপনাকে সদয় হতে অনুরোধ করছি।

উষা ভাগিনেয় বাবু, আপনার অনুরোধ এক্ষেত্রে নিষ্ফল! এতখানি বাগ্মিতা অনর্থক অপব্যয় করলেন।

ভাগি।—আচ্ছা সে ব্যক্তি অর্থাৎ সেই বিজনবাবু যদি স্বয়ং এসে আপনার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করে—তাহলে কি—?

উষা। তাহলেও না। বিজন বাবুকে আমি কথনো দেখিনি আর দেখ্‌তেও চাইনে।—আসুন ভেতরে যাই। ফটিক বোধ হয় আমাদের ডাকতে আসছিল, রাস্তার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েছে।

উষা নিক্রান্ত। ভাগিনেয় কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

শৈলেন। কি ভাব্‌ছ?

ভাগি। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া] ভাব্‌ছি যীশুর কথা—Repent For the kingdom of Heaven is at hand.

উভয়ে নিক্রান্ত।

তৃতীয় দৃশ্য

পরিতোষ বাবু ও শৈলেন ড্রয়িং রুমে আসীন। দুজনের হাতে চায়ের বাটি। কাল প্রভাত। উষা একটু বেলা পর্য্যন্ত ঘুমায় তাই এখনো যোগ দিতে পারে নাই।

পরি। সেদিন ঘোড়ার ডিম তোমার ভাব দেখে ত এমন কিছু বোধ হলনা যে তুমি ওকে আগে থাকৃতেই চেন!—তা কথাবার্ত্তা যদিও একটু অদ্ভুত রকমের তবু ছোকরাটি মন্দ বলে বোধ হল না।' বড় ঘরের ছেলে পয়সা আছে বলছ। বদ্‌খেয়ালের মধ্যে বাঙলা কাগজ চালায়। তা সে ঘোড়ার ডিম বড়মানুষের ছেলেদের একটা বাতিক না থাকলে সময় কাটবে কি করে? আমি কিছুদিন থেকে 'জাপানী গুপ্তচর' ব'লে একটা প্রবন্ধ লিখবো ভাব্‌ছিলুম তা সেটা না হয় ওর কাগজেই লিখব। কি নাম বল্লে কাগজখানার?

শৈলেন। উষার কাছে এখন ফাঁস করে দিওনা 'মন্দাকিনী'।

পরি।—তা দেবনা। কিন্তু তোমরা দুই বন্ধুতে মিলে ঘোড়ারডিম—মেয়েটার বিরুদ্ধে কোন রকম ষড়যন্ত্র আঁটছো না ত?

শৈলেন। তুমি কি পাগল হয়েছ মামা! আসল কথা, বিজন ভয় কচ্চে যে, উষা যদি আগে জানতে পারে যে ওই বিজন বোস তাহলে হয়ত—যাক, তোমার অমত নেইত?

পরি। ছোকরা দেখ্‌তে শুন্‌তে ত মন্দ নয়—তা উষার যদি ওকে পছন্দ হয় তাহলে—

শৈলেন। থামো—উষা আসছে।

দুজনে চায়ের বাটিতে মনোনিবেশ করিলেন।

উষার প্রবেশ।

উষা। বড্ড দেরী হয়ে গেছে-না? কি যে আমার ঘুম সাতটার আগে কিছুতেই ভাঙে না। ফটিক কৈ?

শৈলেন। তাকে পাঠিয়েছি ভাগিনেয় বাবুকে ডেকে আনতে। ওর পাগ্‌লাটে ধরণের কথাবার্ত্তা আমার বেশ লগে।

উষা।—(ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া) পাগ্‌লাটে ধরণের।

শৈলেন।—তা নয় ত কি। আমার বোধহয় লোকটির মাথায় একটু ছিট্ আছে।

উষা (মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া) ভারি ত জানো তুমি! তোমা:—তোমার বন্ধু ঐ অজিত গুহ'র চেয়ে ঢের ভাল।

শৈলেন।— (চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া) অজিতের চেয়ে ভাল! কিসে শুনি? রূপে না গুণে না বিদ্যেয়?

উষা।—সব তাতেই। তোমার বন্ধুদের মধ্যে এমন একটাও নেই—

বলিতে বলিতে হঠাৎ মহালজ্জায় থামিয়া গেল।

পরি।—কি বলে ভাল, যদি তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তুলনায় সমালোচনাই করতে হয় শৈলেন, তাহলে ঘোড়ার ডিম একথা না মেনে উপায় নেই যে ঐ অজিত গুহটা আস্ত জিরাফ্, অশোক সাণ্ডেলটা নিরেট গুণ্ডা, হসিত সামন্তটার যেমন ভাল্লুকের মত চেহারা তেমনি উল্লুকের মত বুদ্ধি—আর ঐ কিংশুক গুপ্তটা—ওটাকে দেখ্‌লে আমার গা জ্বলে যায়।

উষা।—(সোৎসাহে) আমারও—

শৈলেন।—আসল কথা, তোমরা আমার বন্ধুদের দেখতে পারো না।

উষা।—আর মামা—সেই মীনধ্বজ হালদার—!

পরি।—সেটাকে ঘোড়ার ডিম শিম্পাঞ্জি বল্লে শিম্পাঞ্জির মানহানি করা হয়।

উষা।—আর জানো মামা, এঁরা সব কেউ এক বর্ণ বাঙলা লিখ্‌তে জানেন না।

পরি।—সব ঘোড়ার ডিম জানোয়ারা গোয়ার বাচ্চা কিনা।

শৈলেন।—ওরা সব ইংরাজী শিক্ষা পেয়েছে—তাই—

পরি।—আমরাও ত ইংরিজী শিক্ষাটা-আসটা পেয়েছি রে বাপু, উষাও ত ঘোড়ার ডিম জুতোটা মোজাটা পরে, চা বিস্কুটও খায় আর ইংরিজীতে তোমার ঐ সবকটা বন্ধুর ঘোড়ার ডিম কান কেটে নিতে পারে কিন্তু কৈ অমন ট্যাঁস্ ফিরিঙ্গি ত হয়ে যায়নি। তুমিও ত ঘোড়ার ডিম টেব্‌লে বসে খানা ডিনার খেয়ে থাকো কিন্তু তাই বলে কি বাঙ্‌লা কথা ভুলে গেছ?

উষা দাদার বন্ধুদের এই লাঞ্ছনা খুব উপভোগ করিতেছিল। দাদার উপর প্রতিশোধ তুলিবার এত বড় সুযোগ সে বড় পায়না তাই তার এত আমোদ।

সে গম্ভীর মুখে বলিল,—'এক কথায় দাদার বন্ধুগুলো সব একদম রদ্দি।'

শৈলেন।—সব বন্ধু—একটাও বাদ নয়?

উষা। একটাও বাদ নয়।

শৈলেন। [দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া] আচ্ছা বেশ, এর বিচার পরে হবে।

ভাগিনেয় বোসের প্রবেশ।

ভাগি। মাফ্ করবেন, আপনারা বোধ হয় আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

শৈলেন।—বোধ হয় কি রকম—নিশ্চয় ডেকে পাঠিয়েছিলুন।

ভাগি। ঠিক ধরেছি তাহলে। চা খাবার আগে একটু বেড়িয়ে আস্‌ব বলে বেরুচ্ছি দেখি আপনার ফটিক আমার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ঘুমচ্ছে। আন্দাজে ব্যাপারটা বুঝে নিলুম। পাশ কাটিয়ে সটান এখানে চলে এসেছি। তার কাঁচা ঘুম ভেঙ্গে দেবার আর প্রবৃত্তি হল না। সে বোধ হয় নিদ্রিত অবস্থায় এখনো আমার সিংহদ্বারে পাহারা দিচ্ছে।

পরি। বোসো বোসো ভাগিনেয়—উষা চা দাও।

ভাগিনেয় উপবিষ্ট হইল।

শৈলেন। (সহসা) আপনি বাঙলা জানেন?

ভাগি। (অবাক হইয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া) ওর নাম কি, এতক্ষণ কি আমি না-জেনে চীনে ভাষায় কথা কইলাম।

উষা।—দাদার যত সব অদ্ভুত কথা।

শৈলেন।—অর্থাৎ আমি জানতে চাই, আপনি বাঙলায় পদ্য লিখ্‌তে পারেন কিনা?

ভাগি।—একবার এক বন্ধুর বিয়েতে লিখেছিলাম কিন্তু ছাপা হয়নি।

উষা।—[সাগ্রহে] কি পদ্য বলুন না।

ভাগি।—তার প্রথম দু'ছত্র কেবল মনে আছে—

'গজুর অদ্য বিবাহ
পদ্ম বনে ঢুকিবে একটি বরাহ—"
পদ্য শুনিয়া উষা মুখ ফিরিয়া গেল।

শৈলেন।—[খুসী হইয়া] খাসা পদ্য ত। আপনিও দেখছি তাহলে একজন কবি। অবশ্য ঠিক উষার সঙ্গে এক শ্রেণীর না হলেও—

উষা।—দাদা—ফের—

শৈলেন।—না না তোমার সঙ্গে যে ভাগিনেয় বাবুর তুলনাই হয় না সে আমি জানি—

উষা। দাদার কথা শুনবেন না, খালি আপনাকে জ্বালাতন করবার চেষ্টা। আপনি নিশ্চয় ভাল কবিতা লিখ্‌তে পারেন। দাদার বন্ধুরা কেউ এক অক্ষর বাঙলা লিখতে জানে না। আচ্ছা, আপনার লেখা একটা ভাল পদ্য বলুন না।

ভাগি।—দেখুন, আমি যে ভাল পদ্য লিখ্‌তে পারি এটা আজ আপনার মুখ থেকে শুন্‌লাম বলেই সত্যি বলে বিশ্বাস হচ্ছে। এবং আপনার দাদার বন্ধুরা যা পারে না আমি তাই পারি এ কথা প্রমাণ করবার জন্য যদি আমাকে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করতে হয় তাতেও আমি প্রস্তুত আছি—পদ্য বলা ত দূরের কথা।

উষা। [সোল্লাসে] আচ্ছা বেশ। তাহলে একটা বেশ ভাল—এই—ভালবাসার পদ্য বলুন।

শৈলেন। ভাগিনেয় বাবু, কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনি যদি আর কোনও কবির কাব্য নিজের বলে এখানে চালিয়ে দেন, তাহলে তস্কর বলে আপনাকে সনাক্ত করবার ক্ষমতা আমাদের কারুর নেই ঐ উষা ছাড়া। অতএব আপনাকে একটি কাজ করতে হবে।

ভাগি। কি বলুন। সকল রকম পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে আজ আমি বদ্ধ পরিকর।

শৈলেন। আপনাকে একটি ইংরিজী কবিতা তর্জ্জমা করতে হবে।

ভাগি। বেশ কথা। কবিতা বলুন।

শৈলেন। উষা, বিষয় নির্ব্বাচনের ভার তোমার ওপর। তুমি একটা কবিতা বল।

উষা। [কিছুক্ষণ ভাবিয়া তারপর লজ্জিত নতমুখে]

When we two parted
In silence and tears
Half broken-hearted
To sever for years—তারপর আর—তারপর আর মনে পড়ছে না -

শৈলেন।

Pale grew thy cheek and cold
Colder thy kiss;
Truly that hour foretold
Sorrow to this !

ভাগি। কঠিন পরীক্ষা। আচ্ছা কাগজ কলম দিন।

পরি।—ঘোড়ার ডিম! এইখানে বসে বসেই পদ্য লিখবে নাকি?

ভাগি। আজ্ঞে হঁ্যা। ফটিক যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমতে পারে তখন আমি বসে বসে পদ্য লিখ্‌ব এ আর বিচিত্র কি?

উষা কাগজ পেনসিল আনিয়া দিল ও উৎসুক হইয়া লিখনরত ভাগিনেয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল।.........

ভাগি। হয়েছে। ঠিক যে বায়রণের যোগ্য হয়েছে তা বলতে পারিনা—তবু, আচ্ছা শুনুন,—

'যখন মোরা দোঁহে বিদায় নিয়েছিনু
নীরব নীর-নত চোখে,
আধেক ভাঙা বুকে সুখের স্মৃতি ল'য়ে
সাঁঝের ম্লান দিবালোকে;
কপোল হ'ল তব পাংশু হিমবৎ
অধর হ'ল হিমতর—
তখনি জানিলাম সুখের বিভাবরী
পোহাবে ব্যথা-জরজর!'

উষা। [মুগ্ধভাবে ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া] চমৎকার হয়েছে। এমন কি ছন্দটি পর্য্যন্ত!

শৈলেন। ও কিছুই হলনা,

Truly that hour foretold
Sorrow to this—ওর কি এই তর্জ্জমা!

উষা। আপনি দাদার কথা শুনবেন না, সত্যিই ভারী সুন্দর হয়েছে!

ভাগি। [পরিতোষ বাবুর দিকে ফিরিয়া] আপনি কি বলেন?

পরি। ও ইংরিজী বাঙলা কোনোটারই ঘোড়ার ডিম কিছু মানে হয় না।

ভাগি। যাক, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সমালোচনা দুই ভাগে বিভক্ত, একজন বল্‌ছেন চমৎকার হয়েছে আর একজন বলছেন কিছুই হয়নি। এ ক্ষেত্রে যিনি কবি আমি তাঁর মন্তব্যটিই গ্রহণ করলাম। কারণ শাস্ত্রে বলেছে 'কবিতারস মাধুর্য্যং কবি র্বেত্তি'

শৈলেন। উষার মন্তব্য কিন্তু অন্য রকম হত যদি আপনি না লিখে আমার কোনও বন্ধু ঐ কবিতাটি লিখ্‌তেন।

উষা। [আরক্তিম হইয়া] তার মানে?

ভাগি। মানে অতি সহজ—কবিকে না জান্‌লে তাঁর কাব্য বোঝ্‌বার সুবিধা হয় না। আপনি আমাকে জানেন বলেই এত সহজে আমার কবিতাটি উপভোগ করতে পারলেন। ধরুন, আপনাকে জান্‌বার আগে যদি আমি আপনার 'অস্ফুট' নামক ঐ অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থটি পড়তাম হয়ত ভাল না বুঝতে পেরে, সম্যক রসগ্রহণ না করে আমি ওটির নিন্দা করতাম। কিন্তু সে সমালোচনা কি যথার্থ হত? কখনই না!

শৈলেন। আপনার যুক্তির মধ্যে একটুখানি গলদ রয়ে গেল। তা থাক, আমাকে এবার একবার উঠতে হবে, গোটা কয়েক চিঠি লেখা দরকার। মামা তুমিও উঠ্‌ছ নাকি?

পরি। ঘোড়ার ডিম হঁ্যা। কোমরটাতে মালিশ করাতে হবে সেই ব্যথাটা এখনো গেল না। দেখি ফটিক এলো কি না।

প্রস্থান করিলেন।

শৈলেন। উষা, ভাগিনেয় বাবু তাহলে তোমার জিম্মায় রইলেন। তুই কবিতে যত ইচ্ছা কাব্য-চর্চ্চা হোক কিন্তু আমার বন্ধু বাঙ্‌লা লিখতে পারে না. একথাটা ভবিষ্যতে আর বোলো না।

নিষ্ক্রান্ত।

উষা ও ভাগিনেয় কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল। উষার বুকের ভিতরটা দুরুদুরু করিতে লাগিল। এই লোকটির সহিত একলা থাকিলেই উষার ঐ রকম হয়।

ভাগি। কাল পরশুর মত চলুন আজ বিকেলেও কোনও দিকে বেড়িয়ে আসা যাক।

উষা। [নিম্নস্বরে] আজ কোনদিকে যাবেন ?

ভাগি। যেদিকে হয়। সোজা একটা রাস্তা ধ'রে সহর বাজার পার হয়ে এমন কোথাও গিয়ে পৌছনো যাক যেখানে মানুষ নেই, গরু-ভেড়া নেই শুধু আমি আর-শুধু দুজন পথিক—

উষা। - আর বাঘ যদি থাকে ?

ভাগি।—থাকুক বাঘ। বাঘ না থাকলে পথিক দুজনের আনন্দ যাত্রার পথে বৈচিত্র্য আসবে কোথা থেকে ? বাঘ থাকাই চাই।

উষা।—সেদিন ডিঘড়িয়া পাহাড়ে বাঘের নামে কিন্তু বৈচিত্র্যের বদলে আতঙ্কই এসেছিল।

ভাগি।—(কিছুক্ষণ সুখ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া) ওঃ—ডিঘড়িয়া পাহাড়! চলুন আজ সেইখানেই যাওয়া যাক।—আচ্ছা উষা—(বলিয়াই সহসা থামিয়া গিয়া) রাগ করলে নাকি ? (উষা ঘাড় নাড়িল) আমি তোমার চেয়ে বয়সে অন্ততঃ সাত আট বছরের বড়, তার ওপর তোমার দাদার—ইয়ে—সমবয়সী। আর আমাদের আলাপও হল প্রায়—ক'দিন হ'ল উষা ?

উষা।—(মৃদুস্বরে) আজ নিয়ে ন'দিন।

ভাগি।—ন' দিন! দুদিন নয়, চারদিন নয়, এক হপ্তা নয়—পুরো ন'দিন! সুতরাং তোমাকে আমি উষা বলেই ডাকবো এবং আর 'আপনি' বলতে পারব না। —হ্যাঁ কি কথা হচ্ছিল ?

উষা।—ডিঘরিয়া পাহাড়।

ভাগি।—হ্যাঁ ডিঘরিয়া পাহাড়। চল আজ সেইখানেই যাওয়া যাক।

উষা।—এত যায়গা থাকতে আজ সেখানে কেন ?

ভাগি।—সেখানে—আমার টুপীটা হারিয়ে গেছে খুঁজে দেখতে হবে।

উষা।—(হাসিয়া) আপনার টুপী আর খুঁজে পাবেন না।

ভাগি।—পাবনা ? বেশ, কিন্তু আর কিছু যদি হারিয়ে থাকে সেটা ত খোঁজা দরকার।

উষা।—(আরক্তিম নতমুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) না, আমি ওখানে যাব না। আমার বড্ড ভয় করবে। কি জানি যদি ফের কোনও রকম দুর্ঘটনা হয় ?

ভাগি।—(অনেকক্ষণ উষার মুখের পানে তাকাইয়া থাকিয়া) সম্প্রতি তোমার ভাগ্যে একটা গুরুতর দুর্ঘটনা ছাড়া আর কোনও আশু বিপদ ত আমি দেখ্‌ছি না।

উষা। (সকৌতুকে) আপনি হাত গুণতেও জানেন নাকি ?

ভাগি।—জানি বৈকি।

উষা।—(করতল প্রসারিত করিয়া) কৈ শুনুন দেখি আমার হাত। কি দুর্ঘটনা হবে শুনি।

ভাগি।—(উষার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর ভাবে) শীগ্‌গির তোমার বিয়ে হবে—

উষা।—(হাত টানিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া) যান্‌!

ভাগি।—তোমার দাদার এক বন্ধুর সঙ্গে—

উষা।—(রাগ করিয়া) ছেড়ে দিন—আমার হাত দেখ্‌তে হবে না।

ভাগি।—বেশ ছেড়ে দিচ্ছি—(উষার করতলে একটি চুম্বন করিয়া হাত ছাড়িয়া দিল)

উষা।—(ক্রন্দনোন্মুখী হইয়া) আর আমি আপনার সঙ্গে কখ্‌খনো—

ভাগি।—কখ্‌খনো ছেলে মানুষী কোরো না। যেটা নিলাম ওটা গণৎকারের দক্ষিণা।—উষা, একটা ভারী গোপনীয় কথা তোমায় বলব ?

উষা।—আমি শুনতে চাই না—

ভাগি।—তুমি না চাইলেও আমি বলবই।—উষা, আমাকে বিয়ে করবে ?

উষা। যাও!

উষা দুহাতে মুখ ঢাকিল।

ভাগি।—উষা—

উষা।—যাও।

ভাগি।—(উঠিয়া দাঁড়াইয়া) বারবার যাও বল্‌ছ? বেশ, চললাম। (দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া) একটা গুরুতর অপরাধ স্বীকার করবার ছিল—তা আর হল না।

উষা। কি অপরাধ শুনি!

ভাগি।—(ফিরিয়া আসিয়া) আগে বল আমায় বিয়ে করবে?

উষা।—না।

ভাগি।—করবে না?

উষা।—না।

ভাগি।—দুবার না বল্লে। বারবার তিন বার বল্লেই বুঝব মনের কথা বল্‌ছ। বিয়ে করবে না?

উষা নীরব। ভাগিনেয় দুহাত ধরিয়া উষাকে জোর করিয়া তুলিল।

ভাগি।—উষা—

উষা।—আগে শুনি কি অপরাধ।

ভাগি।—আগে বল রাগ করবে না।

উষা।—আগে শুনি।

ভাগি।—আচ্ছা বলছি। রাগ করলে এখন ত আর কথা ফিরিয়ে নিতে পারবে না—বিয়ে করতেই হবে। উষা আমার নাম ভাগিনেয় নয়, আমার নাম—বিজন বোস।

উষা।—(বিস্ফারিত নেত্রে) তুমি—আপনি—তুমি আপনি—

ভাগি।—তুমি—তুমি। 'আপনি' নয়।

উষা।—তুমি—দাদার বন্ধু—

বিজন।—হ্যাঁ। বলেছিলাম কিনা গণনা করে যে তোমার দাদার বন্ধুর সঙ্গে শীগ্‌গির তোমার বিয়ে হবে?

উষা। তুমি 'মন্দাকিনী'র—

বিজন।—হতভাগ্য সম্পাদক!

উষা।—যাও, তোমার সঙ্গে আমি আর একটা কথাও কইব না।

বিজন।—কথা কইবে না? তুমি জানো এই ক'দিনে আমি 'অস্ফুট' থেকে সমস্ত কবিতা আগা গোড়া মুখস্থ করে ফেলেছি! সত্যি বলছি উষা, তোমাকে যতদিন না চিনতাম ততদিন তোমার কাব্যের সৌরভ আমার প্রাণে গিয়ে পৌঁছায়নি। এখন বুঝ্‌তে পেরেছি, আধ-ফুটন্ত অপরিণত প্রাণের কি তরল-মধুর সীধু ঐ বইখানির মধ্যে ভরা আছে। শুনবে? আচ্ছা—'আশ্রয় যাজ্ঞা' কবিতাটি আবৃত্তি করছি—

উষা। (বিজনের মুখ চাপিয়া ব্যাকুল ভাবে) না—না তুমি থামো—

সহসা শৈলেনের প্রবেশ। উষা লজ্জায় জড়সড়।

শৈলেন।—একি! কবি আর সমালোচকে দিব্যি ভাব হয়ে গেছে দেখছি যে!

বিজন।—কবি এবং সমালোচকে যেখানে মিলন হয় সে স্থান মহাপুণ্য তীর্থে পরিণত হয়—মানো কি না?

শৈলেন।—নিশ্চয় মানি।

বিজন।—ব্যস। আজ থেকে দেওঘরও এক মহাতীর্থ হল।

উষা।—দাদা, কি দুষ্ট তুমি! আগে যদি জানতে পারতুম—তাহলে কিন্তু—

শৈলেন।—(উষার গালে আঙুলের টোকা মারিয়া) আগে জানলে সমস্ত ভেস্তে যেত—না? উষা, আমার সব বন্ধুরাই একদম রদ্দি—কি বলিস?

উষা (বিনত ভুবনবিজয়ী নয়না) একদম রদ্দি!

শৈলেন।—আমাকে একবার পোষ্ট-অফিস যেতে হবে। বিজন, আস্‌ছ নাকি?

বিজন।—তুমি এগোও। সামান্য একটু কাজ সেরে আমি এই এলাম বলে। শৈলেন প্রস্থান করিল।

বিজন।—(উষার খুব কাছে গিয়া) সামান্য কাজটুকু সেরে নিতে পারি?

উষা।—(বুকে মুখ গুঁজিয়া) না—

বিজন দুই আঙুল দিয়া উষার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া গভীর স্নেহদৃষ্টিতে ক্ষণকাল সেইদিকে তাকাইয়া রহিল।

বিজন। —পারি?

উষা চোখ খুলিল না, অনুমতিও দিল না। সহসা পরিতোষ বাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া আবার দ্রুতবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। অস্ফুটস্বরে কহিলেন; ঘোড়ার ডিম!

মোগলের প্রাসাদে ও শ্মশানে

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

ভ্রমণ স্মৃতি

(২)

আগ্রায়ও প্রথমে সমাধি। সেকেন্দ্রার বিরাট প্রান্তরে আকবর নিজের সমাধি নিজে নির্ম্মাণ করান। মোগল বাদশারা অনেকেই নিজের সমাধির সব যোগাড় নিজেরাই করিয়াছেন। আকবর যাহা করিয়া গিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর তার উপরে এই সমাধির বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন। প্রকাণ্ড প্রান্তর দেয়াল দিয়া ঘেরা, চারিদিকে চারটা ফটক—একটি সত্য তিনটি মিথ্যা—প্রায় মাঝখানে বিরাট সমাধি সৌধ। প্রধান ফটকটির গায় কত আরবি, পার্শি বয়ানে আকবরের কীর্ত্তিগাথা লেখা রহিয়াছে—সে লেখার আর্টও দেখিবার জিনিষ। ফটক হইতে সমাধি মন্দির প্রত্যেকটি ভাস্কর্য্যের চরম নিদর্শন। প্রাঙ্গণে নির্ভয়ে হরিণগুলি চড়িয়া বেড়াইতেছে। আকবর বাদশাহের সমাধি—বিরাট মন্দিরের সম্মুখেই বিরাট অন্ধকারে রহিয়াছে—আলো নিয়া দেখিতে হয়—সামনের প্রবেশ কক্ষের প্রস্তর সন্নিবেশ—ও রংএর খেলা অপূর্ব্ব অতুলনীয়। রাজা পঞ্চম জর্জ্জের আগমন সময়ে লর্ড কার্জ্জন এই কক্ষের হাতখানেক স্থান সংস্কার করিতে গিয়া অসম্ভব খরচা দেখিয়া পিছাইয়া পড়েন। লর্ড কার্জ্জন পুরাতন কীর্ত্তি রক্ষা আইনে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি তাড়াতাড়ি লোপ করিতে না দিয়া ভারতের অতীত স্মৃতি রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে কিন্তু ভারতীয়দের তরফ হইতে সে ব্যবস্থাকে উন্নত করিবার বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। ভারতের এই সব অতীত কীর্ত্তি রাখা যে কত প্রয়োজন তাহা ভারতীয়দের বোঝা কর্ত্তব্য। অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি কার্জ্জনের আইনে রক্ষিত হইতেছে বটে, কিন্তু অর্থাভাবে অধিকাংশই অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত—উপযুক্ত সংস্কারাভাবে ধ্বংসের মুখে যাইতেছে। ব্যবস্থাপক সভাগুলি দিল্লী সিমলা ঘুরিয়া মাথা ঠাণ্ডা রাখিবার সঙ্গে সঙ্গে এই সব প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির দিকে একটু তাকাইবার অবসর পান না কি? এসব কথা সভ্যদের প্রাণে একটুও জাগে না কি?



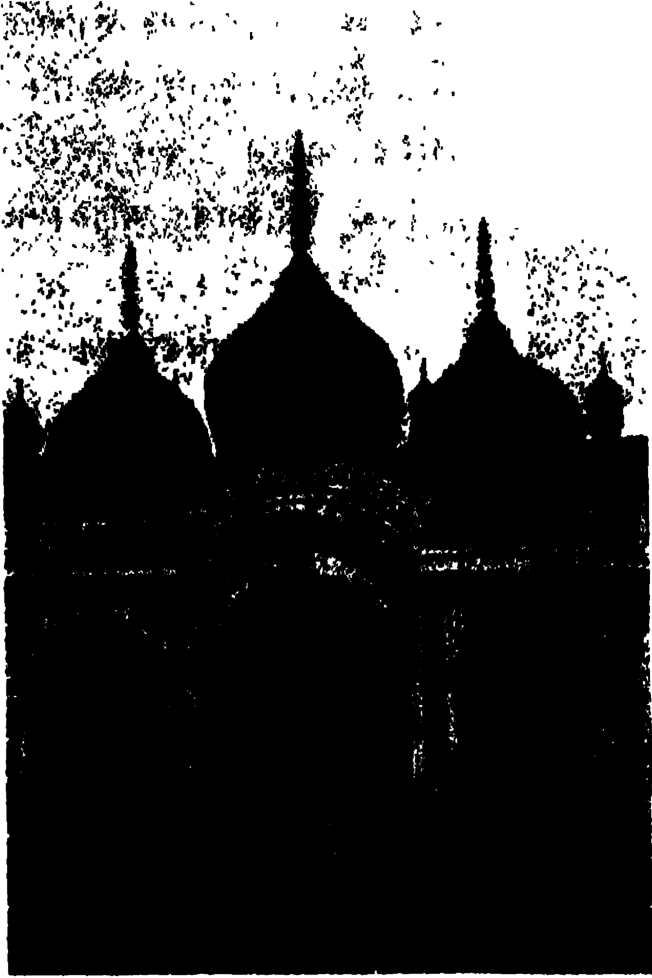
জাহাঙ্গীর মহল

আগ্রার প্রাসাদেও পরিখা, তোরণ ইত্যাদি পার হইয়া যোধবাইয়ের মহলে পড়িতে হয়—আকবরের হিন্দু রাণী—জাহাঙ্গীর বাদশাহের মায়ের ঘরে ও মহলে অসংখ্য দেবদেবী ছিল; সম্রাট ঔরংজেব তাহা ধ্বংস করেন। এ মহলের সৌন্দর্য্য ঔরংজেব নষ্ট করিয়াছিলেন। রাণী যোধবাইয়ের শয়নকক্ষ, বসিবার কক্ষ, ছেলেদের নিয়া খেলিবার চত্বর সব রহিয়াছে, এখানেও প্রাসাদের নীচ দিয়াই যমুনা বাহিয়া যাইত। পরে খাল কাটিয়া যমুনার বেগ ঘুরাইয়া দেওয়া হয়। মহল হইতে পাতালপুরের সিঁড়ি দিয়া যমুনায়

যাওয়া যাইত। অলিন্দে বসিয়া বেগমেরা গীতবাদ্য শুনিতেন

জাহাঙ্গীরের পাঠকক্ষ, নূরজাহানের শয়ন কক্ষ—সাজাহানের সেইকক্ষ যে কক্ষে বসিয়', শুইয়া তিনি পরপারের তাজ দেখিতেন সবই তেমান রহিয়াছে। অনেক কক্ষে কপাট নাই—খোলা, তাঁহারা যখন বাস করিতেন তখন নিশ্চয়ই ছিল। অনেক কক্ষ যেন গুপ্ত-ধনাদি পাইবার জন্য খোঁড়া হইয়াছে মনে হয়।

আকবর বাদশাহের সাধের নওরোজের আনন্দ-বাজারের স্থান এখনো তেমনি আছে। ঔরংজেব



মোতি মসজিদ

পিতাকে যে কক্ষে বন্দী রাখিয়াছিলেন, সে কক্ষও রহিয়াছে। বাদশাহের বাহিরের ও অন্দরের বিচারের সিংহাসনও রহিয়াছে। বেগমেরা বিচার দেখিতেন—তাঁহাদের স্থান অন্তরালে রহিয়াছে। এখানেও স্নান কক্ষে আলো জালিলে এখনো বিচিত্র বর্ণ সম্পাতে উজ্জল হইয়া ওঠে। ছাদের উপরে প্রকাণ্ড একখানি কৃষ্ণপ্রস্তর রহিয়াছে—তেমন প্রস্তর আর দেখি নাই—এখানিও বাদশাহের বসিবার প্রিয় আসনই ছিল

জনশ্রুতি ভরতপুরের জাঠ মহারাজ প্রাসাদ লুণ্ঠন করিয়া যখন এই সিংহাসনে পা রাখেন তখন এই সিংহাসন ফাটিয়া রক্ত বাহির হইয়াছিল! এই প্রাসাদেই সাজাহানের



সামন বুরুজ

মোতিমসজিদ। সমস্ত মার্ব্বেলের তৈরী—মসজি[দে] বসিবার চত্বর, মেয়েদের বসিবার স্থান কত সুন্দর একদিন, সুদিনে এই মসজিদে আমিরওমরাওরা নমা[জ] করিতে পারিলে ধন্য হইতেন, আর আজ এ মসজি[দে] নামাজ দিবার ভক্ত জোটে না। মোল্লা কত দুরবস্থ[ার] কথা জানাইয়া অতি ভদ্র ও বিনীতভাবে কিছু সাহা[য্য] চাহিলেন—এই সব সমাধি ও মসজিদের রক্ষক মোল্লাদের যেখানে যাহা দিয়াছি তাঁহাই তাহারা আ[নন্দে] হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল তাজের নকল কব[রের] দোতালায় মোল্লারা বোলেচালে বিভ্রম জন্মাইয়া কি[ছু] ঠকাইল মনে হইয়াছে। আগ্রার প্রাসাদে সাজাহ[ান] বাদশাহের পায়খানাটি পর্য্যন্ত রহিয়াছে, তাহাও দেখি[লাম]

—সেই হারেম, সেই প্রাসাদ—স্বপ্নের সেই কল্প লোক আজ কত জনে দেখিতেছে—মরমীর মনে এ সব দেখিয়া কি কথা জাগে তা সেই জানে।

এসব দেখিয়া তাজ দেখিতে গিয়া ঠকিয়াছি কি জিতিয়াছি জানি না। কিন্তু বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য্যের চেয়েও যেন আমার মন আগ্রার সেই মোগল প্রাসাদই বেশী অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। শ্বেত প্রস্তরের বিরাট সে সৌধ কত প্রকাণ্ড জিনিষটি অথচ কত ছোট ও কোমল। সৌন্দর্য্য ও প্রেমের সাধনার মূর্ত্ত বিকাশ তাজ,—কিন্তু এর উৎস ছিল আগ্রার প্রাসাদ। মমতাজ সাজাহান এঁদের জীবনের সব লীলা-খেলা তো ঐ আগ্রার প্রাসাদেই হইয়াছে। প্রাসাদও যেমন স্থানে স্থানে জীর্ণ হইয়া খসিয়া পড়িতেছে তাজেরও দু'চার স্থানে তেমনি দেখা গেল. তাজের গা খসা এ যে কত বড় কলঙ্কের চিহ্ন হয়ে চোখে পড়ে! এর সংস্কারে অনেক খরচ—তাজের ভাগ্যেই যখন তা জুটছে না তখন অন্য কোন কীর্ত্তির ভাগ্যে তা জুটাও যে কত মুস্কিল তা সহজেই বোঝা যায়।



মোতি মসজিদ

মোগলের প্রাসাদ ও শ্মশান বিচরণ করে মনে হয় প্রাসাদই যেন চিত্তকে বেশী অভিভূত করে রেখেছে। এসব প্রাসাদ ইংরেজ জয় করবার আগে জাঠ ও রোহিলারা বার বার জয় করে। মসজিদের, প্রাসাদের মহার্ঘ কারুকার্য্যমণ্ডিত কক্ষগুলিতে তাদের সৈন্যেরা সব রান্না করে খেত—এতে অম্লান কারুকার্য্য ম্লান হয়েছে, কত স্থানে নষ্টও হয়েছে। রোহিলারা অবনত মোগল বাদশাকে অন্ধও করে দেয়। আর প্যানইশ্লামিক ভাই সব আবদালী, নাদীর শা প্রভৃতি যা করেছেন সে তো কহতব্যই নয়। মোগল যুগের শেষে ভারতে এমন একটা অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হয়েছিল যে, তখন একটা তৃতীয় শক্তি প্রাধান্য না নিলে ভারতের অতীত কীর্ত্তি আজ একটিও থাকতো কিনা সন্দেহ।



সিকান্দ্রা

মোগলের প্রাসাদ ও শ্মশানের স্মৃতি যখন মনে আসে, তখন রাষ্ট্রীয় সমস্যা, হিন্দু মুসলমান সমস্যা, ভারতের উন্নতি অবনতি অনেক কথাই মনে পড়ে। মোগলের প্রাসাদে ও শ্মশানে যারা আমার মত ভ্রমণ করেছেন, তাদের মনেও একথা আমার মতই কখনো কখনো জাগে বোধ হয়।

শিল্পী-পরিচয়

শ্রীধীরেন্দ্র লাল ধর

উদয়শঙ্কর—

পাশ্চাত্যের আধুনিকতার আলোয় আমরা পথ দেখে অগ্রসর হবো—জাতির এ মনোবৃত্তি আজ বদলাচ্ছে। এমন এক সময় ছিল যখন ভারত ভাবতেও পারেনি যে পাশ্চাত্যকে দেখাবার মত কিছু বিশেষত্ব প্রাচ্যের আছে, যোগ আরাধনার কথা বাদ দিয়ে। আজ ভারতের যে সব মনিষী সাধক জাতির এই মনোবৃত্তি বদলাবার সহায়তা করছেন উদয়শঙ্কর তাঁদের মধ্যে একজন। আমাদের মহাত্মা আজ জগৎগুরু, এদেশের শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি



সাহিত্যিকদের রচনা আজ প্রতীচ্যের নানা ভাষায় অনুদিত, নর্ত্তক উদয়শঙ্করের নাচ দেখে পাশ্চাত্য আজ প্রশংসায় পঞ্চমুখ, অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমারও আজ গোরা মুল্লুকে অভিনয় করতে পশ্চাৎপদ ন'ন—এঁদেরই সৎ-প্রতিভা আজ জাতির মুখোজ্জ্বল করছে।

নাচ সম্বন্ধে গর্ব্ব করবার মত কোন গৌরব আমাদের এতদিন বিদেশে ছিল না কিন্তু সে গৌরবের অভাব ঘুচিয়েছেন শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর চৌধুরী। উদয়পুরে জন্মেছিলেন বলেই এঁর নাম উদয়শঙ্কর—বাংলাদেশের জল-হাওয়ার মাঝে ইনি মানুষ নন যদিও ইনি খাঁটি বাঙ্গালী। এঁদের আদি বাস যশোরে।

শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর আজ একত্রিশ বছরের যুবক। পাতলা ছিপছিপে চেহারা, সবল ও পেশীবহুল। গায়ের রং গৌর নয়—আধময়লা পিতলের মূর্ত্তির সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যেতে পারে। দীর্ঘ আকার আজানু লম্বিত বাহু, সুগঠিত বক্ষ, মেদশূন্য উদর—এঁর আকৃতিতে একটা চমৎকার সুসামঞ্জস্য আছে। সবচেয়ে চোখে প'ড়ে এর মুখে নারীর সুলভ সুষমা ও কোমলতার সমাবেশ। এর চেহারায় এম্নি একটা সুন্দর শ্রী আছে যা সকলকারই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সহজেই।

নৃত্যকলায় ইনি যে খ্যাতি আজ অর্জ্জন করেছেন এঁর জীবনের পূর্ব্বভাগে এ সম্বন্ধে কোন বিশেষত্বই আমরা দেখতে পাইনা। উনিশ-শো খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর উদয়পুরে এর জন্ম হয়। বাইশ বছর বয়স পর্য্যন্ত রাজপুতানা এবং দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন প্রদেশে এঁর কেটে যায়। তখন ইনি বেনারস সেন্ট্রাল কলেজে পড়াশুনা করতেন।

কিছুদিন পরে এঁর পিতা ঝালোয়ার প্রদেশের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হলে, ইনি ঝালোয়ারে চলে আসেন এবং সেখানকার নরোত্তজী আর্ট স্কুলে চিত্রবিদ্যা অধ্যয়ন করতে সুরু করেন।

তারপর ইনি বিলাত যান চিত্রবিদ্যা শিখতে। সেখানকার চিত্র বিদ্যায় সম্মানও ইনি অর্জ্জন করেছিলেন যথেষ্ট। চিত্রবিদ্যায় এঁর তখন এত অনুরাগ ছিল যে পাঁচ বছরের পাঠ ইনি তিন বছরেই শেষ করেন। পা শেষে ছবি এঁকে এবং রাধাকৃষ্ণের অঙ্গ সৌষ্ঠবে

পরিকল্পনার জন্য ইনি দুটি পুরস্কার পান—অপর কোন ভারতীয় এর আগে এ দুটি পুরস্কার পায় নি।

কিন্তু শেষকালে ইনি হলেন নর্ত্তক—কেননা অপরূপ অতনু স্বপ্নকে রূপ দেবার তৃষ্ণা—নাচের নেশা ছিল এঁর রক্তের মধ্যে। তখন হতে ইনি হিন্দু নৃত্যের চর্চ্চা করতে সুরু করেন এবং বিস্ময়ে মুগ্ধ হন হিন্দুনৃত্যের উচ্চাঙ্গ অঙ্গ-সৌষ্ঠবের অপরূপ লীলায়িত ছন্দের অতুলনীয় শ্রেষ্ঠত্ব দেখে।

এই সময় 'ব্রিটিশ মিউজিয়ামে' বিশ্ববন্দিতা শ্রেষ্ঠা নর্ত্তকী আনাপাব্‌লোভার সঙ্গে এঁর পরিচয় হয়। এঁর সঙ্গে হিন্দু নৃত্যের অঙ্গ-সৌষ্ঠব সম্বন্ধে আলোচনা করে পাবলোভা বিস্ময়ে মুগ্ধ হন এঁর পরিকল্পনায়। তারপর হ'তে ইনি চিত্রবিদ্যা ছেড়ে দিয়ে উৎসুক একাগ্রতায় নৃত্য-কলা শিক্ষা করতে সুরু করেন। তারপর 'অপেরা কাউন্ট গার্ডেনে' দুবার ইনি নর্ত্তকবেশে রঙ্গাবতরণ করেন একেবারে বিশ্ব-বন্দিতা আনা পাব্‌লোভার সহকারী হয়ে।

আনা পাব্‌লোভা যে ক'টি ভারতীয় নৃত্যে অবতরণ করতেন, তার সবগুলোর পরিকল্পনাই উদয়শঙ্করের—সেইজন্যই ইনি সে দেশের গুণী ও রসিকদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠলেন শীঘ্রই। তারপর ইনি আমেরিকা গেলেন পাবলোভার সঙ্গে। সেখানকার বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে ইনি পাবলোভার সহকারী হয়ে নৃত্য করেন, সারা আমেরিকা এঁদের উভয়ের—বিশেষ করে এঁর—নৃত্য-প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে।

উনিশ-শো চব্বিশ খৃষ্টাব্দে ইনি পাবলোভার কাজ হতে বিদায় নিয়ে প্যারিতে চলে আসেন। প্যারিতে নিজেরই একটি দল গড়লেন কিন্তু সুদীর্ঘ তিন বছর ধরে এঁকে শুধু অবহেলার আঘাত পেতে হোল। কিন্তু এঁর অসাধারণ একাগ্রতা তিন বছর পরে প্যারিসিয়ানদের আকৃষ্ট করলো অনন্যসাধারণ সাফল্য গৌরবে।

তারপর দুবছর ধরে য়ুরোপের কত বিভিন্ন সহরে ইনি প্রাচ্য নৃত্যের কত অকল্পিত রূপ দিলেন। ক্রমে সারা য়ুরোপ—ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, ইতালী, বেলজিয়াম, অষ্ট্রিয়া, হল্যাণ্ড, হাঙ্গারি, সুইট্‌-জারল্যাণ্ড প্রভৃতি তাঁর প্রতিভার দীপ্তিতে মুগ্ধ হয়ে গেল। এই বাঙালী নর্ত্তকের গলায় প্রতীচ্য পরালো তার শ্রেষ্ঠ জয়মাল্য, উচ্চারণ করলো তাদের শ্রেষ্ঠ প্রশস্তি। কেউ বল্লেন—ও-নাচ আমরা রক্ত মাংসের চক্ষে দেখিনি—এ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের অনুভূতি আমরা পেয়েছি কল্পলোকের স্বপ্নমায়ার মধ্যে! দেবতার সঙ্গে উদয়শঙ্করের তুলনা করলেন কেউ কেউ। ইনি ফিরলেন প্রতীচ্যের চিত্ত বিজয় করে।

প্যারীতে থাকবার সময় বরোদার মহারাজা, কপূর্থালার মহারাজা ও মহীশূরের যুবরাজের সঙ্গে এঁর পরিচয়। তাঁরা এঁর সমাদর করেন উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় আর এঁকে অনুরোধ করেন ভারতে আসবার জন্য। ইনি যখন বরোদা এবং কপূর্থালা রাজ্যে এলেন তখন তথাকার অধিবাসীরা একে সাদর অভিনন্দন জানালো। মহারাজ-দ্বয় এঁকে ভারতে কিছুদিন থাকবার জন্য অনুরোধ করেন কিন্তু কদিন পরেই ইনি বুঝতে পারলেন ভারতের এখনকার রাজনৈতিক অবস্থা এঁর অনুকূলে নয়।

বাংলা মায়ের ছেলে শ্যামল বাংলার কোলে ফিরে এল। নর্ত্তকশ্রেষ্ঠকে অভিনন্দন জানালো কলিকাতার তরুণ সঙ্ঘ—য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্‌। এদেশে ললিতকলা সাধনার আরো অনেক প্রতিষ্ঠান আছে কিন্তু ইণ্ডিয়ান্‌ সোসাইটি অফ্‌ ওরিয়েণ্টাল আর্টিষ্ট ছাড়া অন্য কোন সমিতির পক্ষ হতে এঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করবার কোন ব্যবস্থাই হয়নি। মনোমোহন থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ মহাশয় এঁকে একদিন নিমন্ত্রণ করে নৃত্যগীত এবং জলযোগাদির দ্বারা তৃপ্ত করেন। আরো অনেক সুধী ব্যক্তিও একে আদর আপ্যায়নে সম্মানিত করেছেন।

আর্য্যফিল্মসের শ্রীযুক্ত হরেন ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগে এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে এঁর নৃত্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এঁর নৃত্য আন্তরিক সমাদর পেয়েছিল কলিকাতার উৎসুক শিল্প-রসিকদের কাছ হতে। শিব, ইন্দ্র, গন্ধর্ব্ব ও যোশিৎ—এই চার রকম ভূমিকায় ইনি দেখা দিয়েছিলেন, এঁর এই চরিত্র নৃত্য মনোহরণ করেছিল সকলেরই। এঁর প্রতি পদক্ষেপে ভারতের কত বিস্মৃত যুগের কত মনোহর ছবি মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল—সেসব স্মৃতি-ছবি আজও ইলোরা-অজন্তার গুহা গাত্রে অম্লান হয়ে

আছে। ইনি নাচেন নৃত্যশাস্ত্রের বাঁধাধরা কোন বিধিনিয়মকে মেনে নয়—স্বতঃস্ফূর্ত্ত সৃষ্টির আনন্দে, প্রাণের উচ্ছ্বসিত আবেগে। এর স্বতঃ উৎসারিত সে নৃত্যের উচ্ছ্বল গতি সকলেরই মনে সাড়া জাগায়। সেদিন স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের কত রুদ্ধ দ্বার খুলে গিয়েছিল এই অমরকান্তি যুবকের নৃত্য সুষমায়। সেদিনের সে স্বর্গীয় সুষমার স্বপ্ন আজও আমাদের চোখ থেকে মুছে যায় নি।

ভারতের নানা স্থানে মনোক্ষুন্ন হয়ে কলিকাতার কলারসিক দর্শকদের কাছ হ'তে ইনি যে আন্তরিক সমাদর পেয়েছেন তার জন্য বিদায় কালে কলিকাতা-বাসীকে ইনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আরো বলেন যে উনিশ-শো-বত্রিশ খৃষ্টাব্দে ইনি সদলবলে আবার এখানে আসবেন

কিছুদিন হতে এক নূতন আদর্শ এঁর মনে জাগে ভারতীয় নৃত্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের অর্চেষ্ট্রা কেমন যেন বিসদৃশ লাগে—কোথায় যেন অসামঞ্জস্য রয়ে যায়, তাই ইনি চান ভারতীয় বাদ্যশিল্পী নিয়ে একটা অর্চেষ্ট্রা গড়ে তুলতে। তারই জন্য ইতিমধ্যে ছোট বড়- দেড়শো রকমের বাদ্যযন্ত্র ইনি সংগ্রহ করেছেন এদেশ হতে। এই বাদ্যযন্ত্র শিক্ষা দেবার জন্য বারো জন শিক্ষিত বাঙালী যুবককে ইনি সঙ্গে নিয়েছেন। নিজে বাঙালী বলে বাঙালীদের উপর সহানুভূতি এঁর একটু বেশী।

ভারতে আসবার সময় প্যারীর প্যাথী কোম্পানী এঁকে একটি প্যাথী মেশিন উপহার দেন আর অনুরোধ করেন ভারতের বিভিন্ন সাংসারিক অবস্থা আর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তুলে আনতে। তাদের এ অনুরোধ রক্ষা করতে ইনি ছবি তুলেছেন অনেক। এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ যথেষ্ট ভারতের আসল রূপ প্রতীচ্যের কাছে দেখাবার জন্য।

কলিকাতা থেকে ইনি যাত্রা করেন উত্তর ভারতের দিকে। কাশী, সেখান হতে অজন্তা তারপর বোম্বাই হয়ে ইনি গিয়েছেন প্যারীতে। এঁর এক খুড়তুতো বোনকে ইনি সঙ্গে নিয়েছেন নৃত্যে তাকে মনের মত করে তৈরী করবেন বলে—এই চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকাটির নাম শ্রীমতি কনকলতা দেবী—দেখতে সুশ্রী, নৃত্যোপযোগী দেহ।

আমরা শুনেছিলাম এঁর নাচ ধরা হবে চলচ্ছবিতে এম্পায়ার থিয়েটারে এঁর নৃত্য প্রদর্শনীর দিন, কিন্তু মেঘ ও বৃষ্টির জন্য তা হতে পারে নি—এ বড় ক্ষোভের কথা। আমাদের দেশে ভাল ষ্টুডিও দুর্লভ তাই এমন হোল।

উদয়শঙ্কর জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ হতে প্যারীতে ভারতীয় নাচ দেখানো সুরু করে দিয়েছেন। গেল বারে য়ুরোপ ভ্রমণে গিয়ে ইনি ভারতীয় যন্ত্র-সঙ্গীতের অভাবে ভারতীয় নাচের রূপ ফোটাতে গিয়ে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করেছিলেন—এবার তাঁর সে অসুবিধা আর নেই। কারণ এবার তাঁর সহযাত্রী তিমির বরণ ভট্টাচার্য্যের সহায়তায় যে নূতন ধরণের ভারতীয় অর্চেষ্ট্রার দলে গড়ে তুলেছেন সেই দলের নৈপুণ্য উদয়শঙ্করের নাচের সঙ্গে বিশেষ উপভোগ্য হয়েছে—এরই মধ্যে প্যারীর রসিক সমাজে এই ভারতীয় অর্চেষ্ট্রা সম্প্রদায় প্রচুর আনন্দ চাঞ্চল্যের সঞ্চার করতে পেরেছেন।

প্যারিতে কিছুদিন নাচ দেখিয়ে মার্চ্চমাসের মাঝামাঝি উদয়শঙ্কর ও তিমিরবরণ সদলবলে জেনেভা যাবেন। মিউনিক্, ভিনিস, ভিয়েনা, বুডাপেষ্ট, ষ্টাটগার্ট, হামবার্গ, বার্লিন লিপ্‌জিগ্, নুরনবার্গ, ড্রেস্‌ডেন, আম্‌ষ্টার্ডাম, ব্রুসেল্‌স্—প্রভৃতি ইউরোপের বিভিন্ন সহরে নাচ দেখাতে যাবেন। এঁর জয়যাত্রার পথ পুষ্পাকীর্ণ হোক!

প্যারিতে এঁর রাধাকৃষ্ণের নাচের সবাক্ ছবি তোলা হয়েছে—ছবি শীঘ্রই এদেশে আসবে। প্যারিসিয়ানদের কাছে এজন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এই রাধা-কৃষ্ণের নাচের একটি বিশেষত্ব হচ্ছে যে এতে উদয়শঙ্কর সেজেছেন রাধা আর এঁর সহযোগী নর্ত্তকী 'সিমৃকি' কৃষ্ণ সেজে নৃত্য করেছেন।

এদেশ থেকে প্যারিতে যাবার কদিন পরেই পৃথিবী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 'সিল্‌ভা লেভি' এঁর নৃত্য দেখতে যান। তিনি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন—এঁর সেদিনকার শিব-নৃত্য দেখে আর তিমিরবরণের স্বরোদ শুনে। বিস্মৃত প্রায় অতীতের কোন একদিনের গৌরব স্মৃতি নর্ত্তক শ্রেষ্ঠ উদয়শঙ্কর ভারতের বুকে আবার জাগিয়ে তুলেছেন—পাশ্চাত্যকে ইনি জয় করেছেন ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী জানিয়ে—ধন্য এঁর মনীষা।

নৃত্যকলা প্রাচীন ভারতের গৌরবময় যুগের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভারত সুদীর্ঘকাল চর্চ্চার অভাবে এই অতুলনীয় শিল্পকে হারাতে বসেছিল, শ্রীযুক্ত উদয়শঙ্কর তাঁর ঐকান্তিক সাধনা আর অধ্যবসায়ের গুণে সেই মৃতপ্রায় কলাবিদ্যাকে পরিপূর্ণ গৌরবে পুনরুদ্দীপিত করেছেন। সমস্ত ভারত এজন্য এঁর কাছে ঋণী, বিশেষ করে বাংলা দেশ—সেই অক্ষয় সম্মান মুকুটের জন্য, যা ইনি স্বজাতীয় শিরে আজ পরিয়ে দিয়েছেন এর তপস্যার সুমহান সিদ্ধির দ্বারা, ভগবান এঁকে দীর্ঘজীবি করুন, এঁর যশোপথ পুষ্পাকীর্ণ হোক—এই আমাদের প্রার্থনা।

সেখ ইফ্‌তেখর্ রাসূল্ :—

মূলতানের একটি অতি সাধারণ পরিবারে রাসূলের জন্ম হয়। লাহোর হতে মূলতান সহরটি একশো ছয় মাইল দূর। লেখাপড়া শেখবার জন্য একে চলে আস্‌তে হয় লাহোরে। লাহোর বিশ্ব-বিদ্যালয় হতে ম্যাট্রিক পাশ করে ইনি কলেজে প্রবিষ্ট হ'ন। কিন্তু কলেজে পড়া এঁর সুবিধা হোল না—ছায়াছবির প্রতি এঁর জন্মগত একটা ঔৎসুক্য ছিল প্রাণে, তাই দু-বছর পড়ে একে কলেজ ছেড়ে দিতে হোল। উনিশ-শো-তেইশ সালে ইনি বিলাতে গেলেন ছায়াছবি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করতে।

বিলাতে পৌছেই বিভিন্ন চলচ্চিত্রের প্রযোজকদের কাছে ইনি ছবি পাঠাতে সুরু করে দিলেন, ছবির পিছনে নিজের পরিচয় দিয়ে লিখতেন—দীর্ঘাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ, সুঠাম সুপুষ্ট দেহ এবং প্রেমাভিনয়ে বিশেষ দক্ষ—যদিও এ সম্বন্ধে তখন এঁর কোন জ্ঞান ছিল না।

কিন্তু ছবি পাঠিয়েও কোন ফল হোল না। একখানা উত্তরও আসতো না। সব দেখে শুনে রাসুল হতাশ হয়ে পড়লেন।

ইনি ইংলণ্ড ত্যাগ করলেন ; কিছুদিন ফ্রান্সের উপকূলে অবস্থিত 'নাইস্' সহরে বাস করবেন এই উদ্দেশ্যে।

নাইসে এসে পৌছুবার কদিন পরেই. বিখ্যাত প্রযোজক 'রেক্‌স্ ইন্‌গ্রামের' সঙ্গে এঁর দেখা হোল। ইন্‌গ্রাম্ তখন 'আল্লার উদ্যান' ছবিখানির প্রযোজনা করছিলেন তাতেই রাসুল একটি ছোট অংশ অভিনয় করবার জন্য নিযুক্ত হন, ক' পাউণ্ড মাইনেও পান কয়েকদিনের জন্য। পাশ্চাত্যের ছায়া জগতে অভিনয় করবার এই সুযোগে সাফল্য অর্জ্জন করবার জন্য ইনি ঐকান্তিক চেষ্টা করেন।

অভিনয় এঁর বেশ ভালই হোল, প্রশংসাও হোল খুব। একজন ফরাসী প্রযোজকের দৃষ্টি পড়লো তখন তাঁর উপর। তিনি তখন "নীল নদের সর্প" নামে একটি ছবির প্রযোজনার আয়োজন করছিলেন এবং কয়েকজন শিল্পীরও সন্ধানে ছিলেন। রাসুল এঁর সঙ্গে



প্যারীতে এলেন এবং এই ছবিখানিতে "শাহজাদা হাসানের" ভূমিকা অভিনয় করলেন বেশ সাফল্য গৌরবে।

এই সময়ে ইনি ভারতীয় নৃত্য সম্বন্ধেও কিছু কিছু চর্চ্চা করতে সুরু করেন। "নীলনদের সর্প" ছবিখানির তোলবার পর প্রযোজক মহাশয় একে অনুরোধ করেন প্যারীর রঙ্গমঞ্চে এর নৃত্য দেখবার জন্য, সাহস করে ইনি নেমে পড়লেন প্যারীর রঙ্গমঞ্চে—এঁর নৃত্য প্রশংসা অর্জ্জন করলো অতিরিক্ত ভাবে। তারপর একে একে বার্লিন, বুডাপেস্ত, ভিয়েনা এবং লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে ভারতীয় নৃত্য দেখিয়ে অসাধারণ সাফল্য অর্জ্জন করেন্।

তখনো কিন্তু চলচ্চিত্রে একটি ভাল ভূমিকায় নামবার জন্য ইনি উৎসুক হয়েছিলেন। হঠাৎ সে সুযোগ ইনি

পেলেন, আরবে৷পন্যাসের একটি শ্রাংশ এঁকে দেওয়া হোল অভিনয় করতে। ছবিখানি অভিনয় করবার পর অভিনেতা হিসাবে এঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

এই সময়ে হোলিউড থেকে এঁর ডাক এল কিন্তু আমেরিকা ইনি গেলেন না য়ুরোপেরই বিভিন্ন চলচ্চিত্র কোম্পানী কর্তৃক ইনি কয়েকবার নিযুক্ত হলেন প্রাচ্য প্রথায় ছবিগুলির প্রযোজনা করবার জন্য। কয়েকটি ছবি প্রযোজনা করবার পর ইনি "প্রাচ্যের ভ্যালান্টিনো" এই আখ্যা পান—এর চেয়ে বড় সম্মান বোধ হয় প্রাচ্যে কোন অভিনেতার ভাগ্যে য়ুরোপে ঘটে না।

তারপর এল সবাক চিত্রের যুগ। মূকছবি তখন আর লোকের মনে কোন সাড়াই জাগাতে পারছে না দেখে ইনিও একখানি সবাক চিত্রের প্রযোজনা করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অনেকগুলো বই পড়বার পর "লালা রুক্" বইখানি এঁর বিশেষ পছন্দ হয়। সকল উদ্যোগ আয়োজন শেষ করে ইনি ছবিখানির প্রযোজনা দিবার জন্য এঁর দল নিয়ে কাশ্মীরে চলে এলেন—কেননা এই গল্পটি কাশ্মীরেরই। এই সবাক ছবিখানিতে পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার না করে সেতার, জলতরঙ্গ, তবলা প্রভৃতি এদেশীয় বাদ্যযন্ত্র ইনি ব্যবহার করেন—একেবারে প্রাচ্যের আবহাওয়ার মধ্যে ইনি এই ছবিখানি তোলেন।

ছবিখানি তোলবার পর ইনি আবার য়ুরোপে ফিরে গেছেন। ছবিখানি সেদেশে দেখবার জন্য এঁর ইচ্ছা আছে। প্রাচ্যের ক'খানা সবাক চিত্রের প্রযোজনা করে পাশ্চাত্য দেশবাসীর চোখের সামনে মেলে ধরবেন প্রাচ্যের সব কিছু গৌরবের সঙ্গে।

বিলাত সম্বন্ধে ইনি বলেন—"ও দেশটা প্রাচ্যকে বোঝবার কোন চেষ্টা কখনো করে না—আমেরিকার মত ক্ষণপরিবর্ত্তনশীল মতামত নিয়েই এরা থাকে। বেশ উত্তেজক গোয়েন্দা কাহিনী কিম্বা ডাকাতির ছবি দেখতেই এদের আগ্রহ খুব বেশী—এমন কি এই ধরণের বইগুলোরও বাজারে কাটতি অত্যন্ত বেশী।"

নিজের সম্বন্ধে ইনি বলেন—বিলাতের এই রকম হাবভাব দেখে শুনেও প্রতিভাবান শিল্পীর একদিন আদর হবেই—এই বিশ্বাস নিয়েই আমি ছায়াছবিতে প্রবেশ করি।

রায়ল এখন প্রাচ্যের একমাত্র প্রবাসী 'নক্ষত্র' এঁর অভিনয় নৈপুণ্য পাশ্চাত্যে এত সমাদৃত হয়েছে যে সকলেই এঁর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য বিশেষ উৎসুক—বড় বড় ডিউক, প্রিন্স পর্য্যন্ত। ভোজ সভায়, সমিতিতে, থিয়েটারে বায়োস্কোপে—যেখানে ইনি যান, সেখানেই অসম্ভব রকম জনতা জমে ওঠে এঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য।

অবসর সময়ে ইনি পাশ্চাত্য-দর্শন অধ্যয়ন করতে ভালবাসেন। তা না হলে সিনারিও লেখেন ও প্রযোজনা সম্বন্ধে আলোচনা করেন অধিকাংশ সময়, এইসব বিষয়ে এঁর অভিজ্ঞতা পাশ্চাত্যের অনেক প্রযোজকের চেয়ে বেশী।

চিত্তবিনোদনের জন্য পিয়ানো বাজাতে ইনি ভালবাসেন—পিয়ানো বাজানোতে এঁর হাত ভারি সুমিষ্ট—যিনি একবার শুনেছেন তিনি আর ভুলতে পারবেন না।

প্রাচ্যকে যে সম্মানের মুকুট ইনি পরিয়ে দিয়েছেন—তারই এই কৃতিত্বের জন্য প্রাচ্য ধন্য। এঁর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক এই আমাদের প্রার্থনা।



অদ্ভুত হত্যা

কুমারী বিজনপ্রভা দেবী

গল্প

১

অনেক দিনের কথা। বি, এ পাশ করার পর আমি তখন সবেমাত্র সরকারী তদন্ত বিভাগে ঢুকেছি, তদন্ত কার্য্যে আমি তখন পর্য্যন্ত তেমন পারদর্শিতা লাভ করিতে পারি নাই, তবে নেহাৎ যে একেবারে ফেলান তাও নয়।...

সেদিন সাহেবের খাস কামরায় বসে আছি, সাহেব আমায় তাঁর জীবনের সব চেয়ে আশ্চর্য্য ঘটনাগুলো এক এক করে বলছিলেন, আর মাঝে মাঝে তদন্ত সম্বন্ধে আমায় উপদেশ দিচ্ছিলেন, আমিও মনোযোগের সঙ্গে তাঁর কথাগুলো শুনে যাচ্ছিলুম। তিনি বল্‌তে আরম্ভ করলেন :—

বুঝেছ বাবু, যখন আমি খুব পারদর্শিতা লাভ করলুম এই তদন্ত বিভাগে আমি তখনকার কথা বল্‌ছি, বয়স আমার তখন বিশ কি বাইশ। একদিন বসে বসে ভাবছি এমন সময় বড় সাহেব আমায় ফোনে ডেকে বল্‌লেন, জন্ তোমায় একবার চীনা মুলুকে যেতে হবে, একটা খুনের তদন্ত করতে হবে, খুনটী খুবই অদ্ভুত।...খুনের তদন্তে আমি খুব চট্‌পটে ছিলুম, কাযেই সাহেব আমাকেই মনোনীত করলেন।

আমিও তখন নূতন দেশ দেখবার আশায় কোন বিবেচনা না করেই সম্মতি দিলুম, কিন্তু তখন কি জানতুম বাবু, সে এই চীনা দেশটা কি এক রহস্যময় দেশ।...

এই চীনে লোক গুলো যেমন ধূর্ত্ত তেমনি কুট, আবার একধারে তেমনই সরল। এমনই একটা দৃঢ়তা এদের মধ্যে প্রকাশ পায় যে, যখনই এরা কোন কাজে হাত দেয় সেটা ভাল হ'ক মন্দ হ'ক, তা তারা প্রাণপনেই শেষ করে থাকে। সাহেব আমায় এই লোকগুলো সম্বন্ধে একটা বাহ্যিক রকমের মোটা-মুটি কিছু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন ওদের সঙ্গে মিশে গেলুম তখন দেখলুম, ওদের ভেতর ও বাহির উভয়েই উভয়ের নিকট পৃথক্।...যে যে ঘটনাগুলো প্রধান ওপর ওপর আমি তোমায় সে গুলোই বলে যাচ্ছি, কেন না সব ঘটনা বলা সম্ভব নয়।...

বছর সাতেক পূর্ব্বে সাংহাইর কোন এক জনবহুল অংশে কোলুন নামে একজন চীনা এসে কিছু দিনের জন্য ছিল। চীনা রাজত্বের মধ্যে সাংহাইর নাম জানে না এমন লোক খুব কমই আছে। এখানে কোকো, তামাক, চাল প্রভৃতি দ্রব্যের আমদানি ও রপ্তানি খুব বহুল পরিমাণেই হয়ে থাকে। ঐ সময়ে চেংফু নামে একজন চীনা বণিক নগরের মধ্যে ঐশ্বর্য্যশালী নামে পরিচিত ছিল।

হুফ্ ষ্ট্রীটের এক দ্বিতল বাটীতে ছিল তার অফিস, সে নিজে তারই পার্শ্বে একটী বাড়ীতে বাস করত, অফিসের কাজ থেকে সে নিজেকে সর্ব্বদা পৃথক রাখতে চেষ্টা করত এবং সে নিজে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকৃত।

অত বড় কারবার থাকৃতেও সে কৃপণ স্বভাব ছিল, কিন্তু লোকে বল্‌ত যে লোকটার অগাধ টাকা, নানা রকম দুর্লভ মাণিক্যের সে মালিক, সে সব জিনিষ সব সময়েই তার কাছে কাছে থাকে।...

যাহা হউক, অতগুলো দোষ থাকা সত্বেও গুণের মধ্যে সে ছিল খুব বিনয়ী, নম্র স্বভাব ও শান্ত। এবং এই জন্যই সে যত কিছু অভিসন্ধি গোপনে পূর্ণ করত, চীনা পুলিশ তা বুঝ্‌তে পারত না।

যাক্ এবার আসল ঘটনা বলা যাক্। একদিন কোলুন এসে এই সাংহাইতে তার আস্তানা গাড়বে, শুনা যায় সে পাডাং থেকে এসেছিল, ডি রয়টার

এভিনিউতে সে এক খানা ছোট বাংলা ভাড়া নিলে, এই কোলুন একজন পাকা জহুরী ছিল। সাংহাইতে তার খুব বড় একটা দোকান খোলার ইচ্ছা ছিল এবং এই জন্যই সে রোজ হুক্ ষ্ট্রীটে যাতায়াত করত। হুক্ ষ্ট্রীটে একটা বড় রকমের ঘর তৈয়ার হতে লাগল, প্রত্যহ কোলুন এই দোকানে যেত, কোথায় কি করতে হ'বে তার পরামর্শ দিত, আর রাত্রে সহরের ধনীদের কাছে গিয়ে আড্ডা দিত, ক্রমে ক্রমে কোলুন এই ধনী চেংফুর সঙ্গেও বেশ আলাপ জমিয়ে ফেল্ল।...

তারপর থেকে সে রোজই চেংফুর অফিসে যেত, অবশ্য চেংফুর অফিসেরই একজন কেরাণীর কাছ থেকে আমরা এটা জান্তে পেরেছিলাম...।

যদিও চেংফু খুব ভাল ভাল দামী হীরা জহরত কিনত, ছোটখাট অল্প দামী হীরা-জহরত সে মোটেই পছন্দ করত না, কেননা তার বিশ্বাস ছিল ছোট খাট জিনিসে কোন লাভ নেই।...

কিন্তু কোলুন সেরূপ ছিল না, তাঁর মতলব ছিল অন্য রকমের। সে হুক্ ষ্ট্রীটে বেশ বড় রকমের দোকান খুলবে, ছোট বড় সব রকমের জিনিস থাকবে, সহরের ছোট বড় ধনী গরীব সবার কাছ থেকে সে টাকা চায়, কোলুন ছিল ব্যবসায়ী, আর চেংফু যা কিনত তা নিজের জন্য।

ক্রমে ক্রমে কোলুন জান্তে পারল যে চেংফু সমস্ত মূল্যবান জহরতগুলো তার নিজের কাছেই রাখে, তখন সে এক ফন্দি করল, প্রায় প্রত্যহই সে চেংফুর কাছে গিয়ে নানারকমের জহরতের আলোচনা করত। একদিন কোলুন চেংফুকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করলে, এবং আরও বল্লে, বাড়ীতে আরও অনেক প্রকার জহরত আছে, যা সে গেলে তাকে দেখাবে।

চেংফুর না যাওয়ার কোন কারণ ছিল না, কাজেই সে যেতে সম্মত হল, এবং একদিন বিকেলে যাবে বলে স্বীকার করল।

কোলুন বার বার তাকে যেতে অনুরোধ করে, এবং যেন ঠিক বৈকালেই যায়, বার বার তাহা স্মরণ করাইয়া নমস্কার করে চলে গেল। চেংফু তার কথা রেখে ছিল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা সে ট্রামে এসে উঠল, সন্ধ্যার ধূসর ছায়া তখন মেদিনী আবৃত করছিল, সাংহাইয়ের পথে লোক চলাচল তখন ক্রমেই কমে আসছিল। স্থানে স্থানে দোকান পাট বন্ধ হয়ে গিয়েছে, যাদের দোকান পাট কেবল মাত্র রাত্রের জন্য তারা সবেমাত্র দোকান খুলতে আরম্ভ করেছে।..

কিছুক্ষণ পরে চেংফু একেবারে কোলুনের বাটীর সামনে এসে নামল্। এই রয়টার এভিনিউর উপরিস্থিত বাড়ীগুলি পরস্পর পৃথক, এবং প্রত্যেক বাটীর ভিতরই নানারূপ ফুল ফল বৃক্ষে পরিপূর্ণ বাগান আছে, কিন্তু কোলুন যে বাংলোয় থাকত, তার ভিতরকার বাগানটী তত্ত্বাবধানাভাবে এক প্রকার জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল, এবং যে কেহ নূতন এই স্থানে প্রবেশ করত সেই একবার ভয় পেত।

চেংফু আস্তে আস্তে বাগান পার হ'য়ে কোলুনের বাটীর ফটকের ভেতরে ঢুকল, কোলুনের একটী ভৃত্য ছিল, তার নাম ছিল ওয়াঙ্। এই লোকটা ছিল বেঁটে, স্থূলকায়, কদাকার ও বদ্‌রাগী—একটা জানোয়ার বিশেষ ছিল। ওয়াঙ্ যদি কখনও কারও উপর রাগত তাকে খুন না করে ছাড়ত না।...

ওয়াঙ্ এসে দরজা খুলে চেংফুকে ভিতরে নিয়ে গেল, চেংফু যে কোলুনের বাড়ীতে গিয়েছিল, তার প্রমাণ আমরা এই ওয়াঙের মুখে শুনেছিলুম।

৩

যেদিন আমি সাংহাই পৌছেছিলুম তারপর দিন আমি থানায় বসে বড় সাহেব মিঃ হ্যারিপিলের সঙ্গে বসে কথাবার্ত্তা বলছিলুম, তখন টেবিলের উপর টেলিফোন্‌টা ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল। মিঃ হ্যারি টেলিফোন ধরলেন, কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর তাড়াতাড়ি মোটর তৈরি করতে আদেশ দিলেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—মিঃ জন্, যে ঘটনার জন্য তুমি তদন্তে এসেছ এ সেই ঘটনা, কিছুদিন পূর্ব্বে কোলুন নামে একটা চীনা জহুরী এই সাংহাইতে এসে বাস করতে থাকে, কয়েকদিন হ'ল সে কাহারও দ্বারা হত হয়েছে,

আমি এখুনি যাচ্ছি, ইচ্ছা করলে তুমি আমার সঙ্গে আস্‌তে পারো।"

যাহ'ক, অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলুম, গিয়ে দেখি, একজন পুলিশ ফটকে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি আরও একজন পুলিশ, দেখে আমার মনটা একেবারে ক্ষেপে উঠ্‌ল, কারণ আমার অভিজ্ঞতায় এটুকু বুঝেছিলুম যে, হত্যাকাণ্ড হ'বার পর যারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়, তারা শুধু হত্যাকারীকে পলায়নের সুযোগ দিয়ে থাকে।

রাগ ক'রে আর কি করব, আমি চুপ করে হ্যারির সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে লাগলুম। সামনেই একখানা বড় ঘর, এই ঘর দিয়ে আমরা উভয়েই একটা বারেণ্ডায় এসে উপস্থিত হ'য়ে যা দেখলুম তাতে তিন হাত পেছিয়ে গেলুম।

দেখলুম, বারাণ্ডার উপর একটী মৃতদেহ, মাথাটা তার চূর্ণ-বিচূর্ণ, দেহ দেখে চিনবার কোনও উপায় নাই, ইহাই নাকি প্রসিদ্ধ চীনা জহরী কোলুনের শবদেহ। কোলুনের ভৃত্য ওয়াঙ্ প্রভুর দেহ সনাক্ত করেছে। হত্যাসম্পর্কে ওয়াঙ্‌কেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কিন্তু সে বলল যে সে ইহার কিছুই জানে না। তার প্রভু তাকে গতকল্য সাংহাই হতে দশ মাইল দূরবর্ত্তী পালীনগরে যেতে হুকুম করিয়াছেন, সেখানে কোলুন একটা বাংলো ভাড়া করেছেন প্রতি শনিবার সে এই বাংলোয় গিয়ে বাস করে, সেদিনও ওয়াঙ ঘরদোর পরিষ্কার করার জন্য গিয়েছিল…

ওয়াঙ যখন পালী যাত্রা করে তখন বণিক চেংফু তার প্রভুর নিকট আসে, সে তাহার প্রভু ও বণিক চেংফুকে একত্র রেখে চলে যায়, পরদিন সকাল বেলা ফিরে এসে দেখে তাহার প্রভু মৃত এবং যে সিন্ধুকে তাহার বহুমূল্য জহরতাদি থাকত তা খোলা, তখনই সে ছুটে পুলিশে খবর দেয়।…

ওয়াঙ যে কথাগুলো বলল তা সম্পূর্ণ সত্য বলেই মনে হ'ল, অন্ততঃ যতক্ষণ না প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পায়, মিঃ হ্যারি তাকে তদন্ত শেষ হওয়া পর্য্যন্ত আটক রাখলেন। ওয়াঙও কোনরূপ আপত্তি করল না, শুধু সে অনুরোধ করল যে পালী গিয়া তার কথা সত্য কিনা তা দেখতে।…

যাহ'ক একজন পুলিশ তাকে নিয়ে গেল, আমরা তখন ঘরটী পরীক্ষা করতে লাগলুম, ঘটনাটী খুবই সোজা, সিন্দুক খোলা তাতে চাবি লাগানই ছিল, কোলুন কাকেও কিছু দেখাবার জন্য সিন্ধুক খুলেছিল, মিঃ হ্যারি অস্ফুটস্বরে চীৎকার করে উঠলেন—"চেং ফু" খুনী?

আমরা উভয়ে তৎক্ষণাৎ হুফ্ ষ্ট্রীটে চেংফুর বাড়ীতে গেলুম, কিন্তু শুনলুম সে কাল থেকে এখনও ফিরে নাই, তার ভৃত্য এইমাত্র পুলিশে খবর দিয়েছে যে তার প্রভুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

এখন বুঝতে পারছ বাবু যদি কোন লোক একজন জহুরীর কাছে যায়, তারপর উধাও হয়, এবং সেই জহুরীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় ও তার সিন্দুক খোলা থাকে। তাহলে কে খুনী। কাজেই মিঃ হ্যারি প্রথমেই এই কাজ করলেন—

তিনি তৎক্ষণাৎ চেংফুর নামে একখানা ওয়ারেণ্ট বার করে তার ফটো নগরের পথে ঘাটে টাঙিয়ে দিলেন, যদি কেও তাকে ধরে দিতে পারে। উপরন্তু তিনি একজন লোককে পালী পাঠিয়ে দিলেন, ওয়াঙ যা বলেছিল তার কতটা সত্য কি না তাই পরীক্ষা করতে, তারপর আমরা পরস্পর বিদায় নিলুম, মিঃ হ্যারি তাঁর মোটরে চলে গেলেন।

৪

নিজের ঘরে ফিরে এসে ঘটনাটা একবার ভাল করে আগাগোড়া ভেবে দেখলুম, তারপর ভাবলুম আচ্ছা, চেংফু একজন প্রসিদ্ধ ধনশালী বণিক, সে এই সাংহাইতে ছোটবেলা থেকে বাস করে আস্‌ছে, আর কোলুন সবেমাত্র সেদিন এসেছে, সহরের দু একজন ছাড়া আর কেউ কোনদিন জীবনে তাকে দেখেনি। অথচ এই কোলুন, চেংফুকে নিমন্ত্রণ করেছিল, আবার এই কোলুনই মৃত, ব্যাপারটা যত সহজ মনে হয়েছিল, এখন দেখলুম ততটা সহজ নয়।…

খানিকক্ষণ চিন্তা করার পর ভাবলুম, আচ্ছা মৃত দেহটার মস্তক ওরূপ চূর্ণবিচূর্ণ করেছিল কেন, ওটা চেং-

ফুর মৃতদেহ নয় তা শুনেছি চেংফু তাঁর সঙ্গে বহুমূল্য জহরতাদি সদাসর্ব্বদা রাখত, এমনও ত হ'তে পারে কোলুন তাকে নিজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে এনে হত্যা করেছে, মৃতদেহে কোলুনের পোষাক ছিল, ওয়াঙ্ প্রভুর দেহ বলে শনাক্ত করিয়াছে, কিন্তু একজন, একজনকে হত্যা করে পরিচ্ছদ বদল করতে পারে। ওয়াঙ হয়ত মিথ্যা বলিয়াছে।...

আমি তৎক্ষণাৎ, মিঃ হ্যারিকে আমার মন্তব্য ফোনে জানালাম, তারপর কোলুনের অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞাপন দিতে বললাম, মিঃ হ্যারি বলিলেন—"উত্তম, তুমি যদি ভাল মনে কর তবে তাই হ'ক তবে বিশেষ ফল হবে না।" তার বিশ্বাস চেংফুই খুনী। আহত কোলুনের জন্যও বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। তার কোন বিশেষত্ব ছিল না, ফলতঃ সে এই সাংহাইতে নূতন অনেক লোকেই তাকে চেনে না, তবে এইটুকু ঠিক যে কোলুন একজন চীনা ও প্রায় চেংফুর সমবয়সী।...

কিন্তু চেংফু সকলেরই পরিচিত, যাঁরা তার বিশেষ পরিচিত তারাও মৃতদেহ শনাক্ত করে গেল, ব্যাপারটা আরও একটু জটিল হল।...

আমি আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য টম্‌কে ওয়াঙ্ ও কোলুনের বাড়ীর প্রতি দৃষ্টি রাখতে বলেছিলুম।

কয়েকদিন পরের কথা, একদিন ঘরে বসে চা খাচ্ছি, এমন সময় টম্ এসে যা বলল তাতে ব্যাপারটা আরও গভীর হ'য়ে উঠল। সে বলল, ওয়াঙ্ কোলুনের গৃহে মাত্র দশদিন কাজ করেছে। তার পূর্ব্বে মাপোঁ নামে একটা লোক তার কাছে কাজ করত, ওয়াঙ্ বলেছে সে যেদিন পালী যায় সেদিন সে এই মাপোঁকে একটা লোহার দাণ্ডা হাতে কোলুনের বাড়ীর দিকে আসতে দেখেছে।" টমের নিকট উক্ত ঘটনা শুনে তৎক্ষণাৎ মাপোঁ কে নিয়ে আসিলাম, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলতে লাগল, "তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে যখন কোলুন প্রথম এই সাংহাইতে আসে তখন সে আমাকে তার জন্য রান্না-বান্না করতে রাখে, আমি আমার প্রাণপণ শক্তিতে এই কার্য্য করতুম, একদিন আমি একটা কাপ ভেঙ্গে ফেলায় আমায় খুব মার ধোর করে ও তাড়িয়ে দেয়, সেইদিন থেকে আমি আর কিছু জানিনে এবং তার হত্যা সম্বন্ধেও কিছু জানিনে, ওয়াংকে আমি জীবনে কোনদিন দেখিনি বা কালকে আমি কোলুনের বাংলোর নিকটে ছিলুম না।"

টম্‌কে দিয়ে এই মাপোঁকে থানায় পাঠিয়ে দিলুম, তারপর টমকে কোলুনের বাড়ী যেতে বলে আমিও বেরিয়ে পড়লুম।

আমি যখন কোলুনের বাড়ী গেলুম তখন মধ্যাহ্ন—কয়েকজন পুলিশ বাড়ীখানা পাহারা দিচ্ছে।

পথে যেতে যেতে ভাবলুম, আচ্ছা যদি এই মাপোঁই খুন করে থাকে, কোলুন ও চেংফু যখন বসে দ্বন্দ্ব করছিল তখন হয়ত এই মাপোঁ চুপি চুপি বাড়ীতে প্রবেশ করে, তারপর উভয়কে হত্যা করে, জহরতগুলো আত্মসাৎ করে, চেংফুর মৃতদেহ হয়ত কোন কূপে ফেলে দেয়। কিন্তু কোলুনকে সরাবার আর সুযোগ না ঘটায় পলায়ন করে, যাহ'ক বাড়ীর আশপাশ একবার খুঁজে দেখতে হ'বে, ইতিমধ্যে টম্ এসে উপস্থিত হ'ল।

আগে থেকেই আমার মন নিশ্চিন্ত হ'য়ে গিয়েছিল, যে চেংফু খুনী নয়, তার কারণ কেউ যদি কাউকে খুন করে ত সে হাত মুখধুয়ে আপন ঘরে ফিরে যায় যেন সে কিছুই জানেনা, কিন্তু এমন বোকা খুবই কমই আছে যারা খুন করেই পালিয়ে যায়, খুনের প্রমাণটা স্পষ্ট করে নিজের ঘাড়ে নিয়ে·

* * *

যাহ'ক মাপোঁর গল্পটা আমার অনেক কাজে এল, এখন বোঝা গেল যে চেংফু কিংবা কোলুন কেহই খুনী নয় এর মধ্যে এমন একজন আছে যে এই উভয়কে হত্যা করেছে যে এই বাংলো চিনে এবং কোথায় জহরত থাকত তা জানে, কিন্তু কে এই লোকটা? মাপোঁ কি?...

কিন্তু তার প্রমাণ কি, মৃতদেহ কার, চেংফুর না কোলুনের—ওয়াঙ্ ও মাপোঁর গল্পের কতটা সত্য এই সম্পূর্ণ ঘটনায় মাত্র একটা উপায় আছে, কিন্তু মাপোঁকে ত খুনী মনে হয় না, তাকে দেখলে সাধারণতঃ দয়ার উদ্রেক হয়, আর যদি সে প্রকৃত খুনী হ'ত তাহ'লে সে অতটা খোলা-খুলি থাকতে পারতনা, কাজেই মাপোঁর গল্পটায় বিশ্বাস না করে, আবার একেবারে ছেড়ে না দিয়ে মনের এক কোণে চাপা দিয়ে রাখলুম।

সেদিন সন্ধ্যে হ'য়ে যাওয়ায় কোলুনের বাড়ীর ভিতর বা বাগান অনুসন্ধান করা হল না, কাজে কাজেই ফিরে আসতে হল, টম্‌কে ওয়াঙের গল্পের সত্যতা আর পরদিন কোলুনের বাগান বাড়ী অনুসন্ধানের ভার দিয়ে বাড়ী ফিরে গেলাম, টম্‌ও আমাকে সান্ধ্য প্রণাম জানিয়ে একদিকে চলে গেল।

বাড়ী ফিরে আমি খাওয়া দাওয়া শেষ করে রাত্রি প্রায় এগারটার সময় শুতে গেলাম।······

৫

কাজ অনেক দূর গড়িয়ে গেল। রহস্য আরও গভীর হয়ে উঠল পরদিন মিঃ হ্যারির খাস কামরায় বসে খুন সম্বন্ধে আলোচনা করছি এমন সময় টমের প্রেরিত লোক পালী হইতে ফিরিয়া আসিল, সে বলিল- পালীতে কোলুনের একটা কুঁড়ে আছে সত্য এবং সে ঘটনার আগের দিন বিকেলে কোলুন ঘরটী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করতে গিয়েছিল তাও সত্য, সে রাত্রে সে পালীতেই ছিল এবং পরদিন সকালে সে পালী হইতে ফিরিয়া আসে।

মিঃ হ্যারি সত্য তা কি অস্বীকার কর্চ্ছি, কিন্তু সে নিজেও খুনী হতে পারে। মিঃ হ্যারী "কি রকম তোমার মাথা খারাপ হ'ল নাকি?" শুনলে জন্, ওয়াঙের কথা সত্য কিনা।'

জন—"না এখনও হয়নি, তবে হ'বার যোগাড়ে আছে, আচ্ছা হ্যারি, মনে কর ওয়াঙ্ বিকেলে চেংফু ও কোলুনকে হত্যা করে তারপর পালী যায়।······

সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল; রিসিভার কানে দিয়া বুঝিলাম টম্ কথা কহিতেছে, সে কহিল— "মিঃ জন, আমি সকাল বেলা কোলুনের বাড়ী অনুসন্ধান করিতে আসি, সেখানে কিছু না পাইয়া বাগানের দিকে যাই, সেখানে একটা অব্যবহার্য্য কূপের মধ্যে কেহ কিছু পূর্ব্বে কোন কাজ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়, আপনি কি দয়া করিয়া একবার আসিবেন।"

আমরা তৎক্ষণাৎ সেখানে গেলাম, গিয়ে দেখলাম টম যাহা বলিয়াছে তাহা ঠিক। তৎক্ষণাৎ আগাছাগুলি সাফ্ করিয়া ফেলা হইল, একটী দড়ী ধরিয়া এক জন লোক নীচে নামিয়া গেল। কূপের ভিতর এক ফোঁটাও জল ছিল না। লোকটী একটা কাপড়ের পুটলী লইয়া উপরে উঠিয়া আসিল, পুটলিটী খুলিয়া তার ভিতরে কতগুলি কাপড় ও রক্তমাখা একটা লোহার ডাণ্ডা পাওয়া গেল, ইতিমধ্যে হ্যারির মটর গিয়া চেংফুর ভৃত্যকে লইয়া আসিল, সে কাপড়গুলি দেখিয়া সনাক্ত করিল যে ইহাই তাহার প্রভুর পোষাক। আর লোহার রড্‌টা গভীরভাবে আপনার কার্য্যের পরিচয় দিতে লাগিল।

হ্যারি বলিল, "ব্যাপার অতি সোজা, যদি চেংফুকে হত্যাকরা হইয়াছে তবে নিকটেই কোথাও তাহার মৃতদেহ পাওয়া যাইবে, কিন্তু তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত খুঁজিয়াও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন হ্যারি বলিল—"ওহে জন ঠিক হইয়াছে, চেংফু, কোলুনকে হত্যা করিয়া নিজের কাপড়চোপর এই স্থানে ফেলিয়া ছদ্মবেশে বাহির হইয়া গেছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমি বলিলাম, "মিঃ হ্যারি আপনার কথা হয় ত সত্য, কিন্তু এই লোহার রড্ সম্বন্ধে আপনার মত কি? ওয়াঙ্ বলিয়াছে সে এই মাপোঁকে এই রড্ হাতে বাংলোর কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে, আবার এই লোহার রড্ দ্বারাই হত্যা করা হইয়াছে, এই রক্ত তার প্রমাণ, আশ্চর্য্য নয় কি? মাপোঁ লোহার রড্ হাতে বাংলোর দিকে আসিয়াছে আর চেংফু সেই সময়ই কোলুনকে হত্যা করিয়াছে, তাও আবার একই যন্ত্রের সাহায্যে।······

তারপর আরও শুনুন, চেং নিশ্চয়ই এ বাগান জানত না। এবং দুর্গম স্থানে একটা জল শূন্য কূপ আছে তাও জানত না, উপরন্তু সে লোহার রড্ কোথা পেল, সে কি ইহা নিজ হইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল, আপনি বলিতে চান যে চেংফুর মত একজন প্রসিদ্ধ বণিক একজন জহুরীর সঙ্গে দেখা করতে ওরূপভাবে সশস্ত্র হইয়া গিয়াছিল।···না, শুধু এই বোঝা যায় ওয়াঙের কথা হয় সত্য নয় মিথ্যা; যদি তার কথা সত্য হয় তবে মাপোঁ হত্যাকারী বা খুনীর সহকারী, আর মাপোঁ সমস্তই জানত, এবং সে এই লোহার রড্ হাতেই আশে পাশে ছিল।

অন্যদিকে যদি ওয়াঙের কথা মিথ্যা হয় তবে, সে নিজেই খুনী।

"বেশ তোমার কথাই মেনে নিলুম, মনে কর তোমার কথাই ঠিক তাহ'লে তুমি বল্‌তে চাও সে খুনী নয়, যতক্ষণ না এই মাপোঁ বা ওয়াঙ্ কাওকে দোষী প্রমাণ না হয়, চেং খালি নিমন্ত্রিত হয়েছিল, সে ইহার কিছুই জানে না, কিন্তু এই চেংফু কোথায়? সে যদি মৃত তবে তার দেহ কোথায়, আর সে যদি খুনই না করবে তবে কেন সে পলায়িত?...

"তার উত্তরও আমি তোমায় বলছি হ্যারি, যে মৃত দেহ আমরা কোলুনের বলে জানি, মনে কর এই মৃত দেহই চেংফুর; কেবল মাত্র কোলুনের পোষাক পরিহিত ছিল, ওয়াঙ্ নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা কহিয়াছে, নয় সে, প্রভুর দেহ সনাক্ত করিতে ভুল করিয়াছে, আমার বিশ্বাস এইই চেংফুর দেহ; কোলুন নিশ্চয়ই জীবিত, হয় সে হত্যাকারী, নয় সে এই ওয়াঙ্ ও মাপোঁর সঙ্গে জড়িত, এই লোহার ডাণ্ডা সম্বন্ধে উভয়েই জানে।...

উপরন্তু এই মাপোঁও কিছুই জানে না, ঘটনাবলী প্রকাশ কচ্ছে যে কোলুন ও ওয়াঙই হত্যাকারী। মনে কর কোলুন ও ওয়াঙ্ উভয়ে চে'কে হত্যা করিয়াছে, তারপর পোষাক বদল করিয়া, মৃতদেহের মস্তক এমনভাবে চূর্ণ করিয়াছে যে তাহা চেনা না যায়, তারপর ওয়াঙ্ পালী চলিয়া গিয়াছে, আর কোলুন ভগবান জানে কোথায়?"

ওয়াঙ্‌এর কার্য্য ছিল পালী যাওয়া, ফিরে এসে প্রভুর দেহ সনাক্ত করা তারপর খুন মাপোঁ ও চে'ফুর ঘাড়ে ফেলিয়া পলায়ন করা, কোলুন এখন মস্ত বড় লোক হইয়াছে, আমরাত তাকে চিনিনা, মাত্র জানি সে অল্প দিন হইল সাংহাইতে আসিয়াছে।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা খেয়াল চাপল, আমি বললাম—"মিঃ হ্যারি, আমরা খুব মস্ত বড় ভুল করেছি, আমরা পদচিহ্ন অস্ত্র অথবা এই জহরত যা এই হত্যার কারণ, কিছুইত অনুসন্ধান করিনি।

যদিও আমাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা জহরতগুলো এক রকম চোখের সামনেই দেখ্‌তে পাচ্ছি, কিন্তু যদি এক টুক্‌রাও এই বাড়ীতে অথবা বাগানে পাওয়া যেত তবে আমাদের কাজে লাগত।"

মনে মনে আমি ভাবতে লাগ্‌লুম, "মনে কর এটা বাংলোয় অথবা বাগানে কোথাও নেই, তাহ'লে কোথায়, যদি বাংলোয় না থাকে তবে নিশ্চয়ই কোলুনের অথবা ওয়াঙ্‌এর কাছে, অথবা এমন কোন স্থানে লুকান আছে যা এই কোলুন বা ওয়াঙ্ উভয়ে জানে।...

কিন্তু এমন কেউ বোকা নেই যে এগুলো কোন স্থানে লুকিয়ে রাখ্‌বে জেনে শুনে যে সে স্থান উদ্ধার করা আবার কত কষ্ট হ'বে।

যাক, হত্যার পর কোলুন কোথায় কি ভাবে আছে তা জানিনা, কিন্তু ওয়াঙ সে কোথায়, তাকেত ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, আমরা জানি সে পালী গিয়েছিল, ফিরে ত এসেছে, পুলিশ তার কাছে সন্দেহের মত এমন কিছু পায়নি। কিন্তু এখন ওয়াঙ্ কোথায়?

"কিহে ব্যাপার কি চুপ করে রইলে যে?"

ব্যাপার কিছু না, আমি তোমার মটর নিয়ে পালি যাচ্ছি, কিছু মনে কর না।" বলিয়া দ্রুত বেগে বাহির হইয়া গেলাম।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি একজন পুলিশ লইয়া পালী উপস্থিত হইলাম। মাত্র দশ মাইল পথ, কিন্তু রাস্তা বড়ই খারাপ, কাজেই বিলম্ব হইতে লাগিল।

আমরা সন্ধ্যার শেষে গিয়ে পৌছুলুম, দেখলুম, সব চীনা জেলে তাদের নৌকোগুলো টেনে ডাঙ্গায় তুলে আপনাপন কুটীরে প্রবেশ কচ্ছে।

একজন লোক আমাকে কোলনের কুটীরে নিয়ে গেল, যা অন্যান্য সব ঘর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত।

বাড়ীর ভিতর ঢুকে ঘর পরীক্ষা করতে লাগলুম, কিছুনা, মাত্র দুখানা ঘর পুলিশের লোক দেখে আর কেও আপত্তি করলেনা, আমি তন্ন তন্ন করে সব খুঁজে দেখলুম, দেওয়াল ছবি, চেয়ার টেবিল, মায় জমি পর্য্যন্ত খুঁজে দেখলুম, কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না, মনটা খুবই দমে গেল, এতটা পথ তবে আসা বৃথায় গেল।

যাক্ তারপর বাইরে বেড়িয়ে এলুম, চাঁদের আলো পূর্ণ মাত্রায়ই ছিল, আমি আস্তে আস্তে বালি খুড়িতে

খুড়িতে দেওয়াল ঘেষিয়া চলিলাম, পেছনের দরজায় যখন গেছি তখন দেখলুম বালির উপর কিছু নীচে একটী সিল্কের ব্যাগ, মনে হ'ল যেন কিছু ভরা।

ব্যাগ খুলে দেখলুম, আটটী মাণিক, চারটী ডায়মণ্ড, দুইটী রুবি, ও বাকী দুটী বিড়ালের চক্ষু, সবগুলিই খুব বড় ও দামী, অবশ্য পরে দাম জানা গিয়েছিল প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা।...

ঐ ব্যাগটীর গলায় একটি কাগজে চীনা অক্ষরে লেখা আছে, "চেংফু." ব্যাগটীর মুখ চারটী লাল ও হল্‌দে সূতায় বাঁধা।

আনন্দে আমি তখন পাগল হ'বার উপক্রম হলুম, মনে মনে বললুম কোলুন, তুমি খুব চালাক ; কিন্তু তোমার থেকেও একজন চালাক আছে, যার নাম, জন্ ষ্টুয়ার্ট, যে সুদূর ইউরোপ থেকে তোমাদের দেশে এসেচে তোমাদেরই মত চালাক লোকদের ঘোল খাওয়াতে...সে প্রথম থেকেই সব বুঝতে পেরেছিল। কে খুনী, কোলুন, এখন দেখবে সে আরও কত চালাক, এতদিন সে কেবল সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কোলুন এইবার তোমার জীবন মরণ সমস্যা !

৭

পরদিনই আমি সাংহাইতে ফিরে এলুম।

তারপর দিন আমি হ্যারির কাছে গেলুম, ঘটনাটা শুনে সে খুবই খুসি হ'ল। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, কি কার্য্য তাকে পালীতে নিয়ে গেল। আমি তখন তাকে সব ঘটনা বেশ করে বুঝিয়ে দিলুম। তারপর তাকে বললুম, প্রথম থেকে এই ওয়াঙ্ আমাদের সন্দেহের চক্ষে ছিল, এমন দেখছি এই ওয়াঙই কর্ত্তা। সে সবই জানে। আচ্ছা ভেবে নেও, কোলুন, হত্যা করে ওয়াঙের হাতে ঐ জহরতগুলো দিয়ে বল্‌লে, পালী যাও এবং এগুলো লুকিয়ে রেখে এসে পুলিশ ডেকে বলবে এই মৃত দেহ আমার। তুমি কি মনে কর তখন কোলুন এটা ভাবে নি সে এই জহরতগুলো ওয়াঙের হাতে ছেড়ে দিয়ে হয়ত সে তা নিয়ে আমাদের কদলী প্রদর্শন করতে পারে।...

অন্যদিকে কিন্তু সবই মিথ্যে, ঘটনাটী এই যে ওয়াঙ্ পালী গিয়ে এগুলো লুকিয়ে রেখে, ফিরে এসে নিজেকে একজন বলে প্রচার কল্লে যেন সে কিছুই জানে না।

কিন্তু হ্যারি বল্‌তে পার, ওয়াঙ্ কে, আর কোলুনটা কে। বা কোথায় ?"

হ্যারি বল'ল—"বোধ হয় এই ওয়াঙ্ ও কোলনকে হত্যা করিয়াছে কাজেই তাহাকে পাওয়া যাইতেছে না।"

এক চোট হাসিয়া লইয়া আমি বলিলাম, "মিঃ হ্যারি, এতদিন পুলিশে কাজ করে দেখছি তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি মোটেই হয়নি, আচ্ছা চল গারদ ঘরে তোমায় দেখাচ্ছি কোলুন কোথায়।" আমরা তখন সবাই মিলে থানায় গেলুম, চেংফুর চাকর, মা পোঁ, চেংফুর কেরাণী সকলকেই তখন থানায় নিয়ে গেলুম, কেননা এরাই কোলুনকে চাক্ষুষ চেনে।

অল্পক্ষণ পরেই ওয়াঙ্‌কে দুই জন পুলিশ সমভি-ব্যাহারে আমাদের সামনে আনা হইল। আমি প্রায় এক ঘণ্টা ওয়াঙ্‌কে দেখলুম। তারপর তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, সে জানে কিনা, কোলুন কোথায়, তখনও সে বলল যে কোলুন মৃত ও ঐ দেহই তাঁর প্রভুর।

আমি তখন তাহার কাছে গিয়ে তার দাঁত দুপাটী বাহির করিয়া লইলাম। সঙ্গে সঙ্গে সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল "কি আশ্চর্য্য কোলুন !"

বুঝলে বাবু চীনারা কত চালাক, ভগবানের সৃষ্টি হ'তেও তারা কাল্পনিক সৃষ্টিতে ওস্তাদ। তারা যদি কোন কুকর্ম্ম না করে মাত্র ভোল বদ্‌লে থাকে ত দুনিয়ায় কেও তাকে সন্দেহ করেনা বা কেও তাকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত চিন্‌তে পাবে না।...

* * * *

যা হ'ক পরে সে সবই স্বীকার করলে। এখন শোন বাবু কেমন করে কোলন এমন কাজ করলে, আর কোলুনের ভোল বদলে গেল, এই কোলুন একজন প্রসিদ্ধ ডাকাত। হংকংএ একে চেনে না এমন লোক নেই। এর কাজ হচ্ছে, ধনী লোকদের সঙ্গে জহুরী সেজে আলাপ করা, তারপর সুযোগ বুঝে বুকে ছুরি বসিয়ে চম্পট দেওয়া। এমনি সে জীবনে অনেক করেছে, কিন্তু ধরা পড়ে সে জীবনে এই প্রথম।

সেখানেও সে সাংহাইতে এসে বাংলো ভাড়া করে, একটা চাকর রাখে, তাকে চেন নাম মাপো। এর সঙ্গে একটা অন্তঃসার শূন্য বড় বাক্স থাকত যাতে তাকে খুব বড় জহুরী বলে ভ্রম হ'ত। খুনের কিছুদিন পূর্ব্বে সে মাপো কে জবাব দেয়, তারপর যখন চাকরের দরকার হয় তখন নিজেই নিজের কাজে লেগে যায়, তখন তার নাম হল ওয়াঙ্।

সে আগে নিশ্চিত জেনে নিয়েছিল যে চেংফু সর্ব্বদাই জহরত নিয়ে চলাফেরা করে, সুযোগ বুঝে সে চেংকে নিজবাটীতে নিমন্ত্রণ করে তারপর হত্যা করে ঐ জহরতের জন্য, এবং সে পায়ও ঐ পূর্ব্বোক্ত জহরতগুলিই তার প্রমাণ। চেংফুকে হত্যা করার পর কোলন পোষাক বদল করে, চেংএর পোষাক কূপে ফেলে দেয়, তারপর ওয়াঙ্ সেজে পালী গিয়ে জহরতগুলো লুকিয়ে এসে পুলিশ ডাকে। নিজে সাধু সেজে মাপোর ঘাড়ে সমস্ত দোষ দেয়। দেখ লোকটা কি ধূর্ত্ত।...

যদি আমি ঘটনাটা না দেখে চুপ করে থাকতুম, তাহলে এই নির্দ্দোষী মাপোর যাবজ্জীবনের জন্য শ্রীঘর বাস হ'ত।

৮

যথাসময়ে বিচারে কোলনের ফাঁসী হয়ে গেল, ফাঁসির পূর্ব্বক্ষণে সে আমায় উদ্দেশ করে বলেছিল—"শুন টিকটিকি তুমি সুদূর দেশ থেকে এসে আমার সাথে বাদ সেধেছ। আমি চল্লুম, কিন্তু তুমি আমার হাত থেকে রক্ষা পাবে না, আমি পৃথিবীর এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তোমার অনুসরণ কর্ব্ব। তারপর সবশেষ।...

বাবু, সেই থেকে আমি এই পঁচিশ বৎসর তার অপেক্ষায় আছি। কত দেশ, কত গ্রাম, কত নগর ঘুরে বেড়িয়েছি কিন্তু এই লোকটার কোনও সন্ধান পেলুম না, জানি সে মরে গেছে, কিন্তু তার আত্মা যে আমায় প্রতিশোধ নেবে বলেছিল; আমি অশরীরি আত্মা খুবই বিশ্বাস করি।...

যাক্ বাবু, তুমি এই লাইনে নূতন ঢুকেছ। অনেক কিছু দেখেছ, আরও কত কি দেখবে, হয়ত এমন কত কি দেখবে। দেখে আমার কথা তোমার মনে হবে।

যখনই কোন কাজ কর্ব্বে ভাল করে আগে ভেবে তবে কর। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।

রাত্রি অধিক হওয়ায় আমি বিদায় লইয়া বাড়ী চলিয়া গেলাম।...

* The tales of the Amayat N: 6 হইতে অনুবাদিত।

"অচিন দোসর"

শ্রীরাসবিহারী মল্লিক।

কি যেন পেয়েছি, কি যেন হারাই,
মনে-মনে আমি হাসি-কাঁদি তাই,
ভাবি কারে নিতি, সে কোন্ অতিথি—,
এই আসে আর এই যে নাই।
মনে মনে আমি হাসি-কাঁদি তাই ॥

করুণ সুরেতে বাঁশী কার বাজে—
তরুণ-অরুণ স্বপনের মাঝে,
ঘুম-ঘুম-ঘুম নয়ন-কুসুম,-
ফুটে মুদে যায়, দিশা না পাই।
মনে-মনে আমি হাসি-কাঁদি তাই ॥

* * * * * *

আঁধারে আঁধারে কে আসে কে যায়
উষার চুমায় কোথায় লুকায়,
খুঁজি সব ঠাঁই খুঁজিয়া না পাই,
প্রাণে প্রাণে তবু তারেই চাই।
মনে-মনে আমি হাসি-কাঁদি তাই ॥

আবহাওয়া

শ্রীবিমল মিত্র

গল্প

(এক)

ঘুমটা চট্ ক'রে ভেঙে গেল।

কাল তো সারা রাত ঘুম হয়নি ভোরের দিকে যা' একটু তন্দ্রা এসেছিল, এমন হঠাৎ ভাঙবে আশা করিনি।

পাশে মায়া তখনও তেমনি অঘোরে ঘুমোচ্ছিল;... বালিশ থেকে মাথাটা নেমে এসে আমারি বুকের কাছে পড়েছিল; মনে হোল মাথাটা তুলে বালিশের ওপর রেখে দি'—কিন্তু যদি ঘুম ভেঙে যায়! চুলগুলো রোদে রেশমি রঙ ধরেছে—গালের ওপর আমার ঠোঁটের দাগ যেন তেমনি স্পষ্ট; ঘুমের ঘোরে আবরণের স্বল্পতা বোধহয় অনুভব করেনি। তাই একান্ত নির্ভাবনার সঙ্গে বালিশটা জড়িয়ে শুয়ে রয়েছে!...বেশ দেখাচ্ছে।

কাল রাতে ও অনেক তর্ক করেছে।...ওর স্বামীর কাছ থেকে ওকে এখানে নিয়ে এসে আমি নাকি খুবই পাপ কাজ করেছি।... যেন ওর এতটুকু ইচ্ছা ছিল না... যেন কেবল আমার জুলুম কিংবা অত্যাচারে ও আমার সঙ্গে চলে' এসেছে!

ও বলছিল—আমার না হয় একটু ইচ্ছে ছিল—কিন্তু তুমি তো পুরুষ মানুষ - বিদ্বান, একটু ভেবে বিবেচনা করে' দেখে তবে আন্‌লে না কেন? দেখ, তখন স্বামী শাশুড়ী আমায় হাজার অত্যাচার করুক—কিন্তু তবু শান্তি ছিল—তখন ছিলুম গেরস্ত ঘরের বউ—আর এখন?...

বললুম—তুমি তো অবুঝ নও মায়া—যখন তা'রা অত্যাচার করতো - তখন সত্যিই তোমার কি মনে হোত বল দিকিনি?, মনে হোত না কি যে যদি তুমি দুর্বল না হ'তে—তা' হলে' ওই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে? এখন অবশ্য একথা স্বীকার নাও করতে পার—কারণ—কষ্টের সময় তা'র নির্মমতা ভীষণ লাগে—আর কষ্ট চলে' গেলেই আর তা' মনে থাকে না—তাই বলছি—তুমিও তো মানুষ—তোমার স্বামীও মানুষ—ভাগ্যক্রমে সে লেখাপড়া শিখে চাকরী করে টাকা আনে—তোমাকেও লেখা-পড়া শেখালে তুমি যে চাকরী করে' টাকা আনতে পারতে না—এমন কথা কে বলবে?—তাই বলে যে সে তোমাকে বিনা অপরাধে কিংবা নামমাত্র অপরাধে অমানুষিক শাস্তি দেবে—এর কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে?...তুমিও কি দেখাতে পার না—তোমারও প্রাণ আছে, অত্যাচার করলে তোমারও লাগে—তুমিও মানুষ!

কতকটা শান্ত হোল;...খানিকক্ষণ নিস্তব্ধতা!... তারপর বললে—কিন্তু তবু সে যে আমার স্বামী—একমাত্র সে-ইত' আমার গতি!

বললুম—সে কথা যদি বল—তাহলে' আমার কিছু বলবার নেই।

ও কাঁদতে লাগলো; কী তুচ্ছ!—মনুষ্যত্বের কাছে যে স্বামী-ভক্তি বড় নয়—এ কথা ওকে কেমন কোরে বোঝাই? পুরানো যুগের শাস্ত্র যে আজকার যুগে অচল—সে কালের প্রথা অনুযায়ী যেমন সে কালের শাস্ত্র গড়া হয়েছিল—একালেও তেমনি কোরে আমাদের যে নতুন শাস্ত্র গড়তে হবে—একথা ওর কুসংস্কার-বদ্ধ মন বিশ্বাস করতে চাইবে কি?

আকাশে চাঁদ উঠেছিল,...জানালার গরাদের ভেতর দিয়ে একফালি আলো এসে পড়েছিল বিছানায়। ওর আধখানা গাল সে আলোয় হীরে হ'য়ে উঠেছে... চোখ্ বেয়ে জল গালের ওপর গড়িয়ে পড়েছিল।... পাশের নিম গাছের ডালে একটা পাখী ডেকে উঠলো;... হয়ত চাঁদের আলোয় হঠাৎ ঘুম ভেঙেছে তাই! নিঝুম্ রাত—গাছের পাতার কাঁপুনি শোনা যায়!...ঘাসে ঘাসে সৃষ্টির স্বপ্ন। নতুন পাতা গজাবার শব্দ কাণ পেতে

শুনি…সারা পৃথিবীময় যেন সৃজনের মহান ষড়যন্ত্র চলছে—অজ্ঞাতসারে। একটা পাখী ডানা ঝাপ্‌টা দিয়ে ছাদের ওপর দিয়ে সাঁই সাঁই করে' উড়ে চলে' যায়। সৃষ্টিদেবতার পেছন পেছন যেন মৃত্যু দূত কালো ছায়া বিস্তার করে' বেড়াচ্ছে!…বাঁচবার তবু কী আগ্রহ!

মায়াকে টেনে নিয়ে বললুম—কিন্তু সত্যি বল মায়া—বিয়ে হবার আগে কখনও কি তুমি স্বামী সম্বন্ধে কল্পনা করনি?…এমনি একজন যে কিনা তোমাকে সবচেয়ে ভালবাসবে—চিরকাল—চিরজীবন—আর তুমিও তা'কে তেমনি প্রতিদান দেবে?

মায়া যেন আরও কাছে সরে' এলো।—মানে—কেনা করে?

বললুম—কিন্তু বিয়ের পর যখন সব কল্পনা মিলিয়ে গেল—তখন কি তোমার সব আশা চলে' যায়নি?—তখন কি মনে হয়নি এ জীবনটা এমনিই যাক্‌—পরজীবনে আবার সব হবে?

ও আমার দিকে বিস্ময়-ভরা চোখে চাইলে।—এতটা সত্যি কথা কি করে' জানতে পালু'ম—ও এই ভাবলে!

বললুম—কিন্তু মায়া পরজীবন কি সত্যিই আছে?…নেই আমার মতে—যদি থাকেই সে যখন আসবে তখন দেখা যাবে—এখন থেকে অনিশ্চিতের জন্যে বর্ত্তমান ত্যাগ করি কেন?—হ্যাঁ-যা' বলছিলুম—বিয়ের আগে তোমার কল্পনা করা স্বামী কি আমি হ'তে পারি না?—বল মায়া। ভুলে যাও—তুমি আর একজনের স্ত্রী;—নতুন করে' তোমাতে আমাতে বিয়ে হবে।…আমার কি ভালবাসার শক্তি নেই?…

মায়া বলে' উঠলো—তা' হতে পারে না গো—তা' যে হয় না। আমিতো ভুলতে পারি না যে আমি গেরস্ত ঘরের বউ ছিলুম—এখন বেরিয়ে এসেছি!—এখন কেউ আমায় দেখতে আসবে না—আমি যে এখন…শতকরা নিরেনব্বুই জন মেয়ে যা'—মায়াও তাই।—তফাৎ যা'—তা' হচ্ছে বেরিয়ে আসবার দুঃসাহস—স্বামীর অত্যাচার সহ্য করবার শক্তির অভাবে।… নইলে ভেতরে ভেতরে তেমনি দুর্ব্বলতা অনুশোচনা! আজ মাস দুই দু'জনে একসঙ্গে বাস করছি…মনের দ্বন্দ্ব ওর আজও ঘুচলো না।… রাতে আমি ঘুমোলেও ও জেগে জেগে কাঁদে!

কথা বলতে বলতে মায়া কখন ঘুমিয়ে পড়লো। তারপর আমিও।…মায়ার চুলগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে দিতে লাগলুম।…রেশমের মত চুলগুলো সিল্কের চেয়েও পাতলা।…মাথার সিঁদুরের দাগটা এখনও জল্‌জল্‌ করছে!

হঠাৎ ঘুম ভেঙেই—যেন চম্‌কে উঠ্‌লো।

বললুম—ওকি চম্‌কে উঠলে যে?

বললে—একটা স্বপ্ন দেখছিলুম—কেন জাগালে?—কি দেখছিলুম জান?—দেখছিলুম—ফুলশয্যার দিন যেন সে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে…আমার তন্দ্রা এসেছে—এমন সময় একটা ভীষণ আওয়াজে যেন ঘুম ভেঙে গেল—তাই আমি চম্‌কে উঠ্‌লুম।—কেন জাগালে?

বললুম—আমিই তো তোমার মাথায় হাত বুলোচ্ছিলুম। শব্দ তো কিছু করিনি।…তুমি বড় বেশী ভেবে ভেবে শরীর খারাপ করছ। এখন ও সব ভেবে কিছু লাভ নেই।—কেন আমরা কি দু'জনে সুখে থাকতে পারি না?…এত টাকা রয়েছে—বাড়ী রয়েছে—কিসের ভাবনা?

ও কোনও কথা বললে না। উঠে বাইরে গেল বললে—চা আনিগে।

বুঝতে পারি না সত্যিই খারাপ কাজ করেছি নাকি? সমাজ হয়ত এ কাজ অনুমোদন করবে না—কিন্তু সমাজের জন্যে তো মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই সমাজ। মানুষের সুবিধা অসুবিধায় ব্যবস্থা বুঝে সমাজ বদলাতে বাধ্য! আমি হয়ত একাজের দায়িত্ব প্রথম নিলাম—হয়ত ব্যর্থ হবে, যা'র জন্যে আমার এত সব—সে তো কই অনুমোদন করে না! আমার আকাশ যে আলোর ধ্যানে রাত্রির অন্ধতাকে বরণ করেছে—সে অন্ধতা যদি চিরস্থায়ী হয়?

দুই

বারান্দায় ইজি-চেয়ারে শুয়ে একটা ছবির বই দেখছিলুম।

দূর আকাশে সূর্য্যের শেষ যাওয়ার ছবি বইয়ের ছবির চেয়ে মুগ্ধকর। একটা বাড়ীর ছাদের পাশ দিয়ে ধোঁয়া উঠেছে। রান্না ঘরের ধোঁয়া। একটা মেয়ে ছাদ থেকে শুকনো কাপড় তুলতে এসে চারিদিকের শোভায় নিজেকে

হারিয়ে ফেল্লো।···দু'মিনিট দাঁড়িয়ে আকাশের দিকটা ভাল করে' দেখে নিলে।—মেয়েটির বোধ হয় বিয়ে হয়নি, মাথায় ঘোমটা নেই! পাশের অশথ্ আছে একটা কোকিল অনবরত ডেকে ডেকে ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো;·· আনন্দেরও ক্লান্তি আছে তা' হ'লে?···মায়া হয়ত এই কথাটা বিশ্বাসই করত না।

মায়া গা ধুতে গেছে; নিজে যেতে চায়নি; আমিই পাঠিয়েছি। কোন কাজটাই বা ও ইচ্ছে কোরে করে! সবই আমায় করিয়ে দিতে হয়। ও যখন ঘুমোয়—পাশের গাছে·কাকের শব্দে পাছে ঘুম ভেঙে যায় তাই নিজে উঠে কাক তাড়িয়ে দিই; ও যখন ক্লান্তি বোধ করে আস্তে আস্তে বিছানায় ধরে' এনে শুইয়ে দিই।

পায়ের শব্দে পেছনে চেয়ে দেখি ও আসছে।·· পেছনে কালো কালো লম্বা চুল পিঠময় ছড়িয়ে পড়েছে··· কপালে সিঁদুরের টিপ্—রঙিন্ কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করেছে—বল্লুম—বোস—মায়া।

একটা চেয়ার টেনে নিজে নিয়ে ওকে ইজি চেয়ারটা ছেড়ে দিলুম!

বাইরের সন্ধ্যার সঙ্গে ওর অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ-শ্রী কি সুন্দর মানিয়েছে! ওর আকাশের আজ সূর্য্যাস্ত নাকি?··· আমি কি ওর বুক চন্দ্রদীপে মহিমময়ী করে' তুলতে পারবো না?...আমার আলো তো আজো ফুরোয়নি!

মায়া বললে—দেখ, সেখানে সারা দিন কাজ করতুম, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট্ দেওয়া, রান্না করা—সব তো আমিই করতুম আর এখানে রাণীর মত বসে' বসে' মন খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে—শরীরও খারাপ হচ্ছে। আমায় কাজ করতে দাও—কাজ না করতে না দিলে আমিতো ভাল থাকব না—চাকর বাকর সব ছাড়িয়ে দাও।

বললুম—কেন মায়া কাজতো অনেক রকম হ'তে পারে—তুমি তো সামান্য পড়তে জান—একটু একটু বই পড় না। আমার কত বড় লাইব্রেরী রয়েছে—বাঙ্লা বইও কত রয়েছে—তোমার যা' ভাল লাগে তুমি পড়তে পারো। ওই গুলোই কি কাজ এগুলো কিছু নয়, চাকর বাকর ছাড়িয়ে দিয়ে কি হবে, তা'রা থাক্ তুমি সমস্ত ব্যবস্থা কর। আসল কথা তুমি ভাবনা ছেড়ে দাও।

ও চুপ করে' রইল।—

রাস্তা দিয়ে গান গাইতে গাইতে এক দল খোট্টা চলে' গেল—আজ হোলি!

চারিদিকে আনন্দ; আকাশে বাতাসে মাটিতে। পথিকদের কাপড়ে লাল রঙ, মাথায় কপালেও তাই। সারা জগৎ আজ একটি দিনের জন্যেও জীবনের দুঃখ দৈন্য বুঝি ভুলতে চায়!—কেবল আমাদের আকাশ আজ বিবর্ণতার বিষাদে ম্লান!

ও খানিক পরে বললে—সত্যি বলছি—আমি সেখানে না গিয়ে বাঁচব না। এখানে থাকলে তুমি আমায় বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।···আমায় সেখানে নিয়ে রেখে এস।

চমকে উঠলাম। একবার বেরিয়ে আবার ফিরে যাওয়া! লোকে বলবে কি? বুঝি—ও সেখানে ফিরে যেতে চায় স্বামীর ভালবাসার জন্যে নয় কেবল সংসারের মিথ্যা মোহে!

বললাম—ফিরে তো যেতে চাইছ মায়া, কিন্তু তোমার স্বামী কি তোমায় আর ফিরিয়ে নেবে?—সমাজের চোখে তুমি তো দোষী! এ অবস্থায় সেখানে যাওয়া কি তোমার ভাল হবে?

ও বললে—বাড়ীর ঝি হ'য়ে থাকবো তা'ও দেবে না? বলব তোমাদের সব কাজ করে' দেব—শুধু বাড়ীতে থাকতে দাও।

বললাম—একই কথা—যা'দের ভয়ে তুমি এখানেও স্বস্তিতে থাকতে পাচ্ছ না—তা'রা তো তোমায় কাছে পেয়ে আরও গঞ্জনা দেবে? দূর থেকে বরং কিছু সহ্য করা যায়—কাছে থেকে সাম্না সাম্নি অপবাদ সে অসহ্য মায়া!

ও চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। পরে বললে—তবু আমায় দিয়ে এস তুমি, আমি সেখানে সেই বাড়ীর মাটিতে মরব।···আমায় সেখানে তুমি দিয়ে আসবে চল।

বলতে পারতাম—সে বাড়ীতে তোমার তো মরবারও অধিকার নেই মায়া—তা'রা এখন তোমার সমস্ত সুখ স্বচ্ছন্দের বাইরে—তুমি যে এখন পর মায়া!

কিন্তু তা' বলতে বাধ' বাধ' ঠেকল! আমি তো ওকে আঘাত দিতে চাই না। বললাম—তোমার এখন বিশ্রাম দরকার মায়া—চল শোবে চল—ঘুমোও। না ঘুমোলে তুমি কেবল ভাববে—ভাবলে তোমার শরীর খারাপ হবে মায়া—আমার কথা একটু শোন।

ওকে বিছানার ওপর শুইয়ে দিয়ে এলাম। ও ঘুমোল। আজ আমার ভাবাচ্ছন্নতা এসেছে! ওকে নিয়ে আর কতদিন এমনি ভাবে কাটাব? আমার জীবনটা এমনি ভাবে ব্যর্থ করে' দিতে তো পারি না। একজনের জন্যে আমার স্বার্থত্যাগ সে আমার দ্বারা হবে না। হ্যাঁ, ওকে আমি ভালবাসি—তা' বলে ওর অভাবে আমি আত্মহত্যা করব না নিশ্চয়ই!

তিন

ও এসে বললে—চল।

ও আজ আমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। ওকে ওর স্বামীর বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েই আমার ওর সঙ্গে সম্বন্ধ শেষ; তবে তাই হোক্। ওর পৃথিবীতে যদি আমার আশ্রয় না থাকে—জোর করে' সে আশ্রয় আমি পেতে চাইনা। অন্যায় যদি আমি করেই থাকি—সে অন্যায়ের তবে আজ শেষ হোক্। ওকে প্রতিশ্রুতি ' ' ওর স্বামীর কাছে ওকে গিয়ে দিয়ে আসব।

ওর পোষাক আজ দেখবার মত। কালো একটা ময়লা আটপৌরে শাড়ী কোথা থেকে আবিষ্কার করে' গায়ে জড়িয়েছে। আর কিছু গায়ে নেই। সিঁথের সিঁদুর যেন বড় বেশি রকমের জ্বলজ্বলে!

বললাম—এতটা বাড়াবাড়ি করবার কোনও দরকার ছিল না মায়া—না আমার জিনিষ আমাকে ফিরিয়ে দিতে চাও!—যদি তাই হয় তা' হলে' তোমাকে বলি—ও জিনিষগুলো এখানে না রেখে রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেলেই তো হোত! ওসবের তো দরকার আমার নেই!

আঘাত দিলাম নাকি?···ও হয়ত এতটা আশা করেনি। কিছু উত্তর না দিয়ে ও চুপ করে' চোখের দৃষ্টিটাও যেন স্বাভাবিক নয়!

সোফেয়ারকে গাড়ী হাজির করতে আদেশ দিলুম।

আমার ক্যাডিলাক্ সবেগে ছুটলো। সন্ধ্যে হয়েছে। চেৎলার একটা গলির ভেতর ওদের বাড়ীটা। রাস্তার গ্যাস এখনও জ্বালা হয়নি। অন্ধকারে সরু রাস্তায় যাওয়াই মুস্কিল। পথের মধ্যে নর্দ্দমার উপর দিয়ে ক্যাডিলাক্ নিঃশব্দে চলল।

আমার হাত স্পর্শ করে' দেখলাম ও কাঁপছে। ভয়ে না সঙ্কোচে?···ওর মুখে মোটে কথা নেই পাথরের মূর্তির মত একপাশে ও বসেছিল। বাইরের দিকে জ্যোতিহীন দৃষ্টি—ওর মাথায় যেন চিন্তার পাহাড়! সে বাড়ী থেকে ও স্বেচ্ছায় বেরিয়ে এসেছিলে সেই বাড়ীতে ও আজ আবার স্বেচ্ছাতেই ঢুকছে, ওর গা হিম! এক মিনিট পরেই যেন ওর ভাগ্য নির্ণীত হবে! আদালতে জজের রায় দেবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে খুনে আসামীর মত ওর মনের অবস্থা! জীবন মরণের সমস্যা ওকে আজ নির্জ্জীব করে' রেখেছে।

কি একটা প্রশ্ন করলাম, ও তা'র উত্তর দিলে না।

বাড়ীর একটু দূরে আসতেই ও গাড়ী থামাতে বললে! থামল।

ও বললে—তুমি চলে' যাও—আমি এটুকুন্ হেঁটেই যেতে পারব।

আমি কিন্তু সত্যিই গেলাম না। অন্ধকারে ও মিলিয়ে যেতেই আমি ওর পেছন নিলাম।

বাড়ীর সামনে এসে ও খানিকক্ষণ চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল!···কিন্তু কি ভেবে আবার ঢুকে গেল!

সন্ধ্যার অন্ধকারে আমি তেমনি দাঁড়িয়ে। এখনও ও বাইরে এল না। মনে মনে অনেক কিছু কল্পনা করতে লাগলুম। ও হয়ত বাড়ীতে ঢুকতেই স্বামীর সঙ্গে দেখা, তারপর স্বামী ওকে দেখে হয়ত চিনতে পারলে না—তারপর যখন চিনলে তখন হয়ত লাঠি নিয়ে মারতে এল। মায়া কি করলে? তারপর কি করলে! হয়ত ওর স্বামীর পায়ে মাথা রেখে বললে—আমায় মেরে ফেল—তাই ভালো!

কিন্তু স্বামীটি তা'কে না মেরে হয়ত রাস্তার বাইরে ফেলে দিতে এসেছে—এই এল বোধ হয়! কিন্তু কই—কারো'র তো সাড়া শব্দ নেই।

বাইরে দাঁড়িয়ে অনেক রকম সম্ভব অসম্ভব কল্পনা করতে লাগলুম—একবার ভাবলুম ও হয়ত আস্তে আস্তে ঢুকছে দেখে চোর চোর বলে কেউ চেঁচিয়ে উঠলো। ঘরের থেকে বেরিয়ে এল ওর স্বামী—এসে ওকে দেখেই চিনতে পারলে! তারপর? তারপর হয়ত···হয়ত··· হয়ত কিন্তু কি যে তা নিজেই কল্পনা করতে পারলুম না।

চারদিকে একটা বীভৎস আবহাওয়া, নিঃশ্বাস বন্ধ



শিল্পী- শ্রীহরেকৃষ্ণ স

প্রতীক্ষায়

করছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা'য়ে ব্যথা ধরে গেল। দূরে সোফেয়ার কি ভাবছে জানিনে; বাবুর এই অস্বাভাবিক অবস্থা ও কি ভাবে গ্রহণ করছে কি জানি!. হেড লাইট নিভিয়ে দিয়ে ও একটা বিড়ি ধরিয়েছে।

শাদা কাপড় পরা কে একজন এদিকে আসছে না? ·· একি এযে মায়া! আনন্দে বলে' উঠলাম—যা বলেছিলাম - তাই তো হোল?

ওর মুখে কিন্তু আনন্দের রেখা, কেন? বললে—আমি যা' বলেছিলুম—তাই হয়েছে; ওদের বাড়ী ঝিএর দরকার ছিল···কাল থেকে কাজে লেগে যাব, চার টাকা মাইনে—খাওয়া পরা! কিন্তু তুমি এখনও দাঁড়িয়ে কেন?

ওর কথায় কান না দিয়ে বললুম—তোমায় চিনতে পেরে কি বললে মায়া?

—চিনতে তো আমায় পারেনি। রাত্তির বেলা এই পোষাকে চিনবে কেন? কাল সকালে আসতে বললে—ভোর ছ'টায়; তার আগে আমায় এখানে হাজির হ'তে হবে। তুমি এখনও দাঁড়িয়ে কেন—যাও! কাল থেকে তো আমি এ বাড়ীর ঝি!

বললুম—আজ রাত্তিরটা না হয় আমার ওখানেই কাটাবে—কাল ভোর বেলা আবার পৌঁছে দিয়ে যাবে।

ও প্রথমটা আপত্তি করেছিল কিন্তু আমার পিড়াপিড়িতে বোধ হয় শেষকালে ব্যথা দিতে চাইলে না। গাড়ীতে ও উঠে এল। এখানে আসার সময় মুখে যে আঁধারের আবিলতা দেখেছিলুম—তা' এখন আলোর উৎফুল্লতায় পরিণত হয়েছে।

গাড়ী চলল; বললাম,—ওরা কিছু তোমায় জিগ্যেস করলে না? কে, কি কর, এই সব?

বললে—হাঁ, বললুম—ভদ্রলোকের মেয়ে অবস্থার বিপাকে প'ড়ে পরের বাড়ী চাকরী করতে হচ্ছে। স্বামী আছে কিন্তু চরিত্রহীন—বাড়ীর বাইরেই তাঁর দিন কাটে।

যাক্—ও তবে সন্তুষ্ট! যে বাড়ীতে একদিন ও বউ হ'য়ে ঢুকেছিল সে বাড়ীতে ঝি-গিরী করতেও যদি ওর দ্বিধা না হয়, তবে—ওর যা ইচ্ছে তাই হোক্! ওকে বাধা দেব না। ওর পৃথিবীতে ওর স্বামী ছাড়া আর কোনও পুরুষ নেই কিন্তু আমার পৃথিবীতে মায়া ছাড়া অন্য নারী অনেক আছে যে!

*

পরদিন ও মাথায় তেল মাখলে না; চেহারাকে যে কত পরিবর্ত্তন করা যায়—তা' ওকে দেখে বুঝলুম! হাতের একগাছা শাঁখা ছাড়া আর কিছু রইল না। ময়লা চিট্ কাপড়—চুল রুক্ষ—গায়ে ময়লা। ওকে যেন আমিই চিন্‌তে পারলুম না। তা'র ওপর যদি ঘোমটা ছায়—অতি পরিচিত জনেরও তা' হলে' ওকে চেনা দুঃসাধ্য হ'য়ে উঠবে!

পরদিন ওকে সেই জায়গায় পৌঁছে দিলাম।

নামবার সময় ও বললে—আমার সঙ্গে কখনও দেখা করতে এস না। আমার নাম এখন থেকে মায়া নয়—সৌদামিনী!

চলে এলুম। কিন্তু খুব বেশী যে দুঃখ পেয়েছিলাম তা' বললে মিথ্যে কথা বলা হবে! আমার ভালবাসা অত সঙ্কীর্ণ নয়; মায়া ছাড়া অন্য নারীও যে পৃথিবীতে আছে এ কথা ভুললে চলবে কেন?

চার

অনেক দিন বাদে—

একটা কাজে আবার মায়াদের গলির ভেতর দিয়ে মোটর চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। সন্ধ্যে বেলা; গ্যাস জ্বালা থাকলেও অন্ধকার যেন অনুভব করা যায়।

ওদের বাড়ীর সামনে এসে যেন চমক ভাঙলো। আলোয় আলো জায়গাটা! সামনে একটা মোটর দাঁড়িয়ে আমার পথরোধ করেছে। আমাকে বাধ্য হ'য়ে থামতে হোল। ওটা না চলে' গেলে আমার যাবার উপায় নেই।

বিবাহ-উৎসব নিশ্চয়ই। মোটরটি ফুলে ফুলময়।··· সবই প্রস্তুত; বর এলেই হয়—বর যাত্রীর দল ভীড় করে' চারদিকে দাঁড়িয়ে।

একটা গভীর ঔৎসুক্য নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলুম। আজ বোধ হয় মায়ার দেখা মিলতে পারে।

বর এল—ওকি? ও যে মায়ারই স্বামী! তবে·

একি দ্বিতীয় পক্ষের ব্যবস্থা নাকি?…বর উঠে বস্‌লেন। পাশে সঙ্গীরূপে আরও দু'তিন জন।

অন্দর মহলের মেয়েরা উঁকি দিচ্ছে। শাঁখের আওয়াজে কর্ণকুহর ব্যতিব্যস্ত; উৎসুক-দৃষ্টি দিয়ে ওদের সকলকে দেখতে লাগলাম। কিন্তু মায়া কই?…অনেক খোঁজার পর দেখি মায়া আড়ালে দাঁড়িয়ে শাঁখ নিয়ে ফুঁ দিচ্ছে! চোকে জল কই?…মুখে অকাল বার্দ্ধক্যের ছায়াপাত হয়েছে এরি মধ্যে!…ওর আনন্দ বিচ্ছুরিত নয়নে কবেকার স্মৃতি হয়ত জাগছে;…সেদিনও তো ও এমনি সমারোহের মধ্যে এ বাড়ীতে নববধূর বেশে এসেছিল!…তা'রই জায়গায় আজ আবার যে আসছে—তা'র ভাগ্যে কি লেখা আছে কে জানে? আজ ও এই কথাই ভাবছে নাকি?

আমার হর্ণ বেজে উঠলো।

বরের গাড়ীর পেছন পেছন আমার ব্যাণ্ডিলাকও চলল!

বংশ-রক্ষার অছিলায় পশুবৃত্তি-চরিতার্থের যে মহা আয়োজন আজ দেখলাম—তাতে বিস্মিত হবার কি আছে?

হিন্দুসমাজে নারীর স্থান

শ্রীচারুপ্রভা দেবী

প্রবন্ধ

সৃষ্টির আদিম কাল হইতে বিশ্বনিয়ন্তা পুরুষ ও নারীর সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরুষ ও প্রকৃতিই হইতেছে সৃষ্টি লীলার মূল উপাদান। অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতি দুয়ের মঙ্গল সমন্বয়ে রচনা হইয়াছে। ক্ষুদ্র পরিবার হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজ, জাতি ও বিশ্বমানবতা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই নারীর স্থান আছে ও দিতে হইবে।

মহামানবতারূপ বিহঙ্গের দুইটি পক্ষ। একটী হইতেছে পুরুষ অপরটী হইতেছে নারী। কাজেই যতদিন মানবতা থাকিবে, জাতি ও সমাজ থাকিবে ততদিন পুরুষকে যেমন আবশ্যক, নারীকেও সমান ভাবেই আবশ্যক হইবে, এ কথা বিশ্বের ইতিহাসে চিরন্তন সত্য। যখন পুরুষ ও নারী দুয়ের সমন্বয় লইয়া সমাজ ও জাতীয়তার সৃষ্টি, তখন ন্যায়ের দিক হইতে পুরুষ ও নারীর স্থান সমান হওয়া উচিত, কিন্তু হিন্দুসমাজের সৃষ্টির প্রথম হইতেই নারীকে পুরুষজাতির সম্পূর্ণ আয়ত্ত্বাধীন করা হইয়াছে। সর্ব্ব প্রকার স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া, তাহাদিগের ন্যায়তঃ প্রাপ্য না দিয়া তাহাদিগকে পঙ্গু করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহার জবাবদিহি আজ পুরুষকেই করিতে হইবে। পুরুষ জাতিই চিরদিন সমাজের আধিনায়কতা করিয়া আসিয়াছে এবং তাহারা সুবিধা লইয়া নারীকে আজ এত কোণ-ঠেসা করিয়া রাখিয়াছে।

বহু শতাব্দী ধরিয়া নারীজাতির প্রতি এই নির্য্যাতনের ফলে—তাহাদিগকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিবার ফলে হিন্দু নারীর স্থান জগতের আসনে এতদূর পিছাইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতার মুক্ত দ্বার তাহাদের নিকট রুদ্ধ, শিক্ষার দ্বার তাহাদিগের জন্য দীর্ঘকাল আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। সমাজ-শাসন তাহাদিগের প্রতি দীর্ঘকাল ধরিয়া নির্য্যাতন করিয়া আসিতেছে। মনুষ্যত্ব পরিপুষ্ট হইবার ও জ্ঞানার্জ্জন করিবার যতগুলি উপায় আছে প্রায় সবগুলিই তাহাদের নিকট অবরুদ্ধ রাখা হইয়াছে। এখন তাহাদিগকে জগতের অন্যান্য সভ্যজাতির পারগতা ও জ্ঞানগরিমার মাপকাঠিতে বিচার করিতে গেলে কি তাহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে না?

বর্ত্তমানে এই মরণাপন্ন হিন্দুজাতি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছে যে, নারীজাতি তাহাদের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া বসিয়াছ,—যদি একথা সত্য হয় তবে তাহার জন্য দায়ী কে? পুরুষগণ দায়ী নহে কি? নারীজাতিকে পঙ্গু করিয়াছে কাহারা? তাহাদের

মনুষ্যত্বকে এমন করিয়া পিষিয়া মারিয়াছে কাহারা? এখন যে নারীজাতি একটা অবহনীয় বোঝা হইবে ইহা কি অস্বাভাবিক?

এতকাল ধরিয়া নারীকে কেবল পুরুষের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উপাদান বলিয়াই মনে করিয়া আসা হইয়াছে। এতদিন নারী কেবলমাত্র ভোগের ইন্ধন যোগাইয়া আসিয়াছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কাহারও ভাবিবার অবসর আসে নাই যে, ইহাই পুরুষ ও নারীর মধ্যে স্বাভাবিক ও সহজ সম্বন্ধ নহে। পুরুষ ও নারী উভয়ের গোপন অন্তরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যের সুর আছে। সেই সুরই পুরুষ ও নারীর মধ্যে সহজ ও সরল সম্বন্ধ স্থাপন করে, আর সেই সম্বন্ধই হইতেছে চিরন্তন। পুরুষের সাধারণ ধর্ম্ম ও তাহাদের যে জগৎ আছে তাহা নারীর জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। দুই জনেরই দুইটী পৃথক প্রাচীর ঘেরা রাজ্য আছে। একজনের অপর জনের রাজ্যে যাতায়াতের কোন সুগম পথ সমাজের অধিনায়কগণ রাখেন নাই, রাখিবার আবশ্যকতাও মনে করেন নাই। যতই সুদৃঢ় প্রাচীরের সৃষ্টি করিয়া পুরুষ ও নারীর রাজত্বকে পৃথক করিয়া দেওয়া হউক না কেন, উভয়েরই অন্তরতম স্থলে যে একটী সামঞ্জস্যের সুর আছে, একথা কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না। পুরুষের পুরুষত্বের বিশেষত্ব ভিন্ন তাহার সাধারণ ধর্ম্ম হইতেছে সে মানুষ; নারীরও নারীত্বের বিশেষত্ব ভিন্ন তাহার সাধারণ ধর্ম্ম হইতেছে সে মানুষ। কাজেই পুরুষ ও নারীর মধ্যে মনুষ্যত্ব রূপ সেতু যে মহা সাম্যের সুর বহাইয়া দিয়াছে, সে সুরকে অস্বীকার করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির সুবিধার জন্য পুরুষ ও নারীর মাঝখানে যে অস্বাভাবিক প্রাচীরের সৃষ্টি করিয়া একের অন্য হইতে বিভিন্ন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, একের চিন্তাধারাকে অন্যের চিন্তাধারা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে, একের জগতকে অন্যের জগৎ হইতে বহুদূরে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে—ইহা কি স্বাভাবিক? —ইহা কি সত্য? - ইহা কি চিরন্তন?

পুরুষ ও নারীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আছে এ কথা সত্য, কিন্তু তবুও ইহাদের মধ্যে সহজ ও সরল সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। নারীকে শুধু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উপকরণ এবং ভোগ ও বিলাসিতার আসবাবের মত দেখিলে চলিবে না। তাহাদের ভিতরের মনুষ্যত্বকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে, চিন্তাধারাকে পরিপুষ্ট করিতে হইবে; বাহিরের জীবন, যাহা প্রায় আমাদের দেশে শুধু পুরুষদেরই এক-চেটিয়া সেখানেও তাহাদিগকে স্থান দিতে হইবে।

নারীর কথা ও নারীর জগতের কথা মনে করিলে আমাদিগকে শুধু গৃহের নিভৃত কোণের চিত্র দেখিতে হয়। হাতা বেড়ী খুন্তি সম্মার্জ্জনী তাহাদের জগতের উপাদান ও ঘৎকন্নার কথা—তাহাদের চিন্তাধারা। এই যে গণ্ডী, ইহার বাহিরে যাইবার অধিকার তাহাদিগের নাই। ইহা কি নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ? গৃহের নিভৃত প্রাঙ্গণে ও গৃহকর্ম্মের গণ্ডী ছাড়াইয়া কি নারীর চিন্তাধারা বাহিরে যাইবার উপযুক্ত নহে?

এতদিন ধরিয়া আমাদের দেশে যে পুরুষ ও নারীর মিলন হইয়াছে সে শুধু অন্ধকারের মধ্যে, প্রয়োজন ও প্রবৃত্তির তাড়নায়। এই যে মিলন, ইহার মূলে শাস্ত্রকার-গণের ভাষায় কোন আধ্যাত্মিক ভাব থাকিলেও আমরা বলিব, সে মিলন এতদিন ধরিয়া পুরুষের মনে একটা অস্বাভাবিক হীন ধারণা সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, পুরুষ প্রভু আর নারী দাসী। পুরুষ ও নারীর মধ্যে সহজ ও সরল মিলন চাই। তাহাদিগের অবরুদ্ধ চিন্তাধারাকে স্বাধীনতা দিতে হইবে। বাহিরের মুক্ত আলো ও বাতাসে তাহাদিগকে অবাধ গতি দিতে হইবে। পুরুষ ও নারীর মধ্যে যখন চিন্তাধারার আদান-প্রদান হইবে, ভাবের বিনিময় চলিবে, কর্ম্মজগতে উভয়ে যখন পাশাপাশি চলিতে পারিবে, তখনই আসিবে তাহাদের মধ্যে প্রকৃত মিলন।

"পুরুষ মনময় আর নারী হইতেছে প্রাণময়।" পুরুষ ভাব, চিন্তাধারা inference ও theoryর মধ্য দিয়া সত্যে উপনীত হয়, আর নারী প্রাণের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও অনুভূতির মধ্য দিয়া সত্যে পৌঁছায়। পুরুষ শুধু সংলগ্ন চিন্তা ও ভাব লইয়া ব্যস্ত, নারী কিন্তু প্রাণের অনুভূতি দিয়া সে ভাব যাচাই করিয়া একেবারে fact এ পরিণত করে। পুরুষ চায় ভাব, আর নারী চায় অনুভূতি, পুরুষ চায় theory আর নারী চায় fact।

কাজেই কর্ম্মজগতে নারীর স্থান পুরুষের অপেক্ষাও উপরে। পুরুষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ও লুক্কায়িত শক্তি ও প্রতিভা পূর্ণভাবে বহিঃপ্রকাশের প্রেরণা পায় নারীর মঙ্গলময় স্পর্শে। কর্ম্মে নারীই প্রেরণা আনিয়া দেয়। জলকে যখন যে পাত্রে রাখা যায় সেই পাত্রের আকার ধারণ করে নারীও তেমনি পুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া পুরুষেরই স্বভাবকে প্রতিফলিত করিয়া নিজেকে গঠন করিয়া লয় ও প্রাণময় সত্বার সহজ ও স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ দ্বারা পুরুষের মধ্য দিয়া কর্ম্ম রচনা করে।

এতক্ষণ আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ব্যক্তিগত জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া মহামানবতার মধ্যে নারীর স্থান কোথায়, নারীর সহিত পুরুষের কি সম্বন্ধ? এখন আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব, নারীকে হিন্দুসমাজ কোথায় স্থান দিয়াছে।

হিন্দু-সমাজপতিগণ নারীকে যাচাই করিবার জন্য নারীর পবিত্রতা ও সতীত্ব রূপ যে কষ্টিপাথর আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই কষ্টিপাথরের কৃপায় পুরুষরা এতকাল ধরিয়া নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মম্ভরিতা বজায় রাখিয়া বেশ আরামে কাটাইয়াছেন। কিন্তু এখন আর তাহা চলিতেছে না, কারণ কষ্টিপাথরের জুয়াচুরি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। কষ্টিপাথরের দোহাই দিয়া খাঁটী সোনাকে মেকি বলিয়া নাস্তানাবুদ করিবার সময় আর নাই। এখন যে যেমন জিনিষ তাহার তদনুরূপ দর দিতে হইবে। নারীর কথা উঠিলেই সমাজের নেতাগণ অমনি বিচার করিতে বসিলেন, কোথাও কোন মুহূর্ত্তে সমাজের দেওয়া পর্দ্দা বাহিরের মুক্ত বায়ুর দোলনে সরিয়া গিয়াছে কিনা—যদি সামান্য বায়ু-প্রবেশের পথ দৃষ্ট হইয়া থাকে তবেই সর্ব্বনাশ, অমনি নারীর ভাগ্যবিধাতা তাহার গায়ে পতিতার ছাপ দিয়া দূরে, বহুদূরে ঠেলিয়া দিলেন! সেখানে সমাজের সহানুভূতি পৌছায় না, আত্মীয় স্বজনের স্নেহমমতা নাই, এমন কি মাতাপিতার স্নেহ-ভালবাসাকেও সেখানে যাইবার হুকুম সমাজ দেয় নাই।

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে দিন দিন যে পতিতার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহার জবাবদিহি ন্যায়ের দিক হইতে দেখিতে গেলে পুরুষগণকেই করিতে হইবে। পুরুষরাই নারীজাতির সম্মুখে প্রলোভনের পসরা সাজাইয়া ছলে বলে কৌশলে তাহাদিগকে ভোগের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায় এবং তাহাদের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে। দুই দিন পরে বাসি ফুলের মত তাহাদিগকে ঘৃণা ও অবহেলার সহিত দূরে নিক্ষেপ করে। যদি পুরুষগণ নারীজাতিকে শুধু ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির খোরাক বলিয়া লইয়া থাকে, তবুও দুই দিন ভোগের পর তাহাদিগকে এমন ঘৃণা ও অবহেলা করিয়া সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার ও দূরে সরাইয়া দিবার অধিকার কোন্ ন্যায়ের বিধানে আছে? লাত সহস্র হিন্দু-নারী যে পুরুষদের লালসার আগুনে ইন্ধন যোগাইতেছে ও ভোগের উচ্ছিষ্ট স্বরূপ পরিত্যক্ত হইতেছে, তাহার জন্য সমাজ কি কোন মুহূর্ত্তে ভাবিবার অবসর পাইয়াছে?

সমাজপতিগণ পতিতার গন্ধমাত্র পাইলেই নাসিকা কুঞ্চন করিয়া খবরদারি করিতে আরম্ভ করেন ও সতীসাবিত্রী প্রভৃতির নজির আওড়াইয়া প্রাচীরের উপর প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া সমাজ হইতে তাহাদিগকে ছাটিয়া দেন। সমাজপতিগণ কি কখনও ভাবিবার অবসর পাইয়াছেন, তাহাদের এ অবস্থা করিবার কারণ কাহারা? তাঁহারা কি ভাবিয়াছেন, কাহারা তাহাদের চোখে ধূলা দিয়া কিম্বা বলপূর্ব্বক তাহাদের নারীত্বের অবমাননা করিয়াছে ও নির্য্যাতন করিয়াছে?

বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে যাহারা পতিতা ও হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে হিসাব করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব, তাহাদিগের মধ্যে কয় জন মাত্র স্ব-ইচ্ছায় ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য নারীত্বকে হীন করিয়াছে। বার আনা কিম্বা তাহারও বেশী সংখ্যা নারীকে নষ্ট করিয়াছে পুরুষগণ তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। নারীজাতি সাধারণতঃ হীনবল। পুরুষদের চাতুরি, প্রলোভন ও নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহাদের স্বাতন্ত্র ও নারীত্বের গৌরব কত কাল অক্ষুন্ন রাখিয়া চলিতে পারে? যদি কোথাও একটু অসাবধান হইয়া পড়িল কিম্বা কোথাও একটু দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইল, আর রক্ষা নাই; তাহাকে ছাড়িয়া কথা কহিবার পাত্র পুরুষেরা নহেন। মানুষকে যেমন হিংস্র জন্তুর বিরুদ্ধে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া চলিতে হয়, তেমনি আমাদের সমাজেও নারীজাতিকে পুরুষদের ভয়ে সর্ব্বদা সাবধান হইয়া চলিতে হয়। কোথাও যদি একটু সুবিধা পায় তবে আর শিকারীদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবার যোটী নাই।

নাম-মহিমা

চিত্র

শ্রীবিমলা দেবী

বড় মেয়ের নাম সিক্তা, ছোটটির রিক্তা, খোকার নাম নীরব।

মা বাপের অদূরদর্শিতা ছিল!

সিক্তা চব্বিশ ঘণ্টা কেবলি কাঁদে, কারণে অকারণে, আঁখি-পল্লবের সিক্ততা আর ঘোচে না কিছুতেই।

রিক্তার রিক্ততার ঠেলায় মা অস্থির, মায়ের সঞ্চিত খেলনা, খাবার, কাপড়, জামা, বাপের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই তার হস্তগত হ'তে এবং পর মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হ'তে বিলম্ব হয় না!

মা বলেন—"মেয়েটা কি ডোকলাই' হয়েছে।"

নীরবের কণ্ঠস্বর, গৃহ সংযুক্ত প্রাচীরের উপর বিশ্রাম লাভার্থী বায়সকেও হার মানায়।

দিনে রাত্রে তার সুর সাধনার বিরাম নেই!

পাশের বাড়ীতে থাকেন হরিচরণবাবু, তাঁর স্ত্রী, বড় ছেলে কেষ্ট, ছোট মেয়ে টেঁপি।

সিক্তার মায়ের সঙ্গে টেঁপির মার সই পাতান; ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

রান্নাঘরে কাজ করতে করতে বেরিয়ে এসে রাগ করে টেঁপির মা ডাকেন—"টেঁ—পি—ই—!"

সিক্তার মা তখন নীরবকে চুপ করাবার ব্যর্থ চেষ্টায় স্তুতি জুড়ে দিয়েছেন "দেখ নীরব, তোমার মত লক্ষ্মী ছেলে কি আর আছে—"

উঠানের আস্তাকুড়ে খাদ্য সংগ্রাহক কাক হার মেনে মাঝে মাঝে ডাকে—"কা—!"

আফিসের কাজ পড়েছিল বেশী, সিক্তার বাবা স্নান করে এসে ব্যস্ত ভাবে ডাক দিলেন—"ওগো, ভাত দিয়ে যাও, শীগগির, বড্ড দেরী হয়ে গেছে।"

—"এই যে যাই, তোমার কামিজটার বোতামটা লাগিয়েই যাচ্ছি।"

—"ও থাক গে, বড্ড দেরী হয়ে গেছে; রান্না হয় নি?"

—"রান্না হ'বে না কেন, কবে হয়ে গেছে। ও সিক্তা, সিক্তা, একটা ঠাঁই করে দে ত। কি হ'ল—"

একটা বিকট কর্ণবধিরকারী কোলাহলে, দুজনেই ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন।

সম্মুখেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তাতে কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই সমস্ত ভুলে নির্ব্বাক স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলেন! রান্নাঘরের দুয়ার হাট করে খোলা; চৌকাঠের কাছে বসে নীরব সরবে কোলাহল জুড়ে দিয়েছে, পরাজিতা সিক্তা মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে অশ্রুর বন্যায় দুকূল ভাসিয়ে চলেছে; আর রিক্তা একান্ত মনোযোগ সহকারে হেঁসেলে ঢুকে জননীর প্রস্তুত মাছের বড়ার পাত্রখানি রিক্ত করতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছে; সঙ্গে ভোলা কুকুরটাও আছে!

ধাতস্থ হয়ে সিক্তার মা চড় উঁচিয়ে ছুটে এলেন, ভোলা কুকুরটা অকস্মাৎ জবাবদিহির শঙ্কায়—"কেঁউ" করে একটা শব্দ করেই ছুটে বেরিয়ে গেল।

রান্নাঘরে মায়ের তর্জ্জন গর্জ্জন ও ছেলেমেয়েদের ক্রন্দনের উচ্চ কলরোলে যেন বিপ্লব বেধে গেল।

সিক্তার বাবার মুখ দিয়ে কোন কথাই ফুটল না, বড় সাহেবের রক্ত চক্ষু চোখের সম্মুখে নৃত্য করে উঠল; তিনি হতাশ ভাবে রোয়াকের উপর বসে পড়লেন।

হরিচরণবাবু আফিসে যাবার জন্তে বেরিয়েছিলেন, সহসা কোলাহল শুনে প্রতিবেশীদের বিপদাশঙ্কায় তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন। ব্যাপার জানতে বিলম্ব হ'ল না; হরিচরণ খানিকক্ষণ অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলেন, পরে একটা বিষম খেয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বল্লেন—"তখুনি বলেছিলাম মশায়, নাম গুলো বদলে রাখুন।"

ভারতে আর্য্যরমণীর সভ্যতা

৺রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ

প্রবন্ধ

ভারতের বৈদিক যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভারতে রমণীগণের সভ্যতা অতুলনীয় ও অনুকরণীয় ছিল! রমণীরা তখন কেবল সন্তান প্রসব ও সন্তান পালনকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন না। তখন একান্নবর্ত্তী পরিবার রমণীরাই রক্ষা করিতেন। ঋষি যুগেও আমাদের নারীগণের এইরূপ অবস্থাই ছিল। ভারতের উত্তর, পশ্চিম, দক্ষিণ, পূর্ব্ব সর্ব্বত্রই ঋষি-প্রভাব বর্ত্তমান ছিল। পৌরাণিক যুগেও আমরা কম সম্পদশালী ছিলাম না। রামায়ণে আমাদের সীতা, মহাভারতে আমাদের কুন্তী, দ্রৌপদী, দময়ন্তী, চিন্তা কাহাকেও বাদ দিলে চলে না। বশিষ্ঠ পত্নী এক সময়ে বহু অতিথির স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পরিতোষ রকমে সেবা করিয়াছেন। কলিযুগে এ সকল উপন্যাসের রূপকথার ন্যায় দাঁড়াইয়াছে। তৎকালের রমণীগণের বিলাস-ভূষণ ছিল না। সধবার চিহ্নটুকুই তাঁহারা গৌরবের মনে করিতেন।

ঋষিদিগের ঘর-গৃহস্থালীও ছিল, তাঁহারা ছাত্র পড়াইতেন, বনজাত ফলমূলাদি আহার করিয়া তুষ্ট থাকিতেন। তপস্যা তাঁহাদের আদরের ও সাধনার ধন ছিল। রমণীগণ তৎকালে ঋষিগণের সহায় ছিলেন। স্বামীর জন্য সীতা, দময়ন্তী, চিন্তার কষ্টের কথা ভাবিয়া দেখ। এমন নারী কি পৃথিবীর কোন দেশে জন্মিয়াছে? সীতার জন্য লঙ্কা দগ্ধ হইল, দময়ন্তী স্বামীহারা হইয়া বনে বনে ঘুরিলেন, চিন্তার কথা চিন্তা করিলে তাঁহাকে দেবীর আসনে বসাইতে হয়। শৈব্যা কি স্বামী হরিশ্চন্দ্রের জন্য কম দুঃখ ভোগ করিয়াছেন?

রমণীর সভ্যতার জন্য ভারত চিরদিন প্রসিদ্ধ। আজিও রমণীগণ পুরুষের ধর্ম্মকার্য্যে সহায়। সস্ত্রীক হইয়া এখনো ধর্ম্ম কার্য্য করিতে হয়। তাই স্ত্রী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী। পুরুষের ধর্ম্মভাব এখন আর নাই, ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন আমাদের রমণীগণ। পুরুষের অন্তঃপুরের রাণী রমণীরাই, অন্তঃপুর রাজ্য তাঁহারাই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। আর্য্যরমণীগণের পূর্ব্বাদর্শ এখনো জগতে বিদ্যমান রহিয়াছে। এ দেশ সতীর দেশ, এখনো সতী রমণীর অভাব হয় নাই। ভারতের সতীদাহ এখন না থাকিলেও, দেশ হইতে সতীর উচ্ছেদ সাধন হয় নাই। সতীর আদর্শ লইয়া ভারতের রমণী-চরিত্র গঠিত হইয়াছে। ভারতরমণীর সতী-চরিত্র জগতে দুর্ল্লভ বস্তু, এ জিনিষ ক্রয় করিবার নহে; এ জিনিষ ভোগ করিবারই। প্রাচীন আদর্শে ভারতের রমণী চরিত্র গঠিত হইয়াছে। পুরুষ পরিবারের রাজা আর রমণী সে পরিবারের রাণী। এমন রাণী জগতে দুর্ল্লভ, কোন রাজ্যে এ জিনিষ খুঁজিয়া পাইবে না। আমাদের আদর্শ চরিত্রের রমণীরা কলঙ্কিনী নহেন, তাঁহারা যে জগতপূজ্যা, দেবীস্থানীয়া। দেবী পূজিবার জন্য আমাদের গৃহের বাহিরে যাইতে হয় না। আমাদের গৃহের রমণীরা জননী হইবার জন্য তেমন ব্যস্ত নহেন, তাঁহারা দেবী হইতে চান, দেবী হইয়া তাঁহারা জগৎ পূজ্যা হইতে চান। এরূপ আদর্শ রমণী জগতে আর কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না। এ যে আমাদের স্বর্গভূমি।

বর্ত্তমান যুগে মেয়ের বিবাহেতে যেরূপ পণ ও ব্যয় বাড়িয়াছে, অনেকে তাই মেয়েদের হতাদর করেন, উচিত শিক্ষা দানে বিরত থাকেন, কিন্তু এই মেয়ে যখন গৃহিণী সাজিয়া দেবী হইবে তখন আমাদের গৃহ তাহারাই আলো করিবে। প্রাচীন আদর্শকে আমরা এখনো ঠেলিয়া ফেলি নাই। সেই আদর্শে রমণীগণকে শিক্ষিতা কর, গৃহ উজ্জ্বল হইবে। সেই মেয়েই আমাদের গৃহে জননী হইয়া গৃহ আলো করিয়া জগত পূজ্যা হইয়া উঠিবে, সতী সাবিত্রীর ন্যায় তাহারাই আমাদের

মুখোজ্জ্বল করিবে। আজ কিনা আমরা এসব ভুলিয়া গৃহজাত মেয়েদের অবহেলা করি। আমাদের এ সংকীর্ণতা কবে দূর হইবে? যেদিন নারীজাতিকে মর্য্যাদার চক্ষে দেখিব সেদিন আমাদের সমাজ উন্নত হইবে। আমরা মাতৃজাতির সম্মান, মর্য্যাদা রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের অধঃপতন অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে।

নারীশক্তি জাগ্রত না হইলে আমাদের দুর্গতি দূরীভূত হইবে না। কবি বলিয়াছেন "না জাগিলে সব ভারত ললনা এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।" ফলেও দেখা যায় ভগবতী দশ হস্তে প্রহরণ লইয়া, জাগ্রত হইয়া অসুর বধ করিয়া পৃথিবী রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহা হইল সত্যযুগের কথা, ত্রেতাতে সীতা রাবণ বধে রামের সহকারী ছিলেন, লক্ষ্মণ তাঁরই বলে বলীয়ান হইয়া সূর্পণখার অপমান করিয়াছিলেন, দ্বাপরে দ্রৌপদী অর্জ্জুনাদির সহচরী হইয়া কুরুক্ষেত্র মহাসমর ঘটাইয়াছিলেন! কলির কথা ভাবিলেও মনে হয় রাণী লক্ষ্মীবাই, দুর্গাবতী প্রভৃতি যে বীরত্ব দেখাইয়া ভারতের নারীশক্তি জাগ্রত করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস এ যুগে আমাদিগকে জাগাইয়া রাখিবে।

অতএব আমাদের মাতৃজাতি নারীকুলকে তদ্রূপ শিক্ষা দান কর, যাহাতে তাঁহারা বীরত্বে শক্তিশালিনী হন। নারীর জাগরণে আমাদের শক্তি জাগ্রত হইবে। আমাদের গৃহে তদ্রূপ শিক্ষার ব্যবস্থা কর, যাহাতে বীরত্বে বালিকাগণ বুক ফুলাইয়া চলিতে পারে। বালিকাদিগকে গৃহে রাখিয়াই উপযুক্ত শিক্ষা দান করিতে পারা যায়। শৈশব হইতে তাহাদের হৃদয়ে সত্যের বীজ বপন কর; রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক যুগের আদর্শ রমণী-চরিত্র কাহিনী শুনাইয়া তাহাদিগকে তদ্রূপ চরিত্রে গড়িয়া তোল। মাতৃজাতিকে এইভাবে শিক্ষিতা করিলে—এইভাবে গড়িয়া তুলিলে দেশের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। মাতৃশক্তির উদ্বোধনে নূতন ভারত গড়িয়া উঠিবে—ইহা আজ আমাদের ভাবিবার দিন আসিয়াছে।

বিবাহ-বিচ্ছেদ

আলোচনা

শ্রীবিমল মিত্র

হিন্দু সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ কোনও কালেই ধর্ম্মসঙ্গত নয়। সম্প্রতি কলিকাতায় বাঙ্গালী মহিলাদের একটি অধিবেশনে কিন্তু এই বিষয়টি আলোচিত হইয়াছিল এবং ইহাকে স্ত্রীলোকের সাধারণ অধিকার তালিকাভুক্ত করা হইয়াছিল। যাই হউক্ অধিক ভোট না পাওয়াতে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নাই। তথাপি বিস্ময়ের বিষয় এই যে প্রায় ৫০ জন মহিলা ইহার স্বপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন'।

কিন্তু বিষয়টি তেমন তাচ্ছিল্যের নয়। কারণ ইহার স্বপক্ষে এখন অনেকে ওকালতি করিতেছেন—তাই পত্রান্তরে (Statesman) এই সম্বন্ধে যে কয়েকজন খ্যাতনামা মহিলার মতামত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠকপাঠিকা বর্গের অবগতির জন্য আমারা এখানে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

নিম্নলিখিত মতাবলী পড়িয়া সহজেই বুঝা যাইবে যে সকলেই যদিও এই সম্বন্ধে কোনও খোলাখুলি মত

দিতে দ্বিধা করিয়াছেন তথাপি সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে হিন্দু মহিলাদের বর্ত্তমান অবস্থা এমনি দাঁড়াইয়াছে যে কোনওরূপ সংস্কারের প্রয়োজন অপরিহার্য্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "সিনেট"র সভ্য মিসেস্ পি, কে, রায় এইরূপ মত দিয়াছেন :—

"আমার পক্ষে বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে কোনও নির্দ্দিষ্ট মত দেওয়া শক্ত। প্রাচীন কালের বিধি নিষেধ ইত্যাদি হিন্দু রমণীকে স্বভাবতঃই বিবাহ-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। কিন্তু শতাব্দীব্যাপী প্রথা, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সামাজিক গঠন ইত্যাদিই এই সমস্ত বিধিনিষেধের মূল।

কিন্তু এখন হিন্দু-সমাজ আরো বহুদূর আগাইয়া আসিয়াছে। সেকালের "গৌরী দান" প্রথা আজ সার্দ্দা আইনে আসিয়া ঠেকিয়াছে। আজকালকার সমাজে এমন অনেক উদাহরণ দেখা যায়, যেখানে কন্যাদের কুড়ি এমন কি পঁচিশ বৎসরে পাত্রস্থা করা হইতেছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু মহিলারা সত্যই বিশ্বাস করিতেন যে লেখা পড়া শিখাইলে স্ত্রীলোক বিধবা হইয়া যায়।

আজকাল অনেক সংসারে শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীরা তাঁহাদের নূতন গ্রেজুয়েট পুত্রবধূদের লইয়া গর্ব্ব করেন। সুতরাং যখন সামাজিক প্রথা অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তখন বিবাহ এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কেও কিছু পরিবর্ত্তন দরকার একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেনা।

পুরাকালে সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে প্রতিপালিত আট দশ বৎসর বয়স্ক কন্যার পক্ষে অত্যাচারী স্বামীর দুর্ব্যবহার সহ্য করা সম্ভব হয়ত হইত কিন্তু আধুনিক কালে একটি শিক্ষিতা বালিকার কাছে নিষ্ঠুর মাতাল এমনকি ধনী স্বামীরও অত্যাচার অসহ্য।

আজকাল চারিদিকে "সমান নৈতিক অধিকারের" যে দাবীর কথা শুনা যায় তাহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে আধুনিক হিন্দু স্ত্রীলোকের মনের অনেক উন্নতি সাধন হইয়াছে। উল্লিখিত দাবীর বিরুদ্ধে আমি কখনই নহি এবং ইহা স্বীকার্য্য যে কোনরূপ পরিবর্তন কিংবা পুনর্ব্যবস্থা দরকার। কিন্তু কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে আমাদের চতুর্দ্দিক ভাল করিয়া বিবেচনা করা উচিত।

ভারতীয় নারীর কতকগুলি প্রধান বৈশিষ্ট্যের উপর আমি খুব আস্থা স্থাপন করি। তাহাদের আত্মত্যাগ, সহনশীলতা, মাতৃত্ব বৃত্তি ইত্যাদি অতুলনীয়। হইতে পারে ঐ গুণগুলি পূর্ব্বকালের অমানুষিক কঠোর অত্যাচারের ফলস্বরূপ, কিন্তু তথাপি ওগুলি গুণ পদবাচ্য এবং ভাবিয়া দেখিলে ওগুলির দার্শনিক ব্যাখ্যা মিলে। বিশেষতঃ ওই গুলি বিবাহ-বিচ্ছেদ আইন দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলে কি ফল প্রসব করিবে এবং উহার দ্বারা কতদূর সুবিধা হইবে সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

যদি এমন কোনও বিবাহ সম্বন্ধীয় আইনের সংস্কার হয় তাহা হইলে তাহা জাতির প্রকৃতিগত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। হিন্দু মহর্ষি পরাশর পাঁচটি কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের সম্মতি দিয়াছেন। সেই গুলি ও আবশ্যকমত আরও কতকগুলি যোগ করিয়া এই সংস্কার সাধন করিতে হইবে নতুবা আদালতের সাহায্য লইয়া সমাজের বুকে কলঙ্ক লেপন করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদ না হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত। প্রবৃত্তি চরিতার্থতা ও তাহাদের স্বাভাবিক কোমলতা ও প্রতিষ্ঠা নষ্ট করাই যদি স্ত্রী-স্বাধীনতার অর্থ হয় তাহা হইলে সে স্বাধীনতা আমরা চাই না। পুরুষ ও নারী উভয়ের পক্ষেই "সমান নৈতিক অধিকার ভাল— কিন্তু তাহা যেন "সমান পাশবিক অধিকারে" রূপান্তরিত না হয় তাহা দেখা কর্ত্তব্য।

কবি শ্রীমতী ইন্দীরা দেবী এই মত দিয়াছেন :—

আমার পাশ্চাত্য শিক্ষা সত্ত্বেও আমি এই সম্বন্ধে মনে প্রাণে এখনও ভারতীয়ই আছি। কিন্তু এ কথাও স্বীকার না করিয়া পারিতেছি না যে দুরূহ দুর্গম পথে সহযাত্রী যদি শত্রুর মত ব্যবহার করে অন্য যাত্রীটির পক্ষে সহযাত্রীর সঙ্গ, যে কোন প্রকারে এমন কি কৌশলেও ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু সেই ত্যাগ করার স্বাধীনতার সর্ত্তগুলি কিন্তু সুলভ হইলে চলিবেনা কারণ তাহা হইলে হয়ত সেগুলি বিবাহ বিধি ভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। সভ্য সমাজের ভিত্তিই হইল ওই বিবাহ বিধি।

অন্য দেশে এই সমস্ত সর্ত্তগুলি যাহাই হউক না কেন ভারতবর্ষে যেখানে স্ত্রীলোক—কন্যা, স্ত্রী ও মাতা রূপে পূজা পাইয়া থাকে—পাশ্চাত্য দেশের ওই ব্যক্তিত্ব-মতবাদ (individualistic ideas) কখনই চলিবেনা ইহা নিঃসন্দেহে

বলা যাইতে পারে। আমরা ভারতীয়রা ভাবের আদান প্রদান করিতে পারি কিন্তু আদর্শের পারি না।

আবার বলি—যেখানে বিধবা-বিবাহ প্রথা আজও সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই সেখানে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথা প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়া সময় সাপেক্ষ। এখন ইহা অবিবেচনার কার্য্য। আমার মতে এখন কোনরূপ আইন সঙ্গত বিচ্ছেদ এর ব্যবস্থাই গ্রহণ যোগ্য এবং তাহাই প্রয়োজন। কার্য্যক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রতিষ্ঠায় যে পুরাতনের উচ্ছেদ কেবল ইহাই প্রতীয়মান হইবে তাহা নহে ইহাতে নূতন অনেক বিধি-বন্ধনের মাঝেও পড়িতে হইবে। যদি আমরা নূতন বিধি-বন্ধনের বিপাকে পড়িবার বদলে কতকগুলি রক্ষা-কবচ সহ পুরাতনের মধ্যেই মিটমাট্ করিয়া চলিতে পারি তাহাই আমাদের আধুনিক সামাজিক-স্তরের প্রয়োজন পূর্ণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে!

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু সরস্বতী এই মত দিয়াছেন :—

বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয় ১৯২৯ সালে কলিকাতায় নিখিল ভারতীয় নারীর সামাজিক অধিবেশনে। কিন্তু সে সময়ে ইহা অত্যন্ত অধিক ভোটে পরাজিত হয় কিন্তু এইবার চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ জনও ইহার স্বপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় বাতাস কোন দিকে প্রবহমান।

আমি এমন অনেক উদাহরণ জানি যেখানে স্ত্রী মাতাল স্বামী দ্বারা অপমানিত, প্রহৃত এমনকি নিহত হইয়াছে। আমি অনেক ক্ষেত্র জানি যেখানে স্বামী স্ত্রীকে অমানুষিক অত্যাচার করিবার পর ত্যাগ করিয়া পুনর্বিবাহ করিয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার থাকা উচিত। যদি এই বিবাহ-বিচ্ছেদ স্বপ্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে গোঁড়ামীর সৌধ হইতে আর একটি থাম খসিয়া যাইবে, যাহা এখন অত্যাচার পীড়িতা নারীর রোষ বহ্নিতে স্বল্পায়ু হইয়া আসিয়াছে।

পুরুষ ও নারী দু'জনের জন্য দু'রকম বিভিন্ন বিবাহ-সম্বন্ধীয় আইন যে থাকিতে পারে না ইহা এখন সকলে বুঝিতে পারিয়াছে। স্বামীর ন্যায় স্ত্রীর'ও বিবাহ-বিচ্ছেদ' করিবার স্বাধীনতা থাকা উচিত। ন্যায়-সঙ্গত রূপে অপমানিতা স্ত্রী ইহা দাবী করিতে পারে—এবং যে সমাজ তাহা অস্বীকার করে—সেই সমাজ নিজের বক্ষেই নিজের ধ্বংস-বীজ বহন করিয়া থাকে।

সেই শুভদিনের আগমনের কিছু বিলম্ব হইবে হয়ত—কিন্তু তাহা আসিবেই; মহিলা-কংগ্রেসে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রস্তাব উত্থাপন হইতেই বোঝা যায় যে দিনের আর দেরী নাই। প্রস্তাবটি পরাজিত হইয়াছে বটে কিন্তু দেখিতে হইবে ইহার স্বপক্ষে চল্লিশ জনেরও অধিক ভোট দাতৃ ছিলেন।

"বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি কৌন্সিল অব্ উইমেন" এর সহ-সভানেত্রী মিসেস্ এ, এন্. চৌধুরী বলিয়াছেন :—

হিন্দু মহিলার কাছে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা সংস্কারে বাধে। হিন্দু-বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন—ব্যক্তিগত চুক্তির কথা ইহাতে মোটেই আসে না। কিন্তু একটি পুরুষ যখন ইচ্ছা করিলেই স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া পুনর্বিবাহ করিতে পারে—ওদিকে স্ত্রীর সে স্বাধীনতা নাই—ইহাতে নারীর প্রতি অন্যায় এবং অবিচার করা হয়। যদিও স্ত্রী স্বামীর দ্বারা নিষ্ঠুর ভাবে অত্যাচারিত হইলে তাহার সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারে এবং ক্ষেত্রমত স্বামীর অর্থের দ্বারা তাহার অবস্থা অনুযায়ী প্রতিপালিত হইতে পারে কিন্তু তথাপি স্ত্রীকে এই বিবাহ-বিচ্ছেদের আইনের অধিকার দেওয়া উচিত। অবশ্য এরূপ অবস্থায় স্বামীর অর্থসাহায্য সে না-পাইতে পারে কিন্তু পুনর্বিবাহ করিলে তাহার এ অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

ইহা একটি সামাজিক বিধি সুতরাং চারদিক দেখিয়া বিবেচনা করিয়া ইহা বিধি-বদ্ধ করা উচিত। এই আইনকে প্রচলিত করিতে গেলে হিন্দু-সমাজকে নূতন রকমে পুনর্গঠন করা কর্ত্তব্য!

শ্রীমতী সারদা দেবী বলেন :—

হিন্দু-সমাজের আইন অনুযায়ী ভারতে অত্যাচারিতা স্ত্রী স্বামীকে ত্যাগ করিয়া গেলে—হয় তাহাকে ভাল অথবা খারাপ ভাবে জীবন যাপন করিতে হয়। মাঝামাঝি কোনও আইন সঙ্গত পথ তাহার খোলা নাই। সমাজ তাহাকে ঐরূপ একাকী সুনির্দ্দিষ্ট জীবন যাপন করিতে দেয় না। যত শীঘ্র ওই প্রথা পরিবর্ত্তন হয় এবং আইনের বেড়াজালে তাহা রক্ষিত হয়—ততই নারীর পক্ষে তথা সমাজের পক্ষে মঙ্গল।

সরোজ নলিনী মেমোরিয়াল এসোসিয়েশনের শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী বলেন —

প্রথমে আমাদের এই কথাটি বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, যে কারণগুলির জন্য য়ুরোপে বিবাহ-বিচ্ছেদ ও মুসলমানদের "তালাক" প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার দরকার হইয়াছিল সেগুলি আমাদের হিন্দু-সমাজেও উত্থিত হইয়াছে কিনা। হিন্দু স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে কত কষ্টে বসবাস করে—কারণ এমন কোনও আইন নাই যাহা তাহাকে সেই কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি দেয়—তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। স্ত্রীলোকের আত্মহত্যা সম্বন্ধে সংবাদপত্রে আমরা যে বিবরণ পড়ি তাহাই ইহার প্রমাণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। আমার মনে হয় এই ক্ষেত্রে বিবাহ-বিচ্ছেদ ওই সমস্ত আত্মহত্যা রহিত করিতে সমর্থ হইবে। এবং এই সমস্ত নারীরা যথার্থ শিক্ষা পাইলে পরে সমাজের কর্ম্মী হইয়া উঠিতে পারে এবং এখন তাহারই যথেষ্ট প্রয়োজন। কিন্তু আমার মতে এই আইনের মধ্যে এমন কতগুলি সর্ত্ত থাকা উচিত যাহাতে স্বামী স্ত্রী সামান্য কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ না ঘটায়।

কারাবন্দিনীদের মুক্তিতে অভিনন্দন

শ্রীনিস্তারিণী দেবী

(সহ সভানেত্রী—নারী সত্যাগ্রহী সমিতি।)

কে বলে দুর্ব্বল চিত্ত ভারতের নারী।
"শুধু খায়" "শুধু পরে" "থাকে শুধু রান্না ঘরে",
অজ্ঞান তিমির মাঝে, আপনা পাশরি॥
এ নয় এ নয় কভু ভারতের নারী॥
তাদেরো মহৎ প্রাণ, ক'রে শুধু আত্মদান
পরার্থে আপনা হারা, চিত্ত মনোহারী।
এমন ত্যাগের শিক্ষা, এমন ধর্ম্মের দীক্ষা,
আছে কিগো কোন দেশে, দেখহ বিচারি॥
আজি গো মায়ের ডাকে, নর নারী লাখে লাখে,
গৃহ ছাড়ি কারা বাসে আনন্দেতে ধায়।
মহাত্মার আবাহনে, স্বামী, পুত্র, পরিজনে
ফেলিয়া রমণীগণ চলিল কারায়॥
বালা, বৃদ্ধা, যুবাজনে, সকলেই প্রীত মনে
ধাইছে মায়ের ডাকে, না মানি বারণ।
সঙ্গে করি শিশুগণে, অপার আনন্দ মনে
যেন কোন মহাতীর্থে করিছে গমন॥
কিবা হিন্দু মুসলমান, শিখ, পার্শী, খৃষ্টিয়ান
গুজরাটী, মারহাটী, চলে ভগিনী সমান।
কংগ্রেস পতাকা তলে, মিলিতেছে দলে দলে,
কি এক মহিমা বলে, এ দৃশ্য মহান্॥
মহাত্মার সন্ধিবলে, কারাবাসী নারী দলে,
মিলেছি সকলে আজি এ মহাসভায়।
এ মিলন ধন্য হোক্, ভারতের শান্তি হোক্
ক্ষুদ্র এ রমণী প্রাণ শুধু এই চায়॥

নানা কথা

বাঙ্গলার কংগ্রেস

শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নিবেদন

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত নিম্নলিখিত বর্ণনাপত্র সংবাদপত্রে প্রেরণ করিয়াছেন :—

বন্ধুগণ,

বাঙ্গলার কংগ্রেসের অবস্থা সম্পর্কে দীর্ঘকাল ধরিয়া উদ্বেগের সহিত বিবেচনা করিবার পর আমি এই সিদ্ধান্ত করিতে সঙ্কোচবোধ করিতেছি যে, বাঙ্গলা দেশের মধ্যে যাঁহারা কংগ্রেসকে ভালবাসেন, এবং অন্তরে অন্তরে কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠতম কল্যাণ পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে একটি সুনির্দ্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট পথ প্রদর্শন করা আমার একান্ত অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। এতৎসম্পর্কে আমি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিব, তাহার প্রত্যেকটি সফল পন্থা সেই সমস্ত মুষ্টিমেয় লোকের হাত হইতে কংগ্রেসকে রক্ষা করিবে, যাঁহারা উহাকে ধ্বংস করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহা ব্যর্থ হইলে বাঙ্গলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত স্বার্থ, বঞ্চনা ও অনাচারের মধ্যে নিমজ্জিত হইবে এবং ফলে কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি এই বিশ্বাস লইয়া বাঙ্গলা দেশ ত্যাগ করিয়াছিলাম যে, বি-পি-সি-সির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি যে ঘোষণা দিয়াছেন, তাহা অকৃত্রিম এবং আমার বিশ্বাস ছিল যে, কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহের জন্য সর্ব্বপ্রকার সুবিধা দেওয়া হইবে ও নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা হইবে এবং রিটার্নিং অফিসারদিগকে নিযুক্ত করণের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ বলিষ্ঠ নীতির অনুসরণ করা হইবে এবং এমন সমস্ত লোক দিগকে লইয়া একটি ইলেকশন কমিটি গঠিত হইবে, যাঁহাদের ন্যায়নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কাহারও কোন সন্দেহ উঠিতে পারে না। আমি ঐ বিশ্বাস ও ঐ আশ্বাস লইয়াই বি-পি-সি-সি হইতে পৃথকভাবে সদস্য সংগ্রহের ফর্ম্ম ছাপান বন্ধ করিবার জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সমূহকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইতেছি যে, বি-পি-সি-সির প্রেসিডেন্টের প্রত্যেকটি আশ্বাসের বাক্য অতি নির্লজ্জভাবে ভঙ্গ করা হইয়াছে। সদস্য সংগ্রহের ফর্ম্ম একবারে না দেওয়া এবং অনিয়মিতভাবে দেওয়া সম্পর্কে অনেক অভিযোগ বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী এবং বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটির কর্ম্মকর্ত্তাদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত অভিযোগের সত্যতা ও প্রমাণ সম্পর্কে কোন বিতর্ক উঠিতে পারে না। যাঁহারা এখনও দুরাশা পোষণ করিতেছিলেন যে, বি-পি-সি-সির কার্য্যকরী সমিতির পরিচালকবর্গের মধ্যে সুবুদ্ধির উদয় হইবে, তাঁহাদের শেষ আশা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে রিটার্নিং অফিসারদের প্রকাশিত নামের তালিকা পাঠ করিয়া। বিশিষ্ট কংগ্রেস নায়কগণ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্টগণই রিটার্নিং অফিসারের কার্য্য করিবেন, কিন্তু এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। যে সমস্ত নামের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অল্প কয়েকজনের নাম গ্রহণযোগ্য, কিন্তু এতৎ সম্পর্কে কাহারও তিলমাত্র সন্দেহ নাই যে এবং বাঙ্গলার জনসাধারণ জানেন যে, যাঁহাদিগকে রিটার্নিং অফিসার করা হইয়াছে তাঁহাদের অধিকাংশই অত্যন্ত পক্ষপাত-দুষ্ট। ইলেকশন কমিটির সদস্যদের অবস্থাও এই রকম এবং ইঁহাদের নামের তালিকা হইতে বুঝা যাইবে যে, এককাত্র একজন সদস্য ব্যতীত উহাদের মধ্যে আর কেহই কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলন কার্য্যে যোগদান করেন নাই। (এবং এই সদস্যও এক্ষণে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসকে আক্রমণে ব্যস্ত আছেন)। বাঙ্গলার কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্ব এখন জনকয়েক লোকের হাতে পড়িয়াছে এবং যে বন্দোবস্ত তাঁহারা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা অতীতের কীর্ত্তি অনুসারেই কার্য্য করিতেছেন! ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে, এক দিকে অন্যায় পন্থার দ্বারা শক্তি ও ক্ষমতা হাতে রাখা (কারণ স্বাধীন ও ন্যায়সঙ্গতভাবে নির্ব্বাচন হইলে, ইহাদের সমর্থকগণ কংগ্রেসের নিকট ঘেঁষিতে পারিবেন না) এবং অন্য দিকে খাঁটি কংগ্রেস সেবকদিগকে কংগ্রেসের বাহিরে রাখা। অনাচারমূলক পন্থা অবলম্বিত না হইলে ইঁহারাই কংগ্রেস পরিচালনের ভার প্রাপ্ত হইতেন। আমি উপরোক্ত শ্রেণীর লোকদিগকে খাঁটি কংগ্রেসী লোক বলি না, কারণ জনসাধারণ ইহা ভালই জানেন যে, যে-কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির হাতে এক্ষণে ক্ষমতা রহিয়াছে, তাঁহারা প্রকাশ্যে অথবা গোপনে কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতির বিরুদ্ধে ক্রমাগত নিয়মিতভাবে প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন।

বি, পি, সি, সির বর্ত্তমান কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি জনসাধারণের বিশ্বাস হারাইয়াছেন। কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টকে পর্য্যন্ত ইঁহাদের হাত এড়াইয়া কংগ্রেসের কার্য্য চালাইবার জন্য "কর্ম্ম-পরিষদ" গঠন করিতে হইয়াছিল। বাঙ্গলার গবর্ণমেণ্ট যখন বাঙ্গালা দেশের অন্যান্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর দমন নীতি অবলম্বন করেন, তখন তাঁহারাও কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন।

বাঙ্গলার জনসাধারণের সমক্ষে এক্ষণে এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে :— তাঁহারা কি বর্ত্তমান বি-পি-সি-সিকে এবং কংগ্রেসের নামে যাঁহারা উহাকে চালাইতেছেন তাঁহাদিগকে চাহেন? কিম্বা তাঁহারা সেই সমস্ত খাঁটি কংগ্রেস লোকদিগকে লইয়া কংগ্রেস কমিটি গঠন করিতে চাহেন, যাঁহারা সত্যকারের কংগ্রেস সেবক, যাঁহারা সততা ও সাহসসম্পন্ন

এবং যাঁহারা কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতিকে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে এবং উহার প্রত্যেকটি বিষয় পালন করিতে প্রস্তুত? এই বিষয়ে পছন্দ করিবার ভার জনসাধারণের উপর। কিন্তু আত্মস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যে সমস্ত মিথ্যা চীৎকার ও দলগত মিষ্টকথা উচ্চারণ করিবেন, তৎবিষয়ে আমি জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দিতেছি। আমি তাঁহাদিগকে জালজুয়াচুরি, অনাচার ও জোট-পাকান লোকের কর্ত্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্ম আহ্বান করিতেছি এবং কংগ্রেসের কল্যাণ অনুষ্ঠান করিতে বলিতেছি। ইহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অর্থ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা নহে। বি, পি, সি, সির জোট-পাকান দল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে, সুতরাং তাঁহাদের বিদ্রোহ দমনের জন্ম আমি স্বদেশবাসীকে আহ্বান করিতেছি। ইহা লইয়া যেন কোন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি না হয়। যাহারা কংগ্রেসের নীতি অনুসরণ করেন না এবং কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করেন, তাঁহাদের সহিত আপোষ করার অর্থ হইতেছে—সম্মান ও নীতির সহিত রফা করা। যাহারা কংগ্রেসের লোক, তাঁহারা এবং যাহারা কংগ্রেসের সহিত একমত নহেন—এই দুই দলের মধ্যে কখনও আপোষ হইতে পারে না।

বি, পি, সি, সির বর্ত্তমান কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিকে অস্বীকার করিয়া, বাঙ্গলার কংগ্রেস সেবক ও কর্ম্মীদিগকে লইয়া সত্যকারের বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠন করার ভার কংগ্রেসের লোক ও বিভিন্ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান-সমূহের উপর নির্ভর করিতেছে। এই উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহারা বর্ত্তমান বি, পি সি, সি কর্ত্তৃক নিযুক্ত রিটার্নিং অফিসার-দিগকে অস্বীকার করিতে পারেন। এইজন্য, তাঁহারা কংগ্রেস নির্ব্বাচন চালাইবার জন্ম জেলা কংগ্রেস কমিটি সমূহের প্রেসিডেণ্ট দিগকে কিম্বা সেক্রেটারীদিগকে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভাসমূহের অধিবেশনে রিটার্নিং অফিসাররূপে নির্ব্বাচন করিতে পারেন, কিম্বা কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সভায় সদস্যদিগকে রিটার্ণিং অফিসার নিযুক্ত করিতে পারেন। যে সমস্ত জোটপাকান লোকের হাতে বর্ত্তমানে ক্ষমতা আছে, তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া একটি নির্ব্বাচন কমিটি গঠন করিতে হইবে। কারণ ঐ সমস্ত লোকের জনসাধারণের নিকট হইতে সমর্থন ও সহানুভূতি পাইবার কোন অধিকার নাই। আমার বিশ্বাস, যদি বাঙ্গালার জনসাধারণ ও কংগ্রেসের লোক আমার আবেদনে সাড়া দেন, তবে ঘুষ ও প্রবঞ্চনার এই যন্ত্র শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে। আমি অনিশ্চয়তা শেষ করিতে চাই এবং যে দলগত বিবাদ অনির্দ্দিষ্টকালের জন্ম কেবলই বিলম্বিত হইতেছে, উহাও অবিলম্বে দূর করিতে চাই। জনসাধারণ যদি তাঁহাদের মত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ ও প্রয়োগ করেন, এবং কৃত্রিম আপোষের জন্ম দুর্ব্বলের মত চেষ্টা না করেন ও অন্যায় এবং অসঙ্গতভাবে যে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে, তাহাতে যোগদান না করেন, তবেই ঐ সমস্ত গোলমাল চুকিয়া যায়। যে দেশের যোগ্যতা যেরূপ, সেই দেশের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সেইরূপই হইবে। বাঙ্গলা ও তাহার জনমণ্ডলীর উপর পরীক্ষা চলিতেছে। বাঙ্গলার কংগ্রেস বাঙ্গালীর নিজেদের, সুতরাং উহার চরিত্র ও সুনামের জন্ম তাঁহারা দায়ী।

আমি কংগ্রেসের লোকদের নিকট আবেদন করিতেছি যে, তাঁহারা তাঁহাদের মন স্থির করুন এবং অবিলম্বে এই পথ বা অন্য পথ বাছিয়া লউন। আলাপ-আলোচনায় ও মৌখিক যুদ্ধে সময় নষ্ট করিবার কাল এখন আর নাই। এক্ষণে কাজের সময় আসিয়াছে। আমি যেমন করিয়া অনুভব করিতেছি, জনসাধারণও যদি তেমনই অনুভব করেন যে, বাঙ্গলা দেশের কংগ্রেসকে বাঁচাইতে হইবে, তবে তাঁহাদিগকে অবশ্যই কার্য্য করিতে হইবে এবং অবিলম্বে আমি যে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছি, সেই পথ ধরিয়া দ্রুতগতিতে চলিতে হইবে।

আমি স্বীকার করি যে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সমূহকে বি-পি-সি-সির প্রেসিডেণ্টের প্রতিশ্রুতি বাক্যের উপর নির্ভর করিতে বলিয়া এবং সদস্য সংগ্রহের জন্ম নিজেদের রসিদ বই ছাপান বন্ধ করিতে বলিয়া আমি ভুল করিয়াছিলাম। আমি যে সমস্ত প্রস্তাব করিয়াছি, যদি তাহা অনুসৃত হয় তবে, এই ভুল দূর করা যাইতে পারে। যদি কংগ্রেসের লোক এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহ অচিরে এবং যথাযোগ্যভাবে আমার আহ্বানে সাড়া দেন এবং আমার বিশ্বাস তাঁহারা দিবেন—তবে, কংগ্রেস নায়ক এবং কর্ম্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়া আমি এই বিষয়ে আরও উপদেশ প্রদান করিব।

আমি কংগ্রেসের লোক হিসাবে দেশবাসীর নিকট এই আবেদন করিতেছি। কারণ, আমি কেবল অনাচারপূর্ণ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্যই কংগ্রেসে রহি নাই, আমি আমার দেশের সেই সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্যও কংগ্রেসে আছি, যাহারা নিজেরা অনাচার দুষ্ট হইয়া সমগ্র দেশে অনাচার ছড়াইয়া দিতেছেন।

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের বিবৃতি

শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বহু সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন :—বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার-কার্য্যে শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের কর্ম্মতৎপরতা আমাদিগকে অত্যন্ত বেদনা দান করিয়াছে। তাঁহার পক্ষে যদিও ইহা নূতন নহে, ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্য কেমন করিয়া যে বারংবার এই অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, বিশেষতঃ বর্ত্তমানের এই সঙ্কট সন্ধিক্ষণে নিয়মানুবর্ত্তিতাভঙ্গের প্ররোচনা দান করিতে পারেন, তাহা আমার বুদ্ধির অগোচর। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি দখল করিবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিবার পর তাঁহার আকস্মিক এই চাল, রাজনৈতিক চাতুর্য্যের সহিত যাহারা পরিচিত নহেন, তাঁহাদের পক্ষে কতকটা বিস্ময়কর ব্যাপার। শ্রীযুত সেনগুপ্ত নিজেকে, নিজের পদমর্য্যাদা এবং তাঁহার কর্ত্তব্য একটা বিস্মৃত হইয়াছেন দেখিয়া আমি দুঃখিত। তিনি যে অনিষ্টকর পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তদ্বারা অপরের চেয়ে নিজেরই ক্ষতি করিলেন বেশী। সে যাহা হউক, আমার মনে সত্যই এই আতঙ্ক হইতেছে যে, অকারণ তাঁহার এই আক্রমণের ফলে সব তীব্রতা সহকারে পাল্টা আক্রমণের প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া না উঠে। সেজন্য

আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার বন্ধু ও সমর্থকদের সকলকে এবং যে সব সংবাদপত্র আমাকে সমর্থন করেন, তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে, তাঁহারা যেন, প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবৃত্তিপরবশ না হন। শ্রীযুত সেনগুপ্ত তাঁহার দল অথবা তাঁহার পক্ষের সংবাদ-পত্র যাহাই বলুন, যাহাই করুন না কেন, তাঁহারা যেন তাহা লক্ষ্যের মধ্যে না আনেন। আমরা যেন শান্ত চিত্তে এবং সহিষ্ণুতা সহকারে আমাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাই এবং ফলাফল ভগবানের হাতে সমর্পণ করি। ন্যায় আমাদের পক্ষে এবং আমরা সঙ্গত কার্য্য করিতেছি বলিয়াই আমরা বিশ্বাস রাখি। এক্ষেত্রে যদি কেহ আমাদিগকে আক্রমণ করে বা আমাদের নিন্দাবাদ করে, আমরা যেন তাহাদিগকে বাধা না দেই। অপ্রতিরোধের দ্বারা আমরা আমাদের বিরোধীদিগকে নিরস্ত্র করিতে সক্ষম হইব।

সম্প্রতি আমি সমগ্র বঙ্গদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছি, এবং তাহাতে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে যে দেশ আমার এবং আমার দলেরই পক্ষে। যাঁহারা আমাকে এবং আমার দলকে নিন্দাবাদ করিতেছেন, তাঁহারা আমার ক্ষতি করার অপেক্ষা নিজেদেরই ক্ষতি বেশী করিবে। কিন্তু মাঝে মাঝে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া আমাদের বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, এজন্য আমি বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিকে বিদ্বেষের বিষোদ্গারে অচঞ্চল থাকিয়া তাঁহাদের নিজেদের কাজ চালাইয়া যাইতে বলিতেছি।

আমরা মাসখানেকের মধ্যে সদস্য সংগ্রহের জন্য তিন লক্ষ ৮০ হাজার মেম্বরসীপের ফরম বিলি করিয়াছি; ১৯২১ সালে ৯৫ হাজারের অধিক কংগ্রেস সদস্য সংগৃহীত হয় নাই।

রিটার্ণিং অফিসার এবং নির্ব্বাচন বোর্ডের লোকেরা কাজ আরম্ভ না করিতেই তাঁহাদের নিন্দা করা শ্রীযুত সেনগুপ্তের উচিত হয় নাই।

ঐরূপ বিদ্রোহের সম্বন্ধে অতীত অভিজ্ঞতা বাঙ্গলা দেশের আছে। আমার অনুগামীদিগকে শ্রীযুত সেনগুপ্তের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং প্রেমপূর্ণ আচরণ করিতে বলি।

মৌলবী মুজিবর রহমানের অভিভাষণ

২৮শে মে বরিশাল জেলা মুসলিম সম্মিলনের অধিবেশনে মৌলবী মুজিবর রহমান তাঁহার অভিভাষণে বলেন :-

সমবেত ভাইগণ,

দেশে এত উপযুক্ত ব্যক্তি থাকতেও যে আপনারা আমাকেই নির্ব্বাচিত করেছেন তার কারণ, বোধ হয় আপনারা আপনাদের একজন পুরাণো খাদেমের মতামত সম্বন্ধে কিছু শুনতে চান। গত পঁচিশ বছর ধরে আমি কংগ্রেস, মোসলেম লীগ প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ-ভাবে কিছু সম্বন্ধ রেখে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি এবং তার ফলে আমার যে ধারণা জন্মেছে, আজ তারি কিছু আপনাদের শোনাব।

এই সম্মিলনীতে বিশেষভাবে সেই সকল বিষয়েরই উত্থাপন করা হবে, যার সঙ্গে আপনাদের জেলার লোকের স্বার্থ প্রধানতঃ জড়িত আছে। কিন্তু যতই ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ হোক, একটা জেলার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থা ও তার উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে সমস্ত প্রদেশের, এমন কি সমগ্র দেশের অবস্থার কথাও আপনা থেকেই উঠে পড়ে। সুতরাং বরিশালের মোসলেম সমাজের রাষ্ট্রীয় স্বার্থ-রক্ষা করতে হলে, সাধারণভাবে বিশাল ভারতবর্ষের মোসলেম সমাজের স্বার্থের বিষয়ও চিন্তা করে দেখা দরকার। কারণ তা না করলে কনফারেন্সের উদ্দেশ্য সফল হবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

স্বাধীনতা প্রত্যেক জাতিরই জন্মগত অধিকার। কথাটা পুরানো কিন্তু একান্ত সত্য। যথেষ্ট স্বাধীনতা না পেলে মানুষ কখনো বড় হতে পারে না। যেমন হাত-পা ও সমস্ত দেহের দরকার মত চালনা না হলে শরীর সবল ও পুষ্ট হয় না, তেমনি মনের জন্যও এ কথা সমানভাবে সত্য। যে ব্যক্তি স্বাধীনভাবে মানসিক বিকাশের সুযোগ না পায় তার আত্মা প্রতি মুহূর্ত্তে নিষ্পেষিত হতে থাকে। চিন্তা দ্বারা সে কখনো নিজের বা জগতের উন্নতি করতে পারে না। পরাধীনতার বিষ যার অন্তরে এতটুকু স্থান পেয়েছে, তার দেহ ও আত্মা সেই বিষে জর্জ্জরিত হয়ে পড়ে। তার কর্ম্মে ও চিন্তায় সহজ ও স্বচ্ছন্দভাব কখনো দেখা যায় না।

দীর্ঘকাল পরাধীনতার আওতায় বাস করে আমরা ভারতীয়েরা আজ এমন দুরবস্থায় পড়ে গিয়েছি যে আমাদের উত্থানের জন্য সহজ, সরল ও উৎকৃষ্ট পথ চিনে নিয়ে চলা আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এখন আমরা অনেকটা বুঝতে আরম্ভ করেছি, কোন্ দিকে গেলে বা কি করলে আমরা আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থা ফিরিয়ে ফেলতে পারি। আজ দুনিয়ার বুকে যে বিরাট সংগ্রাম চলছে, এক দেশ যে অন্য দেশের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ক'রে জগতের শান্তি নষ্ট করছে, তার সব চেয়ে বড় কারণ ধন-সমস্যা। আমার দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি পেট ভরে খেতে পেয়ে সুখে থাকবে—প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক, বিশেষ করে এই চিন্তাই বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে তুলেছে; এই সমস্যা কেবল প্রাচ্য বা কেবল প্রতীচ্যকেই বিব্রত করে তোলেনি, শুধু রুশিয়া বা চীনকেই এই সমস্যার সমাধানের চিন্তায় বিব্রত দেখা যায় না, পৃথিবীর সকল দেশের সামনেই কোন না কোন মূর্ত্তি ধরে এই অর্থসমস্যা প্রকট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু ভারতের দৈন্য ও দারিদ্র্য এত উৎকট যে দুনিয়ার মধ্যে অতি অল্প দেশই তার মত হীন অবস্থার মধ্যে পড়ে আছে।

এই সমস্যার সমাধানের উপায় দেশের ধনবৃদ্ধি করা।

সেজন্য দেশের কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতি হওয়া দরকার। কিন্তু ব্যবসা বলতে আজকাল মুদীর বা তরিতরকারীর দোকানই বোঝায় না। এ যুগের ব্যবসার অবলম্বন দেশবিদেশের মধ্যে আমদানী রপ্তানীর সম্বন্ধ বিস্তার ও উহাকে সহজসাধ্য করা। সেজন্য মুদ্রাবিনিময়ের হার নির্দ্দেশ করা ও আদান-প্রদান সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত হওয়া একান্ত দরকার। কিন্তু এসকল বিষয়ের কোনটাতেই আমাদের হাত নাই, আমরা নিজেদের প্রয়োজন-

মত দেশ-বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপন করতে পারছি না—আর্থিক আদানপ্রদানের জন্য উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করাও আমাদের ক্ষমতার অতীত। আমাদের দেশের বিদেশী সরকার বিদেশীদের সুখ-আরামের জন্য বেশী চিন্তিত, আমাদের দেশের অনশনক্লিষ্ট লোকের দুঃখ দূর করবার জন্য তারা তত চিন্তিত নয়। বিদেশী ধনিক ও ব্যবসাদার ভারতবাসীর বুকের রক্ত শোষণ করে নিয়ে যাচ্ছে, দেশ-শাসনে আমাদের বিশেষ কোন হাত না থাকায় আমরা উহার কোন প্রতিকার করতে পারছি না।

কৃষি সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। বাংলা দেশের আর্থিক উন্নতির একটা প্রধান অবলম্বন কৃষি। এই বরিশাল জেলাকে বাংলার শস্যভাণ্ডার বলা হয়। বাংলায় যে পাট জন্মে তা সমগ্র জগতের পাটের অভাব মিটিয়ে থাকে। কিন্তু যে দেশের কৃষিজাত দ্রব্য এত প্রচুর ও এত মূল্যবান, সেই দেশের লোক আজ অনাহারক্লিষ্ট দুর্ভিক্ষরাক্ষসী আজ তাদের গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। তারা শুধু পরিশ্রম করবে, কিন্তু পরিশ্রমের যথাযোগ্য মজুরী তারা পাবে না। লাভ ত দূরে থাকুক দুটো ভাতের কাঙ্গালী হয়ে হয় তারা আত্মহত্যা করবে, না হয় তিলে তিলে জীবন বিসর্জ্জন দিতে থাকিবে। এখন সরকারের যে কৃষি-বিভাগ আছে তার দ্বারা দেশের কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য হয় না।

কিন্তু এ দুরবস্থা হয় কেন? এবং হয়েছে বলেই কি তাকে চিরদিন থাকতে দিতে হবে?

দেশবাসীর দুর্দ্দশা দেশবাসী যেমন ভাবে বুঝতে পারে বিদেশী কখনো তেমনভাবে পারে না। ভারতীয়ের হাতে যদি ভারতের শাসনভার এসে পড়ে তাহলে ভারতবাসীর অভাব অভিযোগ দূর করবার জন্য সকল প্রকার সম্ভবপর উপায় অবলম্বন করা হবে বলে আশা করা যায়। কারণ তখন বিদেশী বণিকের মুখ তাকিয়ে সরকার কোন কাজ করতে বাধ্য থাকবে না। তখন বিভিন্নদেশের সঙ্গে ব্যবসার পথ যথেষ্ট সুগম হবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য করে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াবার জন্য চেষ্টা চলবে।

দেড় শত বছরের বেশী হবে, আমরা বৃটীশ শাসনের অধীনে শান্তশিষ্ট-ভাবে বাস করে আসছি। কিন্তু এই দেড়শত বছর আমাদের শাসকরা শিক্ষার দিক থেকে আমাদিগকে কিরূপ দাবিয়ে রেখেছেন তা আজ কারুর জানতে বাকী নাই। এদের কল্যাণে আজ আমাদের শতকরা প্রায় ৯০ জন নিরক্ষর। কিন্তু যদি দেশের রাষ্ট্রীয় অধিকার আমাদের হাতে থাকত, তা হলে শিক্ষার দিক থেকে আমাদের দেশ কি এত পিছিয়ে পড়ত? নিশ্চয়ই না। আমরা আমাদের বর্ত্তমান প্রভুদের ন্যায় সৈন্য বিভাগের বা অন্যান্য বিভাগে কোনরূপ অনর্থক বা অনাবশ্যক অর্থব্যয় না করে দেশের রাজস্বের যথেষ্ট অংশ শিক্ষা বিভাগে ব্যয় করতাম। অবৈতনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বাঙ্গলার গরীব চাষীদের ঘাড়ে যেরূপ করভার চাপান হয়েছে, তখন সেরূপ হত না। প্রাথমিক শিক্ষার সব ভার রাষ্ট্রই বহন করত।

কিন্তু সকল কথার অর্থ এই যে, দেশকে প্রথমেই স্বাধীন করা আমাদের কর্ত্তব্য। যতদিন দেশ স্বাধীন না হয় ততদিন আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা দূর হবার কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না। কিন্তু দেশকে স্বাধীন করতে হলে সভাসমিতিতে কয়েকটা প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেই কর্ত্তব্য শেষ হবে না। সেজন্য দেশের লোককে দুঃখকষ্ট ভোগ ও ত্যাগস্বীকার করতে হবে। তা না করলে শুধু মুখের কথা শুনে বা চোখের পানি দেখে দেশ আপনি স্বাধীন হবে না।

বর্ত্তমানে আমাদের সমাজের সামনে প্রধানতম রাষ্ট্রীয় সমস্যা হচ্ছে নির্ব্বাচন সমস্যা।

যতক্ষণ না বিভিন্ন সমাজের রাষ্ট্রীয় অধিকার সমান এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থ একজাতীয় হয়, ততক্ষণ তারা পরস্পরকে বিশ্বাসের চক্ষে দেখতে পারে না। কিন্তু অবিশ্বাস থাকলেই বিরোধ বাড়বে আর মিলনের পথ সংকীর্ণ হতে থাকবে। এক সমাজ অন্য সমাজের সুখ দেখে সন্তুষ্ট হবে না, তার দুঃখে সহানুভূতি জ্ঞাপন করতে আসবে না। এ হচ্ছে স্বভাবের নিয়ম। আর এই সন্দেহ, অবিশ্বাস বা বিদ্বেষের জন্য পৃথক নির্ব্বাচন দায়ী; কারণ এই প্রথাই বিভিন্ন সমাজের রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে এক জাতীয় বা একমুখী হতে বাধা দিয়ে পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য ও ক্রমে অবিশ্বাস সৃষ্টি করে।

এই সম্পর্কে কানাডার একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কানাডায় বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব্বে সে দেশের ফরাসী ও ইংরেজ অধিবাসীদের মধ্যে জাতিগত বৈষম্য ছিল এবং এই নিয়ে তাদের মধ্যে প্রায়ই বিরোধ বাধত। শুধু বয়স্ক লোকই নয়, ছেলেরাও যখন আপোষের মধ্যে কলহ-বিবাদ করত, তখন তারা ইংরেজ ও ফরাসী হিসাবে নিজেদের দল বাঁধত। সে সময় সে দেশে পৃথক নির্ব্বাচন চলিত ছিল। দীর্ঘকাল ধরে এই ব্যবস্থা সেখানে চলেছিল। কিন্তু পরে শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তন করবার সময় মিশ্র নির্ব্বাচন প্রথা জারী করা হয় এবং আশ্চর্য্য এই যে, এই প্রথা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই জাতিবিদ্বেষ একেবারে মিটে যায়। এখন ইংরেজ ফরাসী নির্ব্বিশেষে তারা সকলেই কানাডার অধিবাসী হ'য়ে পরস্পরের সঙ্গে সুখে বাস করছে।

পৃথক নির্ব্বাচন মুসলমান সমাজকে শক্তিমান করে না তুলে বরং তাদের শক্তির অপচয়ই ঘটিয়েছে। শক্তি অর্জ্জন করার উপায় হচ্ছে সংগ্রাম করা। কিন্তু সহজে আরাম পাওয়া গেলে কেউ সংগ্রামের কষ্ট স্বীকার করতে চায় না। এই সত্য কথাটা আমরা আমাদের সামাজিক জীবনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে দেখিছি; আজ যে বাংলার ও ভারতের মুসলমান সমাজ সহায়হীন, শক্তিহীন, সম্পদহীন, বিচ্ছিন্ন ও অসংবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে, তার কারণ কি? আমার বোধ হয়, তার কারণ এই যে, আমরা নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার প্রবৃত্তি হারিয়ে পরের মুখাপেক্ষী হয়ে, পরের দ্বারে উপযাচক হয়ে নিজেদের জীবন যাপন করতে চাই!

মূল প্রস্তাবের যে অংশে এই কথাগুলি ছিল, তাহা এই:—

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে দেশের সকল অধিবাসীর জন্য সভ্যতা-

ভাষা, বা মালা, শিক্ষা ও ধর্ম্মের আচরণ সম্বন্ধে সুবন্দোবস্ত করা হবে।

যাঁরা মিশ্র-নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী, তাঁদের মধ্যে অনেকের মত এই যে কাউন্সিলের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যপদ মোসলমানদের জন্য 'রিজার্ভ' রাখা হোক। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে আমি অন্ততঃ বাংলা দেশের জন্য এভাবে সিট্ রিজার্ভ রাখার পক্ষপাতী নই।

এই উপলক্ষে আমি কিন্তু আর একটা কথা বলতে ইচ্ছা করি। কংগ্রেস হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত বলে বহু মুসলমান কংগ্রেসের নিন্দা করেন। কিন্তু এ ভাবে কংগ্রেসের নিন্দা করার চেয়ে যদি আমরা খুব বেশী সংখ্যায় এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করি, তা'হলে বোধ হয় তা'র নিন্দা করবার কারণ থাকে না। একথা সত্য যে গত আইন অমান্য আন্দোলনের সময় মোসলেম সমাজ কংগ্রেসে যোগদান করেছিল, সেজন্য প্রায় বারো হাজার মুসলমানকে সরকারী কোপে পড়তেও হয়েছিল। এই সকল কংগ্রেস কর্ম্মীর মধ্যে বাংলা'র মোসলমানও অংশ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু হিন্দু সমাজের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে বোঝা যায়, বাংলার অতি অল্প মুসলমানই কংগ্রেসের কাজে যোগ দিয়েছিল। কংগ্রেসই এখন সমগ্র ভারতের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান।

আমরা যদি দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য সকল সমাজের সঙ্গে সমানভাবে সংগ্রাম করবার জন্য কংগ্রেসে যোগদান করি, তা'হলে আমাদের ন্যায্য দাবী কেউ অগ্রাহ্য করবে না, কংগ্রেসের নিন্দা করবারও আর আমাদের কারণ থাকবে না।

মাধবী রাতি

মাহ্‌মুদা খাতুন (ছিদ্দিকা)

মাধবী রাতি
গগনে গগনে জ্বলিছে তারার
হাজারো বাতি
দিবা ভ্রমে ডাকে শাখে শাখে পাখি
কেমনে মুদিব এ আতুর আঁখি
চাঁদিমা জাগে
জোছনা পুলকে জাগিছে ধরণী নবানুরাগে
কুসুম কলি
অলস সমীর পরশ লাগি
পড়িছে ঢলি
কল কল তান তটিনী তুলায়ে
ছুটিছে মানব-মরম ভুলায়ে
নীরবে শশী
ভুবন গগন আকুল করিয়া হাসিছে হাসি
এমন নিশা
ধরণী হারাল গগনের পাশে
আপন দিশা
আমিই রহিনু শুধু পথ চাহি
তোমারি গীতিকা আঁখি-জলে গাহি'
জুড়াতে ব্যথা
চরণে তোমার মোর কোনো ঠাঁই হলনা কোথা।

কুসুম বাসে
বিরহী এ হিয়া দ্বিগুণ করিয়া
কাঁদে হুতাশে।
রহিবে জাগিয়া সুখের স্বপন
এ মরমে রবে ব্যাকুল বেদন
নয়ন ঝরে
আসিবে কি আর এমন রজনী জীবন পরে ?
উথলে প্রীতি
গগনে-পবনে ঝরিছে হরষে
অমরা গীতি
তোলে হিয়া ভরি অযুত বাসনা
আসিবে বলিয়া কেন আসিলে না ?
কত বা কাঁদি
ব্যাকুল এ মোর বাহুডোর দিয়া
কাহারে বাঁধি
চাঁদিমা ঢলে
থাকিবে না আর এ মধু যামিনী
প্রভাত হলে
আসিলে না তুমি বাসিলে না ভালো
ঢালিলে না চোখে প্রণয়ের আলো
আসিবে বলে
গেঁথেছিনু মালা আসিলে না তুমি নিলেনা গলে।

নূতন বাসায় প্রথম দিন

শ্রীমনোমোহন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ গল্প

(১)

স্বামী-স্ত্রীতে অনেক বাদানুবাদের পর শেষে দেওঘর যাওয়াই স্থির হইল।

সারাবৎসর নাকে দড়ি দিয়া অফিসে খাটিয়া, শরৎ পূজার এই একটি মাস উপভোগ করিবার জন্য দিন গণিয়া আসিতেছিল। পনের দিন আগে হইতে জিনিষ-পত্র কেনা চলিতেছিল, মোট-ঘাট বাঁধা হইতেছিল, আর দিনের মধ্যে পঁচিশবার 'টাইম টেবল্' খোলা তাহার যেন একটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। বন্ধু-বান্ধবের নিকট হইতে বিদায় নেওয়াও প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল। এখন বাকি কেবল টিকিট কেনা!

ইত্যবসরে যেদিন সাহেব ডাকিয়া 'বাজার মন্দা' অজুহাতে পূরা মাসের স্থলে অর্দ্ধমাসের বেতন 'বোনাস' স্বরূপ হাতে তুলিয়া দিল, সেদিন শরতের চক্ষের সম্মুখে আশ্বিনের মাঝা-মাঝিতে বিস্তৃত পুষ্পিত সর্ষপক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই দ্রষ্টব্য রহিল না। হায়, এই জন্যই কি সে রবিবার পর্য্যন্ত অফিসে হাজির হইয়া 'লেজার' 'আপ-টুডেট' করিয়া 'ব্যালেন্স সিট' প্রস্তুত করিয়াছিল! বলিবার কিছু নাই,—অফিসের অবস্থা ত কিছুই তাহার অজ্ঞাত নাই! কত লোকের যে পূজার পূর্ব্বে 'রিডাক্‌সান' হইয়া গেল!

শরত বরাবরই একটু সৌন্দর্য্যপ্রিয়। তাই এবার সিমলা শৈলে যাইবার জন্যই প্রস্তুত হইতেছিল। কিন্তু বিধি বাদ সাধিলেন! মাহিনার অনেকগুলি টাকাই আগে হইতে সে খরচ করিয়া বসিয়াছিল—তারপর সাহেবের এই নির্ম্মম বদান্যতা! তাহার যেন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল! একবার ভাবিল 'যাত্রা নাস্তি' করিয়া দেয়, তারপর ভাবিল স্ত্রী ত শুনিবেই না, তার উপর বাহিরে মুখ দেখানও শক্ত দাঁড়াইবে। তাই সে লাটাই গুড়াইতে লাগিল! সিমলা থেকে মুশৌরী, দিল্লী, আগরা, এলাহাবাদ, বেনারস, ডিহিরি-অন-শোন্, দার্জ্জিলিং, সে যত উপর হইতে বেগে সানুদেশে অবতরণ করিতে লাগিল, পত্নী ইরার মেজাজ তদনুরূপ বেগে উর্দ্ধগামী হইতে লাগিল।

ইরা বলিল—"বছরে একবার; তাও যদি একটু বাইরে গিয়ে ঠাকুর দেবতার মুখ না দেখ্‌লুম, দুদিনের জন্য একটু হাফ্ না ছাড়লুম ত তেমন জীবনের দরকার কি?"

শরত বলিল—"আমার কি তাতে অসাধ? ঠাকুর দেবতার মুখ পরে অনেক দেখা যাবে কিন্তু এই সময় পাহাড়ের যা শোভা"—

সগর্জ্জনে ইরা বলিয়া উঠিল—"তোমার শোভার নিকুচি করেছে! শোভা নিয়ে ধুয়ে খাবেন! মনিষ্যি হয়ে জন্মেছি, যদি পুণ্যি ধর্ম্ম একটু না করলুম, পরকালে জবাব দেব কি? পুরুষ বটে ও পাড়ার পালেদের বট্‌ঠাকুর! বাড়ীশুদ্ধ সব নিয়ে বেরিয়েছে, এখন দু'মাস আর ফিরবে না কোন তিথ্যি বাদও দেবে না।"

রাগিয়া শরত বলিল "তবে গেলে না কেন বট্‌-ঠাকুরের সঙ্গে তীর্থ করতে—বাঁচতুম!"

গর্জ্জন ও বর্ষণ একত্রীভূত হইল।

ইরা বলিল "তা বাঁচবে বই কি! আমি ম'লে তোমার হাড় জুড়োয় তাকি আমি জানি না। খুব হয়েছে—আর যদি কোথাও যাবার কথা বলি ত—। বাব্বাঃ, মা বলেছিল 'কক্ষণো বাইরে বেরুইনি মা, যদি তোরা যাস আমায় সঙ্গে নিস,' ভাগ্যি আসবার কথা বলিনি!"

ধূমায়িত অগ্নির আশঙ্কায় শরত সন্ধির প্রস্তাব করিয়া সুর খাদে নামাইল। বলিল "সে কথাত হচ্ছে না। আসল কথা হচ্ছে টাকার; অবস্থাত এবার সব বুঝ্‌ছ! আজও যদি ছেলে মানুষী কর আমি নাচার। বল্‌ছিলুম কি, দেওঘরেই যাওয়া যাক। তোমার ঠাকুর দেখাও হবে আমার পাহাড় দেখার সাধও মিটবে। আসছে বছর যদি ভাগ্যে থাকে ত—"

আসছে-বছরের পূজাবকাশের প্রোগ্রামটা বোধ হয় শরত বিস্তারিত ভাবেই বিবৃত করিয়া যাইত যদি না ইরা বিনা বাক্যব্যয়ে কার্য্যান্তরে চলিয়া যাইত!

পাঁচজনের কাছে চক্ষুলজ্জা এড়াইবার জন্য শরতের পকেটের উপরই নির্ভর করিয়া শেষে ইরাকে 'বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে' 'মন্টী' কোলে শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া দেওঘর উদ্দেশ্যেই রওনা হইতে হইল। সঙ্গে চলিল চতুর্দ্দশবর্ষীয় উৎকল নন্দন ভৃত্য 'কিরপা' ও পাড়ার হাবুলের মা; এখানে হাবুলের মার যাওয়ার ইতিহাসটা একটু বলিয়া রাখি।

অল্প বয়সে বিধবা হইয়া হাবুলের মা দুঃখ-মেহনত করিয়া একমাত্র সন্তান হাবুলকে 'মানুষ' করিয়াছিল। ভাল দেখিয়া তাহার বিবাহও দিয়াছিল। হাবুলের উপার্জ্জনে সংসারের দুঃখ ঘুচিয়া তাহার মাকে বিশ্রামের অবকাশ দিয়াছিল। কিন্তু কপাল মন্দ বলিয়া হাবুলের মা'র অদৃষ্টে সুখ সহ্য হইল না। একমাসের আড়া-আড়িতে কলেরায় বৌ-বেটা দু'জনে তাহাকে ফাঁকি দিয়া পলাইল। যাইবার সময় রাখিয়া গেল কিছু নগদ টাকা আর এগার বছরের ছেলে বোকাকে। চোরের ভয় দেখাইয়া পাড়ার হিতৈষীরা হাবুলের মার কাছ হইতে টাকাগুলি ক্রমে ক্রমে আত্মসাৎ করিল। বোকাকে মানুষ করিবার জন্য আবার হাবুলের মাকে গতর খাটাইতে হইল।

বোকা মানুষ হইল বটে কিন্তু ঘরবাসী হইল না। যে বছর সে তিনটে পাস দেয় সেই বছর উত্তর পাড়ার উমাচরণ অনেক বলিয়া কহিয়া মায় হাবুলের মার পায়ে পর্য্যন্ত ধরিয়া বোকাকে জামাই করিয়াছিল। উমাচরণের পয়সায় বোকা এখন উকিল হইয়াছে এবং শ্বশুর বাড়ীতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে। বাজারে 'কেষ্টবাবু' বলিয়া তাহার নাম ডাক খুব। কিন্তু তাহাতে হাবুলের মার কি? সে সেই ভাঙ্গা ঘরে বুড়হাড়ে পরের বাড়ী গতর খাটাইয়া দু'বেলা দুই মুঠা ভাত খায় আর নাতি-নাতবৌ দেখিবার ইচ্ছা হইলে ময়লা তালি দেওয়া কাপড় খানায় অঙ্গ ঢাকিয়া উমাচরণের বাড়ী হাজির হইয়া 'কেষ্টবাবু'র ইজ্জত নষ্ট করিয়া বোকার নিকট হইতে গাল খায়!

সেদিন বিকালে শরতের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া যখন ইরার মুখে শুনিল তাহারা 'বদ্যিনাথে' হাওয়া খাইতে যাইতেছে, কিরপা উড়েটা সঙ্গে যাইতেছে বটে কিন্তু রান্না-বান্নার জন্য তেমন একটি লোক পাওয়া যাইতেছে না, বাড়ীতে বারমাস হেঁসেল ঠেলিতেছে বলিয়া দু'দিনের তরে বাহিরে বেড়াইতে গিয়াও সে ঠেলিতে হইবে ইরার আদৌ ইহা ইচ্ছা নাই। হাবুলের মা আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। দু চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া ইরাকে বলিল "নিবি মা আমায় সঙ্গে? তোর রান্না-বাড়া থেকে ঘরকন্নার সব আমি দেখব—তোর মন্টিকে নিয়ে থাকব—তোকে কিছু করতে হবে না—আমায় নিয়ে চ' মা! জগতে খাটতে এসেছিনু—জীবন ভোর খেটে যাই—কবে ম'রে যাব ঠাকুর দেবতার মুখ আর দেখা হবে না। শরতকে বল মা, তোর মন্টীকে আমার চুলের প্রেমাই দিয়ে আশীর্ব্বাদ করব।" হাবুলের মা'র আবেদন ইরায় চট্ করিয়া নিজের মার আবেদন মনে পড়িয়া গেল। কিন্তু সেদিন শরতের সহিত কথা কাটা-কাটির পর আর সে কথা পাড়িতে তাহার সঙ্কোচ বোধ হইল। উপরন্তু নিজের গর্ভধারিণীকে দিয়া বিদেশে জামায়ের সাক্ষাতে ঝি-চাকরের কাজ-কর্ম্ম করাইতে সে কিছুতেই পারিবে না। তার চেয়ে হাবুলের মাই ভাল। শরতকে সে কথা বলিতে, কি ভাবিয়া শরতও রাজী হইল।

শরতের এক ভগ্নিপতির দেওঘরে একখানি ছোট্ট বাড়ী ছিল—বলা-বাহুল্য শরত ছুটীর একমাস সেই বাড়ীর দখলীকার স্বত্ব সুবন্দোবস্তে আয়ত্ত করিয়াছিল।

(২)

গাড়ীতে চড়িয়া মন্টির কি আমোদ! একবার বাপের কোলে উঠিয়া, জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া, হাত মুখ চোখ নাড়িয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া যায়, তার পরই নামিয়া মার দুই হাঁটুর মধ্যে পড়িয়া ঘোমটার পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়া শরতকে ডাকিয়া বলে "বাবু—দেখ্!"

ইরা হাসিয়া তাহার দুই গালে দুইটি চড় জোড়ে উঠাইয়া আস্তে বসাইয়া দেয়!

মন্টী—প্রাণপণে নিজেকে ইরার কবল হইতে মুক্ত করিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট একটি অপরিচিতা কিশোরীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। যেন তার কত দিনের চেনা!

হাবুলের মা কিরণার সহিত থার্ডক্লাশেই আশ্রয় লইয়াছিল। মন্টি শরতকে জিজ্ঞাসা করিল, বাবু—কিল্‌পা কই ?'

শরত বলিল "সে বাড়ীতে।"

"বুল থাকুমা ?"

"বুড় ঠাকুমাও—বাড়ীতে।"

তারপর মন্টি বাড়ীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল "বাবু এটা কাদেল্ বাড়ী ?„

শরত বলিল "তোমার শ্বশুরদের।"

প্রশ্ন হইল "শ্বশুরা কোত্তা ?"

"যমের বাড়ী।"

মন্টি নিশ্চিন্ত হইল। খানিক পরে—শরতকে চুরুট টানিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিল "কি খাচ্চ বাবু—?"

"তামাক খাচ্চি।"

প্রশ্ন হইল "কেন ?"

শরত বলিল "ক্ষিদে পেয়েছে।"

মন্টি বলিল "আমি খাব বাবু—আমাকে খিদে পেয়েছে—?"

হাসিয়া শরত বলিল "তুমি ছেলে কিনা, তোমার খেতে নেই।"

বুদ্ধি করিয়া মন্টি জিজ্ঞাসা করিল "মাল্ খেতে আছে ? মা ত বল হয়েছে—"

গাড়ী-শুদ্ধ সবাই হাসিয়া উঠিতে ইরা অপ্রস্তুত হইয়া তাহার গালে ঠাস করিয়া এক চড় বসাইয়া দিল। মন্টি পার্শ্বের যাত্রীদের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া বুঝিল তাহার অপমানটা তাহারা সকলে উপভোগ করিতেছে। মনের দুঃখে করুণ নেত্রে পিতার মুখের পানে চাহিয়া হাঁ করিয়া টানিয়া কান্না আনিল "এঁ্যা—এঁ্যা

তাহার অভিমান বুঝিয়া শরত আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইল, মন্টি-কোলে উঠিয়া দেখিল ইরা স্বল্পাবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে হাসিতেছে। মন্টি রাগিয়া একটি চোখ দুই হাতে চাপিয়া অপর চক্ষুটির ঈষৎ বক্রদৃষ্টিতে ছোট্ট জিভখানি বাহির করিয়া মাকে মুখ ভেঙ্গাইল।

পার্শ্বের একটি ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিল "আপনার খোকার বয়স কত হল ?"

শরত বলিল—"বছর তিনেকের হবে।"

ইরা ঘোমটার ভিতর হইতে ফিস্ ফিস্ করিয়া শরতকে বলিল "ফাগুনে চার বছরে পড়বে।"

একটু পরেই সবার কথার মাঝখানে মন্টি বাপের কোলেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ট্রেণের বিরাম নাই। মাঝে মাঝে এক একটা —ষ্টেশনে থামিয়া, দু'পাশের সীমাহীন মাঠের মধ্য দিয়া আপন মনে দিগন্ত ধ্বনিত করিয়া ছুটিয়াছে—চিহ্নিত লৌহপথের উপর দিয়া।

ক'ঘণ্টার-ই বা পথ!

ষ্টেসনে নামিয়া মন্টিকে ইরার কোলে দিয়া শরত কিরণা ও হাবুলের মাকে নামাইয়া এবং একখানা গাড়ি ভাড়া করিয়া বাসার উদ্দেশে চলিল! মন্টি তখন জাগিয়াছে।

(৩)

নূতন বাসাটি সকলেরই পছন্দসই ছিল। খান তিন-চার শোবার ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, পায়খানা, ছোট্ট উঠানের ভিতর একটি কূয়া মায় আশে পাশে দু'চারটি ফলফুলের গাছ্ পর্য্যন্ত লাগান। বাড়ীর পাহারাদার 'ভিখন' ত ছিলই!

পৌঁছিবার খানিক পরে শরত তেল মাখিয়া ভিখনকে দু'বাল্‌তি জল তুলিয়া দিতে বলিলে, ভিখন সসম্ভ্রমে শরতকে বসাইয়া এমন ভঙ্গীতে তাহার মাথায় জল ঢালিয়া, গা

রগড়াইয়া স্নান করাইতে লাগিল যে চিরকাল পুকুরস্নানে অভ্যস্ত শরত হাসিয়া গড়াইয়া পড়িলেও সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেল।

ইরার পরামর্শে সেদিনের মত আহারাদি পর্ব্ব সংক্ষেপ করিবার জন্য হাবুলের মা খিচুড়ি চড়াইয়াছিল। গরম গরম খিচুড়ি পরম আগ্রহে ভাজা, তরকারী ও চাটনি সংযোগে উদরস্থ করিয়া সকলেই সেদিন পরিতৃপ্ত হইল কিন্তু মন্টির মুখে রুচিল না। একে গরম তার উপর হাবুলের মার অকুণ্ঠ হস্তের প্রসাদাৎ লঙ্কার পরিমাণ একটু বেশী হইয়া পড়িয়াছিল। মন্টি খাইবে কি, একটু গরম খিচুড়ি গালে তুলিয়াই ফেলিয়া দেয়, তারপর ঠাণ্ডা তরকারী খানিকটা গালে তোলে তাহাও ঝাল যায় চাটনি পর্য্যন্ত! তাহাও ফেলিয়া দেয়। লোভে পড়িয়া মুখে তুলিল অনেক কিছু কিন্তু কিছুই উদরস্থ করিতে পারিলনা। অধিকন্তু চোখের জলে, নাসিকা নির্গত জলীয় পদার্থে তাহার সারা বুক-পেট ভিজিয়া গেল। শেষে বেচারী হতাশ হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং আহার স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পলাইল।

শেষে দুধ ও দোকান হইতে খাবার আনাইয়া ইরা তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিল।

বেড়াইতে আসিয়াছিল বটে কিন্তু ইরা গৃহস্থের অমর্য্যাদা করে নাই। বিছানাপত্র ও পোষাক পরিচ্ছদাদিতে সে পুটলি ও বাক্সের সংখ্যা এত বাড়াইয়াছিল যে শরতকে অনেকগুলি রেজকী ট্রেণে টিকিট চেকারের পকেটে তুলিয়া দিতে হইয়াছিল। বাসায় পৌছিয়া সেগুলি ইতস্ততঃ অবিন্যস্ত ভাবেই পড়িয়াছিল। বৈকালের দিকে অবসর মত গুছাইবে ভাবিয়া ইরা সেগুলিতে হাত দেয় নাই, মাত্র—সকলের উপস্থিত ব্যবহারের জন্য একটি বড় ট্রাঙ্ক হইতে কাপড় গামছা চাদর প্রভৃতি বাহির করিয়া লইয়াছিল।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া কিরপা—ভিখনের সহিত বাহিরের বারান্দায় একখানি মাদুর বিছাইয়া গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল। হাবুলের মা অক্লান্ত হইয়া একখানি খালি ঘরের মেঝেয় আঁচল বিছাইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে নাক ডাকাইয়া একটু গড়াইয়া লইতেছিল এবং অন্য ঘরে শরত ইরাকে লইয়া পড়িয়াছিল এক মহাসমস্যার সমাধানে।

বিকালে বেড়াইতে যাইবার কথা উঠিতে ইরা বলিল "ভিখন আর খুড়িমা বাড়ীতে থাকবেখ'ন কিরপা মন্টিকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে যাবেখন—"

"তাই হবে—" বলিয়া শরত উঠিয়া গিয়া পুঁটলির ভিতর হইতে একটি কাগজের মোড়ক বাহির করিয়া আনিয়া ইরার হাতে দিল। সাগ্রহে খুলিয়া তাহার ভিতর একজোড়া জরির নাগ্‌রা জুতা দেখিয়া ইরা হাসিয়া বলিল "আমার পূজার বকশীস নাকি?"

অপ্রস্তুত হইয়া শশব্যস্তে শরত বলিয়া উঠিল ধোৎ,—দেখ দেখি পায়ে ঠিক হয় কি না—"

অবাক হইয়া ইরা বলিল "কার পায়ে গো—?"

শরত বলিল "আমার এ গোদা পায়ে ও জুতো ঢুকবে না নিশ্চয়ই তারপর যার পায়ে লাগে তাকেই পরতে হবে।

ঠাট্টা করিয়া ইরা বলিল "যদি কিরপার পায়ে লাগে?"

শরত ফাঁপরে পড়িল। ছোঁড়াটার পায়ে লাগিলেও লাগিতে পারে। কথার মোড় ফিরাইয়া শরত বলিল "না না তামাসা নয়, দেখ না পায়ে দিয়ে—"

ইরা বলিল "পাগল হয়েছ, আমি জুতো পায়ে দেবো কোন দুঃখে—"

শরত বলিল "দেখবেখন বিকেল বেলা রাস্তায় মেয়েরা পিপড়ের সারে চলেছে কারো পা খালি নেই—!"

ইরা বলিল যারা পরে তারা পরে আমি পরবো না, বলে জীবন গেল গোবর ঘেঁটে আজ পদ্মগন্ধ বাসি। লজ্জা করবে না বুঝি আমার?

হাল না ছাড়িয়া শরত বলিল "এখানে তোমার চেনা লোক কে আছে যে লজ্জা করবে? যারা কক্ষণো পরে না তারাও এখানে এসে জুতো পরে—দুদিন থাকলে সব দেখতেও পাবে।"

মুখ ঘুরাইয়া ইরা বলিল—হ্যাঁ, আমি এখানে জুতো-মোজা পরে নাচি আর খুড়িমা দেশে গিয়ে ঢাক পিটুক। তোমায় ত শুনতে হবে না—হবে আমাকে!"

গম্ভীর হইয়া শরত পাশ ফিরিয়া শুইল!

ইরা বুঝিল স্বামী ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। সে আড় হইয়া শরতের গায়ের উপর পড়িয়া তাহার মুখখানা সোজা করিয়া বলিল—"অভিমান হ'ল বুঝি?"

শরত বলিল "না"—

শরত বলিল "ঘুম পাচ্ছে—"

ইরা তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল "না। ঘুমুতে হবে না—আমি জুতো পরি দেখ—"

শরত উঠিয়া বসিতে ইরা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—"ইঃ—বাবুর অভিমান কত !"

শরত বলিল "কই পায়ে দাও—"

ইরা তাহাকে ঠেলিয়া শোয়াইয়া দিয়া নিজে পাশে শুইয়া বাঁ হাতে শরতের গলাটি জড়াইয়া বলিল "বেড়াতে বেরুবে তো বিকেলবেলা—এখন জুতো পরে আর কি করবো, সেই সময়ে দেখা যাবে'খন। ধন্তি কোট্ যাহোক তোমার !—এখন একটু ঘুমুই এস—"বলিয়া হঠাৎ ইরা তড়াক্ করিয়া বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। শরত ব্যপার না বুঝিয়া উঠিয়া বসিল। শুনিল বারান্দায় দাঁড়াইয়া ইরা ভিখণ ও কিরপাকে মণ্টির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। শরতের মনটা ছ্যাৎ করিয়া উঠিল। সে বাহিরে আসিতে ইরা ভীতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল "ওগো মণ্টি কোথা ?"

শরত দমিয়া গিয়া বলিল "সেকি ?—"

চোখের পলকে—ইরা ছুটিয়া যে ঘরে হাবুলের মা ঘুমাইতেছিল সে ঘরে ঢুকিয়া ধাক্কা দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "খুড়িমা মণ্টি ?—"

কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় হাবুলের মা প্রথমে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া লালা নিঃসৃত মুখ মুছিয়া বস্ত্র সংযত করিয়া যখন ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিল তখন সে চীৎকার না করিয়া থাকিতে পারিল না।

তাহার চীৎকারে ইরা চীৎকার করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। শরত মণ্টির উপর নজর না রাখার জন্য কিরপার গালে এক প্রচণ্ড চাপড় বসাইয়া দিয়া ভিখনকে লইয়া প্রতি ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বাড়ীর আস্ পাশ্ খুঁজিতে ছুটিল ! মুহূর্ত্তে ব্যাপার বিষম হইয়া দাঁড়াইল ! কিন্তু মণ্টিকে পাওয়া গেল না।

ইরা ও হাবুলের মা'র চীৎকারে আসেপাশের অনেক স্ত্রীপুরুষ জমা হইল। অনেকে শরতকে পুলিশে খবর দিতে উপদেশ দিল, অনেকে ছেলে ধরার ভয় দেখাইল, অনেকে প্রথম দিন আসিয়াই বেচারীদের এই বিপদে পড়িতে দেখিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই—সেই বিশাল জনতার চিহ্নমাত্র রহিল না।

বাড়ীর মধ্যে ইরার অবস্থা দেখিয়া শরত আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিল না—বালকের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। শরতকে কাঁদিতে দেখিয়া ইরার ও হাবুলের মা'র ক্রন্দনবেগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। কিরপা ত চড় খাইয়া অবধি কাঁদিতেছে। একা ভিখন কাহাকে প্রবোধ দিবে আর কি বলিয়াই বা প্রবোধ দিবে ? এতকাল দেশে বাস করিতেছে কই এমন ব্যাপার ত পূর্ব্বে কখনো ঘটিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল না। যেন ভৌতিক কাণ্ড ! ভয়ে তাহারও যেন হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছিল। মধ্যে সে একবার তার এক বন্ধুকে ডাকিয়া কূয়ার ভিতর পর্য্যন্ত নামাইয়াছিল, যদি কোন প্রকারে দামাল ছেলে বুক বহিয়া জলে পড়িয়া থাকে কিন্তু সেখানেও কোন ফল হইল না ! এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ীর অবস্থা যেন শ্মশানে পরিণত হইল !

ক্লান্ত হইয়া ভিখন একেবারে শেষের দিকের ঘরের দরজায় বসিয়া পড়িল। সেই ঘরখানিতেই ইরা তাহার বাক্স-প্যাটরা রাজ্যের পুঁটলি-পোটলা জড় করিয়াছিল ইচ্ছা ছিল অবসর মত যথাস্থানে সব গুছাইয়া রাখিবে। উবু হইয়া দুটি হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া ভিখন বসিয়াছিল ; হঠাৎ কিসের শব্দে সে চমকিয়া উঠিল। উঠিয়া ঘরের চারিদিক ভাল করিয়া দেখিল, কাহাকেও দেখিতে পাইল না অথচ শব্দটা যে ঘরের ভিতর হইল সে বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। শেষে কি সত্য সত্যই তাহাকে বুড়া বয়সে ভৌতিক ব্যাপার বিশ্বাস করিতে হইবে, ভাবিয়া ভিখন চুপ করিয়া ঘরের ভিতর উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায় মিনিট তিন চার পরে আবার একটা শব্দ হইল কিন্তু এবার ভিখন ঠকিল না, ছুটিয়া ইরার বড় ট্রাঙ্কটির ডালা খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে যাহা দেখিল তাহাতে বুড়া লাফাইয়া উঠিল। প্রকাণ্ড খালি ট্রাঙ্কটার ভিতরে মণ্টি কাত হইয়া পড়িয়া আছে। ঘামে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে যেন এইমাত্র পুকুর হইতে ডুব দিয়া আসিতেছে। মিট মিট করিয়া চাহিতেছে বটে কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলিতেছে টানিয়া টানিয়া। তাহাকে দেখিয়া ভিখনের কোটরস্থ ঘোলা চোখের কোণ বহিয়া

হু হু করিয়া জল গড়াইতে লাগিল, সে ভাবিল সীতারামজী তাহার ডাক শুনিয়াছেন! একবার ভাবিল চীৎকার করিয়া বাড়ীর সবাইকে এখানে জড় করে, আবার কি ভাবিয়া দৌড়িয়া নিজের ঘর হইতে একখানা পাখা আনিয়া মন্টিকে সযত্নে ট্রাঙ্কের ভিতর হইতে কোলে তুলিয়া বাতাস করিতে লাগিল। মন্টি ভুরু কামান চুলপাকা বুড়টিকে ত আগে দেখে নই তাই তাহার কোলে থাকিতে অসম্মতি জানাইল। ভিখনকে ঘর হইতে ছুটিয়া পাখা আনিতে দেখিয়া কিরপাও পিছনে পিছনে আসিতেছিল ঘরের ভিতর মন্টিকে দেখিয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল—"ইয়ে কপাল জগড়নাথ—অ—"

তাহাকে এক ধমক দিয়া ভিখন, যেখানে ইরা মেঝেয় পড়িয়া, চেঁচাইতেছিল সেখানে গিয়া বলিল খোকা যখন ওঘরে বসিয়া রহিয়াছে তখন বহুজীর এত রোতার দরকার কি?

কথাটা কাণে গেলে ইরা তীর বেগে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোথা খোকা?"

ভিখন কহিল "ও ঘরমে—"

বাপের বয়সী বৃদ্ধের কথা বিশ্বাস করিয়া ইরা নিমেষে সেই ঘরে গিয়া মন্টিকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অজস্র চুমায় তাহার বায়ুবদ্ধ রক্তিম মুখখানিকে ভরাইয়া দিল। তখন শরত আসিল, হাবুলের মা আসিল, সংবাদ পাইয়া আর একবার প্রতিবেশীরা জড় হইল!

শরত জিজ্ঞাসা করাতে ইরা চোখে জল মুখে হাসি লইয়া বলিল "ঠিকই হয়েছে, বড় বাক্সটা থেকে আমি কাপড় চোপড় সব বার করে নিয়ে যাই—যাবার সময় তাড়াতাড়িতে ডালাটা বন্ধ করিনি; আর ঘট্‌ঘটে ছেলে তোমার তার ভেতর নেমে খেলা করতে গেছলো, নাড়া পেয়ে ডালাটা প'ড়ে—বাক্সবন্দি!"

বহির্ব্বাটিতে কারণ শুনিয়া একটা হাসির রোল উঠিল। সকলে শরতের সুপ্রসন্ন অদৃষ্টের দোহাই দিয়া খোকার উপর বিশেষ নজর রাখিতে বলিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।

সব কাজ ছাড়িয়া কিরপার উপর মন্টির পাহারার ভার পড়িল। শরত হাসিয়া ইরাকে বলিল—"তোমার ছেলে যে এই বয়সে এমন লোক হাসাবে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি!

ইরা জবাব দিল "নতুন জায়গায় এসে একদিনেই আমার ছেলে তোমায় বিখ্যাত করে দিলে! ভয় নেই, ভবিষ্যত তোমার ভালই বোঝা যাচ্ছে!"

হাবুলের মা আসিয়া ইরাকে বলিল "অ বৌমা, ঘরে গিয়ে সত্যনারাণের সিন্নি দিস্, আর শেতলা পঞ্চানন্দ বুড় শিবের চিনির নৈবিদ্যি মানসিক্ করিছিনু দিস্, আর স-পাঁচ আনার পয়সা তুলে রাখ্ মা—হরি সভায় নোট্ দিতে হবে—"

ইরা হাসিয়া মন্টির মুখের পানে চাহিয়া সস্নেহে তাহার গাল দুটি ঈষৎ টিপিয়া দিয়া বলিল "দেব বইকি খুড়িমা!

কে?

শ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়

নন্দনেরি গর্ব্বভরা ফাগুন-গানের সুর তুলে
কে তুমি মোর এলে মনের বনে
স্পর্শ ক'রে মর্ম্মখানি নিদ্রা-বিহীন চোখ খুলে;
আল্‌তা-পায়ের নূপুর-গুঞ্জরণে।

কে গো তুমি মানবী না কবির সাধের কল্পনা,
ছবির রাণী,—বুকের বধূ!
হৃদয়-তারে সঙ্গীতেরই সুরের শুধু মূর্চ্ছনা;
প্রেমিক কবির সব ভোলান মধু।

নারায়ণী সেনা

শ্রীবিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায় **প্রবন্ধ**

আচ্ছা, জগৎটা কি আপনি হয়েছে বোলে বোধ হয় ?

আপনি হওয়া মানে ?

অর্থাৎ, যাকে বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, fortuitous concourse of atoms।

শুধু মিলনই fortuitous না পরমাণুসমূহের অস্তিত্বও fortuitous ?

তা, তা, তা, যাই হোক্ না।

সে কথাটা স্পষ্ট কোরে জিজ্ঞাসা কোরে নিও।

আচ্ছা, মেনে নেওয়াই যাক্ না যে, পরমাণুসমূহের অস্তিত্বও accident—দেখা যাক্, কোথাকার জল কোথা যায়।

বেশ। কিন্তু তাদের মিলনকে যে accidental বোলছো, অথচ বৈজ্ঞানিকগণই বলেন যে, এই মিলনের ভিতর একটা আইন আছে। আইনের অস্তিত্ব এবং accident—এ দুটো পরস্পর বিরোধী কথা।

মিলনের আবার আইন কি ?

Law of attraction—এই আকর্ষণ না থাক্‌লে মিলন সম্ভবপর হতো না।

কিন্তু এই আকর্ষণটাও ত accident হোতে পারে।

পারে, নাও পারে।

তা হোলে কি দাঁড়ালো ?

কিছুই না।

আচ্ছা, জগৎটা যে পরমাণুসমূহের সমষ্টিমাত্র, এ পর্য্যন্ত ত ঠিক ?

সমষ্টি নয়, মিলন। সমষ্টি একটা mechanical জিনিস, তার ভিতর কোনও প্রাণ নেই। কিন্তু মিলন প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত।

আচ্ছা, মিলনই না হয় হলো। কিন্তু এই মিলনের কোন্ উদ্দেশ্য আছে কি ?

নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝ্‌তে চেষ্টা কর। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এখানে থাই পেতেই পারে না।

কেবল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের objective অভিজ্ঞতা থাই না পেতে পারে। মনকে ইন্দ্রিয় বোল্‌তে হয় বল বা Subject বোল্‌তে হয় বল, এই মনেরও অভিজ্ঞতা তার সঙ্গে জুড়্‌তে হবে।

তাতেও যে বেশীদূর এগুতে পারা যাবে বোলে বোধ হয় না।

এগিয়েই দেখ না, কতদূর যেতে পার।

দেখেছি। সৃষ্টির ভিতর একটা law খুঁজে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কোন moral বা intelligent উদ্দেশ্য সব-সময় পাওয়া যায় না।

কেন ?

আগুনে হাত পোড়ে, পুড়ুক্,—তাতে আমার আপত্তি নেই, যদি তোমার আমার মত অভিজ্ঞ ব্যক্তির হাত হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতাহীন কচি ছেলেও যদি আগুনে হাত দেয়, তার হাতও পোড়ে। এটা কি নিতান্ত জড় আইন নয় ?

কিন্তু কচি ছেলে ত ভুঁইফোঁড় নয়। তাকে রক্ষা কর্‌বার জন্যে তার আগেই তার বাপ-মার সৃষ্টি হয়েছে। এইখানেই জড়শক্তির উপর প্রেমের আধিপত্য।

মানি। কিন্তু সকলের মা-বাপ থাকে না। সুতরাং সেই সকল ক্ষেত্রে জড়শক্তির নিকট প্রেমের পরাজয়। সৃষ্টির উপর কোন স্রষ্টা বা নিয়ন্তা আছেন কি না সন্দেহ হয়। থাক্‌লেও তিনি প্রেমময় নন্, নির্ম্মম যন্ত্রবিশেষমাত্র।

স্থূলদৃষ্টিতে তাই বটে। আবার একটু তলিয়ে দেখ্‌লে এইখানেই প্রেমের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা বা সম্পূর্ণতা।

কি রকম ?

যদি সকলেরই মা-বাপ থাক্‌তো, কেউ নিজের ছাড়া পরের ছেলে-মেয়ের মা-বাপ হবার অবসর পেত না। সুতরাং প্রেমের গণ্ডী সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হোয়ে

পোড়্‌ত। আমার ক্ষুদ্র প্রাণে প্রীতির যে ক্ষীণ স্রোতটুকু বইছে, অনন্ত বিশ্বপারাবারের সঙ্গমলাভ কোরে আপনাকে সার্থক কোরে তুল্‌তে পারত না। moral অথবা, physical, যে-দিক দিয়েই দেখ না কেন, এই বিশ্বের constitution এরূপ যে, কেউ কারও হ'তে পৃথক নয়, প্রতি অণু-পরমাণুই একসূত্রে গাঁথা। "গ্রহের ফেরের" কথা প্রসঙ্গে এর একটা দিক তোমাকে বুঝিয়েছিলাম। কথাটা আরও অনেক রকমেই বোঝান যায়।

কি রকম ?

এই বিরাট সৃষ্টি, এটা কি ? সংখ্যাতীত সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম অণু-পরমাণুর মিলন ছাড়া কিছুই নয়। এই মিলন সম্ভব হয় কেবল পরস্পরের প্রতি তাদের একটা আকর্ষণ আছে বোলেই। সুতরাং এই আকর্ষণই সৃষ্টির একমাত্র final বা ultimate কারণ।

শুধু আকর্ষণ নয়। আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ, এই দুয়ে মিলে সৃষ্টি এবং লয় অর্থাৎ নবসৃষ্টি ঘটাচ্ছে।

যেটাকে বিকর্ষণ বলি, বাস্তবিক সেটা আর-একটা জিনিসের আকর্ষণ। যখন যার আকর্ষণ প্রবলতর হয়, তারই সঙ্গে মিলন হয়। সুতরাং আকর্ষণই একমাত্র শক্তি। অন্তরের আকর্ষণকে প্রেম বলি। বাহিরের আকর্ষণকেই বা এ-নামে অভিহিত কোরতে দোষ কি ? এই আকর্ষণই প্রেম, এবং প্রেমই ঈশ্বর—God is Love। প্রতি অণু-পরমাণু একসূত্রে গাঁথা বোল্‌ছিলাম না ? সে সূত্রও এই প্রেম বা ঈশ্বর।

ভগবান কেবল সূত্রমাত্র, এ-কথা বোল্‌লে কি তাঁকে খেলো করা হলো না ?

তিনি নিজেই বোলেছেন—সূত্রে যেমন মণিগণ গ্রথিত, তেমনি আমাতে এই বিশ্ব গ্রথিত। বাইবেলেও আছে, In Him all things consist—একই কথা। তবে এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে, উপমামাত্রই অসম্পূর্ণ, যেখানে যেটুকু খাপে সেইটুকু খাপিয়ে নিতে হয়।

বিশ্বের উপাদানীভূত অণু-পরমাণুগণকে তিনি কি কেবল গ্রথিত কোরেছেন মাত্র ? তিনি কি করেন নি, তিনি কি এদের কারণ নন ?

হ্যাঁ।

পিতা যেমন পুত্রের কারণ, সেইরূপ ?

হিন্দুশাস্ত্রমতে পিতা যেমন পুত্রের কারণ, সেইরূপ।

তার মানে ?

হিন্দুশাস্ত্রমতে পিতা জায়ার গর্ভে নিজেকেই উৎপাদন করেন। তিনিও তেমনি প্রকৃতির মধ্যে নিজেকেই প্রকাশ করেন।

প্রকৃতি কি ?

পূর্ব্বোক্ত অণু-পরমাণু বা শক্তিসমূহের সমাবেশ।

অণু-পরমাণুগণ কি abstract শক্তি ? তাদের কোনও concrete অস্তিত্ব নেই ?

শক্তির concrete অস্তিত্ব দর্শন বা বিজ্ঞান বা কিছুরই বিরোধী নয়। এবং শক্তি ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়।

তা হোলে তুমি বোল্‌তে চাও—A thing is a permanent possibility of sensations ? এটা তোমার idealism এর উপর অযথা পক্ষপাত।

না। Idealism বা materialism, কারও উপর আমার কোনও পক্ষপাত নেই। জড় চৈতন্য হতে উদ্ভূত বা চৈতন্য জড় হতে উদ্ভূত কিছুই আমি বলি না। আমি শুধু বলি, এ দুয়ের মধ্যে কোনও fundamental difference নেই, যদি কোনও তফাৎ থাকে, it is one of degree।

প্রকৃতি তা হলে শক্তির সমাবেশ ?

হাঁ। আদ্যাশক্তি, মহাশক্তি প্রভৃতি অনেক নামে তাকে অভিহিত করা হয়।

কিন্তু প্রকৃতি কি কোরে শক্তি হোতে পারে ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।

যেমন কোরে দাহিকাশক্তি আগুনের প্রকৃতি।

এটা যুক্তি না উপমা ?

উপমা।

কেন ?

বোলেছি ত উপমায় যেটুকু খাপে সেটুকু খাপিয়ে নিতে হয়। সব দিক দিয়ে খাপান যায় না। দাহিকাশক্তি আগুনের ইচ্ছাপ্রসূত নয়, উভয়েই তৃতীয় শক্তির অধীন।

প্রকৃতি যে শক্তিসমূহের সমাবেশ, Spinozaর ভাষায় একে "natura naturata "অথবা natura naturans" কি বলা ঠিক ?

বোল্‌তে পারি না। কপচান বুলি নিজেই বুঝতে পারি না, পরকে কি বোঝাবো ?

বেশ। তুমি তোমার নিজের ভাষাতেই বোঝাও।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কথা মনে কর। একদিকে নারায়ণ, অপর দিকে তাঁরই সৃষ্ট অসংখ্য নারায়ণী সেনা। এই অসংখ্য সেনাই প্রকৃতির অসংখ্য শক্তিসমূহ। সাম্রাজ্যবাদী চায় এই সকল শক্তির উপর আধিপত্য লাভ কোরে তাদের সাহায্যে নিজের মহিমা, নিজের প্রভুত্ব বিস্তার কোর্‌তে, দুনিয়া জয় কোর্‌তে। বর্ত্তমান ইয়ুরোপের কথা মনে কোরে দেখ। কিন্তু প্রকৃতির শক্তিসমূহ যতই অসংখ্য, অজস্র, রক্তবীজের ঝাড় এবং অজেয় হোক্ না কেন, তাদের উপর তাদের স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা আছেন। নিরস্ত্র নারায়ণের কাছে তাদের পরাজয়।

নারায়ণ নিরস্ত্র ?

সুদর্শন চক্র তাঁর অস্ত্র কিন্তু তাঁকে অস্ত্র ধারণ কোর্‌তে হয় না।

কেন ?

কালের চক্র আপনিই ঘুর্‌ছে, আর ভগবান হইতে উদ্ভূত প্রকৃতির শক্তিসমূহ সেই চাকাতে আপনিই লয় প্রাপ্ত হোচ্ছে।

সুদর্শন চক্র তা হলে কাল ?

কাল, যম, নিয়ম, যা ইচ্ছে-তাই বল।

তা হলে প্রকৃতির উপর আধিপত্য লাভের, তাকে জয় করার চেষ্টা বিড়ম্বনা ? এ বিষয়ে তুমি সংখ্যাকারের সঙ্গে একমত ?

সাংখ্য—বেদান্তের কথা তুল্‌তে চাই না। কেবল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যদি কোনও moral থাকে, সেইটুকু বুঝতে চাই।

কি বুঝলে ?

প্রকৃত শক্তি যোগী, বৈষ্ণব—হৃদিস্থিত পার্থসারথি নারায়ণের দ্বারা যে আপনাকে চালিত করে। যুদ্ধে তারই জয়।

———

বজ্রদগ্ধা

শ্রীপ্রমীলা রায়

(৮)

প্রভাতের সঙ্গে মীনার বিয়ে যখন ঠিক হয়ে গেল, তখন থেকেই রমাপতি যতীকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন। প্রভাতের সঙ্গে যতীর মেলামেশা, আলাপ-পরিচয় সবই, তাঁকে মুগ্ধ করেছিল—যতীকে তিনি যতই দেখ্‌ছিলেন, ততই দুঃখিত হচ্ছিলেন। কেবলই ভাব্‌ছিলেন প্রভাত যদি না এসে পড়তো তবে তো এই যতীই তাঁর 'আপনার জন' হতে পারতো। দশ বছরের ছেলে তিনি তাকে এনেছিলেন, আর এই ষোল বচ্ছর ধরে হাতে ধরে গড়ে-পিটে, ছাব্বিশ বছর বয়সে এসে দাঁড়াল। তাকে মানুষ করা তাঁর সার্থক হয়েছে। হয়তো এই রকম ভাবেই সারাজীবন সে কাটিয়ে দিতে পারতো, কিন্তু শুধু একটুখানি অবিবেচনার ফলে তাঁর হাত দিয়েই তাকে মনস্তাপ পেতে হল। কিন্তু যা' হয়েছে তার তো আর চারা নেই, আঘাত তিনি দিলেন, সুস্থও তিনি করবেন।—

প্রভাত চলে যাবার পরদিন সকালে, খুব দরকারী কি একটা কাজের কথা বলতে গিয়ে রমাপতি বাবু যতীর সাড়া না পেয়ে দরজাটা, অল্প ঠেলে ভিতরে ঢুক্‌লেন। তাড়াতাড়িতে রাত্রে আর দরজা বন্ধ হয়ে ওঠেনি। একটু আশ্চর্য্য হয়েই রমাপতি বাবু দেখ্‌লেন যে তখন পর্য্যন্তও সে ঘুমিয়ে—সাধারণতঃ খুব ভোরেই সে উঠে থাকে। হয়তো অসুখ হয়েছে ভেবে তিনি তাকে না ডেকেই চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু টেবিলের ওপর ভাঁজ করা কাপড়ের গোছ চাপা দেওয়া চিঠিখানি, তাঁকে সেখানে টেনে নিয়ে গেল। নিঃশব্দে টেবিলের ধারে গিয়ে তিনি চিঠিখানা তুলে নিলেন—পড়ে দেখ্‌লেন—পড়ার পরে দু-এক মিনিট সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে, ঘুমন্ত যতীর শিয়রে এসে দাঁড়ালেন। দেখ্‌লেন গভীর ক্লান্তি সমস্ত মুখ খানাতে ছাপ দিয়েছে—মাথায় বালিশ নাই সেটা খাটের এক কোণায় পড়ে আছে—মশারি ফেলা হয়নি—গায়ে যে ফিরোজা রংএর আলোয়ানখানা ছিল, সেইখানাই জড়ান, পরিশ্রান্ত ক্লান্ত যতী গভীর বিষাদে ঘুমিয়ে আছে।

একবার তিনি ভাব্‌লেন উঠিয়ে জিজ্ঞাসা করি, কেন সে বাড়ীতে থাক্‌ছে না! আবার ভাবলেন থাক্—'দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়ে একটু শান্তিতে ঘুমিয়েছে ঘুমাক্। ঘুমাও 'যতী ঘুমাও' বলে চিঠিটা নিয়ে তিনি যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, তেমনি নিঃশব্দে চলে গেলেন। এই সহায় সম্পদ হীন ছেলেটার ওপর স্নেহের তাঁর শেষ ছিল না। তাই তার ব্যথা অনুভব করে, দুফোঁটা জল চোখেই চেপে বেরিয়ে গেলেন।

বাগানে এসে দেখ্‌লেন, তত সকালেই মীনার স্নান হয়ে গিয়েছে—সে ছোট মেয়ের মত অকারণ আনন্দে সবুজ শাড়ীর আঁচল ভরে ফুল তুলেই যাচ্ছে। ফুটন্ত, আধ-ফুটন্ত লাল গোলাপগুলি তার আঁচল থেকে হাসিমুখে উঁকি দিচ্ছিল। মেয়ের সদ্যস্নাত স্নিগ্ধ মূর্ত্তিখানি রমাপতির বড় ভাল লাগল। সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝলেন যে আজকের এই আনন্দের মূলে প্রভাতের স্মৃতি আছে। যতীর জন্যে ব্যথার তাঁর শেষ ছিল না। কিন্তু মেয়ের শান্ত মুখখানি দেখে ভাব্‌লেন, যতী হয়তো এ মুখে এমন শ্রী ফুটিয়ে তুল্‌তে পারতো না। সে যাই হোক যা হয়ে গিয়েছে তা গিয়েছে। যতী 'ইয়ংম্যান' সে অনায়াসে এ ব্যথা কাটিয়ে উঠ্‌বে।

রমাপতিবাবুকে বাগানে তত সকালে আস্‌তে দেখে মীনা খুব অপ্রস্তুত হয়ে গেল। তার ফুল তোলার'

উৎসাহ যেন নিভে গেল। একটা আধফুটন্ত গোলাপ নিয়ে তাড়াতাড়ি তার গায়ে একটা পাতা জড়াতে জড়াতে সে বললে "বাবা, তোমার 'বটন হোলে' এটা পরিয়ে দিই ?"

"দেও" বলে রমাপতি বাবু এগিয়ে এসে মীনার একখানি হাত ধরে বললেন "মা, মীনু, বড় একটা সঙ্কটে পড়েছি, তুমি ছাড়া উদ্ধারের তো উপায় নেই দেখ্ছি।"

ফুলতোলা স্থগিত রেখে মীনা বললে "কি এমন বিপদ বাবা, যাতে বড়দার থেকে আমার সাহায্য— দরকার হোল ?

"বোস মা বোস্।—সবই বল্ছি—হ্যা বলতে আমায় হবেই—পাপ যে করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তো ? বলে তিনি মীনাকে নিয়ে বাগানে ফোয়ারার ধারে যে দুটো কাঠের বেঞ্চি পড়েছিল, তাইতে বসলেন।—

চোখে মুখে একরাশ ঔৎসুক্য ও আগ্রহ নিয়ে মীনা বসল—রমাপতি বল্তে লাগ্লেন।—

"অনেকদিন আগের কথা—জগমোহনের যে ছেলে আছে, তা তখন আমি জান্তাম না। একবার দেশে যাওয়ার দরকার হয়। ফিরবার সময় আমি যতীকে এক রকম নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় দেখে নিয়ে চলে আসি, তুই তখন চার বছরের আর যতী দশে পা দিয়েছে। সুস্থ, সবল, সুন্দর বুদ্ধিমান ছেলে—চোখে বুদ্ধির আলো ঠিকরে পড়্ছে—ভাবলুম—শুভ্রাংশু, সুধাংশু, হিমাংশু তিন ছেলে, আর একটী তার সঙ্গে মানুষ করবো। যাক্—নিয়ে তো এলাম—কিন্তু দু'চার দিন যেতে না যেতেই দেখলাম কেউই ওর ওপর সন্তুষ্ট নয়। দেখে আমি ওর সম্বন্ধে খুব সতর্ক হলাম—সামনে— কেউ আর কিছু করতে পেত না। যতী বুঝতো সবই কিন্তু মুখ ফুটতো না—কিছুতেই। তার এই ভাব আমাকে মুগ্ধ করলে।

ক্রমে ক্রমে একটু একটু করে সে কাজে-কর্ম্মে আমার প্রায় ডান হাত হয়ে দাঁড়াল। ইচ্ছা ছিল, তার সঙ্গে তোর বিয়ে দিয়ে চিরদিনের মত তাকে 'আপনার' করে রাখি। আভাসও তাকে আমি দিয়েছিলাম, সে কিন্তু সব জেনে শুনেও সীমা কোনদিন অতিক্রম করেনি। প্রভাত যদি না আসতো তবে হয়তো শীগগির বিয়ে দিয়েও ফেলতাম—কিন্তু এখন তা তো আর হয় না। যতী আমার প্রিয় এ আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছি—আর প্রভাত!—সে আমার মন কেড়ে নিয়েছে।—'

বাধা দিয়ে মীনা বললে "এতে আমার কি হাত আছে বাবা ? আমায় কি করতে হবে ?—

"কি ই বা বলি!—যতী জেনেছে, খুব ভাল করেই জেনেছে যে তার জায়গায় প্রভাত এসেছে। এত বড় আঘাত সহ্য করতে তাকে, আমাদের সাহায্য করতে হবে।—"

"বাবা, তুমি তো আমাকে আগে কিছুই বলনি! তা হলে আমি কখখনো—"

"মা মীনু! তুই আমাকে দোষ দিস্‌নে মা।—যতীর আজ সকালের ঘুমন্ত বিষণ্ণ মুখ আমাকে কেবল খোঁচাচ্ছে তার মনে এ দুরাশা কে জাগিয়ে দিয়েছিল?—আমিই তো ? তার মন থেকে এ আঘাতের কথা মুছে ফেল্তে, তার মুখে আবার অমলিন হাসি ফুটোতে তুই আমাকে সাহায্য কর্ মা!—

"তুমি বলে দিও বাবা, কি করতে হবে!—

"দেখ্ মা, তার টেবিলের ওপরে এই চিঠিটা আজ সকালে পেলাম, পড়ে দেখ সে আমাকে কি জানিয়েছে। যতী, আমার শুভ্রাংশু, সুধাংশুর চেয়ে কোন অংশে কম নয় আমার কাছে।"—

মীনা তার বাবার হাত থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে পড়ল।—ভাবলে যে শুধু তার জন্যে যতী এক কথায় বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে পারে সে এমন কি জিনিস?— যতীর মনের এ দিকটা তো সে কোনদিন লক্ষ্যই করেনি। ছেলে বেলার খেলা ছাড়া আর কোন ভাব যে যতীর মনে থাকতে পারে, এটা যেন নেহাৎ অবিশ্বাসের কথা। বাবার সঙ্গে এসব নিয়ে আর আলোচনা করতে তার মাথা কাটা যাচ্ছিল।—

মেয়েকে সঙ্কট থেকে মুক্তি দিয়ে রমাপতি বল্লেন "আমি তাকে আরও কাছে ডেকে নেব, তুইও যেন বাদ দিয়ে চলিস্‌নে মীনু, তোর কাছে আমি এই চাই।—

"তাই হবে বাবা—কিন্তু যতীদাকে এড়িয়ে চলতেই বা হবে কেন?—সে যে আমার ছেলে-বেলার খেলার সাথী, একথা সে ভুললেও, আমি ভুলব কেন বাবা?"—

"ভুলিসনে, মা ভুলিসনে"।—বলে রমাপতি সেখান থেকে উঠে ব্যস্ত ভাবে চলে গেলেন।

মীনা সেই ফুলগুলি আঁচলে গুছিয়ে নিয়ে যতীর ঘরে গিয়ে দেখলে সে তখনও ঘুমোচ্ছে। দেখে সে দুঃখিতা হয়ে ভাবিলে না। জানি কাল কত রাত্তির বসে বসে এই ছাই এর ভাবনা ভেবেছে!"—

টেবিলের ওপর চিঠি যখন পেলে না, তখন বাধ্য হয়ে যতী মীনাকে বল্‌লে, "আমার ঘরে আর কেউ এসেছিল, জান?"—

"বাবা বোধহয় এসেছিলেন কারণ তিনি এই ঘরে থেকেই গেলেন দেখলাম।"-

"আর গিয়েই বুঝি তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন? তাই বলি, হঠাৎ তোমার শুভাগমন এ ঘরে হল কেন? তার পর আজ সকাল বেলাই অনুগ্রহ কেন? বকনি দিতে সাধ হয়েছে বুঝি?..."

"আচ্ছা যতীদা!—ওই জন্যে তোমার সঙ্গে আমার বন্‌ল না কোনদিন!—আমি বুঝি কেবলই তোমাকে বকি আর ফরমাস্—করি?"

"বন্‌বে না ও কোনদিন!—অত ফুল তুলেছ কেন? কি হবে? মালা হবে? কাকে পরাবে?—প্রভাত বাবু তো এখানে নাই।"—

"তা আমি জানি।—কিন্তু যতীদা গোলাপে কি মালা হয়? গোলাপ তোড়া বেঁধে ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখ্‌তে হয়। মালার ফুল হ'ল বেল, কুন্দ, যুই, বকুল এই সব।—"

"ঠিক—গোলাপ সুন্দর হলে কি হবে?—ফুলদানীতে রাখা ছাড়া আর কিছু হয় না, তা ছাড়া আনাড়ী মালী হলে, তুল্‌তে হাতে কাঁটা ফুটে রক্ত পাত!—"

মীনা চুপ করে রইলো। বুঝলে ফুলকে উপলক্ষ্য করে যতী অন্য কথা বলে যাচ্ছে।—তাঁও একটু চুপ করে থেকে বল্‌লে, "তারপর, আপ-টু-ডেট মহিলা!—বিয়ের দিন করে ঠিক করলে কিছু জানালে না আমাকে এতদিনের বন্ধু আমি—তোমার! একদিন খাওয়ালেও না। তোড়-জোড় করে আমিই তো এনে জোটালাম। আর এখন পরামর্শের সময় বুঝি আমি বাদ!—তা হ'বেই তো!—কলিকাল কি না?—তোমার গতিক দেখে মনে হচ্ছে, বিয়ের রাত্রের লুচিটাও বোধহয় বাদ যাবে।—"

মীনা দেখলে যতী ক্রমশঃ সহজ হয়ে আস্‌ছে—সেও পরিহাস তরল কণ্ঠে বললে "আমার বিয়ে হচ্ছে বলে, তোমার খুব হিংসে হচ্ছে, না যতীদা? আচ্ছা বাবাকে বলব তোমারও একটা বিয়ে দিয়ে দিতে। তা হলেই তো সমান হল?—

'কি করে? তুমি বিয়ে করবে প্রভাত বাবুকে—যার টাকা নিয়ে নবাবী করবে।—আর আমি বিয়ে করব কোনো মেয়েকে যার জন্যে শেষে হয়তো আমায় ফকিরি নিতে হবে। কি করে সমান হল?—বরং প্রভাত বাবুর ও আমার অবস্থা সমান বলতে পার।—"

"সকাল বেলা অত করে নাম করো না—বিষম লাগবে।—"

"ও বাবা—এত দরদ এখনি? - "

"হবেনা?—হিন্দুর মেয়ে যে!—জন্মান্তর মান না?—"

এবার গম্ভীর হয়ে যতী বল্‌লে "খুব মানি।"—বলে ঘর থেকে সাইকেলখানা বের করে নিয়ে বেরিয়ে গেল। মীনা ওপরে তার ঘরে গিয়ে ফুলগুলো টেবিলের ওপর ঢেলে জানালার ধারে বসে রইলো।—

৯

একমাস পরে।—মীনার বিয়ের আর দুদিন বাকী। রমাপতি বাবুর বাড়ীর কাজ! তাতে আবার তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে! আয়োজন, অভ্যর্থনার আর শেষ ছিল না। সারা হাজারিবাগ সহর খানাই যেন তাঁর বাড়ীতে দিনরাত হাজির। জগমোহন বাবু মীনাকে তাঁর স্ত্রীর সিঁদুরের কৌটা ও মুক্তার মালা এক গাছি দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে গিয়েছেন। বিয়ের জন্যে তিনি তাঁর আত্মীয়-কুটুম্ব সব নিয়ে রমাপতিরই একটা ভাড়া বাড়ীতে উঠেছেন। প্রভাত ছাড়া তার ভাই ক'টী এসেছে; প্রভাত বিয়ের দিন সকালে আস্‌বে।—

হাজারিবাগের মত জায়গায় এ রকম বিয়ে প্রায়

হয় না বল্লেই চলে—নিমন্ত্রিত ও অতিথিদের তো সীমা নেই। শতদল এতদিনের পর যেন করবার-মত একটা কাজ পেয়ে একাই একশ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। মলিনা কাজের মধ্যে অবসর পেলেই এক একবার এসে মীনাকে ক্ষেপিয়ে যাচ্ছিল।

সন্ধ্যার পরে মীনার বন্ধুরা এসে পড়লো। মাধবী এর আগে আর দু একবার মীনার সঙ্গে এসেছিল বলে সেই ছিল দলের পাণ্ডা। শতদলকে কোনমতে দায়-সারা গোছের এক একটা প্রণাম করে মীনার খোঁজে গেল। কয়েকটী সমবয়সী তরুণীর আনন্দ-চঞ্চল পদক্ষেপে সারা বাড়ীখানি সজীব হয়ে উঠ্‌লো।

মাধবীর দল যখন মীনার কাছে গিয়ে পৌছল সে তখন তার নিজের চিন্তাতেই অন্যমনস্ক ছিল।—ভাবছিল বিয়ে ব্যাপারটা প্রথম সৃষ্টি কে করেছিল এর সার্থকতা বা অসার্থকতা কি? সে যে বিয়ে করতে চলেছে তার থেকে কি উঠবে?—বিষ না অমৃত?—প্রভাত লোকটী কেমন?—তার আত্মীয়-স্বজনই বা কেমন?—কেমন ভাবে তার ১৬।১৭ বছরের জীবনটা উল্টিয়ে আবার আবার নতুন জীবন আরম্ভ হবে। এই রকমের নানা কথায় তার মন ভারাক্রান্ত হয়েছিল।—পা টিপে টিপে তার বন্ধুরা একেবারে তার কাছে গিয়ে বললে, "হলা শকুন্তলে!—"

হঠাৎ চমকে মুখ ফেরাতেই সে দেখ্‌লে, তার প্রিয় বন্ধু ক'টী সব এসে হাজির। ভাবনার বোঝা তখনকার মত চাপা দিয়ে সে হাসিমুখে তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করলে; রাস্তায় কষ্ট হয়েছে কিনা সে খবরও নিলে।

হাস্‌তে হাস্‌তে সুপ্রীতি বল্লে "মীনুর আতিথেয়তা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।"

"তারপর—কিগো মীনারাণী, চেলী আর সিঁথি-ময়ূর পরতে হলো কিনা? আমরা কোন্ কথার কি অর্থ তা খুব আগে থেকেই ধরে নিতে পারি—দেখ্‌লি তো?"

বাধা দিয়ে অনীতা বল্লে "তুই থাম্, মাধু, তুই না হয় এবার থেকে "ফরচুন টেলার" হোস্—আমার কথা গুলো বল্‌তে দে দেখি।"

"বল্‌না তুই—আমি কি তোর মুখ আট্‌কে রেখেছি?

"মীনু, তোর "উড্ বি হাজ্‌বেণ্ডের' (would be husband) ব্যাখ্যানা আমাদের একটু শোনা।"

"শোনাব? তবে পয়সা হাতে কর্। তাঁর রূপ!—"

"দরজার কাছে মলিনার শাড়ী দেখা যেতেই জিভ্ কেটে সে চুপ করলে। দেখে সুপ্রীতি বল্লে "বৌদি, আপনি মাটী করলেন—আমরা মীনুর কাছে গোটাকতক প্রাইভেট কথা জেনে নিচ্ছিলাম, আপনি এলেন, আর তো ও বলবে না।"

হেসে মলিনা বল্‌লে "তোমরা এত জনে মিলে প্রাইভেট কথা শুনছ? আমি জানি প্রাইভেসি দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সত্যি মিথ্যে মীনুকেই জিজ্ঞাসা করো। অনেকটা পথ এসেছ, কিছু খেয়ে সুস্থ হয়ে নেও; তারপর বিছানাও তোমাদের এখানেই করে দেব—সারারাত ঘরে যত কিছু প্রাইভেসি আছে ওর, তোমরা তিন জনে মিলে সব বের করে নিও। যেখানে সেখানে ও ভুলে যাবে বা বাদ দেবে, আমি ধরিয়ে দেব।"

"তুমিও কি এখানেই মরবে নাকি?"—বলে মীনা হাস্‌লে।

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য—তোর দাদাটী তো বেশ ভাল মানুষের মত ঘরখানি অপরের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিলেন—কিন্তু ঘরের লোকটীর কথা ভাবলেন না। কি আর করি! ভেবে ভেবে ঠিক করলাম কৃষ্ণ অভাবে, তুলসী পাতায় কৃষ্ণ নাম লিখে কাজ চলে—অতএব তোর দাদার বদলে তোর বিছানাতে জায়গা করে নেব।"—

"কী ফাজিল তুমি বৌদি!"—

"হাঁ—তা তো বল্‌বেই—নিঃস্বার্থপরের মত ঘর, বর, দুইই তোমার বিয়ে বলে ছেড়ে দিলাম কিনা, তুমি তো বল্‌বেই। এস। মাধবী, সুপ্রীতি ও অনীতাকে নিয়ে, মলিনা চলে গেল।

বিয়ের দিন সকাল। বিছানা ছেড়ে উঠবার সময় মলিনা মীনাকে বলে গেল, আজ যেন কিছু খেয়োনা—বুঝলে।'

"কেন বৌদি?—"

আহা ন্যাকা—জানেন না যেন!—এই দিনের ভাবনায়

চোখে ঘুম নেই, পেটে ভাত নেই—আবার এখন ন্যাকামী হচ্ছে "কেন বৌদি ?"—

"ও, এবার কতকটা বুঝ্‌লাম। আচ্ছা ভাই বৌদি, এ তোদের কি নিয়ম! বিয়ে হবে আমার, সেই উপলক্ষে কত জনেই না এ বাড়ীতে পাতা পাত্‌বে—আর বেচারী আমিই শুকিয়ে মর্‌ব? দিস্‌ না ভাই গরম গরম এক পাতা—এই ঘরে খেলে কেউ জানতে পারবে না।—"

"সর্ব্ব রক্ষে!—মায়ের চোখ এড়িয়ে তোমায় কিছু খাওয়াব!—তবেই হয়েছে!—বড় জোর দই-সন্দেশ পর্য্যন্ত উঠ্‌তে পারি—তার বেশী নয়। খাওয়ার জন্যে ব্যস্ত কেন? খেয়ো একেবারে এক সঙ্গে।—"

"তুমি বুঝি তাই খেয়েছিলে?—আচ্ছা কি করে খেলে লজ্জা হলো না?"

"আমি কেন খেতে যাব!—আমার তো আর বিয়ের আগে গোপনে সাক্ষাৎ বা আংটী দান হয় নি—কোনো রোমান্সই হয়নি—একেবারে নিরিমিষ্যি!—বাবা, কতই দেখ্‌লাম—আবার কতই দেখ্‌ব!—আগে একেবারে বিয়ের নামে যেন তেড়ে আস্‌তে—দুদিন না যেতেই সে বুলিও নেই, আওড়ানও নেই। প্রভাত বাবুর নামে সব জল!—আগে থেকেই তুই নিশ্চয়ই চিন্‌তিস্‌ ওকে আর এখানে আস্‌তেও নিশ্চয় তুই বলে দিয়েছিলি—কেননা বাবার চোখে একবার পড়্‌লেই তিনি যে তাঁর এই এই রত্নটীকে বেচারীর ঘাড়ে না চাপিয়ে ছাড়্‌তেন না। তা তুই বুঝ্‌তে পেরেছিলি!—বাবা, পেটে পেটে এত!"

"তা থাক্‌বে না? তোমারই তো বল যে যার স্বামী বা স্ত্রী, জন্ম জন্ম ধরেই তারা তাই হয়।—তবে আমার বেলাতেই বা উল্টোলে চল্‌বে কেন? সত্যবান্‌কে খুঁজে বের কর্‌তে সাবিত্রী রাজার মেয়ে হয়ে বনে গিয়েছিলেন—আমি যে কল্‌কাতা থেকেই মানুষটী খুঁজে বের করলাম, তার জন্যে তোমরা কোথায় আমাকে বাহবা দেবে তোমাদের পরিশ্রম বাঁচিয়ে দিলাম কতটা! তা না আবার দোষ চাপানো।—"

"একেবারেই গোল্লায় গিয়েছ? মুখে যে বাধে না কিছুই দেখি।"

"তা, আমার সঙ্গে সকাল থেকে লেগেছ কেন?"

মলিনা কি বল্‌তে যাচ্ছিল, এমন সময়ে সুধাংশু তাকে খুঁজ্‌তে সেইখানে এলেন। মলিনাকে দেখে "এই যে! শুনে যাও তো একবার!" বলে আগেই তিনি সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন। মুখরা মীনা বল্‌লে "যাও, 'এই যে'র ডাক পড়েছে।"—

ঘর থেকে যেতে যেতে মলিনা বল্‌লে 'যাবই তো। এই দেখ্‌ আমি সকলের সাম্‌নে দিয়েই যাচ্ছি। আমি কি তোর মত লুকিয়ে যাব নাকি?"—

মীনা কিছু না বলে শুধু একটু হাসলে।

সন্ধ্যা বেলা মলিনা মীনাকে বিয়ের 'সাজ' পরাতে বসেছিল—আর সুপ্রীতি ও মাধবী তার হাতের কাছে সব গুছিয়ে দিচ্ছিল। অনীতা জান্‌ত যে তার এখানে থাকাটা হয় তো সকলে পছন্দ করে উঠ্‌বে না। তাই মঙ্গলাচারের নাম গন্ধ যেখানে নাই সেইখানে থেকে সে মীনার বাসর ঘর সাজাবার ব্যবস্থা কর্‌ছিল। তার হাতে পড়ে শ্রীহীন ঘরখানি যেন নবজীবন পেয়ে হাস্‌ছিল।

মীনাকে সাজান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, বাকী শুধু চন্দন পরান ও এখানে-ওখানে হিমানী আর পাউডারের দুটো একটা টান দেওয়া। হাতের তেলোয় চন্দন তুলে নিয়ে মলিনা তাকে পরাতে যাবে দরজার কাছ থেকে রমাপতি বাবুর খুড়ী ওরফে সকলের রাঙা ঠান্‌দি বল্লেন "ও বৌদি! ননদকে নিয়ে মেতে রইলে—এদিকে নন্দাই যে দরজায় এসে পড়্‌লো। 'আচারের ছিরি' আর 'বরণডালা' কই?"—

হাসিমুখে মলিনা বল্‌লে "সে সব আমি ছাতে গোছ করে রেখে এসেছি—মায় আপনার 'মাকু' পর্য্যন্ত। 'ভ্যা' তো আপনিই আগে করাবেন?"

খুসী হয়ে একমুখ হেসে রাঙা ঠান্‌দি বল্লেন "আর ভাই! সে কাল কি আর আছে হে, আমদের মত বুড়ো ঠান্‌দিকে বর আগে দেখ্‌বে—হয় তো আমাদের ঠেলে ঠুলে 'কনে কই' বলে এসে দাঁড়াবে:—কি বলিস্‌ মীনু?"

"ঠান্‌দিদের সময়ে বুঝি তাই হ'ত?"

মুখে আক্ষেপ সূচক একটা উক্তি করে রাঙা ঠান্‌দি বল্লেন "আমাদের আবার সময়!—কোন্‌কালে 'বে' হয়েছে —মনেও জানিনে। জ্ঞান হওয়া থেকে এই ঘরই কর্‌ছি।"

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে ব্যস্ত ভাবে রমাপতি বাবু এসে বল্লেন "খুড়ীমা! তুমি এখানে! আর আমি তোমাকে সারা বাড়ীময় খুঁজে বেড়াচ্ছি! এস, এস শীগ্‌গীর এস —তোমাদের যা করবার তাড়াতাড়ি করে নেও। প্রথম লগ্নেই আমি সম্প্রদান কর্‌ব।—

"মলিনার হাতের কাজ খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিল। সুসজ্জিতা মীনার দিকে একবার চেয়ে রমাপতির বুকের ভিতর থেকে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো। মনে মনে তিনি মীনাকে আশীর্ব্বাদ করে বল্লেন "যেখানে তোমার স্থান, সেইখানে তুমি অচলা হয়ে থাক মা।"

———

ক্রমশঃ



ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৮

এ সংখ্যায় একখানি মাত্র উপন্যাস আছে "বিপত্তি" তাও আবার শেষ হইয়াছে—অবশ্য "অ—পার্থিব" অবস্তুজাত সুরার "প্রবল নেশায়।" ইহাও এক বিপত্তি বৈ কি, তবে আধিদৈহিক নয় অধ্যাত্মিক। কাজেই দেবগণ সাম্‌লাইবেন।

ছোট গল্পও আছে চারটি। প্রথম গল্প শ্রীনির্ম্মলা দেবীর "আলো ও আঁধার।" সচরাচর বালক-বালিকা মহলে যে ধাঁধাটি শোনা যায়—"জ্বললে আঁধার, নিবলে আলো" রচনাটি ঠিক ততখানি জটিল ধাঁধার সৃষ্টি না করিলেও ইহার "কাণ্ড" "পর্ব্ব" ও সৃষ্টি দেখিয়া চোখে প্রথমে একটা ধাঁধা লাগে বটে। এই তিনটি বিভাগের মধ্যে অবশ্য সেই পুরাতন ছবি, মামুলি কথা আছে একজন বড় লোক, আর একজন গরীব। বড় লোকের বাড়ী বিবাহ; তোরণ শীর্ষে নহবতের করুণ তান সাহানা আর গরীবের বাড়ী এক পতি পরিত্যক্তা, অনাদৃতা তরুণীর পুত্র বিয়োগ ব্যথার সকরুণ কান্না। অবশ্য এই দুই কাণ্ডের মাঝখানে একজন প্রতিবেশী আছেন যিনি নিরপেক্ষ। দরকার হইলে উভয়ের সুখে দুঃখেই সমান ভাবে কাঁদিতে ও হাসিতে পারেন।

রচনাটিতে "একচক্ষু মুদিয়া" "গেরস্থর থাকবার" "বাড়ীর সাম্‌নে লেন বলিতে যাহা বুঝায়" বাঁ দিকের বারাণ্ডা হইতে "দুটা পায়খানা" ও "হলহলা-শব্দ" প্রভৃতি থাকিলেও ভাষা মোটের উপর ঝরঝরে। গল্পটিতে প্লট বিশেষ কিছু নাই, কিন্তু শেষে একটি দৃশ্য আছে, যাকে "প্রলাপ দৃশ্য" বলা যাইতে পারে। পড়িয়া মনে হয় রচয়িতা বা রচয়িত্রী যিনি হোন, তাঁর "প্রলাপের" শক্তি আছে।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীঅমিয়ভূষণ বসুর "নিরাশ্রয়ে।" রচনাটি করুণ কিন্তু অসম্পূর্ণ। শেষটুকু আবার এমন আলগা যে মনের উপর হইতে সমস্ত effect নষ্ট করিয়া দেয়। যে একটা অদ্ভুত বিষয়ের ভিত্তি করিয়া গল্পটি রচিত হইয়াছে তার চরিত্রগুলি শ্যালা,—ভগ্নিপতি ও ননদ-ভাজ হইলেও গল্পটাকে "শ্যালা-ভগ্নিপতির লড়াই" নামে অভিহিত করিলে বেশ মানাইত। তবে গল্পটির ভাষা বেশ ঝরঝরে ও লঘু।

তৃতীয় গল্প শ্রীবিজয় রত্ন মজুমদারের "নারী। ইহাও একটী করুণ রচনা। বঙ্কিমী ভাষায় বঙ্কিমী চালে ছোট খাট দু' একটী বক্তৃতা থাকিলেও এবং গল্পটির বিষয় বস্তু নূতন না হইলেও বেশ জমিয়াছে বলা চলে।

জেকব বিশ্বাস "নেটিভ ক্রীশ্চান," তার স্ত্রীর নাম স্বর্গের সুষমা—এক ক্রীশ্চান ধর্ম্মযাজকের মেয়ে—এবং তাদের কন্যার নাম স্বর্গের শোভা। ইহাদের লইয়াই গল্প। জেকব বড় গরীব; কিন্তু তার লক্ষীস্বরূপিনী স্ত্রীর প্রযত্নে সংসার চক্রটি নিয়মিত করিয়া চলে। সে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া স্বামী কন্যাকে সুখী করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করে। পরিশেষে তার কর্ম্মক্লিষ্ট অনশন ক্ষিন্ন দেহ একদিন অচল হইয়া পড়ে; এবং তার প্রাণ বিহঙ্গ সেই ভগ্ন পিঞ্জর ছাড়িয়া চলিয়া যায়। এই গল্প।

ইহার মধ্যে স্বর্গের সুষমা ক্রীশ্চান ধর্ম্মযাজকের কন্যা হইয়াও নিজেকে বলিয়াছিল "হিন্দু।" কথাটা বোধকরি লিখিবার সময় লেখক ভাবিয়া লেখেন নাই। এক পুরুষে ক্রীশ্চান হইলেও ঐ কথাটি বলিবার মত করিয়া শিক্ষা কোন পরিবার তাঁদের সন্তান-সন্ততিকে দিবেন যে এই সন্দেহ করিবার কোনই হেতু নাই। আচারে ব্যবহারে স্বভাবগত কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও এত বড় একটা কথা কেহই স্বীকার করিবেন না, তা সে হিন্দুয়াণীর মাহাত্ম্য যতই বিরাট হোক্। ন্যায়ের এ যুক্তি যেমন সত্য,—পিতার পূর্ব্বে, তার পূর্ব্বে, তারও পূর্ব্বে এবং আরও পূর্ব্বে ইহা ছিল; অতএব ইহা ঠিক আবার ইহাও ঠিক তেমনি করিয়াই বলা চলে পিতার পর, আমার পর, তারপর, তারও পর এবং আরও পর ইহা চলিবে, অতএব ইহাই কর্ত্তব্য। এই হিন্দুর দেশেই-ক্রীশ্চানগণ দেড়শত বৎসরোর্দ্ধে যে পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছেন তাতেই হিন্দুয়াণী পাকশালা ও ছানলা তলা হইতেও পলাইবার উপক্রম। এ সংখ্যায় একটী ভ্রমণ কাহিনী আছে শ্রীহরিপদ মৈত্রেয়ের "আমাদের সিকিম যাত্রা।" বর্ণনা ভঙ্গীতে রচনাটি অতি উপাদেয় হইয়াছে—সকলেরই ভাল লাগিবে।

কাব্য রসিকগণের জন্য কবিতা আছে চারটি। তার মধ্যে শ্রীরাধা চরণ চক্রবর্ত্তীর সেবার অভিশাপে 'ভারতীর' প্রতি 'চাহি না যশ—বস্ত্র দে মা,

অন্ন দে মা দু' মুঠি।"

নিবেদন—"চাহিনা অর্থ, চাহিনা

মান—"পাঠক যদি মিলাইয়া পাঠ করেন ত শেষোদ্ধৃত কথাগুলির আড়ালে যে সত্যটুকু প্রচ্ছন্ন আছে ধরিতে পারিবেন।

শ্রীদীলিপ কুমার রায়ের "গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে" কবিতাটি আড়ষ্ট ও নীরস। তবে ভক্তের মনোবাঞ্ছা বলিয়া সমীহ করিয়া পড়িতে হয়।

শ্রীনরেন্দ্র দেবের "তাশের প্রাসাদ"—তাশের ও প্রসাদের" মাঝে একটী হাইফেন। খুব সম্ভব "তাশ" ও "প্রাসাদ" বলিয়াই ষষ্ঠী বিভক্তির পরও একটী "জোড়" দিয়া দুটিকে একত্রে করিয়া রাখা হইয়াছে। নতুবা পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা! কবিতাটি একটী নারীর খেদোক্তি পুরুষজাতির স্বভাব বর্ণনা করিতে করিতে বলা হইতেছে—"প্রাণহীণ সেই প্রণয় গীতের

স্থর ভাঁজি মোরা অন্ধ হয়ে!"

লাঠি ভাঁজা মুগুর ভাঁজা, ড্যাম্বেল প্রভৃতি ভাঁজা পুরুষের একচোটিয়া হইলেও প্রতারিত নারী অতি করুণ ভাবে স্থর ভাঁজেন।" যা হৌক কবিতাটিতে বিশেষত্ব কিছু নাই নারীর তরফের খেদোক্তি সত্বেও।

রঙিন ছবি এ সংখ্যায় আছে তিনখানি। প্রথম ছবি শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার রায়ের "গায়ত্রী"।

দ্বিতীয় ছবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ মল্লিকের "প্রলয়ের স্থর।" নটরাজ নাচিতেছেন—কিন্তু ভঙ্গী দেখিয়া মনে ভয় বা আনন্দ কিছুই জাগে না।

তৃতীয় ছবি শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কিস্তী" মহাজনের নয়—"দাবা বোড়ের"। কাজেই দেখিয়া আমোদ পাওয়া যায়।

চতুর্থ গল্প শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর "রাণী"—রচনাটি না গল্প, না পঞ্চতন্ত্রের হিতে'পদেশ কিন্তু ইহাতে সংস্কৃত ও হিন্দীর বুকণী এবং উপদেশের ঘটা আছে—এইটুকুই বিশেষত্ব। তবে ভাষায় বেশ "বাঁধনী" আছে।

বসুমতী—বৈশাখ—১৩৩৮

এ সংখ্যায় উপন্যাস আছে চার খানি—"ধর্ম্মদাস", "তিব্বতের বিভীষিকা", "মাটীর স্বর্গ" ও "রহস্যের খাসমহল"। এবং এই গুলির মধ্যে শেষ হইয়াছে শেষোক্ত খানি

ছোট গল্প ও আছে ছয়টি। প্রথম গল্প শ্রীমতিলাল দাস (এম-এ, বি-এ) এর "পাখীর প্রেম।" "বুড়ো" শালিক নয়—তরুণ শালিক ও শালিকার প্রেম। রীতিমত Faithlessness এর ব্যাপার। শালিক পত্নী ডিম্ব প্রসব করিয়া তাহা হইতে ছানা বাহির হইবার দিন কয়েক পরেই পতি ও সন্তান ছাড়িয়া আর একটী তরুণ শালিকের প্রেমে মজে। পক্ষীমাতা তার সন্তানগুলিকে অবহেলা করিয়া প্রেমিকের সহিত বাহার দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় আর সন্ধ্যাবেলা নীড়ে ফেরে। কিন্তু তার পতি এত কাণ্ডের—"কিছুই জানিতে পারিল না।" এদিকে "গোপনে প্রেম রয় না ঘরে" একদিন আগন্তুক শালিকের সহিত 'শালিক পিতার' বিপুল বিরোধ লাগিল। আর পাড়ায় "দোয়েল, টুনটুনি" তারাও মার মার শব্দে বাহির হইয়া "শালিক-পিতার পক্ষে যোগ দিল। ফলে রীতিমত দাঙ্গা ও প্রেমিক শালিকের পুচ্ছ তুলিয়া পলায়ন। পাখীদের চোখের জল পড়ে না, তাই "শালিক বধূ নীরবে দোলনচাঁপার শাখায় বসিয়া রহিল।" তারপর একদিন শালিকা প্রেমিকের সহিত একেবারে নীড়ত্যাগ করিয়া উধাও হইল। এমন কাণ্ড কেবল যে মনুষ্যসমাজেই ঘটে, তা নয়। যাহোক, অগত্যা পক্ষী পিতা ছানাগুলিকে আহার দিতে লাগিল। সে বেচারার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। তারপর, পাঠক শুনিয়া খুসী হইবেন, পক্ষীমাতা একদিন একাকিনী নীড়ে ফিরিয়া সন্তান-পালনে যত্নবতী হইল। কিন্তু তাও বেশী দিনের জন্য নয়—"শ্যামের বাঁশরী রাধাকে গৃহ-কর্ম্ম ভুলাইল", "মুনি ঋষিরা পর্য্যন্ত যে আহ্বানকে জয় করিতে পারেন নাই—" শালিক ত কোন্ ছার। (পক্ষীমাতা যে তার সন্তানকে অবহেলা করে, এমন ভিত্তিহীন কথার সপক্ষে একটু কৈফিয়ৎ) সে প্রেমিক শালিকের সহিত "উড়িয়া পলাইল।" "তাহার পর ছানাগুলি অযত্নে মারা পড়িল। শালিক মনের দুঃখে ওলট কম্বলের বীচি খাইয়া পাগল হইয়া গেল। ইহাই গল্প। ইহার তলে তলে আবার মনুষ্য দম্পতীর প্রেমের বুকনী আছে। এক যায়গায় বলা হইতেছে—"দুর্ণাম বড় দুরন্ত জীব, মরিয়াও সে মরে না।" কিন্তু এজীব গর্ত্তে থাকে না, সংসার অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় আর বাগে পাইলেই রক্ত চক্ষু মেলিয়া লোককে তাড়া করে।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের "নূতন খাত।"—লিখিবার ভঙ্গীতে ও ভাষার গুণে চলনসই।

তৃতীয় গল্প শ্রীপ্রফুল্ল কুমার মুখোপাধ্যায়ের "অন্ধকারের মানুষ।" গল্পের বিষয়টি ভাল; কিন্তু শক্তির অভাবে সবটুকু জমিয়া উঠিতে পারে নাই। প্রারম্ভে জমীদার ও ধীবর বংশের সুদীর্ঘ ইতিহাসটা নিতান্ত অনাবশ্যক, ঐ অংশটুকু ছাঁটিয়া ফেলিলে নিশ্চয়ই সৌন্দর্য্য হানি ঘটিত না। বিষয়টি নিপুণ হতে পড়িলে চমৎকার একটী Tragedy রচিত হইতে পারিত। ভাষাও তেমন খর খরে নয়। তবে বিষয় নির্ব্বাচন তারিফ করিবার মত।

চতুর্থ গল্প শ্রীদেবেন্দ্র নাথ বসুর "অভিসারিকা"

রচনাটিতে নিতান্ত সেকালের ঢঙ্ থাকিলেও স্থানে স্থানে ইহার চরিত্রগুলি স্পষ্ট ও জীবন্ত।

পঞ্চম গল্প শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শীসন।" সমাপ্তিটুকু বেশ :—একটু বিশেষত্ব আছে। কিন্তু গল্পটি এত দীর্ঘ যে সবটুকু পাঠে ধৈর্য্য থাকে না এবং ভাষায় বেগ ও বাঁধনী নাই।

ষষ্ঠ গল্প শ্রীচারু চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের "সুবর্ণ গর্দ্দভ।" পাকা হাতের খাসা রচনা ;—সারা মন প্রাণ দিয়া লেখা।

আরও একটী গল্প আছে, যেটিকে বসুমতী গল্প না বলিয়া বলিতেছেন "সত্য ঘটনা।" কিন্তু আমরা বসি উহা গল্প। কেননা ইহার মধ্যে গল্পের মাল-মসলা সবই আছে এবং রসেরও অভাব নাই। এই "সত্য ঘটনাটির" নাম সাধুর যোগবল না ইন্দ্রজাল।" এক সাধু জন কয়েক সংশয়বাদী ইংরেজকে একটী অলৌকিক ব্যাপারে চমৎকৃত ও জব্দ করেন। ঘটনাটি সত্য হোক মিথ্যা হোক কিন্তু পড়িতে বেশ লাগিল। এই ধরণের রচনায় দীনেন্দ্র বাবুকে হারায় কে ?

এ সংখ্যায় রঙিন ছবি আছে তিনখানি। প্রথম ছবি ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি।

দ্বিতীয় ছবি শ্রীচারু চন্দ্র সেন গুপ্তের "প্রলয় নাচন ইত্যাদি……চারুবাবুর আঁকিবার হাত আছে, কিন্তু এমন পট যে তিনি কেন আঁকেন, তিনিই জানেন। ছবিখানি দিয়াশলাইয়ের বাক্সের উপর চমৎকার মানায়।

তৃতীয় ছবি শ্রীসতীশ চন্দ্র সিংহের "প্রতিবিম্ব।" ছবি খানি দেখিয়া মেয়েটীর মত আমরাও হতভম্ব—এমন চেহারা! কিবা রঙ আর কিবা ভঙ্গী! কিন্তু মেয়েটির পরিধানে ডুরে সাড়িখানি বেশ—এমন সাড়ী বাজারে সচরাচর পাওয়া যায় না।

প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ—১৩২৭।

এ সংখ্যায় একখানিমাত্র উপন্যাস আছে, সেই "অপরাজিত।"

ছোট গল্প আছে চারটি প্রথম গল্প শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্যের "মৃত্যু-বিজয়।"

গল্পটি বর্ত্তমান স্বাধীনতা-আন্দোলনকে ভিত্তি করিয়া অতি স্নিগ্ধ ভাষায় লিখিত। গল্পটির সুরু হইতে শেষ অবধি বেশ একটী Serene ভাব আছে। বর্ত্তমান আন্দোলন সুকুমার মতি বালকগণের অন্তরে সহসা যে ভাব ধারার সৃষ্টি করিয়া সমাজ-ভিত্তির মূলে এক প্রবল নাড়া দিয়াছে তাহারই বিবৃতি।

মানুষের নাড়ীর সঙ্গে দেশ-মাতৃকার যোগ চিরন্তন ও সত্যকারের। সেই যোগ-সূত্রে নাড়া পাইয়া যে চিদ্‌বৃত্তিগুলি জাগিয়াছে, সেগুলির কাছে পুরাতন যুক্তি আজ অচল—সমষ্টির স্বার্থের কাছে ব্যষ্টির স্বার্থ আজ ম্লান। সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, ত্যাগ ও কর্ম্ম, সর্ব্বোপরি প্রেম কিশোর হইতে বৃদ্ধ সকলকে পথ দেখাইতেছে। গল্পটি ভাল ; পড়িয়াও আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা সাময়িক রচনা।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীগৌরগোপাল মুখোপাধ্যায়ের "জীবন ও মৃত্যু।" একটী বিদেশী গল্প, কিন্তু অতি চমৎকার।

তৃতীয় গল্প শ্রীসত্যরঞ্জন সেনের "প্রতীক্ষা"। মন্দ নয়। ইহার খানিকটা নাটকীয় ঢঙে রচিত ; তার কিন্তু মাত্রাটা যেন একটু বেশী। কিশোরী গৌরী একাকিনী রুদ্ধদ্বার গৃহে স্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছে—স্বামী তখন পথে। তার নিকট পৌছিতে হইলে একটী নদী পার হইতে হয়। কিন্তু কাল-বৈশাখীর ঝঞ্ঝা-বাত্যায় সে আসিতে পারিতেছে না। এই সময়টিতে কিশোরীকে যে ভাবে আঁকা হইয়াছে তাতে মনে হয় যেন সে কৈশোরের সীমানা কবে কোনকালে পার হইয়া গিয়াছে—তার অতি পরিণত দেহের মাঝে যে জাগিয়া উঠিয়াছে সে এক পূর্ণ যৌবনা নারী। গল্পের শেষে লেখকের ছোট রকমের একটী হৃদয়োচ্ছ্বাস আছে যাহা অবশ্য আধুনিক গল্পে ক্রমেই অচল হইয়া আসিতেছে। ইহার কিছুমাত্র যে আবশ্যক ছিল, তা উপলব্ধি করা গেল না।

চতুর্থ গল্প শ্রীসীতা দেবীর "আক্কেল সেলামী।" কষ্ট-কল্পিত রচনা ;—প্রাণ নাই।

এ সংখ্যায় রঙিন-ছবি আছে মাত্র দুইখানি। প্রথম ছবি শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের "স্বাধীনতার উষা।" মন্দ লাগে নাই।

দ্বিতীয় ছবি শ্রীরবিশঙ্কর রাওলের "সূর্য্য ও কমল।" ছবিখানিতে একটী চমৎকার স্নিগ্ধ ভাব আছে ;—পরি-কল্পনাটিও বেশ।

একখানি একবর্ণ ছবিও আছে—রবীন্দ্রনাথের।

কবি এ সংখ্যায় একটী কবিতা লিখিয়াছেন—"নীহারিকা।" শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রদত্ত একটী বক্তৃতা, বিদেশ হইতে লেখা একখানি ছোট চিঠি এবং সপ্ততিম জন্মোৎসবের অভিভাষণটিও আছে।



মহাত্মাজী কি বৈঠকে যাইবেন ?

মহাত্মা কি Structural Committee বৈঠকে যোগদান করিবার জন্য বিলাত যাইবেন ? এই কথা অনেকেরই গবেষণার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজ সরকার মহাত্মাকে Structural কমিটির বৈঠকে লইয়া যাইতে চাহেন। এই কমিটী ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতির একটা খস্‌ড়া প্রস্তুত করিবে। এবং সেই খস্‌ড়াই যখন পরে কংগ্রেস কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্যবৃন্দ বিলাত গমন করিলে তাহাদের সম্মুখে উত্থাপন করা হইবে তখন মহাত্মাকে এই কমিটীর বৈঠকে উপস্থিত রাখিতে পারিলে যে ভবিষ্যতে কার্য্যের সুবিধা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ইংরাজ সাংবাদিকগণ বলিতেছেন যে মহাত্মা হিন্দু-মুসলমান মিলনের কোন প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দ্ধারিত না হইলে বিলাত যাত্রা করিবেন না যখন বলিয়াছেন তখন ভবিষ্যতে শেষ অবধি মহাত্মাজী বিলাত গমন করিবেনই কিনা সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। কেননা, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কোন প্রতিবিধান হওয়া দূরে থাকুক উহার গোলমাল ত দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে। এই ত সেদিন কলিকাতা বৈঠকে মৌলানা সৌকৎআলি জোর গলায় বলিয়াছেন যে, হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্পূর্ণ অসম্ভব হইবে যদি হিন্দুগণ মুসলমানগণের ন্যায্য দাবী গ্রাহ্য না করেন। সংরক্ষণশীল মুসলমানগণ সংঘবদ্ধভাবে তাঁহাদের বক্তব্য যেরূপভাবে প্রকাশ করিতেছেন তাহাতে মনে হয় মহাত্মাজী শেষ অবধি হয়ত কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

সম্প্রতি খবর আসিয়াছে যে Structural Committeeর বৈঠক আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বসিবে। সেখানে মহাত্মাজী উপস্থিত থাকিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই খবরটী হয়ত অনেকেরই মুখরোচক হইবে না। কংগ্রেসে একদল মুসলমান আছেন তাঁহারা মহাত্মাজীর সহিত একমত। ভারতে যাহাতে Joint electorate হয় তাহারই পক্ষপাতী। কিন্তু অপরদল তাঁহাদিগকে তোষামদকারী, স্বার্থান্বেষীদল বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন। এখন এই দলের উপর নির্ভর করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতি নির্দ্ধারিত করিতে গেলে পরে বিশেষ অসুবিধা অনুভব করিতেই হইবে। সেইজন্য মধ্যস্থের দল বলিয়া থাকেন মুসলমানদের দাবীতে স্বীকৃত হইয়া ইংরাজদের হাত হইতে ভারতকে উদ্ধার কর।

মহাত্মাজী আজ অবধি এ সম্বন্ধে আত্ম-মত প্রচার করেন নাই। তিনি তাঁহার প্রারব্ধ কার্য্যে কতটা অগ্রসর হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতেই বা কিরূপভাবে কার্য্য করিতে চাহেন তাহাও আমাদিগকে জানান নাই। দুই একটা বৈঠকে যোগদান করা ব্যতীত প্রকাশ্য ভাবে এই সম্বন্ধে কোন মতামত প্রচার করেন নাই। কাজেই Structural Committeeতে উপস্থিত থাকিলে তাঁহাকে অনেক বিষয়ে মতামত দিতে হইতে পারে। তজ্জন্য সময় সাপেক্ষ বলিয়াই কমিটীর বৈঠক জুন হইতে সেপ্টেম্বরে করা হইয়াছে। আমরাও কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, মহাত্মার উদ্দেশ্য সফল হউক, বিশ্ববাসী আবার ভারতকে নব-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে দেখুক।

ভারতশাসন-সমস্যায় হিন্দু-মুসলমান !

Joint electorate মিলিত নির্ব্বাচন প্রণালী ও separate electorate পৃথক নির্ব্বাচন-প্রণালী লইয়া বিশেষ মতান্তর যাঁহারা করিতেছেন তাঁহাদের জানিয়া রাখা দরকার যে কোন শাসক-সম্প্রদায়ই প্রবল হইয়া অপেক্ষাকৃত সংখ্যায় অল্প বা অজ্ঞ ভ্রাতৃবৃন্দকে চিরকালই পদানত রাখিতে পারেন না। ইংরাজ যখন ভারতবাসীকে স্বরাজ দিতে বাধ্য হইতেছেন, তখন স্বরাজ পাইবার পর হিন্দু জননেতাগণ তাঁহাদের ধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যাধিক্যের সাহায্যে, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের কি করিয়া পদানত করিয়া রাখিবেন ? মধ্যযুগের ধর্ম্মান্ধতা এই যুগে ফলাইতে গেলে মহা ভুল করা হইবে। হিন্দু নারী যখন মুসলমান যুবাকে বিবাহ করিতে দ্বিধা করে না এবং উপযুক্ত হইলেই যখন নব্য ও তরুণদের মধ্যে হৃদয়-বিনিময় আরম্ভ হইয়া গিয়াছে তখন শুধু গোঁড়ামীর দোহাই আর চলিবে কি [illegible]পর, আমরা দেখিতে পাই যে, যেখানে মুসলমান নেতারা সংখ্যাধিক্যের জোরে জেলাবোর্ডে নিজ ধর্ম্মাবলম্বী অধিক সদস্য পাইয়াছেন সেইখানেই তাঁহারা মোক্তাব বা মাদ্রাসা [illegible]নের প্রয়াস

পাইয়াছেন। কিন্তু হিন্দুনেতাগণ হিন্দু-মুসলমানের জন্য সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন। ইস্‌লামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা কালে বলা হইয়াছিল ইসলাম কাল্‌চার যাহাতে রক্ষা পায় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্যই এই কলেজ স্থাপিত হইতেছে। এইরূপ করিয়া চলিলে দেশের মধ্যে উদার মত কোনকালই প্রকাশ পাইবে না। কূপ মণ্ডুকের ন্যায় চিরকালেই আমাদিকে ক্ষুদ্র কূপে মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ অনেক সময় সন্দেহ করেন যে, হিন্দুগণ অগ্রসর হইয়া পড়িলে তাঁহারা পশ্চাতে পড়িয়া যাইবেন। সেটা কিন্তু খুবই সত্য। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে মুসলমানগণ ইংরাজ সরকারের সহিত একরূপ অসহযোগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের উর্দ্দ ভাষা ও ভাবকে জাপটাইয়া রহিলেন। এই সভ্যতা মধ্যযুগের। উহা নূতন যুগের সহিত খাপ খাওয়ান হয় নাই বলিয়াই ইংরাজগণ ভারতবর্ষে মুসলমানগণকে হটাইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হিন্দুগণ কিন্তু ইংরাজজাতির সহিত সহযোগীতা করিয়া উন্নততর হইয়া উঠে। মুসলমান নেতাগণ যখন তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারেন তখন হিন্দুগণ বহুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্যার যে অনৈক্য দেখা যায় তাহার মূল ইতিহাসই এই। আবার এই স্বাধীনতার যুদ্ধে মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ যদি হিন্দুদের সহায়তা করা দূরে থাকুক তাহাদের এই সংগ্রামে পদে পদে বাধা আনিয়া দেন, তাহাতে সংগ্রামের দিন বৃদ্ধি পাইতে পারে মাত্র কিন্তু বিজয় একদিন আসিয়া দেখা দিবেই, তখন তাঁহাদিগকে চক্ষু মুছিতে মুছিতে আবার ভ্রান্তি স্বীকার করিতে হইবে। ইংরাজ ভারতবর্ষকে চাহে অর্থাৎ ভারতবাসীর ব্যবসা-বাণিজ্য তাহাদের করতলগত রাখিতে চায়। হিন্দু-ব্যবসায়ী ও গ্রাহকগণ তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন। শীঘ্রই মিটমাট না হইলে অসহযোগ আন্দোলন জোর চলিবে। উহার সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হইয়া যাইবে। ইংরাজ কখনই তাহার মৃত্যু বরণ করিয়া লইবে না। সন্ধি তাহাকে করিতেই হইবে। মুসলমানগণ হিন্দুদের সহিত মিলিতে রাজী না হইলে শুধু হিন্দুদের লইয়া সন্ধি করিবে, যেমন ভারত শাসনের প্রাকালে শুধু হিন্দু লইয়া তাঁহারা তাঁহাদের শাসন-যন্ত্র পরিচালন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই বিষয়টী মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দকে বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি।

বাংলা কংগ্রেসী দ্বন্দ্ব!

বাংলায় কংগ্রেসী খেয়ুড় আরম্ভ হইয়াছে। বাংলার খেয়ুড় বাংলার নিজস্ব সম্পত্তি। শুনা যায় দুই পাঁচালী কোন জমিদার গৃহে উপনীত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া যে বিবিধ সঙ্গীত রচনা করিত, তাহা তৎকালিক বাংলাদেশ উপভোগ করিত, কবির লড়াই, তর্জাও বাংলার নিজস্ব সম্পদ। এই কংগ্রেস-কলহ বাংলার বিশেষত্ব। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের তিরোধানের সহিত বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে নানা স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে দুইটী রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটে। মহাত্মাজীর অনুরোধে এবং অন্যান্য কারণে এই যুযুধমান সম্প্রদায় দুইটী পরস্পর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া কয়েক বৎসর একত্র কার্য্য চালাইয়া ছিলেন। কিন্তু কালক্রমে পূর্ব্বোক্ত কারণগুলি না থাকার দরুণ তাঁহাদের স্বার্থ মূর্তিমন্ত হইয়া উঠিতেছে। কথাটা আমরা বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছি। দেশবন্ধু দাশ যখন মহাত্মার সহিত ভিন্নমত হইয়া 'স্বরাজ' দল সংগঠন করেন তখন কংগ্রেস গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত No-changerদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ ঘটে। তাহার পর স্বরাজদল কংগ্রেস বিদ্রোহী হইয়া কংগ্রেস অধিকার করিলে No-changer দল ঠিক কংগ্রেস বিদ্রোহী না হইলেও তাঁহারা কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়ান এবং অনেকে স্ব স্ব আত্মমর্য্যাদা লইয়া কার্য্য করিতে থাকেন। দেশবন্ধু দাশের মৃত্যুর পর মেদিনীপুরের কর্ম্মীনেতা শাসমল No-changerদের হস্তগত করিয়া কংগ্রেস দখল করিয়া বসেন। কাজেই দেশবন্ধুর মৃত্যুতে তাঁহার শিষ্যবৃন্দদের মধ্যে যে দুইটী দলের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাদিগকে তাহাদের গৃহ-বিবাদ স্থগিত রাখিয়া শাসমল পরিচালিত কংগ্রেসী দলের সহিত বিবাদ চালাইতে হয়। শাসমলী দল পরাস্ত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইলে, উহাদের স্ব স্ব স্বার্থ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে থাকে। তাহারই উৎকটভাব আজ বাংলাকে চমকাইয়া দিতেছে। কাজেই কংগ্রেস বিদ্রোহী বলিয়া আজ যে কথা উঠিয়াছে, সেটা বহু পুরাতন, রচা কথা মাত্র। কংগ্রেস বিদ্রোহী হইয়াই দেশবন্ধু কংগ্রেস জয় করিয়াছিলেন আবার কংগ্রেস বিদ্রোহী হইয়াই দেশবন্ধুর সহচরগণ শাসমল দলকে বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া দেন। সেই অস্ত্র অবলম্বন করিয়াই শ্রদ্ধেয় সেনগুপ্ত অপরদলকে যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছেন! ৩০শে মে তারিখে কলিকাতার একটা সাধারণ সভায় জনপ্রিয় নেতা সেনগুপ্ত নাকি বলিয়াছেন, তিনি কংগ্রেস বিদ্রোহী নন, তবে বর্ত্তমান কংগ্রেসী দলের বিরুদ্ধবাদী। তিনি কংগ্রেসের পরিচালন প্রণালীর সংস্কার করিতে চাহেন। উত্তরে আমরা যদি তাঁহাকে বলি এই সংস্কার করিবার ইচ্ছা যখন তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন তখন হয় নাই কেন? তখন কি কংগ্রেস মধ্যে এখন যে সব অনাচার হইতেছে বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন তাহা ছিল না? একেবারেই যে

ছিল না বলিলেও অনেকেই বিশ্বাস করিবে না? তবে কংগ্রেস তাঁহার হস্তে যাইলে তিনি যে আবার বজ্রহস্তে চালাইবেন তাহার প্রমাণ কি? তাঁহার চেলা চামুণ্ডরা যাহারা আজ সর্ব্বস্ব পণ করিয়া লড়িতেছে তাহারা যে কতকগুলি আবদার না করিবে সে কথা কে বলিল! আমরা বলি নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব সর্ব্বত্রই আছে। বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রেও এটা নূতন নয়। কাজেই পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ না করিয়া উভয়েই তাঁহাদের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে দেশবাসীকে জানান না কেন? তাহার পর বিজয়মাল্য যাঁহার বক্ষে শোভা পায় পাউক।

ব্যয় সংক্ষেপ চেষ্টা

দিল্লীতে ব্যয় সংক্ষেপ কমিটী সংগঠিত হইয়া গিয়াছে, সম্প্রতি খবর আসিয়াছে যে, এই কমিটীকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়া সব কমিটী গঠন করা হইয়াছে। তাহারা তাহাদের বিষয়গুলি বিশেষভাবে গবেষণা করিয়া সকলে একত্র মিশিয়া তাহার পর বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিবেন। বাংলার কেরাণীবৃন্দ ইহাতে বিশেষ ভীত হইয়াছেন। গুজব উঠিয়াছে যে, তাহাদের শতকরা দশ টাকা করিয়া মাহিনা কমাইয়া দেওয়া হইবে। কোন বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপ করা হইবে সে বিষয়ে এখনও স্থির নির্দ্ধারিত না হইলেও সকল কর্ম্মচারীরই যে কিছু কিছু করিয়া মাহিনার হ্রাস পাইবে তাহা প্রায় এক প্রকার নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার ব্যয়-সংক্ষেপে কিছু যে খরচ কমিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা বহু বারই বলিয়া আসিতেছি যে ভারতবর্ষে সরকারী কর্ম্মচারীগণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বড়ই অধিক হারে বেতন পাইয়া আসিতেছেন। ইংলণ্ড, আমেরিকার মতন ধনী দেশসমূহে রাজমন্ত্রীরা যদি বার্ষিক ছয় হাজার টাকা বেতনে সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পারেন, তবে আমাদের দেশে সে স্থলে দুই হাজার টাকা হইলেই কি যথেষ্ট হয় না? এই অনুপাতে মাহিনা কমাইলে Departmental Headদের মাসিক এক হাজার টাকা হইলেই যথেষ্ট। ব্যয় সংক্ষেপ কমিটীকে আমরা আর একটী কথা অনুধাবন করিতে অনুরোধ করিতেছি। সরকারী অফিসসমূহে Stationery বাবদ অযথা বহু খরচ হইয়া থাকে। এই বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করিলে ক্ষতি কি?

রবীন্দ্র জয়ন্তী

রবীন্দ্র নাথের ৭০তম জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। এই তিথির সভাপতিরূপে শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনেক কথার আলোচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ যে শুধু কবি তাহা নহেন, তিনি ভাগ্যবান ও বটেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিষ্ঠা আজ সমস্ত জগতে একটী নূতন সত্য বহন করিয়া আনিয়াছে বলিয়াই তাঁহার বিশ্ব-জগতে এত আদর। কিন্তু এই বরেণ্য পুরুষকে আমরা আজ অবধি কি দিতে পারিয়াছি? পূর্ব্বে কবিগণ সমাজের, রাষ্ট্রজগতের উচ্চ আসনে অভিষিক্ত থাকিতেন সত্য। অনেক কবিই মুসলমান জগতে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা হইয়া গিয়াছেন। ফার্দ্দসী তাদৃশ সম্মান না পাইলেও বিপুল অর্থ ও রাজসম্মান পাইয়া ছিলেন। পাশ্চাত্য জগতেও কবিগণ ঈশ্বরবৎ সম্মান পাইয়াছেন। কথিত আছে, কোন মহিলা Shakespeare এই নামটী দশ হাজার বিবিধ প্রকারে বানান করিয়া ছিলেন। Shakespeareএর গ্রন্থাবলী ইংরাজী সমাজে বাইবেলের পরেই অধীত হইয়া থাকে। Wordsworth Tennyson রাজকবি হইয়া ছিলেন। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত Kipling রাজনীতিতে ধ্রুব নক্ষত্র ছিলেন। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ তাঁহারই ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

পরলোকে মহারাজ মামুদাবাদ

যুক্তপ্রদেশের পুরুষসিংহ মহারাজ মামুদাবাদ পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার তিরোধানে আমরা বিশেষ দুঃখিত কেননা তাঁহার দেহ রক্ষা করিবার উপযুক্ত সময়ের এখনও অনেক দেরী ছিল। ইহা ছাড়া এই সন্ধিক্ষণে তাঁহাকে হারাইয়া কংগ্রেস একজন পরাক্রমশালী উদার-নৈতিক মুসলমান হারাইলেন। তিনি আজীবন ন্যায় ও সত্যেরই সেবা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারই বিশেষ উদ্যোগে লক্ষ্ণৌ সহরে বিখ্যাত হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট সংঘটিত হয়। অসহযোগে আন্দোলনে তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করেন। নেহেরু রিপোর্ট সমর্থন করিবার জন্য তিনি মুসলমান প্রধানদের বিশেষ বিরাগভাজন হন। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও মৌলানা শৌকৎ আলির সহিত যুক্তি-তর্কে যুঝিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার আত্মার উন্নতির জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

মুসলিনীকে আক্রমণ

মুসলিনীর উপর আবার আক্রমণ হইয়াছিল, আক্রমণ-কারী আবার বিফলমনোরথ হইয়াছে। জনপ্রিয় দেশ-নেতার উপর আক্রমণ কেমন করিয়া হইতে পারে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট বহুবার ঘাতকের হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। রুসিয়ার প্রধান পচালক রুসিয়ার সম্রাটের অপেক্ষাও অধিক সতর্কভাবে অবস্থান করেন। তিনি নাকি ঘরের মধ্যে ঘর তাহার মধ্যে যে ঘর সেই ঘরে বাস করেন। প্রত্যেক ঘরটী লৌহ কবাট দ্বারা [illegible] রূপে সুরক্ষিত সশস্ত্র প্রহরী দিবারাত্র এই ঘ[illegible] পাহারা দেয়। কাজেই অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন [illegible] তাঁহাদের জন নায়ক বলিব কেন? শাসন করিতে গেলেই অপ্রিয় হইতে হয়। শাসক চিরকালই লোকসমাজের ত্রাসের হেতু বলিয়া

কখনই পূজা পান পাই। বর্ত্তমান কালে যত প্রকার শাসন যন্ত্র স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহার কোটাই শাসক সম্প্রদায়কে জনপ্রিয় করিতে পারে নাই। ভবিষ্যতে যাহাতে শাসক-সম্প্রদায় জনপ্রিয় হইতে পারে, এমন ব্যবস্থা কি রাজনীতি-বিৎ পণ্ডিতগণ করিতে পারেন না?

বর্ত্তমানের ব্যবসায়

ইংরাজের ব্যবসাবাণিজ্য মন্দা যাইতেছ বলিয়া প্রিন্স অফ্ ওয়েলস দক্ষিণ আফ্রিকায় ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। সেখানকার ব্যবসায়ীমণ্ডলী রাজপুত্রকে সাদরে আহ্বান করিয়া বহু সভা-সমিতিতে তাঁহাকে যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তাঁহারা যে সমস্ত কথা যুবরাজকে বলিয়াছেন তাহার মধ্যে দুই একটী কথা বিশেষ করিয়া প্রণিধান যোগ্য। তাঁহারা বলিয়াছেন যে ইংরাজ ব্যবসায়ীরা বুঝিয়া থাকেন যে কোন দ্রব্য মজবুত ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেই উত্তম দ্রব্য হইল। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে চালিত ফ্যাসান অনবরত বদলাইয়া যাইতেছে। অদ্য প্রচলিত মটর; কল্য আর চলিবে না; কাজেই এক্ষেত্রে কারখানার মালিকগণ যদি মূল্য হ্রাসের দিকে নজর রাখিয়া দেখিতে সুন্দর কিন্তু কম মজবুত জিনিষ তৈয়ারী করান তাহা হইলে ভবিষ্যতে ইংরাজ পণ্য জগতের অনেক স্থলেই প্রতিযোগীতা করিতে পারিবে। মাল বহিবার জন্য পূর্ব্বকার প্রথা অপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক প্রথা অবলম্বন করিতে হইবে, একথাও তাঁহারা খুব জোরের সহিত বলিয়াছেন। যেখানে এখন শুধু ভারবাহী পশুর দ্বারা মাল চলাচল করা হয়, তথায় মোটরের সাহায্য লইতে হইবে। যেখানে রেলে মাল প্রেরণ সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়-সাপেক্ষ সেখানে এরিয়াল রোপওয়ে বা এরোপ্লেনের সাহায্য লইতে হইবে। কথাগুলি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য, আমাদের ভারতের ব্যবসায়ীগণকে এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

সর্ব্ব দেশগত স্বার্থ

বেঙ্গল ন্যাসনাল চেম্বার্স অফ কমার্সের সহকারী সভাপতিরূপে শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার কয়েকটী সারগর্ভ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। কথাটা সত্য যে বাংলা অন্যান্য দেশের সহিত সহযোগীতা করিতে গিয়া বিশেষ ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াই আসিতেছে, ১৯০৫ সালে স্বদেশীর প্রচলন হইলে বাংলা বোম্বায়ের কাপড় মাথায় তুলিয়া লয়, ইহারই পুরস্কার স্বরূপ মহাযুদ্ধ [illegible] বাংলাকে বোম্বাই হইতে ৩।৪ গুণ [illegible] দিয়া বস্ত্র খরিদ করিতে হইয়াছিল। বোম্বা[illegible]ইনসিওর কোম্পানী গুলিতে জীবন বীমা [illegible] বা বোম্বায়ের ব্যাঙ্কগুলিতে টাকা গচ্ছিত [illegible] বাঙ্গালী কখনই দ্বিধা করে না। কিন্তু এই সমস্ত ব্যাঙ্ক বা জীবন বীমা কোম্পানীগুলিতে দায়ীত্ব পূর্ণ সমস্ত কার্য্যগুলিই বোম্বাইবাসীদের হস্তে ন্যস্ত, বাঙ্গালীকে তথায় শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। বর্ত্তমান এক্সেঞ্জ লইয়া যে গোলমাল তাহারও মূলে বোম্বায়ের স্বার্থ নিহিত আছে। মাদ্রাজের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি আসিয়া বাংলায় করিয়া খাইতেছে। সারা রাজপুতনার মারওয়ারী মহল কলিকাতায় প্রাসাদ উত্তোলন করিয়া চলিয়াছে। অথচ বাঙ্গালীর বাংলার বাহিরে স্থান নাই। প্রত্যেক প্রদেশই প্রত্যেক প্রদেশবাসীর জন্য "বাংলা কিন্তু সকল জাতির জন্য মুক্ত। জাতীয়তার দিনে এইরূপ যুক্তি অনেক সময়েই অযুক্তিকর বলিয়া মনে হইয়া থাকে সত্য। কিন্তু সকল বিষয়ের যখন মীমাংসা হইতে চলিল, মাইনরটী সমস্যা যখন অবশ্যম্ভাবী হইয়া দাঁড়াইয়াছে তখন ইহারই বা একটা মীমাংসা না হইবে কেন? স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে বাস করা উচিত নয়, তবে এই উপদেশ সর্ব্বত্র প্রচলিত হইতে দেখিলেই আমরা সুখী হইব। এই জন্যই প্রত্যেক প্রদেশের নেতাগণকে আমরা অনুরোধ করিতেছে, যে স্বার্থের গণ্ডি ভগ্ন করিয়া দিয়া, বেহার কেবল বেহারীদের জন্যই, মাদ্রাজ কেবলমাত্র মাদ্রাজীদেরই জন্য ইত্যাদি নীতির আমূল পরিবর্ত্তন করুন।

স্বদেশিকতা।

প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে পৃথিবীতে এমন কোন দেশই নাই যেখানে তথাকার অধিবাসীদের আবশ্যকীয় তাবৎ দ্রব্যই উৎপন্ন হয়। অন্তর্জাতিক বাণিজ্য এই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধ প্রত্যেক দেশ দেখিল যে সঙ্কটকালে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হইতে গেলে স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করা অসম্ভব হয়। ইটালী যতই আস্ফালন করুক না কেন কয়লা ও লৌহের জন্য তাহাকে বাহিরে তাকাইতেই হয়। ইংলণ্ড নানা প্রকার পণ্য সম্পদে শ্রীমান হইলেও তেলের জন্য অন্য দেশের নিকট হাত পাতিতে হয়। এমন যে আমেরিকা তাহাকেও টেলিফোনের সরঞ্জাম, রবার ও ইস্পাতের জন্য বাহিরে তাকাইতে হয়। এই পরস্পর নির্ভরভাব কাটাইবার জন্য প্রত্যেক দেশই এখন তোড় জোড় করিতেছে। লর্ড বদারফোর্ড তাহার দেশবাসীকে বলিয়াছেন যে তৈল আমাদের দেশে নাই সত্য কিন্তু চেষ্টা করিলে কয়লা হইতে তৈল পাওয়া যাইতে পারে। কয়লা হইতে যে তেল প্রস্তুত হইবে উহার মূল্য নিশ্চয়ই স্বাভাবিক তৈল অপেক্ষা কিছু অধিক হইবে। কিন্তু প্রত্যেক ইংরাজ উচিত অধিক মূল্য দিয়াও এই তেল খরিদ করা।

পুষ্পপাত্র

"বিভোরা"

[illegible] প্রেস, [illegible] কলিকাতা



৫ম. বর্ষ | শ্রাবণ—১৩৩৮ | ৪র্থ সংখ্যা

মহাত্মা গান্ধির রাজনৈতিক দার্শনিকতা

শ্রীভারত কুমার বসু —প্রবন্ধ—

ভারতীয় মতানুসারে গুণ এবং কর্ম্ম অনুযায়ী পৃথিবীর লোকদের চারটী প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে; ("গীতা", ১৮—৪১) যথা:—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। ব্রাহ্মণ অর্থে আত্মিক শিক্ষক, ক্ষত্রিয় অর্থে যোদ্ধা, বৈশ্য অর্থে বণিক ও কৃষক, এবং শূদ্র অর্থে দাস ও শ্রমিককে বোঝায়। শূদ্রের চেয়ে বৈশ্যের, বৈশ্যের চেয়ে ক্ষত্রিয়ের, এবং ক্ষত্রিয়ের চেয়ে ব্রাহ্মণের স্থান বরাবরই উর্দ্ধে। প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ধ্যান-ধারণা আছে এবং প্রত্যেকেই বিভিন্ন দিক দিয়ে বিভিন্ন উপায়ে জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত ক'রতে চায়। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন লোক গুণ এবং কর্ম্ম অনুসারে শূদ্র থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে কখনোই জীবনের চরম শান্তি এবং আশীর্ব্বাদ পেতে পারে না। তা পেতে হ'লে, নিজেকে খাঁটী ব্রাহ্মণের সমান ক'রে তোলা চাই। হ'লেই বা সে শূদ্র। ব্রাহ্মণত্ব ত মনুষ্য-জাতির কোনো নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ নেই। (শান্তি-নিকেতনের পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য) শাস্ত্রী এবং অনেক নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণও এ-কথা স্বীকার ক'রেছেন।

কিন্তু ব্রাহ্মণের সমান হ'তে হ'লে, ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কি, তা জানা উচিত। বহু-বহু বছর আগে থেকেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র-জাতি অনেকগুলি ছোট-বড় যুদ্ধ ক'রে আসছে। প্রাচীনকালের যুদ্ধে ক্ষত্রিয়দের সকলের চেয়ে বড় যুদ্ধ ছিল—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ কেবল ক্ষত্রিয়দেরই মধ্যে হ'লেও, কতকগুলি ব্রাহ্মণও তাতে যোগদান ক'রেছিলেন। একজনের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আচার্য্য দ্রোণের নাম করা যেতে পারে। কিন্তু ওই সব ব্রাহ্মণ ত সেই যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম পালন করেন নি। পালন ক'রেছিলেন খাঁটী ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। সুতরাং ওই নামে-মাত্র ব্রাহ্মণদের কাছে ব্রাহ্মণ্য-স্বাতন্ত্র্যের অনুসন্ধান পাওয়া যাবে না।—তাঁদের ধর্ম্ম ছিল খাঁটী ক্ষত্রিয়ের সেই ধর্ম্মের অনুরূপ, ভগবান কৃষ্ণ "গীতায়" যার ব্যাখ্যা ক'রে গিয়েছেন।...

বৈশ্য এবং শূদ্র জাতির (বণিক-সম্প্রদায়, তাদের প্রজা এবং ভাড়া-করা সৈনিকের) সম্মিলিত-শক্তি সকলের চেয়ে বড় যে-যুদ্ধ ক'রেছিল, তা হচ্ছে ইউরোপের বিগত মহাসমর, যে-মহাসমর নিট্‌স্কের (Nietz-chera) মতো

ব্যক্তিদের আদর্শে পরিচালিত হ'য়েছিল। কিন্তু তখ.না পর্য্যন্ত পৃথিবীর লোক আর একটা বিরাট যুদ্ধের—খাঁটী ব্রাহ্মণ্য-যুদ্ধের (Brahmanic warএর) কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। সে-স্বপ্ন আজ ভারতে মূর্ত্তি ধ'রে উপস্থিত হ'য়েছে। ব্রাহ্মণ্য-যুদ্ধের এই মূর্ত্তির মধ্যে চোখের বদলে চোখ উপ্ড়ে নেবার এবং দাঁতের বদলে দাঁত ভেঙে ফেলবার ইঙ্গিত নেই। ইঙ্গিত আছে—পুণ্য পুস্তক "ধম্মপদে"-রক্ষিত, দু হাজার বছরেরও বেশী দিন আগেকার গুরু-বুদ্ধের পবিত্র বাণীর :—

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেনালীকবাদিনং ॥

ম্যাক্স্‌মুলার এর অর্থ করেছেন,—"লোক যেন প্রেমের দ্বারা ক্রোধকে জয় করে, সাধুতার দ্বারা অ-সাধুতাকে জয় করে, দানের দ্বারা কদর্য্যকে (অর্থাৎ লোভীকে) জয় করে এবং সত্যের দ্বারা অসত্যকে জয় করে।"—পৃথিবীর মধ্যে যাঁরা আধুনিক সভ্যতা এনেছেন, তাঁরা এককালে শোষক এবং বিজেতা, অর্থাৎ, তাঁদের মধ্যে বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়ের অতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বর্ত্তমান আছে। কিন্তু বৌদ্ধ-সঙ্ঘের যে-সব লোক ভারতের বাইরে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, তাঁরা কেবল ভগবান-বুদ্ধের পুণ্য-বাণীর আত্মিক অস্ত্রের দ্বারাই অধিকাংশ এসিয়া-বাসীরই বর্ব্বর এবং পশু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেছিলেন। বুদ্ধের সেই পুণ্য বাণীর প্রতিধ্বনি মহাভারতেও পাওয়া যায় :—

"অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্ অসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্য্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্ ॥"

(—মহাভারত (প্রতাপ রায় সংস্করণ) উদ্যোগ পর্ব্ব ৩৮-৭৩)

—অর্থাৎ, "প্রেমের দ্বারা ক্রোধকে জয় করা উচিৎ," ইত্যাদি।...

ঈশ্বরের অবতার যিশুখৃষ্টেরও উপদেশ ছিল এই,—"যে-কোনো ব্যক্তিই তোমার ডান-গালে মারুক্ না কেন, তার দিকে বাঁ-গালটিও ফিরিয়ে দিয়ো!"—"তুমি যে তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসবে এবং শত্রুকে ঘৃণা ক'রবে, তা হবে না।"—"তোমার শত্রুদের ভালোবাসো এবং যারা তোমাকে অভিশাপ দেয়, তাদের আশীর্ব্বাদ দিয়ো! যারা তোমাকে ঘৃণা করে, তাদের উপকার কোরো এবং প্রার্থনা ক'রো তাদের জন্যে, যারা তোমাকে তিরস্কার করে, নির্য্যাতন করে।—"

এইটাই হচ্ছে খাঁটী ব্রাহ্মণের আদর্শ-ধর্ম্ম। এবং খাঁটী ব্রাহ্মণ যিশুর দ্বারা এই ধর্ম্ম প্রায় দু হাজার বছর আগে ভারতের বাইরে মনুষ্য-সমাজে প্রচার হ'য়েছিল। যিশু তাঁর কথা-অনুযায়ীই কাজ ক'রেছিলেন। শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছিলেন এবং পেয়েছিলেন বিজয়ের গৌরব-মুকুট। শত্রুর রক্ত-পাতে তিনি জয়-লাভ করেননি। তিনি জয়ী হ'য়েছিলেন—নিজের রক্ত-পাতের দ্বারা। নির্ভীক হৃদয়ে পৃথিবীর দুঃখকে জড়িয়ে ধ'রে তিনি কর্ত্তব্য করেছিলেন, এবং তার ফলে, শুধু তাঁর শত্রুরা নয়, সারা-জগৎ তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে প'ড়েছিল।

চোখের বদলে চোখ এবং দাঁতের বদলে দাঁত নেওয়ার পদ্ধতিকে ব্রাহ্মণরা কু-পদ্ধতি ব'লেই মনে ক'রতেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে, অনিষ্টের দ্বারা অনিষ্টের অপসারণ, অসত্যের দ্বারা সত্যের প্রাপ্তি এবং মন্দের দ্বারা মঙ্গলের আগমন কখনো সম্ভব হ'তে পারে না। তাঁদের আরও বিশ্বাস ছিল এই যে, দেহের চেয়ে আত্মা অনেক বড়, এবং আত্মার তুলনায় দৈহিক স্বাধীনতার কোনোই মূল্য নেই; এইজন্যই, আত্মিক শক্তির কাছে দৈহিক শক্তি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আসতে পারে না।

কিন্তু আত্মিক শক্তিকে অর্জ্জন করা যায় কি ক'রে?—ত্যাগের দ্বারা।—"ত্যাগাৎ নান্যত্র মর্ত্তানাং গুণাস্তিষ্ঠন্তি পুরুষে।" ত্যাগ না থাকলে কোনো লোকের মধ্যেই ভাল গুণ থাকতে পারে না। মহাভারতেও লেখা আছে :—

"ন মুহ্যেদর্থকৃচ্ছ্রেষু ন চ ধর্ম্মং পরিত্যজেৎ।
যৎ কল্যাণমভিধ্যায়েৎ তত্রাত্মানং নিয়োজয়েৎ ॥
ন পাপে প্রতিপাপঃ স্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ।
আত্মনৈব হতঃ পাপো যঃ পাপং কর্ত্তুমিচ্ছতি ॥

—অর্থাৎ, আর্থিক দুঃখের সময়ে মুহ্যমান হ'য়ে পড়া এবং ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা উচিৎ নয়। যাতে কল্যাণ হয়, তার চিন্তা এবং তাতেই আত্ম-নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। পাপের প্রতিদানে পাপ করা উচিৎ নয়; সর্ব্বদা সাধু এবং সদয় থাকাই কর্ত্তব্য। যে-ব্যক্তি পাপ-কাজ ইচ্ছা করে, সে পাপের দ্বারা নিজেই নিহত হবে।...

এইটাই খাঁটি ব্রাহ্মণদের চিন্তার সামগ্রী এবং তাঁরা এই অনুযায়ীই কার্য্য করেন। সুতরাং এটাকে কোন মতেই অগ্রাহ্য করা চলে না। তারপর, এটা যে কেবল পরমাত্মিক উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম-জীবনেই অবলম্বনীয়, তা নয়। প্রত্যেক কাজের প্রত্যেক বিভাগেই সমানভাবে এটা প্রযোজ্য হ'তে পারে।

রাজনীতি,—শাণিত, কঠোর, উগ্র রাজনীতি,—তার মধ্যে ধর্ম্ম কিম্বা আধ্যাত্মিকতার কোনো গন্ধও নেই। কিন্তু এই রাজনীতিকেই ক'রতে হবে আধ্যাত্মিক এবং ধর্ম্ম-প্রবণ। এই ধর্ম্ম-প্রবণ রাজনীতিই ব্রাহ্মণের একমাত্র অস্ত্র। এই অস্ত্রের দ্বারাই পৃথিবীর সকল প্রকার অনিষ্টের সঙ্গে নিরাপদে যুদ্ধ ক'রতে পারা যাবে। এবং যেহেতু, যেখানেই ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়, এই কারণে, সকলের শেষে ইষ্টের অভ্যুত্থান হবে নিঃসন্দেহে। আধ্যাত্মিক রাজনীতি-অস্ত্রের দ্বারা খুব বড় দরের ব্রাহ্মণ্য যুদ্ধের কাহিনী ইতিপূর্ব্বে ভারতের ইতিহাসে পাওয়া যায়নি। আজ বহুদিনের পর পৃথিবীর অজ্ঞাত সেই পবিত্র মহাযুদ্ধ হিন্দুস্থানে আত্ম প্রকাশ ক'রেছে—পশু-প্রবৃত্তিকে জয় করবার বিপুল উচ্ছ্বাসে। বিশ্ব-বন্দিত তাপস, পুণ্য-প্রাণ মহাত্মা গান্ধী এই আধ্যাত্মিক যুদ্ধ-যজ্ঞের ধ্যানী পুরোহিত। এ-যুদ্ধের আদর্শ—অহিংসা। কিন্তু তবুও তা সকল প্রকার হিংসা-মূলক অনিষ্টকে দূর ক'রে দেয়, অর্থাৎ, তা রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, সামাজিক এবং চরিত্র-নৈতিক—সব রকমের বিপত্তির নাশ করে। এ-কথা সত্য যে, উক্ত যুদ্ধ ধ্বংসকারী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও ঠিক যে, তা রক্ষাও করে। বরং ধ্বংস-করার চেয়ে তার রক্ষা-করার পরিমাণ অনেক—অনেক বেশী। এই যুদ্ধের আদর্শের দ্বারা মানুষ ভুলের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে এবং সত্যের উজ্জ্বল আলো দেখতে পায়। এই আদর্শের দ্বারা মানুষ কাল্পনিক ভয়, কাপুরুষতা এবং ভীরুতাকে দূর ক'রে, আত্মবিকাশের প্রথম এবং প্রধান বাধা—বন্দীত্ব অথবা দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন ক'রতে পারে। এই আদর্শের দ্বারা পরাধীন জাতি অত্যাচারী বিজেতার কাছে নির্ভীক হৃদয়ে ব'লতে পারে, "হ্যাঁ, আমরা তোমাদের সঙ্গে আর কোনো সংস্রব রাখতে চাই না। তোমাদের যা ইচ্ছে তাই ক'রতে পার। ইচ্ছে ক'রলে, আমাদের মাথা-ও নিতে পার। কিন্তু যত-ই তোমরা শক্তিশালী হও না কেন, মনে রেখো, আমাদের আত্মার গায়ে আঁচড়টা দেবার-ও ক্ষমতা তোমাদের নেই!"

এই সত্যের প্রচারের দ্বারা মহাত্মা গান্ধী তাঁর কর্ম্মের ভিতর দিয়ে সারা ভারতবাসীকে ব্রাহ্মণের সত্ত্বা দান ক'রতে চান। সে দান মানুষের চোখের সাম্‌নে নূতন এক পবিত্র স্বর্গের স্বর্ণ-তোরণ খুলে দেয়। তার মধ্যে এই ক'টা আদর্শ পাওয়া যায়:—

১। মানুষ যেন কোনো দেশের কোনো জাতির কোনো ধর্ম্মের কোনো সম্প্রদায়স্থ লোকের প্রতি হিংসা এবং অনিষ্টের ইচ্ছা পোষণ না করে। এমন কি, জীবিত কীট-পতঙ্গের-ও ক্ষতির ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে অবাঞ্ছনীয়।

২। কোনো কারণেই কেউ মিথ্যাকথা ব'লতে পারবে না, এবং মিথ্যার সঙ্গে সংস্রব রাখতে পারবে না।

৩। সাধুভাবে পরের জিনিষ না পেলে, তা নিশ্চয় গ্রহণ ক'রতে পারবে না।

৪। দেহ এবং জীবন-রক্ষার জন্য কেবল যেটুকু জিনিষের দরকার, তার বেশী কেউ কিছুই নিতে পারবে না।

৫। সকলকেই খাঁটী ব্রহ্মচর্য্য নিয়ে থাকতে হবে।

—মহাত্মা গান্ধীর ব্রাহ্মণ্য-যুদ্ধের সেনানী যাঁরা, বিশেষতঃ তাঁদের কাছে উক্ত আদর্শ একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়। সত্যের পথে শয়তানের অনেক বাধা আছে। জাতির নির্জীব-হওয়া আত্মাকে গান্ধীজী তাই প্রস্তুত ক'রে নিতে চান,—শক্তিমান ক'রে নিতে চান। মৃত্যু? সেত আছেই। জন্ম এবং মৃত্যু হাত-ধরাধরি ক'রে আসে। এই মৃত্যুর ভয়কে দূর করাই মহাত্মাজীর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।—মহান্ যোগী গান্ধীজীর অ-সাধারণ আত্মিক শক্তি-ই তাই আজ সারা ভারতের মিলিত শক্তির জীবন্ত প্রেরণা। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে "গীতায়" সঞ্জয়ের যা-উক্তি আছে, তার মাত্র কয়েকটা কথার পরিবর্ত্তন ক'রে, মনে হয়, সঞ্জয়ের আত্মা যেন মূর্ত্তি ধ'রে এসে, গান্ধীজীর পবিত্র ব্রাহ্মণ্য-সংগ্রামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পীড়িত, নিঃস্ব, বন্দী হিন্দুস্থানের হতভাগ্য নর-নারীকে বিশ্বাস-দৃঢ় কণ্ঠে শোনাতে চাইছে:—

"যত্র যোগোজ্জ্বলো গান্ধী
যত্র চৈতে ধনুর্ধরাঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতি-
র্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥"

—"যেখানে যোগে-উজ্জ্বল গান্ধী র'য়েছেন, যেখানে র'য়েছেন এত ধনুর্ধর (অর্থাৎ পশু-প্রবৃত্তি-ধ্বংসকারী ধর্ম্ম-যুদ্ধের সেনা) সেখানে আমার মনে হয়, শ্রী, বিজয়, বৈভব এবং স্থিরনীতি আসবেই আসবে"।

দক্ষিণ-আফ্রিকার স্বাধীন যুক্ত-রাষ্ট্রের মূল-কারণ—বিখ্যাত বোয়ার-যুদ্ধের উদ্দেশ্যে মিঃ Erskine Childers তাঁর "War and the Arme Blanche"—নামক পুস্তকের ২১৫-র পৃষ্ঠায় লিখেছিলেন :—

"The truth came like a flash··· that all along we had been conquering the country, not the race; winning positions, not battles."

—বর্ত্তমান ভারতেরও জাতীয় যুদ্ধের দিক দিয়ে, লক্ষকোটি চাইল্ডার্সের মুখ থেকে কি ওই উক্তি পুনরাবৃত্তির যোগ্য নয়?—কিন্তু কেন যোগ্য? তার একমাত্র কারণ, মহাত্মাজীর আত্মিক শক্তি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আসুরিক পশু-শক্তিকে পরাজিত করে, ধ্বংস করে। মহাত্মাজীর ধর্ম্ম—আদর্শ হিন্দুধর্ম্ম। এবং হিন্দুজাতি মরবার নয়: যা সত্য এবং সত্য-প্রতিষ্ঠ তার মৃত্যু নেই;—তার জয় অবশ্যম্ভাবী।" সত্যমেব জয়তে নানৃতং"!—স্বামী বিবেকানন্দ ব'লে গিয়েছেন, "আমরা ভারতবাসী যে এই দুঃখ-দারিদ্র্য, এবং ঘরে-বাইরে উৎপাত স'য়ে বেঁচে আছি, তার মানে, আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে; সেটা জগতেরও জন্য দরকার।"

—কিন্তু ওই "জাতীয় ভাব"টা কি?—নিঃসন্দেহে ধর্ম্ম ভাব। সর্ব্ব কর্ম্মের শেষে "ব্রহ্মার্পণমস্তু"—বলার প্রেরণা, ধর্ম্ম-ভাবের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। এই ধর্ম্ম-ভাবই শত বাহুর দ্বারা গান্ধীজীকে আগলে রেখেছে, তাঁকে শক্তি দিয়েছে, মহান্ হ'তেও মহান্ ক'রে তুলেছে।

কিন্তু আসুরিক শক্তি সাধনার যে-প্রেরণা, পরব্রহ্মে তার বিশ্বাস নেই। সে প্রেরণাকে মহাত্মাজী ঘৃণা করেন,—অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করেন।

নিট্‌স্কের (Nietzysche) "এ্যান্টি ক্রাইষ্ট" গ্রন্থে লেখা আছে :—

"শুভ কিসে? ক্ষমতার প্রসারে;—ক্ষমতা-লাভের আকাঙ্ক্ষা যাতে প্রবল হয় তাতে;—মানুষের শক্তি-প্রতাপে। আনন্দ কিসে? ক্ষমতা-প্রসারের অনুভূতিতে; —বাধা-বিঘ্নের অতিক্রমে;—তৃপ্তিতে নয়, অধিকতর শক্তি-অর্জ্জনে;—সর্ব্বস্ব বিনিময়ের শক্তি-লাভে নয়, সংগ্রামে;—ধর্ম্মবলে নয়, কর্ম্মবলে!"

নিট্‌স্কে জার্ম্মাণীকে এই শিক্ষা দিতেন। আসুরিক মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে জার্ম্মাণীর সন্তা তাই ব'লতো, "আমার শক্তি আছে। আমি সেই শক্তির উপর নির্ভর করি। আমার পথে যে প'ড়বে, তাকে দমন ক'রবো। যার সঙ্গে আমার বিরোধ বাধবে, তার উচ্ছেদ ক'রবো। যুদ্ধই আমার জীবন। বাধা-বিঘ্ন সহ্য ক'রবো না। আমার শক্তির বিস্তার চাই'!" আজ সেই জার্ম্মাণীর অবস্থা কি?

এই রকম আসুরিক ভাব প্রবল হ'লেই পৃথিবী দানব-রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু দানব-শক্তিকে শান্ত করবার জন্য, উর্দ্ধে অলক্ষ্য দেবতা সেই বজ্রপানীর সৃজিত ধর্ম্ম-শক্তি শেষে আত্ম-প্রকাশ করে। ইউরোপের বিগত মহাসমরের শেষে, আসুরিক বলের দমনের জন্য আমেরিকার যোগদান তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমেরিকার উক্ত যোগদানের মধ্যে কোনো স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্য ছিল না। আমেরিকার যোগদানের মধ্যে ছিল ধর্ম্ম-ভাবের প্রেরণা। ক্রুসেডের সময়ে যেমন "God wills it! God wills it!" ব'লে বিভিন্ন জাতি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস নিয়ে, ঈশ্বরের-ই আদেশ পালনের জন্য একত্রিত হ'য়েছিল, আমেরিকা-ও তেমনি ঈশ্বরের কর্ম্ম-ভার নিয়ে ধর্ম্মানুপ্রেরণায় উক্ত মহাযুদ্ধে যোগদান করে। তার ফলে, পৃথিবীর বুকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হ'লো যে, ঐশী শক্তি-ই রিপু দমনে সক্ষম এবং ঐশী শক্তি-ই প্রাণ-শক্তি। এই ঐশী শক্তির শেষ নেই, কারণ, তা সারা জগতের সকলকার জন্যই অপেক্ষা করে। কিন্তু ঐহিক শক্তি, ঐহিক প্রতিপত্তি কেবল স্বতন্ত্র ব্যক্তি, অথবা, স্বতন্ত্র জাতির পিছু পিছু ঘোরে। এইজন্যই এর সীমা খুবই সঙ্কীর্ণ, এবং এই কারণেই এর আয়ু স্বল্পকাল স্থায়ী।

জার্ম্মাণ-জাতি অস্ত্র-শক্তিকেই (অর্থাৎ ঐহিক শক্তিকেই) মানব-জাতির শ্রেষ্ঠ সাধনা ব'লে জার্ম্মাণীর শিক্ষা-প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করেন। জনৈক জার্ম্মাণ-সৈন্যাধ্যক্ষ ব্যারণ্ ভন্ ফ্রেট্যাগ্ লরিংহোভেন্ বলেন যে, যুদ্ধের ইচ্ছা মানব-প্রকৃতিগত। সুতরাং যুদ্ধের চেষ্টা করা এবং যুদ্ধের শিক্ষা নেওয়া মানব-জীবনের একটী প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া দরকার।

—এই উদ্দেশ্য যে পশু প্রবৃত্তিরই পরিচায়ক, টাইস্কে-ও (Treitschke-ও) সে কথা বোঝেন। তাই তিনি বলেন,—

"কি-সুসভ্য, কি বর্ব্বর, উভয়ের-ই মধ্যে পশুবৃত্তি আছে। মানব-চরিত্রের পাপ যে মানুষের সৃষ্টির সময় থেকেই জন্মগ্রহণ ক'রেছে, বাইবেলের এ-কথা সম্পূর্ণ সত্য। সভ্যতা সে-পাপ দূর ক'রতে পারে না। যতই কেন সভ্য হওয়া যাক না, তা যাবার নয়। পশু-প্রবৃত্তিকে দমন ক'রতে মানুষ কখন-ই পারবে না।"

কিন্তু ট্রাইস্কে-ই বলেন, যে, মানুষের আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন না হ'লে, শক্তি-পূজাতে কোনো মঙ্গল হবে না; ধর্ম্ম-ভাব ভিন্ন আত্মার সংস্কার অসম্ভব! এ-উক্তি, বহুকাল-হ'তে-শোনা, মহাত্মা গান্ধীর অর্থাৎ সারা ভারতের ধর্ম্ম-প্রবণ মর্ম্ম-বাণীর-ই প্রতিধ্বনি নয় কি?

ম্যাট্‌সিনি (Mazzini) তাঁর "Duties of man" ("মানব-ধর্ম্ম")-নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, ধর্ম্ম-বন্ধন না থাকলে, বিরোধ ও স্বতন্ত্র-ভাব ঘ'টবেই ঘ'টবে। নির্ব্বিরোধ হ'তে হ'লে লক্ষ্য এক এবং একীভূত হওয়া চাই। এই লক্ষ্য-ই ধর্ম্ম। ব্যক্তিগত অধিকার আছে সত্য, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তাকে ধর্ম্ম-ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রতে না পারা যায়, ততদিন সেই অধিকার-রক্ষার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে স্বভাবত-ই অন্য জন বা অন্য জাতি শত্রু হ'য়ে দাঁড়ায়। জাতীয় কিম্বা সামাজিক সংস্কারে ধর্ম্ম-ভাবের দরকার। আমরা এক পিতার সন্তান—এই বোধ জীবনের মধ্যবিন্দু হওয়া চাই। এই ভাব, জীবনের প্রত্যেক অংশে ব্যাপ্ত হওয়া দরকার।......

ইটালীর ম্যাট্‌সিনি ফ্রান্সের Lamennais-এর উপদেশের কথা উল্লেখ ক'রে ব'লেছেন, "অধিকার-লিপ্সা ও কর্ত্তব্য-পালন—এই দুটী স্বতন্ত্র জিনিষ।"—প্রাপ্তির চেষ্টাতে ত্যাগের ভাব না থাকলে, জাতিগত বিরোধের ইতি হয় না। স্বাধিকার-চেষ্টায় বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করা যায় বটে, কিন্তু তাতে বৈষম্যের সামঞ্জস্য ক'রতে পারা যায় না,—জাতীয় একতা গ'ড়ে তুলতে পারা যায় না। যে-জাতি স্বাধিকার-প্রসারে আত্ম-নিবিষ্ট, সে-জাতির জীবন শোণিত-সিক্ত। এই চেষ্টার শেষ কোথায়? নিবৃত্তি কিসে?...যতদিন বলবান ও দুর্ব্বল—উভয় জাতি জগতে থাকবে, ততদিন স্বাধিকারের প্রসার চ'লতে থাকবে! নির্জ্জীব জাতি ততদিন-ই দলিত হবে!

এই অবদলনের দ্বারা যে-ঐহিক প্রতিপত্তির স্পৃহা জেগে ওঠে, তার-ই সম্বন্ধে ম্যাট্‌সিনি বলেন, "যদি একেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ব'লে মেনে নেওয়া হয়, তবে বিরোধ নিয়ে জীবন কাটাতে হবে। এই উদ্দেশ্য-সাধনের ফলে প্রেম-প্রীতি ও আনন্দ-লাভ হয় না।"

বলবান জাতির স্বার্থ-সিদ্ধির প্রধান কৌশল—মুখে বন্ধু-ভাব, কিন্তু, কার্য্যে বৈরী-ভাব দেখানো। এই ঘৃণ্য কৌশলের দ্বারা-ই দুর্ব্বল জাতি দলিত হয়, উৎপীড়িত হয়, অপমানিত হয়।......ম্যাট্‌সিনি তাই ব'লেছেন, "যদি মানব-মনের অধীশ্বররূপে একটি মহা-মন না থাকেন, তবে অধিকতর বলবান ব্যক্তিরা আমাদের উপর অত্যাচার ক'রলে, কে সেই অত্যাচার থেকে আমাদের রক্ষা ক'রতে পারে? মানুষের রচিত-নয় এমন-কোনো পবিত্র ও অলঙ্ঘ্য নীতি যদি না থাকে, তবে কোন্ আইনের দ্বারা আমরা ন্যায়-অন্যায় বিচার ক'রবো? অত্যাচারের বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার বলে প্রতিবাদ ক'রবো? আমাদের ব্যক্তিগত মতামতের দোহাই দিয়ে জন-সাধারণকে কি ক'রে আত্মবলি দিতে, স্বার্থত্যাগ ক'রতে আহ্বান ক'রবো? যতদিন পর্য্যন্ত আমরা আমাদের স্বতন্ত্র বুদ্ধি-প্রসূত মতামতের উপর দাঁড়িয়ে উপদেশ দিতে থাকবো, ততদিন আমরা কথায় মিল পেতে পারি। কিন্তু কাজে পাবো না!"

তাই, জন-সাধারণকে পরিচালিত করবার জন্য যে-মহামনের প্রয়োজন, তাঁর সন্ধান পাওয়া যাবে কোথায়?—একমাত্র সেই রাজ্যে, যার অস্থি-মজ্জায়

ধর্ম্ম-ভাব বর্ত্তমান,—অর্থাৎ ধর্ম্ম-রাজ্যে,—দানব-রাজ্যে নয়।......

জার্ম্মাণীর ভূতপূর্ব্ব সম্রাট, কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ভাবতেন যে, তিনি যিশু-খৃষ্টের পদ পেয়েছেন। তিনি প্রকাশ্যভাবে তাঁর প্রজাদের ব'লতেন, "আমি তোমাদের রণ-দেবতা। আমি যদি তোমাদের আজ্ঞা দিই, পিতা-মাতাকে হত্যা কর', তোমাদের তৎক্ষণাৎ তা ক'রতে হবে! সে-কাজ ভাল, কি, মন্দ—তা তোমাদের বিচারাধীন নয়। তোমাদের শক্তিতে আমার রাজশক্তি। কিন্তু আমার ওপরে আর কেউ নেই। আমার আজ্ঞা-পালন ই তোমাদের প্রধান ধর্ম্ম!"

—কাইজারের অভিমত ছিল এই যে, রাজা রাজ্যের জন্য, এবং রাজ্য কেবল রাজা ও রাজনীতির শাসনাধীন থাকবে,—ধর্ম্মনীতির নয়।...

কিন্তু ও-সব হচ্ছে দানব-রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য। হিন্দুর দেশ হিন্দুস্থান কিন্তু যুগ-যুগ ধ'রেই ধার্ম্মিক দেশ ব'লে প্রখ্যাত। এখানকার সাধনার চরম লক্ষ্য যিনি, তিনি "একমেব অদ্বিতীয়ম্" সেই পরম পুরুষ। তিনি-ই হিন্দু জাতির নায়ক ও নিয়ন্তা। দুর্জ্জনের সংহারের জন্য যুগে যুগে তিনি মহা-মানবের হৃদয়ে অবতার রূপে আবির্ভূত হন। ম্যাটসিনি এই কথা ইটালীতে প্রচার ক'রেছিলেন। তিনি বলেন :—

"সমস্ত বড় বিপ্লবের ভিতর যে-ধ্বনি বেরিয়েছিল, তা ছিল ক্রুসেডের ধ্বনি—"ঈশ্বর সহায় আছেন। ঈশ্বর সহায় আছেন।"—এই ধ্বনি-ই নিষ্কর্ম্মাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত ক'রতে পারে।...স্মরণ রেখো, ফ্লরেন্সের শিল্পীরা মেডিচিদের অধীনে নিজেদের জনতান্ত্রিক স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে অস্বীকার ক'রে যিশুখৃষ্টকেই জনতান্ত্রিক রাজ্যের নেতা ব'লে অভিষেক ক'রেছিল।"

ফ্লরেন্সের শিল্পীদের মতো সমস্ত ভারতবাসী-ও আজ গান্ধীজীর মধ্যে খৃষ্টের সত্ত্বা অনুভব ক'রে তাঁকেই ভারতের নেতা ব'লে অভিষেক ক'রেছে' কারণ তারাও চায় জন-তান্ত্রিক স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার অর্জ্জনের জন্যই মহাত্মাজী আজ বিদ্রোহী। এ-কথা তিনি নিজেই স্বীকার ক'রেছেন। ইমার্সনের-ও একটী বিখ্যাত বাণী আছে—"Wherever a man comes, there comes revolution,"—অর্থাৎ যেখানেই কোনো মানুষ আসে, সেইখানেই আসে বিদ্রোহ। মহাত্মার এ-বিদ্রোহ কিন্তু রাজদ্রোহ নয়। রাজাকে তিনি বন্ধুর মতোই ভালবাসেন। তবে তিনি দুর্নীতি-দ্রোহী। দুর্নীতির বিরুদ্ধে-ই তাঁর পবিত্র বিপ্লব। হুইটম্যান বলেন, "Produce great persons; the rest follows,"—"মহৎ ব্যক্তিদের সৃষ্টি করো; অবশিষ্টরা অনুসরণ ক'রবে।"...মহাত্মার অ-হিংস বিদ্রোহকে প্রচার করবার জন্য, জয়যুক্ত করবার জন্য, আজ ভারতের-ও অবশিষ্ট প্রায়-সকলেই মহাত্মাজীকে অনুসরণ ক'রেছেন। মহাকবি গ্যেটে বলেন, "Fortune's greatest gift to man is personality alone."—এই অ-সাধারণ ব্যক্তিত্ব-ই গান্ধীজীর অতুলনীয় সম্পদ। এ-ব্যক্তিত্ব-প্রভাবের কথা শুনলে, 'আসিসি-'র (Assisi-র) ধর্ম্মাত্মা ফ্রান্সিস্-ও বোধ হয় হিংসা না ক'রে পারতেন না। এই ব্যক্তিত্বের দ্বারাই মহাত্মা গান্ধী দুর্নীতির বিরুদ্ধে', পশুত্বের বিরুদ্ধে, অধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাঁর জয়-যাত্রা সুরু ক'রেছেন—ঠিক 'গোলিয়াথে'র বিরুদ্ধে এগিয়ে-চলা ডেভিডের ই মতো। তাঁর এই কার্য্য কেবল যে ভারতের-ই জন্য, তা নয়;—সারা পৃথিবীর-ও জন্য। ভারতের-ই মাটীতে হয়ত অর্জ্জিত হবে জগতের মুক্তি;—চণ্ড-নীতির উৎপীড়নের হাত থেকে মুক্তি; আত্ম-পাপের অনিষ্ট থেকে মুক্তি।

এই মুক্তি-মন্ত্রের দীক্ষা-গুরু তপস্বী গান্ধীজীকে যারা বন্দী করে, ব্যথিত করে, তাদের বিচার কী "তীক্ষ্ণ"! ১৯২২ সালের পবিত্র দোল-পূর্ণিমার দিনে "বিচারের" দ্বারা ছয় বৎসরের জন্য গান্ধীজী কারা-বন্দী হন নি কি? ঠিক এই রকমই আর-এক বিচারার্থীর কথা "বাইবেলে" পাওয়া যায় :—

"লোকেরা যিশুকে বিচারকের (Pilate-এর) কাছে নিয়ে গেল। তারা তাঁকে দোষী সাব্যস্ত ক'রতে লাগলো এই ব'লে,—'আমরা দেখলুম, এই লোকটা জাতিকে কু-পথে নিয়ে যাচ্ছে এবং সিজারের রাজকর দিতে নিষেধ ক'রছে।' সেই লোকেরা তারপর অধিকতর ভীষণ মূর্ত্তি নিয়ে ব'ললে, 'এই লোকটা দেশবাসীকে উত্তেজিত করে!'—"

জাতির ধর্ম যত-ই খাটী হবে, তত-ই তা উৎপীড়কের ধ্বংস আনবে। এইটাই সার্ব্বভৌমিক এবং সার্ব্বকালীন সত্য। উৎপীড়করা তা বিলক্ষণ-ই বোঝে। এবং এইজন্যই তারা ধর্ম্ম-সংস্কারককে কারা-বন্দী কিম্বা ক্রুশ-বিদ্ধ না করা পর্য্যন্ত স্থির থাকতে পারে না। দু হাজার বছর আগেও তাই যিশু-খৃষ্ট ক্রুশে হত হ'য়েছিলেন এবং দু হাজার বছর পরেও তাই মহাত্মা গান্ধী কারা-প্রাচীরের আড়ালে বন্দী হন। গান্ধীজীর এ-বন্দীত্ব সাধারণ-বন্দীত্ব নয়। তা বুঝতে পেরেই, গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে সারা পৃথিবীর, বিশেষভাবে, আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের দিক থেকে এই রকম প্রশ্ন ও উত্তর ভেসে আসে,—"Does not this prove him to be the Christ of our age ?...I should dare to assert that Gandhi was Jesus come back to Earth."—(Reverend John Haynes Holmes, Newyork.)

যিশুর সত্তায়-উজ্জ্বল গান্ধীজী হচ্ছেন কর্ম্মের অবতার। কিন্তু তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত যোদ্ধ-কর্ম্মী স্পার্টাকাস্ কিম্বা অলিভার্ ক্রমওয়েলের তুলনা হ'তে পারে না,—যেমন হ'তে পারে—জেনারেল্ বুথের সঙ্গে জেনারেল্ ফচের (Foch-এর)। এর একমাত্র কারণ, গান্ধীজীর সারা অন্তর ভ'রে আছে বেদ ও বাইবেল্,—কৌশল নয়। কিন্তু এ-কথা সত্য যে, কৌশল অর্থাৎ মস্তিষ্ক-শক্তির দিক দিয়ে, রুষ-বিপ্লবের নেতারা মহাত্মাজীকে ছাপিয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথা-ও আর-ও সত্য যে, নৈতিক শক্তির দিক দিয়ে, উক্ত নেতাদের স্থান—মহাত্মাজীর অনেক নীচে।...নৈতিক শক্তি ও মস্তিষ্ক-শক্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। নৈতিক শক্তি জাতিকে মহৎ ক'রে তোলে। কিন্তু মস্তিষ্ক-শক্তি জাতির অন্তরে নিয়ে আসে কুটিলতা, চক্রান্ত, পাপ। পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি প্রজা-শাসনের ব্যাপারে এই পাপ থেকে মুক্ত নয়। তার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :—

একবার "রয়টারের" খবরে বেরিয়েছিল,—"আকালী-দের (Jakakil tribe-এর) বিরুদ্ধে আকাশ থেকে কার্য্যগুলি খুব-ই সফল হ'য়েছে। উক্ত লোকদের দিকে ষোলোটি "এরোপ্লেন" বোমা ফেলেছিল এবং কলের কামান ছুঁড়েছিল। তাতে পুরুষ (men) এবং গৃহ-পালিত পশু প্রচুর-পরিমাণে নষ্ট হ'য়ে যায়।...এরোপ্লেন্-গুলো শেষে তাদের আশ্রয়ে ফিরে গেল—সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায়।"

—বোমা এবং কলের কামানের দ্বারা কেবল যে পুরুষ ও পশুরা-ই হত হয়,—নারী ও ছোট ছেলে-মেয়েরা হয় না,—"রয়টারের" খবরে এইটাই কি তা হ'লে বুঝতে হবে ?...যাই হোক, রাষ্ট্রীয় শাসনের অন্যতম রূপ এই রকম-ই ? এইজন্যই ধার্ম্মিক সত্বা যুগে-যুগে ব্যথিত হয়, চঞ্চল হয়, "বিদ্রোহীও" হয়। এইজন্যই রবীন্দ্রনাথ কোন্ অ-সতর্ক মুহূর্ত্তে-নেওয়া তাঁর খেতাব ব্রিটিশ-রাজকে ফিরিয়ে দেন। এইজন্যই দু'হাজার বছর আগে থেকে আরম্ভ ক'রে আজও পর্য্যন্ত যিশু-খৃষ্টের বাণী, ভৎর্সনার স্বরে ব'লে বেড়ায়, "Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell!"—"হে সর্পের দল! বিষধরের বংশধর! কি ক'রে তোমরা নরকের অনন্ত শাস্তি এড়িয়ে যাবে!"

মহাত্মা গান্ধী বলেন, "অ-প্রতিরোধ (Non-resistance) সম্পূর্ণভাবে প্রয়োজনীয়। লোকেরা যদি হিংসাশ্রয়ী হয়, তা হ'লে সমস্তই নষ্ট হবে, কারণ, তখন-ই হবে ভারতের মৃত্যু!" এইজন্যই অমৃতসর-হত্যাকাণ্ডের নায়ক জেনারেল্ ডায়ারের জন্য তিনি শাস্তি প্রার্থনা করেন নি। তাঁর মহান্ আদর্শ হচ্ছে এই, "আমরা অবশ্যই আমাদের শত্রুকে ভালবাসবো।"—এই পবিত্র আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়েই, মহাত্মা গান্ধী উপবাস করেন, ঈশ্বরের কাছে সজল প্রার্থনা জানান ঠিক সেই সময়ে, যখন তাঁর কোনো অনুচর হিংসার পথে যায়, পাপ করে। পৃথিবীতে এ-জিনিষ কি কোনোদিন ইতিপূর্ব্বে আত্ম-প্রকাশ ক'রেছিল ? স্বর্গ ব'লে যদি কোনো-কিছু থাকে, ত, তা কি এর মধ্যেই নেই ?

...মহাত্মাজীর অহিংসা-নীতি তাই আজ পৃথিবীর কাছে এত বড় হ'য়ে উঠেছে। এই অহিংসা-নীতিরই প্রধান অঙ্গ অসহযোগ-পদ্ধতির দ্বারা ব্রিটিশ-দ্রব্য কিম্বা বিদেশী-দ্রব্য-বর্জ্জনের কথাকে বোঝায়,—তা ব'ললে, ভুল বলা হবে। অসহযোগ'-অর্থে অ-সম্মতিকে বোঝায় না। 'অ-সহযোগ' জাতির মধ্যে নিয়ে আসে আত্ম-চেতন,—যে-আত্ম-চেতন যে-কোনো বিদেশী আক্রমণ-

কারীর সঙ্গে মেলামেশা ক'রতে অনিচ্ছা জানায়। বিগত মহা সমরের সময় জার্ম্মানীর "কাইজার" যদি বাকিংহাম-রাজপ্রাসাদে এসে থাকতেন এবং ওয়েষ্টমিনিষ্টারে তাঁর মন্ত্রী আইনের উপর কর্ত্তৃত্ব ক'রতেন, তা হ'লে, ইংলণ্ডের লোকেরা তাঁদের সঙ্গে কি-রকম সম্বন্ধ রাখতেন? নিঃসন্দেহে যে-সম্বন্ধ বর্ত্তমান ভারত ব্রিটীশ-গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে রেখেছে, তা-ই। এইটাই 'অসহযোগ'-কথাটার একমাত্র ব্যাখ্যা। এর-ই সচেতনতায় বষ্টনের এক চায়ের "পার্টি"-তে আমেরিকান ঔপনিবেশিকেরা একদিন ব্রিটিশ-চা বষ্টন-বন্দরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। এরই সচেতনতায় ফ্রান্সের জন-সাধারণ অত্যাচারী নৃপতি চতুর্দ্দশ লুই-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছিল। এর-ই সচেতনতায় আমেরিকায় যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়, রাশিয়ার "জার্" রাজ্যচ্যুত হয়, দক্ষিণ-আফ্রিকার নিপীড়িত ভারতীয়রা তাদের প্রার্থিত অধিকার ফিরে পায়। এবং এর-ই সচেতনতায় আজ ভারতের ঘরে-ঘরে মাতৃ-পূজার মতো চরকার পূজা চ'লেছে—পবিত্র প্রেরণার ভিতর দিয়ে। এই চরকা-ই গান্ধীজীর রাজনৈতিক অর্থাৎ ধর্ম্মনৈতিক শক্তি।—"কারখানার বিপুল ব্যবস্থা তুলে দিয়ে কোনো রকম কুটীর-শিল্পের আয়োজন কর। ভাল'—এই যুক্তির চিন্তাশীল দার্শনিক জন্ রাস্কিন বেঁচে থাকলে, আজ গান্ধী-আশ্রয়ী ভারতবাসীর তেত্রিশ কোটী চরকার কাজ দেখে' নিশ্চয়ই বিস্মিত, বিমুগ্ধ এবং প্রীত না হ'য়ে পারতেন না! এই চরকার কাছেই আত্মবল পাওয়া গিয়েছে ব'লেই, ভারতের আত্মা আজ দৃঢ় স্বরে আব্রাহাম্ লিনকনের স্মরণীয় বাণীর পুনরাবৃত্তি ক'রে ব'লতে পারছে :—"This country, with its institutions, belongs to the people who inhabit it. Whenever they shall grow weary of the existing Government, they can excercise their constitutional right of amending it, or their revolutionary right to dis-member or overthrow it."—"সমস্ত বিধি-বিধান সমেত—এই দেশের অধিকারী তারাই, যারা এখানে বসবাস করে। যখনি তারা বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর প্রতি বিরক্ত হ'য়ে উঠবে, তখনি তারা তার সংশোধনের জন্ত নিয়ম-তান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ ক'রতে পারবে, কিম্বা তাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অথবা বিনষ্ট করবার জন্ত প্রয়োগ ক'রতে পারবে বিদ্রোহাত্মক অধিকার।"

ওই নিয়ম-তান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ ক'রেও, আয়ারল্যাণ্ডে প্রতিশ্রুত গ্ল্যাড্ষ্টোনী সেলফ্ গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হয় নি ব'লে, আইরিশ "সিন্‌ফিন্" দলের সৃষ্টি হয়। এবং ওই নিয়ম-তান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ ক'রেও, ভারত বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর সংশোধন ক'রতে পারেনি ব'লেই আজ বিদ্রোহী! ভারতের এই বিদ্রোহ-বাদই গান্ধীবাদ। পৃথিবীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আজ যে-দুটী জিনিষ সকলের চেয়ে বেশী ভেবে দেখবার যোগ্য হ'য়েছে, তার একটী—বল্‌শেভিক্-বাদ, এবং আর একটী—এই গান্ধীবাদ। মার্কের নীতি রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হব্বার পর যেটীর জন্ম হয়—তার নাম বল্‌শেভিক্-বাদ;—এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মাজীর যে-পন্থায় অপমানকর "এসিয়াটিক্ নীতির" উচ্ছেদ হয়, তার নাম—গান্ধীবাদ। দুটীর-ই আদর্শ এবং লক্ষ্য—সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা। কিন্তু দুটীর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। প্রথমটী চায়—শত্রুর ধ্বংস; দ্বিতীয়টী—শত্রুর সংশোধন! প্রথমটী—নাস্তিক; দ্বিতীয়টী—ঈশ্বরে পরম বিশ্বাসী! প্রথমটী রণক্ষেত্রে রক্ত নিয়ে মুক্তি পেতে চায়; দ্বিতীয়টী—ধর্ম্মক্ষেত্রে রক্ত দিয়ে মুক্তির আশা করে।

জার্ম্মাণীর ভন্ মল্কি (von Moltke) এক "শান্তি-বৈঠকে" ব'লেছিলেন,—"যুদ্ধ পুণ্যকার্য্য, বিধাতার বিধান। এই পুণ্য-বিধানে জগতের শাসন চ'লছে। যুদ্ধ হচ্ছে মানব-প্রকৃতির মহত্ব ও উন্নতির উপায়। তাতেই মনুষ্যত্ব, নিঃস্বার্থপরতা, সাহস, বদান্যতা-প্রভৃতি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। এক কথায়, অত্যন্ত নীচ, হেয়, বৈষয়িক ভাব থেকে তা মানুষকে উদ্ধার করে।"

—জার্ম্মাণ-সংস্কারক মার্টিন্ লুথার্-ও বলেন,

"......it (war) is a business, divine in itself, and needful and necessary to the world as eating or drinking, or any other work."—("Germany and the next war" By General F. von Bernhardi. Page 54) অর্থাৎ, "যুদ্ধ জিনিষটা আপনাতে-আপনি স্বর্গীয়, এবং এটা,

খাওয়া, পান করা কিম্বা অন্য-কোনো কাজের মতো পৃথিবীর কাজে প্রয়োজনীয়।"

জার্ম্মাণ-জেনারেল্ বার্ণ্হার্ডি আর-ও স্পষ্ট ক'রে বলেন,—'ঈশ্বরের প্রেম সর্ব্বোচ্চ সাধনা' এবং 'প্রতিবেশীকে নিজের মতো দেখ'—এই দুটী কথা রাজ-তন্ত্রে খাটে না। খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতি নিজের জন্য। তা কখনোই শাসন-তন্ত্রের জন্য হ'তে পারে না। যিশুর শিক্ষা স্বাভাবিক নিয়মের বিরোধী।"

বর্ত্তমান-অষ্ট্রিয়া-ও এই ভাবাপন্ন। সেখানকার-ও মত এই যে, "Human communities have no conscience" এবং "উদ্দেশ্য-সাধনে সব পন্থাই সাধু।" ...জার্ম্মাণীর বার্ণ্হার্ডি যেমন বলেন যে, যুদ্ধ হচ্ছে biological necessity অর্থাৎ জৈবিক প্রয়োজন, অষ্ট্রিয়ার নীতি-বৈজ্ঞানিক-ও তেম্নি বলেন যে, রাজনীতিক্ষেত্রে বল-প্রয়োগ অনিবার্য্য।

এই সব আসুরিক মনোভাবের কি উচ্ছেদ হবে না? দানবীয় মনোবৃত্তির পাপে-পঙ্কিল জার্ম্মাণীর ভিতরে ঈশ্বরের ধর্ম্ম-নিয়ে-আসা মহামন কান্টে-র (Kant-এর) বাণী কি পাশব-পৃথিবীর চারিদিক থেকেই শোনা যাবে না,—"ঐশী-প্রকৃতির পূর্ণ সাগর থেকে প্রকাশ-হওয়া অন্তর্নিহিত এক পবিত্র উৎস থেকে মানুষ নিজের শক্তি-লাভ করে, তাই মানুষ কর্ত্তা। তাই সে নিজের মধ্যে নিজের ইচ্ছা পরিচালনের নিয়ম পায়। মানব-হৃদয়ের জ্ঞান-ই ঈশ্বর-উদ্ভূত। যা ন্যায়, তা-ই পবিত্র। এই নীতিধর্ম্ম রাজার-ও প্রাপ্য। তাঁকে তা নতজানু হ'য়ে নিতে হয়।"

ঈশ্বরকে উপেক্ষা ক'রে দানবকে প্রাধান্য দেওয়া, মূর্খতা হতেও মূর্খতার কাজ। যে-ইটালীতে ম্যাট্‌সিনী জ'ন্মেছিলেন, সেই ইটালীতেই জ'ন্মেছিলেন গ্যারিবল্ডি। ম্যাট্‌সিনী ইটালীকে দিতে চেয়ে ছিলেন ঈশ্বরের ধর্ম্ম,—অহিংসা, প্রেম, আত্মিক উন্নতি। কিন্তু গ্যারিবল্ডি ইটালীকে দিয়েছিলেন, অস্ত্রের আসুরিক প্রবৃত্তি,—হিংসা, ক্রূরতা, সামরিক উন্নতি। গ্যারিবল্ডির কাছে ইটালী ব'লতে বোঝাতো কেবল ইটালীর রাজা ও রাজার অনুচরবর্গকে। কিন্তু ম্যাট্‌সিনীর ইটালীতে ছিল—ইটালীর গরীবরা, চাষারা, শ্রমিকরা—সাধারণ সকলেই; —ইটালীর রাজা-প্রভৃতি সেখানে প্রজাদের দাস মাত্র। কিন্তু গ্যারিবল্ডির অস্ত্র-দীক্ষায় ইটালীর বাহ্যিক অর্থাৎ বহিঃশত্রুর বিপদ কাটলেও, তার অন্তরের বিপ্লব থেমেছে কি? আজও সেখানকার অবহেলিত শ্রমিক-শ্রেণীর ক্রুদ্ধ-অভিমান থেকে' থেকে' গর্জ্জন ক'রে ওঠে, বিদ্রোহী হয়। কিন্তু ম্যাট্‌সিনির দীক্ষার ফল, অবহেলাকে আনে না; বিদ্রোহ তাই তখন প্রেমের মূর্ত্তি ধ'রে উপস্থিত হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইটালী ম্যাট্‌সিনীকে উপেক্ষা ক'রেছিল।

ম্যাট্‌সিনী ব'লতেন,"আমাদের জাতির ভিতরে ধর্ম্মভাব ঘুমিয়ে আছে; তা জাগ্রত হবার জন্য অপেক্ষা ক'রছে। রাশি রাশি রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রচার করার চেয়ে যিনি সেই ঘুমন্ত ধর্ম্মভাবকে জাগিয়ে দিতে পারবেন, তিনি-ই জাতির অধিকতর উপকার ক'রবেন।"—এই কথার দ্বারা ম্যাট্‌সিনি প্রকারান্তরে জানাতে চেয়েছিলেন যে, ধর্ম্মনীতির মধ্যেই রাজনীতি কেন্দ্রীভূত হ'য়ে আছে; এবং রাজার সঙ্গে ধর্ম্মের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য; সুতরাং ধার্ম্মিক না হ'লে, অর্থাৎ পরব্রহ্মে বিশ্বাসী না হ'লে, রাজনীতি-ই হোক, আর যে-কোনো নীতি ই হোক, কিছুর-ই জ্ঞান অর্জ্জন করা যাবে না।

আজ মহাত্মাজীর কণ্ঠ-ও সারা ভারতে কেবল একটী বাণী-ই প্রচার ক'রে বেড়াচ্ছে—"সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।"—"তদেব সাধ্যতাম্, তদেব সাধ্যতাম্।"—"জ্ঞান সত্য; ব্রহ্ম অনন্ত।"—"তাঁকেই সাধনা কর, তাঁকেই সাধনা কর।"—"নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ"।—ভক্তদের মধ্যে জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন, ক্রিয়াদির ভেদ নেই। জাতি যদি সেই ব্রহ্মের কাছে সত্যকার প্রার্থনা জানায়, তা হ'লে,

'সিদ্ধো ভবতি
অমৃতো ভবতি
তৃপ্তো ভবতি'।

এই আদর্শ-ই গান্ধীজীকে মহৎ ক'রে তুলেছে। এই আদর্শের-ই মধ্যে আছে গান্ধীজীর রাজনৈতিক আধ্যাত্মিকতা। ১৯৩০ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে ঢাকাতে ভারতীয় দার্শনিক কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে

সভাপতি মিঃ এ, আর, ওয়াদিয়া, গান্ধীজীর দার্শনিকতা সম্বন্ধে যা ব'লেছিলেন, তার মর্ম্মার্থ হচ্ছে এই :—

"ভারতীয় দার্শনিকতার দিক দিয়ে যে-জিনিষটী আজকাল সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় হ'য়ে প'ড়েছে, তা হচ্ছে—ভারতীয় ও ইউরোপীয় দার্শিনিকতার একত্র-সমন্বয়। এই সমন্বয় আমরা পাই—মহমানব গান্ধীর কাছে। বহু শতাব্দীর পর আমরা আমাদের মধ্যে গান্ধীজীকে পেয়েছি—গুরুর মত, যিনি কেতাব থেকে বাক্য উল্লেখ ক'রে আনন্দ পান না; কিন্তু জীবনের সামনে এগিয়ে যান এবং চিন্তা করেন ও শিক্ষা দেন। আজকালকার দিনে রাজনীতি সকলের চেয়ে দরকারী জিনিষ হ'য়ে প'ড়েছে। এবং আরও দরকার হ'য়েছে এমন-একটী গুরু, যিনি দেশের কার্য্যপ্রণালীর মধ্যে রাজনীতিকে উচিৎ-পথে নিয়ে আসবার বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারেন। রাজনীতিকে নৈতিক আকার দেওয়া অধিকাংশ রাজনীতিবিদের কাছে স্বপ্নের মতো ছিল। আজ এটাকে বাস্তবে পরিণত করা-ই মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্য হ'য়ে প'ড়েছে। মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা স্বল্পকাল-স্থায়ী নয়; তা সার্ব্বভৌমিক!

"আমাদের অতি পুরাণো শাস্ত্রগুলি যদি মহাত্মা গান্ধীর কাজে না আসে, তা হ'লে গান্ধীজী বোধ হয় শাস্ত্রের সমস্ত মাহাত্ম্যের কথাকেই উড়িয়ে দেবেন; এবং এইদিক দিয়ে তিনি সনাতন হিন্দু-'দর্শন'-শাস্ত্রের "শব্দ-প্রমাণ"কেও ছাপিয়ে অনেক দূরে চ'লে গেছেন। গান্ধীজী জন্মদান ক'রেছেন—চিন্তা করবার এক অভিনব যুগের! এই যুগের তিনি সৃষ্টি ক'রেছেন এমন একটী শ্রদ্ধা-নম্র ভক্তের প্রেরণায়, যে-ভক্ত কেবল যে বেদের মহিমা-ই বিশ্বাস করেন, তা নয়,—বাইবেল, কোরাণ এবং জেণ্ড্ আভেষ্টাকে-ও (Zend Avesta) বেদের মতো ঈশ্বরের প্রেরণা উদ্দীপ্ত ব'লে মনে করেন।

"ঠিক মতো কাজ ক'রলেও যে তার উপর বিশ্বাস করা যায় না' এ-ধারণা গান্ধীজীর কাছে অমূলক হ'তেও অমূলক। কাজ-করার এই সাহস নিয়েই তাই তিনি ইতিহাসের একজন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মযোগী ব'লে প্রতিপন্ন হ'য়েছেন, এবং ভারতের জন্য তিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে-কাজ ক'রেছেন, তা হচ্ছে এই যে, তিনি ভয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রেছেন এবং নিজের মধ্যে এটাকে জয় ক'রেছেন, ও অপর সকলকে শিক্ষা দিয়েছেন—এটাকে জয় করবার জন্য। আমাদের দেশে পুলিস, সৈন্য, জনমত, সমাজ-চ্যুতি ভূত, ছায়া ইত্যাদি জিনিষ থেকে উদ্ভূত ভয়ের-দ্বারা-কম্পিত লোকদের কাছে উক্ত শিক্ষা বড় কম কাজ করেনি। গান্ধীজীর স্নেহ-প্রবণ অন্তরের প্রগাঢ়তা, তাঁর শান্তিমাখা হাসি যেন জীবন্ত চুম্বকের মতো সকলের আন্তরিক শ্রদ্ধাকে তাঁর কাছে টেনে আন্‌ছে। ঈশ্বরের আনন্দ তাঁর মুখে ঝল্‌মল্‌ ক'রছে এবং তাঁর অন্তরে পূর্ণ হ'য়ে আছে।

"খাঁটী নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার দিক দিয়ে, বৌদ্ধ যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে একমাত্র কবীর ছাড়া আর-কোনো ভারতীয়-ই গান্ধীজীর মতো অত প্রাধান্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি। কর্ম্ম-ই হচ্ছে গান্ধীজীর ধর্ম্ম। এই কর্ম্ম-ই হচ্ছে ব্যবহারিক আদর্শ-স্থল, যা কেবল সাধু-যোগীদের-ই জন্য তৈরী হয়নি,—সর্ব্ব সাধারণের-ও জন্য।

"ধর্ম্ম-জগতে গান্ধীজীকে কোনো মৌলিক প্রতিভা রূপে ধ'রতে পারা যায় না। কিন্তু তা হ'লেও, ধর্ম্মের ভিতরকার সত্যটীর জন্য তাঁর আন্তরিক অনুসন্ধান-ই হচ্ছে একটী প্রেরণা-দীপ্ত দৃষ্টান্ত। তাঁর হিন্দুত্ব, সাধারণ হিন্দুয়ানী হ'তে অনেক গভীর, অনেক বিনীত! তা থেকে চারটী প্রধান জিনিষ পাওয়া যায় :—

"হিন্দু-ধর্ম্মকে গ্রহণ; রীতিমত বৈদিক ভাবাপন্ন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে বিশ্বাস; গো-রক্ষায় বিশ্বাস; চতুর্থতঃ তিনি বলেন যে, প্রতিমা-পূজায় তাঁর অবিশ্বাস নেই। মানুষের ভিতরে তিনি ঈশ্বরকে দেখেন। তিনি চান, লোক যেন পাপ্‌কে ঘৃণা করে, পাপীকে নয়। জেনারেল্‌ ডায়ারের দৃষ্টান্ত দিয়ে তাই তিনি বলেন, 'তিনি যে-কাজ ক'রেছেন, সেটাকে আমি ঘৃণা করি। কিন্তু তিনি যদি কখনো অসুস্থ হ'য়ে প'ড়তেন, তা হ'লে আমি তাঁর কাছে যেতুম এবং তাঁর সেবা করতুম।'

"সত্যাগ্রহ এবং অহিংসা-বৃত্তি গ্রহণের উপদেশের মধ্যে গান্ধীজীর একটী রাজনৈতিক দার্শনিকতা আছে। জাতীয় সঙ্ঘের (League of Nations) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সত্যাগ্রহ বড় সুন্দর স্থান পাবে, কারণ, যে-কোনো "ষ্টেট্"-ই অনবরত যুদ্ধে ব্যস্ত থাকবে, "লীগ্" তার সঙ্গে

সহযোগীতা বন্ধ ক'রে দেবে। কলহকারী অত্যাচারীদের সঙ্গে "লীগে"র প্রত্যেক সভ্য ব্যবসা বন্ধ ক'রে দেবে, ঋণ-দেওয়া কিম্বা মাল-সরবরাহ বন্ধ ক'রবে এবং তাদের সামনে এগিয়ে আসবে—বিরক্ত, ক্রুদ্ধ ভাব নিয়ে। এই ব্যাপার ঘটবার প্রভাতোদয় খুব শীগ্‌গির-ই হবে। তখন জাতির সঙ্গে জাতিকে যে-নৈতিক সূত্র জড়িয়ে রাখে, তা বাণিজ্যের দ্বারা যেন-তেন প্রকারেণ ধনী হবার ইচ্ছার চেয়েও মানুষের চোখে অনেক মূল্যবান ব'লে বোধ হবে। এবং এই বিষয়ে গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব ও দার্শনিকতা ভবিষ্যতে রীতিমত কাজ ক'রবে।

"গান্ধীজীর নির্ভীকতা ও অত্যাচার-থেকে মুক্ত হবার প্রচেষ্টা বাস্তবিক-ই একটা জীবন্ত প্রেরণা।

"যে-আচারানুগত ধর্ম্ম, মানুষকে পরমাত্মা থেকে দূরে রেখেছে, সেই ধর্ম্মের উন্নতির জন্য মানব-জীবনের চরমোদ্দেশ্য নৈষ্টিক জীবনের প্রতি-ই মহাত্মা বেশী জোর দিয়েছেন। এইটী-ই মঙ্গলের কারণ; এবং এই সবের জন্যই ইতিহাসে গান্ধীজী বীর-বরেণ্য হ'য়ে থাকবেন।"

...এই নৈষ্টিক জীবন গঠনের জন্যই যিশুর বাণী একদিন মধুর নম্রতায় ঝ'রে প'ড়েছিল। এইজন্যই আরবের মহম্মদ, মিশরের মুশা, ভারতের বুদ্ধ-চৈতন্য-রামকৃষ্ণ শুদ্ধির মন্ত্র বিলিয়ে ছিলেন। কিন্তু সারা জগতের দিক দিয়ে তাঁরা যে-কাজ অ-সমাপ্ত বা অর্দ্ধ-সমাপ্ত ক'রে গিয়েছেন, গান্ধীজী সেইটাকেই আজ সম্পূর্ণ ক'রতে এগিয়ে চ'লেছেন। দু' হাজার বছর আগে 'সারমন্ অন্ দি মাউণ্ট্'—যা কেবল আদর্শের-ই সামগ্রী ছিল, দু হাজার বছর পরে মহামানব গান্ধী সেটাকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ ক'রেছেন—শুধু নিজের জন্য নয়,—শুধু ভারতের জন্য নয়,—সারা বিশ্বের-ও জন্য। মুখে তাঁর এক-মন্ত্র :—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।"

—রাজনৈতিক ধর্ম্মনীতি, অথবা, ধর্ম্মনৈতিক রাজনীতির দিক দিয়ে গান্ধীজীর এ-আদর্শ বেদের মতোই পবিত্র নয় কি?*

আগমন

শ্রীক্ষণপ্রভা দেবী

কবিতা

পথ মাঝে দেখা হ'ল ছায়ার তলে।
আঁখি তার অনিবার মায়া উথলে।
কণ্ঠেতে ছিল তার
একখানি ফুল হার,
দিল সেটী উপহার
আমারি গলে।
বীণা মোর ছিল ম্লান,
যেন সে আকুল-প্রাণ
ভুলে গেছে সব গান
নয়ন-জলে।
তারে নিল কম-ক'রে,
রাখিল বুকের 'পরে
বাজালো নিপুণ স্বরে
লীলার ছলে।
এসেছিল ক্ষণ তরে
বিদ্যুত-রূপ ধ'রে—
আলো ঢালি থরে থরে
পলে-বিপলে।

---

* লেখকের যন্ত্রস্থ গ্রন্থ 'গান্ধীজী' হইতে।

বেসুরা গান

গল্প

শ্রীদেবী মুখোপাধ্যায়

মিউনিসিপ্যালিটির দেওয়া পথের ওপর আবর্জ্জনা জমা করবার পাত্রটি সেদিন বেশ রীতিমত ভাবেই ভরে উঠেছিল, পাশের বাড়ীর উৎসবে, আনন্দভোজের স্মৃতিচিহ্ন উচ্ছিষ্ট পাতা, খুরী আর মাটীর গেলাসে। সকালবেলাতেই একটা কুকুর এসে সেই আবর্জ্জনার পাত্রটির ওপর সামনের পা দুটি তুলে দিয়ে, দুখানা পাতা আর একটা গেলাস নিয়ে টানাটানি করছিল। পাশে দাঁড়িয়ে একটা বছর বারোর ছেলে আর বছর দশেকের একটী মেয়ে সেই কুকুরের মুখের কাছ থেকে লুচির টুকরো কিংবা খুরী নিয়ে ত্যতে যে একটু ক্ষীব লেগেছিল, পরম আনন্দে তাই জিভ দিয়ে চেটে খাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে সেই কুকুরটাকে তাড়িয়ে দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিল।—

হঠাৎ একসময়ে একখানা আলুর সঙ্গে একটা মাছের টুক্‌রো পেয়ে মেয়েটী আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে বলে উঠল—"এই দেখ বিশে, আমি একখানা কত বড় মাছ পেয়েছি—ভাঙ্গা নয় একেবারে আস্তো···"ধুলো কাদামাখা কালো মুখখানার চেহারা, তার বিস্মিত চোখের দীপ্তিতে একবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিশে একবার লোলুপ দৃষ্টিতে মঙ্গলার হাতের মাছের টুকরোর দিকে চাইতেই মঙ্গলা সেখানা একগালে পূরে, মুখখানাকে বিকৃত করে, সেই কাঁটা শুদ্ধ মাছখানা পরম তৃপ্তিভরে চিবোতে সুরু করে দিলে।

আধখানা পটোলভাজা খেতে খেতে, বিশে সেই আবর্জ্জনার স্তূপের মধ্য থেকে আবিষ্কার করলে সন্দেশ-মাখা আধ-গেলাস দই।

"এই গ্যাখ্ সন্দেশ" বলে সে একহাতে মাটির গেলাসটি ধরে, আব এক হাত দিয়ে অল্প করে দই নিয়ে মুখে দিতে লাগল। মঙ্গলা একটু কাতর স্বরে একবার বললে—"আমায় একটু দে না ভাই,—একটু সন্দেশ—শুধু আমি তোকে একটা মাছ পেলেই দেব······

'বয়ে গেছে আমার—তুই তখন দিয়েছিলি?'···বলে সে বাকী দই টুকুতে চুমুক দিয়ে গেলাসটা মঙ্গলাটার দিকে ঠেলে দিয়ে বললে—"নে,যা লেগে আছে ঐটুকু খেয়ে নে ··"

মঙ্গলা ক্ষুণ্ণমনে গেলাসটী তুলে নিলে।—মধ্যে মধ্যে লুচি, আলুর টুকরো আর যা কিছু পাওয়া যায়, তাই সংগ্রহ করে দুখানা পাতায়, দুজনে জমা করছিল। একটু মাছ আর তরকারীলাগা মাছের একটী মোটা কাঁটা নিয়ে মঙ্গলা যেই পাতে রাখতে যাচ্ছিল, বিশে বলে উঠল—এইবার ত পেয়েছিস মাছ—কৈ দিলি না···

"এটা ত কাঁটা···মাছ পেলেই দেব'···

'যাঃ আর চাই না···এই গ্যাখ আমি কতটা ক্ষীর পেয়েছি" বলে দুহাত দিয়ে একখানা কলাপাতা নিয়ে সে-বিপুল উৎসাহে চাটতে লাগল।

এই নে তুই মাছের কাঁটা···আমার একটু ক্ষীর·

আচ্ছা আবার যদি পাই বলে সে নিজের কাজে ব্যাপৃত হল।

ঝন ঝন করে ময়লা-ফেলা গাড়ী এসে হাজির হল। ক্ষুণ্ণ মনে সংগৃহীত উচ্ছিষ্ট নিজের নিজের ময়লা কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়ে তারা সেখান থেকে চলে গেল। পথে যেতে যেতে বিশে বললে, দুপুর বেলায় দুটি গরম ভাত পেলে, তার সঙ্গে এই সব তরকারী যা লাগবে······"

'আমায় কিন্তু তুই একটুও ক্ষীর দিলি না···আচ্ছা ক্ষীরটা কি খুব ভালো—দইএর চেয়েও ?"

'ও সে যা ঢের বেশী ভালো···আচ্ছা আজ ত বেশী খরচ হবে না—গোটাকতক পয়সা পেলে বিকাল বেলা না হয় তোকে দু-পয়সা ক্ষীর কিনে দেব খন, কেমন ?

সত্য দিবি ত তাহলে ?···মঙ্গলার মুখে আশার আনন্দ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠ্‌ল।

* * *

ভিক্ষা করে দুজনেই—সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি। ঘুরে বেড়ায় পথে পথে, লোকের দ্বারে দ্বারে, পথের কুকুরের মত, আর সন্ধ্যাবেলা গিয়ে ওঠে একটা বস্তীতে। এই বস্তীই তাদের ঘর-বাড়ী। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে এক দূরসম্পর্কের মাসী। এই বস্তীরই আশে-পাশে দু' এক বাড়ীতে কাজ করে যা কিছু পায় আর এই বিশে-মঙ্গলার ভিক্ষা-করা পয়সা নিয়ে কোনওভাবে অনাহারে অর্দ্ধাহারে তাদের দিন কেটে যায়।

লোকে কিন্তু বলে বিশের এই মাসীর হাতে পয়সা আছে। বুড়ী থাকে দিনরাত একখানা ছেঁড়া কাপড় পরে—নূতন কাপড় আর তার বরাতে জোটে না। মঙ্গলা বিশে যা আনে, তার মধ্য থেকেই বুড়ী কিছু সরিয়ে রাখে তার ভবিষ্যতের আশায়। সর্ব্বদাই মনে এই ভয় কোন দিন হয় ত এই বিশে-মঙ্গলা তার দিকে আর চাইবে না—তাকে ছেড়ে অন্য কোথায় চলে যাবে।

ভিক্ষা করার সেদিন আর বিশেষ চাড় ছিল না। নেহাৎ মাসীর ভয়···তাই চারটি মাত্র পয়সা হতেই দুজনে বাড়ী ফিরল—কাপড়ের খুঁটে তখনও তাদের সেই আদরের সংগ্রহ করা সামগ্রী। বাড়ীতে ঢুকতে না ঢুকতেই বিশে বলে উঠল—"ও মাসী ভাত হয়েছে, ভাত দে শীগ্‌গির—"

মাসী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল—"নবাবপুত্তুর বাড়ী এলেন ! ভাত দে না ! কোথায় পাবো ভাত ? কাল পয়সা বিকেলে এনেছিলি ? খাবি কি দিয়ে ?

বিশের আজ বুক বাঁধা। সে আজ আর মাসীর কথায় বিচলিত না হয়ে বললে—"তুই শুধু ভাত দে না—তরকারী,—দেখ না-আজ কতকি এনেছি তোর জন্যে··· মাছ ডাল-অম্বল—লুচিও আছে···

মাসীর সুরটা হঠাৎ অস্বাভাবিক ভাবে নরম হয়ে গেল সত্যি, নাকি ? তা বললি না কেন আগে—তাহলে ত···

মঙ্গলা ভরসা পেয়ে বললে—আমিও অনেক এনেছি মাসী এই ছাখ·· আবার তোর জন্যে একখানা আস্তো লুচি এনেছি—

মাসীকে প্রসন্ন দেখে, বিশে মঙ্গলাকে কানে কানে বললে "এই আজ যে পয়সা পেয়েছিস, সে কথা আর মাসীকে বলিস নি। মাসী এবেলা পেলে আবার বিকেলে বেলা পয়সা চাইবে···

মঙ্গলা চাপা·গলায় পরম উৎসাহে বলে উঠল—"বিকেল-বেলা আমায় ক্ষীর কিনে দিবি ত ঐ পয়সায়···"

'আচ্ছা' বলে সে তাকে একেবারে চুপ করতে আদেশ করলে।—

উপাদেয় তরকারী দিয়ে, মহা আনন্দে তাদের তিন-জনের মধ্যাহ্ন ভোজনের পর্ব্বটী সমাধা হয়ে গেল।

সন্ধ্যা তখনও হয় নি।

সবে মাত্র এক পশলা বৃষ্টি হয়ে, রাস্তায় কাদা হয়েছে মটরের চাকা থেকে কাদা উঠে, পথের লোকের জামা-কাপড় চিত্রিত হয়ে উঠছে। ট্রামের ধারে দাঁড়িয়ে বিশে ভিক্ষা করে মঙ্গলাও থাকে কাছে-কাছেই। একটি বাবু ছুটে এলেন একখানা ট্রাম ধরতে; বিশে তাকে সামনে পেয়ে বলে, উঠল, "বাবু একটি পয়সা··· তোমার ভালো হবে বাবু—সারাদিন কিছু খাই-নি বাবু," একটি পয়সা বলে তার পিছনে ছুটতে লাগল।

তাকে পাশ কাটিয়ে ট্রামে চড়তে গিয়ে, পাশের একখানি বাসের চাকা থেকে একটু কাদা এসে লাগল বাবুটির পায়ে—রাগটা কাজে কাজেই পড়ে গেল সামনের ওই ছেলেটার ওপর—তার অদৃষ্টে জুটল বাবুটির ছড়ির একটি আঘাত।—বিশে গজ গজ করতে করতে ফিরে গেল।

রাস্তার আলো সবে জ্বলে উঠেছে। দুজনে বাড়ী ফেরবার জন্য উদ্যোগ করলে। ভালো জামা-কাপড় পরা একটি ছোকরা বাবুকে দেখে, মঙ্গলা নাচতে নাচতে তার কাছে গিয়ে একেবারে তার পাম্প-সু-টাকে দুহাতে চেপে ধরে বলে উঠল—"একটি পয়সা দাও, দোহাই

রাজাবাবু—তোমার চাঁদের মত ছেলে হবে রাজাবাবু—হে বাবু······

দু' একবার সে লোকটি আপত্তি জানিয়ে আগাবার চেষ্টা করলে কিন্তু পা ছাড়িয়ে যেতে পারলে না। শেষে বিরক্ত হয়ে পকেটে হাত দিয়ে, যা পেলে সেটা মঙ্গলার হাতে দিয়েই বললে, নে—দে ছেড়ে দে শীগগির···

তোমার ভালো হবে রাজাবাবু—বলে পা ছেড়ে দিয়ে হাতে পয়সা নিয়ে সেটাকে একবার দেখেই বিপুল বিস্ময়ে সে একবার চীৎকার করে উঠল, "ওরে বিশে—এই ভাখ্, এটা একটা আধুলি বোধ হয়, চক্ চক্ করছে···পয়সার বদলে বাবু ভুলে দিয়েছে···

'তাই নাকি' বলে শ্যেনদৃষ্টিতে তার হাতের দিকে বিশে চেয়ে দেখলে। তারপর 'দেখি' বলে বিশে মঙ্গলার হাত থেকে আধুলিটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিতেই, সে এমন এক তীব্র আর্ত্তনাদ করে উঠল, যাতে পাশের লোক মনে করলে, তার যেন একটা কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

ভয় নেই তোর, নেব না- চল্—ক্ষীর কিনে দেব··· আমার পয়সা থেকে আবার সেই কিনবো—সেই যে রাবড়ী না কি বলে,—বলে আধুলিটা সে তাড়াতাড়ি ট্যাঁকে গুঁজলে।

"না, আমি ক্ষীর চাই না, আমার আধুলি—ই—ই···।

বিশে আধুলিটা নিয়ে ছুটে পালালো। রাস্তার ওপারে খাবারের দোকানে—মঙ্গলাও ছুটল তার পিছনে - একখানা ট্রাম এসে সামনে দাঁড়ালো। সেটা চলে যেতেই সে আবার ছুটতে চেষ্টা করলে—চোখে তার তখনও কান্না···

কিন্তু তার ছোটা আর হল না। একখানা মোটর ছুটে আসতে আসতে হঠাৎ সেই পথের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল আর তার গতি বন্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই মঙ্গলার ছোটার গতিও তার চাকার তলায় পড়ে বন্ধ হয়ে গেল···

রাস্তার কাদার দিকে আর ভ্রূক্ষেপ না করে, মটরখানি ঘিরে, পথের জনতা যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। একটা গোলমাল···বিশেও ও-ধারের ফুটপাত থেকে চার পয়সার রাবড়ি হাতে করে ফিরে এই ভিড়ের মধ্যে মজা দেখতে এল। পথের ওপর মঙ্গলার দেহটা তখন সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে রয়েছে—নাক দিয়ে একটু রক্ত বেরুচ্ছে·

তার এই অবস্থা দেখে, বিশে চীৎকার করে উঠল —ওরে মঙ্লা রে···অজ্ঞাতসারেই হাত থেকে তার রাবড়ির ছোট্ট ভাঁড়টি রাস্তার কাদার ওপর পড়ে গেল।

পুলিশ আর রাস্তার অন্য লোকে মোটরের নম্বর নিলে—তারপর খোঁজ পড়ল ও মেয়েটির বাড়ী কোথা··· নাম কি···এই সব—

বিশে মঙ্গলার পাশে সেই কাদার ওপর বসে কাঁদতে লাগল—একবার ইচ্ছা হচ্ছিল, মঙ্গলার মাথাটা কোলে তুলে নেয় কিন্তু একটি ভদ্দর লোকের কোলে তার মাথা দেখে সে আর ভরসা করে তার মনের সাধ কাউকে জানাতে পারলে না।

অনেকে তাকে সান্ত্বনা দিলে—ভয় কি, ও আবার সেরে উঠবে তেমন লাগে নি—শুধু অজ্ঞান হয়ে পড়েছে ··

বিশের কাণে সে কথা প্রবেশ করলে বলে মনে হল না। অ্যাম্বুলেন্স এসে মঙ্গলাকে তুলে নিয়ে গেল—বিশেও চলল সঙ্গে—চোখ তার জলে ভরা।

মোটরের ড্রাইভারকে নিয়ে পথের লোক তখনও ব্যস্ত করছিল।

* * * *

ভোরবেলা হাঁসপাতাল থেকে মঙ্গলার মাসীর কাছে খবর গেল, তার ছোট্ট জীবনের সব লীলা শেষ হয়ে গেছে।

বুড়ীর কান্নায় বস্তীখানা যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। জানাশোনা দুচার জন বস্তীরই ছেলে হাঁসপাতালে গেল, শুধু বুড়ীর কান্নায়—তার নিতান্ত অনুরোধে।

বিশে হাঁসপাতালের দরজায় বসে কাঁদছিল--তার আর বিরাম ছিল না।

শ্মশানে গিয়ে মঙ্গলার মৃতদেহটা যখন চিতার ওপর রাখা হল, বিশে তখন আর নীরব থাকতে পারলে না।

'ওরে মুঙলী রে, কোথা গেলি রে—' তার বুক ফাটা কান্নায় শ্মশানের বাতাসও যেন ভারী হয়ে উঠল।

মৃতদেহ যারা সৎকার করতে এসেছিল, তাদের একজন তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে।

কিছুক্ষণ পরে তার কান্নার চীৎকারটা ধীরে ধীরে কমে এল।

চিতার আগুনটা খুব জোরে জলে উঠল।

বিশের হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গলো। ট্যাঁক থেকে মঙ্গলার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া সেই আধুলিটা বার করে সে একবারি দেখলে, তারপর আর কালবিলম্ব না করে সেই চিতার ওপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

চিতা জলতে লাগল—সে আস্তে আস্তে সেখানে থেকে সরে গিয়ে এক কোণে বসে রইল; চোখ দিয়ে তার কেবল বইতে লাগল—বুকফাটা কান্নার অফুরন্ত ধারা…।

রোদের তেজ বেড়ে চলেছিল, কিন্তু সেদিকে জ্রক্ষেপ করবার মত মনের অবস্থা ছিল না। তার দৃষ্টি পড়ে রইল সেই চিতার ওপর যেখানে…মঙ্গলার দেহ ধীরে ধীরে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

---

* পুষ্প প্রয়াণ

শ্রীসন্তোষ কুমার ঘোষ এম-এ

কোন্ দূর নন্দনের গন্ধরাজি ল'য়ে বয় আনন্দের স্রোতে
ভাসিতে ভাসিতে
স্বর্গের সুষমা সাথে ফুটেছিল কোমল কলিকা
শাপভ্রষ্টা কোন্ সে বালিকা।
সেদিনো জানেনি কেহ যৌবনের প্রথম দোলায়,
মুছিবে সে জগতের স্নেহ আপনার নিষ্ঠুর হেলায়।
ধরার সৌন্দর্য্য ল'য়ে দিবে ফিরাইয়া
চিতার মলিন ভস্ম: নিদারুণ হিয়া।
আজো তার সঙ্গীতের সুর বাজে কাণে,
নীরব এ হৃদয়ের সকরুণ তানে।
আজো তারে যে যেখানে চাই,
প্রতিধ্বনি ব'লে যায়, নাই—ওরে নাই॥

* কুমারী পুষ্পরাণী চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে লিখিত।



বৈদিক যুগের নারী

শ্রীআভা গুপ্তা বি, এ —প্রবন্ধ—

মনু বলেছেন :—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রাঃ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রমর্হতি ॥"

"স্ত্রী লোকের বাল্যকালে পিতা রক্ষক, যৌবনকালে স্বামী রক্ষক এবং বৃদ্ধবয়সে পুত্রেরা রক্ষক :—স্ত্রীলোক স্বাতন্ত্রের যোগ্যা নয়।"

মনুর উক্ত শ্লোক পাঠে এই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক যুগে আমাদের সমাজে নারী জাতিকে স্বাধীনতা দেওয়া হ'ত না। পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে এসে আমরা আমাদের নারীদের যতখানি স্বাধীনতা দিয়েছি বা তারা আমাদের কাছ থেকে আদায় করেছে—ইংরেজ আসবার আগে ভারতবর্ষের সমাজে নারীরা ততখানি অধিকার ভোগ করতেন কিনা তা' দেখা যাক।

বৈদিক যুগে আমাদের মেয়েদের শিক্ষার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা ছিল? বৈদিককালে স্ত্রী-শিক্ষা বিশেষরূপেই অনুমোদিত ছিল। অথর্ব্ববেদে আছে, "ব্রহ্মচর্য্যেন কন্যাং যুবানং বিন্দতে পতিং"—কন্যা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই যুবা পতি পান। এই ব্রহ্মচর্য্য অর্থে ইন্দ্রিয় সংযমের সঙ্গে বেদ ও ব্রহ্মবিদ্যা অভ্যাস করান হ'ত—এর প্রমাণ শ্রুতি ও মহাভারতে আছে। বৈদিক ঋষিরা স্ত্রীলোকদের বেদ অধ্যয়ণ করাতেন এবং পুরুষের ন্যায় বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করতে শিক্ষা দিতেন। তখন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা একটা নিয়মিত প্রথা ছিল। এরকম নিয়মিত প্রথা বৈদিককালের শেষভাগেও প্রচলিত ছিল—যার ফলে আমরা বৃহদারণ্যোকপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী এবং যাজ্ঞবল্ক্য-গার্গী সংবাদ পেয়েছি।

আমাদের স্মৃতিগ্রন্থগুলিতে, বিশেষতঃ মনুসংহিতায় স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে কিছুই বিধি-নিষেধ দেখা যায় না। সুতরাং এতে এই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিককাল থেকে স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে যে মত চ'লে আসছিল, মনু তার বিরোধী ছিলেন না।

সংহিতা-গ্রন্থ ছেড়ে দিয়ে আমরা যদি পুরাণের মধ্যে প্রবেশ করি, সেখানেও দেখতে পাই যে, স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার বিরোধী কোনও কথাই নেই। পুরাণের মধ্যে মহাভারতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ ব'লেই সর্ব্ববাদিসম্মত। মহাভারতে স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে স্পষ্টই কোনও বিধি নিষেধ নেই। কিন্তু এতে মহামতি ব্যাসদেব দৃষ্টান্ত দিয়ে স্ত্রী-শিক্ষার উপদেশ দিয়েছেন। মহাভারতের দ্রৌপদী-চরিত্র আলোচনা করলে স্পষ্টই বোধ হয় যে তিনি অতিশয় বিদুষী ছিলেন। দ্রৌপদী একাধিক স্থানে পণ্ডিতা বলে অভিহিত হ'য়েছেন। বনপর্ব্বের এক স্থানে আছে—

"অত্র শর্ব্বো শিবা নাম ব্রাহ্মণী বেদ পারগা।"

বেদ অবধি পুরাণ পর্য্যন্ত আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সকলেতেই স্ত্রী-শিক্ষার পরোক্ষ বিধি ও উপদেশ আছে। কিন্তু একটীতেও স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে প্রত্যক্ষ অনুশাসন দেখা যায় না। তন্ত্রশাস্ত্র সেই অভাব পূর্ণ করেচে। মহানির্ব্বাণতন্ত্র পুত্রকে যে-ভাবে শিক্ষা দিতে উপদেশ দিয়েচেন, কন্যাকে তা'র অপেক্ষা এতটুকু নূন ক'রে শিক্ষা দিতে উপদেশ দেন নি। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আছে—"কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষনিয়াতি যত্নতঃ"—অর্থাৎ "কন্যাকেও অতি যত্নসহকারে এই প্রকার অর্থাৎ পুত্রদিগের ন্যায় পালন করিতে ও শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে।"

সংস্কৃত কাব্য-নাটক আলোচনা করলে দেখতে পাই যে, তদুল্লিখিত অধিকাংশ স্ত্রীলোকই কোনও না কোন প্রকার বিদ্যা আয়ত্ত করেচেন।

পূর্ব্বকালে যদি আমাদের স্ত্রী-জাতির মধ্যে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকত, তবে আমরা লীলাবতী, অরুন্ধতী,

খনা, গার্গী, মৈত্রেয়ীর মত বিদূষী নারীর নাম শুনতে পেতাম না।

সুতরাং এ'তে প্রমাণিত হ'ল যে, পূর্ব্বে আমাদের সমাজে স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল।

শিক্ষার পরই বিবাহের কথা আসে। আজকাল আমাদের যে-রকম প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হচ্ছে, বৈদিক-যুগে এরকম পূর্ণবিকাশ প্রাপ্তা কুমারীর বিবাহ দেওয়া হ'ত, না, নারীদেহের পূর্ণবিকাশের আগেই বিবাহ দেওয়া হ'ত, তা শাস্ত্রপাঠে হৃদয়ঙ্গম হয়। বেদে আছে (১০ম, ৮৮সূ), "যে কোন কন্যা পিতৃগৃহে বিবাহ-লক্ষণযুক্তা হইয়া আছে, তাহার নিকট গমন কর।" "যুবতী জায়া পাইলে গুণী ব্যক্তিও তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন না" (৮ম, ২য় সূ); নিতম্ববতী অন্য অবিবাহিত নারীর নিকট যাও, তাহাকে পত্নী করিয়া স্বামী সংসর্গিণী করিয়া দাও" (১০ম, ৮৫সূ)।" এই সকল উক্তি থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিককালে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল। গোভিল গৃহ্যসূত্রে বিবাহের যেরূপ বর্ণনা আছে, তা'তে তখনকারকালে স্ত্রীলোকের যৌবন-বিবাহ যে প্রচলিত ছিল তা প্রমাণিত হয়। গোভিল বলেন, "বিবাহকালে বামপার্শ্ববর্ত্তিনী কন্যা স্বীয় দক্ষিণ হস্তের দ্বারা বরের স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া থাকিবে এবং হোমের পর উভয়ে উপোত্থান করিবে।" অর্থাৎ "উপোত্থান-কালে বরের বামহস্ত কন্যার পিঠে হইয়া বরের দক্ষিণ কাঁধে থাকিবে।" বর্ত্তমানকালে অনেকে মনে করেন যে, ব্যভিচার প্রভৃতি দোষের একটা প্রধান কারণ, স্ত্রীলোকের যৌবন-বিবাহ। আমার তাহা ঠিক বলে মনে হয় না। যে সকল কুমারীর হৃদয় দূষিত ত'াদের বাল্যবিবাহই হো'ক আর যৌবন-বিবাহই হো'ক, তারা অসৎ চরিত্র যে হবেই তা ঠিক। অনেকে বলেন যে, বাল্যবিবাহে, ভগ্নী যেরূপ ভ্রাতাকে প্রীতি করে, সেই রকম স্ত্রী স্বামীকে প্রীতি করতে শেখে। আমার মতে, স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা আরও প্রগাঢ় হওয়া আবশ্যক। যৌবনের প্রথম উন্মেষে যখন হৃদয়ে নব অনুরাগের সঞ্চার হয়, সেই সময় বিবাহ হ'লে সেই নবোন্মেষিত হৃদয়ের সমস্ত অনুরাগ স্বামীর দেহ-মন পূর্ণ ক'রে বর্দ্ধিত হ'তে থাকে।

এখন মনু বিবাহ সম্বন্ধে কিরূপ বিধান দিয়েছেন, তা দেখা যাক্। তিনি বলেন,—"যদি উৎকৃষ্ট ও রূপগুণাদি-সম্পন্ন পাত্র পাওয়া যায় তবে কন্যার বিবাহের যোগ্য বয়স না হইলেও, তার সহিত সেই অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যার বিবাহ দিবে।" এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, কন্যাকে কখন বিবাহের উপযুক্ত ব'লে গ্রহণ করা যাবে? এর উত্তরে মনু বলেন যে, "যৌবনের সূত্রপাত হবার তিন বৎসর পরে বিবাহের উপযুক্ত বয়স জানতে হবে।"

"ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেৎ কুমারী ঋতুমতী সতী
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিং॥

"কুমারী-কন্যা প্রাপ্ত যৌবনা হ'বার পর তিন বৎসর প্রতীক্ষা পূর্ব্বক কালযাপন করিবে; তাহার পর সদৃশ পতি লাভ করিবে।"

ভাষ্যকারের মতে, যৌবন সঞ্চারের কাল দ্বাদশ বৎসর। "যৌবন দর্শঞ্চ দ্বাদশবর্ষাণামিতি সূচ্যতে।" মনু বলেন, "ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যং দ্বাদশবার্ষিকীং" —অর্থাৎ ত্রিশ বৎসরের পুরুষ দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে; কিন্তু সেই কন্যার হৃদ্য অর্থাৎ বাড়ন্ত হইয়া হৃদয়ের প্রীতি উৎপাদক হওয়া আবশ্যক।" তিনি আরও বলেচেন যে "ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টাবর্ষাম্বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ।" এতেই বোধ হয় যে যোল বৎসরই মনুর মতে কন্যা সম্প্রদানের উপযুক্ত কাল। কিন্তু যদি এমন হয় যে, উপযুক্ত পাত্র উপস্থিত ও কন্যার ষোড়শ বৎসরের বয়সও হয়েচে অথচ বাপ-মা অর্থের লোভে সেই পাত্রকে কন্যা সম্প্রদান করচেন না, তখন কন্যা স্বয়ং বিয়ে করলেও পাপ কার্য্য করবে না এবং যাকে বিয়ে করবে সেও পাপ কার্য্য করবে না।

'অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ং
নৈন কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি।"

তবেই বিয়ের বয়স নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে মনুর মত এই যে, অন্যূন ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ, ষোড়শ বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করবে। সম্বর্ত্তসংহিতায় দেখি যে, প্রাপ্ত যৌবনা হবার পূর্ব্বেই দশ বৎসরে কন্যার বিবাহ দিবে। তিনি "দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা"—সূত্রে কন্যার পারিভাষিকত্ব উল্লেখ ক'রে বলেছেন, "প্রাপ্তযৌবনা হবার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দিবে।" পরাশরের মতে, "দশ থেকে বার বৎসরের মধ্যে নিশ্চয়ই কন্যার বিবাহ দেওয়া

ব্রুয়াৎ” এই সম্পর্কে পরাশরের লিখিত সংস্কৃত শ্লোকটী তুলে দিলাম। শ্লোকটী পাঠ করলে আজকাল যে যে সমস্ত বিংশবর্ষীয়া বা ততোধিক বয়স্কা মেয়েরা অবিবাহিতা রয়েচেন, তাঁরা হাস্যসম্বরণ করতে পারবেন না

“অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী
দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অতঊর্দ্ধং রজস্বলা।
প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি
মাসি মাসি রজস্তস্যাং পিবতি পিতরম্ স্বয়ং।”

বশিষ্ঠ বলেন, “কুমারী প্রাপ্তযৌবনা হইয়া তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে। তিন বৎসরের ঊর্দ্ধে উপযুক্ত পতি গ্রহণ করিবে।” এখন দেখতে পাওয়া যাচ্চে যে, প্রামাণিক কোনও সংহিতা-গ্রন্থে অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিয়ে গৌরীদানের ফললাভ করবার কোনও কথাই নেই। গৌরীদানের মাহাত্ম্য এই দুর্ব্বল বাঙ্গালীকে আরও দুর্ব্বল করবার জন্য কিরূপে তাদের অন্তরাসন গ্রহণ ক'রে এখনও জাগ্রত আছে, তা বলা বড় সহজ নয়। মরীচি-সংহিতানামক একখানি-মাত্র সংহিতায় আছে যে, গৌরীদানের ফল স্বর্গধাম, রোহিণী-দানের ফল বৈকুণ্ঠধাম এবং কন্যাদানের ফল ব্রহ্মধাম। আমরা তিন ধামের কোনও ধামই চাই না, আমাদের এই পৃথিবী ধামই ভাল।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের কথা ছেড়ে দিলেও প্রাচীন কালের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র-প্রণেতা ঋষিরা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ব'লে গেছেন। যে অস্ত্র-চিকিৎসা বিশারদ সুশ্রুত-ঋষির গ্রন্থ পাঠ ক'রে পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা মুগ্ধ হ'য়ে গেছেন, তিনি বলেচেন “পঁচিশ বৎসরের কম-বয়স্ক পুরুষ যদি অপ্রাপ্ত ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যাতে সন্তানোৎপাদন করে, তবে সেই সন্তান গর্ভেতেই বিপদ্‌গ্রস্ত হয় এবং যদি বা জন্মগ্রহণ করে, তবে সে দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ও অদীর্ঘজীবি হয়। অতএব অত্যন্ত বালিকাবস্থাতে গর্ভাধান করিবে না।” রঘুনন্দনও বলেচেন যে, “কুড়ি বৎসরের পুরুষ পূর্ণ ষোড়শবর্ষীয়া স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদন করিলে উত্তম সন্তান হয়, তাহার ন্যূন বয়স হইলে অধম সন্তান হয়।”

আজ এইখানেই শেষ করলাম। বারান্তরে স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে কিছু বলবার ইচ্ছে রইল।

যাত্রাকালে

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম-এ

অচিন্ দেশে অনেক দূরে যাচ্ছ তুমি যাও
বাধা তোমায় দেব নাক 'আমি,
সেথায় নূতন সঙ্গী সাথীর মাঝে
ক্ষণেক মোরে স্মরণ ক'রো স্বামী।
তোমার পাশে সুখে দুখে নিত্য আমি রব'
ভাগ্যে আমার নেই তা জেনে নিও,
তাইত' শুধু কর জোড়ে ভিক্ষা আমি মাগি
আমায় তুমি ভুলো নাক' প্রিয়।

নানান্ কাজের মাঝে থেকে আমার কথা তুমি
কল্লে স্মরণ ব্যথাই যদি পাও,
কান্ দিওনা—কান্ দিওনা আমার কথায় তবে
যাও আমারে ভুলেই তুমি যাও।
কিন্তু যদি ভাগ্য দোষে দুঃখ আঘাত আসে
এই কথাটি মনেতে ঠাঁই দিও,
আমি আছি সুখে দুখে আমি তোমার আছি
তখন আমায় ভুলো নাক' প্রিয়।

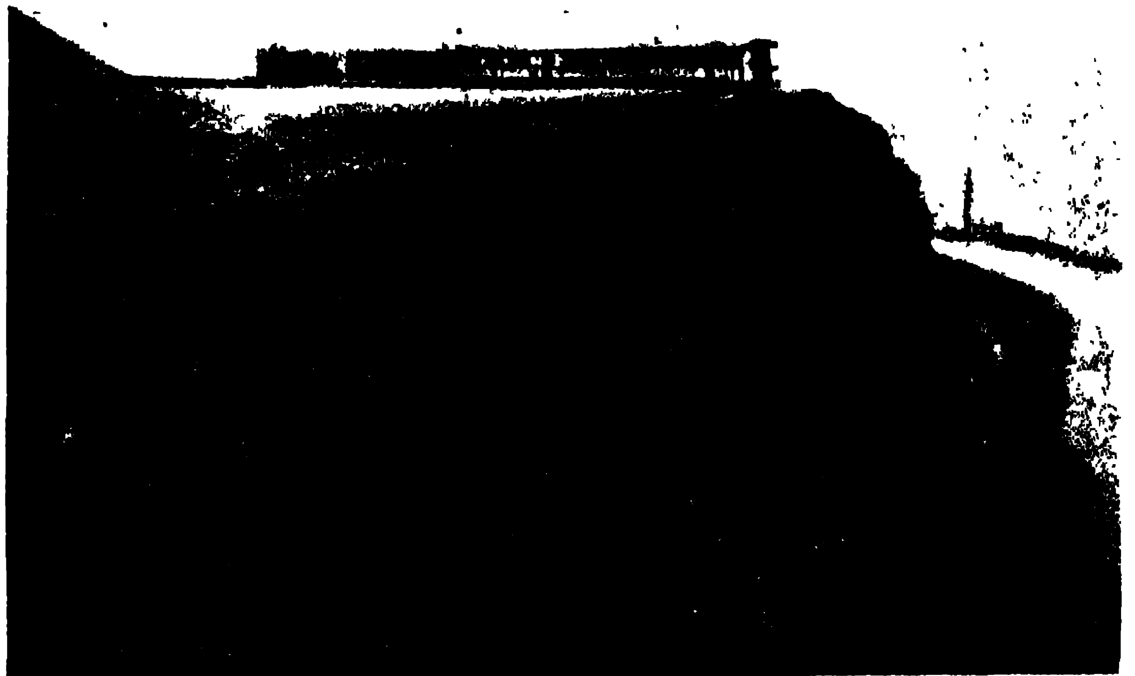
দার্জ্জিলিংয়ের স্মৃতি

শ্রীঅনিলচন্দ্র রায় বি-এ

সুইজারল্যাণ্ড শুধু ইউরোপের ক্রীড়াভূমিরূপে অভিহিত হয় নাই। বিচিত্র পত্রপুষ্পে চির-সৌন্দর্য্যের লীলা নিকেতন হইয়া রহিয়াছে আমাদের দেশের দার্জ্জিলিং সহরকেও সুধীজনেরা ঐ নামানুকরণ করিয়া সৌন্দর্য্য রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন—

প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মাতা পিতা সহকারে একবার দার্জ্জিলিংএ গিয়াছিলাম;—তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, সেদিন নাগাধিরাজের প্রীতিস্নিগ্ধ মোহপাশ সবলে ছিন্ন করিয়া 'গ্রাম্য ফুটবলের' আকর্ষণে আমরা দুই ভ্রাতা একরূপ পলায়ন করিয়াই চলিয়া আসিয়াছিলাম! আজ ছাত্র-জীবনের শেষে দাঁড়াইয়া সেদিনকার কাহিনী আশ্চর্য্যজনক বোধ হইতেছে—রৌদ্রালোকিত দার্জ্জিলিং শহরের বিচিত্র দৃশ্যগুলি অবসর সময়ে স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিয়া মনে মনে কেমন একটা আকুলতার সৃষ্টি করিতেছিল তাই পুনরায় শৈলরাজের দুর্জ্জয় আকর্ষণে সাড়া দিতেছিলাম। সুযোগও মিলিয়া গেল—অধ্যাপনা কার্য্যে আমার সহযোগী শ্রীযুক্ত অমূল্যকান্ত বসু একদিন ভূমিকা না করিয়া বলিলেন "এবার গ্রীষ্মকালে দার্জ্জিলিং যেতে পারলে হতো"—আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রস্তাব সমর্থন করিলাম। যাত্রার দিন ঠিক হইল—বহুপূর্ব্ব হইতেই যাঁহারা যাইবেন বলিয়া বিস্তর শপথ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নির্দ্দিষ্ট দিনে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। রাত্রি সাড়ে আটটায় মেল ট্রেন ছাড়ে; বালিগঞ্জ হইতে শিয়ালদহ আসিতে হইবে। সুতরাং সাতটায় বাড়ী হইতে বাহির হইলাম ষ্টেশনে আসিয়া দেখি অমূল্য বাবু প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন, কিন্তু তিনিও 'না যাইবার দলে', মন নিরাশ হইয়া গেল; নিঃসঙ্গ প্রবাসের চিত্র ভাসিয়া উঠিল।

মধ্যম শ্রেণীর একটি টিকিট কাটিয়া বাঙ্কের উপর শুইয়া আছি—৩০।৩৫ বৎসরের দীর্ঘকায় শীর্ণ শরীর একটি ভদ্রলোক সশব্দে দরজা খুলিয়া আমার অন্যদিকের বাঙ্কের উপর তিনি লম্বমান হইবার উপক্রম করিতেছিলেন। তাঁহার চাদরটি বিনা কারণে অতর্কিত রূপে ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিলেন "উঠে বসুন—



দার্জ্জিলিং হিমালয়্যান্ রেলওয়ে

শীগ্‌গির্ ওঠন" ভদ্রলোক ব্যাপার কি হইয়াছে বুঝিতে না পারিয়া যন্ত্রচালিতের ন্যায় মামুলি ধরণে উত্তর করিলেন" "কেন কি হয়েছে?" "আর দেরী করা যায় না, মারামারি হবে মশায়"—এই বলিয়া ভদ্রলোক তাঁহার বিশীর্ণ হস্তের আস্তিন্ গুটাইয়া অগ্রসর হইলেন। বাঙ্কের নীচে বেঞ্চির উপর একটি ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন, তিনি এই সম্মুখসমর রোধ করিতে অগ্রসর হইলেন এবং আক্রমণকারীর সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "মারতে হবে না আমি আপনাকে একটি চুমো খেতে

চাই" এইরূপ অহেতুক ইচ্ছায় এবং কলিযুগেও নিত্যানন্দের আবির্ভাবে কামরাখানিতে একটি সরসতার হিল্লোল বহিয়া গেল। আমি মুখ বাহির করিয়া দেখি, দীর্ঘকায় ভদ্রলোকটির অবনত মস্তকের নিকট দাঁড়াইয়া



লুইস্ জুবিলি স্যানিটোরিয়ম্

আমাদের পরিচিত কুমিল্লা অভয় আশ্রমের চৌধুরি মহাশয়। সে যে ইহার মধ্যে এতবড় প্রেমিক হইয়া উঠিয়াছে, জানিতাম না। বাঙ্ক হইতে নামিতেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিল ; চৌধুরী সাহেবের সহিত ইতিমধ্যে 'সমর প্রয়াসী' ভদ্রলোকটির একটি মধুর সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে এবং তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমরা যে সব শব্দ-বাণ হানিতে লাগিলাম তাহার প্রচলন সাধারণতঃ বিবাহ বাসরেই বেশী। ঈশ্বরদি এব তাহা। পরবর্ত্তী ষ্টেশন আব্দুলপুরে ট্রেণ প্রায় আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিল, কারণ পথিমধ্যে একখানি যাত্রীগাড়ী উল্টাইয়া গিয়াছিল—কিন্তু এ সময় অতিবাহিত করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর বোধ হইল না। চৌধুরিকে লক্ষ্য করিয়া যে হাস্য পরিহাস চলিতেছিল, তাহা ক্রমশই গভীর হইয়া উঠিতেছিল এবং ইহারি উচ্চ কলরব রেলের কর্ম্মচারিদের পর্য্যন্ত চকিত করিয়া তুলিয়াছিল। পথে-প্রবাসে এইরূপ সম্পর্ক উঠিলে পথশ্রম যে অনেক পরিমাণে লাঘব হইবে একথা আমি নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি।

শিলিগুড়িতে, যখন গাড়ী আসিল তখন প্রায় একটা বজে—অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে আগুন যেন ঝরিয়া পড়িতেছে। উঠিবার সময়ে 'বাসে' যাওয়াই সুবিধা—মুদ্রার পরিমাণও কম এবং ট্রেণ অপেক্ষা অগ্রে পৌছান যায়। দার্জ্জিলিং হিমালায়ান রেলওয়ে ইংরাজজাতির একটি গর্ব্বের জিনিষ বলিয়া চিরদিন সম্মান পাইবে, দুর্গম পাহাড়ের গা খোদাই করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া লাইনগুলি চলিয়া গিয়াছে—ক্রমশই উপরের দিকে উঠিতেছে ; মাঝে মাঝে আবার 'রিভার্স' অর্থাৎ একেবারে উপরের দিকে উঠিতে না পারিয়া পশ্চাতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আবার সম্মুখে অগ্রসর হইতে হয়। প্রায় চারখানা

দার্জ্জিলিং-সহর

করিয়া কামরা লইয়া এক এক খানি গাড়ী চলে—এবং অগ্রে একখানি ইঞ্জিন ও পশ্চাতে একখানি ইঞ্জিন।

আমরা এক "বাসওয়ালার" সহিত বন্দোবস্ত করিলাম; তাহাকে কুড়িটাকা দিতে হইবে, আমরা সাতজন লোক—মরসুম বুঝিয়া পাহাড়ী মালিকটি চার্জ্জ একটু বেশী করিল—অসময়ে শিলিগুড়িতে আসিয়াছি উপায় নাই। বাস যখন তিনদেরিয়া ষ্টেশনে পৌছিল, তখন বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা হইবে শীতের বেশ আমেজ পাওয়া গিয়াছে। ষ্টেশনে বাস আসিলে আমরা নামিয়া নিকটস্থ পানের দোকান হইতে পান ও লেবু সংগ্রহ করিয়া লইলাম—আমাদের সঙ্গে বর্দ্ধমানের স্কুলে পড়ো দুইটি ছাত্র আসিতেছিল, শৈলরাজের বক্ষে তাহাদের এই প্রথম অভিযান। অনেক বুঝাইয়াও তাহাদিগকে ট্রেণে আহার করাইতে পারা যায় নাই—এখন তাহাদের তীব্র বমনোদ্রেক দমন করিবার জন্য আমাদের চৌধুরী মহাশয় বিশেষ ব্যস্ত হইলেন। আমি কিন্তু প্রকৃতির এই অফুরন্ত সৌন্দর্য্যভাণ্ডারের বিচিত্র নব নব দৃশ্য দেখিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। নিম্ন দিয়া রেলের লাইন আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে, বহুদূরে অস্পষ্ট ছায়ার মত সবুজ সমতল ক্ষেত্রের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। বাঁদিক দিয়া গাঢ় কালো মেঘের মত সারির পর সারি পাহাড় উঠিয়া গিয়াছে এবং ডান দিকে গভীর অরণ্যানী বহুল-খাদ। মাঝে মাঝে পাহাড়ের বুক চিরিয়া গভীর শব্দে ঝরণার জল আসিয়া পড়িতেছে। কার্সিয়াং পৌছিতে প্রায় সাড়ে চারটা হইল। টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল—এখানকার স্বাস্থ্যবান পাহাড়ী রমণীরা নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকে না। পিঠের উপর সাল লইয়া আনন্দে কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে চলিয়াছে। ছোট ছোট পাহাড়ী ছেলে-মেয়েগুলি দেখিলে কোলে করিতে ইচ্ছা করে। তাহাদের সাদা আনন্দিত রক্তিম মুখশ্রী, বলিষ্ঠ শরীর পাহাড়ী রমণীদের বাৎসল্যের উৎস জোগাইয়া দিয়াছে। "সোনাদায়" বাস আসিল, চারিদিকে গাঢ় কুয়াসা, সম্মুখে এক হাত দূরে কি আছে ভালরূপে বোঝা যায় না—সমস্ত দিন অনাহার এবং পথশ্রমে সঙ্গীদের মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। হাস্য-পরিহাস জমিতেছে না। "সোনাদাকে" Hope Town বলা হয়; কারণ দার্জ্জিলিং আবিষ্কারকেরা প্রথমে ইহার অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই। বাস্ ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠিয়া "ঘুমের" অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল—"ঘুমের" পরের ষ্টেশনই দার্জ্জিলিং। পৃথিবীর মধ্যে পাহাড়ের উপর যতগুলি ষ্টেশন আছে, "ঘুমই" সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। শুনিলাম, এখানকার অধিবাসীরা বৎসরে দুই মাসের অধিককাল সূর্য্যালোক উপভোগ করিতে সুযোগ পান না। আমাদের জামাগুলি ভেদ করিয়া তীব্র শীত প্রবেশ করিতেছে—হস্তের অগ্রভাগগুলি বরফের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, অনন্ত কুয়াসাচ্ছন্ন "ঘুমে" বাস প্রবেশ করিল—দার্জ্জিলিং 'ঘুম' অপেক্ষা নিম্নে অবস্থিত। এখান হইতে রেলের লাইনটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নীচে গিয়াছে—বহুদূর হইতে সাপের মত মনে হয়। পাহাড়ের গায়ে লতাপাতা খচিত দার্জ্জিলিং সহরের সুন্দর লাল বাড়ীগুলি ছবির মত প্রতীয়মান হইতেছে। প্রায় ছয়টার সময় ষ্টেশনের নিকট বাস আসিল—জড়তাভঙ্গ করিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলাম। আমার থাকিবার স্থান লুইস্ জুবিলি স্যানিটোরিয়াম—ষ্টেশনের পাশের.



ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্

রাস্তা ধরিয়া কিছু নীচে নামিতে হয়। দার্জ্জিলিংএ সাধারণের থাকিবার জন্য যে কয়েকটি হোটেল আছে, তন্মধ্যে এই স্যানিটোরিয়ামই অপেক্ষাকৃত ভাল। তবে ইহার একটি অসুবিধা (আর একটি অসুবিধার কথা পরে বলিতেছি) হইতেছে যে ইহা নিম্নে অবস্থিত। সমতলবাসী বৃদ্ধ এবং শিশুর পক্ষে উপর নীচ করা একটু কষ্টকর। নচেৎ ইহার খাদ্যাদি এবং সাধারণ ব্যবস্থা চমৎকার বলিলেও অত্যুক্তি করা হইবে না। এই স্যানিটোরিয়ামের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, রোগে পড়িলে এখানে চিন্তার কারণ নাই—ইহার অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত শিশির কুমার পাল মহাশয় একজন প্রবীণ চিকিৎসক, বিনা আহ্বানেও তিনি রোগীদিগকে বহুবার



কাঞ্চনজঙ্ঘা

দর্শন দিয়া থাকেন এবং মুদ্রা ব্যতিরেকেই ঔষধাদির সম্পূর্ণ ব্যবস্থা হয়। স্যানিটোরিয়ামের মধ্যে লাইব্রেরী ও Common Room এর বন্দোবস্ত করিয়া কর্ত্তৃপক্ষগণ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন টেনিস্ খেলিবার কোর্ট ও প্রকাণ্ড একটি অঙ্গন থাকায় সাধারণের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। লতাপাতা বেষ্টিত বিবিধ পুষ্প শোভিত এই স্যানিটোরিয়ামকে জ্যোৎস্নালোকে দূর হইতে আনন্দময় স্বপ্নমণ্ডিত গৃহের মত বোধ হয়।

আমি যে গৃহে স্থান পাইলাম তাহাতে দুইজন বৃদ্ধ আছেন দেখিলাম; 'হংস মধ্যে বকো যথা' রূপে বিরাজ করিতে হইবে—এখানকার একঘরে চারিজন করিয়া থাকিতে হয় সুতরাং 'বর্ত্তমানের সদ্ব্যবহার' এই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া জামা খুলিতে খুলিতে বৃদ্ধদ্বয়ের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। একজন ভাগলপুরে থাকেন —কঠোর কর্ম্মস্থল হইতে পেন্সন লইয়া দেশে-বিদেশ ভ্রমণ করিতেছেন আমার দার্জ্জিলিংএর কর্ম্মবিহীন অলস নির্জ্জন রাত্রিগুলি তাঁহার সহিত আলাপ আলোচনার আনন্দে অতিবাহিত হইত।

গরমজলে হাত মুখ ধুইয়া চা-সমেত জলযোগ করিবার পর শরীর সুস্থ বোধ হইল। রাত্রি প্রায় সাতটা হইবে, বাহিরে আসিয়া দেখি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে—ষ্টেশনের রাস্তা দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। ষ্টেশনে আসিয়া দেখি মেল এখনও আসে নাই; বহু উৎকণ্ঠিত নরনারী আশানেত্রে চাহিয়া আছেন। একটু অগ্রসর হইয়া দেখি আমার পূজনীয় পিতৃদেব একটি বেঞ্চির উপর বসিয়া আছেন—তিনি একসপ্তাহ পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছেন এবং Snow View Hotel এ আছেন। দার্জ্জিলিং মেল বিলম্ব হইবার কারণ ইত্যাদি তাঁহাকে বলিলাম।

দার্জ্জিলিং সহরে বাস করা সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর পক্ষে কষ্টকর—এখানকার জাঁক-জমক ও খাদ্যদ্রব্যাদির দুর্ম্মূল্য, স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার পথ রোধ করিয়াছে। সহরটি নির্ম্মাণ করিতেও খরচ কম হয় নাই, কার্ট রোডের প্রতি ফুট রাস্তা প্রস্তুত করিতে লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হইয়াছে। কার্ট রোড দিয়া উঁচু রাস্তা ঘুরিতে ঘুরিতে "চৌরাস্তায়" মিশিয়াছে—মাঝে ম্যালের রাস্তাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; প্রাতে এবং অপরাহ্নে এই রাস্তা ধরিয়া ক্ষুধাসঞ্চয়কারীর দল বিচিত্র পোষাকে আচ্ছাদিত হইয়া 'চৌরাস্তা' অভিমুখে চলিয়া থাকেন—চৌরাস্তার চারিপার্শ্বে অনেকগুলি বেঞ্চি আছে, সেখানে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই আসন গ্রহণ করিতেছেন।—অনতিদূরে কতকগুলি Pony রহিয়াছে, ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া হইয়া থাকে। প্রথিতযশা রূপদক্ষ শ্রীযুক্ত চারু রায়ের দুইটি পুত্রকে প্রায় প্রতি

অপরাহ্নেই Ponyর উপর দেখিতাম—ছোটটির নাম "মীনাকেতু," বয়স ৮।৯ বৎসর হইবে। কয়েকদিনের মধ্যেই আমার সহিত তাহার আলাপ জমিয়া উঠিয়াছিল —এই নিরীহ ছেলেটিকে Ponyর উপর মোটেই মানাইত না; আমি তাহাকে বলিতাম তুমি "জ্যাকি কুগান" হইতে পারিবে না।

চৌরাস্তা হইতে কিছু দূর উপরে উঠিলেই "Observatory Hill পাওয়া যায়—ইহা দার্জ্জিলিংর একটি উচ্চতম স্থান—এখানে একটি বাক্সের মধ্যে ম্যাপ আছে, আকাশ পরিষ্কার থাকিলে কাঞ্চনজঙ্ঘা হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র সিকিম পর্ব্বত শ্রেণী উজ্জ্বল দেখা যায়।

এখানকার বাজারটি কার্ট রোডের উপর অবস্থিত—বাজারে প্রায় সব জিনিষই পাওয়া যায়, প্রথমে মাছের বাজার, পরে তরি-তরকারী; তরকারীর দোকানের মালিকেরা অধিকাংশই রমণী। বাজারের নিকটেই মেয়েরা ঝাঁকা লইয়া অপেক্ষা করে এবং বাজার অভিমুখী গমনশীল ব্যক্তিদিগের তাহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া অনেক সময় দুরূহ হইয়া উঠে। বাজারের রাস্তা ধরিয়া নামিয়া নীচে গেলে বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখিতে পাওয়া যায়—এই উদ্যানটি বিচিত্র লতাপাতায় আবৃত, মাঝে মাঝে নানাবর্ণের ফুল ফুটিয়া আছে। কঠিন পর্ব্বতগাত্রে এরূপ শ্যামায়মান কোমলতা উপভোগ্য।

দার্জ্জিলিং হইতে দূরে আর দুইটি চিত্তাকর্ষক স্থান আছে—একটি সিঞ্চল হ্রদ ও অপরটি "টাইগার হিল" হইতে সূর্য্যোদয়ের দৃশ্য। ঘুম ষ্টেশন হইতে তিন মাইল হাঁটিয়া আমরা একদল সিঞ্চলে গিয়াছিলাম—সেখানে যাইয়া হ্রদের দৃশ্য যাহা দেখিলাম—তাহাতে মন তিক্ত হইয়া উঠিল। পাঠকের অবধানের জন্য ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে 'visitor's book' এ পুঞ্জিভূত মানসিক 'ম্যালেরিয়ার মধ্যে' জনৈক সত্যপরায়ণ ব্যক্তি লিখিয়াছেন —'রাণীগঞ্জের লেক ইহা অপেক্ষা মনোরম'। স্যানিটোরিয়ামে শুনিলাম 'টাইগার হিলে উঠিবার রাস্তা দুর্গম, শীতকালে যখন আকাশ পরিষ্কার থাকে তখন সৌভাগ্যবানেরা ভিন্ন সূর্য্যোদয় অন্য কেহ দেখিতে পারেন না। সেদিনও একদল গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই



টাইগার-হিল্ হইতে সূর্য্যোদয়

অসাড় হইয়া পড়িয়াছিলেন ইত্যাদী ইত্যাদী। কিন্তু কি এক অদৃশ্য আকর্ষণে আমাদের মন আকুল হইয়া উঠিয়াছিল—আমরা taxiর উদ্দেশ্য করিয়া আসিলাম। ঠিক হইল, রাত্রি আড়াইটার সময় গাড়ী ষ্টেশনের নিকট আসিয়া থাকিবে।' ঘুম পর্য্যন্ত আমরা গাড়ীতে যাইব - তারপর তিন মাইল উপরে উঠিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে দেখি দরজায় ঢং ঢং শব্দ - দরজা খুলিয়া দিলাম, চৌধুরী সাহেব ছাতা ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রবেশ করিলেন। তারপর আমরা দুজনে মিলিয়া নিদ্রিত সকলকে উঠাইলাম—অমূল্যবাবু অল্পদিন হইল আসিয়াছিলেন, তাঁহার লেপের আরামটুকু গভীর হইয়া উঠিতেছিল, তাঁহাকে উঠাইতে বেগ পাইতে হইল। গাড়ী যখন ছাড়িল তখন ঠিক তিনটা বাজিয়াছে। জনমানবশূন্য নির্জ্জন রাস্তার অন্ধকার যেন পুঞ্জিভূত হইয়া রহিয়াছে—অসংখ্য নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। রাত্রিতে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল—চালক পাহাড়ী, আমাদিগকে আশ্বাস দিল "দেখা যাইবে"।

রাস্তা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্রমশঃ উপরে উঠিতেছে—কিছুদূর অগ্রসর হইলে দেখা গেল, কয়েকজন Ponyতে চড়িয়া চলিয়াছেন, উঁহারাও Tiger hillএ যাইবেন অনুমান করিয়া আমাদের মধ্যে একজন গলা বাড়াইয়া বলিল—'Are you going to Tiger Hill'? ইহার উত্তর আসিবার পূর্ব্বেই আমাদের মোটর অনতিদূরে চলিয়া গিয়াছিল। যতই ঘুমের নিকট অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তংই কোথা হইতে যেন কুয়াসা আসিয়া ঘিরিতে লাগিল—অন্ধকার রাত্রি তার উপর কুয়াসা—সম্মুখের কিছুই দেখা যাইতেছিল না; চালক খুব সাবধানে এবং ধীরে ধীরে গাড়ী চালাইতে লাগিল—প্রায় তিনটা কুড়ি মিনিটের সময় ঘুমের জড়ো বাংলোর নিকট আসিয়া পৌছিলাম, এখান হইতে Tiger Hillএর রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। আমরা ছয়জন প্রাণী আস্তে আস্তে অগ্রসর হইলাম। কিছুদূর যাইবার পরই টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল—কুয়াসায় চারিদিক আবৃত হইয়া গেল। বামপার্শ্বে পাহাড় উঠিয়া গিয়াছে—ডান দিকে গভীর খাদ্ মাঝে তিন হাত চওড়া রাস্তা। সূচিভেদ্য অন্ধকারে সম্মুখের বস্তু দেখা যায় না, অতর্কিতরূপে একবার পা পিছলাইলেই শত সহস্র যোজন নিম্নে, অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের নিকট 'Torch' ছিল নচেৎ সেদিন আমাদের অদৃষ্টে দুঃখ লেখা ছিল। রাস্তার আর বিরাম নাই—এক ঘণ্টা এইরূপে চলিবার পর অন্ধকারের গাঢ়তা কাটিয়া গেল—চারিদিক যেন অল্প অল্প করিয়া ফর্সা হইতে লাগিল। দূরে বাম দিকে নিষ্ফল deserted barrack এর থামগুলি প্রকাণ্ড দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে—এইখানে golf খেলার জন্য সমতল ভূমি আছে। এখান হইতে রাস্তা ঠিক সিঁড়ির মত খাড়া হইয়া গিয়াছে। পাচটা বাজিয়া গিয়াছে। সেই জন্য আমরা তাড়াতাড়ি উঠিতে লাগিলাম—পা আর চলিতে চাহিতেছিল না, ঠাণ্ডার মধ্যেও সমস্ত শরীর ঘামিয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ অর্দ্ধমৃত হইয়া যখন 'টাইগার হিলের' শীর্ষ দেশে উঠিলাম তখন দেখি ঘুমের নিকট যে কয়েকটি Pony দেখিয়াছিলাম, তাহারি দুইদিকে দুইজন বাঙ্গালী মহিলা! যে জাতিকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের কবি আক্ষেপভরে বলিয়াছেন তাহারা আমাদিগকে স্নেহাঞ্চল দিয়া বেষ্টন করিয়া বাঙ্গালী করিয়াছেন মানুষ করেন নাই, তাঁহাদেরই দুইজনকে এই দুর্গম গিরিপ্রান্তর অতিক্রম করিতে দেখিয়া শ্রদ্ধায় আমার মস্তক অবনত হইয়া গেল।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে 'Love's labour lost' ইহার সার্থকতা জীবনে এই প্রথম অনুভব করিলাম এত পরিশ্রম ও রাত্রিজাগরণের পর এতদূর আসিয়া দেখিলাম যে সাদা মেঘে সর্ব্বত্র ঢাকা! এখানে একটি ছোট গোলঘর আছে, তাহার উপরে একটি ছাদ আছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আমরা ছাদে উঠিলাম—তীব্র-শীতে সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট করিয়া ফেলিতেছে—সেই টিপ টিপে বৃষ্টি যেন অসহ্য বোধ হইল। ছাদের উপর কয়েকটি বেঞ্চি ছিল; অমূল্য বাবু সৌখিন লোক, কাজেই তাহার উপরে ছুরি দিয়া নিজের নামের নক্সা কাটিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা আকাশের দিকে চাহিয়া হতাশ হইয়া পড়িলাম। "মেঘের পর মেঘ জমেছে"—হঠাৎ মুহূর্ত্তের জন্য কোন অদৃশ্য শক্তিমান হস্ত যেন সেই পুঞ্জিভূত মেঘরাশিকে একত্র করিয়া আস্তে আস্তে পর্দ্দার মত সরাইয়া দিল, পূর্ব্বদিকের রক্তিমচ্ছটার মধ্যে 'কাটাপাহাড়ের' উপরস্থিত দার্জ্জিলিংয়ের লাল বাড়ীগুলি অনন্তরহস্যময় বলিয়া বোধ হইল—এবং ঘনকৃষ্ণ গাছগুলি প্রহরীর মত রহস্যময় রাজ্যের দ্বারে দণ্ডায়মান আছে। মনে মনে বলিলাম, হে সূর্য্যদেব, তোমার উদয়ের রূপ আমাকে দাও নাই সত্য কিন্তু পরিবর্ত্তে যাহা দিয়াছ—তাহাতেই আমার সৌন্দর্য্যপিপাসু অন্তঃকরণ ভরিয়া গিয়াছে।

ঘুমে যখন আমরা নামিলাম তখন বেলা প্রায় সাতটা হইবে—ষ্টেশনের তাপমান যন্ত্রে ৫০ ডিগ্রি উত্তাপ উঠিয়াছে দেখিলাম। 'টাইগার হিল' হইতে নামিয়া আসিয়াছি তাই ঘুমের এই গাঢ় ঠাণ্ডায় শীত বোধ হইল না। কিন্তু পেটের তাপমান যন্ত্রে উত্তাপ অসম্ভব তীব্র বোধ হইল। ষ্টেশনের পার্শ্বেই একটি পাহাড়ীর সজ্জিত Restaurant ছিল। সেইখানে আমরা প্রবেশ করিয়া তাঁহার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া কাচের বয়ম হইতে 'কেক' রুটি, ইত্যাদি মুখে গুজিতে লাগিলাম, ডিম সমেত চা পান করিবার পর শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ হইল। গাড়ীতে উঠিয়া আমরা ঘুমের বৌদ্ধবিহার দেখিতে চলিলাম—ঘুম হইতে এক মাইল দূরে নির্জ্জনতার মধ্যে স্থাপিত শুভ্র এই মন্দিরটি

বৃষ্টিতে যেন স্নান করিয়া পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে—মন্দিরের পুরোহিত আমাদিগকে ভিতরে লইয়া গেলেন, অগণিত কারু কার্য্যশোভিত ঘরের মধ্যে ধ্যানমূর্ত্তি বুদ্ধদেব স্তিমিত নয়নে চাহিয়া আছেন—সম্মুখে সারির পর সারি প্রভাত বন্দনার ঘৃত-প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৌদ্ধ-মূর্ত্তি বিরাজমান—এই বিহারে যেন পুরাতন দিনের বিপুল কাহিনী লুক্কায়িত আছে,ধ্যান নেত্র বুদ্ধের সম্মুখে দাঁড়াইলে মনে হয় যেন জীবন অনিত্য, যৌবন অনিত্য, ধনজন অসত্য। বাহিরে আসিয়া যখন গাড়ীতে উঠিলাম তখন হঠাৎ পাঁচবৎসর পূর্ব্বেকার কথা মনে হইল—সেদিনও ঠিক এমনি সময়ে কলিকাতা বৌদ্ধবিহারের সম্পাদক আমার সিংহল নিবাসী বন্ধুর সহিত একত্রে এখানে আসিয়াছিলাম—আজ সে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে; ছাত্রজীবনের সমস্ত স্মৃতি অনির্ব্বচনীয় গন্ধভার লইয়া প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানের মত আমার নিকট পরিস্ফুট হইল।

স্যানিটোরিয়ামে ফিরিয়া আর কোথায়ও যাই নাই —অপরাহ্নে বেড়াইতে বেড়াইতে একবার ভিক্টোরিয়া ফলস্ এ গিয়াছিলাম। স্যানিটোরিয়ামের রাস্তা ধরিয়া কিছু নীচে নামিলেই দেখা যায় নিম্নাভিমুখী জলধারা শৈলাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে সরোষে ছুটিয়া চলিয়াছে—বর্ষাকালে এ দৃশ্য উপভোগ্য।

অদ্য আমার দার্জ্জিলিং হইতে বিদায়ের দিন। সকাল-বেলা জানলা খুলিয়া দেখিলাম, সোনার রৌদ্রে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে—বরফাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘার উপর রৌদ্রকিরণ পড়িয়া রজতশুভ্র আকার ধারণ করিয়াছে—মেঘগুলি তাহার নিম্নে ইতস্ততঃ পদচারণ করিতেছে এবং রৌদ্রালোকিত দার্জ্জিলিংসহর যেন স্নানের পর বাসন্তীরঙের সাড়ী পরিধান করিয়া সমৃদ্ধ তরুণীর মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

* * * *

এই ফটোগুলির জন্য শ্রীযুক্ত সরোজকান্ত মজুমদারের নিকট লেখক কৃতজ্ঞ।

হিন্দু-বিবাহ ভঙ্গ আইন

বরোদা রাজ্যে সম্প্রতি হিন্দু বিবাহ আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহিত জীবনের অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য মহারাজা একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই কমিটিতে রাজ্যের কতিপয় বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলা ছিলেন। তাঁহারা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে -আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেন। তদনুসারে আইনের খসড়া প্রস্তুত হয় এবং জনমত সংগ্রহের জন্য উহা প্রচারিত হয়। সনাতনী ও গোঁড়া হিন্দুগণ আপত্তি করিলেও মহারাজা আইনে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। উক্ত আইন অনুসারে বিবাহিত পুরুষ বা নারী তাহার স্ত্রী বা স্বামীর ৭ বৎসর কোন সন্ধান না পাইলে অথবা স্ত্রী বা স্বামী অন্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে কিংবা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে বা তিন বৎসর কাল নির্দ্দয়-ভাবে ব্যবহার করিলে, অথবা পরিত্যাগ করিয়া যাইলে বা সর্ব্বদা মাদক দ্রব্যে বা অন্য স্ত্রীলোকে আসক্ত হইয়া থাকিলে বিবাহ বিচ্ছেদ করিতে পারিবে। ইহা ব্যতীত স্বামী বা স্ত্রী যদি প্রমাণ করিতে পারে যে, বিবাহের সময় তাহার স্ত্রী বা স্বামী দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত, অথবা অন্ধ, মূক, উন্মাদ বা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ছিল অথবা বয়স লুকাইয়া বিবাহ হইয়াছিল, তাহা হইলেও বিবাহ অসিদ্ধ হইতে পারিবে। এই আইন অনুসারে আদালতে যদি কোন স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের আদেশ হয় অথবা তাহার বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হয় তাহা হইলে বিবাহ বিচ্ছেদ বা বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণার তারিখ হইতে ছয় মাস পরে উক্ত স্ত্রীলোক পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারিবে।

"জলখেলা ও কিছুমিছু"

শ্রীবিনয় কৃষ্ণ ঘোষ —পরিচয়

আজ আমি ব্রহ্মদেশের জলখেলা সম্বন্ধে কিছু ব'লবো। এ জলখেলা এরা কোথায় পেল? এ তো সেই কেষ্টো ঠাকুরের যুগের উৎসব। সেই যুগেই তো কেষ্টোঠাকুর গোপীগণ সহ যমুনাতে জলখেলা ক'রতেন। আমরাও তাঁরই উপাসক; কৈ আমরা ত এ জলখেলা উৎসব করিনা। কিন্তু এরা এ উৎসব কোথায় পেল? বুদ্ধদেবের পূর্ব্বে বা পরে এদেশে আর কেহ ঐশ্বরিক ক্ষমতা নিয়ে আসেন নি। আর এদের ইতিহাস খুললেও তেমন কোন মহাপুরুষের নাম পাওয়া যায় না।

আমাদের পুরাকালীন ইতিহাসের সঙ্গেও একটু সাদৃশ্য দেখা যায়। কপিল মুনির শাপে যখন সগর বংশ একেবারে ধ্বংস প্রায় ভগিরথ তখন অনেক দিন যাবৎ কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মার আরাধনা ক'রে তাঁকে সন্তুষ্ট করেন। ব্রহ্মাও ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্য গঙ্গাকে পাঠালেন। গঙ্গা দেবীও মাতৃত্বের গর্ব্ব নিয়ে সন্তানের আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য দেবার জন্য পাহাড় পর্ব্বত, গিরি, শৃঙ্গ ভেদ ক'রে ভীম বেগে ছুটে আস্‌ছেন। পথে স্বয়ং মহাদেবের সঙ্গে দেখা, কিন্তু গঙ্গা দেবীর সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি সন্তানের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য আকুল হ'য়ে ছুটে যাচ্ছেন। মহাদেবেরও যজ্ঞের সামগ্রী সব ভেসে যাচ্ছে। মহাদেব তখন রেগে অস্থির হয়ে বল্লেন—"কি সামান্য মেয়ে মানুষের এত স্পর্দ্ধা"? তাই তাঁর গতিরোধ ক'রবার জন্য চেষ্টা করেন। কিছুতেই পেরে উঠেন না দেখে বাধ্য হয়ে মস্তকোপরি জটার ভিতর গঙ্গাকে লুকিয়ে রাখেন। ভগিরথ তাঁকেও সন্তুষ্ট ক'রে গঙ্গা দেবীকে মর্ত্তে ল'য়ে আস্‌ছেন, তখন দেবতাদের প্ররোচনায় একটা ভীষণাকার ঐরাবৎ তাঁকে বাধা দেবার জন্য সামনে এসে দণ্ডায়মান হ'ল। সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বর মহাদেব যাঁর গতি রোধ করতে অসমর্থ, সামান্য একটা ঐরাবৎ তাকে বাধা দিবে। মা গঙ্গা তাঁর প্রবল বাহু বিস্তার ক'রে সে দাম্ভিক ঐরাবৎটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন। মায়ের আগমনে মরুসম উত্তপ্ত দেশ ঠাণ্ডা হ'ল! পাপীরা সব পরিত্রাণ পেল। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল।

এরাও যেন ঠিক সেই আদর্শ নিয়ে ভগিরথের সেই পালাটির অভিনয় করে। এদেশের জলখেলাটা চৈত্র মাসের শেষাশেষি হয়। সে সময় সূর্য্য ঠাকুর তাঁর প্রখর কিরণের সাহায্যে পৃথিবীর যেন সব রসটুকু টেনে নিয়ে যান। মৃত্তিকা ফেটে চৌচির। গাছ পালা গুলিও যেন তৃষ্ণায় কাতর। তাদের যৌবন সৌন্দর্য্য সবুজ রংয়ের পত্রগুলি রস শূন্য, আশাহীন। তাহারা তাদের যে দাম্ভিকতা ও রসিকতা নিয়ে পবনের সাথে নৃত্যে পরাস্ত হ'য়ে এক একটা ক'রে ঝ'রে পড়ে প্রকৃতিরও যেন সেই অবস্থা। সবাই যেন রস শূন্য। প্রাণিগুলি মাঝে মাঝে জল খেয়ে তাদের সে অভাবটা পূরণ করে। সে সময় এদেশের অনেক কুয়া ও ইঁদারার জল শুকিয়ে যায়—Upper Burma side এ তো মহামারি কাণ্ড বেধে উঠে।

ব্রহ্মদেশের শস্যাদির জীবনী শক্তি বৃষ্টির উপর। বৃষ্টি যদি না হয়, শস্যাদি হওয়ার আর সম্ভাবনা নেই, তাই সবাই যেন ভগিরথ হয়ে বারি ধারার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। এই প্রার্থনার আকৃতিটাই জল-খেলা উৎসব।

ভগীরথ যেমন তপস্যা ক'রে ব্রহ্মার নিকট হ'তে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য পেয়েছিলেন, এরাও যেন সেই আদর্শ নিয়ে দল বেঁধে নিজেরাই নিজেদের আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য বারি বর্ষণ করে। এদের এ বারি বর্ষণ ব্যাপারে স্বয়ং শিবও আসেননি, বা দেবতাদিগের প্ররোচনায় ঐরাবৎও আসেন না, বা দেবতাদিগের প্ররোচনায় ঐরাবৎও আসে না। তবে নিজেদেরই প্ররোচনায় কাষ্ঠখণ্ড

ও বংশ দণ্ড দ্বারা ভীষণ আকারের ঐরাবৎ তৈরি করে। তার উপর কাগজ ও কাপড় লাগিয়ে নিপুণভাবে রং মাখিয়ে চিত্রকলার এমন পরিচয় দেয় যে, দূর হ'তে সত্য সত্যই একটা ভীষণ আকারের ঐরাবৎ বলে ভ্রম হয়। আবার তাদের পায়ের নীচে কাঠের চাকা লাগান থাকে ও দড়ি বেঁধে সবাই সেটাকে টেনে নিয়ে বেড়ায়। আর চারি পার্শ্বস্থ সকল যুবক-যুবতী পিচ্‌কারীর সাহায্যে জল ছুড়াছুড়ি খেলে, তাতে মনে হয় যেন ঐরাবৎটী তাদের এ বারি বর্ষণ নিবারণ ক'রতে অক্ষম হ'য়ে নীরবে চ'লে যাচ্ছে।

আমাদের ধর্ম্মের দিক দিয়েও এদের অনেক বিষয়ের মিল দেখা যায়। এরা যেন সত্য সত্যই ভগিরথের গঙ্গা-আনার পালাটা অভিনয় করে; তবে ভগিরথ প্রবল বারিধারা গঙ্গার আরাধনা ক'রেছিলেন, এরা প্রবল না হক ক্ষুদ্র বারিধারা বৃষ্টির আরাধনা করে।

আর দ্বাপর যুগের দিক দিয়ে দেখ্‌লেও দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপীগণ সহ বৃন্দাবনে জলকেলি ক'রতেন এরাও যেন সেটার কতক অংশ অভিনয় করে। তবে স্বর্গের জিনিষ মর্ত্তে এলে যতটুকু পার্থক্য হ'তে পারে এতে তার চেয়ে বেশী কিছু দেখা যায় না।

এখন ব্রহ্মদেশের জলখেলার জলন্ত ইতিহাসটা একটু খুলে দেখাই। এ উৎসবটা মাত্র তিন দিন স্থায়ী। ব্রহ্মদেশে এটা একটা মস্ত বড় উৎসব। সমস্ত যুবক-যুবতী সেজে-গুজে দল বেঁধে জলখেলা ক'রতে বাহির হয়। ব্রহ্ম মহিলাদের পরিচ্ছদের বিবরণ আমার পূর্ব্বের রচনা ফুঙ্গিদাহনে পেয়েছেন। এখানেও একটু দিয়ে যাই। মহিলারা তাঁদের মন ভুলান রূপ ও প্রাণ মাতান যৌবন নিয়ে কাচের মত স্বচ্ছ ব্লাউজ গায়ে দিয়ে চোক-ঝল্‌সান রংয়ের লুঙি প'রে পিচ্‌কারী বা কারুকার্য্য শোভিত রৌপ্য ও কাষ্ঠ পাত্র হাতে ক'রে জল খেল্‌তে বাহির হয়েছে। এ যেন সত্য সত্যই সেই কেষ্টো ঠাকুরের আমল। যুবক-যুবতীরা নিঃসঙ্কোচে পরস্পর পরস্পরের গায়ে জল সিঞ্চন কচ্ছে। যুবতীদের একেতো স্বচ্ছ কাচের মত ব্লাউজ তাতে আবার জলসিক্ত। একেবারে সোনায় সোহাগা। কিন্তু এত আর সে শ্রীকৃষ্ণের আমল নয় বা সত্যযুগও নয় তাই যে যার প্রাণের মানুষকেই যেন জলসিঞ্চন বেশী ক'রে কচ্ছে। মোট কথা যুবতীদের আপাদমস্তক জলসিক্ত। এটা যে একটা খুব আমোদের উৎসব তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। আকাঙ্খিত জিনিষকে যে-ভাবে পেতে ইচ্ছা হয় তাকে যদি ঠিক সেই ভাবেই পাওয়া যায় তবে আনন্দ কার না হয়? এইরূপ আকাঙ্খিত দ্রব্য পেলে যে কিরূপ আনন্দ হয় তা সেই বুঝ্‌বে যে তার বাঞ্ছিত জিনিষ ঠিক সেই ভাবেই পেয়েছে।

এ উৎসবে তাদের অনেক কিছু আয় হয়; তবে তার সবই ফায়ার জন্য ব্যয় ক'রে। বাস্তবিক মহিলাদের একটা মোহিনী শক্তি আছে; এ শক্তির প্রভাবে এরা যাতে হাত দিবে তাতে জয়ী হ'বে। মহিলারা তাদের মোহিনী শক্তি নিয়ে যে কাজে হাত দিয়েছেন তাতেই জয়ী হয়েছেন। এখানে আর সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তীর কথা তুলে উঁচুর দিকে উঠ্‌তে চাইনা। নীচের দিক দিয়েই একটা জলন্ত উদাহরণ দেখাই।

ব্রহ্মদেশের কোন এক জেলাতে একজন শ্বেতাঙ্গ বিচারক ছিলেন। যুবতীরা একবার জল খেল্‌তে খেল্‌তে তাঁর উদ্দেশ্যে ধাবমান হ'য়ে তাঁর গায়ে জল-সিঞ্চন করেন। প্রথমে মহিলাদের ভয়ই হয়েছিল কিন্তু ফলে তিনি আকুল হ'য়ে তাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ জলখেলা ক'লেন। জানিনা তিনি প্রাচ্য দেশীয় প্রেম কি আধুনিক যুগের প্রেম কি সত্যযুগের প্রেম লয়ে তাদের সঙ্গে মিশেছিলেন। মহিলারা তাঁর কাছ হ'তে বেশ মোটা কিছু টাকা আদায় করে নিয়েছিল, তবে তার সবই বৌদ্ধফায়ার জন্য ব্যয় ক'রেছিল।

কিন্তু এ কাজটা যদি মহিলাদের দ্বারা না হ'য়ে যুবকদের দ্বারা হ'ত, তাহ'লে হয় তো পুরস্কারটা আইনের সাহায্যে বা অন্য কোন উপায়ে দেওয়া হত।

ব্রহ্মদেশবাসীর গুরুর প্রতি ভক্তি অসীম। এজন্য তারা বহু টাকাও ব্যয় করে। এ দেশে যে কত গুলা ফায়া ওফুঙ্গিচোং আছে তার ইয়ত্তা নেই। তবে তার ভিতর তিন, চারটী ফায়া আছে যার মূল্য বড় একজন ইঞ্জিনিয়ার, বড় একজন চিত্রকর ও বড় একজন জুয়েলার একত্রিত না হ'লে নির্ণয় করা যায় না।

আগ্রার তাজমহলের মত অবস্থা পরাধীন দেশের প্রাচীন কালের বড় বড় সব জিনিষেরই। তথাপি গত ভূমিকম্পে রেঙ্গুনের সোয়েডাগণ প্যাগোডার চূড়াটী ভেঙ্গে পড়েছিল। আমি তা নিজেই একবার দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণা ক'রতে পারলাম না যে এর মূল্য কত? মূল্যবান মণি মাণিক্য ত আছেই তবে আন্দাজ সোনা প্রায় ৫।৬ সের আছে। পরে শুনতে পেলাম এর মূল্য প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। তা' ছাড়া নানারূপ কাজ করা, মনুমেণ্টের মত উঁচু মন্দির যার উপর হ'তে Bay of Bengal নাকি দেখা যায়। এর মূল্যটাও ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্য ব্যতীত নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

আজ জলখেলার শেষ দিন। বেলা তখন প্রায় ২টা হ'বে। সূর্য্যঠাকুর তাঁর ভাণ্ডারের সমস্ত কিরণটুকু পৃথিবীকে বিতরণ ক'রে দিয়েছেন। এখন তিনি গৃহাভিমুখে যাওয়ার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছেন। এমন সময় দূর হতে নানারূপ বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ ও কোলাহল বাতাসের সঙ্গে ভেসে এসে আমার কানে বাজ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ দুটীও আপনাহতেই যেন সেই দিক পানে ছুট্‌লো। চেয়ে দেখি সূর্য্য কিরণ তাদের সেই চক্‌চকে পরিচ্ছদের উপর প'ড়ে ঝিকিমিকি করছে সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটাও একটু আকৃষ্ট হ'য়ে পড়'ল। বাসা হ'তে বেরিয়ে সদর রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। দেখ্‌লাম বহু রমণী তাঁদের সব চেয়ে মূল্যবান পোষাকে সজ্জিত হ'য়ে মাথায় একটী ক'রে জলভরা মৃত্তিকা ভাণ্ড নিয়ে আসছেন আর তাঁদের পিছু একদল বাদক নানা ভঙ্গিমায় বাজ্‌না বাজাচ্ছে। তাঁদেরই পিছে পিছে একদল যুবক। কেউ মুখে মুখস্ পরেছে, কেউ বা সাপুড়ে সেজেছে, আর কেউ বা হনুমানের মত কি একটা জানোয়ার সেজে লাফালাফি ক'রতে ক'রতে আসছে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও চল্লাম। নিকটেই একটা ফায়া ছিল। তারা সবাই সেখানে ঢুক্‌লো এবং খুব মাতামাতি ক'রলো। সমস্ত কয়টি জলভরা ভাণ্ড ফায়ার ঠাকুর দেবতা বুদ্ধদেবের জন্য রেখে দিল। আস্তে আস্তে পূজার সাজ-সরঞ্জাম এসে হাজির হল। সরঞ্জামের মধ্যে দেখ্‌লাম ঠাকুরের সামনে একটী জলঘট দুপাশে দুটী প্রদীপ জলছে। পাশেই একখানা ধুনোচী রয়েছে। সে শুধু ধূমই উদ্গীরণ কচ্ছে। আর লাইন দিয়ে ছোট বড় রেকাবী কলা, কেক্, বর্ম্মা দেশীয় চুরোট, গৈরিক রংয়ের মোটা মোটা কাপড় ও চাদর, দুই একখানা ক'রে তোয়ালে, বর্ম্মা দেশীয় খাদ্য ইত্যাদি দিয়ে সাজান রয়েছে। ফুঙ্গীরা সব উচ্চ গলায় পালি ভাষাতে পূজা শেষ করে দিল। মহিলারা সব জোড়হাত করে, হাঁটু গেড়ে, চোক বুজে ব'সেছিল হঠাৎ সবাই উচ্চরব কি একটা শব্দ ক'রে উঠে দাঁড়াল।

সন্ধ্যা হয়েছে। পাশেরই একটা ঘরে Electric dianemo চল্‌ছে। হঠাৎ Electric light এ ফায়াটা ঝিক্‌মিক্ ক'রে উঠ্‌লো। সবারই বিবিধ রংয়ের পরিচ্ছদ ঝিলিক্ খেয়ে উঠ্‌লো। বাইরের মঞ্চের উপর Burmese Theatre পোয়ে আরম্ভ হ'ল। আমোদের ফোয়ারা ছুট্‌তে লাগ্‌লো। স্ফূর্ত্তীর ভাণ্ডার নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সবাই মিলে আমোদ ক'রতে লাগ্‌লো। রাত্রিও শেষ হয়ে এল। আকাশের পূর্ব্ব কোণে লাল আভা দেখা দিল। যে যার বাড়ীতে চলে গেল।

সবাই ঘরে ফিরল কিন্তু একটী অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক ও একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা আর ঘরে ফিরল না। তারা দুজনাই স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রী। তাদের খোঁজ পড়ে গেল, কিন্তু কোথাও তাদের আর সন্ধান হ'ল না। একদিন, দুদিন কেটে গেল। তারা একেবারে নিরুদ্দেশ।

আজ তৃতীয় দিবস। রবিঠাকুর যেন সকাল সকাল শয্যা ত্যাগ ক'রে শান্ত মনে আকাশের পূর্ব্বকোণে লাল আকারের ভীষণ একখানা থালার মত ভেসে উঠ্‌ছেন। তাঁর সেই মধুর সোণালি কিরণ ইরাবতীর বক্ষে ছড়িয়ে দিয়েছে। ছোট ছোট ঢেউগুলি যেন তার সঙ্গে মিশে আমোদে নৃত্য কচ্ছে। এক জোড়া যুবক-যুবতী দুনিয়ার কোথাও শান্তি না পেয়ে এই ইরাবতীর বক্ষে ঢেউয়ের গদীর উপর সোনালি রংয়ের আলোকে আরামে ঘুমুচ্ছে। সূর্য্যঠাকুরও যেন তাদের সে আরামের ঘুমে বাধা দিতে চাচ্ছেন না। তিনি তাঁর ভাণ্ডারের স্নিগ্ধ সোনালি কিরণ বিতরণ ক'রে তাদের আরও আরাম দিচ্ছেন। মা ইরাবতীও যেন তাঁর ভাণ্ডারের সমস্তটুকু মাতৃস্নেহ দিয়ে ঢেউয়ের গদীর উপর তাদের ঘুম পাড়াচ্ছেন।

ছোট ছোট ঢেউয়ের মৃদু মৃদু নৃত্য যেন তাহাদিগকে স্প্রিংয়ের গদীর মত আরাম দিচ্ছে।

তারা দুজনেই পাশা পাশি শায়িত। ছেলেটীর বাম হাত ও মেয়েটীর ডান হাত দিয়ে উভয় উভয়কে আকড়ে ধরে আছে। আর সে হাত দুখানা একখানা রুমাল দিয়ে বাঁধা। রুমালখানা যেন তাদের এই মিলন বন্ধনকে সহায়তা কচ্ছিল

এ ঘটনাটা যে শুনেছিল তারই প্রাণে বোধ হয় একটু আঘাত লেগেছিল। কিছুক্ষণ পরে তাদের সব কিছু **Romance** শুনতে পেলাম।

শুনলাম ছেলে বেলা হতেই এরা উভয়ে উভয়কে খুব ভাল বাসতো। এমনকি একদিন কেউ কারো না দেখে থাকতে পারতো না। ক্ষণিকের চখের দেখাতেও যেন এরা খুব শান্তি পেত। আস্তে আস্তে এদের ভালবাসা খুব গভীর হয়ে পড়ে। এখন আর ছাড়া-ছাড়ি হয়ে থাকতে তাদের প্রাণ আর চায় না।

দুর্ভাগ্য তাদের! মা বাপ তাদের ভালবাসার গভীর বেগটা বুঝলনা। মেয়ের মা কিছুতেই ও ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে চাহে না। ছেলের বাপেরও বিশেষ মন নেই। অবশ্য ছেলের বাপের মতামতে এদেশে বিশেষ কিছু আসে যায় না। কারণ এদেশে মেয়েরাই প্রধান ও অর্থশালী। মায়ের সমস্ত জিনিষই মেয়েতে পায়। ছেলের ইহার উপর বিশেষ কোন অধিকার নেই। মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাই এনে নিজের ঘরেই রাখেন—যাকে বাংলা দেশে ঘরজামাই বলে।

কিন্তু তাদের এ নবযৌবনের নব উৎসকে কে বাধা দেবে? এযে বন্যার মত প্রবল। সে তো কোন বাধাই মানতে চায় না। তারাও তাই সকল বাধার বাইরে চলে গেল।

তাদের সে স্বেচ্ছায় সহমরণের দৃশ্যটা দেখে মনে হল তারা যেন রুমালের সাহায্যে হাতে হাতে বেঁধে ভগবানের কাছে প্রার্থনা কচ্ছে—হে ভগবান! ইহ-জীবনে আমাদের আর মিলনের সম্ভাবনা নেই; তবে পরজন্মে যেন আমাদের এই বন্ধন অটুট থাকে

———

ক্ষণ-প্রভা

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী, বি-এ।

ওগো ক্ষণিকের বন্ধু, এসেছিলে যেন,
বিনা-মেঘ আকাশের বিদ্যুতের হেন,
　কবে দীপ্তি জ্বালিলে আলোকে,
　সে মহিমা পড়িল না চোখে,
　　অকস্মাৎ বজ্র-রবে কম্পিত ভুবন,
　　বধির শ্রবণ হায়, মূর্চ্ছাহত মন!

———

"সাথী"

কুমারী রেণুকা মিত্র

চিত্র

১

"রেবা, রেবু!"—ব'লে মলিনা তাঁর কন্যাকে পরম স্নেহে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু এত ডাকেও রেবা নাম্নী ছোট্ট সাতবছরের বালিকাটির কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। পরিশেষে মলিনা বিরক্ত হ'য়ে গলার স্বরটা আর একটু উঁচু পর্দ্দায় চড়িয়ে ডাকলেন,—"রেবা, কোথায় গেলি, এত যে ডাকছি শুনতেও পাস্ না?" রেবা তখন তার "টেবির" সঙ্গে খেলায় মত্ত ছিল; মায়ের বিরক্তিভরা কণ্ঠস্বর শুনে তাড়াতাড়ি এসে পিছন দিক্ থেকে তাঁর গলাটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বল্লে, "হ্যাঁ মা শুনতে পেয়েছি; কি কর্‌ব বলো আমার "টেবি সোণা" যে আমায় কিছুতেই ছাড়্‌ছিল না, তাই তো তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারিনি।"

কন্যার এই সরলতামাখান মিষ্টিকথাগুলোতে মায়ের বিরক্তি নিমেষের মধ্যে দূরীভূত হ'য়ে গেল; তিনি তাকে আদর ক'রে কোলের কাছে টেনে এনে গভীর স্নেহে তার পাতলা ঠোঁটদুটিতে একটি চুমা খেলেন। রেবাও তার একটী প্রতিদান দিয়ে ছুটে তার টেবির কাছে চলে গেল। মলিনা কন্যার চঞ্চল পদক্ষেপের দিকে মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রইলেন।

২

কলিকাতার একটি সরু গলির ভিতর, একটি দ্বিতলবাটীতে এই ছোট্ট পরিবারটীর অবস্থান। বাটীর কর্ত্তা নরেনবাবু কলিকাতার একজন বড় অফিসার; তাঁ'র স্ত্রী মলিনা দেবী ও একমাত্র কন্যা রেবা। তাঁর উপার্জ্জনেই দিনগুলি বেশ স্বচ্ছলভাবে অতিবাহিত হ'য়ে যায়। তদুপরি আরো দুইটী প্রাণীও এই পরিবারভুক্ত; একটি, চাকর "হরে" এবং অপরটী, তুলোর মত শাদালোমে ঢাকা কুকুরছানা "টেবি।" টেবি রেবার অতি প্রিয় এবং একমাত্র খেলার সাথী। সে স্কুলে যা'বার সময় এর সঙ্গে দেখা ক'রে, আদর ক'রে যায়, আবার স্কুল থেকে এসেই সর্ব্বাগ্রে তার কাছে গিয়ে বসে।

প্রত্যহ বেলা ১০টার সময় স্কুলের বাস আসে; সহিসটা নেমেই চীৎকার ক'রে ওঠে "গাড়ী আয়া বাবা"; রেবা আগে থেকেই খেয়ে-দেয়ে প্রস্তুত হ'য়ে থাকে; সহিসের উচ্চরব শুনে সে টেবির কাছে গিয়ে তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলে "টেবি, আমি আসি, আবার স্কুল থেকে এসে তোমার সঙ্গে খেলা কোর্‌ব, কেমন?" টেবি তার পা হাত চেটে যেন সম্মতি জানায় "এসো।"

৩

সেদিন সকাল থেকে আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল; ঝুপ্ ঝুপ্ ক'রে অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল।

সর্ব্বাঙ্গে কাদামেখে স্কুলের বাস নিয়মমত দশটার সময় আসতেই সহিসের চীৎকারে রেবাও যথারীতি টেবিকে আদর ক'রে স্কুলে চলে গেল। সাড়ে তিনটার সময় যখন সে স্কুল থেকে ফির্‌ল, তখন তার ভয়ানক মাথা ব্যথা করছে, বেশ জ্বরও হ'য়েছে। মলিনা বড় ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌লেন। নরেনবাবু পাঁচটার পর অফিস থেকে ফিরে কন্যার অসুখ শুনেই তখনি ডাক্তার ডাকতে ছুটলেন। ডাক্তারবাবু এসে দেখে বল্লেন "খুব সম্ভব টাইফয়েড—ফিভার'।"

রাত্রে রেবার জ্বর খুব বেড়ে ১০৫° ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠল। সে বলতে লাগল "মা, আমার টেবি কোথায়? তাকে আমার কাছে এনে দাও না মা।" টেবিকে তার কাছে বিছানায় এনে দেওয়া হোল; সে তার লোমভরা গায়ে পরম আদরের সহিত হাত

বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। টেবি তার ছোট্ট প্রভুর ম্লান মুখখানির দিকে ছলছল চোখে চেয়ে রইল।

এই রকমভাবে দু'দিন কেটে গেল; অসুখ ক্রমশঃ বেড়েই চল্‌ল। অতঃপর তিনদিনের দিন ডাক্তারবাবু এসে তাকে পরীক্ষা ক'রে মুখভার করলেন। তার নাড়ীর গতি ক্রমশঃই ক্ষীণ হ'য়ে আস্‌ছে। ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের শেষরশ্মি জগতের বুক থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেল, সন্ধ্যাদেবী তাঁর ধূসর বর্ণের আঁচলখানি ধরণীর বুকে বিছিয়ে দিয়ে ধরাকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্লেন; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এই ছোট্ট পরিবারটীও শোকের গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। একটি কুঁড়ি ফুটতে না ফুটতেই পৃথিবীর বুকে শুকিয়ে ঝরে পড়্‌ল।

৪

"টেবি" পশু হ'লেও সে বুঝি বুঝতে পেরেছিল যে, তার প্রভু তাকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে গেল। তাই সেও তার জলভরা চোখ দুটী প্রিয় প্রভুর স্বর্গীয় জ্যোতিঃমাখা মুখের উপর স্থাপিত ক'রে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত চেয়ে রইল।

শতচেষ্টা ক'রেও টেবিকে কেউ কিছু খাওয়াতে পারে না; দুধের বাটী দিলে, দুধ সেইভাবেই পড়ে থাকে; সমস্তক্ষণ তার চোখ দিয়ে হু হু ক'রে জল ঝরে। তিনদিন তার অনাহারে কেটে গেল।

চতুর্থদিনের দিন সকালে উঠে দেখা গেল যে, টেবির প্রাণহীন, নিস্পন্দ দেহ পড়ে রয়েছে; তার জলভরা চোখ দুটী যেন তারই প্রভুর পানে আকাশের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে। রেবার বড় আদরের সাথী টেবি আজ অনাহারে তার কাছে চলে গেল! বুঝি রেবা ছাড়া তার ইহজগতে কোন সাথী ছিল না; তাই সঙ্গীহারা, মৌন হ'য়ে সে থাকতে না পেরে তার প্রিয় সাথীর কাছেই চলে গেল।

সর্পদংশনের প্রতিষেধক

বর্ষাকাল আসিয়াছে এ ঋতুতে সর্পের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং কেহ কেহ সর্প দংশনে জীবন ত্যাগ করেন। তাই পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া উচিত। শ্বেত করবীর শিকর ধারণে সর্প ভয় থাকে না। সর্পে দংশন করিলে তৎক্ষণাৎ দ্রোণ পুষ্প (দণ্ড কলসী) গাছের পাতার রস কিঞ্চিৎ তালুতে দিবে এবং এক ড্রাম আন্দাজ রস সেবন করাইলে রোগী মরিতে পারে না। ঢাকা সাধনা ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম, এ, এফ, সি, এস (লণ্ডন) মহাশয় জানাইয়াছেন যে, 'আকন্দ' গাছের ডালেতে ছুরিদ্বারা আঘাত করিলে বা পাতার বোটা ছিড়িলে দুগ্ধের মত যে সাদা রস বাহির হয় তাহার অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ সর্পদষ্ট রোগীকে খাওয়াইলে ও যতটা সম্ভব পরিমাণ দষ্ট স্থানে প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিলে যে কোন বিষধর সর্পের বিষ অবসারিত হইয়া দষ্ট ব্যক্তি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইবে। তিনি বহু রোগীরদ্বারা পরীক্ষার পর ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। দেশবাসী একবার ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

নম্বর '৫৫৫'

শ্রীঅনিল কুমার মুখোপাধ্যায়

গল্প

রাত বারটা।…

প্রকাণ্ড জংসন ষ্টেশন—লাইনের ওপর লাইনের গোলক ধাঁধাঁ।…চারিদিকে আলো—লাল, সবুজ, সাদা। যেন মায়ারাজ্যের মায়াপুরী, দিনান্তে সহসা ভেসে উঠেছে।…

একটী আধা বয়সী ষ্টেশন মাষ্টার প্রকাণ্ড ঘরের এক কোণে চেয়ারে বসে ঢুলছেন—আর মাঝে মাঝে তাঁর ঘুমে ভরা চোখ দু'টো দেওয়ালে টাঙ্গানো বড় রেলওয়ে ঘড়িটার ওপর পড়ছে।……ঢং ঢং ক'রে বারটা বাজলো। আর পনর মিনিট পরে শেষ ট্রেণখানা এসে পঁহুছিলেই তাঁর ছুটী।…

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে ট্রেণ ছুটে আসার শব্দ আসে দূর থেকে। · মাষ্টার বাবু সজাগ হ'য়ে ওঠেন।… তকমা আঁটা মোটা কোট্‌টা আবার একবার তখন গায়ের ওপর ওঠে। কিছু পরেই নং ৫৫৫ গর্জ্জন করতে করতে প্লাটফর্ম্মে ঢুকে হঠাৎ থেমে গিয়ে হাঁপাতে থাকে। চারিদিকে সোরগোল পড়ে যায়—আর চোয়াড়ে চেহারা ছেঁড়া কোর্ত্তা পরা বৃদ্ধ গফুর মিঞা ইঞ্জিন থেকে তার ছোট লণ্ঠনটা হাতে করে নেমে আসে…

রাতের মত এ গাড়ী রোজ এখানেই থাকে।… গফুরের কয়লামাখা শির বেরনো মুখের ওপর একটা তৃপ্তির ছায়া ফুটে ওঠে।……বড় বড় দাঁত বার করে ষ্টেশন মাষ্টারকে সে সেলাম ঠোকে।· …সমস্ত দিন ছিল কাজের নেশায় মশগুল—এখন কার্য্যান্তের অবসরে একটী কচি মুখ চোখের সামনে তার ভেসে ওঠে।…… আজকের মত ছুটী……আবার কাল। ছোট লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে—ষ্টেশনের হদ্দা ছাড়িয়ে,—মাঠ পার হয়ে অদূরের বস্তির পথে পরিপূর্ণ অন্তর নিয়ে সে চলে।……

বৃদ্ধ গফুরের জীবনের শেষ পঞ্চাশটা বছর কেটেছে —লোহা-লক্কড়, ধোঁয়া—আগুনের সঙ্গে। পনর বছর বয়সে সে ঢোকে—ইঞ্জিনের ফায়ারম্যান হ'য়ে—এখন লোকাল ট্রেণের ড্রাইভার সে।·· আর জীবনের প্রায় শেষ সীমায় এসেও এ কাজে কোনদিন তার আলস্য নেই—অবসাদ নেই, ক্লান্তি নেই।…অসীম তৃপ্তি আর উৎসাহের সঙ্গেই সে তার জীবন-তরী একটানা বেয়ে চলেছে সম্মুখের দিকে।…কিন্তু পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও তার শরীর অপটু হয়নি। তার মত লম্বা, [illegible]কানো হাত, চওড়া কব্জি অনেক যুবকেরও নেই।·· কাজে সে যা সুখ পায় আর কিছুতেই বোধহয় তা পায় না।…রেলের সাহেবেরা যখন তার পিঠ চাপড়ে বলে,—"গফুর, তোমার মত বিশ্বাসী আর পাকা লোক আর হবে না।" তখন তার প্রাণ এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভ'রে ওঠে।· এইটুকুই তার সব। এর বেশী সে আর কিছু চায়ও না—আশাও করে না।—ইঞ্জিনের কাজ ছাড়বার কথা সে কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। '৫৫৫' এর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হবার কথা মনে হলেই বৃদ্ধের সকল আনন্দ, সকল উৎসাহ নিমেষে যেন নিভে যায়।… '৫৫৫' এর হাতলে অপর একজন যে এসে হাত দেবে— এ সে কোনমতেই সহ্য করতে পারবে না। '৫৫৫' যে তারই শুধু।…তার প্রত্যেক খোঁজখাঁজ—প্রত্যেক কল কব্জা—প্রত্যেক প্রীংটুকু পর্য্যন্ত যে তার একান্ত পরিচিত। "৫৫৫" ই তার জীবনের সম্বল …

বিবাহ হোয়েছিল তা স্বপ্নের মত মনে পড়ে।…তখন তার বয়স মাত্র উনিশ।…তারপর একটী পুত্রের জন্ম দিয়ে আমিনা বিবি ওপারের ডাকে চ'লে যায়।…রহমত এখন যুবা। তার বিবাহও হ'য়েছে; গফুর একটী ফুটফুটে

নাতিরও মুখ দেখেছে।…গফুর রহমতকেও ঢুকিয়ে নিয়েচে রেলেরই কাজে।…তার ইচ্ছে দাদুটীও তার রেলেরই কাজ শেখে।…গফুরের বাইরের সম্বল ৫৫৫ আর ঘরের সম্বল এই পাঁচ বছরের দাদুটী।…বৃদ্ধের অবসর সময়টুকু কাটে দাদুটীর সঙ্গে রেলের গল্প করে।… এ রকম উৎসাহী ও ধৈর্য্যশালী শ্রোতা সে আর পায়না। হাঁটুর উপর বসিয়ে—হাত নেড়ে কত কথা গফুর তাকে বলে যায়।…পাঁচ বছরের ছেলে,—শুনতে শুনতে ঠাকুরদাদার গলা জড়িয়ে—কখন খিল্‌খিলিয়ে হেসে উঠে—আবার কখন বা অবাক হয়ে শোনে—বৃদ্ধের পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতার কথা।…

প্রত্যেক বছরেই শীতকালে গফুর ছুটী পায় তিরিশটী দিন। এবারেও পেয়েছে।…শীতের কনকনে সন্ধ্যাটা তার কাটে আগুনের ধারে বসে বস্তির আর পাঁচজনের সঙ্গে রেলের গল্প ক'রে।। গল্প করতে করতে তার জীর্ণ মুখে চোখে একটা অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফুটে উঠে।… হাত মুখ নেড়ে সে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার গল্প বলে যায়। কোন সময়ে হয়তো তাদের কাছ থেকে একটু উৎসাহ পায়-আবার কখন বা তারা এই একঘেয়ে গল্প তার শুনতেও চায় না।..অন্তরালে কেউ বলে, বাচাল—কেউ বলে, পাগল।…

সেদিন সকাল থেকেই আকাশ কুয়াসায় ঢাকা ছিল। আর মাঝে মাঝে ঝুর ঝুর করে দু-এক পশলা বৃষ্টিও ঝরছিল।…বস্তির সকল পুরুষই কাজে বেরিয়েচে—কেউ কলে—কেউ রেলে—কেউ নূতন পোলের মাটী কাটতে।…আছে গফুরই কেবল একা।…আজিকার বাইরের আবহাওয়াটার সঙ্গে তার মনের ভিতরকার আবহাওয়াটা একেবারেই একাকার হোয়ে পড়েছিল।… থেকে থেকে একটা অজানা ব্যথার সুর তার হৃদয়ের তারে ঝঙ্কার দিয়ে একটা বে-সুরো গৎ বাজাচ্ছিল।…অতীত দিনের হাঁসি-কান্নার ছোট-বড় অনেক কথাই আজ তার মনের পর্দ্দায় একটীর পর একটী এসে উদয় হচ্ছিল।… কুয়াসার ভিতরে ভিতরে সূর্য্যদেবকে তাড়িয়ে দিয়ে সন্ধ্যারাণী কখন যে তাঁর আসন নিয়েচেন-একথা গফুরের খেয়ালই ছিল না—চমক ভাঙ্গলে দূরের পাট কলের ছুটীর বাঁশীর ক্ষীণ আওয়াজ বাতাসে ভেসে এসে কাণে ঢুকতে।…

ক্রমে ক্রমে দুপুরের শূন্য বস্তিগুলি আবার গুলজার হয়ে উঠলো।…কিন্তু রাত অনেক হ'ল তবু রহমত—আর ফেরে না। বস্তিতে খবর নেওয়া হ'ল, সকলেই এসেছে।—রহমত? কই রহমতকে ত তারা দেখে নাই।…ক্রমে রাত গভীর হয়ে উঠলো।…গফুরের শক্ত অন্তঃকরণটাকেও একটা অজানা ভয় এসে কাঁপিয়ে দিতে লাগলো।…

রাত প্রায় শেষাশেষির সময়—অদূরে একটা সোরগোল শুনতে পাওয়া গেল।…গফুর উৎকর্ণ হ'য়ে—শোনে ভিড়ের ভেতর তার নাম শোনা যায়।……. আগড় ঠেলে ছুটে গিয়ে দেখে রেলের লোক।…… তারা বললে,—"মিঞা, যেতে হবে তোমায় এক্ষুণি—ইষ্টিসানে,—ছেলে তোমার ডাউন ট্রেণের তলায়……

সাহেনা আছাড় খেয়ে পড়ল—গফুর শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইল।…দাদু কিছুই বুঝতে পারলে না—না বুঝেই সে কাঁদতে লাগলো।…

মাসখানেক পরে ছেলেটাকে বুকে ক'রে সাহেনা চলে গেল তার বাপের বাড়ী—বৃদ্ধের ছোঁয়াচ থেকে ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্য। বুড়োই নাকি রহমতকে মেরে ফেলেছে—সেই ত রেলের কাজে ঢুকিয়েছিল তাকে।…নইলে কি রহমত আজ এমন ক'রে ইঞ্জিনের তলায় ..

সাহেনার যাবার দিন গফুর দাঁড়িয়ে রইল—পাথরের মূর্ত্তিটীর মত তার দাদুটীর দিকে চেয়ে,—একটি কথাও মুখ থেকে বেরুল না; কোন আবেদন নয়, কোন নালিশ নয়—এক ফোঁটা চোখের জলও বোধ হয় শুষ্ক গণ্ড বেয়ে তার গড়িয়ে পড়ল না!…

সকলেই গফুরকে ছেড়ে গেছে—এমন কি তার দাদুও। সেই জন্যে সে তার ইঞ্জিনখানাকে আরও বেশী ক'রে যেন আঁকড়ে ধরলে।…ভাবে এও যদি রহমতের মত, তার দাদুর মত হঠাৎ কোনদিন ফাঁকী দিয়ে পালায়!—

কিন্তু আগেকার গফুরের সঙ্গে আজকালকার গফুরের অনেক তফাৎ হ'য়ে গেছে।…আগেকার মত আনন্দ উৎসাহে কাজ কর্ত্তে সে পারে না। চেষ্টা ক'রে, জোর করে—মনটাকে মিশিয়ে দিতে চায়—লোহা-লক্কড়ের মধ্যে।..কিন্তু সব ঠেলে সামনে ভেসে ওঠে একখানি

কচি মুখ।...যেন তার গলা জড়িয়ে,—টানাটানি—ক'রে বলছে,—"দাদু তারপর ?"

ইঞ্জিন ছোটে তার নিত্যকার ছোটার পথে।—আর শূন্য দৃষ্টিতে গফুর বসে থাকে তার হাতল ধ'রে।...বসে ব'সে কি সব আকাশ-পাতাল ভাবে।...একদিকে বন, প্রান্তর, ঝোপ-ঝাড়, নদী-নালা অতিক্রম ক'রে '৫৫৫' ছুটে চ'লে উদ্দাম গতিতে।...আর একদিকে শত শত আরোহীর জীবনকাঠি হাতে নিয়ে গফুর বসে বসে ভাবে।...ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ পরে এক একবার সে খালি চমকে ওঠে।...তখন গফুরের হাত অবশ হোয়ে আসে—হঠাৎ চোখে—অশ্রুর বন্যা নেমে আসে।...চারিদিক ঝাপ্‌সা দেখে।...বাইরের সূচীভেদ্য অন্ধকার ভেদ ক'রে কিছু আর সে দেখতে পায় না।..পঞ্চাশ বছরের পরিচিত রাস্তাটাই তখন একেবারে তার অপরিচিত বলে মনে হয়।—

হঠাৎ সেদিন গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে চোখের সামনে নিমেষে ভেসে উঠলো দু'—দুটো লাল সাঙ্কেতিক আলো। একেবারে সামনা-সামনি।...গফুরের মাথা ঘুরে বুক কেঁপে উঠলো।...সেই সাঁকোটা...বোধ হয়—আবার ভেঙ্গেছে।...শরীরের সমস্ত শক্তি এক কোরে সে ইঞ্জিনের ব্রেক চেপে ধরলে।...কিন্তু তার আগেই কাজ শেষ।...

দুর্ঘটনার পর গফুর হাঁসপাতালে।...সেইখানেই খবর পেলে যে—তার কাজ গিয়েছে। অপরাধ গুরুতর। পুরানো চাকর বলেই তাই—নইলে বড় রকমের অন্য কিছু একটা শাস্তিই হয়তো হোয়ে যেত।...শুনে বৃদ্ধের জরাজীর্ণ শরীরটা খালি একটু কেঁপে উঠলো—চোখের কোণে এক ফোঁটা জলও বোধ হয় বা এসে জমলো কিন্তু আর কিছু নয়।..

* * * *

হাঁসপাতাল থেকে যেদিন গফুর তার ক্ষীণ দেহটাকে টেনে নিয়ে বাইরের মাটিতে পা দিলে সেদিন তার মনে হ'ল—পৃথিবীটা যেন একেবারে বদলে গেছে।...ধীরে ধীরে সন্ধ্যার আঁধারে তার শূন্য কুটীরের প্রাঙ্গণে এসে সে দাঁড়ালো।...দু'টো শেয়াল পায়ের শব্দে ছুটে পালিয়ে গেল। কি মনে ক'রে সে বেরিয়ে আবার এক পা এক পা ক'রে প্রকাণ্ড রেলওয়ে কারখানাটার ধারে এসে দাঁড়ালে। উৎসুক চোখ দু'টো ভিতরে কি যেন অনুসন্ধান করতে লাগলো।...হঠাৎ এক যায়গায়—তার চোখ দু'টো পড়ে স্থির হ'য়ে রইলো।—অত্যুজ্জ্বল বিজলী বাতির আলোয় সে দেখলে, তার আদরের ভাঙ্গা ৫৫৫কে আবার নূতন ক'রে সংস্কার করা হোয়েছে এবং আর একজন নব নিযুক্ত চালক ফুল্ল মনে—তার কলকব্জা পরীক্ষা করছে।...

গফুর বাহিরে এসে অন্ধকারের মধ্যে এক স্থানে বসে পড়ল।...

স্মৃতি

শ্রীসুবাসিনীবালা বসু

চিত্র

পল্লীর বুকে আঁকাবাঁকা পথের পাশে একখানা ভাঙ্গা দোতলা বাড়ী, ঝোপে ঢাকা জঙ্গলে ঘেরা। নানান রকম গাছ তার দেহে শিকড় গেড়ে, আকাশের বুকে মাথা উঁচু করে কত যুগযুগান্তর হতে দাঁড়িয়ে আছে এম্‌নি করে। দিনে বাদুড় চামচিকে ও পেঁচার বাথান। রাতে শিয়াল ডাকে। বাড়ীটা সচরাচর পথিকের চোখে পড়ে না।

এ বাড়ীতে বাস করে একজন বৃদ্ধা।

বয়েস তার অনেক। তার জীবনের উপর দিয়ে কত ঘাতপ্রতিঘাত চলে গেছে, রঙ্গিন বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ একে একে নিজনিজ ক্ষমতা বিস্তার করে চলে গেছে। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে হেমন্তের কুহেলিকায় জীর্ণ মনপ্রাণকে ধরে বসে আছে শীতের প্রতীক্ষায়।

গভীর রাতে শিয়ালের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে যায়। সমস্ত রাতে আর ঘুম আসে না। সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাল্য, কৈশোর, যৌবনের ম্লান স্মৃতি-গুলি ভেসে ওঠে মনের জীর্ণ মন্দিরে সুদূর স্বপনের মত। ভাবে যা চলে গেছে তা কি আর ফিরে আসে না?

মনে পড়ে তরুণ-যৌবনে একজনের হাত ধরে, শঙ্খ ও হুলুধ্বনির মাঝে এই গৃহে প্রবেশ। দু'টি বৎসর সেই লোকটির উপর অকারণে কান্নাহাসি, অযথা মানাভিমান। আবোল-তাবোল বাজে কথা। তারপর নবাগতের আগমনে সে কি আনন্দ। ধীরে ধীরে সংসারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়া। শ্বশুর-শাশুড়ীর মৃত্যু। সংসারে একেশ্বরী কর্ত্রীত্ব।

পুত্র-কন্যার বিবাহ। কত উৎসব রজনী একে একে চলে গেছে।

তারপর প্রিয়তম সঙ্গীর মৃত্যু। সে কি বিষাদময়ী রজনী।

* * * *

পুত্রগণ আজ বিদেশে।

মার খোঁজখবর বড় রাখে না। মা কিন্তু পাড়ার ছেলেদের ধরে চিঠি লেখায়। বলে লেখ, এবার পূজার সময় বাড়ী আসতে।

অনেকদিন উত্তর আসে না। কখন যদি আসে লেখা থাকে,—অফিসের কাজের এত ভীড় যে, চিঠি লিখবার সময় নেই। বাড়ী যাওয়া হবে না; গেলেই তো ম্যালেরিয়া ধরবে। তার চেয়ে না যাওয়া ভাল। আবার অন্য আর একজন লেখে, এবার আমরা পূজার সময় গিরিডিতে বেড়াতে যাবো। আর তোমার বৌমার শরীরটাও তত ভাল নেই।

বৃদ্ধার দুচোখ বেয়ে জল আসে। পুত্রের অমঙ্গলের ভয়ে তাড়াতাড়ি আঁচলে মুছে ফেলে। মনে মনে বলে আহা তাই যাক্—তাতে যদি তারা আনন্দে থাকে তাই যাক্।

কন্যারা সব সংসার নিয়ে ব্যস্ত, কেমন করে আসে।

দীর্ঘনিশ্বাসে পাঁজরা ভেঙে যায়।

সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালে। কিন্তু মনের প্রদীপ আর জ্বলে না। যতটা পারে ঘুরে ঘুরে সমস্ত বাড়ীটায় প্রদীপ দেখায়। এযে তার স্বামীর ভিটে, তার যে তীর্থস্থান। নিজের দিকে দৃষ্টি পড়ে, শিউরে ওঠে ভাবে সেই কি আমি এই।

* * * *

আহ্নিকে বসে।

কিন্তু সমস্ত প্রাণ জুড়ে সেই স্মৃতি। চমকে ওঠে। যেন শুনতে পায়, এক বালিকা ভীতকণ্ঠে বলছে, দেখ মা, ছোড়দা আমায় মারছে।

বৃদ্ধা চীৎকার করে ওঠে, এই ধীরেন আবার লীলাকে মারছিস্?

তারপর একটা বালিকাকে দৌড়ে পলাতে দেখে পশ্চাতে একটা বালক।

মালা হাতেই থেকে যায়। বৃদ্ধা উঠে দাঁড়ায় আকুল আগ্রহে, হস্ত প্রসারিত করে কাকে যেন বুকে চেপে ধরবার জন্য ছুটে যায়। দেওয়ালে আঘাত পেয়ে চৈতন্য ফিরে আসে। অন্তরাত্মা হাহাকারে কেঁদে ওঠে। মাটিতে লুটিয়ে কাঁদে, মনে পড়ে তাকে তো কত দিন কেউ মা বলে ডাকেনি।

থেকে থেকে সুদীর্ঘ-নিশ্বাসের সঙ্গে প্রাণ আকুল উচ্ছ্বাসে প্রশ্ন করে ওঠে শুধু

আরো-আরো-কতদূর!

এই দুর্ব্বিসহ বোঝা নেমে যাবে, সমস্ত ক্লান্তি ভরা বেদনার সমাধি হবে সে শুভ মাহেন্দ্র যোগ—

আরো-আরো-কতদূর!

মাটির ধরণী

শ্রীবিজয় মাধব মণ্ডল সাহিত্য সরস্বতী বি.এ

বিচিত্র সঙ্গীত ময়ী, আলোছায়া ভরা,—
এই নাকি ব্যথা-ময়ী ধরা!
হৃদি-হীন বিধাতার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস,
রুদ্র-অভিশাপ-সম ভরি এর আকাশ বাতাস,
ফিরে নাকি এরি বুকে শ্বসিয়া শ্বসিয়া
হাহাকারে দশদিক মুখর করিয়া!

তারা বুঝি দেখেনি এ ধরণীর মোহিনী মূরতি!
সুললিত শ্রুতি
শোনেনি সঙ্গীত তার,—ছন্দোময়ী আনন্দের বাণী
জীবনের পূর্ণ পাত্র খানি
তুলিয়া ধরেনি বুঝি কোনো দিন প্রাণের নেশায়
তৃষাতুর অধর-রেখায়!

এই এর মাটি—
এ-যে নিজ রূপে রসে পড়িতেছে ফাটি
কুসুমে পল্লবে,—নীল দিগন্ত-বিসার
তৃণাস্তীর্ণ প্রান্তর মাঝার!

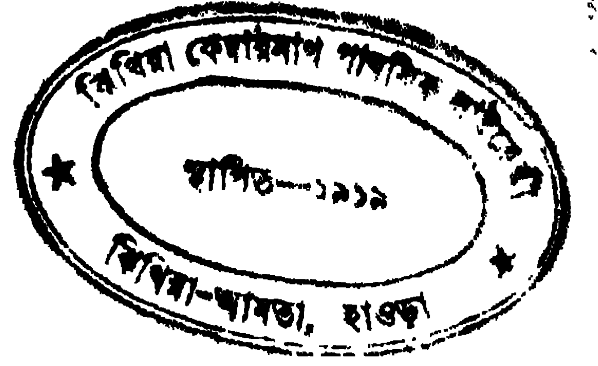
এরি পাষাণের বুক ধূসর বন্ধুর,
ভেদিয়া যে নামে নিত্য সুধাদ্রব সঙ্গীতের সুর
উপলে উপলে তার নৃত্য-তালে মঞ্জীর শিঞ্জনে
অশ্রান্ত-আনন্দ গানে,—পুলকের অসহ স্পন্দনে!

বজ্রগর্ভ এরি মেঘ মালা
বুকে নিয়ে বিজলীর তীব্র বহ্নিজ্বালা
ফিরে কে গভীর কণ্ঠে গান গেয়ে গগনে গগনে,-
পুলকাশ্রু-পূর্ণ দুনয়নে!
তালীবনে বর্ষানামে,—ঝর ঝর ঝর!
লতিকা শিহরি উঠে আনন্দের পরশ-কাতর;

সর্ব্ব হারা
বালুকা কঙ্করাকীর্ণা এরি মরু ধূসর সাহারা
আনন্দের রচে ইন্দ্রজাল—
মরিচীকা হেসে উঠে বক্ষে তার বালুকা বিশাল!
কি প্রচণ্ড আনন্দের সুরের সংঘাত
জাগায় বিচিত্র ছন্দে প্রাণে কত সৃষ্টির প্রভাত!

* * *

এই যদি ব্যথাময়ী ধরা—
তোমরা মাগিয়া লও তোমাদের তৃপ্তি শান্তিভরা
সুখ-স্পর্শ, কল্পলোক, মন্দাকিনী—আনন্দনির্ঝর
কল্পবৃক্ষ, সুখের আকর।
ধূসর বরণী—
এ ধরণী, মাটির ধরণী—
এই মোর ভালো,
এরি বুকে, এরি প্রেমে জ্বলেছিল জীবনের আলো।



পথের আলো

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

গল্প

প্রমোদ কুমার রায় ওরফে পি, কে, রায়, বালুরঘাটের উকীল। সবে বছর পাঁচক হইল ইউনিভার্সিটীর সিঁড়ী পার হইয়াই বালুরঘাটে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছে। স্থানীয় বারে উকীল হিসাবে তাহার নাম যতটুকু থাকুক আর নাই থাকুক, তাহার চাইতে বেশী নাম ছিল তাঁর স্বদেশ প্রেমিকতায়—সে একজন আদর্শ যুবক বলিয়া। কুড়ি বৎসর বয়সে প্রমোদ পিতামাতা হারাইয়াছে। একমাত্র জ্যেষ্ঠ সহোদর কলিকাতার কোন এক মার্চেন্ট অফিসের দুইশত টাকা বেতনের বাবু—কেরানী নন্।

ইউনিভার্সিটীর সিঁড়ি পার হইতে না হইতেই প্রমোদের সহিত নমিতার সাক্ষাৎ হয়। নমিতা প্রমোদের স্ত্রী—বর্ত্তমানে বালুরঘাটের বাসার গৃহিণী। নমিতা ষোড়শী, মৃগনয়না, স্থকেশা · গায়ের রঙও ফর্সা;—একেবারে বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা বা কুন্দের মত কল্প রূপসী না হইলেও সুন্দরী! আর তাহাকে সুন্দরী বলিলে সব চাইতে অধিক আনন্দ গর্ব্ব হইত প্রমোদের।...

প্রমোদ, উকীল হইলেও আপ্-টু-ডেট্ যুবক—তারুণ্যের ভক্ত। সে চাহিয়াছিল, তাহার স্ত্রীকে নম্র বিনয়ী—আধুনিক মতে আইডিয়াল লেডী করিয়া তুলিতে। নানা সভা সমিতিতে নমিতাকে অনেক সময় লইয়া যাইত। আর নমিতা ও ভাবিয়াছিল, স্বামীকে নিজের বশে রাখিয়া তাহার নারীত্বকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিবে—স্বামীর মত সেও চাহিয়াছিল, তাহার সুপ্ত স্বাধীন বাসনার পূর্ণ জাগরণ।

তখন আইন অমান্য আন্দোলন পূর্ণমাত্রায় চলিয়াছে। সাধারণ লোকে সিগারেট—স্থানবিশেষে বিলাতী কাপড়ও—বর্জ্জন করিয়াছে। যে পারিয়াছে সম্পূর্ণ স্বদেশী হইয়াছে; কেহবা পারিয়াছে এই সুযোগে খদ্দর পরিয়া অধিকতর ভদ্র হইয়াছে—অবশ্য গোপনে সিগারেট-সেন্টের শ্রাদ্ধ করিয়াই।

এমনি একদিনে প্রমোদকে অসময়ে কোর্ট হইতে বাসায় ফিরিতে দেখিয়া নমিতা বলিল,—"আজ যে এক্ষুনি বড়............"

"তোমারই টানে"

—নমিতা মুখ গম্ভীর করিয়া বাইরের বারাণ্ডার দিকটায় তাকাইল।

প্রমোদ বলিল,—"বিশ্বাস হ'লনা বুঝি নমিতা!"

"হবে না কেন........."

"—নমিতা!"

"কেন?"

"ব'লছি যে, আজ তোমাদেরই মত কত গৃহলক্ষ্মী কোর্টে এসে পিকেটিং ক'চ্ছেন;—কিছুতেই কাছারীতে ঢুকতে পেলাম না।..... ...কি ক'রে আজ আর কোর্টে যাই বল?"

"তাদের আবার এমন ক'রে কপাল পুড়লো কেন?"

"—নমিতা!.........কি ব'লছো?"

"ব'লছি, তাদের স্বামীগুলোকে ঘরের বার ক'রে দিয়ে তারা মর্দ্দানী ক'ত্তে বেরুলো কি দুঃখে?"

বিস্ময়ে লজ্জায় প্রমোদের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল।

নমিতা বিদ্রূপ কণ্ঠে কহিল,—"কি দেখ্ছো?......আমাকেও নিয়ে গিয়ে পথে দাঁড় করাবে নাকি?"

"দরকার হ'লে আজই........"

"—থাক্ থাক্.........একটুও লজ্জা ক'রলনা ব'লতে? ....আজ নিজের বৌকে, শেষে মা-বোন্‌কে ঘরের বার ক'রে মুখ উজ্জ্বল কর্ব্বে নাকি?"

"ছি!....... নমিতা, তুমি না শিক্ষিতা! তুমি না আমাদের কুললক্ষ্মী!"

"কুললক্ষ্মী বটে;—কিন্তু তোমাদের এই বদ্‌জাতির পথ-লক্ষ্মী নয়!"

একি যা তা বল নমিতা!"

"বলছি, তোমাদের মত পুরুষের কথা!············
এদের পুরুষেরা কি যে·········"

প্রমোদ কি যেন বলিতে চাহিতেছিল—বলিতে পারিল না। বিস্ময়ে ক্ষোভে আপনা হইতেই তাহার মাথা নত হইয়া আসিল। আত্মস্থ হইয়া একবার নমিতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। পর মুহূর্ত্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া কোথায় গেল, কেহই দেখিল না।

লবণ আইন অমান্য করিয়া স্থানীয় বহু যুবক সসম্মানে রাজদ্বারের অতিথি হইয়াছে। দেশময় তখন—"আইন অমান্য কর, আইন অমান্য কর—অসহযোগের পথে অগ্রসর হও"—কলরবে একটা বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রমোদ কুমার কোন্ আইন অমান্য করিবে স্থির করিতে না পারিয়া সহসা কোর্টে যাওয়া বন্ধ করিল এবং বাসায় স্ত্রী-আইনের কূট তর্ক আরম্ভ করিল—স্ত্রী নমিতার সঙ্গে।

যেদিন প্রমোদ কোর্টে যাওয়া বন্ধ করিল সেদিন নমিতা কিছুই খাইল না—বিছানা হইতে উঠিল না। পরদিন বিছানা হইতে উঠিল বটে কিন্তু কিছুই খাইল না। এমনি করিয়া কয়েকদিন হইতে ভাবী অশুভ ঘটনার সূচনায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা ব্যবধানের প্রাচীর গড়িয়া উঠিতেছিল।

স্থানীয় আইন অমান্য পরিষদের চতুর্থ দলের অধ্যক্ষের নাম করা হইল—পি, কে, রায়। প্রমোদও এই উৎসাহী মৃত্যু-কল্প যুবকদের আহ্বান অগ্রাহ্য করিতে পারিল না—করিবার বিশেষ কারণও তখন সম্মুখে দেখিতে পায় নাই। আত্মীয়-স্বজন এমন কী স্ত্রীর নিষেধ সত্ত্বেও স্বেচ্ছাসেবকদলের অধ্যক্ষ পদগ্রহণ করিয়া আইন অমান্যে যোগ দিল। পূর্ব্ব হইতেই তাহার ইচ্ছা ছিল, দেশের দশের, এই পরাধীন জাতির একটা কিছু করিবে। কিন্তু এতদিন স্ত্রী-আইনের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকিয়া তাহাকে সে সংকল্প হইতে বিচ্যুত হইতে হইয়াছিল, আজ সেই সুযোগ আসিল—সে স্থানীয় আইন অমান্য পরিষদের প্রধান স্বেচ্ছাসেবক—চতুর্থ বাহিনীর অন্যতম অধ্যক্ষ।

বিদেশে স্বামীর হাতে পড়িয়া এতটা হইবে নমিতা তাহা পূর্ব্বে কখনও ভাবে নাই। কলিকাতায় বাপের বাড়ীতে বাবা নাই। ভাইদের চিঠি লিখিল, তাহাকে ওখান হইতে লইয়া যাইবার জন্য—কিন্তু চিঠির জবাব আসিল না।··ভাইরাও লক্ষ্মীছাড়া—ঘরের লক্ষ্মী ছাড়িয়া—মুখে আগুন—স্বরাজের হুজুকে পথে পথে কখনও দ্বারে দ্বারে ধন্না দিতেছে।

চতুর্থ দলের লবণ আইন অমান্য চলিতে লাগিল,—সঙ্গে সঙ্গে পাগ্‌লা গাঁধীর হুজুকে বাচ্চা-পোষা গৃহস্থের সযত্ন রক্ষিত তালগাছগুলিও রহিল না। পুলিশ আসিয়া শান্তি-স্থাপনের জন্য নুনের হাঁড়ি ভাঙ্গে—কখনও হাড় ভাঙ্গে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই লক্ষ্মীছাড়ার দল! হাড় ভাঙ্গাতেও হাঁড়ি ছাড়িল না—লক্ষ আঘাতেও লক্ষ্যহারা হয় না।

স্বেচ্ছাসেবক দলের এই আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা এবং আইন অমান্য অপরাধে শীঘ্রই তাহাদিগকে রাজদ্বারের অতিথি হইতে হইল। কাহারও এক মাস, কাহারও কাহারও দুই মাস, আড়াই মাসও আতিথেয়তার বন্দোবস্ত হইল। এদের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ—পালের গোদা—প্রমোদ রায়ের হইল পূর্ণ তিন মাস।

দুই

একাধিক্রমে তিন মাস বাপের বাড়ীতে পড়িয়া থাকা নমিতার কিছুতেই ভাল লাগিতেছিল না। অধৈর্য্য হইয়া একবার অভিশাপ দেয় গান্ধীজীকে—একবার দেয় দেশের এই বয়াটে ছেলেগুলাকে··· স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া ইহারা আকাট মূর্খ হইবে নাকি? দেশ-নেতাদের প্রশংসায় বলে, "নেতা নয়তো—আঁস্তাকুড়ের ন্যাতা!"—এই নমিতাই শিক্ষিতা···উচ্চ শিক্ষিতা—বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব্ব scholar! এই নমিতাই চাহিয়াছিল একদিন তাহার নারীত্বকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে।

সত্যই নমিতা নারীত্বকে বুঝিয়াছিল, চিনিয়াছিল—মাতৃত্বের মহান্ আদর্শকে উপেক্ষা করিয়াই। নারীত্বে এবং মাতৃত্বে কোথায় সাদৃশ্য, কোথায় পার্থক্য—এই দুইএর মিলনে কী স্বর্গীয় ভাবের সৃষ্টি হয়, তাহা বুঝিলে নমিতা নারী স্বেচ্ছাসেবিকাগণকে পথলক্ষ্মী বলিয়া ঘৃণা করিত না—উপহাস করিত না, মা হওয়ার যে কী সুখ,

কত যাতনা, কী লোভ—কত দায়ীত্ব তাহা বুঝিয়াছে যাহারা গৃহলক্ষ্মী ও পথলক্ষ্মী দুইই।

যৌবনের প্রথম স্পর্শেই নমিতার জীবনে এতটা হইয়া গেল, তবুও সে মনে করে, স্বামীকে হাতে পাইলে এতটা হইতে দিত না—অন্ততঃ রাজার অতিথির পরিবর্ত্তে তাহারই একনিষ্ঠ উপাসক করিয়া রাখিত। সে এক মুহূর্ত্তও ভাবেনা স্বামী তাহাকে এই কয় বৎসর হাতে পাইয়াই বা কত কী করিলেন।

ক্ষণিকের উন্মাদনায় সে নিজেকে কৃত্রিম বিদ্রোহী করিয়া তোলে,—ভাবে, একটা পুরুষের ইঙ্গিতে দেশের এই শোচনীয়, লজ্জাজনক অবস্থায় নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিয়া ঠিক করিয়াছে!......

বর্ষার এক বাদল উদাস সন্ধ্যায় নমিতা পিতৃগৃহে দোতালার বারান্দায় দাঁড়াইয়া অস্তোন্মুখ সূর্য্যেরও ভাঙ্গা ভাঙ্গা কয়েকটা রং-বেরংএর মেঘের সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল। ঠিক সৌন্দর্য্য নয়—কী যেন ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা তার চোখে। প্রদোষে ঝিল্লীর ঝিঁ, ঝিঁ রব তাহার কাণে অস্বস্তি উৎপাদন করিতেছিল। ঘরে আসিয়া আল্‌মারী হইতে রবীন্দ্রনাথের একখানি অতি আধুনিক উপন্যাস বাহির করিল এবং খাটের উপর শুইয়া, পড়িতে লাগিল। রবীবাবুর উপন্যাস ভাল লাগিল না, বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পড়িবার পর "ভারী কল্যাণী চরিত্র এঁকেছেন বঙ্কিমবাবু"—বলিয়া বইখানি বন্ধ করিয়া রাখিল; আনন্দমঠ আনন্দ দিতে পারিল না।

খাওয়া-দাওয়ার পর নমিতার বড় বৌদি শৈল ঘরে আসিয়া কহিল, "কী গো, দিন গুণ্‌ছো নাকি?"

"—ব'য়ে গেছে আমার দিন গুণবার? কত মজা, জেলখেটে, দেখুন না এইবার!......গান্ধী কবে যে মর্ব্বে বৌদি।"

"—ও কথা ব'লনা ঠাকুরঝি!......যার নামে আজ ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত......যাঁকে দেখবার জন্যে কোটী কোটী লোক আকুল, যিনি"—

"রেখে দাও তোমার বক্তৃতা,......হ্যাঁ সবই হ'য়েছে, এখন পাগ্‌লা গাঁধী স্বর্গে তুলে দেবে সবাইকে।.. কী যে খেয়াল তোমাদের..."

শৈলজায়া কিছুতেই এতদিনে এই মেয়েটাকে চিনিতে পারে নাই। স্ত্রীলোকেরা নিজেদের সুখে দুঃখ—দৈনন্দিন ঘটনাবলী পর পর আলোচনা করিয়া থাকে কিন্তু কী আশ্চর্য্য মেয়ে এই নমিতা! কলিকাতায় আসা অবধি যেন কী হইয়াছে তার!...কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে গেলে প্রথমেই প্রকাশ করিতে চায় তাহার সমান শিক্ষিতা দেশে ঘরে আর দুইটী নাই।

ছোট বৌদি নীহার প্রায় নমিতার সমবয়সী। নীহারের স্বামী—নমিতার ছোটদাদা—কলিকাতার কোন এক বে-সরকারী কলেজের প্রফেসর। নীহার উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত না হইলেও বাঙ্গালী ঘরের মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী—স্বামী-দেবতার পায়ে আত্মসমর্পণ করিতে হয়—তাঁহার আত্মীয় পরিজনবর্গের প্রিয় হইতে হয় ইহাই সে ভাল বুঝিয়াছিল। স্বামীকে দেবতার মত ভক্তি করে সে—বন্ধুর মত ভালবাসে। নীহারের স্বামী সমীরও স্ত্রীকে বাঙ্গালী ঘরের আদর্শ বধূ করিতে চান—এই লক্ষ্মী প্রতিমা যেন তাঁহাদের সংসার চিরদিন আলো করিয়া রাখে।

পরদিন প্রাতে—

সকালে ভিতর বাড়ীতে সকলের মধ্যে আলোচনা হইতেছিল, কারাবন্দী প্রমোদ কুমার সম্বন্ধে—আর আলোচনাটা বিশেষ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল, সম্মুখে নমিতাকে দেখিয়া - তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই।

কথা প্রসঙ্গে ছোট বৌ নীহার নমিতাকে কহিল,—"ঠাকুরঝি, দেখেছ আজকের খবরের কাগজে লিখ্‌ছে, জামাইবাবু দুই এক দিনের মধ্যেই জেল থেকে বেরুবেন,—তাঁর শরীরও তত ভাল না।"

ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত গর্জ্জিয়া নমিতা কহিল,

"—তা আমাকে শুনিয়ে কী লাভ?......আমি এগিয়ে গিয়ে তাঁর স্বরাজ ব'য়ে নিয়ে আস্‌বো নাকি?... পোড়া কপাল আর কী!..."

"রাগ্‌ছো কেন?...এত' ভাল কথা,......তুমি তাঁর স্ত্রী তাঁর আসায় কত আমোদ-আহ্লাদ ক'র্ব্বে;..... আমরাই লোকের কাছে তাঁর আদর্শের কথা বলি, মনটা কত উঁচু হয়;—তুমি ত তাঁর স্ত্রী!

নমিতার মনটা হঠাৎ দুলিয়া উঠিল, কথার জবাব না দিয়া সেস্থান হইতে চলিয়া গেল। সকলেই অবাক্ হইয়া উহার দিকে তাকাইয়া থাকে, বলে—'মেয়েটা কী!'

তিন

শ্রাবণের শেষে একদিন প্রমোদ প্রেসিডেন্সী জেল হইতে মুক্ত হইয়া সিমলা ষ্ট্রীটে ভাইএর বাসায় আসিল। আত্মীয় অনাত্মীয় সকলেই প্রমোদকে পাইয়া খুবই গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিল। প্রমোদের শ্বশুরালয়ের সকলেই একে একে আসিয়া প্রমোদকে অভিনন্দিত করিয়া গেল,—আসিল না শুধু নমিতা; বৌদিরা তাহাকে অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াছে কিন্তু গর্ব্বিতা নমিতা বসিয়া আছে, স্বামীর অপেক্ষায় নিজ বাপের বাড়ীতে। সে ভাবিয়াছে, স্বামী আগে আসিয়াই তাহার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন—এ বয়সে মান-ভঞ্জন মন্দ লাগিবে না। কিন্তু তাহা হইল না ;—নমিতার গর্ব্ব অভিমান যেন দিন দিন বাড়ীয়াই চলিল, প্রমোদ জেল হইতে ভাইয়ের বাসায় ফিরিয়াছে শুনিয়া।

শ্যালক এবং শ্যালকবধূদের অনুরোধে প্রমোদ একদিন শ্বশুর বাড়ী যাইতে স্বীকৃত হইয়াছিল কিন্তু তাহা ভাগ্যচক্রে ঘটিয়া উঠিল কই ?……সকলের নিষেধ, অনুরোধ, উপরোধ স্বত্বেও সেই অসুস্থ শরীর লইয়া আবার ছুটিয়া চলিল পূর্ব্ববঙ্গের কোনও এক দাঙ্গা-হাঙ্গামায়।

সিমলা ষ্ট্রীটে ভ্রাতা সতীশের বাসায় থাকিতে কিছুই যেন প্রমোদের আর পূর্ব্বের মত ভাল লাগিত না ; দিবারাত্র শুধুই ভাবিত, বালুরঘাটের কয়েকটা দিনের কথা ! মনে পড়িত, তাহার সেই দুপুরের কথা—নমিতার সহিত সেই বাদ বা প্রতিবাদ। তারপর আর নমিতার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। কখনও কখনও ভাবে এইবার বোধ হয় নমিতা বুঝিয়াছে—পুরুষ ও নারীর মিলিত শক্তি ছাড়া স্বরাজলাভ একান্ত অসম্ভব। কিন্তু কই ? এই পাঁচদিনের মধ্যে আত্মীয়, অনাত্মীয়,—পরিচিত, অপরিচিত সকলে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া গেল, কিন্তু নমিতা কী তাহাকে একবারও দেখিয়া যাইতে পারিত না !…যাহার জন্য পাঁ-চ-টা দিন প্রমোদ গৃহে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া রহিল—সে কোথায় ?

পূর্ব্ববঙ্গের কোনও এক বর্দ্ধিষ্ণু পল্লীতে তখন দাঙ্গা-হাঙ্গামা পূর্ণ মাত্রায় চলিয়াছে ; সরকার পক্ষ হইতে যতদূর সম্ভব তত্ত্বাবধান লওয়া হইতেছে কিন্তু শান্তি কোথায় ? স্থানীয় বহু নর-নারী, স্বেচ্ছাসেবক হত-আহত হইয়াছে। যাহারা প্রাণ দিবে বলিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল, তাহারা বিপন্নের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে—কোনও কোনও ক্ষেত্রে আহত অবস্থায় শত শত নর-নারীর মান ইজ্জত রক্ষাপূর্ব্বক হাঁসপাতালে গিয়া নিজেদের প্রাণ দিয়াছে।

সেদিনকার দাঙ্গা-হাঙ্গামায় প্রমোদ রাখিয়াছিল শত শত নর নারীর প্রাণ, কিন্তু মধ্যে কী যে হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিতেও সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে। ক্ষণিকের অসাবধানতায় প্রমোদকে ভূতলশায়ী হইতে হইল—হাঁসপাতালে গিয়া দুই দিন পরে তাহার চৈতন্য হয়।

স্বেচ্ছাসেবকদলের অক্লান্ত পরিশ্রম ও শুশ্রূষার গুণে প্রমোদ ক্রমে ক্রমে সুস্থ হইতেছিল—কিন্তু তখনও জীবন সংশয়। আঘাতের পরিমাণ কিছু বেশী হইয়াছিল, ডাক্তাররা বলেন, ভয়ের কারণ নাই তবে সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে দীর্ঘ সময় লাগিবে।…কলিকাতা হইতে দাদা ও আরও কয়েকজন আত্মীয় আসিয়াছিলেন পূর্ব্বেই।…সেদিনের হাঙ্গামায় একদিকে তাহার অসীম সাহস, ধৈর্য্য অন্যদিকে অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখিয়া বিপন্ন নর নারীর হৃদয় আজও কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া ওঠে !

চার

আসন্ন শরতের এক প্রভাতে কলিকাতায় প্রমোদের শ্বশুরালয়ের সকলেই কী এক অজানা অশুভ আশঙ্কার ভয়ে ভীত। দোতালায় একটা নির্জ্জন ঘরে নমিতা একটা চেয়ারে ঠেস দিয়া সম্মুখস্থ টেবিলের উপরের খবরের কাগজটা দেখিতেছিল। কাগজের শিরোনামায় বড় বড় টাইপে লেখা, "মুক্তি সংগ্রামের একনিষ্ঠ বীর প্রমোদ কুমার হাঁসপাতাল হইতে শীঘ্রই ফিরিতেছেন।"… একটু নীচে—একটা বৃহৎ ছবি প্রমোদের ;—শায়িত অবস্থায় হাঁসপাতালে, একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথায়—বহু নর-নারী তার আশে-পাশে।—কী এক অশুভ আশঙ্কায় নমিতার সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল, আর সে ছবির দিকে চাহিতে পারিল না। চোখে আঁধার দেখিল, পদদ্বয় টলিয়া আসিল, দাঁড়াইতে পারিল না—মেঝের উপর

পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গেল—আঘাতও পাইল কিছু।... কোথায় রহিল এখন নমিতার শিক্ষার অভিমান!—কোথাই বা রহিল তাহার স্বতন্ত্র নারীত্বের গৌরব!

কিছুক্ষণ বাদেই জ্ঞান হইলে নমিতা চাহিয়া দেখিল, তখনও যেন তাহার চোখের সম্মুখে জমাট আঁধার—কী যেন অস্পষ্ট··ঘোলাটে। পার্শ্বে নীহারকে দেখিয়া কহিল, "—বৌদি, বেঁচে আছেন তিনি?"

"ষাট্! অমন অমঙ্গল ডেকে আন্‌তে আছে?... আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সিঁথেই সিঁদুর বজায় থাক্!"

"বৌদি, তাঁকে একবার দেখতে পাবো?"

"...কী যে বল, ঠকুরঝি বালাম চুপ কর—আজই তিনি কোলকাতায় আস্‌ছেন।"

"সত্যি?

"সত্যি আস্‌ছেন আজ! এখানকার সব গণ্যমান্য লোক্‌রা তাঁকে অভ্যর্থনা ক'ত্তে কোন্ পার্কে মিটিং-টিটিং কী···ব'ল্‌ছিলেন ভাসুর ম'শায় এসে;···বিকেলেই তিনি সিম্‌লে ষ্ট্রীটের বাসায় আস্‌বেন।"

নমিতা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। এই চার পাঁচ মাসের মধ্যে তার জীবনে কত বড় একটা আলোড়ন হইয়া গেল। সে স্বামীকে করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল বটে, কিন্তু সত্যই কখনও তাঁহার অমঙ্গল কামনা করে নাই,—স্ত্রী হইয়া কেই বা করে?—কোর্ট হইতে ফিরিতে একটু দেরী হইলেই ঘর বাহির করিত—কালীর কাছে সওয়া পাঁচ আনা মানত করিত; পরে প্রমোদকে আসিতে দেখিলেই অভিমানে কথা কহিত না—লুকোচুরি খেলিত। একদিনের জন্যও ভাবে নাই,—সুখে হ'ক, দুঃখে হ'ক—চার পাঁচ মাস স্বামী ছাড়া হইয়া ভাইদের গলগ্রহ হইতে হইবে। কিন্তু এ কী হইল? কখনও তাঁহাকে অবহেলা করে নাই—কখনও শিক্ষার অভিমানে, গর্ব্বে তাঁহাকে ত অবজ্ঞা করে নাই; তবে হাঁ একাধিকবার তাঁহার সহিত তর্কাতর্কী হইয়াছে বহুবিষয় লইয়াই কিন্তু তাহাত আবার দু'জনের মধ্যে আপোষে সন্ধি হইয়া গিয়াছে!......কে যেন নমিতার মুখে কতকটা আল্‌তা লেপিয়াছিল—দুই চোখ অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল ভাদ্রের ভরা নদীর মত। তাহার সকল অভিমান, গর্ব্ব এখন দিন দিন অনুশোচনায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে, দিন রাত ভাবে, 'কেন তাঁর কথার অবাধ্য হ'য়েছিলাম!.....কেনই বা এ শাস্তি! কিসের আমার মান-অভিমান—তাঁর মানেইত আমার সব! আজ তিনি আমাকে ছেড়ে যে কাযে নেমেছেন তাতে তাঁর কী ক্ষতি?—ভগবান করুন, তিনি আজই ফিরে আসুন দেশের দশের মুখ উজ্জ্বল ক'রে—আমি তাঁর কাছে ক্ষমা চাইবো। খাওয়া-দাওয়া ভুলিয়া সর্ব্বক্ষণই তাহার একই চিন্তা—রাত্রে ঘুম হয় না। সমস্ত রাত ছটফট করে—স্বপ্নে যেন প্রমোদের স্পর্শ অনুভব করে—আবার স্বপ্নেতে উপাধান অশ্রুসিক্ত করিয়া তোলে।

দুপুর বেলায় নমিতা বড় বৌ শৈলবালাকে বলিল, "বৌদিদি আজ সিম্‌লে ষ্টীটে গেলে হয় না?"

"তোকে কী তাই ব'লতে হবে বোন্,......বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে, আমরা তোকে ব'লতে যাচ্ছিলুম—সেজে-গুজে আয় শীগ্‌গির!"—কী এক অব্যক্ত আনন্দে নমিতার হৃদয় ভরিয়া উঠিল, দৌড়িয়া উপরে উঠিয়া গিয়া একখানা দামী ফিরোজা রংএর শাড়ী পরিতে যাইতেছিল, হঠাৎ কী মনে করিয়া একটা লাল পেড়ে শাড়ী পরিয়াই নীচে নামিয়া আসিল। গাড়ীতে নীহার কহিল,

"এটা কেন গো?......সেই যে দামী শাড়ীটা?"

"কোথায় আছে, পেলাম না এখন .....এইই ভাল।"

সন্ধ্যার কিছু আগেই সকলে সিম্‌লা ষ্ট্রীটের বাসায় পৌঁছিল। বাসার সামনে লোকে লোকারণ্য, ভীড় ঠেলিয়া প্রবেশ করা যায় না,—সকলেই দেখিতে চায় রণ-প্রত্যাগত বিজয়ী বীর এই প্রমোদকে। সকলেরই হাতে ফুলের মালা-চন্দন।......স্বামীর অভ্যর্থনার এত আয়োজন, এত ধুমধাম দেখিয়া আনন্দে নমিতার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

বেলা পাঁচটার সময় ভীড় ঠেলিয়া সজ্জিত একখানি প্রাইভেট কার বাসার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রমোদ গাড়ী হইতে নামিতেই সকলে তাহাকে পুষ্পমাল্যে এবং চন্দনে ভূষিত করিয়া ফেলিল—চারিদিকে সজীবতা, আনন্দের অফুরন্ত উৎস। প্রমোদের মন একাধারে গর্ব্বে এবং কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল, ভাবিল,—এই আমার ভাই বোন! এদের ছেড়ে এতদিন মিছে আঁধারে ঘুরে বেড়িয়েছি।

দোতলায় নমিতা দাঁড়াইয়াছিল, সবারই অজ্ঞাতে বারান্দার একটী কোণে? আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না;······পোড়া চোখে জল আসিয়া তাহাকে ক্ষণিকের জন্য অন্ধ করিয়া দিল।······সে স্ত্রী, আজ একবার—আলাপ করা দূরে থাকুক—স্বামীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইবার শক্তি হারাইয়াছে।

আত্মীয়-অনাত্মীয়, অপরিচিত সকলেই শত মুখে প্রমোদের প্রশংসা করিল, আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল, তাহাকে দীর্ঘজীবি হইবার জন্য, কিন্তু নমিতার দেখা নাই। বাড়ীময় খোঁজাখুজি, কোথায় যে লুকাইয়াছে!

সন্ধ্যার কিছু পরেই প্রমোদ বাড়ীর বাহির হইল। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া কোথায় সভার আয়োজন হইয়াছে—সেখানে যাইতে হইবে, সকলের বিশেষ অনুরোধ······কলিকাতার বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি সভায় প্রমোদের বীরত্বের, স্বদেশ-প্রীতির প্রশংসা করিলেন ও তাহার মত আদর্শ, সাহসী মৃত্যুকল্প বীর হইবার জন্য বাংলা তথা ভারতের আশা-ভরসা ভাবী তরুণ-তরুণীকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিলেন। সভায় প্রমোদ সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল, তাহার ভাই বোন্‌কে আহ্বান করিল, তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য স্বদেশের কল্যাণ সাধনার্থে। সভাভঙ্গের পর পুষ্পমাল্যে বিভূষিত হইয়া যখন গৃহে ফিরিল তখন রাত্রি প্রায় এগারটা। ······খাওয়া-দাওয়া করিয়া শুইবার ঘরে গিয়া খাটের উপরে বসিতেই নমিতা আসিয়া বিপন্ন আশ্রয় প্রার্থীর মত তাহার দুই পা-ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। চোখের জলে প্রমোদের পদদ্বয় আর্দ্র হইয়া উঠিল, প্রমোদ তাহাকে তুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই উঠিল না। অনবরত কাঁদিতে লাগিল, ক্ষুদ্র শিশুর মত কী এক হারানো সম্পদের পুনঃপ্রাপ্তির আশায় নমিতা অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে কহিল,

"বল আমাকে ক্ষমা ক'র্বে······

প্রমোদ জোর করিয়া তাহাকে খাটের উপর তুলিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,

"লক্ষ্মী, কেঁদ' না····"

"আমি মোটেই লক্ষ্মী নই, তোমার অযোগ্যা স্ত্রী।·· বল, ক্ষমা ক'রেছ"—তখনও নমিতা অশ্রুসিক্তা। দুঃখে, ক্ষোভে তাহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল।

প্রমোদ তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "কেঁদনা নমিতা, তুমি যে আমার······

গভীর ঝড় বৃষ্টিতে নীড়হারা বিপন্ন পাখী সহসা আশ্রয় পাইলে যেমন যুগপৎ নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হয়, নমিতা তেমনি প্রমোদের বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া এক মুহূর্ত্তে তাহার জীবনের ঝঞ্ঝা-বাদলের কথা ভুলিয়া গেল—অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনা রাশি মুহূর্ত্তে স্বামী দেবতার অমৃতস্পর্শে ঘুচিয়া গেল।

পরদিন নমিতা নিজে গিয়া নারী স্বেচ্ছাসেবিকাগণের দলভুক্ত হইল এবং স্বামী-স্ত্রীতে স্বদেশের কাজে—জগতের কাজে উৎসৃষ্ট হইল।

পুরুষ ও নারীর মিলিত শক্তি ব্যতিরেকে পরাধীন জাতির মুক্তির আশা কোথায়?

প্রমোদ এখনও মাঝে মাঝে পথে স্বেচ্ছাসেবিকা নমিতাকে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে,

"কী, গো; গৃহলক্ষ্মী, এখন যে বড় পথলক্ষ্মী হ'লে? ···মা, বোন্‌কে ঘরের বার কর্‌"···নমিতা গম্ভীর অথচ সলজ্জ কণ্ঠে উত্তর দ্যায়,

"যাও তুমি ভারী ই'য়ে······

বজ্রদগ্ধা

শ্রীপ্রমীলা রায়

পূর্ব্ব পরিচ্ছদের পরাংশ

রমাপতিবাবুর পিছনে পিছনে যেতে যেতে রাঙা ঠান্‌দি বল্লেন "কেমন, তোমার জামাই বাছা? চুপি চুপি বিয়ে করতে এল! বাজনা নাই, আলো নেই,—চোর নাকি?"

একটু হেসে তিনি বল্লেন, "জামাইএর মা তো নেই। তার ওপর বড় সড় হয়েছে বলে ও সব আলো-বাজনায় সে লজ্জা পায়। আলো করে না এসেছে তাতে কি, দেখ্‌বে চলো কি রকম সভা—আলো করা জামাই হয়েছে আমার! তুমি আশীর্ব্বাদ কর—মীনু আমার, চিরদিন যেন হেসে-খেলে কাটায়।"

"ষাট্—তা আবার বল্‌তে! ওলো, ও নাত্‌বৌ—যা হয় একখান পাটের শাড়ী পরে শীগ্‌গির আয় ভাই—জামাই বরণ করতে হবে।"

* * * *

ফুল বিছানো পথ—ফুলের ভিতর দিয়ে মীনাকে এনে প্রভাতের সামনে বসিয়ে রমাপতি বাবু যথারীতি সম্প্রদান করে দিলেন। সম্প্রদানের সময়ে এক ফোঁটা জল তাঁর চোখে এসে পড়ল—সেই পিতৃ-হৃদয়ের চির-দিনের দুর্ব্বলতা! "আমার ছিল, তোমাকে দিলাম।" ফুলের মালা দিয়ে বাঁধা মীনার হাতখানাকে, নিজের হাতের ওপরে প্রভাত সর্ব্ব কল্যাণময়ী বলেই ধরে-ছিলো। বিয়ের শাস্ত্রীয় সমস্ত অনুষ্ঠান হয়ে গেলে প্রভাত উঠে তার পিতাকে প্রণাম করলে। জগমোহন তার মুখে তৃপ্তির হাসি দেখে একেবারে নিশ্চিন্ত হলেন—এগিয়ে এসে মীনাকে কোলে টেনে নিয়ে বল্লেন "মা, যে হতভাগার মা হ'তে তুমি চল্‌লে, সে সত্যি বড় হতভাগা—তাকে মায়ের স্নেহ দিয়ে তার দুঃখ দূর করে দিও—আর এ ক'টী তোমার ছোট ভাই—শৈশবে মাতৃহীন; এদের অভাবও তোমায় দূর করতে হবে মা" বলে তিনি প্রণব, প্রশান্ত ও প্রভাসকে দেখিয়ে দিলেন। মীনা মাটীতে মাথা ঠেকিয়ে প্রথমে শ্বশুরকে পরে বাবাকে প্রণাম করলে। দুজনেই নীরবে আশীর্ব্বাদ করলেন। শাঁখ বাজিয়ে, হুলুধ্বনি করে মীনা ও প্রভাতকে রাঙা ঠান্‌দি বাসরে নিয়ে গেলেন।

বাসরে ঢুকে প্রভাত দেখলে, সে ঘরটীতে শুধু বিছানাটী বাদ দিয়ে চারিদিকে সুন্দরীর মেলা বসে গিয়েছে। তাদের রঙ-বেরঙের শাড়ী ও গহনার জৌলুষে তার চোখ যেন ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। কাউকেই সে বিশেষ করে চেনেনা—এক বিয়ের গোটা কয়েক আচার অনুষ্ঠানে রাঙা ঠান্‌দির সঙ্গেই তার সামান্য পরিচয় হয়েছে। অসংখ্য সুন্দরীর মেলার মাঝে, কি করে সেখানে চল্‌তে হবে তার উপায় কিছু ভেবে বের করতে না পেরে, সে মুখ নীচু করে শীতের মাঝেও ঘেমে উঠলো। কতক্ষণ সে এই অবস্থায় থাক্‌ত তার ঠিক নেই, তার সুকৃতি বলে শতদল এসে তাকে কিছু মুক্তি দিলেন। খাবারের রেকাবীখানা সামনে সাজিয়ে দিয়ে মৃদুভাষিণী শতদল বল্‌লেন "কিছু খাও বাবা।" অনুমানে প্রভাত বুঝলে ইনি শাশুড়ী হবেন—সে আর কিছু না বলে খাবারের থালাটা টেনে নিলে। তার খাওয়া হলে শতদল প্রভাতকে ঘুমোতে দেওয়ার জন্যে

সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে ঘরের আলো কমিয়ে দিলেন। একটী নতুন বিয়ে হওয়া মেয়ে বললে, "তুমি যাওতো মামীমা, একটা দিন শোবার অনিয়ম হলে আর তোমার জামাই 'গলে' যাবে না। বাসরে বুঝি কেউ ঘুমোয় ?

সস্নেহে প্রভাতের দিকে চেয়ে শতদল অনুযোগ-কারিণীকে বললেন "তা হোক্ মা। আজ একটু ওকে ঘুমোতে দে মা—এখন তো কিছুদিনই রইলেন। এরপর তোরা আমোদ-আহ্লাদ করিস্। কাল সারারাত রেলে এসে আজ আবার এই হাঙ্গামা, শেষে অসুখ-বিসুখ না হয়।"

"কেন মামীমা ? মীনু এখন শ্বশুরবাড়ী যাবে না ?"

"না বাছা, বেয়াই দিনকতক পরে মীনুকে নেবেন। প্রভাতের দিন দশেক ছুটী—ও এখান থেকেই ওর কাজের জায়গায় ফিরে যাবে।

"আচ্ছা, বেশ মামীমা—তোমার কথাই রাখ্ছি আমরা—কিন্তু ফুলশয্যার দিনে আমরা তোমার কোন কথাই শুনব না।" বলে মেয়েটী তার দলবল ডেকে নিয়ে চলে গেল।

ঘরের আলো খুব কমিয়ে দিয়ে শতদল বল্লেন, "সারাদিন হট্টগোল গিয়েছে, এইবার একটু ঘুমোতে চেষ্টা কর বাবা। আজ আর কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না।" প্রভাত শুয়ে পড়ে গায়ের ওপর শালটা ভাল করে টেনে দিলে। তা দেখে, শতদল নতুন লেপ দুখানা এনে মেয়ে ও জামাইএর গায়ে ঢেকে দিলেন। রাঙা ঠান্দি তখনও বসে বসে ঢুল্ছিলেন—শতদলকে যেতে দেখে তিনি বললেন, "অমনি আমাকেও গায়ে দেবার একখানা কিছু দিও তো বৌমা। বাসরে বর কনের একলা শুতে নেই—আমি এইখেনেই শোব।"

"বেশ তো খুড়ীমা—গায়ের কাপড় আমি এনে দিচ্ছি।" বলে শতদল অন্তঘরে গেলেন। লেপ থেকে মাথা বের করে প্রভাত ঠান্দিকে একটু রসিকতা করার লোভ ছাড়তে পারল না। এ বাড়ীতে আসার পর থেকে ঠান্দি তাকে একাই নানা রকমে জ্বালাতন করছিলেন। সে একটু হেসে বললে, "একাই শুলেন ঠান্দি—ঠাকুরদাকে আনিয়ে নিন—তাহলে ডবল বাসর হয়ে যাবে। কবে বাসরে শুয়েছিলেন তা তো আর মনে নেই!"

ঠান্দি হেসে বল্লেন "তার যে, কি আছে দাদা ? বুড়ো বড় শীত-কাতুরে! কিছুতেই নিজের ঘর ছেড়ে নড়্ল না। না হলে এই যুগল-মিলন দেখতে আসে না!"

"ওঃ বুঝেছি। তাহলে আপনার বিরহ-শয়ন। আচ্ছা ঠান্দি, অত কষ্টে কাজ কি ? ঠাকুরদা উপস্থিত নেই, আমি তো আছি। আপনি না হয় বাসরটা আমার সাথেই করুন।

"ও! বড় যে সাহস দেখ্ছি—পাশে যে মুগুর আছে, তা খেয়াল নেই বুঝি ? অ মিনি, তোর বেয়াড়া বর সাম্লা বাপু! শেষে কি 'বগীবিন্দির' ঝগড়া সুরু হবে ?"

"মাভৈঃ! ঠান্দি! 'বগীবিন্দির' ঝগড়া আপনারা করলেও তাদের স্বামী হওয়ার দুর্ভাগ্যটা স্বীকার করে নিতে আমি মোটেই রাজী নই। অতএব সন্ধি। এই আমি ফের লেপ-চাপা দিলাম।" বলে প্রভাত আপাদ-মস্তক ঢেকে শুয়ে পড়ল। অন্য লেপের ভিতরে মীনা অগ্রহায়ণের শীতেও ঘেমে উঠ্ছিল—ঘুম তার মোটেই হল না।

১০

রাত প্রায় ১টা হবে। প্রভাত সবেমাত্র অসংখ্য উপদ্রব সহ্য করে একটু মুক্তির নিশ্বাস ফেলার সময় পেয়েছে। বাড়ীর কোলাহল প্রায় থেমে এসেছে—দরজাটা বন্ধ করে প্রভাত তার শোওয়ার জায়গায় ফিরে আস্ছিল। বন্ধ দরজায় বাইরে থেকে মৃদু আঘাতের সঙ্গে শোনা গেল, "দরজাটা একবার খুলে দেওনা

কথা যে বল্ছিল, তার বলার ভঙ্গীতে, সে যে অতি ভয়ে ভয়ে, প্রার্থনার মত করে, কথা ক'টী বলছিল তা বোঝা যাচ্ছিল। প্রভাত আবার ফিরে গিয়ে দরজা খুলে দিলে—দেখ্লে বাইরে যতী দাঁড়িয়ে। যতীও একটু যেন কুণ্ঠিত হয়ে বললে "ও! আপনি! মীনু কি ঘুমিয়ে পড়েছে ?"—

কি বলবে তা প্রভাত ভেবে পেল না। কারণ মীনা ঘুমিয়েছে কি জেগে আছে তা সে জানে না

বাসরে প্রভাত, শতদলের কৌশলে ঘুমিয়ে নিয়েছিল বলে, আজ ফুলশয্যার দিনে তারা তাকে মোটেই শুতে দেয়নি। সন্ধ্যা থেকে এতক্ষণ ধরে নানা রকমে তাকে জ্বালাতন করে মেয়ের দল পরিশ্রান্ত হয়ে চলে গেল। সে তখন উঠে দরজা বন্ধ করে মীনার পরিচয় নিতেই যাচ্ছিল, এমন সময়ে যতী তাকে এই প্রশ্ন করায়, সে কিছুই বলতে পারল না। উত্তর দিতে দেরী হচ্ছে দেখে যতী তাকে আবার বললে "একটু অনুগ্রহ করে ডেকে দেবেন কি? ওঁকে আজই আমার একটু দরকার আছে।"

কপালের ওপর থেকে লম্বা চুলগুলো এক ঝট্‌কায় পিছন দিকে সরিয়ে প্রভাত বললে "আপনি ডাকুন না। আমার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় হয় নি।"

যতী একটু হাসলে। এদের বিয়ের আগে, বাগানের সেই রাত্রির কথা মনে পড়ল। ভাবলে অতক্ষণেও 'পরিচয়' হয় নি? না, এ বোধ হয় নতুন বিয়ের পর, তৃতীয় প্রাণীর উপস্থিতির লজ্জা। কিন্তু সেই বা ডাকে কি করে? যদি মীনা সত্যিই ঘুমিয়ে থাকে, তবে তাকে তার স্বামীর সাম্‌নেই নাম ধরে ডেকে জাগানো বোধহয় শিষ্টাচারের বাইরে। কি করবে ভেবে না পেয়ে সে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে ফিরেই যাচ্ছিল—তা দেখে প্রভাত বললে "কই, ডাকলেন না?"

যতী "না, আপনি তো আমাকে সাহায্য করলেন না ডাকতে"-- বলে পিছন ফিরতে মীনা নিজেই ঘরের অন্য দরজাটা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। এ দরজা ধরে প্রভাত দাঁড়িয়েই ছিল।

মীনাকে বাইরে আসতে দেখে যতীর মুখটা একবার আলোময় হয়ে উঠ্‌ল—পরক্ষণেই সে এগিয়ে এসে তার হাতে গোলাপের দুটো বড় তোড়া ও গহনার ছোট একটা 'কেস' তুলে দিয়ে বললে, "তোমার বিয়ের দিন তোমাকে কিছু দেওয়া হয় নি বলে তুমি নিশ্চয়ই মনে করেছ যে যতীদা বেতে ফাঁকি দিলে—ফাঁকি কিন্তু দিই নি, এই জিনিসটার আসতে দেরী হ'ল বলেই দিতে দেরী হল।" বলে সে গহনার কেসটা দেখিয়ে দিলে।

মীনা তাড়াতাড়ি কেসটা খুলে দেখলে ছোট একটা সোনার আংটী, এক ফোঁটা চোখের জলের মত পবিত্র ও টলটলে একটুকরা হীরা বুকে নিয়ে রয়েছে। হীরার আংটীর দাম সে দু রকমেই বুঝ্‌লে। মনে পড়ল যতীর কিছুদিনের আগের কথা, "গোলাপে বড় কাঁটা—তুলতে না জেনে তুলতে গেলে কাঁটা ফুটে রক্তপাত হয়।" আজ যতী সেই কাঁটাওয়ালা গোলাপের তোড়া বেঁধে, আর নিজের দুঃখের অশ্রু, আংটীতে বসিয়ে মীনাকে উপহার দিয়ে গেল। সমস্ত বুঝেও মীনা কিছুই তাকে বলতে পারল না। নিজের আহরিত জিনিসগুলো ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিয়ে সন্তুষ্ট মনে যতী তার নিজের ঘরে চলে গেল।

মীনাকে একই রকমে, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, প্রভাত একটু অবাক হয়ে গেল। এমন কি ঘটল যাতে করে মীনার চলার শক্তি হারিয়ে গেল? কোনদিকে কেউ নেই দেখে সে এক পা বেরিয়ে এসে তার হাত ধরে টান দিতেই তার হাত থেকে ফুল ও কেস গড়িয়ে গেল। নীচু হয়ে সেগুলো কুড়িয়ে নিতে নিতে প্রভাত বললে "বাঃ! বেশ আংটীটা তো?—দেখি তোমার আঙুলে পরিয়ে দিই।" বলে মীনার হাতটা ধরতেই সে হাত টেনে নিলে।—"কেন পরবেনা?"—মীনা মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালে।—আর কোন কথা না বলে প্রভাত মীনাকে ডেকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। ফুলের বিছানায়, ফুলের ঘন গন্ধে নিশ্বাস ভারী হয়ে আস্‌ছিল। প্রভাত খুব ধীরে, যেন শুধুই মীনা শুনতে পায় এই রকম স্বরে বললে "তুমি খুসী হয়েছ তো মীনা? তোমাকে বিয়ে করে অন্যায় করি নি তো তোমার ওপর? যেভাবে তুমি চাইবে, বাবা তোমাকে সেই ভাবেই রাখ্‌বেন—থাকবে তো মীনা খুসী হয়ে আমাদের ঘরের অচপল লক্ষ্মী, আর আমার ধ্রুবতারা হয়ে?" লজ্জিতা হয়ে মীনা বললে "ওগুলো আর বলবেন না। সেদিন আমি সব বাজে কথা বলে ছিলাম। সেদিনকার প্রগল্‌ভতার জন্যে আজ আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।"

"ক্ষমা! কিসের ক্ষমা! যাক্‌—ভালই করেছিলে সেদিন। আমি কিন্তু তোমার কাছে ঋণী হয়ে আছি সেদিন থেকে—আজ আমি ঋণমুক্ত হব বলে তোমার কাছে অনুমতি চাচ্ছি।" বলে প্রভাত শোবার বালিশের

নীচ থেকে সরু চেনে ঝুলানো একটা হীরার 'পেণ্ডেণ্ট' বের করে মীনার মাথার কাপড়টা খুলে সেটা পরিয়ে দিয়ে ঘাড়ের কাছে চেনের টিপকল এঁটে দিয়ে খুব সন্তর্পণে হাতটা সরিয়ে নিলে। পেণ্ডেণ্ট মীনার গলায় দুলতে লাগলো, যতীর দেয়া আংটীটা কিন্তু কেসেই রইলো, এখন আর তার কথা মীনার মনে ছিল না।

অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে থেকে প্রভাত বল্‌লে "ভাগ্যিস এখানে বেড়াতে এসেছিলাম আর মোটরটা কি সুক্ষণেই ভেঙ্গে ছিল! নাহলে!—"

"না হলে কি হত!"

'না হলে তোমাকে পাওয়া যেত না। জানি কি আগে যে এই বাঘ-ভালুকের রাজ্যে আমার প্রেয়সীর খোঁজ পাব? তোমার কিন্তু খুব রাগ হয়েছিল, না?—"

"যা-ন্‌।—কখন?"

"সেই যখন তোমার গাড়ীতে যতীবাবু আমাকে তুলে নিলেন?—হয় নি? যদিও হবারই কথা।"

"হু"। আপনার যেমন ধারণা?—রাগ কর্‌তে যাব কেন?"

"সে যাক্‌।—রাগই কর আর যা ই কর—ব্যাপারটা কিন্তু আগাগোড়া আমারই—অনুকূল। যেমন করেই হোক্‌ তোমাকে তো পেয়ে গেলাম।—এখন তুমি যতই রাগ করনা কেন—সে রাগ ভাঙ্গাতেও আমি জানি।—"

"আমি মোটেই রাগ করিনি ও কখন কর্‌বও না।—"

"ঠিক্‌ তো? মনে থাকে যেন।"—বলে প্রভাত ঘরের আলোটা আরো কমিয়ে দিয়ে বিছানায় এসে বসলো!—দেওয়ালের গোলাপী আভা, ফুলের মিষ্ট গন্ধ, আলো-অন্ধকারের খেলা তার মনকে যেন কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল।—মীনার কাছে সরে গিয়ে তার হাত দুখানা চেপে ধরে সে বল্‌লে, "মীনু, রাণি আমার, আজ থেকে তুমি আমার জীবনের সকল সুখ-দুঃখের নিয়ন্ত্রী হলে—আমার এই ছন্ন-ছাড়া জীবনটাকে তোমার হাতে তুলে দিলাম, তুমি একে সুন্দর করে তুলো।—

"মৃদুস্বরে মীনা বল্‌লে "সেই আশীর্ব্বাদ তুমি আমাকে করো।"—

* * * *

সকাল হয়ে গেল। রমাপতিবাবু যতীর খোঁজে তার ঘরে গিয়ে দেখ্‌লেন, জিনিস-পত্র বিছানা সবই পড়ে আছে—নেই কেবল যতী। যতীর শূন্য ঘর তাঁর মনে গভীর ব্যথা দিলে বিছানার ওপর এক টুকরা কাগজে লেখা "আমার জন্য বৃথা খোঁজ করিবেন না—মন বড় বিক্ষিপ্ত হওয়ায় আমি বাহির হইলাম—কিছুদিন পরে ফিরিব। আর যদি মরিয়া যাই তো এই শেষ। প্রণাম লইবেন।—আপনাদের দয়া কখনও ভুলিব না।—প্রণত যতী।"—

কাগজের টুক্‌রাটী পড়ে রমাপতি নিরুপায় ক্ষোভে বল্‌তে লাগলেন, "একদিন আমি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম যতী, আজ আবার আমিই তোমাকে আশ্রয়চ্যুত করলাম, কাগজ টুকু হাতে করে তিনি যখন শতদলকে গিয়ে দিলেন, তখন শতদল প্রভাতের জল খাবারের যোগাড় করছিলেন। পড়ে তাঁর মাতৃ-হৃদয় কেঁদে উঠ্‌লো। হায়!—যতী ছাড়া এবাড়ীর যে কিছু চলেনা। কী গভীর বৈরাগ্যেই যে যতী বাড়ী ছেড়ে গেল, সে কথা মনে হয়ে শত কাজের মধ্যেও তাঁর আর চোখের জলের শেষ থাক্‌ল না।—

অনীতা, সুপ্রীতি ও মাধবী তিন জনে অবাক্‌ হয়ে শতদলের কান্নার কথা মীনাকে জিজ্ঞাসা করায় চোখ মুছে ধরা গলায় সে বললে "যতীদা, কোথায় চলে গিয়েছে তার খোঁজ নেই।"—আজ এ বাড়ীর সকলেই যতীর জন্যে লালায়িত—অহর্নিশি কাছে থেকে যতী তার দাম কাউকে বোঝাতে পারে নি—আর একদিনের দূরে যাওয়াতেই বাড়ীর প্রতি লোকটীর কাছে সে তার মূল্য চোখের জলে আদায় করে নিলে।—

শুষ্ক মীনার কাছে বিদায় নিয়ে মাধবীরা সেইদিনই বোর্ডিংএ ফিরে গেল।

দ্বিতীয় খণ্ড

১

দোলের ছুটীতে প্রভাত আবার হাজারিবাগে এল। মীনার আর শ্বশুর বাড়ী যাওয়া হয়ে ওঠেনি, কারণ জগমোহনবাবু তাঁর বাড়ীখানাকে তখন ভেঙে চুরে নতুন করে তৈরী করতে আরম্ভ করেছিলেন। ইচ্ছা ছিল, একটা বড় ছুটীতে প্রভাত মীনাকে নিয়ে আসবে এবং তার উপ-

স্থিতির মধ্যে তিনি মীনার 'বউ ভাত'টা সেরে দিবেন। বাড়ীতে বউ আসবে আর ছেলে অনুপস্থিত থাকবে এটা তাঁর বিসদৃশ বলে মনে হচ্ছিল—তাইতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্ত্বেও দেশের বাড়ীতে বউ নেওয়া, তাঁর হয়ে ওঠেনি।

বিয়ের পর প্রায় মাস আড়াই পরে প্রভাত আবার মীনার কাছে এল। দেখলে, বিয়ের পরে মীনা কিছুই বদলায় নি। তার আসার দরুণ যে আনন্দ সেটাকে সে মনেই চেপে রাখলে—শুধু "কেমন আছ?" "ভাল আছি" ছাড়া আর কোনো কথাই কেউ জিজ্ঞাসা করলে না।

রাত্রের গাড়ীতে এলেও প্রভাত 'বার্থ' একটা রিজার্ভ করে বেশ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এসেছিল। দিনের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে, সে তবুও একটু গড়িয়ে নেবে ভাবছিল। শুধু করবার কিছু নেই বলে, আর মীনাকেও তখন পাওয়া যাবে না বলে। ঘরের দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে, স্যুটকেস থেকে একখানা 'ওমর খৈয়াম' বের করে নিজের কলমটি নিয়ে মীনার নাম লিখতে বসল।

নাম লিখতে বসে তার কিন্তু খুব মুস্কিল হল। কি লেখে! যেটা লিখব বলে মনে করে, দেখে যে সেটা পুরাণো হয়ে গিয়েছে। অনেক ভেবে ভেবে ঠিক করলে যে কিছুই না লিখে, শুধু "মীনা" এই অক্ষর দুটীই বসিয়ে দেবে। প্রভাতের হাতের লেখা ছিল সুন্দর। তার পরে সে আরও সুন্দর করে বইটার শেষ পাতাতে "মীনা" এই অক্ষর দুটি বসিয়ে দিয়ে বারে বারে, দূরে রেখে, কাছে এনে, নানা রকমে ধরে নিজের হাতের লেখাটি দেখতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে আর দেখতে ভাল লাগল না। কি করে যে এই অলস দুপুর কাটানো যায়, এ যেন তার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে উঠল

প্রভাত ছিল সেই প্রকৃতির, যে প্রকৃতির লোকে স্বভাব গম্ভীর, অথচ স্নেহ-প্রবণ হয়। তাদের স্নেহ উপচে পড়ে না, কিন্তু খুব গভীর; তারা কথা বলে কম, কাজ করে বেশী। নতুন বিয়ে হলেও প্রভাতের চঞ্চলতা ছিল না। এটা-সেটা নাড়া-চাড়া করেও সময় যখন মন্থর গমনেই চলতে লাগল, তখন ওমর-খৈয়ামখানা খুলে সে পড়তে আরম্ভ করল। কিন্তু সবে মাত্র

"জাগো, জাগো রাত্ পোহালো,
তরুণ প্রাতের অরুণ আলো
তীর হেনেছে নিশীথিনীর বুকে—"

পড়তে পড়তেই ঘুমে তার চোখ ঢুলে এল—হাত থেকে অত আদরের বইটা খসে বিছানায় লুটোতে লাগল। ঘুমিয়ে প্রভাত স্বপ্ন দেখলে, তার মা যেন তাকে বলছেন "প্রভাত কতদিন তুই আমার কোল ছাড়া—আয় আমার কাছে।" এ দিকে মীনাও যেন শাশুড়ীর উপস্থিতিতে স্বামীকে কিছু বলতে পারছে না—কিন্তু কাতর চোখে তার পানে চেয়ে আছে। মা ও স্ত্রীর মধ্যে কার কথা শুনবে তাই ভেবে সে আকুল হয়ে উঠছিল—এমন সময়ে গায়ে মৃদু ঠেলা পেতেই উঠে বসে স্বপ্নটা একবার আগাগোড়া ভেবে নিলে। দেখলে স্বপ্ন, স্বপ্নই হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে আর তার ছোট শালা হিমাংশু তাকে মৃদু ঠেলা দিয়ে ডাকছে। বলছে "জামাই বাবু, উঠুন না, কত ঘুমোবেন আর! সাঁওতালদের নাচ দেখতে যাবেন?"

প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে প্রভাত বললে "চল। মুখ হাত ধুয়ে আসি। কে কে যাবেন? -"

বিজ্ঞের মত হেসে হিমাংশু বললে "আপনি, আমি বৌদি, দিদি আর হীরা সিং। মা কোনদিন কোথাও যান না। আর বড়দার কোথায় "কলে" যেতে হবে। আর ছোড়দা যদি যেতে চায় তো যাবে—কিন্তু আপনাকে বলে রাখছি খবদ্দার ওকে 'গাইড' হতে দেবেন না—ও হাজারিবাগে জন্মেছে বটে, কোথায় কি আছে কিছু জানে না—আপনাকে দেখাবে কি করে? ওকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে আপনিই ঠকবেন—ওতো যা' তা একটা নাম বলে দেবে আর আসল জিনিসটা আপনি জানতে পারবেন না। ওই যে ছোড়দা আসছে—ওর নামে আপনার কাছে কিছু বলেছি, তা যেন ওকে বলে দেবেন না। তা হলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না। যা জোর হয়েছে ওর গায়ে—ডাম্বেল করে করে।—"—

ছোট শ্যালা হিমাংশুর এই সব কথা শুনে প্রভাতের খুব হাসি এল। তার ইচ্ছে হল, তাকে নিয়ে আর একটু মজা করতে! কিন্তু সুধাংশুকে আসতে দেখেই হিমাংশু সামনে যে খোলা দরজাটা পেলে তাই দিয়ে ছুটে পালালো—যাওয়ার সময়েও সে ইঙ্গিতে একবার অনুনয় করে নিষেধ করে গেল।

সুধাংশু এসেই বিনা ভূমিকাতেই বললে "চলুন

জামাই বাবু, সকলে তৈরী, সাঁওতালদের পাড়ায় যাব। ওদের নাচ একটা দেখবার জিনিস।"

প্রভাত তাকেও বললে "কে, কে যাচ্ছেন ?—"

হিমাংশুর চেয়ে সুধাংশু ৬।৭ বছরের বড়—বুদ্ধিও তার তাই একটু পেকেছে। বললে "বাবা তো বাড়ী নেই, আর থাকলেও তিনি এ সবে কোনদিন মেশেন না—আর বড়দা ডাক্তারী করতে গিয়েছে। মা, বাবা, বড়দা বাদে আমরা সবাই যাব। বড় মোটরটা বের করিয়েছি। আমি 'ড্রাইভ' করব।—চলুন তাড়াতাড়ি।"

প্রভাত আর দেরী না করে উঠে তাড়াতাড়ি তার বেশ-ভূষা শেষ করে নিলে। গাড়ীতে উঠবার জন্যে বের হয়ে এসেই সে দেখতে পেলে মীনা, মলিনা সেখানে অপেক্ষা করছে। মীনার পরণের 'হেলিওট্রোপ' রংয়ের শাড়ী ও ব্লাউসে, শাড়ীর পাড়ের রূপোলী জরিতে পায়ের লাল নাগরাতে তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বিকেলের পড়ন্ত রোদের সোনালী আভা তার মুখে, ঠোঁটে ও সমস্ত গায়ে পড়ে তাকে আরো জ্যোতির্ম্ময়ী করে তুলেছিল। বুকের কাছে যে পিনটা কাপড় আটকে ছিল তার মধ্যে দুটো আধ ফুটন্ত গোলাপের কলি বেঁধানো ছিল। ঠিক তার পাশেই প্রভাতের প্রথম উপহার পেণ্ডেণ্টটা দুলছিল। এক চোঁখ চেয়েই প্রভাত মীনার এই সৌন্দর্য্য দেখে নিল—তার চোখ যে তৃপ্ত হয়েছে তা তার মুখ দেখেই বোঝা গেল। মীনাও বুঝতে পেরে লাল হয়ে উঠতে লাগল।

তাদের এই অবস্থায়, মলিনার খুবই হাসি পাচ্ছিল। সে শেষে বলেই ফেললে, "উঠুন প্রভাত বাবু, বিকেলটা যদি দাঁড়িয়েই কেটে যাবে তো কখন বেড়াবেন।—"

চকিত হয়ে প্রভাত গাড়ীতে উঠে বসল। মীনাকে একটু ঠেলা দিতেই সে মলিনার কাণে কাণে বললে, "আমি ওখানে বসতে পারব না ভাই।"

বিরক্ত হয়ে মলিনা বললে, "মরণ আর কি। প্রভাত বাবুর পাশে আমি না বসলে দেখতে সুশ্রী হবে কেন? নে যা, ঢের ন্যাকামী হয়েছে, এবার উঠে বসগে যা।"

অগত্যা মীনা উঠে প্রভাতের পাশে বসল, তার পাশে মলিনা বসল। হিমাংশু বাইরে বসবার জন্যে ঝুঁকেছিল—কিন্তু সুধাংশুর তাড়া খেয়ে শেষে মলিনার কোলেই বসল।

বিয়ের প্রায় আড়াই মাস পরে মীনাকে এত কাছে পেয়ে, প্রভাতের সমস্ত দেহ মনে আনন্দ যেন আর ধরছিল না। কিন্তু গাড়ীতে লোক অনেক, তা ছাড়া দিনের বেলা—সে চুপ করেই রইলো। সামান্য কোন কথাও মীনাকে বলতে পারলে না।

ফাল্গুন মাসের গোড়া—কিন্তু শীত তখনও অল্প অল্প ছিল। তাই প্রভাতের গায়ে একখানা শাল ছিল—মীনাও শাল নিয়েছিল, কিন্তু গায়ে দেয় নি। চলতে আরম্ভ করলে হাওয়ায় শীত করতে লাগল—প্রভাত বললে "বৌদি, আপনারা শালগুলো গায় দিয়ে নেন্—অন্ততঃ পাগুলো ঢেকে বসুন।" মলিনা একটু হাসলে; কিন্তু শালখানা হাঁটু থেকে জড়িয়ে নিলে। মীনার শাল তার হাঁটু ঢেকেও প্রভাতের কোলে গিয়ে পড়ল। সকলের চোখ এমনি করে এড়িয়ে প্রভাত তার হাতখানা দিয়ে মীনার একখানা হাত অতি কোমল ভাবে মুঠো করে ধরলে। পাশেই মলিনা রয়েছে, অতি সামান্য নড়া-চড়াও সে বুঝতে পারবে—তাই মীনাও প্রভাতের হাতের মধ্যে ধরা নিজের হাতখানাকে একেবারেই ছেড়ে দিল। প্রভাত, ফুলের মত নরম, প্রিয় হাতখানাতে নিজের হাতের স্পর্শ বুলিয়ে যাচ্ছিল। তার লতানো আঙুলগুলো মীনার আঙুলের সঙ্গে কি কথা বলছিল তা তারাই জানে। তার নিজের কিন্তু খুব ইচ্ছা হচ্ছিল, সেই হাতখানাতে একবার ঠোঁট দুটো ছুঁইয়ে নিতে!—কিন্তু গাড়ীতে যে লোক! বাইরের দৃশ্যই সে দেখছিল বটে, হাত কিন্তু তার মীনার হাতখানা ধরেই রইলো। মনে মনে ভাবছিল, "চক্ষে পেয়েও, তবু কেন বক্ষে পেতে দেরী।—"

গাড়ী আস্তে আস্তে সাঁওতালদের পাড়ার মধ্যে এসে পড়ল। তাদের নাচ-গান তখন পুরো মাত্রাতেই চলছে। দুজন সাঁওতাল যুবা মাদল বাজাচ্ছে আর একদল সাঁওতাল-মেয়ে সেই তালে তালে নাচছে। কথা তাদের কিছুই বোঝা যায় না—শুধু একটা সুর। সুধাংশু গাড়ী থেকে নেমে তাদের হিন্দী বাংলা মিশিয়ে বুঝিয়ে দিলে যে গাড়ীতে 'মাঝিজী'রা তাদের নাচ দেখতে এসেছেন। ভাল করে দেখালে 'বকসিস' পাবি। 'বক্‌সিসের' লোভে যারা দর্শক হয়ে সেখানে শুধু দাঁড়িয়ে ছিল তারাও দেখতে দেখতে কোথা থেকে বনের ফুল জোগাড় করে, মাথায়

গুঁজে, কাণে পরে, হাতে দিয়ে, পরণের কাপড়গুলিকে নাচের ভঙ্গিমায় পরে একেবারে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। কাছেই একটা ঘর থেকে আর একজন বলিষ্ঠ সাঁওতাল যুবা মাথার বাবরি দুলিয়ে মাদল বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে এল। তার পর সকলে মিলে ভাঙা বাংলায় গান আরম্ভ করলে

"এখনও তারে, নজরে দেখি নাই—
দেখি নাই গো—"—

সঙ্গে সঙ্গে নাচ। গান কিন্তু ঐ এক লাইনই—ঘুরে ফিরে, সামনে, পিছনে কত রকম যে সেই সাঁওতালের মেয়ে ক'টী, শরতের মেঘের মত, স্বচ্ছন্দ লঘুগতিতে নেচে গেল তার ঠিক নেই। গান আরম্ভ হওয়ার পরে প্রভাত এবার সকলের সামনেই মীনার দিকে চেয়ে একটু হেসে ধৃত হাতখানার একটু চাপ দিলে, যেন বল্‌তে চাইলে "শুন্‌চ?"—মীনার মনেও তখন এদেরই কাছে শোনা আর একটা বাংলা গানের একটা লাইন ঘুরে যাচ্ছিল। ভাব্‌ছিল, তাদের বলে যে

"তুমি এসেছ কি এস নাই
এখনও নজরে দেখি নাই, বঁধুগো!"

এই গানটা করতে। কিন্তু কেমন মুখ চেপে গেল—মীনার বলা আর হল না। গান শোনা হলে দুটো টাকা ফেলে দিয়ে প্রভাত সুধাংশুকে উঠতে বল্‌লে। সুধাংশু উঠে গাড়ীখানাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হলো। সাঁওতালদের গানের একটানা সুর ও মনের মত কথাগুলি প্রভাত ও মীনার মনে মায়াজাল রচনা কর্‌লে।—

২

বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। নতুন জামাই বিকেলে যে কিছু না খেয়েই বেড়াতে চলে গেল, এটা শতদলের কাছে মোটে ভাল লাগছিল না। কিন্তু কি বলবেন তিনি! স্বামী, পুত্রের কাজে বা কথায় বাধা দেওয়া তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ! তাই মায়ের প্রাণ নিয়ে তিনি শুধু অপেক্ষাই করছিলেন কখন এরা ফিরে আসে! যথেষ্ট সময় পেয়ে খাবার তিনি অনেক তৈরী করে রেখেছিলেন—আহা! বারমাস বিদেশে থাকে, ঘরেও মা, বোন কেউ নেই, কে বা সময়ে খাবার দেয়! জামাই-য়ের এমনি সব ভাবনায় মন তাঁর সমবেদনায় ভরে উঠ্‌ছিল। দুদিন আগে যাকে চিন্‌তেন না, আজ তার সঙ্গে প্রাণাধিকা মেয়ের বিয়ে দিয়ে তিনি যেন শুভ্রাংশু, সুধাংশু, হিমাংশুর চেয়েও বড় করে, আপনার করে দেখতে ইচ্ছা করছিলেন।

চায়ের জল ফুটে ফুটে উনুনটা নিভে যাবার যোগাড় হচ্ছিল। শতদল সেই একই ভাবে এক চিন্তায় বিভোরা। রমাপতি এসে তাঁর পাশে বসে পড়েই বল্‌লেন "বাইরে কাউকে দেখলাম না, ছেলেরা, প্রভাত সব গেল কোথায়?"

শতদল তাঁর স্বভাব ধীর স্বরে বললেন "কোথায় বেড়াতে গিয়েছে, মীনু, বৌমাও গিয়েছে।"

"মোটর নিয়ে গিয়েছে!—হীরা সিংকে দিয়েছ তো সঙ্গে?"

"হ্যাঁ।"

"ও! তাই বুঝি তুমি রান্নাঘরে একলা? কেন, তুমিও গেলে পারতে ওদের সঙ্গে!"

শতদল শান্ত চোখে একবার স্বামীর দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন, পরে বল্‌লেন "সেই কোন্ সকলে তুমি এক রকম না খেয়েই বেরিয়ে গিয়েছ, আর এই সারা দিনটা গেল, তুমি বাড়ী আসার সময় পেলে না, আমি বেড়াতে কি করে যাই? তা ছাড়া, কবে সখ করে বেড়াতে গিয়েছি বল?"—সময়টা সন্ধ্যা—বাড়ীটাও নির্জ্জন। রমাপতি দরজার কাছে এসে একবার মুখ বাড়িয়ে বাইরে দেখে নিয়ে ডান হাতটা স্ত্রীর গলায় জড়িয়ে দিয়ে বাঁ হাত দিয়ে তাঁর কপালে যে চুলগুলো লতিয়ে নেমে পড়ে ঘামে ভিজে একেবারে কপালের সঙ্গে এঁটে গিয়েছিল, সেইগুলি সরাতে সরাতে বল্‌লেন "সামান্য 'রাজমিস্ত্রী'র এত আয়াসের দরকার? ঝি, চাকর তো ছিল, তাদের দিয়েই না হয় একদিন চালিয়ে নিতাম, লতা, তুমি গেলে না কেন?"

প্রায় বছর তিরিশ থেকে "ওগো", 'শুনছ', শুনে শুনে শতদল প্রথম যৌবনের স্বামীর আদরের ডাক প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন। আজ আবার বিস্মৃতপ্রায় অতীতকে স্বামীর নিজ মুখে ব্যক্ত হতে দেখে তাঁরও যেন এই প্রৌঢ় বয়সে মতিভ্রম হল। নিজের গলায় যে হাতটী জড়ান ছিল, সেটী আরও একটু দৃঢ় করে

জড়িয়ে নিয়ে অসঙ্কোচেই স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন "হ্যাঁ 'রাজমিস্ত্রীই' হও, আর যা-ই হও না কেন, আমার তো রাজা তুমি—তাঁর আরাম, বিশ্রামের 'ভার' বেঁচে থাকতে আমি কার হাতে ফেলে দিয়ে ক্ষণিক আমোদ করতে যাব? তা ছাড়া ছেলেমানুষের সঙ্গে ছেলেমানুষেই যায়. ওদের মা হয়ে আমি কি করে 'এখন' প্রভাত মীনুর সঙ্গে যেতাম! ওদের এখন পরস্পরের সঙ্গই তৃপ্তিকর।"

রমাপতি স্ত্রীর দিকে চেয়ে একটু হেসে বল্লেন "হ্যাঁ, এ কথাটা আমার মনেই হয় নি।"

"তোমরা ভুলে যাও—কিন্তু আমরা ভুলি না; তাই স্মৃতিসর্ব্বস্বা হয়ে আমরা বেঁচে থাকি।"

"আচ্ছা, মীনু কি সুখী হয়েছে? আমি বুঝে উঠতে পারিনে। এক একবার ভাবি যতীর হাতে দিলেই কি ঠিক হ'ত? যতীর অভিশাপ মীনুকে স্পর্শ করবে না তো এসে? আহা! যতীও ভাল ছেলে! আমার যদি আরো মেয়ে থাকতো তবে আমি যতীকেও 'আপনার' করে নিতাম! কতদিন হল যতীকে দেখিনি, তার কোনো খবর জানিনে। সময় সময় তার জন্যে মন এত খারাপ হয়, কোথা যে গেল! একটু যদি আমাকে জানিয়ে যেত!"

স্নেহময়ী শতদলের চোখ দুটীও ছলছলিয়ে এল। বললেন, "শুভ্রাংশু, সুধা, খোকার চেয়ে আমি যতীকে কোনদিন অন্য ভাবিনি। মীনুকে সে বরাবরই খুব ভালবাসতো—তার পরে বিয়ের কথাটা জানাজানি হয়ে পড়াতে সে যে কত খুসী হয়েছিল, তার আর কি বলব! তার সে সময়কার হাসি মুখখানি যেন এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। আবার যেদিন প্রভাতের সঙ্গে মীনার বিয়ে ঠিক করলে, তার সেদিনকার ব্যথাকাতর মুখ, সারারাতের জাগরণ, কিছুই আমার চোখ এড়ায় নি। কিন্তু কি সংযমের সঙ্গে সে মীনুর বিয়ে পর্য্যন্ত কাটিয়ে দিয়ে গেল—কি সংযতভাবে অত বড় একটা বিপর্য্যয় ঘটার পরেও সেই মীনুর সঙ্গেই সে সরলভাবে ভাই-বোনের মত হাসি-খেলা করত তা আমার জানতে বাকী ছিল না। কিন্তু সে যে চলে যাবে এটা আমিও বুঝতে পারি নি। ভেবেছিলাম, মীনুর বিয়ের হাঙ্গামাটা মিটে গেলে তার বিয়ে দিয়ে তার মুখের দিকে যত্ন করে চাইবার, 'আপন' বলে কাছে টেনে নেবার একজন লোক করে দেব—কিন্তু সবই ভেস্তে গেল। যতী চলে গিয়ে আমার প্রভাতকে পাওয়ার আনন্দটা মাটী করে দিলে একেবারে। সখেদে রমাপতি বললেন, "কি ব্যথাই মনে পেল যে একেবারে দেশত্যাগী হয়ে গেল! মীনু কি এখনও ওর কথা ভাবে?

"তা আবার ভাববে না? বিশেষ করে যখন শুনেছে যে তার বিয়েই যতীর দেশ ছেড়ে পালাবার কারণ। তবে যতীকে সে 'যতীদা' ছাড়া আর কিছুই কোনদিন ভাবেনি—তাই নিরুদ্দিষ্ট ভাইএর জন্যে বোনের যেমন স্নেহ-মমতা থাকা দরকার তার বেশী সে কিছুই করে না। প্রভাতের স্নেহ যে তাকে শান্তি দিয়েছে, তা আমি বুঝতে পারি। তাই হোক, প্রভাতকে সে চিনে নিয়ে যেন, তার ঘরকেই আপন করে নেয়!"

রমাপতি স্ত্রীর মাথায় হাত বুলোতে বললেন "তা পারবে। তোমার মেয়ে যে।"—

"তুমি সেই আশীর্ব্বাদই ওকে কর। ভগবান্ ওকে বড় করে দিয়েছেন—বড়র মত মন নিয়ে, নিজের বলে কিছু না রেখে, মাতৃহারার মা হয়ে, নিরন্নকে অন্ন দিয়ে, দুঃখীর চোখের জল মুছিয়ে, হেসে, খেলে যেন ওর দিনগুলো কেটে যায়।"

"আমি বলছি, নিশ্চয় বলছি, দেখো লতা, মীনু ঠিক তোমারই মত সুগৃহিণী হবে। তোমার"—বাইরে 'হর্ণ শোনা গেল। রমাপতি ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াতেই, শতদল তাঁর হাতটা চেপে ধরলেন। বাধ্য হয়ে তিনি বসে পড়ে শতদলের কাণে কাণে বললেন, "আমাকে কি এই রান্নাঘরেই ধরে রাখতে চাও, ছেলে মেয়েদের সামনে?"

"না, ধরে আমি তোমাকে রাখতে চাইনে—তুমি যেটুকু সময় খুসী হয়ে আমার কাছে থাকতে চাও, সেই আমার ভালো—বারণ করছি শুধু এখন গেলে মীনা ও প্রভাত লজ্জা পাবে বলে। ওদের সুখস্বপ্ন এখুনি ভেঙে দেবে? লজ্জায় ওরা অস্থির হয়ে পড়বে।"

"আচ্ছা, তবে একটু বসি, তোমার এখানে ওরা কেউ তো আর আসছে না?"

"সম্ভব তো নয়। তবে কাপড় ছেড়ে মলিনা বোধহয় আসবে। এখ্খুনি কেউ আসছে না।"

"তবে আমিও আমার ভুলে যাওয়া যৌবনকে মনে করে, স্মৃতির দিনের আর একটু সঞ্চয় বাড়াই" বলে প্রৌঢ় রমাপতি তাঁর যৌবনের প্রিয়া, প্রৌঢ়ত্বের গৃহিণী, শতদলের চোখের পাতা দুটীর ওপরে একে একে চুমো দিলেন। অনেক দিন ভুলে যাওয়া, এই স্পর্শে শতদল শুধু একটু কেঁপে উঠলেন; বুঝি চোখ দুটী বন্ধ হয়েও এল। পরক্ষণেই রমাপতির হাতটা ছেড়ে দিয়ে তাঁকে এক রকম জোর করে তুলে দিয়েই বল্লেন "এইবার, তুমি বাইরে যাও। আমি তোমার খাবার ঠিক করে ডেকে পাঠাচ্ছি।"

রমাপতির মনে, তখন পঁয়ত্রিশ বছর আগের যুবা রমাপতি জেগে উঠেছিল—আগুনের আঁচে শতদল কেবলই ঘেমে উঠছিলেন—তাঁকে একটু সরিয়ে কাছে টেনে নিতেই ব্যস্ত হয়ে শতদল বলে উঠ্লেন, "তুমি ওঠ, তোমার খাবার দেরী হয়ে যাচ্ছে—তা ছাড়া ছেলে-মেয়েরা কে এসে পড়বে! রমাপতি হেসে উঠে পড়লেন। শতদল তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারতে আরম্ভ করলেন।

মীনা তার সেই ওপরের ঘরখানিতে গিয়ে একটু ক্লান্ত ভাবে বসে পড়্ল। কাপড় তখুনি ছাড়া হল না। গাড়ীতে প্রভাত যখন মীনার হাতখানি ধরে ছিল, অনেক বারই তার মনে হচ্ছিল যে আঙুলে যেন কি পরাণ হচ্ছে--কিন্তু পাশেই মলিনা বসে! হাতটা বের করে দেখতেও পারে না অথচ জিনিসটা দেখবার আগ্রহ তার মনকে ব্যস্ত করে তুল্লে। চেয়ারে এখন বসেই সব প্রথমে সে বাঁ হাতটা বের করে দেখ্লে সত্যিই প্রভাত তার অনামিকাতে হীরার আংটীটার পাশেই আর একটা "হার্ট সেপ" মীনা করা আংটী পরিয়ে দিয়েছে। প্রভাতের এই আত্মসমর্পণ জান্তে পেরে: মীনা তার কবি-মনের প্রশংসা না করে থাক্তে পার্লে না। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সে সেই আংটীটা দেখ্তে লাগলো—খুলে দেখ্তে ইচ্ছা হলোনা, মনে হল, প্রভাতের স্পর্শ তার সেই আঙুলে জড়িয়ে আছে। রাত্রে যদি প্রভাত এই আংটীর কথা কিছু জিজ্ঞাসা করে তবে তাকে কি বল্বে সেটাও যেন সে এখন থেকেই ভেবে রাখ্ছিল।

অনেকক্ষণ থেকে মীনার কোন সাড়া না পেয়ে মলিনা একবার তার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখ্লে মীনা চেয়ারের ওপর বসে একদৃষ্টে নিজের আঙুল দেখ্ছে। দূর থেকে মলিনা ব্যাপার কি তা বুঝতে না পেরে ঘরের ভিতরে এল। অল্প এগিয়ে এসেই শাদা হীরার পাশে নীল রংএর মীনে, তার দৃষ্টি আকর্ষণ কর্লে।—হাসিমুখে এগিয়ে এসে মলিনা বল্লে "ও তাই বলি! মীনুরাণীর দেখা নেই কেন? এ উপহার কখন্ এসে পৌছোল?—বাবা, খুব মেয়ে যা-হোক সকলের চোখ এড়িয়ে এটী কখন হাতে এল?—এদিকে চুপ চুপ করে থাকা ওদিকে সব ঠিক আছে!—"

"দেখ্ বৌদি, তুই যে ষাঁড়ের মত চেঁচাতে আরম্ভ কর্লি একেবারে!—আমি তো আর 'কালা' নই যে আস্তে বল্লে শুন্তে পাবনা!"—

"ওগো জানি গো জানি। এখন তুই যে চিন্তায় মগ্ন, তার কাছে আমার কথা ও উপস্থিতি যে তোর কাণে ও প্রাণে মধু বর্ষণ করবে না তা তো জানিই।"

"তোর উপস্থিতি বা কথা আমার কাণে, প্রাণে মধু বা গরল যা-ই বর্ষণ করুক, এই সন্ধ্যায় তুই সে কথা জান্তে আমার কাছে মর্তে এলি কেন? যার কাছে জিজ্ঞাসা করলে ঠিক উত্তর পাবি, রাত্রে তার কাছে জিজ্ঞাসা করে নিস্।"

"রাত্রে কেন?—এখুনি করব।"

"কর্ গে যা।—আমাকে জ্বালাতে এলি কেন?"

"যাব, যাব, তার আগে জেনে যাব 'সুন্দর' কোন সদুপায়ে 'বিদ্যার' হাতে আংটী পৌছে দিলেন?"

"বড়দাকে জিজ্ঞাসা করিস্। যে উপায়ে বড়দা মা-বাবার চোখ এড়িয়ে ঘন ঘন তোর ঘরে কাজের ছুতোয় যাওয়া-আসা করেন, ঠিক সেই উপায়ে।—"

"বুঝেছি। দেখি আংটীটা কেমন?"

মীনা তার আংটী শুদ্ধ হাতখানা মলিনার দিকে বাড়িয়ে দিলে।—মলিনা আংটীটা খুলে দেখতে গেল

মীনা একবার বারণ করতে গিয়ে থেমে গেল। আংটী দেখা হয়ে গেলে ফিরিয়ে দিতে দিতে মলিনা বললে—

"তুমি বিনা কেহ নাই,
মাতা, পিতা, ভগ্নি ভাই,
তুমি মম ধ্যান তুমি জ্ঞান !"—

হেসে মীনা বললে তুমি যা-তা বলছ বৌদি—"আমি কি চেয়েছি !"—

"আহা !—এ বুঝি চাইতে হয় ? আচ্ছা বল্‌তো, না চেয়ে পেয়ে তোর কি মনে খুব আনন্দ হয় নি ? চেয়ে পাওয়ার থেকে না চেয়ে পাওয়ার মাধুর্য্য বেশী, এ তো আর অস্বীকার কর্‌তে পারবিনে ?—নে চল্‌ এখন, সারা বিকেলটা তো বেশ বুড়ো মা'র ঘাড়ে সংসারটা ফেলে দিয়ে মজা করে বেড়িয়ে এলাম, দেখি গে কববার মত কোন কাজ মা মনে করে বাকী রেখেছেন কি না ?"—

"যাওনা, বারণ কে কর্‌ছে ?—আমি একটু পরে যাব।—"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তাই যেও মশা'য়। এখন বসে বসে ভাবো বিছানাটা কোন্ মুখো হওয়া দরকার, আলোটা কোনদিকে রাখা দরকার, ফুল বেলি ভাল না যুঁই ভাল, এই কর।—অনুগ্রহ করে চা নীচেই খাবে, না সে আবার এই অধমা দিয়ে যাবে ?"

"আমি মিনিট পনর'র মধ্যেই যাচ্ছি।—কাপড খুলেই। তুল্‌তে আজ আর পারছি না সব এখানেই পড়ে থাকবে।—চা'টা ঠিক করে রাখিস্ ভাই—নেমেই যেন পাই।"

"যো হুকুম" বলে মলিনা চলে গেল।

নীচে নেমে দেখলে শুভ্রাংশু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। দালানে মলিনাকে দেখ্‌তে পেয়ে তিনি বললেন "খুঁজে খুঁজে হয়রান !—কোথায় যাওয়া হয়েছিল ?'

গম্ভীর মুখে মলিনা বল্‌লে "সফরে।—"

শুভ্রাংশু নীরবে কথাটী হজম করে নিজের ঘরে চলে গেলেন। রান্নাঘরে শতদলকে জলখাবারের রেকাবী গোছাতে ব্যস্ত দেখে মলিনাও এসে যোগ দিলে।—কথায় কথায় প্রভাতের আংটী দেওয়ার কথাও সে শতদলকে জানিয়ে দিলে। শুনে তিনি শুধু একটু হাসলেন।

রাত্রের খাওয়া-দাওয়া মিটে গেলে, শুভ্রাংশু, প্রভাতকে সঙ্গে করে দোতলার সেই ঘরখানিতে গিয়ে গল্প জুড়ে দিলেন।—রাজনীতি,—অর্থনীতি, সামাজিক, লৌকিক সব আলোচনাই তাঁদের হতে লাগল। প্রায় ঘণ্টাখানেক এই রকম গল্প করার পর শুভ্রাংশু "আচ্ছা, রাত হ'ল তুমি শোও" বলে উঠে পড়লেন।—একটু পরেই ছাত, পার হয়ে সিঁড়িতে তাঁর চটির শব্দ শোনা গেল।—

মাসটা ফাল্গুন হলেও শীত অল্প ছিল। খোলা দরজাটা ঠেসিয়ে দিতে গিয়ে প্রভাত দেখ্‌লে মীনা ঠিক দরজার পাশেই ও মলিনা ফিরে যাচ্ছে।—মলিনার একেবারে চলে যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে প্রভাত মৃদু আকর্ষণ করে মীনাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল।—বাঁ হাতে তার একটা হাত ধরে রেখে, ডান হাতটা দিয়ে দরজায় খিল লাগাতে লাগাতে প্রভাত বল্‌লে "বেশ তো তুমি এই হিমে দাঁড়িয়েই রয়েছ। ভাগ্যে আমি দরজা বন্ধ করতে উঠেছিলাম, না হলে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে ?" দরজা বন্ধ করে মীনার কোমরটা জড়িয়ে ধরে সে টেবিলের ধারে এসে দাঁড়াল। মীনার বুকের ভিতর লজ্জায় তখন দুরু দুরু করে উঠছিল। কথা কি বল্‌বে তা দুজনের কেউই কিছু ভেবে পেলে না।—একটু পরে প্রভাত বললে, "আমি এসেছি বলে, তুমি খুসী হয়েছ ? আমার কথা তোমার মনে আসে ?" বারে—বারে জিজ্ঞাসা করাতে মীনা শুধু ঘাড় নেড়ে জানালে "হা"

"আংটীটা তোমার পছন্দ হয়েছে ?—"

"হয়েছে। কিন্তু তুমি আনলে কেন ?—এই তো বিয়ের সময় সেদিন 'পেণ্ডেণ্ট' দিয়েছ !—"

"আমার ভাল লাগ্‌ল, তাই এনেছি। দেখি, কি রকম দেখাচ্ছে ?—"

মীনা প্রভাতের হাতটা ছাড়িয়ে বিছানার নীচে থেকে আংটীটা বের করে প্রভাতকে দিয়ে বল্‌লে "পরিয়ে দেও"।—

"খুলেছিলে কেন ?—"

মৃদুস্বরে মীনা বল্‌লে "আংটীটা ভাল করে দেখ্‌বে বলে বৌদি খুলে নিয়েছিল, তোমার কাছ থেকে আবার পরে নেব বলে আমি আর পরি নি।" প্রভাত আবার মীনার হাতটা সযত্নে তুলে নিয়ে আংটী পরিয়ে দিল। মীনার গৌরবর্ণের সঙ্গে মীনের নীল রংটা খুবই মানিয়ে গিয়েছিল। প্রভাত মীনার আংটী-পরা হাতখানি খুব ধীরে আল্‌গা ভাবে ঠোঁটের ওপর ধরেই ছেড়ে দিল পাছে কোন আঘাত লাগে।—ঘরের ঘড়ীতে ১২টা বেজে গেল। প্রভাতের কাঁধের ওপর নিজের হাতটা রেখে মীনা বল্‌লে, "রাত অনেক তো হল।—এইবার ঘুমোবেনা !"—

"হুঁ চল।"—বলে প্রভাত তার সঙ্গে বিছানায় এল। দোলের জন্য তখন সাঁওতালদের পাড়ায় খুব নাচ গান হচ্ছিল—তারই মাদলের শব্দ অস্পষ্ট ভাবে ভেসে আস্‌ছিল।—

ক্রমশঃ

রাশিয়ার নব্যতন্ত্রে লেনিন ও ষ্টালিন

শ্রীশম্ভুচন্দ্র সেন গুপ্ত

প্রবন্ধ

রাশিয়ার নব্যতন্ত্রে ষ্টালিন কতখানি স্থান অধিকার ক'রে আছেন,—তা আর নতুন করে বলতে হবে না। এই পৃথিবী বিখ্যাত বলশেভিক নেতার রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হ'য়েছিল—যখন তিনি টাইফ্লিসের একটী থিয়োজফিক্যাল স্কুলের ছাত্র মাত্র। এই স্কুলের ছাত্রাবস্থায় তিনি বলশেভিষ্ট্‌দের দলে যাতায়াত আরম্ভ করতে থাকেন। এইরূপে ঘন ঘন যাতায়াতের ফলে তাঁর অনেকের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্টতা হ'য়ে উঠ্‌ল। ক্রমে ক্রমে তিনি বলশেভিকদলের এক প্রধান পাণ্ডা হ'য়ে উঠ্‌লেন। ষ্টালিনের চরিত্রের একটী বিশিষ্টতা আছে—সেটী হচ্ছে তাঁর অদম্য উৎসাহ। কোনও কার্য্যে বারবার হতাশ হ'লেও তিনি কখনও ভগ্নোদ্যম হ'তেন না। তার এই অপূর্ব্ব গুণটী অনেক আগেই লেনিনের চক্ষে ধরা পড়েছিল—তখন তিনি এত বড় নামজাদা নেতা নন—সামান্য একজন কর্ম্মী মাত্র। তাঁর এই 'ষ্টালিন' নাম লেনিনের নিজের দেওয়া। রুশ ভাষায় 'ষ্টলের' (Stal) অর্থ হচ্ছে ইস্পাত। তাঁর ইস্পাতের মত ইচ্ছাশক্তি লেনিনের দেওয়া এই 'ষ্টালিন' নাম সার্থক হয়েছে। ষ্টালিনের আসল নাম হ'চ্ছে—জোসেফ ভাইমারোনেভিচ্‌ জুগাম্‌ভিলি। কিন্তু তাঁর এই আসল নাম অনেকের কাছেই অজ্ঞাত—ষ্টালিন নামেই তিনি সকলের কাছে সুপরিচিত।

ষ্টালিন জর্জ্জিয়া প্রদেশে জুতা সেলাইয়ের কাজ করতেন। তাঁর অনুচরবর্গের মধ্যে যখন তাঁর কার্য্যকলাপ নিয়ে আলোচনা চলত—তখন দু'একজন তাঁর চরিত্রকে বাষ্পীয় রোলারের সঙ্গে তুলনা করতেন। রাস্তা তৈয়ারীর সময় বাষ্পীয় রোলার যেমন মন্থর গতিতে চলে—অন্যান্য গাড়ীর ন্যায় সচরাচর পথবিচ্যুত হয় না—যা সম্মুখে পায় তাই নিষ্পেষণ ক'রে যায়—ষ্টালিনের চরিত্র নাকি এই রকমই। যে পথে তিনি একবার অগ্রসর হ'তেন, শত বাধাবিঘ্ন এ'লেও সে পথ থেকে তিনি বিচ্যুত হ'তেন না। কিন্তু এই অপূর্ব্ব চরিত্রের তিনি অধিকারী হ'লেন কিরূপে? সকলের এ বিষয়ে একটা কৌতূহল জন্মাতে পারে। তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে তাঁর কারাজীবন সম্বন্ধে অনেক কিছুই বল্‌তে হয়। কারণ এই কারাজীবনের অভিজ্ঞতা ও কঠোরতাই তাঁর চরিত্রের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল—যার ফলে তিনি আজ এতবড় নেতা হ'তে সমর্থ হ'য়েছেন। কত কঠোর, কত ধৈর্য্যশীল হ'তে পারলে এত বড় হওয়া যায় তা তাঁর কারাজীবনের কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে জানাচ্ছি।

১৯০১ সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ বৎসর—সেই থেকে ১৯০৭ সাল পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ সতের বৎসর তিনি বিদ্রোহীরূপে দ্বাদশ বার গ্রেপ্তার হ'ন্‌ ও আর্ক্‌টিকের (Arctic) নিকটবর্ত্তী ভীষণ শৈত্য প্রধান ও নির্জ্জন স্থানে তাঁকে দ্বীপান্তরিত হ'তে হয়। কিন্তু প্রত্যেকবারই তিনি কারাগার থেকে পলায়ন করেন। পলায়নের সময় তাঁকে যে কি অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণা ও হীনতা সহ্য করতে হয়েছিল তা ধারণাতীত। দ্বাদশবার যখন তিনি গ্রেপ্তার হ'য়ে সাইবেরিয়ার নির্জ্জন প্রদেশে নির্ব্বাসিত হয়েছিলেন—তখন কেরেন্‌স্‌কি (Kerensky) তাঁকে ক্ষমা প্রদর্শন করায় তিনি মুক্তিলাভ করেন। জারের পুলিসের কাছে তিনি প্রহেলিকাস্বরূপ ছিলেন। কখন কিরূপে যে তিনি এ'দের চক্ষে ধূলি দিয়ে পালিয়ে যেতেন—তা এরা বুঝতে পারত না। এই চাতুরীবিদ্যা তিনি শিখেছিলেন জর্জ্জিয়া প্রদেশের 'কিন্‌টো'দের কাছ থেকে—বাল্যকালে তাদের সঙ্গে একত্র অবস্থানের ফলে। এই 'কিন্‌টো'দের (Kinto) জর্জ্জিয়া প্রদেশেই দেখতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে রাস্তায় ফেরী করা ছাড়া

এদের আর কোনও কাজ নেই। সেখানকার লোকেরা এদের 'ভবঘুরে' আখ্যা দিয়ে থাকে। ষ্টালিন এই 'কিন্‌টো'দের কাছ থেকে যে চাতুরী শিখেছিলেন—সেই বুদ্ধিশক্তি প্রয়োগ ক'রে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার অনেক বিশিষ্ট নেতাদেরও হতভম্ব ক'রে দিয়েছিলেন।

অনেকেরই মনে হ'তে পারে, ষ্টালিনের মত নেতা নিশ্চয়ই খুব পণ্ডিত ব্যক্তি। কিন্তু তা' নয়। একমাত্র কার্ল মার্ক্‌সের 'ক্যাপিট্যাল' ও লেনিনের গ্রন্থগুলি ছাড়া ষ্টালিন আর বেশী কিছু বই পড়েন নি। এই বইগুলি রুশ ভাষায় লেখা। অথচ শুন্‌লে আশ্চর্য্যান্বিত হ'বেন ১৫ বৎসর বয়সে 'টাইফ্লিসে'র স্কুলে ভর্ত্তি হ'বার পূর্ব্বে তিনি রুশ ভাষাতে কথা পর্য্যন্ত বলতে পারতেন না। এখনও তাঁর কথাবার্ত্তার উচ্চারণে জর্জ্জিয়া প্রদেশের প্রভাব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তিনি কার্লমার্ক্‌সের কতকগুলি বইয়ের টীকা করেছেন। এই ব্যাখ্যা পুস্তক-গুলিতে তিনি অতি সরল ও সহজ ভাষায় কার্লমার্ক্‌সের নীতিগুলি বিশদভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

ষ্টালিনের পরিবারের মধ্যে তিনি, তাঁর স্ত্রী ও তিনটী পুত্র ছাড়া আর কেহ নাই। মস্কোর কাছাকাছি গর্কী নামক একটি ছোট নগরে তিনি তাঁর পরিবার নিয়ে লেনিনের বাটীতে বাস করেন। এই বাটীতেই লেনিন তাঁর জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটিয়ে গেছেন। বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র অবকাশের সময় তিনি ক্রীমিয়া প্রদেশে বেড়াতে যান। এ ছাড়া তাঁর আর অন্য কোনও বিষয়ে অনুরাগ নেই। আমোদ-প্রমোদের স্থানগুলিতে তিনি মোটেই পদার্পণ করেন না। কাজকেই তিনি তাঁর একমাত্র আমোদের বিষয়ে পরিণত ক'রেচেন। দিনের মধ্যে চৌদ্দ থেকে ষোল ঘণ্টা তাঁকে কাজে ব্যস্ত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অনেক বৎসর পূর্ব্বে মাত্র দুবার বলশেভিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য তিনি দেশভ্রমণে বাহির হয়েছিলেন। একমাত্র রাশিয়া ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে তিনি খুব অল্পই খবর রাখেন। একমাত্র রুশ ভাষা ব্যতীত আর কোনও বিদেশীয় ভাষায় তার ব্যুৎপত্তি নেই। ষ্টালিন বড় অল্প কথা কন। এই জন্য তিনি কোনও সাধারণ সভায় যোগ দেন না বা বক্তৃতা করেন না! খুব প্রয়োজনীয় সভার অধিবেশন হ'লে তিনি বৎসরের মধ্যে হয়ত দুবার কি তিনবার এ সব সভায় উপস্থিত থাকেন।

এই ত গেল ষ্টালিনের দৈনন্দিন জীবনের কথা। রাজনৈতিক জীবনে তিনি কিরূপে অগ্রসর হয়েছিলেন—তা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। ১৯১৮ থেকে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত কমিউনিষ্ট পার্টির কাউন্‌সিলে ষ্টালিন একজন নগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। সে-সময় রুশিয়ার চারিদিকে যে সমস্ত বিদ্রোহীদল বর্ত্তমান ছিল—তা'দের প্রত্যেক দলটীর সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন। এ ছাড়া তাঁর আর একটী জিনিস ছিল—সে হচ্ছে তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা। এর দরুণই তিনি "কমিটী অফ্‌ সেভন্‌" (Committee of Seven)"এর সভ্য হ'তে পেরেছিলেন। এই কমিটী অফ্‌ সেভেন্‌ই পরে কেরেন্‌সকিকে বিতাড়িত করে ও ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসের পর কিছুদিনের জন্য বলশেভিক আন্দোলন পরিচালনা করেন। ষ্টালিনের আর একটী গুণ ছিল—সেটী হচ্ছে তাঁর আদেশকে কার্য্যে পরিণত করবার অসাধারণ ক্ষমতা। এর দরুণ লেনিন তাঁকে তাঁর সহকর্ম্মীদের মধ্যে একটী বিশিষ্ট স্থান দিয়েছিলেন।

অনেকেরই জান্‌তে ইচ্ছা হ'তে পারে ষ্টালিন সম্বন্ধে লেনিনের কি মত ছিল। ষ্টালিন সম্বন্ধে লেনিন কি মত পোষণ করতেন তা' তাঁর মৃত্যুশয্যায় কমিউনিষ্ট পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটীকে লিখিত একটী পত্রে জানতে পারা যায়। এই পত্রে তিনি ষ্টালিনের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে তাকে বলশেভিকদলের জেনারেল সেক্রেটারীর পদ থেকে অপসারিত করবার জন্য বিশেষ ক'রে লিখেছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়ার নেতার পদে ষ্টালিন তাঁর মতে একজন অনুপযুক্ত ব্যক্তি। কিন্তু লেনিন ষ্টালিনের এই অভ্যুদয়কে বাধা দিতে সমর্থ হন নি। যদি তিনি বেঁচে থাকতেন ও শয্যাশায়ী না হ'তেন, তা'হলে বোধ হয় তিনি এ বিষয়ে সফলকাম হ'তে পারতেন।

লেনিনের মৃত্যুর পরই ষ্টালিন বহির্জগতে এসে দাঁড়ালেন। যে দুই বৎসর লেনিন অসুখে শয্যাগত হ'য়ে পড়েছিলেন, সেই সময় ষ্টালিন অতি চতুরতার সহিত মতলব আঁটছিলেন। কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারল

সেক্রেটারীরূপে তিনি এইবার সেণ্ট্রাল কমিটীর সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করবার জন্ম তাঁর সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেন। এই সেণ্ট্রাল কমিটীই বলশেভিকদলের সমস্ত কার্য্য-কলাপ পরিচালনা করত। পূর্ব্বে এই কমিটীতে বলশেভিষ্টদলের সেরা সেরা ১৯ জন নেতা সভ্য ছিলেন। ষ্টালিন এই কমিটীর সভ্যসংখ্যা দ্বিগুণ করেন ও পরে এর সভ্যসংখ্যা একাত্তর জন পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করেন। বলাবাহুল্য নতুন সভ্যগণকে তিনি নিজেই নিযুক্ত করেছিলেন। এর পর তিনি উক্রেনে (Ukrain) ও অন্যান্য সোভিয়েট সাধারণ তন্ত্রে কমিউনিষ্ট দলের সেণ্ট্র্যাল কমিটীগুলি সংগঠনে মনোযোগ দেন। যারা তাঁর মতের বিরুদ্ধে যেতেন তাদের তিনি ছলে কৌশলে অপসারিত করতে লাগলেন। এইভাবে যখন তাঁর দল বেশ সুগঠিত হ'য়ে উঠল ষ্ট্যালিন স্বপক্ষীয় ব্যক্তিদের একে একে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত করতে আরম্ভ করলেন।

দলের ভেতর নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার পর ষ্টালিন অন্যান্য বিষয়ে মন দিলেন। তিনি ভালরকমই জানতেন, বলশেভিকবাদ দেশের আর্থিক ব্যাপারে যে নীতি প্রচলিত করেছেন দেশের জনসাধারণের পক্ষে তা দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠেচে। ১৯২১ সালে লেনিন অর্থ সম্বন্ধে যে-আইন প্রবর্ত্তন (New Economic Policy) করেন তাতে pıvatie trade অনুমোদিত ছিল। এর দ্বারা জনসাধারণের জীবন সুসাধ্য ক'রে দিয়েছিল। গম, মাখন, মাংস ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সমবায় সমিতিতে এসে হাজির হ'ত। প্রজারা যথেষ্ট পরিমাণে খেতে পেত। পূর্ব্বের অবস্থার তুলনায় এখন তাঁদের স্বর্গবাস বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

তাদের মতে রাজ্যের প্রচলিত অবস্থাই বেশ সুবিধা-জনক মনে হ'য়েছিল এর কোনও পরিবর্ত্তন তারা চায় নাই। কিন্তু ট্রট্স্কির মত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উল্টা ছিল। তার মতে লেনিনের এই অর্থ-আইন সাময়িক ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। তখন দেশের যেরূপ সঙ্কট অবস্থা হ'য়েছিল—তারই প্রতিবিধানে এই আইনের আবশ্যক ছিল—এখন এই আইনের রদ আবশ্যক -এই ছিল লেনিনের অভিমত। কমিউনিষ্ট সম্প্রদায়ের কয়েকজন ট্রট্স্কির এই মতকে সমর্থন করেছিলেন কিন্তু দলের বেশীর ভাগই ওই আইন প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। এদের মধ্যে রিকভ, বুখারিন্, ট্রটস্কি প্রভৃতি নেতারা একটী দল গঠন করলেন। লেনিন তাঁর জীবিতকালে বলশেভিষ্টদলের মধ্যে যে একতা এতদিন বজায় রেখে এসেছিলেন—এতদিনে তার অন্তিমকালে এর ভাঙ্গন সুরু হ'ল ও ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর মৃত্যুর পর এই মনোমালিন্য এরূপ চরম অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যে দুই দলে ঝগড়া সুরু হয়।

এই সময় ষ্টালিন খুব বিবেচনা ও কৌশলের সঙ্গে কাজ করতে লাগলেন। এ সময় যে পক্ষেরই জয় হোক না কেন এটা তার পক্ষে মঙ্গলজনক নয়—কারণ এতে তাঁর সমস্ত মতলব ব্যর্থ হ'তে পারে। দলের মধ্যে 'ট্রটস্কি'ই তাঁর একমাত্র চিন্তার বিষয় হ'ল। এর পর তিনি নিজেকে মধ্যপন্থী ব'লে ঘোষণা করলেন ও 'রাইট উইং' দলের কাছে মিলন প্রস্তাব প্রেরণ করেন। তাঁর এই প্রস্তাব রাইট উইং দলের নেতা রিকভ ও তাঁর সহকর্ম্মীগণ গ্রহণ করেছিলেন! এর পর ষ্টালিন ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে ট্রটস্কিকে নেতৃত্ব থেকে বিতাড়িত করেন।

এর পর ষ্টালিনের কার্য্যকলাপে সকলেই বিস্ময় অনুভব করেছিলেন। কারণ যে ট্রটস্কিকে তিনি দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন, পরে সেই ট্রটস্কিরই প্রধান প্রধান নীতিগুলিকে তিনি গ্রহণ করে কার্য্যে পরিণত করতে আরম্ভ করেন।

Forced collectivization. militarization of labour, accelerated tempo of industrialization. প্রভৃতি ট্রটস্কির প্রধান নীতিগুলিকেই ষ্টালিন গ্রহণ করলেন। ১৯২৮ সালে তিনি Five-year plan প্রবর্ত্তন করেন, লেনিনের অর্থ-আইন বদলাইয়া দেন ও Private Trade বন্ধ ক'রে দেন।

ষ্টালিনের এইরকম কার্য্যকলাপে যখন রাইট উইং' নেতারা বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাদের সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেচেন, তখন তাঁরা 'লেফ্ট্ উইং' দলের সহিত গুপ্তভাবে মন্ত্রণা করতে আরম্ভ করলেন—ষ্টালিনকে বিতাড়িত করবার জন্ম! কিন্তু তাঁদের এই চেষ্টা ঠিক সময়োপযোগী না হওয়ার দরুণ ফলবতী হয় নি। কারণ

ট্রট্স্কি তখন আলমাটার (Almuata) নির্ব্বাসিত অবস্থায় জীবন কাটাচ্ছেন এবং দলের ভেতর ষ্টালিন বেশ সুদৃঢ় ভাবে অবস্থান করচেন। ট্রট্স্কির অনুচর-বর্গের মধ্যে জিনোভিক্, ক্যামিনি প্রভৃতি নেতার ট্রট্স্কির ন্যায় তেজস্বিতা ছিল না। একমাত্র ব্যাক্ভ্স্বি ছাড়া দলের সকলেই ষ্টালিনের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং তিনি তাদেরকে গবর্ণমেন্টের বিভিন্ন বিভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে নিযুক্ত করে দেন।

ষ্টালিন কিরূপ দক্ষতার সহিত সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট্ ও পুলিসকে নিজ করায়ত্ত করেছিলেন তা' বুখারিন কর্ত্তৃক ক্যামেনিভকে লিখিত একটী পত্রে বেশ বুঝতে পারা যায়। এই চিঠিতে বুখারিন লিখেছিলেন,—"আমাদের সভার খবর যেন কেহ সন্ধান না পায়। টেলিফোনে আমার সহিত কথা কহিবেন না। আমাকে গুপ্তচর সদা সর্ব্বদা অনুসরণ করিতেছে। আমি আপনার সহিত কথা কহিতে ইচ্ছুক, কিন্তু কাহারও মধ্যস্থতায় নয়। রিকভ ও টম্স্কি ব্যতীত আর যেন কেহ আমাদের কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে কিছু জানিতে না পারে"।

এই চিঠি পাঠানোর ইতিহাস বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। মোকলনিকভ—যিনি বর্ত্তমানে লণ্ডনে সোভিয়েট রাজদূতের পদে অবস্থান করচেন—তিনিই এই চিঠি আদান-প্রদান করেছিলেন।

এর পর ষ্টালিন 'প্রাভদা'র সম্পাদক পদ থেকে বুখারিণকে বিতাড়িত করেন। এই 'প্রাভদা' পত্রিকাখানি কমিউনিষ্ট সম্প্রদায়ের মুখপত্র ছিল। তারপর টমসাককে সোভিয়েট ট্রেড্ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেন। এই সোভিয়েট ট্রেড্ ইউনিয়ন' কমিউনিষ্ট্ সম্প্রদায়ের পরই একটী বিশেষ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। টমস্কের স্থানে তিনি কাগানাউচ্কে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি ষ্ট্যালিনের একজন বিশিষ্ট ভক্ত। এইরূপে দু'বৎসর ক্রমাগতঃ কৌশল প্রয়োগ ক'রে তিনি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

ষ্ট্যালিনকে আজ আমরা সোভিয়েট রাশিয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নিয়ন্তারূপে বিরাজিত দেখতে পাচ্চি। সোভিয়েট রাজনীতি বিশারদগণের মধ্যে, এখন তিনি সর্ব্বোচ্চশাখায় অবস্থান করচেন। সামান্য অবস্থা থেকে তাঁর এই শক্তির চরমশিখরে আরোহণ—এ বড় কম বাহাদুরীর কথা নয়। কারণ তাঁকে এর জন্য তাঁর অপেক্ষা শত-গুণ প্রতিভাসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞদের সহিত প্রতিনিয়তই যুঝতে হয়েচে। ষ্ট্যালিন যখন ক্রমে ক্রমে এক একটি ক্ষমতা হস্তগত করছিলেন, তখন ট্রট্স্কি, ব্যাকভ্স্বি, জিনোভিক্, ক্যামোনভ্, রিক্ভ, টম্স্কি প্রভৃতি রাজনীতি বিশারদ নেতারা দুর্গের মধ্যে পরামর্শে পরস্পর নিযুক্ত ছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই ষ্ট্যালিনের অপেক্ষা রাজনীতিতে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে অনেক বড় ছিলেন। এই নেতারা যখন বিদ্রোহের বিভিন্ন পথ নিয়ে আলোচনায় রত ছিলেন—ষ্ট্যালিন তখন নিজের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে ব্যস্ত ছিলেন।

"পুষ্প" বিয়োগে *

নন্দন-বন-"পুষ্প" সে যে গো
ফুটেছিল ধরণীতে।
সৌরভ তার ছড়ায়ে আছিল
বিশ্বের চারি ভিতে।
সুমধুর তার কণ্ঠের গীতি
সুললিত তার বাণী।
মরতে কাহারও অভিশাপে সে কি
এসে ছিল বীণা-পাণি!
ক্ষণিকের তরে এসেছিল হেথা
বিলাতে অমিয় রাশি।
রাঙা ঠোঁটে তার খেলিয়া বেড়াতো
মধুর চটুল হাসি।
কমনীয় তাঁর অঙ্গ-সুষমা
কোমল তাহার প্রাণ—
ধরার রোদনে ব্যথিতা, তাইকি
অকালেতে অবসান!
ত্রিদিবের দেবী ফিরিল ত্রিদিবে
বাজিল শঙ্খ সেথা।
বিরহে তাহার ভরে উঠে জলে
সবার নয়ন হেথা।

—শ্রীপ্রতিভা ঘোষ

* কুমারী পুষ্পরাণী চ্যাটার্জ্জীর বিয়োগ-ব্যথায়।

পাথেয় উপন্যাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৫

মিঃ রায় নিজের গৃহমধ্যে চেয়ারে বসিয়া সেই দিনকার সংবাদপত্রখানা পাঠ করিতেছিলেন; ইন্দিরা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া পথের অগণিত জনতার পানে তাকাইয়া ছিল।

সেদিন জনৈক বিখ্যাত দেশনেতা কলেজ স্কোয়ারে বক্তৃতা দিবেন, দলে দলে খদ্দর-পরা ছেলের দল কলেজ স্কোয়ারের দিকে চলিয়াছে, মাঝে মাঝে সকলে মিলিয়া চীৎকার করিতেছে—বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্।

ইন্দিরার চোখে এ দৃশ্য একেবারেই নূতন। দেশ-সেবা—দেশপ্রেমের কথা সে বইতে পড়িয়াছে. ইউরোপ-জাপান প্রভৃতি স্থানে থাকিতে সে সব দেশের লোকের দেশকে ভালবাসা স্বচক্ষে দেখিয়াছে, কিন্তু ভারতবাসী যে কোনদিন দেশকে মা বলিয়া ডাকিতে পারে, দেশের ডাকে সাড়া দিতে পারে, তাহা সে জানে না বলিয়াই, এ দৃশ্য তাহার নিকটে একেবারে নূতন বলিয়া বোধ হইতেছিল।

দলের পর দল চলিয়া গেল, তাহাদের মুখ দৃপ্ত, তাহাদের কণ্ঠে বিজয়ধ্বনি, বন্দেমাতরম্—বন্দেমাতরম্।

শ্রান্ত ইন্দিরা ফিরিয়া আসিয়া পিতার পার্শ্বের চেয়ার খানায় বসিয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, "ওখানা কি আজকের কাগজ বাবা—"

কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া মিঃ রায় বলিলেন, "হ্যাঁ, আজকের কাগজই বটে; তুই পড়বি ইন্দু, আচ্ছা পড়।"

ইন্দিরা বলিল, "না, তুমি পড়। আজ ব্যাপারটা কি হবে তাই জানতে চাচ্ছিলুম। দেখলুম, দলে দলে ছেলে বুড়োর দল পথ দিয়ে কলেজ স্কোয়ারের দিকে চলেছে, সব খদ্দর পরেছে, কোথায় কি হবে বুঝি?"

মিঃ রায় বলিলেন, "হ্যাঁ, এই যে লিখেছে আজ কলেজ স্কোয়ারে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একজন প্রসিদ্ধ দেশনেতা বক্তৃতা দেবেন। এখানে যোগ দেওয়ার জন্যে দেশের সকলকেই বিশেষ করে ছাত্রদের, উপস্থিত হওয়ার জন্যে বলা হয়েছে।"

রুষ্ট হইয়া ইন্দিরা বলিল, "আর কিছু নয় এ কেবল ছেলেদের মাথা-খাওয়া। এই সব হুজুগে পড়ে লাভে হচ্ছে ছেলেরা লেখা-পড়া ছেড়ে দিচ্ছে, এই তো হচ্ছে এদের উন্নতি। এরা যেটুকু লেখাপড়া শিখতে পেয়েছে এতে শিখবে কেবল জোচ্চরী, চুরি ডাকাতি, মানুষ হতে কোনদিনই যে পারবে না, এ আমি লিখে দিতে পারি। এই সব ছেলেরা দেশের সেবা করবে—তবেই হয়েছে। দেশের সেবা করবে নাম নিয়ে করবে কেবল জোচ্চরী নয় ডাকাতি, এ ছাড়া আর কিছু করবার যোগ্যতা এদের হবে না।"

মিঃ রায় কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বেহারা একখানা কার্ড আনিয়া টেবলের উপর রাখিয়া সেলাম দিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দিরা কার্ডখানা তুলিয়া লইয়া তাহার উপর দৃষ্টি ফেলিয়া মুখখানা বিকৃত করিল মাত্র।

মিঃ রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ইন্দু?"

ইন্দিরা উত্তর দিল, "মিঃ মুখার্জ্জি।"

মিঃ রায় বেহারাকে আদেশ দিলেন "বাবুকে নিয়ে এসো।" সে চলিয়া গেল।

ইন্দিরা বলিল, "আমার কাজ আছে বাবা, আমি ও ঘরে গেলে হতো না?"

মিঃ রায় বলিলেন, "কাজ হবে এখন মা. এখনও তো বেলা ঢের পড়ে আছে।"

পর্দ্দা সরাইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সুশীল মিঃ রায়কে অভিবাদন করিল।

মিঃ রায় বলিলেন, "বসো সুশীল, আমি সকালেই বেয়ারাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলুম, কাগজপত্রগুলো

দেখা শোনা চাই, বুঝে নেওয়া চাই নইলে, অফিসের কোন কিছুই বুঝতে পারব না। সেই জন্য তোমায় বিশেষ করে—''

বলিতে বলিতে হঠাৎ তিনি থামিয়া গিয়া বিস্ফারিত নেত্রে সুশীলের পরিচ্ছদের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

তাঁহার দৃষ্টির সামনে সুশীল সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল।

মিঃ রায় একটু থামিয়া বলিলেন, "আজকাল তুমিও খদ্দর ধরেছ দেখছি সুশীল, দিন দিন তোমাদের সব হচ্ছে কি বল দেখি? তোমাদের ব্যাপার দেখে আমি যে একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি।"

ইন্দিরা মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুমিও দেশোদ্ধারে নামছ নাকি?"

তাহার কথার উত্তর না দিয়া সুশীল মিঃ রায়ের পানে তাকাইয়া বলিল, "একটা মিটিং ছিল, সেখানে গিয়েছিলুম, সেইজন্যে ভারতীয়ের জাতীয় পোষাক পরে গিয়েছিলুম।''

"ভারতীয়ের জাতীয় পোষাক কি খদ্দর" ইন্দিরা এবার প্রকাশ্যেই হাসিয়া ফেলিল,

সুশীল গম্ভীরভাবে বলিল, "যদি বলি তাই—"

ইন্দিরা বলিল, "আমি ত বলি, এই খদ্দর পরার মূলে কিছু নেই, আছে শুধু একটা উদ্দামভাব, যেটাকে পাগলামী বলা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।"

মুখখানা লাল করিয়া ফেলিয়া রুদ্ধশ্বাসে সুশীল বলিল, "পাগলামী?—"

ইন্দিরা বলিল "সত্যিই তাই। আপনারা চান খদ্দর পরে দেশ উদ্ধার করতে, কিন্তু তাই কি হতে পারে আমি তাই জিজ্ঞাসা করি? এই খদ্দরে দেশকে উন্নত করবে—স্বাধীন করবে, এ স্বপ্ন যারা দেখে তারা পাগল ছাড়া আর কি হতে পারে?"

দৃঢ়কণ্ঠে সুশীল বলিল, "আমি তোমার কথায় প্রতিবাদ করছি, আমি জানি খদ্দরে দেশকে অনেকটা ক্ষতির হাত হতে বাঁচাতে পারবে। তুমি বলছ, এ কোনদিন হবে না, কিন্তু যদি কোনদিন হিসেব করে দেখতে ইন্দু, দেখতে পেতে,—এক এই কাপড়েই কত টাকা বিদেশে চলে যায়। অবশ্য আমি এ কথা জোর করে বলব না যে এক এই খদ্দরেই আমাদের এই ভারতবর্ষের পরাধীনতা ঘুচিয়ে একে স্বাধীনতা দেবে, তবে খদ্দরও যে একটা প্রধান অভাব দূর করবে এ কথা জোর করে বলতে পারা যায়। তুমি হয়তো কোনদিন জানতে চেষ্টা কর নি আগে আমাদের দেশের অবস্থা এ রকম ছিল কি না। তুমি জন্মে জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত দেখছ, এ দেশের লোকেরা পরাধীন হয়ে আছে। কোনদিন তারা মুখ ফুটে নিজেদের অভিযোগ পর্য্যন্ত রাজদ্বারে করতে চায় না। সে রকম বরাবর দেখে এসেছ বলেই মনে করে এসেছ চিরদিনই এ দেশ এমনি ছিল, দেশবাসী চিরকালই এমনি করে পরের হাততোলা দানে তাদের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করে এসেছে। সত্যি যদি কোনদিন এ দেশের অতীত জীবনের ইতিহাসখানার দিকে একটী বারের জন্যেও তোমার চোখ পড়ত ইন্দু, দেখতে পেতে—চিরদিন এ দেশ এমনই দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে ছিল না, এ দেশ একদিন স্বাধীন ছিল, এদেশের লোকেরা একদিন নিজেদের ভাত-কাপড়ের যোগাড় নিজেরাই করেছে, সেদিন বিদেশী এসে তাদের শিল্প, বাণিজ্য, দেশ সবই নিজের হাতে নেয় নি।"

একটু থামিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে আবার বলিল, "বড় কম কৌশলে এরা তো এ দেশকে সহজে জয় করতে পারে নি। আজ ভারতবর্ষ দীনা কাঙ্গালিনী হয়ে পড়েছে, নিজের বসন ভূষণে অন্যকে সাজিয়ে সে আজ রিক্তা হয়ে এক পাশে পড়ে রয়েছে; আজ তাকে পেটের ভাত যোগানের জন্যে পরের দরজায় চাকরী করতে হয়, পরণের কাপড়ের জন্যে লোকের কাছে হাত পাততে হয়। আমি আজ খদ্দর পরেছি বলে তুমি আমায় বিদ্রূপ করছো ইন্দিরা, কিন্তু তোমার পরণে ওই সুন্দর কাপড় জামার জন্যে যে তুমি বিশ্বের চোখে বিদ্রূপের পাত্রী হয়েছ তা কোনদিন ভেবে দেখেছ কি? আজ তুমি একজন ইউরোপীয়ের কাছে যাও, সে ভদ্রতার খাতিরে মুখে তোমায় আপ্যায়িত করলেও মনটা কি তার ঘৃণায় ভরে উঠে না, সে কি তোমায় পদানত কুকুর বলেই মনে করবে না?"

বিচলিত হইয়া উঠিয়া ইন্দিরা বলিল, "তুমি ও কি বলছো?"

জোর করিয়া মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া সুশীল বলিল, "হ্যাঁ, যা সত্যি তাই বলছি ইন্দিরা, অতিরিক্ত

এতটুকুও বলি নি। মানুষ বিশ্বাস করে, কিন্তু সে বিশ্বাস যদি একবার কোন রকমে ভেঙ্গে যায়, আর কি তার পরে বিশ্বাস রাখতে পারা যায়?"

ইন্দিরা উত্তর দিল না।

সুশীল বলিল, "বল, কেউ যদি তোমার বিশ্বাস ভেঙ্গে দেয়, তুমি কি আর কখনও তাকে বিশ্বাস করতে পারবে?"

ইন্দিরা নীরবে কেবল মাথা নাড়িল, মুখে একটী কথাও বলিল না।

একটু হাসিয়া মিঃ রায় বলিলেন, "আমি বলছি সুশীল, যে বিশ্বাসের পাত্র একবার বিশ্বাস হারায় তাকে আর বিশ্বাস করা যায় না।"

সুশীল বলিল, "সত্য কথা। আমাদের দেশের রাজা ইংরেজ, যাদের কাছে আমরা মান চাই, প্রতিষ্ঠা চাই, তারা কি সত্যই আমাদের বিশ্বাস করে? কাজের সময় ওরা আমাদের গায়ে হাত বুলায়, সে সময় ওরা আমাদের বন্ধুভাবে গ্রহণ করে, কিন্তু কাজ ফুরিয়ে গেলে তারা আমাদের হয় তো চিনতেই পারে না, কেননা ওরা যে রাজার জাতি আমরা যে ওদেরই অধীন।"

ইন্দিরা নরম স্বরে বলিল, "ধরছি—না হয় তোমার কথাই সত্যি, ওরা আমাদের অতি হেয় অতি অপদার্থ বলে মনে করে, কিন্তু খদ্দর পরলেই যে তারা আমাদের মানুষ বলে ভাববে এমন কি কথা আছে?"

সুশীল হাসিল, বলিল, "অন্ততঃ পক্ষে এই কথাটুকুই আজ জোর করে বলতে পারি ইন্দিরা, আজ আমাদের কাজেই তারা জানতে পেরেছে, যতটা হেয় বলে তারা ভারতীয়কে ভেবেছিল তা আর ভাবতে পারছে না। তুমি এখনও নিজের দেশকে—নিজের দেশবাসীকে চিনতে শেখনি, কিন্তু আশা করছি—শিগ্‌গিরই চিনবে, সেদিন আজকের দিনের কথা ভেবে লজ্জিতা হয়ে উঠবে।"

ইন্দিরার মুখ অন্ধকার হইয়া গেল, আর একটী কথা না বলিয়া সে সেদিনকার কাগজখানা টানিয়া লইল।

মিঃ রায়ের পানে ফিরিয়া সুশীল বলিল, "অনেক অকাজের কথাঃ এসে পড়েছে, এর জন্যে আমায় মাপ করবেন। যে কথা বলবার জন্যে ডেকেছিলেন সে কথা এবার বলুন।"

মিঃ রায় ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "সে কথা বলতুম, যে প্রশ্ন করতুম তার উত্তর তোমাদের এই সব কথাবার্ত্তার মধ্যেই পেয়ে গেছি সুশীল।"

বিস্মিত হইয়া গিয়া সুশীল বলিল, "কি প্রশ্ন করতেন আর তার কি উত্তর আপনি পেলেন?"

মিঃ রায় বলিলেন, "আমি প্রশ্ন তুলতুম—অফিসে কেন কেবল ভারতীয় লোকই রয়েছে, ইংরেজ কেউ নেই কেন? এখন বুঝছি মনের মধ্যে ভারতীয়দের সম্বন্ধে এই মহান আদর্শ রেখেই তুমি কোন যোগ্যতম ইংরেজকে অফিসের কাজে রাখনি।"

জিজ্ঞাসুনেত্রে সুশীল তাঁহার পানে তাকাইয়া আছে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমি তোমার কথা শুনে এখন বেশ বুঝতে পারছি—ইংরেজ আমাদের ঘৃণা করে এই কল্পনাটা মনের মধ্যে রেখে তুমিও ওদের তেমনই ঘৃণা করছ, ওদের কোন কাজ দাও নি, কিন্তু—"

বাধা দিয়া সুশীল বলিল, "আপনিই বুঝতে ভুল করছেন। ওদের হয় তো আমি পছন্দ করিনে কিন্তু তাই বলেই যে কাজ দিচ্ছি নে তা নয়। আমাদের এই 'না পছন্দ করা' ওদের কতটুকু ক্ষতি করতে পারে ভাবুন দেখি, আমরা ওদের হুকুমে চলতে যখন বাধ্য, তখন আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় ওদের কতটুকু আসে যায়? এ দেশে "খয়ের খাঁর" তো অভাব নেই, ওরা যদি ভুলের বশেও একটা কাজ করে যায়, এই খয়ের খাঁয়ের দল বলে উঠবে—ঠিক হয়েছে, ভাল হয়েছে। ওদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে পারি আমার ক্ষমতা কি? তবু যে বলবেন আমি ভারতীয়দেরই কেবল কাজ দিয়েছি, সেটা কেবল ওদের জানিয়ে দিচ্ছি—ওরাও পারে, ওদেরও সে শক্তি আছে। আপনি এতে আমায় দোষ দিচ্ছেন, কিন্তু আমার মনে হয়, আপনি একবার ভাল করে বুঝে দেখলে এতে আমার দোষ পাবেন না।"

সুশীলের কথা শুনিতে শুনিতে মিঃ রায়ের মুখখানা দু' তিনবার বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, কথা যখন ফুরাইল—যখন তিনি মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার মুখ দিব্য প্রশান্ত।

১৬

মিঃ রায় কি ভাবিতেছিলেন, সুশীল ইন্দিরার হাতের কাগজখানার পানে চাহিয়া রহিল।

চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া একটা আড়ামোড়া ছাড়িয়া মিঃ রায় বলিলেন, "তুমি কিন্তু গোড়াতেই একটা দারুণ ভুল করেছ সুশীল। ইন্দিরা অবশ্য আগে তোমার সঙ্গে তর্ক করবার জন্যেই নেমেছিল কিন্তু তর্ক করার মত প্রচুর শক্তি তার নেই তাই সে চুপ করে গেল। আমি নতুন কথার অবতারণা করছি নে, সেই কথারই জের টেনে চলেছি মাত্র। এই দেশের লোকেরা অনেককাল ধরে দাসত্ব করছে, দেড়শো বছরের ওপর পৌণে দুশো বছর হবে তারা এই শিকলে বাঁধা পড়েছে। দাসত্ব তাদের এমন মজ্জাগত হয়ে পড়েছে যে দাসত্ব করব না বললেও কেউ শোনে না। এই যে এদেশের ছেলেরা স্কুল কলেজে লেখাপড়া শিখছে—এর মূল লক্ষ্য কি বল দেখি,—দাসত্ব নয় কি? ওদের মনে আশা আছে ওরা লেখাপড়া শিখবে উঁচু চাকরী পাবে। এ দেশের মায়েরা ছোট বেলায় ছেলেদের ঘুম পাড়ানোর ছড়া বলেন—তাতেও বলে থাকেন—খোকা বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে চাকরী করবে। কই, কোন মা বলতে পারেন না—তাঁর খোকা বড় হয়ে স্বাধীন থেকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মুটেগিরি করেও জীবিকার্জ্জন করবে? কই এত দেশে গেছি, এত দেশ বেড়িয়েছি, কোন মায়ের মুখে এ গান তো শুনিনি যে তাঁর ছেলে—"

বাধা দিয়া সুশীল বলিল, "আমাদের দেশে কি কোন বীর জন্মায় নি যে চাকরী-করা ঘৃণা করেছে? আপনি বলতে চান অন্য দেশের মায়েদের কথা, কিন্তু আমাদের দেশেও কি তেমন মা জন্মান নি যিনি স্তন্য দুধের সঙ্গে ছেলের মনে স্বদেশপ্রীতির বীজ বপন করেছিলেন? না না, আমি আর সে সব কথা বলব না, তবে এইটুকু আপনাকেও বলি—নিজে ভারতীয়—বাঙ্গালী হয়ে—ভারতীয়ের মুখে বাঙ্গালীর মুখে এমন ভাবে চুণকালি লেপে দেবেন না।"

উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া মিঃ রায় বলিলেন, "আমি তোমার উদ্দেশ্য বেশ বুঝেছি সুশীল; কিন্তু বুঝলেও আমি এখন তোমায় কিছু বলব না, শেষ পর্য্যন্ত আমি দেখতে চাই। তুমি এ দেশের লোকদের যোগ্যতা পরীক্ষার স্থান নির্দ্দেশ করেছ আমার অফিস, কিন্তু সেটা সে ছেলেখেলার জায়গা নয়, লক্ষ লক্ষ টাকা ওর পেছন ঢালা হয়েছে—হচ্ছে সে কথা মনে রেখো। অবশ্য আমি এ কথা বলিনে যে আমার অফিস কেবলমাত্র ইউরোপীয়ানদের দ্বারাই চলবে, এ দেশের লোকও থাকবে বই কি, না থাকলে চলবে কেন? তুমি বলছো—এদেশের লোকদের মাথাতেও বুদ্ধি আছে,—তা যদি বল—তবে আমিও বলি—গরুরও তো বুদ্ধি আছে, তবে সে কেন বোঝা বয়, কেন গাড়ী টানে? এ দেশের লোকেরা গরুর মত শুধু বোঝা বইতে জানে, আর কিছু জানে না। এরা কি নিজের জাতিকে জগতে শ্রেষ্ঠ করে তুলবার জন্যে হাসতে হাসতে মরণকে আলিঙ্গন করতে পারে?"

সুশীলের চক্ষু দুইটী প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, আর্দ্র কণ্ঠে সে বলিল, "হ্যাঁ পারে। ভারতীয় কতখানি ত্যাগ করতে পারে, কেমনভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে—অতখানি ত্যাগ করতে আর কোন জাতি কখনও পারবে না, অমন ভাবে মরণকে আলিঙ্গন করতেও আর কেউ পারবে না!"

মিঃ রায় মৃদু হাসিলেন, তাঁহার সে হাসিতে স্পষ্ট ভাবে অবজ্ঞাই ফুটিয়া উঠিল, সুশীলের চক্ষুতে তাহা এড়াইল না, কিন্তু সে নাকি অত্যন্ত আহত হইয়াছিল বলিয়াই চুপ করিয়া রহিল।

মিঃ রায় বলিলেন, "ধরলুম ভারতবাসী মরতে পারে অসাধ্য সাধনও করতে পারে। হ্যাঁ, মরতে যে পারে এ কথায় অস্বীকার করব না—করতে পারব না। বাঁচার সহস্র উপায়ে থাকতেও এরা কেমন সহজে অদৃষ্টের পর নির্ভর করে বসে থাকে, খেতে পেলে বলে—অদৃষ্ট জুটিয়েছে না খেতে পেলে বলবে—অদৃষ্ট জুটায় নি, কাজেই খাওয়া হল না।"

সুশীল একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল, "অর্থাৎ আপনি বলতে চান জগতে কে না শ্রেষ্ঠ জাতি আছে তারা কোনদিনই অদৃষ্ট মানে না, পুরুষকারটাই মেনে চলে।

তাই যদি হল, নেপোলিয়ান কেন অদৃষ্ট মানতেন, তিনি কেন—"

বাধা দিয়া হাসিয়া উঠিয়া মিঃ রায় বলিলেন, "ওই তো, নেপোলিয়ান অদৃষ্টকেই মূলাধার বলে খুসি থাকার জন্তেই না তাঁকে শেষকালটায় সেণ্ট-হেলেনায় থাকতে হয়েছিল। অত বড় একজন মহান সম্রাটের শেষ জীবনের পরিণামটাও যে তোমার কাছে অজ্ঞাত থেকে গেছে তা তো নয়। আসল কথা বোঝ সুশীল—অদৃষ্টের পর নির্ভর করে বসে থাকে কাপুরুষে পুরুষে নয়। আমাদের এই ভারতবর্ষ অদৃষ্টবাদী, তাই না যুগে যুগে যে কোন জাতি এসেছে, অবাধে প্রভুত্ব করে গেছে, নির্জীব ভারতবাসী কপালে হাত দিয়ে শুধু বলেছে—অদৃষ্ট। তারা নির্য্যাতন সয়েছে, পরের প্রভুত্ব সয়ে গেছে, তবু তারা নিজেদের পদে নির্ভর করে দাঁড়ায় নি। তুমি ভারতীয়দের যে ত্যাগ যে মরণের কথা উল্লেখ করছ সুশীল তা তারা স্বেচ্ছায় করে নি, দায়ে পড়ে করতে বাধ্য হয়, কাজেই ও কথাটা যেখানে-সেখানে আর বলো না, ওতে তোমায় উপহাসাস্পদই হতে হবে মাত্র।"

সুশীলের সুগৌর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল সে মুখ নত করিল।

মিঃ রায় কোমল স্বরে বলিলেন, "জানি, আমার মুখ হতে হয় তো এমন অনেক শক্ত কথা বার হয়েছে যাতে তোমার মনে আঘাত লেগেছে কিন্তু এখন ওসব কথা ছেড়ে দাও সুশীল, আমরা নিজের কথায় আবার আসি। আমার অফিসের কথা হচ্ছিল, সেই কথাই হোক। আমার অফিসে সকলেই ভারতীয় থাকতে পারে না, কয়েকজন উপযুক্ত শিক্ষিত ইউরোপীয়ান থাকবে আর জন কতক উচ্চপদস্থ ভারতীয়কে বিদায় দিতে হবে।"

"আমাকেও তো তা হলে বিদায় নিতে হবে, আপনি আমাকেও তো নামিয়ে দিতে চান?'

তাহার বিকৃত কণ্ঠে চমকাইয়া উঠিয়া ইন্দিরা কাগজ হইতে মুখ তুলিল!

মিঃ রায় বলিলেন, "আরে না না, তাও কি হয় সুশীল? তুমি যেমন আফিসের সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে আছ তেমনিই থাকবে, তোমার অধীনে আর সব থাকবে—এটা কি তোমার পদমর্য্যাদা নয়।

সুশীল উত্তর দিল না।

মিঃ রায় তাহার শুধু মুখখানার পানে তাকাইয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি এতে এত ভাবছ কেন বল দেখি? একটু ভেবে দেখ-আমি যা ব্যবস্থা করছি এতে অফিসের উন্নতি হবে কিনা। এই কয়টা বছর দেশে দেশে ফিরেছি, দুনিয়ার সকল জাতের সঙ্গে মিশেছি, সকলকে পরীক্ষা করে ব্যবসাকাজে কে উপযুক্ত কে অনুপযুক্ত ঠিক করেছি। আমার সিদ্ধান্ত ভাল কি মন্দ হবে তা তো তুমি একমাস পরীক্ষা করে নিজেই জানতে পারবে সুশীল।"

সুশীল উন্মনা ভাবে বলিল, "আপনি তা'হলে অফিসে এ ব্যবস্থা জানিয়ে দেবেন, আমার বলার চেয়ে আপনার বলা ভাল বলে মনে করি।

মিঃ রায় হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওহে ইয়ং ম্যান রক্ত অত গরম হতে দিয়ো না, ঠাণ্ডা হয়ে কথাগুলো আগে শোন। অমি অফিস হতে কাউকেই দূর করব না, অফিসটাকে আর একটু বাড়াব, আর কয়েকটা বড় বড় পোষ্ট তৈরী করে তাতেই ইউরোপীয়দের রাখব। অবশ্য তারা সকলের পরেই হুকুম চালাবে, তাই বলে কি তোমার পরে হুকুম চালাবে তাই মনে করেছ? জীবনের একটা শুভকাজের প্রারম্ভে সামান্য একটা কাজের অছিলায় লোকের অভিশাপ কুড়াতে আমি তোমাদের কাউকেই দেব না।

সস্নেহ দৃষ্টি একবার কন্যা ও সুশীলের উপর দিয়া তিনি বুলাইয়া লইলেন।

"ম্যানেজার লোকটাকে অন্য কাজে বাহাল করতে হবে, আর বাপু, ওই টাইপিষ্ট মেয়েটাকে বিদায় করে দিতে হবে, ওকে আমার অফিসে রাখা চলবে ন।"

সুশীল বিস্ফারিত নেত্রে মিঃ রায়ের মুখের পানে তাকাইল, তাহার মুখখানা যে মুহূর্ত্তের জন্য বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তাহা ইন্দিরার সতর্ক দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না।

সুশীল মুহূর্ত্তে নিজেকে সামলাইয়া লইল। শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "কিন্তু বিনা অপরাধে তো তাকে ছাড়ানো চলবে না, তার একটা কোন দোষ তো বার করতে হবে।"

একটা মোটা সিগার ধরাইতে ধরাইতে মিঃ রায় বলিলেন, "সে আমি দেখে নিয়েছি। খাতাপত্রে দেখেছি সে কাজে জয়েন করা হতে এ পর্য্যন্ত অনেকদিনই অ্যাবসেণ্ট থেকে গেছে। যদিও তুমি অন্ত লোক দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছ, আমার অফিসের কোনও ক্ষতি হয় নি, তবু আমি জানতে চাই—কেন এ রকম হবে? এটা বড় কম অফেন্স নয়, আর এর জন্তেই যে তাকে কর্ম্মচ্যুত করা যায় তা তুমি জানো নিশ্চয়ই।"

সুশীল নত মু-খ একখানা কাগজের পানে চাহিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

মিঃ রায় নরমস্বরে বলিলেন, "একটা কথা কি জানো আমি এই নেটিভ খৃশ্চানগুলোকে ঘৃণা করি। এই সব অল্পবয়স্কা খৃশ্চান মেয়ে, ওদের কখনও বিশ্বাস করতে আছে, ওরা না পারে এমন কাজই নেই। ভেবে দেখ, খৃশ্চান হয় কারা যারা লো-কাষ্ট, তারাই খৃশ্চান হয়, হিন্দুধর্ম্মে বৈষ্ণব হয়। বৈষ্ণবদের তবু পথ আছে, ওরা নিজের ধর্ম্মেই থাকে, কিন্তু নেটিভ খৃশ্চানদের সে পথও নেই। যারা এক সময়ে নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করতে পারে তারা না করতে পারে কি? ধর্ম্মটা কি নেহাৎ ছেলেখেলার জিনিস, গায়ের কাপড় যে যখন খুসি বদলানো যাবে? কাজেই বুঝে দেখ এই সব নেটিভ খৃশ্চানদের এ কুলও নেই ও কূলও নেই; হিন্দুরাও ওদের বিশ্বাস করে নয়, সাহেবেরাও ওদের বিশ্বাস করে না। ওই সব লো-কাষ্ট খৃশ্চান—"

বাধা দিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে সুশীল বলিল, "মানুষকে মানুষ হিসাবেই ধরা উচিত, জাতি হিসাবে ধরতে গেলে অনেক সময় চলে না। আজ আপনি যেমন খৃশ্চানকে ঘৃণা করছেন, খৃশ্চানও কি আপনাকে তেমনই ঘৃণা করছে না? প্রত্যেক জাতিই প্রত্যেক জাতিকে নিজের চেয়ে হীন চোখে দেখে এটা তো স্বীকার করতে পারবেন। আপনি বলছেন, কেউ নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করে পরের ধর্ম্ম নিয়েছে, অতএব তাকে কোনদিনই বিশ্বাস করতে নেই। কথাটা যে খুবই দামী তা আমি জানি, কারণ ধর্ম্ম পরিত্যাগ যে করতে পারে সে যে সবই করতে পারে লোকে সেই কথাটাই ধরে রেখে দেয় কিন্তু যে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করলে তারও যে একটা দিক আছে সেটা কি কেউ কোনদিন দেখে? হয় তো কোনও কারণে বড় মনোকষ্ট পেয়ে কেউ ধর্ম্মত্যাগ করেছে, কেউ বা বিশ্বাস হারিয়ে করে, কিন্তু সকলেই যে খেয়ালের বশে ধর্ম্মত্যাগ করে এ কথার মনে ভাবাই অন্তায়। সে যাই হোক—যে যাই করুক, আমাদের তাতে কতটুকু যায় আসে? আমরা কেবল একটা দিক দেখব সে ধর্ম্মত্যাগী, আর কোন দিক দেখব না? তার শক্তি সাহস, তার দৃঢ়তা, তার স্বদেশ প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি ইত্যাদি সুকোমলবৃত্তি যে আছে তা কিছুই দেখব না, দেখব একমাত্র দোষ তার ধর্ম্মত্যাগ, না, এতখানি সঙ্কীর্ণতা হয় তো মনের মধ্যে জাগাতে পারব না, আমায় মাপ করবেন।"

মিঃ রায় একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন, "ধরলুম, মিস দাস না হয় কোন সম্ভ্রান্ত ঘর হতেই এসেছে, তবুও আমি তাকে এখানে কাজে রাখা অনেক কারণে ভাল বলে মনে করি নে। টাইপিষ্টের জন্তে ভাবনা নেই, আজ যদি কাগজে জানাই, কালই দেখতে পাবে— টাইপিষ্টে আমার অফিস ভরে গেছে।"

ইরা যে কতখানি কষ্টে ও অভাবের মধ্যে পড়িয়া কাজ করিতে আসিয়াছে তাহা জানে একমাত্র সুশীল, আর কেহই না। এই কাজটার উপর তাহাদের মা ও মেয়ের জীবন নির্ভর করে। আজ এ কাজ গেলে কাল তাহাদের কি অবস্থা হইবে তাহা সুশীল জানে বলিয়াই সে ইহার পক্ষ লইয়া একটা কথাও বলিল না। সে বুঝিতেছিল কোথায় ইহারা গলদ দেখিয়াছেন, কেন তাঁহারা ইরাকে তাড়াইতে চান।

খানিক চুপ-চাপ বসিয়া থাকিয়া সে উঠিয়া পড়িল, ভাল কথা মিস্ দাসকেও "আপনি জানিয়ে দেবেন।"

মিঃ রায়ও উঠিলেন, "তুমি যদি না বল তবে আমাকেই অগত্যা জানাতে হবে।"

সুশীল একটা শুষ্ক অভিবাদন দিয়া চলিয়া গেল, আর পিছন পানে ফিরিয়াও চাহিল না।

স্রোতের মুখে

ডাঃ শ্রীনৃপেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী এম-এ-ডিলিট গল্প

পোষ্ট কার্ডে লেখা সামান্য কয়েকটি ছত্র! তাতেই সঙ্কুর মন খুসীতে ভরে উঠে।

একবার—দুবার—তিনবার—প্রতিবারেই যেন কেমন নতুন লাগে। নীল জামাটার বুক পকেটে রেখে দেয়, টেনে বের করে! পড়ে আবার সস্নেহে পকেটে পুরে বোতামটা আস্তে আস্তে এঁটে দেয়।

হাতের লেখাটা কার? রামলালের? তা হোক্, কথাগুলো ত দুলারীর;

সঙ্কুর চোখ্ মুখের উপর দিয়ে যেন বিদ্যুতের ঝলক খেলে যায়!

তিন, তিনটে বছর! বাপরে! মন্থরতায় তিনটা যুগও যেন পেছিয়ে পড়েছে!

সঙ্কু ভাবে।

তের বছরের একটা কিশোরী, বালিকা বললেই হয়! চঞ্চলা হরিণীর মত ঘাটে, মাঠে, ছুটোছুটি করে বেড়ায়। পাকা ডালিমের রংএর শাড়ীখানা বাবলা গাছের ফাঁক দিয়েও বেশ দেখা যায়। তোড়ার "ঝুমুর ঝুমুর" আওয়াজ পাখীর ডাক ছাপিয়ে এসেও কাণে মিষ্টি লাগে। গম তুলতে মন আর বসে না। নানা ছুতো নাতা করে বাড়ীর দিকে আসতে চায়। বুড়ো বাপ আপন মনে বকে "বহুটা এসেই ছেলিয়াটাকে মাটী করে দিলে।"

গেট্‌ম্যান্ রাম কিষাণের বৌ চেরা সিঁথির মাঝে টকটকে সিন্দুরের তিলক এঁকে, পায়ের পাঁজোর আর কাঁকণের রিনি-ঝিনি শব্দ করতে করতে ভাগনের ঘাট থেকে জল নিয়ে ফিরে। সোনালী রোদের আভা এসে তার মুখের উপর পড়ে। সঙ্কু অপলকে চেয়ে থাকে—বুভুক্ষুর ক্ষুধা ভরা দৃষ্টি সে নয়—তার চোখে মাখান থাকে এক মায়ালোকের বিভোরতা।

দুলারী। এতদিনে সেও এত বড়টী হয়েছে। তার নাকের পাশে সেই ছোট তিলটী ঠিক্ তেমনিই আছে কি? ঘাড় নাড়লে ছোট নথটীও নড়ে উঠে?

স্বপ্নের জাল বোনাই চলে—শেষ তার হয় কই? দুলারীর চিঠি!

সঙ্কুকে সে দেখতে চায়! অনেক দিন দেখিনি।

তাজ্জব ব্যাপার! কাছে থেকেও যে ছিল দূরে দূরে- দূর থেকে সে কাছে টানতে চায়!

সঙ্কু ভাবে। খেই হারিয়ে যায়।

কুয়াশায় ঢাকা মাঘের আকাশে এত নীলের ছড়াছড়ি এত দিন ছিল কোথায়। বউলের কুঁড়ির কাঁচা গন্ধটুকু বেশ মিঠে লাগে! রোদের মাঝে এতখানি দরদ মাখিয়ে রাখলে কে?

কঠিন মাটী। মন এসে যেন ঠিক্‌রে পড়ে।

ঠিকাদারের এখন অনেক কাজ। ছুটি হয়ত মিলবে না। তিন, তিনটী বছর! শ্বাসের জোরে বুকখানা ফুলে ফুলে উঠে। বাল-বিধবার অস্ফুট আর্ত্তনাদ যেন বুকের মাঝে গুমরে বেড়ায়।

মাড়োয়ারী ঠিকাদার। রাজপুতনার মরুভূমির মত বুকখানাতেও কোন রসের সন্ধান মিলে না। বোঝে শুধু লাভ লোকসানের খতিয়ান—চায় কেবল কাজ। ছুটি চাইতে গেলে—ভীষণ চটে যায়।

সঙ্কু কিছু ঠিক করতে পারে না।

ভাবে পাঁচটা টাকা এখন পাঠিয়ে দি। পাটের আমদানীটা একটু মন্দা পড়লেই ছুটী চাওয়া যাবে।

রেললাইনের ধারে সারি সারি ছোট গুম্‌টী—কুলি লাইন!

খাটিয়ার পাশে ইটের পর ইট সাজিয়ে তার পর রাখা আছে একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স। মুনসী থেকে

চাবি কাঠি নিয়ে খুট্ করে খোলে একটা চার পয়সা দামের মিলারের তালা। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে এক কোণ থেকে বেরোয় একখানা চকচকে নতুন পাঁচ টাকার নোট্।

দশবছর আগেকার পুরাণো ছেয়ে রংয়ের রেলের খাতা খুলে একখানা মণি অর্ডারের ফারম হাতে নেয়। একটা দীর্ঘনিশ্বাস বুকখানাকে আবার তোলপাড় করে তোলে।

বাইরে আসতেই গায়ে লাগে দুই একফোঁটা টিপ্ টিপে। আকাশের দিকে চায়! এরই মধ্যে রংএর বদল হয়ে গেছে। ঘোলাটে মেঘে সমস্ত আকাশখানাকে কে লেপে দিয়েছে। ছাতা নেওয়ার আবশ্যক আর হয় না। কম্বলখানাকে টেনে গায় দিয়ে সামনে এগিয়ে চলে।

মালঘর। এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্য্যন্ত ঠাসা কত কি—পাটের গাঁট্, তিসির বস্তা, করগেট শীট্ আরও অনেক সব।

দোরের এক পাশে খানদুই ভাঙ্গা চেয়ার ও একটা নড়বড়ে টেবিল। টালি ক্লার্কের আফিস।

অশ্বিনী একটা চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে উদাস ভাবে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। সামনের খাতা খোলা আছে—কলমটায়ও রয়েছে কালিমাখানো। মেঘলা আকাশের ছায়া বুকে এঁকে পদ্মা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কলকল ছল ছলের বিরাম নাই।

থেকে থেকে খুলনা জেলার একটা দূর পল্লীর স্মৃতি মনের মধ্যে সাড়া দিয়ে যাচ্ছে—পাটের হিসাব রাখবার দিন আজ নয়।

ফারম হাতে সম্ভু এসে দাঁড়ায়। অশ্বিনী চুরুটে জোরে টান দেয়, হাসে।

"কি রে বহুকে 'রূপেয়া' ভেজ দিবি নাকি।"

সম্ভুর মুখেও হাসি ফুটে ওঠে—বড় কোমল ও করুণ।

ঠিকানা লেখা হয়।—

উত্তরে বাতাস একটু জোরে বইছে। বৃষ্টি একটু জোরে পড়ছে। ফরমখানিকে ভাঁজ করে সম্ভু বুক পকেটে সেই চিঠিটার পাশেই রাখে—মনটা হাল্কা লাগে। তাতে লেখা আছে দু'লারীর নাম।

শীতের দিন। তার উপর আবার বাদলা। বেলা থাকতেই অন্ধকারের আঁচল এসে পৃথিবীর মুখ ঢেকে দেয়।

ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জলে ওঠে। ফেরী ষ্টীমারের বিজলি বাতি পদ্মার জলে সোনার তাল গাছের সৃষ্টি করে। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা তাকে ভেঙে চুরে চুরমার করে দেয়।

ষ্টেশনের বাতি ঝিক্ মিক্ করছে। এখনি ক'ল‐কাতার ট্রেণ এসে পড়বে! গেলে দু'পয়সা রোজগার হত।

খাটিয়ার উপর সম্ভু উঠে বসে। হাই তোলে, তুড়ি দেয়, কম্বলখানাকে সরিয়ে রাখে।

আলো জ্বালার কথা আজ আর মনে হয়নি। আঁধারের মাঝেই দু'লারীর ছবি বেশ লাগে।

ঘাট লাইনের পাশ দিয়ে জলের ছপ্ ছপ্ শব্দ করতে করতে কে আসে। আরও কাছে মিঠে মিঠে কাঁকণের আওয়াজ কানে আসে।

রাম কিষাণের বৌ একটা বাছুর কোলে করে চলেছে। ভিজে যাচ্ছে সে দিকে খেয়াল নেই। আপন মনে গুণ্ গুণ্ করে কি গাইতে গাইতে চলেছে। খয়ের রংএর শাড়ীখানা জলে ভিজে ভাজে ভাজে গায়ের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে।

ভোঁস ভোঁস্ শব্দ কাছে শোনা যায়। ট্রেণ এসে প্লাটফরমে দাঁড়ায়।—

সম্ভুর তাড়া নেই। আবার কম্বলটাকে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ে। বুক পকেটে হাত দিয়ে দেখে। সেখানে আছে দু'লারীর চিঠি আর তাকে টাকা পাঠানর ফরম।

আবার পায়ের শব্দ শোনা যায়।—রাম কিষাণের বৌ কি? দামাল বাছুরটা আবার পালানো না কি?

সম্ভু উঠে বসে।

দোরের গোড়ায় দেখা দেয় মাড়োয়ারী ঠিকাদারের বিশাল বপু। জলের ছাটে পাগড়ীটা প্রায় ভিজে গেছে। বর্ষাতির গা বেয়ে টপ্ টপ্ করে জল গড়াচ্ছে।

সম্ভু ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

ভারী গলায় হেঁকে ঠিকাদার বলে, "সম্ভু, কাল বেলা ১০ টার আগেই ১২নং বোটখানাকে মহেশতলার ঘাটে

পৌঁছে দিয়ে আসা চাই-ই—তিসির বস্তা জলে ভিজছে—বুঝলি !"

সঞ্জু বোঝে, কিন্তু বুঝানর আগেই ঠিকদার বেরিয়ে পড়ে—কত কাজ তার। জলের মাঝেও রেহাই আছে কি ?

সামনে ওই পদ্মা, মেঘ আর বাতাস দুই সঙ্গীকে পেয়ে আনন্দ আর চেপে রাখতে পারছে না ! দশ হাত উঁচু পাড়কেও এই শুভ-সংবাদ জানাবার জন্য নিজের কোলে টেনে নিতে চায়।

সঞ্জু আকাশের দিকে যায়। কে বলে মাঘ মাস ! ভাদ্র ফিরে এসেছে বুঝি !

পারাপারের ফেরী আবার ফিরে এসেছে। ঝড়-বাদল-এখনও থামে নি। কখন থামবে কেই-বা জানে।

সঞ্জু ভাবে, যেতেই ত হবে। রাতারাতিই বেরিয়ে পড়ি। সাত আটটার মধ্যে পৌঁছান যাবে।

বাতাসটাও পিছেন' আছে। হাল ধরে বসে থাকলেই চলবে।

দু'লারীর নামে টাকাটা না হয় মহেশতলার ডাক-ঘর থেকেই পাঠান যাবে।

নীলজামাটার নীচে একটা কালো কোর্ত্তা পরে। খাকী রঙের বর্ষাতিটা তার উপর চড়ায়। বুক পকেটে আছে সেই চিঠিখানা, টাকা পাঠানর ফারম আর সেই ঝক্‌ঝকে নোটখানা।

পদ্মার চরের বাবলা গাছে কাক-শালিক ডেকে ওঠে। পূব আকাশে সিন্দুরের আভা দেখা দেয়। বাতাসের বেগ কিন্তু বেড়ে ওঠে।—

এবার আর পিছনে নয়, উজান দিকে। সঞ্জুর হাতের হাল ঘুরপাক খায়। সে জোরে চেপে ধরে। নৌকার মুখ তবু ঠিক থাকতে চায় না।

উত্তরে হাওয়ায় হাড়ের মাঝে কাঁপুনি লাগে। বৃষ্টির ফোঁটা বর্ষাতি ভেদ করে গায়ে ছাট মারে। চোখে মুখে সূচ বিঁধিয়ে দেয়।

পদ্মার জলে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। বড় বড় ঢেউএর উপর বোটখানা আছাড় খেয়ে পড়ে।

চারদিকে সঞ্জু দৃষ্টি হানে। একটা জেলে ডিঙিও চোখে পড়ে না। খাল, নালাও কোথাও কাছে নেই। এ বোধ করি সেই চট্‌কাতলার ঘাট।

বোটের এক পাশে একটু ছোট ছৈ। হাল ছেড়ে সঞ্জু গিয়ে তার মাঝে সেঁদোয়। কাণ্ডারীহীন নৌকা ঢেউএর তালে তালে ছুটে চলে। প্রলয় নাচন তার সুরু হয়ে গেছে।

ঝড়ের ঝাপ্টায় ছৈও আর টেঁকে না। নির্ম্মম হস্তে ঝটিকা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়। পদ্মার বুকের উপরকার আকাশটুকুতে দুর্দ্দান্ত ছেলে ঘুড়ি উড়িয়ে খেলা করে।

সঞ্জু গিয়ে লুকোয় বোটের মাল বোঝাই করবার খোলের ভিতর। ঝলকে ঝলকে মাথার উপর দিয়ে জল গড়িয়ে চলে। চেতনা ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। বুক পকেটটাকে তবু মুঠোর মধ্যে সজোরে চেপে ধরে। দেহের সমস্ত শক্তি সেই মুঠোটার মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখানে আছে দুলারির চিঠি !

* * * *

দুপুরের পর ঝড় জল থেমে গেছে। মাতামাতির পর পদ্মা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে ! তখনও কিন্তু তার বুকের উপর সন্ধান চলছে মানুষের হারাণো ধনের।

ঠিকাদারের লোকেরা খুঁজতে খুঁজতে দেখে ১২নং বোটখানা এক চড়ার পাশে কাত্‌ হয়ে আটকে পড়ে আছে।

দু'চার জন গিয়ে তখনই লাফিয়ে নৌকার উপর উঠে। নৌকার খোল জলে একেবারে ভর্ত্তি। বর্ষাতি ভাসতে দেখে হিড় হিড় করে টেনে তুলে।

যাকে দেখতে পায় সে সঞ্জু।

পাথরের চেয়েও শক্ত ও ঠাণ্ডা তার সমস্ত দেহ। বুক পকেটটা মুঠোর মধ্যে তখনও ধরা রয়েছে।

অস্তবেলার এক ঝলক সোণালী রংএর আভা এসে পড়ে তার জলে-ভেজা মৃত্যু-শীতল মুখখানার উপর !

—

কুলী

মাহমুদা খাতুন ছিদ্দিকা গল্প

হাবড়া ষ্টেসনের অনতিদূরে নদী সৈকতে বসিয়া একজন কুলী একজন ভদ্র যুবককে বলিতেছিল, "বাবু বল্‌বো কি আমার দুঃখের কথা অকালে মা মারা গেল, নানীতে কত দুঃখে কষ্টে মানুষ করলো। মা-হারা ছেলে বলে অন্যায় করলেও কখনো মার-টার কোর্‌তো না। বড় হলে বাপ স্কুলে দিল, কিন্তু জন্মাবধি যে পড়া শুনার মর্ম্ম শোনেনি ও আলোচনা কোর্‌তে কাউকে দেখেনি তার সহজে পড়া শুনায় মন বসবে কেন? তাতে শাসনহীন আব্দারে ছেলে ছিলাম পড়াশুনায় মন বস্‌তে চাইত না এ জন্য অনেক সময় মাষ্টারের হাতে বেত খেতাম, তাতে আমার মন স্কুলের উপর আরোও বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লো। মাষ্টারের মারের কোন হিসাব ছিল না, নানীর তা সহ্য হল না। তিনি স্কুল ছাড়িয়ে দিলেন আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বাবা তাতে খুবই চটে ছিলেন কিন্তু নানীর জিদই বজায় রইল। বাবারও হয়ত ছেলের পিঠের মারের দাগগুলি মনে বসেছিল—তিনিও ত লেখা পড়া করেন নি, তত গরজ রইল না। আমিও বনের পথে বাঁশি বাজিয়ে মার্ব্বেল খেলে দিন কাটাতে লাগলাম। কিন্তু বাবা যেন লেখা-পড়ার মর্ম্ম বুঝেছিলেন তাই বছর তিন পরে নানী মারা গেলে আবার আমায় ভর্ত্তি করে দিলেন আর বুঝিয়ে দিলেন যে আমি যদি ভালো করে লেখা-পড়া করি আমার খুব ভালো হবে। সংসারে বাপ ছাড়া আর কেউ ছিল না তাই বাপের কথামত আবার স্কুলে যেতে লাগ্‌লাম। কিন্তু একবার যার ইয়ার বন্ধু জুটে গেছে, যে বদসঙ্গীর স্বাদ পেয়েছে তার আর লেখা-পড়ায় মন বস্‌বে কেন? আর বদসঙ্গীরাই বা তাকে লেখা-পড়া কোর্‌তে দেবে কেন? আড্ডা দেওয়ার লোভ যে ছেলে পেয়ে গেছে সে কি আর সামলাতে পারে, অন্ততঃ যার ভালো-মন্দের জ্ঞান পরিপক্ক হয়নি সে পারে না। আমি ছুটীর পরই তাদের সঙ্গে মিশতাম আর ঘুড়ি উড়িয়ে মার্ব্বেল খেলে সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরতাম, কিন্তু লেখা-পড়া করতাম বলে বাবা কিছু বল্‌তেন না। আমি বাধহীন অবস্থায় মিশ্‌বার সুযোগে তাদের কৃপায় ক্রমে সিগারেট তার পর স্মোকিং ধরলাম। তাদের সঙ্গে ঘোরার ফলে বেশ্যালয়ের অনেক চিত্রই আমার চক্ষে পড়্‌ত আর অবসর কালে সেই সব কল্পনা আমার খেলত। এমনি করে বছর দুই তিন যেতেই আমি কিশোর হয়ে উঠ্‌লাম।

গানের নেশা আমার ছোটবেলা থেকেই ছিল। অনেক সময় বেশ্যালয়ের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের গান-বাজনা শুনতাম। শেষে একদিন দেখলাম সেখানে আমার একজন বন্ধুকে, সে দেখ্‌তে পেয়েই আমাকে বল্‌লো এতে কিছু দোষ নেই। মন্দ ছেলেরা বাবু ভালো ছেলেকেও মন্দ করে, মন্দ বুঝে করে না তারা মনে করে এমন স্ফূর্ত্তি এমন সুখ, এ কী মন্দ? এর চাইতে আবার কি সুখ আছে? স্ত্রীলোকের স্নেহ-যত্ন অনেক দিনই হারিয়ে ছিলাম তারা আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলে সে কী বল্‌বো? তাদের আদর আপ্যায়ন ভারী ভালো লাগ্‌লো। এমনি করে তাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বেড়ে চল্‌লো। বল্‌বো কি বাবু। তারা যেন হতে করে লোককে মন্দ করে। নইলে তাদের রোজগার হবে কি করে? তাদের উদ্দেশ্যই টাকা রোজগার করা। তাদের কৃপায় লোকের যে সব গুণ ধরে আমারও তা ধর্‌লো, আমিও মদ ধরলাম—সঙ্গে সঙ্গে আমার ফাঁকি দেওয়ার বুদ্ধিও বেড়ে চল্‌লো। এমন করে চলতাম যে আমার এ সব গুণ বাবা একদিনও টের পেতেন না। আমি তাঁর সন্তুষ্টির জন্য একদিনও লেখা-পড়ার কামাই করতাম

না। প্রথম প্রথম ও বেশী মদ খেতাম না কাজেই কেউ জানতে পেল না, আর ছেলে কি কোর্‌ছে না কোর্‌ছে বাবাও তার খোঁজ রাখার দরকার মনে কোর্‌তেন না।

যাক্ এমনি করে কিছুদিন গেল, কিন্তু ওসব পথে যারা পা দিয়েচে তারা সীমা রাখ্‌তে পারে না তার নেশা জিনিস বেড়েই চলে, তাই একদিন যখন ঘোর মাতাল হয়ে বাড়ী এলুম প্রথমে বাবা হতভম্ভ হয়ে গেলেন। পরেই তাঁর শাসন যেন গর্জ্জন করে উঠ্‌লো। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মার গাল খেলাম। মুখ ফুটে বল্‌তে ইচ্ছা হল, এতদিন কি ঘুমিয়েছিলে? কিন্তু প্রথম অপরাধীর মুখে কথা ফুটলো না। তিনি আমায় ঘাড় ধরে বাড়ীর বার করে দিলেন তারপর আর হুঁস ছিল না।

ভোরে উঠে দেখি পায়খানার ধারে ড্রেণের ভিতরে পড়ে আছি। নিজের অবস্থা দেখে মনটা বড় ভেঙ্গে গেল। অসীম স্নেহময় পিতার কাছে ফিরে যেতে আর ইচ্ছা হল না। বরঞ্চ তা'কে শাস্তি দেবার জন্য জিদ্ করে গায়ের কোট বিক্রি করে কল্‌কাতা চলে এলাম। বাবু ওই বয়সে অত শাসন সহ্য হয় না—ভাবনা চিন্তাও আসে না। তাই কুলীগিরির পয়সাতেও ফুর্ত্তির সঙ্গেই দিন কাটিয়ে এসেছি, কিন্তু আজ আর ভালো লাগে না, ভদ্রঘরে জন্মে জীবনটাকে কোর্‌লেম কি? এ জীবনের সার্থকতা কোথায়?

যুবক বিস্মিত ব্যথিত চক্ষে চাহিয়া বলিলেন "তুমি ভদ্র লোকের ছেলে?"

কুলী সজল চক্ষে কহিল "হাঁ বাবু ভদ্র লোকের ছেলে" কুলী চুপ করিল, তাহার অন্তর্বেদনায় কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া গেল। যুবক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন—একটী ভদ্র সন্তান তাহার এই পরিণাম? ক্ষণকাল পরে কহিলেন "আজও তুমি মদ খাও?"

কুলী উত্তেজিত হইয়া কহিল "হাঁ বাবু খাই, পেট ভরে খেতে পাই না যে পয়সাটী পাই তা দিয়ে মদ খাই এমনি করেই আমার জীবন শেষ হয়ে আস্‌ছে ও যে সর্ব্বনাশের নেশা।

যুবক করুণ কণ্ঠে কহিল "কিন্তু আজ যদি আবার ভদ্র ভাবে থাকার সুযোগ পাও ও সব ছাড়্‌তে পার তুমি!"

কুলি উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল "হাঁ বাবু হাঁ! আজ যদি আবার মানুষ হবার সুযোগ পাই তবে প্রাণপণ করে মানুষ হই, এই প্রাণহীন আনন্দ যে বিষ এ বিষ পান করার হাত থেকে অব্যাহতি পেলে আমি বাঁচি।"

যুবক গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন "চল তবে আমার সঙ্গে তোমাকে মানুষ হবার সব সুযোগ দেবো—তারপর যা হয় উপার্জ্জন করে ভদ্র ভাবে চল্‌তে পার্‌বে। কৃতজ্ঞতায় কুলী নির্ব্বাক হইয়া গেল কিছুক্ষণ পরে সহসা চেতনা লাভ করিয়া দুইহাতে যুবকের পায়ের ধূলি মাথায় তুলিয়া লইল—"বাবু বাবু মানুষ—আপনিই মানুষ। যুবক সসব্যস্তে তাহার হাত ধরিয়া উঠাইলেন। তাঁহার অন্তর আলোড়িত হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যার রক্ত-কিরণ তখন মিলাইয়া আসিতেছিল কিছুক্ষণ পরে লোকেরা বিস্মিত হইয়া দেখিল হাওড়া ষ্টেসনের চির পরিচিত কুলী একজন যুবকের সহিত ট্রেণে চলিয়া গেল।

ইহারই কিছুকাল পর, একজন লেখকের জীবনী সমালোচনায় লোকে বিস্মিত হইয়া জানিল—এ সেই হাওড়ার কুলী।

পুষ্পপাত্রের গল্প প্রতিযোগিতার বিশেষত্ব কি আগে দেওয়া নিয়মাবলীতে দেখুন

নানাকথা

নিখিল-বঙ্গ জাতীয়তাবাদী মুস্‌লিম সম্মেলন

সভাপতি ডাঃ আন্সারীর অভিভাষণ

নিখিলবঙ্গ জাতীয়তাবাদী মুস্লিম সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতি ডাক্তার আন্সারী নিম্নলিখিত অভিভাষণ প্রদান করেন :—

"ভদ্র মহোদয়গণ,

অদ্যকার সভায় যে সমস্ত গুরুতর বিষয় আলোচিত হইবে ভবিষ্যৎ ভারতের গঠনে তাহার বিশেষ প্রভাব পড়িবে। আপনারা আমাকে এই সভার সভাপতিত্ব করিতে আমন্ত্রিত করায় আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

গত বৎসর হইতে ভারতবর্ষের লোকেরা বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশের লোকেরা যেরূপ বীরত্ব সহকারে সংগ্রাম করিতেছে, তাহা বিস্তারিত বর্ণনা করার আবশ্যকতা নাই। আপনারা সকলেই তাহা জানেন এবং যাঁহারা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের অধিকাংশই সেই সংগ্রামে যোগ দিয়াছিলেন। এই সংগ্রামে শত্রু-মিত্র সকলেই প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে এবং বিদেশীর কবল হইতে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার চেষ্টার ইতিহাসে এক নবীন অধ্যায় রচনা করিয়াছে।

আমাদের স্বধর্ম্মীরা এই সংগ্রামে তাহাদের অতীত শৌর্য্যের তুলনায় যথোচিত অংশ গ্রহণ করে নাই বটে তথাপি, রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব এবং স্বার্থপর লোকের বিপরীত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের স্বধর্ম্মীরা এই সংগ্রামে যে, অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহা একেবারে নগণ্য নহে। সীমান্তের মুসলমানেরা এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে যে বীরত্ব দেখাইয়াছে, তাহাতে ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হইয়াছে।

জাতীয়তাবাদী মুস্লিম দল এবং সর্ব্বদল সম্মিলন দলের মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন। আমি এই তথাকথিত সর্ব্বদলের অসারতা এবং জাতীয় দলের শক্তি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। ভারতবর্ষে মুস্লিম জাতীয়দলের মত প্রতিনিধিমূলক মুস্লিমদল আর একটিও নাই। সর্ব্বদলে যে কাহারা আছেন তাহা বলা শক্ত। অল-ইণ্ডিয়া মুস্লিমলীগ এবং সেন্ট্রাল খিলাফৎ কমিটিকে বাদ দিলে আপনারা দেখিবেন যে, আর কোন দলই এই সর্ব্বদলের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মুস্লিমলীগের প্রকৃত অস্তিত্ব বহুদিনই লোপ পাইয়াছে। উহার অস্তিত্ব কেবল কাগজে কলমে। এলাহাবাদে গতবার যে শেষ সভা হইয়াছিল তাহাতে সভা হইবার পক্ষে প্রয়োজনীয় ১৫ জন সদস্যও উপস্থিত ছিলেন না। যে সেনট্রাল খিলাফৎ কমিটি একদিন খুব শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ছিল আজ তাহার ছায়ামাত্র বিদ্যমান। সুতরাং কোনটি মুসলমানদের প্রতিনিধি-মূলক সঙ্ঘ তাহা স্থির করিতে আপনাদের কষ্ট হইবে না।

জাতীয়তাবাদী মুস্লিম দলের শাখা ভারতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। ইহার ৭টি প্রাদেশিক এবং ৭১টি জিলা শাখা আছে। বহু প্রদেশে এবং জিলায় এই দলের সম্মিলনী হইয়াছে। এবং দলে হাজার হাজার সদস্য আছে। লক্ষ্ণৌতে এই দলের যে সর্ব্বভারতীয় সম্মিলনী হইয়াছিল, খিলাফৎ আন্দোলনের পর মুসলমানদের এত বড় সভা হয় নাই। সমগ্র ভারত হইতে সম্মিলনীতে ৬১৯ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়াছিলেন।

গত এপ্রিল মাসে লক্ষ্ণৌতে নিখিলভারত জাতীয়তাবাদী মুস্লিম সম্মেলনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা হইতেই বুঝা যায় যে, জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা স্বসম্প্রদায়ের প্রকৃত স্বার্থ বিকাইয়া না দিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃহত্তর মিলনের চেষ্টাই করিয়াছেন।

লক্ষ্ণৌতে উক্ত প্রস্তাব গ্রহণের পূর্ব্বে দিল্লীতে ১৮ই মার্চ্চ তারিখে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌর প্রস্তাব দিল্লীর প্রস্তাবের অর্দ্ধাংশ মাত্র। আমরা সর্ব্বদলের সহিত আলোচনায় লিপ্ত ছিলাম বলিয়া সকল কথা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়া দেওয়া সঙ্গত বোধ করি নাই। আজ আমি আপনাদের নিকট সম্পূর্ণ প্রস্তাবটি দাখিল করিতেছি। আমাদের মনে হয়, উহাই সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের উপায়। ইহা গণতন্ত্র এবং জাতীয়তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সে গণতন্ত্র ও জাতীয়তা সংখ্যা গরিষ্ঠের আক্রমণাত্মক প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য হিন্দু সভার ছদ্মবেশী গণতন্ত্র ও জাতীয়তা নহে। মুস্লিম সর্ব্বদল এবং শিখদের মত জঙ্গী সাম্প্রদায়িকতাও নহে, যে অন্যান্য সম্প্রদায়কে চরমপত্র দিয়া তাহাদের আত্মসমর্পণ দাবী করা হইতেছে। আমরা যে প্রস্তাব আপনাদের নিকট দাখিল করিতেছি, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, যাহারা সংখ্যায় অধিক তাহারা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ে পরিণত হইবে না এবং লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থও ক্ষুণ্ণ হইবে না। আমাদের প্রস্তাব এই :—

(১) ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্বের ভিত্তি হইবে বয়স্ক ব্যক্তি মাত্রেরই ভোটাধিকার সমন্বিত যৌথ নির্ব্বাচক মণ্ডলী।

(ক) প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকার থাকিবে। যে সমস্ত সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থেরও কম সেই সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য যুক্ত রাষ্ট্রীয় পরিষদে তথা প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় পরিষদে সংখ্যানুপাতে সদস্য পদ সংরক্ষিত রাখিতে হইবে এবং তাহাদিগকে অতিরিক্ত সদস্য পদের জন্য প্রতিযোগিতার অধিকার দিতে হইবে।

(খ) যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার

এক-চতুর্থাংশেরও কম, সে সমস্ত প্রদেশে তাহাদের জনসংখ্যার অনুপাতে সদস্যপদ সংরক্ষিত রাখিতে হইবে ও তাহাদিগকে অতিরিক্ত সদস্য-পদের জন্য প্রতিযোগিতা করিতে দিতে হইবে। কিন্তু যদি অন্য কোন সম্প্রদায়কে সংখ্যানুপাত অপেক্ষা অধিকতর সদস্যপদ প্রদত্ত হয় তবে মুসলমানদিগকেও সেই সুবিধা দিতে হইবে এবং বর্ত্তমানে তাহারা যে সুবিধা পাইতেছে, সেই সুবিধা বজায় রাখিতে হইবে।

(গ) যদি প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার না প্রদত্ত হয় অথবা এমন ভাবে ভোটাধিকার প্রসারিত না করা হয় যাহাতে বিভিন্ন সম্প্রদায় জনসংখ্যার অনুপাতে ভোটাধিকার পাইতে পারে তবে যতদিন পর্য্যন্ত বয়স্কের ভোটাধিকার বা এরূপ ভাবে সংখ্যানুপাতিক ভোটাধিকার প্রবর্ত্তিত না যে, সংখ্যাধিক মুসলমানেরা ভোটাধিকারে অপরাপর সম্প্রদায় অপেক্ষা দুর্ব্বল বা সমান না হইয়া পড়ে, ততদিন পর্য্যন্ত পঞ্জাবে এবং বঙ্গদেশে মুসলমানদের জন্য সদস্য সংখ্যা সংরক্ষিত রাখিতে হইবে।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষৎদ্বয়ে মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা হইবে মোট প্রতিনিধি সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ।

(৪) পাব্লিক সার্ভিস কমিশন সরকারী চাকুরীতে লোক নিয়োগ করিবেন। চাকুরীতে নিযুক্ত হইবার একটা নিম্নতম যোগ্যতা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। সেই নির্দ্দিষ্ট যোগ্যতা এরূপ হওয়া চাই, যে কোন সম্প্রদায়ই যেন যথোচিত সংখ্যক চাকুরী হইতে বঞ্চিত না হয়। নিম্নতম চাকুরী-গুলি কোন সম্প্রদায়েরই একচেটিয়া থাকিতে পারিবে না।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলে, বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভার সকলদলের সম্মতি ক্রমে একটি নিয়ম করিয়া তদনুসারে মুসলমানদের স্বার্থ প্রকৃষ্ট ভাবে রক্ষা করিতে হইবে।

(৬) সিন্ধু দেশকে একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত করিতে হইবে।

(৭) উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং বেলুচিস্থানে ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অনুরূপ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

(৮) দেশে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তিত হইবে, উদ্বৃত্ত ক্ষমতা প্রাদেশিক রাষ্ট্রের হাতে থাকিবে।

(৯ক) রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতে হইবে যে, কোন লোকেরই সভ্যতা, ভাষা, বর্ণমালা, শিক্ষা, ধর্ম্ম ও আচার, দেবোত্তর সম্পত্তি এবং বৈষয়িক স্বার্থে হস্তক্ষেপ করা হইবে না।

(খ) রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্দ্দিষ্ট বিধান দ্বারা লোকের মূল অধিকার এবং ব্যক্তিগত আইন সুরক্ষিত রাখিতে হইবে।

(গ) যুক্তরাষ্ট্রীয় উভয় পরিষদের সদস্যদের মধ্যে অন্ততঃ তিন চতু-র্থাংশের মত না লইয়া রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্দ্দিষ্ট কোন মূল অধিকারের পরিবর্ত্তন হইবে না।

আমার মতে সংখ্যা গরিষ্ঠের প্রাধান্য বজায় রাখা যেমন গণতন্ত্রের পক্ষে আবশ্যক, সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ-সংরক্ষণও তদনুরূপ আবশ্যক। বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের মুসলমানেরা কদাপি তাহাদের সংখ্যাধিক্যের অধিকার বিসর্জ্জন দিতে পারে না। যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের মুসলমানেরা এই ভরসায় নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে যে, সংখ্যাধিক হিন্দুরা তাহাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবে, যে সমস্ত প্রদেশে হিন্দুদের সংখ্যা কম সে সমস্ত প্রদেশে হিন্দুরাও সেরূপ ব্যবহার পাইবে। এ কথাটা ভাল করিয় বুঝিলে চাকুরি বা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদের জন্য রেষারেষি দূর হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে। বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের দিনকানারা একথা ভুলিয়া গিয়া 'ইসলাম ডুবিল' বলিয়া রব তুলিয়াছেন।

গোলটেবিল বৈঠকে মাইনরিটি কমিটিতে স্যার মহম্মদ সফী বাঙ্গলা ও পঞ্জাবের ব্যবস্থা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় পাঞ্জাবে শতকরা ৪৯টি আসন এবং বাংলায় শতকরা ৪৬টি আসন মুসলমানদের জন্য থাকিবে; আর তা ছাড়া বিশেষ নির্ব্বাচক মণ্ডলীতেও সকলের সহিত সমানভাবে নির্ব্বাচন পদপ্রার্থী হইতে পারিবে। ফলে যদিও মুসলমানেরা বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ, তাহা হইলেও তাহাদিগকে চিরকালই ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যালঘিষ্ঠই থাকিতে হইবে। বিশেষ নির্ব্বাচক মণ্ডলী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা পদ পাইলেও বাংলার মুসলমানেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ থাকিয়াই যাইবে। ভদ্র মহোদয়গণ, পঞ্চনদের এই বীর পুঙ্গবের বাংলার প্রতি এইরূপ অহেতুক প্রীতির কি কারণ ঘটিল? বাংলা তাঁহার কি করিয়াছে? যে বাংলায় আপনারা সংখ্যায় অধিক এবং যেখানে আপনাদের অতীতের গৌরবপূর্ণ ইতিহাস রহিয়াছে এবং যাহার ভবিষ্যৎ গঠনে আপনাদের ন্যায্য দাবী রহিয়াছে, তাহার জন্য কিনা এই ব্যবস্থা! ইহার অর্থ এই দাঁড়াইতেছে যে, আপনারা আপনাদের সমস্ত স্বার্থ ও অধিকার বিসর্জ্জন দিয়া "সংখ্যা লঘিষ্ঠে কায়েম" হইয়া থাকুন, কারণ তাহা হইলেই কতিপয় স্বার্থান্বেষী গবর্ণমেন্টের মনোনীত গোলটেবিল বৈঠকের তথাকথিত মুসলমান প্রতিনিধিদের স্বার্থ সিদ্ধি হইবে। যদি স্যার সফীর প্রস্তাবানুযায়ী ভবিষ্যতে শাসন সংস্কার গঠিত হয়, তবে মনে রাখিবেন, বাংলায় চিরকালই আপনাদিগকে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ থাকিয়া সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্ব্বাচিত সদস্যদের উপর আপনা-দিগকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতে হইবে। এই ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব ও বিরোধ থাকিয়াই যাইবে এবং আপনাদের মধ্যে গোঁড়া সাম্প্রদায়িকেরই উদ্ভব হইবে। ব্যবস্থাপক সভা সাম্প্রদায়িক যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইলে এবং প্রত্যেক প্রশ্নই সাম্প্রদায়িকতার দিক দিয়া বিচার করিয়া সাম্প্রদায়িক ভাবেই মীমাংসিত হইবে। ফলে আপনাদের দেশের শান্তি লোপ পাইবে। কাজে কাজেই কৃষ্টি ও সভ্যতায় আপনারা কোন কিছুই দান করিতে পারিবেন না। আপনারা স্বসম্প্রদায় বা দেশের কোন উপকারই করিতে পারিবেন না।

এই সমস্ত বিষয়ে চিন্তা করিয়া এবং গত বিশ বৎসর যাবৎ পৃথক নির্ব্বাচনের কুফল দেখিয়া এবং সমগ্র দেশে যে দেশাত্মবোধ জাগিয়াছে, তাহাতে জাতীয়তাবাদী মুস্লেমদল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন সংস্কারে

প্রতিনিধি প্রেরণের ভিত্তি হইবে "পূর্ণ বয়স্কের ভোটাধিকার দিয়া মিশ্র-নির্ব্বাচন।" একমাত্র এই ব্যবস্থা দ্বারাই আপনারা আপনাদের অতীত গৌরবময় কীর্ত্তির ভিত্তি স্থাপন করিয়া স্বাধীন ভারতের স্বাধীন নাগরিক হইতে পারিবেন। আমরা চাই স্বাধীনতা। আমরা শ্বেতাঙ্গের বা কৃষ্ণাঙ্গের কাহারও কৃতদাস থাকিতে চাই না। আমরা চাই গণতন্ত্র—এবং ইহা সম্ভবপর করিতে হইলে, যাহা কিছু জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী তাহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে হইবে এবং উভয়সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তি ও সদ্ভাব থাকিলেই ইহা একমাত্র সম্ভবপর। আমার বিশ্বাস যে এসম্বন্ধে জাতীয়তাবাদী, মুস্লিমদলের যে নীতি, তাহা গ্রহণ করিলেই আপনারা ইহা লাভ করিতে পারিবেন। এরূপ করিলেই আপনারা দায়িত্বমূলক গবর্ণমেন্টের সুবিধা ও উপকারিতা সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে পারিবেন—সংখ্যালঘিষ্ঠে কায়েমী হইতে পারিবেন না। পূর্ণবয়স্কের ভোটাধিকারের উপর ভিত্তি করিয়া একমাত্র মিশ্র-নির্ব্বাচন দ্বারাই আপনারা দেশের ও নিজের মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন, ভোটাধিকার যতই বিস্তার করিবেন ততই সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূর হইবে। এইরূপ করিলে এক সম্প্রদায়ের লোক অপর সম্প্রদায়ের নিকট যাইতে বাধ্য হইবে, কারণ তাহা না হইলে নির্ব্বাচনে জয়লাভ সম্ভবপর হইবে না এবং উভয় সম্প্রদায়ের ভোটের জোরে নির্ব্বাচিত হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় গেলে সেখানে জাতীয়তার দিক ছাড়া অন্য কোনদিকে কাজ করা যাইবে না।

ভারতীয় জাতীয় মহাসভা গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিতে স্থির করিয়াছেন ভারতের নূতন শাসন-সংস্কার তৈয়ার হইতে চলিয়াছে। জাতির পক্ষে ইহা পরম সন্ধিক্ষণ; কারণ একদিকে যেমন সুবিধা হইবে, আর একদিকে তেমন বিপদেরও কারণ আছে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদিগকেও এই দুশ্চিন্তার ভাগ লইতেই হইবে। আমরা মাতৃভূমির স্বাধীনতাকামী এবং আমরা চাই ন্যায়সঙ্গতভাবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান।

ভারতের মুসলমানেরা গত দশ বৎসরের উপর স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের ব্যবস্থানুসারে চলিয়া ইহার ব্যর্থতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের জাতীয় জীবন শক্তি হরণ করিয়া শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের ও কৃষ্ণাঙ্গ আমলাতন্ত্রের অনুগ্রহপ্রার্থী করিয়া তুলিয়াছে।

বাংলায় আপনাদের লোকসংখ্যা আড়াই কোটি এবং আপনাদের প্রাকৃতিক সম্পদ প্রচুর। ইচ্ছা করিলেই আপনারা ইহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়া আপনারা ধনে, মানে ও ক্ষমতায় এই প্রদেশে বৈশিষ্ট্য লাভ করিতে পারেন।

দেশাত্মবোধ জাগরিত হইলেই দেশের অর্থোন্নতি অনিবার্য্য। যদি বাংলার মুসলমানেরা জাতীয়তাভাব উদ্বুদ্ধ হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ না হন, তবে আমার ভয় হয়, তাঁহাদিগকে কৃত্রিম সংরক্ষণ ও সুবিধা সুযোগের উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। একমাত্র দেশাত্মবোধ ও সঙ্ঘবদ্ধতা দ্বারাই আপনারা স্বাধীন ভারতে বিশিষ্ট স্থান করিয়া লইতে পারিবেন। বাংলা ও বাঙ্গালীরা সমস্ত ভারতের স্বাধীনতার যাত্রীদের পথপ্রদর্শক এবং আমি আশা করি, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত এই প্রদেশ ভারতের সমস্ত মুসলমানকে প্রকৃতপথে পরিচালনা করিবে।

আমার একান্ত অনুরোধ যে, সময় থাকিতে আপনারা হাল ধরিয়া প্রকৃত ইসলামের সন্তান বলিয়া পরিচিত হউন।

"ইসলাম ডুবিল" বা "সংখ্যালঘিষ্ঠেরা রসাতলে গেল"—এই রব শুনিয়া ভীত হইবেন না। মুসলমানেরা বীরের জাতি। তাহারা প্রতিবেশীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। ইসলাম আপনাদিগকে বিদেশীর কবলে আসিতে শেখায় নাই। ১৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ইহাই আপনাদিগকে মুক্তির বাণী শুনাইয়াছিল। দাসত্বের শৃঙ্খল আপনারা নিজেরা পরিয়াছেন। ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ভারতের মুক্তিদাতা বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত হউন।

গ্রন্থ পরিচয়

'নেক-নজর'

উপন্যাস। মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক দি মুসলমান পাবলিশিং কোং লিঃ, ১১-২, কড়েয়া বাজার রোড, কলিকাতা। গ্রন্থকার 'নেক-নজর' শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিককে এই বলিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন 'আপনার মন্দিরের আরতি আমার মসজিদের নামাজে বিঘ্ন উৎপাদন করে না। আপনার দেওয়ালীর দীপ আমার শবে-বরাতের চেরাগে অবজ্ঞার রেখাপাত করে না। আপনার বিজয়ার কোলাকুলি এবং আমার ইদের আলিঙ্গন আপনার মনে সমভাবে প্রীতি উৎপাদন করে।' উৎসর্গের এই অল্প কয়টি কথা হইতেই বুঝিতে পারা যায় লেখক তাঁহার আড়াইশত পাতার বইখানি লিখিয়াছেন কি উদ্দেশ্য লইয়া। একটি হিন্দু পরিবার ও একটি মুসলমান পরিবারের বংশপরম্পরায় চলিত সখ্য ও প্রীতির বন্ধন ও উভয় পরিবারের কিশোর-কিশোরী মনির ও সুন্দরীর মেলা-মেশা ও আবাল্য প্রীতির বন্ধনের উপরই গ্রন্থখানি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার সুনাম দুর্নাম ও ইহা লইয়া নানা কথা কি ভাবে বর্ত্তমান সমাজে রাষ্ট্র হয় লেখক কৃতিত্বের সহিত তাহাও দেখাইয়াছেন। আশৈশব সাহচর্য্যের প্রীতি বন্ধন এবং বয়ঃসন্ধিকালে এ বন্ধন ভাঙ্গিয়া দিবার প্রয়াস, ইহা হইতে তরুণ-তরুণীর মনে যে বিক্ষোভ আসে সেই বিক্ষোভই 'নেক-নজরের' বেশীর ভাগ পৃষ্ঠার উপর দিয়া বহিয়া গেলেও ইহার কোথাও কাম-লালসার ইন্ধনে এতটুকু অপবিত্র হয় নাই অথচ তাহাতেও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের বৈচিত্র্যের হানি হয় নাই। মনিরের ও সুন্দরীর মা দুইজনার চরিত্রও হইয়াছে আদর্শ মাতৃ-চরিত্র। মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লার উচ্চ আদর্শ, মানবতার প্রতি অসীম দরদ, হিন্দু-মুসলমানের মিলন-বন্ধন গাঢ় করিবার প্রয়াস এ-সব দিক দিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। গ্রন্থের ভাষায় একটু নূতনত্ব আছে—কোন কোন বইয়ের মত অপ্রচলিত শব্দকে চালাইবার প্রয়াস লইয়া নয়—সে নূতনত্ব হইয়েছে সমগ্র পদটির বিন্যাসে। কথোপকথনে অনেক স্থানে এইরূপ পদবিন্যাসই চলিত বেশী, তবে পড়িবার সময় প্রথম দু'চার পাতায় একটু অসুবিধা বোধ হইতে পারে, কিন্তু পরে তাহা কাটিয়া যায়। মুসলমান লেখক-লেখিকারা তাঁহাদের উচ্চভাব আদর্শ ও দেশপ্রীতি লইয়া বাংলা সাহিত্যের সেবায় যত বেশী আসেন ততই ভাল। মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা তাঁহার স্বল্প-অবসর সময় এই ভাবে বাংলা সাহিত্যের সেবায় নিয়োজিত করিতেছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ সুখী। আশা করি তিনি অদূর ভবিষ্যতে মাতৃভাষাকে আরো সুন্দর রত্নরাজিতে সাজাইতে পারিবেন। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ভাল—উপন্যাস প্রিয় পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে ইহার সমাদর হইলে সুখী হইব।

সত্য প্রিয়

রমণী-হৃদয়

শ্রীসত্য রায়

গল্প

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে এক সপ্তাহের ছুটি পাইয়া টেরি টেরিয়াল সৈন্যদলের কয়েক জন কর্ম্মচারী ইংলণ্ড যাইতে ছিলেন। পথে রেল গাড়ীতে বন্ধুদের মধ্যে নানাবিধ গল্প চলিতেছিল। মেজর ডেরিক জ্যাকসন বলিয়া উঠিলেন—"তোমরা কি সব বাজে কথা বলিতেছ—এবার একটি বালিকার ধৈর্য্য ও মনের জোরের কথা হাঁসপাতালের ডাক্তারের কাছে শুনিলাম, তার কাছে আমার মনে হয় পুরুষের সহ্যশক্তি সব ছেলেখেলা"।

তোমরা—অক্সফোর্ড পদাতিক সৈন্যদলের নতুন লেফটেনাণ্ট হেনরীকে ত জানিতে। ছোকরা যেমন সুদর্শন তেমনি সাহসী ও মিশুক ছিল। আমাদের পাশের গ্রামের এক পাদ্রীর ছেলে সে—কলেজ ছাড়িয়া সৈন্যদলে সে ভর্ত্তি হইয়াছিল। যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইতে তার এমন আগ্রহ যে, সে শিক্ষা-নবিশীর কয়েকটা মাস অতি কষ্টে কাটিয়াছিল। তারপর যে দিন তার দলের সঙ্গে সে ফ্রান্সে রওনা হইল, তখন তার আনন্দ দেখে কে? সে আমাদের সকলেরই বড় প্রিয় ছিল;—তার সুন্দর চেহারা, সদা প্রফুল্লভাব তার অমিত সাহস এবং হাসি মুখে কষ্ট সহিবার ক্ষমতার জন্যে সকলেই তাহাকে বড় ভালবাসিত।

বয়সে হেনরী বালকমাত্র;—তার মনে যে কোন লুকান দুঃখ থাকিতে পারে, তাও আবার ব্যর্থ প্রেমের জন্য, একথা আমাদের মনেও আসিত না, যদি না সে নিজে আমার কাছে কথাটা প্রকাশ করিত। সেদিন সমস্ত দিন যুদ্ধের পর আমাদের ও হেনরীর দলের সে রাত্রির সব বিশ্রামের ছুটি ছিল। হেনরী ধীরে—ধীরে আমার কাছে আসিয়া বসিল;—এমন বিমর্ষ গম্ভীর ভাব হেনরীর কখনও, দেখি নাই। আমি উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"ব্যাপার কি হে?" হেনরী বলিল "তুমি হয়ত শুনে হাসবে, কিন্তু আমার মনে একটা দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, এই যুদ্ধেই আমার জীবন শেষ হইবে। তাই আজ তোমার কাছে লুকান পাপের কথা সব খুলিয়া বলিতে চাহি। য়্যানী আমার ছেলেবেলার সাথী ছিল; শৈশবে, কৈশোরে যৌবনে দুজনে একত্র বড় হইয়াছি; আমাদের ভালবাসা ক্ষণিকের মোহ মাত্র ছিলনা—তাহা আমাদের জীবনেরই এক অংশ ছিল। আমি মহাপাপী; একান্ত নির্ভরশীলা সরলা য়্যানির সর্ব্বনাশ করিয়াছি। সে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল, কিন্তু আমার বিমাতার মত হইল না। আর আমিও পরাধীন। ক্ষোভে দুঃখে সে যে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, কোনো সন্ধান পাইলাম না। তারপর আমি কলেজ ছাড়িয়া সৈন্য দলে যোগ দিলাম। আমি বেশ জানিতেছি যে, আমার দিন, ফুরাইয়া আসিতেছে, এখন তার কাছে ক্ষমা না চাইলে আমি মরণেও শান্তি পাইব না। তোমাকে সব কথা খুলিয়া বলিলাম। যদি য়্যানীর দেখা পাও, বলিও যে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি তাকেই ভালবাসিতাম; সে যেন আমার সেই প্রথম এবং এই শেষ অপরাধ মার্জ্জনা করে।" বলিয়া হেনরী চুপ করিল। আমি কি বলিব ভাবিয়া না পাইয়া বসিয়া বসিয়া চুরুট টানিতে লাগিলাম।

(২)

ইহার পর পনর দিন হেনরীর কোন সংবাদ পাইলাম না,—তখন তাহাদের দল আরো অগ্রসর হইয়াছিল। আমাদেরও কদিন একটুও সময় ছিল না—দিনরাত্রি যুদ্ধ চলিতেছিল। সে যে কি ভীষণ ব্যাপার তা তোমরা সবাই জান—আমি আর কি বলিব। দুই সপ্তাহ পরে আমাদের ছুটি হইল—এক নূতন দল আমাদের স্থান অধিকার করিল। সেই সময় খবর পাইলাম যে, হেনরী

গুরুতর আহত হইয়াছিল—তাহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাদের দলের কাপ্তেনের সঙ্গে দেখা হইল। হেনরীর বীরত্বের কথা বলিতে বলিতে সেই কঠোর হৃদয় বৃদ্ধ কাপ্তেনেরও চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তিনি শেষে বলিলেন, "হেনরীর এ যাত্রা রক্ষা নাই ;—কিন্তু আমার যদি ছেলে থাকিত তবে আমি তার হেনরীর মত বীরের মৃত্যুই কামনা করিতাম। সে তোমার বন্ধু ছিল ;—যদি পার হাঁসপাতালে একবার তার খবর নিও

ছুটিতে আসিবার সময় তাই আমি হাঁসপাতালে গিয়াছিলাম। সেখানে ডাক্তারের কাছে যা শুনিয়াছিলাম তাহাই তোমাদিগকে বলিব।

ডাক্তারকে হেনরীর কথা বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন, "হেনরী যখন হাঁসপাতালে আসে তখন তার অবস্থা খুবই খারাপ। তার দুটি চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছিল এক প্রায় সর্ব্বাঙ্গেই আঘাত লাগিয়াছিল. তার ফলে খুব জ্বর এবং প্রলাপ। প্রলাপের মধ্যে একই কথা "য়্যানী আমাকে ক্ষমা কোরো,' "য়্যানী আমাকে ক্ষমা করো" যতক্ষণ একটুও জ্ঞান থাকিত ততক্ষণ সে এই কথাই বলিত। তার অবস্থা দেখিয়া বড়ই কষ্ট হইত। এক দিন ভাবিলাম যে, যদি কোন নার্সকে য়্যানী বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহাকে ক্ষমা করার কথা বলিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তবে হয়ত বেচারার শেষ ক-টা দিন শান্তিতে কাটিতে পারে। এই হাঁসপাতালে নার্স এড্‌নার মত রোগীর সেবা করিতে কেহ পারে না। সে যে অক্লান্ত হৃদয়ে সমস্ত মন দিয়া আহত সৈনিকের সেবা করে - তাহা দেখিলে তাহাকে দেবী বলিয়া মনে হয়। সে কাছে দাঁড়াইলে অতি বড় অসহিষ্ণু রোগীও শিশুর মত মাতার ক্রোড়ে শান্ত হইয়া থাকে। জানি না কি কুক্ষণে আমি হেনরীর কথা তাহাকে বলিলাম এবং তার সেবার ভার লইতে বলিলাম। সমস্ত কথা শুনিয়া অত্যন্ত সংক্ষেপে গম্ভীর ভাবে নার্স এডনা হেনরীর সেবার ভার গ্রহণ করিতে এবং নিজেকে য়্যানী বলিয়া পরিচয় দিতে স্বীকার করিল। আমি হেনরী সম্বন্ধে নিশ্চিত হইলাম, কেন না তার অবস্থা দেখিয়া আমার মনেও শান্তি ছিল না। তার পর সাতদিন হেনরী জীবিত ছিল। নার্স যে ভাবে তার সেবা করিত, তাহা তার মাতা কিম্বা তার প্রণয়িনী য়্যানীও করিতে পারিত না। তার উপর সে য়্যানী সাজিয়া হেনরীর জ্বরতপ্ত হাত দুখানি ধরিয়া সান্ত্বনা দিত যে, সে তাহাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করিয়াছে। এই সাত দিনের মধ্যে আমি একবারও নার্স এড্‌নাকে হেনরীর কাছ ছাড়া হইতে দেখি নাই, সে যেন তাহার নিদ্রার উপর সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়াছিল। যদিও হাঁসপাতালের নিয়ম অনুসারে তার বিশ্রামের ছুটি ছিল এবং সেই সময়ে রোগীর পরিচর্য্যা করিবার জন্য অন্য নার্সও ছিল, এড্‌না কিন্তু আর কাহাকেও হেনরীর সেবা করিতে দিত না। অনেক সময় দেখিয়াছি, নার্স এড্‌না হেনরীর হাতখানি ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছে—তার চোখদুটি ছল ছল করিতেছে। আমি আশ্চর্য্য হইতাম—কারণ আমি তাকে আর কখনও বিচলিত হইতে দেখি নাই, ভাবিতাম করুণ হৃদয়া এডনা বুঝি এই সুন্দর যুবকের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছে। আমি মনে তার অভিনয় দক্ষতার প্রশংসা করিতাম,—সে যদি নার্স না হইয়া অভিনেত্রী হইত তাহা হইলে সে খুব কৃতকার্য্য হইত সন্দেহ নাই। এমনি করিয়া সাত দিন - সাত রাত্রি কাটিল। একদিন ভোরে প্রিয়তমা য়্যানীর নিকট শেষ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া নার্স এড্‌নার বুকে মাথা রাখিয়া হেনরী পরলোকের পথে যাত্রা করিল। হেনরীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়া গেলে আমি নার্স এডনার ঘরে গিয়া দেখিলাম সে গম্ভীর ভাবে কাগজপত্র গুছাইতেছে। আমিও একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলাম। নার্স এড্‌না কোন কথা কহিল না দেখিয়া হেনরীর কথা পড়িলাম,—শেষে বলিলাম—"দেখ এড্‌না, তুমি যদি নার্স না হইয়া অভিনেত্রী হইতে তাহা হইলে তোমার খুব নাম হইত। এ কদিন তুমি যে ভাবে হেনরীর কাছে তার প্রণয়িনী য়্যানীর অভিনয় করিয়াছিলে তাহাতে তোমার এ বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়াছিলে। সেত অন্ধ হইয়াছিল, তোমার মুখ দেখিতে পায় নাই,—কিন্তু সে শান্তিতে মরিয়াছে।" মরণাহতা হরিণীর কৃষ্ণতার চক্ষুর মত তার বড় বড় ঘন নীল চক্ষু দুটি বিস্ফারিত করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে এড্‌না বলিল,—

'অভিনয়, হা জগদীশ্বর! ডাক্তার আমি অভিনয় করি নাই, আমিই সেই য়্যানী।" আমি স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। ডাক্তারের সে কাহিনী শুনিয়া আমার মনে যে কি হইতেছিল তাহা ভগবানই জানেন। ভাবিলাম, আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে দশটা লোক মারিয়া বীর বলিয়া প্রশংসা লাভ করি, কিন্তু এই যুবতীর মনের বলের কাছে তাহা কি সামান্য। "ভিক্টোরিয়া ক্রসও" তাহার পূর্ণ সম্মান দিতে পারে না। গল্প শেষ করিয়া মেজর ডেরিক চুপ করিয়া চুরুট টানিতে লাগিল। তার সঙ্গীরা বিস্মিত হইয়া দেখিল, তার দুটি চক্ষুতে অশ্রু ভরিয়া উঠিয়াছে। —মেজর ডেরিককে সকলেই অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক বলিয়া জানিত।*

* ইংরাজী হইতে

ব্যায়ামবীর বিধুভূষণ



শ্রীমান বিধুভূষণ জানা তমলুকের অধিবাসী। তাঁহার বয়স মাত্র ১৯ বৎসর। এই অল্প বয়সেই তিনি লাঠি, তরোয়াল, বন্দুকছোঁড়া, মুষ্টিযুদ্ধ (Boxing) প্রভৃতিতে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছেন। ১৯২৮ সালে Calcutta Boys Schoolএর বর্ত্তমান Principal C. Fritchley Esqr. তাহার মুষ্টিযুদ্ধ (Boxing) দেখিয়া তাঁহার যৎপরোনাস্তি সুখ্যাতি করেন। ঐ সময় Colonel B. K. Bose কর্ত্তৃক Hyderabad Regimentএর জন্য তিনি আমন্ত্রিত হ'ন। কিন্তু তিনি সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯২৯ সালে Dist. Magistrate এর আগমনে তমলুক হ্যামিল্টন স্কুলে যে Physical fits দেখান হয়, শ্রীমান বিধুভূষণ তাহাতে সর্ব্বপ্রথম স্থান লাভ করেন। এই অল্প বয়সেই শ্রীমান বিধুভূষণ অনেকগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পাইয়াছেন ও 'খাদ্য', 'ব্যায়াম', ও 'স্বাস্থ্য', সম্বন্ধে তিনখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। শেষোক্ত পুস্তকখানি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

নালন্দার ধ্বংসাবশেষ

বিহার প্রদেশগত ঘটনা নগরীর ৬৫ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে ইতিহাস বিশ্রুত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষে অবস্থিত। ইংরাজী ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ভারতসরকারের ন প্রত্নতত্ব বিভাগ হইতে এই স্থান খনন করিয়া নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করা হয়।

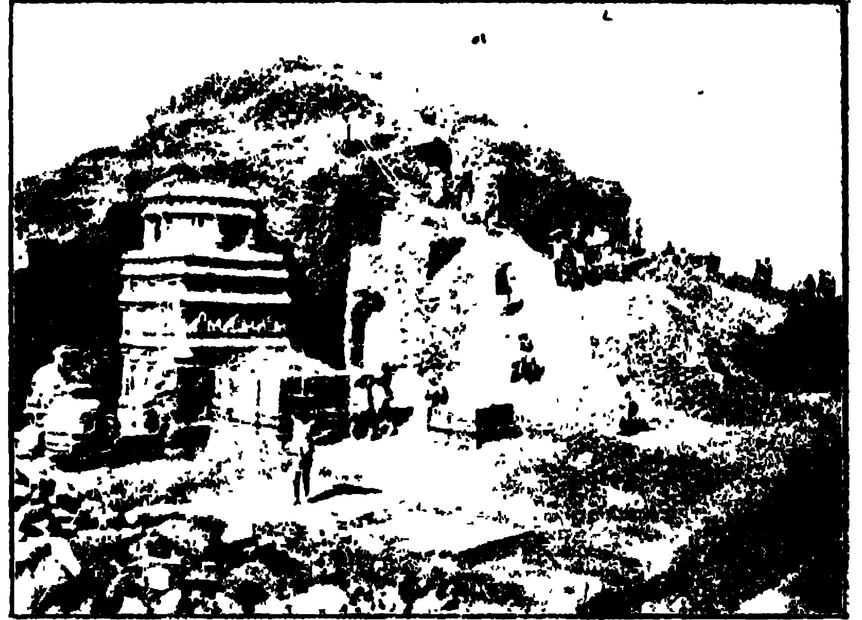
১নং



৩নং স্তুপের একটি দৃশ্য

নালন্দার বিষয়ে নূতন করিয়া বলিবার কিছুই নাই। উহার ঘটনা ইতিহাসের ছাত্রদিগের নিকট অবিদিত নেই। চীন পরিব্রাজক হীয়েন চাঙের বিস্তৃত বিবরণ পড়িলে বুঝা যায় সে প্রাচীন কালেও ভারতে শিক্ষার কোনও অভাব ছিল না বরং ভারতবাসীরা এখন বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না পাইলে যেরূপ তাহাদের শিক্ষার পরিপূর্ণতা রহিল বলিয়া মনে করেন সেইরূপ তখনকার দিনে বিদেশীরা ভারত হইতে কোন শিক্ষা না পাইলে তাহাদের কোন শিক্ষাই হয় নাই বলিয়া মনে করিতেন! জগতের ইতিহাস বদলাইয়া গিয়াছে! এখন ye East! thou art the mother of Culture কেহ স্বীকার করে না!

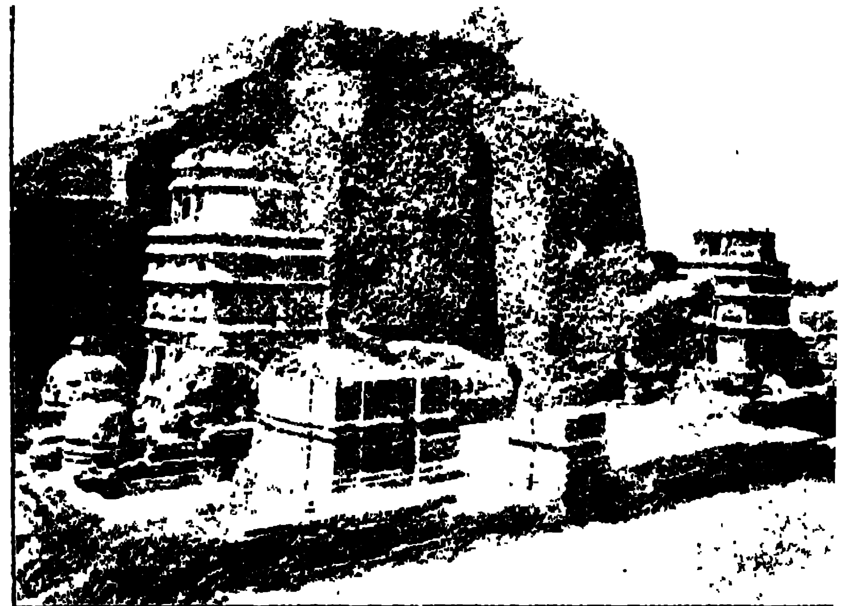
২নং



৩নং স্তুপের বিভিন্ন দৃশ্য

জগতের সৌভাগ্য সূর্য এমন "পশ্চিমে" উদিত-আলো সেই দিকেই, কিন্তু "পূর্ব" সে সব সময়ে

৩নং



৩নং স্তুপের আর একটি দৃশ্য

'সন্ধ্যায় ছিল না এই কথা স্বীকার করিতে যাহাদের কষ্ট বোধ হয় তাহাদের নিকট নলন্দর ধ্বংসাশেষে একটা চরম দৃষ্টান্ত স্বরূপ!

এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শীলাভদ্র নামে একজন উদাসীন পণ্ডিতের অধ্যাপনায় বেদ, ব্যাকরণ চিকিৎসা,

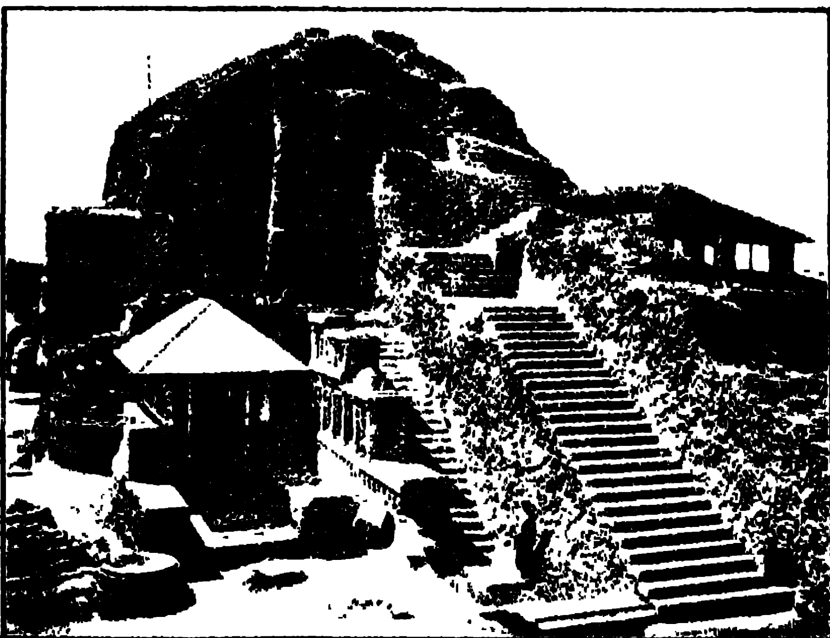
৪নং



১নং মঠের দৃশ্য

অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইত। দূর দেশ হইতে হাজার হাজার লোক এই শিক্ষা লাভ করিবার জন্য কতই না কষ্ট স্বীকার করিত! এখানে

৫নং



মিহি সুরু কাঁকড় দিয়া তৈয়ারি সিঁড়ি

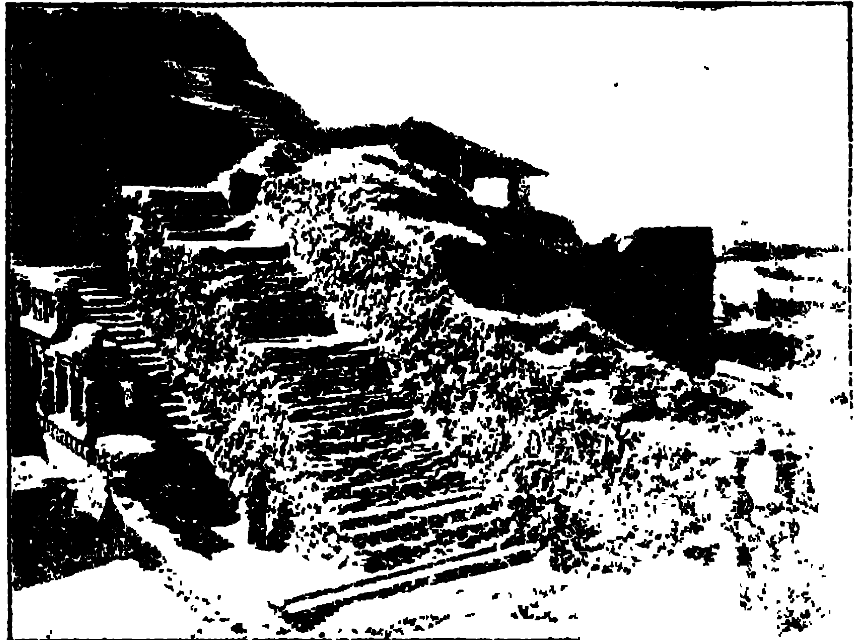
একটী পুরাতন "রত্নদধি" নামেতে পুথিভরা নালন্দার "নতলীয়া"ঘর আবিষ্কৃত হয়। প্রকাশ এখানে একশ' রকম বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যায়!

সপ্তম শতাব্দীতে হীয়েন-চাঙ্ যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগশাস্ত্র শিক্ষা করিতেছিলেন তখন বর্ম্মাই কুমার ভাস্কর এই চীন পরিব্রাজককে নিজের দেশে লইয়া যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পত্র দেন! এবং একটী কুমার ভাস্কর নাম অঙ্কিত মোহের নাকি যে সব অসংখ্য জোরামাটির মোহর এই খনন কার্য্য করিয়া সরকার পাইয়াছেন তাহার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে এবং অনুমান এইটী সেই নিমন্ত্রণ পত্র।

নালন্দার আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কেবলমাত্র স্তুপাকার করা ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা পাকা ঘর পাওয়া যায়।

অনুমান এই সকল পাকা ঘরগুলি সাধারণতঃ স্তুপ ও মঠ হিসাবে ব্যবহৃত হইত এবং বৌদ্ধ সভ্যতার এই একটী বিশেষত্ব যে যে মঠ আছে সে সে স্থলে স্তুপও আছে!

৬নং



স্তুপের উঠিবার সিঁড়ি

উত্তর দক্ষিণ দুদিকে এই সকল স্তুপ [illegible] অবস্থিত! প্রত্নতত্ত্ববিদরা অনুমান করেন যে সপ্তম [illegible] দ্বাদশ শতাব্দীর ভিতর অনেক কিছু [illegible] এই মঠ আর স্তুপ সকল নির্ম্মিত হয়!

মঠগুলি সাধারণতঃ ছোট ছোট কুঠরীতে [illegible] সার নির্ম্মিত! এই সকল মঠগুলি চারিদিকে [illegible] ঘর আছে ও উহার সম্মুখস্থ বারান্দার একপাশে [illegible] জল যাতায়াতের জন্য নর্দ্দামা রহিয়াছে।

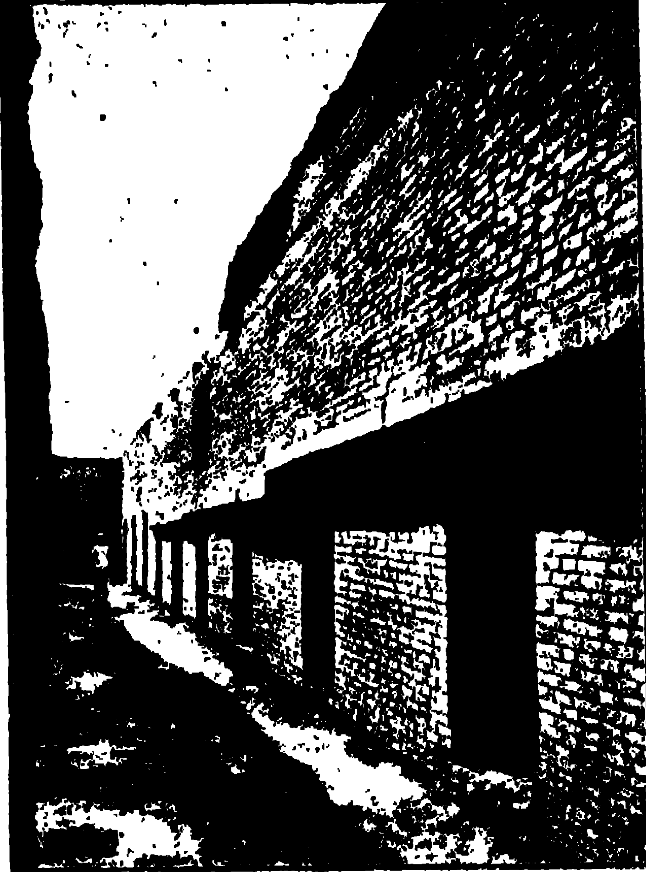
স্তূপের চারিপাশে পাকা দালান স্থান আছে।

পাকা ঘরগুলির চাল বড় বড় কাঠ লোহা ও মাটিতে পাকা করা হইয়াছে!

৩ নম্বর স্তূপ ও ১ নং মঠের দৃশ্য অতীত চমৎকার।

১ নং মঠের ভিতর নত্তলীয়া বা নমহলীয়া ঘর থাকার চিহ্ন দেখা যায়! এই ঘরেরই বোধ করি রত্নদধি নামে পুথিটী ছিল!

৭নং



১নং মঠের দক্ষিণদিকের বারান্দা

স্তূপ বা মঠে উঠিবার জন্য আঁকাবাঁকা সিড়ি আছে। এই সকল সিড়ি সাধারণতঃ সরু মিহি কাঁকড়-মাটিতে গাঁথা এই সিমেন্ট এত ভালও মজবুত যে উহা আজকালকার বিলাতী মাটীর চেয়ে অনেক শক্ত, মিহি ও চক্‌চকে। এই ভগ্নাংশের ভিতর arch or অর্দ্ধগোলাকৃতি খিলান বা ইটের গাথনি আবিষ্কৃত হইয়াছে!

অনেকের ধারণা ছিল যে মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে এইরূপ গাথনি আমাদের দেশে জানা ছিল না কিন্তু এখন ইহা প্রমাণিত হইল যে এই ধারণা

৮নং



স্তূপের আবিস্কৃত মূর্ত্তি

সম্পূর্ণ ভুল! সপ্তম শতাব্দীতেও ভারতবর্ষে এইরূপ খিলান করবে Technique জানা ছিল।

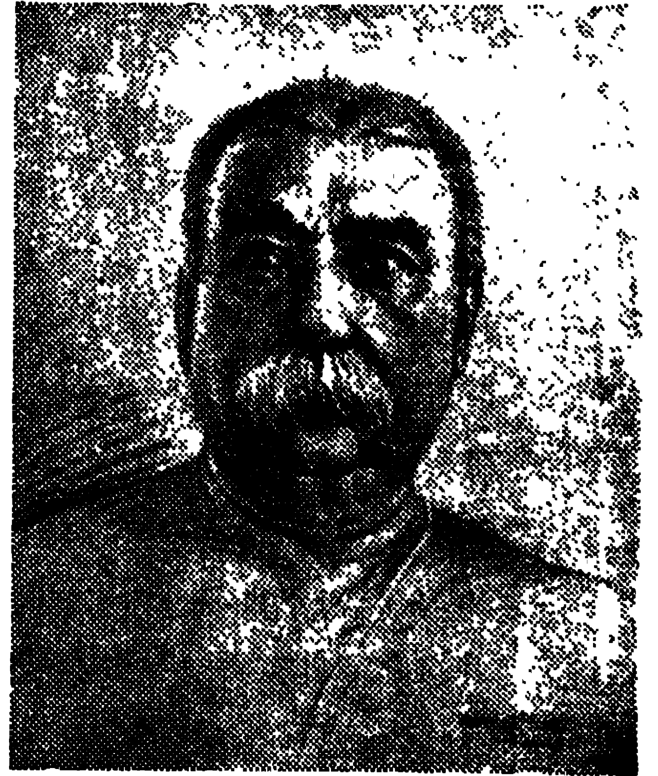
মঠের ভিতর সুন্দর সুন্দর বুদ্ধ মূর্ত্তি ও অন্যান্য দেবদেবী মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে দেখা যায়!

নলন্দার খনন কার্য্য (Nalanda Excavitoin) প্রাগঐতিহাসিক যুগের সভ্যতা সংরক্ষণে লর্ড কার্জ্জনের মনস্তত্ত্বের পরিচায়ক রহিবে ও প্রাচীন যুগের সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ জগতের নিকট সকল সময়েই সমাদৃত থাকিবে।

স্মৃতি-পূজা



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন


স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়



ভারতবর্ষ—আষাঢ়—১৩৩৮

আষাঢ়ের ভারতবর্ষে দুইখানি উপন্যাস সুরু হইয়াছে। একখানি ডাঃ শ্রীনরেশ চন্দ্র সেনগুপ্তের "তারপর" অপর খানি শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতীর "দূরের আশায়।" নামের বহরে মনে হয়, ইহার শেষ অনেক দূরে।

এ সংখ্যায় ছোট গল্প আছে মাত্র দুইটি। প্রথম গল্প শ্রীনির্ম্মল কুমার রায়ের "একালের রূপকথা।" গল্পটির বিষয়-বস্তু প্রেম, স্থান অবশ্য আধুনিক গল্প সাহিত্যের দস্তর মত বাংলা দেশ নয়—রাঁচি। কিন্তু নায়িকা-নায়করা সকলেই বাঙালী এবং প্রায় প্রত্যেকেই এক একটী ধোপ দেওয়া অর্থাৎ কেহ বিলাত-ফেরতা, কেহ বা ইটালী-প্রত্যাগত এবং যিনি বোম্বাইও ছাড়েন নাই, তিনিও কায়দা-কেতায় ধোপ-দোরস্তদের প্রায় ধর-ধর। কাজেই ঘটনাটা উচ্চাঙ্গেরই বলিতে হইবে। গল্পটির সাজ-সজ্জা এবম্প্রকার হইলেও লেখক অবশ্য ধোপ-দোরস্ত বাঙালীদের প্রতি যে সংযত অথচ তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া ধোপের তলায় মলিনতার সন্ধান দিয়াছেন, তাহা তারিফ করিবার মত। অশোকও ইটালি-প্রত্যাগত সুনিপুণ চিত্রশিল্পী এবং পাশ্চাত্য-শিক্ষায় পূর্ণ শিক্ষিত তথাপি সে নিজের জাতীয়তা ভুলিতে পারে নাই। তাহার শিষ্ট সরল, মধুর ব্যবহার ও অনাড়ম্বর অথচ পরিষ্কার খদ্দর বেশই পরিশেষে "নবীন ব্যারিষ্টার কমল গুপ্তকে" পরাস্ত করিয়া সুন্দরী রমার হৃদয়ে তাহাকে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল। আর একটু কথাও এই সঙ্গে না বলিলে চলে না ;—তাহার চেহারাটা অবশ্য ছিল নারী হৃদয়ে শেল হানিবার মতই। নতুবা—যাক্ সে কথা। গল্পটি বেশ ;—বিশেষতঃ শেষটুকু। ভাষাও বেশ ঝর ঝরে, ছোট গল্পেরই উপযোগী। কিন্তু ইহা রূপকথা মাত্র। ধোপদোরস্ত বাঙালী পাড়ায় "খদ্দর বস্ত" যে, সে কিন্তু অশোকের মত এমন "ভাগ্যমন্ত" নয়।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের—

"দুঃস্বপ্ন";—আষাঢ়ের নয়, উন্মাদ ফাল্গুনের! গল্পটি দীর্ঘ ; স্বপ্নও অনেকগুলি। কিন্তু অতি সুখপাঠ্য ;—কাহারো মনে এই দুঃস্বপ্ন চাপিয়া না বসিলেই রক্ষা। চির কুমার বৈজ্ঞানিকের চিত্তবনে ফাল্গুনের পিক যে একদিন সহসা ডাকিয়া উঠে এবং তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে ও সংযমের সীমাতিক্রম করিয়া একটি হৃদয়ের দিকে প্রধাবিত করে, গল্পটিতে সে কথা অতি উৎকটরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গল্পটির নায়ক—"এক প্রৌঢ় ডাক্তার—শহরের সিভিল সার্জ্জেন। বাঙ্গালী ক্রিশ্চান।" "বিবাহ তিনি করেন নাই। কেন করেন নাই কে জানে। হইতেও পারে বা, হয়ত তিনি তাঁহার মনের মত মেয়ে খুঁজিয়া পান নাই, কিম্বা হয়ত কাহাকেও ভালবাসিয়াছিলেন। যাই হোক, সেজন্য মনে তাঁহার কোন ক্ষোভ বা দুঃখ আছে বলিয়া ত বিশ্বাস হয় না। দিব্য নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকার, সদানন্দময় পুরুষ ; নিয়ত সংযত শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের মত তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ দেহ, প্রশস্ত ললাট, সমুন্নত নাসিকা, আয়ত দুইটি চক্ষু ;—দূর হইতে সহসা দেখিলে ধূম্র-লেশহীন জ্যোতিঃশিখা বলিয়া ভ্রম হয়। অথচ ইহার জন্য কোনও নারীচিত্ত কোনোদিন ক্ষুব্ধ ক্ষুধাতুর হইয়া উঠে নাই,—ইহাই আশ্চর্য্য।"

এই "ধূম্রলেশহীন জ্যোতিঃশিখা' একদিন সহসা প্রচুর কৃষ্ণ ধূম্র উদ্গীরণ করিয়া তাঁহার "পাচক সদানন্দের"

"অসামান্যা সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী, যুবতী" দ্বিতীয় পক্ষের কচি ও সরস হৃদয়খানি জ্বালাইয়া যে গাঢ় রস বাহির করিয়া দিলেন, তাহা পান করিয়া "নিয়ত সংযত শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের মত" পুরুষ আপনি ত মরিলেনই, ঐ যুবতীটিকে অবধি রেহাই দিলেন না। তবে ইহার মধ্যে একটু কথা আছে এই যে, রসের খোলা অগ্নির সান্নিধ্য লাভ না করিলে উষ্ণ হইতে পারে না। এ ক্ষেত্রে "ধূম্রলেশহীন জ্যোতিঃ শিখা" অবশ্য জিহ্বা মেলিয়া অগ্রসর হয় নাই, সুন্দরী "আরতিই" প্রথমে তাঁহার নিকট ঘনাইয়া আসে। ডাক্তারবাবু সংযমী পুরুষ তাই রক্ষা। তিনি একদিন সদানন্দকে সস্ত্রীক তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেই কি নিস্তার আছে? রাত্রে ঘুমের ঘোরে তিনি আরতীকে স্বপ্নে দেখিতে লাগিলেন। একদিন স্বপ্নে, "তাহাকে বুকের উপর তুলিয়া" ধরিলেন। "আরতি বলিল, "লোকে কি বলবে?" কিন্তু সে সময়ে কে কার কথা শোনে? ডাক্তারবাবু তাহাকে একেবারে বুকে জাপ্টাইয়া ধরিলেন। বলিলেন, "বলুক্?" আর একদিন শুনিলেন, আরতি "বাঁচাও, বাঁচাও" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। এই দুষ্ট স্বপ্নের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে "ধূম্রলেশহীন জ্যোতি-শিখা" সদৃশ "নিয়ত সংযত" পুরুষটি পরদিন "রাত্রে আর কিছু খাইলেন না", শুইবার আগে হাত-পা মুখ চোখ ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিলেন। শয়নের পূর্ব্বে দেবতার নাম স্মরণ করিয়া" ঘুমাইয়া পড়িলেন। এমনি করিয়া দিন কয়েক তিনি ছিলেন ভাল ;—দিনের বেলায় থাকিতেনও বেশ। কিন্তু রাত্রি হইলেই যত গোলমাল! তবুও ইহা তাঁহার বেশ লাগে। যাহা হউক, তিনি তৃতীয় দিন ঘুমের ঘোরে যে দুষ্ট স্বপ্ন দেখিলেন, তাহাই চরম। সেদিন আরতি সুরাপাত্র হাতে অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী নৃত্যপরা নটী। তাহার পায়ে পায়ে ঘাঘ্রা দোলে, ওড়নাতলে চারুকটাক্ষে বিজুরী হানে আর সেই সঙ্গে স্ফূর্ত্তির মজ্‌লিশে শব্দ শিহরিয়া উঠে—লে হরুরা—ছারা রা রা!!! কিন্তু মজলিশের মাঝখানে বোধ হয় ডাক্তার বাবুর লজ্জা করিতেছিল, তাই সেদিন আর তিনি তাহাকে আগে জাপ্টাইয়া ধরিলেন না, ধরিল আরতি। তারপর যাহা করিল, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিই। "আরতি মুখে কোন কথা বলিল না; ঈষৎ হাসিয়া শুধু সে তাঁহার দুটি আতপ্ত ওষ্ঠপুটে নিজের দুটি সুচারু আরক্তিম ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া আনমিত মুখে চক্ষু মুদ্রিত করিল।" এ দৃশ্য নিলর্জ্জের মত চোখ মেলিয়া দেখিবার নয়; তাই আমরাও চক্ষু মুদ্রিত করিলাম।

আর একটি দৃশ্য আছে -ইহা স্বপ্ন নয় বাস্তব। অপঘাত মৃতা আরতির শবদেহের উপর ডাক্তারবাবু যখন ছুরি চালাইতে যাইতেছেন তখনকার। তিনি শবব্যবচ্ছেদাগারের দরজা অর্গলবদ্ধ করিয়া গোপনে সে কাযটি সারিলেও পাঠক-পাঠিকার দাঁড়াইয়া দেখিবার ব্যবস্থা আছে। না দেখিলেই ভাল হইত; কিন্তু তাহাতে যে বাঙালীর আকণ্ঠ গল্প-রসপিপাসার নিদারুণ পীড়ার উপশম হয় না।

টেবিলের উপর সুন্দরী যুবতী আরতির মৃতদেহ। ডাক্তার বাবু পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর ও এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেনকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া দরজা অর্গলবদ্ধ করিলেন। তারপর আরতির দেহাবরণখানি উন্মোচন করিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। "সেই মুখ, সেই চোখ, সেই ঠোঁট, সেই দেহ"..."ডাক্তার বাবু কম্পিত হস্তে তাহাকে স্পর্শ করিলেন"...তারপর তাহার "প্রফুল্ল প্রস্ফুটিত শতদলের মত অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি দুই হাত দিয়া তুলিয়া ধরিয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ এক সময় তিনি ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।" কিয়ৎক্ষণ পরে দরজার বাহিরে ঠক্ ঠক্ করিয়া আওয়াজ হইতে লাগিল। ইন্‌স্পেক্টর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কতক্ষণ?"

"ডাক্তার বাবু দেখিলেন, জ্ঞানহীন উন্মাদের মত তিনি তখন তাহার সেই নিঃসাড় নিঃস্পন্দ হিমশীতল মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া তাহারই অনাবৃত নগ্নবক্ষে মাথা রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছেন।"

ইহার পর আরও একটু আছে। কিন্তু সেখানি ইহারই মত "অনাবৃত নগ্নবক্ষে" মাথা-রাখা ব্যাপার। দেখিলে দুঃস্বপ্ন বাড়িবে বৈ কমিবে না তাহাতে মানসিক স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা আছে। কাজেই চাপা দিলাম।

এ সংখ্যায় কবিশেখর কালিদাস রায় একটী কবিতা লিখিয়াছেন—"কর্ম্ম শুধু ঘর্ম্ম নয়।" অর্থাৎ তাহাতে মজাও আছে। যেমন—

"গ্রাম ঢুকিতে দেখি কে ঐ নেচে নেচে সান্‌ছে কাদা
নেইক সরম, দেওয়াল পরে হয়ত বসে তারই দাদা ॥"

দেওয়ালের উপর দাদা বসিয়া থাকে, আর তাহার সম্মুখে "কে ঐ" নাচে—একি কম মজা! আরও মজা লাগে পরের বাড়ীর বেড়ার ফাঁক দিয়া "ঢেঁকির পরে বধূর "কোমরে গোট দুলিতে দেখিয়া। আবার মজার সেরা মজা, যখন দেখা যায় "পল্লীবধূ চল্‌ছে নেচে ঘোম্‌টা মাথায় তুল্‌ছে মাজা।" তাই বিস্মিত কবি বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "ঠাকুর, তুমি এমন মজাদার, তোমার রাজত্বের চারিদিকে মজার এত ছড়াছড়ি অথচ মোর কপালে—?"

এ সংখ্যায় রঙিন্ ছবি আছে তিনখানি। "গায়ত্রী," "মস্‌লিনের জন্মকথা" ও "মেঘদূত।" তিনখানি ছবিতেই ভাবের দ্যোতনা আছে। মন্দ লাগে নাই।

প্রবাসী—আষাঢ়—১৩৩৮

রবীন্দ্রনাথ এ সংখ্যায় দুইটি কবিতা লিখিয়াছেন। "বৈশাখেতে তপ্ত বাতাস মাতে" ও "বালক বয়স যখন ছিল।"

এ সংখ্যার চারটি ছোট গল্পের মধ্যে চতুর্থটির সবটুকুই একটা বিদেশী গল্প। এগুলি ছাড়া দুইখানি উপন্যাস আছে, সেই "অপরাজিত" ও "পোর্টআর্থারের ক্ষুধা।"

এবার আষাঢ়ে রথযাত্রা নাই, কিন্তু গল্পের বাজারে পরশুরামের "মহেশের মহাযাত্রা" আছে। ইহাই প্রবাসীর প্রথম গল্প।

গল্পটিতে হাস্যরসের সহিত আর একটী ক্ষীণ সুর আছে—দূর দূরান্ত থেকে মহেশের গলার আওয়াজ এল—ও সাতকড়ি—আছে, আছে, সব আছে, সব সত্যি—"

মহেশের খাট অগোচর হয়ে এল, তখনও তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে—আছে, আছে ··"পরশুরামের গল্পে ইহা একটী নূতন সুর। গণিত অধ্যাপক মহেশ মিত্তির ভূত-ভগবান কিছুই মানিতেন না; কিন্তু তিনি মৃত্যুর পর এ গুলির অস্তিত্ব স্বীকার করেন! কথাটায় কেহ যেন না হাসেন।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীমনোজ বসুর "প্রেতিনী।" ইহাও ভুতুড়ে গল্প—কিন্তু ইহাতে ব্যঙ্গ নাই, রঙ্গ-রস ও কান্নার কারুণ্য আছে। গল্পটিতে প্লট কিছু নাই, এবং যে ছত্রটিতে গল্পটিকে শেষ করা হইয়াছে, সেখানে শেষ হওয়া উচিত ছিল না। লেখকের আলস্য বশতঃই এরূপ হওয়া সম্ভব। তথাপি রচনাটিতে একটী চমৎকার শ্রী আছে। যে দুইখানি চিত্র ইহাতে অঙ্কিত করা করা হইয়াছে, তাহাও অতি পরিষ্কার। আর একটী জিনিষ ইহাতে স্পষ্ট চোখে পড়ে—আমাদের বঙ্গ-পল্লীর রূপ। আধুনিক গল্পে ইহাকে খুঁজিয়া বাহির করা একটা সুকঠিন ধাঁধার উত্তর দেওয়ার সমান। গল্পটির ভাষা বেশ ঝর ঝরে ও মিষ্ট।

হরিচরণ তাহার দ্বিতীয়া তরুণী স্ত্রী প্রভাকে লইয়া নদীপথে নৌকায় যাত্রা করিয়াছে। যাত্রাপথে দুইজনের প্রেম সম্ভাষণ ও হরিচরণের প্রথমা স্ত্রীর বিষয়ে প্রভার আগ্রহপূর্ণ আলোচনা এবং সেই সঙ্গে পুরুষের ভালবাসার প্রতি তাহার মৃদু ব্যঙ্গোক্তি, ইহাই গল্পটির প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় ভাগে বাঙ্গলার রূপ ও তাহার সহিত হরিচরণের বিগত দিনগুলির ইতিহাস ও প্রথমা স্ত্রী সরযূর বিস্মৃত সুন্দরী মূর্ত্তি। এই শেষের ভাবটিকেই আশ্রয় করিয়া গল্পের নামকরণ হইয়াছে—"প্রেতিনী।" নামটা কিন্তু আদৌ মানানসই নয়।

তৃতীয় গল্প শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "টেলিগ্রামের দৌত্য।" গল্পটিতে হাস্য রসের উপাদান বেশ আছে। সবটুই বেশ জমাট ও সংযত।

এ সংখ্যায় রঙিন্ ছবি আছে চারখানি। প্রথমখানি প্রাচীন ছবি—"দীপক রাগ"; দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবি যবদ্বীপের "বেডয়ো" নৃত্যের। চতুর্থ ছবি শ্রীবিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়ের "চড়াই উৎরাই।" মন্দ লাগে নাই। "কিন্তু জায়গাটা কোথায় জানিতে পারিলে সুবিধা হইত। অনেক কবিচিত্ত এই দুস্তর ক্ষেত্র একবার পারাপার করিয়া ভাবঘাম ছুটাইয়া সুস্থ হইতে পারিতেন।

বসুমতী—জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৮

এ সংখ্যায় চারখানি উপন্যাস আছে—"জীবন স্বপ্ন", "ধর্ম্মদাস", "মাটীর স্বর্গ" ও "তিব্বতের বিভীষিকা।" ছোট গল্প আছে পাঁচটি।



পুষ্পরানী

জন্ম [illegible] মৃত্যু [illegible]

এসেছিল [illegible] নিবেদনে [illegible]

[illegible]

সে ফুল [illegible] দেবতা [illegible]

[illegible] কোথা অধিকার?

প্রতিভা ঘোষ

লক্ষ্মীবিলাস প্রেস লিঃ, কলিকাতা।

প্রথম গল্প শ্রীসরোজ নাথ ঘোষের "প্রতিক্রিয়া।" গল্প হিসাবে ইহার মূল্য কিছু না থাকিলেও বিষয়-বস্তু অত্যন্ত চিন্তোদ্দীপক। বাংলাদেশের নারী-সম্মেলনে কিছুকাল পূর্ব্বে বিবাহ বিষয়ক যে প্রস্তাবগুলি উত্থাপিত হয়, প্রচ্ছন্নভাবে সেগুলির দুই একটীকে ও পাশ্চাত্য মনীষিগণ অধুনা মানসিক বৃত্তিগুলির অবাধ চরিতার্থতাই নর-নারীর মিলনের সত্যকারের ভিত্তি বলিয়া যে শিক্ষা দান করিতেছেন তাহাকে প্রতিরোধ করিতে, প্রাচ্যের মহান্. শিক্ষার মূলনীতিকে গল্পটিতে কয়েকটি বক্তৃতায় অল্প-স্বল্প ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই মহা সান্ধক্ষণে যেন এই কথাটি বেশ গভীর করিয়া ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে;—প্রতীচ্য পৃথিবীময় যে সভ্যতার বাণী ছড়াইয়াছে, তাহা মানুষকে সত্যের পথে কতটুকু অগ্রসর করিয়া দিতেছে। নর-নারীর মিলনের ভিত্তি কোনটি হওয়া উচিত—ব্যষ্টির চিদ্‌বৃত্তির অবাধ চরিতার্থতা, না সমষ্টির সুখকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়া সংযম, ত্যাগ ও প্রেমে মনুষ্যত্বের পরিস্ফূর্ত্তি? প্রেমের স্থান উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা পূর্ণ হইলে জাতির জীবনে কল্যাণ নাই। কিন্তু লেখক কেবলমাত্র বাংলাকেই উদ্দেশ্য করিয়া কথাগুলি বলিলেন কেন? ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তে যে প্রতীচ্যের ঐ শিক্ষার ঘূর্ণী-হাওয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্যের "দীপ ও ধূপ।" যথার্থ প্রেমিক যে বাঞ্ছিতার সুখের জন্য "দীপের মত আপনি জ্বলিয়া তাহার অন্তরের অন্ধকার দূর করে, ও "ধূপের মত আপনি পুড়িয়া গৃহ পবিত্র ও সুরভিত" করিয়া তোলে গল্পটির পরিশেষে একটী চরিত্রের ক্রিয়া-কলাপে তাহা সুব্যক্ত। কিন্তু গল্পটির আসল কথা যেন "পরম হিন্দু মানে যে নারী-নির্য্যাতনকারী ও অবিচারক, একথা আমার জানা ছিল না" রমেশ ইহাই। কথা কয়টি বড় চমৎকার, বড় সত্য, বড় আশাপ্রদ। "ধর্ম্মগ্রন্থ, সৎসঙ্গ, হরিসভা ইত্যাদি লইয়া থাকেন" চন্দ্রনাথের মতন এমন মানুষের মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে বলিয়া কথাগুলি এত ভাল লাগে। ইহার পিছনে কত বড় প্রাণ আছে! এমনিতর মানুষই সমাজের আদর্শ।

তৃতীয় গল্প শ্রীসুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী (বি-এস্ সির) "মাতৃহীনা" চলন সই।

চতুর্থ গল্প শ্রীশচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "সরলা"। চতুর্থ পর্য্যায়ের।

পঞ্চম গল্প শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" একটী শিক্ষিতা তরুণীর স্বচ্ছন্দ বিচরণ দেখিয়া এক উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত শিক্ষিত তরুণ তাহার পিছু লইয়াছিল। ইহার মত নির্লজ্জ ও নির্ব্বোধ তরুণের অভাব পথে-ঘটে নাই। যাহা হউক, গল্পে তাহার প্রতি যথোচিত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ফলে তরুণটীর চেতনা ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু গল্পটি পাঠ করিয়া আরাম পাওয়া গেল না। যাহা হইতে গল্প-সৃষ্টি ইহার মধ্যে সেই আনন্দ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

এ সংখ্যায় রঙিন্ ছবি আছে তিনখানি। প্রথম ছবি শ্রীচারুচন্দ্র সেন গুপ্তের "ঝরাফুল।" বেশ লাগিয়াছে। একটী সকরুণ ভাব মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। দ্বিতীয় ছবি শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের "অরুণোদয়।" রঙের খেলা। বেশ। আর তৃতীয় ছবি জি, এম, রাজিনের "দিবা ও সন্ধ্যা।" একটী পুরুষ, একটী নারী। হায় কি মূর্ত্তি, মরি কি ভাব! দুটীতে আবার মিলন হইয়াছে ডোবার ধারে, দেউলের পাশে, গাছের তলে! তবুও ছবি ত বটে, আর কাচ ও ফ্রেমের দোকানে বিকায়ও।

বন্ধু-বিয়োগে

কুমারী রেণুকা মিত্র

এ জগৎটা যেন 'পান্থশালা'। মানবরূপী পান্থ এসে এখানে ক'দিনের জন্য ঘর বাঁধে, সুখ, দুঃখের খেলা খেলে, আবার তার কর্ত্তব্যকর্ম্ম ফুরিয়ে গেলে; সে তার নিজের গন্তব্যস্থানে ফিরে যায়।

জীবনের কঠোর সত্য মৃত্যু হঠাৎ এসে কোন কাকুতি-মিনতির অপেক্ষা না করে মানুষের আত্মাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়; আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব রক্তমাংসের শরীরখানাকে শ্মশানঘাটে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে শোকসন্তপ্ত অন্তর নিয়ে বাড়ী ফেরে।—যে যায়, সে চলে যায়, যাবার পথে ফিরেও চায়না; কিন্তু পিছনে ফেলে রেখে যায় মধুর স্মৃতিটুকু,—যা' দিয়ে বন্ধু ও আপনজন তাদের অন্তর ভরিয়ে রাখে।

আজ যার কথা বল্‌তে বসেছি সেও ঠিক এমনি করে মরণের হাতে ধরা দিয়ে এ জগতের সমস্ত জিনিষের সঙ্গে নিজের দেনা-পাওনা চুকিয়ে কোন্ এক নিরুদ্দেশ অভি-যানের পথে চলে গেছে। জীবনের শেষপ্রান্তে সে এসে পৌছোয়নি, জীবনের আস্বাদ তিক্ত কি মিঠা, তা' জানবার মত বুদ্ধি বা বিবেচনা তার হয়নি; ঠিক "পুষ্প" ফোট্‌বার মুখেই এল ওপারের ডাক,—এপারের সমস্ত খেলা ছেড়ে দিয়ে চিরপরিচিত ঘরে ফের্‌বার একটা নিষ্ঠুর তাগিদ, কোনদিন স্বপ্নের ঘোরেও সে ভাবেনি যে, এই ডাকে, তার একান্ত অনিচ্ছায়, সাড়া দিতে হ'বে —তার জন্যে সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না।—

"পুষ্পরাণী" ছিল আমার বন্ধু। তার সম্বন্ধে বল্‌তে গেলে অনেক কথাই মনে হয়, সবকথা আমি গুছিয়ে স্পষ্ট করে লিখ্‌তে পারবোও না, তা' আমার পক্ষে এখন সম্ভবও নয়।—তার কথা ভাবতে গেলেই, তার সেই সরলব্যবহার, সুন্দর হাসিমাখান মুখ—এইগুলোই চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে।—সত্যই সে "পুষ্প" নামের যোগ্যা ছিল। তার অন্তরটা ছিল "পুষ্পেরই" মত মধুর, সৌরভে ভরপুর। তার সমস্ত সৌরভ বিলিয়ে দিয়ে, সে অতি অকালে শুকিয়ে ঝরে পড়ল। কবির কথাই বুঝি সত্য—"Whom Cod loveth dies young." অল্পদিনের আলাপে তার যে সকল গুণের পরিচয় আমি পেয়েছিলাম, তা' চিরদিন আমার অন্তরকে স্মৃতি-সুধায় ভরিয়ে রাখবে। তার অসুখে তাকে আমি দেখ্‌তে যেতাম, তখনও তার সেই শীর্ণ অধরে হাসির রেশটুকু লেগে থাক্‌তো,—নিজের রোগযন্ত্রণা ভুলে গিয়ে সে কতক্ষণ প্রাণ খুলে আমার সঙ্গে আলাপ কর্‌তো।—

পুষ্প অতি শৈশবেই মাতৃহীনা হ'য়েছিল। তার স্নেহময় পিতা একাধারে পিতামাতার স্নেহে আপ্রাণ চেষ্টায় তাকে এত বড় করে' তুলেছিলেন; আজ তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে, তাঁকে ফাঁকি দিয়ে সে পরপারের যাত্রী হয়েছে।—তার ঠাকুমা, বড়মার কাতর-কান্না এখনো মনে পড়ে,—তার পিতা ও জ্যেঠার বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস শুন্‌লে সমস্ত মনপ্রাণ ব্যথায় ভরে ওঠে; মাতৃহারা তার একমাত্র ছোট ভাইটীর কথা মনে কর্‌লে চোখে জল আসে।

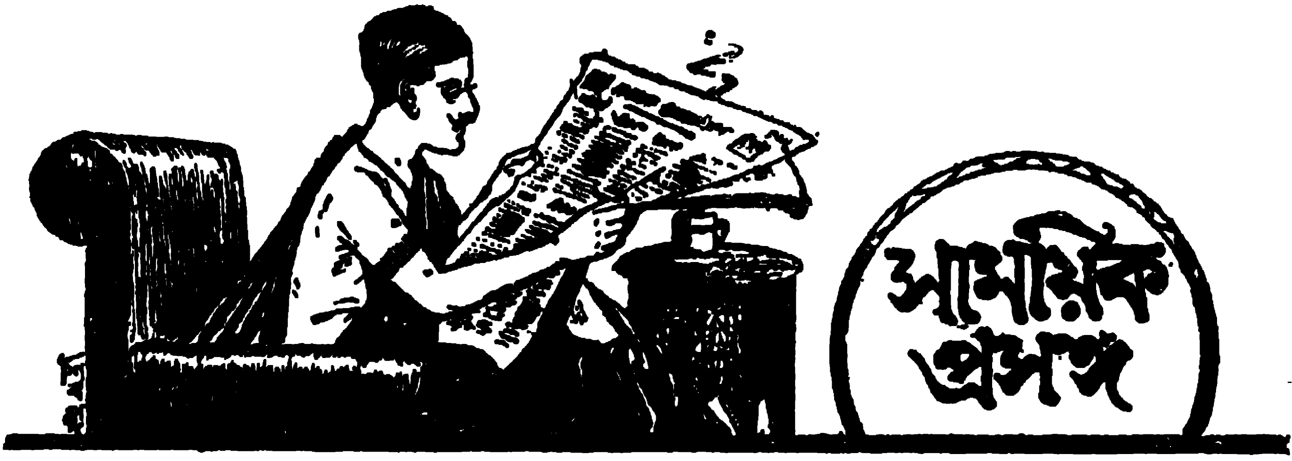
পুষ্প চলে গেছে। তার একলার জন্যে যে কতগুলি মানুষের জীবন দুর্ব্বিষহ হ'য়ে উঠেছে, সে হিসেব সে যাবার আগে তো নেয়নি; তার আসার আশায় আজ ত্রিশটা দিনরাত কেটে গেল, কই সে তো পুরানো পথ দিয়ে আর ফিরে এল না।—আর তার সেই সুমধুর কণ্ঠের সঙ্গীতধারায় "বেতার" ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠ্‌বেনা।—

আজ সে নেই, তাই তার বিয়োগের ব্যথা এম্‌নি করে আমাদের বুকে বেজে ওঠে। আজ সে যে অমৃত-ময়ের রাজ্যে গেছে, সেখানে তার অমর আত্মা যেন চিরশান্তিতে বাস করে,—এইটুকুই আমার প্রার্থনা।—

প্রিয় বন্ধু, বিদায়ের পথে আমার অন্তরের প্রীতিপূর্ণ অভিবাদন গ্রহণ কর।*

---

* কুমারী পুষ্পরাণী চট্টোপাধ্যায়ের অকাল-প্রয়াণে—



স্বাধীনতা কতদূর

গোল টেবিল বৈঠকে কে যাইবে তাহা লইয়া এরই মধ্যে আমাদের মধ্যপন্থীদের মধ্যে বেশ একটু আলোচনা সুরু হইয়া গিয়াছে। বাজারে গুজব যে যাঁহারা গত বৎসর বিলাত গিয়াছিলেন, তাঁহারা ত যাইবেনই তা ছাড়া আরও দু'চারি জন সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। এই অতিরিক্ত সভ্যদের মধ্যে বাংলার তরফে স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ও হিন্দুস্থানের শ্রীযুত নলিনী রঞ্জনের নাম শুনা যাইতেছে। কংগ্রেস পক্ষ হইতে বোধ হয় একমাত্র মহাত্মাজী ব্যতীত অন্য কেহই যাইবেন না—শেষ পর্য্যন্ত তাহাতেও সন্দেহ আছে। এই জন্য এই তরফের ধুরন্ধরদের কোন নাম শুনা যাইতেছে না। এংলো ইণ্ডিয়ান পত্রগুলি সকলেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে—মহাত্মা গান্ধীর শান্তি স্থাপন করিবার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও তাহার চেলা-চামুণ্ডেরা যাহাতে সন্ধি না হয় তাহারই কামনা করিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁহারা বলিতে চাহেন সর্দ্দার পাটেল বা শ্রীযুত নেহেরু এখনও স্থানে স্থানে জ্বালাময়ী অভিযানের দ্বারা মাত্র ইহাই জ্ঞাপন করিয়া বেড়াইতেছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থা যুদ্ধ-স্থগিতের ক্ষণিক অবস্থা, ইহাই শক্তি সংগ্রহের উপযুক্ত কাল, কিন্তু শীঘ্রই ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে তাহাতেই প্রকৃত ফলাফল নির্ণীত হইবে। কতকটা যেন এই জনশ্রুতির প্রতিধ্বনী করিয়াই মহামান্য বড়লাট বাহাদুর সিমলার চেমস্ ফোর্ড ক্লাবে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন ইংরাজ যুদ্ধ-স্থগিত চাহে না, তাহারা প্রকৃত শান্তি চাহে, তাহারা ভারতবাসীর সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইতে চাহে।

বিশেষ ভাবে আলোচনা করিতে গেলে আমাদের এই কথাই স্বাভাবিক ভাবে মনে উদিত হয় যে, ডিপ্লোমাটিক চাল চালিবার সময় চলিয়া গিয়াছে। ইংরাজের শিল্প-বাণিজ্য জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পণ্য বিক্রয় করিবার প্রায় তাবৎ ক্ষেত্রগুলিই একের পর এক করিয়া তাহাদের হস্তচ্যুত হইতেছে। এই সময়ে ভারত ও স্বাধীন হইতে পারুক আর নাই পারুক, এখানে ভীষণ অরাজকতা বিরাজ করিলে তাহাদের পণ্য-বিক্রয়ের ভীষণ বাধা-বিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হইবে। শিল্প-প্রাণ ইংরাজ তাহা কখনই কামনা করিতে পারে না। এই জন্যই তাহারা এখন ভারতকে কতকটা স্বায়ত্ত শাসন দিয়া ঠাণ্ডা করিতে চায়। তবে কতটা প্রদান করিবে এবং কি কি বিভাগ আবার হস্তান্তরিত হইয়া আমাদের নেতাদের শাসনাধীন হইবে তাহা বিশেষ বিবেচ্য।

ভারতের শাসন-সংস্কারের ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দুই-একটী জিনিষ বেশই উপলব্ধি করিয়া থাকি, নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি। সিপাহী-বিদ্রোহের পর যখন বর্ত্তমান হাইকোর্ট ও আইন-সভাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও ইংরাজ একদিকে সামন্ত রাজাদের কখনই রাজ্যচ্যুতি ঘটিবে না বলিয়া তাহাদিগকে যেমন আশ্বস্ত করিয়াছিলেন এবং সেইরূপ রাজ্যহীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-বর্গকে ইংরাজ-শাসিত প্রদেশগুলির আইন-পরিষদ-গুলিতে মনোনীত করিয়া লইয়া তাহাদের সহিত সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, রাজ্যহীন সম্ভ্রান্তরা ও সামন্ত নৃপতিরাই

সিপাহী-যুদ্ধের প্রবর্ত্তক ও নেতা ছিলেন। তাহার পর ইংরেজী-শিক্ষার প্রচলনের সহিত মধ্যবিত্তদের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান ও কর্ম্মদক্ষ তাঁহারা তাঁহাদের দাবী জ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করিলে লর্ড লান্সডাউন আইন-পরিষদ গুলিতে কতকটা নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া তাঁহাদিগকে তথায় প্রবেশ করিবার সুযোগ করিয়া দেন। পরে মিনটো-মর্লি রিফর্ম বা মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার প্রণালীতে এই সম্প্রদায়কেই যথেষ্ট কার্য্য করিবার ক্ষেত্র দেওয়া হইয়াছিল। এদিকে আবার অভিজাতদের প্রভাব জনমণ্ডলীর উপর হ্রাস হইতেছে দেখিয়া তাহাদের ক্ষমতাও সেই পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সন্ধিক্ষণে এখন ইংরাজ যদি কোন ডিপ্লোমাসি চালিতে চাহেন ত সেই কথাই ভাবিতেছেন। চার্চ্চহিল ও তাঁহার অনুচরগণ চাহেন পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিয়াই চলা হোক। আর অগ্রসর হইতে গেলে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষকে প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে হইবেই। অপর দল দেখিতেছেন যে, জোর-জবরদস্তি করিয়া পূর্ব্বাবস্থা রক্ষা করিতে গেলে এক অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য সারা ভারতে ভীষণ অশান্তি বিরাজ করিবে। ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার পক্ষে সেই অবস্থা কখনই লোভনীয় হইতে পারে না, সেই জন্য তাঁহারা চাহেন শান্তি, কাজেই কিছু স্বায়ত্ত শাসন দিতে হইবে। কতটা পাওয়া যাইবে এবং কতকটা না পাওয়া যাইবে তাহা নির্ভর করিতেছে—আমাদের নেতৃবর্গের উপর।

ডাঃ আনসারী ও হিন্দু-মুসলমান মিলন

ফরিদপুর কন্‌ফারেন্স হইয়া গেল। ডাক্তার আনসারি তাঁহার প্রাণের কথা বেশ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা ঐ কথাগুলি ডাক্তার আনসারির মুখে শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তাঁহার বক্তৃতার প্রত্যেক ছত্রেই আমরা মিষ্টার জিন্নার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলাম। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান এক মহা সমস্যা—এবং জাতীয়তা প্রতিষ্ঠার পক্ষে মহা অন্তরায় স্বরূপ। এইরূপ হয় কেন? বিভিন্ন ধর্ম্ম মত এবং বিভিন্ন জাতি পাশাপাশি সমস্ত দেশেই আছে। চীন দেশেও প্রায় দুই কোটী মুসলমান বাস করে। সোভিয়েট রুশিয়ায়ও মুসলমান জন-সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। কিন্তু ধর্ম্ম বা জাতি লইয়া ত কোন গোলমাল দেখা যায় না।

ভারতের মুসলমানগণ যদি হিন্দুদের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া এক জাতি হিসাবে বাস করিতে চাহেন, তাহা হইলে মীমাংসা হওয়া কি সহজ হয় না? কিন্তু তাঁহারা যদি শুধু পশ্চিমের দিকেই তাকাইয়া থাকেন এবং আর্য্য সভ্যতাকে পদ-দলিত করিয়া তাঁহাদের সভ্যতা চালাইতে যান, তবে মিলনের কথা বলিতে গেলেই বিবিধ সর্ত্তের অবতরণা করিতে হয়। ডাক্তার আনসারিকে আমরা এই কথাই স্পষ্টভাবে বলিতে চাহি যে, তিনি এবং তাঁহার সম্প্রদায় যে বলেন যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলেই সংখ্যায় গরিষ্ঠ হিন্দুজাতি মুসলমানদিগকে পদ-দলিত করিবে। তাঁহাদের সু-চিন্তিত সর্ত্তগুলি দেখিলে হিন্দুরাও কি বলিতে পারেন না, আমাদেরও সন্দেহ হয় যে, ভবিষ্যতে ভারতীয় মুসলমানগণ পশ্চিমের মুসলমান শক্তিগুলিকে হস্তগত করিয়া ভারতে ইসলামবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। আর এটা শুধু অনুমানই বা বলি কেন? দুই একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান নেতা ত স্পষ্টই তাহা বলিয়াছেন। এইরূপ যুযুধমান সম্প্রদায় যুগলের মিলন হইতে পারে না বলিয়াই মহাত্মাজী অনেকটা হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন।

সন্দেহকে ভিত্তি করিয়া মিলন-প্রাসাদ তৈয়ারী করিতে গেলে ভুল করা হইবে। সখ্য ও হৃদ্যতা সকল মিলনের মূল মন্ত্র। ভারতের মুসলমান যদি ভাবেন ভারতের হিন্দু তাহারই একজন ভাই, তবে মিলন সংঘটন করিতে বিলম্ব হয় কি? কিন্তু মুসলমান যদি ভাবেন আফগান, তুরস্ক, পারশ্য তাঁহার আপন জন, এবং হিন্দুরাও যদি অনবরত তাহাই সন্দেহ করে তবে মিলনের জন্য সূক্ষ্মদর্শী এটর্ণির ন্যায় যতই তর্কের বন্ধন দিয়া 'মিলনের বেষ্টনী' তৈয়ারী করা হউক না কেন উহা ভাঙ্গিয়া পড়িবেই।

বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

বাংলায় কংগ্রেসীদ্বন্দ্বের কোন অবসানই হইল না। কোন একটা সভা-সমিতি প্রকাশ্যভাবে হইতে গেলেই গুণ্ডার আবির্ভাব ঘটে এবং পরে দক্ষ-যজ্ঞের অভিনয় হয়। শ্রীযুত সেন গুপ্তের দল ইহাতে যে অনেকটা বিব্রত হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি কাউন্সিল নির্ব্বাচন লইয়া যে সমস্ত সভা-সমিতি হইত এবং সেগুলিতে দেশমান্য মধ্যপন্থী নেতাদের যা-সব লাঞ্ছনা হইত, সে সমস্ত কি তাঁহার স্মরণ আছে, বাগবাজারে পশুপতি বাবুর বাড়ীতে, কলেজ স্কোয়ারে আলবার্ট হলে যে সমস্ত দক্ষযজ্ঞ সংঘটিত হইয়াছিল, তখন তিনি কংগ্রেসের প্রধান পরিচালক। অমৃতবাজার প্রভৃতি নিরপেক্ষ কাগজগুলিতে তাহার প্রতিবাদ বাহির হইলে, তিনি তাহার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেন কি? প্রত্যুত্তরে বরং বলা হইত দেশবাসী তাঁহাদের উপর বিরূপ, কলিকাতার নাগরিকগণ তাঁহাদিগকে মুখ খুলিতে দেন না তা আমরা কি করিব? প্রকৃতির প্রতিশোধ রূপে সেই সমস্ত অস্ত্রই আজ তাঁহার উপর ব্যবহৃত হইতেছে, সহ্য করিতে হইবে। তবে আমরা এ কথা অবশ্যই বলিব যে, প্রতিপক্ষ এইরূপ দুর্ব্যবহার করিয়া ক্রমশঃ জনসাধারণের সমস্ত সহানুভূতিই হারাইতেছেন। এ কথা হয়ত সত্য হইতে পারে যে, শ্রীযুত সেনগুপ্তকে অপদস্থ করিয়া শাসমলের ন্যায় তাঁহাকেও কংগ্রেস হইতে হটাইয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং শ্রীযুত বোসের প্রভাব কিছুদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইতেও পারে, কিন্তু বর্ত্তমান এই সন্ধিক্ষণে এইরূপ করিয়া শ্রীযুত বোস এবং তাঁহার সমর্থকগণ কি পরে ডুবিয়া অনেকটা ক্ষতিগ্রস্থ যাইবেন না?

কেহ কেহ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, কংগ্রেস মহলে এইরূপ আত্ম-বিনাশ কেন চলিতেছে? কংগ্রেসের শত্রুপক্ষে বলে যে স্বায়ত্ত-শাসন আগত প্রায়। ভবিষ্যতে কে প্রধান মন্ত্রী হইবে বর্ত্তমান কলহের মূল কারণই তাই। কথাটা ভাবিবার বটে! কিন্তু মহাত্মা গোল-টেবিল বৈঠকে কতটা সফলকাম হইবেন এখনও তাহার স্থিরতা নাই। শ্রীযুত নেহেরু বা সর্দ্দার পেটেলকে বিশ্বাস করিতে গেলে আমাদের অন্য ধারণাই হয়, অর্থাৎ হয়ত বা আবার পূর্ণউদ্যমে অসহযোগ আন্দোলনে নামিতে হইবে। তবে এখন হইতেই কালনেমীর লঙ্কা ভাগ কেন?

চীন ও ভারতবর্ষ

চীন ও ভারতবর্ষ এশিয়ার দুইটী অভিশপ্ত দেশ। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান দুইটী বিভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায় থাকায় এখানে জাতীয়তা সংগঠন করা যেমন অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে, সেইরূপ চীনেও উত্তর ও দক্ষিণের কলহ মিটিয়াও মিটিতেছে না।

কাইসেক চীনের সর্ব্বময় শাসনকর্ত্তা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি খবর আসিয়াছে যে, দক্ষিণ আবার বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া তাহাদেরই নেতাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতেছে। চীনও ভারতবর্ষের মত একটি বিস্তৃত মহাদেশ। সেখানকারও জনসংখ্যা প্রায় চল্লিশ কোটি। উহারও বিস্তৃতি ভারতবর্ষ অপেক্ষাও অনেক অধিক। সকলেই মঙ্গলীয়, সভ্যতাও একই চৈনিক সভ্যতা। তবু তথাপি ও সেখানকার কলহ ও আত্মদ্রোহ মিটিতেছে না কেন? ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে এক আমেরিকার যুক্তরাজ্যগুলির কথা ছাড়িয়া দিলে, প্রায়ই যেখানে কোন দেশ রাজ-শাসন অগ্রাহ্য করিয়া সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, সেইখানেই ভীষণ আত্মদ্রোহ আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। বহু রক্তপাতের পর ফ্রান্সে শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। আজও পর্ত্তুগালের কোন প্রকার মীমাংসা হয় নাই। দক্ষিণ আমেরিকার রাজ্যগুলিতে একে একে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলেও রাজ-দ্রোহ, ভ্রাতৃ-দ্রোহ সেখানে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া রহিয়াছে। আজকাল যেরূপ সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাতে প্রায়ই সেখানকার কোন একটি সম্প্রদায় প্রবল হইয়া তাহার নেতাকে অগ্রণী করিয়া রাখে। অপর দলগুলি যতক্ষণ না মাথা তুলিতে পারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকে, অবসর বুঝিলেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইতালীতে মুসলিনী এবং তুরস্কে কামাল পাশা এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভুত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছেন, যে হেতু তাঁহাদের সমর্থক সংখ্যা এখনও প্রবল আছে।

যে মুহূর্ত্তে তাঁহাদের সংখ্যা হ্রাস হইবে সেই মুহূর্ত্তেই বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করিবে। মধ্যে মধ্যে কামাল পাশা বা মুসলিনীর উপর আক্রমণ যখন শুনা যায় তখন এই কথাই আমাদের মনে পড়ে।

বিশ্বঋণ ও আমেরিকা

প্রেসিডেণ্ট হুভার জাতি-সঙ্ঘের নিকট এ বৎসরের জন্য যাহাতে পৃথিবীর জাতিগণকে পরস্পর পরস্পরকে ঋণ না দিতে হয় তাহার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইংরাজ সাগ্রহে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ইংরাজ অধ্যুষিত উপনিবেশগুলিও ইংরেজকে অনুকরণ করিতে রাজী হইয়াছে। প্রধান সচিব ভারতবর্ষকে তাহার ঋণ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন।

ষ্টক এক্সসেঞ্জের বাজার একটু বেশ সুবিধা হইয়াছে। ভারতবর্ষে অনেক স্থলেই দেখিতেছি তাহাতে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে ধন্যবাদ দিবার কিছুই নাই। আমেরিকা বা বিলাত শিল্প-প্রধান দেশ। সারা পৃথিবী উহাদের পণ্যক্ষেত্র হইলে তবে উহাদের কারখানা গুলির খোরাক হইতে পারে। জাতিগুলি ঋণজালে জড়িত থাকিলে, ব্যবসায় ক্ষেত্রগুলি মন্দা যাইবেই। দুশ-একশ কোটি টাকায় সরকারি তহবিলে কিছু স্বচ্ছলতা হইলে জাতির কর কিছু হ্রাস করা যায় সত্য কিন্তু তাহাতে ত জাতির অন্ন-সমস্যার মীমাংসা হয় না। এই জন্যই আমেরিকা ও ইংরেজ পৃথিবীর দেশগুলিতে যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থা ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টিত। ফ্রান্স তাহার শিল্পের এখনও তেমন উন্নতি করিতে পারে নাই। তাহার সরকারী ব্যয় গত যুদ্ধ হইতে অসম্ভবরূপ বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই ফ্রান্স এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে নাই। ফ্রান্সে অন্ন-সমস্যা থাকিলেও তথায় উহা তত সাংঘাতিক ভাবে আত্ম-প্রকাশ করে নাই। সেখানকার সকল প্রজারই ভরণ-পোষণের জন্য সামান্য জমি আছে। কাজেই 'ভাত' তাহার ঘরে বাঁধা আছে। আন্তর্জাতিক ঋণ প্রত্যাহার প্রস্তাবে সম্মতি দিতে গেলে তাহার শাসন ব্যয় অসম্ভব রূপে বাড়িয়া যাইবে, প্রকৃতি-পুঞ্জ তাহাতে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে, কাজেই ফ্রান্সকে উক্ত প্রস্তাবে খুব দৃঢ়তার সহিত 'না' বলিতে হইয়াছে।

এদিকে এংলো ইণ্ডিয়ান সহযোগীরা যতই বলুন না কেন, ভারতকে এ বৎসরের জন্য ঋণ হইতে অব্যাহতি দিয়া খুব মহানুভবতা দেখান হইয়াছে, আমরা কিন্তু বলিব উহাও খুব একটা বড় রাজনৈতিক চাল হইয়াছে। কেন না, ভারত-সরকারকে ঋণের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছিল এবং শাসন-ব্যয় অসম্ভব রূপ বৃদ্ধি পাওয়ায় সর্ব্বরকমেই ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে হইতেছিল, এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে ভারত-সরকারের শুধুই যে ঋণ-গ্রহণের সুবিধা হইল তাহা নয়, ভারত সরকারের তহবিলেও অনেকটা স্বচ্ছলতা ঘটিবে।

উপাধি বর্ষণ

মহামান্য সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে এবার বাংলায় উপাধি বর্ষণ বাংলার বড় লোকদের মতে বেশ ভাল রকমই হইয়াছে। এডভোকেট জেনারল হইলেই স্যার হয়, এই হিসাবে বাংলার প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব শ্রীযুত নৃপেন্দ্রনাথ স্যার হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারগিরি করিলেই নাইট হয়, এই হিসাবে ডাক্তার সুরাবর্দ্দি নাইট হইয়াছেন। ঠিক এই প্রকার কুলগত-প্রথানুযায়ীই মিষ্টার ট্রাভার্স্ নাইট হইয়াছেন, কেন না তিনি ইউরোপীয়ান এসোসিয়নের সভাপতি ছিলেন। তবে কর্ণেল গিড্নী ও অধ্যাপক রাধাকিষণ কিন্তু একটু অতিরিক্ত কারণেই ঐ একই উপাধি পাইয়াছেন। শ্রীযুত চারুচন্দ্র বিশ্বাস সি-আই-ই হইয়াছেন। এই পুরস্কার আমরা কি হিসাবে লইব; তাঁহার যোগ্যতার নিদর্শনস্বরূপ না সহযোগীতার প্রতিফল বলিয়া, শেষোক্ত কারণই যদি প্রকৃত হেতু হয় তবে পি-এন-জীকেও একটা উপাধি দেওয়া উচিত ছিল। তিনি ত বহু গবেষণা করিয়া তাহার 'কন্ট্রিবিউসন্' বাহির করেন। আমাদের মনে হয় উপাধি প্রদান করিবার হাত বাংলার মন্ত্রী মণ্ডলের নাই, তাহা না হইলে মন্ত্রী মণ্ডলের প্রবর্ত্তক ও রক্ষক মিঃ গুহ এই বিরাট

উপাধি-দান-যজ্ঞে বাদ পড়িলেন কেন? ইহা কি অনেকটা শিবকে বাদ দিয়া শিবহীন যজ্ঞ তুল্য হইল না।

ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারি

ব্যাঙ্কিং এনকোয়ারী কমিটীর কার্য্য শেষ হইয়াছে। তাঁহাদের লিপিবদ্ধ রিপোর্টও বোধ হয় শীঘ্রই বাহির হইবে। এই রিপোর্ট সম্বন্ধে দুই একটা গুজব যাহা বাজারে বাহির হইয়াছে এখানে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। এই কমিটী স্থির করিয়াছেন যে ভারতে অচিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। সুতরাং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক লইয়া যে গোলমাল এতদিন চলিতেছিল এই বিশেষজ্ঞদের মতে তাহা অনর্থক ও মিথ্যা কলহ। তবে এদেশের শিল্প-বাণিজ্যর সুবিধার জন্য ইন্‌ডষ্ট্রীয়াল বা শিল্প-বাণিজ্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা উচিত। ইউরোপীয় সহযোগীগণ তাহাতে ভীষণ আপত্তি করিয়াছেন, তাঁহারা বলিলেন যে কোন প্রকার সহানুভূতি করিবারই প্রয়োজন নাই। সাধারণের বিবৃতির জন্য কথাটা আমরা বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। বর্ত্তমানে কলিকাতায় যে সমস্ত বড় বড় ব্যাঙ্ক আছে, সেগুলি সমস্তই ইউরোপীয় বা বিদেশী কর্ত্তৃক পরিচালিত। টাকা গচ্ছিত রাখিয়া কোন কারবার করিতে গেলে আমরা আমাদের গচ্ছিত টাকার উপর এক পয়সাও ঋণ পাইনা। কিন্তু যখনই উহাদের কোন স্বদেশবাসী কোন নূতন কারবার খুলিবার জন্য বা পুরাতন কারবার বাড়াইয়া তুলিবার জন্য ঋণ চাহেন, তিনি তাঁহার গচ্ছিত অর্থের অনেক বেশী ঋণ পাইয়া থাকেন। তাহাতেই ব্যবসা জোর চলিয়া থাকে। আমাদের যে সব প্রতিনিধি উক্ত কমিটিতে ছিলেন তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে যে সমস্ত শিল্প-বাণিজ্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাদিগকে তাহাদের বিবেচনানুযায়ী দেশী শিল্পের উন্নতির জন্য ঋণ প্রদান করিবার ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক। ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণ ইহাতে আপত্তি করিয়াছেন।

সুন্দর দেহ

দেহকে কি সুন্দর করা যায় না। ইহাই এখন পশ্চিমের গবেষণার বিষয় হইয়াছে। এই বিষয়টী লইয়া তথায় ভীষণ আলোচনা ও অনুসন্ধান চলিতেছে। আমরা এই কথাই এখানে বলিয়া রাখি যে, দেহ ও মনের সহিত খুবই নিকট সম্বন্ধ এবং একের অসুস্থতায় অপরের অসুস্থতা সর্ব্বদাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। সেই জন্যই হিন্দু-শাস্ত্রে মনের যাহাতে সর্ব্ববিধ উন্নতি হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্য বা সাময়িক ব্রহ্মচর্য্য সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। এই ব্রহ্মচর্য্য হইতে চ্যুত হইয়াই বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ তাহাদের স্বাভাবিক কমনীয় ভাব হারাইতেছে।

সমর বিভাগ ও বাঙ্গালী

সামরিক কমিটীর অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ভারতীয়গণকে হয়ত শীঘ্রই কতকগুলি সামরিক কাজ ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে কিন্তু বাঙ্গালীর আমোদ করিবার কিছুই নাই। আজ অবধি যে কয় জন সামরিক বিভাগে উচ্চপদ পাইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে এক রয়েল ইন্‌জিনিয়ারী একটী মাত্র পদ একজন পাইয়াছে—আর সকলেই অবাঙ্গালী। এই কঠিন জীবন-সংগ্রামের দিনে এ কথা কি ভাবিবার নয়।

সহযোগী ষ্টেটস্‌ম্যান হিন্দু-জাতিকে লইয়া এত মাথা ঘামান কেন? সামরিক কমিটীর অধিবেশন সুরু হইলে সহযোগী একদিন বলিলেন, উচ্চ সামরিক কর্ম্মচারীর পদগুলি ভারতবাসীর জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিলে, যাহারা চিরদিনই ভারতের সৈনিক জাতি অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাববাসী হিন্দু-মুসলমানরাই ঐ পদগুলি পাইবে। এবং প্রমাণ স্বরূপ দেখাইয়াছেন যে, আজ অবধি যতগুলি পদ ভারতবাসীকে প্রদান করা হইয়াছে, তাহারাই তাহা পাইয়াছে।

কংগ্রেসী দলভুক্ত ভদ্র পদবীধারী সম্প্রদায়দের উক্ত পদ পাওয়া বড়ই দুরূহ হইয়া উঠিবে। আমরা প্রত্যুত্তরে বলিব, কিছুই দুরূহ হইবে না। এখন যেরূপভাবে উহা উন্মুক্ত করা হইয়াছে তাহাতে ঐ সব সম্প্রদায় ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের প্রবেশ বড়ই কঠিন ব্যাপার। স্বরাজ লাভের পর যখন উহা বেশ ব্যাপক ভাবে উন্মুক্ত করা হইবে তখনই অন্যান্য সম্প্রদায় বেশ ভালভাবেই প্রবেশ করিবে।

ই কি অনর্থের মূল !

'কজন নৈতিক পণ্ডিত ঠিকই বলিয়াছেন যে সমস্ত ।১ অনর্থের মূল। সমস্ত ismরই মূলে আর্থিক পরিবর্ত্তন ইচ্ছা নিহত আছে। এবং ismই যখন বলবৎ হয় তখন বিশ্বে রক্তপাত সংঘটিত হইয়া থাকে। আমাদের রাজনৈতিক পণ্ডিতগণ কি বলেন ?

ট্রাম ও বাস

সহরে যখন বাস চলিতে আরম্ভ হয় তখন লোকে মনে করিয়াছিল যে সহর হইতে ট্রাম কোম্পানীকে কারবার তুলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে ট্রাম কোম্পানী ত তাহাদের কারবার তুলিলই না, পরন্তু নিত্য নূতন ব্যবস্থা করিয়া অধিক সংখ্যক গ্রাহক সংগ্রহ করিতেছে। ট্রাম কোম্পানীর নূতন নূতন ব্যবস্থাগুলি বাস্তবিকই জনসাধারণের বিশেষ উপকারী হইয়াছে। শুনা যাইতেছে কোম্পানী সত্বরই সহরে এক প্রকার গাড়ী বাহির করিবেন তাহা অনেকটা composite carর মতন, ফাষ্ট ক্লাশ ও সেকেণ্ড ক্লাশ একই গাড়ীতে থাকিবে এবং মধ্যে একটী দরওয়াজা থাকিবে! এই ব্যবস্থায় মাত্র একটী কণ্ডাক্টর রাখিলেই চলিবে। দেখা যাক্ এই গাড়ী সহরে কেমন চলে। আমাদের বাস সিণ্ডিকেট হইয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার ক্রমোন্নতি বিশেষ কিছু এ পর্য্যন্ত উপলব্ধি হইতেছে না ইহা, দুঃখের বিষয়। বাস ও ট্রাম এক সঙ্গে কালীঘাট হইতে ছাড়িলে অনেক সময়ই চৌরঙ্গীতে ট্রামই আগে আসে, ইহা কিন্তু হওয়া উচিত নয়। বাসের কণ্ডাকটারেরা অনেক সময় আরোহীদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে না, বাস যেখানে এক মিনিট থামাইলে চলে সেথায় ইচ্ছামত ৫।৭ মিনিট দাঁড়ায়। রাত্রে অনেক সময় কালিঘাটগামী গাড়ী বেশী যাত্রী না পাইলে ধর্ম্মতলা বা ওয়েলিংটন হইতে আরোহী নামাইয়া ফিরিয়া যায়—গ্রাহ্যও করে না,—এ সব বিষয়ে এখন সিণ্ডিকেটের কঠোর দৃষ্টি দরকার। আমরা বাস সার্ভিস ও সিণ্ডিকেটের উন্নতিকামী—কিন্তু তাহা অব্যবস্থায় হওয়া তো সম্ভব নয়। তার পর আর এক কথা—বাস সিণ্ডিকেটের স্রষ্টা, মাম্বলী সিষ্টেমের সেক্রেটারী এস-কে-ব্যানার্জ্জি বা শ্রীযুত সুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম আর দেখা যাইতেছে না, সে স্থানে আর-এস সিন্নার নাম দেখা যাইতেছে। তবে কি এমন বিরাট ব্যাপার গঠন করিয়া সুরেন্দ্রবাবুকে সরিয়া পড়িতে হইল ? ব্যক্তিগত হইলেও সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে বাস সিণ্ডিকেট এতটা জড়িত—যে প্রয়োজন বোধে একথার উল্লেখ করিতে হইল। বাসগুলি ইচ্ছামত চলিবার অনিয়মে অতিষ্ট হইয়া সিণ্ডিকেট সম্প্রতি নিজ তত্বাবধানে এক্সপ্রেস সার্ভিস করিয়া তাড়াতাড়ি কতকগুলি বাস চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন জানিয়া সুখী হইলাম।

মাইকেল স্মৃতি

খিদিরপুর মাইকেল লাইব্রেরীর উদ্যোগে লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিস্থানে মাইকেল স্মৃতি উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। এই লাইব্রেরীর সভ্যগণ রেডিওতেও গীত আবৃত্তি প্রভৃতি করিয়াছিলেন।

চিত্রকর

ডাঃ শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী গল্প

পরিতোষ সারা মন দিয়া ছবি আঁকিতেছিল। দ্বিতলের ছোট একখানি ঘর, পরিপাটি ভাবে সাজান। গৃহকোণে একটি মাকড়সার জাল বা মেঝের ধূলিকণার চিহ্নমাত্র নাই। দেওয়ালে কয়েকখানি মূল্যবান ছবি এবং নীচে এদিকে-ওদিকে নিজকৃত কতকগুলি সমাপ্ত, কতকগুলি অসমাপ্ত চিত্র। হাতের কাছে তুলি, ব্রাস, রঙ ও একটা পাত্রে জল। মেজের উপর একটি ছোট ধবধবে সাদা বিছানা বিছানায় খান দুই ছবির বই।

পরিতোষের বয়স কুড়ি বাইস হইবে! দিব্যি সুন্দর গৌরকান্তি চেহারা। চক্ষু দুইটি বেশ টানা, মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল। গভীর মনোযোগের সহিত ছবিখানা আঁকিতেছিল। একটি তরুণী হঠাৎ গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল।

"হ্যাগা, শুন্‌ছ ?"

বোধ হয় যুবকের কানে সে স্বর, প্রবেশ করে নাই। যেমন নিবিষ্ট মনে ছবি আঁকিতেছিল তেমনি আঁকিতে লাগিল। তরুণী তখন আরও নিকটে যাইয়া আপেক্ষিক উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—

"কিগো শুনতে পাচ্ছ না নাকি একেবারে কালা হয়েছ ?"

"কে, সুষি ? দেখতেই ত পাচ্ছ কাজে ব্যস্ত রয়েছি। এ অসময়ে কি মনে করে!"

"কাজ ত তোমার লেগেই আছে! দিন রাত কি যে হিজিবিজি আঁক, ভাল লাগে না আমার। দুদণ্ড গল্প ক'রব তা না। ঘরে এসে, বলত কে বোবার মত বসে থাকতে পারে ?"

"ব'কো না—লক্ষ্মীটি আমার,—কাজটা শেষ হতে দাও, তারপর—"

"তা হলেই হয়েছে! না, আমার আসাই ঝকমারী!

পরিতোষ মাথা ঝাকিয়া বলিল,—"হু"।

"মাথা ঝাকলে হবে না। আজ রোববার, থিয়েটারে ম্যাটিনী আছে। ষ্টারে 'রমা' দেখিয়ে আনতেই হবে।"

"হাতের কাজ না সেরে কোথাও যেতে পারব না। আজকের মত মাপ কর, আর একদিন নিয়ে যাব।"

"এত তোমার বাঁধা বুলি। যেদিনই বলি, ঐ এক কথা। না, আজ আর তা শুনছি নে।

"লক্ষ্মীটি, যাও দেখি এখনকার মত, কাজটা সারতে পারি যদি।"

"যদি টদি শুনছি নে যেতেই হবে আজ। তা না হ'লে একটা ভয়ানক হাঙ্গামা বাধাব।"

এই বলিয়া পরিতোষের নব পরিণীতা স্ত্রী সুষী ওরফে সুষমা দেবী দুপ-দাপ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল।

কিছুই যেন হয় নাই,—পরিতোষ তেমনি নিবিষ্ট মনে ছবি আঁকিতে লাগিল।

সুষি নীচে যাইয়া একবার এটা নাড়ে, ওটা নাড়ে, একবার বা বসে। পরক্ষণেই উঠিয়া জানালার পরদা সরাইয়া রাস্তার দিকে তাকায়। সেখানে লোকের চলাফেরা দেখে। চক্ষের সম্মুখে প্রতি মুহূর্ত্তে জগতের কত বৈচিত্র্য দেখিতে পায়। একটি পাখী গাছের উপরে বসিল, পরক্ষণেই আর একটি আসিল। উভয়ে কত গান গাহিল, আবার তখনি নীচে নামিয়া আসিল। গলাগলি, কাণাকাণি, মুখোমুখী উভয়ের কত খেলা! জীবনের কি বিচিত্র সুর। দেখিলেও প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। আর তার,—একি দুর্ব্বিসহ জীবন। দুটি কথা কহিবে, তাহার লোক নাই। স্বামীর কাছে যখনই যায়—সর্ব্বদাই ছবি আঁকায় ব্যাপৃত। কথা কহিতে গেলে বিরক্ত হন। তার এই নূতন যৌবন, জীবনের গাঙ্গে এই প্রথম জোয়ার। এ সময় প্রাণের সঙ্গীতে সারা

বিশ্ব মুখরিত করিতে ইচ্ছা হয়, তার মধ্যে এ কি মর্ম্মন্তুদ কঠিন নীরবতা!

তাই সে মাঝে মাঝে কারণে-অকারণে ঝিঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধায়, আবার মুহূর্ত্তপরেই তাহাকে হাসিতে পাগল করিয়া দেয়। ঝি বুঝিতে পারে না, তাহার এই ঠাকুরাণীটির এ কি অভিনব ব্যাধির সৃষ্টি হইল!

এদিককার রান্না বান্না শেষ করিয়া সুষি আবার তেমনি দুপ-দাপ করিয়া উপরে উঠিল। চেঁচাইয়া বলিল,—"কি গো মশাই,—আপনার হয়েছে? আমি ত সব সেরে-সুরে এলাম। উঠে পড়ুন; সময় আর মোটেই নাই। এর পর গেলে জায়গা মিলবে না।"

"আ কি গোল বাধালে! এই না বল্লুম—হাতের কাজ শেষ না করে আমি যেতে পারব না।"

"হরি,—সে বুঝি এখানকার কথা! তারপর এক যুগ চলে গেল যে। বলি দিন রাত ত ঐ ভস্মে ঘি ঢালছ,—ফল ত দেখি না কিছুই।"

"ভারি বিরক্ত আরম্ভ করলে ত! যাও বলছি, আমায় এমন করে উৎপাত করলে।"

"ধরে মার লাগাবে, না তাড়িয়ে দেবে?"

"হয়ত শেষে তাই করতে হবে।"

"বটে—এতদূর।"

এই বলিয়া গরগর করিয়া সে তখনই নীচে চলিয়া গেল। তখনকার সেই রোষদীপ্ত রক্তোৎপল সদৃশ লাল টুকটুকে সুন্দর মুখখানি দেখিলে অপর যে কাহারও মাথা ঘুরিয়া যাইত নিশ্চয় এবং তখনই পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিয়া এই রূঢ়তার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত

কিন্তু পরিতোষ ছিল ঐ এক ধাতের। যেমন ছবি আঁকিতেছিল, তেমনই আঁকিতে লাগিল;—কিছুই যেন হয় নাই। ছোটবেলা হইতেই তাহার ঝোঁক ছিল এই ছবি আঁকার দিকে এবং মনে মনে আশা ছিল যে, কালে সে একজন র‍্যাফেল বা একজন ভ্যানডাইক, নিদেন অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর বা নন্দ লাল বসুর মত হইবেই হইবে। এবং যে পর্য্যন্ত না সেরূপ না হইতে, পারে সে পর্য্যন্ত আর কোন বিষয়ের ধার ধারিবে না। উদ্যোগ ছিল তার যথেষ্ট, সহিষ্ণুতার অভাব ছিল না এবং কাজও করিতে পারিত অসাধারণ। কিন্তু যে চক্ষু থাকি বিশ্বের সমস্ত জিনিষ সৌন্দর্য্যময়, প্রাণময় হইয়া উ তাহার চক্ষে সে দৃষ্টি, সে সূক্ষ্মানুভূতি, সে পরম বিশ্লে শক্তি ও নিগূঢ় প্রেম ছিল না। কাজেই চিত্রগুলি সজীব লাভ করিতে পারিত না।

সে না যাইত কোন আমোদ প্রমোদে, না যাই কোন খেলা-ধূলায়। ঘরের কোণটিতে বসিয়া নিবি মনে নিজের কাজ করিয়া যাইত। কোন মেসে স্বত একটি ঘর লইয়া থাকিত। কখন এখানকার ওখানকার প্রদর্শনীতে দু একখানা ছবি দিত। কি এ পর্য্যন্তও উহা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হই না। মাতা স্বর্গলাভ করেন অতি শিশুকালে যখন তাহার বয়স মাত্র ষোল বৎসর তখন পিতৃ-বিয়োগ হয়। ভাগ্যক্রমে পিতা ব্যাঙ্কে কিছু টাকা রাখিয়া যান তাহারই সুদ হইতে তাহার একার ভরণ পোষণের কোন কষ্ট হয় না। আত্মীয়, বন্ধু, স্বজন বলতে ছিলেন একমাত্র পিসী নতুবা সংসারে আপনার জন আর কেহই ছিল না। সেই পিসীও থাকিতেন বাগবাজার কম্বুলীটোলা। ক্বচিৎ কালে ভদ্রে সে তাঁহার ওখানে যাইত। সেই-খানেই একদিন সুষমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হয় এবং বার কয়েক ঘন ঘন যাতায়াত করে। কোন দিক হইতে কোন বাধা না থাকায় পিসিমাই উদ্যোগী হইয়া এই বিবাহ দেন। সুষমা তখন সবে প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। বিবাহান্তে কয়েক দিন পিসিমার বাড়ীতেই কাটাইল। পরে ধীরে সুস্থে হরতকী বাগানে একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে সুসমাকে লইয়া আসিল।

বিবাহের যে এত ঝঞ্ঝাট তা তার জানা ছিল না সাংসারিক জ্ঞান মোটেই ছিল না। সুতরাং পদে পদে অসুবিধা হইতে লাগিল। সুষমা প্রত্যেক কাজেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসে, তাহার পরামর্শ চায়। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ তা জানিতে চায়। পরিতোষ উহা ভালবাসে না। সে চায় তেমনি পূর্ব্বের মত একনিষ্ঠ হইয়া চিত্রাঙ্কণে রত থাকিতে। অবশেষে বিরক্ত হইয়া একটী বয়স্কা ঝী আনিয়া হাজির করিল। স্ত্রীকে বলিল, যদি কোন বিষয়ে কিছু জানিবার প্রয়োজন হয়,

উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই হইবে। তাহাকে যেন বিরক্ত না করে।

তাই ছবি আঁকিবার আলাদা ঘর হইল। সে চায় সর্ব্বতোভাবে পৃথক হইয়া থাকিতে। যেমনটি পূর্ব্বে ছিল ঠিক তেমনটি।

কিন্তু তা যে আর হয় না, তা সে বুঝিতে পারে না। বসন্তের নবমুকুলিত আম্র মঞ্জরীর ন্যায় নবযৌবন সমাগমে সুষি উদ্‌ভ্রান্ত। সে চায় নিত্য আদর, নব নব সোহাগ। ভ্রমর যেমন পুষ্পকোরকের চারিদিকে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায় সে চায় তার স্বামী তেমনি মধুর আলাপনে তাকে মুগ্ধ করিয়া রাখে। তাই বার বার ছুটিয়া যায় তার কাছে, কিন্তু সেদিক হইতে কোন সাড়াই মিলে না,—ফিরিয়া আসে একান্ত হতাশ প্রাণে।—

এমন অবস্থা অনেকদিন চলে না।—দূরত্ব ক্রমেই বাড়িয়া যায়। এক ছবি আঁকা খেয়াল ভিন্ন স্বামীর বিশ্ব সংসারের কোন দিকে দৃষ্টি নাই। সত্য, টাকা সে মাসের প্রথমেই সুষির হাতে দিত। পেটের ক্ষুধা মিটিতে কোন বেগ পাইতে হইত না, কিন্তু প্রাণের ক্ষুধা ত মিটিত না; বিবাহের পূর্ব্ব হইতে সে কত আশা করিয়াছে। তার সমবয়স্ক বন্ধুদের মধ্যে যাদের বিবাহ হইয়াছে, তাদের কাছে কতই না সুখের সংবাদ শুনিয়াছে। তাদের স্বামীরা কত আদর, যত্ন, সোহাগ করে, কত হাসি, ঠাট্টা, আমোদের শেষ নাই। নিত্য আনন্দের হাট লাগিয়া আছে। স্বর্গ সুখ তার কাছে কোন ছার!

আর তার অদৃষ্টে এ কি ঘটিল! বিধাতার এ কোন অভিশাপ! ভাবিয়া আর কূল পায় না। এক একবার স্বামীর কাছে যায়, সময়ে আব্দারও করে কিন্তু সে যেন ভাস্কর খোদিত প্রাণহীন পাষাণ প্রতিমা। কেবলি প্রত্যাখ্যান। যৌবনের এই প্রথম সময়ে এ অপমান কি সহ্য করা যায়? ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে ব্যবধান আরও বাড়িয়া চলিল এবং এক ছাতের নীচে বাস উভয়ের পক্ষেই পীড়াদায়ক হইয়া উঠিল।

সেদিন বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিধারায় চারিদিক প্লাবিত। আকাশের মেঘগুলি ধরার বক্ষে নামিয়া আসিয়াছিল। সেই ঘন বারিপাতে চারিদিক তমসাবৃত, কোথাও কিছুই দেখা যাইতেছিল না। পরিতোষ বসিয়া বসিয়া মেঘের এই সৌন্দর্য্য দেখিতেছিল এবং চিত্রে তাহাই ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিল।

এমনি সময়ে সুষি একেবারে ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল এবং বলিল,—

"ওঠ, শীগগির ওঠ, খিচুড়ী রান্না করেছি। গরম গরম খাবে এস। এই জলে খিচুড়ী খেতে ভারি মজা। সঙ্গে ইলিস মাছ ভাজা, আলু ছেঁচকী ও ডিমের মামলেট। ঠাণ্ডা হলে সব মাটী হয়ে যাবে কিন্তু।"—

সে ধ্যানস্তিমিত লোচনে দেখিতেছিল বর্ষার মুক্ত-কেশী রূপ; তার মধ্যে এ কি বাস্তবতা! একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। পূর্ব্বে যাহা কখনও করে নাই, আজ তাহাই করিল। স্ত্রীকে অপমান করিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল ও ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিল।

খিচুড়ী সেদিনকার মত কাহারও মুখে উঠিল না। নর্দ্দামায় গড়াগড়ি গেল।

বাহিরের মেঘ কাটিয়া গেল, কিন্তু মনের মেঘ কাটিল না।

পরিতোষ পরদিনই গাড়ী করিয়া স্ত্রীকে বাগবাজারে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিল।

ইহার পর দীর্ঘ কুড়ি বৎসর চলিয়া গিয়াছে। স্বামী-স্ত্রীতে আর দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। একজন তাহার ছবির খেয়াল লইয়া রাত দিন কাটাইয়াছে।—আর এক-জন কেবল ভাবিয়াছে যে, সে এমন কি করিয়াছে যার জন্য তার ভাগ্যে বিধাতা এমন গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন।

পরিতোষকে এখন কেউ আর বিরক্ত করে না। আপন খেয়াল মত ছবি আঁকে। নির্দ্দিষ্ট স্থানে আহার্য্য ঢাকা থাকে। ইচ্ছা হয় খায়, নতুবা যেমন তেমনি পড়িয়া থাকে। আজ জীবনের ভাঁটার মুখে পৌঁছিয়া একবার ভাবিতে হইল। এই যে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া সে চিত্রের সাধনা করিল, জীবনের সকল সুখ, সকল সম্ভোগ ত্যাগ করিয়া, একাগ্রচিত্তে ইহার তপস্যায় মগ্ন রহিয়াছে তাহার ফল কি দাঁড়াইল? কোন প্রদর্শনীতে সে নাম করিতে পারিল না—তার একখানি ছবিও বিখ্যাত হইল না। অর্থাগম দূরে থাকুক, তাহার পিতৃদত্ত যে পুঁজি-পাটা ছিল তাহাও প্রায়

নিঃশেষিত। তাহার বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, জগতে সে একাকী। সুখ দুঃখের ভাগী একমাত্র যে স্ত্রী তাহাকেও সে নিজ হইতে ত্যাগ করিয়াছে। আজ যৌবনের সে উৎসাহ নাই মনের সে দৃঢ়তা নাই। জগৎ আজ আর রঙীন স্বপ্ন দেখায় না।

একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। বাহিরে যাইয়া দেখিল, বর্ত্তমান জগতের সহিত সে পরিচিত নহে। উহাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, চলন সমস্তই ভিন্নরূপ। যেন সেই কোন সুদূর প্রাচীন কালের নিদর্শনস্বরূপ একা রহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানের সহিত তার কোন যোগই নাই।

আজ বহুদিন পরে তার স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। এই আশাভঙ্গ নিঃসঙ্গ অবস্থায় মনে হইতে লাগিল, তার সেই সদা হাস্যময় প্রফুল্ল মুখখানি, তাহার সেই চঞ্চল গতি, প্রতি কার্য্যে তাহার কাছে ছুটিয়া আসা, তাহার খাওয়া-পরা প্রভৃতি সর্ব্ব কার্য্যে তার প্রাণের গভীর ব্যাকুলতা। পৃথিবীর আর সবারই মত যে সুখ তার করায়ত্ত ছিল আজ তাহা সুদূরে।

সে ভাবিতে লাগিল। চিত্রাঙ্কণে তাহার আর উৎসাহ রহিল না! যে নেশায় ভরপুর হইয়া সে থাকিত তাহা আজ কাটিয়া গিয়াছে। দিন আর কাটে না। চারিদিকের কোন কিছুই তাহার সহিত খাপ খায় না। এমন জীবন যে কি দুর্ব্বিষহ তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে কল্পনাও করিতে পারে না। যদি আত্মহত্যা করিবার মত সাহস তাহার থাকিত তবে বোধ হয় তাহাই করিত।

তবে কি বিনাদোষে পরিত্যক্ত তাহার স্ত্রীকে ফিরাইয়া আনিবে? তাহার সেই রূঢ়, হৃদয়হীন ব্যবহারের পর আর কি সে ফিরিয়া আসিবে? কে জানে আজও জীবিত আছে কি না। এক দিনের তরেও ত তাহার সংবাদ লয় নাই। এই সব ভাবনায় সে পাগলের মত হইয়া উঠিল। এক একবার উঠিয়া দাঁড়ায়, দুচার বার পায়চারী করে, মোহাবিষ্টের ন্যায় বসিয়া পড়ে। চিন্তার বিরাম নাই, শেষ নাই।

তাহার স্ত্রীর কাছে যাওয়াই শেষে স্থির করিল। তাহার নিকট অকপটে ক্ষমা ভিক্ষা করিবে। যদি সে ক্ষমা না করে, যদি তাহার মত পশুর সহিত আসিতে স্বীকৃত না হয়?

সে আর ভাবিতে পারে না। যাহা হয় হইবে। সে যাইবেই। পরের কথা পরে ভাবা যাইবে।

সে জামা গায় দিয়া বাহির হইল। ফটকের বাহির হইয়া একবার গৃহপানে ফিরিয়া দেখিল। প্রথমে ধীরে ধীরে চলিল, পরে দ্রুত পদে যাইতে লাগিল।

কতকাল সে বাগবাজারে যায় নাই। যদিও এদিকে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই তথাপি যেন সবই নূতন বলিয়া মনে হইল। কম্বুলী টোলায় আসিয়া তাহার পা কাঁপিতে লাগিল। গলিতে ঢুকিতেই সমস্ত দেহ যেন অসাড় হইয়া আসিল। একটি বাটীর রোয়াকে বসিয়া জিরাইয়া লইল। একবার মনে করিল আর কাজ নাই, ফিরিয়াই যাই। তাহাও পারিল না। উঠিয়া আবার চলিল। যখন তাহার শ্বশুর বাড়ীর দোর গোড়ায় পৌছিল তখন বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে!

কাহাকে ডাকিবে? সে বাটীতে তাহারাই আছে কিনা কে বলিবে? তাহার স্ত্রীর ছোট ভাই নরু—সে তখন মাত্র চার বছরের। এখন সে রীতিমত জোয়ান হইয়াছে নিশ্চয় তাহাকেই চিনিতে পারিবে কি? না, ডাকা আর হইল না। ফিরিয়া যাওয়াই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ফিরিয়াই বা যাইবে কোথায়।

প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংগ্রহ করিয়া ডাকিল—,

"নরু, বাড়ী আছ?"

ভাগ্যক্রমে সে তখন গৃহেই ছিল এবং দিদির সহিত গল্প করিতেছিল। সহসা বহুদিন বিস্মৃত সেই পুরাতন স্বরের সাড়া পাইয়া সুষমা চমকিয়া উঠিল,—ভাবিল নিশ্চয় শুনিতে ভুল হইয়াছে। সে আজ কত দিন! এও কি কখন সম্ভব?

আবার ডাক পৌছিল,—

"নরু, বাড়ী আছ কি?"

না, সেই পরিচিত কণ্ঠই ত মনে হয়। আর কেই বা ডাকিতে আসিবে? নরু সাড়া দিয়া বলিল,-

"কে?"

অজানিতে দিদি তার হাতখানি ধরিল সহসা কথা জোগাইল না। কেবল বলিল.—

"নরু, ভাই"

"দিদি—"

"যাত ভাই নীচে, তুই বোধহয় চিন্তে পারবি না। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে—হয়ত হরতকী বাগান থেকে এসেছেন। হয়ত বা আমারই ভুল। তবুও যেন তাঁরি স্বর বলে মনে হচ্ছে। ভাই, সাবধানে পরিচয় নিস্। কোন রকম অনাদর করিস্ নে যেন। কি মনে করে যে এলেন জানি না। আর দেরী করিস্ নে, যা ভাই, কিন্তু দেখিস্ খুব সাবধান। তখন তুই এইটুকু, তোর ত চেনবার কথা নয়।"

আজ কত কথাই মনে হইতে লাগিল। কত আশা উৎসাহ লইয়া সে জীবন আরম্ভ করিয়াছিল আর এই দীর্ঘ কুড়ি বাইস বৎসর তাহার উপর দিয়া কি ঝড়ই না প্রলয় বিষাণ বাজাইয়া গিয়াছে! কি নিদারুণ নিষ্ফলতা!

নরু নীচে যাইয়া পরিতোষকে চিনিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই আপনার?"

তুমি নিশ্চয় নরু, কারণ মুখের সেই সাদৃশ্য স্পষ্টই দেখছি। তুমি আমায় চিনতে পারবে না। তখন তুমি কতটুকুই বা ছিলে! পরিতোষ বাবুর কথা বোধ হয় অনেকেই শুনেছ, আমিই সেই গুণধর নরাধম পশু। তোমার দিদির সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছি। যদি দয়া করে দেখা করেন—আচ্ছা, তিনি বেঁচে আছেন ত? ভাল আছেন ত? এই কথা বলিতে বলিতে তিনি একেবারে হাঁপাইয়া উঠিলেন।

"আপনি যে হাঁপিয়ে উঠলেন। বসুন এখানে একটু, এই যে একখানা পাখাও রয়েছে; আপনি চিন্তা করবেন না—তিনি বেঁচে আছেন সত্য তবে ভাল যে নাই তাত বুঝতেই পাচ্ছেন?"

—"ভাল নেই! তবে একরকম মেরেই ফেলেছি। হে ভগবান্!"

তিনি দুই হাত মুখে ঢাকিয়া আরও বেশী হাঁপাইতে লাগিলেন।

"আপনি যে একেবারে অস্থির হলেন। একটু ঠাণ্ডা হুন, আপনাকে উপরে নিয়ে যাচ্ছি।"

"ঠাণ্ডা হব! আর কি ঠাণ্ডা হবার উপায় রেখেছি? এই ছাখ—"এই বলিয়াই নরুর হাতখানা টানিয়া আনিয়া তাহার বুকের উপর রাখিলেন।

নরু দেখিল—হৃৎপিণ্ডের কি দ্রুত স্পন্দন হইতেছে!

উহাদের দেরী দেখিয়া সুষমা উপরে আসিতে পারিল না। এক পায়ে, দু পায়ে নীচে নামিয়া আসিল। উহাদের কথাবার্ত্তা হইতে বুঝিতে পারিল, তাহার স্বামীই আসিয়াছেন। যখন নরুর হাত ধরিয়া বুকের উপর লইলেন, তখন আর আড়ালে থাকিতে পারিল না। ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিয়া একেবারে স্বামীর পায়ের উপর পড়িল।

পরিতোষ তাহাকে তখনই উঠাইয়া বলিল,—

"এ তুমি কি কচ্ছ? আজ আমি এসেছি তোমার পায় ক্ষমা ভিক্ষা করতে। তোমার উপর যে নির্য্যাতন, যে অবিচার করেছি তার জন্য মাফ চাইতে—

"এ সব তুমি কি বলছ? তুমি স্বামী, চিরনমস্য।"

"হ্যাঁ যে স্বামী তোমার জীবন বিষময় করেছে, যে স্বামী তোমায় বিনা কারণে গৃহবহিষ্কৃত করেছে, যে স্বামীর অপরাধের শেষ নাই—"

"তবুও তুমি স্বামী! আজিও তোমারই অপেক্ষায় তোমারই পথপানে চেয়ে এ জীবনের ভার বইছি! ভেবেছিলাম, হয়ত তুমি একদিন আসবে। আজ তুমি কি সত্যই এসেছ? এ সুখ কি আমার সইবে? আজীবন দুঃখী আমি।"

"আমি যে এসেছি তাতে কি এখনও সন্দেহ আছে? কিন্তু তুমি কি এই পাষাণ-প্রাণ অপদার্থ স্বামীকে গ্রহণ করতে পারবে? তার সকল দোষ মার্জ্জনা করে তার অবশিষ্ট জীবনকে ধন্য করবে?

"আবার ঐ কথা! আমি যে চিরদিনই তোমারি

পৃথিবীর মঙ্গল সাধনায় মহাত্মা গান্ধী*

অদ্য রাত্রিতে আমরা এখানে মিলিত হইয়া জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অত্যাশ্চর্য্য মানবের নিকট গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি এবং আমরা আশা করি, আমাদের জীবন-কালের মধ্যে তাঁহার দর্শনলাভ করিব। আমাদের এ-যুগে অন্তঃস্বার শূন্য লোকের সংখ্যা বহু হইলেও প্রকৃত মহাপুরুষের সংখ্যা অতি অল্পই। যেমন বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, ডারুইন, নেপোলিয়ান ও লিঙ্কন বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তেমনই কোনও মহাপুরুষ তাহার যুগকে চমৎকৃত করিয়া দেন। মানবের চিরন্তন স্বভাব এই যে, সাধু, দয়ালু ও অধ্যাত্মশক্তি সম্পন্ন মানব, হীন, ও রক্ত-পিপাসু বড়লোকের অপেক্ষা তাঁহার সমসাময়িক জন-গণকেই অধিকতরভাবে চমৎকৃত করেন।

অতএব আমরা, যাহারা ভারতবর্ষের এই মহামানবকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করি, যদি জগতের বহুলোকও তাঁহাকে করুণার চক্ষে দেখে, কখনও বিচলিত হইব না। এই সকল লোক, যাহারা তাঁহার প্রতি এখন অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে, তাহাদের পুত্র-কন্যাগণ তাহাদের সঙ্কীর্ণচেতা পূর্ব্বপুরুষগণের উপর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর ন্যায় মহাপুরুষের যুগে বসবাস করিবার জন্য হিংসা প্রকাশ করিবে।

ভারতবর্ষের জন্য গান্ধীজী যে বিরাট কার্য্য করিয়াছেন, জগতের দ্বিতীয় জনবহুল মানব সমাজকে অর্থনীতিক একতায় আবদ্ধ করিয়া যে কি বিরাট জাতিতে পরিণত করিতেছেন, আজ তাহা সমগ্র পাশ্চাত্যবাসীর অন্তরে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু আমার মনে হয়, আমরা এখনও জানি না যে, এই বিরাট মস্তিষ্ক ও তেজোময় আত্মা সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলের জন্য কি গভীর সাধনাই করিতেছে এবং আমরা ইহাও জানি না যে, এই শ্রেষ্ঠ মানবের হৃদয়ে কি গভীর শক্তিই নিহিত রহিয়াছে।

গত ১৯২২ সালে সংবাদপত্র পাঠে আমরা প্রথমতঃ গান্ধীজীর নাম জানিতে পারি। তখন এক নূতন মহাদেশের সূচনা এবং পাশ্চাত্য জগতের স্থাপিত অধিকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দুইটি দেশে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে; একটি চীনদেশে পুরাতন রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং অপরটি দক্ষিণ আফ্রিকায় দাসত্বের বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীর নিষ্ক্রিয় শান্ত সংগ্রাম। আমরা শুনিয়াছিলাম যে, অক্সফোর্ডের একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় আইন ব্যবসায়ী দেশময় অদ্ভুত শক্তিতে সহস্র সহস্র নরনারীকে এমন-ভাবে চালিত করিতেছিলেন যে, গভর্ণর জেনারল স্মাটস্ স্বাধীনতার চুক্তিপত্রে সহি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আমরা বহুদিন পর্য্যন্ত আর গান্ধীজীর নাম শ্রবণ করি নাই, পুনরায় যখন তাঁহার নাম শুনিলাম, তখন বৃটিশ জাতি তাঁহার নিকট অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহাদের স্বপক্ষে দাঁড়াইয়া গান্ধীজী যেন ভারতের প্রজাবৃন্দকে বিরাট যুদ্ধে বৃটিশের ন্যায়পরতা বুঝাইয়া দেন এবং জার্ম্মাণীকে পরাজয় করিবার জন্য ভারতবাসীকে অর্থ ও প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে প্রবুদ্ধ করেন।

অতঃপর ১৯২২ সালে আবার শুনিতে পাইলাম যে, তাঁহারই প্রেরণায় সমগ্র ভারতবর্ষ বৃটিশের সাময়িক প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য, সেনাপতিগণের দ্বারা নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডের জন্য এবং মানবজীবনের শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষার ন্যায়-সঙ্গত দায়িত্বের উপর পদাঘাত করিবার জন্য ভীমগর্জ্জনে হুঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে।

তাঁহারা দেশের বে-সরকারী জাতীয় কংগ্রেস তাঁহার উপর অধিনায়কত্ব প্রদান করেন এবং জাতীয় সেনাদল তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ

---

* বিখ্যাত লেখক মিঃ আপ্টন ক্লোজের মহাত্মা সম্পর্কে একটি বক্তৃতা।

হন। অতঃপর সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ চমকৃত হইয়া পড়িল যখন তাহারা শুনিতে পাইল যে, এই মানবশ্রেষ্ঠ এই সর্ত্তে অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হইতে গোলা গুলি অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি হিংসাপূর্ণ দ্রব্যের ব্যবহার চিরদিনের জন্য বর্জ্জন করিতে হইবে। তিনি বৃটিশ সম্রাটের নিকট তৎপ্রদত্ত পুরস্কার প্রত্যর্পণ করিয়া এই শেষ ঘোষণা প্রকাশ করেন,—

"আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশা দ্বারাই আমরা আপনাকে জয় করিব।"

তাঁহার এই বাণীতে তদানীন্তন ভারতের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড চেমসফোর্ড তাঁহাকে শুধু "নির্ব্বোধ" আখ্যাই প্রদান করিয়াছিলেন। আমার বিশ্বাস, আজ যাঁহারা এখানে গান্ধীজীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে মিলিত হইয়াছি, আমরাও আমাদের রক্ষাকর্ত্তাগণের অমোঘ বাণী—'যাহারা তরবারি ধারণ করিবে, তাহারা তরবারি আঘাতেই বিনষ্ট হইবে' অথবা আমাদের বংশ-সম্ভূত মহাপুরুষের বাণী—'তরবারি অপেক্ষা লেখনীর শক্তি অধিকতর' অন্তর হইতে বিসর্জ্জন দিয়াছি। বেশী-দিনের কথা নহে, যখন আমরা শুনিতে পাইলমে যে, গান্ধীজী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন, আমাদের সংবাদ পত্র সদম্ভে প্রচার করিল যে, ইহা আধ্যাত্ম শক্তির বিরুদ্ধে বিফল সংগ্রাম।

গত কয়েক মাসের মধ্যে আমরা আরও সংবাদ পাইয়াছি, সম্ভবতঃ আমাদের হৃদয় গান্ধীর অপেক্ষাও সরল ও পুরাতন। সাদা টুপী-পরিহিত নিরস্ত্র জনমণ্ডলীর নিকট সুশিক্ষিত সৈনিকদলের ও বৈজ্ঞানিক ধ্বংসকারী যন্ত্রাদির পরাজয়ের পর আমাদের আর তাহার উপর পূর্ব্বের ন্যায় প্রবল বিশ্বাস নাই। আমরা এখন আর রাজকীয় পরিচ্ছদ ও রাজকর্ম্মচারীবৃন্দের জাঁকজমক দর্শন করিয়া গর্ব্ব বোধ করি না। কারণ এই সকল জাঁকজমকের অধিকারীবৃন্দকে সমভাবে এমনই একজন মানবের সমক্ষে যাইতে হইবে, যাঁহার পরিধানে কটিবাস, যিনি ভ্রমণ করেন তৃতীয় শ্রেণীতে। আজ যে সকল ব্যক্তি আমাদের এই বস্তু-তান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিবাদ করিতেছেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই।

আজ আমরা আমাদিগকে লইয়া ভীষণ ভাবে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। আজ গান্ধীজী যদি আমেরিকায় আগমন করিতেন সমগ্র আমেরিকাবাসী শ্রদ্ধায় নতশির হইয়া কি বিরাট বিপুলভাবে যে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিত, তাহা বোধ হয় আমেরিকার ইতিহাসে কখনও সম্ভবপর হয় নাই।

গান্ধীজী আমাদের বৃটীশ ভ্রাতৃগণের উদ্দেশ্যে কি বাণী প্রচার করিতেছেন? এই বৃটীশ জাতিই তাঁহার মহাদেশে যিশুখৃষ্টের অহিংসা প্রচার করিয়াছিল, আবার এই জাতিই সেই মহাদেশে হিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কি ভীষণ বৈজ্ঞানিক উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন! গান্ধীজী সমগ্র জাতির মধ্যে এক নূতন বিপ্লব সৃষ্টি করিবার জন্য এই ব্রহ্মাস্ত্র অবলম্বন করিয়াছেন। আজ ভারতবর্ষে আমরা এই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, দেশের অস্ত্রশস্ত্র আত্মার অস্ত্রের নিকট তাহার বিরাট সাধকের সমক্ষে সম্পূর্ণভাবে পরাজয় স্বীকার করিতেছে।

শরতের প্রারম্ভে বৃটিশ কারামুক্ত ব্যক্তিগণ, লণ্ডনে এক সম্মেলনে মিলিয়া ইংরাজ জাতি ও ভারতবাসীর মঙ্গলার্থে যে সন্ধি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন, তাহার আলোচনায় যোগদান করিবেন। অদ্য রাত্রিতে আমরা এখানে মিলিত হইয়া এই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি যে, ভারতের মহান্ আত্মা যেন সেই ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের মহা সম্মেলনে শক্তি ও বুদ্ধি বজায় রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারে এবং আমরা আরও আশা করি যে, তাঁহাদের সাহস যেন বৃটিশ রাজনীতির নিকট কখনও পরাভূত না হয়।

ইংলণ্ড যদি বিচক্ষণতার সহিত ভারতের এই দাবীতে ত্যাগ স্বীকার না করে, তবে অদূর ভবিষ্যতে রোম সাম্রাজ্যের ন্যায় তাহার সাম্রাজ্যবাদ নিশ্চয়ই ধ্বংস হইবে।

সমগ্র বিশ্বের নিকট গান্ধীজীর কি বাণী? অথবা আমাদের নিকটই বা তাঁহার কি বাণী? মানব ধর্ম্ম সম্বন্ধে রুশিয়ার মহান্ আত্মা টলষ্টয়ের নিকট হইতে তিনি প্রেরণা গ্রহণ করিয়াছেন। নব ইংলণ্ডের নিকট হইতে তিনি গুণ্ডামির ও রাজকর্ম্মচারীদের হীনতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে গান্ধীজী এই

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে খৃষ্ট ও টলষ্টয়কে আনয়ন করিয়াছেন।

গান্ধীজীর সংগ্রাম শুধু ভারতীয় জাতি ও তাহার বিজেতাগণের মধ্যে নহে। এই সংগ্রাম মানবত্ব ও সমাজতান্ত্রিক অত্যাচারের মধ্যে। ইহা পাশ্চাত্য বস্তু-তান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে এশিয়ার বিরাট অভিযান। ইহা আমেরিকা ও ভারতের কৃষক সম্প্রদায়ের মর্ম্মন্তুদ হাহাকার, যে কৃষি ও শ্রমের মধ্যে মিলন স্থাপিত না হইলে তাহারা আর বাঁচিতে পারিবে না।

ভারতবর্ষ ও আয়র্ল্যাণ্ড—মহাত্মা গান্ধী এবং জর্জ্জ রাসেলই গ্রাম্য কৃষি ও আত্মসম্মান অক্ষুন্ন রাখিবার উদ্দেশ্য প্রকৃত পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। সমগ্র জগতের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীই একমাত্র শ্রেষ্ঠ আদর্শ—যিনি রাজনীতিক সততা প্রদর্শন করিয়াছেন।

এই মহাপুরুষের বাণী দিকে দিকে প্রচারিত হউক, তিনি বলিয়াছেন—"জয়ের মঙ্গল মুহূর্ত্ত সমাগত, যখন ক্ষমতাপন্ন দলের উন্মত্ততার বিরুদ্ধে আর কোন শব্দও উচ্চারিত হইবে না—যখন ভারতের সমস্ত ধ্বংসকারীর অস্ত্র শস্ত্রে মরিচা পড়িতে থাকিবে।"

ইহা ব্যতীত আরও কোন সত্য বাণী আছে কি ?

আজ জগতের মধ্যে তিনিই নূতন জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, কারণ তিনি এমন পন্থা অবলম্বন করিয়া জাতিকে গঠন করিতে চাহেন যাহাতে শাসিত জনগণ সাধু হইয়া সামাজিক, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক সাম্য অর্জ্জন করতঃ শাসন শক্তির সহিত প্রেমের বন্ধনে মিলিত হইতে পারে। তিনি প্রকৃতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি জাতির স্বাধীনতার আশাও পরিত্যাগ করিতে পারেন কিন্তু তাহা লাভ করিতে একটি অতি সামান্য হিংসাবৃত্তিও অবলম্বন করিতে প্রস্তুত নহেন। গান্ধী ভারতবর্ষ ও গ্রেট বৃটেনে যিশুখ্রীষ্টের ন্যায় জীবিত রহিবেন।



অভিমানিনী

শিল্পী — শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা (বাং । সংক্রান্ত



৫ম বর্ষ	ভাদ্র—১৩৩৮	৫ম সংখ্যা

বাঁচিবার অধিকার

ভারতে আজ যে স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ চেষ্টা চলিতেছে—ইহার মূলে মানবের জন্মগত অধিকার লাভ তথা মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার পাইবার চেষ্টাই সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। আজ ভারত যদি তাহার এ বাঁচিবার অধিকার ঠিক করিয়া লইতে না পারে তবে অ-দূর বা সু-দূর ভবিষ্যতে ভারতীয়দের চিহ্ন কি ভাবে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে তাহা ভবিষ্যতজ্ঞ বলিতে পারেন।

আজ ভারতবাসী এই সন্ধি-মুহূর্ত্তে তাহার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আপ্রাণ নিয়োগ না করিয়া অন্য কোন ভাবে যদি নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে যায় তবে বিশ্বের চোখে সে তো নিন্দিত হইবেই তা-ছাড়া ভবিষ্যতে নিজের নিশ্চিহ্ন হইবার পথও মুক্ত করিয়া দিবার সহায়তা করিবে তাহাতেও সন্দেহ নাই।

আজ যে অন্ন-সমস্যায় ও অর্থ-সঙ্কটে সারা-বিশ্ব টলটলায়মান ও যাহার তাড়নায় অন্যান্য দেশ রাজনীতিতে তোলপাড় সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে—বিশ্ব-রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বিরাট সংঘাত আরম্ভ হইয়াছে—ভারতীয়দের অবস্থা এই সঙ্কট-কালে আরো সঙ্কটাপন্ন হইলেও তাহারা ঐ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইবার কি উপায় আজ পর্য্যন্ত রাজনীতি বা দেশনীতিতে প্রয়োগ করিতে পারিয়াছে—কি সু-ফল সে ইহা হইতে লাভ করিয়াছে?

দেশের হাহাকার—অন্নাভাব—অর্থাভাব কোন বিশেষ সম্প্রদায় লক্ষ্য করিয়া আসে না—ইহা আসে সার্ব্বজনীন ভাবে—দেশে যে বাস করে তাহারই উপর দিয়া। বিপদ্‌কালে সাপে ভেকে, বাঘে গরুতেও শত্রুতা থাকে না—মিত্রভাবে সকলেই বিপদ্‌মুক্ত হইবারই চেষ্টা করে।

ভারতের এ সঙ্কট-কালে এই সন্ধিক্ষণে আজ সম্প্রদায় বা জাতিগত স্বার্থ ভুলিয়া ভারতবাসী হিসাবেই একত্র হইয়া ভারতীয় ভাবে পরিচিত যদি ভারতবাসী হইতে পার তবেই হাহাকার-মুক্ত, সুস্থ সবল জাতি হিসাবে স্বায়ত্ত-শাসন তথা বাঁচিবার দাবী তোমরা করিতে পারিবে, বাঁচিতেও পারিবে—কিন্তু তাহা যদি না পার তবে ভারতকে মরুভূ করিয়া কিম্বা অগাধ সলিলে ডুবাইয়া—জাতি নহে সম্প্রদায়ের কঙ্কাল হিসাবে ভারত-শ্মশানে ভ্রমণের অধিকারই তোমার থাকিবে—ভারতীয় জাতি হিসাবে বিশ্বের সমুখে উন্নত মস্তকে কোন দিনই দাঁড়াইতে পারিবে না—বাঁচিবার অধিকার হারাইতে হইবে।

স্মৃতির পূজা

গল্প

অধ্যাপক—শ্রীযোগেশচন্দ্র পাল

মানুষ যে কোথা হতে কোথায় চলে যায়, তাদের প্রতিদিনকার জীবন-যাত্রা যে উপন্যাসের মতই রহস্যপূর্ণ, তা আমার জীবন দিয়েই বুঝতে পারি। এতদিন মনে করতাম উপন্যাসের ঘটনাগুলি নিশ্চয়ই মনগড়া, ওর ভেতর সত্যের কোন সন্ধান পাবার উপায় নেই; আজ আমার নিজের জীবনের কথা থেকেই সে ভ্রম দূর হয়েছে। একদিন ছিলাম জ্যোতিঃদির বন্ধু :—জ্যোতিঃদির কাছে জগদীশবাবুর সব কথা শুনেছি; শুনে মনে করেছিলাম, যদি জগদীশ বাবুর সহিত কোনদিন দেখা হয়, তবে তাঁকে এক চোট বকে দিব; মেয়েদের মনে কষ্ট দেওয়ার যে কি মজা তা বুঝিয়ে দিব। কিন্তু একথা ভাবতেই পারি নাই, একদিন সত্যি সত্যি জগদীশ বাবুর সহিত দেখা হবে। কালের এমন পরিবর্ত্তন, বিধাতার এমন লিখন যে, জ্যোতিঃদির বন্ধু "বেলা" আজ জগদীশ বাবুর বৌদি হয়ে এসেছি

জ্যোতিঃদির সহিত আমার যেমন বন্ধুত্ব ছিল, দুদিনের মধ্যে জগদীশ বাবুর সহিতও আমার তেমনি বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এমন সহজ সরল মানুষ জগদীশবাবু! না আছে তার মান অপমানের জ্ঞান, না আছে খাওয়া পরার খেয়াল, না আছে নিজের শরীরের দিকে নজর, কেবল দেশসেবার একটা খেয়াল তার মাথায় চেপেছে। খদ্দর পরেন, খদ্দরের সাধারণ বেশভূষা। বাড়ীতে কিছুরই অভাব নেই। মাসে হাজার টাকা ব্যয় করে বাড়ীতে বসে খেলেও তার কোন দুঃখ নাই, তবু সে তা করবে না। বড়লোকের ছেলে হয়েও সাধারণ মানুষের মত সে থাকবে। মান-অহঙ্কার একদম তার নেই। এই জন্যই দশ জনের মধ্য হতে তাকে বেছে নেওয়া চলে সহজে। এই সহজ সরল ভাবের জন্য সবাই তাকে ভালবাসে। এই জন্যই বোধ হয় জ্যোতিঃদি তাকে এমন করে ভালবেসেছে।

টাকা পয়সা খাওয়া-দাওয়া কিছু দিয়েই কেউ তাকে ধরে রাখতে পারে না। কিন্তু সে ভালবাসার কাঙ্গাল; যে তাকে ভালবাসবে সেই তাকে ধরে রাখতে পারবে এই জন্যই জ্যোতিঃদির মা তার কাছে এত প্রিয় জ্যোতিঃদির মা বাস্তবিকই প্রাণ ঢেলে ভালবাসে জগদীশবাবুকে, এই জন্য জগদীশবাবু জ্যোতিঃদির মাকে অবহেলা করতে পারে না; এই জন্যই জ্যোতিঃদির মা তার কাছে সব চেয়ে বেশী আপন। জ্যোতিঃদির মার পরে আর কেউ যদি জগদীশবাবুকে ভালবেসে থাকে, তবে সে জ্যোতিঃদি। জ্যোতিঃদি জগদীশবাবুকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। আর জগদীশবাবুও তাকে হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে ভালবাসে। আমি আজ বলব, জ্যোতিঃদির যদি কেউ বর হবার উপযুক্ত হয়, সে জগদীশবাবু। কেন যে জ্যোতিঃদির মা ওদিগকে বিয়ে দিচ্ছেন না, তা আমি বুঝে উঠতে পাচ্ছি না। জ্যোতিদির মা কি বুঝছেন না যে, সামাজিক যত বাধাই থাক না কেন,—প্রেমের কাছে তার মূল্য নগণ্য। এরা দুটি প্রাণী একে অন্যকে কেমন করে ভালবাসে তা আমি ভাষায় ব্যক্ত করতে পারব না। যদি সামাজিক নিয়ম মেনে ওদের জীবন দুটিকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়, তবে কি এরা জীবনে আর সুখী হতে পারবে! হয়তো জ্যোতিঃদি তার স্বামীকে জীবনে ভালবাসতেই পারবে না; আর জগদীশবাবু—সে হয়ত বিয়েই করবে না, জীবনে।

বিয়ে হওয়ার পর প্রথম শ্বশুর বাড়ী আসার পর জগদীশ বাবুর সহিত বন্ধুত্ব হল। তাই নূতন জায়গায় এসেও কোন কষ্ট হল না। কিন্তু জগদীশবাবুকে পেয়ে আমি খুব খুসী হয়েছিলাম এবং জ্যোতিঃদির সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারব বলে, তাকে আরো বেশী করে আপন করে নিলাম। মাঝে মাঝে দেখতাম, জগদীশবাবু একা একা বসে যেন কি করেন। অবশেষে জানালার ফাঁক দিয়ে একদিন দেখতে পেলাম জ্যোতিঃ-দির ছোট একখানা ফটো চুপে চুপে বের করে চুমু খাচ্ছে—আর বিহ্বল হয়ে ফটোকে বুকে চেপে ধরছে।

আবার ফটোকে মালা পরিয়ে বিড় বিড় করে কি যেন বলছে। বুঝলাম, এ জ্যোতিঃদিকে ধ্যান করা হচ্ছে।

আমি যে জ্যোতিঃদির বন্ধু একথা এখনও জগদীশ-বাবুকে জানতে দেই নাই। জগদীশ বাবুর কাছ হতেই সব কথা একে একে বের করে নেব বলে জাল পাততে লাগলাম।

একদিন বিকাল বেলা বাগানে গিয়ে দেখি জগদীশ বাবু বসে বসে বকুল ফুলের একটি মালা গাঁথছেন, আস্তে আস্তে তার কাছে গিয়ে বললাম, "কে এমন ভাগ্যবতী যার গলায় এমন নিপুণ হাতের গাঁথা নিপুণ মালাটি পরবে?"

"ও-কথাটি আমি যদি আপনাকে বলতাম তবেই শোভা পেত।" এই বলে জগদীশবাবু হেসে উঠলেন।

"আমাকে আর বলতে হবে না। আমরা মালা পরালেও পরাই, না পরালেও পরাই, তার ভেতর বিশেষত্ব কিছু নেই ঠাকুর-পো। ভয় হয় এই সব অবিবাহিত ঠাকুরপোর দল দেখলে। আর দুঃখও হয়, —তা বলুন, কোন স্বপ্ন-সুন্দরীকে অভিসারে ডেকে এনে এমালা গাছটি পরাবেন?"

জগদীশ বাবু কোন কথা বললেন না। চুপ করে মালা গেঁথে চললেন, যেন এসবে তার কোন রুচি নেই, তাই আমি তাকে বললাম, "অতি সাধুতা চোরের লক্ষণ।"

"একথা বলছেন কেন বৌদি?" মালা গাঁথা তার ক্ষণেকের জন্য বন্ধ হল।

"আপনাকে দেখে জ্যোতিদির কথা মনে পড়ে গেল। সেও আপনার মত চুপটি করে থাকত, একদম সোজা শান্ত মেয়ের মত। কিন্তু একদিন জান্‌তে পারলাম, এই সোজা শান্ত মেয়েটি ত কম নয়।" আমার মুখে জ্যোতিঃদির নাম শুনে সে সম্বন্ধে আরও জানতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। মালা গাঁথা তার বন্ধ হল।

আমি তার কথায় কোন আগ্রহ প্রকাশ না করে জ্যোতিঃদির বিষয় চাপা দিতে চেষ্টা করতেই জগদীশবাবু বললেন, "কে আপনার জ্যোতিঃদি?"

"সে সম্বন্ধে শুনে আর লাভ কি হবে! আপনার মতই সে একটি চাপা মেয়ে। কোন একটি যুবককে সে ভালবাসে। ভদ্রঘরের মেয়ে তার সম্বন্ধে আলোচনা না করাই ভাল।" আমি একটু মুচকে হেসে জগদীশ বাবুর মালা গাঁথায় সাহায্য করতে লাগলাম। জগদীশবাবু কিন্তু আমার এ হাসির অর্থ বুঝতে পারলেন না!

জগদীশবাবুর প্রাণে একটা চঞ্চলতার ঢেউ খেলে গেল। তিনি বললেন, "তার বিয়ে হয়েছে বৌদি?"

"তা তো বল্‌তে পারলাম না। হয়ত হয়েছে!"

"যাকে ভালবাসত তার সাথে?"

"সে খবরত আমি পাইনি।" বলেই জগদীশ বাবুর মুখের দিকে তাকাতেই দেখি, তার মুখখানা অনেকটা মলিন হয়ে গেছে।

"কাকে ভালবাসত আপনার জ্যোতিঃদি?"

"তা আপনার জেনে লাভ কি?" একটু মুচকে হাসলাম।

"বলুনইনা বৌদি! তাতে আর দোষ কি?"

"যাকে সে ভালবাসত তার নাম জগদীশ বাবু।"

জগদীশবাবু চমকে উঠে বললেন, "কোন জগদীশবাবু?"

"তা দিয়ে আপনার দরকার কি? আপনি ত আর নন্!"

"তবু বলুন না।"

"আপনার এত জানবার আগ্রহ কেন ঠাকুরপো! তবে আপনি কোন জ্যোতিঃকে ভালবাসেন বুঝি?"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। মুখে চোখে একটা ব্যাকুলতার ছায়া এসে পড়ল। চুপ করে থাকতে দেখে বললাম, "বলুন না, ভালবাসাত একটা খারাপ কথা নয় যে, বলতে লজ্জা পেতে হবে।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে জগদীশবাবু বললেন, "তাকে আমি ভালবাসি কিনা বলতে পারি না, তবে এক জ্যোতিঃকে আমি জানি।"

"বলুন না, কে সে ভাগ্যবতী জ্যোতিঃ—যদি সে আমার জ্যোতিঃ দিদি হয় তবে ঘটকালীর টাকাটা আমরাই প্রাপ্য হবে।"

জগদীশ বাবু জ্যোতির যে পরিচয় দিলেন, সে জ্যোতিঃ আমারই জ্যোতিঃদি। আমি তার কথা শুনে বললাম, "এযে আমারই জ্যোতিঃদি, তবে জ্যোতিঃদি আমায় যা বলেছেন, সব সত্য।"

"কি বলেছে আপনার জ্যোতিঃ দি?" জানবার জন্য

জগদীশ বাবু আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। জ্যোতিঃ দি আমায় যা যা বলেছিল, তা সবই জগদীশ বাবুকে বললাম। তার পর জিজ্ঞেস করলাম, "আমি যা বললাম, সব ঠিক ঠাকুর পো ?"

"সব ঠিক, এর ভিতর কিছুই অসত্য নেই। কিন্তু এর পর যে আরো অনেক হয়েছে, তা আপনি শুনেন নি বুঝি। আচ্ছা আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে বলব।"

"তা শুনব। কিন্তু আপনি তাকে বিয়ে করেন না কেন ? সে যে আপনার প্রতীক্ষায় বসে আছে !"

"বিয়েতে আমার কোনই অমত নাই বৌদি, তার মারও কোন অমত নেই। একথা তার মা মুখ ফুটে না বললেও আমি বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, জ্যোতিঃ আপনাকে যা বলেছে তার পরের কথাগুলি বললেই আপনি সব বুঝতে পারবেন।"

* * * *

"কেমন করে জ্যোতির সহিত আমার পরিচয় হল, কেমন করে আমাদের দুটি হৃদয় ধীরে ধীরে বিনাসূতার মালা গেঁথে চলছিল হৃদয়ের বিনিময়ে, তা আপনি শুনেছেন। জ্যোতিকে আমি ভালবাসতাম কিনা তা আমি জানিনা। হয়ত মনের কাছে থেকে তার কোন সাড়াও পাইনি। বিয়ে আমি করব না এটি ছিল আমার পণ, কিন্তু জ্যোতিঃকে দেখে কেন যেন আমার ভাল লাগত। ওর হরিণ-চোখ দুটি যখন আমার চোখের উপর ফেলত, তখন কি আনন্দ না আমার হত। মনে হত ওর চোখ দুটি সারা জীবন এমন করেই দেখি।

"বিয়ে করতে না চাইলেও কত সুন্দরী মেয়ের সাথে যে আমার পরিচয় হয়েছে, আলাপ হয়েছে, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা সৌন্দর্য্য হয়ত নিরপেক্ষ ভাবে তুলনা করলে জ্যোতির চেয়ে শতগুণ বেশী, তাদের মাতা-পিতা আমার অগোচরে, গোপনে বিয়ের কথাও বলেছেন। অনেকে তাদের স্কুলে পড়া মেয়েকে আমার সাথে মিশতে দিয়েছেন, উদ্দেশ্য, আমাকে আপন করে নিতে চান তাদের মেয়ে দিয়ে। কত মেয়ের সাথেইত মিশেছি—কেউ কিন্তু আমার মনকে দোলা দিতে পারে নাই,—হাজার মিশামিশিতেও। তাদের মেয়ের সাথে বিয়ে হতে আমার কোন বাধাও ছিল না,—সমাজের দিক থেকেও না আমাদের নিজের দিক থেকেও না ; এত সুযোগ সত্ত্বেও সেই সব সুন্দরী যুবতী মেয়েদিগকে আমি উপেক্ষা করে এসেছি। আর জ্যোতিঃকে যখন এগার বছরের দেখি, তখনই ভাল লেগেছিল—সবচেয়ে ভাল লাগত তার হরিণ-চোখ জোড়া।

হয়ত তাকে ভাল বাসতাম নিজেকে নিস্ব করে দিয়ে, হয়ত বিয়ে করে তাকে পাব একথা আমার মনে একদিনও উঠত না, যদি তার মা সেই কথাটা আমায় একদিন না বলতেন, "নেন না আমার জ্যোতিঃকে—যাবি জোতিঃ !"

এই একটি কথা আমার জীবনের এক নূতন অধ্যায় খুলে দিল। ধীরে ধীরে শত চেষ্টা করেও মনকে প্রবোধ দিতে পারতাম না। মনে হত, জ্যোতিঃ আমার হবে। সেই দিন হতে আর কোন মেয়ের সাথে আমি আর তেমন করে মিশতে পারি নাই। কেউ বিয়ের কথা বললেই গা জ্বালা করে উঠত। যে মন দিয়ে জ্যোতিঃকে ভাল বেসেছি, সে মন দিয়ে আবার অন্য মেয়ের কথা ভাবব কি করে ? মেয়েরা যেমন এক পুরুষ ভিন্ন অন্য পুরুষের কথা ভাবলে দ্বিচারিণী নাকি হয়, পুরুষের বেলায় বুঝি আর তা ঠিক নয়।

"জ্যোতিঃকে ভালবাসি ভালবাসার জন্য, তাকে পাবার জন্য হয়ত নয়। ভালবাসা পেয়ে শান্তি পাওয়া যায় না। যাকে ভালবাসা যায়, তার নিকট হতে কিছু প্রত্যাশা করে ভালবাসলে সে ভালবাসা ভালবাসাই নয়। তবে যদি সে কিছু দেয়,—নিজেকে নিঃস্ব করে ছেড়ে দেয় আমার কাছে তবে গ্রহণ না করেও উপায় নাই। নইলে তার প্রাণ যে ব্যথায় ভরে উঠবে। তার প্রাণও ত চায় দিতে। আমি কিছুই চাই না তার কাছ থেকে বৌদি, আমি চাই কেবল দিতে, কিন্তু তাকে দিবার আমার কি আছে, আমার যা কিছু নিজের মন, প্রাণ, জীবন, মান, সবই যে দিয়ে ফেলেছি তাকে, তার অজ্ঞাতে ; আমার বলতে যে আমার কিছুই নেই। এত করেও আমার মনে হচ্ছে তাকে বুঝি কিছুই দেওয়া হয় নাই, বুঝি তাকে তেমন করে ভালবাসতে পারি নাই,—তাই দুঃখ হয়।

"জ্যোতিঃ, জ্যোতিঃকে কেমন করে ভালবাসি, তা

কেমন করে বলব বৌদি! তার সাথে হয়ত আমার বিয়ে হবে না, হয়ত জীবনে তাকে আর দেখব না, হয়ত জীবনে আর তার কথা শুনব না, তবু তাকে ভালবাসব আজীবন; যদি অন্যের সাথে বিয়ে হলে জ্যোতিঃ সুখী হয়, আমার কোন দুঃখ হবে না, বুঝব জ্যোতিঃ আমার সুখী,—আমিও সুখী হব। কিন্তু যেদিন শুনব জ্যোতিঃ আমার ক্ষণেকের জন্য দুঃখী হয়েছে, তবে সেদিন আমার আর দুঃখের সীমা থাকবে না। তাই ভবিষ্যতের দুঃখের কল্পনা করে অনেক সময় মুষড়ে পড়ি, তাই ইচ্ছা হয়, জ্যোতিঃকে চিরকাল বুকে করে সব দুঃখ কষ্ট হতে তাকে আড়াল করে রাখি।

"অনেক বাজে কথা বলে ফেললাম বৌদি, রাগ করবেন না। তারপর জ্যোতিঃর মা কেমন করে আমাকে জ্যোতির সহিত মিশবার সুযোগ দিয়েছেন, তা জ্যোতিঃর কাছ থেকেই আপনি শুনেছেন। সে সব বলে আর লাভ নাই। জ্যোতিঃ যা বলেছে তার পর আবার যে জ্যোতির সাথে আর তার মার সাথে দেখা হয়েছিল, সেই কথাই বলব!

দু' বছর পরে আবার হঠাৎ একদিন ধূমকেতুর মত তাদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম। সবাই দেখে অবাক। জ্যোতিঃ সরল সহজ বালিকাটির মত তেমনি কাছে এসে দাঁড়াল, মুখে তার আনন্দের ছাপ, মনে তার উথলিয়ে উঠা বেদনার ফেনা। তাড়াতাড়ি গিয়ে আমার সুটকেসটা ও যা কিছু ঘরে নিয়ে এল, কাউকে তা ছুঁতে দিল না। তার কাছে তা যেন কত পবিত্র!

জ্যোতিকে দেখলাম এবার নূতন রূপে। চেহারাখানা অনেকটা লম্বা হয়েছে,—কিন্তু পরিণত; কৃশ অনেকটা হয়েছে,—মন যেন তার শুকিয়ে গেছে। তাই যখন জিজ্ঞেস করলাম, "জ্যোতিঃ তোমায় এমন দেখাচ্ছে কেন? অসুখ করেছিল নাকি?"

তার চোখ মুখ যেন জ্বলে উঠল, একটা ঝঙ্কার দিয়ে বলল, "তুমি তার কি বুঝবে নিষ্ঠুর?"

জ্যোতিঃর এমন কথার জবাব দিতে পারলাম না। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম তার মুখের দিকে চেয়ে। সে আমার পাশ কাটিয়ে চলে গেল তার নিজের কাজে,—কাজ হয়ত তার কিছুই ছিল না। মনে মনে বললাম, নিষ্ঠুর আমি না তুমি? না তোমার মা! চিঠি লিখলে একখানা চিঠিরও জবাব দেওনা, হয়ত বা তোমার মা মানাই করেছেন চিঠি লিখতে। নিষ্ঠুর বললে তোমার মাকেই বলতে হয়। তিনি কেন এমন করে আমাদিগকে মিশতে দিলেন, কেন তিনি এমন করে আমাদের প্রাণে আগুন জেলে দিলেন। তিনি কি বুঝেন না, আমাদের প্রাণে কি দারুণ পিপাসা।

কয়দিন থাকব তাদের ওখানে একথা জানিয়ে দিলাম। জ্যোতিঃর মা শুনে আনন্দিত হলেন। জ্যোতিঃকে বুঝতে পারলাম না। সে চেপে যাচ্ছিল সব কথা; যেন আমার থাকা না-থাকায় তার কিছু আসে যায় না। কয়দিন মেলা মেশাতেও তাকে বুঝতে পারলাম না,—যেন তার সবই হেয়ালী। আগের জ্যোতিঃ আর সেদিনকার জ্যোতিঃতে অনেক প্রভেদ। সে যেন আমায় ভুলে গেছে, আর আমি যেন তার কেউ নই এই ভাবটা দেখাতে লাগল। এ তার গুমরে মরা অভিমান, আর কেবল আমাকে কষ্ট দেওয়া। কেবল কি তাই, আমার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করাই তার কাজ। আমার সব তাতেই সে বিরোধিতা করবে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে তার জবাব দিবে না; আর সে যে কথা জিজ্ঞাসা করবে তার জবাব না দিলেই অমনি রাগ,—অমনি অভিমান।

তাকে কাছে খুঁজে পাওয়া আবার মুস্কিল। জ্যোতিঃর মার কাছে একথাটা ধরা পড়'ল যে, জ্যোতিঃ আমাকে এড়িয়ে চলছে, তাই তিনি জ্যোতিঃকে পাঠিয়ে দিলেন আমার সাথে একা, কোন কাজ উপলক্ষে বেড়াতে। বাড়ীর বাহির হতেই যেন সে তার প্রাণটা খুলে দিল; তার গোপন হৃদয়ের দ্বার ভেঙ্গে গেল। তাই সে অধীর হয়ে সে দিন কত কথাই বলল; আজ আর আমি তা বলতে পারবনা বৌদি! সেদিন ছিলাম আমি আর সে একা।

জ্যোতিঃর মাকে আজও আমি বুঝতে পারলাম না বৌদি! তিনি আমায় ভালবাসেন সবটুকু হৃদয় দিয়ে, ইচ্ছা হয় তার কোলে মাথা রেখে শান্তিতে পড়ে থাকি নিরিবিলিতে। তিনি আমায় এত স্নেহ করেন যে, জ্যোতিঃ তা দেখে আমায় হিংসা করে। জ্যোতিঃর

কথা না শুনে যখন তিনি আমার কথা শুনেন, অভিমানে জ্যোতিঃর মন তখন ভার হয়ে উঠে। জ্যোতিঃর মা যে আমায় কেমন করে ভালবাসেন তা আমি আপনাকে কেমন করে বুঝাব বৌদি! তাকে যে আমি বুঝে উঠতে পারিনা। আমি জগতে সবার কাছেই জিতে গিয়েছি, জ্যোতিঃর কাছেও জিতেছি, কিন্তু হার মানতে হয়েছে জ্যোতিঃর মার স্নেহের কাছে। তিনি আমাকে যতটা বুঝেন জ্যোতিঃ এত আপন হয়েও আমাকে ততটা বুঝেনা। তিনি আমার কষ্ট দেখতে পারেন না, আমার একটুখানি দুঃখ বা কষ্ট হলে তাঁর প্রাণও কেঁদে ওঠে। সেদিন আমার যেন কেন রাগ হয়েছিল, তাই বিছানায় পড়ে ফুপিয়ে কাঁদছিলাম। আজও আমার মনে পড়ে কেমন করে কোলে টেনে নিয়ে আমার হৃদয়ের সব জালা যন্ত্রণা, রাগ অভিমান ধুয়ে দিলেন। আমার দুঃখ হবে বলেই হোক বা জ্যোতিঃকে আমার হাতে দিয়ে আমাকে আপন করে নেবার জন্যই হোক কত অছিলায় জ্যোতিঃকে পাঠিয়ে দেন আমার সাথে একা। বুঝিনা তার এই ভাবে পাঠিয়ে দেবার অর্থ। আবার খুলেও বলেন না জ্যোতিঃকে চিরদিনের জন্য আমার হাতে তুলে দিবেন কিনা?

সেদিন ছিল থিয়েটার। বাড়ীতে আরো লোক ছিল, তারাও যাবেন থিয়েটারে—তবু নানা অছিলায় তাদিগকে পরে যেতে বলে জ্যোতিঃকে আর আমাকে পাঠিয়ে দিলেন আগে। যাবার কালে কতবার করে বলে দিলেন জ্যোতিকে, সে যেন আমার কাছে পুরুষদের সাথে বসে। জ্যোতিঃ লজ্জাতেই হোক বা আমার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করবার জন্যই হোক বলে বসল সে আমার কাছে বসবে না। বসলও না। সেখানে গিয়ে মেয়েদের ভিতরই বসল। তার মা যদি এমন কথা না বলতেন, তবে হয়ত সে নিজে ইচ্ছে করেই আমার কাছে, আমার বাহু বন্ধনে, আমার বুকের কাছে এসে বসত।

নারী অভিমান করে বিরোধিতা করে কতক্ষণ থাকতে পারে, তাকে হার মানতে হবেই, জ্যোতিঃকেই হার মানতে হল। অর্দ্ধেক থিয়েটার তখন হয়ে গেছে, পূর্ণিমা রাতের চাঁদ মাথার উপর এসেছে, জ্যোতিঃ আস্তে আস্তে আমার কাছে এসে বলল, "রাগ করেছ আমার উপর?"

কি করুণামাখা তার কথা কয়টি, তারপর বলল, "চল, বের হয়ে কিছুক্ষণ জ্যোৎস্নায় বেড়িয়ে আসি।"

তারপর আর মানা করতে পারলাম না। তার হাত ধরে লোকের ভিড় ঠেলে বের হয়ে পড়লাম। আমাদিগকে এমনি ভাবে যেতে দেখে যুবকের দল মুখ চাওয়া-চাওই করতে লাগল। জ্যোতিঃ সে সব ভ্রূক্ষেপ না করে আমার হাতখানায় একটু জোরে চাপ দিয়ে বের হয়ে এল আমার সাথে। তারপর চা খেয়ে আবার গিয়ে বসলাম ভিতরে। এবার জ্যোতিঃ আমার বুকের কাছে না বসলেও খুব কাছে বসেছিল।

এমান করে জ্যোতিঃ অনেকবার আমার কাছে হার মেনেছে। কতদিন জ্যোতিঃকে বলেছি নৌকায় বেড়াতে যেতে। কেবল আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য মানা করেছে। সেদিন নদীর তীরে অনেকে মিলে বেড়াতে গিয়েছি। সঙ্গে ছেলে মেয়ে বৌ, অনেকেই ছিল। নৌকায় যাবনা তা আগেই ঠিক ছিল। নদীতে উত্তাল তরঙ্গ নেচে নেচে খেলা করছে। তীর হতে সবাই তা দেখে ভয় পাচ্ছে। যে জ্যোতিঃকে শত বলেও রাজি করতে পারিনি, নদীর তীরে এসে আমার চোখের উপর তার চোখ দুটি ফেলে বলল, "চল, নদীতে বেড়াতে।"

তার ঐ চাহনীর ভিতর দিয়ে তার অন্তরটা বুঝতে পারলাম, কি ঝড় বইছে তার হৃদয়ে। বললাম, "এই ঢেউর মধ্যে কেউত যাবে না।"

আবার তার গভীর দৃষ্টি আমার চোখের উপর ফেলে বলল, "কেও না গেল, তুমি আর আমি।"

সেই আগ্রহ করে আমাকে নৌকার কাছে নিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকেই গেল দেখে তার মনটা আবার ভার হয়ে উঠল। সে চেয়েছিল, সেদিন আমাকে নিয়ে নদীর উপর ঢেউর সাথে দোল খেতে। হয়ত সেদিন আমরা বাহু বন্ধনে নদীর অতলে মিলন রাজ্যে চলে যাব এই ছিল তার ইচ্ছা।

অমনি মান-অভিমান ও বিরোধের সৃষ্টি করেই কাটল তাদের বাড়ীতে। সে যেমন আমাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করত আমিও তার প্রাণে আঘাত দিয়ে দূরে রাখবার চেষ্টা করতাম। তারপর এল য

দিনের কথা। সবাইকে জানিয়ে দিলাম যে, আর এক দিন পরই আমি চলে যাব। কথাটা জ্যোতিঃর কানে যেতেই জ্যোতিঃর একটা ভয়ানক পরিবর্ত্তন দেখা গেল। চোখ মুখ যেন তার ভার হয়ে উঠল। আমি কিন্তু তার সাথে কথা বন্ধ করেছি,—তাকে আঘাত দেওয়ার জন্য।

জ্যোতিঃ কেবল জানতে চাচ্ছিল, আমি সত্যি যাব কিনা? কেন এত শীঘ্র যাব? আরো কয়দিন থাকব না কেন? কিন্তু যখন কিছুতেও আমার যাওয়া সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন হল না, তখন জানতে চাচ্ছিল আবার আমি কখন তাদের বাড়ী আসব। আমি কথা বলিনা তার সাথে তাই অভিমানিনী জ্যোতিঃও অভিমান করে কথা বলে না। কিন্তু বুঝলাম, মন তার হার মেনে কাঁদছিল আমার সাথে কথা বলবার জন্য। সন্ধ্যায় যখন জ্যোতির ছোট বোনকে বললাম, "বল না তোমার দিদিকে একটা গান গেতে?"

জ্যোতিঃ তার ছোট বোনের কাছেই ছিল। অবসর পেয়ে সে নিজেই বলল, "আমার গলা বসে গেছে, আজ আর গাইতে পারব না। আবার যখন আসবে তখন গান গেয়ে রাত ভোর করে দিব। তোমাকে ঘুমাতেও দিব না। কবে আসবে?"

"আসব না আর। আর কেনই বা আসব?"

"কেন আসবে?" বলে জ্যোতিঃ আমার মুখের দিকে তীব্র করুণ দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর বলল, "আচ্ছা, না এলে!"

চোখে তার জল ছল্ ছল্ করে উঠল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে চলে গেল অন্য ঘরে।

চলে আসার আগের দিন জ্যোতিঃ আমার কাছে এসে বলল, "আজ তোমায় ঘুমাতে দেবনা।"

"আমাকে ঘুমাতে দিবে না। খানিকক্ষণ বাদে তুমিই যে ঘুমিয়ে পড়বে!" জ্যোতিঃ রোজই শত কাজ থাকলেও সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ত।

"রোজ ঘুমাই বলে আজ আর ঘুমাব না। তোমায়ও ঘুমাতে দিব না, রাত ভোর বসে গল্প করব।

রোজ জ্যোতিঃর মা সন্ধ্যা হলেই তার কাছে ডেকে নান। সেদিন তিনি যেন কত কাজে মেতে গেলেন, তাই ডাকলেন না। জ্যোতিঃর সাথে গল্প চলল। সেদিন যেন সে মুক্ত কলিকা। কত কথাই বলল। জীবনে কি করবে—ম্যাট্রিক পাশ করার পর ডাক্তারী পড়বে। এখন স্কুলে তার পড়াশুনা ভাল চলছে, গৃহ-বিজ্ঞান ভাল করে পড়ছে, ড্রইংএ তার ভাল হাত হয়েছে, আরও কত কি? এমনি গল্প করতে করতে রাত একটা বেজে গেছে। আমি আর পারলাম না, শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকাল বেলা ছয়টায় আমার গাড়ী। জ্যোতিঃ রাত-ভোর ঘুমিয়েছে কিনা তাও জানি না। ভোর চারটার সময় আমি জেগেছি। জেগে দেখি, তখন জ্যোতি বসে বসে আমার জন্য চা করছে। কাছে গিয়ে ডাকলাম, "জ্যোতি!"

জ্যোতি আস্তে উঠে এসে আমার খুব কাছে দাঁড়াল। তার অন্তর কি যেন চাচ্ছিল,—বলতে পারল না, কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডালিম ঠোঁট দুটি দাঁত দিয়ে কামড়াতে লাগল। আমার তৃষিত পরাণ কেবল বলছিল, তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে চুমুতে চুমুতে গোলাপী গাল দুটি ভরে দেই। সেও হয়ত তাই চাচ্ছিল আমার কাছ থেকে। পলকহীন দৃষ্টিতে আমরা দুজন দুজনের মুখের পানে তাকিয়ে রইলাম। তারপর তাকে বুকের কাছে বাহু-বন্ধনে টেনে নেব এমন সময় তার মা এসে ডাকলেন, "চা হল জ্যোতিঃ?"

জ্যোতিঃ আবার চা করতে বসল।

আমার সময় হল। গাড়ী এল। জ্যোতিঃ আমার কাছে কাছে ঘুরতে লাগল। হয়ত আমার ঠোঁটের একটুখানি ছোঁয়াচ পাবার জন্য যা তার অন্তরে স্মৃতি হয়ে থাকবে, কিন্তু তা আর হল না। আমি টাঙ্গায় গিয়ে বসলাম। জ্যোতি আর এগিয়ে আসতে পারলনা, কপাট ধরে দাঁড়িয়ে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আমি তার দিকে আর তাকাতে পারছিলাম না। তার মুখ চোখ অন্তর যেন আমাকে বলছিল, গোপন ভাষায়, "ওগো আমায় নিয়ে চল তোমার সাথে। তোমায় ছাড়া আমি থাকতে পারবনা।

আমি আর তাকে কোন কথা বলতে পারলাম না। একটা সান্ত্বনার বাণীও না। গাড়ী ষ্টেশনে ছুটে চলল।

চলে এসেছি নিষ্ঠুরের মত, আর দেখা হয় নাই। হয়ত আর জীবনে দেখা হবেও না। কিন্তু তার স্মৃতি যে আমার অন্তরের কানায় কানায় ভরে আছে তার পূজা করেই আমার এজীবন-রাত ভোর করতে হবে।"

* * * *

শেফালী

গল্প

ডাঃ অমূল্যধন ঘোষ

তরু।—কেন তুমি অমন ক'রে আমার পানে চেয়ে র'য়েছ?—তোমার হয়েছে কি?

ফুল।—তোমার ওই ন্যাকা-পনা আমার সহ্য হয় না।

তরু।—কেন, আমার কি একটা কথা জিজ্ঞেসা করবারও আর অধিকার নেই?—তুমি ত' আমারই ছিলে।

ফুল।—ওই চিন্তাই ত' আমায় মর্ম্মান্তিক বাজে। বাতাসে নেচে নেচে উন্মত্ত হ'য়ে তুমি যে আমার পানে ফিরেও চাও না,—তা' ত' আমার প্রাণে তত অসহ্য হয় না; কিন্তু যখন তুমি আমার দুঃখের কারণ জিজ্ঞেসা কর, তখন আমার বুক ফেটে যায়। আমি যে তোমারই ছিলুম, এই চিন্তাই ত' আমার সব চেয়ে বেশী দুঃখের। তোমারই ত' ছিলুম, তবে সত্যিই কি তুমি আমার দুঃখটা কিছুই বুঝ্‌তে পারো না?

তরু।—তোমার ওই মিছে কান্না আমার ভাল লাগে না। তুমি ঝরা-ফুল!—তোমার ইচ্ছে হয় ত' উড়ে কোথাও যেতে পার,—না হয় ত' শুকিয়ে মরে যেতেও পার। তুমি লজ্জায় মাথা নীচু ক'রে সর্ব্বাঙ্গে বিন্দু বিন্দু ঘেমে, আমার পানে আড়চোখে যে আছ ওতে আমায় অন্য ফুলেরা কি মনে করে, বলতো। ও'র চেয়ে, তোমার যতদূর ক্ষমতা আছে, আমায় শাস্তি দিয়ে সরে যাও।

ফুল।—তোমায় শাস্তি দেবার ক্ষমতা ও অহঙ্কার আমার মোটেই নেই;—অমন ইচ্ছেও আমার মনে আসে না। আমার কান্না যদি তোমার বুকে বাজতো ত' তোমায় শাস্তি দিতে আমি পারতুম। তবুও যখন আমার বড় কষ্ট হয়, তখন ইচ্ছে হয় তোমারই বুকের ওপর মাথা রেখে, তোমারই মুখের পানে চেয়ে চেয়ে প্রাণভোরে কাঁদি। যখন বাতাস বইতে থাকে, আর তুমি অন্য ফুলদের সঙ্গে আনন্দে নাচ্‌তে থাকো,—তখন পাছে আমি চোখের ওপর তা' সহ্য ক'রতে না পারি এই ভাবনায় বাতাস আমায় উড়িয়ে তফাতে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, রোদ্দুর আমায় শুকিয়ে শেষ ক'রে ফেলে, আমার যাতনা একেবারে ঘুচিয়ে দিতে চায়। কিন্তু, তোমায় ছেড়ে মরতেও আমার ইচ্ছে হয় না,—উড়ে যেতেও আমার প্রাণ চায় না। তোমার পানে চেয়ে র'য়েছি ব'লে তোমার অন্য ফুলেরা যদি কিছু মনে করে ত' তাদের ব'লো, যে তুমি আমায় ঘেন্না ক'রে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়েছ,—তা'দের কোনও ক্ষতি আর আমার দ্বারা হতে পারবে না।

তরু।—তুমি বিস্বাদ পরিণামের বিকট ছবি তা'দের চোখের ওপর এঁকে ধরে নিয়ে ব'সে থেকে, তা'দের মধুময় জীবনের সুস্বাদ সুখে উপভোগ ক'র্‌তে দিচ্ছো না।

ফুল।—তা'দের এ উপভোগ ত' চিরস্থায়ী নয়! সে আশা যদি তা'রা ক'রেও থাকে ত' আমারই মতন আবার শেষে ত' ভুগ্‌বে।—তা'র চেয়ে আমার দশা চোখের ওপর সর্ব্বদা দেখ্‌লে, তা'রা আগে থাক্‌তে পরিণাম ভেবে নিয়ে সাবধান হ'তে পারবে;—তা' হ'লে যে-টুকু সময় তোমায় পাবে, সেটুকু সময়ও প্রাণভ'রে ভালবেসে নিতে পারবে;—আমার মতন আগা গোড়াই ঠ'কে যাবে না। তা' ছাড়া তোমার অন্য ফুলেরা কিছু মনে করবার কথা যা' তুমি ব'ল্‌ছো সে তোমার মিছে কথা!—তুমি নিজেই আমায় দেখ্‌লে এখন বিরক্ত হও, তা'ই-ই বল না।

তরু—তা'ই—ই যদি হয়, তা'তেও ত' তোমার কোনও জোর নেই।

ফুল।—আমার কোনও জোর নেই জানি ব'লে ত' আমার বেশী দুঃখ হয়। আমার আবার জোর কোথায়? যখন তোমার বুকের ওপর স্থান পেয়ে ছিলুম, তখনই আমার জোর খাট্‌তো না,—আর এখন পায়ের তলায়

ছুড়ে ফেলে দিয়েছো, এখন আমার কিসের জোর খাট্‌বে?

তরু—বুকের ওপর থেকে নামিয়ে দিয়েছি ব'লেই বুঝি তোমার অত অভিমান হয়েছে! চিরকালের মত আমার বুকের ওপর ফুটে থাক্‌বে, এই আশাই তুমি ক'রেছিলে নাকি?

ফুল।—আমি ত' সেই রকম আশাই ক'রেছিলুম।—যতদিন না একেবারে শুকিয়ে যায়, ততদিন গোলাপ যেমন গাছের বুকের ওপর ফুটে থাক্‌তে পায়,—আমি ত' সেই রকম ফুটে থাক্‌বার আশাই ক'রেছিলুম।—শুধু এক রাত্তিরের জন্যে যে ফুট্‌বো, এ কথা ত' আগে ভাবিনি'।

তরু।—গোলাপ গাছের সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না!—সে ছোট গাছ।—তা' ছাড়া তা'র কাঁটার জ্বালাও মাঝে মাঝে গোলাপ-সুন্দরীকে বেশ সইতে হয়।

ফুল।—ছোট গাছের কাঁটা স'য়েও যদি আমি অমনি সোহাগে ফুটে থাক্‌তে পেতুম সে যে আমার ভাল ছিল। এ একরাত্তিরের আদর সোহাগ,—রাত পোহাতেই ফুরিয়ে গেল!—এ'তে আমার কি সুখ হ'ল?—কেবল কেঁদে কেঁদেই জীবনটা কেটে গেল।—সে তবু হাসি-কান্নায় কাট্‌তো।—

তরু।—গোলাপ-কামিনী কেমন সুন্দরী!—তার কত গুণ!—আর—

ফুল।—আর তোমায় গোলাপের গুণ গাইতে হ'বে না—গোলাপের সঙ্গে আমার তুলনা করা তোমার সাজে না। তা'র সঙ্গে আমার সমান অবস্থা হ'লে, আমিও যে কেমন হতুম, তা' ব'লতে পারি না। জীবনে কখনও ভালবাসা হারাতে হবে না, এতটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে যদি মনের শান্তিতে কাটাতে পারতুম, তা' হ'লে আমারও মুখে অমন গোলাপী আভা ফুটে উঠ্‌তো।—তুমি শুধু 'পরের সুন্দরীর' রূপই দেখ্‌তে পাও; কিন্তু আমার রূপের মাথাটা যে তুমিই খেয়ে দিয়েছো, সে কথাটা ত' একবারও ভাবো না! কেবল হতাশে, আকাশপানে চেয়ে চেয়ে আমার সবটুকু রক্ত শুকিয়ে গিয়ে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলুম,—দেহের বাড়টুকু একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেল,—সেটা কখনও মনে করো কি?—মিলনসুখের আ'বেশভরা নরম গালের রং ফলানি কেবল তোমার মিষ্টি লাগে,—আর বিদায় বেলার ঠোঁট ফুলোনি দেখলে তুমি বড়ই বিরক্ত, হও!—যাক্!—আমার সুখের রাত্রি শেষ হয়ে গেছে,—আর সুখের আশা আমি করি না।—এখন, দয়া ক'রে, শুধু তোমার পায়ের তলায় আমায় প'ড়ে থাক্‌তে দাও।—তোমার নির্দ্দয় আচরণ চোখের ওপর দেখ্‌ছি, আর চুপ ক'রে চেয়ে প'ড়ে র'য়েছি,—একটী কথাও ত' তোমায় বলিনি'! ক্ষুদ্র কুসুমের একমাত্র আশা-তরু, ওগো, নিতি সুখের নব-নাগর! তোমার পায়ে ধ'রে মিনতি ক'রছি, আমায় বিরলে ব'সে একটু চুপ ক'রে কাঁদ্‌তে দাও।—তোমার মত ধনীর কাছে এটা যত বড় উপহাসের জিনিসই হোক না কেন, আমার মত গরীবের যখন চোখের জল ছাড়া আর কোনও সম্বলই নেই, তখন সেটা শেষ ক'রে ঢেলে দিতে দাও। আমি যে তোমার পায়ের তলায় প'ড়ে শুকোবার জন্যেই ফুটে'ছিলুম তা' তুমি যদিও জান্‌তে বটে,—আমি তা' আগে কিছুই জান্‌তুম না। তবে কেন এখন আমায় বিদ্রূপের বাণে এমন খুঁচিয়ে' মারছো? তুমি রোজ রোজ তোমার সখের খেয়ালে নতুন নতুন আশা দিয়ে, আমার মত অমন কত ফুল ফুটিয়ে তুলছো,—আর ঝরিয়ে দিচ্ছো! কিন্তু, আমি ফুল হ'য়ে, জন্মের মত একবারই পৃথিবীতে ফুট্‌তে এসে ছিলুম,—তাই তোমার মুখের মিছে আশাকেই সত্যি ব'লে বুকে ধ'রে নিয়ে, অনন্ত বিশ্বাসের একান্ত নির্ভরে ফুটে উঠেছিলুম। কিন্তু, এত নিষ্ঠুর তুমি, যে তোমার সখের খেলা খেল্‌তে গিয়ে আমার প্রাণটাই নিয়ে নিলে,—পরিবর্ত্তে একটু দয়াও দিলে না! যে-বাতাসে রোজ তুমি উন্মত্ত হ'য়ে নাচো, সেই বাতাসেই যে তুমি একদিন হতাশায় ভেঙ্গে পড়্‌বে,—সে ভাব্‌না ত' তুমি ভাবো না! তবে আমি ফুল হ'য়ে জন্মেছি,—তোমার সে পরিণাম ভাব্‌তেও আমার প্রাণে দারুণ বাজে!

তরু।—সত্যিই যদি তুমি আমায় এত ভালবাস যে, আমার সে দুর্গতি ভাব্‌তে তোমার মনে কষ্ট হয়,—তবে অমন আশা বুকে ক'রে নিয়ে প'ড়ে আছ কেন?

ফুল।—কেন?—জানোনা, কি যে তা'তে আমার যে স্বার্থ র'য়েছে, তা' ছাড়্‌তে গেলে, জন্মান্তরেও তোমার

আশা ছেড়ে দিতে হয়?—তোমায় পেয়ে যে আমার কত সুখ, তা' কি আমি ভুলতে পেরেছি? মনে পড়ে কি তোমার সেই গত রাত্তিরের কথা?—আমার জীবনের সেই একটী মাত্র মিলন রাত্তির?—সন্ধ্যেবেলায় আমাদের মিলন হোল,—এই ফাঁকা মাঠের মাঝখানে —মনে ক'রলুম, বুঝি বা শরতের নির্ম্মল চাঁদ একা আমাদের বিয়ের সাক্ষী হ'ল। কিন্তু, একটু পরেই বুঝলুম, তা' নয়,—সকলেই টের পেয়েছে। দেখলুম, বাতাস কোথা হ'তে চুরি ক'রে দেখতে পেয়ে, পাশ দিয়ে হেসে চ'লে গেল;—আমি সরমে তোমারই বুকে মুখ লুকালুম। চারিপাশের গাঁয়ের বৌয়েরা চারিদিক থেকে আলো জেলে দিয়ে, শাঁকের মঙ্গলধ্বনি ক'রে, আমাদের বাসর সাজিয়ে দিয়ে গেল,—আর সন্ধ্যাবধূ হাস্‌তে হাস্‌তে ঘোমটা খুলে বাসর জাগতে নেমে এ'লা! সে সুখের মিলনের কথা কি জীবনে আর ভুলতে পারলুম? তাই আবার মিলনের মিছে-আশা নিয়ে প'ড়ে আছি। সত্যি-মিছে, কি সব সময় আমরা বুঝতে পারি! নিশ্চিন্ত নির্ভরের গভীর শান্তিতে, স্তব্ধ নিশীথে যখন আমি তোমার আলিঙ্গনের মাঝে সুষুপ্ত হ'য়ে পড়েছিলুম,—তখন কি কিছু বুঝেছিলুম? তারপর রাত্রি শেষে সাধ মিটে যাওয়ায় অবসাদে তোমার বাহুবন্ধন শিথিল হ'য়ে প'ড়ল, তখনও না বুঝে আমি তোমার বক্ষলগ্ন হ'য়ে রইলুম। কিন্তু, যখন প্রভাতের স্নিগ্ধ শীতল সমীরণ আমার গায়ে ঠেলা মেরে জাগিয়ে তুলে সহানুভূতির ভাষায় তোমার হেলা-ফেলার বার্ত্তা জানিয়ে, আমার দুর্দ্দশার বিষয়ে আমায় সচেতন ক'রে দিয়ে গেল তখনই কেবল দারুণ দুঃখে আমি ভেঙ্গে ঝ'রে পড়লুম। তবুও আমার মনে হয়, আমার এত আশা কি নিস্ফল হবে, নিশ্চয়ই আবার আমাদের মিলন হবে,—এই পৃথিবীরই কোলে। সেদিন আমরা মিশে একেবারে এক হ'য়ে যাবো—সেদিনও বাতাস আমাদের মিলনের সহায়-সাথী হবে;—আমাদের বিয়ের ঘটক হবার আনন্দে সে বেগে ছুটে আসবে। তবে সে মিলন আর তেমন হাস্‌তে হাস্‌তে হবে না,—কাঁদতে কাঁদতেই আমাদের মিলতে হবে। আকাশভরা জ্যোছনার মাঝে পরিতৃপ্ত অন্তরে তোমার বুকে আলস্যে গা' ঢেলে দিয়ে আমার গত মিলন হয়েছিল,—কিন্তু এবার যেদিন মিলন হবে, সে দিন আমার তৃষিত অন্তর, ধ্বংসের রেণু-মাঝে তোমায় খুঁজে পেয়ে সকল সঞ্চিত তৃষা মিটিয়ে নেবো। ভরা প্রাণে, না চাইতেই তোমায় পেয়েছিলুম ব'লে, এত শীঘ্র হারালুম,—এবার শূন্য প্রাণে, চেয়ে চেয়ে তোমায় পাবো ব'লে চিরদিন ধ'রে রাখতে পারবো।

কবি

শ্রীপ্রতাপ সেন বি-এস্‌-সি

অনন্ত ঘেরি' প্রথম যেদিন সুধুই আঁধার ছিল,—
স্তব্ধ শূন্যে, নিঝুম বিশ্বে কে প্রাণ সঞ্চারিল?
যেদিন সবিতা-কর-সম্পাতে, হাসিল সকল দিক্—
জান কি তখন তার সাথে কার সুরু হ'ল আহ্নিক?
বিশ্বের এত শোভা-সম্পদ কার যাগে দিল হবি!
সাগর ভূধরে সুপ্ত সে জন—কবি, সে যে সেই কবি॥

পূত আশ্রম ভেদিয়া যেদিন উঠিল সামের গান;
নির্জ্জন তরু, বন-লতিকায় সমীরণ দিল প্রাণ;—
বসন্ত এল দুলায় দুকূল, নীল-অঞ্চল-তল,
একে একে সব ঋতু সুন্দরী হাতে লয় শতদল।
এত আয়োজন প্রকৃতি রাণীর কার তরে এত ছবি?
সৃষ্টির প্রতি কণিকার মাঝে—কবি, সে যে সেই কবি॥

সমাজের যত অনুগৃহীত দুনিয়ার দূরে ফেলা—
তুচ্ছ যাহারে জ্ঞান করে সবে—সকলের অবহেলা;
কুমারীর ঐ হৃদ্ কোকনদ—নহে সেত' সুধু খেলা—
প্রাণের সহিত বহে সেথা যেগো, ভাসে প্রেম-নীরে ভেলা
এ সবের তবু আছে একজন—তুচ্ছ নহেক' সবই,
বিশ্বের চির-ভ্রূকুটি-ভাজন—শাশ্বত সেই কবি॥

জগতের প্রতি নর-নারী তার প্রীতির আধার যেন;—
কৈশোর সেত কুসুম-কলিকা স্নিগ্ধ-রসের হেন।
যৌবন তার রুদ্র-রসের আকর লইয়া হাতে—
মানব-জাতির কল্যাণ তরে প্রেমাশীষ দিল মাথে।
সাম্যবাদের প্রচারক সেই স্বাধীন-বহ্নি-রবি—
মুক্তি-পথের যাত্রী সে যেগো-কবি, সে যে সেই কবি॥



স্বাস্থ্য শব্দের ব্যুৎপত্তি

—স্বাস্থ্যতত্ত্ব

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র

বাংলার নষ্ট-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আজকাল নানাভাবে নানা স্থানে বহু আলোচনা হইতেছে। সত্য-কথা বলিতে কি, বাঙ্গালী দিন দিন যে ভাবে নষ্ট-স্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে তাহার পরিণাম চিন্তা করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। বাঙ্গালীর ছেলে-মেয়ের মুখ হইতে প্রফুল্লতা ও সজীবতার মাধুরিমা লোপ পাইয়াছে। বাঙ্গালার মাতৃ-জাতির অঙ্গ হইতে যৌবনের উজ্জ্বল-লাস্য ফুটিয়া উঠিয়াই পর মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইতেছে। বাঙ্গালী পুরুষগণ যৌবনেই নত-দেহ ও বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া পড়িতেছে। এ-অবস্থার পরিণাম ভয়াবহ সন্দেহ নাই। সুতরাং, ইহার প্রতিকার উপায় উদ্ভাবন করিতে সকলেরই একান্ত চেষ্টা করা উচিত।

নানা দিক হইতে বাংলার এই স্বাস্থ্য-সমস্যা সমাধানে চেষ্টা হইতেছে, একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেহ দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে পুষ্টিকর উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, দারিদ্র্য ও মানসিক দুশ্চিন্তা এই অবস্থার জন্য দায়ী; কেহ বা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় প্রাথমিক নিয়ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও শরীর-পালন বিধি ও sanitationএর অভাব হইতেই এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, এই দুইটি কারণ প্রত্যক্ষভাবে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য-নাশের জন্য দায়ী হইলেও ইহাদের পশ্চাতে আরও একটি প্রচ্ছন্ন কারণ বিদ্যমান। সেটি আবিষ্কৃত না-হওয়া পর্য্যন্ত বাংলার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য-সম্পদ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। সে কারণটি আমরা ধরিতে পারি না, তাহার কারণ "স্বাস্থ্য" বলিতে কি বুঝায় সে সম্বন্ধে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণার অভাব। এই কারণেই আমাদের আলোচনা ও অনুশোচনা অরণ্যে রোদন মাত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা স্বাস্থ্যের ব্যাপক সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিব।

ইংরাজি শিক্ষা-প্রসারের ফলে স্বাস্থ্য ও Health শব্দ-দ্বয় প্রায় এক অর্থ বাচক ও প্রতিশব্দে পরিণত হইয়াছে। আমরা বাংলা-শব্দ 'স্বাস্থ্য' ব্যবহার করিলেও তাহার দ্বারা Health. শব্দের অর্থের অতিরিক্ত কিছু ধারণা করিতে পারি না। ফলে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে যখন কিছু বলি, তখনই Health. এই ইংরাজি শব্দটীর দ্বারা যতটুকু অর্থ প্রকাশ পায়, তাহার অধিক কিছু বুঝাইতে বা বুঝিতে পারি না। Health এই শব্দটী একটি পুরাতন ইংরাজি শব্দ হইতে গঠিত, ইহার অর্থ সুস্থ ও নিরাময় অবস্থা। সুতরাং, ইহার আভিধানিক অর্থ "ব্যাধির অভাব।" বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন স্বাস্থ্যের এই সঙ্কীর্ণ অর্থকে ইংরাজিতে Common Place বলিয়া নিন্দা করা হয়। H. C. King তাঁহার Rational Living পুস্তকে স্পষ্টই বলিয়াছেন Health বলিতে যদি এই মাত্র বুঝায় তাহা হইলে সেই অবস্থা এত সাধনার অবস্থা নয়, এবং মানব জীবনের মহান ও ব্যাপক উদ্দেশ্য সাধন করিবার পথে একমাত্র সম্বল যে, স্বাস্থ্য তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। একথা সত্য সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতে দূরদর্শী ঋষিরা যে স্বাস্থ্য-সুখ ও মানব-জীবনের চরম লক্ষ্যজ্ঞান করিতেন, তাহা জীবনের পথে ক্লিষ্ট, ক্ষিন্ন, অবসাদযুক্ত শরীরকে কোন মতে ব্যাধির হাত হইতে মুক্ত রাখিয়া, টানিয়া লইয়া যাওয়া মাত্র বুঝাইত না। হাসপাতালের বাহিরে থাকিতে পারিলেই যাঁহারা সন্তুষ্ট হন, তাঁহার স্বাস্থ্যের প্রকৃত ও ব্যাপক অর্থের সহিত পরিচিত ন'ন। "স্বাস্থ্য সকল সুখের মূল" এই প্রবাদ বাক্য তাঁহাদের নিকট অত্যুক্তি দোষে দুষ্ট, তাঁহারা ইহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।

ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত অবস্থা স্বাস্থ্যের মোটা অর্থ। ইহাকে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্বাস্থ্য এই শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থে সেই অবস্থাকে বুঝায় যে অবস্থায় মানব সম্পূর্ণ আত্মস্থ। সেই অবস্থা মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ ও কাম্য অবস্থা, তখনই মানব মন ও

দেহ একযোগে কর্ম্মক্ষম। এক কথায় শরীর ও মনের সুস্থ ও কর্ম্মপটু অবস্থাকে স্বাস্থ্য নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। কবি রবীন্দ্র নাথ যে "আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু" ভিক্ষা করিয়াছেন, তাহা মানব-জীবনের সেই অবস্থা, যে অবস্থায় মানব শুধু নিরাময় নয়, কিন্তু মহিমা-মণ্ডিত মহৎ জীবন যাপন করিয়া, দশ ও দেশের সেবায় তাহা ব্যয় করতঃ জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ। ইহাই স্বাস্থ্যের প্রকৃত ও ব্যাপক অর্থ। যে য়ুরোপীয় জগৎ আজ জীবনের সকল মধু পান করিয়া তৃপ্ত, তাহা আজ স্বাস্থ্যের এই সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করিয়া, চরম লক্ষ্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছে—Health may be defined as the quality of life which renders the individual fit to live most and to serve best (Jesse Feiring William M.D.) স্বাস্থ্য বলিতে আর্য্যরা ইহাই বুঝিতেন। সেইজন্য তাঁহারা স্মৃতি (সমাজবিধি,) নিদান, আহার, বিহার এমন কি দৈনন্দিন জীবনকে এই লক্ষ্যমুখী করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহারা শুধু ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত ছিলেন না, বিরাট জীবনের বিকাশ দেখাইয়া জগতকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই সেকালে লোকে শুধু সুস্থ দেহ ও দীর্ঘজীবী ছিল না, কিন্তু স্বাস্থ্যের আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত এই অন্নভোজী বাঙ্গালীর ঘর আলো করিয়া শ্রীচৈতন্য বিরাজ করিতেন। আর আমরা স্বাস্থ্যের এই ব্যাপক অর্থ ভুলিয়াছি বলিয়াই, জগতের চক্ষে হেয় এবং দুর্ব্বহ জীবন বহন করিয়া কাতর এবং য়ুরোপ আজ ইহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছে বলিয়াই, সেখানে Roosevelt, Pastor, Wagner বিরাজ করিতেছেন।

য়ুরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান একটা বড় সত্য আবিষ্কার করিয়াছে। সেটা ঋষিদের শিক্ষার একান্ত অনুবর্ত্তী। জীবন বলিতে এই রক্ত-মাংস দেহ মাত্র বুঝায় না। ইন্দ্রিয়ের বাহিরে এক অতিন্দ্রিয় শক্তি আছে, যাহা শরীর-যন্ত্রের সমতা রক্ষা করিয়া চলিতেছে। এই দেহের কোন যন্ত্র বাহিরের কোন কারণে পীড়িত হইলে, সেই শক্তি ক্ষুণ্ন হয় সত্য, আবার মনের সংযম ইত্যাদির অভাবে, সেই শক্তি ব্যাহত হইলে শরীর অপটু ও অসুস্থ হইয়া পড়ে। বাহিরের যে সকল শত্রু শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতি ঋতুর আধিক্য বা অসমতা এবং Bactria, microbes প্রভৃতি প্রতিনিয়ত শরীরের পীড়া উৎপাদন করিতেছে, তাহাদিগকে দূর করিবার জন্য শরীর পালন, মুক্তবায়ু পুষ্টিকর খাদ্য sanitation প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই Bacilii, বা Bacteria দুই ব্যক্তির শরীর সমান ভাবে আক্রমণ করিলেও, এক ব্যক্তি অসুস্থ হয় এবং অপর ব্যক্তি কেন সুস্থ থাকে, তাহার কারণ আজও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। Immunity, Re sisstance প্রভৃতি শব্দগুলি দুর্বোধ্য বা অর্থহীন। ইহাদের মোটা অর্থ এই যে পেশী, শরীরের Defence প্রভৃতির পশ্চাতে এমন কোন প্রচ্ছন্ন শক্তি আছে, যাহা শরীরের বিষ দূর করিবার পক্ষে অপটু হইলে, তাহা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিতে সমর্থ। এইজন্য একজন সবল-পেশী ব্যক্তিও কলেরার আক্রমণ এড়াইতে পারে না, আবার অপর একব্যক্তি অল্পতর দেহ-বল লইয়া কোমা Bacilii অবাধে পান করিয়াও সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিতে পারে, এই প্রত্যক্ষ সত্য আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে—বিশাল দেহ, সুস্থ, সবল পেশী, অব্যাহত রক্ত চলাচল এবং দেহ-যন্ত্র সমূহের প্রকৃতিস্থ অবস্থাই সুস্থ থাকিবার একমাত্র উপায় নয়। এগুলি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি কেন্দ্রনিহত প্রচ্ছন্ন শক্তি কোন কারণে কার্য্যকারিণী না হয়, তাহা হইলেও আমরা সুস্থ থাকিবার আশা করিতে পারি না। পবিত্রভাবে জীবন যাপন, মনের প্রফুল্লতা উৎপাদন এবং মনের উদারতা সম্পাদন, যাবতীয় স্নায়ুরোগের প্রথম ও প্রধান চিকিৎসা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা হইতে এই সত্যই প্রতিপন্ন হয় যে, মনকে সুস্থ রাখিতে না পারিলে অনেক ক্ষেত্রে শরীরকে সুস্থ রাখিতে পারা যায় না। মনকে সুস্থ রাখিবার জন্য সদ্‌কার্য্য, সদ্‌চিন্তা, প্রফুল্লতা, সাহস প্রভৃতির প্রয়োজন। এ-কথা য়ুরোপও আজ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। R.C. Cabot তাঁহার What men live by পুস্তকে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, মন ও আত্মার বিষয় চিন্তা না করিয়া, কেবলমাত্র দেহের উন্নতির জন্য যত চেষ্টা কর না কেন, তোমার সকল চেষ্টাকে ব্যাহত করিয়া এই সত্যই প্রতিপন্ন হইবে যে, মানব-জীবন বলিতে এই দেহ মাত্রকে বুঝায়

না;—দেহ, মন ও আত্মার অব্যাহত প্রশান্ত সমাজ-মুখিনী গতিকে বুঝায়, সুতরাং যে কার্য্য (স্বার্থপরতা) এমন কি, যে চিন্তা সেই গতিকে প্রতিহত করে, সেই কার্য্য (স্বার্থপরতা) সেই চিন্তা মন ও আত্মার অশান্তি ঘটাইয়া শরীর ও মনকে পীড়িত করে। সুতরাং, যিনি প্রকৃত সুস্থ থাকিতে চান, দেহের উন্নতি ও মনের উৎকর্ষতা সম্পাদন করিবার চেষ্টা করা তাঁহার একান্ত উচিত।

বাঙ্গালী আজ জীবনের মহৎ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে। ফলে রোগ, শোক, জরা, বাঙ্গালীর জীবনকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে। বাঙ্গালার স্বাস্থ্য বিভাগ নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা করিতেছে, তাহার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখাইবার হেতু থাকা সত্ত্বেও, আমি একথা বলিতে বাধ্য, যতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী জীবনের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া আত্মশুদ্ধির দ্বারা মানব-জীবনকে সমাজ ও ধর্ম্মের অংশরূপে কল্পনা করিতে না শিখিতেছে এবং আপনাকে সমস্ত জগতের সহিত বিচ্ছিন্ন না করিয়া অংশরূপে জ্ঞান করিবার শিক্ষা লাভ করিতেছে এবং মন ও আত্মার পরিপুষ্টি সাধন করিতে সমর্থ হইতেছে, ততদিন চিন্তা-মসীলিপ্ত বাঙ্গালীর মুখে স্বাস্থ্যের অরুণালোক ফুটাইয়া তুলিবার আশা-দুরাশা মাত্র। দুর্নীতি, দুশ্চিন্তা, নীচতা, সর্ব্ববিধ কুকার্য্য ও কুচিন্তা পরিহার করিয়া, বাঙ্গালীর নিকট জীবনের মহৎ লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করিবার সময় আসিয়াছে। যদি বাঙ্গালী শরীর পালন ও স্বাস্থ্যবিধি মানিয়া চলার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দৈনন্দিন ও সমাজ-জীবনকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে, যাহাতে তাহার মন ও আত্মা শান্তির পরম আনন্দ লাভ করিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে এই মরা গাংয়ে বান আসিবে, শতাব্দী সঞ্চিত, পুঞ্জীভূত পঙ্কিলতা ভাসিয়া গিয়া, বাঙ্গালার পূত-প্রান্তরে মানবতার রত্ন বেদী গড়িয়া উঠিবে, এবং শান্ত, সবল, বাঙ্গালী তাহার তলে অর্ঘ্য লইয়া যেদিন উপস্থিত হইবে, সেদিন দেবতার হস্ত হইতে অপার আনন্দ ও স্বাস্থ্যলাভ করিয়া, তাহার মলিন মুখে মধুর হাসি ফুটিয়া উঠিবে!

অসমাপিকা

শ্রীপ্রফুল্ল সরকার

তোমার কথাটি হয়নিক' শেষ
আজো মোর মনে জাগে!
শাশ্বত হ'ল ক্ষণিক নিমেষ
অশেষের অনুরাগে।
কাজল আঁখির মায়াজাল মিলে
যে স্বপন মোর আকাশে আঁকিলে
তেমনি সে আজো রহে অচপল,
আনীল-তন্দ্রা-ভোর!
ঝরালে যে তব শেষ আঁখিজল
সে হ'ল প্রথম মোর!

ভোলা কথা গেঁথে ফিরি নিশিদিন
স্মৃতির সায়র-কূলে;—
আকাশ কুসুম সুষমা বিহীন,
সাজোনা বকুলফুলে!
ঝরা-মালিকার মরমের পুটে
রুদ্ধ-কামনা গুমরিয়া লুটে,
বাসক বনের কিশলয় দল
মর্ম্মরে কাঁদি উঠে?
বুকের মুকুল বিকাশ-বিভল
কুসুম হইয়া ফুটে!

অন্ধকারে

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল

গল্প

বছর কয়েক আগে শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি একটা রাত্রিতে যে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হইয়া কলিকাতা সহরটা দেখিতে দেখিতে দুই হাত জলের নীচে ডুবিয়া গিয়াছিল তাহা বোধ করি এখনো অনেকের স্মরণ আছে। অবশ্য কলিকাতার জলনিকাশের যেরূপ সুব্যবস্থা তাহাতে সহরের কোনও কোনও অংশে আধ ঘণ্টা বৃষ্টি হইবার পরই এক হাঁটু জল জমিয়া যাওয়া কিছু নূতন নয়। কিন্তু সেবারের দুর্য্যোগ এতই ভয়ানক হইয়াছিল যে, বোধ করি গত চল্লিশ বছরের মধ্যে এমনটা দেখা যায় নাই। ইলেকট্রিক তার ছিঁড়িয়া রাস্তার গ্যাস বাতি নিভিয়া সমস্ত রাত্রির জন্য মহানগরী একেবারে অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। সত্যমিথ্যা বলিতে পারিনা, কিন্তু শুনিয়াছি সেই এক রাত্রের জন্য একটা মোম বাতির দাম পাঁচ পয়সা হইতে দুই টাকায় দাঁড়াইয়াছিল।

বাদুড় বাগানে আমার বাসা। সেদিন সন্ধ্যাবেলা একটা জরুরী কাজে সহরের উল্টাদিকে হাওড়ার অভিমুখে গিয়াছিলাম। কাজ শেষ করিতে সাতটা বাজিয়া গেল। ফিরিবার পথে চা খাইবার জন্য দর্মাহাটার কাছাকাছি একটা ছোট্ট দোকানে ঢুকিলাম। বাহিরে তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। রাস্তায় গ্যাসের আলো কাচের উপরকার বৃষ্টি বিন্দু ভেদ করিয়া ঝাপসা ভাবে বাহির হইতেছে। আমার দুর্ভাবনার বিশেষ হেতু ছিল না—সঙ্গে ছাতা ছিল। আরাম করিয়া বসিয়া চা খাইতে লাগিলাম।

দোকানে বেশী লোকজন ছিল না। দুটি লোক—একজন আধ-বয়সী ও একজন কর্ণমূল পর্য্যন্ত জুলপি বিশিষ্ট যুবক—অয়েলক্লথ মোড়া টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া দানীবাবু এবং শিশির কুমার ভাদুড়ীর পাগলের ভূমিকায় অভিনয় করিবার আপেক্ষিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে উত্যপ্তভাবে আলোচনা করিতেছিল। চা খাওয়া অনেকক্ষণ তাহাদের শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তর্কের ভালরকম নিষ্পত্তি না হওয়ার জন্যই বোধ করি, তাহারা উঠিতে পারিতেছে না।

যুবক বলিল; 'জানেন মশায়, শিশির ভাদুড়ী আগাগোড়া বুড়ো আলমগীরের পার্ট করে একবারও দাঁত বেরোয় না।'

আধবয়সী লোকটি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, 'ভারী কেরামতি! দাঁত নেই ত বেরুবে কোত্থেকে? আর দাঁত না বেরুলেই বড় অ্যাক্টর হয় নাকি?'

যুবক চটিয়া উঠিয়া বলিল, 'আপনিও ত বুড়ো হয়েছেন, দাঁত না বার করে একটা কথা বলুন না দেখি!'

তর্ক শুনিতে শুনিতে ও চা খাইতে খাইতে প্রায় মিনিট পনের কাটিয়া গেল। চা শেষ করিয়া দাম দিয়া দোকান হইতে বাহির হইতেছি—যুবক তখন দানীবাবু সম্বন্ধে অত্যন্ত মানহানিকর কথাবার্ত্তা বলিতেছে—এমন সময় সোঁ সোঁ করিয়া একটা উন্মত্ত হাওয়া কোথা হইতে আসিয়া দরজা জানালাগুলাকে আছড়াইয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। আকাশের দিকে চোখ তুলিতেই নীল রঙের ভয়ঙ্কর আলোতে দু'চোখ একেবারে ধাঁধিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় শব্দে বাজ পড়িয়া কানদুটাকে যেন বধির করিয়া দিল। তাহারি মধ্যে অস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইলাম, আকাশের গায়ে যেন কালী ঢালিয়া দিয়াছে। দিগন্ত ব্যাপিয়া নিকষ-কালো মেঘের উপর আরো কালো মেঘ জমিয়া যেন নিরেট নির্ভাঁজ হইয়া গিয়াছে—অন্য জিনিষের একতিল সেখানে যায়গা নাই।

এইবার ভীষণ বেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বড় বড় ফোঁটা তির্য্যক্‌ভাবে নিরবচ্ছিন্ন মুষলধারে পড়িতে সুরু করিল। রাস্তার আলোগুলা জলের পুরু পর্দ্দার অন্তরালে

পড়িয়া নিস্তেজ হইয়া গেল, শুধু তাহাদের চারিদিক হইতে একটা মণ্ডলাকার প্রভা বাহির হইতে লাগিল।

দোকানে ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম; চাকরটাকে ডাকিয়া বলিলাম; 'আর এক পেয়ালা চা দাও ত হে!'

মেঘের আকস্মিক ধমকে তার্কিক দুজনের বিসম্বাদ সহসা থামিয়া গিয়াছিল। তাহারা আবার আরম্ভ করিল, 'দানী ঘোষ যদি ইচ্ছে করে, অমন পাঁচটা শিশির ভাদুড়ীকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারে!'

জুলপি বিশিষ্ট ছোকরা কড়া রকম একটা যুক্তি প্রয়োগ করিতে যাইতেছিল, আমি বাধা দিয়া বলিলাম, 'থাক না মশায়! পৃথিবীতে দানী ঘোষ আর শিশির ভাদুড়ী ছাড়া আর কি লোক নেই? অন্য কিছু আলোচনা করুন না।'

জুলপি সিংহবিক্রমে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'চা খাচ্ছেন চা খান। মেলা ক্যাচ্ ক্যাচ্ করবেন না।'

আমি চা খাইতে লাগিলাম।

ক্রমে আটটা বাজিল। বৃষ্টির বিরাম নাই—সমভাবে সতেজে চলিয়াছে। তার সঙ্গে ঠাণ্ডা এলোমেলো বাতাস। রাস্তার লোক চলাচল কমিয়া আসিল।

নয়টা বাজিল। বাহিরে বৃষ্টি ও ভিতরে তর্ক একভাবে চলিয়াছে। অদ্ভুত একনিষ্ঠা এই দুটি লোকের, তখনো দানী ঘোষ ও শিশির ভাদুড়ীকে লইয়া কামড়া কামড়ি করিতেছে। পৃথিবীতে যেন অন্য প্রসঙ্গ নাই।

সাড়ে নয়টার সময় আর সহ্য করিতে না পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যে করিয়া হোক রাত্রে বাড়ী পৌঁছিতেই হইবে। কিন্তু যাই কি করিয়া? ছাতায় এ বৃষ্টি আটকাইবে না—পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভিজিয়া কাদা হইয়া যাইব। একে আমার সর্দ্দির ধাত—তখন নিউমোনিয়া ঠেকাইবে কে? এই সময় বৃষ্টি আরও চাপিয়া আসিল; হঠাৎ হাওয়ার বেগ যেন বাড়িয়া গেল।

একবার বাহিরের দিকে উকিঝুঁকি মারিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম।

দোকানের চাকরটা নিশ্চল নিষ্পন্দভাবে নিবন্ত উনানের পাশে উপু হইয়া দেয়াল-ঠেস দিয়া বসিয়া আছে। মাথার উপর ধুঁয়ায় মলিন ইলেক্‌ট্রিক বাতিটা পীতবর্ণের আলো বিকীর্ণ করিতেছে। বাহিরে আশেপাশের দোকান-পাট সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে—মোটরের হর্ণ ও ট্রামের ঢং ঢং আর শুনা যাইতেছে না।

যুবক বলিল;—শিশির ভাদুড়ী—

ঠিক এই সময় হঠাৎ আলো নিভিয়া গেল।

কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ।

দোকানের চাকর ভাঙা গলায় বলিল;—বাজ পড়ে তার ছিঁড়ে গেছে—আজ রাতে আর মেরামত হবে না। দেশালাই দেবেন বাবু—লাম্পোটা জ্বালি!

অন্ধকারে হাতড়াইয়া দেশালাই দিলাম। ল্যাম্পো জ্বলিল। মিটমিটে আলো ও দুর্গন্ধ ধুঁয়ায় ঘর ভরিয়া উঠিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক এতক্ষণে প্রথম অন্য কথা কহিলেন, বলিলেন;—নীলমণি, কেটলীটা আর একবার চড়াও—আর এক পেয়ালা চা হোক।

জুলপিধারী যুবক তীব্রভাবে আমার দিকে আবার তাকাইয়া গর্ব্বিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল; 'সিগারেট আছে?'

আমি পকেট হইতে সিগারেট কেসটা বাহির বাহির করিয়া দিলাম। গোটা কয়েক সিগারেট বাহির করিয়া লইয়া যুবক কেসটা তাচ্ছিল্য ভরে আমায় দিয়া দিল। তারপর এমনভাবে আমার দিকে পিছ করিয়া বসিল, যেন আমার বাঁচিয়া থাকার সমস্ত প্রয়োজন শেষ হইয়া গিয়াছে—আর আমি কাহারও কাজেই লাগিব না।

প্রৌঢ় ব্যক্তি বাহিরের দিকে একটা উদাসীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন;—'এ বিষ্টিতে বেরুনো যাবে না। গ্যাসগুলোও নিভে গেছে দেখচি যে! বা বাবা! বলিয়া নিশ্চিন্তভাবে আবার সেই একমাত্র এবং অদ্বিতীয় প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন।

আমিও বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিলাম,—সত্যই ত! রাস্তার গ্যাসবাতী একটাও জ্বলিতেছে না। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, কোথাও জনমানব নাই। কেবল অবিশ্রান্ত বারি পতনের ঝুপঝুপ ঝম্ ঝম্ শব্দ।

আর এক পেয়ালা চা খাইলাম। প্রৌঢ়লোকটি বলিলেন;—আজ রাত্রে বাড়ী যাওয়া হলনা দেখছি। নীলমণি, বিষ্টি থামলে আমাকে তুলে দিও।' বলিয়া বেঞ্চির উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন। যুবক

কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আমার সিগারেট টানিতে লাগিল।

কিন্তু আমার ত বেঞ্চির উপর রাত্রি কাটাইলে চলিবে না—বাড়ী যাওয়াই চাই। বাড়ীতে স্ত্রী দুটি ছোট ছেলে-মেয়ে লইয়া একলা আছেন। ঝিও হয়ত বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। অথচ বৃষ্টি না ধরিলে যাই বা কেমন করিয়া?

ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি—এগারোটা!

প্রৌঢ় ব্যক্তির নাকের ভিতর হইতে মাঝে মাঝে একটা অনৈসর্গিক শব্দ বাহির হইতেছে। যুবক স্থির ভাবে প্রতীক্ষা করিয়া আছে, তাঁহার ঘুম ভাঙিলেই আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিবে।

রাত্রি যত গভীর হইতেছে, আমার মনের উদ্বেগ ও অস্থিরতা ততই বাড়িতেছে। এদিকে ঝড়বৃষ্টির উদ্দাম নৃত্যে কিছুমাত্র শ্রান্তির লক্ষণ নাই।

ঘড়ির কাঁটা সরিয়া সরিয়া পৌনে বারোটায় পৌঁছিল। নীলমণির ল্যাম্পোর জ্যোতি নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। সে উঠিয়া বাতিটা একবার নাড়িয়া বলিল;—'তেল ফুরিয়ে গেছে—আর পাঁচ মিনিট।'

প্রৌঢ় ব্যক্তির নাসিকা-নিঃসৃত একটি ধ্বনি অর্দ্ধপথে রুখিয়া গেল। তিনি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন;—আঁ থেমেছ?

নীলমণি বলিল;—'না বাবু, আলো নিভে যাচ্ছে।'

'ওঃ' বলিয়া নিরুদ্বেগ প্রৌঢ় আবার শুইবার উপক্রম করিলেন।

শিকার ফস্কায় দেখিয়া যুবক বলিল;—'আমি তখন বলছিলুম শিশি—'

আমার মাথায় খুন চাপিয়া গেল। চীৎকার করিয়া বলিলাম,—'খবরদার বলছি! ফের যদি ওদের নাম করেছ ছোকরা, তোমার জুলপি ছিঁড়ে নেব।'

আমার এই আকস্মিক উগ্রতায় যুবক ও প্রৌঢ় দুজনেই স্তম্ভিতবৎ আমার মুখের দিকে নিস্পলক নেত্রে তাকাইয়া রহিল।

নীলমণি ভগ্নস্বরে কহিল;—'বিষ্টি ধরে আসছে বাবু, এই বেলা বেরিয়ে পড়ুন। আমি দোকান বন্ধ করি।'

সাগ্রহে বাহিরের দিকে গলা বাড়াইয়া দেখি সত্যই বেগ প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া গিয়াছে—ঝড়ও যেন থামিয়াছে। একাদিক্রমে পাঁচ ঘণ্টা দাপাদাপি করিয়া বুঝি তাহারা অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।

ছাতাটা তুলিয়া লইয়া উঠিয়া পড়িলাম। আর দেরী নয়। যাইতে হয় ত এই সময়!

পশ্চাত হইতে যুবকের কণ্ঠস্বর আসিল;—'মশায়, দেশালাইয়ের গোটাকয়েক কাঠি দেবেন কি?'

রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। এই সময় পিছু ডাক! পকেট হইতে দেশালাইএর বাক্সটা বাহির করিয়া টেবিলের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

ল্যাম্প দপ দপ করিয়া দু'বার খাবি খাইয়া নিভিয়া গেল।

* * * *

কি অন্ধকার! একটা প্রকাণ্ড সহর বর্ষার রাত্রিকালে সহসা আলোকহীন হইয়া গেলে যে কিরূপ ভয়ানক অন্ধকার হয়, তাহা কল্পনা করা দুঃসাধ্য। খুব শক্ত করিয়া চোখ বাঁধিয়া দিলে কিম্বা অন্ধ করিয়া দিলেও বোধ করি এর চেয়ে বেশী অন্ধকার হয় না। নিস্পলক চক্ষুদুটা কোথাও আশ্রয় না পাইয়া বিস্ফারিত হইয়া থাকে—এবং অন্য ইন্দ্রিয়গুলা অতিশয় তীক্ষ্ণ ও সতর্ক হইয়া উঠে।

প্রথম ঝোঁকে খুব খানিকটা চলিয়া আসিয়া থমকিয়া পড়িলাম। কোথায় যাইতেছি—কোনদিকে যাইতেছি? বাড়ী গিয়া পৌঁছিবার একান্ত আগ্রহে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি বটে, কিন্তু এই বিদ্ঘুটে অন্ধকারে পথ চিনিয়া যাইব কি প্রকারে? দোকান হইতে বাহির হইয়া ঠিক যে, কোন মুখে আসিয়াছি তাহাও স্মরণ করিতে পারিতেছি না। হয়ত বা যেদিকে বাড়ী তাহার উল্টা পথেই গিয়াছি। এখন উপায়!

কিন্তু পথের মাঝখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে এ সমস্যার সমাধান হইবে না। যেদিকে হোক চলা দরকার, যদি এমনি ভাবে চলিতে চলিতে কোথাও একটা আলো বা মানুষের সাক্ষাৎ পাই। সুতরাং আবার সম্মুখ দিকে চলিতে আরম্ভ করিলাম।

বৃষ্টি ও ঝড় ক্রমে কমিয়া কমিয়া একটা বিষাদপূর্ণ

দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া থামিয়া গেল। তখন এই অন্ধকারের বুকের উপর আর একটা জিনিস চাপিয়া বসিল—সেটা এই মধ্য রাত্রির ভয়াবহ নীরবতা। এতক্ষণ বৃষ্টির ছপ্ ছপ্ ঝর ঝর শব্দ ও বাতাসের গোঙানিতে যাহা চাপা ছিল, এখন তাহা উলঙ্গ মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল। পৃথিবীর সব মানুষ যেন মরিয়া গিয়াছে শুধু আমি একা বাঁচিয়া আছি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমি একা—একেবারে নিঃসঙ্গ

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া ছুটিয়া চলিলাম। মনের গূঢ়তম প্রদেশে বোধকরি এই আকাঙ্ক্ষাটাই দুর্ণিবার হইয়া উঠিয়াছিল যে মানুষ চাই, সঙ্গী চাই, কোনও প্রকারে এই দুঃসহ নিঃসঙ্গতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। কিন্তু বেশী দূর যাইতে হইল না। খানিক দূর গিয়াই প্রচণ্ড একটা হোঁচট্ লাগিয়া হুমড়ি খাইয়া একেবারে এক কোমর জলের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। ছাতাটা হাত হইতে কোথায় ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

হাঁচোড়-পাঁচোড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিলাম, —না, এক কোমর নয় তবে জল এক হাঁটু বটে। আন্দাজে বুঝিলাম বোধ হয় এতক্ষণ ফুটপাথে চলিতে ছিলাম এবার রাস্তায় নামিয়াছি। কিন্তু এই অবতরণটি যেমন সুখকর নয়, ফুট্‌পাথে ফিরিয়া যাওয়াও তেমনি অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। কারণ ফুট্‌পাথ যে কোন দিকে তাহা জলে পতনের সঙ্গে সঙ্গে গুলাইয়া গিয়াছে।

পাঁচ ঘণ্টা ক্রমান্বয়ে বৃষ্টি হইবার পর যে, রাস্তায় জল জমিতে পারে এ সম্ভাবনটা তখন পর্য্যন্ত মাথায় আসে নাই। কিন্তু ভগবান যখন চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন, তখন দুশ্চিন্তা হইল—না জানি কোথায় অথৈ গভীর জল আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, হয়ত একপা অগ্রসর হইলেই হুস করিয়া ডুবিয়া যাইব।

এক হাঁটু জলের মধ্যে এক পা এক পা করিয়া সাবধানে অগ্রগামী হইতে লাগিলাম। বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল। হায় ভগবান্! এ আমার কি দুর্দ্দশা করিলে। কেন মরিতে আজ ঘরের বাহির হইয়াছিলাম। যদি বাহির হইয়াই ছিলাম তবে চায়ের দোকানে রাত্রিটা কাটাইয়া দিলাম না কেন?

কিন্তু পশ্চাত্তাপে কোনও ফল হইবে না। আমি মাথা ঠাণ্ডা করিয়া একটু ভাবিতে চেষ্টা করিলাম—এরূপ ক্ষেত্রে কি করা উচিৎ। প্রথমত কোনও রকমে ফুটপাথে ওঠা চাই—মাঝ রাস্তায় জলের মধ্যে দিয়া দশ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গেলেও কোনও একটা লক্ষ্যে পৌছানো যাইবে না। ফুটপাথে উঠিতে পারিলে, কোনও একটা বাড়ীর দরজায় ধাক্কা দিয়া লোক জাগাইয়া রাত্রির মত আশ্রয় পাওয়া যাইতে পারে কিম্বা অন্য কোনও ব্যবস্থা করা সম্ভব। মোট কথা যে উপায়েই হোক, নরলোকের সহিত সম্বন্ধস্থাপন করা দরকার। এই অন্ধকার সমুদ্রের মধ্যে বেশী নয়, আপাততঃ একটা মানুষের দেখা পাইলেও যে সাক্ষাৎ চাঁদ হাতে পাইব তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

শামুকের মত হাঁটিয়া হাঁটিয়া কিন্তু কোনও দিকেই এমন একটা বিশিষ্ট কিছু ধরিতে পারিলাম না যেখান হইতে আমার যাত্রাটাকে সুনিশ্চিত করিতে পারি। এক হাঁটু জল কখনো কমিয়া আধ হাঁটুতে নামিতেছে, আবার কখনো উরুত পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছে। এ ছাড়া, দিগ্‌দর্শন করিবার কিম্বা যাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিবার আর কোনও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিহ্নই নাই।

সৃষ্টির প্রথম জীব বোধকরি এমনি অন্ধভাবে প্রলয়পয়োধির অতলতলের মহা স্তব্ধতার মধ্যে অদৃষ্ট পরিচালিত হইয়া হাঁটিয়া বেড়াইত; এবং আবার মহাপ্রলয়ের দিন যখন সূর্য্যচন্দ্রের আলো নিভিয়া যাইবে, তখন সৃষ্টির শেষ জীব এমনি নিরুপায় দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে।

এই ভাবে কতক্ষণ চলিয়াছিলাম বলিতে পারি না—সময়ের ধারণাও এই ঘোর নীরবতার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ পায়ের আঙুলে একটা শক্ত বস্তু ঠেকিল। অনুভবে সিঁড়ির ধাপের মত বোধ হইল। তাহার উপর উঠিয়া দু'চার পা এদিক ওদিক ঘুরিবার পর বুঝিলাম এতক্ষণে আমার সেই ঈপ্সিত ফুটপাথে পৌঁছিয়াছি।

যাক—তবু ত কিছু পাইয়াছি! দুই হাত বাড়াইয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে কিছুক্ষণ চলিলাম। একটা ভিজা দেয়াল হাতে ঠেকিল। তখন সেই দেয়াল ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুকাল এইভাবে যাইবার

পর কাঠের দরজায় হাত পড়িল। সশব্দে একটা নিশ্বাস ফেলিলাম—এতক্ষণে বুঝি এই দুঃখ সাগরে কূল মিলিল।

দরজায় সজোরে ধাক্কা দিলাম। তারপর চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলাম.—'কে আছ দোর খোল' 'মশায় দয়া করে একটিবার দোর খুলুন' 'ওহে কেউ শুনতে পাচ্ছ, একবার দরজাটি খুলবে?' কিন্তু কোথায় কে? দরজা যেমন বন্ধ ছিল, তেমনি বন্ধই রহিল। বাড়ীর ভিতর হইতে কোন জবাব আসিল না। শুধু আমার আগ্রহ ব্যাকুল কণ্ঠস্বর কোথাও আশ্রয় না পাইয়া একটা নিঃসঙ্গ প্রেতযোনির মত এই বিরাট নিস্তব্ধতার মধ্যে গুমরিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পূর্ব্ববৎ দেয়াল ধরিয়া আবার আর একটা দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঠেলাঠেলি হাঁকাহাঁকি করিলাম, কিন্তু কোনই ফল হইল না। দরজা খুলিল না,—এমন কি দরজার অন্তরালে কোথাও যে লোক আছে, তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া গেল না। আরও দুই তিনটা দরজা এমনিভাবে চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কিন্তু যথা পূর্ব্বং তথা পরং—ফলের কোনও তারতম্য হইল না।

শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল,—মনও উদ্‌ভ্রান্ত উদাসীন হইয়া গেল। যদি কলিকাতার সকলেই মরিয়া গিয়া থাকে, তবে আমার বাঁচিয়া থাকিয়াই বা লাভ কি? এখন কোথাও একটু শুইবার জায়গা পাইলে আর কিছুরই আমার দরকার নাই। জলের মধ্যে হাঁটিয়া হাঁটিয়া পা দুটা যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে—যদি মরিতেই হয় তবে কোনও একটা শুষ্ক স্থানে পা ছড়াইয়া শুইয়া মরিতে পারিলেই ভাল।

কিন্তু পা ছড়াইয়া শুইবার মত স্থান এই প্রলয়-প্লাবিত কলিকাতা সহরটার মধ্যে কোথায় পাওয়া যায়, ফুটপাতের ওপরেও ত প্রায় এক ফুট জল!

যাহোক, এরকমভাবে হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। মন যতই অবসাদে ডুবিয়া যাইতে চাহিল, ততই তাহাকে জোর করিয়া চাঙ্গা করিয়া তুলিতে লাগিলাম। একটা কিছু সুরাহা হইবেই। এমন কথনো হইতে পারে যে কোনও বাড়ীর লোক সাড়া দিবে না? হয়ত এখনই একটা বিলম্বিত ভাড়াটে গাড়ী কিম্বা একজন আলোকধারী পথিক আসিয়া পড়িবে।

হঠাৎ আমার মনে একটা দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। কোনও অভাবনীয় উপায়ে অন্ধ হইয়া যাই নাই ত! নহিলে একি সম্ভব যে এতক্ষণ ধরিয়া এই দুই চক্ষে একটা কোন কিছুই দেখিতে পাইতেছি না? এত অন্ধকার কি হইতে পারে? হয়ত সেই যখন জলে পড়িয়া গিয়াছিলাম—

দুই চক্ষু সজোরে কচ্‌লাইতে আরম্ভ করিলাম—কিন্তু চক্ষুর দুর্ভেদ্য তিমির দূর হইল না। হঠাৎ মনে হইল দেশালাই জ্বালিয়া দেখিনা কেন! দু'পকেট খুঁজিলাম দেশালাই নাই। দেশালাই যে জুলপিকে দিয়া আসিয়াছি, তাহা তখন কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না।

যেন পাগলের মত হইয়া গেলাম। অন্ধ হইয়া গিয়াছি কিনা এ সন্দেহটা তখনি যেমন করিয়া হোক ভঞ্জন করিতেই হইবে—মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহেনা! আঁন্দ্রে একটা দরজার সম্মুখে গিয়া দু'হাতে তক্তার উপর চাপড়াইতে লাগিলাম;—'ও মহাশয়, কে আছেন একটিবার দোর খুলুন না। ও মশায়!'

পিছন হইতে শান্তস্বরে কে বলিল;—'মিছে চেঁচামেচি করছেন—এখানে কি লোক আছে যে উত্তর দেবে! এ গুলো সব দোকান।'

আমি যেন আঁতকাইয়া উঠিলাম; 'অ্যাঁ—কে—কে—কে?'

'কোনও ভয় নেই, আসুন আমার সঙ্গে। আমার হাত ধরুন।'

আমি হাত বাড়াইয়া দিলাম। একখানা হাত—বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা—আমার আঙুলগুলা চাপিয়া ধরিল। আমার পা হইতে চুলের ডগা পর্য্যন্ত যেন একবার অসহ্য শীতে কাঁপিয়া উঠিল। দাঁতে দাঁতে ঠুকিয়া ঠক্ ঠক্ শব্দ হইতে লাগিল।

আমি বুদ্ধি-ভ্রষ্টের মত জিজ্ঞাসা করিলাম;—'আমি কি অন্ধ হয়ে গেছি?'

ছোট্ট একটি হাসির শব্দ হইল।

'না ভারি অন্ধকার তাই চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। ভয় পাবেন না, আমি আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিচ্ছি।'

আমি বলিলাম,—'আমার বাড়ী শাঁখারী বাগানে।'

'আচ্ছা।'

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব। অদৃশ্য আগন্তুক স্বচ্ছন্দে অবলীলাক্রমে আমাকে সব রকম বাধা-বিঘ্ন বাঁচাইয়া লইয়া চলিল। আমার বুদ্ধিশক্তি ক্রমশঃ ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

আমি বলিলাম ;—'আচ্ছা, এই অন্ধকারে আপনি ত বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছেন !'

কোনও উত্তর পাইলাম না।

কিছুক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম ;—'আমি ধর্ম্মাহাটার একটা দোকানে চা খেতে ঢুকেছিলাম। সেখান থেকে বেরিয়ে কোথায় এসে পড়েছিলাম, বলতে পারেন !'

উত্তর হইল ;—'আপনি নিমতলা ঘাটের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন।'

নিমতলা ঘাট ! সর্ব্বাঙ্গের রক্ত যেন জল হইয়া গেল। আরও কিছুক্ষণ দুজনেই নিস্তব্ধ।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম ;—'আপনি কে ? আপনার নাম কি ?'

'আমার নাম—শুনে আপনার লাভ নেই।—এদিক দিয়ে ঘুরে আসুন, ওখানে একটা ম্যান্‌হোল্ খোলা আছে। জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না ? ওর মধ্যে যদি আপনি গিয়ে পড়েন। তাহলে আর—,

সভয়ে সরিয়া আসিলাম।

অল্পকাল পরে আমার দিব্য চক্ষুষ্মান পথ-প্রদর্শক বলিল ;—'অনেকটা ঘুরে যেতে হবে। সহরের মাঝখানে, ঠন্‌ঠনের কালীবাড়ী ঘিরে প্রায় দেড় মানুষ জল জমেছে। আপনি সে পথ দিয়ে যেতে পারবেন না।'

আমি নিঃশব্দে পথ চলিলাম। মিনিট পাঁচেক পরে বলিলাম,—'কলকাতা সহরটা মনে হচ্ছে যেন শ্মশান হয়ে গেছে। কোথাও আলো নেই, শব্দ নেই, মানুষ নেই —

'ও রকমটা মনে হয়। সহরের প্রাণ হচ্ছে তার রাস্তাঘাট।, সেখানে মানুষ না থাক্‌লে শ্মশানে আর সহরে কোনও তফাৎ থাকেনা।'

আমি কতকটা নিজের মনেই বলিলাম ;—'মনে হচ্ছে যেন এটা ভূতের রাজ্য।'

হাসির শব্দ হইল।

'এই রকম রাত্রে ভূতেদের ভারি ফুর্ত্তি হয়—কি বলেন ?—আচ্ছা, আপনি যখন একলা দরজা হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন তখন যদি একটা ভূতের সঙ্গে দেখা হত, আপনি কি কত্তেন বলুন দেখি ?'

'কি করতাম ? বোধহয় দাঁত কপাটি লেগে মারা যেতাম।'

'হা হা হা হা ! ভাগ্যে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ! আচ্ছা, ভূতকে এত ভয় কিসের বলুন দেখি ? একটা লোক মরে গেছে বৈ ত নয় ?'

'বলেন কি মশায় ! ভূত হল গিয়ে একটা—প্রেতাত্মা। তার চালচলন রীতি-নীতি স্বভাবচরিত্র কিছুই জানা নেই—ভয় কর্ব্বে না ?'

'তা বটে।—আচ্ছা মনে করুন—না থাক—'

আমার বুকের ভিতরটা হঠাৎ গুরগুর করিয়া উঠিল। এ কাহার হাত ধরিয়া চলিয়াছি ?

তবু মনে সাহস আনিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম ;—'আপনার নাম ত বল্লেন না। কোথায় থাকেন বল্‌বেন কি ?'

'কোথায় থাকি ? যেখানে দেখা হয়েছিল, তারই কাছাকাছি থাকি।'......

'আজ আমার যে উপকার করলেন, জন্মেও তা ভুলব না। আবার আমাদের দেখা হবে নিশ্চয় !'

'দেখা—বোধহয়—আর হবে না···তবে যদি আবার কখনো এমনি বিপদে পড়েন—হয়ত ···'

'আচ্ছা আপনি কি করেন ? কোনও কাজকর্ম্ম করেন নিশ্চয়—তাও কি বল্‌তে দোষ আছে ?'

'আমি কিছু করিনা, এমনি ঘুরে বেড়াই—বেকার।'

খানিকক্ষণ আবার চুপচাপ।......

'আপনার স্ত্রী ছেলে মেয়ে সব ভাল আছে—কোন ভাবনা নেই।'

আমি চম্‌কাইয়া উঠিলাম।

'আপনি আমার মনের কথা জান্‌লেন কি করে ?'

আবার হাসির শব্দ হইল।

'এ রকম অবস্থায় পড়লে মানুষের মনে স্বভাবতঃ কি চিন্তা আসে তা আন্দাজ করা কি খুব শক্ত ?'

'না—তা বটে। কিন্তু—কিন্তু—আমার স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে আছে, আপনি জানলেন কি করে?'

'ওটাও আন্দাজ।'

দীর্ঘ নীরবতা। এ কে? কোন জগতের অধিবাসী?

আমি মরিয়া হইয়া আরম্ভ করিলাম,—'দেখুন—'

'ওকথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বেন না।'

আমার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম;—'আ—আ—আমায় ছেড়ে দিন—আমি—'গলা দিয়া আর আওয়াজ বাহির হইল না।

'ভয় পাবেন না—এতক্ষণ যখন এসেছেন, তখন আরও খানিকটা আসুন। আপনার বাড়ী প্রায় এসে পড়েছে।'

পায়ে পায়ে জড়াইয়া যাইতে লাগিল, গলা এমন ভাবে বুজিয়া গেল, যেন শত চেষ্টা করিয়াও একটা কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারিব না। বরফের মত হাতখানা আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল। .....

হঠাৎ শেষ রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগিল। সে দাঁড়াইল; আমার হাত ছাড়িয়া দিল।

'এইবার আপনি একলাই যেতে পার্ব্বেন। এখান-থেকে গুণে একশ' পা এগিয়ে যান, গিয়ে ডানদিকে ফিরলে সামনেই দরজা পাবেন—সেই আপনার বাড়ী। ভোর হয়ে আসছে,—এবার আমাকে যেতে হবে।'

আমি অর্দ্ধমূর্চ্ছিতের মত নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

পুনরায় হাসির শব্দ হইল; কিন্তু এবার যেন শব্দটা বড় ব্যথাপূর্ণ।

সে বলিল,—'আপনি বড় ভয় পেয়েছেন। আচ্ছা চল্লাম তবে; এই নিন আপনার ছাতা জলের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন। ভোর হতে আর দেরি নেই—আচ্ছা—বিদায়।' শেষ কথাটা যেন গভীর দীর্ঘশ্বাসের মত মিলাইয়া গেল।

আমি আমার সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম;—'আছেন কি?'

উত্তর আসিল না।

আমি মুখ তুলিয়া দেখিলাম—অতি দূরে আকাশের পুঞ্জিত মেঘ ভেদ করিয়া অল্প একটুখানি ফ্যাকাশে আলো দেখা দিয়াছে।

"এস"

শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী

অতিথির বেশে এসেছিলে যদি চলে গেলে কেন ফিরে?
স্নেহ দিয়ে মোর হিয়া জয় করে বেঁধে গেলে প্রীতি ডোরে।
এস—কিশোর অরুণে, তরুণ তপনে,
এস—প্রভাতীর গানে, কানন শোভনে,
এ নব প্রভাতে, মরমের ব্যথা,
মুছাও সোহাগ আদরে।
এস—জ্যোৎস্না হাসিতে, চাঁদিনী নিশীথে,
এস—শেফালী যুথীতে, মধুর বাসেতে,
ঢাল সুধাধারা, তাপিত এ প্রাণে,
পথ চেয়ে আছি বাহিরে।

এস প্রভাত সমীরে, সুনীলম্বরে,
এস—শিশিরে শিশিরে, নব তৃণ পরে,
ফোটে নাই মম, কাননের কলি
ফুটাও আজি হে তাহারে।
এস—ছায়া বীথি তলে, আজি এ নিরালে,
ভরেছি আঁচলে, শেফালী বকুলে,
পেতেছি আসন, ঝরা এই ফুলে
এস সখা মোর বাসরে।

রক্তদগ্ধা

শ্রীপ্রমীলা রায়

উপন্যাস

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

৩

রমাপতি ছোট বেলাতে মা, বাপ দুজনকে হারিয়ে, পরের আশ্রয়ে দিন কাটিয়ে পরের অনুগ্রহে ভাগ্য অন্বেষণ করতে হাজারিবাগে এসে হাজির হন। তখন সেখানে 'মোটর বাস্' চলত না. ষ্টেশন থেকে সহরে যাওয়ার একমাত্র 'যান' পুস্‌পুস্ এবং তা প্রায় আট দিনে পৌছত।—লোক বসতি এত ছিল না, তার ওপর প্রায় চল্লিশ মাইল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া! কাজেই উপযুক্ত রকম সঙ্গী না জুটলে, দুএকদিন ধরে একই জায়গায় থাক্‌তে হতো।—এমনও শোনা গিয়েছে যে, যেসব একরোখা লোক বারণ না শুনে, নিজের জেদে সেই দুর্গম বনের ভিতর দিয়ে গিয়েছে, তারা বাঘের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছে।—এখন আর তত ঘন জঙ্গল নাই, বাঘ ভালুকও শিকারীদের সখের শিকারের জ্বালায় প্রায় লোপ পেয়েছে বল্লেই হয়।—শীতের আরম্ভ থেকে শেষ পর্য্যন্ত দেশী, বিদেশী, স্থানীয়, দূরাগত কত যে শিকারী এই জঙ্গলে শিকারের আশায় ঘুরে বেড়ায় তার ঠিক নেই। যার ভাগ্যে কিছু জুটে যায়, সে অহঙ্কারে ফুলে ওঠে।

এই রকম সময়ে, রমাপতি 'মরিয়া' হয়েই ভাগ্য পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করতে হাজারিবাগে এলেন। দেশে যে আত্মীয়ের বাড়ী চাকরের খাটুনী খেটে দুবেলার ভাত ও মাথা গুঁজবার ঠাঁই জোগাড় করেছিলেন, তা সামান্য একদিনের অসহিষ্ণুতায় কর্পূরের মত উবে গেল। আহার ও আশ্রয় দুটীর অভাব যখন একসঙ্গেই ঘটলো, রমাপতি তখন দেশের মাটী কামড়ে আর পড়ে না থেকে, বিদেশে বের হবেন ঠিক করলেন।—আত্মীয়ের ঘরে মিষ্টি কথা, মিষ্টি ব্যবহার এর অভাব খুবই ছিল; কিন্তু তাতে করে একদিকে যেমন রমাপতির দুঃখের শেষ ছিলনা, অন্যদিকে তেমনি বন্ধু, বান্ধব না থাকায় তাঁর কাজ-কর্ম্ম করে উদ্বৃত্ত সময়টুকু লেখাপড়ায় কাটিয়ে সুখেরও শেষ ছিল না। পড়ায় অনুরাগ তাঁর এত বেশীই ছিল যে, কোলে ছোট ছেলে নিয়ে কিংবা দোকানে যাবার পথেও তাঁর পাঠ অভ্যাসের বিরাম হ'ত না।

সততা, পড়ায় অনুরাগ ও দারিদ্র্য মাথায় করে ষোল বৎসর বয়সে তিনি চেয়ে, চিন্তে, ভিক্ষে করে কল্‌কাতায় হাজির হলেন। কল্‌কাতা তাঁর কাছে সমুদ্রের মত বোধ হল। কোথায় যাবেন, কি করবেন কিছুই ঠিক করতে না পেরে একটা রাস্তা ধরে বরাবর গঙ্গার ধারে হাজির হলেন। দেশের নাম, আনন্দপুর, কিন্তু খাওয়ার অভাবে লোকে সেখানে বেশীর ভাগ নিরানন্দেই থাকে।—দেশ থেকে কলকাতা একদিনের পথ, সেই পথ তিনদিনে এসে, চেনা লোক কাকেও দেখ্‌তে না পেয়ে আর আহার, আশ্রয়ের ভাবনাতে তিনি অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। ক্ষুধাও খুব, কিন্তু পয়সা না ফেল্‌লে খাওয়ার যো নাই। এ তিনদিন যা তা' খেয়ে কাটালেও, এখন এই প্রচণ্ড ক্ষুধার সময়, আনন্দপুরের আত্মীয়কে প্রথমবার মনে পড়ল। সেখানে থাক্‌লে তার খাওয়ার জন্যে ভাবতে হত না, এখন সেটা প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যেতে লাগলো—রমাপতি উঠে আঁজলা ভরে জল নিয়ে খেয়ে চোখ, মুখ, মাথা, সব ধুয়ে ফের এসে বস্‌লেন।

তাঁর এই ভাব, কিছুক্ষণ আগে থেকে একজন প্রবীণ লোক লক্ষ্য কর্‌ছিলেন। তাঁকে ফিরে বস্‌তে দেখে তিনি ধীরে এগিয়ে এসে বল্লেন, "তোমার নামটী কি বাবা?"

"শ্রীরমাপতি মিত্র"। বলে রমাপতি লোকটীর দিকে তাকালেন, দেখ্‌লেন স্নেহ-মমতায় কোমল একখানি মুখ, তার জন্যে অসীম করুণা চোখে মুখে ফুটিয়ে তাঁকে সম্বোধন করছেন।

আবার তিনি বল্‌লেন, "এখানে কি পড়া শুনা করা হয়?—"

"আজ্ঞে না—করি না কিছুই।—আজই এখানে এসে পৌছেচি। থাক্‌ব কোথায়, খাব কি এই চিন্তা এখন আমার প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে।—কারণ আমি কর্পদ্দক শূন্য।"

"আমি যদি তোমাকে এই দুটী ভাবনা থেকে মুক্তি দিই, তবে তুমি কি আমার কাছে থাক্‌তে পারবে?"

"নিশ্চয় থাক্‌ব। রমাপতি এত অকৃতজ্ঞ নয় জান্‌বেন।"

"বেশ, তবে আমার সঙ্গে এস।" বলে সেই লোকটী আগে যেতে লাগলেন আর রমাপতি পিছনে পিছনে যেতে লাগ্‌লেন।—গঙ্গার খুব কাছেই তাঁর বাড়ী—ছোট বাড়ী খানিতে লক্ষ্মীশ্রী যেন ফুটে বের হচ্ছিল। কড়া নাড়্‌তেই আর একটী ছেলে এসে দরজা খুলে দিলে। রমাপতি চেয়ে দেখ্‌লেন যে, ছেলেটী তাঁরই বয়সী হয়তো দু'চার বছরের বড়ও হতে পারে। তার দিকে চেয়ে লোকটী বল্‌লেন, "দেখ, পথ থেকে তোমার আর একটী ভাই নিয়ে এলাম। ডেকে নিয়ে যাও।—"

লোকটীর নাম অনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নিজের ছেলে পিলে কিছুই নেই—স্ত্রীও অনেক দিন মারা গিয়েছেন। কিছু টাকাকড়ি ছিল, তা তিনি অনাথ ছেলে-পিলেদের মানুষ করতে খরচ কর্‌ছিলেন। কোনো ছেলেদের মলিন মুখ দেখ্‌লেই তার পরিচয় নেওয়া, তাঁর মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল। এমনি করে কত যে ছেলেকে তিনি মানুষ হবার পথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন তার ঠিক নেই। এখনও কত ছেলে তাঁর আশ্রয়ে নির্ভাবনায় দিন কাটাচ্ছিল। রমাপতিও এই দলে ভর্ত্তি হয়ে গেলেন।

কথায় কথায় অনাথ বাবু রমাপতিকে একেবারেই নিঃস্ব জেনে তাঁর লেখাপড়া বা জীবিকার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন। ষোলো বৎসর বয়স পার হয়ে যাওয়ায়, রমাপতি আবার 'পড়ো' ছেলে হ'তে চাইলেন না। নিজের শক্তির আর মনের জোরের ওপর তাঁর খুব বিশ্বাস থাকায়, তিনি বললেন যে, হাতে-কলমে কাজ শিখে তিনি ঠিকাদার (কনট্রাক্টর) হবেন, এই-ই তাঁর মনের ইচ্ছা। চার পাঁচ দিনের সাহচর্য্যে অনাথবাবু রমাপতির এতটা পক্ষপাতী হয়ে পড়েছিলেন যে, রমাপতির ইচ্ছাতে কোন বাধা না দিয়ে তিনি তার সুব্যবস্থা করে দিলেন।—

প্রথম কাজ করতে রমাপতি হাজারিবাগে এলেন, সেখানের বড় কনট্রাক্টর ক্ষিতিমোহন দে অনাথ বাবুর বিশেষ বন্ধু। তাঁরই অধীনে কাজ করবেন বলে অনাথবাবু রমাপতিকে পাঠালেন, বলে দিলেন ভাগ্য যদি বদলায় তো এই হাজারিবাগেই বদ্‌লাবে। তখন তাঁর তেইশ বছর বয়স। হ'লও তাই—ক্ষিতি মোহন বাবু বছর দুয়েকের মধ্যেই মারা গেলে, ও অঞ্চলে এক রমাপতি ছাড়া কনট্রাকটর কেউ আর থাক্‌লো না। জগমোহন, ক্ষিতি বাবুর একমাত্র ছেলে, বাবার মত রৌদ্রে কুলিমজুর খাটাবেনা বলে কলেজে তখন পড়্‌ছিল। বাবা মারা যেতেই কলেজের পড়া অসমাপ্ত রেখেই, মা, বোন ও স্ত্রী নিয়ে তাকে হাজারিবাগ থেকে সরে পড়্‌তে হল। কারণ অধিকাংশ কনট্রাক্টরের যা হয়, 'যত্র আয় তত্র ব্যয়' হওয়ায়, ক্ষিতি বাবুরও সঞ্চয় কিছুই ছিল না। যখন টাকা ছিল, তখন আত্মীয়েরও অভাব ছিল না, এখন টাকার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মীয়ের ডাল-পালা, সরে গিয়ে অন্য আশ্রয় খুঁজতে গেলেন।

হাজারিবাগে আসার এই দুবছরের মধ্যেই জগমোহনের সঙ্গে রমাপতির খুবই বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাঁর নিজের কেনা একটা ছোট বাংলোতে তিনি জগমোহনকে সপরিবারে আজীবন থাকবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। (কারণ তাঁর বাড়ীটা তখন ভাড়া দিয়ে কিছু আয়ের ব্যবস্থা হচ্ছিল) কিন্তু জগমোহন মৃদু হেসে বলেছিল "বন্ধুর কাছে কখনো ঋণী হতে নেই, বুঝ্‌লে? তা'হলে বন্ধুত্বের মর্য্যাদা থাকে না, তাছাড়া সিংহের বাচ্চা সিংহই হয়, শিয়াল হয় কি?" রমাপতি চুপ করে রইলেন। বন্ধুকে মনক্ষুণ্ণ হতে দেখে তিনি আবার বল্লেন "ভেবোনা,

উপায় যা হয় একটা বের করবই তবে আপাততঃ দেশের বাড়ীতে এঁদের রেখে আসি, তাহলে ঘাড়টা হাল্কা হলে, উপায়টা শীগ্গীরই বের হবে।”—সেই থেকে রমাপতি ও জগমোহনের ছাড়াছাড়ি। হাজারিবাগে বেশ ভাল করে গুছিয়ে বসার পর অনাথবাবু একবার রমাপতিকে ডেকে পাঠান। তিনি সেখানে পৌছাবার দুদিন পরে সন্ন্যাস রোগে অনাথবাবু মারা গেলেন। তাঁর উইলে লেখামত তাঁর সমস্ত ত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থা করে হাজারিবাগে ফির্বার আগে তাঁর মনে হল যেন, জগতের সঙ্গে সকল বন্ধন তাঁর শেষ হয়ে গেল।—এই সময়ে দেশে থাকৃতে যে আত্মীয়ের বাড়ী তিনি ছিলেন, কার কাছে খোঁজ পেয়ে তিনি সঙ্গে একটী পনের বছরের মেয়ে নিয়ে রমাপতিকে দেখ্তে এলেন। মেয়েটীর নাম বল্লেন, শতদল। পরিচয় দিলেন, শালীর মেয়ে বলে। তার পরেই হঠাৎ রমাপতিকে বিয়ে করবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন।

রমাপতি তখন জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও হিতকামী বন্ধু, অনাথবাবুকে হারিয়ে সত্যিই যেন ভেঙে পড়েছিলেন। আপন বল্তে কেহই আর তাঁর তখন ছিলনা। অনেক ভেবে দেখ্লেন যে, বিবাহ তো করতেই হবে কারণ, রোগে, বিপদে তাঁকে দেখ্বার কেউ নেই! আর সংসারী হতে গেলে, প্রধানতঃ যে জিনিসের দরকার অনিবার্য্য, সেই টাকা, এখন তাঁর হাতে যথেষ্ট পরিমাণেই আস্ছে এবং স্বাস্থ্য ভাল থাকলে আরও আসবার আশা আছে, তবে বিয়ে না করবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আর কিছুই নেই।

দু চারদিন ধরে ভেবে তিনি তাঁর সেই আত্মীয়কে বিয়ের সম্মতি জানিয়ে দিয়ে যেন দায়মুক্ত হলেন। তারপরে এক শুভদিনে, (হাঁ শুভ দিনই বটে, কারণ শতদল ঘরে গিয়ে পর্য্যন্ত তাঁকে অর্থ কষ্ট কোন দিনই পেতে হয় নি) শতদলকে তাঁর হাতে দিয়ে পাথেয় এবং সাহায্য স্বরূপ কিছু টাকা নিয়ে শতদলের ‘মেসো’ সেই যে পিছন ফির্লেন আর কোন দিন তাঁদের খবর নিলেন না।

শতদল চিরকাল পরের আশ্রয়ে এবং অনুগ্রহে থেকে থেকে দুঃখ বা আনন্দকে খুব সহজ ভাবেই নিতে শিখেছিলেন। বেশী দুঃখেও ভেঙে পড়তেন না, আনন্দেও অধীর হয়ে উঠতেন না। তাই হাজারিবাগে নিয়ে গিয়ে রমাপতি যখন তাঁর বাড়ীর প্রত্যেকটী কোণা পর্য্যন্ত দেখিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেসা করছিলেন, “বাড়ী, ঘর, লোকজন ও আমাকে তোমায় পছন্দ হয়েছে তো? তুমি খুসী হয়েছ তো?”

উত্তরে শতদল মুখে কিছু বল্তে পারেন নি বটে, কিন্তু মনের দর্পণ মুখে, তাঁর যে ছবি ফুটে উঠেছিল, রমাপতি তা দেখ্তে পেয়েছিলেন, পেয়ে তাতেই তিনি পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। শতদলের মুখে ভালবাসা জানাবার ভাষা ছিল না, কিন্তু দু'টী ছন্নছাড়া জীবন যে এক আগ্রহ, এক লক্ষ্য নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল সে শুধু তাঁর মধুর স্বভাবে। বিয়ের পর পঁয়ত্রিশ বছর এক নিয়মে একই জনের কর্ত্তৃত্বে রমাপতির সংসার চলে আসছে, কোথাও একটু বিশৃঙ্খলা হয়নি

মেয়ের বিয়ে দিয়ে এবং ছেলেদের নিয়ে সংসার করা বোধ হয় রমাপতির ভাগ্যে ছিল না, তাই মীনার বিয়ের ছয় মাস পরে সন্ন্যাস রোগে তিনি মারা গেলেন। মরবার সময় কোনো কথাই স্পষ্ট করে বল্তে পারলেন না। হঠাৎ মৃত্যু, তাঁর মনের সকল ইচ্ছাকে অপ্রকাশিত রেখে দিল।

শুভ্রাংশুর টেলিগ্রাফে প্রভাত যখন এই খবর পেলে, তখন সবার আগে তার মনে হল, মীনার চতুর্থী-শ্রাদ্ধের আর দেরী নেই। তার বাবাকেও সে একখানা জবাবী ‘তার’ করে জানতে চাইলে, মীনা কি করবে?—’

জবাবে জগমোহন লিখ্লেন, মীনা যে ভাবে পিতৃশ্রাদ্ধ করতে ইচ্ছা করবে, সেই ভাবেই তাকে করানো হয় যেন। প্রভাত টেলিগ্রামের উত্তর পেয়েই কিছু টাকার ব্যবস্থা করে আফিসে ‘ক্যাজুয়েল লিভের’ একটা দরখাস্ত লিখে দিয়ে সাহেবের কাছে সোজাসুজি ব্যাপারটা বলে তিনদিনের ছুটী চাইলে।

প্রভাতের ভাগ্যক্রমে ‘সাহেবটী’ সহৃদয় ও সদাশয় ছিলেন। মন দিয়ে শুনে ব্যাপার বুঝে তার কাজ নিজের হাতে নিয়ে তার তিনদিনের ছুটী মঞ্জুর করলেন। কিন্তু কথা রইলো তিনদিন পরে ফিরে এসে ‘ওভারটাইম’ খেটে এ তিনদিনের কামাই পুরিয়ে দিতে হবে। প্রভাত তাতেই রাজী হয়ে, যাওয়ার উদ্যোগ করবার জন্যে বেরিয়ে গেল।

রাত্রের গাড়ীতে হাজারিবাগ,' 'বার্থে,' শুয়ে প্রভাত কত কিই যে ভাব্‌ছিল,'—দোলের ছুটীর পরে ফিরে এসে সে আর হাজারিবাগে আসতে পারে নি। মন অনেক সময় চঞ্চল হয়ে ছুটে যেতে চাইলেও, যাওয়ার সুবিধা কিছুতেই হয়ে ওঠেনি। মীনার সেই হাসিমুখের বদলে এখন শোকের এই কালোছায়ার সামনে যেতে তার ভয় হচ্ছিল। প্রায় দুমাস মীনার সঙ্গে দেখা নাই। এখন শোককে সামনে রেখে কি ভাবেই যে দেখা-শুনা হবে সে ভাবনাটাও তার কম ছিল না। হঠাৎ মনে হল, এখন মীনার অশৌচ। হয়তো মোটেই দেখা হবেনা—এ কথাটা তার মনে একদিক দিয়ে স্বস্তি দিলেও আর এদিকে অস্বস্তি দিতে লাগ্‌ল। এই সব নানারকম ভাব্‌তে ভাব্‌তে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুম ভেঙে দেখ্‌লে 'নিমিয়াঘাট' ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়িয়ে। আর ঘুমোন ঠিক হবেনা, কারণ একটু পরেই হাজারিবাগ; এই ভেবে সঙ্গের স্যুটকেসটী পাশে রেখে দিয়ে সে উঠে বস্‌লো। একটু পরেই হাজারিবাগে এসে গাড়ী থাম্‌লো।

আগে খবর দেওয়া ছিল না বলে প্রভাত মোটর বাসে করে প্রায় দেড়টার সময় শ্বশুরবাড়ী পৌছল। নেমে বাড়ীর ভেতর ঢুক্‌তে তার পা দুটো কেঁপে উঠ্‌লো—দেখ্‌লে সারা বাড়ীর ওপর দিয়ে যেন একটা ভীষণ ঝড় বয়ে গেছে।

গেট্‌ খুলে ভিতরে ঢুক্‌তেই রমাপতির প্রিয় কুকুরটা ডেকে উঠ্‌লো—তার ডাকে ঘর থেকে হীরা সিং বেরিয়ে এসে প্রভাতকে দেখে বিষণ্ণমুখে এগিয়ে এসে তাকে একটা সেলাম ঠুকে স্যুট কেসটা হাত থেকে নিলে। তারপর বল্‌লে, "রামজীর ইচ্ছা, দেব্‌তার মত মনিব আমার এক লহমায় চলে গেলেন। যত সব ডাগদর সব নিয়ে এলাম, সকলেই এক কথা বল্‌লে—রামজীর ইচ্ছা।" বুড়ো দারোয়ান জামার হাতায় চোখ দুটো মুছে নিলে।

ভিতর দিকে একটা জান্‌লা খোলার শব্দ হল—কে জিজ্ঞাসা করলে, "কার সাথে কথা বল্‌চ হীরা সিং?"

"জী হুজুর, জামাইবাবু।" জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল। একটা অস্পষ্ট কান্নার শব্দ প্রভাতের কানে ভেসে এল—একটু পরেই খালি পায়ে, থান্‌ পরা, কাচা গলায় শুভ্রাংশু বিষণ্ণমুখে সেখানে এসে দাঁড়ালেন। বড়শ্যালার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থেকেও প্রভাত যেন মুখ তুল্‌তে পার্‌ছিল না—এই গভীর শোকে কি সান্ত্বনা সে দেয়! একেই তো এসব সামাজিকতা তার আদৌ আসে না, তার ওপর এদের সঙ্গে একটু চেনা-শোনা হতে না হতেই এই বিপদ! শুভ্রাংশুর সঙ্গে আলাপ করাটা খুবই সমীচীন বলে মনে হলেও, মুখ দিয়ে তার একটা কথাও বেরোল্‌ না।

একটু পরে শুভ্রাংশু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তার' কখন্‌ পেয়েছিলে?—"

নতমুখে প্রভাত বললে, "কাল দুপুরে, তার পেয়ে ছুটী মঞ্জুর করিয়েই বেরিয়ে পড়েছি। হঠাৎ এরকম হল! আগের বারে এসে দেখে গেলাম, স্বাস্থ্য তখন তো বিশেষ খারাপ বলে বোধ হয় নি!"

বিষাদ ভরা স্বরে শুধাংশু বল্‌লেন "হ্যাঁ—ভাই, হঠাৎই হ'ল পরশু এমন সময়েও তিনি কাজ কর্ম্ম করেছেন, বিকেল বেলাতে মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা হওয়াতে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে আসেন, তারপরে এ্যাপোপ্লেকিসর যা নিয়ম—বল্‌বার, কইবার অবসর না দিয়েই প্রাণত্যাগ! এতটা বয়েস হল, কখনও কিছু হাতে করে করিনি—পর্ব্বতের আড়ালে ছিলাম—কি করে যে দায়মুক্ত হব, সেই আমার ভাবনা।"

এইবার প্রভাতের কথা ফুট্‌লো, বল্‌লে, "কোন ভয় বা ভাবনা নেই দাদা! কাজ যাঁর তিনিই কর্‌বেন—আপনি তো উপলক্ষ্য!—"

কপালে হাত ঠেকিয়ে সবিষাদে তিনি বল্‌লেন, "কি জানি! এস, তোমার বিশ্রামের একটু ব্যবস্থা করে দিই। হীরা সিং, জামাই বাবুর জন্যে তুমি কিছু রসুই কর।" বলে তিনি অগ্রসর হলেন—পিছনে যেতে যেতে প্রভাত যেন দ্বিধার সঙ্গে বল্‌লে, "একেবারে মা'র সঙ্গে দেখাটা করে নিলে হ'ত না?—"

"হ্যাঁ—মার কাছেই তো যাচ্ছি।" যে ঘরে প্রভাতকে নিয়ে শুভ্রাংশু হাজির হলেন, সে ঘরখানা বাড়ীর এক নির্জ্জন প্রান্তে। মাটীতে কম্বলের বিছানায় শতদল শুয়ে ছিলেন আর তাঁর পাশে মলিনা বসে ছিল—আরও কেউ যে এ ঘরে ছিল তা অন্য পাশের খোলা মহাভারতটা

দেখেই বুঝা যাচ্ছিল। প্রভাত ঘরে ঢুকেই একেবারে শতদলের পায়ের কাছে বস্‌ল। শাশুড়ীর এই দীনা মূর্ত্তি দেখে, তারও মনের ভিতর যেন কেঁদে উঠ্‌ছিল। শতদল একবার ফুঁপিয়ে উঠেই একেবারে স্থির হয়ে গেলেন। কাঁদ্‌বার ক্ষমতাটুকুও তাঁর রমাপতি যেন নিঃশেষ করে নিয়ে গেছেন। ঘরের আর ক'টী প্রাণীর চোখে, তখন জলের বিরাম ছিল না। একটু পরেই শুভ্রাংশু ইসারা করে প্রভাতকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় প্রভাতের খাওয়ার কি ব্যবস্থা তিনি করেছেন তা-ও মলিনার কাণে কাণে জানিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যার একটু আগে খেয়ে প্রভাতের আর যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। রাত্রের জলযোগ সেরে, শুভ্রাংশু তাকে নিয়ে নিজের ঘরে শুলেন। সেইখানেই প্রভাত, মীনা যে চতুর্থী শ্রাদ্ধ করবে, তার সব জোগাড় করে দেওয়ার জন্য শুভ্রাংশুকে বল্‌লেন। তিনি সকালে সব ঠিক করে দেবেন বল্‌লেন।

পরদিন প্রভাতের ও শুভ্রাংশুর চেষ্টায় মীনা রমাপতির বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ কর্‌লে। নিমন্ত্রিত লোকদের খাওয়ার ব্যাপারটাও সুশৃঙ্খলায় হয়ে গেল। সেই দিন মীনা প্রভাতের কাছে এল—তারপর দিন তার যাওয়ার কথা।

প্রভাতের বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ কর্‌তে লাগল, এই শোকার্ত্তা তরুণীকে সে কি বলে সান্ত্বনা দেবে?—বল্‌তে তার ইচ্ছা হচ্ছিল, অনেক কথাই, কিন্তু কথাগুলো তার নিজের কানেই কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেক্‌ছিল

মীনা ঘরে এসেই প্রভাতকে দেখবামাত্রই কেঁদে ফেল্‌লে। প্রভাত ধীরে ধীরে তার পাশে বসে, তার মাথাটা কোলের উপর টেনে নিলে। মীনা সহানুভূতির স্পর্শ পেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো—তার মাথায়, পিঠে হাত বুলোনো ছাড়া প্রভাত একটী কথাও তাকে বল্‌তে পার্‌লো না। কেঁদে কেঁদে মীনা শান্ত হল। তখন প্রভাত বললে, "আমার 'মা' নাই, তোমার 'বাবা' নাই। তোমার মা ও আমার বাবাকে আমরা ভাগ করে নেব। তুমি তো অবুঝ না, তোমাকে বোঝাব আর কি? ভেবে দেখ, এ তো প্রতি ঘরে, প্রতি মুহূর্ত্তে হয়ে যাচ্ছে। তাঁর সময় হয়েছিল, তিনি গেলেন বটে, কিন্তু কত অসমাপ্ত কাজ তাঁর পড়ে রইলো। মাকে দেখা এখন আমাদের একটা প্রধান কাজ।—"

"মাকে যে এমন করে আমি আর দেখ্‌তে পারছিনে।"

"কিন্তু দেখ্‌তেই যে হবে মীন—তুমি তাঁর মেয়ে—তাঁর এ ব্যথা তুমি খুব সহজেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। যে ক'দিন বাবা তোমাকে না নিয়ে যাচ্ছেন, সে ক'দিন তুমি মাকে দেখ।" বাবার কথা মনে হওয়াতে মীণার চোখ দুটী ছলছলিয়ে এল। প্রভাত তা দেখ্‌তে পেয়ে, চোখ দুটীতে একে একে চুমো দিয়ে বল্‌লে "না, মীণু, তুমি অত ভেঙে পড়্‌লে চল্‌বে না তো? আজ যদি আমিও মরে যাই তো তুমি কি কর?"

সভয়ে দু'হাত দিয়ে প্রভাতকে জড়িয়ে ধরে মীনা বল্‌লে "না, না, ওকি কথা? অমন অলক্ষুণে কথা কেন বল্‌লে? আচ্ছা, আর আমি কাঁদ্‌ব না।"

মীনার আলিঙ্গন আরও দৃঢ় করে প্রভাত বল্‌লে, "কিছু ভয় পেওনা—আমি কথার কথা বল্‌ছি বলে সত্যি আজ কিছু আমি মর্‌ছিনে।—"

"না, না, ও কথাটা তুমি আর বলোনা। ওটা আমার কাণে বিষম বাজ্‌ছে।"

একটু হেসে প্রভাত বল্‌লে, "কিন্তু জগতে এইটাই সত্যি কথা। না? চল, তুমি বড় ক্লান্ত হয়েছ—আজ—শুয়ে পড়া যাক্‌গে।"—

পরদিন সন্ধ্যায় যাওয়ার আগে প্রভাত মীনাকে ডেকে পাঠালে। সে এলে নিজের শরীরের ওপর দৃষ্টি রেখে, মাকে দেখ্‌বার কথা বার বার বল্‌লে। যেতেই হবে, ছুটী নাই। না হলে যেতে প্রভাতের একটুও ইচ্ছা ছিল না। দেরী করে করে সময় যখন আসন্ন হয়ে এল, তখন সে মীনার মুখখানা দু'হাতে চেপে ধরে অনেকখানি আদর ঢেলে দিয়ে চলে যেতে যেতে বল্‌লে, "ভাল থেক মীনা—তুমি ভাল থাক্‌লে আমিও ভাল থাক্‌ব।"

এত বড় শোকের পরে স্বামীকে একদিনের জন্যে কাছে পেয়ে মীনার মন অনেকটা স্থির হয়ে এসেছিল—তারও প্রভাতকে এত শীঘ্র ছাড়্‌তে ইচ্ছা হচ্ছিল না—কিন্তু পরের চাকরী; তা ছাড়া আবার হয়তো আস্‌তে হবে—শ্রাদ্ধের সময়। এই রকম সাত পাঁচ ভেবে মীনা স্বামীর এই চলে যাওয়া ব্যাপারটাকে খুব হাল্‌কা ভাবে নিতে চাইলে—কিন্তু মন হাল্‌কা হলনা। তার মুদিত চিত্ত কমল, প্রভাতের আদর স্পর্শে তখন সবেমাত্র দল মেল্‌তে আরম্ভ করেছে।

(৪)

রমাপতির শ্রাদ্ধের আর আট দিন বাকী আছে। শুভ্রাংশু দু চার দিন থেকেই ভাবছিলেন যে, শ্রাদ্ধটা একটু বিশেষ রকম ঘটা করেই করবেন। পরামর্শই বা কার সঙ্গে করবেন—উপদেশই বা কে দিবে? এখন পিতার অবর্ত্তমানে যিনি তাঁর মত হয়ে তাঁকে উপদেশ বা উপায় বলে দিতে পারেন, এমন লোক এক শতদল ছাড়া আর তো কেউই নেই। মীনু তো নেহাৎ ছেলে মানুষ, কোনো কথা বলবার আগেই সে কেঁদে ভাসায়; তার সাথে পরামর্শ চলে না—সুধাংশু, হিমাংশু তো খুবই ছোট—কি বিপদ যে হয়েছে, তা ভাল করে বুঝবার ক্ষমতা তাদের হয় নি। শুধু রমাপতি মারা গেলেন, তাঁকে শ্মশানে নিয়ে গেল, তাঁকে আর দেখতে পাওয়া যাবে না কোনদিন, এইটুকুই তারা বুঝলে—তার পরের ভাবনাগুলো বড়দার ঘাড়ে চাপিয়ে তারা আগের মতই খেলা করে বেড়াতে লাগল।

হবিষ্যি সেরে শুভ্রাংশু ঠিক করলেন, আজই দুপুরে যেমন করে হোক্ মায়ের কাছে কথাটা পাড়বেন। কষ্ট হবে, কিন্তু হলেই বা কি করা যাবে? যে কষ্ট হয়েছে, তার চেয়ে বেশী তো হবে না। বাবার সঙ্গে একপথে চলে তাঁর মতামত তিনি যতদূর জানতে ও বুঝতে পেরেছেন এত আর কে পেরেছে? এ কাজে তাঁকে পরামর্শ দিতেই হবে। এই রকম ভাবতে শুভ্রাংশু মায়ের ঘরটায় উঁকি দিয়ে দেখে গেলেন, মা শুয়ে আছেন কিনা—দেখলেন কেউই নেই—কম্বলটা পাতা রয়েছে, পাশে একখানা মহাভারত, পরমহংস দেবের কথামৃত দু'খানা, আর একটা ঘটী। দেখে শুভ্রাংশু ফিরে আবার বাইরে চলে গেলেন।—

প্রায় ঘণ্টা দুই পরে, হাতে কতকগুলি লম্বা সরু সরু কাগজের ফালি একটা ফাউণ্টেন পেন ও একখানা ব্যাঙ্কের খাতা নিয়ে শুভ্রাংশু আবার সেই ঘরের দরজায় এলেন। দেখলেন, মীনা মহাভারতের 'শান্তি পর্ব্ব' পড়ছে, আর মলিনা মাথার কাছে বসে শতদলের রুক্ষ চুলগুলোর জটা ভেঙে দিচ্ছে। একটু ইতস্তত: করে তিনি মীনাকে ডাকলেন।

মহাভারতটা বন্ধ করে মীনা বাইরে এল। দু ভাই-বোনে অনেকক্ষণ ধরে কি কথা হ'বার পরে মীনু হঠাৎ ঘরে ঢুকে বললে, "মা, বড়দা একবার এখানে আসতে চায় তার কি দরকার আছে তোমার কাছে।"

শুনে শতদল মৃদুস্বরে বললেন, "আসবে আসুক। তার আবার জিজ্ঞাসা কি?" মীনা ইসারা করতেই শুভ্রাংশু ঘরে ঢুকে এলেন। মায়ের কম্বলের এক ধারে বসে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে শুভ্রাংশুর মনের ভিতর কান্না গুমরে উঠলো—শুধু অস্পষ্ট স্বরে বল্লেন "মা!" তাঁর কান্না আর বাধা মানতে চাইছিল না।

উপযুক্ত ছেলের এই অসহায় ডাকে, শতদল শুধু "বাবা" ছাড়া আর কিছুই বলতে পারলেন না। রমাপতির বিদায়ের পরে ছেলের সঙ্গে তাঁর এই প্রথম সাক্ষাৎ! শুভ্রাংশু এসেছেন, বসেছেন, সমস্ত খুঁটি-নাটি খবর নিয়েছেন, কিন্তু সবই শতদলের অসাক্ষাতে, অজ্ঞাতে। শতদলও শুভ্রাংশুর সমস্ত খবর পড়ে থেকেও নিয়েছেন। আজ শুভ্রাংশু সরাসরি তাঁর কাছে এসে বসতে তাঁর যেন বৈধব্যের প্রথম দিনের মতই যন্ত্রণা বোধ হচ্ছিল। অনেকক্ষণ কেঁদে দুজনে শান্ত হলেন—কেউ কাউকে থামাবার চেষ্টাও করলেন না। চোখ মুছে, গলা ঝেড়ে নিয়ে শুভ্রাংশুই আগে কথা বল্লেন। "মা, তুমি যদি এ বিপদে আমাকে বুদ্ধি না দেও, তবে আমি কার মুখ চাইব? কি করে আমি এ দায় থেকে মুক্ত হব, তুমি বলে দেও মা।"

রাঙা চোখ দুটো তুলে শতদল বল্লেন, "তোরাই বল্ না বাবা, আমি কি করি।"

"ও কথা বল্লে হবে না তো মা—কাঁদবার দিন আমরা তো অনেক পাব। বাবার পারলৌকিক কাজের এতটুকু অঙ্গহানিও আমার সইবেনা মা—তুমি শুধু বলে দেও কি করতে হবে। তাঁরই টাকায় তাঁর কাজ করব, এত বড় অযোগ্য সন্তান আমি! আমাদের সুখ বা তৃপ্তির জন্যে তিনি তো কম ব্যবস্থা করে যাননি! তাঁর তৃপ্তি কিসে হবে তাই শুধু তুমি বলে দেও।"

"তুই বল্ বাবা, কি করবি? আমি শুনি—আমার হাত পা যে সরছে না—আমার বল, বুদ্ধি, ভরসা সবই চলে গিয়েছে। না হ'স তুই এমনি শুকনো

মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্, আর আমি তা চুপ করে দেখ্‌ছি! কথাটাও আমার আর যোগায় না রে!"

"মা, আমাদের তো কোনো হাত নেই। এ ভগবানের মার, মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া কোনো উপায় নেই মা। সুধা, হিমু ওরাও তোমার কাছে আস্‌তেই সাহস পায় না—তুমি এত ভেঙে পড়্‌লে, আমরা কোথায় যাই?"

"তাই তো মলিনা মা, ওদের একবার ডাকো তো। বাছাদের কতদিন দেখিনি আমি! তাই তো, আমাকে উঠ্‌তেই হবে ঝেড়ে।" মীনা এ সব আলোচনা আরম্ভ হতেই পালিয়েছিল, মলিনাও এখন সুধাংশু, হিমাংশুকে ডাক্‌তে উঠে গেল। গায়ের ওপর যে চাদরটা দেওয়া ছিল, সেটাকে সরিয়ে দিয়ে শতদল উঠে বসে বল্‌লেন, "তুই কি কর্‌বি মনে করেছিস্ খোকা? বেশী আড়ম্বরে দরকার কি বাবা? তিনি গরীব, গরীবের বন্ধু ছিলেন। বেশী আড়ম্বর করে সে টাকাগুলো ব্রাহ্মণদের পেটে না দিয়ে, দরিদ্র-নারায়ণের ভোগ দিস্।"

শুভ্রাংশু একটু কি যেন ভাব্‌লেন, পরে বল্‌লেন "মা, এইখানে তোমার সঙ্গে আমার মিল্‌লো না মা! বাবার শ্রাদ্ধ বারে বারে কি ভাবে করে উঠ্‌তে পারব জানিনে! কিন্তু এই প্রথম বারের কাজটায় আমি একটু আড়ম্বরেই কর্‌তে চাচ্ছি মা! আর কাঙালী বিদায় তো হবেই—"

বাধা দিয়ে শতদল, বল্লেন "বিদায় নয় বাবা! কাঙালী-ভোজন! এই সব গরীবেরা দু'বেলা পেট পূরে হয়তো ভাত খেতেও পায় না—ভাত, তরকারী রেঁধে এদের বসিয়ে খাইয়ে দিতে হবে। তাতে যদি কিছু এধারে কম কর্‌তে হয় তো তাও ভাল।"

"আচ্ছা, মা, তাই হবে। আর আমার বৃষোৎসর্গ, ওদের দুভায়ের ষোড়শ হবে এটা স্থির। দেশের থেকে কি পুরুত আনাবো না এখানের পুরুতেই হবে?"

"দেশে আমাদের কিছু নেই বাবা? আর বারমাসই এ দেশের পুরুতে ষষ্ঠী, মাকাল-পূজো করলে, এখন, এ ব্যাপারে, দেশ থেকে পুরুত আনালে এঁরাও মনক্ষুণ্ণ হবেন। বাবা, তুই বেশী হাঙ্গামা করিস্‌নে—কে এসব ঝঞ্ঝাট পোহাবে? মীনু, বৌমা দুজনেই ছেলেমানুষ, বিশেষ বৌমার এখন বেশী পরিশ্রম করা উচিত নয়—কি হিতে বিপরীত হবে শেষে! আর তো তিনি নেই যে সব ভাবনা মাথায় করে তুলে নেবেন!"

শুভ্রাংশু মাথাটা একটু নীচু করে কি ভাব্‌লেন, বল্‌লেন, "বেশী পরিশ্রম না হোক্ একটু একটু কর্‌তে হবে বৈকি মা। আর তুমি যদি বল তবে না-হয় আমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণীকে আস্‌তে বল্‌তে পারি। দু' এক দিনের মধ্যেই আমাকে তো একবার কল্‌কাতা যেতে হবে, জিনিস-পত্তর কিন্‌তে রিষ্‌ড়ে থেকে ঐ সময় তাঁকে সঙ্গে করে আন্‌তেও পারি। আর না হলে লোক তো কাউকে দেখি নে।"

"তাই যা হয় কর্ বাবা। আর দেশে মাসীমাকে আস্‌বার জন্য একখানা চিঠি লিখে দিস্। তিনি বুড়ো মানুষ, এলে বেয়ানে আর তাতে মিলে তাও খানিকটা সুবিধা হবে। না হ'লে মীনু আর বৌমা কি পারে? আমার যে হাত পা একেবারেই ভেঙে গেছে।"

শুভ্রাংশু দরজার দিকে চেয়ে দেখ্‌লেন, সুধাংশু, হিমাংশু দরজার পাশ থেকে উঁকি দিচ্ছে—দেখে একটু বিষাদের হাসি হেসে বল্‌লেন, "দেখ মা, সুধা, হিমু দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে—ঘরে আস্‌তে পারছে না—তুমি ওদের ডাক মা।"

শতদলের চোখে দুফোঁটা জল এসে পড়লো—ভাব্‌লেন আজ ওদের চেয়ে অসহায় বুঝি আর কেউ নেই! পিতৃহীন তো ওরা হয়েছেই—মাতৃহীনও বুঝি সঙ্গে সঙ্গেই হয়েছে, না হলে এই সব দুধের ছেলে ফেলে আজ ২০।২২ দিন তিনি কি করে আছেন? ওরাও বোধহয় ভেবেছে, ওদের 'মা' নেই—না হলে এসে ভয়ে ভয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে কেন?" বাঁ-হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের জলটা মুছে ফেলে তিনি ঘরের বাইরে এসে দুই ছেলেকে কাছে টেনে নিলেন।

মায়ের এই নতুন বেশ, ময়লা কাপড়, শাদা হাত, রুক্ষ মাথা যেন তাদের মনে নিচ্ছিল না—হিমাংশু বার বার মায়ের মুখের দিকে চেয়ে কি যেন দেখ্‌তে লাগল। দুজনের হাত ধরে শতদল ঘরের ভেতরে নিয়ে গিয়ে তাঁর

বিছানার ওপর বসালেন। তারপর বললেন, "তোমরা আর বিকেলে বেড়াতে যাও না? খেলা কর না?"

সুধাংশু বললে, "কেউ আর আমাদের বেড়াতে নিয়ে যায় না, তাই আমরা দুজনে বাড়ীতে একা-একাই খেলি।"

"বিকেলে তোরা কি খেয়েছিস্? না খেয়ে থাকিস্ তো যা বৌদির কাছে খেয়ে আয়"

"আমরা খেয়েছি। এখানে আসবার আগে বৌদি আমাদের দুধ, মিষ্টি দিয়েছেন।"

"তবে যা এখন বাইরে খেলা কর্‌গে। সন্ধ্যে বেলা আবার আসিস্ আমার কাছে।"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সুধাংশু, হিমাংশু চলে গেল। সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে দেখে শুভ্রাংশু উঠতে বললেন "যাই আমিও; মীনুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাল তাহলে কল্‌কাতা যাব আর্ ফির্‌বার সময় রিষ্‌ড়ে থেকে ওঁকে আন্‌ব তো? হীরা সিং থাক্‌বে আর দয়াল বাবু-দেরও বলে যাব, তিন চার দিন পরেই আবার ফির্‌ব। আঃ! এ সময়ে যতীটা থাক্‌লে যে কী সুবিধেই হ'ত! আচ্ছা, এক কাজ কর্‌লে হয় না? কাগজে কাগজে বাবার মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে, যতীকে ফিরে আসবার জন্যে একটা বিজ্ঞাপন দিই। আমার বিশ্বাস, যদি সে বেঁচে থাকে, তবে, এ বিজ্ঞাপন দেখ্‌লে নিশ্চয় আস্‌বে।"

যতীর কথা যে শতদলেরও মনে হয় নি তা নয়, কিন্তু খবর তার কেমন করে পাওয়া যাবে, সেইটাই তাঁর মাথায় আস্‌ছিল না। এখন শুভ্রাংশুর এই কথায়, তিনি কাঙালের মত বলে উঠ্‌লেন, "তাই দে বাবা, আহা! মনে কী দুঃখ নিয়েই যে দেশান্তরী হ'ল! আমারও বিশ্বাস, এ খবর জান্‌তে পারলে সে কখনো স্থির হয়ে থাক্‌তে পার্‌বে না। ভগবান্ যদি যতীকে মিলিয়ে দেন, তবে তোর পাশে সে থাক্‌লে আমার কোনো ভাব্‌না থাক্‌বে না। ওরে সে যে সব পারে। মীনুর বিয়ের সময় কি খাটুনীটাই না খেটেছিল সে!"

"তবে তাই করিগে।" বলে শুভ্রাংশু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

অবশ হয়ে শতদল বিছানায় লুটিয়ে পড়লেন। চোখ দিয়ে অবিশ্রান্ত জল পড়্‌তে লাগ্‌ল। ভাব্‌লেন যাঁর সুখ, সুবিধায় সামান্য ত্রুটীও তাঁর সহ্য হ'তনা, আজ বাইশ দিন তাঁর সম্বন্ধে যাবতীয় ভাবনা, চিন্তা, বিদায় দিয়ে তিনি কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছেন! ভগবানের এ কি বিধান! সংসারে এনে, একজনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জীবনটা গেঁথে দিয়ে তার পরে অতর্কিতে কি করে যে পরম প্রিয় সাথীটীকে তুলে নিয়ে জোড় ভেঙে বিজোড়া করে চলার পথ থামিয়ে দেন, তা তিনিই জানেন। এত স্নেহ, ভালবাসা, যত্ন, আদর, কিছুই কি আর বাকী থাকে না? একেবারেই সব শেষ হয়ে যায়? আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে স্বর্গে মর্ত্ত্যে কোথাও আর তাঁকে দেখা যাবে না—না স্বপ্নে, না জাগরণে; এই চিন্তাই যে বড় যন্ত্রণার, বড় দুঃখের, বড় হতাশার। আর যে ক'দিন বাঁচা, সে শুধু স্মৃতি নিয়েই বেঁচে থাকা। যখন সুখের দিন আসে, তখন স্মৃতির কথা আমাদের মনেও আসে না—কিন্তু যখন দুঃখের ভারে মন নুয়ে পড়ে, সুখের আলো কিছু দেখা যায় না, তখন স্মৃতিগুলো কিন্তু ঠিক সময়েই, আপনা থেকেই মনে আসা-যাওয়া করে, তাই তারা এত অমূল্য, এত অপূর্ব্ব, এত সুন্দর, এত মধুর? মন যখন বিরাম চায়, যখন নিজের মাঝে শামুকের খোলায় লুকিয়ে থাকার মত, নিজেকে লুকিয়ে রাখ্‌তে চায়, সংসার তখনও তার দাবী, পাওনা কর্‌তে ছাড়ে না। দেহটাকে কোনমতে টেনে বেড়াতে হয়, তাঁর ফেলে-যাওয়া প্রিয় জিনিসগুলি গুছিয়ে রাখ্‌তে হয়, অসমাপ্ত কাজগুলি শেষ করার ব্যবস্থা করতে হয়—না হলে, শুভ্রাংশু যখন অসহায় হয়ে পরামর্শ নিতে তাঁরই কাছে ছুটে এল, তিনি তো কই তাকে ফেরাতে পার্‌লেন না! চোখের জল, আপনিই আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—ঘরে আলো জাল্‌তে মীনা এসে ঢুক্‌লো।

আলো জ্বালার মৃদু শব্দেই শতদল চোখ খুলে চাইলেন, দেখলেন, আলো জ্বেলে দিয়ে জান্‌লার একটা গরাদ ধরে মীনা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে কাছে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তোর শ্বশুরের, প্রভাতের, সব চিঠি পেয়েছিস্? কেমন আছেন তাঁরা?

"ভালই আছেন?"

"প্রভাত কবে আস্‌তে পার্‌বে কিছু লিখেছে কি? খোকা যে বড় ছেলেমানুষ! আমি যত দূর বুঝ্‌তে পার্‌ছি, সে একটা বৃহৎ কাজে নাম্‌তে চাচ্ছে—এই সময়ে



পল্লী দৃশ্য

লোকের সাহায্য যে বড্ড বেশী দরকার! সবার আগে আজ আমার যতীকেই মনে পড়ছে। তার মত খাট্‌বার ক্ষমতা, খাট্‌বার ইচ্ছা, আগ্রহ আমি আর দেখিনি বল্‌লেই চলে। মা, তোর কি যতীকে মনে পড়ে না রে?

হাঁ মা, পড়ে বই কি। কেন যে যতীদা গেল, বাবাকে শেষ একবার দেখ্‌তেও পেলে না। আমার মনে হয় সে কোথাও কাছাকাছিই লুকিয়ে আছে।"

কপালে হাত ঠেকিয়ে শতদল বল্লেন, "হবেও না। সে যে বড্ড অভিমানী।"

এমন সময়ে মলিনা ঘরে ঢুকে মীনার কাণে কাণে কি কথা বলাতে সে বেরিয়ে গেলে, তার জায়গায় মলিনা বস্‌ল। শতদল ধীরে ধীরে উঠে বস্‌লেন। মলিনার কথাটা তাঁর দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বল্লেন, "আহা, চুলগুলোতে যে জটা ধরে গেল, হাত দিয়েও কি ছাড়াতে পারিস্‌নে মা। কবে যে আমি আবার উঠ্‌ব, তা জানিনে। আমার পাগ্‌লা ছেলের কথা শুনে তুমিও যেন বেশী পরিশ্রম করো না। মীনু তো আছে, যা করবার ওকে দিয়েই করিয়ো। এই বিপদের সময় আবার তোমার যদি কিছু হয়, তবে আর আমি বাঁচ্‌ব না। আমি তো বেশী খাটি নে। যা করি মীনুকেও ডেকে নিই।"

"আর এতদিন যদি চালালে, তবে আর দু' দশ দিনও চালিয়ে দেও। তারপরে সবই ঠিক হবে, কেবল যে মহাপ্রাণ চলে গেল, তাই গেল। আমার আর আমার ভবিষ্যৎ বংশধর, আসছে, তার জন্যে কত আনন্দ কর্‌বো, কত কল্যাণ কামনা কর্‌ব তা না সব সাধে বাদ সেধে এই অকূল দুঃখ সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে তিনি সরে পড়্‌লেন। শুনেই গেলেন দেখা আর, এ জন্মে হ'ল না।" শতদলের চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল। মলিনা কি বল্‌বে ভেবে না পেয়ে মাথা নীচু করে বসেই রইলো।

মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে মীনা দেখ্‌লে, শুভ্রাংশু সেখানে পায়চারী কর্‌ছেন।

তাকে আসতে দেখে তিনি বল্‌লেন "মীনা যতী এসেছে।"

"কই, কোথায়?" বলে মীনা অস্থির হয়ে উঠ্‌লো। "মা যে তারই কথা আজ কত বলছিলেন। কোথায় ছিল, কি করে শুন্‌লো!"

"ছিল এলাহাবাদে। সেখান থেকে কি দ[illegible]বে কাশী আসে। সেখান থেকে এখানে আস্‌বার জন্যে বোধ হয়, তারপরে একেবারে ষ্টেশনে এসে সব শোনে। তখন বরাবর এখানে চলে এসেছে—মার ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে গিয়ে দেখি ওরা সিং কার সঙ্গে কথা বল্‌ছে দেখে কিছু না জিজ্ঞাসা করেই ঘরে গেলাম, একটু পরেই দেখি যতী ঘরে ঢুকে একেবারে ছোট ছেলের মত কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল।—অনেক করে একটু ঠাণ্ডা হয়েছে। কিন্তু ও মার সঙ্গে এখুনি দেখা কর্‌তে চায়—তার আগে ওকে কিছু খাইয়ে দিই। তুই চট্‌ করে একটু চিনি কি বাতাসা ভিজিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দে দিকি।" বলে শুভ্রাংশু চলে গেলেন।—তার একটু পরেই এক গ্লাস সরবত নিয়ে মীনা বাইরে গেল।

ঘরে শুভ্রাংশু ও যতী ছাড়া আর কেউ ছিল না। যতী তখন শুভ্রাংশুর কাছে রমাপতির শেষ সময়ের সব কথা শুন্‌ছিল, মীনা এসে সরবতের গেলাসটা যতীর হাতে দিয়ে বল্‌লে "খাও যতীদা! ওসব কথা শুন্‌বার সুযোগ ঢের পাবে।—আগে একদিন যদি আসতে! বাবা যে তোমার জন্যে কত দুঃখু নিয়ে গেছেন, আজ তিনি নেই, তুমি এসেছ, তিনি থাক্‌লে যে কত সুখী হতেন! এলেই তো, আর একটু আগে কেন এলে না যতীদা?—"

মীনার এই আক্ষেপে যতী মুখ আর তুল্‌তে পার্‌লেন না। তার দেওয়া সরবত্‌টা খেয়ে শুভ্রাংশুকে লক্ষ্য করে বল্‌লে, "উঠুন তা হলে।—"

"হ্যাঁ—চল।" বলে শুভ্রাংশু তাকে নিয়ে অগ্রসর হলেন।

যে ঘরে শতদল মলিনার সাথে গল্প কর্‌ছিলেন, সেইখানে শুভ্রাংশু যতীকে নিয়ে বল্লেন, "মা, চেয়ে দেখ কে এসেছে!—"

"কে?"—বলে শতদল মুখ ফিরিয়ে যতীকে দেখেই কান্নায় ফেটে গিয়ে বল্লেন "এলে বাবা যতী?—এতদিনে তোমার অভিমান ভাঙ্‌ল? তিনি থাক্‌তে যদি আস্‌তে তবে যে কি সুখেরই হ'ত, তোমার চলে যাওয়াটা তাঁর বড্ডই লেগেছিল যে!—"

অপরাধীর মত মুখটা নীচু করে যতী বসে বসে কাঁদ্‌তে

লাগ্‌লো। ঘরে তখন শুধু চাপা কান্নার শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না।—অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে শতদল যতীর হাত দুটী ধরে বল্লেন "বাবা, এসেছ তো যেওনা। খোকা বড় একা, কি করে যে উদ্ধার হবে ভেবে পাচ্ছে না—দুটো ভাল কথা তাকে বলে এমন কেউ নেই; তোমাকে তিনিই পাঠিয়ে দিয়েছেন বাবা—আজ আমরা তোমার কথা যে কত বল্‌ছিলাম!—"

এইবার যতী মুখ তুলে ভাঙাগলায় বল্‌লে, "আপনি ওকথা বলছেন কেন কাকিমা? আমি আর কোথাও যাবনা।—কাকাবাবু আমাকে খুব শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। যে ক'দিন আপনি আছেন, সে ক'দিন আপনাকে 'মা' বলে ডেকে, আপনার সন্তান হয়ে এখানেই থাকব।"

অশ্রুরুদ্ধ স্বরে শতদল বল্লেন "আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখী হও বাবা"।—

সেদিনের মত বিদায় নিয়ে যতী ও শুভ্রাংশু চলে গেলেন।—তার পরের দিন শুভ্রাংশু যতীকে বাড়ীতে করবার যে কাজগুলি ছিল, বুঝিয়ে দিয়ে কলকাতায় রওনা হলেন। যতী আগের মত বাড়ীর ছেলে হয়ে সুধাংশু, হিমাংশুকে সঙ্গে নিয়ে কাজগুলি একে একে শেষ করতে লাগ্‌লেন।—দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাড়ীর পেছন পরিষ্কার হয়ে সেখানে একখানা চালা ঘর বাঁধা হয়ে গেল। ভিতরের আঙিনাটী পার হয়ে সেখানে যাওয়ার জন্যে একটা অস্থায়ী পথও তৈরী হল!—মস্ত মাঠটা ঘিরে বেশ মজবুত করে বাঁশের খুঁটি পুঁতে একটা তাঁবু খাটানো হলো।—যতী ভূতের মত খাট্‌ছিল। মুখে তার একটী কথাও ছিলনা। এই খাটুনীর ভিতর দিয়েই সে বোধহয় অন্নদাতা, আশ্রয়দাতা রমাপতির ওপর তার কর্ত্তব্য শেষ করে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে মীনা এসে বল্‌তো "যতীদা, এতটা বেলা হল, একটু সরবৎও মুখে দিলেনা, খেটে খেটে মরে গেলে যে ভাই!"—

বিষণ্ণ মুখ তুলে যতী শুধু একটু হাসতো—কিন্তু তার কাজের বিরাম হ'ত না।—

ক্রমশঃ

চা-বাগানের কুলি

শ্রীঅমলা দেবী

এ শুধু চায়ের দেশ।
চারিদিকে এর চায়ের বাগান,
মাটীর নাইকো লেশ।
হেথা নিতি মোরা ধূলি-রেণু মাখি'
তুলি পাতা, আর বিধাতারে ডাকি
চিত্ত-ভুবন অশ্রু-মগন,
রহি' রহি' সহে ক্লেশ।
কোথায় চিহ্ন জন্ম-ভূমির!
জননী-পরশে পূণ্য কুটীর!
কুলীর জীবনে স্মৃতিটুকু শুধু
আছে হায় অবশেষ!

——

হত্যার দ্বারা স্বরাজ লাভ হইবে না

মাহাত্মা গান্ধী

"বোম্বায়ের অস্থায়ী লাটের প্রাণ লইবার চেষ্টার উদ্দেশ্য কি? এ ভাবে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার প্রয়াস পাইয়া ছাত্রটি শত্রুতার ভাব বৃদ্ধি করিয়াছে। নিজের ছাত্র-জীবনের অপব্যবহার করিয়া সে ছাত্র-জীবনের উপরই কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছে। এই উপদ্রবের পশ্চাতে আবার বিশ্বাসঘাতকতাও রহিয়াছে। লাট সাহেব ফার্গুসন কলেজের অতিথি ছিলেন। অতিথি সর্ব্বদা রক্ষণীয়। অতিথি যদি শত্রুও হয় তথাপি আরবরা তাহাকে হত্যা করে না। হিংসায় বিশ্বাসী সঙ্ঘগুলির কার্য্যের কি কোন সীমা নাই? আমাদের বিরুদ্ধে কেহ এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিলে আমরা ব্যথিত হইতাম। আমাদের প্রতি যাহা করা অনুচিত মনে করি অপরের প্রতি তাহা করি কি করিয়া? এই ধরণের কার্য্যে ভারতের গৌরব নাই, বরং হ্রাসই পায়। আমাদের মত একটা মহান প্রাচীন দেশে বিশ্বাসঘাতকতামূলক হত্যাকাণ্ডদ্বারা স্বরাজ লাভ সম্ভব নহে। স্বরাজের অর্থ দেশের লোকের হিতার্থে দেশের লোকের ক্ষমতা প্রাপ্তি। শুধু ইংরাজরা দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেই অথবা তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিলেই সেই ক্ষমতা লাভ হইবে না। অগণিত মূক কৃষকের সেবার দ্বারাই সেই ক্ষমতা লাভ করা যাইতে পারে। ধরা যাউক যে, কয়েক হাজার হত্যাকারীর চেষ্টায় ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ নির্ম্মূল হইল, তাহা হইলেই কি তাহারা ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনা করিতে পারিবে? হত্যার মদিরায় প্রমত্ত হইয়া তাহারা যাহাকে পছন্দ করিবে না তাহাকেই হত্যা করিতে থাকিবে।'

ড্যালটন শিক্ষা-প্রণালী ও বঙ্গ-দেশে তাহার প্রবর্ত্তন

শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-টি

প্রবন্ধ

ম্যাসাচিউসেট্সের অন্তর্গত ড্যাল্টন্ নামক স্থানে মিস্ পার্কাষ্ঠ প্রথম এই প্রণালীর উদ্ভাবন ও প্রবর্ত্তন করেন। ড্যালটনে প্রথমে ইহার প্রবর্ত্তন হয় বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে 'ড্যালটনে শিক্ষা প্রণালী'। বর্ত্তমান সময়ে প্রায় সমস্ত বিদ্যালয়েই শিক্ষকমহাশয়গণ ছাত্রদের শুধু পড়াইয়া যান ও তাহারা কেবল শুনিয়াই যায়। প্রত্যেক বালক সমস্ত পাঠ ঠিক বুঝিতে পারিতেছে কি না কিম্বা সকলের পক্ষে বোঝা সম্ভব কি না, ইহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্দ্ধারণ করিবার অবকাশ শিক্ষকমহাশয়দের প্রায়ই হয় না। এই অসুবিধা দূর করিতে এবং প্রত্যেক বালক যাহাতে তাহার আপন ইচ্ছা ও সুবিধামত প্রত্যেক বিষয় ভাল করিয়া বুঝিয়া পাঠ সমাপ্ত করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রণালী উদ্ভাবিত হয়।

ছাত্র ও শিক্ষক মহাশয়দের মধ্যে আদান-প্রদানের সম্পর্ক ইহাতে আর প্রায় পূর্ব্বের মত থাকে না। পূর্ব্বে শিক্ষকমহাশয়গণ ছিলেন দাতা এবং ছাত্রেরা ছিল মৌন-গৃহীতা। কিন্তু এখন মাত্র তাঁহারা ছাত্রদের কার্য্যে সহায়তা করিবেন—আবার তাহাও যখন তাহাদের নিতান্ত প্রয়োজন হইবে কেবলি তখন। প্রত্যেক ছাত্রই প্রায় পৃথক ভাবে কিম্বা কখনও বা দলবদ্ধ হইয়া এক একটি বিষয়ের অনুশীলন করে। শিক্ষকগণ সেখানে উপস্থিত থাকেন তাহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে এবং তাহাদের কার্য্যে যাহাতে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, তাহার সম্যক্ ব্যবস্থা করিতে। প্রত্যেক পৃথক বিষয়ে বিশেষরূপে পারদর্শী এক একজন শিক্ষক ছাত্রদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকেন। প্রত্যেক ছাত্র স্বেচ্ছায় এবং আপন আপন প্রবৃত্তি অনুসারে পৃথক পৃথক বিষয়ের অনুশীলনে ব্যস্ত থাকে। কতক্ষণ তাহারা এক বিষয়ের অনুশীলন করিবে, তাহা তাহাদের নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাহার জন্য বাঁধাবাঁধি কোনও নিয়ম নাই। প্রত্যেক পৃথক বিষয়ের জন্য এক একটি নির্দ্দিষ্ট ঘরের ব্যবস্থা আছে। সেই সেই বিষয়ের অনুশীলন করিতে যাহা যাহা প্রয়োজন হওয়া সম্ভব, সেই সমস্ত দ্রব্যই সেই গৃহে রক্ষিত হয়!

মাত্র চারটি কি পাঁচটি বিষয় (যথা ইংরাজি, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি) এই প্রণালীদ্বারা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ছাত্রগণ যখন ভালরূপে লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছে, তখনই তাহারা এই শিক্ষাপ্রণালীদ্বারা শিক্ষা আরম্ভ করিতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক ঘর নির্দ্দিষ্ট আছে, প্রত্যেক গৃহেই তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে পারদর্শী এক একজন শিক্ষক উপস্থিত থাকেন। ছাত্রদের প্রয়োজনমত তাহাদিগকে সাহায্য করাই তাঁহাদের কার্য্য। পৃথক পৃথক বালকগণ নিজের ইচ্ছামত আসিয়া তথায় কার্য্য করিতে থাকে। সাধারণ বিদ্যালয়ের মত তথায় ঘণ্টাধ্বনি দ্বারা পৃথক পৃথক পড়িবার সময় বিভাগ হয় না। যতক্ষণ এক বিষয়ে কাজ করিতে ভাল লাগে, ততক্ষণ তাহারা সেই বিষয়ে কাজ করে। যখন আর সে বিষয়ে কাজ করিতে ভাল লাগে না, তখন তাহারা প্রয়োজনমত অপর বিষয়ে নিযুক্ত হইবার জন্য অপর ঘরে চলিয়া যায়।

একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রত্যেক বিষয়েই এক একটি নির্দ্দিষ্ট অংশ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। এই নিমিত্ত প্রত্যেক বৎসরকে দশভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভাগকে এক এক মাস বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। প্রত্যেক ঘরের বাহিরে এক একটি বোর্ডে সেই সেই বিষয়ের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাবলী লাগাইয়া রাখা হয়। প্রত্যেক ছাত্র আপন আপন খাতায় তাহা লিখিয়া লয়। একবৎসরের কার্য্যাবলীর নাম "Contract" (কন্ট্র্যাক্ট)। প্রত্যেক পৃথক মাসের কার্য্যের নাম "assignment" (য়্যাসাইন্‌-মেণ্ট)। প্রতি মাস চারি সপ্তাহে বিভক্ত হয় এবং

প্রত্যেক সপ্তাহের কার্য্যের নাম দেওয়া হয় "Period" (পিরিয়ড্)। প্রত্যেক দিনের কার্য্যের নাম 'unit' (ইউনিট্)।

ছাত্রেরা তাহাদের আপন আপন কার্য্য নিয়মিত ভাবে করিতেছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যেক বিষয়ে কতখানি কাজ তাহারা প্রতিদিন করিতেছে, তাহা নিজেদের খাতায় এবং শিক্ষকগণের খাতায় লিখিয়া রাখে। প্রত্যেক পাঠের সঙ্গে কতকগুলি করিয়া প্রশ্ন দেওয়া থাকে। সেই পাঠ শেষ করিয়া সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখিতে হয়। শিক্ষকগণ তাহা পরীক্ষা করিয়া তাহাদের ফলাফল পৃথক খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। কোনও বিষয়ের উত্তর সন্তোষজনক না হইলে ছাত্রদের পুনরায় সেই পাঠ পড়িতে হয়, যতদিন না তাহারা সন্তোষজনক উত্তর লিখিতে পারে। সুতরাং প্রতি মাসের শেষে প্রত্যেক বালক কতখানি কাজ করিয়াছে এবং কোন্ বিষয়ে কোথায় তাহাদের সাহায্য করা প্রয়োজন, তাহা সহজেই নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। এই সমস্ত "Assignment"গুলি প্রস্তুত করিবার জন্য বিশিষ্ট এবং উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। কেননা "Assignment" এর উপরেই এই প্রণালীর সফলতা নির্ভর করে। এই "Assignment" গুলি হইতেছে পৃথক পৃথক বিষয়ের এক একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা এবং তাহাদের সম্বন্ধীয় কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রশ্ন।

এই প্রণালীর স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন। অনেক স্থলেই ইহার সাফল্য পরিলক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রণালীদ্বারা পড়াইয়া বাঙ্গালা দেশে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় নাই। এই প্রণালীতে কার্য্য করিতে হইলে, ছাত্রগণকে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে দেওয়া হয়। "ক্লাশ প্রমোশন" এর কোনও কথাই ইহাতে নাই। তাহাদিগকে পৃথক পৃথক বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য দেওয়া হয়। আপন আপন সুবিধামত তাহারা নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে ঐ সমস্ত কার্য্য শেষ করে। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কাজ করে বলিয়া সমস্ত বিষয়েরই এক সময়ে নির্দ্দিষ্ট অংশ শেষ করিতে পারা যায় না। সুতরাং বর্ত্তমান নিয়মানুযায়ী কাজ করিতে গেলে, ইহাতে বিশেষ বাধা পড়ে।

একজন ছাত্র সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী কিন্তু গণিত শাস্ত্রে সে সন্তোষজনক ফল দেখাইতে পারে না। সাহিত্যে সে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র হইলেও গণিতের জন্য সে 'প্রমোশন' পাইবে না। গণিতের জন্য তাহাকে পিছাইয়া থাকিতে হইবে। ইহার জন্যই সে সাহিত্যে নূতন পাঠ পাইতে পারিবে না। পরে অধিকতর পরিশ্রম করিয়া যদি সে গণিতে আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারে, তখনও তাহাকে উপরের ক্লাশে যাইতে দেওয়া হইবে না। অনর্থক তাহাকে বাৎসরিক 'ক্লাশ প্রমোশনের' সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। এই বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে পড়িয়া বাঙ্গালাদেশে ড্যাল্টন্ শিক্ষাপ্রণালী কার্য্যকর হইতে পারে না। ইহাকে আমাদের বাঙ্গালাদেশে কার্য্যকরী করিতে হইলে, বর্ত্তমানে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর অনেক পরিবর্ত্তন করিতে হয়। অবশ্য বাহ্যতঃ কাজ চালান যাইতে পারে বটে, কিন্তু এই প্রণালীমতে প্রকৃত কার্য্য করিতে গেলে, তাহাতে বিশেষ বাধা পড়ে।

আর একটি প্রধান অন্তরায় হইতেছে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। এই প্রণালীমতে কার্য্য করিতে গেলে, শিক্ষকের কার্য্য সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও উপদেশ দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষককে বিশেষরূপে পারদর্শী হইতে হয়। প্রত্যেক ছাত্র সম্বন্ধে তাঁহাকে সবিশেষ সংবাদ রাখিতে হয়। তাহাদের কৃত কার্য্যাবলী পরীক্ষা করিয়া কোনস্থলে তাহাদের সাহায্যের প্রয়োজন তাহা নির্দ্ধারিত করিতে হয়। প্রত্যেক ছাত্রের সম্বন্ধে সঠিক বিবরণের হিসাব তাঁহাকে তাঁহার একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিতে হয়। প্রত্যেক অমনোযোগী ও অপকৃষ্ট বালকের উন্নতির জন্য পৃথক পৃথক উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হয়। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালাদেশের শিক্ষকের এত অবসর কোথায়? নিজ পরিবারিক অভাব-অভিযোগের চিন্তায় হৃদয় তাঁহার বিশেষরূপে ভারাক্রান্ত। বিদ্যালয় হইতে প্রাপ্ত সামান্য বেতনে তাঁহার অভাব মোচন হয় না। সুতরাং সৎপথে থাকিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, তাঁহাকে অবসর সময়ে কার্য্যান্তর গ্রহণ করিতে হয়। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কলের মতই তিনি কাজ করিয়া চলিয়াছেন—বিশ্রাম উপভোগ করিবার সময় তাঁহার ভাগ্যে লিখা

নাই। এইরূপ অবস্থায় স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া নূতন কোনও প্রণালীকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করা কি তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর? সুতরাং আমাদের এই বাঙ্গালাদেশে বিশেষভাবে শিক্ষিত উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব ও বড় সামান্য নয়। তাহা ছাড়া বাঙ্গালাদেশে শিক্ষার বাহন হইতেছে প্রধানতঃ বিদেশী ইংরাজি ভাষা, বিদেশী ভাষা বিশেষভাবে আয়ত্ত করিতে হইলে, সেই ভাষায় কথোপকথন ও সেইভাষায় অপরের কথোপকথন শ্রবণ করা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, বাঙ্গালাদেশে এই শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের পথে বাধা অনেক!

এই প্রণালীদ্বারা শিক্ষার সফলতা সম্বন্ধে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরও বিশেষ আস্থা নাই। কিন্তু এই প্রণালীতে যে প্রভূত পরিমাণ উপকার হইতে পারে, কেহই তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। শিক্ষকের অনাবশ্যক কঠোরতা ও তাড়না হইতে ইহা ছাত্রগণকে মুক্ত করিয়াছে। বিদ্যালয়কে তাহারা আর 'তাড়নাগার' মনে করে না। আপন ইচ্ছামত এবং আপন অভিরুচিমত তাহারা আপন আপন কাজ করিয়া যায়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট পাঠ সমাধা করিতে হইবে অথচ তাহা সমাধা করাইতে শিক্ষকের রক্তবর্ণ চক্ষু তাহাদের উপর নাই—তাহারা নিজের দায়িত্বেই সব করিবে, নিজের শক্তির উপরই তাহারা নির্ভর করিবে এবং তাহাদেরই স্বাধীনচিন্তা তাহাদিগকে পরিচালিত করিবে। এই সাফল্যে আনন্দ আছে—আত্মমর্য্যাদা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্র ইহাতে নিহিত আছে। ইহারদ্বারা সমস্ত ছাত্রই আপন আপন শক্তি অনুযায়ী কার্য্য করিতে পারে—ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাহাকেও সম্মুখের ডাক অগ্রাহ্য করিয়া পড়িয়া থাকিতে হয় না। সময়মত আগে চলার এবং জ্ঞানের ভাণ্ডারে নিত্য নূতন রসাস্বাদন করার আনন্দ হইতে কেহই তাহাদের বঞ্চিত করিতে পারে না। সুতরাং এই প্রণালীর মূলমন্ত্র সম্মুখে রাখিয়া শিক্ষকগণ যদি আপন ব্রত-সাধন করিতে থাকেন তবে এই প্রণালীর মতে অক্ষরে অক্ষরে কার্য্য না করিয়াও ছাত্রগণকে তাঁহারা নূতন আশায় এবং নূতন উদ্যমে প্রবুদ্ধ করিতে পারিবেন। তাহা যদি তাঁহারা করিতে পারেন, তবেই বুঝিতে পারিবেন যে, শিক্ষার আদর্শ তাঁহার চিরকাল অক্ষুণ্ণ ও অম্লান রহিয়াছে।

গান

শ্রীঅলক রায়

বাজিয়ে মাদল নাম্‌ল বাদল
আকাশ ছেয়ে।
তালের বনে পাখীরা সব
উঠল গেয়ে।

কদম গাছের মাথায় আজি
বর্ষা-মৃদঙ উঠল বাজি
শালের বনে শাওন-ধারা
নামলো ধেয়ে।

মেঘ ডাকে ঐ গুরু গুরু
ঝ'রছে বারি ঝুরু ঝুরু
আষাঢ় এলো ধরার মাঝে
আকাশ বেয়ে।

ভক্ত কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য্য



ভক্ত কৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য্য

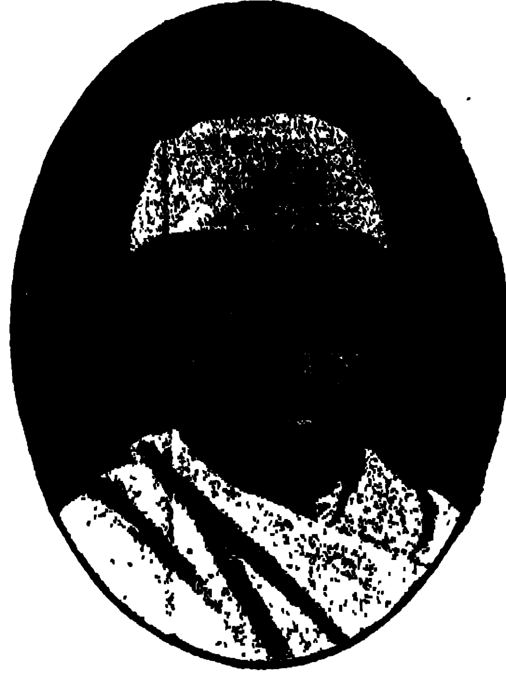
তাঁহার বিদুষী ও ধর্ম্মপ্রাণা মাতার আদর্শেই কৃষ্ণকুমারের চরিত্র গঠিত হয়। কৃষ্ণকুমার সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর এবং আবৃত্তিশক্তি অতি সুন্দর ছিল।

অতি শৈশবকাল হইতেই কৃষ্ণকুমারের দেবদেবীর প্রতি অনুরাগ দৃষ্ট হইত। কখনও সঙ্গীদের সহিত নির্জ্জন স্থানে ঠাকুরদের পুতুল লইয়া খেলা করিতেন, কখনও নিজহস্তে গঠিত মৃত্তিকায় শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন এবং কখনও বা সুললিত কণ্ঠে দেবদেবীর স্তুতিগানে আত্মহারা হইয়া থাকিতেন।

মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি শৈশব হইতেই কৃষ্ণকুমারের উপর পতিত হয়। তিনি কৃষ্ণকুমারকে খুব ভালবাসিতেন। নানারূপ বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথ কৃষ্ণকুমারকে নিকটে পাইয়া উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা তাঁহাকে "মানুষ" করিয়া তুলিয়াছিলেন। কৃষ্ণকুমার উক্ত মহাত্মার আদর্শে গঠিত হইয়া—সত্যপ্রিয়তায়, সকলকে আন্তরিক যত্ন ও ভালবাসায়, পরদুঃখ নিবারণে যত্নশীলতায়, এবং একনিষ্ঠ গুরুসেবায় সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। যিনি কৃষ্ণকুমারের সহিত একদিন মাত্র আলাপ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তিনিই তাঁহার সহাস্য সরল মিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। তাঁর সংসর্গলাভ ও তাঁর সহিত বাক্যালাপ করিতে সকলেই যেন অবসর অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইত।

"ইটালী শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চ্চনালয়ের" প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য—দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রিয়তম ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকুমার ভট্টাচার্য্য—আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালনে, শ্রীগুরুসেবায় ও জন সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ৪১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গত ১৫ আষাঢ় মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

গোল টেবিলের সদস্যবৃন্দ



মহাত্মা গান্ধী



সরোজিনী নাইডু



সার আকবর হয়দারী



নবাব ছত্রী



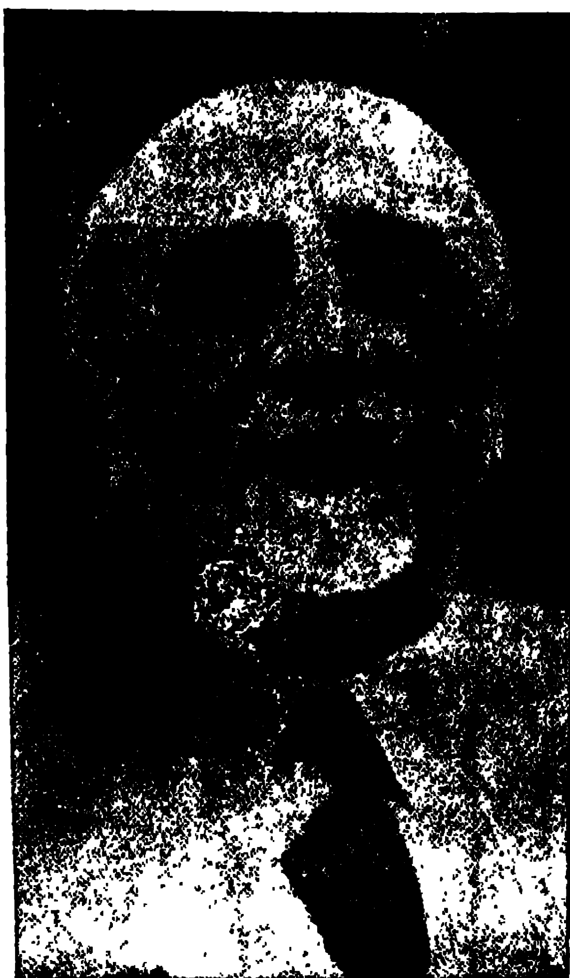
মোঃ সৌকৎ আলি



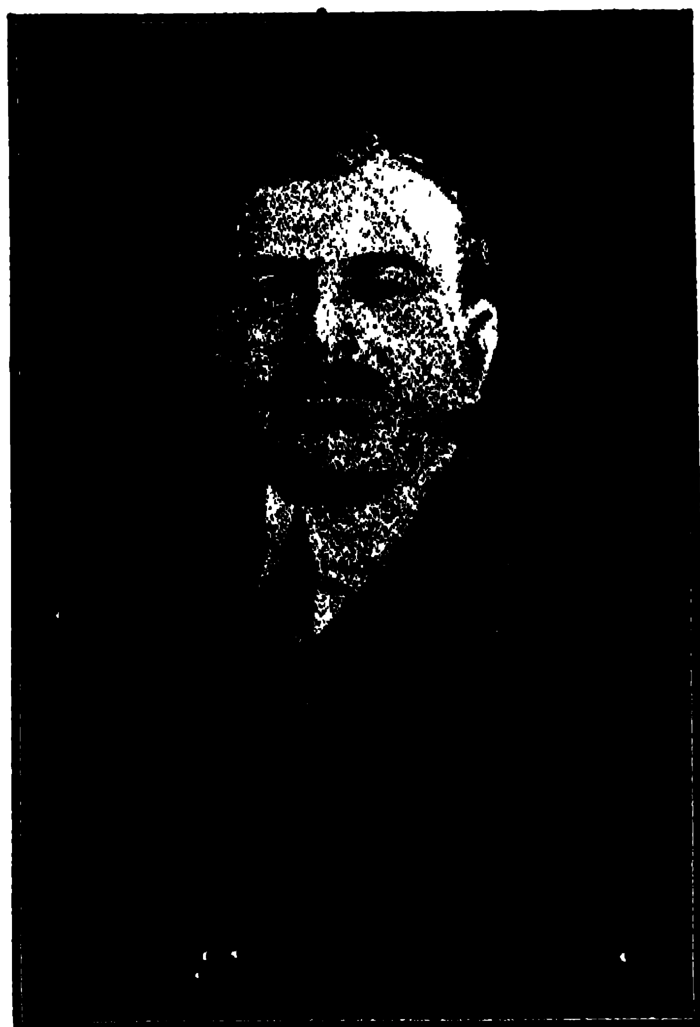
নবাব—ভূপাল



মিঃ জিন্না



সার ফিরোজ শেঠ্‌না



মাননীয় আগা খাঁ



মিঃ সুলতান আহাম্মদ



সার মহম্মদ সাফি



মৌলনা ফজলল হক



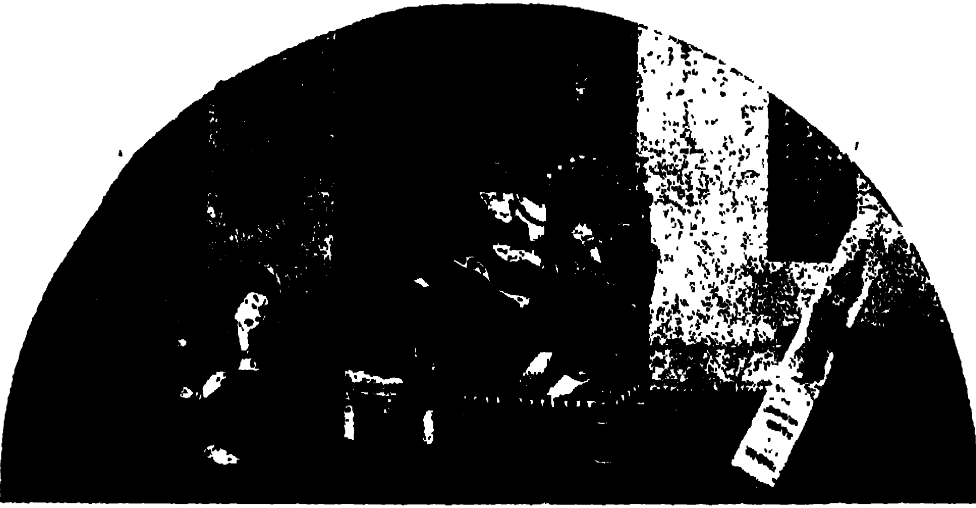
মিঃ গজনভী

ভারতীয় শিল্পকলা

বুনিয়াদি জাতিঃ সভ্যতাই স্বতন্ত্র।

এই জন্যই গ্রীক্ ও ভারতীয় শিল্পের বোধ হয় এত কদর!

কিছুদিন পূর্ব্বে বোম্বে আর্ট স্কুলের ছাত্রদের চিত্র নিপুণতা পাশ্চাত্যদেশসমূহে দেখাইবার জন্য আলড্‌উইচত সহরে একটা প্রদর্শনী খোলা হয়। এই স্কুলটী প্রায় ৭০ বৎসরাধিক কাল জীবিত থাকিয়া ছাত্রদের শিল্পকলা শিক্ষাদান করিতেছে! বিখ্যাত ইংরাজ লেখক রুডইয়াড কিপ্‌লিঙের পিতা এই স্কুলের একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী ও ডিরেক্টর ছিলেন এবং ঐ স্থানেই কিপ্‌লিঙের জন্ম হয়। এই স্কুলের ছাত্রদের উন্নতি এখন সকলকার ঈর্ষার বিষয় হইয়াছে! ইহাদের চিত্রে নিপুণতার নিদর্শন স্বরূপ ইহাদিগকে নূতন দিল্লীর ভারত সরকারের অফিসের গম্বুজের উপর ছবি আঁকিতে দেয়া হয়েছে! এই গম্বুজটী আটকনা তজ্জন্য প্রত্যেক কোণে ভারতীয় চিত্রযুগের একটী চিত্র আঁকা হইয়াছে—চিত্রগুলি এইরূপ :—















ভু-প্রদক্ষিণ পথে

(কলিকাতা হইতে লণ্ডন)

ভ্রমণ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ

শেষ বিদায় !

খিদিরপুরে ডকের ১১ নং বার্থ (berth) থেকে আমাদের জাহাজ মধ্য রাত্রে ছাড়্‌বে। বেলা তিনটা থেকে পাঁচটার মধ্যে যাত্রীদের জাহাজে উঠবার সময়। কারণ বেলা পাঁচটার সময় ডাক্তার সমস্ত যাত্রীদের পরীক্ষা করবেন। আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব সমভিব্যাহারে বেলা ৪টার সময় জাহাজে ওঠা গেল। ইহার পূর্ব্বে কখনও বিলেতের জাহাজে ওঠা হয় নি, সুতরাং যে ধারণা ছিল বা শোনা গিয়েছিল জাহাজ ঠিক বাড়ীর মত পরিষ্কার —তা জাহাজে উঠে বোধ হ'ল না। এমন অপরিষ্কার—চারদিকে কয়লা ছড়ান, এখানে খানিকটা কাছি পড়ে রয়েছে, ওখানে গোটা কতক লোহা লক্কর আর এমন ধুলো যে মনে হ'ল, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কাপড়-চোপড় সব ময়লা হয়ে গেল—আর এত গোলমাল ! এখান দিয়ে কয়লা তুলছে, ওখান দিয়ে মাল ওঠাচ্ছে, মজুরেরা মাঝে মাঝে জাহাজের গর্ত্তের (hold) ভেতর থেকে হেঁইয়ো হেঁইয়ো কচ্ছে। কখনও বা ষ্টেভেডোর মশায় কোনও লিকে গালাগালি দিচ্ছেন আবার জাহাজের ব্রিজের ওপর থেকে কখনও 1st Officer বা 2nd Officer শিঙে ফুঁকে দূরের খালাসীদের সঙ্গে কথা কইচেন—চারদিকেই গোলমাল এই গোলমাল ও ধুলোর মধ্য দিয়ে কুলি আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর দরজার কাছে নিয়ে যেতেই একজন গোরা (পরে জানা গেল 2nd Steward) টিকিট দেখ্‌তে চাইলে। তারপর টিকিট দেখে সে আমাদের একটা ঘরে (State-Room) নিয়ে গেল। এই State-Room এ দুটো বিছানা (Berth) ছিল। Steward আমাকে বল্লে ওপরের বিছানাটা বা (berthটা) আমার।

ডাক্তারের পরীক্ষা

ঘরে (Cabin) তোরঙ্গটা রেখে আমরা ডেকের ওপরে ধুমপানের ঘরে (Smoking Room) এসে সকলে গল্প-গুজব কচ্ছি এমন সময় Steward এসে বলে গেল যে, ডাক্তার এসেছে এবং এখনি 1st class saloon বা first class এর খাবার ঘরে যাত্রীদের পরীক্ষা করবেন। 1st class saloon এ গিয়ে দেখি পুরুষ যাত্রীরা সব দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং মেয়ে যাত্রীরা বসে রয়েছে। এইবার ডাক্তার মশায় পরীক্ষা কর্ত্তে আরম্ভ করলেন। প্রথমে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের টিকিট অনুযায়ী নাম ডাকৃতে লাগলেন—মিঃ ব (Mr. B) ব মশায় অমনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রথমটা বুঝতে পারলুম না যে এ কি রকম স্বাস্থ্য পরীক্ষা, তারপর মনে হ'ল সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে সুতরাং ডাক্তার মানুষ লোকের চলন দেখে কেন জান্‌তে পারবে না, যে লোকটা রোগী কি না। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের পরীক্ষা আরম্ভ হ'ল। ক্রমে "ঘ" মশায়ের নাম ডাকা হ'লে "ঘ" মশায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং "ঘ" মশায়ের পরীক্ষা শেষ হ'য়ে গেল। এই রকমে জন কুড়ি যাত্রীর স্বাস্থ্য-পরীক্ষা মিনিট তিনেকে সম্পন্ন হ'য়ে গেল।

লোকটা পাগল নাকি !

ডাক্তারের পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হবার আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্পে যোগদা

যাচ্ছি এমন সময় ডেকের ওপর একটী ছোকরা ডেকে বল্লে "Are you Mr. Ghose ?" My name is B.

ঘোষ মশায়—"Well glad to meet you."

বে—"So am I."

বে—You are going alone ?

ঘো—Why, aint you going ?

বে—No, no, I don't mean that I mean none of your folks are going.

ঘোষ—(স্বগতঃ—লোকটা পাগল নাকি ! দেখ্‌তে পাচ্ছে ওরা সব ধুতি চাদর পরা। তারপর তাকে বল্লাম কোনও লোক কি ধুতি চাদর পরে বিলেত যায় নাকি ?

ব—So I thought they must have come to say sou good-bye.

ঘ—That's what it is.

তারপর বন্ধু বান্ধবদের কাছে এসে ঐ কথা ব'লে ত খুব খানিকটা আমোদ করা গেল।

শিবের বাহনের লেজ

ক্রমে ৬টা বাজিবার পূর্ব্বে অন্য যাত্রীদের যাঁরা বিদায় দিতে এসেছিলেন তাঁরা চলে যেতে লাগলেন। এই সময় একটা আরতির ঘণ্টার মত আওয়াজ কানে গেল। প্রথমটা মনে হ'ল, জাহাজে আবার আরতি কি। ঘড়ি খুলে দেখি ৬টা! তারপরেই একটা খানসামা এসে বল্লে—'আপনি Tableএ যাবেন না।' 'যাব বৈকি' বলে Saloon বা খাবার ঘরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসা গেল। বসে দেখি সকলে আরম্ভ করে দিয়েছে। তারপর একজন বাবুর্চ্চি কাছে এসে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, "কি এনে দেব ?" Table এর ওপর থেকে menuটা নিয়ে দেখি গোড়াতেই Oxtail Soup! ঐ খানেই খাওয়ার শেষ হয়ে গেল। কারণ খাব কি ? কেবলই শিবের বাহন মশায়ের লেজের দিকটার আকৃতি মনে পড়্‌তে লাগল।

তারপর বাবুর্চ্চিকে বল্লুম "আমাকে এক কাঁপ্‌ কফি এনে দাও" ঐ এক cup Cofee ও খানকতক বিস্কুট খেয়ে table থেকে উঠে এসে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হওয়া গেল।

জন্মের মত বিদায়

বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ডেকের ওপর বেড়াচ্ছি, এমন সময় সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে অস্তমিত হচ্ছেন। আকাশে কত রকমের আলোকছটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে দিঙ্মণ্ডলকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করেছে: কতদিন কতবার এই গঙ্গার ওপর থেকেই সূর্য্যাস্ত দেখেছি, কিন্তু সে ত এমন নয়। বুঝিবা ইহাই আমার জন্মভূমিতে শেষ সূর্য্যাস্ত দেখা। ক্রমে অন্ধকার হ'য়ে এল; বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই আমার শুভ কামনা করে বিদায় গ্রহণ করলেন —কে জানে তাঁরা আমায় জন্মের মত বিদায় দিলেন কি না!—কতবার কত জায়গায় গেছি কিন্তু মন ত কখন এত চঞ্চল হয় নি—"সার্থক জনম মোর তোমায় ভালবেসে।" কতক্ষণ জানিনা জাহাজের সিঁড়ির ধারটিতে দাঁড়িয়ে ছিলুম। আর দাঁড়িয়ে থাকা বৃথা বিবেচনা করে, নিজের Cabinএ আসা গেল। এসে দেখি, দ্বিতীয় berthটার জন্য কোনও যাত্রী নাই। সুতরাং সমস্ত কেবিনটিই আমার।

State Room (কেবিন)

হাড় মড়-মড়ানি অসুখ

ঘরটা লম্বায় ফুট আষ্টেক ও চওড়ায় ফুট পাচেক। Berthগুলো অনেকটা Trainএর bunk এর মতন; তবে ঝোলান নয় কাঠের দেওয়ালের সঙ্গে আঁটা। এক একটা berth লম্বায় সাড়ে ছয় ফুট ও চওড়ায় আড়াই ফুট হবে। আমার তাতে কষ্ট হ'ত না কারণ ৬ ইঞ্চি চওড়া হ'লে, আমার মতন লোকের পক্ষে যথেষ্ট—তবে যাঁরা চওড়ায় ফুট তিনেক তাঁদের কষ্ট হ'তে পারে। বিপরীত দিকের দেওয়ালের সঙ্গে একটা বেতের adjustable chair লাগান, যখন ইচ্ছা তাকে দেয়াল থেকে টানলেই সুন্দর বেঁতের চেয়ারের কাজ করে। আর একটা দেয়ালে অর্থাৎ কেবিনে ঢোকবার দরজার বিপরীত দিকের দেয়ালে একটী ছোট আলমারির মতন জিনিষ দেয়ালের সঙ্গে ফিট করা রয়েছে। আলমারির ওপরে একটা ছোট আয়না ফিট করা ছিল ও তার ওপরে একটা খাবার জলের কুঁজো (কাঁচের) বা pitcher ও দুটী গ্লাস ছিল। আলমারির মতন জিনিষটার একটা হুক ধ'রে টানলেই একটা Sink বেরিয়ে

আসে। এই Sink এর ধারে দুটী ক'ল লাগান আছে। একটা ঠাণ্ডা জল ও আর একটা গরম জলের জন্য। এই Sink মুখ ধোবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আলমারীর ওপর দিকটায় এই Sink থাকে এবং নীচের দিকে বা তলায় এক দিকে একটা pan থাকে। রাত্রে প্রস্রাব করবার জন্য বা Sea-Sick হ'লে প্রস্রাব করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং অন্যদিকে একটী পাত্র থাকে। সেই পাত্রটীতে Sink এর জল এসে পড়ে। Sink বা pan ময়লা জিনিষের জন্য ব'লে উহাদের ঐরূপ আবৃত ভাবে চোখের অগোচর স্থানে রেখে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে যখন যাত্রীরা প্রাতর্ভোজনে টেবিলে যান তখন মেথর এসে পরিষ্কার ক'রে দিয়ে যায়। এ ছাড়া একটা ছোট Electric fan ও Electric light আছে। যে দিকে adjustable চেয়ার সেই দিকে একটা গোল ১ ফুট ব্যাসের গর্ত্ত ছিল। ইহাকে port-hole বলা হয় এবং ইহা Cabin এর জানালার কাজ করে। এই জানালা দিয়ে ঘরে বায়ু সঞ্চারণ করে। ঘরের সমস্ত জিনিষই, এমন কি, কব্জাটীও পেরেকটা পর্য্যন্ত গিল্টি করার মত ঝক্ ঝক্ চক্ চক্ করছে। Berth এর ওপর যে বিছানা সেটা কিসের তৈরি ঠিক বলতে পারি না—বোধ হয় খড় বা ঐ জাতীয় কোনও জিনিষের হবে। কারণ পদ্মলাভ করবার সময় মনে হ'ত যেন হাড় মড়মড়ানির অসুখ হ'য়েছে। ঐ রকম খড় খড় আওয়াজ হ'ত কিন্তু খুব নরম। আর বিছানার চাদর ধপ ধপ কর্চ্ছে ফরসা। মাথার বালিস দুটো ক'রে বটে তবে পাশ বালিশ নেই কারণ berth এর ওপর পাশ বালিশ রাখলে যাত্রীকে ভূমিশয্যা আশ্রয় কর্ত্তে হবে। মাথার শিয়রের কাছে Electric bell আছে। যখন Cabin boy কে ডাকবার বা কোনও attendanceর দরকার হয়, তখন ঐ bell টা টিপলেই কেহ না কেহ Cabin এসে জিজ্ঞাসা কর্ব্বে কি দরকার। অর্থাৎ এক কথায় মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা সুবিধার জন্য যে যে জিনিষের প্রয়োজন তা ঐটুকু—৮ ফুট × ৫ ফুট ঘরে কোনটারই অভাব নাই।

রাত্রে ভাল রকম ঘুম হয় নি। একে মাথা ধ'রেছে (মনে কর্ব্বেন না যে কেঁদে মাথা ধরেছিল কাঁদতে যাব কেন?) তার উপর সেই জাহাজের ডেকের ওপরের গোলমাল সুতরাং এক রকম অর্দ্ধ অচৈতন্য অবস্থায় শুয়ে থাকা গিয়েছিল। রাত্তির চারটার সময় জাহাজের চেনের ঘড়-ঘড়ানি আওয়াজ সুরু হ'তে আরম্ভ হ'ল এবং ঘণ্টা দুই তিন সেই আওয়াজে বিরক্ত হ'য়ে ওঠা গিয়েছিল। পরদিন ভোর ছয়টার সময় দরজায় knock শোনা গেল এবং একজন বাবুর্চ্চি সেই adjustable চেয়ারের ওপর এক cup চা ও একটা Toast রুটী রেখে গেল। সেই boyটাকে জিজ্ঞাসা কর্লুম "হাহে, অত চেনের ঘড় ঘড়ানি আওয়াজ হচ্ছিল, কেন?" সে ব'ল্লে যে, জাহাজ ডক থেকে বেরিয়ে আসবার আগে চারদিকে যে সব বড় বড় চেন দিয়ে জাহাজ বাঁধা থাকে সেই সব চেন গোটান হচ্ছিল। আমাদের জাহাজ কিছুক্ষণ হ'ল ডক থেকে বেরিয়ে এখন গঙ্গার ওপর পড়েছে। আমি জিজ্ঞাসা কর্লুম জাহাজ ছেড়েচে কখন? সে বল্লে যে রাত ৪টার সময় তবে ডক থেকে বেরুতে দুই তিন ঘণ্টা লাগে। তাড়াতাড়ি উঠে মুখ ধুয়ে ডেকের ওপর গিয়ে দেখা গেল যে জাহাজ মেটে বুরুজের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। খানিক বাদেই সেই আরতির ঘণ্টা। ঘড়ি খুলে দেখি, আটটা বোঝা গেল breakfastএর ঘণ্টা। Saloonএ যাব ব'লে সিঁড়ি দিয়ে নামচি এমন সময় একটা বদখদগন্ধ নাকে এসে লাগল—এ অবশ্য খাবারের গন্ধ। তখনই আবার শিবের বাহন মশায়কে মনে প'ড়ে গেল—একি তারিরই গন্ধ নাকি! যা হোক দমটা বন্ধ ক'রে (কারণ ঘ্রাণেন অর্দ্ধ ভোজনং) Saloonএ গিয়ে টেবিলে বসা গেল।

Dining Saloon বা খাবার ঘর

Saloonটী কি সুন্দর ভাবে সাজান! একটা ছোট খাট হ'ল Hall বল্লেই চলে। দু দিকে দুটো Dining table রয়েছে। আমরা যাত্রী ছিলুম, জন দশ বারো। সুতরাং একটা tableএই কুলিয়েছিল আর একটা table এ ছোট ছোট টবে ক'রে ফুল গাছ সাজিয়ে রাখা হ'য়েছে। মেজেটা সমস্ত carpet দিয়ে মোড়া আর প্রত্যেক দরজায় curtain দেওয়া। ঘরটার কাঠের দেয়ালের এক দিকে আলমারি লাগান আছে এবং

তাতে নানা রঙের বাঁধান বই সাজান। ইহাই দ্বিতীয় শ্রেণীর লাইব্রেরী। ঘরের এক কোণে একটা ছোট table আছে ও তার ওপরে একটা letter-box আছে, তাতে note-paper ও envelope থাকে। যাত্রীরা এইখানে ব'সে চিঠি পত্র লেখেন। ঘরটার চারিদিকেই কেমন একটা গোছান ভাব।

কুকুরের বমি

যা হো'ক table এর ওপর থেকে menuটা নিয়ে গোড়াতেই দেখা গেল porridge (পরিজ বা পায়েস) বাবুর্চ্চিকে পরিজ আন্‌তে বললুম। সে কিছুক্ষণ বাদেই একটা Dish এ ক'রে খানিকটা কুকুরের বমি জড় করে সাম্‌নে রেখে দিলে। দেখেই ত খাওয়া হ'য়ে গেল। porridge কি দিয়ে খেতে হয় তা জানা ছিল না (cream বা দুধ দিয়ে খেতে হয়) যা হোক কি রকম আস্বাদটা দেখে নেওয়া যাক্ মনে ক'রে নিশ্বাস বন্ধ করে এক চামচ খাওয়া গেল। বোধ হ'ল যেন পেটের ভেতর গিয়ে আবার বেরিয়ে আসবার জন্যে গলার কাছে একটা ডেলা মতন হ'য়ে অপেক্ষা কর্চ্চেন। তার পরে breakfast ক'রে ওপরে আশা গেল। জাহাজ এতক্ষণে বজ বজ উলুবেড়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কারণ জাহাজের ওপর থেকে বজ বজের petrol oil এর সাদা রঙ করা—reservoirগুলিকে বেশ দেখা যাচ্ছিল। এক এক বার মনে হচ্ছিল, কই এতক্ষণ ত জাহাজে রইচি sea-sick হ'লুম না, তবে বুঝি ওসব বাজে কথা! আমাদের জাহাজ যখন গঙ্গার ওপরের কোনও কলকারখানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন সেই কলকারখানা থেকে অনেক European রুমাল উড়িয়ে আমাদের cheer কচ্ছিল। আমাদেরও জাহাজের ওপর থেকে রুমাল উড়িয়ে তাদের cheer করা হচ্ছিল। এই রকমে গঙ্গার এপাশ ও-পাশ দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাওয়া হচ্ছে, এমন সময় আবার আরতির ঘণ্টা হ'ল। ঘড়ি খুলে দেখি একটা। তখন ঠিক করা গেল lunch এর সময়। Lunch খেয়ে ওপরে আসা গেছে খানিক বাদে ৩।৷৹টার সময় একটা বাবুর্চ্চি এসে বল্‌লে afternoon tea is ready। আবার নীচে গিয়ে বিস্কুট চা খেয়ে আসা গেল।

আমি কি রাক্ষস নাকি

খানিক বাদেই আমাদের জাহাজ Diamond Harbour এর কাছে এসে নঙ্গর ক'র্‌লে এবং শোনা গেল জাহাজ আর আজকে চল্‌বে না। খানিকটা ডেকের ওপর বেড়িয়ে ঘুর্‌তে-ফিরতেই ৬টা বাজল। আবার সেই আরতির ঘণ্টা Table এ যাওয়া। ওপরে এসে বেড়িয়ে-চেড়িয়ে রাত্তির ৯।৷৹টা হয়ে গেছে—Cabin এ গিয়ে জামা-কাপড় খুলছি এমন সময় boy এসে বল্‌লে যে, Supper ready। এই খানিকক্ষণ হ'ল এক পেট খেয়ে এসেছি এর মধ্যেই আবার Supper। Supper এর নাম শুনেই রাগ ধরতে লাগল, ভাবলুম আমি কি রাক্ষস নাকি!

রাত্তিরে শুতে যাবার সময় মনে হ'তে লাগল এই রকম লম্বা লম্বা ৩০টা দিন কি ক'রে কাটবে।

Sea-Sickness

পরদিন ভোরে ঠিক ৬টার সময় Boy এসে দোরে knock করে আবার Toast ও চা রেখে গেল। চা ও Toast খেয়ে Toilet বা পায়খানায় যাচ্ছি মাথাটা কি রকম ঘুরছে ঘুরছে ব'লে বোধ হ'তে লাগল। ঠিক ঠাওর কর্ত্তে পারলুম না কি জন্যে। Breakfast শেষ হয়ে গেছে। Steward এসে বল্‌লে যে কারুর যদি কোনও চিঠি ফেলবার থাকে, তা হ'লে চিঠি-গুলো তাকে যেন শীঘ্র দেওয়া হয়। আমি প্রথমটা ঠাওর কর্ত্তে পারলুম না, এই সমুদ্রের মধ্যখানে আবার চিঠি ফেলবে কোথায় (আমাদের জাহাজ সকাল থেকেই সমুদ্রে পড়েছে) তার পর Steward কে জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্‌লে যে, pilot এখনি নাম্‌বে ও ঐ pilot এর boat এ mail যাবে। তাড়াতাড়ি চিঠি লিখ্‌ছি, এমন সময় এমনি গা বমি বমি করে এল যে, কোনও গতিকে চিঠিটা শেষ ক'রে Stewardকে দিয়ে Cabin এ আস্‌তে না আস্‌তে বমি—এই বমির সুরু। শোবার পর যতক্ষণ জেগেছিলুম কেবল বমি শেষকালে যখন আর পেটে কোনও জিনিষ ছিল না তখন কেবল পিত্তি উঠ্‌তে আরম্ভ হ'ল। দু' ঘণ্টা আগে যে Sea-Sickness কাকে ব'লে জানতুম না তা এখন বেশ মালুম পাওয়া গেল। ক্রমাগত বমি ও মাথা কামড়ানি।

শেষকালে ক্লান্ত হ'য়ে বেহুঁস হয়ে পড়া। সমস্ত দিনের পর যখন ঘুম ভাঙ্গল, দেখি সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গা বমি বমি করছে মাথা খাড়া ক'রে তুলতে পাচ্ছিনা। যা হোক Steward এসে knock করলে ও ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা কর্লে "Mr. ঘ কেমন আছ?"

ঘ মশায়—বড়—গা-বমি বমি কচ্ছে ও মাথা কামড়াচ্ছে

Steward—ডাক্তার এই কটা বড়ি খেতে বলেছে এই—পাঁচটা বড়ি এক সঙ্গে খাও।—

ঘ মশায়—বড়ি কটা ঐ-খানে রাখ খাচ্ছি।—

তারপর steward চলে যাবার পর আমি ভাবলাম পাঁচটা বড়ি এক-সঙ্গে এ—নিশ্চয় গোরার Dose। ২টা খেলুম ও তিনটা port hole দিয়ে ফেলে দিলুম। যাই হোক, ওষুধ খাবার পরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা যখন পরদিন ঘুম ভাঙ্গল, দেখি বেলা দুপুর বেজে গেছে। এই দুটো বড়িতেই যখন এতক্ষণ ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল তখন বোধ হয় পাঁচটা বড়ি খেলে ঘুম আর ভাঙ্গত কিনা সন্দেহ। গা আর তত বমি বমি কচ্ছেনা বটে কিন্তু মাথা কট-কটানি বড্ড বেড়েছে।—মাথায় মনে হচ্ছে, কিছু নেই—এত হালকা হালকা ব'লে বোধ হচ্ছে। মনে করলুম ডাক্তারের বড়ি খেয়ে ভাল করিনি। ওত sea siakness এর বড়ি নয় ও হচ্ছে ভবলীলা সাঙ্গ করবার বড়ি।—তিনদিন আর বিছানা থেকে উঠতে হয় নি। Boy এর মধ্যে রোজই ২।৩ জনের নাম কর্ত্ত। আজকে সেই মোটা লোকটা পড়েছে, কাল সেই দুটো বাচ্ছা ছোঁড়া পড়েছে।—এ-খবরটা রাখবার প্রয়োজন এই যে শুধু—আমিই Sea. Sick হইনি আর আর সকলেই কমবেশী Sea-Sick হয়েছে। সুতরাং দুঃখ করবার আর কিছুই ছিল না।—তবে অপরে একবেলা আধ-বেলা Sea-Sick থাকৃত আর আমার তিন-তিনটে দিন, আমারও বোধ-হয় অতদিন থাকৃত না যদি না ডাক্তার মশায়ের বড়ী খাওয়া হ'ত।

বারোয়ারী পূজা.

Sea-Sick হ'লে কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। খাওয়া-ত দূরের কথা খাওয়ার নাম কল্লে গা বমি বমি কর্ত্ত।—কিছু না খেয়েও-ত থাকা যায় না, তাই জন্যে নিমকি বিস্কুট, শিরকা বা pickles এবং একটু আধটু ফলমূল। ইহাই তখন যেন যথেষ্ট ব'লে বোধ হ'ত। চতুর্থ দিনে (সমুদ্রে-পড়ে) অর্থাৎ ৬ষ্ঠ দিন (ক'লিকাতা ছেড়ে) Boy বল্লে "আপনি ডেকের ওপর যান না—সমুদ্র খুব ভাল। ঢেউ টেউ কিছু নেই—আর রাতদিন Cabin এর ওপর বসে থাকলে কি Sea-Sickness সারে—জাহাজে পাইচারি কর্ত্তে হয়—পেট ভ'রে খেতে হয়; কখনও পেট খালি রাখতে নেই—আজ কি কাল সকালে আমাদের জাহাজ Colombo পৌছবে।"

পটাপট আরও কত কি ব'লে গেল। যা হোক, Dress ক'রে কোনও রকমে দেয়াল ধ'রে ধ'রে ওপরে যাওয়া গেল। দেখি, ডেকের ওপর সুন্দর ক'রে পাল দিয়ে ঢেকে দিয়েছে ও ধুয়ে মুছে খট্‌খটে করে রেখেছে একটা ময়লা এবড়ো-খেবড়ো অপরিষ্কার মাঠকে বারোয়ারী পূজার উপযুক্ত করলে মাঠের যে অবস্থা হয়—আমাদের ডেকের এখন ঠিক সেই অবস্থা। যেদিন প্রথম জাহাজে উঠি, সেদিন যে Deck দেখেছিলুম এখন আর তাকে চেনবার জো নেই।—যাত্রীরা এক একটা Deck-chair এ ব'সে বই পড়ছে আর কেউ কেউ বা ডেকের ওপর পাই চারি কচ্ছে। আমাকে হঠাৎ ডেকের ওপর দেখে, সকলে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। সকলেই জিজ্ঞাসা কর্ত্তে লাগল "How do you feel to day Mr: G"

G—Well, a litlle better thank you.

"Mr, G, is n't it a very fine day

G—Indeed, the pond is very calm

তারপর চেয়ারে ব'সে গল্প হচ্ছে, আমরা কত মাইল এসেছি। একজন এক map খুলে ঠিক আমরা কোন জায়গায় সেইটে দেখাচ্ছে।—আর সকলেই যেন একটু খুসী খুসী ভাব, কারণ কাল সকালে পাঁচ দিন বাদে (কলিকাতা থেকে ৭ দিনের দিন) আমরা জমি দেখতে পাব ও বেলা ১০টার সময় আমাদের জাহাজ Colombo পৌছবে।

ভগবানের চিঁড়িয়াখানা

আমরা যে কজন দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী ছিলুম সকলেই এক এক রকমের। একজন ছিল বেশ লম্বা দোহরা গোছের, দেখলেই মনে হয়, military department এর। তিনি রাত্তির দিন কেবল গোঁফেই চাড়া

দিচ্ছেন। ইনি একজন Lt. Col. একজন ছিলেন একটু প্রৌঢ় গোছের। মুখের ভাব-ভঙ্গীতে স্পষ্টই বোঝা যায় কি রকম সন্দিগ্ধ সন্দিগ্ধ গোছের। ইনি একজন পুলিসের লোক। একজন ছিলেন, কাপড়ে বাবু—বোধ হয় লোকটার ভিন্ন ভিন্ন রকমের গোটাকতক সুট ছিল। প্রথম দিন সকাল বেলাই দেখি বেশ মোটা Scotch Tweedএর একটা সুট পরে ডেকের ওপর বেড়াচ্ছে। বোধহয় গরমটা কিছু বেশী মনে হ'তে খানিক বাদে এক এড়ির সুট ও Straw hat প'রে ওপরে এলেন। আবার খানিক বাদে বোধহয় তাও সহ্য হ'ল না তাই একটা সাদা সিদে সুট ও মাথায় একটা Golf cap প'রে এলেন, লোকটা কেবল ঐ সুটই বদলাচ্চে আর পাইচারি করবার সময় এক একবার নিজের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখ্ছে যেন তাকে কিছুতেই ভাল দেখাচ্ছে না। একজন এমন মোটা গোছের ছিল যে লোকটা রাত দিন deck chairএর ওপর লম্বা হ'য়ে cigaretteএর বংশ ধ্বংস কর্ত্ত। যখনই দেখ লোকটার মুখে হয় cigarette নয় পাইপ নয় cigar—একটা না একটা আছেই। দুজন কেরাণীমশাই ছিলেন, একজন ইংরেজ ও আর একজন Anglo-Indian বা Eurasian-এঁদের ঠিক কেরাণীর উপযুক্ত চেহারা বটে, অল্প বয়সে বুড়ুটে বুড়ুটে গোছের চেহারা। একজন মহিলা ছিলেন, তাঁকে দেখ্লে ইংরাজ মহিলা ব'লে বোধ হয় না, কারণ ও রকম লম্বা ছাঁচের মুখ ইংরাজ মহিলার বড় দেখা যায় না অনেকটা Scandinavian গোছের। দেখ্লেই গম্ভীর ভাব মনে হ'ত। তিনি রাত দিন গালদুটো ফুলিয়েই থাক্তেন। আর ছিলুম আমরা তিনজন সঙ্গী বা বন্ধু—একজন Australian, একজন Anglo-Indian বা ৮।১০ পুরুষের British Born আর একজন খাঁটি (full-blooded) হিন্দু। আমরা এই তিন জনে বিভিন্ন জাতীয় হ'লেও আমাদের বেশ মিল হয়েছিল। আমরা তিন জন একসঙ্গে বেড়ান গল্প-গুজব এবং মন খুলে প্রাণের কথা (আমার কিছু ছিল না অবশ্য) পরস্পরের মধ্যে বলাবলি হ'ত। ইহাই ভগবানের চিঁড়িয়াখানা।

জাহাজ হইতে কলম্বো

আজ ৭দিনের দিন আমাদের জাহাজ Colombo Harbourএ নঙ্গর কর্লে। জাহাজ নঙ্গর করবার খানিকবাদে ডাক্তারের lunch দূরে দেখা গেল। আমাদের জাহাজ থেকে অমনি একটা সিঁড়ি ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল। ডাক্তার মশাই জাহাজে উঠলেন আর সঙ্গে সঙ্গে একজন লাল পাগড়ী Deckএর উপর উঠে সেই কাঠের ঝোলান সিঁড়ির পথটায় চৌকি দেবার জন্যে দাঁড়িয়ে রইলেন কি উদ্দেশ্যে বল্তে পারিনা—বোধহয় কেউ জাহাজ থেকে যেন না পালায়।

ডাক্তার এসে খালাসীদের রোগ পরীক্ষা করবেন এবং যে যে passenger ও পারে যাবে বা Colombo সহর দেখ্তে যাবে তাদের পাশ দেবেন। আমরা Shoreএ যাব সুতরাং ডাক্তারের কাছে পাশের জন্যে যেতে হ'ল। তিনি 1st. class saloon থেকে pass issue কর্ছিলেন। ডাক্তার একবারটী মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখ্লে, তারপর একখানা ছাপা পাশ দিলে। ডাক্তারের কাছ থেকে পাশ নিয়ে এসে দেখি 2nd. class এর Deck রীতিমত বাজার হয়ে গেছে। কালে কালো লোক মাথায় খোঁপা বেঁধে চিরুণী গুঁজে শুধু পায়ে কোমরে একটা ক'রে লুঙ্গি জড়িয়ে ও শুধু গায়ে উল্টান কলার কোট গায়ে দিয়ে সারি সারি Deckএর ওপর ব'সে গেছে।—সাম্নে একএকখানা কাপড় বিছান ও সেই কাপড়ের ওপর যে যার পণ্য দ্রব্য সাজিয়ে রেখেছে। অধিকাংশ জিনিষই হাতির দাঁতের কিম্বা পোকরাজ জাতীয় পাথরের। passengerরা অনেকেই অনেক জিনিষের দর-টর করলেন কিন্তু কাউকে বিশেষ কিছুই কিন্তে দেখলুম না। আমার বোধ হয়, যদি এরা জান্তে পারত যে সব খরিদ্দার তা হ'লে ॥৹ আটআনা বাজে খরচ করে (Shore থেকে যাতায়াতের boat ভাড়া) বোধ হয় বৃথা সময় কাটাতে কেউ আস্ত না।—এই সব ফোড়েরা অনর্গল মা-বাপ-মরা ইংরেজী বল্তে পারে ও Europeanদের সঙ্গে নির্ভয়ে কথা-বার্ত্তা কয়, তাদের জুজু মনে ক'রে দূরে থাক্তে চায় না। তার

কারণ আছে—Colombo'তে রোজই ২।৪ খানা boat লাগেই—আর এদের কাজই হ'চ্ছে passengerদের মাল গছান। সুতরাং লাল মুখ passenger দেখে দেখে জুজুর ভয় কেটে গেছে। এদের মাল গছাবার বাহাদুরী আছে। আমাদের দলের সেই Australian ছোকরাটাকে একজন আংটীওয়ালা বেশ পাকড়াও করেছে। দোষের মধ্যে সেই ছোকরাটা আংটী দেখ্‌তে চেয়েছিল। সে ছোকরাও কিছুতে কিন্‌বে না আংটীওয়ালাও কিছুতেই ছাড়বে না। শেষকালে আংটীওলা বল্‌লে যে, যাহোক একটা দর ব'ল (আংটীওলা চেয়েছিল ৫০৲ টাকা) ছেলেটা বল্‌লে পাঁচ টাকা। কিছু পরে সে রাজী হ'ল। আমার বোধ হয়, আসল আংটীর একটা নকল দিয়ে থাকবে।

কলম্বোতে আমাদের জাহাজ থেকে তিন জন passenger একেবারে নেমে যাবে। সেই Lt. Col. পুলিশ ও মোটা লোকটা। তারা নেমে যাবার সময় বাকী সব passenger দের সঙ্গে কর মর্দ্দন করে আমাদের যাত্রা শুভ হউক বলে বিদায় নিয়ে গেল। দেশে থাক্‌তে এই সব লোকেরাই কি রকম কি রকম থাক্‌তেন কিন্তু জাহাজে চেপে অবধি যেন একটু অন্য রকম অন্য রকম ঠাওর হচ্ছে। যেন কত অমায়িক ও—ভদ্র।

তারপর, আমরা দুই—বন্ধু আমি ও সেই australian দুজনে Shore এ-যাব বলে সিঁড়ি দিয়ে নামবার মুখে লাল পাগড়ী মশায় কে পাশ দিয়ে নাম্‌তে হ'ল।

এরা প্রায় দুজনের বেশী একসঙ্গে কোথায় ও যায় না কারণ Two is a company three is a crowd.

Colombo harbour টা হচ্ছে artificial বা কৃত্রিম harbour। Breakwater দিয়ে তৈরী।—জীবনে এই প্রথম breakwater দেখা গেল। Breakwater হ'চ্ছে একটা পাথরের পাঁচিলের মত বরাবর ডাঙ্গা থেকে গেঁথে এসে সমুদ্রের মধ্যে খানিকদূর পর্য্যন্ত গাঁথা। জলের label থেকে অনেকটা উঁচু বলে বড় বড় ঢেউ গুলো এসে এতে ধাক্কা লেগে ভেঙ্গে যেত আর চারদিকে জলগুলো অনেক উঁচু হয়ে ছড়িয়ে পড়ত। যদি এই Breakwater না থাক্‌ত তা হ'লে Harbour এর জল স্থির থাক্‌তে পারত না এবং জাহাজ থেকে তীরে এ-নৌকা চলাচলের অসুবিধা হ'ত।

বৃহৎ ফাঁড়া

আমরা জাহাজ ছেড়ে নৌকা ক'রে খানিকদূর এসেছি এমন সময় আমাদের নৌকা Tuticorin এর mail Steamer এর ঠিক সামনে পড়ে গেছে।—mailটা ঠিক তখনই ছেড়েছে আর কি। আমার মনে হ'ল ধাক্কা লাগল বলে কারণ আমাদের নৌকা ও mail Steamer এর মাঝে মাত্র হাত ১০।১৫ ব্যবধান। মোটে দুজন দাঁড়ী ছিল ও আমি ছিলুম হালে। দাঁড়ীরা চেঁচিয়ে উঠ্‌তে জাহাজ থামিয়ে ছিল কিনা ব'লতে পারি না তবে জাহাজের force এ harbour এ-তে যে ঢেউ উঠেছিল সেই ঢেউতে আমাদের নৌকাকে অনেকদূর তফাতে সরিয়ে ফেলেছিল।

ক্রমশঃ

পুষ্পপাত্রের গল্প প্রতিযোগিতার বিশেষত্ব কি আগে দেওয়া নিয়মাবলীতে দেখুন

অঙ্গুরী

শ্রীকমলাকান্ত বসু

রায় বাহাদুর প্রভাতকুমার বসুর বাটীতে লতা কাজ করে। লতার মত প্রিয়ম্বদা, মধুরস্বভাবা, ধীরপ্রকৃতির ঝী আজকাল খুব কমই দেখা যায়। তাই লতার নাম এই তিন মাসে বাহাদুর বাড়ীর ঝী-মহলে একটা বিরাট হৈ-চৈ সৃষ্টি করেচে। অন্দর-মহলেই লতার রাজ্য, কিন্তু পারত পক্ষে তার এলাকা ছাড়িয়ে আরও বহুদূর সে একতন্ত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এতে অপর পরিচারিকা-দের হিংসার এক শেষ।

সে যাই হ'ক, রায় বাহাদুর প্রভাতবাবুর দৃষ্টি লতা কখনো এড়াতে পারেনি, যদিও লতা কত সময় (তাঁর কাছে অন্ততঃ) আত্মগোপন করে থাকৃতেই ভালবাস্ত। কেন জানি না, প্রভাতবাবুর সকল ঝী অপেক্ষা এই তরুণী নবীনা আয়াটার প্রতি স্বতই একটু অনুরাগ দেখা যেত। বড়লোকদের বাড়ী দাসী চাকরাণী যে কিরূপ সম্মান পায় তা বলাই বাহুল্য। তবু অনুমানে বোঝা যায় যে, প্রভাতবাবুর কাছে লতা কোনো স্নেহের দাবী-দাওয়া না ক'রলেও, প্রভাতবাবু তার অসামান্য গুণ আর অপরূপ রূপের আদর করে তাঁর চরিত্রের একটু আলোর আভার পরিচয় দিয়েচেন। সাধারণ (?) ঝী হয়েও লতার পক্ষে এ কি কম সৌভাগ্যের কথা! কিন্তু ঈর্ষান্বিত কিঙ্করীর দল এতে বেশ একটু ক্ষেপে উঠ্‌ত, হিংসাপরবশে পরোক্ষে তার সর্ব্বনাশ ক'রতেও পেছপাও হ'ত না। কিন্তু পরিচারিকাদের আদর্শ (?) লতা যে সবাইকে তার কল্পনা-কৌশলে আগে থেকেই জয় ক'রে রেখেছে।

সন্ধ্যা হয়-হয়। এই একটু আগে কার্য্যান্তে প্রভাত-বাবু বাড়ী ফিরেছেন। কলতলায় অঙ্গপ্রক্ষালন-অভিপ্রায়ে তিনি সবেমাত্র নেমেছেন। হৌজের (চৌবাচ্ছার) পাড়ে প্রথমেই তাঁর দৃষ্টি গেল, একটি বহুমূল্য উজ্জ্বল পরকলা প্রস্তরের উপর! সচকিতে ত্বরিত হস্তে তিনি তা কুড়িয়ে নিলেন,—তিনি অবাক্ স্তম্ভিত বজ্রাহত! নিমিষের মধ্যে অলক্ষ্যে যে কি অপূর্ব্ব ছলনার অভিনয় হয়ে গেল, তা অন্তর্য্যামীই জানেন!

"লতা?"

অদূরেই আনমনা লতা আপনমনে তার পিতলের শান্‌কিখানা মাজিতে তন্ময়। কোমরে খানিকটা কাপড়-জড়ানো—মলিন ছাইমাখা হাতে চপলপদে লতা সামনে এসে দাঁড়াল,—"আজ্ঞে"!

"এ হীরার আঙ্‌টাটা কা'র জানো?"

সহসা মাথায় বজ্রাঘাত হ'লেও কেউ বোধ হয় এরূপ ঘাবড়ে যেতো না। প্রভাতবাবু কি জিজ্ঞাসা করেচেন তা তাঁর মনে নেই। তিনি বিপুল-বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে ডাক্‌লেন,—"লতা?"

লতা থতমত খাবার আগেই প্রভাতবাবু ব'লতে লাগ্‌লেন,—"দেখ লতা, আংটীতে লেখা রয়েছে 'ল—লি—তা'; কে হ'তে পারে, আচ্ছা চেনো তাকে? এখানে তো ও নামে কেউ নেই, তবে ও কোত্থেকে এলো ··আশ্চর্য্য!"

প্রভাতবাবুর কণ্ঠ যেন জড়িয়ে গেল। তিনি এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন লতার মুখের পানে। দিবা-নিশির সন্ধিক্ষণ উপস্থিত;—প্রভাতবাবু যেন কি মহাসমস্যার সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে যেন আকাশ-পাতাল হাতড়ে বেড়াচ্ছেন তিনি; কিম্বা যেন উর্দ্ধে অসীম নভোপটে ধ্যানমগ্ন নিশ্চল নক্ষত্রের প্রায় আজ স্বপ্ন-মগ্ন যোগী তিনি। ললিতা,—এই তিনটী 'অক্ষর যেন ত্রিস্রোতা ত্রিবেণী সঙ্গমে তাঁর মর্ম্মতন্ত্রীর তিনটী মিশে একটা অতীত সুর। ললিতা,—এই তিনটী অক্ষর যেন

বিস্ময়-সংশয়-স্মৃতির ত্র্যহস্পর্শ যুগপৎ তাঁর মনের মাঝে উঁকি দিল। বাইরে ধরণী রাকার রোশ্‌নায় হাস্‌চে, কিন্তু ভিতরে যেন লুকোচুরি খেলা। প্রভাতের বুকে তুমুল ঝড়—লতার চোখে বাঁধভাঙা বান্‌।

"জান লতা, এ কা'র জিনিষ? কেউ কি আজ এসেছিল? কেউ কি ফেলে গেছে? বল্‌তে পারো—" প্রভাতবাবুর স্বর আরও গম্ভীর আরও জড়। জিজ্ঞাসু নেত্রে তিনি তাকিয়ে, আজ এর চূড়ান্ত মীমাংসা চাই-ই চাই।

লতার অধর-পল্লব যেন তিলেকের তরে কেঁপে উঠ্‌ল। কিন্তু প্রভাতবাবুর চোখে তা চাপা পড়্‌ল না;—পড়্‌ত যদি বা চাঁদের আলো সেদিন দেখা না দিত। আজ সে হাতে-হাতে ধরা পড়ে' গেছে—সব খেলা "তবু" পলায়নের রন্ধ্রটা অবধি নেই। হায় লতা, আগুন যে চিরদিন আঙ্‌রা ঢাকা থাকে না!

"অ্যাঁ লতা, তুমি কাঁদ্‌ছ—প্রভাতবাবু আরও অবাক্‌!

অবাঙ্মুখী লতা তখনই অঞ্চলপ্রান্তে চক্ষু মুছে সরে' দাঁড়াল,—"বাবু—"

"কি লতা, বল বল। জান তুমি কে—?"

"ও আমার আঙ্‌টী"...

কথাটা বল্‌ব-না-বল্‌ব-না ক'রেও বলে' লতা যে কতখানি অপ্রতিভ সেই জানে। তবু উপায়ান্তর নেই যে।

"কি বল্লে, তোমার—

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

অপ্রত্যাশিত জবাব পেয়ে প্রভাতবাবু যেন আকাশ থেকে পড়্‌লেন! "লতা, এতে যে ললিতা লেখা। তুমি কি ক'রে—"...

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

'বল লতা, সব খোলসা করে' বল।. ভয় পাচ্ছ কেন? তুমি চুরি করেছ...তবে?"—

নিস্তব্ধ আঙিনায় আলোছায়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'টী মূর্ত্তি। এ কোন্‌ মায়া-কাঠীর কুহক-পরশে নিস্তব্ধ নিথর।

সে গভীর স্তব্ধতা ভেঙ্গে বলে' গেল লতা তার অশ্রু-ভেজা ব্যথাভরা মৌন-কাহিনী সশঙ্কোচে ধীরে ধীরে,--

"বিয়ের বছর দুই আগেকার কথা বল্‌ছি। একবার বারাসতে বেড়াতে যাই আমরা। সেখানে যে বাড়ীতে ছিলুম আমরা ঠিক্‌ তারই পাশের বাড়ীর একটী যুবকের সঙ্গে কিছুদিন যেতে বেশ চেনা হয়। সেই অকপট ভালবাসার আঁখরই এই অমূল্য অঙ্গুরী. আপনার চোখে সামান্য হলেও, এ বড় উচ্চ স্মৃতির জিনিষ।—"

বিচলিতভাবে শ্রোতা জিজ্ঞেস ক'রলেন,—"আহা, কে সে যুবক, কি নাম লতা?—"

লতার বুক ঠেলে নিশ্বাস বেরিয়ে এলো। সে বল্লে'—"প্রভাতকুমার বসু"! লতা শঙ্কিতা ত্রস্তা, হয়তো 'বাবু' তার এ জবানবন্দী তাচ্ছীল্যে উড়িয়ে দিয়ে তাকে অম্লান-বদনে অপহারিণী সাব্যস্ত ক'রবেন। কিন্তু নিজের নাম শুনেই প্রভাতবাবু বিপুল বিস্মিত।

লতা বলে' গেল:—

"তারপরই আমার বে' হয়ে যায়। এখনো সে সুখস্মৃতি মন থেকে ঝরে যায় নি। প্রথম ক'টা দিন কত সুখেই গুজরাণ হয়। তখন ভাব্‌তুম, দুনিয়ায় দু'জন না হলে প্রকৃতির সম্যক্‌ উপভোগ হয় না...

কিন্তু কে জানে নিয়তির নিষ্ঠুর নীতি? স্বামী আমায় নিয়ে এলেন কল্‌কাতায়। তারপর রেসের ঝোঁক হ'ল, নেশার টান হ'ল, সমস্ত অলঙ্কার আসবাব-পত্র খোয়া গেল, ভাড়াবাড়ীর দেনা জমে গেল, স্বামী সেই থেকে নিরুদ্দেশ। সেই থেকে তাঁর চরিত্রে দুরপনেয় দুর্ণামের ছাপ পড়্‌ল। তাঁর বন্ধুর কাছে শুনেছি এ সব; কিন্তু প্রত্যয় হয় না। যাক্‌ সে কথা। অভাগী আমি এখনও কত আশা করি স্বামীকে ফিরিয়ে আন্‌তে, কিন্তু তিনি কি আর এ-মুখো হবেন? পূর্ণেন্দু তিনি—কলঙ্কের আবছা পশরার আতঙ্কে আজও কি তিনি আকাশে কুয়াশাচ্ছন্ন থাক্‌বেন? সে দিব্য জ্যোতি কি আর পাব না এ আঁধার জীবনে?—"

লতার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো!

প্রভাতবাবু জিজ্ঞেস ক'রলেন—"তোমার স্বামীর নাম কি লতা..."

লতা একটু ভ্রূভঙ্গী ক'রলে। প্রভাতবাবু আপনার এই অন্যমনস্কতায় একান্ত অপ্রতিভ হয়ে সে-কথা চাপা দিলেন! "তারপর লতা, এ আংটীতে যে 'ললিতা' লেখা তার কি—"

নিজেকে যথাসাধ্য সাম্‌লে নিয়ে লতা বল্লে,—"কৈফিয়ৎ ? দেখুন, এতদিন আপনার কাছে আত্মগোপন ক'রে চলেছিলুম, কিন্তু আজ যখন বল্‌তে বসেছি তখন সবই খুলে বল্‌ব। দেখুন, আমারই আসল নাম ললিতা ; আর যে নামে আমি এখানে পরিচিত, ওটা আমার নিজের দেওয়া জাল নাম। আসল নামের একটা অক্ষর বাদ দিয়ে আজ আমি ক্ষুদ্র এক অঙ্গুরীর বিরাট বিচিত্র ইতিহাসের তাজমহল সৃষ্টি করেচি। দেখুন, কোন্ সাহসে প্রকৃত পরিচয় দেব আমি ? আমি নিজেই স্বপ্ন দেখি, এ যেন সব অবাস্তব, ভিত্তিহীন, খেয়ালীর হেঁয়ালি।"

প্রভাতবাবুর ঝটিকা-অবসাদ অবসান হ'ল। যেন শীতল প্রাণজুড়ানো মলয়মারুত শিরায় শিরায় বয়ে গেল। বাতাসের স্তরে স্তরে ভেসে আস্‌তে লাগ্‌ল একটা বেশ মনমজানো স্বরের রেশ যন্ত্রের সহযোগে—

"যদি এমনি চাঁদের জ্যোছনা,
অন্তরে তবে কিসের শোচনা।"

সেই আলো-আঁধারের মিলন-ছায়ায় প্রভাত ব্যাকুল-আবেগে জড়িয়ে ধর্‌তে গেল লতাকে বুকের মাঝখানে। "ললিতা, যে স্মৃতির দানকে আজও তুমি হারাও নি—সেই স্মৃতির স্মৃতি যে আ—মি।"··

"আমার ছোট্ট প্রিয়া"

শ্রীসুধীর কুমার সেন

১

আমার ছোট্ট প্রিয়া,—
জল আন্‌তে চল্‌লো ঘাটে, কলস কাঁখে নিয়া ;
বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে পথে, নেইকো সাথে কেউ,
ছোট্ট মনে জাগলো তাহার, নূতন প্রেমের ঢেউ।
ঘাটের পথে একলা যেতে, দেখে আমার বেশ,
সেইখানেতেই হ'ল যে তার, ঘাটে যাওয়ার শেষ ;
কয় সে কথা আমার সনে, কলস কাঁখে নিয়া ;
সে মোর ছোট্ট প্রিয়া।

২

আমার ছোট্ট প্রিয়া,—
হেসে হেসে এগিয়ে এসে, কাঁপায় গো মোর হিয়া
উজল তাহার আঁখি দু'টী, আমার পানে চায়,
মধুর তাহার মুখখানিতে, প্রেমের বিকাশ পায়।
প্রিয়া আমার কইলো কত, মনের ব্যথা তার,
ব্যথার টানে তাই ত ছুটে, আসে বারংবার ;
অবশ সে তার হিয়াখানি, আমায় সঁপে দিয়া
খেল্‌তো হেসে প্রিয়া।

৩

আমার ছোট্ট প্রিয়া,—
মিট্‌তো না তার আশাগুলি, হৃদয় সঁপে দিয়া ;
মধুর স্বরে গাইত গো সে কত করুণ গাথা,
মনের মায়া এতই বেশী—এতই বুকে ব্যথা।
প্রিয়া আমার শিখ্‌লো কোথা—গোপন ভালবাসা ?
বুঝি "প্রণয়" বেঁধেছিল তার মনেতে বাসা ;
যাবার বেলা, বিদায় নিত, মর্ম্মটা মোর নিয়া,
সে মোর ছোট্ট প্রিয়া।

পাথেয় উপন্যাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১৭

মনীষা বসিয়াছিল। এমন সময় শশাঙ্ক আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। মনীষা একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া বলিল, "স্নানাহার হয়ে গেছে দেখছি।"

শশাঙ্ক একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, তা হয়ে গেছে। এক বন্ধুর সঙ্গে এসেছি, তিনি জোর করে তাঁর বাড়ীতে টেনে নিয়ে গিয়ে সেখানেই খাইয়ে-দাইয়ে তবে ছেড়ে দিলে।"

হঠাৎ গম্ভীর হইয়া উঠিয়া মনীষা বলিল, "তার চেয়ে সোজা কথায় বল যে, নিরামিষ খাওয়া তোমার পছন্দ হয় না, তাই তুমি কোনও হোটেলে—"

বাধা দিয়া শশাঙ্ক বলিল, "নিজের গায়ে হাত দিয়ে কথা বলো মনীষা, সত্যের গলা টিপে মেরে ফেলেছি আমি না তুমি? তুমি জানোনা আমি উপস্থিত এই এক'বছর হতে নিরামিষ খাই। তোমাদের এখানে গত বছর এসে আমিষ ত্যাগের মন্ত্র নিয়ে গেছি, এখনও নিরামিষই খেয়ে আসছি।"

বিস্ফারিত যুগল চোখের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া মনীষা বলিল, "কিন্তু সত্যই যদি তা করে থাক, আমি সে জন্যে তোমার এতটুকু প্রশংসা করব না, বরং নিন্দেই করব।"

শশাঙ্ক বলিল, "নিন্দে করাও অন্যায় হবে—কেন না তুমিই একদিন আমিষ খাওয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অনেক কথাই বলেছিলে সে কথা বোধ হয় ভুলে যাওনি মনীষা!"

মনীষা বলিল, "বলেছিলুম কেন—এখনও বলি; আমিষ ছাড়াও মনুষ্য বাঁচে, তাদের স্বাস্থ্যও অক্ষুন্ন থাকে, অন্যায় রকমে জীবহত্যাও করতে হয় না। নিরামিষ সব রকমেই ভাল, কিন্তু সেটা অনেক আগে হতেই অল্পে অল্পে অভ্যাস করতে হয়। যাদের মাছ মাংস না হলে খাওয়া হয় না, তারা যদি হঠাৎ পরম বৈষ্ণব হয়ে যায়, তাতে তাদের ত্যাগের সংযমের প্রশংসা করা যেতে পারে বটে, কিন্তু যে ত্যাগ করলে তার স্বাস্থ্যের কতটা ক্ষতি করলে সেটা ভাবা উচিত।"

শশাঙ্ক হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল, "ওঃ, পাছে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় তাই? কিন্তু চেয়ে দেখ মনীষা, আমার শরীর তো একটুকু রোগা হয় নি, আমার মানসিক শক্তিও যে কমে নি তাও আমি বেশ বুঝতে পারছি। এখানে যে রকম খাটনি পড়েছে, তাতে বরং আমার আরও রোগা হওয়ার কথা, কিন্তু সে রকম আমার কি দেখছ?"

মনীষা মাথা নাড়িয়া বলিল, "দৈহিক ক্ষতি না হোক মানসিক ক্ষতি নিশ্চয়ই হয়েছে, এ আমি ঠিক বলব।"

বিবর্ণ হইয়া উঠিয়া শশাঙ্ক বলিল, "মানসিক ক্ষতি কি রকম?"

জিজ্ঞাসুনেত্রে সে মনীষার পানে তাকাইয়া রহিল। হাসিয়া মনীষা বলিল, "তোমার মুখখানা শুদ্ধ যখন ওরকম বদলে গেল দাদা, তখন ক্ষতি যে, তোমার হয়েছে এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করতেই হবে।"

শশাঙ্ক অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতে লাগিল।

মনীষা বলিল, "তবে স্বীকার করছ, তোমার এই

ত্যাগের ফলে তোমার অনেকখানি ক্ষতি হয়েছে, তা হলে আমি জিতেছি।"

শশাঙ্ক মৃদু হাসিল, বলিল, "হয়তো জিতেছ, আর নিজের মনটাকেও তাই বলে উৎফুল্ল করে তুলতে পার মনীষা, আমি কিন্তু এখনও নিজের হার-জিত ঠিক করতে পারি নি। তুমি বল্‌বে—আমি হেরেছি, কিন্তু নিজের মনে সে হার ঠিক বোঝা চাই তো—কেবল তোমার কথা মেনে নিলেই তো আমার চলবে না।"

মনীষা বলিল, "নিশ্চয়ই নয়, আমিও তা বলি নে। আমার মোট কথা কি জান দাদা, অতিরিক্ত ভোগ ও ভাল নয়, অতিরিক্ত ত্যাগও ভাল নয়, যা রয়-সয় তাই ভাল। আজ তুমি জেদের বশে আমায় দেখানোর জন্যই আহারে-বিহারে অতিরিক্ত রকম সংযমী হয়ে উঠেছ, আবার এমন দিন আসবে যেদিন এই সংযম দূরে যাবে—আগে পর্য্যন্ত তোমার যা ছিল তাও যাবে। আসল কথা কি জানো, মানুষকে যখন ঠিক মানুষের সঙ্গে মিশেই থাকতে হবে, তখন কিছুরই বাড়াবাড়ি করে অতি মানুষ বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা মিছে।"

শশাঙ্ক উত্তর দিতে যাইতেছিল, এই সময়েই সুশীলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"দিদি—"

মনীষা উত্তর দিল, "এই যে.. এই ঘরে আছি ভাই—এসো।"

সুশীল প্রবেশ করিয়াই শশাঙ্ককে দেখিতে পাইল, অভিবাদন করিয়া বলিল, "শশাঙ্ক বাবু যে, কখন এলেন ?"

বন্ধু-বান্ধবেরা শশাঙ্কের নাম ধরিয়া ডাকিত।

মনীষা উত্তর দিল, "এই খানিক আগে এসেছেন। তোমার কি অসুখ করেছে সুশীল, চেহারাটা ভারি বিশ্রী দেখাচ্ছে।"

সুশীল একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়া শ্রান্তভাবে বলিল, "সবাই এই একই কথা জিজ্ঞাসা করছে, কি যে আমার হয়েছে তাও জানিনে। উত্তর যে কি দেব তাই ঠিক করতে পারছিনে।"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া মনীষা বলিল, "তবে থাক, আমি না হয় উত্তরটা নাই শুনলুম।"

অধীর হইয়া সুশীল বলিল, "উঁহু, সেটী হচ্ছে না, তোমাকেই তো সব কথা বলতে এসেছি। আর যখন এসেছি তখন সব কথা নিশ্চয়ই বলে যাব।"

শশাঙ্ক উঠিয়া দাঁড়াইল, "আচ্ছা, তোমাদের কথা হোক, আমি ততক্ষণ ও ঘরে যাই।"

সুশীল তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, বলিল, "না, সেটি হচ্ছে না শশাঙ্ক বাবু, ভগবান যখন আপনাকে এনেই দিয়েছেন, আমার আর আপনার কাছে খড়্গপুর পর্য্যন্ত দৌড়তে হল না, নচেৎ দৌড়াতে হতো। বসুন, আপনার জন্যেই আমার দিদিকে দরকার।"

আবার বসিয়া বিস্মিত হইয়া শশাঙ্ক বলিল, "আমার কাছে আপনার দরকার ?"

সুশীল মাথাটা কাত করিয়া মনীষার পানে তাকাইয়া বলিল, "তুমি যে নারী আশ্রমটী করেছ দিদি, সেটা দিয়ে আমার যে কোন কাজই হবে না, নচেৎ আমি আর কোথাও যেতুম না। দেশের কাজ দেশের ছেলে মেয়েরা করবে, দেশের লোকই সে আশ্রমে আশ্রয় পাবে, এ কাজে যোগ দিতে পারবে, কোন লোকে না এ ইচ্ছে করে শশাঙ্ক বাবু ?"

শশাঙ্ক উৎসাহিত ভাবে উত্তর দিল, "সবাই করবে, সবাই অর্থাৎ যাদের হৃদয় আছে।"

সুশীল বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "কেউ কেউ এমন লোকও আছে, যাদের এ রকম একটা মহৎ কাজের প্রতি মোটেই সহানুভূতি নেই। আমাদের কোম্পানিটাকে নিয়ে আমি এই রকম একটা দারুণ মুস্কিলে পড়েছি, শশাঙ্ক বাবু।"

শশাঙ্ক বলিল, "কিসের মুস্কিল বলুন তো ? আপনাদের কোম্পানীর নাম আজকাল খুব বিখ্যাত হয়ে পড়েছে ; সকলেই বলছে ভারতীয়ের দ্বারা এমন একটা কাজ যে হতে পারে এটা সকলেরই অবিশ্বাস্য ছিল, আপনারা নতুন এই বিশ্বাসটা লোকের মনে এনে দিয়েছেন। আজকাল অনেক বিদেশীয় আপনাদের হিংসে করছে, আর কিসে যে আপনাদের কোম্পানীকে অচল করে দেবে তারই চেষ্টায় ফিরছে।"

দিন পনের কুড়ি আগে এই কথাটা শুনিলে সুশীল যতটা আনন্দ পাইত, আজ তাহার শতাংশের এক অংশও পাইল না, তাহার মুখে মলিন একটু হাসির রেখাই ভাসিয়া উঠিল মাত্র।

সে বলিল, "অচল করতে পারবে—তবে সে রকম

ভাবে নয়, ভারতীয়দের হাত হতে এ কোম্পানী ওদের হাতে গিয়ে পড়ল বলে। আজ যেখানে গেলে ভারতীয়দের মুখই কেবল দেখতে পাবেন, আর দুদিন বাদে সেখানে গিয়ে দেখতে পাবেন—শ্বেতাঙ্গে ভরে গেছে।"

বিস্মিত শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম ?"

সুশীল বলিল, "কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী ভারতীয়দের বিশ্বাস করেন না, তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস শ্বেতাঙ্গদের পরে। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, এই কোম্পানী এর পর শ্বেতাঙ্গদের হাতেই থাকবে, ভারতীয়েরা তাদের অধীনে থাকবে, কেন না ওরা বণিকজাতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ওরা যত বুঝবে ভারতীয়েরা তার এতটুকু বুঝবে না।"

উষ্ণ হইয়া উঠিয়া মনীষা বলিল, "তিনি ভারতীয় —বাঙ্গালী নন ?"

সুশীল বলিল, "কিন্তু এইটুকুই যা কলঙ্ক, নইলে তাঁদের পিতাপুত্রীর শিক্ষায়, আচারে-ব্যবহারে কেউ ধরতে পারত না, তাঁদের মাতৃভূমি এই দেশ।"

একটু নীরব থাকিয়া সে বলিল, "এ দেশের পুরুষদের সম্বন্ধে যা ধারণা তাতো স্পষ্টই বুঝলে দিদি, মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা আরও চমৎকার। তিনি স্পষ্টই বলেন, এ দেশের মেয়ের মানসম্ভ্রম নেই, এরা নিজেদের ইজ্জত রাখতে জানে না—"

দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া মনীষা বলিল, "এ কথা বলতে তাঁর মুখ বিবর্ণ হয়ে যায় নি, তাঁর গলার স্বর কেঁপে ওঠে নি, তিনি কি ভুলে গেছেন, এই দেশের মেয়েই বুকের রক্ত দুধের আকারে পরিবর্ত্তিত করে তাঁকে বাঁচিয়েছে ? বুঝতে পারছ কি দাদা, মিস মেয়ো এ দেশের মেয়েদের সম্বন্ধে যে সব অকাট্য সত্য প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন সে সব প্রমাণ কাদের কাছ হতে পেয়েছেন ?"

শশাঙ্ক একটা লঘু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "এই সামান্য ব্যাপারে এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠলে কি চলে মনীষা ?"

উত্তেজিত সুশীল বলিল, "ব্যাপারটাকে আপনি সামান্য বলে উড়িয়ে দিতে চান শশাঙ্ক বাবু, আমি উড়াতে পারিনে। যে আমাদের দেশের সাধ্বী পতিব্রতা দেবীদের সম্বন্ধে এমন নীচ ধারণা রাখে, তার সঙ্গে সম্পর্ক পাতানো দূরে থাক, তাঁর অফিসে কাজ করাও আমি ঘৃণাকর বলে করি।"

একটু থামিয়া সে আবার বলিল, "তিনি ভুলে যেতে পারেন তাঁর মা এই দেশের মেয়ে, তাঁর বোন এই দেশের মেয়ে, এমন কি তাঁর স্ত্রীও এই দেশের মেয়েই ছিলেন ; তাঁদের সৌভাগ্য যে তাঁরা মরেছেন—তাই এই দুর্ভাগ্যের এমন সব কথা তাঁরা শুনতে পেলেন না। তিনি অসঙ্কোচে এমন একটা কথা বলে যেতে পারলেন, কিন্তু আমি তো সে কথা ভুলি নি শশাঙ্ক বাবু। বাংলার এই সব মেয়েদের পানে তাকিয়ে আমার স্বর্গগত মায়ের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে—সেই মা আমার বুকের দুধ খাইয়ে বাঁচিয়েছেন, আমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে জগৎ চিনতে শিখিয়েছেন। আমার বোনের কথা মনে পড়ে ; মনে পড়ে, আমার সেই ছোট বোনটা দুই হাতে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে আমার বুকে মাথা দিয়ে পড়ে থাকত, দাদা নইলে তার খাওয়া হতো না, ঘুম হতো না, খেলা হতো না। আজ তাঁরা কেউ জগতে নেই, কিন্তু এই সব মেয়েদের মুখই তো আমার মায়ের কথা, বোনের কথা মনে করিয়ে দেয়। আজ তাঁরা নেই বলেই না তাঁদের স্মৃতি আমার কাছে এত মূল্যবান বলে মনে হয় শশাঙ্কবাবু।"

তাহার কথা গুলি সকলেরই হৃদয় বেদনায় পূর্ণ করিয়া দিল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া মনীষা কি বলিতে যাইতেছিল, সুশীল বলিল, "আমি ঠিক করেছি কি জানো দিদি—যে মাতৃজাতির অবমাননাকারী—দেশের কলঙ্ক তার সঙ্গে আর কোনও সংস্রব রাখব না, আমি এ কোম্পানির সংস্পর্শ ছেড়ে দেব। কিন্তু শশাঙ্ক বাবু, আমি দুজন লোকের দায়ীত্ব নিজের মাথায় নিয়েছি, একজন নিরঞ্জন —দিদি তাকে চেনেন, আর একজন আমাদের টাইপিষ্ট মিস দাস, এদের কাজের ভার আপনি নিন, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাই।"

মনীষা জিজ্ঞাসা করিল, "মিস দাসের কাজ যাবে কেন ?"

সুশীল ক্লিষ্ট হাসিয়া বলিল, "তার চরিত্রকে ওঁরা বিশ্বাস করেন না। ওঁরা বলেন, যারা খৃষ্টান তারা সব করতে পারে, ওঁরা নেটিভ খৃষ্টানদের আন্তরিক ঘৃণা করেন।"

শশাঙ্ক বলিল, "আমারই উপস্থিত একজন টাইপিষ্টের দরকার কাজেই মিস দাসকে আমি এখনই নিচ্ছি। আর যে ভদ্রলোকের কথা আপনি বলছেন, আশা করছি তাঁকেও কাজ দিতে পারব।"

সুশীলের বুক হইতে একটা ভারি বোঝা নামিয়া গেল।

১৮

অফিসে গিয়াই সুশীল ইরাকে ডাকিতে পাঠাইল। মিনিট পাচ পরে মিস দাস দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। পর্দ্দা সরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আসতে পারি কি?"

সুশীল অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে কাগজ পত্র দেখিতেছিল, ইরার কথা শুনিয়া চমকাইয়া মুখ তুলিল, বলিল, এসো—"

ইরা প্রবেশ করিল।

সামনের চেয়ারখানা দেখাইয়া সুশীল বলিল, "বস, তোমার সঙ্গে অনেকগুলো কথা আছে

আজ মাস খানেক সুশীল সর্ব্বপ্রকারে ইরার সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিয়াছে, তাহার ভাব বুঝিয়া ইরাও দূরে দূরে থাকে, সেও স্বেচ্ছায় কোনদিনই সুশীলের সামনে আসে না। আজ দিন বার চৌদ্দ হইল ইরার মা ইরাকে একা ফেলিয়া জগতের সঙ্গে দেনা-পাওনা চুকাইয়া চলিয়া গিয়াছেন, এ সংবাদও সুশীল পায় নাই।

ইরা চেয়ারে বসিল।

দেওয়ালের ক্লক ঘড়িটায় অনবরত টক টক শব্দ করিতেছিল, ঘরের মধ্যে যে দুজন মানুষ রহিয়াছে উভয়েই সম্পূর্ণ নির্ব্বাক। সুশীল অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতেছিল তাহা সেই জানে, ইরা অনর্থক এভাবে বসিয়া থাকায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। দৈবক্রমে এই সময়ে যদি মিঃ রায় আসিয়া পড়েন সেই কল্পনা করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিতেছিল।

নিজের জন্য সে এতটুকু ভাবে না, তাহার কিসের ভয়? নিজের ভয়ের কথা মনে করিতে গেলেই তাহার হাসি পাইত। যে সমুদ্রে শয্যা পাতিয়াছে, সামান্য ভয় হইত সুশীলের জন্য, পাছে সে মিঃ রায়ের বিরাগভাজন হয়।

স্ত্রীলোকের কৌতূহল বড় বেশী, সে তাই মিস রায় সম্বন্ধে সকল কথাই জানিয়া ফেলিয়াছিল। সুশীলের সহিত মিস রায়ের বিবাহ সম্বন্ধ যে বহুকাল হইতেই স্থিরীকৃত আছে, ভাবি জামাতাকে তিনিই যে মানুষ করিয়াছেন এবং তাহাকেই সমস্ত সম্পত্তি যৌতুক দিয়া যাইবেন, ইহা তাহার নিকট অজ্ঞাত ছিল না।

সে ইহাও শুনিয়াছিল, সুশীল ও মিস রায় উভয়েই উভয়কে প্রাণাপেক্ষা বেশী ভালবাসে। প্রথম যে সময় সুশীলের হাতখানা মিস রায়কে টানিয়া লইতে দেখিয়াছিল সেই সময়টায় তাহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সে অন্তরে বেশী রকম একটা আঘাত অনুভব করিয়াছিল, পরমুহূর্ত্তে নিজের কথা ভাবিয়া নিজেই সে না হাসিয়া থাকিতে পারে নাই।

সে কে, মিস রায় ও সুশীলের মাঝখানে দাঁড়াইবার অধিকার তাহার কি? ইহাই ভাবিয়া নিজের অসারত্ব বুঝিয়া সে অল্পে অল্পে প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছিল।

মাতৃ-বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে কাজ ছাড়িয়া দিবার অদম্য বাসনা তাহার অন্তরে জাগিয়া ছিল, কিন্তু ছন্নছাড়া জীবনটাকে আবার সে টানিয়া লইয়া যাইবে কোথায়? যেখানেই যাক, আহার্য্য সংগ্রহের জন্য আবার তো তাহাকে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে, আর এখানে নয় ওখানে, ওখানে নয় সেখানে করিয়া লাভ কি?

মিঃ রায় প্রায়ই তাহার প্রতি কার্য্যের ত্রুটী বাহির করেন, সুশীল সে সব ত্রুটী নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়। সাময়িক ভাবে তাহাকে সে বাঁচাইয়া গেলেও তাহার ব্যবহারে মিঃ রায় ইরাকে কতখানি সন্দেহের চোখে দেখিতেছেন তাহা সে জানিতে পারে নাই। পিতার আদরিণী কন্যা মিস রায়। পিতার সহিত সে প্রায়ই অফিসে আসে, কিন্তু নিতান্ত ঘৃণাভরেই এই তরুণী টাইপিষ্টের সহিত আলাপ করে নাই। অথচ ইরা বেশ বুঝিতে পারে, মিস রায়ের বড় বড় দুইটী চোখের দৃষ্টি নিয়ত তাহাকেই অনুসরণ করিতেছে, তাহার কাজ দেখিতেছে। ইহা মনে করিতে ইরার সমস্ত

তাহার কর্ম্মপ্রবণ হাতখানা অবশ হইয়া আসে, তবুও সে কাজ করে, তবুও সে নিয়মিত অফিসে আসে।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়াও যখন ইরা দেখিল সুশীল মুখও তুলিতেছে না কথাও বলিতেছে না তখন সে নিজেই কথা বলিল।

"আমায় কি জন্যে ডেকেছেন, মিঃ মুখার্জ্জি?

সুশীল মুখ তুলিল।

তাহার সেই মুখখানার পানে তাকাইয়া ইরা বিস্মিতা হইয়া গেল। সুশীলের এমন অসহায় করুণভাব সে কখনও দেখিতে পায় নাই। আজ এই প্রথম ইরা লক্ষ্য করিল, সুশীল অত্যন্ত রোগা হইয়া গিয়াছে।

সুশীল খানিক তাহার মুখের পানে লক্ষ্যহীনভাবে তাকাইয়া রহিল, ইরা সে দৃষ্টি সহিতে না পারিয়া মুখ নামাইল।"

মুখ ফিরাইয়া সুশীল বলিল, "একটা বিশেষ দরকারে তোমায় ডেকেছি ইরা তুমি বোধ হয় জানো না, আমি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছি?"

"চলে যাচ্ছেন—?"

ইরা চমকাইয়া উঠিয়া বিবর্ণ হইয়া গেল।

শান্তভাবে সুশীল বলিল, "হ্যা, আমি দুই চার দিনের মধ্যেই চলে যাচ্ছি; আর এই যাওয়াই হয় তো আমার শেষ যাওয়া, আমি আর কোনদিনই এ দেশে ফিরব না বলেই ভাবছি, তারপর আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই, ঘটবে।"

ইরা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাচ্ছেন?" তাহার কণ্ঠস্বরে ব্যগ্রতা ঝরিয়া পড়িতেছিল।

সুশীল অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, "খুব সম্ভব জয়পুরে যাব। সেখানে আমার এক আত্মীয় আছেন, তিনি একাই থাকেন, বিয়ে করেন নি, তাঁর কাছেই গিয়ে থাকব। তাঁকে একটা কাজ ঠিক করে রাখতে বলেছি, এর মধ্যে কাগজ পত্রগুলো মিঃ রায়কে দেখিয়ে শুনিয়ে কাজ দেখিয়ে দিয়ে যেতে চাই।"

একটু থামিয়া মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "হিসাব-নিকাশ না দিয়ে তো একপা নড়বার ক্ষমতা নেই, কাজেই ওটা আগে দেওয়া দরকার। সব বদনামই তো নিয়েছি, নেই নি কেবল চোর বদনামটা, তা যে রকম দেখছি তাতে কোনদিন যে ও বদনামটাও নিতে হবে তাই ভাবছি। অবশ্য এ নামটা নেওয়ার জন্যে কেউই কোনদিন আকাঙ্ক্ষা করে না। ডাকাত হতে সবাই চাইলেও চাইতে পারে—কেন না ওর মধ্যে শৌর্য্য-বীর্য্য আছে, ডাকাতের মধ্যেও মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখা যায়, কিন্তু চোরের মধ্যে ও সব বালাই কোনদিনই নেই, কি বল ইরা?"

কথা কয়টা শেষ করিয়া সে প্রচুর হাসিতে লাগিল, কিন্তু ইরা তাহার হাসিতে যোগ দিল না, বিষণ্ণমুখে কেবল তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

সুশীল বলিয়া চলিল, "অবশ্য আমি যাওয়ার আগে তোমাদের ব্যবস্থা করে রেখে যাচ্ছি, সে জন্যে কিছু ভাবতে হবে না।"

মিস্ দাসের কানে হঠাৎ এই কথাটাই আসিয়া লাগিল, সে ব্যগ্রচোখে তাহার পানে তাকাইয়া বলিল, "কিসের ব্যবস্থা?"

সুশীল বলিল, "তোমাদের কাজের।"

ইরা বলিল, "আপনি কেন এমনভাবে হঠাৎ চলে যাচ্ছেন সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

সুশীল বলিল, "সে অনেক কথা, এর পর যদি সময় পাই জানাব, আজ সে সব কথা থাক। আমি এখন তোমাকে বলতে চাই কি তুমি আজই পদত্যাগ পত্র লিখে দাও, ওঁরা তোমায় ছাড়িয়ে দেওয়ার আগে তুমি নিজেই কাজ ছেড়ে দাও, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাই।"

ইরা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "যদি এখন না দেই—?"

সুশীল দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "তোমায় দিতেই হবে, দেব না বললে তো তোমায় ছাড়ব না ইরা। তুমি এখনও বুঝছ না এখানে কাজ করার জন্যে তোমায় কতখানি নীচু হয়ে পড়তে হয়েছে, তোমার সম্ভ্রম পর্য্যন্ত ওদের পায়ের তলায় দলিত হচ্ছে। আমি তোমায় এমনভাবে অপমানিতা হতে এখানে রাখব না; আমি জানি সে জোর আমার আছে, কারণ আমিই তোমায় এখানে এনেছি।"

ইরা হাসিল, সে হাসিতে ঝরিয়া পড়িল তাহার বুকের পুঞ্জিকৃত বেদনারাশি।

সে বলিল, আপনি বলার আগেই আমি কাজ ছেড়ে দেব ঠিক করেছি মিঃ মুখার্জ্জি। যে অপমানের কল্পনা আপনি আজ করছেন, আমি সে কল্পনার আভাস অনেককাল আগেই পেয়েছি।"

সুশীল ব্যগ্রভাবে বলিল, "পেয়েছ তবু ছাড় নি ?"

ইরা নতমুখে বলিল, "না, কেন না আমার চাকরী করার দরকার ছিল, আমার মা বর্ত্তমান ছিলেন। মিঃ মুখার্জ্জি, চাকরী করতে এসেছিলুম কেবল আমার মায়ের জন্যে, মায়ের চিকিৎসার জন্যে, পথ্যের খরচ যোগানোর জন্যে, সে দরকার আমার মিটে গেছে, কাজেই আমার এখন চাকরী করার দরকারও নেই। আমার একটা লোকের জীবন, যেমন করেই হোক কেটে যাবে, নিজের জন্যে কোনদিন ভাবি নি, ভাববও না।"

উৎকণ্ঠিতভাবে সুশীল জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তোমার মা—মিসেস দাস—"

বাধা দিয়া ইরা বলিল, "তিনি আজ তের দিন হল সংসার ত্যাগ করে গেছেন।"

তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, নতনেত্র কোণ বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

সুশীল নির্ব্বাকে শোকাকুল নারীর পানে তাকাইয়া রহিল, একটি কথাও তাহার মুখে তখন আসিল না।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুশীল ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "কিন্তু সে কথা তো আমায় একটা দিনও জানতে দাও নি ইরা, তুমি তো ছুটিও নাও নি তার জন্যে ?

মুখ তুলিয়া শুষ্ককণ্ঠে ইরা বলিল, "কি দরকার ছিল মিঃ মুখার্জ্জি; যারা চাকরী করতে আসে, তাদের যে সব স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাতো আপনার অজানা নেই।"

পরক্ষণেই সে একটু হাসিয়া বলিল, "আর আমার মা তো মরেই ছিলেন, জীবনটা ছিল এইটুকু, কিন্তু জীবিতের কোন চিহ্নই তো তাঁর ছিল না।"

সুশীল নতমুখে সামনের কাগজ কয়খানা নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

খানিক পরে মুখ তুলিয়া বলিল, "ভাল কথা—হয় তো আমায় জানানোর দরকার হয়নি বলেই জানাও নি, কিন্তু আমার মনে হয়—জানালেই ভাল হতো। যাক, যা তোমার নিজের কাজ তার জন্যে আমি মিথ্যে অনুযোগ করব না, এখন তোমার আমি কাজের ঠিক করেছি, তুমি সেখানে কাজ করতে পারবে।"

মিস দাসের মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল, সে জোর করিয়া মুখের উপর একটুকরা হাসি ফুটাইয়া বলিল, "সঙ্গে সঙ্গেই কাজের ঠিক করেছেন, কোথায় কাজ করতে হবে ?"

তাহার সে হাসি দেখিয়া সুশীল থতমত খাইয়া গেল, একটু থামিয়া বলিল, "আমার এক বন্ধুর অফিসে তুমি টাইপিষ্টের কাজ করবে। কিছু ভেব না, মিঃ বোসের মত ভাল ছেলে আমি বাস্তবিকই আর দেখতে পাই নি। তাঁর চরিত্র, লোকজনের পরে নম্র আচরণ, এ সবই তাঁর মহত্বের পরিচয় দেয়। তোমার বেতন সম্বন্ধেও আমি বন্দোবস্ত করেছি, সেখানে তুমি মাসিক আশি টাকা করে পাবে, তারপরে—"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া ইরা বলিল, "ধন্যবাদ! কিন্তু কি হবে আমার আশিটাকা বেতন নিয়ে কাজ করে? আমার পায়ের শিকল খসে গেছে, আমি কোনও হোমে আমার জীবন কাটিয়ে দেব, আমি মুক্ত, স্বাধীন। কাজ না করলেও আমার দিন কেটে যাবে।"

সুশীলের মুখখানা পাংশু হইয়া উঠিল, সে বলিল, "হোমে থাকা বলচ সহজ, কিন্তু আজও যাদের সংস্কার মজ্জাগত হয়ে রয়েছে, হোমে গেলে সে সংস্কার কি যাবে? আমি তাই ভাবছি ইরা, তোমার শুচিতা সংস্কার বাঁচিয়ে সেখানে থাকতে সমর্থ হবে তো ?"

বেদনাপূর্ণ হাসি হাসিয়া ইরা বলিল, "এখন এতদিনে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি, বুঝেছি খৃষ্টান যদি তার পূর্ব্বপুরুষের আচার সংস্কার বাঁচিয়েও চলে, তবুও সে খৃশ্চান। খৃশ্চান যে সে চিরকালই খৃশ্চান, সে হিন্দু হবে না—হতে পারবে না।"

সুশীল কি বলিতে যাইতেছিল, বলা হইল না। দরজার দিকে তাকাইয়া সে সন্ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

দরজার উপর দাঁড়াইয়া মিঃ রায়—তাঁহার মুখে দারুণ ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

১৯

শরীরটা অসুস্থ হওয়ায় রতিনাথ বাবু আফিসে গিয়া ঘণ্টাখানেক বাদেই বাড়ী চলিয়া আসিয়াছিলেন।

মনীষা তখন বাড়ী ছিল না, রতিনাথ বাহির হইবার পরই সে তাহার নারীরক্ষা সমিতিতে প্রত্যহ যেমন যায়, তেমনই চলিয়া গিয়াছিল।

মাথার যন্ত্রণায় রতিনাথ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পরে তাঁহার এই মাথার ব্যারামের সূত্রপাত হয়। কোনও দিন বেশী কাজ পড়িলে বা বেশী রকম ভাবিলে মাথার যন্ত্রণা বড় বেশী রকম হয়।

রতিনাথ বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছিলেন, ভৃত্য বাতাস করিতে করিতে বলিল, "ডাক্তার বাবুকে ডাকব বাবু?"

শুষ্ক হাসিয়া রতিনাথ বলিলেন, "না দরকার নেই, মাথার যন্ত্রণা ঘণ্টাখানেক বাদেই নরম পড়ে যাবে এখন।

পুরাতন ভৃত্য কৃষ্ণ মনীষাকে সংবাদ দিতে একজন ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিল। রতিনাথের অসুস্থ সংবাদ পাইয়া আধঘণ্টার মধ্যেই মনীষা আসিয়া উপস্থিত হইল।

তখন রতিনাথের মাথার যন্ত্রণা একটু নরম পড়িয়াছিল, তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। কৃষ্ণ মনীষাকে দেখিয়া হাতের পাখাখানা রাখিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেল।

রতিনাথের যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়া বড় বেশী রকম আলো আসিতেছিল দেখিয়া মনীষা জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

রতিনাথ উঠিতে যাইতেছিলেন, মনীষা বাধা দিল, আর একটুখানি শুয়ে থাকুন বাবা, এখনি উঠবেন না।

বিস্মিত নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রতিনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কখন এলে মা?"

মনীষা বলিল, "আমি দেড়টার সময় এসেছি আপনাকে আর জানালুম না, সেই পর্য্যন্ত আমি এই ঘরেই রয়েছি।"

রতিনাথ উঠিয়া বসিলেন—চিন্তিত ভাবে বলিলেন, দেখ দেখি কেষ্ট বেটার আক্কেলখানা, একটু মাথা ধরেছে কি—না, অমনি তোমায় খবর দিয়ে বসে আছে। হতভাগাটা ডাক্তার ডাকবার কথাও বলেছিল, ধমকে তবে থামিয়েছি। আরে বাপু, একটু মাথা ধরবে, গা ব্যথা করবে সব তাইতে সকলকে অস্থির করে তোলাই বা কেন, ডাক্তারই বা ডাকা কেন? এ তো আমার সঙ্গের সাথী, যে দিন চিতায় শেষ সেদিন এ আমার একেবারে মরবে, তার আগে কারও সাধ্য নেই যে একে দূর করে। এর জন্যে অনর্থক লোককে জ্বালাতন করা, ভাবিয়ে তোলা কেন?

ক্ষুন্ন হইয়া মনীষা বলিল, "কিন্তু বাবা, এর জন্যে কেউ যে কোন দিন বড় বেশী রকম জ্বালাতন হয়েছে তা বলে তো মনে হয় না, তবে আপনি যদি মনে করে থাকেন—সে স্বতন্ত্র কথা। যখন আপনার লোককে পর বলে মানুষ ভাবে তখনই মনে করে হয়তো তার স্নেহের টানটাও—"

"পর" ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া রতিনাথ বলিয়া উঠিলেন, "সে মা, আর যাই বল ও কথাটা বলো না, তোমায় কোনদিন পর বলে ভাবতে পারি কি? আমার যে মেয়ে চলে গেছে, তারই প্রতিমূর্ত্তি বলেই তোমায় জানি। আমার তো সে দিনের কথা মনে আছে মা, যে দিন তোমায় আমি প্রথম গৃহলক্ষ্মীরূপে আমার ঘরে বরণ করে নিয়ে আসি। সেদিন তুমি ছিলে এতটুকু একটা মেয়ে, দুইহাত দিয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে আমার কানের কাছে কচি মুখখানা এনে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি আমার বাবা, আমায় আর ভবানিপুরে পাঠিয়ে দেবেন না তো? সে দিনে সেই যে তোমায় কোলে নিয়েছিলুম মা—"

বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া তিনি বলিলেন, "তারপর কতই যে ঝড়-ঝাপ্টা আমার মাথার উপর দিয়ে চলে গেল মা, আমার সংসারের একমাত্র অবলম্বন ছেলে গেল, মেয়ে গেল, আমি সব হারালাম। তবু আমি বেঁচে রইলুম, আবার উঠলুম, আবার নিয়মিত কাজ করতে লাগলুম,

সে কার মুখ চেয়ে মা. কাকে অবলম্বন করে? আজ—এই ষাট বছর বয়সেও আমি যুবার মত খাটছি সে কি শুধু নিজের জন্যই, কেবল চাকরী বজায় রাখার জন্যই, তার মূলে আর কাউকে সুখী করবার কামনা নেই কি মা?"

মনীষা এক মুহূর্ত্ত নীরব হইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "হয় তো আছে। কিন্তু বাবা, আমি বলি, আপনি এ রকমভাবে বয়সের অতিরিক্ত খেটে শরীরটা আর নষ্ট করবেন না। আর ভেবেও দেখুন, ষাট বছর যাঁর বয়েস হয়েছে তাঁর এখন খাটবার সময় নয়, বিশ্রামের সময়। সেকালে যাদের বয়স পঞ্চাশের উপরে হতো, তারা সংসারের সব কাজ ছেড়ে দিয়ে ভগবানের নাম করত। আপনি এখন কাজ করা ছেড়ে দিন বাবা, আর কেন? আমাদের যা কিছু আছে তাতেই দিন বেশ স্বচ্ছন্দে রাজার হালে কেটে যাবে।"

একটু থামিয়া রতিনাথ বলিলেন, "সে কথা হয়তো সত্য, কিন্তু কাজ ছাড়লেই তো চলবে না মা, কাজের নেশা ছাড়ব কি করে; ওযে এতটুকু বয়স হতে আমায় পেয়ে বসেছে। ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে বেকার জীবনটা ভারি খাপছাড়া বলে মনে হয়, চিরন্তন নিয়মের সঙ্গে কিছুতেই খাপ খায় না।

জোর করিয়া মনীষা বলিল, "খাপ খাওয়াতে হবেই, না হলে চলবে না। আপনি কাজে জবাব দিন দেখি, আমি আপনাকে এত কাজ দেব যে আপনি নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পাবেন না, অথচ সেগুলো ঠিক সত্যি কাজই হবে।"

মাথাটা একদিকে হেলাইয়া রতিনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ তা হতে পারে কিন্তু একটা কথা কি জানো মা, তুমি যে কাজ দেবে তাতে আমি কতখানি তৃপ্তি পাব? আচ্ছা, আর দুদিন যেতে দাও তারপর দেখি কি করব। শরীর যদি ভাল না বুঝি, অগত্যা কাজে জবাব দিতেই হবে।"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, "আজ তোমার বাবা আমার সঙ্গে দেখা করতে অফিসে গিয়েছিলেন। শুনলুম, কাল তিনি এখানেও এসেছিলেন কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। বলেছেন কাল সন্ধ্যার পর তিনি এখানে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।"

পিতার কথা শুনিয়া মনীষার প্রফুল্ল মুখখানা শুকাইয়া উঠিল, সে জিজ্ঞাসা করিল, "তিনি হঠাৎ কেন আপনার কাছে গিয়েছিলেন?"

রতিনাথ শুইয়া পড়িয়া বলিলেন, "সে অনেক কথা মা, সব বলছি।"

মনীষা বলিল, "তবে একটু পরে বলবেন বাবা, আমি আহ্নিকটা সেরে আসি, সান্ধ্য হয়ে গেছে। আপনি যেন এখন উঠবেন না মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন।"

তাঁহাকে বার বার সতর্ক করিয়া বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়া দিয়া মনীষা বাহির হইয়া গেল। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, বৃদ্ধ রতিনাথ তাহার পানে তাকাইয়া রহিলেন; অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলেন।

ক্রমশঃ

পুষ্পপাত্রের গল্প প্রতিযোগিতার বিশেষত্ব কি আগে দেওয়া নিয়মাবলীতে দেখুন

আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহ

শ্রীবিমল মিত্র

আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহ (Inter communal marriage) লইয়া চারিদিকে তর্ক-বিতর্ক হইতেছে। সহযোগী পত্রিকার কোনও এক প্রতিনিধি কয়েক জন খ্যাতনামা লোকের নিকট হইতে যে মতাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন—তাহা আমরা এখানে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এইরূপ বিবাহের ঘোর বিরুদ্ধে। এ বিষয়ে কোনও বিরুদ্ধ-মত দেওয়া দূরে থাক—তিনি এ সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করিতেই রাজী হন্ নাই।

শ্রীমতী কামিনী রায়—

কামিনী রায়ের মতে আন্তর্সাম্প্রদায়িক এবং পরস্পর বর্ণজাতের মধ্যে বিবাহ দুই-ই প্রচলন হওয়া আবশ্যক। তিনি আশা করেন এটি প্রচলিত হইলে, ভারতের জাতিত্বের বৃদ্ধি হইবে এবং তাহার ভিত্তি আরও দৃঢ় হইয়া উঠিবে। কিন্তু তাহার মতে এই আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহের প্রচলন করিতে হইলে, পূর্ব্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পারিক সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন করা উচিত; প্রত্যেক বিবাহেই বিপদের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যদি দম্পতি-যুগলকে সমান ভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় এবং যদি জীবন-সম্বন্ধে তাহাদের মত সমভাবাপন্ন হয়—তাহা হইলে এইরূপ বিবাহে বিপদের সম্ভাবনা কম। অবশ্য, তিনি বলেন, এইরূপ বিবাহ "সিভিল-ম্যারেজ" পদবাচ্য হইবে।

অধ্যক্ষ হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র—

অধ্যক্ষ বলেন যে একজন ব্রাহ্ম হিসাবে তিনি সম্প্রদায় অথবা বর্ণজাতের পার্থক্য মানেন না, তাঁহার এই মত যে যাহাতে ভবিষ্যতে কোনরূপ অসন্তোষের সৃষ্টি না হয় এই জন্য পাত্র এবং পাত্রী উভয়কেই ভাল করিয়া বাছাই করা উচিত।

ডাঃ এ, সুরবার্দ্দি এম্-এল্-এ—

ডাঃ বলেন :—আমি এই কঠিন সমস্যায় কোনও রূপ নির্দ্দিষ্ট মত দিতে পারি না। এ সম্বন্ধে আমার যুবক বয়সের মত হইতে এখনকার মতের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। যখন Legislative Assemblyতে সার হরি সিং গৌরের Special marriage Amendment Bill লইয়া আলোচনা হয় তখন এই সম্বন্ধে আমাকে মুসলমান সম্প্রদায়ের মত জানাইতে হয়। আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহ কেন প্রচলন হওয়া উচিত নহে, তাহার আইন সঙ্গত কারণ সার বি, এল মিত্র ও রাজা বাহাদুর ও, কৃষ্ণমাচারিয়ার সুন্দর বক্তৃতায় স্পষ্ট করিয়া বলা আছে। গোঁড়া মুসলমান ও গোঁড়া হিন্দু সদা এক্ট এর বিরুদ্ধে এত ভীষণভাবে দাঁড়াইয়াছে—ইহার উপর যাহা তাহাদের ব্যক্তিগত ও ধর্ম্মগত আইনকে আঘাত করিতে আসে, তাহা তাহারা কখনই সহ্য করিবে না। সে ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রেম ও ভালবাসা এই ধর্ম্মের গোঁড়ামী ও ধর্ম্মের বিধি-ব্যবস্থাকে অমান্য করিতে চায় সে রূপ অবস্থায় আইনসঙ্গত পন্থা এবং অন্যান্য অনেক পন্থা মুক্ত আছে।

কুমার শিব শেখরেশ্বর রায়—

কুমার আন্তর্সাম্প্রদায়িক ও পরস্পর বর্ণজাতের মধ্যে বিবাহ—এই দু'য়েরই ঘোরতর বিরুদ্ধে। আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহ হিন্দুসমাজের গঠন ধ্বংস করিবে—ইহাই তাহার মত। কিন্তু তিনি বলেন, হিন্দুসমাজের সামাজিক ক্রম বিবর্ত্তনের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ-প্রথা পরে দরকার হইতে পারে।

মিসেস্ আয়েষা আহ্মেদ

তিনি বলেন :—ভারতবর্ষে বহু জাতি ও সভ্যতার সংমিশ্রণ সাধিত হইয়াছে। মানব-বিজ্ঞানে বলে বাঙালীরা—হিন্দু ও মুসলমান—সমস্তই এক। আমরা স্বীকার করি কিংবা না করি, সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণ নিয়তই

হইতেছে। চলতি ঘটনার উপর সোজাসুজি নজর দিলে আমরা বুঝিতে পারিব—আমরা চাই অথবা না-ই চাই —আন্তর্সাম্প্রাদায়িক বিবাহ-প্রথা আসিবেই। সেই শুভ দিন আরও আগাইয়া লইয়া আসাই মঙ্গল। এই মঙ্গল বিধান করিতে হইলে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে বালক-বালিকার একত্র-শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাতে সকল সম্প্রদায় ও ধর্ম্মাবলম্বীরাই পাশাপাশি বসিয়া শিক্ষা পাইবে; সকলের স্বভাবের উগ্রতা ও তীক্ষ্ণতা চলিয়া যাইবে; যৌন-সম্বন্ধের অতি-বোধ ক্রমে লুপ্ত হইবে এবং বাকীটুকু করিবে প্রণয়। আমার মনে হয়, আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহের বিরুদ্ধবাদীদের পরাজিত করিতে হইলে, এই উপায়ই বিজ্ঞ-জনোচিত।

আমি ভবিষ্যতে সমস্ত জাতি ও সভ্যতার সমাবেশে, পারস্পারিক ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনে এক উন্নত ভারতবর্ষ দেখিতে চাই। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারত-বর্ষেই এইরূপ পরীক্ষায় সুফল প্রদান করিবে। আমি এই অন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহের স্বপক্ষে, এবং ইহা প্রচলন করিতে হইলে, প্রণয় ও পারস্পারিক সম্মানের উপরই নির্ভর করিতে হইবে—পূর্ব্বাহ্ণে ঘটকালি-রূপ ব্যবস্থার দ্বারা ইহার প্রতিষ্ঠা হইবে না। শেষে সুফল হইবে এই যে—আজকাল আমাদের দেশের সর্ব্বত্র যে সাম্প্রদায়িক অ-মিলন দেখা যাইতেছে, তাহা দূরীভূত হইয়া যাইবে। এইরূপ বিবাহ প্রতিষ্ঠিত হইলে—উৎকৃষ্টতর জাতি ভারতে সৃষ্ট হইবে এবং তাহা হইতেই ভারতবর্ষে একতা আসিবে।

মিসেস্ এন, সি, সেন—

ইনি বলেন, আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহ প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে ইহা তাহার মিলন সেতু স্বরূপ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও মনে করেন যে, ইহা আইনে লেখা থাকা উচিত এই ভাবে বিবাহিত দম্পতি-যুগলের প্রত্যেকে তাহাদের পূর্ব্ব-ধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারিবে।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত—

ইনি বলেন:—আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—দেশে যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা দেখা দিয়াছে আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহের দ্বারা ইহার সমাধান হইবে, কি না। আমার মনে হয় না যে যদি এইরূপ বিবাহে উৎসাহ দেওয়া হয় এবং ইহা প্রচলিত হয়, তাহা হইলে উক্ত সমস্যার সমাধান হইবে; বর্ত্তমানে যে আইন আছে তাহা এইরূপ বিবাহে কিছু মাত্র বাধা দেয় না—এবং ইহার সন্তান সন্ততিগণকেও সমধর্ম্মাবলম্বী দম্পতি-যুগলের সন্তানদিগের মতই আইন-সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা হয়।

বর্ত্তমানেই ইণ্ডিয়ান সিভিল ম্যারেজ য়্যাক্ট আইন পুস্তকে লেখা আছে এবং বিবাহকে বিধিবদ্ধ করিবার জন্য কোনওরূপ আন্দোলনের আবশ্যক নাই।

অনেক রকম সামাজিক, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কারণ দেখিয়া আমি এইরূপ বিবাহের বহুল প্রচলন পছন্দ করি না। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণজাতের মধ্যে পারস্পরিক বিবাহের কথার সম্বন্ধে এই বলা যায় যে, ইহাতে শাস্ত্রের কোনও নিষেধ নাই। পুরাকালে এইরূপ বিবাহের প্রচলন ছিল। স্মৃতি ও নিবন্ধ এই বিবাহ স্বীকার করে এবং এই বিবাহে দ্বারা উৎপাদিত সন্তান-সন্ততিগণের ভিন্ন হইবার সময় প্রত্যেকের অংশ ভাগ করিবার বিশেষ আইন-পদ্ধতিও জানাইয়া দিয়াছে।

এখন যে বিবাহ-প্রচলিত আছে, ইহা আমার মতে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ; হিন্দুজাতি যখন বর্দ্ধিষ্ণু ছিল, তখন যেরূপ বিবাহপ্রথা ছিল, সেই প্রথা আজকাল প্রচলিত করিতে হইবে।

অধ্যাপক আবদুল কাদির—

ইস্‌লামিয়া কলেজের অধ্যাপক আবদুল কাদির বলেন:—এই আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহের প্রচলন দুইটি প্রধান সমস্যার সহিত যুক্ত আছে। আমাদের জীবনে ধর্ম্ম অনেক প্রকার সুখ-সুবিধা আনয়ন করে। স্বামী ও স্ত্রী যদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী হয়—তাহা হইলে সংসারে সুখ আসিতে পারে না; কিন্তু শিক্ষা আমাদের পথের সমস্ত বাধাকে অনেক কমাইয়া দিতে পারে। ইস্‌লাম ধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিতে গেলে যদি কোনও দম্পতিযুগল সুস্পষ্ট ধর্ম্মমতে বিশ্বাস করে—তাহাদের জীবনে অসন্তোষ সৃষ্টি হইবার আশা কম। এই কারণেই ইস্‌লাম-আইনে

মুসলমানের সহিত ইহুদিদিগের এবং পরে মুসলমানদের সহিত হিন্দুদের বিবাহে বাধা নাই।

কিন্তু ইহাতে একটি প্রধান সামাজিক অসুবিধা আছে; মুসলমান নারীর যে অধিকার আছে, অন্য ধর্ম্মাবলম্বী নারীর হয়ত সে অধিকার নাই, যথা—বিবাহ-বিচ্ছেদ, যৌতুক উত্তরাধিকারসূত্র ইত্যাদি! এখন মুসলমান নারী অ-মুসলমান কাহাকেও বিবাহ করিলে এই সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। অপর পক্ষে অ-মুসলমান কোনও নারী কোনও মুসলমানকে বিবাহ করিলে, অনেক সুবিধার অধিকারী হইবে—যথা উত্তরাধিকার-সূত্র ছাড়াও যৌতুক সমেত যখন ইচ্ছা বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিবে।

সুতরাং যদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সামাজিক নিয়ম ঐরূপ ভাবে তৈয়ার করা যায়—তাহা হইলে, আমি বিশ্বাস করি, আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহ অতি শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

রেভারেণ্ড্ বি, এ, নাগ—

ইনি বলেন:—স্কুল-কলেজে বালক-বালিকার একত্র শিক্ষাদেওয়ার রীতি বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে যুবক-যুবতী একত্র কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ আন্তর্সাম্প্রদায়িক বিবাহ প্রচলিত হইবে;...ইহাতে বাধা প্রদান করিতে গেলে ইহার ভিত্তি আরও দৃঢ় হইয়া উঠিবে। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, এইরূপ বিবাহ চলিতে দেওয়া উচিত কিনা—তাহা হইলে আমি ইহাই মাত্র বলিতে পারি যে, ইহাতে সামাজিক ও ব্যক্তিগত বহু বিপদের সম্ভাবনা আছে। যদি দেখা যায়, যুবক অথবা যুবতী পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, হয় তাহারা অত্যন্ত ধর্ম্ম ভীরু, নয় তাহারা ধর্ম্ম লইয়া বেশী কিছু চিন্তা করে না। যদি শেষেরটাই সত্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের সন্তানগণ কোনও ধর্ম্মাবলম্বীই হইবে না। ইহা সমাজের এবং দেশের পক্ষে বিপদজনক। আর যদি প্রথমটিই সত্য হয় (অর্থাৎ যদি তাহারা উভয়েই অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু হয়) তাহা হইলে কথা উঠিবে—কোন ধর্ম্মমতে তাহাদের শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হইবে—এবং এই লইয়া স্বামী ও স্ত্রী-মধ্যে হয়ত বিবাদ উঠিয়া তাহাদের সংসারিক জীবনের সমস্ত সুখ নষ্ট করিতে পারে—এবং তাহাদের শিশুসন্তান-দের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইতে পারে। ইহা সকলেই জানেন যে রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী নারী অ-রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী পুরুষকে বিবাহ করিয়া যদি শপথ করে যে তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণকে রোমান ক্যাথলিক মতে শিক্ষা দিবে—তাহা হইলে সেই নারী রোমান-ক্যাথলিক চার্চের নিকট হইতে কিছু সুবিধা (dispensation) প্রাপ্ত হয়—কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা কখনও সুফলপ্রসূ হয় নাই। উপরন্তু এমন অনেক যুবক আছে যাহাদের ধর্ম্মমত বহু-বিবাহ করিবার অনুমতি দেয়; এইরূপ কোনও যুবকের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া শুধু নিজের নহে—সমাজেরও বিপদ ডাকিয়া আনা হয়।

শ্রীযুক্ত পদ্মরাজ জৈন—

তিনি বলেন:—আমি এইরূপ বিবাহের ঘোরতর বিরুদ্ধে। প্রধানতঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে এত তফাৎ যে বিবাহিত জীবনে কখনও সুখ আসিতে পারে না। আমি সত্যই ইহা বিশ্বাস করি যে বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ বিবাহ হিন্দুসমাজের বহুল পরিমাণে ক্ষতি করিবে। কিন্তু আমি বিভিন্ন বর্ণ-জাতের মধ্যে পরস্পর বিবাহ অনুমোদন করি—কারণ ইহা ভবিষ্যতে হিন্দু-সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বর্ণজাত ও শ্রেণীতে প্রাণ-সঞ্চার করিতে সমর্থ হইবে।



বিজয়া

শ্রীললিতমোহন কুণ্ডু

গল্প

সেদিনকার বাহিরের ঝড় অপেক্ষা বড় ঝড় বহিয়া গিয়াছিল উমাচরণের মনের মধ্যে, যখন সে প্রাতঃকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই শুনিতে পাইল যে লতিকাকে পাওয়া যাইতেছে না। ফুটন্ত যৌবনা লতিকা যে তাহার বড় আদরের কন্যা. তাহাকে সকাল হইতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, কোথায় গেল সে? বৃদ্ধ যেন পাগলের মত হইলেন। এই যে তাহাকে এত স্নেহ, ভালবাসা দিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছে সে, তাহাকে না পাইলে সে বাঁচিবে কি করিয়া, তাহার যে এক পা চলিবার উপায় নাই। তিনি আজ হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন যে কখন তাঁহারই অজ্ঞাতসারে তাঁহার সমস্ত ভার পড়িয়াছে লতিকার উপর। লতিকাই যে বৃদ্ধের সমস্ত কাজ করিত, সে যে মুখ দেখিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া লইতে পারিত। তাঁহার এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে লতি না থাকিলে, তাঁহার এক পা নড়িবার সাধ্য নাই, সেই ভয়েই না উমাচরণ এখনও লতিকার বিবাহ দেয় নাই? কিন্তু আজ? লতি যদি আর না ফেরে? বৃদ্ধ আর ভাবিতে পারিলেন না, মাথাটা যেন বন বন করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

বাহিরে প্রবল ঝড়। আকাশ-বাতাস পাগল করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে, এরূপ তাণ্ডবনৃত্য যেন আর কখনও হয় নাই, কিন্তু উমাচরণের মনে তখন যে ঝড় উঠিয়াছিল, তাহা ইহা অপেক্ষা ঢের প্রবল, যেন কখন থামিবে না। উমাচরণের তখন খেয়াল নাই যে, অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে—মুখে কথা নাই, প্রশ্ন নাই, জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর নাই। তাঁহার মন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে চায়, "ওরে ফিরে আয়, লতি ফিরে আয়" - কিন্তু মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হয় না।

"বাবা!"

শশাঙ্ক তাঁহার অষ্টমবর্ষীয় পুত্র, উমাচরণ চমকিয়া উঠিলেন। "কে কে এলি রে? লতি আয় আয় মা, ছুটে আয়, আমি যে আর পারি না।"

শশাঙ্ক ডাকিল, "বাবা"

"কে শশাঙ্ক?" উমাচরণ শশাঙ্ককে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। শশাঙ্ক রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "বাবা! দিদি কোথা গেল বাবা?"

"বল্, বল্ শশাঙ্ক! তোর দিদি কোথা গেল। ওরে খুঁজে নিয়ে আয়। আর যে পারি না শশাঙ্ক?"

শশাঙ্ক পিতার এইরূপ ব্যস্ততায় অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল। কোথা গেল তার দিদি? এই ত কাল রাত্রে দিদির কাছে শুইয়াছিল সে? রাত্রে সে স্বপন দেখিয়াছিল, তাহার দিদিকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, সে চীৎকার করিতে চাহিল, কিন্তু একটু শব্দ তাহার কণ্ঠভেদ করিয়া বাহিরে আসিল না।

শশাঙ্ক চমকিয়া উঠিল, দিদিকে কেহ চুরি করে নাই ত?

শশাঙ্ক চীৎকার করিয়া উঠিল "বাবা!"

শশাঙ্ক পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

"শশাঙ্ক কাঁদিসনি, তুই যদি এরকম ক'রে কাঁদিস, ওরে আমি পাগল হ'য়ে যাব।"

"বাবা দিদিকে বোধ হয়, ডাকাতে ধ'রে নিয়ে গেছে, আমি চীৎকার ক'রে তোমাদের ডাকলুম, তারা আমার গলা টিপে ধ'রলে বাবা, আর কথা কইতে পারলুম না।"

"কি বললি শশাঙ্ক! লতি মা আমার!"

বৃদ্ধ উমাচরণ মূর্চ্ছিত হইয়া লুটাইয়া পড়িলেন।

উমাচরণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন গভর্ণমেণ্ট অফিসার, প্রথম বয়সে তিনি মন্দ রোজগার করেন নাই। লোকে বলিত, তিনি নাকি বেশ দুপয়সা জমাইয়াছেন। কিন্তু তিনি যে পরিমাণে রোজগার করিয়াছিলেন, সে পরিমাণে

জমাইতে পারেন নাই। তাহা কিন্তু কেহই জানিত না। তিনি ছিলেন অমায়িক, দয়ালু, দানী। নিজে স্বচ্ছলভাবে বাস করিয়া, কন্যাকে শিক্ষা দিয়া, দান করিয়া, বিশেষ কিছু রাখিতে পারেন নাই। তিনি দান করিতেন, স্ত্রীর হাত দিয়া দরিদ্র গৃহস্থদিগকে, যাহাদের দুঃখের দায়ে পথে বাহির হইবার উপায় নাই, পরের নিকট হাত পাতিবার উপায় নাই। কিন্তু এ কথা অন্যলোকে জানিতেই পারিত না। বৃদ্ধ বয়সে তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিয়া পেন্সন লইয়া বাস করিতেছিলেন। তিনি যাহা পেন্সন পাইতেন, তাহাতেই তাঁহাদের বেশ চলিয়া যাইত, তাহার কারণ তাঁর বাটীতে লোক চার পাঁচটী।

লতিকে তিনি বড় ভালবাসিতেন। তাই তিনি তাহাকে যথাক্রমে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন। পাছে লতিকার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে হয়, সেই জন্য তিনি স্ত্রীর বারবার কান্নাকাটী এবং অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া কন্যার বিবাহ দিতে চান নাই। তিনি বলিতেন, দেখো সরো, মেয়ের বিয়ে দিলেই সে আমার কাছ থেকে চ'লে যাবে, তাহলে আমি থাকব কি ক'রে? আমি জানি আজ না হয় কাল তার বিয়ে দিতেই হবে, তবুও তাকে শিক্ষা দিই বেশ ভাল ক'রে তারপর তার উপযুক্ত পাত্র দেখে বিয়ে দোব। আর একটা লাভ যে কটা দিন আমার কাছে থাকে।"

বৃদ্ধের মনে একটী বড় আশা ছিল, তিনি একটী উপযুক্ত পাত্র মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। সে হরিশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র অরুণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। অরুণ বাইশ বৎসর বয়স্ক স্বাধীনচেতা যুবক। তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়িতেছিল। অরুণের একটা মস্ত গুণ ছিল এই যে, সে যাহা ভাল বুঝিত তাহা করিত, কোন বাধা-বিঘ্ন সে মানিত না। কাহারও দোষ দেখিলে সে তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিত না। সে নিজে ছিল বিশেষ নীতিবাদী।

তাঁহাদের বাটী ছিল উমাচরণের বাটীর কাছেই এবং তাহাদিগের পরিবারের মধ্যে যাতায়াত ছিল। অরুণ তাহাদের বাটীতে ঘন ঘন যাতায়াত করিত এবং দুই গৃহকর্ত্তার মধ্যে বন্ধুত্বও ছিল। উমাচরণের মনে স্থির বিশ্বাস ছিল যে, অরুণ তাহার সুন্দরী শিক্ষিতা কন্যাকে অপছন্দ করিবে না। আর তিনি লতিকার কথাবার্ত্তার ধরণে মনে মনে বুঝিয়াছিলেন যে লতিকা অরুণকে ভালবাসে। কিন্তু এ কথা স্ত্রীর নিকটে পর্য্যন্ত বলেন নাই। কিন্তু তিনি ধারণা করিতে পারেন নাই যে অরুণও লতিকাকে ভালবাসিতে পারে। অরুণ ছুটীতে বাটী আসিলেই তাহাদিগের নিকট আসিত। অরুণ সর্ব্বসমক্ষে লতিকার সহিত এমন মেলামিশা করিত যে, কেহ তাহার সরলতার উপর সন্দেহ করিতে পারে নাই। কিন্তু লতিকা তাহার পিতার স্নেহের চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারে নাই। উমাচরণ এই সব বুঝিয়াই স্থির করিয়াছিলেন যে, ইহাদের বিবাহ দিবেন। উমাচরণ একদিন কথায় কথায় তাঁহার উদ্দেশ্য হরিশের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে হরিশবাবু বলিয়াছিলেন, "অমন মা লক্ষ্মীকে আমার ঘরে আনার চেয়ে সুখের বিষয় আর কিছু নেই, তবে এখন ত অরুণের বিয়ে দোব না ভাই, আগে বি, এ পাশটা করুক তারপর বিয়ে দোব।"

তাহার পরই কথাটা একপ্রকার পাকা-পাকি হইয়া যায়, কিন্তু কথাটা আর কেহই জানিল না। হরিশ বলিয়াছিল, "দেখো ভাই, এখন কথাটা প্রকাশ হ'য়ে কাজ নেই—অরুণের কানে গেলে ব্যাটার মাথা বিগড়ে যাবে, পাশ করতে পারবে না।" কাজেই ইহা অপ্রকাশিত রহিল। এইমাত্র স্থির হইল যে অরুণের পরীক্ষা শেষ হইলেই তাহাদের বিবাহ হইবে।

ক্রমে ক্রমে আটদিন কাটিয়া গেল। লতিকার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, বৃদ্ধ উমাচরণ অনুসন্ধানের ত্রুটী করেন নাই কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল হইল। বড় আশা ছিল তিনি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন—কিন্তু যখন দিনের পর দিন তিনি নিষ্ফলতার খবর ছাড়া আর কিছুই পাইলেন না, তখন মনকে ধরিয়া রাখিবার আর কিছুই রহিল না। কত আশা করিয়াই না কন্যাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন! অরুণের ন্যায় জামাতা লাভ তাহার ভাগ্যে ঘটিবে না। তাহার চক্ষুর সম্মুখে যেন সারা সংসার কালো হইয়া গেল। এই

যে জলের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে, তাহাকে আর সে আটকাইবে কি দিয়া। কন্যাকে ফিরাইয়া না পাওয়ার এই যে দুঃখ তাহা সহ্য করিবার ক্ষমতা আর যাহারই থাকুক না কেন, বৃদ্ধ উমাচরণের ত নাই। বৃদ্ধ পাগলের মত হইলেন—আহার নাই, নিদ্রা নাই, অনবরত চিন্তা, চিন্তা, চিন্তা। কি জানি লতি এখন কি ভাবে আছে, কিরূপ কষ্টভোগ করিতেছে সে, সে যে, তাহার পিতাকে ছাড়িয়া একদণ্ডও থাকিতে পারিত না। আর এখন? ওরে লতি। তুই কি তোর বুড়ো বাপকে ভুলে গেলি মা? ওরে ফিরে আয়, ফিরে আয়।

বৃদ্ধের মনে নানাপ্রকার এলোমেলো চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, লতিকা তাহার নিকট আসিয়াছে—উমাচরণ তাহাকে ধরিতে গেলেন, লতিকা অমনি অদৃশ্য হইল। বৃদ্ধ কাঁদিয়া উঠিলেন। এইরূপে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। তাঁহার জন্য সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। এইরূপভাবে ইনি আর কতদিন বাঁচিবেন।

আরও দু একদিন গড়াইয়া গেল। সন্ধ্যা হয় হয়। উমাচরণ তাঁহার রোয়াকের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। শশাঙ্ক বাহিরে কোথায় খেলা করিতে গিয়াছে। গৃহিণী সরোজিনী তখন রাত্রের আহারের উদ্যোগে ব্যস্ত।

বৃদ্ধ ভাবিতেছিলেন, "হে কাঙ্গালের ঠাকুর। তুমি এই কাঙ্গালের ধনকে ফিরিয়ে এনে দাও। কোনদিন তোমায় অবিশ্বাস করিনি, কিন্তু আর যে বিশ্বাস রাখতে পারি না ঠাকুর। লতি ত ফিরে এল না। তবে লতি কি বেঁচে নেই? ভগবান······"

"বাবা"!

উমাচরণ চমকিয়া উঠিলেন। কে কে এলিরে? লতি ফিরে এসেছিস মা? দ্যাখ দ্যাখ তোর বুড়ো বাপের অবস্থা দ্যাখ। লতি মা আমার?

"বাবা"।

লতিকা ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। উমাচরণ স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি লতিকাকে বুকের ভিতর চাপিয়া ধরিলেন। দুজনারই চোখে জল, মুখে কথা নাই। কথা কহিয়া এ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিবার ইচ্ছা নাই। লতির ফিরিয়া আসাতেই আনন্দ। এইরূপে কতক্ষণ কাটিল ঠিক নাই। অবশেষে উমাচরণ চক্ষু মুছিয়া ডাকিলেন "লতি"?

"কি বাবা"?

"কোথা ছিলিমা এতদিন? তোর জন্যে যে বড় কষ্ট মা"

লতি বলিতে পারিল না। কেবল তাহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আবার প্রশ্ন করিলেন। লতিকা বলিল, "এতে আমার কোন দোষ নেই। সে দিন রাত্রে প্রদোষ আর দু একটা লোক আমার ঘর থেকে চুরি ক'রে নিয়ে যায়

"প্রদোষ চুরি করেছিল? কেন?"

"হ্যাঁ বাবা প্রদোষ চুরি করেছিল। তোমার কাছে আজ কোন কথা গোপন ক'রব না বাবা, সমস্ত অকপটে ব'লব। তুমি বোধ হয় লক্ষ্য ক'রে থাকবে। প্রদোষ ইদানিং কিরকম ঘন ঘন আমাদের বাটী আস্‌ত। তুমি যেন মনে কোরনা সে তোমাদের জন্য আসত—সে আসত আমার জন্যে। আমি জানতুম, তার চরিত্র খারাপ তাই তার কাছে বড় একটা ঘেঁসতুম না, কিন্তু সে আমার সঙ্গে প্রায়ই নির্জ্জনে কথা কইবার চেষ্টা কোরত। অরুণদা আমাদের বাড়ী আসত ব'লে সে তাকে বড় হিংসা কোরত। অনেকদিন তাকে এড়িয়ে চলার পর একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ একলা তার সামনে প'ড়ে যাই, সে আমার পথ আগলে আমায় কাছে ডাকলে, তার কাছে যেতেই সে আমার হাতটা ধ'রে ফেল্লে। আমি হাতটা ছাড়িয়ে নিতেই সে বল্লে, "রাগ ক'রনা লতি, আমি তোমায় ভালবাসি। তুমি আমায় বিয়ে ক'রবে। কি না বল?" আমি সে কথা অস্বীকার করায় সে অরুণদার নাম নিয়ে অনেক কটু কথা ব'লে শাসিয়ে যায়। আমিও তাকে অনেক কটুকথা ব'লে বিদায় দিই।"

"কিন্তু এসব কথা আমায় আগে কেন বলিস্‌নি মা? তাহলে হয়ত সে তোকে নিয়ে যেতে পারত না।"

"আমি জানতুম সে ছোট, কিন্তু সে'যে এত ছোট তাত জানতুম না বাবা। আমি মনে করেছিলুম সে আমায় ভয় দেখাচ্ছে মাত্র।"

"আচ্ছা এর প্রতিকার আমি করব। তারপর কি হ'ল ?"

"তারপর অনেকদূরে এক যায়গায় নিয়ে যায়। সেখানে আমায় বিয়ে করবার জন্যে পীড়াপীড়ি ক'রে, আমায় মেরে ফেলবার ভয় পর্য্যন্ত দেখায়।"

"কিন্তু সে ত এখানে ছিল, এখান থেকে ত যায়নি ?"

"হ্যাঁ, সে সারাদিন এখানে থাকত, পাছে কেউ সন্দেহ ক'রে। কিন্তু ঠিক সন্ধ্যায় সেখানে যেত।"

"ও বুঝেছি। আচ্ছা তারপর।"

"তারপর তার বামুনকে আমার গয়না দিয়ে হাত করলুম। সে আমায় আসবার ব্যবস্থা ক'রে দিলে। বাবা ?"

"কেন মা ?"

"আমার কি হবে ?"

"ভয় কি মা। আমি কখন কারও অনিষ্ট করি নি। বিনাদোষে ভগবান আমায় শাস্তি দেবে না। ওরে ভগবানই ত তোকে ফিরিয়ে এনে দিলে। আর সমাজ যদি তোকে থাকতে না দেয়, তাহলে স্থির জানিস মা আমারও স্থান এ সমাজে হবে না। আমি তোকে ছেড়ে সমাজকে নিয়ে ত থাকতে পারব না মা। আচ্ছা তুই বিশ্রাম করগে যা।"

লতিকা তাহার মাতার নিকট চলিয়া গেল, আর উমাচরণ ভাবিতে লাগিল তাহার ভবিষ্যতের কথা। যদি সমাজ একথা অস্বীকার করে, যদি কন্যাকে গৃহে স্থান দেওয়ায় আপত্তি করে। তাহা হইলে তাহার কি হইবে। পুত্রের উপনয়ন আছে, লতিকার বিবাহ আছে। আর বাড়ুয্যে একজন সমাজের মাথা সেই কি সকলের কথা ঠেলিয়া তাহার কন্যাকে পুত্রবধূ করিতে রাজী হইবে? তিনি যদি লতিকাকে লইতে না চান তাহা হইলে তাহাকে এতদিন ধরিয়া রাখিবার সার্থকতা কোথায়? বৃদ্ধের চিন্তা করিবার শক্তি লোপ হইল, এমন সময় স্ত্রীর কথায় তাহার চমক ভাঙ্গিল, তাহার স্ত্রী তখন বলিতেছিল, "হা গা এত ক'রে ডাকচি শুনতে পাচ্ছ না? ঘুমুচ্ছ নাকি? খাবার যে জুড়িয়ে গেল।"

পরদিন লতিকা তাহার ঘরে বসিয়া ভাবিতেছিল, সে যে শশাঙ্ককে দিয়া অরুণকে ডাকিতে পাঠাইয়াছে, সে আসিবে কিনা, যদি না আসে তাহা হইলে তাহার কি হইবে? না না আসিবে বৈকি, তাহা না হইলে প্রদোষকে শাস্তি দিবার কি হইবে? সে যে একান্তে অরুণের উপর নির্ভর করিয়া আছে।

অরুণ কাল বৈকালে কলিকাতা হইতে আসিয়াছে, আসিয়াই সে উমাচরণ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছে কিন্তু লতিকার সহিত দেখা হয় নাই। তাই শশাঙ্ককে লতি পাঠাইয়াছিল অরুণকে ডাকিয়া আনিতে। তাহার বিশ্বাস অরুণ্‌দা নিশ্চয়ই আসিবে ইহা সহ্য করিবে না। এই সকল চিন্তা করিতে করিতে সে মাত্র অরুণের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া রহিল, কি সুন্দর, উন্নত গঠন।..

"কি লতিকা ব্যাপার কি বলত ?" হঠাৎ অরুণ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল

"অরুণ্‌দা" লতিকা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"কি বল, কাঁদ্‌ছ কেন ?"

"বল অরুণ্‌দা তুমি আমায় অবিশ্বাস কর না ?"

"এ কথার অর্থ কি লতি ?"

"তবে শোন, রাগ কোরো না, তুমি আমার ব্যাপার সব শুনেছ ত? আমি যে নির্দ্দোষ তার ত কোন প্রমাণ নেই অরুণ্‌দা, কিন্তু তুমি কি বিশ্বাস করতে পারবে ?"

"এ কথা বলবার কোন প্রয়োজন ছিল না লতি, তোমার শিক্ষা আমার হাতেই সুরু, আমি ত জানি লতি তুমি কি, তোমাকে আমি যেমন তেমন আর কেউ চেনে না ভাই, তাই সকলেই যদি অবিশ্বাস করে আমি ক'রব না, আমারই হাতে গড়া লতি ত এত নীচ হতে পারে না। আর একটা কথা আজ তোমায় বলি যা আমি ব'লব না ঠিক করেছিলুম, তুমি লজ্জা পেও না— আমি তোমায় ভালবাসি।"

সঙ্গে সঙ্গে লতিকার গণ্ডদ্বয় লাল হইয়া উঠিল, সে আস্তে আস্তে মাথা নীচু করিল।

অরুণ বলিতে লাগিল, "এ কথা ব'লে যদি কোন দোষ ক'রে থাকি লতি তাহলে তুমি কিছু মনে কোর না। আর এই জন্যই তোমায় আমি অবিশ্বাস করতে পারি না।"

অরুণ সহসা লতিকার হাত ধরিয়া ফেলিল, "বল লতি তুমি আমার উপর রাগ করনি ?"

লতিকার সমস্ত শরীরের ভিতর একটি বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, প্রত্যেক শিরা-উপশিরার মধ্যে জোর রক্ত চলাচল করিতে লাগিল। অরুণ কতবার প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে তাহার হাত ধরিয়াছে। কই লতি ত কখন এমন ভাবে অনুভব করে নাই তাহাতে তাহার এত আনন্দ হয় কেন? লতিকা হাত ছাড়াইবার কোন চেষ্টা করিল না, বলিল, না অরুণ্দা আমি রাগ করিনি। আমি জানি তুমি আমায় ভালবাস, তাই ত তোমায় ডাকতে সাহস করিচি, তাই মনে হয় অরুণদা কপালে এ সইবে কি না। আমার মত তুচ্ছ একটা মেয়ে এ-যে আশা ক'রতে পারে না। একটা কথা শুনবে অরুণদা আমি তোমায়......"

"বল্ বল্ লতি আর দেরী করিস্ না তাহ'লে দম বন্ধ হয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ"

"আচ্ছা তবে আয় লতি আজ আমাদের ভালবাসার প্রথম নিদর্শন রেখে দিই—"

এই প্রথম অরুণ "তুই" সম্বোধন করিল। লতিকা একটু মুখ তুলিতেই অরুণ লতিকাকে বুকে টানিয়া লইয়া গভীর ভাবে চুম্বন করিল।

লতিকা বলিল, "আর আমার কোন ভয় নেই অরুণ্দা, আচ্ছা অরুণদা যদি কেউ দেখতে পেত আমায় কি মনে কোরত বলত? এই এতদিন বাইরে কাটিয়ে এলুম আবার আজকে এই..."

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই লতিকা একটু হাসিল।

অরুণ বলিল, "হ'ত আবার কি আমাদের বিয়েটা টপ্ ক'রে হ'য়ে যেত। যাক সে কথা, আমায় ডেকেছিলে কেন?"

"বোধ হয় এই জন্যে।"

"ধ্যেৎ—ঠিক ক'রে বল্ কেন ডেকেছিলি।"

লতিকা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল, ক্রোধে তাহার শিরা স্ফীত হইয়া উঠিল; বলিল, "আমায় যে এরকম ক'রে অপমান ক'রলে অরুণদা তার শাস্তি দেবে না? তার শাস্তি না হ'লে আমি যে স্থির হ'তে পাচ্ছি না।"

"তুই নিশ্চিন্ত হ লতি, তার পাপের শাস্তি ভগবান দেবেন। আর তাতে তোর যদি বিশ্বাস না হয়, তাহ'লে বিশ্বাস কর—এই লোহার মত শক্ত হাত দুটোকে যে কখন কারুকে ভয় করেনি।"

কিরূপভাবে অরুণ যে প্রদোষকে শাস্তি দিয়াছিল সে খপর লতিকা পাইয়াছিল। অরুণ কাহারও কাছে নালিস করে নাই, কাহাকেও সাহায্যের জন্য ডাকে নাই, নিজে একা সন্ধ্যার সময় সে প্রদোষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া, আর যতক্ষণ না প্রদোষ চৈতন্য হারাইয়াছিল, ততক্ষণ তাহাকে ছাড়ে নাই। তাহা না হইলে তাহাকে যে লতিকার নিকট অবিশ্বাসী হইতে হইবে। সে যে তাহাকে অনেক বিশ্বাস করিয়াছে—সে যে লতিকাকে কথা দিয়াছিল; প্রদোষকে স্বহস্তে শাস্তি দিবে বলিয়া।

লতিকা এই সমস্ত শুনিয়া অত্যন্ত আরাম বোধ করিয়াছিল। সে যে অরুণকে ভালবাসিয়াছে, সে ত তাহার মান রাখিয়াছে তবে আর তাহার ভাবিবার কি আছে? সে যে তাহার উপর নির্ভর করিয়াছিল এই নির্ভরতার মান তো সে সম্পূর্ণভাবেই রাখিয়াছে। কিন্তু......

এই কিন্তু লইয়াই সে বড় বিপদে পড়িয়াছিল। সে জানিত, তাহাদের সমাজ বড় কড়া। সমাজ যদি তাহাকে শাস্তি দিতে চায়, যদি বলে তাহাকে ঘরে স্থান দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে তাহার গতি কি হইবে, কোথায় দাঁড়াইবে সে? কেন সমাজ তাহাকে এত শাস্তি দিবে কেন? কি দোষ করিয়াছে সে? সে ত স্বইচ্ছায় গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যায় নাই। যদি কোন চোর ডাকাত তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া থাকে তবে দুর্ব্বল সে কি করিতে পারে? যাহার দ্বারা সে এইরূপ অপমানিত, লাঞ্ছিত সমাজ হইতে তাহাকে শাস্তি দিবার কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে?

এতকথা সে ভাবিতে শিখিয়াছিল অরুণের কাছে। এই চিন্তা তাহার আরও প্রবল হইয়াছিল যখন গ্রামের মাতব্বরগণ মধুমণ্ডলের চণ্ডিমণ্ডপে পঞ্চায়েৎ বসাইয়া তাহার পিতাকে ডাকিয়া পাঠাইল। লতিকা এত ছেলেমানুষ নয় যে ইহার অর্থ বুঝিতে পারে নাই। তাই গৃহে বসিয়া ছটফট করিতে লাগিল কি ফল হয় শুনিবার জন্য। সে

অস্থির হইয়া উঠিল, না জানি তাহার পিতাকে কি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে; অতগুলি লোকের সম্মুখে তাহার বৃদ্ধ পিতা কি বলিবে। সকলে যদি তাহাকে দোষী বলে তাহা হইলে তাহার পিতা তাহাকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিবে কি দিয়া, প্রমাণস্বরূপ তাহার হাতে কিছুই ত নাই? সকলেই ত আর তাহার স্নেহময় পিতা নয়, সকলেই ত অরুণদা নয় যে, তাহার কথা তাহারা নির্ব্বিচারে মানিয়া লইবে। হঠাৎ সে পায়ের শব্দে চমকিয়া মুখ তুলিল, দেখিল হাসিতে হাসিতে অরুণ গৃহে প্রবেশ করিতেছে। উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হইবামাত্র অরুণের হাসি মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল। লতিকার চক্ষু লাল, কপালে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কেশ দাম। অরুণ প্রশ্ন করিল, "লতি তোর কি হ'য়েছে রে? কোন অসুখ করেনিত? চুপ ক'রে রইলি কেন? কাকাবাবু কোথা? ছি-ছি কাঁদছিস? কি হ'য়েছে বল দিকি?"

"অরুণদা তুমি এখনও শোননি? আজকে আমার পাপের বিচার হবে। তারপর ঠিক হবে আমি এখানে থাকতে পাব কিনা। আচ্ছা অরুণদা?"

"কি?"

"আমাকে তারা থাকতে না দেয়, আমি না হয় চ'লে যাব কিন্তু তুমি বাবাকে দেখবে বল?"

"এসব কথার অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না, লতি। তুমিই বা যাবে কেন আর তোমার বাবাকেই বা দেখতে হবে কেন? প্রদোষকে যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছি, আবার কিসের জন্যে তুমি যে এত উতলা হোয়েচ তা'ত বুঝতে পাচ্ছি না।"

"শোন, আজ মধুমণ্ডলের ওখানে পঞ্চায়েৎ, আর আমিই তার আলোচনার বিষয়।" এই বলিয়া লতিকা কাঁদিয়া ফেলিল। অরুণের এখন অন্যদিকে লক্ষ্য ছিল না। এই এতটুকু দুর্ব্বল সমাজ—যার এতটুকু উপকার করিবার ক্ষমতা নাই, লোকের সর্ব্বনাশ করিবার, জাতিনাশ করিবার তাহার এত আগ্রহ কেন?. কেবল এইটাই কি সমাজের প্রধান কাজ? আর সমাজ বলিতে যাহাদের বুঝায় তাঁহারা যে সকল বিষয়ে এক একটি জটায়ু তাহাতে তাঁহাদের হুঁস নাই।

অরুণ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কোথায়? মধুমণ্ডলের চণ্ডীমণ্ডপে? আচ্ছা যা হয় ব্যবস্থা আমি কোরব। হ্যাঁ তোকে যদি ডাকতে আসে খবরদার তুই যাবিনা," বলিয়া দ্রুত চলিয়া গেল।

মধুমণ্ডলের চণ্ডীমণ্ডপে হারাধন শিরোমণি, উপেন্দ্র তর্কবাগীশ, তর্কচূড়ামণি, শিরোরত্ন, কাব্যতীর্থ, ন্যায়কচকচি প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতগণ থেলো হুকা লইয়া স্ব স্ব পুঁজি হইতে শ্লোক আবৃত্তি করিয়া লতিকার এইরূপ অপরাধ যে কখনও ক্ষমা করা যাইতে পারে না বার বার তাহাই প্রকাশ করিতেছেন। আর উমাচরণ সভার একধারে মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া আছেন। সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, যদিও লতিকার নিজের কোন দোষ নাই তথাপি সে কলঙ্কিণী। কাজে কাজেই তাহাকে আর গৃহে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না। বৃদ্ধ উমাচরণ অনেক অনুরোধ অনেক কান্নাকাটী করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা শুনিলেন না! শিরোমণি মহাশয় তাঁহার বৃহৎ সপুষ্প শিখাটি আন্দোলন করিয়া বলিলেন, "দ্যাখ উমাচরণ তোমাকে আমরা যথেষ্ট স্নেহ ক'রে থাকি সেই জন্যেই আরও বলছি যে কন্যা তোমার এমন বংশে কালি দেয় তাকে আবার তুমি গৃহে স্থান দেবে কি ক'রে বলত? তাহলে আমাদের এই যে হিন্দুসমাজ এতে ব্যভিচার ঢুকবে। সমাজটা একেবারে নষ্ট হ'য়ে যাবে। সমাজে ও সব স্ত্রীলোকের স্থান হ'তে পারে না।"

"ও সব স্ত্রীলোকের স্থান হ'তে পারে না আর তোমাদের মত পাষণ্ড পুরুষের স্থান হ'তে পারে—না ভট্চায্যি?" চমকিয়া উঠিয়া সকলে দেখিল, উগ্রমূর্ত্তি অরুণ চণ্ডীমণ্ডপের উপর উঠিতেছে। শিরোমণি রাগে ফুলিতে লাগিলেন। প্রথমে তাহার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না, হাত হইতে কলিকা পড়িয়া গেল। অবশেষে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কি আমায় পাষণ্ড? দুপাতা ইংরাজী প'ড়ে তোরা কি মনে করিস? আমি ভণ্ড?"

"নিশ্চয়ই"

"তোমাদের মুখদর্শন কর্ত্তে নাই ভণ্ড তোমরা। পাষণ্ড এমন অভিসম্পাত কোরব জানিস তোর জিহ্বা খ'সে প'ড়ে যাবে। এঁ্যা আমি কিনা.."

"থাম পণ্ডীতজী, অভিসম্পাত দেবার তেজ তোমাদের আর নেই, আমি-তোমাদের কাছে মুখ দেখাবার জন্যে বিশেষ লালায়িত নই। কিন্তু কথা এই, তোমাদের মত লোকের সমাজের মাথা হ'য়ে থাকা আর চ'লবে না, হয় তোমরা যাবে, না হয় আমরা যাব। মনে পড়ে না ভট্‌চাযি্য সে'দিন রাত্রিবেলা মাতাল অবস্থায় বাড়ীতে এনে দিয়েছিল কে? আমি। সে দিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে কার বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলে বলত ঠাকুর? তার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ তা আমি জানি। আর তা আমি সকলের নিকট প্রচার করব আর তুমি এখন এসেছ আর একজনকার বিচার কোরতে?"

শিরোমণি ভয়ঙ্কর রাগিয়া উঠিলেন তিনি একটা খড়ম তুলিয়া বলিলেন, "বেরিয়ে যা অর্ব্বাচীন। কে তোকে এখানে আমাদের বিচার কর্ত্তে ডেকেছে ম্লেচ্ছ? এ তোর অনধিকার প্রবেশ। বেরিয়ে যা

অরুণ একহাতে খড়মটা ধরিয়া ফেলিল, বলিল, "বেরিয়ে আমি যাব, কিন্তু ব'লে যাই তোমাদের মত লোকের হাতে একটা মেয়ের জীবন আমি নষ্ট হ'তে দোব না। আপনারা তাকে স্থান না দেন, তার ভয় নেই আমি তাকে বিবাহ কোরব। চাই না সমাজ যেখানকার মাথারা "নর" শব্দের রূপ পর্য্যন্ত ক'রতে জানে না। আসুন কাকা বাবু আপনার কোন ভয় নেই আমরা অন্য যায়গায় গিয়ে বাস ক'রব।"

"অরুণ?"

"বাবা?"

"একি ছেলেমানুষী কোরছ, অরুণ?"

"কেন বাবা?"

"ছাখ বাস্তবিকই লতিকা কলঙ্কিণী, সে ওর ইচ্ছাতেই হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক। কাজেই তার শাস্তি হওয়া দরকার, তা যদি না হ'ত অরুণ আমিই তাহ'লে তোমাদের বিবাহের ব্যবস্থা করতুম। কিন্তু এখন এ মতলব পরিত্যাগ কর। তুমি একজন শিক্ষিত তোমার বিবেচনা করা উচিৎ।"

"আমি অনেক ভেবেছি বাবা, তা হ'তে পারে না। যদি এর কোন সামাজিক কলঙ্ক না থাকত তাহ'লে হয়ত আমি বিবাহ নাও ক'রতে পারতুম কারণ অন্যে একে বিবাহ কোরত। এ আপনাদের কাছে কলঙ্কিণী কিন্তু আমি লতিকে খুব জানি সে ঠাকুরের ফুলটীর মত পবিত্র. কিন্তু যে সমাজে যথার্থ পণ্ডিত নেই, যেখানে নির্দ্দোষ স্ত্রিলোকের শাস্তি হয়, যে সমাজ পুরুষের সকল প্রকার ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দেয়, তাকে শাস্তি দেওয়া দূরে থাক্ নিজেরাও সেই ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়, আর যে কোন স্ত্রীলোকের সময়ই তারা পুঁথির পাহাড় নিয়ে বসে—না না বাবা আমি সে সমাজে থাকতে পারব না। অন্যায়ের পোষকতা আমি কোরতে পারব না। আসুন কাকা বাবু, আমরা এখানে আর থাকতে চাই না কোথাও দূরদেশে চলে যাই যেখানে এই সব শিরোমণি নেই, তর্কচূড়ামণি নেই, সেখানেই আমরা সুখে বাস করব। বাবা আমায় বিদায় দিন।"

বৃদ্ধ উমাচরণ দাঁড়াইয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

শেফালিকা

গল্প

শ্রীপুলিনবিহারী পোদ্দার বি, এল

সেবার জ্যৈষ্ঠমাসে কলিকাতায় খুব গরম পড়িয়াছিল, তাই ভোলানাথ বাবু দুই মাসের ছুটী লইয়া সপরিবারে পূর্ব্ববঙ্গের পৈতৃক বাটীতে চলিয়া আসিলেন। কলিকাতার প্রাচীর-ঘেরা ক্ষুদ্র বাটীর গণ্ডী এড়াইয়া যখন তাহারা পল্লীরাণীর মুক্ত আঙ্গিনায় আসিয়া দাঁড়াইল তখন সকলেই যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। পাথরে বাঁধান এক ঘেয়ে রাস্তায় চ'লে চ'লে আর পোড়া মাটীর বড় বড় ইমারত দেখে দেখে দৃষ্টি তাদের শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিল। আজ চারিদিকে প্রকৃতিদেবীর এই অফুরন্ত শ্যাম সজ্জা দর্শনে প্রাণ তাদের নাচিয়া উঠিল বিপুল আনন্দে। দুই বৎসর পরে কর্ম্মক্লান্ত কেরাণীজীবনের এই অবসরটুকু যে সোনার কাঠীর স্পর্শ তাহা আর কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হয় না—বিশেষতঃ যারা ভুক্তভোগী। বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে, আমোদ আহ্লাদেই এই পরিবারের দিন কাটিতে লাগিল।

ভোলানাথ বাবুর এক মাত্র কন্যা শেফালিকা যে চতুর্দ্দশ বর্ষ পূর্ণ করিতে চলিয়াছে, তাহাকে যে বিবাহ দিয়া পরের ঘরে পাঠাইতে হইবে, কলিকাতার আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়াই হউক অথবা কন্যার প্রতি অত্যধিক স্নেহ বশতঃই হউক, সে কথা ভোলানাথ বাবুর এতদিন মনে হয় নাই। পূর্ব্ব প্রথার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন পল্লী-সমাজদারদিগের নিকট হইতে পরোক্ষে একটু একটু খোঁচা খাইয়া ভোলানাথ বাবু গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া কন্যার বিবাহের জন্য সচেষ্ট হইলেন। ভোলানাথ বাবুর সাংসারিক অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না; কাজেই ভালমন্দ সম্বন্ধও ।।৫টি আসিয়া জুটিল। এদিকে শেফালিকারও অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রীতে গোলাপী আভা ধরিয়াছে, তার পরিপুষ্ট অবয়বে পূর্ণতার ঢেউ লাগিয়া উঠিয়াছে। ঘনকৃষ্ণ দীর্ঘ কেশরাশি এলাইয়া সে যখন আনন্দোৎফুল্ল মরালগতিতে চলিয়া যায় "মেয়েটী বেশ" এই প্রশংসাটুকু সকলেই একবাক্যে তাহাকে দিয়া যায়।

১০।১৫ দিন ধরিয়া বর বাছাই, দেনা-পাওনা এবং অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর রাজনগরের অমল চৌধুরীর ৩য় পুত্র সুরেশের সহিত শেফালিকার শুভ সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল। সুরেশ এবার মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম, বি পাশ করিয়া পাটনায় প্রাকটিস্ আরম্ভ করিয়াছে। বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইলে ভোলানাথ বাবু দরখাস্ত করিয়া আর কিছুদিন ছুটী বাড়াইয়া লইলেন শেফালিকার জীবন ইতিহাসের রঙ্গীণ পাতাটার উপর প্রজাপতি একটা যুগল মূর্ত্তির ছাপ মারিয়া দিলেন। যথোচিত সমারোহের সহিত সুরেশ ও শেফালিকার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

তিন বৎসর শেফালিকার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাটনায় সুরেশের ব্যবসা বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বাটীর দিকে মনটা তত জমে নাই। শেফালিকাকে পাটনা লইয়া যাওয়ার জন্য সকলেই সুরেশকে অনুরোধ করিয়াছে; কিন্তু প্রতিবারেই সুরেশ একটা না একটা বাজে কৈফিয়ৎ দিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। নূতন পশারের সঙ্গে সঙ্গে সুরেশের যে চরিত্র দোষ ঘটিয়াছে একথা সকলেরই কাণে উঠিয়াছে। অঙ্কুরেই বাধা পড়িলে হয়তো সুরেশ অধঃপাতের পথে বেশী নামিয়া যাইতে পারিত না কিন্তু অভিমানিনী শেফালিকা মুখ ফুটিয়া সুরেশকে কোনদিন কোন কথাই বলে নাই। ভাদ্রের ভরা নদীর মত দেহে তাহার যৌবন, মুখশ্রী তাহার অনিন্দ্যসুন্দর, নয়নে হরিণীর দৃষ্টি, বুকে অদম্য ভালবাসা, লেখাপড়ায়ও সে সাধারণ গৃহস্থবধূর

চেয়ে কোন অংশে কম নহে। বিধাতার আশীর্ব্বাদ তো তার উপর পূর্ণ মাত্রায় ঝরিয়া পড়িয়াছে। স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য সে আবার নূতন করিয়া কি করিবে এই ধারণার বশবর্ত্তিনী হইয়া সে কোন দিনের জন্যই তার আত্মাভিমানকে সুরেশের নিকট খাটো করিয়া ধরে নাই। স্বামী যদি তার অলোকসামান্য রূপরাশির মর্য্যাদা না রাখিয়া, তার যৌবনের দাবীকে অগ্রাহ্য করিয়া অন্য রমণীতে আসক্ত হয়, তবে সে দোষ কার? স্বামী যদি গৃহের সুশীতল বারি উপেক্ষা করিয়া মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাতে ছুটিয়া যায় সে কেন নিজের আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীর পায়ে ধরিয়া ফিরাইতে যাইবে? পাপের পথ এমনি পিচ্ছল যে, এক পা বাড়াইয়া দিলে পথ তোমাকে টানিয়া লইবে। বাধা না পাইয়া, স্ত্রীর ঔদাসীন্যে সুরেশও পাপের গভীর পঙ্কে নিমগ্ন হইতে লাগিল। পূর্ব্বে মাঝে মাঝে একবার বাটী আসিত। কথা উঠিলে নিজের দোষটা চাপা দিতেও চেষ্টা করিত কিন্তু পাপের মোহে এখন সে শেফালিকার দিকে ফিরিয়াও চাহে না, লোক লজ্জা জিনিসটাকে একবারে হজম করিয়া ফেলিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিতা শেফালিকার অন্তরাত্মা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। অনাঘ্রাত কুসুমের ন্যায় সে দিন দিন শুকাইতে লাগিল, তার ফুল্লশতদল দেহ দেবপূজার অযোগ্য বিবেচনায় নিজের উপর তার একটা ধিক্কার আসিল, নারীজীবনের কৌস্তুভরত্ন স্বামী-প্রেম লাভের আশায় তার ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণ একান্ত উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। বার বার চিঠি লিখিয়াও সুরেশের নিকট হইতে যখন কোনই জবাব পাইল না শেফালিকা দেবর রমেশকে সঙ্গে করিয়া একদিন পাটনায় সুরেশের বাসায় গিয়া হাজির হইল।

রমেশ শেফালিকাকে পাটনায় রাখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছে। মানুষ যে জিনিসটা নিজের প্রাণ দিয়া বোঝে সেটাকে সে একটু ব্যগ্র আলিঙ্গনেই জড়াইয়া ধরে। শেফালিকাও আজ নিজেকে যেন নূতন ছাঁচে ঢালিয়া লইয়াছে, স্বামীর উপেক্ষাটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাঁর ভালবাসা পাইবার আশায় সমগ্র অন্তঃকরণ দিয়া সে আজ সুরেশকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। স্বামীর নিকট স্ত্রীর যে আত্মম্ভরিতা চলে না তিক্ত অভিজ্ঞতায় সে আজ তাহা বেশ ভাল করিয়া বুঝিয়াছে। সুরেশকে সে সেবা দিয়া বেষ্টন করিয়াছে। সুরেশের ভিতরকার পশুটা যতই প্রবল হউক, শেফালিকার সেবামন্ত্রে সে অনেকটা বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে সম্বন্ধ তার দাবী অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা স্বয়ং দেবরাজেরও নাই, সুরেশ তো সামান্য মানুষ মাত্র। সে এখন শেফালিকাকে ভয় করিয়া চলে—প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করিবার মত সাহস তাহার আর নাই। স্বভাব শীঘ্র বদলাইবার নহে। অপরাধী যেমন কাতর দৃষ্টিতে বিচারকে সম্মুখে দাঁড়ায় সুরেশও তেমনি গোপনে অনুষ্ঠিত পাপ কার্য্যের জন্য ধরা পড়িয়া কৈফিয়ৎ দিতে আসিয়া শেফালিকার সম্মুখে শঙ্কিত দৃষ্টি লইয়া দাঁড়ায়। শেফালিকার নিকট সুরেশ কতবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে সে আর বাহিরে যাইবে না কিন্তু প্রতিজ্ঞা সে রাখিতে পারে নাই। সুযোগ পাইলেই অপরাধ করিয়া বসিয়াছে। অনুনয় করিয়া, অভিমান করিয়া, রাগ করিয়া কিছুতেই যখন সুরেশকে করায়ত্ত করিতে পারিল না, শেফালিকা রোগের বিষময় পরিণাম চিন্তা করিয়া কতকটা ভাঙ্গিয়া পড়িল।

পাশের বাড়ীর উকীল পঙ্কজবাবুর সহিত সুরেশের খুব ভাব ছিল। নারী ভিন্ন নারীর ব্যথা বুঝিতে পারে না, তাই পঙ্কজের স্ত্রী নীহারিকাও শেফালিকার এই নূতন অভিযান সাফল্যমণ্ডিত করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। দুজনের প্রায় একই বয়স, তারপর বিদেশে এই পাশাপাশি বাসের জন্য বন্ধুত্বটা সহজেই খুব ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। জরুরী একটা মোকদ্দমা থাকায় পঙ্কজ ১০॥টা বাজিতেই বাহির হইয়া গিয়াছে। বাটী ফিরিতেও রাত্রি হইবে বলিয়া গিয়াছে। কাজেই নীহারিকা বামুন ঠাকুরকে প্রয়োজন মত উপদেশ দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াই বিকালের দিকে প্রিয় সখী শেফালিকার নিকট গিয়া হাজির হইল। দুইবন্ধুতে অনেক কথাবার্ত্তা হইল, সুরেশকে জব্দ করিবার অনেক মতলব আঁটা হইল। কৃতকার্য্য হইবার আশা নাই ভাবিয়া আবার তাহা পরিত্যজ্য হইল। শেষে নীহারিকার মাথায় নূতন

রকমের একটা খেয়াল চাপিল। সেটা হইতেছে এই— নীহারিকা পুরুষবেশে শেফালিকার সহিত অন্য সন্ধ্যার পর প্রেমের অভিনয় করিবে। শেফালিকাও সোহাগভরে কল্পিত প্রেমিকের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িবে। দরজা খোলা থাকিবে, সুরেশ ঘরে ঢুকিলে তার লক্ষ্য পথে পড়িয়াই নীহারিকা খিড়কীর দরজা দিয়া পলায়ন করিবে। তারপর সুরেশের সহিত শেফালিকার কিরূপ কথাবার্ত্তা হইবে এবং শেষে কিরূপ ভাবে সমস্যার সমাধান হইবে তারও একটা খসড়া হইয়া থাকিল। শেফালিকা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া নীহারিকার পিঠে একটা কিল বসাইয়া দিয়া বলিল "পোড়ার মুখি, এত আজগুবি ফন্দিও তোর মাথায় আসে?

নীহারিকা—যেমন কুকুর তেমন মুগুর না হ'লে কি চলে ভাই? নেমকহারাম পুরুষ জাতটাকে হাতে রাখতে হ'লে রাশ সব সময়ই টেনে রাখতে হয়। একটু আলগা পেয়েছে কি বিপথে চলতে সুরু করেছে। ক্যোচ্‌ম্যান কি ক'রে বেয়াড়া ঘোড়াকে চাবুক মেরে মেরে কাজে লাগায় তা বুঝি তুই দেখিস্ নি?

শেফালিকা—তোর ঘোড়াতো ভাই বিপথে যায় না, তবে তুই এ চাবুক মারা বিদ্যেটা শিখলি কোথায়?

নিহারীকা—ইস্! ফাঁক পেলে ঘোড়া যে বিপথে যেতে পারে না তা তুমি মোটেই বিশ্বাস করোনা বলে রাখ্‌ছি। রাশ আমি জোরে টেনেই রাখি, ঘোড়ার সাধ্য কি বিপথে যায়! আমি তো আর তোর মত বোকা নই যে রাশ আলগা করে দিয়ে ঘোড়ার সহিত পীরিত্ত করতে যাব।

শেষে ঐ কথাই ঠিক হইল। সন্ধ্যার পর নীহারিকা নূতন অভিসারের জন্য রমণীমোহন বেশে শেফালিকার কুঞ্জে আসিয়া হাজির হইবে। সন্ধ্যার পর পঙ্কজ বাটী আসিলে নীহারিকা তাহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিল। পঙ্কজ হাসিতে হাসিতে নীহারিকাকে কাছে টানিয়া লইয়া তার গোলাপীগণ্ডে চুম্বনের রেখা অঙ্কিত করিয়া দিয়া বলিল, "এটা তোমার নূতন আবিষ্কারের পুরস্কার। পঙ্কজের নিকট হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত নীহারিকা পরদিন সন্ধ্যার পরই মদনমোহন বেশে শেফালিকার কুঞ্জে গিয়া হাজির হইল। নীহারিকাকে দেখিয়াই শেফালিকা বলিয়া উঠিল "এস এস ওগো আমার রসিক নাগর, তোমার অধরসুধা পানের জন্য আমার চিত্তচকোর যে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে উঠেছে।"

নী—চুপ কর পোড়ারমুখি! ঝী এখনও বাইরে দাঁড়িয়ে

শে—বাঃ রে। আমার যে উৎকট বিরহ জেগেছে তাতে লজ্জা-মান-ভয় এ তিনের কোনটাই তো থাকার কথা নয়। এরকম সম্ভাষণ না হ'লে আমার শ্যাম নটবর বংশীবাদন যে অভিমানেই ফিরে যাবে।

নী—ওগো আমার প্রেমময়ী রাধে, তোমার প্রেমে যে শ্যাম চাঁদ হাবু ডুবু খাচ্ছে। এবার "দেহি পদ-পল্লব" ছাড়া উপায় নাই। এখন দয়া করে একটা পান দাও তো, তাড়াতাড়িতে সাজা পানটা ফেলে এসেছি।

শে—আজ যদি তুমি তোমার প্রেমানুরক্তা শেফালিকার পান ছেড়ে অন্য কারও সাজা পান খেতে তা হ'লে তো আমি দেয়ালের গায়ে মাথা ঠুকেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিতাম।

নী—ভাগ্যিস তা হ'লে ভুলটা হয়েছিল, নচেৎ আবার তো সতীদেহ কাঁধে নিয়ে ত্রিভুবন তোলপাড় করতে হোতো।

সখিদ্বয়ের কথাবার্ত্তা আর বেশী সময় চলিল না! বাইরের ঘরে ডাক্তার বাবুর জুতার শব্দ শোনা গেল। নীহারিকা তাড়াতাড়ি পালঙ্কের উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বাম হস্তের উপর গণ্ডস্থল ন্যস্ত করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মানা শেফালিকার একখানা হস্ত ধারণ করিয়া হাসিমুখে প্রেম নিবেদন সুরু করিয়া দিল। শেফালিকাও মাঝে মাঝে প্রেমিকার সোহাগ ভরে নীহারিকার গায়ে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। ঘরে ঢুকিবার মুখেই ভিতরে ঐরূপ কথাবার্ত্তার শব্দ পাইয়া সুরেশ থমকিয়া দরজার পাশে দাড়াইল। একটুখানি শুনিয়াই তাহার গোলাপী নেশার ঝোঁকটা কাটিয়া গেল। রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল, ইচ্ছা হইল, এখনই দুটিকে কাটিয়া জলে ভাসাইয়া দেয়। প্রেমিক যুগলও সুরেশের দরজার পার্শ্বে আগমন বুঝিতে পারিয়া প্রেমের বহরটা একটু বাড়াইয়া দিল। সুরেশের আর সহ্য হইল না, সবেগে দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিল, "প্রাণ ভরিয়া সখ মিটাও,

তাইতো সুবর্ণ সুযোগ" নীহারিকা তাড়াতাড়ি খিড়কীর খোলা দরজা দিয়া ছুটিয়া পলাইল। শেফালিকা ভয়ের ভান করিয়া, ধরা পড়িয়াছে বলিয়া যেন তাহার উত্তর দিবার সাহস নাই এই ভাবই প্রকাশ করিল। সুরেশ ক্রোধদীপ্ত কণ্ঠে বলিল, সতী শিরোমণির ক্ষুধা মিটাইবার এরূপ সুযোগ কতদিন হইতে জুটিয়াছে জিজ্ঞাসা করি ?

শে—সে দিন হইতে যেদিন তোমার পায়ে ধরিয়াও দুলালী বাইজীর বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিতে পারি নাই। (অবশ্য স্বামীর মুখে মুখে এইরূপ উত্তর দিতে যাইয়া শেফালিকা লজ্জায় ও ভয়ে ভিতরে ভিতরে শিহরিয়া উঠিতেছিল।)

সুরেশ—সতীত্বের অহঙ্কারে যে আর মাটীতে পা দিতে চাইতে না। আজ তোমার ভূয়ো সতীত্বটা রাস্তার ধূলায়ও স্থান পাবার যোগ্য নয়।

শে—আমার উপর যত পার দোষারোপ কর। কারণ আমি হাতে হাতে ধরা পড়িয়াছি। কিন্তু সাধারণ ভাবে হিন্দুরমণীর সতীত্বের উপর দোষারোপ করিবার অধিকার তোমার নাই। গৃহলক্ষ্মীদের সতীত্বই এই হিন্দু সমাজের মেরুদণ্ড। হিন্দুরমণীর সতীত্বের উপরই নির্ম্মিত হয়েছে সনাতন ধর্ম্মের এই অভ্রভেদী চূড়া—শত ঝঞ্ঝা শত প্রলয়েও যাহা হিমাদ্রীর মত অচল অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সু—পর পুরুষের সহিত ঢলাঢলিতেও সতীত্বটা বজায় থাকে নাকি ?

শে—পরনারীর সহিত ঢলাঢলিতে পুরুষের পবিত্রতা যদি বজায় থাকে, তবে নারীর-ই বা থাকিবে না কেন জিজ্ঞাসা করি ? সমাজের আদরের দুলাল পুরুষও অগ্নি সাক্ষী করিয়া বৈদিক মন্ত্রে বিবাহিত স্ত্রীর সকল দাবী অগ্রাহ্য করিয়া সারারাত্রি বারাঙ্গনার সজ্জিত নরকে ডুবিয়া দানবীয় লীলা করিবেন, তাহাতে কোন দোষ নাই। নেশার ঘোর কাটিয়া গেলেই তাহারা পূজার পুষ্পের মত পবিত্র, আর নারী পরপুরুষের দিকে চাহিলেই সে সমাজের পতিতা সকলের কাছেই ঘৃণ্য। জগতে তার আর মুখ দেখাইবার ও অধিকার নাই। বিবাহের মর্য্যাদা রক্ষা বিষয়ে পুরুষের কোন কর্ত্তব্য নাই, সমস্তই তাহার খেয়াল অথবা অনুগ্রহের উপর নির্ভর করেই আর সমস্ত কর্ত্তব্যের বোঝা, শাস্ত্রবাক্যের সমস্ত বিধি নিষেধ অবাধে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এই দুর্ব্বল নারী জাতটার উপর। পুরুষের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার অধিকার নারীর নাই। পুরুষ নির্ব্বিবাদে তার স্বেচ্ছাচারিতার বিজয় শকট অবলার প্রাণের উপর দিয়া চালাইয়া দিবে, এই তো তোমাদের শাস্ত্রের বিধান ?

সুরেশ—শাস্ত্রটা তোমাকে জব্দ করিবার জন্য আমি হিংসাপরবশ হ'য়ে লিখে রাখি নি।

শে—তুমি না হইলেও তোমাদের পুরুষ জাতেরই লেখা শাস্ত্রের অধিকাংশ বিধান। শাস্ত্রকার যদি নারী হইত, তাহা হইলে হয়তো বিধানটা অন্যরূপ হইত। মানুষ ছবি আঁকে তাই মানুষের পদতলে সিংহ; আর সিংহ যদি ছবি আঁকিত তাহা হইলে সিংহের পদতলেই মানুষ দেখা যাইত। বলিতে বলিতে শেফালিকার চক্ষে অগ্নির দীপ্তি ছুটিয়া বাহির হইল। একটা মহিমাময় তেজ যেন তাহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিল। শেফালিকার শেষকথাগুলি সুরেশের কাণে গেল কিনা বলা যায় না। সে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "ভুতের মুখে রামনাম শোনার প্রবৃত্তি আমার নাই; ভাল চাও যদি এই মুহূর্ত্তে আমার গৃহ ত্যাগ করে তোমার প্রবৃত্তির কাহারো অন্য সন্ধান দেখ গে।" ঠিক সেই সময়ে পঙ্কজ পুরুষ বেশী নীহারিকাকে ধরিয়া আনিয়া সুরেশের সামনে হাজির করিয়া বলিল—"দেখ দেখি ভাই এই দুর্ব্বৃত্তই কি তোমার স্বর্ব্বস্ব হরণের চেষ্টায় ছিল ?" ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র যেমন ছুটিয়া যাওয়া শিকার পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহার উপর বিপুল বিক্রমে লাফাইয়া পড়ে, সুরেশ সেইরূপ আক্রোশেই নীহারিকার দিকে অগ্রসর হইলে একদিক হইতে পঙ্কজ অন্যদিক হইতে শেফালিকা তাহার গতিরোধ করিয়া দিল।

রহস্যটা যখন উদ্ঘাটিত হইল, সুরেশ লজ্জায় ঘৃণায় মাথা নীচু করিয়া রহিল। নীহারিকা হাসিয়া সুরেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ঠাকুরপো পরধনে লোভ করার চেয়ে নিজের ধন আগলে বসে থাকাই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ। আর দেখ শেফী এখন থেকে রাশটা একটু জোরে টেনে রাখিস"।

জাতির বৈরী

—গাথা—

শ্রীভারত কুমার বসু

[প্যারিসে ভুবন-বিখ্যাতা সুন্দরী নর্ত্তকী মাতাহারির নৃত্যাভিনয়ে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে পাবার জন্য কেবল ফ্রান্সের ধনী-বিলাসীরা নয়,—ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, স্পেন ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের উচ্চ-পদস্থ অনেক রাজ-কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত আত্ম-মর্য্যাদা হারাতে ব'সেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ সারা ইউরোপে মহাসমরের দামামা বেজে উঠলো। চতুর জার্ম্মাণী তখন প্রচুর অর্থের বিনিময়ে মাতাহারিকে হস্তগত ক'রে তাঁকে গুপ্তচরের কাজে নিযুক্ত ক'রলে। কিন্তু যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসর ১৯১৫ সালের প্রথম দিকেই ফরাসী-কর্ত্তৃপক্ষের কাছে মাতাহারির সমস্ত কৌশল ধরা প'ড়ে গেল। নৃত্যের বিলাস মঞ্চ থেকে তাঁকে এনে কারাগারের রুদ্ধ কক্ষে বন্দী করা হয়। কোর্ট-মার্শাল্-বিচারে ঐ বছরেই (১৯১৫ সালেই) ১৫ই অক্টোবর তারিখে সকাল বেলায় বন্দুকের 'গুলি'তে তাঁকে হত্যা করা হ'লো। এই সত্য ঘটনার উপরেই নিম্নলিখিত কবিতাটীর ভিত্তি।]

(১)

নিখুঁৎ রূপসী লীলা-পটিয়সী অভিনয়ে অভিরাম,—
কপোলের লালে ভুলাতে যুবায় পথ খোঁজে অবিরাম।
পীবর-বক্ষে কণক-কান্তি,—আঁখিতে উন্মাদনা ;
চরণে বিলালো কোমল হৃদয় কত-না বেপথু জনা।
প্রেমের পসারী রূপসীর রূপে যৌবন-বিনিময়।
নটীর নয়ন-শায়ক করিল ভুবন-চিত্ত জয়।

(২)

জাতির তীর্থ পুণ্য নিত্য, স্বাধীন সোনার দেশ
তখনো সহেনি বিষের বাতাসে ব্যাকুল বেদনা-লেশ।
তখনো বাহুর প্রীতির বাঁধন বাঁধা ছিল গলে-গলে,
মিলিত সবাই মুক্তি-প্রতীক পতাকার তলে-তলে।
তখনো সবাই আদরে কুসুম চুমিত সুবাস শুঁকে।
কেহ না জানিত, কীটের আবাস গোপন, ফুলের বুকে!

(৩)

বিজাতি-বৈরী রূপসী নারীর হেরি' ছল্-সুচাতুরী
উৎকোচে দিল রমণীর হাতে গুপ্তঘাতীর ছুরী।
ঘৃণ্য পাপের কৌশলে যারা সয়তান হ'তে ক্রুর,—
ভা'য়ের অস্ত্রে অনুজের করে আঘাতে অস্থি চূর্,—
বীর্য্য যাদের পটের আড়ালে,—ভীরু ও ফেরুর পাল,—
তাদের হ'তেও রূপসী ছড়ালো কুটিল কাঁটার জাল!

(৪)

অযুত-লক্ষ ছেলের রক্তে যে-দেশে এসেছে জয়,—
যার মাটী বুঝি আজো লালে-লাল্—পথ-ঘাট বনোময়,—
স্মৃতির শ্মশানে আজো যেথা স্বর ভেসে আসে প্রতি-কানে,
"ভালবেসো মোর জন্মভূমিরে, ভালবেসো প্রাণে-প্রাণে!"—
সে-মাটী-মাতায় শিকল পরাতে গোপন তথ্যগুলি
চলিল নাগিনী, বৈরীর হাতে একে-একে দিতে তুলি'।

(৫)

ভাবেনি স্বপনে 'প্যারী'র পিয়ারী, একদা যাহারা ভুলে
রঙিলা হাসির মূল্য দিয়েছে নিমেষে হৃদয় খুলে,—
হ'য়েছে বিভোল্,—আঁখির বিলোল্ দিঠির ইন্দ্রজালে,—
অলির মতন আঁকিয়া চিহ্ন কোমল কমল-গালে,—
তাদের বক্ষে জাতির চেতন সহসা অট্টহাসে
জাগিয়া উঠিবে বিলাস ত্যেজিয়া বিপুল তেজোচ্ছ্বাসে!

(৬)

নগরে-নগরে শুনিল সবাই, কারায় রূপসী-নারী!
বিচারে, অগ্নি-অস্ত্র-আঘাতে জীবনের শেষ তারি!
...বীরেরা বিকল হয়নি নটীর নয়নের ছলনাতে!
বীরের প্রণয় নারী সাথে নয়,—তীক্ষ্ণ অসির সাথে!
মুক্ত, দৃপ্ত বক্ষে যাহারা কামান-গোলক ধরে,
পারে কি রমণী তাদের হৃদয় ভেদিতে আঁখির শরে?

(৭)

বধ্যভূমিতে হাসিল রূপসী ;—অদূরে সেনার দল।
বন্দুকে বুঝি ছুটিল অগ্নি ;—সব থির ভূমিতল!
সহসা রূপসী ত্যেজিয়া বসন চকিতে নগ্ন দেহ!
হায় সে ক্ষণিক! ছুটিল শস্ত্র ;—বিকল হ'লো না কেহ।
নটীর রক্তে ভিজিল পৃথ্বী ;—বাণী গেল ভেসে ভেসে,—
"জাতির বৈরী এ ভাবে ঘুমায় যুগে-যুগে দেশে দেশে!"

———

নানা কথা

ভারতের ঋণ সম্পর্কে কংগ্রেস

ভারত গভর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত বহু টাকা ঋণ করিয়াছেন। ন্যায়তঃ ভারতবাসী এই সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য কিনা এই প্রশ্ন উঠিয়াছে।

অনুসন্ধান করিয়া এই বিষয়ে মত প্রকাশের জন্য করাচী কংগ্রেসের অধিবেশনে একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছিল। সম্প্রতি সেই কমিটির রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। রিপোর্টখানি তিন ভাগে বিভক্ত। ইহাতে প্রথমে ১৮৫৮ সাল পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তাহার আলোচনা আছে। তারপর বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে আসিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট যে টাকা ধার করিয়াছেন, তাহার হিসাব দেওয়া হইয়াছে। সদস্যগণ একমতে মন্তব্য করিয়াছেন যে, ন্যায়সঙ্গত উপায়ে এবং ভারতবাসীর উপকারের জন্য যে সমস্ত ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার দায়িত্ব ভারতবাসীরই গ্রহণ করা উচিত।

কোম্পানীর আমল :—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া সদস্যগণ বলিয়াছেন, ব্যবসা ও রাজ-শাসন এই দুইটি কার্য্যে কোম্পানী ব্যাপৃত ছিলেন। গোড়ার দিকে এই দুই কাজের পৃথক হিসাব রাখা হয় নাই। সুতরাং সে হিসাব পাইবার উপায় নাই। তবে ১৮৮১ সালে সার জর্জ্জ বেলফুরের প্রস্তাব অনুসারে কোম্পানীর ঋণের একটি তালিকা পার্লামেণ্ট সভায় দাখিল করা হইয়াছিল। তাহা হইতে জানা যায়, ১৮৫৭ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত কোম্পানীর ঋণ ছিল ৫ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড। নিম্নলিখিত কাজের জন্য এই ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল :—

প্রথম আফগান যুদ্ধ	১৫,০০০,০০০
ব্রহ্মদেশের দুইটি যুদ্ধ	১৪,০০০,০০০
চীন, পারস্য ও নেপালে অভিযান প্রেরণ প্রভৃতি	৬,০০০,০০০
১৮৩৩-১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মূলধনের সুদ ইত্যাদি	১৫,০০০,০০০
পাউণ্ড	৫০,০০০,০০০

ভারতের বাহিরে যে সমস্ত যুদ্ধ হইয়াছে, তাহার ব্যয় বহন করা ভারতবাসীর কর্ত্তব্য নহে, কমিটির সদস্যগণ, বিশিষ্ট ইংরাজের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া এই মন্তব্য সমর্থন করিয়াছেন।

"ভারত গবর্ণমেণ্টের সৈন্য বল ও অর্থবলের দ্বারা এশিয়ার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। কোন কোন স্থলে একমাত্র বৃটিশের স্বার্থেই এই সমস্ত যুদ্ধ করা হইয়াছে। বৃটিশ মন্ত্রিসভার নির্দ্দেশ ক্রমে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারত গভর্ণমেণ্ট এই সমস্ত যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং এই সমস্ত যুদ্ধের জন্য বৃটিশ জাতিই সম্পূর্ণ দায়ী। দৃষ্টান্ত স্থলে আফগান যুদ্ধের কথা বলা যাইতে পারে। কোম্পানীর ডিরেক্টারগণকে জিজ্ঞাসা না করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন।......ইদানীং পারস্যের সহিত যে যুদ্ধ হইয়া গেল, তাহাও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টেই ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহার সহিত ভারতবাসীর স্বার্থের কোন সম্পর্ক নাই।" সার জর্জ্জ উইংগেট।

"......আফগান যুদ্ধের ব্যয়ের কথা বলিয়াছি। ইংরাজের উপরই এই ব্যয়ভার অর্পণ করা উচিত ছিল। কারণ বৃটিশের স্বার্থের জন্যই বৃটিশ মন্ত্রিসভা এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।......" মিঃ জন্ ব্রাইট।

এই সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির অভিমত উদ্ধৃত করিয়া কমিটি মন্তব্য করিয়াছেন, এই ৫১,০০০,০০০ পাউণ্ড ঋণ পরিশোধ করা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

১৮৩৩ সালের এক আইন অনুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মূলধনের টাকা শতকরা ১০ টাকা হিসাবে সুদসহ পরিশোধ করা হয়। এই বাবদে মোট ৩৭,০০০,০০০ পাউণ্ড অর্থ প্রদান করা হয়। ভারতের রাজস্ব হইতেই এই অর্থ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ভারতবাসীর তাহাতে কোনই উপকার হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যে অধিকার ও সম্পত্তি ছিল, তাহা বৃটিশ জাতির প্রতিনিধি হিসাবে বৃটিশ পার্লামেণ্ট ক্রয় করেন। অর্থ ভারতের হইলেও এই ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে ভারতীয় সম্পত্তির মালিক হন বৃটিশ জাতি। সুতরাং ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ এই অর্থের জন্য ভারতবাসীকে দায়ী করা যায় না।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ দমন করিতে প্রায় ৪০,০০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখনও এদেশ শাসন করিতেছিলেন। কমিটী মন্তব্য করিয়াছেন, সেই কোম্পানীর কুশাসনের ফলেই সিপাহী বিদ্রোহ হইয়াছিল। সুতরাং সিপাহী বিদ্রোহ দমনের ব্যয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বহন করা উচিত।

এই সম্পর্কে ১৮৭২ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখে তদানীন্তন ভারত-সচিব এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলেন, ১৮৫৭-৫৮ সালে ভারতবর্ষে যে ভীষণ বিদ্রোহ হইয়াছিল, তাহা অভূতপূর্ব্ব। ইহাতে প্রাচ্য-দেশে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিপন্ন হইয়াছিল। রাজ্য-রক্ষার জন্য বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তখন আপ্রাণ চেষ্টা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভারতীয় করদাতাগণই এই বিদ্রোহ-দমনের ব্যয়ভার বহন করিতেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অপর কোন অংশে এরূপ ব্যাপার ঘটিলে অন্ততঃ এই ব্যয়ের একটা মোটা অংশ বৃটিশ জাতিকেই বহন করিতে হইত।

তদানীন্তন ভারতসচিবের এই অভিমত উদ্ধৃত করিয়া কমিটী আবার বুয়র যুদ্ধের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সেই যুদ্ধের সমস্ত ব্যয়ভার

বহন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু বিপর্য্যস্ত কৃষিক্ষেত্রগুলি পুনরায় কার্য্যোপযোগী করিবার নিমিত্ত বুয়রদিগকে ৩০,০০,০০০ পাউণ্ড দেওয়া হইয়াছিল।

মোটের উপর, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে যে সমস্ত ঋণ করা হইয়াছিল, তাহার ফলে ১১,২,২০০,০০০ পাউণ্ড ঋণের বোঝা ভারতবাসীর ঘাড়ে চাপিয়াছে। তন্মধ্যে –

বিভিন্ন যুদ্ধ ও অভিযানের জন্য	৩১,০০০,০০০
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মূলধন ও লভ্যাংশ ইত্যাদির জন্য	৩৭,০০০,০০০
সিপাহী বিদ্রোহ দমনের জন্য	৪০,০০০,০০০
মোট	১১,২,২,০০,০০০

পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্টের আমল :—সিপাহী বিদ্রোহের পর বৃটিশ পার্লামেণ্ট স্বয়ং ভারত-শাসনের ভার গ্রহণ করেন। এই পার্লামেণ্টারী শাসনের ব্যয় প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ—(১) ভারতের বাহিরে যুদ্ধ বিগ্রহ। ইহাতে ৩,৭০,০০,০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। কমিটী বলেন, আবিসিনিয়ায় অভিযান প্রেরণ, দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ, মিশরে সৈন্য প্রেরণ, উত্তর পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধ এবং ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ প্রভৃতির সহিত ভারতবাসীর সম্পর্ক নাই। বৃটিশের স্বার্থে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ অনুসারে ভারত গভর্ণমেণ্ট এই সমস্ত যুদ্ধে যোগ দিয়াছেন। লর্ড সেলিসবারি, লর্ড নর্থব্রুক, সার চার্লস ট্রেভিলিয়ান, লর্ড লিটন, মেসার্স ফসেট, গ্লাডষ্টোন, গোখলে প্রভৃতির অভিমত উদ্ধৃত করিয়া কমিটি দেখাইয়াছেন, এই অর্থ প্রদান করিতে ভারতবাসী ন্যায়তঃ বাধ্য নহেন।

ইউরোপীয় মহাসমর :—বিগত ইউরোপীয় মহাসমরের সময় গ্রেট বৃটেনকে মোট ১৮৯ কোটী টাকা দান করা হইয়াছে। আইন অনুসারে ভারতীয় রাজস্ব হইতে কোন অর্থ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে দান করিবার অধিকার ভারত গবর্ণমেণ্টের নাই। সুতরাং এই টাকা ফিরাইয়া দেওয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। কমিটি আরও বলেন যে, এরূপভাবে অর্থদান করা ভারতবাসীর আর্থিক সামর্থ্যের অতীত। তারপর ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ভারতবর্ষ অন্যান্য বৃটিশ উপনিবেশের ন্যায় অনুরূপ সাহায্যও দিয়াছে। মহা যুদ্ধ উপলক্ষে ভারতের সামরিক ব্যয় হইয়াছে ১৭১ কোটী। মোটের উপর দান ও সামরিক ব্যয় বাবৎ মহাযুদ্ধ উপলক্ষে ভারতের ২৯৭ কোটী ব্যয় হইয়াছে। ইহার বিনিময়ে ভারতবাসী উপকৃত হয় নাই। সুতরাং কমিটির মতে, এই অর্থ বৃটিশের নিকট দাবী করা যাইতে পারে।

(২) বিবিধ ব্যয় বাবৎ ২০,০০০,০০০ পাউণ্ড। বিলাতের ইণ্ডিয়া আফিস, এডেন, পারস্য ও চীনের দূতাবাস এবং ধর্ম্মযাজকদের ব্যয় বাবৎ এই অর্থ দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ভারতের কোন স্বার্থ নাই বলিয়া কমিটি এই অর্থ দাবী করিয়াছেন। মেজর জেনারেল বলেন, ওয়েলবি কমিশনের রিপোর্ট এবং মিঃ ষ্টিফেন জেকোবের মন্তব্য দ্বারা এই দাবী সমর্থন করা হইয়াছে।

(৩) ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে মোট ৮২ কোটী ব্যয় হইয়াছে। ভারতের রাজস্ব হইতে এই টাকা দেওয়া সঙ্গত নহে বলিয়া কমিটি মন্তব্য করিয়াছেন। তবে কমিটির একজন সদস্য বলিয়াছেন, ব্রহ্মদেশ যদি ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন না হয় তাহা হইলে এই অর্থ দাবী করা সঙ্গত হইবে না।

(৪) দুর্ভিক্ষের সাহায্য দান সম্পর্কে যে অর্থ ঋণ করা হইয়াছে, তাহা অনেক স্থলে যথারীতি ব্যয়িত হয় নাই। অনেক অর্থের অপব্যয় হইয়াছে। তথাপি কমিটি স্বীকার করিয়াছেন, এই ঋণ পরিশোধ করা ভারতবাসীর কর্ত্তব্য।

(৫) মুদ্রা বিনিময়, বাট্টার হার নির্দ্ধারণ প্রভৃতি সম্পর্কে ভারতের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। কমিটী, ভারত গবর্ণমেণ্টের বাট্টা নীতির নিন্দা করিয়াছেন। তথাপি এই ক্ষতির অর্থ ভারতবাসীর পক্ষ হইতে দাবী করা হয় নাই।

(৬) রিভার্স কাউন্সিল বিল সম্পর্কে ৩৫ কোটী ক্ষতি হইয়াছে। কমিটী ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, এই ক্ষতির জন্য গ্রেট বৃটেনই দায়ী। সুতরাং এই ক্ষতি পূরণ করা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য।

(৭) রেলপথ নির্ম্মাণে ব্যয় বাহুল্য এবং গবর্ণমেণ্টের নীতির আলোচনা করিয়া কমিটী মন্তব্য করিয়াছেন, সামরিক প্রয়োজনে এবং বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের রাজ্য রক্ষার খাতিরে অনেক রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং এডেনে রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়া ৩৩ কোটী ব্যয় করা হইয়াছে। অতিরিক্ত মূল্য দিয়া ভারতের কোন কোন রেলপথ ক্রয় করা হইয়াছে। ইহাতে ৫০ কোটী ব্যয় হইয়াছে। এই সমস্ত ঋণের জন্য ভারতবাসীকে দায়ী করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ—ডাক বিভাগ, টেলিগ্রাফ বিভাগ, সেচ বিভাগ, পূর্ত্ত বিভাগ প্রভৃতির জন্য অনেক টাকা ধার করা হইয়াছে। কমিটী এই সমস্ত ঋণের কথাও আলোচনা করিয়াছেন। নূতন দিল্লী নির্ম্মাণ করিয়া যথেষ্ট অর্থের অপব্যয় করা হইয়াছে। তথাপি স্বীকার করা হইয়াছে যে, এই সমস্ত ঋণের দায়িত্ব মানিয়া লওয়া ভারতবাসীর কর্ত্তব্য।

মোটের উপর কমিটি, এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, নিম্নলিখিত বিষয়ে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহার জন্য ভারতবাসী দায়ী নহে। সুতরাং এই টাকা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টেরই দেওয়া উচিত।

কোম্পানীর আমল –

যুদ্ধ বিগ্রহ	৩১ কোটী পাউণ্ড
মূলধন ও সুদ	৩৭ "
সিপাহী বিদ্রোহ	৪০ "
	১১২ কোটী পাউণ্ড

পার্লামেণ্টের আমল –

যুদ্ধ বিগ্রহ	৩৭ কোটী পাউণ্ড
ইউরোপীয় যুদ্ধে দান	১৮৯ "
" ব্যয়	১৭১ "
	৩৯৭ কোটী

বিবিধ	২০ কোটী পাউণ্ড
ব্রহ্মদেশ	৮২ "
রিভার্স কাউন্সিল বিলের ক্ষতি	৩৫ কোটী পাউণ্ড
রেলপথ সমূহ	৮৩ "

সর্ব্বসমেত ৭২৯ কোটী পাউণ্ড

কমিটীর মূল কথা :—বর্ত্তমানে ভারত গভর্ণমেণ্টের ঋণের পরিমাণ ১১০০ কোটী পাউণ্ড। ভারতবর্ষ দখলে থাকায় নানা দিক দিয়াই গ্রেট বৃটেনের প্রচুর লাভ হইতেছে। পক্ষান্তরে ভারতের শিল্প বাণিজ্য চাপিয়া রাখা হইতেছে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া কমিটি এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, আয়র্ল্যাণ্ডের বেলায় গ্রেট বৃটেন যে নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন, ভারতের বেলায়ও তাহাই করা কর্ত্তব্য। আয়র্ল্যাণ্ড এক সময়ে গ্রেট বৃটেনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখনকার ঋণের বোঝা, আয়র্ল্যাণ্ডকে স্বাধীন করিবার সময়, তাহার ঘাড়ে চাপান হয় নাই। তাহাকে সমস্ত ঋণের দায় হইতে মুক্তি দিয়া গ্রেট বৃটেন নিজ স্কন্ধে সমস্ত ঋণভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কমিটি মনে করেন, ভারতের রাজস্ব দ্বারা যদি পূর্ব্বকৃত ঋণ শোধ করিতে হয়, তাহা হইলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য যথোচিত অর্থ পাওয়া যাইবে না। সুতরাং ভারতবর্ষকে স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করিবার সময় তাহাকে পূর্ব্বকৃত ঋণমুক্ত করিয়া দেওয়াই উচিত। সমস্ত ঋণভার গ্রহণ করিতে রাজী না হইলেও অন্ততঃ পক্ষে ৭২৯ কোটী পাউণ্ড ঋণভার গ্রহণ করিতে রাজী না হইলেও অন্ততঃ পক্ষে ৭২৯ কোটী পাউণ্ড ঋণের জন্য দায়ী হওয়া গ্রেট বৃটেনের কর্ত্তব্য।

স্বতন্ত্র মন্তব্য :—মিঃ জে, সি, কুমারাপ্পা দুইটী স্বতন্ত্র মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, প্রতি বৎসর ভারত সরকার যে অর্থ সৈন্য সামন্তের জন্য ব্যয় করেন, তাহার কিছুটা অন্ততঃ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বহন করা উচিত। কেননা এত সৈন্য সামন্ত রাখার প্রয়োজন ভারতবাসীর নাই, বৃটীশের স্বার্থের জন্য এই বিরাট বাহিনী রক্ষা করা হয়। এ পর্য্যন্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট মোট ২১২৮ কোটী পাউণ্ড সামরিক ব্যয় করিয়াছেন। তন্মধ্যে অন্ততঃ ৫৪০ কোটি পাউণ্ডের জন্য দায়ী হওয়া বৃটীশের কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, রিপোর্টের মধ্যে যে সমস্ত ঋণ বৃটীশের স্বার্থে করা হইয়াছে বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, তাহার সুদ বাবদ প্রায় ৫০৬ কোটী পাউণ্ড প্রদান করিতে হইয়াছে। এই অর্থের জন্যও বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে দায়ী করা যাইতে পারে। এই দুইটী দাবী যদি স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রায় সমস্ত ঋণ—অর্থাৎ ১০৫০ কোটী পাউণ্ডের দায়িত্বই বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের গ্রহণ করা উচিত।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনে

সভাপতি মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দীর

অভিভাষণের মর্ম্ম

হিন্দু-ধর্ম্মের মর্ম্মবাণী

একদিন হিন্দুত্বের দাম্ভিকতা, গোঁড়ামী ও কুসংস্কার আমাদিগকে নষ্ট করিতে বসিয়াছিল, ইহার সত্যতাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে আন্দোলন প্রচলিত হয় আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু যুবক সেই আন্দোলনের শেষ ফল। দাম্ভিক হিন্দুত্ববোধ ও তাহার গোঁড়ামী ও কুসংস্কার বর্জ্জন করিতে গিয়া সে আজ হিন্দুত্বের সত্যকার মাহাত্ম্যবোধ ও গৌরবানুভূতি হারাইয়া ফেলিয়াছে। কেবল যে হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহাই নহে,—হারাইয়া ফেলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছে—ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের কথা আর কি আছে জানি না।

আত্ম-বিস্মৃতির এই অতলতার মধ্যে ডুব দিয়া হিন্দু যুবক আজ কি রত্ন খুঁজিয়া মরিতেছে? তাহার নিজের খনিতে কি রত্ন নাই? মণি-মাণিক্যের সন্ধানে কি তাহাকে আজ ভিক্ষায় বাহির হইতে হইবে?

চিন্তায় বিশ্বানুভূতি

হিন্দু চিন্তাধারার একটি বিশেষত্ব—ব্যক্তি ও সমষ্টির একত্বানুভূতি। হিন্দু সভ্যতার ইতিহাসে তাই আমরা ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে কোনও বিরোধ দেখি না। সমষ্টির মধ্যে পাই—জ্ঞান ও আনন্দের চরম বিকাশ এই সমষ্টির জ্ঞান ও আনন্দের প্রতিষ্ঠা ব্যক্তির পরিপূর্ণতায়। ব্যক্তি বলিতে হিন্দু শুধু মানুষকেই বুঝে না সমুদয় জীবকেই বুঝে। ব্যক্তি-মানুষে নহে—সমষ্টিজীবে হিন্দু চিন্তার ধারা প্রবাহিত, প্রস্তরে যাহা সুপ্ত, জীবে যাহার স্বপ্নাবস্থা, মানুষে তাহাই জাগ্রত।

বাস্তবকে হিন্দু দর্শন কোনও দিন তুচ্ছ করে নাই, dignity of labour, work is worship—এই সব সস্তা ইংরাজী বুলি আজ আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে এবং তাহারই সূত্র ধরিয়া আজ আমরা নিজেদের বিচার করিতেছি—এ লজ্জা রাখিবার স্থান আমাদের কোথায়?

মহাভারতের ধর্ম্মব্যাধের উপাখ্যান যাঁহাদের জানা আছে, তাঁহারা বলিতে পারিবেন—কি করিয়া কশাই-এর কর্ত্তব্যকেও হিন্দু পূর্ণ মর্য্যাদা দিয়াছে।

কোন সঙ্কীর্ণতা হিন্দুর নাই; আজ যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচার রীতি-নীতির শৃঙ্খল আমাদের পায়ে পায়ে বাজিয়া উঠিতেছে, তাহার একটিও হিন্দু দর্শনের নির্দ্দেশ নয়; পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তাহাদের জন্ম, সাময়িক হিসাবে তাহাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া সমাজ-পতিরা এগুলির প্রচলন করিয়াছিলেন মাত্র—শৈবালের মত তাহারা কূলে আসিয়াছিল স্রোতের টানে, আবার অপ্রয়োজনের মধ্যেই তাহারা

ভাসিয়া যাইবে; প্রবহমান বিপুল জলস্রোতে তাহাদের স্থান নাই। আজ বদ্ধজলায় তাহারা পাঁক জমাইয়া তুলিয়াছে, সে পাঁকে ডুবিয়া নিজেরা মরণযন্ত্রণা অনুভব করিতেছি—প্রতিপক্ষ সে সুযোগ উপেক্ষা করিবে কেন? মুমূর্ষুর মত পড়িয়া না থাকিয়া সবল বাহুতে যদি এই শৈবালদলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে পারি, তবে নিজেরাও মরি না—বিপুল জলস্রোতের অব্যাহত প্রবাহ আবার ফিরিয়া আসে।

যাহা চাই, তাহা এই বিপুল বল, অমিত তেজ পৌরুষের অনতিক্রম্য প্রভাব। চাই ঋজু মেরুদণ্ড, সাহসবিস্তৃত বক্ষস্থল সত্যভাষণের অকুণ্ঠ কণ্ঠ।

অস্পৃশ্যতা

অস্পৃশ্যতা আজ হিন্দু ধর্মকে কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। শূদ্র নাকি ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য মহাভারতের সভাপর্ব্বে (৪৮ অধ্যায়) দেখিবেন—রাজসূয় যজ্ঞে কি কাণ্ডটাই না ঘটিয়াছিল—রাজারা ব্রাহ্মণদের পরিবেশন করিতেছেন এবং সেই পরিবেশক রাজন্যবর্গের মধ্যে চীন, যবন, পারসীক, শক, হূন, তুষার, যোনক প্রভৃতি কেহ বাদ যায় নাই।

গুণবিভাগ করিয়া চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছিল, কোনও বর্ণ কোনও বর্ণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট এ বোধ ছিল না। সমাজরক্ষার জন্য সকল গুণ, সকল কার্য্য অপরিত্যজ্য বলিয়া ধরা হইত। চারি বর্ণের উপরই শাস্ত্রের সমান শ্রদ্ধা ছিল। চারি বর্ণ-ই শাস্ত্র কর্ত্তৃক দেবতা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে—ব্রহ্মণ্যদেব, নৃদেব, আর্য্য বা গুপ্ত দেব, দাস দেব (ঋক, পুরুষ সূক্ত, দ্বাদশ মন্ত্রের সায়ন ভাষ্য)। শান্তি পর্ব্বের ৫৯ অধ্যায়ে দেখি কর্দ্দম ব্রাহ্মণের পুত্র বেণ হইলেন রাজা, তাঁহার দুই পুত্রের একজন নিষাদ হইলেন ব্যাধ, আর একজন পৃথু হইলেন রাজা। এই উদার সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে অস্পৃশ্যতার স্থান কোথায়?

অসবর্ণ বিবাহ

বিবাহের মূল সূত্র হইতেছে—দম্পতিযুগলের মধ্যে এক প্রাণতা। প্রেমসঞ্জাত বিবাহে প্রাণের একটা মিল থাকা সম্ভব কিন্তু আচার-ব্যবহারে ও সভ্যতায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবনের সহিত পুরাপুরি মিল না হইবারই সম্ভাবনা বেশী। নারীর মধ্যে মিশ খাইয়া চলিবার একটী স্বভাবগত শক্তি আছে—কিন্তু সে শক্তিরই ত সীমা আছে।

এই সীমারেখা অতিক্রম করিবার ব্যক্তিগতভাবে যথেষ্ট যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু সমষ্টিগত কারণ কিছুই আছে বলিয়া মনে হয় না। মহাভারতের স্ত্রী পর্ব্বের দ্বাবিংশ অধ্যায়ে দেখি ধৃতরাষ্ট্র-কন্যা দুঃশলার স্বামী জয়দ্রথের যবনী-স্ত্রীর কথা। ইহাতে মারাত্মক অপরাধ বলিয়া জয়দ্রথকে সমাজচ্যুত করিবার কথা কোথাও পড়ি নাই। সমষ্টির মধ্যে এইরূপে ব্যষ্টি স্বাতন্ত্র্যকে হিন্দু চিরকালই মর্য্যাদা দিয়া আসিয়াছে। ~~প্রয়োজন হইলে~~ আজও তাহা না দিবার কোনও হেতু নাই।

যেথানে অসবর্ণ বিবাহ কোনও নরনারীর পক্ষে একান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়িতেছে, সেখানে—হিন্দুসমাজের উচিত নিরপেক্ষ থাকা। সামাজিক অনুশাসন বর্ত্তমানে অসবর্ণ বিবাহের অনুকূলে প্রচার করিবার প্রয়োজন হইয়াছে কিনা তাহা স্থির করিবেন সমাজ সংস্কারক—ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার হইতে কয়েকটি কথা এখানে বলিয়া রাখিলাম।

নারী-প্রগতি

নারী-প্রগতির কথা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। নারী সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্র বলিতেছেন—

নারী যেখানে থাকেন সেখানে দেবতা বিরাজ করেন। "গৃহলক্ষ্মী" আখ্যা দিয়া হিন্দু নারীকে দেবীর সম্মান দিয়াছে। কোনও দেশের কোনও জাতির বা সমাজের মধ্যে এমন গৌরবাত্মক নামে নারীকে কেহ সম্মানিত করে নাই। নারীকে হিন্দু তাহার যোগ্য সম্মান দিতে কখনই কার্পণ্য করে নাই—নারীকে দেবতার আসনে বসাইয়া হিন্দু পূজা দিয়াছে—গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব দিয়া হিন্দু তাহাকে মহিয়সী করিয়া তুলিয়াছে—কল্যাণ কর্ম্মে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে নারীকে সহধর্ম্মিনী করিয়া হিন্দু আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে—নারীর যোগ্যতা ও প্রয়োজন অনুসারে হিন্দুর দান চিরদিনই অকৃপণ। কিন্তু নারী আজ বিদ্রোহিণী। আজ কেবলই শুনিতে পাই—পুরুষ স্বার্থপর, অত্যাচারী, কামুক, হৃদয়হীন পশু ইত্যাদি। যাহারা তাহাদের জীবনে পুরুষকে তাহার প্রকৃত স্বরূপে দেখিবার সুযোগ বা অবসর পাইল না—তাহাদের কথা আলোচনার যোগ্য নহে। কিন্তু সমাজে নরনারীর আদর্শ জীবনের উদাহরণের ত অপ্রতুল নাই। অন্ধ সংস্কার ও কদাচারের মোহে নারীকে দুর্গতির পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইতেছে একথা বলিলে খুব মিথ্যা কথা বলা হইবে না। শ্বশুরালয়ে বধূর প্রতি অত্যাচার কাহিনীর কথা স্মরণ করিলে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়—অনেক হৃদয়বিদারক পাশবিক অত্যাচারের মধ্যে "স্বামী-দেবতার" যে যথেষ্ট হাত আছে—এরূপ ঘটনাও অসত্য নহে। অধিকাংশক্ষেত্রে শিক্ষার অভাবে, আজ নারী যে জন্মদাত্রী ও ধাত্রী, গৃহ-সংসারে প্রয়োজনের দাসী হইয়া পড়িতেছে—ইহাও কদাচ সমর্থনীয় নহে।—কিন্তু দৈহিক গঠন ও মনের স্বাভাবিক গতিকে উপেক্ষা করিয়া আজ আধুনিক নারী যদি পুরুষের সঙ্গে কাঁধ মিলাইয়া চলিতে চান, তাহা হইলে হিন্দু সমাজের শেষ দিন উপস্থিত হইয়াছে মনে করিব।

যোগ্যতা অনুসারে অধিকারের দাবীর মূল্য আছে—অন্যথায় তাহা করুণ বা হাস্য রসের উদ্রেক করে। দেহ ও মনের অনুপযোগী কোনও অধিকারের দাবী নারীর পক্ষে একান্ত অবান্তর।

—নারীর আসন হিন্দু যথাযোগ্য স্থানেই পাতিয়া রাখিয়াছে—তিনি সেখানে ধৈর্য্যে ও ক্ষমায়, স্নেহে ও সেবায়, প্রেমে ও পুণ্যে,—নারীর সকল প্রকার স্বভাবগত মহত্ত্বে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করুন, কিন্তু বিদ্রোহ করিবার সাধু ইচ্ছার ভাণ করিয়া নারী-শক্তির অপমান যেন তাঁহারা না করেন।

বিধবা-বিবাহ

বিধবা-বিধবা সম্পর্কে এযাবৎ বহু আলোচনা হইয়াছে। তবুও দুই একটি কথা এখানে বলার প্রয়োজন মনে করি। স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র

মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন—হিন্দুর ঘরে বিধবারা অলঙ্কার স্বরূপ।—কথাটা বিশেষ করিয়া চিন্তা করিবার বিষয়। আমরা প্রত্যেকেই জানি এক একটি পরিবারের সর্ব্বপ্রকার দায়িত্ব লইয়া এক একজন বিধবা আজীবন ত্যাগের মহান ব্রত সাধন করিতেছেন—নিজের ঐহিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে পরিবারের স্বার্থে বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারা যে সংযমের আদর্শ জীবন যাপন করিয়া থাকেন, তাহা অন্য কোনও দেশের সমাজে আছে কিনা জানি না। যখনই আমাদের হিন্দু-গৃহাশ্রমে এইরূপে এক একটি দয়াবতী ত্যাগব্রতচারিণী মহিয়সী নারীকে দেখি, তখনই মনে হয় ভূদেবচন্দ্রের বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

কিন্তু তাই বলিয়া অল্পবয়স্কা বালিকা, যুবতী বিধবা—প্রোষিতভর্ত্তৃকা প্রভৃতি যে সব নারীর বিবাহের বিধান শাস্ত্রে বিহিত আছে, তাহাদের পুনর্ব্বিবাহের প্রথা যাহাতে সমাজে প্রবর্ত্তিত হয়, সে বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রত্যেক হিন্দুরই কর্ত্তব্য। সমাজের জনবলের দিক হইতে ইহার একটা সার্থকতাও আছে, অধুনাতম মনীষীবর্গ তাহা স্বীকার করিতেছেন। তাই আমার মনে হয় এ বিষয় সামাজিক অনুশাসনের প্রতি যথোচিত মর্য্যাদা রাখিয়া যতখানি ঔদার্য্য দেখান দরকার, তাহার জন্য যেন হিন্দুসমাজ প্রস্তুত থাকেন।

প্রাদেশিক সীমা নির্ণয়

প্রাদেশিক সীমানির্ণয় সমস্যা আর একটি প্রধান ও প্রয়োজনীয় বিষয়। এই সীমানির্ণয় সমস্যা লইয়া হিন্দুগণ—শুধু হিন্দু কেন যাঁহারাই ভারতের ভাবী শাসন পদ্ধতির বিষয় চিন্তা করেন, তাঁহারাই বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছেন। আমার মনে হয়, যাঁহারা সম-ভাষাভাষী এবং জাতি হিসাবে ও শিক্ষা-দীক্ষা হিসাবে এক পর্য্যায়ভুক্ত তাঁহাদিগকে লইয়া এক একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করা কর্ত্তব্য। আমাদের ভবিষ্যত ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্ত্তমানে যে কমিশন গঠিত হইয়াছে, সেই কমিশনও এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতির পরিবর্ত্তনসাধনের পূর্ব্বে একটি "সীমানির্ণয় কমিশন" গঠন করা কর্ত্তব্য। এই কমিশনই যাহারা সমভাষা-ভাষী ও যাহারা শিক্ষা দিক্ষা হিসাবে এক, তাহাদিগকে লইয়া বিভিন্ন প্রদেশের সীমানির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। এবিষয়ে আমাদের বাঙ্গালা দেশ বহুদিন হইতে নানা অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালী বঙ্গ-ভঙ্গের বেদনা ভুলিতে না ভুলিতে মানভূম, সিংভূম, পূর্ণিয়া, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জিলাকে বাঙ্গালা দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্য দেশের সহিত সংযুক্ত করা হইল। আমাদের আশা ছিল, সীমা নির্দ্দেশ কমিশন গঠিত হইলে ইহার সুমীমাংসা হইবে, কিন্তু আমাদের সে আশা ব্যর্থ হইল। গবর্ণমেন্ট সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা কোনরূপ সীমানির্দ্দেশ কমিশন নিযুক্ত করিবেন না; তাঁহারা মাত্র বিহার ও সিন্ধু দেশের জন্য দুইটি পৃথক কমিটি নিযুক্ত করিবেন। এ সমস্যা সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্যা। এরূপ গুরুতর সমস্যাসমাধানের জন্য এবং এই সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনার জন্য কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে এক সীমা-নির্দ্দেশ-কমিশন গঠিত করা কর্ত্তব্য।

শুদ্ধি ও সংগঠন

শুদ্ধি ও সংগঠন হইবে কিনা, ধর্ষিতা নারীকে সমাজে স্থান দেওয়া উচিত কিনা সে বিচারের আজ প্রয়োজন হইয়াছে।

বেদের তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণে ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞের বিবরণে দেখা যায়, কেবল দু'একটি নয়, গোষ্টিকে গোষ্টি হিন্দুধর্ম্মভুক্ত করা হইয়াছে। 'দেবল স্মৃতি' বলিতেছেন—বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত, কলুষিত বা আবদ্ধ স্ত্রীলোক এবং ঐশ্বর্য্য লাভে ধর্ম্মত্যাগীকে সমাজে পুনরায় গ্রহণ করা যাইতে পারে।

চৈতন্যদেবের কীর্ত্তি কাহিনী হিন্দু মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করিয়া তিনি যে সর্ব্বজাতি সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যেই আমার মনে হয়, সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান রহিয়াছে। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীচৈতন্য নীলচলে তাঁহার পূর্ণ মহিমা প্রকট করিলেন। উচ্চ নীচ ভেদাভেদ শূন্য হইয়া জগন্নাথক্ষেত্রে যেমন প্রসাদ পাইবার রীতি আছে—সেইরূপ ঠিক বাহিরের সমাজে ছুঁৎমার্গ দূর করিবার জন্য চাই চৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম ও সেবানুরাগ। হিন্দু প্রধানতঃ উদার-ধর্ম্ম কাল-ধর্ম্মের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া হিন্দুকে উদার হৃদয় ও ব্যাপক দৃষ্টি লইয়া সমাজ সংস্কারে ব্রতী হইতে হইবে।

আধুনিকতা গর্ব্বী বলিবেন সব বুঝিলাম কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে এই যে, একথা আমরা এতবার শুনিয়াছি—যে ইহা শুনিয়া আমাদের আর লাভ নাই। আমি বলি—ইহা শুনিয়া যদি লাভ নাই, তবে কিসে লাভ আছে?

আমি মহৎ, আমার ধর্ম্ম মহৎ, আমার ইতিহাস গৌরবময়, এ সকল ভাবিয়া বুঝিয়া যদি মাহাত্ম্যের প্রেরণা না পাই, তবে পাইব কিসে?

নির্ব্বাচন-সমস্যা

হিন্দু ও মুসলমান সম্পর্কে আজ কোনও কথা বলিতে গেলে, নির্ব্বাচন সমস্যা সম্বন্ধে কোনও কথা না বলিলে চলে না। মুসলমান সম্প্রদায়ের জাতীয় দল বা Nationalist Party ছাড়া অনেকে শাসন পরিষদে স্থান সংরক্ষণ ও পৃথক নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহাদের এই দাবীর মধ্যে ভারতবর্ষের জাতীয়তার পরিপন্থী দুইটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রথম—স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট মুসলমান-ভারতবর্ষের কল্পনা এবং দ্বিতীয়—কনষ্টান্টিনোপল হইতে পাঞ্জাব এবং সিন্ধু পর্য্যন্ত একটি নিখিল মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মিলিত রাজ্যসংগঠনের ধারণা। একথার আভাষ পূর্ব্বেই দিয়াছি।

প্রকাশ্যভাবে একথা বলা না হইয়াছে তাহা নহে। শুধু হিন্দু-জাতির নহে—রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ প্রত্যেক রাজপুরুষেরই ইহা বুঝিয়া দেখিতে হইবে। এই প্রকার দাবীর সমর্থন শুধু যে জাতিহিসাবে ভারতের

ভাগ্যবিপর্য্যয় আনিবে তাহা নহে, কোনও কালে সম্মিলিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে উদ্ভব হইবে সে আশাও সুদূরপরাহত।

ভারতবর্ষ হিন্দুর নহে, মুসলমানেরও নহে--ভারতবর্ষ ভারতবাসীর—এই চিন্তায় যেদিন আমরা হৃদয়ে বল পাইব, সেদিন সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথাও আর থাকিবে না। জাতিহিসাবে ভারতবাসী যদি সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ ভুলিয়া স্বাধিকারের দাবী করিতে পারে, সম্প্রদায় নির্বিশেষে যদি ভারতবাসী সম্মিলিত শক্তিতে আপনার দাবী উপস্থিত করিতে পারে—তবেই জাতীয়তার স্বপ্ন সফল হইবে। আমার মনে হয়, ভারতের শাসনতন্ত্র যদি কোনও দিন দেশের অনুকূলে গঠিত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রথম সূত্র হওয়া উচিত—অসাম্প্রদায়িকতা। শতধাবিচ্ছিন্ন জাতির কোনও শক্তি নাই, স্বায়ত্তশাসনের দাবী করিবার অধিকারও তাহার নাই। হিন্দু ও মুসলমান প্রত্যেকেরই একথা আজ মনে রাখিতে হইবে যে, একহাতে স্বার্থলাভ হইবে না—ঘরের কলহ ও স্বার্থের কাড়াকাড়িতে আজ আমরা সকলের কাছে হাস্যাস্পদ হইয়া আছি।

—রাজনৈতিক অধিকারলাভের জন্য দুই সম্প্রদায়কে একসঙ্গেই চেষ্টা করিতে হইবে- দুই জাতির উত্থান ও পতন ভাগ্যবিধাতা একই অবিচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। যে সম্প্রদায় আজ শুধুমাত্র অসম্ভবের আশায় শিরোপোষণ করিবে, সে শুধু স্ব-সমাজের নহে—স্ব-দেশেরও ভীষণ ক্ষতি করিবে। সমগ্র জাতির অনিষ্ট করিয়া সমাজসেবার আত্মপ্রসাদলাভ ভ্রমাত্মক মাত্র।

প্রচারশীল হিন্দু

ভবিষ্যৎ হিন্দুকে প্রচারশীল হইতে হইবে। নিজের জন্য নহে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে অনুদার সঙ্কীর্ণতার আবর্জ্জনা দেশবিদেশে জমিয়া উঠিতেছে,—তাহারই উচ্ছেদকল্পে ভারতবাসী হিন্দুকে আজ প্রচারে বাহির হইতে হইবে। হিন্দুত্বের গণ্ডীতে অন্যকে আবদ্ধ করিবার জন্য নহে—ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশ্বমানবকে পুনরুজ্জীবিত করিতে।

পাশ্চাত্যের নাস্তিক্যবাদ আজ মানবকে রিক্ত, ক্লান্ত ও অন্ধ করিয়াছে—পাপে-পুণ্যে আস্থাহীন হইয়া পরলোকে বিশ্বাস হারাইয়া, বিশ্বমানব আজ নিজের আঘাতে নিজেই ক্ষতবিক্ষত—সেই ক্ষত নিরাময় করিবার মহান কর্ত্তব্য নব্য হিন্দুর সারল্য, বিশ্বাস ও নির্ভরতা ধর্ম্মাধর্ম্ম ও সদসৎ জ্ঞান সমস্তই তাহাকে পুনর্ব্বার ফিরাইয়া আনিতে হইবে;—যে কল্যাণ একদিন হিন্দু দর্শন প্রচার করিয়াছিল, সেই কল্যাণ আজ বিশ্বমানবের দ্বারে দ্বারে নব্য হিন্দু প্রচারককে বহন করিয়া ফিরিতে হইবে। একদিন যেমন যবন, কিরাত, গান্ধার, চীন, শবর, শক, কাম্বোজ প্রভৃতি সম্পর্কে সে দরদী হইয়াছিল—আজও তাহাকে সেইরূপ দরদ পোষণ করিতে হইবে।

হিন্দু তুমি ভুলিও না—

"বিশ্বমানবকে যে উদ্ধার করিবে, তাহার জন্ম হিন্দু সভ্যতার অন্তঃস্থলে। তুমি হিন্দু! তুমি আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর। অটল অচল বিশ্বাসের শক্তিতে অনুভব কর, তুমিই বিশ্বমানবের হৃদয় হইতে জড়ের ভীষণ পাথরের চাপ বিদূরিত করিবে। হিন্দু-সমাজ তোমারি জন্মের অন্ধকার মথুরা, তোমারি কৈশোরে মধুবন, তোমারি সম্পদের দ্বারকা, তোমারি ধর্ম্মের কুরুক্ষেত্র, তোমারি শেষ-শয়নের সাগরসৈকত।"

দেশে দেশে তোমাকে তপোবনের সেই বাণী বহন করিয়া ফিরিতে হবে...

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

গ্রন্থ-পরিচয়

রূপ-সায়র—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ প্রণীত গল্পগ্রন্থ, মূল্য দুই টাকা। প্রধান প্রাপ্তিস্থান এস, কে, মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স—২৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। এই গ্রন্থে 'মহাকাব্য রচনা', 'ডানপিটে', 'প্রেমের অভিষেক', 'অদৃষ্টের পরিহাস', 'রূপ-দেওয়ালী', প্রভৃতি কয়টি গল্প আছে। এই গল্পগুলি পূর্ব্বে পুষ্পপাত্রে বাহির হইয়াছিল। প্রথম দু'টি গল্পের সুর বাংলায় অনেকটা নূতন। বেপরোয়া জীবন কসংস্কার-বন্ধন-মুক্ত করিয়া ছাড়িয়া দিলে প্রকৃতির কত নিগূঢ় বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে, কি ভাবে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা কি ভাবে সম্ভব ও কার্য্যকর হয়, তাহারই পরিচয় এই গল্পের নায়কদের [illegible]কতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। শেষের তিনটি গল্প প্রেমের,—প্রেমের হইলেও ইহা গতানুগতিক সাধারণ প্রেম নহে, এ প্রেমের গল্পে যথেষ্ট বৈচিত্র্য ও বাস্তবতা আছে—এবং ইহার মধ্যে ভাবিবার, শিখিবার ও চিন্তা করিবারও বস্তু আছে, নূতনত্বও আছে। পুষ্পপাত্রে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহার বেশী প্রশংসা পুষ্পপাত্রে করিয়া লাভ নাই—পাঠক-পাঠিকা পড়িয়া দেখিলেই এই সুন্দর গল্পগুলির বৈচিত্র্যে মুগ্ধ হইবেন। ছাপা, বাঁধাই সুন্দর হইলেও গ্রন্থের আয়তন হিসাবে মূল্য কিছু বেশী হইয়াছে।

—

'বিপ্লবের পরে রাশিয়া'—শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, দাম ছয় আনা। এই ৪৯ পৃষ্ঠার পুস্তিকাখানির মধ্যে 'সোভিয়েটের জয়যাত্রা', 'সোভিয়েট রাশিয়ায় শ্রমজীবিগণের অবস্থা', 'সামরিক শক্তি', 'মধ্য এসিয়াতে বোলশেভিক নীতি', 'রাশিয়ার লোক শিক্ষা', 'উচ্চশিক্ষা' প্রভৃতি প্রবন্ধ আছে। বইখানি পড়িলে বর্ত্তমান রাশিয়ার অবস্থা কেমন, সে সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা জন্মিবে। বইখানিতে বর্ণশুদ্ধি প্রচুর রহিয়া গিয়াছে।

পরাজয়

শ্রীধীরেন্দ্র লাল ধর

গল্প

সংকীর্ণ স্থান আর অবরুদ্ধ আলো বাতাসের মধ্যে জীবনের চারটি বছর কেটে গেছে এই ছাব্বিশ জনের। ছাব্বিশ জন মানুষ ছাব্বিশটা 'মেশিন' যেন। জীবনটা এদের কাছে মামুলী একঘেয়ে, এ পথে চলবার মোহ এদের নেই যেতে হয় তাই যাওয়া।

প্রকাণ্ড বাড়ীটার নীচের তলাটা কারখানা—রুটি তৈরী হয়। চারিদিকে জাল দেওয়া, আগে রুটি আর বিস্কুট চুরী হোত তারই জন্য এই ব্যবস্থা।

পাচ আনা মূল্যে আমরা প্রত্যেকে প্রতিদিনকার জীবনটা এখানে ক্ষয় করে দিচ্ছি। মুখের শ্যামল লাবণ্য পাণ্ডুর হয়ে গেছে। হাতের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে আগুন আর ময়দার সঙ্গে লড়াই করে করে। বুকের বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাসের ওপর ঘনিয়ে এসেছে অবসাদ, চোখে যে তারুণ্যের স্ফূর্তি জেগেছিল মৃত্যুর কালিমা ঘনিয়ে এসেছে তার ওপর। পেষণ ক্রিয়া চলেছে সারাদিনই মালিকের সিন্দুকটাকে ভরিয়ে তোলবার জন্য।

প্রকাণ্ড উনানটা—তারই সাতটা বড় বড় খুপরি। সর্দ্দার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই আগুনে রুটি সেঁকে, আর আমরা সারাদিন ময়দা মাখি সর্দ্দারকে যোগান দেবার জন্য। মালিক সময় সময় চড়াগলায় জিজ্ঞেস করে যান—কত রুটি তৈরী হোল।

দিনের মধ্যে বাইরে খাবার দরজাটা তিনবার মাত্র খোলা হোত রুটি বাইরে চালান দেবার জন্য। নাহ'লে দিনরাত আমরা বন্দী। তিনতলা প্রকাণ্ড বাড়ীটা আমাদের বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে যেন।'

বাইরের দোকানঘরে আরো চারজন কাজ করতো অবসর পেলে আমাদের সঙ্গে একটু আড্ডা জমিয়ে যেত। মুখে তাদের হাসি, চোখে চঞ্চল দৃষ্টি, প্রাণে বসন্তের নেশা—আমাদের চেয়ে তাদের অবস্থাটা ভাল। তাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে আমাদের কোথায় যেন বাধতো।

আমাদের চোখে বসন্তের আমেজ জাগিয়ে দিয়েছিল ঐ তরুণী মেয়েটা। রোজ সকালে এসে জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে সে আমাদের কাছ থেকে বিস্কুট চেয়ে নিত। সে এসে দাঁড়ালেই তাকে একটার পর একটা প্রশ্ন করতো—ভাল আছ তো?

—তোমার চুলে আজ আর ফুল পরনি কেন?

—এলোচুলে তোমায় বেশ মানিয়েছে কিন্তু!

—এখনো চা খাওয়া হয় নি?

—নীল সাড়ীখানায় তোমায় বেশ মানিয়েছে!

এমনিভাবে অনর্গল তারা কথা কয়ে যায় ঝরণা ধারার মত।

ও শুধু একটু হেসে দু-একটা জবাব দেয় তারপরই বিস্কুটগুলো নিয়ে চলে যায়। হাসিটা ওর মুখে কিন্তু ভারি সুন্দর মানায়।

ও চলে গেলেই আমাদের মনে হয়, যেন জীবনের উৎস শুকিয়ে আকাশের বুকে সোনালী প্রভাত যেন মিশিয়ে গেছে। আবার সুরু হয় সেই আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ, সেই অশ্লীল আলোচনা, সেই গলদঘর্ম্ম –

কিছুক্ষণ পরে সর্দ্দার বলে—ও আমাদের দেবতা—

সুখন বলে—ও যদি আমার বোন হোত—

লছমন বলে—আমি যদি ওর ছোট ভাই হতুম--

ওকে ঘিরে আমাদের যত কিছু কামনা বেদনা, আশা আকাঙ্ক্ষা সবই যেন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠতো। মূর্ত্তিমতী বসন্ত শ্রীর মত যখন সে এসে দাঁড়াতো আমাদের জানালার সামনে, প্রভাতী রোদের মত তখন আমাদের মন সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় নত হয়ে পড়তো। মনে হতো আমাদের যেন আর কোন কষ্টই নেই, সব দুঃখই যেন আমাদের শেষ হয়ে গেছে।

*　　*　　*

হঠাৎ মালিক একজন নতুন লোক নিযুক্ত করলেন, কারখানার দেখাশুনা করবার জন্য। একদিনের আলাপেই সে আমাদের সঙ্গে বেশ জমে গে

পুষ্পপাত্র ফটো-প্রতিযোগিতা—শ্রাবণ



প্রথম পুরস্কার

টি, এন. ঘোষ

কলিকাতা

প্রথম পুরস্কার "প্রমোদ বিহার" --১০৲

দ্বিতীয় পুরস্কার

এ, টি, মজুমদার

কলিকাতা



য় পুরস্কার "দিগ দিগন্তে"

ভারি ফুর্ত্তিবাজ আমুদে লোক, বয়স প্রায় বছর ত্রিশ হবে, নাম রহমন। সে নাকি যুদ্ধের ফেরতা, তার প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ চেহারাটাই তার সাক্ষী।

কেবল মেয়েদের কথা বলতেই সে ভালবাসে—বসোরা দিয়ে মেসোপটেমিয়া যাবার সময় ক'টা মেয়ে তাকে ভালবেসেছিল, যে বাড়ীতে সে গত চারমাস ছিল সেখানকার চারটে মেয়ের সঙ্গে সে এমন ভাব করে ফেলেছিল যে, তাদের মধ্যে নাকি খুনোখুনি বেধে গিয়েছিল—কেবল এই সবই কথা। মাঝে মাঝে হা-হা করে হেসে উঠতো—সে সঙ্গে আমাদের বুকটা জখম হয়ে উঠতো।

সব সময়েই সে থাকতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আর মুখে তার একটা বিজয় গর্ব্বের হাসি লেগে থাকতো সর্ব্বদাই।

* * *

সেদিনটা ছিল ভারি মেঘলা।

কাজ করতে আমাদের ভালো লাগছিল না। এমন সময় রহমন আমাদের ঘরে এসে আলাপ জমিয়ে দিলে—সেই মেয়েদের কথা।

গোঁফটা দু-আঙ্গুলে পাকাতে পাকাতে রহমন বললে—এ তোমার রুটি সেঁকা বিদ্যে নয় সর্দ্দারজি—সব আওরাৎই আমার কাছে হার মেনে যাবে—হাহাঃ—

—সর্দ্দার বলল—পল্‌কা বাঁশের সঙ্গে লড়েছো কি? পাকা কঞ্চীর সঙ্গে তো কখনো লড়নি!

রহমন জিজ্ঞেস করলো—তার মানে?

—মানে টানে কিছু নেই—ব'লে সর্দ্দার খুপরীর মধ্যে রুটিগুলোকে সাজাতে লাগলো।

রহমন কিন্তু নাছোড়বান্দা; সর্দ্দারের কথার হেঁয়ালী তাকে বুঝিয়ে বলতেই হবে। অনেক কথা কাটাকাটির পর বিরক্তকণ্ঠে সর্দ্দার বললো—বলছিলুম মনিয়ার কথা।

হা হা হাঃ—এই, আচ্ছা আমায় এক মাস সময় দাও!

—তার চেয়ে একবছর নাও না কেন!

—আচ্ছা দেখো পনেরো রোজ বাদে—পনেরো রোজ সময় দাও—

পকেট থেকে ছোট একখানা খাতা বার করে লিখতে লিখতে রহমন বললে—এ রুটি ভাজা বিদ্যে নয় সর্দ্দার—এ দস্তুর মাফিক হাতে-নাতে শেখা বিদ্যে—

তারপর খাতাখানা পকেটে রেখে গুন্ গুন্ করে গাইতে গাইতে সে বেরিয়ে গেল।

আমাদের রাগ হোল সর্দ্দারের ওপর—এভাবে মনিয়াকে জড়াবার কি দরকার ছিল

—আরে তোরা কি বুঝিস বলতো? মনিয়ার কাছে গেলেই লাথি খাবে—সর্দ্দার বললো।

আমাদের মনে একটা জোর এল, বুকের রক্তে একটা বিশ্বাসের তুফান জেগে উঠলো—রহমন বলে কি! পাথরের কেল্লাই না হয় সে জয় করেছে, তা বলে কি হাওয়ার কেল্লা দখল করা এতই সোজা—মনিয়া যে হাওয়ার চেয়ে হাল্‌কা, স্বপ্নের মত!

মনের সন্দেহটাকে চাপা দেবার জন্য এ পনেরো দিন আমরা অবিশ্রান্ত কাজ করতে লাগলুম। এতরুটি আমরা তৈরী করে ফেললুম যে, আমাদের একদিনের ছুটি দেওয়া হোল।

মনিয়াকে আর একদিন দেখিনি।

ছুটির দিনটা আমরা সকলে বসে তারি কথা আলোচনা করছিলুম। মেঘে মেঘে আকাশ সেদিন অন্ধকার হয়ে উঠেছে; মাঝে মাঝে মেঘ-গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কথাবার্ত্তার খেই হারিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের মনে সন্দেহের কুয়াসা জমে উঠেছিল।

হঠাৎ গুন্ গুন্ করে গান গাইতে গাইতে রহমন এসে হাজির হোল—এ তোমার রুটি সেঁকা নয়, সর্দ্দারজী দেখবে মজা—হাহাহাঃ—

রহমন দরজার পাশ থেকে মনিয়াকে টেনে আনলো—হাতে তার একগোছা ফুল, চোখে আবেশ মাখা!

আমাদের ভাবগতিক দেখে রহমন হেসে উঠলো—হাহাহাঃ। মনিয়ার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠলো।

যে আমাদের মানসপটে এতদিন দেবী হয়ে ছিল, সে আজ পাকের চেয়েও অধম হয়ে গেছে। কেমন যেন একটা অনুভূতির জ্বালা আমাদের চোখে ফুটে উঠলো। সে শুধু বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল আমাদের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির দিকে—তেমনি প্রশান্ত, স্নিগ্ধ অপরূপ সুন্দর ভাবে!

আমরা সুরু করলাম, নানা রকম অশ্লীল ঠাট্টা একান্ত নির্দ্দয় ভাবে।

সব শুনে মনিয়া একবার ঘৃণাভরে আমাদের পানে—তাকিয়ে বললে—জানোয়ার শয়তানের দল! বলেই সে ছুটে চলে গেল—

সেই থেকে মনিয়াকে আমরা আর কখনো দেখিনি! তেমনি প্রভাতী রোদ এসে আমাদের আশীর্ব্বাদ করে যায়—কিন্তু মনিয়া আর আসে না। দিন আমাদের কাটে তেমনি বৈচিত্র্যহীন ভাবে, নবপ্রভাত আমাদের কাছে বহন করে আনে ক্লান্তি—দিন তবু চলে।

* Maxim Gorky, লিখিত Twenty Six and One নামক গল্পের মর্ম্মানুবাদ

নরবলি

শ্রীরমেশচন্দ্র মিত্র

প্রবন্ধ

প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যে মানব সভ্যতার অতি আদিম অবস্থায় ভারতে ও ইউরোপে এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে নরবলি পূজার বা যুদ্ধের জন্য প্রদত্ত হইয়া আসিত। ক্রমে সভ্যতার সহিত জ্ঞানের বিকাশ হওয়ায় এবং রাজ-শাসনের দৃঢ়তায় এই হেয়-প্রথা ক্রমশঃ হ্রাস পায়।

সুদূর অতীতে ফিনিসিয়গণ বল্ ও মোলক্ নামক দেবতার পূজা করিতেন ও সেই দেবতাগণের উদ্দেশে নরবলি দিয়া তাঁহাদিগের তৃপ্তি সাধন করিতেন। প্রাচীন কার্থেজের অধিবাসিগণ রণবিজিত হতভাগ্য শত্রুগণকে বলিদান দিতেন। গ্রীসের এথেন্স নগরবাসিগণ তাঁহাদিগের নিজ নিজ পাপক্ষয়ের জন্য আপোলো দেবের উদ্দেশে আরজিলিয়া পর্ব্বে নরবলি দিয়া দেবতার শোণিত তৃষ্ণা মিটাইতেন। বর্ত্তমান সুসভ্য ইংলণ্ডের প্রাচীন Druidগণ তাঁহাদিগের দেবতার সমক্ষে নরবলি দিয়া ধন্য হইতেন। মহাকবি হোমর তাঁহার কাব্যে ইউলিসিসের ছয় বন্ধুর সাইক্লপদিগের গুহায় সিলা কর্ত্তৃক ভক্ষণের বর্ণনা করিয়াছেন। মহামতি টড্ তাঁহার রাজস্থানে আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের সময় মহারাণা ভীমসিংহের সাতটী পুত্রের প্রাণ "মৈ ভুখা হুঁ" বলিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবী কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া দান— এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন আসিরিয়গণ নরবলি দিতেন বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত আছে। ইজিপ্সিয়ানগণেরা রক্তবর্ণ চুল বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে নরবলি দিতেন। রোমানরা রণে পরাজিতদিগকে বলি দিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিত। পরে এই জঘন্য প্রথা কর্ণিলিয়াস ও লিসিনিয়াস কর্ত্তৃক নিবারিত হয়। প্রাচীন য়িহুদী জাতিরা মোলক্ দেবতার নিকট নিরপরাধ ক্ষুদ্র শিশুকে বলিদান দিয়া সেই ভীষণ দেবতার রক্ত-পিপাসা মিটাইতেন বলিয়া বর্ণনা পাঠ করি। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্রেস্‌কাট তাঁহার মেক্সিকোর ইতিহাস নামক গ্রন্থে আজেতক্ জাতির ভিতর নরবলি-প্রথা ছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আমাদের দেশে পশ্চিম উড়িষ্যার খন্দ জাতির ভিতর ঐ প্রথা ছিল—এবং উহারা এখনো সুবিধা পাইলে নরবলি দিয়া বিশেষ আনন্দানুভব করিয়া থাকে।

ঋকবেদে আত্রেয় ব্রাহ্মণে নরবলির কথা বর্ণিত আছে। (T. A. S. VXIII P-96) নরমেধ, পুরষমেধ ইত্যাদির কথা আমরা পুরাণে পাঠ করিয়া থাকি। কালিকা পুরাণে দেবীর নিকট কিরূপ ব্যক্তিকে বলি দেওয়া হইতে পারে, তাহার বিশদ বর্ণনা আছে। রামায়ণে চামুণ্ডার নরবলি-প্রীতি সকলেই পাঠ করিয়াছেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই দুর্গা পূজার সময় ক্ষীরের পুতুলের বলি দেখিয়া থাকিবেন বোধ হয়। অনেকেই জানেন না যে উহা তাঁহাদিগের বংশে যে পূর্ব্বে নরবলি প্রদত্ত হইত, তাহার শেষ চিহ্ন। আমাদের দেশের মেয়েরা যে বুক চিরিয়া দেবীর সমক্ষে রক্তদান করেন, তাহাতে দেবীর নরশোণিত স্পৃহাই প্রমাণ হয়। গঙ্গা সাগরে সন্তান বিসর্জ্জনও যে দেবতার নরমাংস-প্রিয়তার লক্ষণ তাহাতে সন্দেহ নাই।

পেরুভিয়ায় ও দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরের দ্বীপপুঞ্জ-সমূহের মধ্যে অদ্যাবধি নরবলির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তবে খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই ভীষণ প্রথা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে বলিয়া জানা যায়।

ভারতবর্ষে অঘোরপন্থী নামক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নরমাংস-প্রিয়তার কথা অনেকেই জানেন।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুরের নিকট একটি মুসলমান ক্ষৌরকারকে কালী দেবীর সম্মুখে বলি দেওয়া হয়। হত্যাকারীর অবশেষে ফাঁসি হয়।

কয়েক দিন পূর্ব্বে আফ্রিকার কাংগো দেশ-বাসীরা ইয়োরোপীয়গণের অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া একজন ইয়োরোপীয় কমিসনারকে হত্যা করিয়া রন্ধন করিয়া খাইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। আফ্রিকার অসভ্য জাতিদের মধ্যে এখনো নরমাংস-প্রিয়তার কথা শুনা যায়। তবে ক্রমশঃ তাহাদিগের ঐ স্পৃহা কমিয়া আসিতেছে।



ভারতবর্ষ—শ্রাবণ—১৩৩৮

এ সংখ্যায় ছোট গল্প আছে চারটি।

প্রথম গল্প শ্রীহাসিরাশি দেবীর "চির-বিদায়।" লম্পট ও দুশ্চরিত্র স্বামীর প্রতি পরিত্যক্তা রূপহীনা স্ত্রীর দৃঢ় অনুরাগ এবং পরে সেই স্ত্রীর কাছে স্বামীর অন্তর বেদনা নিবেদন ও তাহার সহিত পুনর্মিলনের ইচ্ছা প্রকাশ,—গল্পটির বিষয় বস্তু। ইহার মধ্যে অবশ্য নূতনত্ব কিছু নাই। কিন্তু মোহান্তজীর চরিত্রটি যে-ভাবে আঁকা হইয়াছে, তাহাতে লেখিকার নির্ভীকতা সুস্পষ্ট। ঠিক এমনি স্পষ্ট ছবি আর কোন লেখিকা পূর্ব্বে আঁকিয়াছেন বলিয়া মনে তো পড়ে না। এই প্রাণীটি জাতির দেহে কয়েকটি গুরুতর ব্যাধির মধ্যে একটীর মত লাগিয়াছে।

রচনাটির ভাষা বেশ সরল ও ঝর ঝরে; অনাবশ্যক বাগ্‌জালে পাঠকের মনকে পীড়িত করে না। তবে আবার একজায়গায় একসঙ্গে প্রত্যেকটি ছত্রের শেষে—জমিয়াছিল, উঠিয়াছিল, করিয়াছিল, তুলিয়াছিল—এতগুলি "আছিলও" শুনিতে ভাল নয়। আর একটী ক্ষুদ্র আপত্তি আছে, জাত বৈষ্ণবের মেয়েকে কাশি পাঠানোয়। অমন শ্রীবৃন্দাবন থাকিতে সে কাশি যাইবে কোন্ দুঃখে? আমরা তো জানি বৈষ্ণবেরা শ্রীবৃন্দাবনের জন্যই ব্যাকুল।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীপাচুগোপাল মুখোপধ্যায়ের "পদচিহ্ন।" একটী গণিকার গল্প। প্রথমে সে গণিকা প্রখ্যাত কবির মনে ভাব জোগায়, দোর্দ্দণ্ড অভিনেতাকে উদ্দীপিত করে, ডেঁপো ছোকরার Pleasant adventure-এর লক্ষ্য হয় ও ধনী বাবুর রক্ষিতা থাকে, পরে সে "আত্মঅভিব্যক্তির" ঠেলায় কতুর। আহা! হৃদয়েই যে গল্পের জন্ম।

তৃতীয় গল্প শ্রীবিজয় রত্ন মজুমদারের "সেবিকা।" বেশ হইয়াছে,—কিন্তু কেমন একটা বিলাতী বোটকা গন্ধ পাওয়া যায়। সত্যই যদি হাসপাতালের সেবিকারা (নার্স) এই কথাটি বলিতে পারিতেন, "আমি ঈশ্বর সাক্ষী করে যে ব্রত নিয়েছি, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তা পালন করব" তাহা হইলে, ঘরের চেয়ে আমাদের দেশের লোকে রোগ হইলে হাসপাতালে গিয়াই মরিতে চাহিত। গল্পটির মধ্যে কয়েকখানি ছোট ছোট চি… আছে, আর আছে ছোট ক্ষুদ্র একটী Romance—সবগুলিই বেশ!

চতুর্থ গল্প "শ্রী……রায়ের" "ভুল ভাঙা।" গল্পটিতে কৌতুক উপভোগ করা যায়। ম… হয় নাই।

এ সংখ্যায় রঙিণ্ ছবি আছে চারখানি।

প্রথম ছবি শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার রায়ের "কালিদাস" —পরিকল্পনাটি একটা সংস্কৃত শ্লোক হইতে গৃহীত। কালিদাসকে লোকে না-দেখিলেও সাধারণতঃ তাঁহার যে মূর্ত্তি কল্পনা করে, তাহা অবশ্য এই ছবিখানি অপেক্ষা সুন্দর। ছবির কালিদাসকে দেখিয়া মনে হয়, তিনি ছিলেন খাস উৎকল-বাসী এবং শ্রীক্ষেত্রে পাণ্ডা-গিরি করিতেন। আর রাণীর মূর্ত্তিখানি হইয়াছে চীন-ব্রহ্মদেশের মাঝামাঝি এক প্রদেশের নারীর মুখ, দক্ষিণ হাতখানি রসের এক পয়সা দামের পুতুলকেও … ধরিতে হার মানায় এবং বাম হাতখানি—না, হাতের কথা বাদ দিয়া দেহের কথা বলি। স্কন্ধ হইতে কটি এবং কটি হইতে গুল্ফ—যেন ভুটিয়ার আগা … পাঞ্জাবীর পাছতলা।

দ্বিতীয় ছবি এম, ভি, হুব্বা রাওয়ের "নাগপূজা" মন্দ লাগে নাই, কিন্তু পূজারিণীর পূজাপাত্র হইতে যে ধূম নির্গত হইতেছে তাহা কি ধূপের? তাহা হইলে তো সর্ব্বনাশ!

তৃতীয় ছবি শ্রীযুক্তা হাসিরাশি দেবীর "রাত্রি এসে যেথায় মেশে। দিনের পারাবারে—"পরিকল্পনাটি পাওয়া গিয়াছে রবীন্দ্রনাথ হইতে, উৎসাহ দিতেছেন ভারতবর্ষ। একদিন ফল ভালই হইবে আশা করা যায়।

চতুর্থ ছবি শ্রীযুক্ত কুলজারঞ্জন চৌধুরীর "মাছধরা।" বাংলার প্রায় সকল নদীতেই এই দৃশ্য দেখা যায়। দৃশ্যটি অতি সাধারণ কিন্তু ইহার মধ্যেকার ভাবটি বেশ। কিন্তু মাছরাঙাটাকে মনে হয় যেন পায়রা আর ধীবরটির হাত কয়েক নীচে নৌকাখানাকে ধীবর ও জালের অনুপাতে মনে হয় যেন একটা মোচার খোলা।

প্রবাসী—শ্রাবণ—১৩৩৮

এ সংখ্যায় ছোট গল্প আছে চারটি—তাহাদের মধ্যে একটী ইটালিয়ান হইতে।

প্রথম গল্প শ্রীতারাদাস মুখোপাধ্যায়ের "সাধ"—মেয়ের নয় একটী নিঃসঙ্গ পুরুষের অন্তরের। রচনাটিকে চিত্র বলাই ঠিক! মন্দ হয় নাই। পড়ার পরে মনে একটু ছাপ থাকে। ভাষা পরিষ্কার।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীস্বর্ণলতা চৌধুরীর—"চুরির দায়।" এইটিই ইটালিয়ান হইতে।

তৃতীয় গল্প শ্রীসত্যভূষণ সেনের "দেড়টাকা।" চলনসই।

চতুর্থ গল্প শ্রীসুবোধ বসুর "মামার মোটর।" রচনাটি লঘু—পড়িতে মন্দ লাগে না। মধ্যে যে দু'একখানি চিত্র আছে, বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গীতে অঙ্কিত। চালিয়াৎ তরুণটিকে পরিশেষে যে ভাবে লজ্জা দেওয়া হইয়াছে, তাহা Dramatic করিলে বেশ হইত।

এ সংখ্যায় রঙিণ ছবি আছে তিনখানি। প্রথম ছবি—"একটী প্রাচীন চিত্র হইতে।"

দ্বিতীয় ছবি "আর তুর্ক অঙ্কিত "ইস্পাহান।" ছবিখানিতে বেশ একটী ঔদার্য্য ও শান্তি আছে।

তৃতীয় ছবি শ্রীরমেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তীর "দোকান।" আড়ষ্ট।

বসুমতী—আষাঢ়—১৩৩৮

এ সংখ্যায় ছোট গল্প আছে পাঁচটি।

প্রথম গল্প শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের "অকিঞ্চনের দাদা।" গল্পটির কয়েকটি দৃশ্য রেখাচিত্রের সাহায্যে স্পষ্টতর করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না—বাক্য কৌশলে তাহা সুস্পষ্টই। বরং কাঁচা হাতের চিত্রগুলি যেন একটু রস-ভঙ্গ করিয়াছে। গল্পটি দীর্ঘ, কিন্তু পড়িতে একতিলও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না, প্রথম হইতে শেষ অবধি কৌতুকে ভাসিয়া চলে।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীমনীন্দ্র লাল বন্দোপাধ্যায়ের "নারায়ণীর অদৃষ্ট।" গল্পটি অনাবশ্যক দীর্ঘ,—স্থানে স্থানে মনে হয় কোন দৈনিক সংবাদ-পত্রে হিন্দু-মুসলমান-দাঙ্গা বিবরণ পাঠ করিতেছি। তাহা ছাড়া, পাপ করিলে শাস্তি এবং পুণ্য করিলে সুখ, এ কথাটা এমন মোটা ভাবে বলা হইয়াছে যে সমস্ত রচনাটি একেবারে ব্যর্থ। লেখাটি পড়িতে আরম্ভ করিলে, গল্পের আমোদ অপেক্ষা হিতোপদেশের পীড়নই মনে অনুভূত হয়। এ ধরণের গল্প বটতলারই বিশেষত্ব বলিয়া এতদিন জানা ছিল।

তৃতীয় গল্প শ্রীগিরীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের "সুধা-কণা।" গল্পটির প্রারম্ভে এই মর্ম্মে ক্ষুদ্র একটী সম্পাদকীয় মন্তব্য আছে যে, ইহা ভগবানের অপূর্ব্ব প্রকাশের একটী সত্য কাহিনী। কাজেই পরিসমাপ্তিটুকু অপূর্ব্ব! একজন কিছু না-খাইয়াই ত্রিশ বৎসর রূপলাবণ্যযুক্ত সুস্থ দেহে দিব্য বাঁচিয়া আছে। কিন্তু লেখাটি মানুষের কেরামতি বলিয়া একদম রদ্দি। লেখক বলিতেছেন—"বাঙ্গলার গৃহে আজ তৃতীয় ব্যক্তির স্থান ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আসছে. বিশেষ সে তৃতীয় ব্যক্তি যদি দুভর বিধবা হয়।" হায় বাঙালী! তোমার গৃহে অনেক প্রাচুর্য্য সত্ত্বেও, তুমি এমন জঘন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত; আর চাহিয়া দেখ, ঐ বিহারের যব-ভুট্টার ক্ষেত শুকাইয়া খাঁ খাঁ করিতেছে, তবু সেখানে গৃহে গৃহে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এমন কি সপ্তম পুরুষও দিব্য আরামে খৈনি ডলিয়া একজনের রোজগারে পেট ভরিয়া দাল রুটি সেবন করিতেছে। যাহা হউক, বসুমতীর দেব-দ্বিজে ভক্তি আছে। পর পর দুইটি গল্পেই তাহা অতি স্থূলভাবে প্রকাশিত।

চতুর্থ গল্প শ্রীমতিলাল দাশ (এম্-এ, বি-এল) র "স্বামী ও স্ত্রী।" মনে করিয়াছিলাম, বুঝি রঙ্গ-কৌতুক অথবা কোন বৃহৎ সমস্যার সমাধান বা উত্থাপন। শেষে দেখি হায়! বড়লোকের মেয়ে ও গরীবের ছেলের

একটা আজগুবী ব্যাপার। লেখকের স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আচরণ এমন হৃদয়হীন ও আজগুবি যে মনে হয়, লেখক গল্পটি লিখিবার কালে, অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন। স্বামী সংসার চিন্তায়, পরিশ্রমে দিন দিন শুকাইয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে অথচ স্ত্রী তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চলে, এ কথাটা এ দেশের মেয়ের সম্বন্ধে একটুও লজ্জা বোধ হইল না, ইহাই আশ্চর্য্য!

পঞ্চম গল্প শ্রীসৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের "তপশ্চর্য্যা" —বিযোদগার' আশা করি, যোগাক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ গল্প শ্রীসুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী (বি-এস-সি)র "মরীচিকা।" পরম নিষ্ঠাবান্, শিক্ষিত ও ধনী পিতা এবং তাঁহার পশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী পুত্রের মধ্যে বিরোধ। গল্পে বিরোধের কারণটা স্পষ্ট নয় কিন্তু পিতার ক্রোধ ও পুত্রের আত্মাভিমান সুপ্রকট। পুত্র এক বিলাতি তরুণীর পাণীপীড়নে সচেষ্ট থাকিয়া পরিশেষে পিতার কঠিন রোগ-সংবাদে সেই সদিচ্ছা ত্যাগ করিয়া পিতার কাছে ফিরিয়া যায়। মরীচিকার মায়াজাল ইহার মধ্যে কোথাও সুস্পষ্ট নয়—কাজেই নামটিও ঠিক হয় নাই। "কেঁচেগণ্ডূষ" নামটি কেমন মানায়?

এ সংখ্যায় রঙিন্ ছবি আছে তিনখানি।

প্রথম ছবি শ্রীচারুচন্দ্র সেন গুপ্তের—বিরহিণী যক্ষী। দেখিলে মনে হয় যেন এক পারসীক সুন্দরী। ছবিখানি করুণ হওয়া উচিত ছিল, আর হওয়া উচিত ছিল চাঁদের আলো ঠিক চাঁদের আলোর মতই। ইহা অবশ্য শিল্পীর ক্রুটি নয়—খোদার উপর খোদকারী।

দ্বিতীয় ছবি শ্রীসতীশ চন্দ্র সিংহের "অপরাহ্নে"— ভরা কলসী মাথায় এক পশ্চিমা তরুণী, বোধ হয় মহুয়া গাছের তলা দিয়া যাইতেছে। দেহে তাহার ভরা যৌবন, মুখে তাহার মুচ্‌কি হাসি—ভাল না লাগিয়া যায় কোথায়?

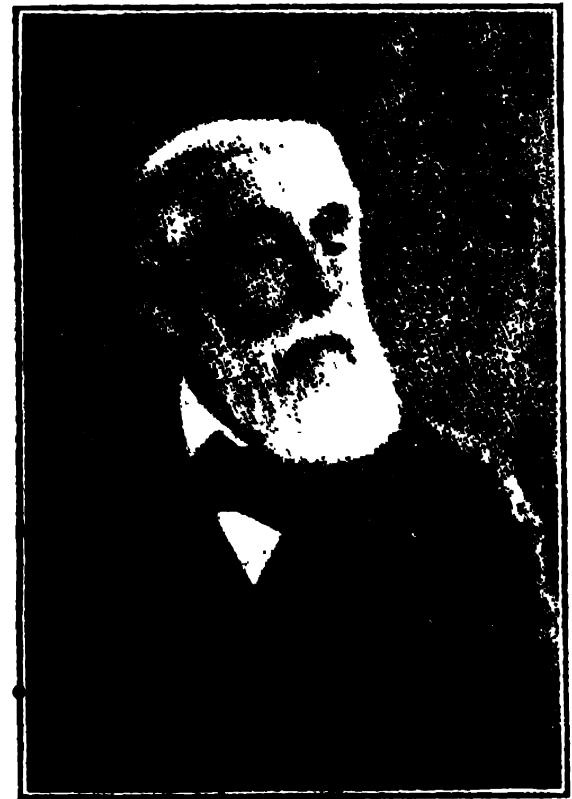
তৃতীয় ছবি এ, কে, চ্যাটার্জ্জীর "আব্‌দার।" শিল্পী নিশ্চয়ই বাঙালী, নামে সাহেবী ঢঙ্ থাকিলে কি হয়। আর ছবি, থাক, সে কথা আর নাই বলিলাম। বাঁচিয়া থাক্ বাংলার মাসিক-পত্রিকা—ছবি প্রকাশের ভয় কি?

—

স্মৃতি পূজা



৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর



৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ষা-বিলাস

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ঘোষ

ওগো তোরা সবে দেখ চেয়ে নভে
একি উৎসব লেগেছে।
মুক্ত মেঘের অন্তরে আজ
পুলক নৃত্য জেগেছে।

কাননে ফুটেছে যুঁই-বেলি-ফুল,
শিহরি পুলকে ঝরে কেয়া ফুল,
পারুল গন্ধে পরাণ আকুল,
হরষে দাদুরী ডেকেছে।
শ্রাবণ গগন ঘেরিয়া বাদল
উৎসব তরে জেগেছে।

বরষার গানে ক্রন্দন আনে
সঞ্চারে প্রাণে বেদনা,
পুষ্কর মেঘে জমাট বেঁধেছে
বিশ্ববিরহ চেতনা।

উড়ে-চলা-মেঘে ছুটে চলে মন
যেথায় বিরহী পেতেছে শয়ন,
আজিকার দিনে কে বলিবে তারে—
'কেঁদনা গো তুমি কেঁদনা'
বরষার ধারা বরিষণে আজ
সঞ্চারে প্রাণে বেদনা।

দুর্ব্বার স্রোতে ধেয়ে চলে জল
কল কল্লোল নাদিনী,
জলদমন্দ্রে ধ্বনি উঠে নভে
মেঘমল্লার রাগিণী।

সেই ধ্বনি মাঝে শুনি পেতে কাণ
যক্ষনারীর বেদনার গান,
কোন অলকার নির্জ্জনে কাঁদে
ব্যথিত দুঃখ-ভাগিনী,
গুরু গুরু মেঘে দুরু দুরু বুক—
বাজে মল্লার রাগিণী।

বিদ্যুৎ আজি করে ভ্রূবিলাস,
হানে বিদ্যুৎ নয়নে,
কিশোর সুষমা-সিঞ্চিত-হাসি
বিকশিত তারি বয়নে।
উড়ে পড়ে ঘন—কাল-কুন্তল,
হিল্লোলে দোলে বিলোলাঞ্চল,
চমকি চমকি চলে চপলায়া
কার আঁখি-জল চরণে?
বিদ্যুৎ-ফণী নাচে ফণা তুলে—
করে পরিহাস নয়নে।

মেঘ-মৃদঙ্গে কাঁপে অম্বর,
আশ্বাসে চাহে ধরণী,
পাগল বাতাস ছাড়ে নিশ্বাস
চিত্ত-উদাস করনী!

আজ মনে পড়ে কোথা সেই দেশ,
কোন্ বাতায়নে এলায়িত কেশ,
কা'র দিঠি ভরা ব্যথিত আবেশ,
কোথা চম্পকবরণী?
পাগল বাতাস মরিছে শ্বসিয়া—
নিঃস্ব এ সারা ধরণী।

ওগো আজ মোরে কে কহিয়া দিবে—
কোথায় সে অভিসারিকা,
চাঁপার কলির মত অঙ্গুলি
গাঁথে বন-ফুল মালিকা!

অলকগন্ধ আসিছে বাতাসে,
নয়ন-নীলিমা ভাসিছে আকাশে,
কঙ্কণ ধ্বনি শুনেছি আভাসে,
কণ্ঠ কি মনোহারিকা!
শুধাব কাহারে, কে বলিবে মোরে
কোথায় সে অভিসারিকা?

আমার নিভৃত অন্তর মাঝে
ওগো মন্থরগামিনী,
এসো এসো চির-বিরহবিধুরা—
ওগো চির অভিমানিনী!

জল-ভরা-চোখে চাহ একবার,
ঢল ঢল মুখ দেখিব তোমার,
শুনিব চিত্ত-বাতায়ন খুলি
সঙ্গীত দিবা যামিনী,
এ ভরা বাদরে এসো অন্তরে
ওগো মন্থর গামিনী।

আজি এ শ্রাবণ-বর্ষণ মাঝে
মেঘ-গুণ্ঠন খুলিয়া
ক্রন্দিছে যত বিরহী আত্মা,
শ্বসিছে ফুলিয়া ফুলিয়া।
ঝর ঝর বারি ঝরে অবিরল,
দিকে দিকে বাজে বাদল-মাদল,
নভো সীমান্তে সলিলাঞ্চল
কে দিয়েছে ভুলে তুলিয়া?
শ্রাবণ-প্লাবন-উৎসব-দিনে
দাও গুণ্ঠন খুলিয়া॥



মহাত্মা ও ভারত শাসননীতি

গুজবের এখনও শেষ হইল না। মহাত্মা বিলাত যাইবেন কিনা এখনও দেখিতেছি অনেকেরই সন্দেহ আছে। তাঁহার শেষ 'আল্‌টীমিটম্‌' দেখিয়া যাঁহারা এখনও তাঁহার বিলাত যাত্রা সম্বন্ধে সন্দিহান, তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকুন মহাত্মাজী বিলাত যাইবেনই। তাঁহার কতকগুলি দাবী-দাওয়া আছে এবং তিনি সেইগুলি বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বে কড়ায়-গণ্ডায় সরকার পক্ষ হইতে আদায় করিয়া লইতে চাহেন। বরদৌলি তালুকের সমস্যার সমাধান তাঁহার নিকট অত্যন্ত প্রিয়; কেননা উহাই তাঁহার প্রধান কর্ম্ম-ক্ষেত্র। সর্দ্দার পেটেল ও পণ্ডিত জহরলালকে আপাততঃ কতকটা নিরস্ত রাখাও তাঁহার উদ্দেশ্য। বরদৌলি তালুকের সমস্ত গোলমাল মিটিয়া গেলে, সর্দ্দার পেটেলকে ঠাণ্ডা রাখিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। আর পণ্ডিত জহরলালকে বশে না রাখিতে পারিলে যে কোন মুহূর্ত্তে যুক্ত-প্রদেশে অগ্নি প্রবাহের যুক্ত বেণী মুক্ত-বেণীতে পরিণত হইতে পারে। এই সন্দেহ করেন বলিয়াই তাঁহাকে সঙ্গ করিয়া লইয়া বড়লাট মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়াছেন। এখন তাঁহার বিলাত-যাত্রার পথ তো বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

তবে বিলাতে তাঁহার গমন লইয়া তথাকার সাংবাদিকরা একটু বেশ রহস্য করিতেছেন। যাঁহারা চিরকালই সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা ভাবিতেই পারিতেছেন না মহাত্মাজী সামান্য কৌপীন বস্ত্র পরিধান করিয়া মহামান্য প্রধান মন্ত্রীর সহিত একাসনে কি করিয়া উপবেশন করিবেন? আর একদল যেন একটু সহানুভূতি দেখাইয়া বলিতেছেন, অক্টোবরে বিলাতে দারুণ শীত পড়িবে, তথায় বস্ত্রহীন অবস্থায় গেলে মহাত্মাজীর কঠিন পীড়া হইতে পারে। কিন্তু বিলাতি সাংবাদিকরা ভুলিয়া যান কেন যে, তাঁহাদের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী কিছু একজন অভিজাত নন, তাঁহাকেও একদিন কয়লার খনিতে কাজ করিতে হইয়াছে। এখন তাঁহার গাত্রে কোট, ওভার কোট শোভা পাইলেও একদিন উহারা একান্তই অভাব ছিল। আমরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কতকগুলি কাপড়ের অন্তরালে তাঁহার কুলিজন্ম ঢাকা পড়িয়া আভিজাত্য গৌরব ফুটিয়া উঠিয়াছে কি? তাহার পর তাঁহার পরিধেয় বসন কি হইবে, তাহার সবিশেষ সমাধান মহাত্মাজী নিজেই করিবেন। ভারতের মহাপুরুষরা বদরিকার মতন মহা শীত প্রধান স্থানেও নগ্ন গায়ে বাস করিতেন। এখন যাঁহারা কাঞ্চন-জঙ্ঘা অভিযান করিতেছেন, তাঁহারা তো তাহা স্ব-চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, ইংরাজ সাংবাদিকরা তাহা কি অবগত ন'ন?

দ্বিতীয় গবেষণার বিষয় মহাত্মাজী তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূরণে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন? যাঁহার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার নিকট অদ্যাবধি তাবৎ সমস্যাই নতশির হইয়াছে, যাঁহাকে তাবৎ পৃথিবীবাসীই নরাবতার বলিয়া যখন পূজা করিয়া আসিতেছেন, ভারতের পূজনীয় নেতারা যখন তাঁহাকে একমাত্র প্রতিনিধি করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তাঁহার ক্ষমতায় সন্দেহ করা বাতুলতা মাত্র। মহাত্মাজী ভারতকে মুক্তির পথে আগাইয়া দিবেনই, ভারতকে মুক্তির পথে যাইয়া দাঁড়াইতে হইবেই। তবে বিপ্লব-পন্থীদের কার্য্যাবলী তাঁহাকে একটু বিব্রত করিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অহিংসার অবতার, বর্ত্তমান যুগের শাক্যসিংহ গান্ধিজী বিপ্লব-পন্থীদের কার্য্যাবলী নিশ্চয়ই সমর্থন করিতে পারিতেছেন না। উপরন্তু তাঁহার শত্রুপক্ষ তাহাদের ঘটনাবলীর সাহায্যে

তাঁহার বিরুদ্ধে একটী বেশ শক্তদল গঠন করিবার প্রয়াস পাইতেছে।

ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন-প্রণালী কি হইবে তাহা ভবিতব্যই জানেন। ইউরোপের ও আমেরিকার বর্ত্তমান সমস্ত শাসন প্রণালীগুলিই পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট। যে দল কোন রকমে দেশের অপরাপর জন সম্প্রদায়কে কোন রকমে হস্তগত করিতে পারে, তাহারাই দিনকতক শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়া থাকে। পতিতের উপর অত্যাচার তাহাদের অস্থি-মজ্জাগত। ভারতকে দিয়া হয়ত ভগবান এমন শাসন-প্রণালী গঠন করাইতে চাহেন, যেখানে প্রবলের অত্যাচার চিরকালের জন্য শাসন-নীতির ইতিহাস হইতে দূরীভূত হইবে। জাতির উপর জাতির হিংসা অন্তর্হিত হইবে। সমগ্র মানব-জাতি আপনাকে এক পরিবার ভুক্ত বলিয়া মনে করিবে। এগুলি অবশ্য যুগ ধর্ম্মের কথা। সোভিয়েট রসিয়া অনেক আশা দিয়াছিল, কিন্তু তাহা পূরণ করিতে পারিলনা। কামাল শাসিত তুর্কি ও মুসোলিনী শাসিত ইটালী 'টিরানীর' নামান্তর মাত্র। তাই আজ সমগ্র জগৎ দারুণ যন্ত্রণায় ও ভীষণ উৎকণ্ঠা বক্ষে পোষণ করিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র মহামানবটীর দিকে তাকাইয়া আছে।

একদল বলিতেছেন, ডারহাম সাহেব কানাডায় যেমন সুন্দর ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন কিম্বা কারসন্ সাহেব যেমন আয়র্লণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, ঐ রকম একটা ব্যবস্থা ভারত-সম্বন্ধে প্রণয়ন হইলেই যথেষ্ট। আমরা কিন্তু বলি, তাহা হইলেই ভারতের পক্ষে যথেষ্ট হইবে না। মহাত্মা যীশু জন্মাইবার পূর্ব্বে পুরাকালে ইহুদি জাতি যেমন শতধা বিভক্ত হইয়া সহস্র সহস্র নেতার অধীনে চালিত হইয়া বিবিধ প্রকারের শিকল দেহের সর্ব্বাঙ্গে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, বর্ত্তমানে ভারতের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছে। এখানে বর্ণের সমাধান হওয়া যেমন দুরূহ, বিবিধ ধর্ম্মবাদের সমন্বয় করাও তেমনি কঠিন। স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতও ভীষণ। শুধু কতকগুলি রচা কথার সাহায্যে কানাডা বা আয়র্লণ্ডকে নকল করিয়া কোন শাসন-প্রথা প্রচলন করিতে গেলে ভুল করা হইবে। মহাত্মাজী ম্যাক্‌ডোনাল্ড প্রভৃতির ন্যায় সাধারণ রাজনৈতিক ন'ন, তাঁহার কার্য্য-প্রণালীও তাঁহাদের ন্যায় গতানুগতিকতার বশ্য নয়, সেইজন্যই তাঁহার নিকট আমরা একটা অভিনব কিছু চাই, যাহা প্রকৃত নূতন যুগ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের নিকট আশা করা যায়।

বাংলার কংগ্রেস-সালিসের খবর কি ?

মিঃ আনি পালাইয়াছেন। দুই পক্ষই বস্তা বস্তা কাগজ আনিয়া তাঁহার এজলাস ভর্ত্তি করিয়াছিল। বড় বড় কৌন্সিল তাঁহাদের মক্কেলদের পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন। হাকিমী করিতে অনভ্যস্ত মিষ্টার আনির তাহা ভাল লাগিবে কেন, তাই তিনি ভয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। এখানে আমাদের একটা শোনা কথা মনে পড়িয়া গেল। স্বর্গীয় লালমোহন ঘোষকে কোন একটা খুনি মামলায় আসামীর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য বর্দ্ধমানের কোন এক এজলাসে একবার হাজির হইতে হইয়াছিল। মোকদ্দমার অবস্থা সঙ্গিন দেখিয়া ব্যারিষ্টার প্রবর তাঁহার পুস্তকালয়ের যাবতীয় পুস্তক গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া এজলাসে হাজির করেন। মফস্বলের হাকিম মিঃ ঘোষের পুস্তক-রাজি দেখিয়া একেবারে ভ্যাবাচাকা খাইয়া মিঃ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করেন, ঐগুলি আনিবার প্রয়োজন কি ? মিঃ ঘোষ গম্ভীরভাবে রুমালে মুখ মুছিয়া বলেন, তাঁহার বিশ্বাস তাঁহার মক্কেল নির্দ্দোষ, ঐ বইগুলি পাঠ করিলে যে-ধারায় তাহা প্রমাণ হইবে তাহা তিনি জানিতে পারিবেন, এই জন্যই ঐ পুস্তকগুলি তিনি কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমানে লইয়া আসিয়াছেন। হাকিম মহোদয় তখন একটা লম্বা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নাকি বলিয়াছিলেন—মিঃ ঘোষ, বই রাখুন, আপনি যখন বলিতেছেন তখন আসামীকে আমি নির্দ্দোষী বলিয়াই ছাড়িয়া দিতেছি। মিঃ অ্যানির অবস্থাও বোধ হয় অনেকটা তদ্রূপই হইয়াছিল।

তাহাতো হইল। কিন্তু বাংলার রাজ-নীতি ক্ষেত্রে যে বিষ্ঠার পূতিগন্ধ আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে তাহার নিরাকরণ হইবে কি ? আমাদের মনে হয় বরং বাড়িয়াই চলিল। ১লা আগষ্ট কোন কাগজে একটা ফর্দ্দ ছাপা হইয়াছে। আমরা যাহা সন্দেহ করিয়া আসিতেছিলাম অর্থাৎ গত দুই সংখ্যায় যে কথার অবতারণা করিয়াছিলাম, তাহাই এবার ছাপার অক্ষরে দেখিতে পাইলাম। গত চারি বৎসর যখন মিঃ সেনগুপ্ত কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র

ছিলেন, তখন যাহাদিগকে চাকুরী দেওয়া হইয়াছিল, কাগজখানি তাহারই একটা লিষ্ট দিয়াছে। আমরা বলিব, উহা কিছু নূতন কথা নয়। কোন একটা অন্যায় জিদ বজায় রাখিবার জন্য অন্যায় যুদ্ধে যাহারা সাহায্য করে, তাহাদিগকে অনুগ্রহ দেখাইতে হইবেই, ইহা তো সনাতন সত্য। পৃথিবীতে এমন কোন মহাপুরুষ নাই যিনি আপনাকে ইহারও উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন। কোন কোন কাগজ দুই পক্ষের হইয়া যে গাল আরম্ভ করিয়াছে তাহা দাশরথির পাঁচালীকেও হার মানাইয়াছে। উহার অবসান হইবে না। কেন না, নেতারা স্বয়ংই উহাদের আস্কারা দিয়া আসিতেছেন, সারা বাংলা আজ কোথায় দাঁড়াইল, দলাদলি থামাইয়া একবার সে কথা ভাবিবেন কি ?

কর্পোরেশন ও ভবিষ্যৎ বাংলার শাসন

অনেকেইবলিয়া থাকেন যে, কলিকাতা করপোরেশন স্বরাজীদের হাতে না থাকিলে, উহাদের মধ্যে বর্ত্তমানে যে দলাদলি চলিতেছে, এত উৎকটভাবে উহা কখনই আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত না। আবার ভবিষ্যতে এই দলাদলি আরও বৃদ্ধি পাইবে, যখন বাংলার সরকার কংগ্রেসের হস্তগত হইবে। এই কথার উত্তর কি, তাহা আমরা ঠিক না জানিলেও তবে একথা সত্য যে বাংলায় বর্ত্তমানে যেরূপ ভ্রাতৃদ্রোহ চলিতেছে, যদি তদ্রূপই চলে তবে অন্যান্য প্রদেশে যাহাই হউক না কেন, বাংলার কংগ্রেস প্রধানকে কখনই প্রধান মন্ত্রী হইবার জন্য আহ্বান করা হইবে না। বাংলায় হিন্দু-মুসলমান জন সংখ্যা প্রায় সমান বাংলার কংগ্রেসী দল যদি মুসলমান নেতাদের হস্তগত না রাখিতে পারেন তাহা হইলে হয়ত মুসলিম লিগের সভাপতিকেই প্রধান মন্ত্রী করিয়া, সরকারী পক্ষ ও অ-কংগ্রেসী দল লইয়া রাজ্য-শাসন চালান হইবে। সুতরাং কালনেমীর লঙ্কা-ভাগের মতন তাঁহাদের সমস্ত আশাই বৃথা হইয়া যাইতে পারে। এই বিষয়টী যেন বিশেষ করিয়া মনে রাখেন।

ভারতীয় ঋণ

ভারতীয় ঋণ লইয়া আবার গোলমাল উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে ভারতের সমস্ত ঋণের পরিমাণ ১, ১০০ কোটী। কংগ্রেস ঠিক করিয়াছেন যে, উক্ত ঋণের ৭২৯ কোটী টাকা অযথা ভাবে খরচ করা হইয়াছে। উহাদ্বারা ভারতের বা ভারতবাসীর কোন উপকার হয় নাই! সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ তাঁহার বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য সংরক্ষণ উদ্দেশ্যে তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য উক্ত অর্থব্যয় করিয়া ঋণ-ভার ভারতের স্কন্ধে চাপান হইয়াছে, ভারতের ঋণ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিয়া লইতে গেলে যেটুকু ইতিহাসের প্রয়োজন আমরা এখানে সেইটুকুই আলোচনা করিতেছি।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী এখানে ব্যবসা করিতেই আসিয়াছিলেন, রাজ্য-স্থাপন করিবার কোন উদ্দেশ্যই প্রথমে তাঁহাদের ছিল না। ব্যবসার কেন্দ্র স্থাপন করিতে গিয়া দেশীয় শাসন-কর্ত্তাদের নিকট হইতে বাধা পাইয়া মোগল সরকার হইতে কতকগুলি বাণিজ্য-কেন্দ্র খাস ভাবে দখল করিতে সুরু করেন। তখন মোগল রাজত্বের অবসান হইয়া আসিতেছে, কাজেই ইংরাজ বণিকগণ তাঁহাদের পরওয়ানার বলে কতকটা স্বাধীন ভাবে বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলির শাসনভার গ্রহণ করিল। সে সব প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের কর্ণগোচর হইলেও সামান্য নজর গ্রহণ করিয়া বা একটু তদ্বির করিতে পারিলেই তাঁহারা নিরস্ত থাকিয়া যাইতেন। স্বাধীন বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন ব্যাপার লইয়াই ফরাসীদের সহিত ইংরাজদের কর্ণাটে ও বাংলায় সংঘর্ষ ঘটে। কোম্পানীকে বাধ্য হইয়া লস্কর সৈন্য ও গোরা সৈন্য সংগ্রহ করিতে হয়। একবার সৈন্যদল গঠন হইলে উহাকে বিদায় দেওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। রণক্ষেত্রে ইংরাজ-সৈন্য দেশীয় সৈন্যের তুলনায় আকাশপাতাল তফাৎ প্রমাণিত হইয়া যাওয়ায়, দেশ-জয়ের আশা ক্রমশঃ তাহাদের মাথায় ঢুকে। তাহার পরই ভারতের এক একটী প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন শাসন কর্ত্তাদের পরাজিত করিয়া দখল করিতে থাকে। ইংরাজ প্রধানগণ ভারতে যে ব্যবস্থা করিতেন, ইংলণ্ডের বোর্ড অফ্ ডিরেক্টর তাহা পছন্দ করিতেন না। তাঁহারা ভারতে ব্যবসায়ী হিসাবেই থাকিতে চাহিতেন, এইজন্য অনর্থক যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের খরচা বৃদ্ধি করিতে চাহিতেন না। মোটকথা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারত সরকারকে মারহাট্টা, টিপু সুলতান, শিখদের সহিত যুদ্ধ চালাইবার জন্য ঋণ করিতে হইয়াছিল।

তাহার পর সিপাহী যুদ্ধের সময় এই ঋণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ১৮৭৬খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিস্‌রেলী যখন স্বর্গীয়া মহারাণীকে ভারতের সাম্রাজ্ঞী হিসাবে ঘোষণা করেন, তখন ভারতের ঋণ-ভার দেখিয়া তিনি বেশ খানিকটা চমকাইয়া ছিলেন। তাহারপর আফগান যুদ্ধ, বর্মা-যুদ্ধ ইত্যাদিতে এই ঋণ-জাল বাড়িয়া যায়। লর্ড কার্জ্জন যখন ভারতের কর্ণধার নিযুক্ত হইয়া আসেন, তখন তিনি বলেন যে, পৃথিবীর তাবৎ সভ্যদেশেই জাতীয়-ঋণ নামে একটা ঋণ আছে। উহা সাধারণ প্রজার পক্ষে বেশ উপকারী। কেননা, তাহার নির্ভাবনায় তাহাদের সঞ্চিত অর্থ উহাতে গচ্ছিত রাখিতে পারে। এই জন্য তিনি ভারতীয় ঋণকে নূতন জীবন দিবার জন্য উহার সুদের হার কমাইয়া কতকগুলি জন-হিতকর কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিবার জন্য নূতন ঋণ গ্রহণ করেন। মহাত্মা গোখেল এক সময়ে ঋণ করিয়াই ভারতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। তখন ভারতের ঋণের পরিমাণ চার হইতে পাঁচ শত কোটীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। গত মহাযুদ্ধের সময় ভারত সরকার ইংলণ্ডকে সাহায্য করিবার জন্য ইউরোপে সৈন্য প্রেরণ করেন। তাহাতে উক্ত ঋণ-ভার বৃদ্ধি পাইয়া বর্ত্তমানে ১, ১০০ কোটীতে পরিণত হইয়াছে।

কংগ্রেস বলিয়াছেন যে, ইষ্ট-কোম্পানী তাহাদের রাজ্য-বিস্তারের জন্য যে অর্থ ব্যয় করিয়াছিল, তাহার জন্য যদি কেহ লাভবান হইয়া থাকে ত তাহা ইংলণ্ড। গত মহাযুদ্ধে ইংলণ্ড তাহার স্বার্থ-রক্ষার জন্যই ভারতকে অস্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিল কাজেই উক্ত ঋণ প্রকৃত পক্ষে ভারতের নহে। চীনে বৃটিশ বণিকের সাহায্যে জন্য যে অভিযান করা হইয়াছিল কিম্বা বৃটিশ-শিল্পের বাণিজ্য-কেন্দ্র প্রসার অভিলাসে বর্মা দখলে আনিবার জন্য যে সমস্ত অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছিল, উহাদের সকলেরই মূলে বৃটীশ স্বার্থ নিহিত ছিল। সুতরাং ভারত উহা কখনই দিবে না। কংগ্রেসের এই অভিমত প্রকাশ হইবার পর ক্যাপিটাল উহার সমালোচনা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিল। তাহাদের যুক্তির মধ্যে মৌলিকতা না থাকিলেও উহা একেবারেই সারহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ভারতীয় ঋণকে দুইভাকে ভাগ করা যাইতে পারে, ভারতে যে ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে, উহাকে রূপী-লোন বা ভারত হইতে সংগৃহীত ও টাকার দ্বারা পরিমাণিত ভারতীয় ঋণ; আর একটা ষ্টারলিং লোন বা ইংলণ্ড হইতে উত্তোলিত পাউণ্ডে সংগৃহীত ভারতীয় ঋণ। প্রথমোক্ত ঋণটি ভারত হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং উহার হিসাব ভারতীয় অর্থ টাকায়ই রাখা হয়। শেষোক্তটী বিলাত হইতে উত্তোলিত এবং উহার হিসাব বিলাতি অর্থ পাউণ্ডে রাখা হয়। ভারতীয় রাজনীতিবিৎ নেতৃবর্গ যদি মনে করেন যে, রূপীলোনটা তাঁহারা গ্রহণ করিবেন এবং ষ্টারলিং লোন দিব না বলিয়া অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে ষ্টারলিং লোনেরও অনেক খরিদদার ভারতেরই অধিবাসী এবং ভারতবাসী এবং রূপীলোনের অনেক খরিদ্দার ইউরোপীয়ও আছেন। সুতরাং এ চালে চলিতে গেলে তাঁহাদিগকে নিরাশ হইতে হইবে। তাহার পর যদি পূর্ব্বমত বজায় রাখিবার জন্য যে টাকাটা তাঁহাদের মতে ইংরাজ সরকার ভারতবর্ষের স্কন্ধে চাপাইয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইয়াছেন সে টাকাটা বাদ দিতে চান, তবে উহার কত অংশটা ষ্টারলিং লোন এবং কত অংশটাই বা রূপী-লোন তাহা নির্ণয় করা যেমন কঠিন হইবে উহার অনুপাত করিয়া দেশীয়দের বাদ দিয়া বিদেশীয়দের উপর চাপানও সেইরূপ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, নূতন শাসন-প্রণালীকে দেশ ও বিদেশের নিকট সম্মানিত ও পূজ্য রাখিতে গেলে, সোভিয়েট সরকারের অনুকরণে ভারতীয় ঋণ অগ্রাহ্য করিতে যাওয়া আমাদের বিবেচনায় বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইবে না। সরকারের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিয়া অনেক গরীব গৃহস্থ যেমন নিশ্চিন্ত আছেন, সেইরূপ অনেক রাজা মহারাজারাও বেশ শান্ত আছেন। ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করিয়া লর্ড ডালহৌসী দেখিলেন, দেশীয় রাজন্যবৃন্দ ভারতের সমতা আনিবার অনেকটা অন্তরায়স্বরূপ। সেই জন্য তিনি Doctrine of lapse প্রবর্ত্তন করিয়া রাজ্যগুলির অস্তিত্ব নাশ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন। ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পণ্ডিত-

গণ যদি ভাবেন যে স্বরাজ্য স্থাপিত হইলেই ভারতের ধনিক সম্প্রদায়কে অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন তবে তাঁহারা জানিয়া রাখুন যে তাহাতে তাঁহারা ভারতের গৃহ-বিবাদের পথই প্রশস্ত করিয়া দিবেন। কি ধনী, কি গৃহস্থ যাহারা তাঁহাদের প্রস্তাবিত প্রথানুযায়ী তাঁহাদের মূলধন হইতে বঞ্চিত হইবেন, সিপাহী-বিদ্রোহের রাজ্যচ্যুত সীমান্তদের মতন তাঁহারা তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবেই। ভারতের বাহিরে তাঁহাদের শত্রু-পক্ষ ন্যায়ের আচরণে প্রবল ভাব ধারণ করিবে। কোন নূতন শাসন প্রণালীর পক্ষে তাহা কখনই মঙ্গল-জনক হইতে পারে না।

ভারতের ঋণ সম্বন্ধে মহাত্মা

এ সম্বন্ধে মহাত্মা বলিতেছেন—"ব্রিটেন এবং ভারতবর্ষের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে কমিটির রিপোর্ট অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ—বিশেষতঃ এ সময়। পল্লবগ্রাহী রাজনৈতিকগণ কর্তৃক এই রিপোর্ট রচিত নহে, খ্যাতি ও জ্ঞানসম্পন্ন লোকেরাই এই রিপোর্ট লিখিয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং ভারতের মধ্যে যে সমস্ত আর্থিক লেন-দেন হইয়াছে, এই রিপোর্টে তাহারই সমালোচনা করা হইয়াছে। এই রিপোর্টকে কেহ যেন কংগ্রেসের চরম দাবী বলিয়া মনে না করেন। রিপোর্টখানিতে কংগ্রেস অনেক তথ্য পাইবেন, ইচ্ছা করিলে কংগ্রেস যে কোন দাবী উপেক্ষা করিতে পারেন আবার আবশ্যক হইলে যে-কোন দাবী যোগ করিতে পারেন। কংগ্রেস কখনও বলে নাই যে, তাহার দাবী পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। এবিষয় বিচারের ভার মধ্যস্থের উপর প্রদান করাই প্রকৃষ্টতম পন্থা; আইরিশ ফ্রী-ষ্টেটের বেলায় সেইরূপই করা হইয়াছিল। গয়ায় এবং লাহোরে কংগ্রেস যখন অধিক বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল, তখন এরূপ একটি কমিটী গঠন করারই সঙ্কল্প ছিল, সুতরাং কংগ্রেস স্বভাবতঃই সেই সংকল্প অনুযায়ী চলিবে। ভারতবর্ষ যাহাতে অন্ধকারে ঝাঁপ না দেয় কংগ্রেস তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। ভারতবর্ষের স্কন্ধে যে ঋণের বোঝা পড়িবে, তাহা পরিশোধ করিতে হইবে দরিদ্র অধিবাসীদের। এই দরিদ্রদের উপর খরচার বোঝা চাপাইয়া ভারতবর্ষ উদারতা দেখাইতে পারে না।"

বিব্রত ইউরোপ

জার্ম্মাণিকে লইয়া সারা ইউরোপ ও আমেরিকা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ যে হইবে তথাকার মহারথীরা কি জানিতেন না? স্বার্থ তাঁহাদিগকে এমন ভাবে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল যে তাঁহারা তাহা সম্যকভাবে বুঝিতে পারিলেও বুঝিতে চাহিতেন না। আমরা পূর্ব্বকার সংখ্যায় স্পষ্টই বলিয়াছিলাম যে আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি শক্তি সমূহ যাহারা শিল্প-সম্ভারের উপর নির্ভর করে তাহারা কখনই জার্ম্মাণকে নষ্ট হইতে দিবে না। কিন্তু ফান্সের স্বার্থ তাহা নয়। তাহাদের কৃষিগত জীবন। জার্ম্মাণির নিকট হইতে অর্থটা সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহাদের কম রাজস্বে চলিতে পারে। কাজেই তাহাদের স্বার্থের সহিত অপরাপর শক্তি পুঞ্জের স্বার্থের সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। জগৎ-ব্যাপী অর্থ-বিপ্লবে ও তাহারা যদি শিল্পজীবিই থাকিতে চাহে তবে তাঁহারা আর সন্ধির ও শান্তির কথা মুখে আনিবেন না। পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা যখন সভ্য ইউরোপের কাছে শিল্পের জন্য তাকাইত তখন ইউরোপের শিল্পজীবি হওয়ায় লাভ হইয়াছিল। বর্ত্তমানের এই বিরাট সভ্যতাকে রক্ষা করিতে যাইয়া তাহারা নানা রূপে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে একের পর একটী করিয়া তাঁহাদের পণ্য করিবার কেন্দ্রগুলি হস্ত চ্যুত হইতেছে। যে জাপান চীন তাহাদের বস্ত্রের জন্য মানচেষ্টারের দিকে তাকাইয়া থাকিত, আজ তাহারা তাহাদের তাবৎ অভাব মোচন করিয়া ভারতের বাজার ও দখল করিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছে। যে আমেরিকার তুলা বিশ্ব-বিখ্যাত ছিল, ভারত ও জাপান হইতে উৎপন্ন তুলা তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা করিয়া অনেক স্থলেই হঠাইয়া দিয়াছে। কলকত্তার একচেটিয়া কারবার ও পাশ্চাত্যদের হস্তচ্যুত হইয়া আসিতেছে। প্রতীচ্যের ব্যাঙ্ক ও ইনসিওর কোম্পানীগুলিও মাথা তুলিতেছে। পাশ্চাত্য যদি এই সময়ে কতকটা সামঞ্জস্য করিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নূতন প্রথায় চালিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে তবেই পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়া আসিবে, নতুবা তাহা সুদূর পরাহত।

কালের দুন্দুভি

'কালের দুন্দুভি আবার বাজিল ভারতে।' কবি যাহা গাহিয়াছিলেন চিরকালই ভারতে তাহা সত্য হইয়া রহিল। এবার এমন সু-জন্মা বৎসরে বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে খবর আসিতেছে যে তথাকার প্রজারা খাইতে পাইতেছে না। চাষীর গৃহে পয়সা নাই, জমিদার কপর্দ্দকহীন এ অবস্থায় আর কতদিন চলিবে। সহরে চাঁদার তদ্বির চলিতেছে কিন্তু চাঁদা দিবে কে? আর যাহা সংগৃহীত হইবার তাহার সমস্ত অংশটাই কি প্রকৃত স্থলে গিয়া পৌছাইবে। সরকারে পক্ষ হইতে অনেক স্থলে খাজনা রেহাই দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, কিন্তু উহাত রিপু কর্ম্ম, প্রকৃত রক্ষাকার্য্য কতদিনে সরকার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইবে।

বাংলা কাউন্সিল

বাংলার আইন সভায় এবার বিলের শ্রাবণের ধারা বহিয়া গেল। সরকারী ও বে-সরকারী বিলের সংখ্যা প্রায় ষোলটী ছিল। একদিকে যেমন গরম আইন সভায় তেমনি আইনের তর্ক। ব্যাপারটা মন্দ নয়। কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রী মহাশয়কে একটু তারিফ না করিয়া থাকিতে পরিতেছি না। তিনি না বহু দিন কর্পোরেশনের সদস্য ছিলেন। তাঁহার একটী প্রস্তাবিত বিলে মোটরের উপর ট্যাক্স বসাইবার কথা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে যে আইন আছে, তাহাতে লোকাল বোর্ড-গুলির মধ্যে একমাত্র কলিকাতা করপোরেশন ব্যতীত অন্য কেহই মোটরের উপর ট্যাক্স বসাইতে পারে না। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, ঐ ট্যাক্সটা বাংলা সরকার কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইবে এবং উহার এক একটা অংশ এক একটা লোকাল বোর্ডকে দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানে কলিকাতা করপোরেশন চারি লক্ষ টাকা মোটর ট্যাক্স বাবদ পাইয়া থাকে, সুতরাং করপোরেশনের ভাগে ৪ লক্ষ টাকা রাখিয়া বাকী টাকা ভাগ করিয়া দিবেন। তিনি কি জানেন না যে, মোটর ব্যবসায়ীরা নানা প্রকারে সরকার পক্ষকে ট্যাক্স দিয়া আসিতেছে। সেণ্ট্রাল রোড কমিটী তাহাদের উপর এক প্রকার কর ধার্য্য করিয়াছে। পেট্রল ও টায়ার-টিউবের উপর শুল্ক বাড়াইয়া পরোক্ষভাবে তাহাদের আয় কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার নূতন ট্যাক্স বসিলে তাহাদিগকে বিপদগ্রস্ত করা হইবে এবং পরোক্ষভাবে কলিকাতা ট্রাম কোম্পানীকে সাহায্য করা হইবে। সমস্ত স্বাধীন দেশেই দেশী প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে চলে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে এখানে তাহার ব্যতিক্রম কেন হইবে আমরা ত বুঝিতে পারিতেছি না।

ডাক্তার নরেশচন্দ্র তাঁহার জুটবিলটী নাকি আইন-সভা হইতে গৃহীত না হওয়ায় সমধিক দুঃখিত হইয়াছেন। জুট-বিলটী কি আমরা তাহা পড়ি নাই। তবে শুনিলাম উহাতে নাকি প্রত্যেক গ্রাম কতটা করিয়া পাট চাষ করিবে ইউনিয়ন বোর্ড তাহাই নির্ণয় করিয়া দিবে। অর্থাৎ পাট চাষটাকে তিনি প্রয়োজনানুযায়ী সংক্ষেপ করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহাই যদি সত্য হয়, সরকার পক্ষ হইতে উহার প্রতিবাদ হইল কেন? তাঁহারা কি জানেন না যে কোন পণ্য কে তাহার চাহিদা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে তাহার মূল্য বৃদ্ধি হয়। তবে একথা যদি সত্য হয় যে, বর্ত্তমান মন্ত্রিগণ ও তাঁহাদের সমর্থকগণ কতিপয় ইংরাজ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ হানি হইবে বলিয়া উহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে উহা খুবই দুঃখের বিষয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আর একটী বিল পাশ হইয়াছে, উহা Industry বিল বা দেশের শিল্প প্রসার বিল। উহার দ্বারা দেশে শিল্প প্রচার ও বৃদ্ধি হইতে দেখিলে সুখী হইব। কিন্তু এমন কি মনে হয় না যে প্রাথমিক শিক্ষা বিলের ন্যায় উহা সরকারী দপ্তরের মধ্যেই থাকিবে। অর্থাভাবে যদি বিলের প্রস্তাবগুলি কার্য্যে আরম্ভ করিতে না পারা যায়, তবে অতটা মেহনৎ করিয়া উহার প্রস্তাব আনয়ন করা হয় কেন? সবটাই কি eye-wash? স্বাধীন দেশ হইলে মন্ত্রীদিগকে নিশ্চয়ই কৈফিয়ৎ দিতে হইত, তবে এখানে এ কথা স্বতন্ত্র ইহা সত্য।

কাশ্মীর দাঙ্গা

হিন্দু-মুসলমানী দাঙ্গা অতি ভীষণ ভাবে কাশ্মীরে আত্মপ্রকাশ করিল কেন? ভারতবর্ষে দুইটী বিভিন্ন

প্রকৃতির সামন্ত নৃপতি শাসিত দেশ আছে। হায়দ্রাবাদ হিন্দু প্রধান দেশ কিন্তু তথাকার শাসক একজন মুসলমান সামন্ত, সেইরূপ কাশ্মীর মুসলমান প্রধান জনপদ, কিন্তু তথাকার কর্ণধার একজন হিন্দুরাজা। কয়েকদিন ধরিয়া কাশ্মীরে যে নাটকের অভিনয় হইল, তাহা দেখাইয়া অনেক ইংরাজ রাজনৈতিক বলিতেছেন, ঐ দেখ ভারত যদি হিন্দু প্রধান হইয়া একমাত্র কংগ্রেস কর্তৃক শাসিত হয়, তাহা হইলে যে সমস্ত দৃশ্য ঘটিবে তাহারই ক্ষুদ্র সংস্করণ কাশ্মীরে অভিনীত হইল। ব্যাপারটা খুব দুঃখের। নিরপেক্ষ তদন্তের একান্ত প্রয়োজন। গোপনে গোপনে যদি কোন উত্তেজনা থাকে, তাহার সাজা হওয়ায় খুব দরকার।

বয়সের গাছ পাথর নাই!

তুর্কির জেরা আগার বয়স বর্ত্তমানে ১৫০ বৎসর। আমরা এতদিন তাঁহাকে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া জানিতাম। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে যে, তাহা অপেক্ষা অধিকতর বয়োজ্যেষ্ঠ আর একজন আছেন, তাঁহার নাম বাইসিন, নিবাস চীনে। তাঁহার বর্ত্তমান বয়স ২৫০ বৎসর। তাঁহার স্বাস্থ্য এখনও অটুট আছে, তিনি প্রত্যেক দিন ৩৪ মাইল পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ১৪টী বিবাহ করিয়াছেন।

বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ

সম্প্রতি গণিতজ্ঞ শ্রীযুত সোমেশ চন্দ্র বোসের নাম বেশ জমকালো ভাবে শুনা যাইতেছে। ১২।১৪ বৎসর পূর্ব্বে ইনি ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটুটে গণিতজ্ঞতা দেখাইয়া কলিকাতায় বিশেষ খ্যাতি পান। পরে আমেরিকায় গিয়াও খ্যাতি অর্জ্জন করেন। শোনা যায় ইহার মত গণিতজ্ঞ এখন পৃথিবীতেও আছেন কিনা সন্দেহ। তিনি বড় বড় অঙ্কের উত্তর খুব তৎপরতার সহিত অতি অল্প সময়ের মধ্যে দিয়া থাকেন। তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়, ৩১৯৯৩ ৯১২০৬১৯৯১৯১২৩ ইহার কিউবিক্ রূট্ কত। তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন, ৬৮৩৯৪৭। প্রত্যহ মাত্র খানিকটা দুগ্ধ খাইয়াই নাকি তিনি জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগের পর হইতে তিনি শুদ্ধাচার যোগীর জীবন যাপন করিতেছেন এবং প্রত্যহ স্বর্গস্থ স্ত্রীর সহিত ধ্যানে নাকি তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

অস্পৃশ্যতা পরিহার

অস্পৃশ্যতা দিনে দিনে হিন্দু সমাজকে কত হীনবল করিয়া ফেলিয়াছে চিন্তাশীল হিন্দুমাত্রেই এখন তাহা বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন। মহাত্মা গান্ধী বরাবর হিন্দু সমাজকে অস্পৃশ্যতা পরিহার করিতে বলিতেছেন। —সম্প্রতি আমেদাবাদ সাহীবাগে একটি মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন কালে মহাত্মা বলিয়াছেন—'অস্পৃশ্যদের সম্পর্কে আমাদের কর্ত্তব্য রাজনৈতিক ব্যাপারের চেয়ে কম নহে। সমাজ সংস্কারে রাজনীতি যাহাতে বাধা না জন্মাইতে পারে আমি সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখি। তথাকথিত অস্পৃশ্যদের নিকট হিন্দুসমাজ বহুঋণে ঋণী—এ ঋণ সমাজকে পরিশোধ করিতে হইবে। সত্যই—অতীতে হিন্দুসমাজ অন্ত্যজদের উপর দানবের মত ব্যবহার করিয়াছে। সে কলঙ্ক হিন্দুসমাজের গৌরবোজ্জ্বল নাম কলঙ্কিত করিয়াছে, আমরা যদি এতদিনও স্বরাজ না পাইয়া থাকি, ঐ কলঙ্কের জন্যই পাই নাই। হিন্দু সমাজ অসঙ্কোচে অস্পৃশ্যদের তাহাদের সামাজিক গণ্ডীর মধ্যে গ্রহণ করে নাই। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের এখন নিজেদের ভিতরকার এই উচ্চ-নীচ-ভেদ বিচার বিস্মৃত হইতে হইবে। তখনই হিন্দুরা প্রকৃত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিতে সক্ষম হইবেন, কারণ সমাজের মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদ রাখিতে গেলেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বর্ব্বর সাম্প্রদায়িকতায় পর্য্যবসিত হয়। বর্ণাশ্রমে সংযম ও সাম্য থাকিতেই হইবে। অস্পৃশ্যদের কেহও যেন মন্দিরে প্রবেশের অধিকারের জন্য বলপ্রয়োগ না করে। শান্তিপূর্ণ ভাবে কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া মতি গতির পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তাহাদেরও মন্দিরের উন্নতি করিতে হইবে ও বিশুদ্ধ চরিত্র হইতে হইবে। অস্পৃশ্যরা যে দিন হিন্দুধর্ম্মে সমানাধিকার পাইবে সেই দিনই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার ঘটিবে।' অস্পৃশ্যতা যেখানে যেমনভাবে যতটাই থাক্ না কেন হিন্দুমাত্রকেই ইহা দূর করিতে অগ্রণী হইতে হইবে। নতুবা উত্থানের আশা নাই—সঙ্কট ক্রমেই ঘনাইয়া আসিবে।

এ বৎসরে কি হইবে ?

গত বৎসরে দেশে সু-জন্মা ছিল, খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য যথেষ্ট সুলভ ছিল তবু একমাত্র পাটের দাম কম হওয়ায় জমিদার, কৃষক সকলেরই দুরবস্থার শেষ গিয়াছে, অন্নাভাবেও অনেকস্থল হইতে আত্মহত্যার খবর শোনা গিয়াছে। এবার আরো সোনায় সোহাগা মিশিয়াছে। পাটের দাম ত কম আছেই তাহার উপর আবার সমগ্র বাংলা ও আসামে ভীষণ বন্যা হইয়া গেল। এই বন্যায় আউস ও আমন ধান ও পাটের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। কোথাও বা একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দেশময় হাহাকার এখনই পড়িয়া গিয়াছে, ইহার পর তো অবস্থা ক্রমেই আরো শোচনীয় হইতে থাকিবে। প্রকৃতির মারের উপর কাহারো হাত নাই কিন্তু বাংলার আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয় তাহাতে এখন হইতে দেশের শাসক-সম্প্রদায় ও নেতাগণ এ বিপদ হইতে যথাসম্ভব পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিয়া তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতে থাকিলে বিশেষ সুখের কারণ হইবে।

অহিংসা নীতি

ভারত-স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় অহিংসনীতিই গ্রহণ করা হইয়াছে—এবং মূলতঃ সর্ব্বত্রই এই নীতি অনুসৃত হইতেছে। তবু কোন স্থলে হিংস নীতির প্রভাবে হত্যাকাণ্ড ঘটিলে, ভারতীয় সকলেই তাহাতে দুঃখিত হন ও রাজনৈতিক অগ্রগমন প্রচেষ্টায় এরূপ কার্য্যে বাধা পড়িল মনে করেন। কিন্তু এইরূপ হিংস ব্যাপারে জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের সায় আছে, এইরূপ কল্পনায় ধরিয়া কোন কোন ইঙ্গ-কাগজ কংগ্রেসকে তথা মহাত্মাকে দোষী করিয়া আত্মতৃপ্তি পান। তাই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতি আবার ঘোষণা করিয়াছেন—'যাহারা গোপনে বা প্রকাশ্যে ঐ সব হত্যাকাণ্ড অনুমোদন করে কিম্বা উৎসাহ দেয়, তাহারা জাতির উন্নতিতে অন্তরায়ই ঘটাইতেছে। নিখিল-ভারত-সমিতি সকল প্রতিষ্ঠানকে ঐরূপ হিংসামূলক কার্য্যের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে প্রচার কার্য্য চালাইতে আহ্বান করিয়াছেন। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সমূহকেও এ বিষয়ে তাঁহাদের প্রভাব প্রয়োগের অনুরোধ করিতেছেন।' মহাত্মাগান্ধীও আবার বলিয়াছেন—"অহিংসাই আমাদের মূলনীতি, কায়মনোবাক্যে আমাদের ঐরূপ কার্য্য করিতে হইবে।' মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট—বিশেষতঃ যাঁহারা অহিংস অসহযোগ লইয়া আইন অমান্য চালাইয়াছেন, তাঁহাদের হিংসা-পন্থী বা হিংসার সাহায্যকারী বলিয়া দোষী করিবার চেষ্টা একান্তই হাস্যকর। কিন্তু তবু সব বুঝিয়াও যাহারা ইহা করে তাহারা করিবেই।

পণ্ডিত মালব্য

মালব্যজী গোঁড়া হিন্দু, অবশেষে তিনিও কালাপানি পার হইয়া বিলাত চলিলেন। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী বলিয়াছেন—মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য প্রয়োজন হইলে, তিনি তাঁহার প্রিয়তম ধর্ম্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেও সর্ব্বদা প্রস্তুত।

বিদেশী কাপড়

ভারতীয়েরা বিদেশী বর্জ্জন করিতেছে, এই সুযোগে জাপান যথাসম্ভব ভারতের কাপড়ের বাজার অধিকারের চেষ্টা করিতেছে, কাপড় কিনিবার সময় এদিকে সকলেরই দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য যাহাতে জাপানী কাপড় না কিনিতে হয়। জাপানের এই অন্যায় প্রতিযোগীতা বন্ধ করিবার জন্য, মিঃ এইচ্-পি-মোদী প্রয়োজন হইলে বৃটনকে কিছু শুল্ক-সুবিধা দিবার জন্য মহাত্মাকে লিখিয়াছিলেন—মহাত্মা জানাইয়াছেন—যদি প্রতিযোগীতা না থাকে, এবং বিদেশী কাপড় না হইলে আমাদের না চলে এবং স্বাধীন ভারত যদি বৃটনের সমপর্য্যায়ের রাষ্ট্র হয় তবে অন্যান্য সকল দেশের চেয়ে বৃটনকে সুবি[illegible] আমার অভিমত।

নূতন প্রজাসত্ত্বে কার লাভ!

নূতন প্রজাসত্ত্ব আইন অনুযায়ী জমি হস্তান্তরে জমিদারের নজরটা যাহা প্রাপ্য ছিল তাহা এখন গবর্ণমেণ্টের তহবিলে যায়, গবর্ণমেণ্ট তাহা হইতে নিজাংশ রাখিয়া বাকী জমিদারদের দেন। ১৯২৯ সালের এপ্রিল হইতে ৩১ সনের মার্চ্চ পর্য্যন্ত এ বাবদ জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ৪৬০৭৪৭২৲ টাকা পাইয়াছেন। এখনও ৩৭৪০৭৩২৲ টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট জমা

আছে। এই টাকাগুলি জমিদারেরা এখনো পান নাই, কবে পাইবেন তাহারও নিশ্চয়তা নাই। দেশের যে রকম দুর্বৎসর এবং জমিদারের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় তাহাতে এ টাকাগুলি অবিলম্বে তাহাদের দেওয়া কর্ত্তব্য। এই নজ্‌রান্‌ টাকা জমিদারদের একটা বড় আয় ছিল, এখন তাহার একটা অংশ তাঁহারা পান মাত্র। সে অংশ পাইতেও এত হায়রাণ। প্রজাসত্বে জমিদারের হাত ছাড়াইয়া তাঁহাদের প্রাপ্য গবর্ণমেণ্টের হাতে তুলিয়া দিয়া যে প্রজার কি হিত হইয়াছে, তাহা বুঝি না—তবে জমিদারের অ-হিত ইহাতে যথেষ্ট হইয়াছে বটে!

সিগারেট

স্বদেশীতার বোধেই হউক, অ-সহযোগের প্রভাবেই হউক বা যে-কোন কারণেই হউক না কেন, সিগারেট জিনিষটার মুখে মুখে প্রচলন ক্রমেই কম হইয়া আসিতেছিল, মাঝে এমনও হইয়াছিল যে, কাহারও মুখেই ও বস্তুটি দেখা যাইত না। আবার সাময়িক সন্ধি-চুক্তির পর হইতে সিগারেট জিনিষটির চল ক্রমশঃ বাড়িতেছে, মনে হইতেছে—এবার বিলেতী বা আমেরিকান নহে, একেবারে গ্যারাণ্টিড্‌ চাইনিজ। এই চাইনিজ খাইয়া কি যে আত্মতৃপ্তি বাবুরা লাভ করিতেছেন তাহা তাঁহারাই জানেন। কিন্তু এখন একটু ভাবিয়া দেখা উচিত যে, আর কি ইহাতে পয়সা খরচ করা সঙ্গত?—অপ্রাপ্তবয়স্কদের তো এই ধূমপানের অভ্যাস বিষবৎ পরিত্যজ্য।

গোলটেবলের মুসলমান প্রতিনিধি

গোলটেবলে মুসলমান প্রতিনিধি যে ভাবে লওয়া হইয়াছে তাহাতে এক শ্রেণীর মুসলমান যে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইবেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। সাম্প্রদায়িকতা-বাদী মুসলমানেরা হয়তো এ ভাবের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে খুসী হইতে পারেন কিন্তু ভারতে তাঁহারাই একমাত্র মুসলমান সম্প্রদায় নহেন, জাতীয়তাবাদী মুসলমান বলিয়াও ভারতে কিছু মুসলমান আছেন এবং তাঁহারাও ভারতের চক্ষে নিতান্ত নগণ্য নহেন। বিশেষতঃ ডাঃ আনসারীর গোলটেবলে যোগ দেওয়ার কথা শেষ পর্য্যন্তও শোনা যাওয়া সত্বেও শেষ কালে তাহা হয় নাই। অথচ মোঃ সৌকৎ আলি হইতে, দাউদি সাহেব পর্য্যন্ত সকলেই নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন। প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে সাম্প্রদায়িকতার জয়-জয়াকার হইয়াছে—এখন শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায় তাহা ভবিতব্যই জানেন।

হাস্যকর উল্লাস!

ল্যাঙ্কাসায়ারের দুঃখে বিগলিত শোকে কোন কোন মুসলমান বিলাতী কাপড় চালাইতে চাহিতেছেন, কেহ বা আবগারীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া বিলাতী মদ্য পর্য্যন্ত চালাইতে চাহিতেছেন, এ সব সংবাদ কোন কোনও ইঙ্গ কাগজ বড় অক্ষরে ছাপিতেছেন এবং একটা উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস পাইতেছেন—কিন্তু ইহা কাহার গৌরবের ও কাহার অগৌরবের? আর এত উল্লাসই বা কেন? এই করিয়াই তবে ল্যাঙ্কাসায়ার রক্ষা পাইবে ও আবগারী বাঁচিবে না কি?

পরলোকে কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ

সিটি কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন চট্টরাজ গত ১০ই আগষ্ট পরপারের যাত্রী হইয়াছেন। চট্টরাজের 'এলজাব্রার' সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। তাঁহার ছাত্র শিষ্যও কম নহে। চট্টরাজ মহাশয়ের পরিবারবর্গকে আমরা সমবেদনা জানাইতেছি।

'ষ্টেট্‌সম্যানের' নূতন কর্ম্ম

বিখ্যাত 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' আজকাল পুনঃ পুনঃ তাহার সম্পাদকীয় 'টুকরায়' একটি কর্ম্ম করিতেছেন। কোন্‌ দেশীয় পরিচালিত কাগজ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও হত্যাকারীর কতটুকু সংবাদ কেমন ভাবে প্রকাশ করিল তাহারই পরিচয় দিতেছেন। সংবাদ প্রকাশের দোষাদোষ দেখিবার জন্য সরকারী কর্ম্মচারী আছেন তাহা স্বত্বেও ষ্টেট্‌স্‌মানের এই উৎসাহ দেখিবার জিনিষ। অবশ্য কোন সংবাদপত্রের কথা কোন সংবাদপত্র দোষজনক মনে করিলে তাহা অন্য ভাবেও দেখানো যাইতে পারে—কিন্তু ষ্টেট্‌স্‌ম্যান যে ভাবে এই কার্য্য করিতেছেন তাহা কি সংবাদপত্রের রীতি অনুমোদিত?

পরলোকে মিঃ খুদাবক্স

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব্যারিষ্টার মিঃ এস্ খুদাবক্স গত ৭ই অগষ্ট পরলোকের যাত্রী হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইহার বয়স মাত্র ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। পাটনার বিখ্যাত খুদাবক্স লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ খুদাবক্স ইহার জনক ছিলেন। ইনি বিলাতে শিক্ষা লাভ করেন—কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিতেন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলাম ইতিহাস ও আইনের অধ্যাপক ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যও ছিলেন। পণ্ডিত খুদাবক্স সর্ব্বপ্রকারে আধুনিক ছিলেন—কি ধর্ম্ম কি সমাজ সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহার মত বিশেষ উদার ছিল। ইস্‌লাম কৃষ্টি সম্বন্ধে ইনি বহু মূল্যবান রচনা রাখিয়া গিয়াছেন। এমন একজন বিদ্বানের অকাল তিরোধানে দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইল সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহার পত্নী ও কন্যাকে সমবেদনা জানাইতেছি।

গান *

ভূপালি—একতালা

শ্রীসরলা দেবী

তোমরা ভাষার রাজা,
ভাবের যে গো মালিক !
এনেছ কি পত্রপুটে
সাতরাজার ধন মাণিক !

তোমরা দেশের মাথা,
জাতির তোমরা মান,
মাথা যদি উচ্চে রাখ
বাঁচিয়ে আত্ম-অপমান !

ওহে ভাবের মালিক
দাও হে দাও
সাতরাজার ধন মাণিক !

তোমরা মুখোজ্জ্বল,
দেশের মানুষ সেরা
মানুষতা-পাঠটি যদি
পড়াও পত্রনবীশেরা !

ওহে ভাবের মালিক
দাও হে দাও
সাতরাজার ধন মাণিক !

আজকে উৎসবেতে
আসিয়ে তীর্থকাক,
শুধাইছে—পাই গো কোথা
সেই সে নিত্য খোরাক !

ওহে ভাবের মালিক
দাও হে দাও
সাতরাজার ধন মাণিক !

* ইণ্ডিয়ান জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশনের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে রচিত ও গীত। ২রা আগষ্ট, ১৯৩১



পুষ্পপাত্র প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মিত্র

জন্ম—১২৯৩,
২০শে জ্যৈষ্ঠ

মৃত্যু—১৪ই আশ্বিন,
১৩৩৭ সন

Lakshmibilas Press, Ltd.,



৫ম বর্ষ | আশ্বিন—১৩৩৮ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

স্মরণে

গত বৎসর এমনি দিনে, শারদীয়া মহানবমীর দিন পুষ্পপাত্রের প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্রকে আমরা হারাইয়াছি। তারপর দেখিতে দেখিতে এক বৎসর চলিয়া গেল, পুষ্পপাত্রের কাজ করিতে প্রতি নিয়ত তাঁহাকে মনে পড়িয়াছে—মানুষ যায় তবু তাহার স্মৃতি এভাবে মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

সতীশচন্দ্রের সহিত আমাদের বা পুষ্পপাত্রেরই যে শুধু ঘনিষ্ঠ যোগা-যোগ বা প্রাণ-সম্পর্ক ছিল তাহা নহে, বাংলা ভাষার সহিত তথা বাংলা সাময়িক পত্রের সহিত সতীশচন্দ্রের একটা অচ্ছেদ্য প্রীতির সম্পর্ক রহিয়াছে। বাংলায় যখন যেরূপ সাময়িক সাহিত্যের অভাব তিনি অনুভব করিয়াছেন তখন তাহা পূরণের জন্য নিজ সামর্থ্য নিয়োগ করিয়াছেন—এইভাবেই প্রবাহিণী, বাসন্তী প্রভৃতি সচিত্র সাপ্তাহিক হইয়াছিল। এই ভাবেই প্রিয়তমা কন্যা, পুষ্পের স্মৃতিকে মূর্ত্ত করিতে গিয়া এই 'পুষ্পপাত্রের' আবির্ভাব—এই ভাবেই ছ'আনা সংস্করণে সুলভ-সাহিত্য প্রচার প্রচেষ্টা হইয়াছিল।

সতীশচন্দ্রের এই সব চেষ্টার মধ্যে বাংলা সাহিত্যের গতির কতটা যোগা-যোগ ছিল তাহা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ যাহারা দেখিতেছেন তাহারাই বুঝিবেন। জীবনে সাহিত্যে ও কলা-শিল্পের জন্য সতীশচন্দ্র অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন তাঁহার শেষ ব্যয়ের নিদর্শন এই পুষ্পপাত্র খানি যাহাতে কাল-চক্রে অকালস্থায়ী না হয় এজন্য বিশেষ করিয়া পরিবারবর্গকে বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শেষ সাধ পূর্ণ করিতে তাঁহার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী ও যোগ্য পুত্রদ্বয় সুবোধকুমার ও সুধাংশু কুমার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন।

পুষ্পপাত্রকে দীর্ঘস্থায়ী ও আরো নানা রূপে-গন্ধে সাজাইতে পারা যাইবে কিনা তাহা পরম মঙ্গলময় ভগবান জানেন। আজ সতীশচন্দ্রের স্মৃতি-স্মরণে আমরা তাঁহার আশীর্ব্বাদও যেমন চাহিতেছি—আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের সহানুভূতিও তেমনি চাহিতেছি। সকলের শুভেচ্ছার ভিতর দিয়াই সতীশচন্দ্রের কর্ম্মজীবনের শেষ স্মৃতি এই পুষ্পপাত্রকে জীবন্ত রাখা সম্ভব। আজ বর্ষপন্থে অশ্রুভারাক্রান্ত মনে সতীশচন্দ্রকেই বার বার স্মরণ করিতেছি—ও পুষ্পপাত্র পরিচালনায় তাঁহারই প্রাণভরা প্রেরণা অমৃত-লোক হইতে চাহিতেছি।

সহধর্ম্মিণী

শ্রীকালিদাস রায়

—প্রবন্ধ—

স্বামী যে ধর্ম্মাবলম্বী—(হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি) স্ত্রীও যদি সেই ধর্ম্মাবলম্বী হয়, শুধু তাহা হইলেই সে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলা যাইতে পারে না—এবিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহমাত্র নাই। বিবাহের পর কুশণ্ডিকার সময় অগ্নিসমক্ষে বলিতে হয়—

মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনুচিত্তন্তে হস্তু
মম বাচমেকমনাজুষস্ব প্রজাপতিস্ত্বানি যুনক্তু মহ্যং॥

এই বৈদিক শ্লোকটির প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিলে সহধর্ম্মিণী শব্দের প্রকৃত অর্থ বোঝা যায়। পত্নী স্বামীর সংসার-সঙ্গিনী ও অঙ্কলক্ষ্মীমাত্র হইলেই সহধর্ম্মিণী আখ্যা লাভ করিতে পারে না। স্বামীর যাহা ব্রত, mission, vocation, জীবনযজ্ঞের যেটি মন্ত্র, বাণী, জীবন-যাত্রার যাহা লক্ষ্য, সহধর্ম্মিণীরও তাহাই হওয়া উচিত। স্বামীর জীবনের গতি যেদিকে, পত্নীর জীবনগতিও যদি সমান্তরালভাবে তাহার সাথী হয়, তবেই সে পত্নী সহধর্ম্মিণী হইতে পারিবে।

আমরা বস্তুজগৎটাকে এত বড় করিয়া দেখি যে, সমস্ত জগৎটাকেই বস্তুজগৎ ঠিক করিয়া লই এবং সংসার বলিলে ঐ বস্তুজগতের সংসারটাকেই বুঝি এবং এই জগতের সম্পর্কের সহায়তাটাকেই একমাত্র সহায়তা মনে করিয়া সহধর্ম্মিণী অর্থে শুধু গৃহিণীই বুঝিয়া থাকি। সহধর্ম্মিণী যে শুধু গৃহিণী নয়, সচিব, সখী ও প্রিয় শিষ্যা, তাহা ভুলিয়া যাই। চিত্তরাজ্যের সহায়তাই যে সহধর্ম্মিণীর প্রকৃত লক্ষণ, তাহা মনে আনিতেই আমাদের অবসর হয় না। এই চিত্তরাজ্যের মিলন ব্যতীত 'সহধর্ম্ম' সঞ্জাত হইতে পারে না। পত্নীর চিত্ত পতির চিত্তের অনুবর্ত্তী বা সহযোগী হওয়া চাই।

এইখানে একটি প্রশ্নের আবির্ভাব হয়। তবে কি এক্ষেত্রে নারী জাতির ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য নাই? নারী Rational Being হওয়া সত্ত্বেও কি স্বাতন্ত্র্যহীন? মনের দিক হইতে দেখিতে গেলে নারীর স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতেই হইবে, কিন্তু দেহের বৈষম্যের জন্য নারীর ব্যক্তিত্ব পুরুষ-নির্ভর বলিয়াই মনে হয়। সাংখ্যের প্রকৃতির যে হিসাবে স্বাতন্ত্র্য বা অস্বাতন্ত্র্য, নারীর স্বাতন্ত্র্যের বা অস্বাতন্ত্র্যের কথা সেই ভাবেই ধরিতে হইবে। সে হিসাবে সংসারপথে পত্নী পতির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য। নারী লতার মত অবলম্বন পাইলেই নিশ্চিন্ত হয়।

কিন্তু তাই বলিয়া পুরুষও কি নারীর উপর নির্ভর করিতে বাধ্য নহে? পুরুষ ও নারীর সম্বন্ধ অন্ধ-পঙ্গুন্যায়-গত। অনন্তের পথে ছুটিতে হইলে দুইটি সমান্তরাল সরলরেখা যেমন পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভর করে—নরনারীর সম্বন্ধও সেইরূপ। নারী নরের ঠিক পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলে, একথা না বলিয়া নারী নরের হাতধরাধরি করিয়া চলে বলিলে আরো সঙ্গত হয়। ভাসা-ভাসা দেখিলে মনে হইবে, নর নারীকেই গড়িয়া তুলে—নরের গঠনে যেন নারী কোনো সাহায্যই করে না। কার্য্য-কারণের সম্বন্ধবিচারে মনে হয়, কার্য্য কারণের উপর নির্ভর করে—কারণ কার্য্যের উপর যেন কিছুই নির্ভর করে না! কিন্তু ইহা ভুল—কার্য্য ও কারণ দুইই পরস্পর-মুখাপেক্ষী। কার্য্যকারণ সম্বন্ধে যেমন একের দ্বারা অন্য নিয়ন্ত্রিত, সেইরূপ নারীকেই নরের অনুসরণে আত্ম নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিতে হয় আর নর ধ্রুব হইয়া রহে, তাহা সত্য নহে—নরও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নারীর প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া চলে। দুইটি সমান্তরাল বিদ্যুৎস্রোত যেমন দুইয়েরই সমবেত প্রয়াসে দুইয়ের মধ্যেই পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া সমষ্টিগত শক্তি বাড়াইয়া চলে, তেমনি নারী-নরের চিত্ত-মিলনে পরস্পরের সাহায্যে শক্তি বাড়িয়াই যায়।

এই ত গেল নরনারীর সম্বন্ধের কথা। পতির সহিত পত্নীর চিত্তের মিলন ঘটাইতে হইলে উভয়েরই প্রয়াস ও অনুশীলন প্রয়োজন। উভয়েরই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও

প্রয়াস ব্যতীত মিলন ঘটিতে পারে না। এক চিত্ত অন্য চিত্তের অনুবর্ত্তী হইতে হইলে তাহাদের মধ্যে সাধর্ম্ম্য ও সাম্য থাকার প্রয়োজন। দুইটি চিত্ত, স্বাধীনভাবে অনুশীলনের দ্বারা, এরূপ ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে যে, তাহাদের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য স্বতই জন্মিয়াছে, পরে তাহাদের মিলন ঘটিলে সুখের মিলন হয় এরূপ আশা করা যায়। ইহা free love এর rational কারণ। কিন্তু ঠিক এইপ্রকার সংগঠন ও সংঘটনা জুটিয়া উঠা কত কঠিন! আর একপ্রকার হইতে পারে, পতি বালিকা-পত্নীকে মনের মতন করিয়া গড়িয়া তুলিয়া তাহার সহিত সহধর্ম্মা হইতে পারে। নারীহৃদয়ের যে সকল বৃত্তি পরিণত অন্তঃকরণে দেখা যায়—তাহার সকলগুলির অঙ্কুরই অপরিপুষ্টভাবে বা অঙ্কুরিত অবস্থায় বালিকাহৃদয়ে থাকে। নারীহৃদয়ের মূল উপাদান সকল নারীতেই সমানভাবে বর্ত্তমান। শিক্ষিত স্বামীও বালিকা-হৃদয়কে সেই মুকুলিত অবস্থায় শিক্ষার দ্বারা আপনার চিন্তানুবর্ত্তী করিয়া লইতে পারে। মনে রাখিতে হইবে, আমি শিক্ষিত সমাজের সহধর্ম্মিনীত্বের কথাই এখানে বলিতেছি।

It's education that forms the common mind.
Just as a twig is bent, the tree is inclined.

(Pope)

উভয় ক্ষেত্রেই স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন। হয় অবিবাহিত জীবনে কতকটা শিখিয়া ভাগ্যক্রমে নিজের মনোমত স্বামী লাভ করিয়া শিক্ষা সম্পূর্ণ করা—অথবা বিবাহিত জীবনে স্বামীকেই গুরু বলিয়া শিক্ষারম্ভ করিয়া—স্বামীর মনোমত হইয়া নিজেকে গড়িয়া তুলা। অবিবাহিত জীবনে পিতা ভ্রাতা বা শিক্ষকের নিকট গৃহে বা বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিয়া বা নিজে নিজে গ্রন্থ পাঠ করিয়া ও সৎপরিবারের ও সৎসমাজের মঙ্গলকর প্রভাবে নারী জগৎ-সংসার সম্বন্ধে একটা ধারণা লাভ করিতে পারে। বিবাহিত জীবনে স্বামীর কাছেই প্রধান শিক্ষা--স্বামিগৃহের প্রভাবেও কতকটা সুশিক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা।

চিত্ত জিনিসটা বুদ্ধি,অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তির উপাদানে গঠিত। কেহ কেহ বলেন নারীজাতির অনুভূতি খুব প্রবল। অনুভূতির দিকটাই সহজে উহাদের উৎকর্ষ লাভ করে এবং অনুভূতির উৎকর্ষেই নারীর নারীত্ব। কিন্তু এই আবেগাত্মক দিক্‌টাও ত আপনা হইতে অধিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না, বুদ্ধির সাহায্যে ইহারও অনুশীলনের প্রয়োজন। অর্থাৎ নারীর মধ্যে নারীত্বকে জাগাইতে হইলেও স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন।

অনেকে বলেন নারীজাতিকে যদি চিন্তা ও চেষ্টার রাজ্যে অধিক অগ্রসর হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহারা হৃদয়ের দিকে আর ততটা রমণীয়া থাকিবেন না। এই কথাটিতে অনেকটা ভাবিবার বিষয় আছে। সকল দেশে, সকল জাতিতে ও সকল যুগেই রমণী, হৃদয়ের উৎকর্ষের জন্যই অর্চ্চনীয়া। তাই "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।" মমতা,স্নেহ, প্রেম, করুণা, কারুণ্য, অন্তরের গভীর অনুভূতি, সেবা, আত্মদান, ত্যাগ,—ক্ষমা ইত্যাদি হৃদয়ের মধুর ও সরস উপাদানেই সর্ব্বদেশে সর্ব্বযুগে নারীর নারীত্ব। নারী যশোদা, নারী মেনকা, নারী অন্নপূর্ণা, নারী ম্যাডোনা, a ministering angel.

নারীর এই নারীত্ব, রমণীর এই রমণীত্ব ও রমণীয়ত্ব—জননী ভগিনী পত্নী কন্যার মহীয়ান আদর্শ রমণীকে পুরুষ অপেক্ষা, কোনো কোনো অংশে উন্নত করিয়াছে। কিন্তু এই আদর্শকে নারীর মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে হইলে চিন্তা ও চেষ্টার সাহায্য লইতে হয়—চিন্তার বৃন্ত না হইলে কোনো অনুভূতি বা রস ফুটিয়া উঠে না। অনেকে মনে করিতে পারেন এই প্রকার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে কোনোরূপ অনুশীলনের চিন্তার বা শিক্ষার প্রয়োজন নাই—কিন্তু তাহা মনোবিজ্ঞানের হিসাবে ভ্রান্ত। অপরিমার্জ্জিতবুদ্ধিসম্পন্না নারীর মধ্যেও ঐ সকল গুণ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহা সমাজের চিন্তাপুঞ্জেরই অপ্রত্যক্ষ প্রভাবে ও কতকটা অন্ধ অনুকরণেই জাগিয়া উঠে। মগ্নচৈতন্যের তলে তলে অনেক কাজ চলে সত্য, কিন্তু সচেতন ও বোধানুমোদিত প্রক্রিয়ায় ঐ সকলকে দৃঢ়ভিত্তি ও শক্তি দান করিলে তবে নারীর প্রকৃত নারীত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, সেজন্য নারীরও নরের মতই বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশীলতার উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজন।

মনের ত্রিবিধ দিকের উপাদানগুলি এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে সুসম্বদ্ধ যে, যে কোনোটিরই উৎকর্ষ সাধন করিতে যাওয়া

যাক্ অপর দুইটির সাহায্য ব্যতীত তাহা নিষ্পন্ন হয়না এবং অপর দুটিরও ঐ সঙ্গে যুগপৎ কিয়দংশ উন্নতি হইবেই। অবশ্য ইহাও মনোবিজ্ঞানসম্মত যে, কোনো একটি দিকের অতিরিক্ত অনুশীলন মনের অপর দিককে অভিভূত করিয়া তোলে। তাহাতে চিন্তারাজ্যের গভীর সাধনা নারীর হৃদয়ের দিককে আচ্ছন্ন করিয়া নারীর নারীত্ব ও সুকুমার মাধুর্য্যের আদর্শ নষ্ট করিয়া দিতে পারে।

এইখানে দুইটি প্রশ্ন উদিত হয়—প্রথম, তবে কি নর-নারীর আদর্শ ভিন্ন ? তাহা হইলে উভয়ের সহধর্ম্ম কিরূপে সম্ভবে ? দ্বিতীয় নারীর, বুদ্ধি ও চিন্তানুশীলনের সীমাই বা কতটা ?

নর-নারীর আদর্শের যে বৈষম্য আপাতদৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হইতেছে—প্রকৃতপক্ষে মূলে বা আদর্শে সে বৈষম্য নাই। আদর্শপথের সোপানে সোপানে যে বৈষম্য লক্ষিত হয়, তাহার অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা আছে। নতুবা উভয়ের সম্পূর্ণ মিলন ঘটিতে পারে না।

নারীচিত্তের সহিত নরচিত্তের ঠিক সমানের সহিত সমানের মিল নহে,—অংশের সহিত পরিপূরকের মিল—অন্ধপঙ্গুন্যায়ানুগত। একটি চিত্তের একদিক যেমন সেই চিত্তেরই অন্যদিকের সহিত সুসম্বদ্ধ—নারীচিত্তের সহিত নরচিত্তেরও সেই প্রকারই সম্বন্ধ। পতিপত্নীর দুইটি মনে একটি অখণ্ড মন রচিত হওয়া চাই। একটি জীবদঙ্গের মধ্যে এক অংশের সহিত অন্য অংশের বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও অনবরত adjustment ও readjustment এর দ্বারা ও distribution ও redistribution এর ধর্ম্ম সাহায্যে সমগ্রের অখণ্ডতা রক্ষা করিয়া উহা একলক্ষ্যের জন্য সহধর্ম্ম হইতে পারে। সেইরূপ পতি ও পত্নীর চিত্তের ক্রমবিকাশের পদ্ধতির বৈষম্য থাকিলেও সম্পূর্ণ মিলনে একই লক্ষ্য লাভ করিতে পারে।

প্রত্যেক চিন্তার জন্য তদনুসারক বিশিষ্ট অনুভূতি ও রস আছে, প্রত্যেক অনুভূতির অনুসারক কর্ম্ম আছে। হৃদয়ের প্রত্যেক অনুভূতি যেমন মস্তিষ্কের তদনুযায়ী চিন্তার সহিত সমঞ্জস, অনুভূতিপ্রধান নারী-হৃদয়ও তেমনি চিন্তা-প্রধান পতি-হৃদয়ের মধুর মিলনে অনুবর্ত্তী। রসের পথ সুন্দরের তীর্থে লইয়া যায়,—চিন্তার পথ সত্যের মন্দিরে লইয়া যায়,—কর্ম্মের পথ মঙ্গলের তীর্থে লইয়া যায়, একথা আমরা পুঁথির ভাষায় বলি। প্রকৃতপক্ষে সত্য, সুন্দর, শিব, একই পরম সত্তার তিন দিক, তিনই এক—প্রকৃতিজগতে তিনটি সূত্রই পরস্পর অনুস্যূত। নারীর বিশেষত্বকে অটুট রাখিতে হইলে পতির সহিত পত্নীর মিলনকে ভাবের সহিত রসের মিলন মনে করিতে হইবে। যাহা পতিহৃদয়ে ভাবরূপে জাগিবে, তাহাই পত্নীহৃদয়ে রসরূপে ফুটিবে। অথচ ঐ ভাবের মধ্যেও যে রস নাই বা ঐ রসের মধ্যেও যে ভাব নাই, তাহা নহে। যে জিনিসটির যাহাতে প্রাধান্য তদনুযায়ী তাহার নামকরণ হয় মাত্র।

নরহৃদয়ের সাধারণতঃ যে প্রকারের উপাদান, তাহাতে সহজে জ্ঞানরাজ্য গড়িয়া উঠে। নারীহৃদয়ের মধুরতায় রসরাজ্য গড়িয়া উঠে। যাহার পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, তাহাকে সেই পথেই আত্মোৎকর্ষ সাধন করিতে দেওয়া উচিত। অতিরিক্ত জ্ঞানানুশীলন ও একেবারে জ্ঞানানুশীলন না করা দুইই হৃদয়ের রসসৃষ্টিরও পরিপন্থী। সেজন্য নারীশিক্ষায় লক্ষ্য করিতে হইবে, যাহাতে চিন্তা রসকে অভিভূত না করে, অথচ রস যেন চিন্তার বৃন্তেই প্রস্ফুটিত অনুভূতি-পুষ্পের মধুর মতই জাগে। নারীর মধ্যে যাহাতে পৌরুষ জাগিয়া না উঠে, সেজন্য তাহাকে চিন্তা ও চেষ্টার রাজ্যে সংযম অভ্যাস করিতে হইবে।

জগতে অনেক বীরাঙ্গনা জন্মিয়াছেন, যাঁহারা সত্যই যুদ্ধও করিয়াছেন এবং খনা লীলাবতী গার্গী মৈত্রেয়ীর ন্যায় নারী চিন্তারাজ্যে অনেক পুরুষকেও পরাজয় করিয়াছেন। তাহা হইলেও ইহা নারীর নিজস্ব অধিকারের রাজ্য নহে, এবং ইহাতে প্রমাণ হয় না যে নারী জাতি পুরুষের মত ঐ দুইবিভাগেও সহজে পারদর্শিনী হইতে পারে।

যে বিভাগে নারীর নিজস্ব মহিমা বা গরিমার চরমোৎকর্ষ হইতে পারে, সেই বিভাগে নারীজাতি যাহাতে দুর্ব্বল হইয়া না পড়ে সে বিষয়ে সমাজের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

জ্ঞানের কোন্ কোন্ শাখা নারীর অধিকারে পড়ে এবং কোন্ কোন্ শাখায় নারীকে শিক্ষা দান করিলে সে নারী-বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া পুরুষের সহধর্ম্মিণী হইতে পারে ইহা লইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ খুবই চিন্তা

করিতেছেন। মস্তিষ্কচালনা করিতে গেলে তাহাদের দৈহিক শক্তিসামর্থ্য কমিয়া যায়। নারীজাতির দেহের গঠন যেরূপ, তাহাতে অত গুরুভার তাহারা সহ্য করিতে পারে না। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলেন তাহাতে fecundity (জননশক্তি) কমিয়া যায়—এমন কি বন্ধ্যাত্ব আসে—নয় মৃত বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয় সন্তানের জন্ম হয়। নারীর মধ্যে পৌরুষভাব ক্রমে জাগরিত হইলে নারী তখন আর ঠিক গৃহলক্ষ্মীটি থাকেন না—গৃহ তখন Mess হইয়া দাঁড়ায়। নারীর মধ্যে যে আত্মদানের গৌরব নারীকে মহীয়সী করিয়াছে তাহা ক্রমে লুপ্ত হইয়া যায় এবং নারী ক্রমশঃ আত্ম-প্রতিষ্ঠার দিকে ধাবিত হয়, তাহাতে নরনারীর চিত্তে চিত্তে মিলনের অসুবিধাই হয়।

মনের ত্রিবিধ দিকের সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ সংসারে বিরল। কোনো একটির উৎকর্ষ সাধনে অপর দুইটিরও কতকটা উৎকর্ষ সাধিত হয় বটে, কিন্তু চিত্তরাজ্যে কোনো একটি দিকের অতিরিক্ত প্রাধান্য ঘটিলে অপরগুলি কতকটা ম্লান হইয়া যায়। নারীর যাহা সাধনা, তাহা রসের দিকের—হৃদয়ের দিকের। নারীর নারীত্বকে উজ্জ্বল করিতে হইলে চিন্তার দিককে অনুভূতির দিকের বশীভূত করিয়া রাখিতে হইবে। রসের দিক যাহাতে প্রাধান্য লাভ করে, সেজন্য হৃদয়ের উৎকর্ষসাধক বিষয়গুলি নারীদের শিখান উচিত। বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত ও শাণিত করিবার জন্য কতকটা সাধারণ শিক্ষা দেওয়ার পর ইহাদের প্রকৃত পথ দেখাইয়া দেওয়া উচিত। দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয় নারীজাতির শিক্ষাপথের মধ্যে ততটা পড়ে না।

হৃদয়ের উৎকর্ষসাধনে সর্ব্বাপেক্ষা সহায় ললিতকলা। ললিতকলাই রসের সৌষ্ঠবময় রূপ। কাব্য, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত ইত্যাদির দ্বারা হৃদয়বৃত্তির মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য বাড়ে। উপন্যাস নাটক ইত্যাদি রসসাহিত্যের দ্বারা এই শ্রেণীর উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। নারীচরিত্র-গঠনে পুরাণ খুব সাহায্য করে—কিন্তু তাহাও অধিক দিন নহে। ক্রমে চিত্তোন্নতির সহিত নারী পুরাণেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিবে না। কল্পিত আদর্শসৃষ্টিসম্মত লোকশিক্ষার রাজ্য ত্যাগ করিয়া যখন তাহারা রক্ত মাংসের জীবন্ত জলন্ত ঐতিহাসিক সত্য চাহিবে—তখন ইতিহাস ও ভূগোলের দ্বারা কতকটা জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারিত হইলে তাহারা উপন্যাস পড়িতে পারে। প্রথম অবস্থায় উপন্যাসে তত কাজ করিতে পারে না। কতকটা অগ্রসর হইলে উপন্যাস পাঠের সুফল লাভ করিতে পারিবে—উপন্যাস পড়ার পর উহারা পুরাণকে নূতন আলোকে বুঝিতে পারিবে।

হৃদয়বতীর সাধনার সহিত গৃহলক্ষ্মীর সাধনার নিকট সম্পর্ক। গৃহলক্ষ্মীর সাধনার জন্য নারীকে ব্যাবহারিক জ্ঞানও কতক কতক অর্জ্জন করিতে হইবে। বস্ত্রবিচার, শিশুপালন, গোপালন, পাকপ্রণালী, প্রাথমিক আয়ুর্ব্বিদ্যা- স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও গৃহধর্ম্মের প্রয়োজনীয় অন্যান্য জ্ঞান ও নারী জাতিকে অর্জ্জন করিতে হইবে। এ সকল বিষয় নারীত্বের আদর্শপ্রতিষ্ঠার সহায়ক।

শিক্ষা অর্থে শুধু জ্ঞানানুশীলন নহে, চিত্ত-সৌকুমার্য্যের উৎকর্ষসাধনও যে প্রকৃতশিক্ষার অঙ্গীভূত তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নারীহৃদয়ের রসানুভূতিগুলি যদি অন্ধভাবে পতির ভাবপুঞ্জের অনুসরণ না করে, তাহা হইলেই নারী সহধর্ম্মিণী হইতে পারে। স্ত্রীশিক্ষার অর্থ,—যাহাতে নারীহৃদয়ের রম্য বৃত্তিগুলি বোধানুগত ও সচেতনভাবে স্বামীর চিত্তবৃত্তির অনুসরণ করে, তাহারি শিক্ষা। তাহা না করিলে পুরুষের সখীত্ব করা হইবে না, দাসীত্ব করাই হইবে। "স্বামী" বলিয়া প্রথাগতরূপে ভালবাসিলে অথবা সমাজভয়ে বা পোষণপালনরক্ষার কৃতজ্ঞতার জন্য অথবা ভোগলালসাপরিতৃপ্তির জন্য ভাল বাসিলে ঠিক সহধর্ম্মিণীর ভালবাসা হইল না। স্বামী জিনিষটাকে বুঝিতে হইবে—স্বামীর সাধনার মূল্যমর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, স্বামীর প্রিয়ব্রতকে নিজের প্রিয়ব্রত মনে করিয়া লইতে হইবে—কেবল স্বামীর দেহকে, বাহুবলকে, স্বামী নামটিকে ভালবাসিলে চলিবে না—স্বামীর চিত্তটিকে ভালবাসিতে হইবে। এই প্রকারের ভালবাসাই স্থায়ী ও অটল এবং নারীত্বের পক্ষে প্রকৃত ধর্ম্মানুকূল এবং ইহাই সহধর্ম্মিণীত্ব। এই জন্য ভালবাসার মধ্যেও শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

দেশপরিমাপ হিসাবে আমাদের গৃহখানি নিতান্ত

ক্ষুদ্র সন্দেহ নাই। সে হিসাবে নারীর রাজ্যটি ক্ষুদ্রই মনে হইবে। পুরুষ কর্ম্মানুরোধে বৃহত্তর জগতে পরিভ্রমণ করে। বিনা কর্ম্মেও যতটা দেশের (Space) মধ্যে তাহার ভ্রমণ করিবার স্বাধীনতা আছে তাহা নারীর গণ্ডী অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত সন্দেহ নাই। এবং এই হিসাবে নারীর জ্ঞানচর্চ্চা ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে সন্নিবদ্ধ এবং পুরুষের জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্র অনেক বড় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? নারীর ক্ষেত্র কয়েকখানি গৃহ ও একটি আঙিনা—খুব জোর একটি পাড়া এবং পুরুষের একটি নগর বা ততোধিক বৃহৎ বলিয়াই কি নারীর জগৎটি অতি ক্ষুদ্র? জগতের পরিমাপ শুধু দেশগত নহে—বস্তুগতও নহে। উহার পরিমাপ মনোবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে। গার্হস্থ্য জীবনটিকে যত ক্ষুদ্র মনে করা হয়—তাহা তত ক্ষুদ্র নহে জীবনের মাপ দৈর্ঘ্যে নহে—গভীরতায় ও নিবিড়তায়। তাই আপেক্ষিক গুরুত্ব হিসাবে পরিবারিক জীবন সামাজিক বা জাতীয় জীবন হইতে গভীরতর ও নিবিড়তর। পারিবারিক জীবন সামাজিক ও জাতীয় জীবনের প্রাণ-স্বরূপ। এ হিসাবে নারীর ক্ষেত্র পুরুষের ক্ষেত্র অপেক্ষা কোনো অংশে ক্ষুদ্র নহে, বরং অধিকতর গুরুত্বময় ও দায়িত্বপূর্ণ। নরনারীর মনোযোগের পরিসর অসীম নহে,—কর্ম্মশক্তি অনন্ত নহে,—ধারণাশক্তি অফুরন্ত নহে। ক্ষেত্র যত বৃহত্তর হইবে—সাধনা তত লঘু ও অগভীর (Superficial) হইবে। নারীর সাধনার ক্ষেত্র-বৃত্ত দেশ-পরিমাণে ক্ষুদ্রতর হওয়ায় সাধনা গভীরতর, নিবিড়তর ও অধিকতর গুরুত্বময়।

ইতিহাস ও ভূগোল বিরাট বিশাল দেশকালের মধ্যে আপনার অনুশীলন-ক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়াছে—মনোবিজ্ঞান একটি মন লইয়াই গড়িয়া উঠিতে পারে। তাই বলিয়া মনো-বিজ্ঞান ইতিহাস বিজ্ঞান হইতে কম গুরুতর বিষয় নহে। মানুষের সহিত মানুষের বিবিধ সম্বন্ধের মধ্যে স্নেহ, প্রেম, দয়া, মমতা আত্মত্যাগ, সেবা ইত্যাদির মধ্যে—লালন পালন পোষণ তোষণ সান্ত্বনা সহানুভূতির মধ্যে—নৈতিক-জীবনের গঠন,—ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ, কর্ম্মজীবনের প্রেরণার উন্মেষ ; সামাজিক জীবনের ভিত্তি-স্থাপন, সাহিত্য-জীবনের নিত্য নূতন উপাদানের আয়োজন। এখানেও জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্র অতি বৃহৎ, অতি গভীর।

পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনের অধিষ্ঠাত্রীগণের জ্ঞানরাজ্য Elizabeth Victoriaর রাজ্যের মতই বৃহৎ বা বৃহত্তর। যে নারী পুরুষের সহধর্ম্মিণী হইতে চায়, সে নারীর পক্ষে এই বৃহৎ জীবনের বাহিরে যাইবার ও বাহিরে সাধনাক্ষেত্র সন্ধানের কোনো প্রয়োজন নাই। নিজের রাজ্যকে অনাবিষ্কৃত (unexplored) রাখিয়া অপর রাজ্যের তথ্যানুসন্ধান নারীর পক্ষে অহিতকরই বলিতে হইবে।

গৃহ ভগবানের শিব ও সুন্দর মূর্ত্তির দেউল—ভগবান কি তাঁহার জ্ঞান-মূর্ত্তিকে বাহিরে রাখিয়া এই দেউলে অধিষ্ঠিত হন? যাঁহারা শিবসুন্দরের প্রভাব ও অধিকারকে ছোট করিয়া দেখেন—যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞান কাহাকে বলে জানেন না। যাঁহারা ভগবানের অটল মৌলিক বিধানকে টলাইতে চাহেন—তাঁহারাই জ্ঞানানুশীলনের জন্য নারীকে দেশদেশান্তরে পাঠাইতে চাহেন।

এক একটি গৃহ এক একটি জাতীয় জীবনের atom নহে—জাতীয় জীবনও জড় নহে, বরং ইহা এক একটি Monad—Res complita বা whole in itself এবং ইহার মধ্যেই জাতীয় জীবনই পূর্ণ প্রতিফলিত—জাতীয় জীবন বা মহামানবের জীবন এই জ্ঞানময় মনোময় জীবনেই নিহিত রহিয়াছে। অথবা জাতীয় জীবনকে একটি বিরাট organism ধরিয়া পারিবারিক জীবনগুলিকে তাহার অংশ এবং তাহার অঙ্গীভূত স্বতন্ত্র organism মনে করা যাইতে পারে। বিশ্বজীবনেও যে চিরন্তন নিয়ম, যে প্রাণশক্তির বিস্তার ও লীলা—পারিবারিক জীবনেও তাই। কেবলমাত্র পারিবারিক জীবনকেই জ্ঞানক্ষেত্র ধরিয়া লইলে বিশ্বজীবনকেই জ্ঞানক্ষেত্র করা হইল।

কর্ম্মানুশীলন সম্বন্ধেও একই কথা। যখন 'ঘর'কে 'বাহির' এবং 'বাহির'কেই যখন ঘর করা যায় তখন ঘর ও বাহির দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ নহে। 'ঘর' ও 'বাহির' একই জগতের দুই দিক। কর্ম্মসৌকর্য্যার্থে এবং নরনারী মান-সিক উপাদানের বৈচিত্র্য বশতঃ 'ঘর বাহির' দুই শ্রেণীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে—'বাহির' পুরুষহস্তে, 'ঘর', নারীহস্তে। মানবসংসার এই ব্যবস্থাতেই আজিও টিকিয়া আছে। পুরুষ

সন্তান পালন করিতে পারে না—নারী সৈনিক হইতে পারে না। উভয়ের সাধনার সমবায়ে জাতীয় জীবনের রক্ষণপালন। এ নিয়ম না মানিলে মানবসংসার ছারেখারে যায়। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' নামক পুস্তকে ইহার স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া আছে। নরনারীর এই বৈষম্য মৌলিক ও বিধিনিয়ন্ত্রিত। ইহার বিরুদ্ধে যাহারা অস্ত্রধারণ করে তাহারাই সন্দীপ

গৃহ জাতীয় জীবনের বাল্যের স্তন্যাধার, যৌবনের শক্তি ও উৎসাহের উৎস—প্রৌঢ়ত্বের আশ্বাসময় আশ্রয় এবং আত্মত্যাগের সাধনক্ষেত্র ও বার্দ্ধক্যের তপোবন। গৃহ সংসারসংগ্রামের শিবির। সকল সংগ্রামেরই বিরাম-নিলয়। এই সঙ্গে মনে রাখা উচিত।

"বিরাম কাজেরই অঙ্গ এক সাথে গাঁথা,
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।"

নারী সংসারের অরুন্ধতী, সংসারসংগ্রামের সুভদ্রা, সাহিত্যজগতের বিরাট্রিচে—ত্যাগে উর্ম্মিলা-জানকী—ধৈর্য্যে সর্ব্বংসহা ধরিত্রী—পুণ্য-সাধনায় সহযোগিনী সুদক্ষিণা। সে একাধারে—

"গৃহিণী সচিব মিথঃ সখী প্রিয় শিষ্যা ললিতে
কলাবিধৌ।"

এ সংসারের কোনো যজ্ঞই স্বর্ণ-সীতায় পরিপূর্ণ সিদ্ধি-চ করে না। মহাত্মা Irving বলেন—

Man is the creature of interest and ambition. His nature leads him into the struggle and bustle of the world. Love is but the embellishment of his early life or a song piped in the intervals of his acts. He seeks for fame, for fortune, for space in the world's thought and dominion over his fellowmen. But a woman's whole life is a history of the affections. The heart is her world. It is there her ambition strives for empire. It is there her avarice for hidden treasures. She embarks her whole soul in the traffic of affection.

নারীর রাজ্য, অধিকার ও জীবনের কর্ত্তব্য এই কটি কথায় বেশ সুস্পষ্ট। হৃদয়রাজ্য বস্তুজগৎ অপেক্ষা অনেক বড়, হৃদয়ের প্রেরণা ব্যতীত কোনো কর্ম্মই সম্পন্ন হয় না। হৃদয়রাজ্যের অধিশ্বরীগণের প্রেরণা ও সোৎসাহ উত্তেজনায় পুরুষের সকল কর্ম্মের বিস্তার ও সিদ্ধি। হিন্দুজাতি নারীর মধ্যে মহাশক্তির রূপ দেখিয়াছেন। পুরুষ চিরদিন তাহার নিকট শক্তি ভিক্ষা করিতেছে। এই মহাশক্তির অংশ রমণী পুরুষের দাসীত্বও করিবে না, পুরুষের উপর প্রভুত্বও করিবে না; পুরুষের বাহুতে বলের মত অধিষ্ঠিত থাকিবে—হৃদয়ে উদ্দীপনার মত বিরাজ করিবে। সংগ্রামের রক্তাক্ত প্রাঙ্গণে সে সঙ্গে থাকে না বটে, শিবিরে বসিয়া সে পুরুষকে অস্ত্রে ভূষিত করিয়া রক্ষাকবচ বাঁধিয়া সমরে প্রেরণ করে, বিজয়ী হইলে জয়মাল্যের দ্বারা জয়কে মহিমান্বিত করে, আহত হইলে বক্ষে করিয়া বহিয়া আনিয়া স্নিগ্ধ প্রলেপ দান করে এবং সমরক্ষেত্রে সগৌরবে পতিত হইলে—নিজহস্তে চিতা সাজাইয়া দুই জনে এক চিতায় দগ্ধ হয়।

কি কর্ম্মজগতে, কি পারিবারিক জগতে কি সামাজিক জগতে সর্ব্বত্রই নারী পুরুষের সকল কর্ম্মের, সকল ভাবের, সকল ব্রতের সহযোগিনী হইতে পারে এবং এই সহযোগিতাই প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কাজ। পুরুষের প্রত্যেক ব্রতের উদ্‌যাপনার জন্য তাহার সহায়তা সমান্তরালভাবে গার্হস্থ্যজীবনের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইবে। অনেক সময় পুরুষ যাহা করিবে তাহারি কর্ম্মভারের ভাগ লইয়া নহে—পুরুষ যেটুকু করিতে পারে না, তাহাই সম্পাদন করিয়া তাহার ব্রতের অনুসরণ করিবে এবং সিদ্ধি লাভের সহায়তা করিবে।

এজন্য পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন—নতুবা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই উচ্চ শিক্ষা ব্যতীত স্বামীর ব্রতকে উপলব্ধি করিতেই পারিবে না, তবে এই শিক্ষা গার্হস্থ্য জীবনের প্রতিকূলে না যায়, গার্হস্থ্য জীবনের বাহিরে তাহার শক্তি ব্যয়িত না হয়। নারীর সকল শিক্ষা গার্হস্থ্য জীবনের শিক্ষার সহায়ক হওয়া চাই। নারীত্বকে রক্ষা করিতে সাহায্য করিয়া, তাহার বিশেষত্বকে প্রবুদ্ধ রাখিতে সুযোগ সুবিধা দিয়া, নারীর শিক্ষাপ্রণালী নির্ব্বাচন করা চাই। গার্হস্থ্য জীবনটি যখন সংকীর্ণ ও ক্ষুদ্র নহে—বিরাট, বিপুল, নিবিড়, ও গভীর, তখন এই জীবনকে অবলম্বন করিয়া নারীর যে-

শিক্ষা হইতে পারে, তাহা পুরুষের উচ্চতম শিক্ষা হইতে কোনো অংশে ন্যূন নহে। নারীর শিক্ষারও অন্ত নাই—পুরুষেরও শিক্ষার অন্ত নাই। পুরুষের প্রত্যেক শিক্ষার ও প্রত্যেক কর্ম্মের অনুযায়ী শিক্ষা ও কর্ম্ম নারীর আয়ত্তে গার্হস্থ্য জীবনেই বর্ত্তমান আছে। দেহের সহিত মনের যে সম্পর্ক, বহির্জীবনের সহিত অন্তঃপুরের জীবনের অনেকটা সেই সম্পর্ক—এবং উভয়ের কর্ম্মের সম্পর্ক Psychological parallelism-এর মতই। এই নিয়মের অনুসরণ করিলেই নারী পুরুষের প্রকৃত সহধর্ম্মিণী হইতে পারে।

পুরুষ সূর্য্যের ন্যায় কর্ম্মজগতের দিবাভাগকে আলোকিত করে। সে জ্ঞানের সহস্রাংশুতে যত উজ্জ্বল হইবে ততই জগতের গুহ্যতম গুহার অন্ধকারও বিদূরিত হইবে।

নারী চন্দ্রের ন্যায় গার্হস্থ্য জগতের নিশীথগগনকে স্নেহপ্রেমাদিতে স্নিগ্ধ ও রমণীয় করিয়া রাখিয়াছে—তাহার চারপাশে নক্ষত্রের আনন্দময় সংসার। তাহার নীহারস্তূপে ধরিত্রীর ফলশস্যের পরিপুষ্টি—ওষধির অন্তরে অন্তরে জীবনরস সঞ্চার।

এই চন্দ্রসূর্য্যের অপূর্ব্ব মিলনে ও অপূর্ব্ব কর্ম্মবিভাগে জগৎসংসার মহাকালকে আয়ুঃস্বরূপ লাভ করিয়াছে। চন্দ্র পূর্ণচন্দ্র হইয়া অন্তঃপুরের নিশীথগগন চির আলোকিত করুক, কিন্তু—চন্দ্রমাও সূর্য্য হইয়া নিশীথকেও দিবাভাগ করিয়া তুলুক, ইহা প্রকৃতিদেবী চাহেন না—তাহা হইলে জীবজগৎ যে আর জীবিত রহিবে না।

মরণের দ্বারে

শ্রীপ্রমীলা রায়

মরণের দূত, আসিয়াছে দ্বারে,
নিভিছে চোখের আলো;
ভাঙা হৃদয়ের নিভৃত গুহায়,
প্রদীপ জ্বলিছে ভালো।
জীবন ভরিয়া যত হাসি, গান,
যত বা পেয়েছি দুঃখ,
আজি এ বেলায়, সব একে একে
ভরিয়া তুলিছে বুক।
আজি, এ ধরার শ্যামল ছবিটী
নয়নে লাগিছে ভালো;
স্নিগ্ধ আলোক ডাক দিয়ে যায়,
মুছে নেয় সব কালো।
মরণের দূত দুয়ারে এসেছে
পরশ পেয়েছি তারি—
এক জনমের প্রাণের বেদনা
আজি কি মুছিতে পারি?

আমি চলে গেলে, হয়তো কাহারো—
নয়নে ঝরিবে জল,
হয়তো কাহারো, নিত্য-স্মরণে
আঁখি হবে ছল ছল।
জীবনের মত জীবন থাকিলে—
বেঁচে থাকা লাগে ভালো।
আমার অশ্রু-অন্ধ-নয়নে
আজিকে জ্বলুক আলো।
হাসি, আলো, গান, ভরা এ ধরায়,
দুখের নাহিক ঠাঁই—
বেদনার মত বেদনা সহিয়া
আজিকে বিদায় চাই।
মরণের দূত শিয়রে এসেছে
নিভেছে চোখের জ্যোতিঃ।
বিদায় আজিকে সকলের কাছে—
সবারে জানায়ে নতি।

অশ্বডিম্ব

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য বি-এ —গল্প—

সরকারদের চণ্ডীমণ্ডপে সেদিন বিশেষ একটু উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল।

নরহরি বলিল, "উনি না আসেন আমরা বা কেন যেতে গেলাম! বড় লোক আছেন, উনি আছেন।"

গণেশ মুখোপাধ্যায় মুখখানিতে যথাসম্ভব তাচ্ছিল্য ফুটাইয়া বলিল, "বড় লোকও আমাদের খুব দেখা আছে। আর এমন বড় লোকই বা কি! আমাদের পাড়া গাঁ— তাই একটু হলে লোকে বেশী দেখে। কল্‌কাতায় অমন লোককে কেউ পোঁছেই না। সেখানে অমন বড় লোক অলিতে-গলিতে পাওয়া যায়।

প্রাণহরি বেশ আবেগের সহিত গণেশকে সমর্থন করিয়া বলিল, তাতো বটেই; সেবার আমি টেবুর বিয়েতে মামার ওখানে গিয়েছিলাম। দেখি, সে এক আজব কাণ্ড! কে কার খবর রাখে। মামার বাড়ীর বাঁদিকে দুখানা বাড়ীর পরের বাড়ীখানা কি প্রকাণ্ড! রাত্রে আলোয় আলোর বাড়ীখানা দিনের মত হয়ে ওঠে। গান-বাজনা তো চব্বিশ ঘণ্টা লেগেই আছে। দেউড়িতে পাঁচ জন দারোয়ান সর্ব্বক্ষণ বন্দুক হাতে পাহারা দিচ্ছে;—ইয়া তাদের গোঁপ! মামাতো ভাই পটলাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হ্যাঁ ভাই পটলা এটা কাদের বাড়ী রে?' পটলা ঠোঁট-মুখ উল্‌টে বল্লে— কে জানে ভাই কাদের?' আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্লাম, এত বড় বাড়ী আর এত কাছে—তাদের নামটাও জান না? পটলা বল্লে, অমন বড় বাড়ী ঢের আছে; তার হিসেব রাখ্‌তে গেলে অন্নজল ত্যাগ করতে হয়।"

কেশব খুব গম্ভীর হইয়া বলিল, "সে যাই হোক্ এটা রীতিমত insult—যাকে বলে অপমান।'

কেশব বাঁশো সহরের ইংরাজী স্কুলে ফোর্থ ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল এবং সেই অধীত বিদ্যা সুদে আসলে বাড়িয়া চিরদিন গ্রামবাসীর প্রশংসা ও বিস্ময় অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছে। কেশবের কথাটা সকলেরই প্রাণে লাগিল। অপমান সহ্য কে করিতে পারে? তাহার উপর, ইহা শুধু অপমান নহে—ইহার আবার একটা সাংঘাতিক ইংরাজী নাম আছে। ইংরাজী নামটা তাহাদের খুব পরিচিত নহে সত্য, কিন্তু জিনিষটা তো সবাই বুঝে।

তখন সবাই মিলিয়া স্থির করিল যে এই অপমান এবং সঙ্গে সঙ্গে কেশবের দেওয়া ঐ ইংরাজী নামটা কেহই সহ্য করিবে না।

কিন্তু সহ্য না করিয়া কি করিবে? কি করিয়া তাহাদের এই মহৎ উদার ক্রোধটুকু ঐ পার্শ্বের দ্বিতল অট্টালিকার অসভ্য জীবটিকে দেখাইবে? কোনদিন কি উহার কোন কিছুর দরকার পড়িবে না? কোন জিনিষের অভাব বা কোন পরামর্শের প্রয়োজন হইবে না?

দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু এই বন্ধু চতুষ্টয়ের কল্পিত বা প্রার্থিত শুভদিনের শুভক্ষণটুকু কিছুতেই আসিল না। পক্ষকাল কাটিয়া গেল তথাপি একটিবারের জন্যও এই অসামাজিক জীবটি তাহাদের দুয়ারে আসিল না!

কখন কখন দ্বিতলের একটি কাচের জানালা হইতে কাচের মাথায় ও মুখের কিয়দংশ যেন দেখা যাইত। কোন কোন দিন বৃহৎ গুম্ফযুক্ত বিশাল বাহু একটা লোক গৃহে উপবিষ্ট ঐ জীবটির কাছে বুঝি আদেশের জন্য দাঁড়াইয়া আছে মনে হইত। কোন কোন দিন সন্ধ্যার সময় সেই জীবটি যেন কাহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইত। সেই সময়ে যে প্রাচীর পার হইয়া উহার ঘরকন্নার সন্ধানটা জানিয়া যাইবে তাহারও যো ছিল না। কারণ প্রায়ই সেই সময়ে বড় বড় গোঁফওয়ালা সেই চাকরটা পাহারায় থাকিত।

এইরূপে এই দুর্ভেদ্য রহস্যের দুশ্চিন্তা দুষ্টব্রণের মত ক্রমশঃ গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল।

(২)

যেখানে নূতন অট্টালিকাখানি গ্রামবাসীদের ঈর্ষা উৎপাদন করিয়া বিরাজ করিতেছে, শুনা যায়, পূর্ব্বে ঐস্থানে অন্যান্য গ্রামবাসীদেরই মত কয়েকখানি পুরাণো একতলা ঘর ছিল। কোন সময়ে সেই গৃহের অধিকারী দুঃখ দৈন্যের তাড়নায় ভাগ্যের সন্ধানে রাজধানী গিয়াছিল তাহার ইতিহাস গ্রামের বর্ত্তমান যুবকেরা প্রত্যক্ষ না করিলেও তাহাদের পিতামাতাদের কাছ হইতে শুনিয়াছিল। তারপর যখন সেই জীর্ণ ঘর কয়খানি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সেখানে এই বিরাট সৌধ গড়িয়া তোলা হইল, তখন গ্রামবাসীদের কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না যে সেদিনকার পলাতক গৃহস্বামী ভাগ্যলক্ষ্মীর যথেষ্ট কৃপা লাভ করিয়াছে—যাহার কয়েক বিন্দুমাত্র এই অখ্যাত ক্ষুদ্র পল্লীর অধিবাসীদের প্রচুর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। বিস্ময় তাহাদের আরও বাড়িয়া চলিয়াছিল যখন তাহারা দেখিল কেহ সেখানে বাস করিতে আসিল না অথচ বৎসরে দুইবার একজন কর্ম্মচারী আসিয়া ঘরদুয়ার মেরামত করাইয়া, রং লাগাইয়া, যেখানে যাহা দরকার তাহারই ব্যবস্থা করিয়া যাইত। পল্লীর বর্ত্তমান যুবকদের সমক্ষে এই প্রথম ঘটিল যে, দুই একজন কয়েকদিনের জন্য এই বাড়ীতে বাস করিতে আসিল। এ সম্বন্ধে তাহাদের কৌতূহলের অবসান হইতেছে না—সে জন্য তাহাদের আক্রোশ দিন দিন বাড়িয়াই যাইতেছে।

একদিন এ রহস্য জানিবার একটা সুযোগ হইল। সেই গোঁফওয়ালা লোকটা একদিন লাঠি হাতে ডাকঘর হইতে একটা প্যাকেট লইয়া আসিতেছে, এমন সময় কেশব প্রমুখ কয়েকটি যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ। দেখামাত্র বুঝা গেল লোকটা বাঙ্গালী নহে, পশ্চিমের কোন এক প্রদেশের হইবে। কেশব তাহার নিজস্ব হিন্দীতে বলিয়া উঠিল, "এই ছাতু, তোমরা ভারি অহংকার হ্যায়।"

হঠাৎ এই অপূর্ব্ব সম্বোধনে লোকটা মুখ তুলিয়া দেখিল, কয়েকটি যুবক তাহাকে প্রায় ঘিরিয়া ফেলিয়াছে ও একজন ডবলব্রেষ্ট সার্ট গায়ে যুবক তাহার পানে ক্রুদ্ধভাবে চাহিয়া আছে।

এই ক্রুদ্ধ যুবকই যে পূর্ব্বের কথা কয়টি বলিয়াছে তাহা বুঝিয়া লোকটি বিশুদ্ধ বাংলায় উত্তর দিল, "ভারী অহঙ্কার কোথায় দেখ্লেন, ভাতবাবু, যে একথা বল্ছেন?"

'ভাতবাবু' কথাটা শুনিয়া কেশব আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কিন্তু কথাটা 'ছাতুর'ই জবাব ইহা মনে বুঝিয়া ও-প্রসঙ্গ চাপিয়া গিয়া বলিল, 'অহংকার না হ্যায়? একশো বার হ্যায়। এত্তা দিন আয়া হ্যায় কখন হামলোককো বাড়ী আয়া হ্যায়?'

"আপনাদের বাড়ী কোন দরকার ছিলনা তাই যাই নি, বাবু। তাতে রাগ করছেন কেন?—ভৃত্য পূর্ব্ববৎ বাংলায় উত্তর দিল।"

কেশব সপ্তমে চড়িয়া বলিল, "দরকার না থাকনেসেও যানে হোগা। হামলোককা গ্রামসসে থাকনেসেই যানে হোগা।"

এই পর্য্যন্ত বলিতেই রাগ আরও চড়িয়া গেল ও কেশব বলিয়া ফেলিল, "নেহি যায়গা তো গলা ধরকে বাহার কর দেগা।'

ভৃত্য লাঠি গাছটা বাগাইয়া ধরিয়া বলিল, "বেশতো, গলা ধরেই বা'র করে দেবেন। এখন পথ ছাড়ুন, বাড়ী যেতে দিন্।'

লাঠি উঁচু দেখিয়াই বন্ধু কয়জন চট্ করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল ও লোকটি অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সহিত তাহাদের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

কেশব সঙ্গীদের কাছে এতটুকু হইয়া গেল। বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বাহাদুরি লওয়ার অন্তরালে পাশের বাড়ীর বাবুটির বিবরণ জানিবার ইচ্ছাটা তাহারও ছিল। সে সুযোগ নষ্ট হওয়ায় সকলেই ক্ষুন্ন হইল। সকলেরই মনে হইল, কেশব অত বাড়াবাড়ি না করিলে এবং হিন্দীভাষার উপর অতটা দখল না দেখাইলে সবটা না হউক্, হয়ত কতকটা জানা যাইত।

সেই দিনই তাহাদের সনাতন সভায় অর্থাৎ সরকারদের চণ্ডীমণ্ডপে সকলে মিলিয়া অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির করিল, যেমন করিয়া হউক আগন্তুকদের সবিশেষ বিবরণ জানিতেই হইবে; না জানিলে তাহাদের গ্রামের সমূহ কলঙ্ক এবং বিপদও বটে। কারণ এমন কথাও

দুই একজন বলিতেছে যে অনেক রাত্রে ও বাড়ীর ছাদ হইতে কখন কখন নারী কণ্ঠের গানও যেন শুনা যায়।

নরহরি তো একথা শুনিয়া একেবারে মরিয়া হইয়া উঠিল। সারা গ্রামের মধ্যে সেই খুব কড়া মেজাজের লোক বলিয়া বিখ্যাত। কেশবের মতে বাড়ীর মধ্যে discipline রাখার ক্ষমতা একমাত্র নরহরিরই আছে। শুনা যায়, নরহরির স্ত্রী কলিকাতার মেয়ে এবং গাড়ী করিয়া মহাকালী পাঠশালায় কিছুকাল পড়িয়াছিলও। তাহার উপর কবিতা ও স্তোত্র বেশ সুর করিয়া পড়িতে শিখিয়াছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলায় সে বাংলায় লেখা ন একটা স্তব সুর করিয়া পড়িতেছিল এমন সময় নরহরি বাড়ীর কাছে আসিয়া পৌছিয়াছিল। নরহরি পরের বৌয়ের খুঁত ধরিয়া বেড়ায় আর তাহারই বাড়ীতে এই ব্যাপার। নরহরি তো একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহার বৌ—সন্ধ্যাবেলা গা ধুইয়া (হয়ত বা সাবান মাখিয়া) ফরসা কাপড় পড়িয়া মিহিসুরে গান গায়,—আর বাহিরের লোক তাহা শুনিয়া যায়। নরহরি বাড়ী ঢুকিয়াই discipline এর জন্য এমন কাণ্ড করিয়া বসিয়াছিল যে সেই দিন হইতে তাহার স্ত্রীর কণ্ঠ হইতে সুর সভয়ে বিদায় লইয়াছিল এবং গ্রামে তাহার একটা স্বামী প্রতিপত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

এ হেন নরহরি পাশের বাড়ীতে মেয়ে মানুষের গান শুনিয়া একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। সকলেরই মত হইল, সেই দিনই যেমন করিয়া হোক ভিতরের কথা জানিতে হইবে। কিন্তু কি উপায়ে? বাড়ীখানা যে রকম উঁচু প্রাচীর দিয়া ঘেরা তাহাতে সে প্রাচীর লঙ্ঘন করাই কঠিন। আর যদিই বা কষ্টে-সৃষ্টে লঙ্ঘন করিয়া কোন গতিকে ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে, সে বাহির হইবে কি করিয়া? দরজায় যদি ভিতর হইতে তালা দেওয়া থাকে? নামিবামাত্র যদি কেহ গলাটি টিপিয়া ধরে তখন কি বলিবে? তবে কি প্রাচীরের উপর হইতে দেখিবে? যদি কেহ-তাড়া করে? তখন কি লাফাইতে গিয়া পা ভাঙ্গিবে না ধরা পড়িয়া জেল খাটিবে?

এইরূপ নানা কল্পনা-জল্পনার পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে বাড়ীর সম্মুখে তাহাদের প্রাচীরের বাহিরে যে একটা বড় কাঁটাল গাছ আছে তাহারই উঁচু ডালে উঠিলে বাড়ীর ভিতরের সবই দেখিতে পাইবে। গাছটা উঁচুও খুব, যদি দ্বিতলের বারান্দায় আগন্তুক বসিয়া থাকে, তাহা হইলেও সেখানকার সব প্রত্যক্ষ করা যাইবে।

কিন্তু রাত্রে গাছে ওঠার একটা যে অমানুষিক ভয় আছে, সে কথাটা গণেশের মনে হইয়াছিল। কিন্তু দলের মধ্যে সে ব্রাহ্মণ হইয়া কি করিয়া ভূতের ভয়ের কথাটা তুলিবে? তাহার উপর, কথাটা তুলিলেই কেশব হয়ত ইংরাজীতে তাহার এমন একটা নাম দিয়া বসিবে যাহার অর্থ সে না বুঝিলেও আঘাতটা কম বাজিবে না। এদিকে কৌতূহল যে ছিল না তাহাও নহে। কাজেই গণেশ মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল, একখণ্ড কাগজে লাল কালি দিয়া একশোবার রাম নাম লিখিয়া রাখিবে এবং রাত্রে আসিবার সময়ে সেই কাগজখানি কবজের মত কোঁচার খুটে বাঁধিয়া রাখিবে।

কাজেই গাছে উঠিয়া রহস্য আবিষ্কারের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল; এবং দিবাভাগে সকলে গাছটার উপরভাগ একবার ভাল করিয়া দেখিয়া গেল এবং কে কোন্ খানে বসিবে তাহাও স্থির করিয়া গেল।

(৩)

পাড়াগাঁয়ে সন্ধ্যার পর আর বড় একটা লোক চলে না। কিন্তু গ্রীষ্মকালে একটু সাড়াশব্দ পাওয়া যায়। সেজন্য সন্ধ্যাটা কাটাইয়া চারিবন্ধু অভিযানে বাহির হইল।

শুক্লা চতুর্থী। তখনও অন্ধকার। এই অন্ধকারের মধ্যেই গাছে উঠিতে হইবে। নহিলে কেহ হয়ত দেখিয়া ফেলিতে পারে। গাছে উঠিবার পর জ্যোৎস্না উঠিলে কোন ভয় নাই। পাতার আড়ালে তখন আর কেহ দেখিতে পাইবে না।

শীঘ্রই কয়জনে গাছতলায় পৌছিল। তারপর একে একে নীচেকার একটা শাখা হাত দিয়া ধরিয়া গাছের গুঁড়ির উপর দিয়া শাখার উপর উঠিয়া পড়িল। তারপর সন্তর্পণে উঠিতে উঠিতে কয়জনই বেশ উঁচু জায়গায় উঠিয়া বসিল।

প্রথমটা বড় একটা কিছু বুঝা গেল না। এক আধটা কথার টুকরা, বুঝি বা এক আধটুকু হাসির ছিটা তাহাদের কানে আসিয়া পৌছিতেছিল। মিনিট পনেরো পরে

জ্যোৎস্না উঠিল তখন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চারি বন্ধু চাহিয়া রহিল।

কৈ উপরের বারান্দায় বা ঘরে তো কাহাকেও দেখা যাইতেছে না! তবে কি হইল?

কেশবই সব প্রথমে লক্ষ্য করিয়া কি যেন দেখিতে পাইল। দেখিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া সকলকে কি বলিল সকলেই তখন দেখিতে পাইল, অট্টালিকার সম্মুখের স্থানটুকু দুইভাগে ভাগ করিয়া ফুলের বাগান। দুই বাগানেরই মধ্যস্থলে দুইটি বেদী। বামদিকের বাগানের মধ্যেকার বেদীর উপর কাহারা যেন বসিয়া। লক্ষ্য করিয়া সবাই দেখিল, একজন বসিয়া কি যেন লিখিতেছে। ভাবে বোধ হইল, সেই গৃহস্বামী। জ্যোৎস্না তখন বেশ পরিষ্কার, দূরত্বও বেশী নহে। গৃহস্বামীকে দেখিলে মনে হয় নবীন বয়স, শুভ্র পরিচ্ছদ; কাগজের উপর কালি না লইয়াই 'বিলাতী' কলম দিয়া লিখিয়া যাইতেছে।

মিনিট পনেরো কাটিয়া গেল। যুবকটি সুধু লিখিয়াই যাইতে লাগিল। বন্ধু চতুষ্টয় অধীর হইয়া উঠিল। সুধু কি হাতের লেখা দেখিতে ইহারা আপদ-বিপদ্ তুচ্ছ করিয়া এতরাত্রে গাছে আসিয়া বসিয়াছে? এ লেখা তো—তাহারা শশধর পণ্ডিতের পাঠশালাতেও দেখিতে পাইত।

কিছুক্ষণ পরে সেখানে একটি রহস্যজনক মূর্ত্তির উদয় হইল। মূর্ত্তিটি যে কোন সুন্দরী যুবতীর সে বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। কেবল গণেশের একবার মনে হইয়াছিল মূর্ত্তিটা ঐ কোণের রজনীগন্ধার ঝাড় হইতে হাঁটিয়া আসে নাই তো! গণেশ কিন্তু সে সন্দেহ কাহারও কাছে প্রকাশ করিল না। ভাবিল যখন আসিয়াছেন, তখন কথা তো কহিবেন বটেই। সেই সময়েই ধরা পড়িবেন। গণেশ ঐ শ্রেণীর জীবদিগকে সম্মান করিয়া কথা কহিত এবং শিবের ললাটের মত—চন্দ্রবিন্দুর দ্বারা যে উহাদের সব কথাই শোভিত থাকে তাহাও সে জানিত।

যুবতী কাছে আসিতেই যুবক মুখ তুলিয়া চাহিল। চক্ষে ভয়ের কি ভালবাসার দৃষ্টি—তাহা ঠিক বুঝা গেল না। কিন্তু কোন আর্ত্তনাদ শুনা গেল না। আর একটু লক্ষ্য করিতে দেখা গেল যুবতীর দক্ষিণ হস্তে একটি পানপাত্র। তাহা যেন পূর্ণ বলিয়াই মনে হইল।

যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, "কতখানি হ'ল?"

যুবক বলিল, "অর্দ্ধেক। এই যে এনেছ, বেশ। বস।"

পাত্রটি-যুবকের সম্মুখে রক্ষা করিয়া যুবতী যুবকের পার্শ্বে বসিল।

গণেশ লক্ষ্য করিল, কণ্ঠস্বরে চন্দ্রবিন্দু নাই। তবে তো তাঁরা ন'ন্। কয়জনই তখন আশ্বস্ত হইল যে এতক্ষণে তাহাদের সকল শ্রম সার্থক হইল। তাহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় কর্ণ ও চক্ষুতে পরিণত করাইয়া বন্ধু চতুষ্টয় শুনিতে ও দেখিতে লাগিল।

যুবক সম্মুখে স্থাপিত কাচের পাত্র হাতে তুলিয়া এক চুমুক খাইয়া আবার রাখিল। ভাবে মনে হইল, যেন বড় আরামই পাইল।

প্রাণহরি চুপি চুপি সাগ্রহে বলিল—গেলাসে মদ!

তা বৈকি। কাচের গ্লাসে মদ ছাড়া আর কি হইবে? সকলের লোমহর্ষণের মত অবস্থা হইল। তবে তো ঠিকই!

আর এক চুমুক পানীয় পান করিয়া যুবক বলিল, 'আর একবার সেটি গাও।'

যুবতী বলিল, "এখনি?"

যুবক বলিল, "হ্যাঁ। আজই শেষ কর্‌ব। তোমার গান না শুন্‌লে শেষটা ভাল হবে না।"

যুবতী উঠিয়া গেল। তাহার স্বচ্ছন্দ লঘুগতি দেখিয়া মনে হইল যেন জ্যোৎস্না সমুদ্রে ভাসিয়া যাইতেছে।

একটু পরেই যুবতী ফিরিয়া আসিল। তাঁহার হাতে একখানি এস্রাজ। দুই এক মিনিটে সুর ঠিক করিয়া লইয়া যুবতী এস্রাজের সুরের সঙ্গে গান ধরিল। সঙ্গীতজ্ঞ না হইলেও সকলেরই গানটি বড় সুন্দর ও এ কণ্ঠ বড় মধুর বলিয়া মনে হইল।

যতক্ষণ গান চলিতেছিল যুবক অবাধে লিখিতেছিল ও এক একবার বাম হাতে গেলাস তুলিয়া এক চুমুক করিয়া পানীয় উদরস্থ করিতেছিল। মাঝে মাঝে এক একবার গায়িকার পানে চাহিতেছিল। গান শেষ হইবে এমন সময় যুবক যুবতীর কাছাকাছি মাথা রাখিয়া ক্ষণকালের জন্য শুইয়া পড়িল। বন্ধু কয়জন বুঝিল

পানীয়ের প্রসাদাৎ যুবকের বসিবার ক্ষমতা লোপ পাইয়া আসিতেছে। তাহারা বুঝিল অদ্ভুত শক্তি এই পানীয়ের যাহা কয়েক মিনিটেই এমন নেশা আনিয়া দেয়।

একটু পরেই তাহারা চাহিয়া দেখিল যুবতী পা দুখানি সরাইয়া লইয়াছে ও যুবকের ললাটের উপর আপনার দক্ষিণ হস্ত বুলাইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে ইহারি গুণে কিছুক্ষণ পরেই যুবক আবার উঠিয়া বসিল ও লিখিতে লাগিল।

গণেশ বলিল, 'দেখ, মদ আছে, মেয়ে মানুষও জুটেছে। আর কি চাই?"

আর যে কি চাই কেহ বলিতে পারিল না। কেশব বলিল, "এও তো হতে পারে ঐ যুবতী যুবকের স্ত্রী।"

নরহরি বলিল, "ধ্যেৎ, তাহলে গান গায়!"

কেশব বলিল, "তা গায়। কলকাতায় এ রকম হয় শোনা যায়।"

নরহরি উত্তর করিল, "তাহলে তারাও সেই রকম স্ত্রী।"

প্রাণহরি বলিল, মদ খাচ্ছে, মেয়েমানুষের গান শুনছে, আবার লুটিয়ে পড়াও হচ্ছে;—তবু অবিশ্বাস!

ইহার মধ্যে যুবক কলম রাখিয়া দিয়া কিছুক্ষণ যুবতীর মুখপানে চাহিয়া রহিল এবং ক্ষণকাল পরে যুবতীর মুখ চুম্বন করিল।

চারি জনেরই বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ভদ্রলোক প্রকাশ্যভাবে চাঁদের আলোয় বসিয়া তাহাদের চোখের সামনে এক যুবতীকে চুম্বন করিল! সবচেয়ে অভিভূত ও উত্তেজিত হইল নরহরি। তাহাদের গ্রামের বুকের উপর বসিয়া একি কাণ্ড! ইহার প্রতিকার চাই-ই চাই।

ঠিক এই মুহূর্ত্তে একটা অঘটন ঘটিয়া গেল। নরহরি উত্তেজিত হইয়াছিল বেশী, হাত পায়ের আস্ফালনও বোধ হয় বেশী করিয়া ফেলিয়াছিল, আর যে ডালটার উপর বসিয়াছিল সে ডালটাও ছিল ভাগ্যদোষে পলকা। উত্তেজনার বেগ সহিতে না পারিয়া ডালটী মড়াৎ করিয়া ভাঙ্গিল ও সঙ্গে সঙ্গে নরহরি বাঁ দিকে কাত হইয়া পড়িল। একটু নীচে বসিয়াছিল কেশব। জলে মজ্জমান ব্যক্তির মত নরহরি কেশবকে এক হাত দিয়া ধরিয়া আপনাকে বাঁচাইতে গেল। কিন্তু নরহরির দেহভার কেশবের দ্বিগুণ। কাজেই সে কেশবকে সাথী করিয়া সশব্দে একেবারে নীচে আসিয়া পড়িল। নরহরির স্থূল দেহের উপর কেশব আসিয়া পড়িয়াছিল তাই রক্ষা, নতুবা পতনের জন্য যত না হউক নরহরির বপুর পেষণে কেশবকে 'পরিত্রাহি' ডাক ছাড়িতে হইত।

যাহারা পড়িয়াছিল এবং যাহারা তখনও গাছে বসিয়া ছিল কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য দুই পক্ষেরই জ্ঞান বুদ্ধি হারাইয়া গিয়াছিল।

ক্ষণপরেই নরহরি বাপরে, গেছি রে, বলিয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং সেই অবসরে কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া প্রাণহরি ও গণেশ নিঃশব্দে নীচে নামিয়া ভূপতিত বন্ধুদ্বয়ের সাহায্যার্থে হাত বাড়াইল। ঠিক সেই এক তীব্র আলোকের রশ্মি তাহাদের চোখের উপর পড়িয়া তাহাদিগকে চমকিত করিয়া দিল। আলোক সরাইয়া লইতে কয়জনে সবিস্ময়ে দেখিল, গৃহস্বামী বৈদ্যুতিক আলোক হস্তে তাহাদের সমক্ষে দাঁড়াইয়া; তাহার পাশেই পূর্ব্বদৃষ্টা, পশ্চাতে পূর্ব্বপরিচিত গুম্ফযুক্ত লোকটি।

যুবক বলিল, ব্যাপার কি? কে যেন পড়ে গেছেন বলে মনে হল!

বলিয়া আলোকটি ভূপতিত নরহরির পানে সন্নিবেশিত করিয়া বলিল, 'আহা, পা-টায় যে বড্ড লেগেছে দেখছি। কি করে পড়লেন?'

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই যুবক বলিয়া গেল, "এখানে তো হাঁসপাতাল নেই, চট্ করে ডাক্তারও পাওয়া যাবে না। ভেতরে চলুন; যা পারি আমরাই চেষ্টা করে দেখি। এস তো রঘুপতি।"

বলিবামাত্র গোঁফওয়ালা লোকটী এক লাফে নরহরির কাছে আসিয়া, প্রভুকে কহিল, 'বাবু, আপনি ছেড়ে দিন; আমি একাই পারব।'

বলিয়া স্থূলকায়, নরহরিকে সাবধানে তুলিয়া লইয়া ভিতরে গেল।

বন্ধুত্রয়ের পানে চাহিয়া যুবক বলিল, "আপনারাতো এঁর বন্ধুলোক, অপনারাও চলুন দয়া করে।'

তিনজনেই যুবকের আগে আগে চলিল। যুবক তাহাদের অনুসরণ করিতে করিতে দেখিল, একজন খোঁড়াইতেছে। যুবক জিজ্ঞাসা করিল, আপনারও কি লেগেছে?

সে ব্যক্তি কেশব। বলিল, 'তেমন নয় সামান্যই।'

তথাপি যুবক কেশবের কাছে আসিয়া তাহার আলোক দিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, "কয়েক জায়গায় কেটে গেছে; ও একটু ঔষধ দিলেই সেরে যাবে।

রঘুপতি ততক্ষণে নরহরিকে বেদীর উপর শয়ন করাইয়া দিয়াছিল। এইটুকু নড়াচড়াতেই সে আর্ত্তনাদ করিতে সুরু করিয়াছিল। যুবক সেখানে পৌছিতেই যুবতী একটী ব্যাগ ভিতর হইতে আনিয়া সেখানে রাখিল। যুবক ব্যাগ হইতে খানিকটা শুভ্র বস্ত্রে ঔষধ লাগাইয়া তাহার যে স্থানে আঘাত লাগিয়াছিল, সে স্থানটি পরিষ্কৃত করিয়া লইল; তারপর সেখানে আর একটি ঔষধ লাগাইয়া দিয়া বেশ নিপুণতার সহিত ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিল। যেখানে প্রয়োজন হইতেছিল যুবতী ক্ষিপ্রহস্তে তাহা যুবকের হাতের কাছে আগাইয়া দিতেছিল। ব্যাণ্ডেজ শেষ হইলে যুবক কেশবের হাতে ও পায়ের ২।১ স্থানে নিজ হাতে ঔষধ লাগাইয়া দিল।

নরহরির পানে চাহিয়া যুবক বলিল,হাড়টাড় ভাঙ্গেনি। দুচার দিন ঔষধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করালেই সেরে যাবে, ভাববেন না। কিন্তু পড়লেন কি করে।"

বড় শক্ত প্রশ্ন। গণেশের ভূতের ভয় আছে, একটু কল্পনা প্রবণ ও বটে। চট্ করিয়া বলিল, 'দৈবের কাজ মশায়! নইলে এমন হয়! আমরা দুজন বেড়িয়ে ফিরছি। এমন সময় হুড়মুড় করে শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার। এসে দেখি আমাদেরি বন্ধু দুজন পড়ে কাতরাচ্ছেন। ওদের বাড়ী কি একটা পূজো। তাতে কাল সকালেই নিখুঁত কাটালের পাতার দরকার; তাই দুজনে মিলে গাছে উঠেছিল পাতা বাছতে। তারপর এই দুর্ঘটনা।"

গল্পটি খুব বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও যুবক কোন অবিশ্বাসের লক্ষণ দেখাইল না। যুবক যুবতীর কাণে কাণে কি বলিতেই যুবতী ভিতরে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ উঠাইয়া রঘুপতি যুবতীর অনুসরণ করিল।

এই অবসরে সকলে সে স্থানটি একবার দেখিয়া লইল।

কেশব জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বুঝি কলিকাতা থেকে এসেছেন?"

যুবক একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, হাঁ, কলিকাতা আমরা থাকি বটে, কিন্তু আপনাদেরই দেশের লোক। একবার দেশ দেখতে ইচ্ছা হ'ল তাই এলাম, এমন কারও সঙ্গে পরিচয় নেই যে তাঁকে সঙ্গে করে গ্রামের সকলের সঙ্গে দেখা শোনা করে আসি।"

কেশবের বেদনায় ঔষধ দেওয়ায় সে একটু আরাম বোধ করিতেছিল। সে অনেকটা কৃতজ্ঞতাভরেই বলিল, তার জন্য ভাবনা কি? আমিই আপনাকে নিয়ে গিয়ে গ্রামের সবারই সঙ্গে introduce করিয়ে দেব। এখানেই তো আমরা চার জন আছি।

বলিয়া কেশব একে একে সবারই নাম, পেশা ইত্যাদি বলিয়া দিল। অবশ্য পেশা ও আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে কেশব একটু অতিশয়োক্তি করিয়াছিল। তা আমরা সবাই একটু আধটু করিয়া থাকি।

আর একটু পরে রঘুপতিকে সঙ্গে করিয়া যুবতী ফিরিল। রঘুপতের হাতে একটি থালার উপর পানীয়ভরা ৪টি কাচের গেলাস। যুবতীর হাতে ঐ রকম আর এক খানি থালার চারখানি ডিসে করিয়া সাজানো কয়েক প্রকারের খাবার।

যুবক বলিল, একটু চা খান্। আপনিও খান্ একটু, উপকার পাবেন।

শেষের বাক্যটি নরহরিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল। রঘুপত সকলের সমক্ষে এক একটি চায়ের ও খাবারের পাত্র ধরিয়া দিল।

কয় বন্ধুই চাহিয়া দেখিল, যুবক যে গ্লাস হইতে পানীয় লইয়া এক চুমুক করিয়া পান করিতেছিল এবং এখনও যাহার অর্দ্ধেক ভরা তাহাতেও ঐ চা যাহা তাহাদের পাত্রেও বিরাজ করিতেছে। তাহা হইলে উহা মদ নহে!

এমন সময়ে যুবক বলিল, "আমাদেরও একটু পরিচয় দেওয়া উচিত। ইনি আমার স্ত্রী; এঁরই কাছে আমি রোগীর শুশ্রূষা কিছু কিছু শিখেছি এবং এঁরই ইচ্ছায় এখানে এসেছি। আর ইনি রঘুপত্ সিং। বড় বিশ্বাসী। আমার অভিভাবক বল্লেই হয়।"

যুবতী লজ্জায় মাথা নীচু করিল। তাহাতে মুখখানি আরও মনোরম হইয়া উঠিল।

রঘুপত্ কি বলিবে তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া

বিপন্নের মত চাহিল। তাঁহার মুখভাব বড়ই হাস্যোদ্দীপক হইয়া উঠিল।

খাবার শেষ করিয়া চা খাইতে খাইতে কেশব জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি পেয়ালা করে চা না খেয়ে গ্লাসে করে খান যে!"

যুবক হাসিয়া বলিল, "সে একটা কথা বটে। এ একটা খেয়াল মাত্র আর কিছু নয়। তবে খেয়ালটা হবার একটা সামান্য কারণও আছে। রুসিয়ায় সাধারণ গৃহস্থের ঘরে গ্লাসে করে চা খাওয়ার প্রথা আছে। রুসিয়ার সঙ্গে আমাদের দেশের অনেক মিল আছে। সেজন্য রুসিয়ার অনেক প্রথাই আমি ভালবাসি। একখানা বই পড়ে a glass of tea র কথা জানি। সেই থেকে কি খেয়াল হ'ল গ্লাসে করেই চা খাই।"

কেশব আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি লিখ্‌ছিলেন?"

যুবক কিছু বলিবার পূর্ব্বেই যুবতী বলিল।

"ইনি ইংরাজীর অধ্যাপক।"

কিন্তু অধ্যাপনার চেয়েও এর গল্প লেখায় বেশী নাম। ইনি একজন বিখ্যাত গল্প লেখক।

কেশব বাংলা সাহিত্যের কিছু কিছু খবর রাখিত অর্থাৎ গল্প ও উপন্যাস পড়িত। সে সবিনয়ে যুবতীকে বলিল,' 'এর নামটি তো জান্‌তে পারলাম না।'

যুবতী হাসিয়া ফেলিল—কিন্তু নামটি ধরিতে পারিল না। রঘুপতি বলিল—বাবুর নাম মণিময় চট্টোপাধ্যায়।

এ নাম গণেশ জানিত। সে প্রশংসমান দৃষ্টিতে যুবকের পানে চাহিল।

কেশব জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বুঝি গান শুন্‌তে শুন্‌তে গল্প লেখেন?"

মণিময় বলিল, আমি যা কিছু লিখি ওঁর গানের শক্তিতে। ওঁর গানই আমার inspiration। ওঁর গান শুন্‌লেই কল্পনারাজ্যের কত নানা দেশ, নূতন তথ্য, নবীন সৌন্দর্য্য চোখের সাম্‌নে ভেসে আসে। এক এক সময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়ি।

সকলের চা পান শেষ হইলে কেশব বলিল, "আপনাদের অনেক কষ্ট দিলাম। এবার উঠি।"

মণিময় নরহরিকে দেখাইয়া বলিল, 'ইনি কি যেতে পারবেন? আজকের রাতটা এখানে থাকলে এর কি কোন অসুবিধা হবে? আমি এঁর বাড়ীতে খবর পাঠিয়ে দিতাম।'

নরহরি ব্যস্ত হইয়া বলিল, 'না, আমিও যাব। এরাই একটু কষ্ট করে নিয়ে যাবে খন। এই কাছেই তো বাড়ী।'

মণিময় তখন বলিল, "রঘুপত্‌ তুমি তবে তোমার খাটিয়া খানাতে ব্যবস্থা করে ওঁকে রেখে এস। তুমি একদিকে ধর, এঁরা দুজনে অন্যদিকে ধরবেন। এ অবস্থায় হাঁটলে বিশেষ ক্ষতির আশঙ্কা।

বন্ধু চতুষ্টয় সেই ভাবেই বিদায় গ্রহণ করিল। কেশব নমস্কার করিয়া ধন্যবাদ দিতে ভুলিল না। বন্ধুদের কাছে ইহাতে কেশবের প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়া গেল।

পথে কেশব কেবল একবার জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার বাবু গান শুন্‌তে শুন্‌তে মাঝে মাঝে শুয়ে পড়েন কেন?'

রঘুপতি বলিল, "বাবু বড় ভাবুক। দুঃখের গান শুন্‌তে ভাল বাসেন; আর শুন্‌লেই চোখে জল আসে। এক একবার সব ভুলে যান্‌।"

ইহার পর সকল বিষয়ই দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিল। চারি বন্ধুরই এক সঙ্গে মনে হইল, কি ভুলই তাহারা করিয়াছিল।

কিন্তু কেহই সে কথা মুখে প্রকাশ করিল না।

ভাতার মারা পাথার

বন্দে আলি মিয়া

চলনের বিল আর কলমের গাঁ
এ দুয়ের নাহি কূল নাহি সীমানা—
এরি মাঝে ধু ধু করে দিশে হারা মাঠ
রোদে যেন মাটি ফাটে পুড়ে যায় কাঠ,
এইখানে হল চষে মাজু সোনা ভাই
একলা সে পাথারেতে গাছ পালা নাই।
বিহানের রোদ যায় দুপুরের খরা
ক্ষিদে লেগে রোদে পুড়ে সোনা আধ মরা
ডান হাতে ভাত আর পানি লয়ে ভাঁড়ে
বউ তার আল্ বেয়ে আসিচে খামারে।

*

গাঁও ছাড়া জোত জমি চষেযে সোনাই
তার লাগি দেক্ বড়ো হেঁটে এত ঠাঁই
চেকন কাজল গাও ঘামে চুব্ চুব্
ক্ষেত চষে হয়েচে সে হয়রান খুব—
তেষ্টায় ফাটে ছাতি ঝশেখের বেলা
আধ পর রোদ গেলে পথে দেছে মেলা,
আলপথে বউ দেখি হাসে মনে মনে
অভাগারে মনে বুঝি পড়ে এত খনে,
কাছে এলে দেবে গাল ভাবে তাই সোনা
খোয়ামীরে দুখ দেওয়া বউয়ের গোনা।

হতভাগী বউ আসে টিপি টিপি করি
হেঁটে আর পারে না সে—চলে আল্ ধরি
পহরেক বেলা যাবে আসিতে সে হেথা
পিয়াসায় জান যায় বাহিরে না কথা—
হাতে ছিল নড়ি গাছি তুলি বারে বারে
তাই দিয়ে ইসারায় ডাক দেয় তারে—
নড়ি দেখে বউ ভাবে নসিব খারাপ
আজিকার অপরাধ হবে নাকো মাপ ;—
দেরী দেখে গোঁসা ভরে ডাকিতেছে বুঝি
কাছে গেলে ঘা কতক দেবে সোজা সুজি

*

ঠক্ ঠকে কাঁপে গাও—পাও না ওঠে
কাঁকালের ভাত পানি মাটিতে লোটে—
বউ ভাবে গোর আজি নজদিকে তার
ক্ষুধার চোটেতে স্বামী রাগিয়া আঁধার
এই বেলা জান লয়ে পলাইয়া বাঁচি
থালা ঘটি গোছাইয়া করি এক গাছি
সোনা ভার ভয়ে বউ ছেড়ে গেল মাঠ
পানি বিনা মাজু সোনা কেঁদে পাট্ পাট্,—
সেই কাঁদা আজো কাঁদে পূবের বাতাসে
কানা মেঘে ঝরে দেয়া বুক ফাটা শ্বাসে।

ঐতিহাসিক হীরক

শ্রীঅসিত মুখোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

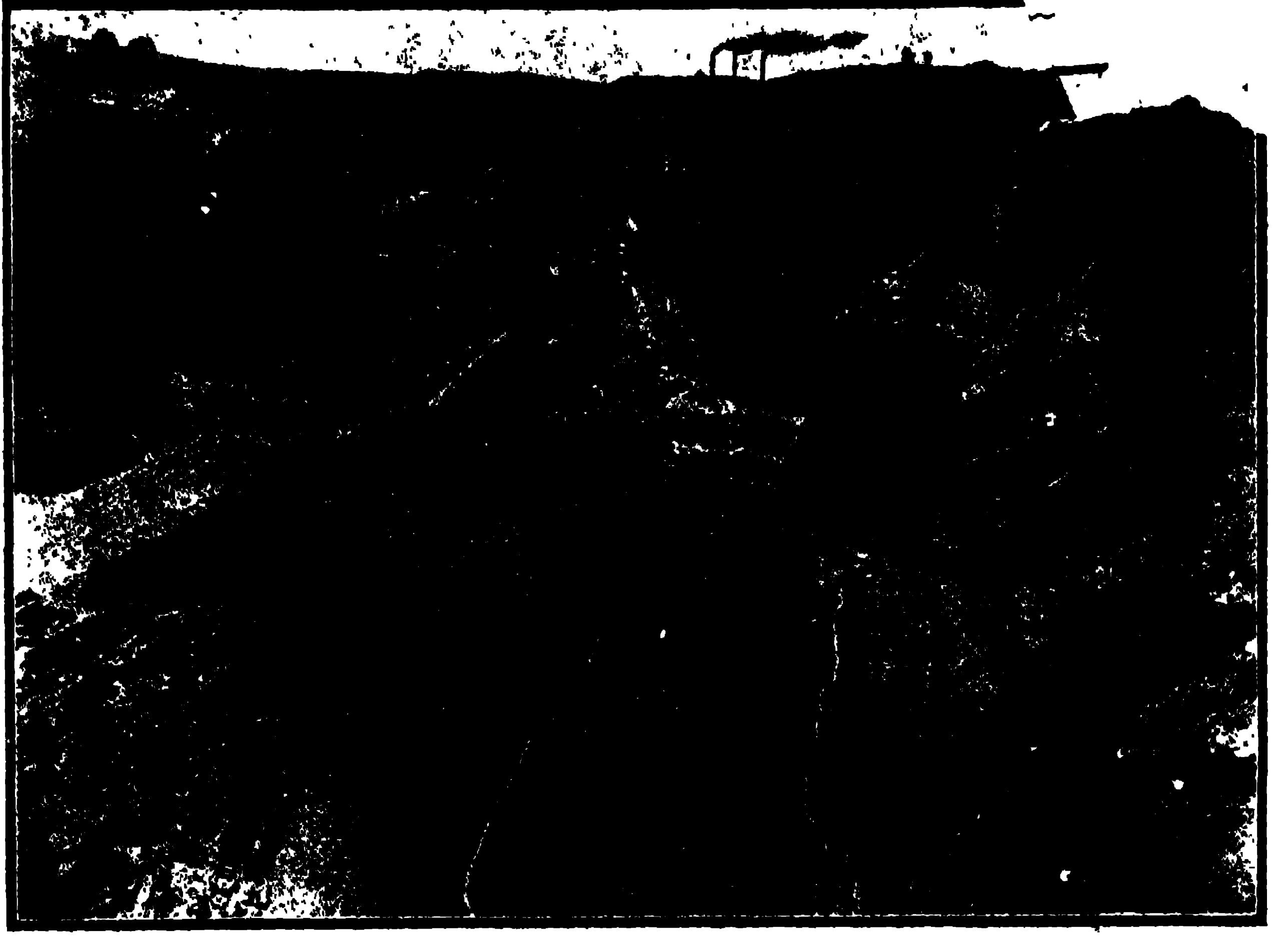
১। কোহিনুর—জগদ্বিখ্যাত ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ একখানি হীরক। এই সুবৃহৎ সমুজ্জ্বল হীরকখানি কতকাল হইল পাওয়া গিয়াছে, তাহা সঠিক জানিবার কোন উপায় নাই। অতি প্রাচীন কালে ইহা মালবের হিন্দুরাজাদের অধিকারে ছিল। আলাউদ্দীন খিলিজি নাদির শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। সেই সময়ে নাদির শাহ এই হীরকের পরিচয় পাইয়া কৌশলে মোহম্মদ শাহের নিকট হইতে ইহা হস্তগত করেন এবং ইহার নাম "কোহিনুর" রাখেন। "কোহিনুর" শব্দটী সংস্কৃত কিংবা বাংলা নহে। নাদির শাহের পর



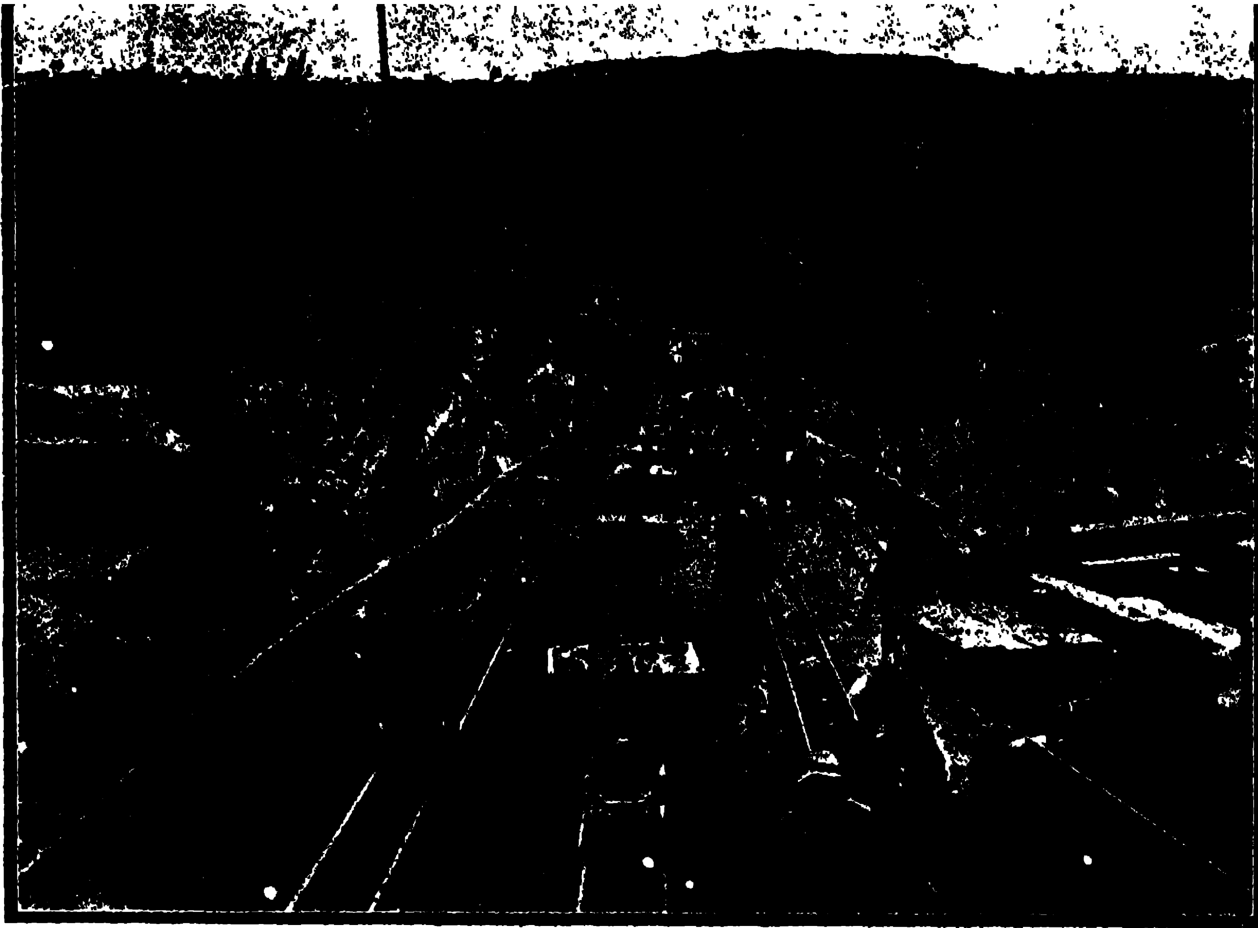
এন্টোয়ার্পের হীরক কাটাইয়ের কারখানা—বামদিক হইতে দণ্ডায়মান তৃতীয় ব্যক্তি মেসার্স ঠাকুরলাল হীরালাল কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী

মালবের অধীশ্বর হইলে, এই হীরকখানিও তাঁহার অধিকারে যায়। তৎপরে কোনক্রমে ইহা গোয়ালিয়রের রাজার হস্তগত হয়। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট বাবর তাঁহার নিকট হইতে ইহা প্রাপ্ত হন। তদবধি ইহা মোগল সম্রাটগণের অধিকারে ছিল। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে "কোহিনুর" তাঁহার পুত্রের অধিকারে যায়। তৎপর কাবুলাধিপতি অহ্‌মদ শাহ উত্তরাধিকার-সূত্রে ইহা প্রাপ্ত হন। আহ্‌মদ শাহের মৃত্যুর পর ইহা তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শাহ্‌ সুজার হস্তগত হয়। শাহ্‌ সুজা যখন কাবুল হইতে পলায়ন করিয়া পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ

সিংহের আশ্রয় লন, সেই সময়ে রণজিৎ তাঁহার নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করিয়া বিনিময়ে তাঁহার ভরণ-পোষণের জন্য সু-বিস্তৃত জায়গীর প্রদান করেন। রণজিতের মৃত্যুর পর এই মহারত্ন তদীয় মহিষী মহারাণী ঝিন্দন ও নাবালক পুত্র দলিপ সিংহের অধিকার ভুক্ত হয়। দলিপের নাবালক অবস্থায় ভারতের তৎকালীন গভর্ণর জেনেরল লর্ড ড্যালহাউসি পাঞ্জাবের কোষাগারে হস্তক্ষেপ করিয়া এই অমূল্য নিধি হস্তগত করেন এবং পরে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। একণে ইহা ইংলণ্ডেশ্বরের মুকুটের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।



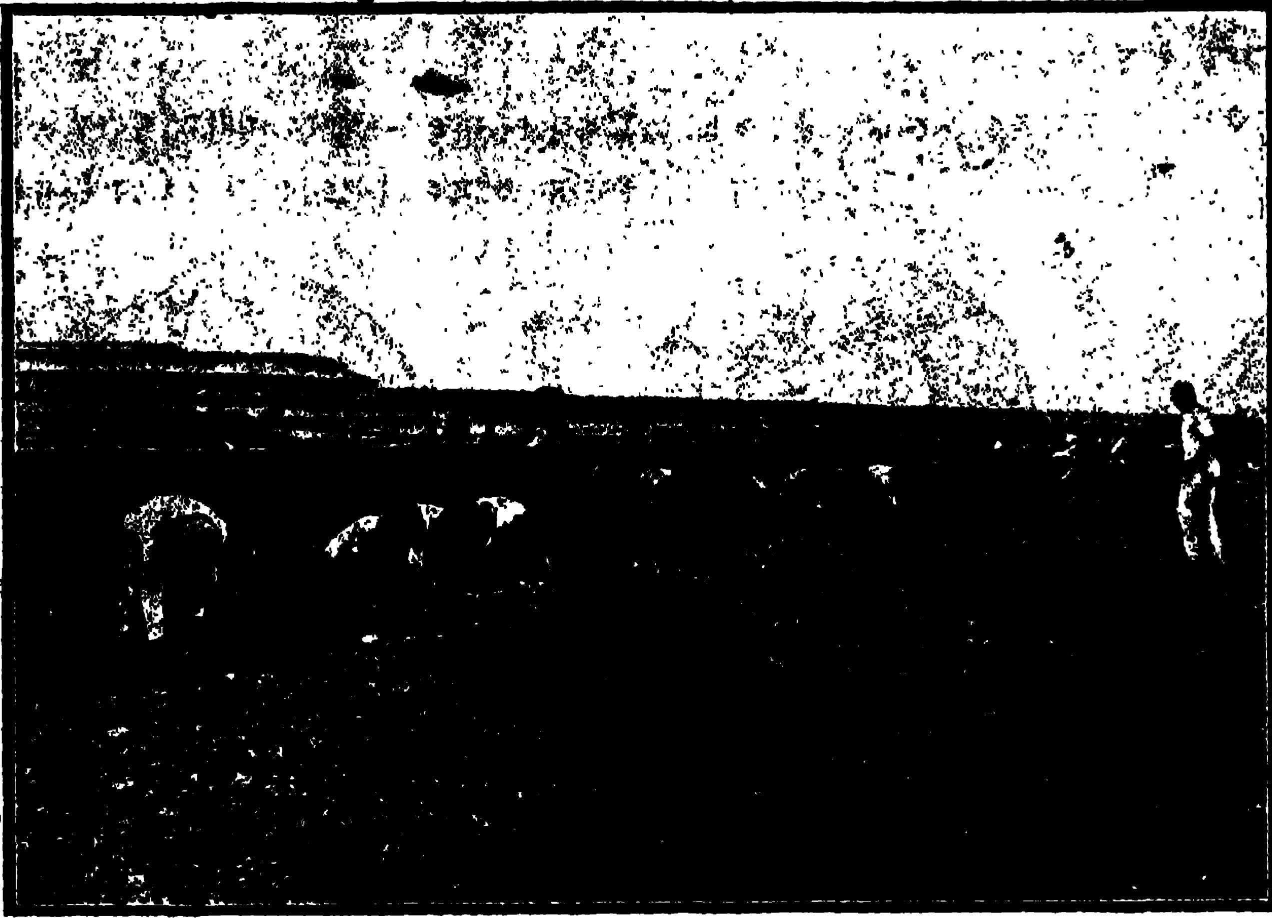
প্রিমিয়ার হীরক-খনি



খনি হইতে হীরক উপরে তোলা হইয়াছে

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময়ে ব্যবহারের উপযোগী করিবার জন্য ইহাকে কাটিয়া পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেক ছোট করা হয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ইহা লণ্ডনের বিশ্ববিখ্যাত একজিবিশনে (Exhibition) প্রদর্শিত হয়। আমষ্টার্ডামের বিখ্যাত হীরক-শিল্পী মিঃ কোষ্টার ইহার সর্ব্বশেষ কাটাইয়ের কার্য্য করিয়াছিলেন।

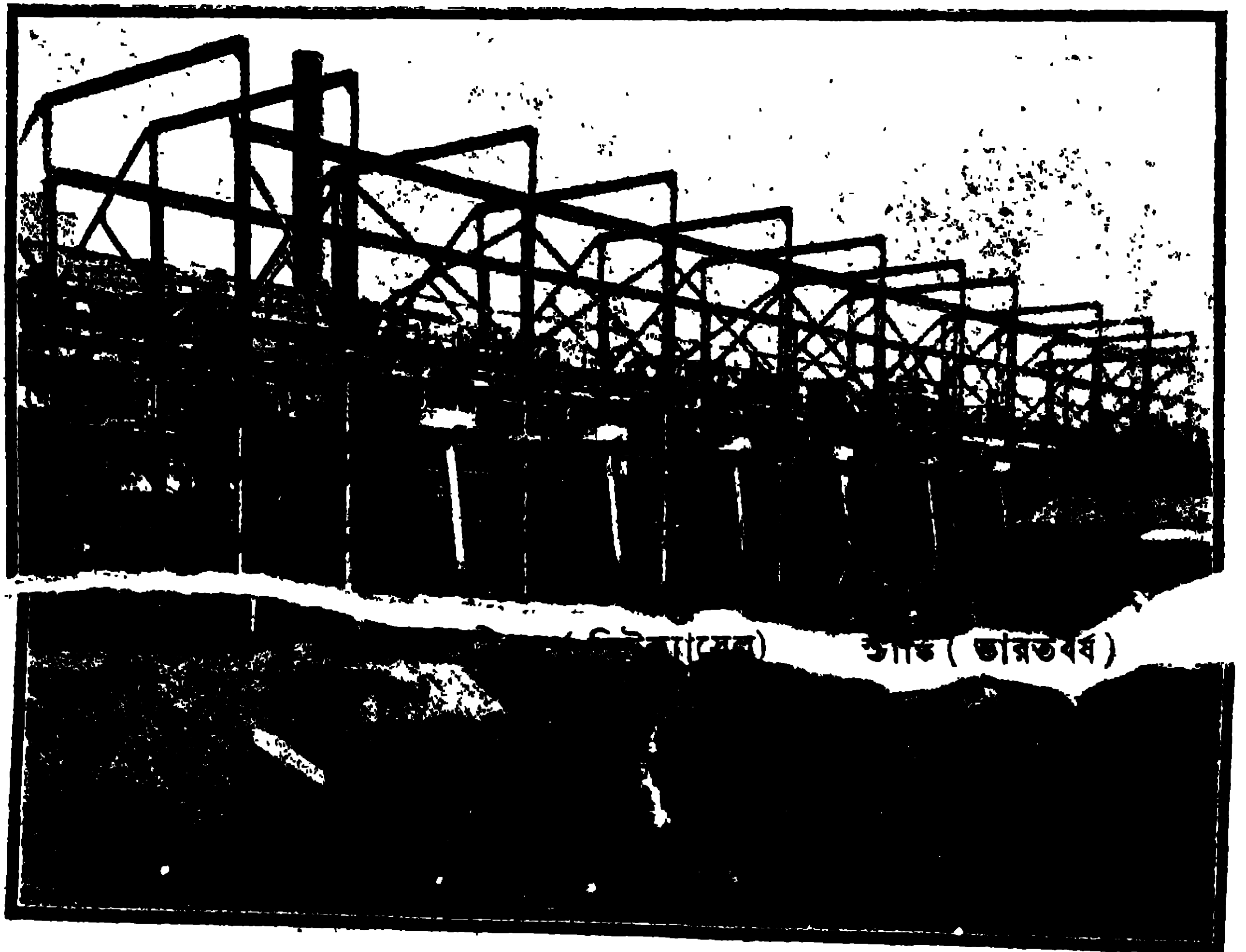
এই হীরক-খণ্ডের প্রথমে ওজন ছিল ৭৯৩ ক্যারেট। প্রথম বারের কাটাইয়ের পর ওজন দাঁড়ায় ১৮৬ ক্যারেট এবং দ্বিতীয় কাটাইয়ের পর দাঁড়ায় ১০৬ ক্যারেট। কথিত



খনি হইতে হীরক উপরে তোলা হইতেছে

আছে, রণজিৎ সিংহ এই হীরকখানিকে হাতে বাঁধিতেন। কোন সময়ে একব্যক্তি ইহার মূল্য জিজ্ঞাসা করায় রণজিৎ উত্তর করিয়াছিলেন—"পাঁচ জুতা"—অর্থাৎ যাহার শক্তি আছে, সেই ব্যক্তিই ইহা কাড়িয়া লইতে পারে, মূল্য দিয়া এই অমূল্য পদার্থটি ক্রয় করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। এই হীরক খানির বর্ত্তমান মূল্য ৫৬ লক্ষ টাকা হইতে পারে বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন

২। অরলফ্ হীরক—এই হীরক রুশিয়ার জারের সম্পত্তি ছিল। বর্ত্তমানেও ইহা রুশিয়ার রাজকোষেই রক্ষিত হইতেছে। প্রবাদ আছে—কোন একব্যক্তি ভারতীয় দেবমূর্ত্তির চক্ষু খুঁড়িয়া এই রত্ন অপহরণ করে এবং বহু হাত ঘুরিয়া অবশেষে রুশিয়ার ক্যাথারিণের নিকট প্রচুর অর্থের বিনিময়ে বিক্রীত হয়। এই প্রবাদ বাক্যের মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য আছে, তাহা বলিতে পারি না। ইহার বর্ত্তমান ওজন ১৯৩ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য ৫১ লক্ষ টাকার উপর।



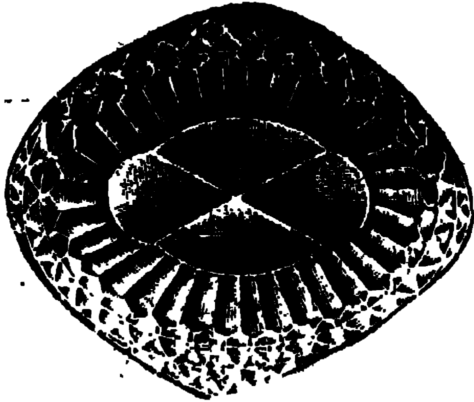
কিম্বালির ওয়াশিং মেশিন

৩। নিজাম—এই মূল্যবান হীরকখানি গোলকুণ্ডার রাজার অধিকারে আছে। আধুনিক রুচি অনুসারে

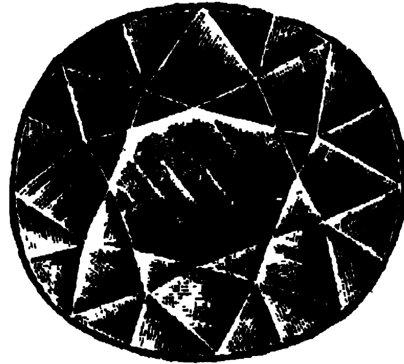
এখনও ইহাকে কাটাই করা হয় নাই। ইহার ওজন ৩৪০ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা। বর্তমান রুচি-অনুসারে কাটাই করিলে মূল্য আরও অনেক বাড়িয়া যাইবে।

টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার বর্তমান আনুমানিক মূল্য ৬৭ লক্ষ টাকার উপর।

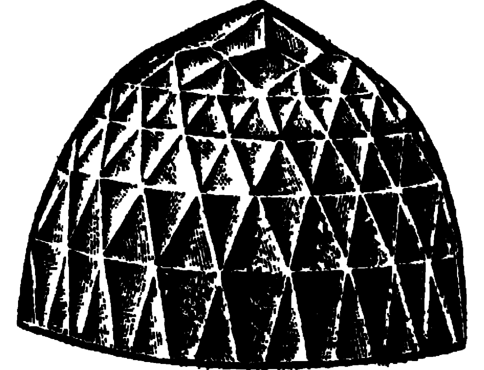
৬। ষ্টার অব্ দি সাউথ—১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই অমূল্য হীরকখানি জনৈক নিগ্রোর অধিকারে ছিল।



কোহিনুর—পুরাতন কাটাই (ইংলণ্ড)



কোহিনুর—নূতন কাটাই (ইংলণ্ড)



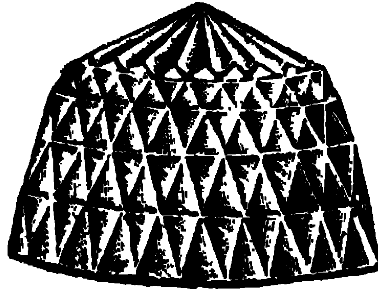
গ্রেট মোগল (রুসিয়া)

৪। গ্রেট মোগল—এই হীরকখানির কাটাই ঠিক গোলাপ ফুলের অনুরূপ। কেহ কেহ বলেন—কোহিনুরের যে দুইটি অংশের কোন খোঁজ মিলিতেছে না, ইহা তাহারই একটি অংশ। সম্ভবতঃ দিল্লী লুণ্ঠিত হইবার সময়ে ইহা অপহৃত হইয়াছিল। বর্তমান রুচি অনুসারে কাটাই করিবার পর বর্তমান ওজন দাঁড়াইয়াছে ২৮০ ক্যারেট এবং অনুমানিক মূল্য প্রায় ৫৮ লক্ষ টাকা।

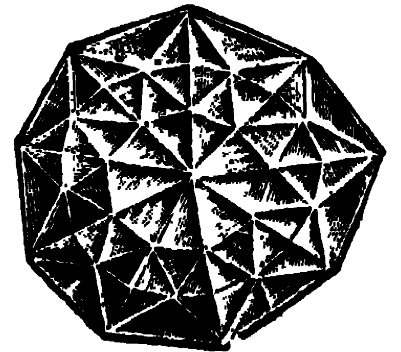
কাটাইয়ের পূর্ব্বে ইহার ওজন ছিল ১২৫ ক্যারেট। আকার ঠিক গোল নহে এবং ভিতরের দীপ্তি খুব উজ্জ্বল। খুব সাদা না হইলেও ইহা যে উচ্চশ্রেণীর হীরকের অন্তর্ভুক্ত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমষ্টার্ডামের বিখ্যাত হীরক-শিল্পী মিঃ কোষ্টার ইহাকে কাটাই করেন এবং নানা কারণে তিনিই কিছুদিনের জন্য ইহার মালিক হন। বর্তমানে ইহা কোন এক ভারতীয় রাজার রাজকোষে হইতেছে। তিনি কিঞ্চিদধিক ১১ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এই অমূল্য রত্ন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।



রিজেন্ট (ফ্রান্স)



অরলফ (রুষিয়া)



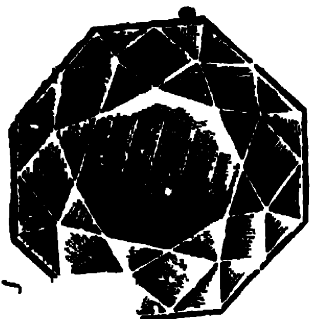
ফ্লোরেন্টিন (আফ্রিকা)

রিজেন্ট হীরক—এই হীরক ফ্রান্সে সংযোজিত আছে এবং বর্তমানে উহা প্যারিসে রক্ষিত হইতেছে। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে ইহা ডিউক অব্ অরলিয়ান্সের সম্পত্তি ছিল। পরবর্তী সময়ে ইনিই ফ্রান্সের রিজেন্ট ছিলেন; ইনি এই বৎসরেই ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জের গভর্ণর মিঃ পিটের নিকট হইতে এই হীরকখানি ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্ব ওজন ছিল ৪১০ ক্যারেট এবং বর্তমান ওজন ১৩৬ ক্যারেট। ইহাকে বর্তমান রুচি অনুসারে কাটাই করিতে দুই বৎসর সময় এবং ৪৯ হাজার

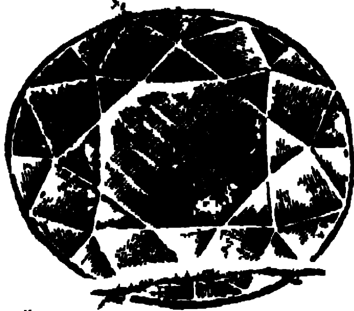
৭। গ্রেট স্যান্সি—এই হীরকখানির আশ্চর্য্য ইতিহাস আছে। ডিউক অব্ বারগাণ্ডি তাঁহার রাজকীয় পোষাকের সহিত ইহা পরিধান করিতেন। ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে ইহা পর্টুগালের রাজার অধিকারে যায়, ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি নিকোলাস ডি বার্লি, ব্যারণ ডি স্যান্সির নিকট বিক্রয় করেন। তিনি তাঁহার নামানুসারে ইহার নামকরণ করেন। স্যান্সি তাহার অনুচরের দ্বারা

উপহারস্বরূপ ইহা রাজার নিকটে পাঠান। অনুচর পথিমধ্যে দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হইয়া হীরকখানিকে গিলিয়া ফেলে এবং তাহার মৃত্যুর পর ইহা তাহার শরীরের মধ্যে পাওয়া যায়। ইহা কিছুদিনের জন্য রাণী বিসের অধিকারে ছিল এবং পরে কোন ভারতীয় নৃপতির নিকট বিক্রয় করা হয়। ইহার বর্ত্তমান ওজন ৫৩½ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য প্রায় ৫½ লক্ষ টাকা।

১০। পিগট্ হীরক—ডিম্বাকৃতি উৎকৃষ্ট হীরক। বর্ত্তমান ওজন ৪৭½ ক্যারেট। গত শতাব্দীতে প্রায় ৪ লক্ষ টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল। তৎপর রানডেল এণ্ড ব্রিজ ৮৪ হাজার টাকায় ক্রয় করেন এবং কিছুকাল নিজেদের অধিকারে রাখিয়া মিশরের পাশার নিকট প্রায় ৪ লক্ষ টাকায় বিক্রয় [illegible] বর্ত্তমানে ইহা কাহার অধিকারে আছে, তাহা এখনও জানা যায় নাই।



২৫। [illegible] পারসিয়া—শাহ্‌ [illegible] র কনিষ্ঠ পুত্র যুবরাজ খস্রু এই [illegible]



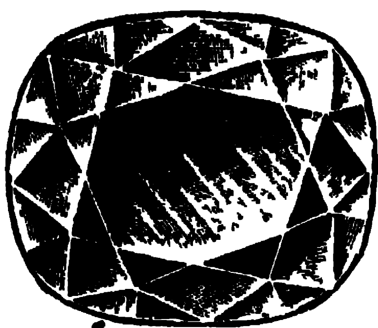
পিগট (ইংলণ্ড)



ন্যাসাক—ত্রিকোণ হীরক (ইংলণ্ড)

৮। [illegible] —হলুদ বর্ণের পুরু হীরক। ইহার [illegible] প ফুলের অনুরূপ। অন্যান্য ঐতিহাসিক হীরকের মত এখানাও বহু হাত ঘুরিয়া পরে দ্বিতীয় পোপ জুলিয়াসের অধিকারে আসে এবং তিনি ইহা অষ্ট্রীয়ার সম্রাটকে দান করেন। ইহার বর্ত্তমান ওজন ১৩৯ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য প্রায় ১৫½ লক্ষ টাকা।

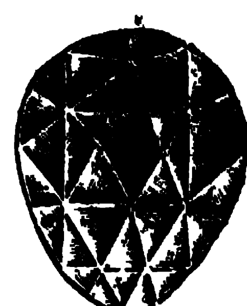
১১। ন্যাসাক হীরক—ত্রিকোণাকার হীরক। দাক্ষিণাত্যে অভিযানকালে মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস্ এই হীরকখণ্ড সংগ্রহ করেন এবং তদবধি ইহা ভূতপূর্ব্ব মার্কুইস অব ওয়েষ্ট মিনিষ্টারের অধিকারে ছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্য প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই তাঁহার যে জন্মতিথি উৎসব হইয়াছিল, সেই উৎসবের দিনে মার্কুইস অব ওয়েষ্ট মিনিষ্টার তাঁহার তরবারির



জুবিলী—জাগার্সফন্‌টিন (ইংলণ্ড)



হোপ—নীলাভ হীরক (নিউক্যাসেল)



স্যান্সি (ভারতবর্ষ)

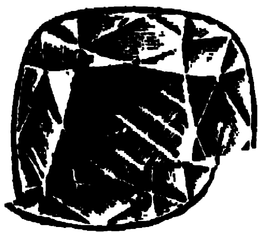
৯। ম্যাটাম হীরক বোর্ণিয়োর অন্তর্গত ম্যাটামের রাজার অধিকারে আছে। ইহার আকার এবং কাটাই উৎকৃষ্ট। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইহা ম্যাটামের রাজার হাতে আসে। এতদতিরিক্ত আর কোন ইতিহাস জানা যায় নাই। বহু ক্রেতা প্রচুর অর্থের বিনিময়ে ইহা সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রাজা বিক্রয় করেন নাই। ওজন ৩৬৭ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য ৩৮ লক্ষ টাকা।

ফলকে এই হীরক সংযোজিত করিয়া ঐ তরবারি পরিধান করতঃ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্ব ওজন ছিল কিঞ্চিদধিক ৮৯ ক্যারেট, বর্ত্তমান ওজন ৭৮ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য কিঞ্চিদধিক ৪ লক্ষ টাকা।

১২। ইংলিশ ড্রেসডেন—এই বৃহৎ হীরকখানি বরোদার গাইকোয়াড়ের কোষাগারে রক্ষিত হইতেছে।

ইহার প্রথম ওজন ছিল ১১৯২ ক্যারেট এবং বর্ত্তমান ওজন ৭৬২ ক্যারেট। ইহার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৫২ লক্ষ টাকা।

১৩। কাম্বার্ল্যাণ্ড হীরক—এই হীরকখানি লণ্ডনে ক্রয় করা হয় এবং ক্যালোডেনের যুদ্ধের পর কাম্বার্ল্যাণ্ডের ডিউককে উপহার দেওয়া হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়া পরবর্ত্তীকালে ইহা হনোবরের রাজাকে দান করেন। ইহার ওজন ৩২ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য প্রায় ১২ লক্ষ টাকা।



পোলার ষ্টার (রুষিয়া

১৩। ইউজিন বৃলিয়্যাণ্ট—সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এই মূল্যবান হীরকখানি ক্রয় করেন। ইহা ঠিক গোলাকার নহে এবং একদিকের কাটাই উৎকৃষ্ট না হইলেও অন্য দিকের কাটাই খুবই চমৎকার। পূর্ব্বে ইহা মহারাণী ইউজিনের সম্পত্তি ছিল। পরে তিনি বরোদার গাইকোয়ারের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলেন। ইহার ওজন ৫১ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা।

১৪। মাউণ্টেন অব্ স্পেলেণ্ডার—পারশ্য-রাজকোষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন। ইহার ওজন ১৩৫ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য প্রায় ২০২ লক্ষ টাকা।

১৫। দি হল্যাণ্ড—এই হীরক নেদারল্যাণ্ডের রাজার রাজ-মুকুটে শোভা পাইতেছে। ইহার ওজন ৩৬ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য প্রায় ১২ লক্ষ টাকা।

১৬। পোর্টার রোড্স্ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বার্লি হীরক-খনিতে এই মহামূল্য হীরকখানি পাওয়া গিয়াছে। ইহা বর্ত্তমানে মিঃ আর, পোর্টার রোড্স্ এর সম্পত্তি। ওজন ১৫০ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা।

১৭। অষ্ট্রীয়ান ইয়োলো—মরিয়া থেরেসার সময় পর্য্যন্ত এই মূল্যবান পাথরখানি অষ্ট্রীয়া-সম্রাটের সম্পত্তি ছিল। ইহার ওজন ১৩৩ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য প্রায় ৭ লক্ষ টাকা।

১৮। মুন অব দি মাউণ্টেন—অনেকে ভুলবশতঃ ইহাকে অরলফ হীরক বলিয়া থাকেন। নাদির শাহ্ দিল্লী হইতে এই মূল্যবান হীরকখানি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর জনৈক আফগান সৈন্য ইহা চুরি করিয়া লইয়া যায় এবং সাফরাস্ নামক এক আমেরিকানের নিকট বিক্রয় করে। রুষ-সম্রাট বহু অর্থের বিনিময়ে এই মূল্যবান পাথর ক্রয় করিয়া নিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে উহা রুষিয়ার রাজকোষে রক্ষিত হইতেছে। ইহার ওজন ১২০ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য প্রায় ৭ লক্ষ টাকা।

১৯। হোপ [illegible] ক্যারেই সব চেয়ে বড়। [illegible]হে এবং ভিতরের দীপ্তি খুব উজ্জ্বল। বর্ণের হীরকের মধ্যে ইহা [illegible]জ্ঞেরা এইখানাকেই প্রথম স্থান দিয়াছেন। ইহার ওজন ৪৪ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য কিঞ্চিদধিক ৪ লক্ষ টাকা। ডাচেস্ অব্ নিউ ক্যাসেল্ ইহা ক্রয় করিয়াছিলেন



শাহ্ অব্ পার্সিয়া (রুষিয়া)

২০। পাশা অব্ ঈজিপ্ট—শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর হীরক ইব্রাহিম পাশা ইহার বর্ত্তমান মালিক। ওজন ৪০ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা।

২১। রিজেণ্ট অব্ পর্টুগাল—এই হীরক পর্টুগাল রাজার রাজ-মুকুটের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। জনৈক নিগ্রোর নিকট হইতে পর্টুগালের রাজা ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার ওজন ২১৫ ক্যারেট, মূল্য এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

২২। জাগার্সফণ্টিন—১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই হীরকখানি সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহার বর্ত্তমান ওজন ২০৯ ক্যারেট, মূল্য এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

২৩। দি ষ্টিওয়ার্ট—১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই হীরকখানি

দক্ষিণ আফ্রিকায় পাওয়া গিয়াছে। ইহার ওজন ২৮৮ ক্যারেট মূল্য, এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই।

২৪। দি ক্যালিস্তান—প্রিমিয়ার ডায়মণ্ড মাইনিং কোম্পানীর প্রেসিডেণ্টের নামানুসারে এই হীরকখানির নামকরণ হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান ওজন ৩০২৫ ক্যারেট। দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট ইহা ক্রয় করেন এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে জন্মদিন উৎসব উপলক্ষে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডকে দান করেন। এই হীরককে বর্ত্তমানে নয় ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এই ভাগ করার জন্য আরও একশত খণ্ড টুক্‌রা মূল হীরক হইতে বাহির হইয়াছে। এই টুক্‌রাগুলির দামও একেবারে কম নহে। কাটাই হওয়ার পূর্ব্বে ইহার মূল্য ছিল ৭০ লক্ষ টাকা।

২৫। শাহ পার্সিয়া—১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে আব্বাস ...র কনিষ্ঠ পুত্র যুবরাজ খস্রু এই অমূল্য রত্নখানি জার নিকোলাসকে দান করেন। এই হীরকের উপর তিনজন পারস্য সম্রাটের নামাঙ্কিত ছিল। শেষবার কাটাই করায় ইহার ওজন ৯ ক্যারেট কম হইয়া গিয়াছে এবং এই জন্য বর্ত্তমানে ইহার উপর নাম খোদাই করার কোন চিহ্ন নাই। ইহার আনুমানিক মূল্য কিঞ্চিদধিক ৪ লক্ষ টাকা।

২৬। এক্‌সেলসিয়ার—ক্যালিস্তানের আবিষ্কারের পূর্ব্বে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন এই হীরকখানিকে জাগাস-ফন্‌টিন খনিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা দক্ষিণ আফ্রিকার খনি হইতে প্রাপ্ত সুবৃহৎ হীরকগুলির অন্যতম এবং শুভ্র-নীলাভ দীপ্তির জন্য বিখ্যাত। ইহাকে কাটিয়া ২১ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান ওজন ৩৬৪ ক্যারেট এবং আনুমানিক মূল্য কিঞ্চিদধিক ৬ লক্ষ টাকা।

২৭। পোলার ষ্টার—রুশিয়ার রাজ-কোষে রক্ষিত হইতেছে। ওজন ৪০ ক্যারেট, আনুমানিক মূল্য কিঞ্চিদধিক ২ লক্ষ টাকা।

অস্তবাদল

শ্রীবিরামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ভরা ভাদরের ধূসরিত সাঁঝে বৃষ্টি ঝরে না আর
শ্রাবণের শেষে বন্ধ হ'য়েছে বাদল পুরীর দ্বার;
শিখিনী নাচন-তৃষা
বেদনা বিরহ-নিশা
মেঘ-মাদলের গত উৎসবে
ভুলেছে শঙ্কা তার;
ভরা ভাদরের ধূসরিত সাঁঝে বৃষ্টি ঝরে না আর।

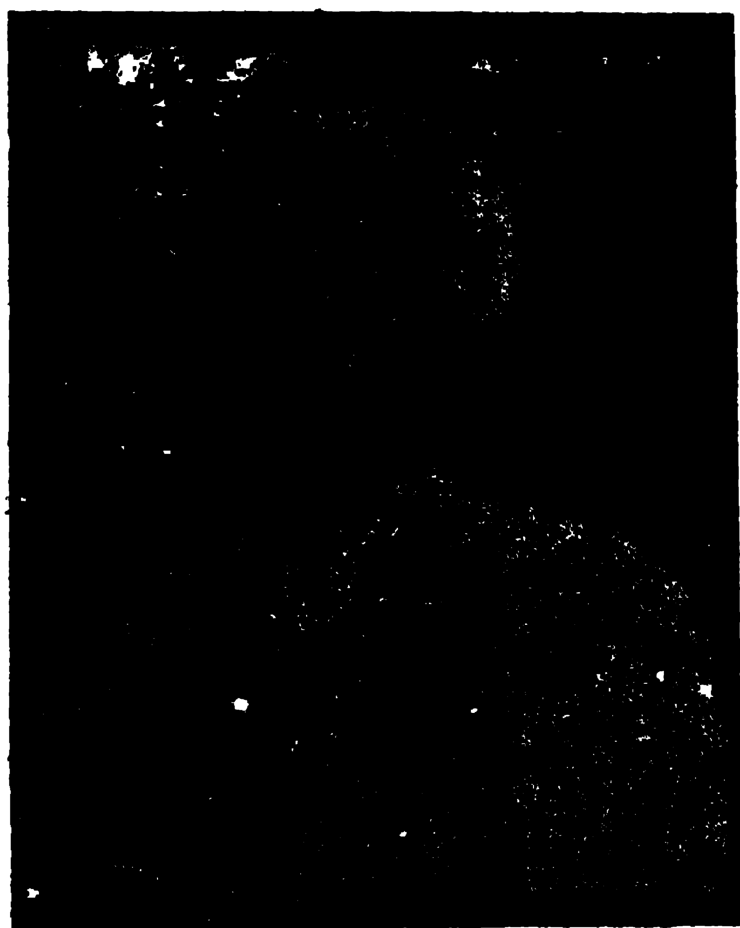
দেবদারু হেনা চম্পক বনে নাহি সে মাতাল বায়ু;
কৃষ্ণচূড়ার তৃষ্ণা মিটেছে, বেড়েছে খানিক আয়ু;
সরস কেতকী দোলে
দোপাটী ঘোম্‌টা খোলে—
কুসুমের বুকে সুষমা শোভিছে
—সবল শিথিল স্নায়ু;
দেবদারু হেনা চম্পক বনে নাহি সে মাতাল বায়ু।

অস্ত রবির আধ' আলো রেখা ভাদরের সাঁঝে হাসে,
ইন্দ্রের ধনু রঙ দিয়ে তা'য় সান্ধ্য তিমির নাশে;
ঝিঁঝিঁর ঝাঁজালো তান
প্রদোষে ভরালো কান—
শিশু শরতের স্মরণীয় শোভা
খতলে ভূতলে ভাসে,
অস্ত রবির আধ' আলো রেখা ভাদরের সাঁঝে হাসে!

গোধূলি, বনের শ্যামল শোভায় ঢেলেছে ফাগুন ফাগ,
বেণু বেতসের কুঞ্জে বাতাস সাধিছে বেণুর রাগ,
করবী কবরী টোটে
নীপের কেশর লোটে
অভিমানী যূঁ'র অভিসার শেষ
অধরে বিজুরী দাগ;
গোধূলি, বনের শ্যামল শোভায় ঢেলেছে ফাগুন ফাগ।



মিঃ খুদাবক্স



সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খাঁ।



মিঃ সফায়েৎ আমেদ খাঁ.

জাতীয় স্বাস্থ্যই প্রকৃত জাতীয় সম্পদ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র

—স্বাস্থ্য তত্ত্ব—

"There are many sources of national wealth. But from a broad stand-point. the greatest Source of a nation is the health of the people."

গত কয়েক বৎসর হইতে ভারতের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করিবার সাধু চেষ্টা দেখা যাইতেছে। স্বাধীন জীবিকা-অর্জ্জনের পন্থা নির্দ্ধারণ, স্বদেশী শিল্পের বিস্তার, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, খনি ও বন-বিভাগের উন্নতি প্রভৃতি বহু বিষয়ের প্রতি দেশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহা সুখের কথা ও উন্নতির চিহ্ন সন্দেহ নাই। কিন্তু যেভাবে আমাদের গ্রামগুলি সৌন্দর্য্যহীন, লোকশূন্য ও শশ্মানে পরিণত হইতেছে, কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কৃতান্ত অনুচরগণ যেভাবে মৃত্যুর ধ্বংস-লীলা চালাইতেছে, এবং এই দীপ-মালা শোভিতা মহানগরী-তেও যেভাবে শিশুমৃত্যু ঘটিতেছে, তাহার আলোচনা করিয়া কোন একজন ইংরাজ বলিয়াছেন, এই অকাল মৃত্যুর ফলে ভারতের যে জাতীয় সম্পদ নষ্ট হইতেছে, অঙ্ক শাস্ত্রের সাহায্যে তাহা সীমাবদ্ধ করা অসম্ভব। Harvard University Press-হইতে প্রকাশিত T. N. Carver তাঁহার Essays in Social Justice নামক পুস্তকে মানবজীবনের মূল্য সম্বন্ধে ১৭৩ পৃষ্ঠা হইতে ২০২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ করিয়া সকলেরই পাঠ করা উচিত। উহার পাঠে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে রোগ শোক ও অকাল মৃত্যুর দ্বারা বহু আশা অঙ্কুরে বিনষ্ট হইতেছে, পিতা-মাতার সোনালী স্বপ্ন অর্দ্ধপথে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, বিধবার হাহাকারে ও দীর্ঘশ্বাসের তপ্ত নিশ্বাসে শান্তিময় গৃহে সুখের আবহাওয়া নষ্ট হইতেছে, শোক, নিরাশা ও অকৃতকার্য্যতা-জনিত দুর্ব্বলতায় জাতীয় কর্ম্মপটুতা হ্রাস পাইতেছে, অধিকন্তু জাতীয় দুর্ব্বলতা ও লোকাভাবে সমাজের ক্রম-বিকাশ বাধা পাওয়ার ফলে জাতীয় সম্পদ বহুপরিমাণে ক্ষুন্ন হইতেছে। ইহার উপর প্রতি সন্তান প্রতিপালনের জন্য যে ব্যয় হয় যদি আমরা ইহাকে পিতা-মাতার Investment বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে প্রতি শিশুমৃত্যুর জন্য পরিবারের যে আর্থিক ক্ষতি হইতেছে, Bad investment এর মাপ কাটিতে তাহার বিচার করিলে, নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় যে জাতীয় দারিদ্র্যের ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারণ। সুতরাং আমাদের সমস্ত চিন্তা ও শক্তি তথা কথিত জাতীয় সম্পদ-বৃদ্ধির আলোচনায় নিয়োগ করিলে চলিবে না। এই অকালমৃত্যুর হাত হইতে দেশবাসীকে রক্ষা করিতে হইবে। নতুবা আপাত দৃষ্টিতে জাতীয়-সম্পদ বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া ধারণা জন্মিলেও, ভবিষ্যৎ সূক্ষ্ম দর্শী সমালোচকের হিসাব-নিকাশের তুলনায়, তাহা বহু পরিমাণ ক্ষুন্ন হইয়া পড়িবে। *

কি ভীষণ ভাবে নানা কারণে ভারতের বিশেষতঃ বাংলার লোকক্ষয় হইতেছে, তাহা আলোচনা করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। এ আলোচনা মধ্যে মধ্যে সাময়িক পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা আজও দেশের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই, সেই জন্যই দেশের জনসাধারণই যে দেশের ও জাতির প্রধান ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ এই প্রতীতি আজও আমাদের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই। তাহারই ফলে মৃত্যু তাহার লেলিহান জিহ্বা দ্বারা সেই সম্পদের শেষ চিহ্নটি পর্য্যন্ত মুছিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, এই মহাসত্য উপলব্ধি করিয়া, আমরা তাহার প্রতিকার করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে

* Putting the whole health problem on the economic and Social levels, we find an imperative need not only to prevent Sickness but also to Improve the quality of life.

পারি নাই। যাঁহারা স্বাধীনতা সমরে আত্মোৎসর্গ করিতেছেন, তাঁহারা নমস্য, যাঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারোৎঘাটনে অবহিত, তাঁহারা ধন্যবাদের যোগ্য, কিন্তু যদি জাতির সমস্ত শক্তি এইখানেই পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে ইহা ধ্রুব যে, যেদিন ভাগ্যলক্ষ্মী জাতির সাধনাকে জয়যুক্ত করিবেন, সেই দিন ভারতবাসী তাহার বহু সাধনার কাম্যলাভ করিয়া, জাতির মধ্যে বণ্টন করিতে গিয়া, সংখ্যা লঘিষ্ট দর্শনে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিবে এবং সেই আনন্দের দিনে ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ বংশধরেরা নিরাশার যে গভীর বেদনা পাইবে, তাহাতে তাহারা আমাদিগকে অভিসম্পাত না করিয়া থাকিতে পারিবে না।

আধি-ব্যাধির দ্বারা কিভাবে লোক ক্ষয় হইতেছে এবং তাহার ফল কি, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। আমাদের দেশের জন্ম, মৃত্যুর নিখুঁত তালিকা পাওয়া সম্ভব নয়। Birth Registrer হইতে জন্ম মৃত্যুর যে তালিকা প্রস্তুত হয়, তাহা নানা কারণে ভ্রমসঙ্কুল। কিন্তু ইহা ব্যতীত অন্য উপায়ে এই তথ্য সংগ্রহ করিবার আর দ্বিতীয় উপায়ও আজ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই। সুতরাং আমাদিগকে ইহার উপর নির্ভর করিতে হইবে। সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত Statistics হইতে আমরা যাহা জানিতে পারি, তাহা মোটামুটি এই—যক্ষ্মায় এতটী, ম্যালেরিয়ায় এতটী, বসন্তে এতটী এবং অন্যান্য রোগে এতটী বঙ্গবাসীপ্রতি মুহূর্ত্তে ভবলীলা সম্বরণ করিতেছে! ইহার সহিত শিশু-মৃত্যু যোগ করিলে, সমগ্রজাতি যে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে, একথা বুঝিতে বাকি থাকে না। ভারতে ৫টী শিশুর মধ্যে ১টি শিশুর মৃত্যু ঘটে, আর গ্রেট ব্রিটনে ১০০০ শিশুর মধ্যে ৬৯টী শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৯২১ খৃঃ কলিকাতায় ১০০০টী শিশুর মধ্যে ৩৩০টী শিশু জন্মের এক সপ্তাহের মধ্যে ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছিল। ১০০ মধ্যে ১৬টী শিশু জন্ম হইতে এক মাসের মধ্যে ইহধাম ত্যাগ করিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শতকরা ৫২টী শিশু জন্ম হইতে এক মাসের মধ্যে ভবলীলা সম্বরণ করে। Fisher মানবজীবনের মূল্যের যে খতিয়ান প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার হিসাবে শিশু মৃত্যুর দ্বারা ভারতের কতটী জাতীয় সম্পদ প্রতিবৎসর নষ্ট হইতেছে—

জন্ম কালে—	৯০,০০ ডলার
৫ বৎসর বয়সে	৯৫০,০০ „
১০ বৎসর বয়সে	২০০০,০০ „
২০ বৎসর বয়সে	৪০০০,০০ „
৩০ বৎসর বয়সে	৪১০০,০০ „
৪০ বৎসর বয়সে	২৯০০,০০ „
৮০ বৎসর বয়সে	৭০০,০০ „
গড়ে	১৭০০,০০ „

এই তালিকা হইতে পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ২০ বৎসর হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত মানুষের কার্য্য করিবার শক্তি সমধিক বলবতী থাকে। এই জন্য এই সময়ের মূল্য অধিক। এই কার্য্যশক্তিকে মেরুদণ্ড করিয়া জন্ম হইতে Investment হিসাবে একটা মূল্য ধরা হয় এবং বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার মূল্যও যেন বাড়িয়া চলে। মানবজীবনকে এইভাবে কল্পনা করিলে, আমরা কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তাহা বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। যে সময়ে কার্য্যকারিণী শক্তি সমধিক প্রবল, সেই যৌবনেই আমরা প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হই। সুতরাং জীবনে কখনই পূর্ণ কার্য্যক্ষম বলিয়া বিবেচিত হইতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ আমাদের মধ্যে কয়জন ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন? ইহার যত পূর্ব্বে আমাদের মৃত্যু ঘটে, ততই আমাদের জীবনের মূল্য কমিয়া যায়। যদি প্রতি নরনারীকে জাতীয় asset রূপে পরিকল্পনা করা হয়, তাহা হইলে জাতীয় asset দিন দিন কমিয়া যাইতেছে, সমস্ত জাতি দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, একথা স্বীকার করিতেই হইবে।

জাতীয় কর্ম্মপটুতা কি প্রকারে হ্রাস পাইতেছে, তাহার একটা উদাহরণ দিই। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ই বি রেলের মধ্যে কোন কোন স্থানে বর্ষা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দিন মজুরদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ব্যক্তি জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় রেলের কার্য্য প্রায় অচল হইয়া উঠে। এই কারণে রেলওয়ে বোর্ড প্রায় ১২০০৲ মাহিনায় ম্যালেরিয়া নিবারণে দক্ষ একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া যাহাতে ম্যালেরিয়ার এবম্বিধ প্রকোপে রেলের

কাজ বন্ধ না হয়, তাঁহার বন্দোবস্ত করেন। ইহা হইতে যদি আমরা মোটামুটি ইহা ধরিয়া লই যে আষাঢ় মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত গ্রামের এক ষষ্ঠাংশ উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি জ্বরে আক্রান্ত হইয়া উপায় না করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রতি বৎসর গ্রামের ১/১২ উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তি রোগের জন্য পরের গলগ্রহ হইয়া রহিয়াছেন। ইহার ফল কি হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রায়ই এইরূপ অভিযোগ শুনা যায় যে ভারতের উৎপাদিকা শক্তি সত্ত্বেও, এই নদীমেখলা ভারত ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের হার অন্য দেশের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। (It is noteworthy that the average yield per acre of crops in India compares very unfavourably with that of other Countries in spite of her natural advantages—Exhibition guide (1928) ইহা কি ভারতবাসীর কার্য্যকারিণী শক্তির হীনতা এবং কার্য্যক্ষম ব্যক্তির রোগের জন্য কার্য্য করিতে না পারার জন্য অনেকটা দায়ী নহে এবং তাহার ফলে কি জাতীয় সম্পদ অনেকটা ক্ষুন্ন হইতেছে না? আমরা অদৃষ্টবাদী; হয়ত যাহা বলিলাম, তাহার উত্তরে পরমায়ুর দোহাই দিয়া সকল কথা উড়াইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু বিজ্ঞান বলিতেছে ভারতেও বহুরোগ নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেছে, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, কলেরা অন্য দেশেও ছিল এবং আজও অনেক দেশে আছে। সেই সকল দেশে যে সকল বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করিয়া, তাহাদিগকে দূর করা হইয়াছে ও হইতেছে, সেই সকল বৈজ্ঞানিক উপায় ভারতে অবলম্বিত হইলে, ভারতেও তাহাদের আক্রমণ বহু পরিমাণে নিবারিত হওয়া সম্ভব। ইহার উপর সমাজ-বিধির সংস্কৃত ও নৈতিক পরিবর্ত্তনের দ্বারাও বহু রোগ হ্রাস পাইতে পারে। ডাক্তার জহরলাল দাস এই কথাই বলিয়াছেন। শিশু মৃত্যুর সম্বন্ধে তিনি বলেন—The chief causes of death among infants of one week or less are congenital debility, obvivusly results of prenatal influences Poverty, ignorance, Chid marriage and Purda System—all combine undermine the health of the mothers and weakly premature babies are the results. A very large proportion of premature deaths was also due to Syphilis and strong evidence of its wide spread prevalance was to be found in a large number of still births recorded.—Manual of Hygine and public Health. সাধারণ পাঠক সিফিলিসের উৎপত্তি; বিস্তৃতি, ও পরিণাম অর্থাৎ ফলাফলের সকল সংবাদ রাখেন কিনা জানি না। ইহার ফলে যে বহু নারী মৃত-বৎসা ও বন্ধ্যা হইয়া অশেষ মনকষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন, ইহা একান্ত সত্য। পিতামাতার দুষ্ট রক্তে জাত পুত্র কন্যা চিরজীবন পিতামাতার পাপের ফল ভোগ করে। সুতরাং স্বামী সুস্থ ও ব্যাধিমুক্ত থাকিলেও, স্ত্রী পিতামাতার দোষে দুষ্টরক্তের ফলে মৃত সন্তান প্রসব করিতে পারেন। বিজ্ঞান এ কথা নিঃসন্দেহ প্রমাণ করিয়াছে। ইহা হইতে সহজেই প্রতিপন্ন হইবে সদ্‌বিচারের দ্বারা প্রণোদিত না হইয়া, অনুরাগ ইত্যাদির দ্বারা পরিচালিত পাত্র-পাত্রী নির্ব্বাচনের ফলে এই ভীষণ ব্যাধি ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যদি মনোনীত পাত্র-পাত্রীর মধ্যে কাহারও রক্তে উক্ত রোগের জীবাণু বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে, হিন্দুধর্ম্মে বিবাহের যে মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা—কিংবা বিবাহিত জীবনের যে পরম গৌরব—সুস্থ, সবলকায়, মেধাবী সন্তান উৎপাদন,—তাহা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য পূর্ব্বরাগ মূলক বিবাহ বিপদজনক। আমাদের দেশে পূর্ব্বে স্বঘর অন্বেষণ করা হইত, তাহার অর্থ এই যে, যে ঘরের সকল তথ্যের সহিত পরিচয় থাকিত, এবং শুধু অনুমানের উপর নয়, আদান-প্রদান, মেলামেশার ভিতর দিয়া সুস্পষ্ট জ্ঞানের দ্বারা যে ঘরকে নির্দ্দোষ বলিয়া নিঃসন্দেহে জানা থাকিত, সেই ঘরের সহিত বিবাহের সূত্র দিয়া মিলনকে সুদৃঢ় করা হইত। এই ভীষণ ব্যাধির প্রসার রোধ করিতে হইলে, উক্ত বিধির অনুবর্ত্তিনী কোন বিধির প্রচলন এবং সামাজিক বর্ত্তমানের স্রোত পরিবর্ত্তন একান্ত প্রয়োজনীয়।

আধুনিক মোক্ষ

শ্রীসুশান্ত কুমার সিংহ

গল্প

আর কয় ডিগ্রি গরম বাড়িলে কলিকাতা সহর সাহারা মরুভূমিকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করিতে পারে, খস্‌খসাবৃত বৈদ্যুতিক পাখা শোভিত বৈঠকখানায় বসিয়া মনে মনে তাহাই আলোচনা করিতেছিলাম, এমন সময় 'জয় মহাপ্রভু' শব্দে চমকিত হইয়া দেখি খসখসের পর্দ্দা সরাইয়া রেশমী আলখাল্লা পরিহিত জনৈক যুবক সন্ন্যাসী ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানি গৈরিক রঙের সুবাসিত রেশমীরুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিয়া বলিলেন, "আঃ গরমটা কি না পড়েছে—ওরে একটু জল।"

বিস্ময়ের প্রথম ভাবটা কাটিলে সন্ন্যাসী প্রবরকে চিনিতে পরিয়া বলিলাম, "আরে অতুল—তুই।' এক-খানি চেয়ার টানিয়া পাখার তলায় লইয়া বসিয়া আগন্তুক একটু মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন, "অতুল নই—অতুল আমার গার্হস্থ্য জীবনে নাম ছিল, এখন আমার নাম স্বামী বিহ্বলানন্দ।'

নাম শুনিয়াই হোক অথবা তাহার বলিবার ধরণেই হোক একটু বিহ্বল হইয়া পড়িয়া চাকরকে ডাকিয়া দুই গ্লাস সরবত প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলাম। ভৃত্য প্রস্থানদ্যোত হইলে অতুল ওরকে স্বামীজি বলিয়া উঠিলেন, "ওরে কাঁচের গ্লাসে আনিস নি, পাথরের গ্লাসে—অভাবে কাঁচের গ্লাসে ও কাঁচ-ফাঁচ ম্লেচ্ছামি চলবে না—"

চাকর চলিয়া যাইলে কত কথাই না মনে পড়িল, এই অতুল একদিন কি না ছিল। আজ কাঁচের গ্লাসে তাহার সরবত্‌ খাইতে আপত্তি অথচ কতসব অখাদ্য কুখাদ্য না-সে হজম করিয়াছিল। আজ সন্ন্যাসী হইয়াছে—কিন্তু একদিন ইহারই অত্যাচারে আমরা বন্ধুবর্গ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলাম। ধার লইয়া তাহার কথা ভুলিয়া যাওয়া, অন্যের মূল্যবান দ্রব্য বিনা দ্বিধায় আত্মসাৎ করা প্রভৃতি সদ্‌গুণভূষিত যে অতুল আজ তাহারই এত পরিবর্ত্তন। নাঃ হিন্দুধর্ম্ম আছে বৈকি নহিলে কি আর রত্নাকর বাল্মিকী হয়—না অতুল, স্বামী—দূর ছাই নামটাও মনে পড়ে না,—হায়। উপবীত গ্রহণ করিবার পর একবৎসর নিয়মিত ভাবে গায়ত্রী দেবীর আরাধনা করিয়া পরে সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়া ধর্ম্মের ষাঁড় হইয়াছি বলিয়া সত্যই মনে মনে অনুতাপ হইতে লাগিল। আজ তাহার মূল্যবান, সুবাসিত পরিচ্ছদ দেখিয়া সহসা অনুমান করা শক্ত হয় যে, একদিন এই-ই কাল দিবার অঙ্গীকারে আমার নিকট হইতে কুড়ি টাকা ধার লইয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছিল।

চাকর কাঁসার গ্লাসে (কারণ পাথরের গ্লাস আমার নাই) সরবত লইয়া অতুলকে ও কাঁচের গ্লাসে আমাকে সরবত দিল। একনিঃশ্বাসে সরবত পান করিয়া তৃপ্তি-সূচক আঃ উচ্চারণ করিয়া গ্লাস চাকরকে ফিরাইয়া দিয়া বলিল, "উকীল হয়েছিস, শুনেছি—তারপর কেমন চলছে রে?"

ওকালতীর গাউনের অন্তরালে দৈন্য যে তাহার বিরাট মূর্ত্তি লইয়া অবস্থান করিতেছেন, সে কথাটা স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। আমায় নিরুত্তর দেখিয়া সে বলিল, "তা মন্দ হচ্ছে না নিশ্চয় নইলে এই আসবাব, চাকর—কি বলিস?"

গৃহের সাজসজ্জার কিয়দংশও যে আমার স্বোপার্জ্জিত নয়, শ্বশুর কন্যা যে তস্য পিতার গৃহ হইত লইয়া আসিয়াছেন, এই সহজ সরল সত্য কথাটা প্রকাশ না করিয়া মৃদু হাসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার যা হয় চলে যাচ্ছে তারপর তোর—হঠাৎ সাধুই বা হলি কেন?"

একটু হাসিয়া যুক্তকর মাথায় স্পর্শ করাইয়া সে বলিল, 'মহাপ্রভুর ইচ্ছেয় তাঁর কৃপায় একরকম ভাবে দিন কাটছে।' তারপর একটু থামিয়া বলিল, 'তোর কাছে সেই যেদিন কুড়ি টাকা ধার করে নিয়েছিলুম মনে আছে?—"

মনে আমার বিলক্ষণই আছে কিন্তু তাহার স্মৃতি-শক্তি যে আজকাল এত প্রবল হইয়াছে, তাহা জানিতাম

না। ধর্ম্মের ইহাও একটা গুণ ভাবিয়া টাকাগুলির পুনরুদ্ধার আশায় একটু আশান্বিত হইয়া বলিলাম, "হ্যাঁ তুমি সেই যে কাল আসবে বলে ডুব দিলে আর তারপর তোমার সঙ্গে আজ এই দেখা—হ্যাঁ তারপর—"

সলজ্জ হাসি হাসিয়া অতুল বলিল, "তোর কাছ থেকে যাবার দিন দুয়েক বাদে রাস্তায় এক কাবুলীওয়ালা ধরে খুব ত অপমান করলে, তার কাছ থেকে কোনরকমে গালাগাল, কানমলা খেয়ে রেহাই পেয়ে বাড়ী এসে শুনি যে দুখানা বডি ওয়ারেণ্ট নিয়ে আদালতের পেয়াদা ঘোরাঘুরি করছে। সত্যি বলছি ভাই মনে তখন বড় বৈরাগ্য এল, ভাবলুম এই ত সংসার যেখানে সামান্য টাকার জন্য এত অপমান, সেখানে থাকব না আত্মহত্যা করে এই পাপ সংসার ছেড়ে পাওনাদারদের কলা দেখানোই ঠিক করলুম। এমন সময় বললে হয় ত বিশ্বাস করবি না—প্রত্যাদেশ পেলুম।

বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করি "প্রত্যাদেশ?"

"হ্যাঁ প্রত্যাদেশ এই তোমরা যাকে বিবেকবাণী বল! —হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে কে যেন গভীর উদাত্তস্বরে বলে উঠল, 'বৎস' আত্মহত্যা করো না—পৃথিবীতে অনেক কাজ তোর জন্যে আছে।—চমকে উঠলুম, সঙ্গে সঙ্গে মন স্থির করে গৃহত্যাগ করলুম।"

তাহাকে থামিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তার-পর স্ত্রী পুত্র?"

বিরক্তির সহিত অতুল বলিল, "স্ত্রী পুত্র। এইজন্যেই ত পৃথিবীতে কোন মহৎ কাজ তোমাদের দ্বারা হয় না, মরে গেলে স্ত্রীপুত্র কার কাছে থাকবে গৃহত্যাগ করবার সময় বুদ্ধদেব ভাবেন নি, চৈতন্যদেব ভাবেন নি, কোন মহাপুরুষই ভাবেন নি, আমিও ভাবলুম না—গৃহত্যাগ করে এক পয়সা দিয়ে গেরুয়া রঙের মাটী কিনে আর আনা আষ্টেক দিয়ে ডজন তিনেক ছোট মাদুলী কিনলুম। তারপর কাপড়টাকে গেরুয়া রংকরে মাদুলীগুলোতে মাটী পুরে আমি নির্ব্বাণ যাত্রা করলুম।

"গেরুয়া পরণে পেটের চিন্তা থাকে না বিশেষতঃ আমাদের দেশে। প্রথমদিনেই সেই মাদুলীর কটা বেচে প্রায় পাঁচটাকা পেলুম—বললে হয়ত বিশ্বাস করবি না, যে সেই মাদুলীর অনেকগুলো কাজ করেছে। তারপর, হঠাৎ একদিন দেখা পেলুম এক প্রৌঢ় জমিদারের, তিনি যৌবনে এমন দুষ্কর্ম্ম নেই যা করেন নি। এখন ঠিক তার বিপরীত, যেমন শ্রীমান তেমনি ভক্তিমান। আমায় ত মহাখাতির। আমিও বুঝলুম যে এখানে মাদুলী চলবে না, সুতরাং চোখ বুঝে কোন হিসাবে তাকে বোঝালুম যে পরকালে পাপের দেনা শোধ করবার আর ইহকালে নাম কিনবার সহজতম উপায় হচ্ছে যে, সেবাশ্রম করা, বিবেকানন্দর কথা নজীর করলুম।"

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর" বাইবেলের কথা উদ্ধৃত করে বললুম—

তৃষ্ণার্ত্তকে জল দিলে, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদিলে আমার সেবা করা হইবে।"

'দেখলুম, লোকটার সত্যি সত্যি পাপের উপর ঘৃণা এসেছে—আমার কথা বলবামাত্রই সেবাশ্রম খুলতে রাজী হয়ে তারই একটা কাছারী বাড়ী ছেড়ে দিলে আর নগদ পাঁচহাজার টাকাও।—তার দিনকয়েকবাদে গ্রামেরই দুইটী অনাথ বালিকা নিয়ে মহোৎসবে সেবাশ্রম উদ্বোধন করা হল, কাগজে দেখিস নি তার রিপোর্ট!"

মোহাবিষ্টের মত তাহার কাহিনী শুনিতেছিলাম, হঠাৎ তাহার প্রশ্নে সচকিত হইয়া বলিলাম, "কৈ না।"

আলখাল্লার পকেট হইতে একখানি বাংলা কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিল। লাল পেন্সিল দিয়া চিহ্নিত একটী প্রবন্ধ পাঠ করিলাম তাহাতে লেখা ছিল:—

"হিমালয় প্রত্যাগত নানা শাস্ত্রবিশারদ শ্রীশ্রীমৎ বিহ্বলানন্দ স্বামীজি জনসাধারণের সেবার্থে, গণেশপুর গ্রামের জমিদার মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে একটী সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গত বৈশাখী পূর্ণিমার দিন মহাসমারোহে তাহার উদ্বোধন উৎসব হইয়াছে। ঘোষ-নগর গ্রামের ধর্ম্মোৎসাহী জমিদার মহাশয় সেবাশ্রমের সেবার জন্য শ্রীশ্রীমৎ স্বামীজির হস্তে দশ হাজার টাকা দিয়াছেন। স্বামীজি শীঘ্রই কাশী ও প্রয়াগ ধামে কয়েকটী শাখা সেবাশ্রম খুলিবেন।'

কাগজ পাঠ শেষ হইলে তাহাকে ফিরাইয়া দিলাম, সহাস্যে সে বলিল, "হ্যাঁ, কাশীতেও সেবাশ্রম খোলা হয়েছে এইবার পুরীতে একটা খুলব এই ইচ্ছা আর এইজন্যই কলিকাতায় আসা"—সে চুপ করিল।

প্রথম তাহাকে দেখিয়া যে একটু শ্রদ্ধার ভাব আসিয়াছিল তাহার দীর্ঘ আত্মকাহিনী শ্রবণ করিয়া মনে সংসারের কথাই ভাসিয়া উঠিল, পাপের মন আর কাহাকে বলে? তাহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার স্ত্রী পুত্র তাদের কি খোঁজ এখনও নাও না।'

মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "না খবর নিয়েছি, জমিদার মহাশয়ের কাছ থেকে টাকা পেয়ে তাদের কিছু পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, এখন তারা আমার কাশী সেবাশ্রমে আছে, আমার স্ত্রীই সেখানে in charge."

তাহার অসচ্ছলতার দিন চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া, আমার পূর্ব্ব ঋণ টাকা কয়টী ফিরিয়া পাইবার দুরাশা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল, তাহার বক্তৃতা শুনিয়াও হাতের ময়লা টাকা কয়টীর মায়া এই দুঃসময়ে ছাড়িতে পারিলাম না। নির্লজ্জের মত তাহাকে বলিলাম। "তোর ত সময় বেশ ভালই যাচ্ছে তবে এইবার আমার টাকা কটা—"

আমাকে বাধা দিয়া বিস্ময়ের সহিত সে বলিল, "তোর টাকা—সে ত আমি অনেকদিন আগে শোধ করে দিয়েছি। দেনা আমি কারুর এক পয়সা রাখি নি।—"

তাহাকে দেখিয়া যত আশ্চর্য্য না হইয়াছিলাম, সে টাকা পরিশোধ করিয়াছে, শুনিয়া ততোধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সত্যি? টাকা কাকে কোথায় দিলি রে?"

হো হো করিয়া উচ্চহাস্যে পথচারীদিগকে সচকিত করিয়া সে আলখাল্লার পকেট হইতে একটা পুস্তক বাহির করিয়া কয়েকটা পাতা উল্টাইয়া আমাকে দিল। দেখিলাম, সেখানি তাহারই সেবাশ্রমের দান স্বীকারের রসিদ বহি। সে যে পাতাটী আমাকে খুলিয়া দিয়াছিল তাহাতে সন্তোষ কুমার চক্রবর্ত্তী উকীল মহাশয়ের নিকট কুড়ি টাকা দান স্বীকার করা হইয়াছে।

ঋণ পরিশোধের এই অভিনব পন্থায় রাগে সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিলেও মুখে কিছু বলিতে না পারিয়া বলিলাম, "তাইত সব টাকাটা চাঁদায়?"

আমায় বাধা দিয়া, হাত হইতে খাতাটা লইয়া সে বলিল, "সব টাকাটা, এই সামান্য টাকায় কি হবে রে! কত বড় বৃহৎ কাজ "তোর কাছে আরও কিছু পুরীর সেবাশ্রমের জন্য নোব বলেই ত এসেছি—" টেবিলের উপর হইতে ফাউনটেনপেনটী লইয়া বলিল, "তা কত লিখি—পঞ্চাশ?"

নেড়া কয়বার বেলতলায় যায়, সেই সনাতন সত্য তাহাকে উপলব্ধি করাইবার জন্য গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "পঞ্চাশ টাকা ত দূরের কথা পঞ্চাশ পয়সাও দোব না।

আমার কথা শুনিয়া সে তাহার স্বভাবসুলভ মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, "কেন দেবে না ভাই? এটা—যে তোমার কর্ত্তব্য—দেশের যে দাবী তোমার কাছে আছে!" তারপর সে তাহার চেয়ার ছাড়িয়া আমার চেয়ারের কাছে আসিয়া কাঁধে হাত দিয়া বাহিরের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল! "একবার ঐ বাহিরের দিকে তাকিয়ে দেখ ত ভাই কত লোক খেতে না পেয়ে শুকিয়ে মরছে—তাদের ক্ষুধাতুর মুখে দুমুঠো ভাত দিতে যদি তোমার সিগারেটের খরচা একটু কম হয়, বাবু লিখতে একটু বাধা পড়ে তাও কি সহ্য করা উচিত নয়।"

সে একটু হাসিয়া একবার মুখের দিকে চাহিল তারপর স্নিগ্ধস্বরে পুনরায় বলিল, "আচ্ছা পঞ্চাশ না পার যা পার তাই দাও, আচ্ছা তাও আমি ঠিক করছি…

আমাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া আমার কোটের পকেট হইতে মণিব্যাগটি বাহির করিয়া লইল। সৌভাগ্যক্রমে তাহাতে পাঁচ টাকার বেশী ছিল না। সেই কয়টী টাকা বিনা দ্বিধায়, বিনা সঙ্কোচে লইয়া একটা রসিদ দিয়া বলিল, "এই পাঁচ টাকাই নিলুম, ভুক্তের দলে এই পাঁচ টাকাই আমার কাছে লাখ টাকা। তারপর রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়া বলিল, "আচ্ছা চল্লুম—যাস না একবার আমার সেবাশ্রমে—যাস না ছুটীতে—"সে চলিয়া গেল।

উগ্রসুরভির গন্ধে সমস্ত ঘরটা আমোদিত হইয়া রহিল—তাহার আগমন আমায় যত না বিহ্বল করিয়াছিল তাহার নিস্ক্রামন আমায় আরও বিহ্বল করিল। সে নির্ব্বিবাদে আমার পাঁচ টাকা লইয়া গেল অথচ তাহাতে বিন্দুমাত্র বাধা দিতে পারিলাম না, কৌতুহলাক্রান্ত ভাবে শুধু রাস্তার দিকে চাহিলাম। অগ্নিশিখাবৎ অসহ্য সূর্য্যকিরণ ঝলসিত রাজপথে সে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে—এই ট্যাক্সি—

একান্নবর্ত্তিতা ও কথা-সাহিত্য

শ্রীসারস্বত শর্ম্মা — প্রবন্ধ—

বর্ত্তমান কথা-সাহিত্যের অভিভাবকগণ বলেন,—একান্নবর্ত্তিতার অন্য গুণ যতই থাক—পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা মনে হয় উহা নৈতিক অধোগতির সহায়ক। খুড়তুতো জ্যাঠতুতো মামাতো পিসতুতো ভাইবোন, ঘর-জামাই, বিমাতা, সপত্নীপুত্র ইত্যাদি সকলে মিলিয়া এক পরিবারের সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে বাস করার ফল সব সময় ভাল হয় না। বাহির হইতে বিপদ আসিবার আশঙ্কা যেমন এ ক্ষেত্রে কম—ভিতর হইতে বিপদ জন্মিবার আশঙ্কা তেমনি বেশী। বর্ত্তমান কথা-সাহিত্য এই সত্যকে উপেক্ষা করিতে পারে না।

আমরা বলি—যাহাদের সহিত রক্ত-সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ তাহাদের মধ্যে একটা যৌন ঔদাসীন্য থাকার কি সম্ভাবনা থাকে না? তাঁহারা বলেন, যৌন আকর্ষণ থাকা অসম্ভব নয় বলিয়াই হিন্দুসমাজ ব্যতীত অন্যান্য সমাজে তাহাদের মধ্যে প্রণয়ঘটিত বিবাহ হয়। এই যৌন আকর্ষণ অস্বাভাবিক নয় বলিয়াই আমাদের শাস্ত্রে ও লোকাচারে নানা প্রকার সতর্কতার বিধান দেখা যায়। উহারা আরো বলেন সাধারণ যৌন ঔদাসীন্য থাকিলেও তাহা নর-নারীর জীবনের সকল অবস্থাতেই থাকে না—শরীরতত্ত্বগত রহস্যময় নিয়মের প্রভাবে নর-নারীর চিত্তবল সকল সময় সমান থাকে না—সময়ে সময়ে লালসা অত্যন্ত দুর্দ্দম হইয়া উঠে, তখন তাহা সর্ব্ববিধ ঔদাসীন্যকে জয় করিয়া ফেলে। মানুষের মধ্যে পশুটা একেবারে মরিয়া যায় না—সুপ্ত থাকে মাত্র সুযোগসুবিধা পাইলেই জাগিয়া উঠে।

আমরা বলি, এক সঙ্গে যাহারা প্রতিপালিত হয়—সর্ব্বদা যাহারা পরস্পরকে দেখে—তাহারা পরস্পরের মধ্যে লোভনীয় সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না—ইহাইত স্বাভাবিক। তাঁহারা বলেন, ইহা আংশিক সত্য। সৌন্দর্য্যই সব সময় লালসাকে উদ্দীপিত করে না। যৌবনের অভিযান ও নর-নারীর অঙ্গকে একটা অভিনবতা দান করে, মুহুর্মুহুঃ নবনব বৈচিত্র্য দান করে—উহা অতিপরিচয়ের গ্লানি ও নিত্যদৃষ্টতার নীরসতাকে জয় করিয়া উঠে। যাহাদের দীর্ঘকাল ইন্দ্রিয়বৃত্তির অনশন চলিতেছে, সমাজ যাহাদের যৌন ক্ষুধাতৃপ্তির কোন ব্যবস্থাই করে নাই, তাহাদের কথাও ভাবিতে হইবে। তাহা ছাড়া ঘৃতও অগ্নির উপমাও মনে রাখিতে হইবে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে অসতর্ক ও অনবধান অবস্থায় দেখিবার সুযোগ পায়—তাহাতেও বিপদ আছে। একান্নবর্ত্তী পরিবারে যাহারা সকলে একত্র আবাল্য প্রতিপালিত হয় নাই বা যাহাদের মধ্যে রক্তসম্বন্ধ নাই এমনও অনেকে একত্র বাস করেন। মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি বা নৈতিক বলের উপর খুববেশী নির্ভর করা উচিত নয়। নারী পুরুষ অপেক্ষা বয়ঃক্রমে বা সম্বন্ধে বড় বলিয়া ক্ষেত্রবিশেষে যৌনসম্পর্ক বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিবার উপায় নাই। যেখানে নারী বয়ঃক্রমে বড় সেখানে নারীর পক্ষ হইতে প্ররোচনা আসিতে পারে। যৌবনে লালসা যে বিপদ ঘটায়—কৈশোরে কৌতূহলই সেই বিপদের সূত্রপাত ঘটাইতে পারে। বর্ত্তমান কথা সাহিত্য এই সব কথা বলে, ইহাই তাহার অপরাধ।

আমরা বলি—অভিভাবক অভিভাবিকারা কি একেবারে অন্ধ? তাঁহারা কি জন্য আছেন? তদুত্তরে তাঁহারা বলেন—অভিভাবক বা অভিভাবিকাগণ ঘনিষ্ঠসম্পর্কে সন্নদ্ধ কিশোর কিশোরী বা যুবক যুবতীদের সম্বন্ধে কতকটা অসাবধান ও নিশ্চিন্ত—কেহ কেহবা উদাসীনও থাকিতে পারেন। ঐ অসাবধানতা বা ঔদাসীন্য বহুক্ষেত্রে অনর্থ ঘটাইতে পারে। উহাদের নিকট সন্তানসন্ততির বাল্য অক্ষয় বলিয়া মনে হইতে পারে—কন্দর্পের কোন প্রভাব তাহাদের কল্পিত বাল্যে পড়িয়াছে মনে করিতেও তাঁহাদের মনঃক্ষুন্নতা জন্মিতে পারে। তাহা ছাড়া—তাঁহাদের মনে মনে একটা প্রচ্ছন্ন অহমিকাও নিরুদ্বেগ অন্ধতার সৃষ্টি করে। "আমাদের সন্তানসন্ততি কি নৈতিক বলে এত দুর্ব্বল

হইতে পারে?" অনেক সময় পরস্পরের সেবাশুশ্রূষার মধ্য দিয়াও লালসার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে—রোগ-শয্যাতেও অঙ্কুরিত হইবার সুযোগ পায়। শয়নগৃহ ও শয্যার ব্যবস্থা সম্বন্ধে শিথিলতা ও ঔদাসীন্য বড়ই অনর্থকর।

যখন বলি আত্মপরিবারের মর্য্যাদারক্ষার জন্য পরিজনগণ কেন স্বভাবতঃ সংযত হইবে না। তখন তাঁহারা বলেন—একই পরিবারের মধ্যে সকলেই চরিত্রবান ও ইন্দ্রিয়জয়ী হইবেন, সকলেই বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও সাবধান হইবেন—সকলেই পরিবারের মর্য্যাদারক্ষায় ব্রতী হইবেন এরূপ আশা করা ভুল। কেহ বা দুশ্চরিত্র, কেহবা মাতাল, কেহবা কুসঙ্গে আসক্ত হইতে পারেন। আবার কেহ প্রকাশ্যে বা বাড়ীর বাহিরে চরিত্রহীনতার পরিচয় দেন নাই বলিয়াই যে বাড়ীর ভিতরেও গোপনেও চরিত্রবান হইবেন এমন কিছু কথা নাই। এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করিলেই ঐন্দ্রয়িক সংযম সম্বন্ধেও ঐক্য থাকিবে—এমন আশাও করা যায় না। অন্তঃপুরের এক কক্ষে ভাগ্যবতী বধূ নানা বিলাসলীলার আবেষ্টনীর মধ্যে রাত্রিযাপন করিবে, ঠিক তাহার পাশের কক্ষে তাহার স্বামীর তরুণী ভগিনী বা ভ্রাতৃজায়া সমস্ত রাত্রি বৈধব্যব্রত পালন করিবে, এব্যবস্থা কখনও মঙ্গলজনক হইতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে হিন্দু নারীরও সংযমের সীমা আছে।

এক পরিবারের মধ্যে নরনারীর মধ্যে হিন্দুসমাজে কথাবার্ত্তারও নিষেধ আছে। সেটাও কি সংযত নীতির অনুকূল নয়? ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন—একান্নবর্ত্তী পরিবারে ভাসুর ভ্রাতৃবধূ সম্বন্ধে সামাজিক প্রথা বিশেষ সতর্ক হইয়াছেন। একচক্ষু হরিণ নদীর তীরে যখন ঘাস খাইত, তখন কানা চোখটিকে নদীর দিকে ও দৃষ্টিময় চোখটিকে স্থলের দিকে রাখিত,—ভাবিত, স্থলের দিকেই বিপদের অধিকতর সম্ভাবনা। কিন্তু একদিন নদীবক্ষে নৌকার উপর হইতে একটি তীর আসিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিল। ভাসুর সম্বন্ধে আমাদের সমাজ যেমন কড়াকড়ি ব্যবস্থা করিয়াছেন দেবর সম্বন্ধে তেমনি অতিরিক্ত ঢিলা ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফলে একান্নবর্ত্তী পরিবারের অধিকাংশ Incest ই দেবরসঞ্জ। জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুর পরে অথবা বিদেশবাসে বা রোগ-জরাদিজনিত অশক্তাবস্থায় প্রায়ই অনর্থ ঘটে বলিয়া শোনা যায়—শেষে হয়ত কাহারো আত্মহত্যায় পরিসমাপ্তি হয়। কত সংসার যে, এই প্রকারের পাশবিকতায় ধ্বংস পাইয়াছে ও পাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। Maternitiy Home এ যে সকল নারী সন্তানপ্রসবের জন্য আসে, তাহাদের দুর্গতির ইতিহাস শুনিলে মনে হয়, মানুষের অন্তর্নিহিত পশুত্ব কোন প্রকার সম্বন্ধবিচারই করে না। মানুষ এত-দিনের সভ্যতা ও সাধনার ফলে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে যে অপূর্ব্ব মধুময় পবিত্র সম্বন্ধগৌরব গড়িয়া তুলিয়াছে মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় ও মোহান্ধতায় তাহা মানবসন্তানেরই অন্তঃস্থ পশুটা সব চূর্ণ করিয়া দেয়। যে ব্যক্তি কখনও অপরকে জীবনে এতটুকু আঘাত করিতেও ইতস্ততঃ করে, কখনো কাহারো একটি পয়সাও ফাঁকী দিয়া লয় নাই, সেও পশুত্বের প্রভাবে পিতৃহত্যা মাতৃহত্যা ভ্রাতৃহত্যা অপেক্ষাও ভীষণতর পাপ করিয়া ফেলে।" যে ক্ষেত্রে বাড়ীর কর্ত্তাই নিজগৃহেই সর্পস্বরূপ—সেখানে কে সাবধান হইবে তাই ভাবি। সমাজত অনর্থ ঘটার পর শাসন করিতে আসেন।

এই সকল যুক্তি দিয়া তাঁহারা বলেন—বর্ত্তমান কথা-সাহিত্য বিদেশ হইতে নীতি ও রুচির আদর্শ পায় নাই—সাহিত্যকে Realistic সাহিত্য হইতে হইলে সমাজের যথাযথ অবস্থাই চিত্রিত করিতে হইবে। বর্ত্তমান কথাসাহিত্য কোন অপরাধই করে নাই ইত্যাদি।

সামাজিক ও পারিবারিক জীবনই প্রধানতঃ কথা সাহিত্যের উপজীব্য ও উপাদান। একান্নবর্ত্তিতা আমাদের দেশের পারিবারিক জীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ। দেশের কথাসাহিত্য একান্নবর্ত্তিতাকে উপেক্ষা করিতে পারে না—একান্নবর্ত্তিতার দোষগুণ দুইই কথাসাহিত্যে স্থান পাইবে।—উপায় নাই। ৺তারকনাথ গাঙ্গুলী হইতে শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত একান্নবর্ত্তী পারিবারিক জীবন অবলম্বনে উপন্যাস রচনা করিয়া ইহার একদিকের বক্তব্য নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের পরবর্ত্তী ও সমসাময়িক সাহিত্যিকগণ বোধ হয় আমাদের পারিবারিক জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব অনুভব করিতেছিলেন। একান্নবর্ত্তিতার যে বিপদের কথা পূর্ব্বে আলোচিত হইল,—বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণ তাহার মধ্যেই বৈচিত্র্য দেখিতে লাগিলেন।

ফলে বর্ত্তমান কথাসাহিত্যের প্রধান উপজীব্য হইয়া উঠিল —একান্নবর্ত্তিতার যৌনসঙ্কট। ইহাকে কুনীতিমূলক ও আপত্তিজনক বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে বটে, কিন্তু ইহা অনিবার্য্য। সাহিত্যে এই যৌন সঙ্কটের অভিযানকে কি করিয়া প্রতিরোধ করা যায়? বাস্তবমূলক কথাসাহিত্য রচনা যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে বাস্তবকে বাদ দিয়া কিরূপে তাহা সম্ভব হইবে? দেশের পারিবারিক জীবনে যদি একান্নবর্ত্তিতা থাকে এবং তজ্জনিত যৌনসঙ্কট যদি ঘটিতে থাকে—তবে তাহা সাহিত্যের উপজীব্য হইবেই। বাস্তব-জীবনকে ত্যাগ করিয়া কল্পিত জীবন লইয়া সৎসাহিত্য রচিত হইতে পারে না। সাহিত্যে নৈতিক নির্ম্মলতা সাধন করিতে হইলে পারিবারিক জীবনের নির্ম্মলতা সম্পাদন আগে করা উচিত।

তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায়—যৌন জীবন জঘন্য হইলেও সাহিত্য জঘন্য কেন হইবে? উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিকের লেখনী উচ্চ নৈতিক আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হইয়া জঘন্য যৌন জীবনকে উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া শোভন সুন্দর শুভসাহিত্য রচনা করিতে পারেন। অক্ষম ও হীনরুচি লেখকরাই অসংযত যৌন জীবনের কদর্য্যতাকে রচনার মধ্য দিয়া উপভোগ করে এবং সাহিত্যকেও জঘন্য করিয়া তুলিয়া জঘন্যরুচি পাঠকের উপভোগ্য বাগ্‌বিলাসের সৃষ্টি করে।

বন্ধন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম-এ, বিটি

মুক্তিকামী নইক' আমি মোক্ষ আমি চাই না হরি
জগৎ মাঝে সেবার কাজে পরাণ আমার দাও গো ভরি।
স্নেহের বাঁধন, প্রীতির বাঁধন বরণ আমি কর্ত্তে চাই,
সর্ব্ব ত্যাগী নইত, আমি—ত্যাগের আমার বড়াই নাই।
ব্যথার বোঝা, হতাশ কাঁদন, চোখের জলের বন্যা ধারা—
এ সব ভুলি কেমন ক'রে মুক্তি চাহে অভাগারা!
দুঃখ যেথায় ডঙ্কাবাজায়, দৈন্য যেথায় সর্ব্বগ্রাসে,
দারুণ অভিশাপের মত মৃত্যু যেথায় নেমে আসে।
এ সব নিয়ে থাক্‌তে হবে বইতে হবে পরের ভার,
একেবারেই ভুলতে হবে মুক্তি চাওয়ার অহঙ্কার।
যাঁদের তরে জগৎমরু শষ্য শামল বসুন্ধরা,
জীবন প্রান্তে যাদের সাথে যাত্রা মোদের সুরুকরা
যাঁদের স্নেহের কাঙাল হয়ে বিশ্বপতি বারং বার
স্বর্গ ছাড়ি ধরায় আসেন, হয়েন নরের অবতার।
কর্ম্মাকর্ম্ম আত্ম ভুলি বন্ধু-প্রীতির বাঁধন পরি,
কুরুক্ষেত্র মহারণে বরা ধরেন আপনি হরি।
'পিতৃপূজায় জরাবরণ করেন পুত্র যযাতির
'সঙ্গী' ছাড়ি স্বর্গে যেতে চান্‌নি রাজা যুধিষ্ঠির।

এসব ভুলি তুচ্ছ-মানব মোহের ঘোরে মুক্তি চায়,
আপন গড়া মরীচিকার জগৎ মাঝেই তুষ্ট হায়!
কিন্তু যে দিন টুটবে আঁধার প্রভাত হবে মোহের নিশি,
কল্পনারই রঙিন ছবি শূন্যতলে যাবে মিশি।
দারুণ অনুশোচনানল দহন দিবে সকল গায়
জীবন হবে দুর্ব্বহ সে বিবেকবাণীর তাড়নায়।
বিশ্বপিতার পুত্র মোরা—নয়ত' মোরা অন্য কেহ,
যেথায় তাঁহার আসন পাতা সেইত' মোদের আপন গেহ।
যদি দুখের অবসানে একটি মুখের হাসি ফোটে,
তীব্র তাপের অন্তে যদি একটি হিয়া দাঁড়িয়ে ওঠে,
স্বর্গ সেথায় আসবে নেমে, ঝরবে তাঁহার আশীর্ব্বাদ
পালিয়ে যাবে আত্মগ্লানি, ঘুচবে সকল অবসাদ।
মুক্তি ত' আর কিছুই নহে—দূরে থাকার অভিলাষ,
অন্য সবাই থাকুক পড়ে নিজের আগে পুরুক আশ।
তাইত' বলি মুক্তি আমি, মোক্ষ আমি চাই না হরি
বিশ্ব সেবার বাঁধন দিয়ে বাঁধ আমায় দৃঢ় করি।

তাজমহল

শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র এম-এ

গল্প

আগ্রার একটী নিভৃত কেলি কুঞ্জে সম্রাট শাজাহান তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী মমতাজের সহিত একাসনে বসিয়া পাশা খেলিতেছিলেন। তখন বসন্তকাল। পূর্ণিমার চন্দ্র নীল-আকাশে বেশ স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া সম্রাট-দম্পতির উপর তাহার স্নিগ্ধ কিরণ বর্ষণ করিতেছিল। মমতাজ চাহিতেছিলেন কি একটা দান ফেলিতে, তাহা হইলে তিনি সম্রাটকে অনেকটা আগাইয়া যাইতে পারেন। সম্রাটও চাহিতেছিলেন, এমন দান ফেলিতে যাহাতে মমতাজের পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়া যায়! উভয়েই খানিকক্ষণ চিন্তা করিবার পর সম্রাট-পত্নী পাশা ফেলিলেন। তিনি যাহা চাহিতেছিলেন সেই দানটী পড়ায় সম্রাটের মুখ গম্ভীর হইয়া আসিল। সম্রাট দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহার বাঞ্ছিত দান ফেলিবার জন্য কম্পিত হস্তে যেই পাশা ফেলিলেন অমনি পাশাগুলি এমন বেয়াড়াভাবে চিৎ হইল যে, সেই নির্দ্দেশ অনুযায়ী চাল চালিতে গেলে তাঁহারই পাকা ঘুঁটী কাঁচিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। ক্ষুব্ধ সম্রাট বলিলেন, 'পেয়ারী, দানটা বদলে নোব"—একটু মনোমুগ্ধকর মৃদু হাসিয়া মমতাজ বলিলেন, 'ইব্রাহিম লোদী যদি তাহার দানটা পানিপথে বদলে নিত জাঁহাপনা, তবে আজ দিল্লী-আগ্রার তক্তে মোগলের বাদসাগিরি চলত কি?' সম্রাট হাসিয়া বলিলেন, 'ভাল, আমার কলি, যদি হারাও ত, তোমার বাহু-পাশে আমাকে বন্দী করো। মমতাজ একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'শুধু তাই নয়, শাহনসা সম্রাটকে আমার মহলে উমোর ভোর আটক রাখব।' সম্রাট অলক্ষিতে একটু শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'তেমন নসিব হ'বে, জান'।

সম্রাট হারিয়া গেলেন! প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সম্রাট মমতাজের প্রাসাদে বাস করিতে স্বীকৃত হইয়া দরওয়াজাগুলি খুলিয়া দিয়া গোলাপবাগের হাওয়া গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলেন। পূর্ণিমার চন্দ্রও নিশা-শেষে পশ্চিমাকাশে ঢুলিয়া পড়িতেছিল। মমতাজ সম্রাটের বক্ষে মস্তক রাখিয়া ক্রমশঃ ঢুলিয়া পড়িলেন। সারা হিন্দুস্থানের সম্রাট সুন্দরী শ্রেষ্ঠা মমতাজকে বক্ষে ধারণ করিয়া ক্রমশঃ সুপ্তির মিষ্ট আহ্বানে আত্ম-সমর্পণ করিলেন।

নিদ্রা-ঘোরে সম্রাট স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁদের জীবনের গানটীর তাল কাটিয়া গিয়াছে। কি দক্ষ গায়কের মতন তানসেনী সুর-লয় লইয়া কি উদ্দীপনাপূর্ণ সঙ্গীত যেন তাঁহার কণ্ঠ-নিসৃত হইয়া সারা-বিশ্বে অমৃত সিঞ্চন করিয়া যাইতেছিল; কিন্তু এক বদ্ সুরৎ কাল পুরুষ আসিয়া তাঁহার গলা টিপিয়া দেওয়ায় সেই সুর ভঙ্গ হইল। সুপ্তি-বিভোর সম্রাট এবার যেন স্পষ্টই অনুভব করিলেন তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী মমতাজকে কে যেন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। চক্ষু চাহিয়া সম্রাট যেন দেখিলেন তাহারা সাক্ষাৎ যমদূত। সম্রাট ক্ষিপ্ত-কণ্ঠে বলিলেন, "তোমরা দাঁড়াও, তোমাদিগকে হিন্দুস্থানের এক একটা সুবা দিব! ইরাকের সুন্দরী আনিয়া তোমাদের সহিত সাদী দিব।" যমদূতগুলি সম্রাটের বাক্যে বিকট হাস্য করিয়া বলিল, 'সম্রাট," আমরা পর-জগৎ হইতে পরওয়ানা লইয়া আসিয়াছি, তোমাকেও একদিন এমনিভাবে লইয়া যাইব।' সম্রাট বলিলেন, 'তোমরা কি পৃথিবীকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিতে চাও? আজ আমার জীবনের রোশনাই, প্রাসাদের জান, সারা দুনিয়ার জহরত-খানা ওকে রেখে দাও; বরং আমাকে নিয়ে যাও, আমার জীবনের সম্মুখ ভাগে চাহিবার আর কিছু নাই।" যমদূতেরা বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল।

অন্ধকার, অন্ধকার। এত অন্ধকার কোথা হইতে আসিল। নিদ্রিত সম্রাট যেন "তাঁহার সমস্ত জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়া দেখিলেন, খালি অন্ধকার। পৃথিবীর

সৃষ্টিকালে, চন্দ্র-সূর্য্য, যখন গগন-মার্গে শোভা পাইত না, তখনও বুঝি বা এত অন্ধকার ছিল না। সম্মুখে অন্ধকার, পশ্চাতে অন্ধকার, উপরে অন্ধকার, নীচে মাটীর উপর অন্ধকারের স্তূপ সীমাহীন পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান। একাকী সম্রাট ভয়-বিহ্বল চিত্তে তাঁহার জীবন-সঙ্গীতটী স্মরণ করিলেন। সঙ্গীতটীও বক্ষের মধ্য দিয়া গলার নিকট ভাসিয়া আসিয়া স্বরের অভাবে অনুচ্চারিতই রহিয়া গেল। সম্রাট আবার চেষ্টা করিলেন, এবার বুকের পাঁজরাগুলা কাঁপিয়া উঠিল। গলাটাও কাঁপিয়া ওঠায় কতকগুলি অস্ফুট স্বর বাহির হইল মাত্র। উন্মত্ত আবেগে সম্রাট আবার চীৎকার করিবার চেষ্টা করিলেন, এবার সুরহীন, তাল লয় শূন্য এক মর্ম্মভেদী ভীষণ আর্ত্ত-নাদ গলার গহ্বর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহার স্পন্দনে সমস্ত বিশ্ব স্পন্দিত হইয়া সারা শূন্য যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। অণু-পরমাণুগুলা আঘাত লাগিয়া সারা দুনিয়া যেন দুলিয়া উঠিল। সম্রাট আবার চেষ্টা করায়—পূর্ব্বকার মর্ম্মস্পর্শী হৃদয়-বিদারক স্বর এবার স্পষ্ট এবং অধিকতর ক্ষমতাশালী হইয়া হাওয়ায় এমন প্রবল ধাক্কা মারিল যে, পর্ব্বতগুলা ঘরঘর করিয়া উঠিল, বড় বড় গাছ-গুলা হুড়মুর করিয়া নুইয়া পড়িল, দুই-কূল ভীষণ বন্যায় ভাসাইয়া দিয়া দরিয়াগুলি বহিয়া চলিল। আগ্নেয়গিরি হইতে নিঃসৃত উত্তপ্ত বায়ুর ন্যায় সম্রাটের নাসিকা-রন্ধ্র হইতে যে নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, তাহার স্পর্শে যে কেহ আসিল সেই ভস্মীভূত হইয়া গেল। ধ্বংসের সহিত উৎকণ্ঠার মিলনে সারা-বিশ্ব কেমন যেন বেশী ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

সম্রাটের কণ্ঠে ক্রমশঃ সুর ও তাল ফিরিয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার বক্ষের স্পন্দন ক্রমশঃই কমিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু মৃত্যু তখনও তাঁহার চক্ষের সমক্ষে তাহার তাণ্ডব নৃত্য নাচিয়া যাইতেছে। সম্রাট ভাবিলেন, 'মৃত্যু, সে ত মানবের চরণের ভৃত্য। মৃত্যু, সে ত আমাদের জীবনের সহচর। যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করিলে সে পাশে শয়ন করে। রোগ-শয্যায় শয়ন করিলে, সে অতি পরিচিত বন্ধুর মতন আসিয়া মুক্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। চির-পদানত জাতির হৃদয়ে স্বাধীনতার দুর্গম আশা জাগিয়া উঠিলে সে মৃত্যুকে তাহার পায়ের গোলাম বানাইয়া লয়। তবে আমি মৃত্যুকে ভয় করিব কেন! সুর-সুন্দরী মমতাজ মরিবে, তাহার অনিন্দ্য রূপ লাবণ্য মাটীর অঙ্গে মিলাইয়া যাইবে, কিন্তু তাহার স্মৃতিকে অমর করিয়া দিবার ক্ষমতা মানুষের মস্তিষ্কে আছে। আমার দুঃখ করিবার কি আছে! উদ্দাম-নদী পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া দুই কূল ভাসাইয়া বহিয়া যায়, তাহাকে সাগরে গিয়া মিশাইতে হইবেই। কিন্তু তাহার স্মৃতি স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইয়া অপূর্ব্ব বেহস্তের রচনা করে। আমাকেও তাই করিতে হইবে। যে সুন্দরী আমার হৃদয়ের উৎসাহ ছিল, মস্তিষ্কের প্রতিভা ছিল; যাহার দেব দুর্ল্লভ প্রেম আমাকে অমৃতের বেষ্টনী দিয়া ঘেরিয়া রাখিয়াছিল; যাহার স্পর্শে আমার হৃদয়ে সপ্ত সুর স্পন্দিত হইয়া উঠিত; যাহার দর্শনে আমার সমস্ত শরীরে আনন্দের রোমাঞ্চ উঠিত; তাহাকে রূপ দিতে হইবে, তাহাকে অমর করিয়া সৃজন করিতে হইবে, তাহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে হইবে। মোগল সাম্রাজ্য থাকিতে পারে বা না থাকিতে পারে, দিল্লী-আগ্রা ধ্বংস হইতে পারে বা না হইতে পারে, কিন্তু আমার তাজ, সম্মানের, শ্রদ্ধার, ভক্তির তাজ হ'য়ে চির পূজিত হইবে।'

বিদ্যুৎ চমকানোর ন্যায় সামান্য আলোক চক্ষের সম্মুখে ঝলসাইয়া যাওয়ায় সম্রাট দেখিলেন, মমতাজের পিতা বিষণ্ণ বদনে তাঁহারই দিকে তাকাইয়া আছেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া সম্রাট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পিতঃ বলুন, তাজ কোথায়।' তিনি অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, 'বেহস্তে বৎস। আমি তোমার কাছে আসিলাম তাজের রূপের একটা আভাষ দিতে। তুমি না এই মাত্র তাহাকে সজীব করিবে বলিয়া ভাবিতেছিলে?' সম্রাট সাগ্রহে বলিলেন, 'নিবেদন করুন, তাজকে কি প্রকার রূপ দিয়া ফুটাইলে সে চিরকাল দুনিয়াব তাজ হ'য়ে থাকবে।' তাজের পিতা বলিলেন, 'আমি তোমাকে সেই উপদেশই দিতে আসিয়াছি বৎস। হিন্দুস্থানের দরিয়াগুলি অবধি সলিল রাশি বহন করিয়া গেলেও তাহাদের উন্মত্ততা নাই। তাহাদের প্রকৃতিই যেন শৃঙ্খলিত। আমার

আহুরি তাজ ছিল আমুদরিয়া বা শিরদরিয়া—খর-স্রোতা। তাহার রূপের জৌলসে যেমন পুরুষ-অন্তঃকরণ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত, তাহার পিতৃ-মাতৃ প্রেমেও আমরা তেমনি অধীর হ'য়ে পড়িতাম। তোমার রাজপুতনার মরুভূমিতে বালু আছে। তা'র মাঝে মাঝে গাছ আছে, গ্রাম আছে। রাত্রে এক পল্লী হইতে অন্য পল্লীতে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সাহারা শুধুই বালুর স্তূপ—সীমাহীন, অনন্ত আমার তাজের দুঃখ সহ্য করিবার ক্ষমতাও ঠিক সেই রূপ ছিল। সাহারার পথিকের ন্যায় তাহার ধৈর্য্যের অভাব হইত না, তাহার হৃদয়ে কখনও হতাশা আসিয়া উঁকি মারিতে পারিত না। সে থাকিত দূর ঐ কল্প-রাজ্যে, যেখানে সমস্ত আশাই মুকুলিত হয়, সমস্ত সুখৈশ্বর্য্য চিন্তা মাত্রে করতলগত হইয়া পড়ে। হিন্দু-স্থানের নারীগুলা গৃহ সুখী। তারা চায় স্বামী, আত্মীয়-স্বজন, পুত্র-কন্যা। গণ্ডির বাইরে তাহারা কাহাকেও স্নেহ দান করিতে পারে না। পিতাকে ভক্তি করিলেও পিতৃ-বন্ধুকে তাদৃশ সম্মান দিতে চায় না। আমার তাজ কিন্তু ছিল বেদুইন্। সমস্ত জাতিই তাহার স্বজাতি। সমস্ত বয়োজ্যেষ্ঠ পিতৃ স্থানীয় পুরুষই তাহার পিতা। বয়োকনিষ্ঠ তাবৎ নর-নারীই তাহার ভ্রাতা-ভগ্নী

হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া সম্রাট দেখিলেন, তাজ-ভ্রাতা কি একটা ক্ষীণ-আলোকে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, 'সম্রাট, ভগ্নীকে ধরাতলে অমর করিতে চান? তবে শুনুন আমি বলি তার সু-রূপ। ফোয়ার দেখেছেন, আপনাদের গুলবাগানের নয়, গভীর জঙ্গলের মধ্যে, পাহাড়ের বুকে। সে ফোয়ার যেমন অনবরত বারি বর্ষণ করিয়া গিয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ নদী সৃজন করে, আমার ভগ্নীর হৃদয়ের প্রেম-বন্যাও সেইরূপ অনবরত প্রবাহিত হইয়া গিয়া কত জানদার ভাই-ভগ্নী সৃজন করে গেছে। ভগ্নীর স্নেহ সেই করপ্রার্থী হইয়া যে কেহই আসিয়াছে—সে বিমুখ হয় নাই। তাহার হৃদয়ের সৌ-ভ্রাতৃভাবের তল ছিল না। বেহস্তের হুরী আমি কখনও চক্ষে দেখি নাই, আরব্যোপন্যাসের পরীরাও বোধ হয় কবির কল্পনা মাত্র, পূর্ণিমার চাঁদের কলঙ্ক আছে, এমন কোন গোলাপই নাই, যাহা কণ্টকহীন হ'য়ে জন্মায়, আমার ভগ্নীর রূপ তাদের সহিত তুলনা কর্লে কতটা সত্য বলা হয় ঠিক জানি না, তবে আমার মনে হয়, সে রূপের জৌলসে দাঁড়ান যায়, তাঁর স্নিগ্ধতা কলঙ্কহীন হইলেও আরামদায়ক, জলমল করে জ্বললেও নয়নের তৃপ্তিকর।"

সহসা সম্রাট অনুভব করিলেন, তাঁহার পুত্র-কন্যা যেন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'পিতঃ মায়ের রূপ অমর করিতে চান, ধরাতলে তাঁহাকে চির-প্রতিষ্ঠ দেখিতে চান? তবে কল্পনা করুন—অনন্ত সমুদ্র, তাহাতে কেউ নাই, খালি নীল জলরাশি, ঐ নীল আকাশের ন্যায় শান্ত স্থির। সে বিশাল জল ঐ আকাশের বিশালতার মতনই মনোমুগ্ধকর, কোন প্রকার ভীতিই উৎপন্ন করে না। কল্পনা করুন স্নিগ্ধ সুশীতল বায়ুরাশি—তাহার হিল্লোলে প্রাণে আনন্দের উৎস বহাইয়া দেয়, অন্তরে অন্তরে এমন আরো বন্যা বহিয়া যায় যে, স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়া উঠিতে ইচ্ছা করে, জননি—তুমি নারীরূপে দেবী, আমরা তোমার ঐ চরণে শত শত প্রণাম করি।'

আবার অন্ধকার আসিয়া সম্রাটের চক্ষু ঢাকিয়া দিল। অন্ধকার, অন্ধকার। সে সূচিভেদ্য অন্ধকারে কোন বস্তুই উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। চক্ষু বুজিয়া সম্রাট প্রেয়সীর রূপ কল্পনা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ চিন্তার পর নিদ্রা-বিভোর সম্রাট স্বপ্নেই যেন অনুভব করিলেন, তিনি বিরাট হিন্দুস্থানের ময়ূর তখ্‌তে আসীন থাকিয়া দূর যমুনার ধারে মার্ব্বেল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইতেছেন। জগতের শ্রেষ্ঠ কারিকরগণ একত্রীকৃত হইয়াছে। সম্রাট তাঁহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন, 'দেখ, এমন প্রাসাদ রচনা কর, যাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল মূর্ত্তি দর্শন করিলে কন্যা-বিয়োগে আত্মহারা পিতা যেন ভাবেন—তাঁহার কন্যার রূপ এমনই ত ছিল। এই সৌধ শ্রেষ্ঠ তাজে তাহার প্রতিবিম্ব যেন মার্ব্বেলে খোদিত করিয়া রাখা হইয়াছে।' 'যো হুকুম খোদাবন্দ' বলিয়া তাহারা কার্য্য আরম্ভ করিবে, সম্রাট তাহাদের কার্য্য বাধা দিয়া বলিলেন, 'শুন, শুন প্রিয়ার রূপকে এমনও একটা আকৃতি দিতে হইবে যাহাকে দেখিলেই প্রিয়তম৷

ভগ্নীকে হারাইয়া যে ভ্রাতা অশ্রু বিসর্জন করিতেছে, সেও যেন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়ায়, সেও যেন বলে, হ্যাঁ এইত ঠিক, এইত আমার ভগ্নীর মূর্ত্তি শ্বেত পাথরে খোদিত হইয়া অমর হইয়া আছে।' 'তাই হইবে" বলিয়া, কারিকরগণ সেই আবার কাজ সুরু করিতে যাইবে, সম্রাট ভীষণ ব্যাকুল চিত্তে বলিলেন, 'শুন শুন। আমার পুত্র কন্যাদের কথা শুন। সৌধশ্রেষ্ঠা তাজের এমন রূপ দিতে হইবে, যেন যে কেহ পিতৃ মাতৃ-হীন বালক বা বালিকা চক্ষের অশ্রু মুছিতে মুছিতে, সৌধ-অঙ্গনে গড়াগড়ি দিতে দিতে বলে আমার জননীর কোল এমনি শীতল ছিল।' কি যেন, মন্ত্রাবিষ্ট হইয়া কারিকরগণ বলিল—'তাই হইবে জাঁহাপনা'। এবার সম্রাট সিংহাসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "এবার শুন আমার কথা। দাও এমন রূপ, এমন জ্বালা, এমন আগ্রহ, এমন ব্যাকুলতা, এমন স্নেহ, এমন স্নিগ্ধতা, এমন ভালবাসা, যাহা সারা বিশ্বে নাই, যাহা দুনিয়ায় দুর্ল্লভ। ঐ বেহস্তের রূপের পার্শ্বে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ; মায়ের হৃদয়ের ব্যাকুলতার ধারে দাম্পত্য-প্রেমের প্রাবনতা; ঐ হিমালয় তুল্য গগন-স্পর্শী ভক্তি ও শ্রদ্ধার ধারে ঐ দুর্ব্বারই ন্যায় স্নিগ্ধ সুস্থ কোমলতা। এমন ভাবে সৌধ রচনা কর যে, তাহার বক্ষে সকল স্মৃতি ঘুমাইবে। যেখানে আসিলে কন্যাহারা পিতা তাহার কন্যার, মাতৃহারা সন্তান তাহার জননীর, ভগ্নীহারা ভ্রাতা তাহার ভগ্নীর, স্মৃতির সমাধি দেখিতে পাইবে। বুঝেছ তোমরা, তাজকে সমাধি সৌধ ক'রে মৃত্যুর উপর প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে হ'বে, ত'বেই তাকে অমর করে রাখ্‌তে পারা যাবে।"

হঠাৎ প্রভাত বায়ু গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দম্পতি-যুগলের নিদ্রা ভগ্ন করিয়া দিল। দূরে কেল্লার দুইভাগে নহবতের ক্ষীণ-কণ্ঠ ভাসিয়া আসিয়া কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করায় সম্রাট ডাকিলেন, 'রূপ আসরফি, বালা-উন্নিসা, চমক-জাহান, রূপ-দরিয়া, পিয়ারী, আমি তোমাকে অমর ক'রে ধরা-পৃষ্ঠে রেখে যাব।' তাজ সম্রাটের কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বলিলেন, 'যাই বল না সম্রাট, তোমাকে আমার প্রাসাদে চিরদিনের জন্যই বেঁধে রাখ্‌বো।'

অতিথি

শ্রীক্ষণপ্রভা দেবী

আজি এ প্রাতে
কনক রথে
অরুণ সাথে
ফুল বাগেতে
সহসা জাগি
নিরখি' সে যে
তখনও গাছে
নিঝুম ধরা
নিশার শশী
বিদায় মাগে
কানন ছায়ে
সিক্ত ভূমি

হিয়ার পাতে
আমার দ্বারে
মালিকা হাতে
এল সে ভোরে।
মেলিয়া আঁখি
অচেনা সাথী
ডাকেনি পাখী
ঘুমে অঘোরে।
মেঘের কোলে
নয়ন জলে
বীটপী মূলে
নীহার ভারে

অতিথি এল
দীপ্ত দেহ
উষার হাসি
কণ্ঠ ভরা
আজি এ প্রাতে
রচিনি আসন
কেমনে আজি
বরিব তারে
হয়নি ভরা
বিরলে বসি
হয়নি জ্বালা
কি দিয়া আজি,

আমার আজি
আলোকি মাঝে
কিরণে সাজি
আলোক হারে।
বারেক ভুলে
বকুল-ফুলে
এই নিরালে
হৃদয়-দ্বারে।
কুসুম ডালা
গাঁথিনি মালা
আরতি আলা
তুষিব তারে।

বজ্রদগ্ধা

শ্রীপ্রমীলা রায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর) —উপন্যাস

(৫)

শুভ্রাংশু ঠিক চারদিন পরেই শাশুড়ী ও শতদলের মাসীমাকে নিয়ে হাজারিবাগে ফিরলেন। এসে দেখলেন যে কাজ যেমনভাবে কর্‌তে তিনি বলে গিয়েছিলেন, তা তো হয়েই গিয়েছে, বেশীর ভাগ, যতী আরো যে সব কাজ এগিয়ে রেখেছে, তিনি তা সাতদিন বসে ভাবলেও করতে পারতেন না। প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে তিনি বললেন "বাঃ! যতী! ভগবান্ তোমাকে ঠিক সময়েই এনে দিয়েছেন, এ সব তুমি না হলে, আর কেউ এমন সুন্দর করে, সুশৃঙ্খলার সঙ্গে কর্‌তে পারতোনা। বাবা, তোমাকে তাঁর ঠিক প্রিয় ছাত্রই করে গ্যাছেন।"

এত কথার উত্তরে যতী শুধু একটু হাসলে। শ্রাদ্ধের দিন সকালে প্রভাত এসে পৌঁছাল। তাকে দেখেই যতীর কিন্তু কেমন বিতৃষ্ণা বোধ হতে লাগল। তবুও আজ তার চেয়ে প্রভাতের সন্মান বেশী বলে, সে এগিয়ে গিয়ে নিজেই যেচে বললে "ভাল আছেন তো জামাই বাবু?" ছোটবেলায় শোনা একটা রূপ-কথার ছড়া তার মনে এল।

"হাতের কাঁকন দিয়া কিনিলাম দাসী!—"

সেই হইল রাণী,—আর আমি হইলাম দাসী!"

এ যেন ঠিক সেই ধরণের হয়েছে। প্রভাতের মনে কিন্তু এ সুরের বালাই ছিল না, সেও এগিয়ে এসে যতীর দুই কাঁধ ধরে নাড়া দিয়ে বললে "বাঃ যতীবাবু! আপনি এমন 'কমেটের' মত কোথা থেকে আবিভূত হলেন? খুব সময়েই এসে পড়েছেন যা হোক! আচ্ছা আপনার কাজে বাধা দেব না, আমি চট্ করে ভেতর থেকে ঘুরে আসছি, দেখি আমার মত আনাড়ী লোক দিয়ে কোনো কাজ হয় কিনা!" প্রভাত চলে গেল। তার চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে যতীর আর কোনো কাজে মন লাগল না। যোড়শের ও বৃষোৎসর্গের সমস্ত জিনিসগুলি তাঁবুর ভিতরে সাজাবার কাজটা যতী নিজেই নিয়েছিল, এখন প্রভাত এসে পড়ায় তার সমস্ত যেন বিস্বাদ হয়ে গেল, হাতের কাজ হাতেই রইলো, যতী এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।

তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শুভ্রাংশু বল্লেন "যতী, তোমার কি হল? অসুখ করছে নাকি?" বলে উদ্বিগ্ন মুখে কাছে এলেন।

মৃদুস্বরে একটা "না" বলে দিয়ে যতী যে সময়টুকু দাঁড়িয়ে নষ্ট করেছে সেটুকু পুরোবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ আরম্ভ কর্‌লে। একটু পরেই তার মনে আর কিছুই রইল না, শুধু সে রমাপতির আশ্রিত, তাঁর স্নেহ, দয়া ও অন্নপুষ্ট; এইটুকুই তার কাজের গতির বেগ বাড়িয়ে দিলে।

ভেতরে এসে প্রভাত কাকেও দেখতে পেল না, এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে ভাঁড়ার ঘরের কাছে মলিনাকে দেখতে পেয়ে তার কাছে, তার ঘড়ি, মনি ব্যাগ, ও সুটকেসটা দিয়ে বললে "এগুলো এখন আপনি রাখুন তো বৌদি। আমি বাইরে যাচ্ছি।" বলে সে বাইরে চলে গেল।

মলিনার মা সিদ্ধেশ্বরী বল্লেন, "বৌদি, বলে কথা বলে গেল, ও ছেলেটা কে রে খুকী?" মায়ের দিকে একবার চেয়েই মুখ নীচু করে জিনিসগুলি তুলতে তুলতে বল্লে: "ও আমার নন্দাই, প্রভাত বাবু!"

ঠোঁটটা উল্‌টিয়ে তিনি বললেন 'সব্ব রক্ষে, এই মীনুর বর দূরে থেকে কতই শোনা যায় যে! তবে যে শুনেছিলাম মীনুর খুব ভাল বরে বিয়ে হয়েছে? এ যদি ভাল বর তবে আমার নেত্যরঞ্জন কি দোষ করেছিল?" 'নেত্যরঞ্জন' সিদ্ধেশ্বরীর ভাইপো। পড়াশুনা এক রকম করলেও, দেখতে সে অতি কদাকার আর মা, বাবা কেউ না থাকায় পিসীর কাছেই মানুষ! মলিনার শ্বশুর রমাপতি যে একটী কামধেনু সে খবর তিনি পেয়ে, নেত্যরঞ্জনের সঙ্গে মীনার বিয়ে দিয়ে এক ঢিলে দুই পাখী মারতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা হল না। বি-এ ডিগ্রী মাত্র সম্বল নৃত্যরঞ্জনের সঙ্গে মীনার বিয়ে দিতে রমাপতি কিছুতেই স্বীকার হলেন না। সিদ্ধেশ্বরীর কিন্তু বেয়াই ও তাঁর মেয়ের ওপর একটা আক্রোশ রয়েই গেল! তাই এখন প্রভাতকে দেখেই তিনি জলে উঠেছিলেন। মায়ের রাগ কেন এবং কোথায় তা মলিনাও ভাল রকম জান্‌তো—তাড়াতাড়ি একথা চাপা দেবার জন্যে সে বললে "যাকে যার পছন্দ হয়, তা ছাড়া ভবিতব্যি যেখানে, সেখানে তো হবে।"

"তা হোক্ গে, আমার নেত্যর বৌও বেশ হয়েছে, পিসীমা পিসীমা করে সে কি যত্ন আত্তি! তেমন, তোমার ওই পটের বিবি ননদ, সাত জন্মেও পেয়ে উঠবে না বাছা!"

কথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে মলিনা বল্লে, নেত্যদার বৌকে আন্‌লে না কেন? আমি তো বিয়ের সময় যেতে পেলাম না, দেখিও নি, কবে যে দেখব তাও জানিনে।"

"পোড়া কপাল আমার! সে কি এখানে আছে, দিল্লী না কোথায় তার বাপ কাজ করে সেখানে গেছে যে। সে এলে কি আমার এই সব দেখতে হ'ত? একাই তোমার ভাঁড়ার দেখা থেকে কুটনো বাটনা সব গুছিয়ে তুলতো—এখন তো বাড়ীর যত কিছু ঝক্কি সেই পোহায়! আমি আর কুটোটিও নাড়িনে। বদ্দি মরুক গে দুদিন পরে ওই তো সব কর্‌বে ...বলা বাহুল্য মলিনার সহোদর ছিল না।

. থান গরদের ধুতি পরে, শুভ্রাংশু, শাশুড়ীকে বল্লেন "বাবার শেষ কাজ কর্‌তে যাচ্ছি, আশীর্ব্বাদ করুন যেন ভাল ভাবে করে আসতে পারি।" বলেই তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।—

সিদ্ধেশ্বরী জামাইএর কথার উত্তরে ঠোঁটটা নেড়ে কি বললেন, বোধ করি আশীর্ব্বাদই কর্‌লেন।

ভাঁড়ার ঘরে চাবী দিয়ে, মলিনা মাকে ডেকে নিয়ে শাশুড়ীর কাছে গিয়ে বস্‌লো। সেখানে শতদল মাটীতে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন—আজ যেন তাঁর সকল ব্যথা আবার নতুন হয়ে উঠছিল। "একদিন যার পূজা হয়ে গেছে, আজ শুধু তার বিসর্জ্জন।"

মীনা ও শতদলের মাসীমা সেই ঘরেই একটা জানালায় বসে আস্তে আস্তে কি কথা বল্‌ছিল—মলিনা সেইখানে গিয়ে বসলো। সিদ্ধেশ্বরী, শতদলের পিঠে হাত দিয়ে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন "ব্যান্ ওঠ—যা হয়েছে তাতো হয়ে গিয়েছেই—তুমি এমনি করে মাটী আঁক্‌ড়ে যদি পড়ে থাকো, তবে এই সব ছেলে মেয়ে কার মুখ তাকায়? তোমার উপযুক্ত ছেলে, আজ বাদে কাল নাতি হবে, তোমার কি এখন হাল ছেড়ে দিয়ে ছেলেমানুষের মত পড়ে থাকা শোভা পায়! নেও ওঠ—জানালাটার পাশে ব'সি গে চল,—উঠোনের সবই দেখা যাবে, গীতা পাঠ হচ্ছে, বিরাট্ পাঠ হচ্ছে—চল ভগবানের কথা শুন্‌লেও মনটা ভাল হবে।"

"উঠ্‌তে যে আর আমার বল নেই দিদি! উঠি কি করে?"

"কি করে আবার উঠ্‌বে—মনে জোর করে ওঠ। তোমাকে পড়ে থাক্‌তে দেখলে তোমার ছেলে মেয়ে মুষড়ে পড়ে, তা তুমি বোঝ না? তোমার ছেলে এত বড় একটা বৃহৎ কাজে নেমেছে তোমার মুখ চেয়ে সে ভরসা পাবে—তা না তুমি লুকিয়ে, মুখ গুঁজে পড়ে রইলে! ওঠ" বলে সিদ্ধেশ্বরী, শতদলের হাত ধরে বসিয়ে দিলেন। শতদল কোনও রকমে অবশ দেহটাকে টেনে নিয়ে যেখানে তাঁর মাসীমা বসে ছিলেন, সেইখানে গিয়ে "মাসীমা, এ কি হল?" বলেই ফুঁপিয়ে উঠলেন।

শতদলের মাসীমা লোক আসলে মন্দ ছিলেন না—শুধু অভাবের তাড়নাতেই একটু রুক্ষ হয়ে উঠ্তেন। বললেন "কি করবে মা, তোমাকে তো আমরা রাজরাণী করে দিয়েছিলাম—যে ক'দিন সে সুখভোগ করার অদেষ্ট তোমার ছিল, করলে, এখন আবার তার সংসারে তার ছেলে পিলে নিয়ে অন্য রকম করে ঘর সংসার কর। যেদিন তার দরকার হবে তোমাকে ডেকে নেবে। তবু তো তোমার অন্য ভাবনা কিছু নেই—আর আমার দেখ দিকি মা, নিত্যি অভাব, অনাটন, মরা, ছাড়া লেগেই আছে। এই যে দুদিন এসেছি তা, মন থেকে কি, সে পোড়া সংসারের ভাবনা গিয়েছে, সেই একেবারে চিতেয় শুলে যদি যায়, আসার সময় আবার ছোট নাতিটার জ্বর দেখে এলাম, সে আমার বড় 'ন্যাওটা', মনে করলাম নিয়ে আস্ব—তা তাকে একা এনে কি রক্ষে আছে? সব ক'টি ব্যস্ত হয়ে উঠবে।"

মৃদুস্বরে শতদল বল্লেন "তা, নিয়ে এলে না কেন তাদের? আমিও একবার দেখ্তাম।" রাম, রাম, তারা কি মানুষ যে নিয়ে আস্ব!—একদিনে সব ভেঙে চুরে তছনছ করে ছাড়্বে! এই বিপদের ওপর সে আবার তোমার আর এক জ্বালা হ'ত!"—"জ্বালা আর কি! লোক জনে দেখ্তো। এই মীনু চলে গেলে বাড়ীটা কত খালি হ'য়ে যাবে। মীনুর শ্বশুর যে দয়া করে এখনও নেন নি তাই—না হলে এই বাড়ী ঘরে কি করে যে টিঁক্‌ব!"

সিদ্ধেশ্বরী বল্লেন "মীনা বুঝি একবারও শ্বশুর বাড়ী যায় নি?"

"না দিদি! ব্যাই এর সংসারে মেয়ে মানুষ তো কেউ নেই—একা ছেলে মানুষ গিয়ে কি করে থাকবে, তাই ব্যাই সব ঠিক করে মীনুকে নিয়ে যাবেন।"

"ও তাই! আমি বলি বুঝি অন্য মত্‌লব আছে।"

"না, মত্‌লব আর কিছু নেই। মীনুর শ্বশুরও যেমন, আর জামাইটি তো রত্ন বল্লেও হয়। দেখেছ নাকি প্রভাতকে?"—

"হুঁ, দেখ্লাম। খুকির কাছে কি রাখ্তে এসেছিল! এই শুনে মীনা মলিনার দিকে চাইলে, মলিনা আস্তে আস্তে বললে "ঘড়ি মনিব্যাগ এই সব দিতে এসেছিলেন, সে গুলো আমি তোর ঘরেই রেখে এসেছি।"

প্রায় বিকেল বেলা শুভ্রাংশু সমস্ত শেষ করে ভেতরে এলেন। তাঁকে দেখেই শতদল আবার কেঁদে উঠলেন। শতদলের মাসীমা ও সিদ্ধেশ্বরী জোর করে তাঁদের তখনই একটু একটু সরবত খাওয়ালেন। রাত্রে আর বিশেষ কোন হাঙ্গামা ছিল না। পরের দিন কাজ থাকায় সকলেই সকাল সকাল শুয়ে পড়লো। প্রভাত আসায় মীনাকে তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও শতদলের কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল, আর শুভ্রাংশু ভাই দুটীকে নিয়ে মায়ের ঘরে শুলেন। মলিনা, সিদ্ধেশ্বরী ও ঠান্‌দি (শতদলের মাসীমা) এক ঘরে শুলেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম। বাতাস নেই বল্লেই চলে। সারাদিন পরিশ্রমের পরে প্রভাত ছুটি পাবামাত্র ওপরে এসে ঘরের ভেতরে না শুয়ে ছাতেই মাদুর বিছিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মীনা যখন শুতে এল তখন সে খুব ঘুমোচ্ছে। মীনাও আর ঘরে না গিয়ে সেই মাদুরের ওপরেই বসে পড়লো। ঘুম তারও খুব পাচ্ছিল, কিন্তু শোয় কোথায়? মাদুরের উপর প্রভাত এমনভাবে তেরছা হয়ে শুয়েছে যে তার পাশে খুব গুঁড়ি মেরে শোয়াও চলে না—শুতে গেলেই সে জেগে উঠতে পারে। বসে বসে ঢুলতে ঢুলতে কখন যে সে প্রভাতের পাশেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তা সে নিজেই বুঝতে পারেনি। ঠাণ্ডা বোধ হওয়াতে রাত তিনটা আন্দাজ প্রভাতের ঘুম ভাঙল—জেগে দেখে মীনার একটা হাত তার নিজের মাথার নীচে, বালিশের বদলে দেওয়া, অন্য হাতটী তার বুকের ওপর পড়ে আছে। প্রভাত ও সেই চেপে ধরে চুপ করে শুয়ে রইলো, ভাবলে এর মধ্যে যদি মীনার ঘুম ভাঙে, তো উঠে দুজনে ঘরেই যাবে—ভোরের ঠাণ্ডা লাগানো ঠিক হবে না। কিন্তু মীনার ঘুম ভাঙতে একটু দেরীই হল। ঘুমের ভিতর পাশ ফিরতে গিয়ে হাতখানায় টান পড়ায়, প্রভাতের তন্দ্রা এবং তার ঘুম একসঙ্গেই ভেঙে গেল। সে জেগে দেখ্লে যে প্রভাতের মুঠোর মধ্যে তার হাতটা ধরা—সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়্‌ল এখানে প্রভাত তাকে ডেকে আনে নি. সে নিজেই এসে বসেছিল, তার ঘুম ভাঙার অপেক্ষায় তার

পরে কেমন করে যে সে তার পাশেই ঘুমিয়ে পড়েছে তা সে এখনো জানে না। প্রভাত তাকে না ডাকা সত্ত্বেও, সে যে এখানে এসে শোওয়ার লোভ সাম্‌লাতে পারে নি, এটা প্রভাত বুঝতে পেরেছে মনে হয়ে সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠ্‌লো। মাথার কাপড়টাও খুলে গিয়েছিল, সেইটা মাথায় দিতে যেতে, প্রভাত টেনে ধরে বল্লে "থাক্‌না। ভাঙ্‌লো ঘুম! তুমি কখন এসেছ, আমাকে তো ডাক নি। আমি কিন্তু মনে মনে লোভ করে শুয়েছিলাম, যে তুমি আমাকে ডেকে তুল্‌বে, তখন ঘরে যাব—কি করে ডাকো, তাই মিথ্যে মিথ্যে চোখ বুজে থেকে জেনে নেব। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়্‌লাম সত্যি সত্যি, আর জেগে দেখি, তুমি পাশেই আছ। এখন ঘরে যাবো না বাকী রাতটুকু এখানেই কাটাবো?"

"না, ঘরেই চল—এখানের ঠাণ্ডা বড় বিশ্বাসঘাতক—টপ্‌ করে ঠাণ্ডা লেগে যায়—তাতে তুমি নতুন এসেছ—সহ্য হবে না।"

"তাই চল। বাবা বলে দিয়েছেন এবারে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা কর্‌তে। যাবে তো মীনু, তোমার কোনো আপত্তি নেই তো?"

"আপত্তি? আপত্তি কিসের? তোমার সঙ্গে তোমার বাড়ী যাব এতে আপত্তি কি হতে পারে? জানো, তোমার বাড়ী দেখ্‌বার জন্যে আমার কত আগ্রহ হয়!"

"কিন্তু সেখানে তো আমি থাক্‌বো না।"

"নাই বা থাক্‌লে! তোমার তো বাড়ী সেটা, তুমি তো সেখানে যাওয়া-আসা করবে! তোমার পরিচয়ে আমি সেখানে দাঁড়াতে পার্‌ব তো!"

"তোমার কিন্তু খুব কষ্ট হবে—কেউ মেয়ে মানুষ নেই, হয়তো কোন সঙ্গীও পাবে না, মা যদি থাক্‌তেন তবে তোমার কোনো কষ্টই হত না।"

"বারে বারে তুমি ঐ কথাই বল্‌ছ কেন? তুমি আমাকে নিয়ে গিয়েই দেখ, ঠিক থাক্‌তে পার্‌ব। মা যখন এসেছিলেন তখন হাজারিবাগে একটী প্রাণীও ছিল না—আমিও মায়ের মত করে থাক্‌তে পার্‌ব।"

"তাই পেরো মীনা। দেশের বাড়ীটায় আর ঢুক্‌তে ইচ্ছে করে না। ঝি, চাকরে কি গেরস্থালী রাখ্‌তে পারে? এর মধ্যে তোমাদের হাত চাই, তবে না সুন্দর হয়! যদি এসেছ, তবে আমার সকল ভার তুমি মাথায় নিয়ে আমাকে ধন্য করে দাও। আমার জীবন-টাকে, সুন্দর করে গুছিয়ে তোল। রাণী আমার, অন্তর আমার যেমন ভরে দিয়েছ; বাহিরও তেমনি ভরে দাও। তোমরা ইচ্ছে কর্‌লে তো সবই কর্‌তে পার!"

"তাই-ই আমি করব! তোমার বাড়ীতে তোমার পরিজনের একজন হয়ে থাক্‌তে আমার আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই। তুমি আশীর্ব্বাদ কর আমার এ ইচ্ছা যেন চির দিনই থাকে।" "কিন্তু, এই ব্যাপারের পরে, এখুনি তোমাকে নিয়ে যাওয়াটা যেন আমার বাধ বাধ ঠেক্‌ছে। বড়দা হয়তো মনে কর্‌বেন 'এতদিন গরজ ছিল তাই, এখন গরজ ফুরিয়েছে আর এই দুঃসময়ে নিয়ে গেল'!"

"বড়দা, কিছুই বল্‌বেন না। তা ছাড়া বৌদির ছেলে পিলে হ'বার সময় আবার আমাকে আস্‌তে হবেই—মা আর পেরে উঠ্‌বেন না। তখন তো এঁদের গরজেই আস্‌ব।"

"বৌদির ছেলে পিলে হবে নাকি?"

"হবে তো। তা তার দেরী আছে এখনও।" বলে সে একটু হাস্‌লে।

প্রভাত একটু চুপ করে থেকে বল্‌লে, "আমি তো 'নিয়মভঙ্গের' দিন রাত্তিরেই যাচ্ছি—তার পরে একদিন এসে তোমাকে নিয়ে যাব। কি বল? এই-ই তো ঠিক?"

"হ্যাঁ—আমিও সময়মত মাকে জানিয়ে রাখ্‌ব।"

প্রভাত একটু হেসে, মীনার হাতটা নিয়ে খেলা কর্‌তে কর্‌তে বল্‌লে, "তা হলে, এইবার তোমার গার্হস্থ্য জীবন আরম্ভ হবে, কি বলো? আমার কিন্তু মনে হলেই হাসি আস্‌ছে খুব—তোমাকে যেন এইখানে এই রকম ভাবেই মানায়! এর কোনো রূপান্তর হলে, আবার সেটা কেমন হবে কি জানি?"

"কি রকম হবে আবার! আমরা খুব শীগ্‌গিরই বদ্‌লে যেতে পারি।"

"হ্যাঁ—তা জানি—না হলে হঠাৎ কন্যা থেকে, বধূ হয়ে শেষে মা হয়ে পড় কি করে!—ভোল বাদ্‌লাবার

ক্ষমতা তোমাদের খুবই আছে। তা আমি স্বীকার করছি।"

"যা-ও। সব তাতেই তোমার ঠাট্টা।"

"ঠাট্টা নয়রে—ঠাট্টা নয়—এইটেই খাটি সত্যি এই যে অস্তির জন্যে জীবন ব্যাপী যুদ্ধ আমরা করছি—ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখছি যাতে করে তারাও ঠিক আমাদেরই মত বাঁধা নিয়মে জীবনটাকে কাটিয়ে যেতে পারে, এতে করে বোঝাচ্ছে না কি যে আমরা দাসত্বেরই পক্ষপাতী! তা কি ঘরে, কি বাইরে। তোমরা হাসাও, কাঁদাও, আদর কর, অভিমান কর, কতকি কর, আর আমরা কলের পুতুলের মত শুধু তোমাদের ইঙ্গিতে খুসী মনে চলা-ফেরা করি, একি তোমাদের কম ক্ষমতার পরিচায়ক? ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের ওপর আর একজন মানুষই, কেমন অবাধে প্রভুত্ব করে যায় একি কম যোগ্যতার কথা? সাধে কি শাস্ত্রকার শিবের বুকে শিবানীর সৃষ্টি করেছেন! রাগ করছ নাকি?"

"না—না বল আরও বলে যাও। থামলে কেন?"

"বলবই তো।" বলে প্রভাত মীনার গালের ওপর আঙুল দিয়ে মৃদু টোকা দিয়ে বললে, "কিন্তু, ওদিকে দেখছ?"

সভয়ে মীনা বললে "কি?"

"আরে, তুই এত অল্পেই ভয় পাস্? তবেই আমাদের দেশে গিয়ে তুই থেকেছিস্! সেখানে গাছ পালা দেখলে আর পাখ্ পাখালীর ডাক রাত বিরাতে শুনলেই, তোর হয়ে যাবে! এঁ্যা এত ভয়?"

"বা রে ভয় কখন করলাম!"—

"করনি? আমার কত কাছে সরে এসেছ তা [illegible] ঘরে এসে পর্য্যন্তই তো টানাটানি করছি—নড়াতে তো পারিনি। এখন ভয় যদি না পেয়ে থাক, তবে সরে এলে কি করে?"

মীনা চেয়ে দেখলে সত্যিই সে একেবারে প্রভাতের কোলের কাছে এসে পড়েছে। অপ্রস্তুত হয়ে সরে যাবার যোগাড় করতেই—তাকে হাত দিয়ে আরো কাছে এনে প্রভাত বললে "ইস্! তত বোকা আমাকে পাওনি যে [illegible] চলে যেতে দেব? যাও দেখি আর আমি ঘুমিয়ে আছি মনে করে যখন নিজের ইচ্ছামত ব্যাপার গুলো করে যাওয়া হয়, তখন যদি আমি জানতে পারি না ভাবো—ক্ল. ঘুমিয়ে রয়েছি—আমি চোখ বুজে দেখি, তুমি কি কর? কেন জোর করছ, মীনু? তোমারই হাতে লাগবে—তুমি কি আর আমার এই লৌহ ভীমের আলিঙ্গন থেকে পালিয়ে যেতে পারবে?" Escape me! never!

"তুমি. ভারি দুষ্টু! যা তা কথাগুলো আমার নামে বলছ কেবল!"

"বেশ, দোহাই তোমার রাগ করে যেন বন্ধ করে দিওনা সব। তাহলে গরীব বেচারী পাথেয় অভাবে পথেই মরে যাবে।"

মীনা একটী ছোট কিল তুলে, প্রভাতকে শাসিয়ে খিল খুলে বেরিয়ে গেল। কারণ আকাশ তখন বেশ পরিষ্কার হয়ে লাল হয়ে উঠছিল।

প্রভাতও কাজের জন্যে প্রস্তুত হয়ে বিছানা ছেড়ে, তার মুখ ধোবার টুথব্রাশ ও পেষ্ট হাতে নিয়ে নীচে নেমে গেল। পরদিনের কাজের ব্যস্ততার মধ্যে তার আর নিশ্বাস ফেলার অবসরও মিললো না। যতী ও সে দুজনেই সমান খাটছিল—কাজের চাপে, যতীর মনে প্রভাতের ওপর যে একটু বিদ্বেষ ছিলতা কর্পূরের মত উড়ে গিয়ে সেখানে অনাবিল বন্ধুত্ব এসে পড়ল। এমন কি, দুজনের মধ্যে "তুমি" বলাও আরম্ভ হয়ে গেল। যতী তার নিজের অজ্ঞাতে মনের এই পরিবর্তন দেখে খুসী হয়ে উঠলো। যতীর গৃহত্যাগের কারণটা শুভ্রাংশু কতকটা আন্দাজ করে নিয়েছিলেন কাকেও না জিজ্ঞেসা করেই; তাই এখন তাদের দুজনকে সমবয়স্ক, বন্ধুর মত মিলতে দেখে, তিনিও স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেললেন। ভাবলেন রমাপতি অলক্ষ্য হাতে এদের মিলিয়ে দিলেন।

'নিয়মভঙ্গ' ব্যাপারও একরকম নির্ব্বিঘ্নে হয়ে গেলে, প্রভাত মীনাকে পরে এসে নিয়ে যাবে এই কথা শুভ্রাংশুকে জানিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে মীনার সঙ্গে দেখা করতে এল। কথা যা' তা' তাদের আগের দিনই শেষ হয়েছিল, এখন সে শুধু আর একবার সেগুলো মনে করিয়ে দিয়ে, শতদলকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়ল। পরদিন মলিনার মা ও ঠানদি যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—শুভ্রাংশু অনেক করে তাঁদের বললেন যে আর দু'একদিন পরেই তাঁদের তিনি নিজে পৌছে দিয়ে আসবেন, তবে তাঁরা একটু সুস্থির হলেন। দিন [illegible] পরে শুভ্রাংশু শাশুড়ী ও ঠানদিকে নিয়ে তাঁদের [illegible] পৌছে দিয়ে, হাজারিবাগে ফিরে এসে স্থির হয়ে [illegible] দেখতে বসলেন।

কালের স্রোত

শ্রীবিমলচন্দ্র রায় — গল্প

পথের দু'পাশে দু'খানা বাড়ী।

একটী নানাকারুকার্য্যখচিত সুরম্য অট্টালিকা;—আর একটী শত ছিদ্রময় জরাজীর্ণ কুটীর।

একটীতে রৌদ্র বায়ুতো দূরের কথা,—স্বয়ং যমরাজ ঢুকতেও ভীত হন;—আর একটীতে রৌদ্র জলবায়ুর ত' কথাই নাই—চন্দ্রালোক অবধি অবাধে প্রবেশ করে; এমন কি অতি দূরের তারকারাজি পর্য্যন্ত ছিদ্ররূপ গবাক্ষ দিয়ে কুটীরের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারে; প্রকৃতির যেন অবারিত দ্বার সেটী।

প্রথমটী জমিদার সত্যবাবুর বাটী, দ্বিতীয়টী দুঃখী নিত্যর বাটী। দু'জনার বালক পুত্রদ্বয়ের মধ্যে গলাগলি ভাব;—যেন একবৃন্তে দুটী ফুল। অসম্ভব সম্ভব হোয়েছে।

লোকে বলে,—সত্যবাবুর ছেলের সঙ্গে ওই বেটা নিত্যর ছেলেটার এত ভাব হ'ল কি করে? নিত্য বেটা দু'বেলা খেতে পায় না, আর জমিদার বাবু হোচ্ছেন ..... আশ্চর্য্য কিন্তু!

কেউ বলে,—সত্যবাবু' ছেলেটা যে বড় ভাল। অহঙ্কার নেই, বড় মোলায়েম ছেলে।

দিন যায়, দু'জনার মধ্যে অচল, অটল বন্ধুত্ব নিয়ে। ধনী জমিদারের ছেলে বলে—ভাই, তুইত বড় হোলে আমাকে ভুলে যাবি নে?

ম্লান হেসে চিরদুঃখী গরীবের ছেলে বলে, আর দু'দিন পরে হয় ত' তুই আমাকে দেখে নাক সিঁটকে চলে যাবি। তুই যে ভাই ধনীর ছেলে, আর আমি গরীবের ছেলে,—দু'বেলা পেট ভরে খেতে পাই নে।

আবেগে ধনীর ছেলে গরীবের ছেলেকে আলিঙ্গন-পাশবদ্ধ করে।

বলে—আমার দ্বারা এও কি সম্ভব? না—না ভাই, তুই কিন্তু আমাকে ভুলিস না।

গরীবের ছেলে আবার ম্লান হাসে

ধনীর ছেলে বলে—'আমি যখন বাড়ীর কর্ত্তা হব, তখন তোকে অনেক টাকা পয়সা দোব, বাড়ী ক'রে দোব, জমিজমা দোব · ভাই, এখন ত' আমি কর্ত্তা নয়। তোকে এখন যা দিই, সমস্ত চুপে চুপে—পাছে বাবা জান্‌তে পারেন।'

গরীবের ছেলের চোখের কোণে অশ্রু আসে।

এই ভাবে দিনের পর দিন অবাধে কাটে।

হঠাৎ গরীবের ছেলে পিতার মৃত্যুর পর চোখে অন্ধকার দেখে। সংসার সাগরে বৃদ্ধা জননী, বিবাহ যোগ্যা ভগিনী এবং সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীকে লইয়া সে হাবু-ডুবু খায়।

দিন আর চলে না।...

অনেক দিন পর তার ধনী বন্ধু বিলাত [illegible] করে আসে। সে এখন বাড়ীর কর্ত্তা।

প্রাণভরা আনন্দ নিয়ে গরীব ধনী বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যায়।

দারোয়ান গেটে ঢুকতে দেয় না, উপহাস ক'রে তাড়িয়ে দেয়। চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে গরীব আপনার কুটীরে ফেরে, ভাবে—এই সেই বন্ধুর বাড়ী!

রাস্তায় দেখা,—ধনী বন্ধু মটর হাঁকিয়ে আসে। গরীব কম্পিত কণ্ঠে বলে,—ভাই, ভাল আছ?

ধনী অগ্নিদৃষ্টিতে বক্রভাবে একবার চায়, তারপর যেমন আসে তেমনি নক্ষত্র বেগে চলে যায়।

গরীবের বক্ষভেদে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে অনন্ত আকাশে লীন হয়।

ভাবে—হায়, এই সেই বাল্যবন্ধু!—যে একদিন বলেছিল,—ভাই, তুই ত' বড় হোলে আমাকে ভুলে যাবি নে?

দুঃখে, ঘৃণায় তার হৃদয় পূর্ণ হ'য়ে উঠে।

দেখে শুনে কাল মুচ্‌কি হাসে।

জমিদার ধনী বন্ধুর নিকট থেকে বাকি খাজনা আদায়ের জন্য গরীবের ঘরে পেয়াদা আসে। তাকে ধরে নিয়ে জমিদারের নিকট পেয়াদা হাজির করে।

গরীব কেঁদে বাল্যসখাকে বলে,—এই ভাদ্র মাসের শেষাশেষেই খাজনাটা দিয়ে দোব। দয়া ক'রে এই ক'টা দিন সময় দিন। দেখ্ছেন ত এবার দেশের কি অবস্থা। পেট ভরে মা বউ ছেলেকে খেতে দিতে পারৃছি না।

গম্ভীর কণ্ঠে ধনী বন্ধু বলে,—না বৎসর অনেক দিন শেষ হ'য়ে গেছে, আর কতদিন খাজনা ফেলে রাখা যায়। পাড়াপ্রতিবাসী বলে তোমাকে আমি তাগাদা দিই নাই। আচ্ছা যাও, ১০ দিন সময় দিলুম।

দর্ দর্ ক'রে গরীবের অশ্রু বক্ষ ঝরে। কাল দেখে শুনে বলে—কেমন? এই নাকি তোমার বাল্যবন্ধু? তোমাদের দু'জনার না এক মন, এক প্রাণ। দেখ—ঠেকে শেখ—হাঃ,—হাঃ

* * *

ধনী জমিদারের বাটীতে দুর্গোৎসব—বিরাট ব্যাপার বিপুল আয়োজন,—আনন্দ, ফূর্ত্তি, নাচ, গান…।

গরীবের বাটীতে যমরাজের দূতগণের তাণ্ডব নৃত্য—গরীবের পুত্রটীর এখন-তখন অবস্থা;—দুঃখ, কান্না, নিরানন্দ…।

খাজনা এ পর্য্যন্ত অনাদায়ে ধনীর পেয়াদা গরীবকে পুনরায় বেঁধে নিয়ে যায়।

ধনী বলে—তোমাকে যথেষ্ট দয়া দেখিয়েছি, কোথায় ভাদ্র মাস, আর কোথায় আশ্বিন মাস! ..

গরীব কেঁদে বাল্যবন্ধুর পা দু'টো শক্ত ক'রে ধরে বলে—হুজুর! ছেলেটী মর্তে বসেছে, আমার যথাসর্ব্বস্ব তার জন্যেই যাচ্ছে—আর একটা মাস সময় দিন, হুজুর। চিরকাল আপনার কেনা হ'য়ে থাকব।

কান্নায় ধনীর হৃদয় টলে না, হুকুম দেয়—আটক ক'রে রাখতে।

গরীব হাউ মাউ ক'রে কেঁদে উঠে, বলে—হুজুর পুত্র আমার শয্যাশায়ী।

ধনী বিদ্রূপ ক'রে বলে—তা' আমি করব কি? খাজনা দিবি না—আমার জমিতে বাস করিস্ কেন?

উঃ, এই সে বাল্যবন্ধু! গরীবের চোখে বান ডাকে। মনে পড়ে বন্ধুর শৈশবের কথা—আমি যখন বাড়ীর কর্ত্তা হ'ব, তখন তোকে টাকা পয়সা দোব—বাড়ী ক'রে দোব—জমি জমা দোব ..। আর আজ?…।

ধনী বলে—আচ্ছা, এখন ছেড়ে দিলাম; কিন্তু ও বেলা টাকা চাই-ই। জানই ত' বাড়ীতে দুর্গাপূজা, এখন আমার টাকার প্রয়োজন কত!

গরীবের হৃদয় বলে—আমার বাড়ীতে যে মৃত্যুপূজা!

ছাড়া পেয়ে গরীব ছুটে চলে মরণপথের পথিক পুত্রকে দেখ্‌বার আশায়। তার বুকের মধ্যে দুরু দুরু করে—অশুভ চিন্তা মনের কোণে উঁকি মারে—ভাবতে সে পৃথিবী অন্ধকার দেখে।

উর্দ্ধশ্বাসে ছোটে—কানদুটী সজাগ রেখে।

দূরে—অতি দূরে—ঠিক তারই বাড়ী থেকে ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি—

বাড়ীতে পা দিতেই সে শুন্‌তে পায় ক্ষীণ কণ্ঠের আকুল ক্রন্দন—বাতাসে দিগদিগন্ত ধ্বনিত হোচ্ছে। সেইখানেই সে বসে পড়ে। রামধনুর সাতটী রঙ তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই জমিদার ধনী বন্ধুর বাড়ী থেকে সপ্তমী পূজার ঢাক ঢোল বেজে উঠে—ক্ষীণ ক্রন্দন ধ্বনিকে গলা টিপে থামিয়ে দেয়।

পুষ্পপাত্র ফটোগ্রাফ প্রতিযোগিতা— ভাদ্র (২য়)



"বেলার শেষে"

প্রথম পুরস্কার -১০৲ — শ্রীবটুমাল বসু কলিকাতা

Lakshmibilas Press, Ltd.

পুষ্পপাত্র ফটোগ্রাফ প্রতিযোগিতা—ভাদ্র (২য়)





"অকূল পাথারে"

দ্বিতীয় পুরস্কার—৫৲ শ্রীসলিল মিত্র, কলিকাতা





"শ্রমিক"

অতিরিক্ত পুরস্কার শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়, [illegible]

এক

কাঁচা বয়সের কবিদের মধ্যে পুঁটুরাম ছিল অগ্রগণ্য! অবশ্য পুঁটুরাম নামে তাঁকে অনেকেই চিনত না—তাঁর একটা পোষাকী নাম ছিল;—সেটা হ'চ্ছে শ্রীসজল সেন।···পোষাকী হ'লেও এই নামটাই ও সচরাচর ব্যবহার করত!

আমরা ক'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া তা'র পুঁটুরাম নামটি কেউ জানত না! মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় শ্রীসজল সেন যিনি আমাদের বন্ধু পুঁটুরাম তিনিই!···

এই নূতন নামাকরণের কারণ, পুঁটুরাম—আমাদের যা' বলেছিল সেটা অবশ্য যুক্তিসঙ্গত! পাঠকরা নাকি লেখকের নাম দেখে গল্পের তারিফ করেন এবং সম্পাদকগণও নাকি মোলায়েম কবি-কবি নাম না হ'লে কবিতা ছাপতে চান্ না! দলের মধ্যে আমরা দুর্ভাগ্য বশতঃ কেউ কবিও না কিংবা সম্পাদকও না!

সজলের বৈঠকখানায় অর্থাৎ ওর ড্রইংরুমে ব'সে ব'সে আমাদের মাঝে মাঝে গল্প-টল্প হোত!···

এখানে সজলের একটু পরিচয় দিয়ে রাখি;—ম্যাট্রিক পাশ করা সজলের ভাগ্যে ঘ'টে ওঠেনি—তার আগেই মা সরস্বতীর একচোখোমীর মধ্যে ওর পড়া শুনা ছেড়ে দিতে হয়!···বাপ জমিদার বল্লেই হয়—পয়সা আছে, অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ আছে··· বেশ আরামে থাকতে লাগল!···আজ এর বাড়ী নেমন্তণ্ন কাল ওর বাগানে ডিনার এই রকম আরামে দিন কাটাতে কাটাতে একবার নেশা হোল ফটো তোলবার—দুশ টাকা দিয়ে এক ক্যামেরা কিন্‌লে! খুব কষে। ফূর্ত্তি কর্ত্তে লাগল! হঠাৎ একদিন লুকিয়ে কোন সুন্দরী মেমের ফটো তুলতে গেছিল—সেই হোল ওর কাল! মেম ওর নামে কেস্ করে,—তারপর ওর বাপ অনেক টাকা দিয়ে মিটমাট করে দিয়ে ক্যামেরা কেড়ে নিলে! সেইখানেই ফটোর নেশায় যবনিকা পতন!।

তারপর নেশা হোল বন্দুক ছোঁড়ার; খুব দামী একটা বন্দুক কিনে আজ এখানে, কাল ওখানে শিকার ক'রে বেড়াতে লাগল। কিছুদিন পরে হঠাৎ একটা সাহেবের কুকুরের গায়ে বন্দুকের গুলি লেগে যায়—সাহেবও সজলের নামে কেস্ করতে যাচ্ছিল কিন্তু সেবারও ওর বাবা অনেক টাকা দিয়ে মিট্‌মাট্ ক'রে দ্যায়।··· আর বন্দুকও কেড়ে নেয়···ওই খানেই বন্দুক ছোঁড়ার নেশা শেষ!

তারপর কত নেশাই হ'য়েছিল—একে একে সব শেষ হ'য়ে যাবার পর একদিন একখানা মাসিকপত্রিকা পড়তে পড়তে হঠাৎ কবি হ'বার নেশা হোল—এই নেশাটাই হল সব চেয়ে ভীষণ!···তখুনি চার পাঁচটা মাসিক পত্রের গ্রাহক হবার জন্যে চিঠি লিখে দিলে···সঙ্গে সঙ্গে কবিতা লেখাও চল্‌ল!···দুএকজন সম্পাদকের সঙ্গে ভাব ছিল—তারা সজলের কবিতা ছাপিয়ে দিলে! সজল মহা সন্তুষ্ট হ'য়ে তাদের কাগজের গ্রাহকভুক্ত হ'য়ে গ্যালো···ওর বাপও হাঁপ ছেড়ে বাঁচল··· ভাবলে···অন্য নেশার চাইতে এ নেশা তবু ভাল!

সজল কোট পরা ছেড়ে দিয়ে···গোটাকতক ফিন্‌ফিনে আপ্-টু-ডেট্ ষ্টাইলের পাঞ্জাবী তৈরী করে নিলে, তা'রপর লরেন্স্ মেয়োর দোকান থেকে একটা সৌখীন চশমা কিনে ব্যবহার করতে লেগে গ্যালো!···চুলগুলো লম্বা লম্বা রেখে বাবড়ী করে' ছেঁটে নিলে আর সর্ব্বসমেত "careful careless" ধরণে সাজসজ্জা [illegible]: অর্থাৎ প্রথম দর্শনেই মনে হোত যেন মরি-মরি মুখোপাধ্যায় কিংবা বঁধু কৈ বঁধু-কৈ বোস!···মুখে ছিল ওর একটা উদাস-উদাস ভাব, যেন পৃথিবীর কোন ধার ইনি ধারেন না—দু'টো পাখা হ'লেই ঊর্দ্ধ রাজ্যে উড্ডীয়মান হন্!

সজলের ড্রইংরুমে আমাদের মাঝে মাঝে আড্ডা ব'সত তা'তে সজল যে কথাগুলো বলত সেগুলো [illegible] নোট্ করে' নিই নি ব'লে' এখন [illegible] নেই, [illegible]

গুলো যে অবশ্য দাবী ক'. যতই আমি বলি না কেন-- আমাকে মানতেই হবে!

সজল বলত—দেখ, আমরা তরুণ—সাহিত্যেও আমরা একটা Novelty বা মৌলিকতা আনতে চাই!—সেই সেকেলে প্রবীণদের মত প্রেম-প্রেম-প্রেম আর প্রেম তা'তে নেই য়্যাডভেন্চার কিংবা কোনও রকম রস! ইংরেজী দু'একখানা নভেল পড়লেই তা' পাওয়া যায়!... সেকেলে লোকরা ওই চাইত কিন্তু আমরা লোকের taste বা লোক কি রকম পছন্দ করে তা' দেখে বই লিখব না, আমরা Society বা সমাজ কি রকম হওয়া উচিত তা'ই বলব;—আমরা লোকের taste গড়ে নেব, এই আমাদের লক্ষ্য বা mission.

ভুতনাথ আমাদের মধ্যে [illegible] উঠত—তা' হলে তোমরা কি প্রেম মানতে চাও না! প্রেমই ত' সব—[illegible] ত' প্রেমের কথাই লেখা আছে —[illegible] তাই চায়!

[illegible] তা'র চুল বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে পেছন দিকে সরিয়ে দিতে দিতে বলত—"যা লোকে চায় তা'ই কি মানতে হবে নাকি! প্রেমের কথা যা' বললে—ও একঘেয়ে হ'য়ে গ্যাছে—প্রেম আমরা মানি না, চিরকাল মানুষ কেবল নারীর প্রেমে পড়েছে বলে' যে কথা আছে তা' ভণ্ডামী ভিন্ন আর কিছুই নয়—প্রেম ট্রেম সব বাজে কথা—আসল জিনিষ নর নারীর কাছ থেকে যা' চায়, তা' নারীর যৌবন সেইটাকেই তা'রা পূজো করে...আর তা' ছাড়া আমরা ভুত বা ভগবানও মানি না! ভূত কে? ভূত যদি থাকত আর তা'দের ক্ষমতা থাকত আর তা'হলে জগৎ ত' একদিনে লুঠপাট হ'য়ে যেতো! ভূত দেখেছে এমন কথা কেউ বলতে পেরেছে?—আর [illegible] করে। আর ভগবানকে আমরা বিশ্বাস করি না কারণ ভগবান নামক অলক্ষিত দ্রব্যটি কেবল কতকগুলো ভীতু লোকদের কাজ করা থেকে নিবৃত্ত করার মন্ত্র! আমি বাস্তবিক ভগবান টগবান মানিনে। কারণ আমি যা' ভাল বুঝবো তাই করব তা'তে ভগবান আমাকে শাস্তি দিতে আসুক দেখি!—আমার [illegible] goal অর্থাৎ আমি যা' হবার জন্যে চেষ্টা [illegible] সাধনা [illegible] জীবনের ব্রত বলে মনে করি!

শুধু শুধু পাঁচ মিনিট টাক্ চোখ বুজে একটা অনিশ্চিতের ধ্যান করা বুড়ো লোকদেরই কাজ, ততক্ষণে আমার একটা চতুর্দশ পদী কবিতা লেখা হ'য়ে যায়!...

কথাগুলো শুনে আমরা একটু একটু প্রতিবাদ করতুম! কিন্তু শেষে একদিন একটা মতলব ঠিক করলুম!...দলের মধ্যে ছিলাম আমি অবিনাশ আর সুকুমার!...

দুই

মিসেস্ রায়ের বাড়ীতে একটা ভোজের বন্দোবস্ত করলুম! অবশ্য খরচ আমাদের কিছুই করতে হয়নি... খরচ করলেন সমস্তই মিসেস্ রায়! খুব আমুদে লোক! আসল উপলক্ষ্য হ'ল সজলকে ঠকান অর্থাৎ ওর মতের পরিবর্তন করান। আর নাম মাত্র উপলক্ষ্য যে'টা সেটা হ'চ্ছে মিস্ রায়ের পুতুলের বিয়ে!

সজলকে একটা কার্ড দিয়ে নেমন্তন্ন করা হোল,... আরও অনেক ভদ্রলোককে কার্ড পাঠান হোল।... আমাদের বন্ধুদের মধ্যে বাদ রইল না কেউ!

সন্ধ্যে হোল; সজল একটা ফিন্‌ফিনে ধুতি আর গায়ে একটা আদ্দির পাঞ্জাবীর উপর চাদর জড়িয়ে চুরোট ফুঁকতে ফুঁকতে এলো!...একটা বিস্ময়ের ভাব দেখিয়ে বললাম—হ্যালো, এই যে এসে গ্যাছো!

সজল মুখটাকে একটু কবি প্যাটার্ণের হাসিতে ভরিয়ে নিয়ে জবাব দিলে—হ্যাঁ দেরী হ'য়ে গ্যাছে নাকি?—তারপর ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে; বললে, হ্যাঁ পাঁচ মিনিট দেরী হয়ে গ্যাছে!

বললুম, কবিদের ও রকম একটু হয়। আমাদের মতন আলসে তো আর নয়, কবিদের কত কাজ!

সজল ঠাট্টা বুঝতে পারলে না, মনে করলে সত্যিই বুঝি আমি seriously বলছি; সজল বললে, মিস্ রায় কোথায়?

বললুম, চলনা, ভেতরে চল! সবাই আছেন—ব্যারিষ্টার মিটারের মেয়ে অলকা এসেছে। অলকা তোমায় এতক্ষণ খুঁজছিল—তোমার লেখা নাকি ওর খুব ভাল লাগে! একটু আগেই মিসেস্ রায়কে [illegible] আমাকেও জিগ্যেস্ করছিলেন, তোমার কথা। তোমার সঙ্গে আলাপ করবার তাঁ'র ভয়ানক ইচ্ছে।...

সজল ঘাড় বেঁকিয়ে জিগ্যেস্ করলে—কে বল দিকিনি—অলকার-নাম শুনেছি বটে! ব্যারিষ্টার মিটারের এক মেয়ে ছিল—সরেটোতে পড়তো—হাঁ সে—I beg your pradon তিনি এসেছেন নাকি ?

বললাম—হ্যাঁ হ্যাঁ সেই অলকা মিত্তির!—এইবার বি, এ পাশ দিয়ে বাড়ী এসেছে;…ব্যারিষ্টার মিটার তাঁর বিয়ের জন্যে ত' আমাকে বলছিলেন।—আমি ভেবেছিলুম দেখব!

সজল যেন বিরক্ত হোল;—থার মোড় ঘুরিয়ে বললে—হ্যাঁ, তিনি কি বলছিলেন আমার লেখা নিশ্চয়ই পড়েছেন ?

বললুম—পড়েন নি ?—কলকাতার কে নেই যে পড়েনি ?—তোমার নাম বাঙালী মাত্রই জানে।—সেদিন ট্রামে যাচ্ছি এক ভদ্রলোক—

চুপ-বলে' সজল নীরব হোল!—দেখলুম মিস্ রায়ের সঙ্গে আসছেন, মিস্ অলকা মিত্তির!

অলকা মিত্তির কাছে আসতেই আমি এগিয়ে গেলাম—বললুম—এই মিস্ মিট্র। আপনি যাকে খুঁজছিলেন—এই যে তিনি এসেছেন!—আসুন, আপনার সঙ্গে introduce করে' দিই!—এই ইনি হচ্ছেন, আমাদের বন্ধু আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রী সজল সেন!—

তারপর সজলের দিকে ফিরে বললুম—ইনি হচ্ছেন ব্যারিষ্টার মিটারের মেয়ে মিস্ অলকা মিত্র!—সম্প্রতি ইনি বি, এ দিয়েছেন—ফিলজফিতে অনার্স এবং ম্যাট্রিক Scholarship holder!

দু'জনে আধুনিক ষ্টাইলে নমস্কার করার পর—আলাপ হোল!—মিস্ রায় বললেন—সজল বাবু, বর দেখিবেন না!—কেমন বউ হোল দেখবেন না ?

—ও হোঃ আপনি—বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল! চলুন দেখে আসি! মিস্ রায় সজলকে নিয়ে Hall এর ভেতরে ঢুকে গেলেন!—আমিও চল্লুম পেছন পেছন!—মাঝে মাঝে অলকা মিত্রার সঙ্গে সজল কথা কইছিল!—ছোট টেবিলের ওপর মিস্ রায়ের পুতুলের বাক্স ছিল—মিস্ রায় সজলকে ডেকে বললেন—দেখুন সজল বাবু, এই হচ্ছে বর;—কি বলেন দেখতে ভাল না ?—নিউ মার্কেট থেকে দু'টাকা দিয়ে ক্রিষ্টমাসের সময় কেনা—ভাল দেখতে হবে না ?—আর কা'র সঙ্গে জানেন ত ?—লতির পুতুল মেরীর সঙ্গে!—দেখুন কেমন দেখতে—বরটা ঠিক আপনার মত আর বউটা কা'র মত বলুন দেখি ? ঠিক অলকার মত!…

অলকা লজ্জায় বেগুনি হ'য়ে উঠলো! মিস্ রায় বলে' উঠলেন—চলুন—আপনারা গল্প টল্প করুনগে যান—আমার একটা কাজ আছে-যাই!…

মিস্ রায় চলে' গেলেন;…আমিও আর সজলদের বাধা দেব না বলে' বললুম সজল আমি যাই একটু পরেই আসছি!…

সজল উত্তর দিলে আচ্ছা!…

উঠে এলুম; হল্ ঘরের পাশ দিয়ে উঠে আসছি। পাশের একটা অন্ধকার ঘর থেকে আমায় ডাকলেন, মিস্ রায়!…

কি ব্যাপার!…মিস্ রায় বললেন—সজল বাবুকে ঠকাবার কি করছেন?…আমি বললুম—সেত ঠিক আছে!…অলকাকে সব বলা আছে!…যখন সজল অলকাকে প্রেম নিবেদন করবে—অলকা অমনি সুকুমার হয়ে যাবে!…সজলও ভ্যাবা-গঙ্গারাম!!!

মিস্ রায় বললেন—আর একটা প্ল্যান্ করলে হয়না ?… সজল বাবুত ভুত আর ভগবান মানেন না—আজকে ওঁকে ভয় দেখালে হয় না ? আসুন না এই ঘরটায় কিংবা ওপরে কোনও ঘরে এই কাণ্ড করা যাবে!…

বললুম—এখন কি ক'রে হয়—আপনার তো এখন বেজায় কাজ।—আপনার ছেলের বিয়ে আর আপনি কাজ ছেড়ে আনন্দ করতে যাবেন ?

—না না এখন বলছি না—লোক টোক্ হাল্কা হ'য়ে যাক্—তারপর করা যাবে!

বললুম—বেশ!…

* * *

খাবার সময়ে দেখি সজল বাবু, অলকারূপী সুকুমার একসঙ্গে পাশাপাশি বসেছে;—

মিস্ রায় আমার দিকে চোখ দিলেন—আমিও উত্তর দিলাম! অন্য কোনও কথায় মন না দিয়ে শুনতে লাগিলাম—ওদের দু'জনের কথাবার্ত্তা।

অলকা বলছিল—আপনার গল্পগুলো আমার চমৎকার লাগে কেমন একটা সচ্ছল সরল ভাব···

সজল বিনয় জানিয়ে বললে—সকলেই ওই কথা বলে। আমি কিন্তু কিসে বড় বুঝতে পারি না—যাক্ পাঠক-পাঠিকাদের ভাল লাগলেই ভাল।

অলকা নাছোড়বান্দা! বললে—দেখুন সজল বাবু, আপনার 'পুষ্পপাত্রে' সেই 'কাকজ্যোৎস্না' গল্পটা আমার এমন ভাল লেগেছিল কি বলব! ভারী চমৎকার;—হোষ্টেলের সমস্ত মেয়েকে ডেকে ডেকে সেই গল্পটা পড়িয়েছি!···দেখলুম, সকলেই আপনার গল্প পড়েছে আর যা'রা না পড়েছে তা'রাও অন্ততঃ নামটা শুনেছে!···

সজল কথাগুলো শুনে পরিতৃপ্ত হোল—কিন্তু সে ভাব না প্রকাশ ক'রে একটু হেসে জবাব দিলে, হ্যাঁ সব কাগজেই লিখি কিনা···সম্পাদকরা বাড়ী এসে ধন্না দেন—না দিয়ে পারি না তাই নাম জানাটা স্বাভাবিক!···

[illegible] তখন বললে—আচ্ছা সজল বাবু—শুনেছি ত' মাসিক পত্রিকায় লিখলে টাকা পাওয়া যায়···আপনিও

সজল বললে···আর বলবেন না। আমাদের দেশের সাহিত্যের দুরবস্থা!···একে'ত পাঠকই নেই তা'র উপর ভাল লেখকও নেই!···কতকগুলো পুরোণো সাহিত্যিক আছে তা'রা কেবল তরুণদের দেখে নাক সিঁটকোবে—তা'দের কাগজে আমাদের গল্প ছাপায় নাত'!···আমরা তাই নিজেদের কাগজ করেছি···এখন আমরা তা'তে স্বাধীন মত প্রচার কর্চ্ছি! ইয়োরোপে কত কাগজ আর কত লেখক আর পাঠকের ত' অভাই-ই নেই!···সেখানে প্রত্যেক লেখার জন্যে পয়সা দিতে হয়···কিন্তু এখানে···গল্প ছাপাবার জন্যে ঝুনোঝুনি—টাকা দেওয়াত'দূরের কথা!

অলকা বললে—প্রায়ই আপনার নাম দেখতে পাই খবরের কাগজে···হয়ত আপনি কোনও তেলের বহুল প্রশংসা করছেন তাই তুলে দিয়েছে···আচ্ছা, ওসব তেল কি আপনারা সত্যি সত্যি মেখে প্রশংসাপত্র লেখেন—না অমনি টাকা ছায়!··

সজল বললে···সবরকমই হয়!···যেমন 'লক্ষ্মীবিলাস তেলে'র জন্যে সেদিন এক প্রশংসা পত্র লিখেছিলুম—ওটা সত্যিই খাঁটি—আমি রোজ ওই তেলই মাখি!···

অলকা তখন অন্য কথা আরম্ভ করলে!···আমি আরও মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলুম! মিস্ রায়ও মন দিয়ে শুনছিলেন···তা'কে একবার চোখ টিপে দিলাম—তিনিও উত্তর দিলেন চোখ টিপে।

অলকা বললে—আচ্ছা সজলবাবু, আজকাল কিছু লিখছেন নাকি?···

সজল বললে—হ্যাঁ অনেকগুলো লিখছি···চারটে গল্প!···সেদিন এক পত্রিকার সম্পাদক একটা নভেল লিখে দেবার জন্যে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছেন!···প্লটটা করে ফেলেছি—লিখতে শীঘ্র আরম্ভ করব;—নায়িকার নাম নিয়ে আটকে যাচ্ছে···কি নাম দিই বলুন দিকিন?···বেশ একটা আধুনিক নাম দিতে হবে!···

অলকা বললে—দীপ্তি—তৃপ্তি, উৎপলা এই সব নাম দিন!

সজল কিছুক্ষণ কিছু বললে না তারপর অলকার দিকে চেয়ে মিনতির সুরে বললে—আচ্ছা আপনার যদি কিছু আপত্তি না থাকে···তা' হ'লে···

—বলে' ফেলুন না আপত্তি আমার কিছু নেই—

—তা'হলে···'অলকা' নাম দিলে কেমন হয়!

অলকা বললে—তাতে আর এত সঙ্কুচিত হচ্ছেন কেন?···আমি ছাড়া কত অলকাই আছে···ওতে আমার কিছু আপত্তি নেই!···যদি আমার নামটা আপনার এতই ভাললেগে থাকে তা'তে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি!···আচ্ছা সত্যি সত্যিই কি আমার নামটা আপনার এতটা পছন্দ হয়েছে?

সজলের চোখ দেখি সত্যিই সজল হ'য়ে উঠল!···খানিক পরে বললে—সত্যি আমার অলকা নামটা খুব ভাল লাগে···বোধ হয় আপনার ওই নাম ব'লে···। অলকাও যেন খুব moved হয়েছে এই রকম ভাব দেখালে···অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ!

তিন

খাওয়া-দাওয়ার পরে মিস্ রায় এক ফাঁকে অলকার কানে কানে একটা কথা ব'লে এলেন!···

আমি ও মিস্ রায় দোতলার কোণের দিকের একটা ঘরের খাটের নীচে গিয়ে অন্ধকারে আশ্রয় নিলাম···মশা ভন্ ভন্ করছিল···ড্যাম্প্ জায়গা, কিন্তু তবু

একটা মজা করবার জন্যে বেশ একটা আনন্দ হচ্ছিল !… মিস্ রায় একেবারে আমার পাশেই ছিলেন…আমার মুখের কাছে তা'র গরম নিশ্বাস অনুভব করছিলাম !… আস্তে আস্তে কথা কইছিলাম !…আলো জ্বালা ছিল না… অন্ধকারে তার গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে হচ্ছিল…পাছে কথা কইলে কেউ জানতে পারে…

খানিক পরে অলকা ও সজল মিস্ রায়ের ব্যবস্থামত সেই ঘরে এসে পড়লেন—অলকা বললে—আসুন সজল বাবু, এইখানে একটু বসা যাক্…ঘুরে ঘুরে পা ব্যথা হ'য়ে গ্যাছে…কি বলেন !

সজল বললে—কিন্তু যে রকম অন্ধকার !…আলোটা জ্বালুন না…

অলকা দেওয়ালের গায়ে হাত দিয়ে দিয়ে সুইচটা আবিষ্কার করে' অন্ করে' দিলে ! সজল ও অলকা দুজনেই খাটের ওপর এসে বসল !…

অলকা বললে—দেখুন সজলবাবু, আপনার সেই কি একটা গল্প হ্যাঁ "প্রতিবেশীনী" । সেই গল্পটার নায়িকা রেবা যেখানে নায়কের সঙ্গে অন্ধকার ঘরে কথা কইছে, সেই খানটা ঠিক এই জায়গাটার মত !…শুধু আলোটা নিবিয়ে দিলেই হয়…

সজল—যদি আপত্তি না করেন, তা'হলে আমার কাছে একটা অসম্পূর্ণ গল্প আছে সেটা এখন পড়তে পারি !… এটা 'তরুণ লিপি'তে পাঠিয়ে দেব…

অলকা খুব আগ্রহ দেখিয়ে বললে—পড়ুন না…কিছু আপত্তি নেই—আপনার গল্প আমি যত পারি ততই পড়ব …সবই নতুন !…

সজল বললে—তবে শুনুন—গল্পটার নাম—

নগ্ন-কামনার হোমানলে—

অসীত আর পলাতকা…

প্রেসিডেন্সী আর বেথুন কলেজ !

দু'জনের আলাপ প্রথম কেমন করে হোল…সে খবর ওই দুজন ছাড়া আর একজন জানত তা'র নাম মীরা !… হীল উঁচু জুতো পরে' পলাতকা যখন বেথুনের বাসে উঠত—অসীত জানলার ফাঁক দিয়ে তা'র দিকে একদৃষ্টে তাকত চেয়ে…সমস্ত অঙ্গ তা'র উদ্বেলিত হ'য়ে যে অতৃপ্ত আশঙ্কার সৃষ্টি করত…তা'কে দূর করবার মত শক্তি অসীতের ছিল না একচুল !…একটা উদাম দুর্বার বাসনা নিয়ে অসীত বিছানায় পাশবালিশ জড়িয়ে পড়ত শুয়ে !… প্রতি অঙ্গে লাগত তখন তা'র দহনের শিহরণ…

অলকা ব'লে উঠল—বাঃ বাঃ, আপনার বেশ কল্পনার ভাবা…চমৎকার ! এমন অর্দ্ধেক পড়িয়ে রস মাটি করবেন না…সবটা লেখা হ'য়ে গেলে—পাঠিয়ে দেবেন তখন পড়ব !…উঃ, চোখে বড় আলোটা লাগছে—নিবিয়ে দিই কি বলেন !…

অলকা সুইচ অফ্ করে' দিয়ে এসে…বললে কই সজলবাবু, আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না ত…

সজল বললে—এই যে আসুন না আমার হাত ধরুন !

আমি নীচে বসে মিস্ রায়ের পা টিপে দিলাম…মিস্ রায় বললেন…চুপ !

অলকা ব'লে উঠল…ওকি সজলবাবু হাত অত জোরে টিপ্‌বেন না…লাগে ; ছাড়ুন !…আচ্ছা সজলবাবু আপনি কখনও কোনও মেয়েকে…

সজল বললে—অলকা কিছু মনে কোরনা তোমাকেই আমি ভালবেসেছি…প্রেমে পড়েছি…জীবনে এই প্রথম… আমাকে মাপ কর অলকা…আমি যদি কিছু অন্যায় ক'রে থাকি…আমাকে বিমুখ কোরনা অলকা…তোমার সঙ্গে সত্যি প্রেমে…

অলকা বললে—কিন্তু সজলবাবু আপনিত' প্রেম মানেন না…হঠাৎ আমার প্রেমে পড়ে গেলেন ?…

সজল বলে উঠলো…অলকা আমাকে প্রাণে মেরো না…আমি সত্যি বলছি, তোমাকে ভালবসেছি…

অলকা বললে—কিন্তু আপনি ত বলেন, শুনেছি যে আপনি প্রেম মানেন না—প্রেম নাকি মিথ্যে !… দেহের কামনা ছাড়া অন্য কোনও কামনা নাকি নর আর নারীর মধ্যে আসতে পারে না…আমি ত' সেই জন্যেই এতক্ষণ চুপ করে' ছিলুম…নইলে—সত্য বল্‌তে কী…

সজল বিজয়ীর মত বলে' উঠল…সত্যি বলছ ? সত্যি বলছ অলকা ?…কিন্তু আমরা প্রেম মানিনা। ওটা শুধু একটা কথার কথা…শুধু আমরা সাহিত্যে একটা novelty আনতে চাই বলে'—আর শিশুর

জন্যে না—সত্যি আমাদেরো মনে প্রেমে পড়বার ইচ্ছে প্রবল !…খুব প্রবল !…সত্যি অলকা তুমি আমাকে…

নীচে বসে' আমি হেসে মরে যাচ্ছিলাম…মিস্ রায় আস্তে আস্তে আমাকে বললেন—খাটটা উঁচু করে' তুলুন !

তুললুম…ওদিকে মিস্ রায়ও দু'হাতে উঁচু ক'রে ধরলেন—

সজল হঠাৎ চমকে উঠল—ওকি অলকা…কি হোল খাট নড়ে কেন ?…কই তুমি—এঃ কী অন্ধকার… আলোটা জ্বালো… অলকা…কই !

অলকা ভাণ করে' ভয় পেয়ে বলে' উঠল—সজল বাবু, পালিয়ে চলুন আমি আগেই শুনেছিলাম, এ ঘরে নাকি ভূত…

সজল লাফিয়ে উঠল। বললে…তাই নাকি ভূত ? আলোটা জ্বালো অলকা…ভূত ভূত…ঘাড় মট্‌কাবে… শীগ্যির জ্বালো…

অলকা বললে—আমায় ধরুন সজল বাবু—আমার মাথায় কে চাঁটি মারলে—উঃ, ওকি পালিয়ে যাচ্ছেন— উঃ বাপ্‌রে— কি ভূত ? মামদো ভূত নিশ্চয় !—

সজল লাফিয়ে পালিয়ে যেতেই দেয়ালে মাথা ঠুকে গ্যালো—রক্ত পড়তে লাগলো—চেঁচিয়ে বললে— অলকা আলোটা জ্বাল' অলকা—তুমি এত বিশ্বাস ঘাতক ! —উঃ রক্ত পড়ছে উঃ—

অলকা বললে—আমার ভয় করছে, সজল বাবু— আমার মাথায় কে মারছে যেন—সজল বাবু—ওকি ! আপনি কোথায় ?

সজল বলে' উঠল—আর কোথায় !—অলকা আজ বেঘোরে প্রাণ হারাতে হোল। মাথায় ভীষণ লেগেছে —হা ভগবান !—ভগবান রক্ষা কর !—অলকা ভগবানকে ডাক !

অলকা বললে—কিন্তু আপনি যে ভূত ভগবান মানেন না সজল বাবু !—

সজল বললে—এবার থেকে মানব—অলকা—আমার নাম তরুণ দল থেকে কেটে দেব—আমার সেই পুরাণ নামই থাকবে,—আমি আর সজল সেন নই আমি পুঁটুরাম ! পুঁটুরাম সেন নামেই গল্প ছাপাব—উঃ বাপ্ ! —অলকা—একবারটি আলোটি জ্বালো—আমি ভূত মানব —ভগবান মানব !

নীচে থেকে আমরা উঠে এসে সুইচ টিপে দিলুম— আলো জ্বলে উঠলো !—সজল সকলের দিকে চেয়ে ভ্যাবাচেকা মেরে গ্যালো—অলকা তখন অলকা নেই সুকুমার হ'য়ে গ্যাছে !

সজল বললে—ওকি—অলকা ?

সুকুমার বলে' উঠলো অলকা নেই তা'র বদলে আমি সুকুমার !—পুঁটুরাম তখন একেবারে।—'থ'

কালো মেঘ

শ্রীশম্ভুচন্দ্র সেন গুপ্ত

ওগো কালো মেঘ, তুমি কি আমার
প্রিয়ার চোখের কাজল হরি'
মমতা মেদুর-মাধুরী বুলালে
তৃষাতুর এই নয়ন ভরি ?
ভুলাতে বিগত সোণালী স্বপন—
মধু-যামিনীর স্মৃতির বেদন,
নিয়েছ কি সাজ প্রিয়ার মতন
পরেছ কি তার নীলাম্বরী ?

এলায়ে দিলে কি শিথিল কবরী
চির-বিরহীর বুকের 'পরে ?
হারানো সুখের বিজুরী চমকে
শিহরিয়া উঠি আবেগ ভরে।
উতলা পবন উদাসী হিয়ায়
আনিছে আদুরী ললিতা-প্রিয়ায়,
বধূর তনুর ভাসিছে সুবাস
তব সাথে, মেঘ, আকাশ ভ'রে' !

—

রায়বেশে

শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক বি-এ

প্রবন্ধ

যখন সহরবাসী 'প্যাভলোভা', 'উদয়শঙ্কর' প্রভৃতির নৃত্যে বিভোর, তখন আমাদের পল্লীগ্রামে পুরাতন চির-নূতন রায়বেশে নৃত্যের নূতন হিল্লোল তুলিয়াছেন আমাদের বন্ধুবর সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত আই, সি, এস্। এই নৃত্য বহুদিন অনাদৃত অবস্থায় আত্মগোপন করিয়াছিল সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে। বিবাহের শোভাযাত্রার সঙ্গে রায়বেশে দলের নৃত্য এখনো প্রচলিত আছে, কিন্তু এই রায়বেশে দলই যে আমাদের রণদুর্দ্ধর্ষ বাঙ্গালী বীরের বংশধর তাহা আমরা এতদিন জানিতে পারি নাই। গুরুসদয় লিখিয়াছেন, "কিন্তু ইহা এই পতিত বাঙ্গালী সমাজের একটা পরম আশ্চর্য্য সৌভাগ্যের কথা যে, উপবাসে নিরন্নোদর, শিক্ষার আলোক হইতে বঞ্চিত ও অস্পৃশ্যতার অন্ধ অবজ্ঞায় উপেক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও, ইহাদের আত্মার বীরোচিত তেজ ও আনন্দ ইহারা এখনো হারায় নাই; এবং তাহারা এই মহাসম্পদগুলি হারায় নাই বলিয়াই এখনো বাঙ্গালী হয়ত অতীতের আত্মঘাতী ভুল সংশোধন করিয়া ইহাদিগকে ইহাদের উপযুক্ত আদর ও স্নেহ দান করিয়া ইহাদের অন্নসংস্থান ও উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে, ইহাদিগকে বীরোচিত-প্রকৃতির শিক্ষকের পদে বরণ করিয়া লইবে, এবং ইহাদিগের নিকট হইতে আমাদের অতীত যুগের এই সকল উদ্দীপনাময় অমূল্য সামরিক নৃত্যকলা ও ব্যায়াম-ক্রীড়া শিক্ষা করিয়া জাতীয় জীবনে আবার শক্তি, সাহস ও আনন্দের সহজ ও জীবন্ত ধারার উৎস জাগাইয়া তুলিতে পারিবে, এই আশা আমি করি। এই যে, আজ আমাদেরই অতি আপন রায়বেশে যোদ্ধাদের সঙ্গে আমাদের বহুযুগের পর নূতন করিয়া আবার পরিচয় হইল, তাহার ফলে যেন সেই উদ্বোধন ও সেই প্রচেষ্টা আমাদের 'শিক্ষিত', 'সম্ভ্রান্ত' ও 'ভদ্র' সমাজের হয়—এই আমার প্রাণের আশা ও প্রার্থনা। 'রাইবিশে' নামে প্রচ্ছন্ন থাকিয়াও আজ সেই অতীত যুগের গৌরবময় বাংলার বীরসন্তান 'রায়বেশে' যোদ্ধাদের বীর বংশধরগণ আমাদিগকে আবার বীর প্রকৃতিতে নূতন করিয়া দীক্ষিত করুক ও বীরের প্রকৃত মর্য্যাদা দেখাইতে আমাদিগকে শিক্ষিত করুক।.... বাঙ্গালী যেন বাংলার পল্লীতে শত উদয়শঙ্করের শিক্ষাগুরু স্থানীয় ভারতীয় আদিম বিশুদ্ধ তাণ্ডব নৃত্যকলার যে জীবন্ত মূর্ত্তরূপ আজ কাঙ্গাল বেশে বাংলার পথে পথে বেড়াইতেছে, তাহাকে চিনিয়া লইতে পারে এবং তাহার প্রকৃত আদর করে।"

এই বীর নৃত্যের মধ্যে কাল-প্রভাবে বহু ভেজাল জুটিয়াছিল। রায়বেশে 'রাইবিশে' হইয়া খেমটা নাচের হীন অনুকরণ পটু হইয়াছিল। গুরুসদয় এই নৃত্য হইতে খাঁটী বীর নৃত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। বীরভূমের 'গোয়ালিয়া'র যে রায়বেশে সেনা কলিঙ্গ জয় করিয়াছিল, যাহারা মানসিংহের সময়ের অজেয় বীর বলিয়া খ্যাত ছিল, তাহাদেরি বংশধরগণের নৃত্যকে খাটি রায়বেশে নৃত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আমাদের এই নৃত্য দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সত্যই "এমন পুরুষোচিত নৃত্য দুর্লভ" আমিও এই নৃত্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম। কি বিচিত্র লীলাময় অঙ্গ চালনা, কি লীলাময় ক্ষিপ্র লঘু গতি!

এই রায়বেশেগণ সত্যই যেন রসকলার সাধক, শত অবজ্ঞা অনাদরের মধ্যে ইহারা সেই প্রাচীন নৃত্যকে আপন করিয়া রাখিয়াছে। গুরুসদয়ের সোণার কাঠির স্পর্শে আজ মৌন মূক অনাদি অতীতের মুখে বাণী ফুটিয়াছে। এই রায়বেশে নৃত্য প্রচলনের জন্য গুরুসদয় অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকুণ্ঠ অর্থব্যয় করিতেছেন; তাঁহার ন্যায় দরদী হৃদয় বাংলার গৌরব। সৌভাগ্যক্রমে তিনি কতকগুলি সুযোগ্য সহযোগী পাইয়াছেন—বীরভূম ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রায় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর সি, আই, ই, শ্রীযুক্ত রায় নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

বাহাদুর, শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র এবং স্থানীয় নিজ Lees ক্লাবের উৎসাহী সভ্যগণ।

লাভপুর, সুলতানপুর, নলহাটী প্রভৃতি স্থানগুলিতে রায়বেশে নৃত্য ও ব্যায়ামের প্রচলন হইয়াছে, উহা দেখিবার জিনিষ। দেশের ছেলেরা এমন সুন্দর স্বদেশী সহজ সরল নৃত্য ও ব্যায়াম যে কেন এতদিন শিখে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য মনে হয়। এই নৃত্য সম্বন্ধে গুরুসদয় বঙ্গলক্ষ্মীতে ধারাবাহিক যে সুন্দর প্রবন্ধগুলি লিখিতেছেন, তাহা প্রত্যেক বঙ্গবাসীরই পাঠ করা উচিত। এ নৃত্য সম্বন্ধে কেন যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে না দেখিয়া দুঃখ হয়। অদ্য আমি গুরুসদয়ের রচিত কবিতাটী উদ্ধৃত করিতেছি এবং যদি পাঠক-পাঠিকাগণের অনুমতি পাই এ নৃত্য সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

রায়বেশের পরিচয়

"বাঙ্গালী যোদ্ধার কি স্বরূপ দেখায়
তার সাক্ষাৎ মূর্ত্তি যদি দেখবি ত আয়।
'বোরো বোদুর'র ও অজন্তার গুহা হতে
যেন উঠে এসেছে লোক বাংলার পথে!
বহু দীর্ঘ শতাব্দীর অবজ্ঞা সয়ে
পথে ভ্রমে বীরের দল কাঙ্গাল হয়ে।
তবু ভোলে না অতীতের গৌরব ধারা
নাচে বীরের নৃত্য—হয়ে আত্মহারা।
পদ দলিত লাঞ্ছিত নির্য্যাতিত
থাকে নিরন্নোদর—রাখে বক্ষ স্ফীত।
পায়ে বাজল নুপুর, বুকে অসীম সাহস,
পেটে অন্নের ক্ষুধা, মুখে নৃত্যের হরষ।—
মুহুঃ হুঙ্কার রবে ভীতি জাগায় মনে,
তেজো দীপ্ত স্ফুলিঙ্গ—ঝলক নয়নে,—
বেড়া পাকের চাকে কভু দ্রুত ঘুরে,
বেগে দাপট মেরে, কভু শূন্যে উড়ে;—
কভু ব্যাঘ্র রূপে পড়ে ভূমিতলে,
কভু লম্ফে কাঁপায় ক্ষিতি সিংহের বলে।
মহা দেবের মূর্ত্তি কালের ভস্মে ঢেকে;—
খেলে তাণ্ডব নৃত্য গায়ে ধূলি মেখে,
রণ ভল্লবিহীন হাতে মুষ্টি পেকে'
রণ ভল্ল বিক্ষেপ রীতি বেড়ায় এঁকে।
কবে আস্‌বে সে দিন—ভাবে থেকে থেকে
যেদিন চিন্‌বে স্বদেশবাসী আমরা যে কে?

গুরুসদয় সত্যই গাহিয়াছেন—

"রণ নৃত্য কলার তেজোদ্দীপক ধারা
যারা বুঝবে এদের কাছে বুঝুক তারা।
রণ বীরের ক্রীড়ার তেজোস্ফূটক ধারা।
যারা শিখবে এদের কাছে শিখুক তারা।"

পাথেয় উপন্যাস

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

২০ (পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সন্ধ্যা করিতে বসিয়া মনীষার চিত্ত আজ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, সে কিছুতেই মন-সংযোগ করিতে পারিতেছিল না।

কোনমতে সন্ধ্যা শেষ করিয়া সে খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইল।

নীচে রাজপথে লোকজন, গাড়ী মোটর যাতায়াত করিতেছে, বিদ্যুতালোকে পথ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে সেদিকে তাহার দৃষ্টি নাই। নীলাকাশের এককোণে যেখানে পঞ্চমীর ক্ষীণ চাঁদখানা জড়সড় ভাবে ভাসিয়া উঠিয়া ক্ষীণ আলো ছড়াইয়া দিতেছিল সে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। সন্ধ্যার স্নিগ্ধ শীতল বাতাস ঝরঝর করিয়া বহিয়া আসিয়া তাহার সমস্ত গায়ে লাগিতেছিল, মাথার রুক্ষ অবিন্যস্ত চুলগুলাকে আরও এলোমেলো করিয়া দিতেছিল।

মনীষা ভাবিতেছিল, তাহার পিতা মাতার কথা। মা বহুকাল পরে হঠাৎ সেদিন এ বাড়ীতে কেন যে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহা সে তখন বুঝিতে না পারিলেও—তিনি যে কোনও উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা ঠিকই বুঝিয়াছিল এবং সেই উদ্দেশ্যটা যে কি তাহা ভাবিয়া উৎকণ্ঠিতাও হইয়াছিল বড় কম নয়।

প্রথমেই বিলাসিনী মায়ের বাহ্য সৌন্দর্য্য তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল এবং সে বড় কুণ্ঠিতা হইয়াছিল। মাও এই ব্রহ্মচারিণী কন্যার পাশে অত বিলাসিতা লইয়া দাঁড়াইতে সঙ্কোচবোধ করিতেছিলেন এবং সেই জন্যই তাড়াতাড়ি জুতা খুলিয়া কাপড়খানা সাধারণভাবে পরিয়াছিলেন, মুখের রং গুলাও চট করিয়া মুছিয়া ফেলিলেও সম্পূর্ণ যায় নাই।

যাহাই হোক—মায়ের উদ্দেশ্য বুঝিতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই। মা তাহার পাগলামি এই নারী-প্রতিষ্ঠানের অনেক নিন্দা করিয়াছিলেন, যত সব নীচ মেয়েদের সংস্রবে আসার জন্য তাহাকে তিরস্কারও করিয়াছিলেন এবং অজস্র চেখের জলও ফেলিয়াছিলেন।

মনীষা অসহায়ভাবে বলিয়াছিল, "কিছুই করব না তবে বিধবার জীবন কি ভাবে কাটবে মা তার একটা উপায় ঠিক করে দাও, একটা পথ দেখাও।"

মা রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "পথ লোকে দেখাবে কি? অনেক সময় নিজেই দেখে নিতে হয়, নিজেকে এই যে প্রবঞ্চনা করছিস মনীষা,—নিজেকে ঠকাচ্ছিস্, পরকে ঠকাচ্ছিস এর ফল কি বল দেখি? জোর করে বললেই কি হয়—আমি বিধবা, আমার কামনা বাসনার ধ্বংস হয়ে গেছে? জোর করে একখানা থান পরলেই কি মনটাকে পবিত্র রাখা যায়? তা যদি হতো—তবে আজ নিজেকে ব্যর্থ মনে করে কাজ খুঁজে বেড়াতিস্ নে, মনকে মিথ্যে প্রবোধ দিতে চাইতিস্ নে।"

মনীষার মুখখানা শবের মতই বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; সেই বিবর্ণ মলিন মুখখানা মায়ের প্রাণে বড় বেশী রকম আঘাতই বুঝি দিয়াছিল। তাই শেষটায় তাহার মাথা নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া স্নেহভরে রুক্ষ এলোমেলো চুলগুলা সাজাইয়া দিতে দিতে স্নেহ কোমল কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "আমার কথা শুনে চল্ মনীষা, মিথ্যে এমন করে নিজেকে বঞ্চনা করিসনে অন্তরের বৃত্তিগুলোকে চেপে পিষে ফেলে শুকিয়ে যাস্ নে। নারীর মনের শ্রেষ্ঠ কামনা মা হওয়া, এ ভাব তাদের মনে এতটুকু বেলা হতে জেগে ওঠে, তাই না তারা এতটুকু বেলা হতে খেলাঘরে সংসার পাতায়, পুতুলের মা হয়। সত্যি করে বল দেখি মনীষা, তোর মনের অন্তরালে এখনও এই বাসনা কি লুকিয়ে

নেই? তুই কার চোখে ধূলো দিতে চাচ্ছিস্ বল দেখি;—আমি যে তোর মা আমায় ভুলিয়ে দেওয়া কি বড় সহজ? আমি তো বুঝছি, তোর অন্তরের সেই কামনাকে ধ্বংস করবার জন্যেই তুই নিয়ত কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছিস, কাজের চাপ দিয়ে তুই তোর কামনা-বাসনা বৃত্তিগুলোকে গুঁড়িয়ে ফেলতে চাস্। কিন্তু না, আমি তোকে এমন করে ধ্বংস হতে দেব না। কেন না আমি তোর মা; তোর এতটুকু বয়সে যেমন ইষ্ট চিন্তাই করে এসেছি, এখনও তেমনই করি বলে তোর জীবনটাকে আমি শান্তিতে ভরিয়ে তুলব। সংসার এখনও তোর মায়া ছাড়ে নি, তুই তার ডাক এড়িয়ে যাচ্ছিস্ কি করে বল দেখি?"

মা সে দিন যে কথাগুলা বলিয়া গিয়াছিলেন সময়ে অসময়ে সেই কথাই তাহার মনে পড়িতেছিল, সে এসব কথা ভুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল, আরও বেশী করিয়া কাজ করিতেছিল।

পিতা মাতার মনের ভাব সন্তানের বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বাল্য হইতে রতিনাথের নিকটে আসিয়া সে পাপপুণ্য, ভালমন্দ বিবেচনা করিতে শিখিয়াছিল। সেই জন্যই পিতামাতার আচরণ তাহার নিকট বড় বিসদৃশ্য বলিয়া মনে হইত। সে প্রাণান্তেও পিতামাতার কথা তুলিত না, পিতামাতার অবাধ বিলাসিতা তাহাকে বড় পীড়া দিত বলিয়াই সে তাঁহারা লইয়া যাইতে চাহিলেও ভবানীপুরে যাইত না।

পিতার সহিত রতিনাথের দেখা হইয়াছিল, তিনি আবার কি বলিয়া গেলেন জানিবার জন্য তাহার উৎকণ্ঠা বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সে বেশ জানিতেছিল, রতিনাথের শিরঃপীড়া তাহার পিতার সহিত দেখা করার ফলে হইয়াছে। নিদারুণ আঘাত হঠাৎ না পাইলে তাঁহার এরূপ শিরঃপীড়া হয় না।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার যখন রতিনাথের নিকটে ফিরিয়া আসিল, তখনও তিনি চুপ করিয়া চোখের উপর হাতখানা আড়াআড়ি ভাবে রাখিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি নিদ্রামগ্ন অথবা জাগ্রত তাঁহার ভাব দেখিয়া কিছুই বুঝা যাইতেছিল না। মনীষা নিঃশব্দে আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে খানিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া তেমনই নিঃশব্দে ফিরিবার উপক্রম করিল।

রতিনাথ চোখের উপর হইতে হাত নামাইলেন "কে, মণি, সন্ধ্যাহ্নিক হয়ে গেছে?"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মনীষা বলিল, "হ্যাঁ বাবা, এই হল।"

"আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও না মা, বড় দপ্ দপ্ করছে।"

মনীষা তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, "বাবা কি বলছিলেন বললেন,—"

রতিনাথ তাহার হাতখানা কপালে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিলেন, খানিক নির্ব্বাকে থাকিয়া হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, অনেক কথাই হয়েছে; তিনি যে আমার পরে বেশ একটু রাগও করেছেন তাও আমি বুঝেছি। প্রথমটায় আমি তাঁকে একেবারেই শেষ জবাব দিয়ে দিলুম, তারপর তাঁর যুক্তি তর্কে আমারই হার হয়ে গেল।"

উৎকণ্ঠিতা মনীষা বলিল, "কিসের যুক্তি-তর্ক বাবা? তিনি কি বলতে এসেছিলেন?"

রতিনাথ বলিলেন, "তিনি আমায় বুঝিয়ে দিলেন, নিজের স্বার্থের দিকে চেয়ে আমি অপরের কতখানি অনিষ্ট করছি। এখন মা আমি বেশ বুঝতে পারছি—তোমায় এ রকম ভাবে হাত পা বেঁধে একটু একটু করে দগ্ধ করার চেয়ে একেবারে হত্যা করাই ভাল ছিল। আমি যে তোমায় বাঁচিয়ে রেখে তোমার মহৎ উপকার করেছি তা নয়। স্বার্থপরের মত কেবল নিজের দিকটাই দেখে যাচ্ছি, তুমি যে আমার স্বার্থসিদ্ধির মূলে নিজেকে বলি দিয়েছ, তা তো জানি নি মা।"

মনীষা রুদ্ধশ্বাসে তাঁহার কথা শুনিতেছিল, হাঁফাইয়া উঠিয়া বলিল, "আপনি এ সব কি বলছেন বাবা, আপনার স্বার্থসিদ্ধির মূলে আমি নিজেকে বলিদান দিয়েছি—এসব কি কথা? আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছিনে।"

শুষ্ক হাসিয়া রতিনাথ বলিলেন, "কল্যাণী তুমি, কি করে বুঝবে মা? আমরা বুঝে ও তুমি অবুঝের মত থাকতে চাও। তোমার বাবা তোমার বিয়ের কথা বলতে এসেছিলেন, আর আমিও তাতে মত দিয়েছি।"

"আমার বিয়ে—বাবা আপনি এ কি বলছেন?"

মনীষা হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল।

তাহার হাতখানা দুই হাতে নিজের ললাটের উপর চাপিয়া ধরিয়া শ্রান্তকণ্ঠে রতিনাথ বলিলেন, "সেটা তো অন্যায় নয় মা বরং তাতে ভালই হবে। তোমার বাবা ভেবে নিলেন আমি তোমার বিয়ের কথা একবারও ভাবি নি, কিন্তু তা নয় মণি, আমিও অনেক ভেবেছি। কিন্তু কি জানো—পাছে নিজের স্বার্থে আঘাত লাগে, পাছে তোমায় হারাতে হয় এই ভয়ে সে কথা মুখ ফুটে একটা দিনও বলতে পারি নি। যে দিন তুমি মুখ ফুটে আমায় জিজ্ঞাসা করলে—"বিধবার দিন কি ভাবে কাটে," সেই দিন আমার বুকে একটা ভীষণ আঘাত লাগল, আমি ভাবতে লাগলুম—তাই তো, কি ভাবে তোমার দিন কাটবে। ব্রহ্মচর্য্য পালনের যোগ্য অধিকারী কি সবাই হতে পারে মনীষা? আমি ভুল বুঝেছিলুম, ভেবেছিলুম—কেন পারবে না? সেই ভুল করেই না আমি তোমায় এ পথে আনতে গিয়েছিলুম। আজ বুঝছি—কাউকে কিছুই করানো যায় না, অপাত্রে অমৃতও বিষ হয়ে ওঠে

তিনি দুই হাতের মধ্যে মুখখানা চাপিলেন। মনীষা নীরব, নিশ্চল, নিঃশ্বাস পড়িতেছিল কিনা তাহাও সন্দেহ।

অনেকক্ষণ নীরবে থাকিয়া রতিনাথ মুখ হইতে হাত নামাইলেন, তখন তাঁহার মুখে বেশ স্বাভাবিক ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে।

মৃদু হাসিয়া তিনি বলিলেন, "আমার ও সব কথা ধরো না, মা, কি বলতে কি বলি তার ঠিক নেই। যাই হোক, আমি মত দিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে পাত্রের খবরও দিয়েছি। আমাদের শশাঙ্কের মত ছেলে পাওয়া দুষ্কর; আর তার পরে আমার জোরও খাটবে খুব, তাই ভাবছি যদি তোমার বিয়েই দিতে হয়—আর কাউকে দেব না, ওকেই আমার চাই। কি বল মা, সেই কি ভাল হবে না? একবার তার হাতে মেয়ে দিয়েছিলুম, তাকে আপনার করে নিয়েছিলুম, অদৃষ্টে নেই—অমন জামাই আমার সইল না। ভগবানের ইচ্ছা বোধ হয় এই, তোমার দিয়ে আবার আমি তাকে নিজের খুব কাছে পাব। আমি সেই মন করে অফিসে বসেই তাকে পত্র দিয়ে এসেছি, যেন সে পত্র পাঠমাত্র আমার এখানে চলে আসে। যাই হোক—তার মতটা তো একবার নেওয়া চাই। তোমার মা সেদিন এসে নাকি জেনে গেছেন—বিয়ে করতে তোমার মত আছে। আমার এ কথা শুনে বাস্তবিকই একটু কষ্ট হয়েছিল এই ভেবে কে এ কথাটা তুমি আমায় একবার জানাতে পারলে না মা? তারপর নিজেই মনকে প্রবোধ দিলুম এই বলে—আমি কে, পর বই তো নই। যার সঙ্গে এসে আমার সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে গিয়েছিলে, সে তো আজ নেই, তবু যেটুকু কর সে আমার সৌভাগ্য। নিজের মাকে বলবে না তো আর কাকে বলবে মা? আর এও সত্যি কথা, এই আবার বিয়ে করাটাকে নিতান্ত নোংরা জিনিস বলেই আমি ভাবতুম আর সেই জন্যেই কোনদিন তোমায় এ সম্বন্ধে একটা কথাও বলি নি।"

মনীষা ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কথা শেষ হয়েছে কি?"

তাহার কণ্ঠ স্বরে চমকাইয়া উঠিয়া রতিনাথ তাহার পানে চাহিলেন, কিন্তু সে মুখে এতটুকু বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না।

রতিনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, তুমি বেশ করে ভেবে দেখ নিজে। যদি বিয়ে করতে হয় তবে শশাঙ্ককেই করো, তোমায় দেবীর আসনেই রাখবে, কারণ সে নারীকে কেবলমাত্র ভোগ বিলাসের সামগ্রী বলে ভাবে না।"

মনীষা উঠিল, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল—যেন একখানি ছায়ার মতই।

(২১)

সারারাত্রি মনীষা ঘুমাইতে পারিল না, ছটফট করিতে লাগিল।

পিতা মাতার কথা মনে করিয়া তাহার যেন বুক ফাটিয়া কান্না আসিতেছিল। পিতা মাতা সন্তানকে ভালবাসেন বলিয়াই তাহাকে সুখী করিতে চান, কিন্তু এই কি সেই ভালবাসা, এই কি সন্তানকে সুখী

করা? মনীষার মনে হইতেছিল—তাহার পিতামাতা সুখের নামে তাহাকে দুঃখই দিতে আসিয়াছেন, ভালর নামে তাঁহারা মন্দই করিয়া যাইতেছেন।

বিবাহ করিতে হইবে—সংসার পাতাইতে হইবে—মানুষের জীবনে এই কি একমাত্র সার্থকতা? বিবাহ করা ছাড়া সে কি সংসার পাতাইতে পারে না; সে কি সংসারের কেহই হইতে পারে না? এই যে বিশাল সংসার, ইহার মধ্যে তাহার কি এতটুকু স্থান হইতে পারে না, কেহই কি তাহাকে আপনার বলিয়া ভাবিয়া লইতে পারে না?

বিবাহ—কথাটা মনে করিতেও বুকের মধ্য দুলিয়া উঠে। যে ফুলে একবার দেবতার পূজা হইয়া গিয়াছে, সে ফুলে আর কি পূজা করা যায়? মনীষা জানে, সে পূজার নির্ম্মাল্য সে একবার উৎসর্গিত হইয়া গেছে তাহাকে দিয়া আর পূজা হইবে না। সে সংসারে থাকিয়া সংসারের উপকার করিয়া যাইবে—যতখানি তাহার সাধ্যে কুলায় তাহা করিবে, কিন্তু সংসারের আবর্জ্জনায় জড়াইবে না।

কত সাধনার ফলে, কত কঠোরতার ফলে সে এতখানি উঠিয়াছে। আবার তাহাকে এস্থান হইতে নামিতে হইবে, আবার সংসারের পঙ্কে ডুবিবে?

কিন্তু কোথায় যাইবে সে, কোথায় গিয়া সে পরিত্রাণ পাইবে? জ্ঞান হইয়া অবধি সংসারের যে পঙ্কিলতাকে সে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে, আবার সে নিজেই সে পঙ্কিলতার মধ্যে নামিবে? তাহার বেদ, বেদান্ত, গীতা, উপনিষদ পড়া ব্যর্থ হইবে, এত দিনকার সংযম, নিষ্ঠা বিসর্জ্জন দিয়া সে এই সংসারে গা ভাসাইবে!

মনীষিগণ বলিয়াছেন—ভোগেই ভোগের তৃষ্ণা বাড়ে, ত্যাগ দ্বারা কেবলমাত্র জয়ী হওয়া যায়, ভোগের ফলে পরাজয় যে নিশ্চিত সে কথা সংসার বুঝিল না।

নিজের পরিধেয়, নিজের অলঙ্কারশূন্য হাত দুখানার পানে তাকাইয়া মনীষা দীর্ঘশ্বাস রোধ করিতে পারিল না।

মনীষা নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করিল—সে কি চায়? উত্তর সহজেই মিলিল—সে ভোগ চায় না। জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সে যে উপদেশ পাইয়াছে, যে দৃষ্টান্ত দেখিয়াছে, ঠিক সেই মত নিজেকে গঠন করিয়া লইয়াছে। আজ সে ভোগের পথে চলিতে গেলে তাহার সংস্কার তাহাকে বাধা দিবে। তাহার অন্তরে বিবেক আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিতেছিল,—"না না, আমার এমন করিয়া গলা টিপিয়া হত্যা করিয়ো না, আমায় বাঁচাও—আমায় বাঁচিতে দাও।"

কেমন করিয়া মনীষা তাহাকে বাঁচাইবে? তাহার দুরদৃষ্টক্রমে যাহারা রক্ষক আজ তাহারাই ভক্ষক হইয়াছে। সন্তান ব্যথা পাইয়া যে মায়ের কাছে ছুটিয়া যায়, সেই মা তাহাকে আঘাত দিয়াছেন, তবে সে কি করিবে?

হয় তো মায়ের অপরাধ নাই। মা জানেন না তাঁহার এ প্রস্তাব কন্যাকে কতখানি আঘাত দিয়াছে। মা যে চোখে সন্তানকে দেখিয়া তাহার মঙ্গল কামনা করেন, মা সেই চোখে মনীষাকে সর্ব্বহারা ব্রহ্মচারিণী দেখিয়া আবার তাহাকে সব দিয়া সংসারের একজন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

কিন্তু না, এও কি সম্ভব? চিরদিন নিজের মতে চলিয়া আজ সে একান্তভাবে পরের মতের উপর নিজেকে ছাড়িয়া দিবে? তাঁহার যে দেহটাকে ভগবানের পবিত্র সিংহাসন বলিয়া জানে, সেই দেহটাকে কুকুরের পদদলিত হইতে দিবে? যে যাহাই বলুক, তাহার কি নিজের বলিয়া কিছু নাই, যাহা দ্বারা সে নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে পারে?

জগৎ তাহার বিপক্ষে যদি আজ দাঁড়ায়, দাঁড়াক, সে ভয় পাইবে না, সে নিজের ব্রত অক্ষুণ্ণ রাখিবে। কই, তাহার মন তো মায়ের প্রস্তাবের অনুমোদন করে নাই—সে তো এতটুকু খুসি হইতে পারে নাই।

কিন্তু শশাঙ্ক—

তাহার কথা মনে করিতেই মনীষার মনটা সঙ্কুচিত হইয়া গেল। কেবল সে একাই নয়, সকলেই লক্ষ্য করিয়াছে, শশাঙ্ক তাহার সহিত মিশিতে, তাহার সহিত কথা কহিতে সর্ব্বদা ব্যগ্র হইয়া থাকে। রতিনাথ পর্য্যন্ত ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সেই জন্য তিনি শশাঙ্কের সহিতই তাহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

কিন্তু ছিঃ শশাঙ্ক সত্যই কি তাহাকে চায়? ভালবাসিতে হয় তো পারে, সন্তান মাকে ভালবাসে, ভাই বোনকে ভালবাসে, শিশু চাঁদ ভালবাসে, কাজেই

মানুষের ভালবাসা দোষের নয়, কারণ ভালবাসা মানুষের স্বভাবজ ধর্ম্ম। কিন্তু শশাঙ্ক কি ভালবাসে? শশাঙ্ক কি তাহার এই ধ্বংসশীল দেহটাকেই কামনা করে, তাই কি সে তাহার সহিত মিশিতে চায়?

বিরুদ্ধ সকল চিন্তা ঠেলিয়া ফেলিয়া সহসা সে আর্ত্ত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না, না, তা কখনই হবে না, কখনই হবে না, আমি নিজের ব্রত বিসর্জ্জন দেব না, আমি পরের লালসা মিটাবার জন্যে সৃষ্ট হই নি। আমি স্ত্রী নই, আমি মা, আমি বোন।"

মনীষার দুই চক্ষু দিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ছট্‌ফট্ করিয়া ভোরের দিকটায় একটু ঘুম আসিয়াছিল। বাড়ীর দাসদাসীদের কাজ-কর্ম্মের শব্দে কথাবার্ত্তায় যখন সে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখন বেশ বেলা হইয়াছে, খোলা জানালা দিয়া অনেকখানি সূর্য্যের আলো ঘরের মেঝের আসিয়া পড়িয়াছে।

কোনদিনই মনীষার এত বেলায় ঘুম ভাঙ্গে না, প্রতিদিন সে বাড়ীর সকলের আগে উঠিয়া স্নান করিয়া পূজার ঘরে যায়, পূজার ঘর হইতে যখন সে বাহির হইয়া আসে তখন রতিনাথ শয্যাত্যাগ করেন। মনীষা স্বহস্তে তাঁহাকে চা ঢালিয়া দেয়, চা পান করিয়া তাহার পর তিনি বাহির হন।

আজ সেই চিরন্তন নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া গিয়াছে; এমন ধারা মনীষার জ্ঞানে কখনও হয় নাই।

পূজার গৃহ হইতে বাহির হইয়াই সামনে একজন দাসীকে দেখিতে পাইয়া মনীষা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কোথায়?"

সে উত্তর দিল, "তিনি চা খেয়ে বাইরে গেছেন।"

মনীষা ধীরপদে নিজের গৃহে প্রবেশ করিল।

প্রতিদিনকার মত রতিনাথ স্নানান্তে আহার করিতে ভিতরে আসিলেন। প্রতিদিনকার মতই মনীষা নিকটে গিয়া বসিল।

তাহার মুখ আজ অন্যদিনকার মত আনন্দদীপ্ত নহে, বিশেষ অন্ধকার যেন সে মুখে ঘনাইয়া আসিয়াছে।

আহার করিতে করিতে রতিনাথ দুই একবার মুখ তুলিয়া তাহার পানে তাকাইলেন, একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি হয়েছে মা, আজ সকালে উঠতে পারনি, মুখখানাও বড় শুকনো মত দেখাচ্ছে, অসুখ-বিসুখ করে নি তো?"

মনীষা শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিল, "না বাবা, আমি বেশ ভালই আছি।"

ইহার পর সে আপনা হইতে আর একটি কথাও বলিল না, রতিনাথ প্রতিদিনকার মত অনর্গল কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন, কিন্তু অপর পক্ষ একেবারেই নীরব হইয়া কেবল শুনিয়া যাইতে লাগিল।

অনর্গল কথা বলিয়া যাইতে যাইতে রতিনাথ মাঝে মাঝে লক্ষ্য করিতেছিলেন, অপর পক্ষ নির্ব্বাক হইয়া আছে। মনীষার নীরব হইয়া থাকা নাকি নিতান্তই অস্বাভাবিক, সেই জন্য তাহার নীরবতা বড় বিশেষভাবেই রতিনাথকে আকৃষ্ট করিতেছিল।

(২২)

ইন্দিরা জানালার পাশে চেয়ারখানা টানিয়া আনিয়া-ছিল এবং তাহাতে বসিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি নীচে রাজপথের উপর পড়িয়াছিল, কিন্তু সে যে কিছুই দেখিতেছিল না তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছিল।

সন্ধ্যার মলিন ছায়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুকের উপর ছড়াইয়া পড়িতেছিল, পথের লাইটগুলি ইহার মধ্যেই জ্বলিয়া উঠিয়া অন্ধকার দূর করিয়া দিতেছে। দূরে দূরে গলির মধ্যে বাড়ীগুলির ফাঁকে ফাঁকে অন্ধকার আশ্রয় লইয়া জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

পাশের বাড়ীতে একটি মেয়ে হার্ম্মোনিয়ামের সঙ্গে কণ্ঠে মিশাইয়া গাহিতেছিল—

"দিবস যদি সাঙ্গ হল, না যদি গাহে পাখী,
ক্লান্ত বায়ু যদি না আর চলে—"

নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় এ গানটি ইন্দিরার কানে বড় মধুর হইয়াই বাজিতেছিল।

আগে তাহার গৃহেও প্রতিদিন পিয়ানো বাজিয়া উঠিত, তাহার সহিত সে কণ্ঠস্বর মিলাইত, আজ কয়েক-দিন তাহার গৃহে আর পিয়ানো বাজে না।

পিতা যখন গান গাহিতে বলেন সে তখন শ্রান্তভাবে

বলে—"আজ থাক্‌না বাবা, শরীরটা আজ তত ভাল লাগছে না।"

পিতা ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তবে থাক মা; কিন্তু তোর শরীরটার জন্যে যে বড় ভাবনায় ফেলেছিস ইন্দু; না হয় মিঃ দত্তকে ডেকে পাঠাই, তিনি এসে দেখে-শুনে যা হয় একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যান্‌।"

মলিন হাসিয়া ইন্দিরা বলে, "কিছু দরকার নেই বাবা, সে হিসাবে শরীর বেশ ভালই আছে, ডাক্তার দেখে কি করবে?"

এই মেয়েটির জন্য মিঃ রায়ের ব্যগ্রতার শেষ ছিল না। দুই বৎসর বয়স হইতে মানুষ করিয়া তাহাকে উনবিংশ বৎসরের করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি সবই করিতে পারেন; ইন্দিরার জন্য তাঁহার সুখ-শান্তি ছিল না। কেবলমাত্র ইন্দিরার মুখ চাহিয়াই তিনি অজস্র টাকা ব্যয় করিয়া সুশীলকে ইয়োরোপে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাকে ব্যবসায় চালাইবার জন্য অজস্র অর্থ দিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হয় না ইন্দিরা বড় হইয়া গিয়াছে, মনে হয়—আজও সে সেই দুই বৎসরের খুকিটি হইয়া আছে, তাই পদে পদে তাহার জন্য তাঁহার ভাবনা, তাহার উপর তাঁহার সদা-সতর্ক দৃষ্টি পড়িয়া।

সে দিনে সুশীলের সহিত দেশ ও বিদেশ লইয়া তর্ক করার পর হইতে ইন্দিরা বড় বেশী রকম বিমর্ষ হইয়া গিয়াছে। সুশীল চলিয়া গেলে পিতা ফিরিয়া আসিয়া কতক্ষণ গুম হইয়া বসিয়াছিলেন, তাহার পর হঠাৎ অত্যন্ত রাগ করিয়াই বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "ষ্টুপিড, ওয়ার্থলেস।"

এই শব্দ কয়টি যে কেবলমাত্র অন্তরের ক্রোধ ভাবটাই প্রকাশ করিয়াছিল তাহা নহে, দারুণ ক্ষোভ এবং নৈরাশ্যও ফুটাইয়া দিয়াছিল।

পিতা-পুত্রী সর্ব্বাংশে বিদেশীদের অনুকরণ করিয়া চলিতে ভালবাসিতেন, কেন না ইহাতে নাম যথেষ্ট, রাজজাতির নিকট হইতে প্রচুর সম্মানও পাওয়া যায়। মিঃ রায় দেশে ফিরিতেই কেবল মাত্র দেশবাসী 'হিসাবে তাঁহাকে ধরিয়া দুচারজন দেশবাসী দেশের জন্যই তাঁহার কাছে কিছু সাহায্য চাহিয়াছিল। মিঃ রায় সাহায্য তো করেনই নাই, তাহা ছাড়া কূটতর্ক ধরিয়াছিলেন, সে তর্কে পরাস্ত হইয়া তিনি অবশেষে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, তিনি এদেশে জন্মিয়াছেন দেশ শুধু এই গৌরবটুকুই লাভ করিতে পারে, তিনিও এই গৌরবটুকু লাভ করিবার অধিকার তাহাকে দিতে পারেন। ইহা ছাড়া তিনি দেশকে আর এতটুকু কিছু দিবেন না, দিতে পারিবেন না।

অথচ সরকার তাঁহার নিকট হইতে মোটা সাহায্য পান, তিনি বড় বড় সাহেবদের প্রায়ই পার্টি দেন, বিদেশেও তিনি যথেষ্ট নাম করিয়াছেন দানবীর নামে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন।

ইন্দিরা এই পিতারই কন্যা, এই পিতার নিকট হইতে সে শিক্ষালাভ করিয়াছে। তাহার এই মনের ভাব এত দিন এতটুকু পরিবর্ত্তিত হয় নাই, তাহার গর্ব্বে এতটুকু আঘাত লাগে নাই।

সেই গর্ব্বে আঘাত দিয়াছে সুশীল, তাহার মনের গতির বিপরীত দিক হইতে সে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়াছে। মাসখানেক পূর্ব্বে যে ইন্দিরাকে দেখিয়াছে, তাহাকে আজ স্বীকার করিতে হইবে ইন্দিরার স্বভাবের অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আর এ পরিবর্ত্তন শুধু কন্যার মধ্যে আসে নাই, পিতার মধ্যেও দেখা যাইতেছিল।

ইন্দিরা এখন ভাবিতে শিখিয়াছে। আগে যাহা নেহাৎ ছেলেমানুষি—পাগলামী বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, এখন সে ব্যাপারটাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করিতে পারে না। কাহারও সহিত কথাবর্ত্তায় সেই প্রসঙ্গ উঠিলে, সংবাদপত্রে সেই কথা পড়িলে অন্তরের কোন সেই অন্তরতম স্থানটায় বেদনা বোধ হয়, মনে হয়—হয় তো ইহার মধ্যে সত্য কিছু আছে, মিথ্যার ভিত্তির উপর এ ইমারত গঠিত হইতেছে না।

আজ সন্ধ্যায় জজ মিঃ বসুর বাড়ীতে সান্ধ্য পার্টি ছিল, সেখানে ইন্দিরা পাশ্চাত্য সঙ্গীত বিদ্যার পরিচয় দিবে এই কথা ছিল। হঠাৎ বাঁকিয়া বসিল—সে কোথাও যাইবে না কে জানে কেন আজকাল এই সব আনন্দে যোগ দিতে তাহার সারা অন্তর সঙ্কুচিত হইয়া উঠে।

মিঃ রায় কন্যার হঠাৎ আপত্তিতে কিছু বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন. "আজকার দিনটা চ-- ইন্দিরা, এর পর না হয় আর কোথাও যাসনে। আজ

সবাই জানেন, তুই সেখানে যাবি, এখন যদি না যাস তাঁদের কি রকম ভাবে অপমান করা হবে সেটা একবার ভেবে দেখেছিস্ কি ?"

শ্রান্তভাবে ইন্দিরা বলিয়াছিল, "আজকের দিনটা তুমি একাই যাও বাবা, ওঁদের বলো—হঠাৎ আমার শরীরটা বড় খারাপ হয়েছে। আমি ঠিক জানি শরীর খারাপ শুনলে কেউ আমার পরে অসন্তুষ্ট হতে পারবে না। ওঁদের, নিমন্ত্রণ রক্ষা আজ তোমার দ্বারাই হোক, আমি খানিকটা শুয়ে পড়ে থাকি।"

অগত্যা কেবলমাত্র নিমন্ত্রণকারীর সম্মান রক্ষার জন্যই মিঃ রায় একাই মিঃ বসুর বাড়ীতে গিয়াছেন। বলিয়া গিয়াছেন—যত শীঘ্র পারেন তিনি ফিরিয়া আসিবেন।

ইন্দিরা শয়ন করে নাই। জানালার ধারে বসিয়া আকাশের পানে অন্যমনস্ক ভাবে চাহিয়াছিল, কত ভাবনা তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। অতীতের পানে তাকাইয়া সে বর্ত্তমানের সহিত মিলাইতেছিল, ভবিষ্যতের ভাবনা এখনও সে ভাবে নাই।

চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু জ্বালা করিতেছিল, ইন্দিরা শ্রান্ত চোখ দুইটী ফিরাইয়া লইল।

পাশের বাড়ীর মেয়েটী তখন গাহিতেছিল—

পাথেয় যার ফুরায়ে আসে পথের মাঝখানে,
ক্ষতির রেখা উঠেছে যার ফুটে—

ইন্দিরার চোখে অলক্ষিতে খানিকটা জল আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আজি এই প্রথম তাহার মনে হইতেছিল তাহার পাথেয় ফুরাইয়া গেছে, তাহার কিছু নাই যাহা লইয়া সে পথে চলিবে। নিজের অন্তরের পানে চাহিয়া দেখিল সেখানে কিছু নাই, যাহা কিছু ছিল সবই পুড়িয়া ছাই হইয়া গেছে।

আজ পথে চলিতে তাহার সঙ্গী কেহ নাই। দীর্ঘ এ পথ অতিবাহন করিতে যখন শ্রান্তি ভরে তাহার সারা দেহ অবশ হইয়া আসিবে তখন যাহার উপর সে নির্ভর করিবে, কে তাহার হাত ধরিবে ?

দুনিয়া তাহার সহিত এমনভাবেও প্রবঞ্চনা করিল। তাহাকে সবদিয়া আবার সব কাড়িয়া লইয়া নিঃস্ব করিল, ভিখারিণী সাজাইল ? সে তো আসিয়াছিল, ইন্দিরাকে গ্রহণ করিবার জন্য তাহার ব্যগ্র হাত দুখানা সে তো প্রসারিত করিয়াছিল, ইন্দিরার আত্মাভিমান, অহঙ্কার তাহাকে বাধা দিল, সে সে হাত ধরিতে পারিল না।

আজ প্রথম ইন্দিরা ভাবিতেছিল, সুশীলের স্বভাব কিরূপ ছিল। মনে পড়িতেছিল সেই এতটুকু বেলা হইতে সুশীল কোনদিন তাহাকে একটা রূঢ় কথা বলে নাই, সে যে কাজ করিয়াছে, অন্যায় জানিয়াও সুশীল তাহাতে বাধা দেই নাই। কত সময় সৎ উপদেশ দিতে গিয়া সে ইন্দিরার নিকট হইতে তীব্র বিদ্রূপ সহ্য করিয়াছে, তবু সে তাহাতে বিরক্ত হয় নাই, মৃদু হাসিয়াছে মাত্র।

সুশীলের হৃদয় যে কি উপাদানে নির্ম্মিত ছিল আজ ইন্দিরা তাহাই ভাবিতেছিল। কিন্তু কেন—এ ভাবে তাহাকে অপমান করিয়া যাওয়ার তো কোন দরকারই ছিল না ; সুশীল একেবারে এই আঘাতটা না দিয়া আগে হইতে তাহাকে বুঝায় নাই কেন ?

আজ সে চলিয়া গেছে, কেবলমাত্র ইন্দিরার হৃদয়টাই শূন্য করিয়া যায় নাই, লোকের কাছে তাহার মুখ দেখানোর পথও যে রুদ্ধ করিয়া দিয়া গেছে। সকলেই জানে সুশীল ইন্দিরার ভাবী স্বামী, সকলেই জানে এই মাসটা গত হইলেই সুশীল ও ইন্দিরার বিবাহ হইবে। সুশীলকে বিবাহ বিবাহ না করিয়া চলিয়া গেলে ইহাতে সকলেই ব্যাপার কি জানিতে চাহিবে, তখন ইন্দিরা কি জবাব দিবে।

ইন্দিরা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া নিস্তব্ধ ভাবে কতক্ষণ পড়িয়া রহিল।

হঠাৎ এক সময় মুখ তুলিতেই চোখের উপর লাইটের উজ্জ্বল আলো ভাসিয়া উঠিল, দাসী কখন আসিয়া আলো জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছে তাহা সে জানিতেও পারে নাই।

দৃষ্টি ফিরাইয়া সে আবার বাহিরের পানে চাহিল।

টেবলের উপরকার ক্ষুদ্র ঘণ্টাটা নাড়া দিতেই দাসী আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্দিরা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা ফিরেছেন ?"

দাসী উত্তর দিল—"না—"

ঘড়িতে তখন নয়টা বাজিয়া গেছে, ও বাড়ীর গান থামিয়া গেছে।

টেবলের উপর দৃষ্টি পড়িতে সে দেখিল, একখানি

কার্ড পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাতে লেখা আছে মিস ইরা দাস।

মিস ইরা দাস? ওঃ সেই মেয়েটী, যে একদিন তাহাদের অফিসে টাইপিষ্ট ছিল—।

অকস্মাৎ ইন্দিরার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল; তখনই নিজেকে সামলাইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার সঙ্গে দেখা করতে কেউ এসেছিল?

সঙ্কুচিত ভাবে দাসী উত্তর দিল "এসেছিল।"

ইন্দিরা জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

দাসী বলিল, "একটী মেয়ে এসেছিল, কার্ড দিয়েছিল," টেবলের ওপর সে হাত দিয়া কার্ডখানা দেখাইল।

রাগ করিয়া ইন্দিরা বলিল, "ও তো দেখেছি, কিন্তু আমায় তুমি ডেকেছিলে?"

দাসী বলিল, "না মিস, আপনি গান শুনছেন, ডাকলে বিরক্ত হবেন বলে আমি আপনাকে ডাকিনি।"

ইন্দিরা রাগ চাপিয়া বলিল, "সে মেয়েটী আছে না চলে গেছে?"

দাসী বলিল, "সে আধঘণ্টার ওপর চলে গেছে।"

ইন্দিরা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "খুব হয়েছে—যাও।"

সেই মেয়েটী—কিন্তু সে কোন উদ্দেশ্য লইয়া এখানে আসিয়াছিল তাহাই ইন্দিরা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না।

প্রথম দৃষ্টিতে সে এই মেয়েটীকে সুচোখেই দেখিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিতে পাইল সুশীল এই মেয়েটীর জন্য অতিরিক্ত রকম ব্যস্ততা দেখায়, শুনিতে পাইল—সুশীল মাঝে মাঝে তাহার বাড়ীতে যায় তখনই তাহার মনে দারুণ বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিয়াছিল। মেয়েটীকে তাড়াইয়া দিয়া সে শান্ত হইয়াছিল, কিন্তু সুশীলের উপর হইতে বিশ্বাস হারাইয়াছিল।

কেবলমাত্র ইরার জন্যই সে এমন একটা বিসদৃশ ব্যাপার ঘটাইয়া বসাইল যাহা তাহার স্বভাবের একেবারেই বিরুদ্ধ ছিল। এখন আর সংশোধন করিবার উপায় নাই, যাহা করিয়া ফেলিয়াছে তাহা আর ফিরানো যায় না।

ইরা কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল, কে জানে, হয় তো সে সুশীলের সম্বন্ধেই কোন কথা বলিত। দেখা হইলে বোধ হয় ভালই হইত।

ইন্দিরা ছটফট করিতেছিল, কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না।

আবার ডাক!

শ্রীপূর্ণশশী দেবী

তুমি সেই সুরেতে আবার ডাক
যে সুর গোপন মরম পুরে
আধেক জাগা ঘুমের ঘোরে
সুখ-স্বপনে উঠল ফুটে
সেই স্বপ্নটুকু জাগিয়ে রাখ
আবার ডাক!

যে সুর গভীর গহন রাতে
নিদ্‌হারা এই নয়ন পাতে
অশ্রুজলে উঠ্‌ল ফুটে
সেই অশ্রুটুকুন্ মুছনা'ক
আবার ডাক!

যে সুর আমায় নীরব ধ্যানে
বেদন ভরা নিঝুম প্রাণে
বাঁশীর গানে উঠ্‌ল বেজে
সেই গানেতে ডুবিয়ে রাখ।
আবার ডাক!

যে সুর, ব্যাকুল হিয়ার তলে
আশায় আশ্বাসিয়া বলে
"সাধন তোমার সফল হবে
আর দুটোদিন এম্‌নি থাক"
সেই সুরেতে আবার ডাক!



"অহিংসা জীবনের মূলমন্ত্র"

মহাত্মা গান্ধী

কংগ্রেস শান্ত ও অহিংস উপায়ে স্বরাজলাভের চেষ্টা করিবে। আমরা বারংবার বলিয়াছি যে, অহিংসাই আমাদের ধর্ম্ম। কায়মনোবাক্যে আমাদিগকে এই কথানুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। ১৯২০ সালে আমরা এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছি. তারপর অনেকবারই এসম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস শুধু কংগ্রেসসেবীদের মধ্যেই নিবদ্ধ, বাহিরের লোক যদি হিংসানীতি অবলম্বন করে, তবে সেদিকে কংগ্রেসের দৃষ্টি দিবার কোন আবশ্যকতা নাই। কিন্তু আমি বলি যে, কংগ্রেস সমগ্র ভারতের, সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি; কারণ, কংগ্রেস শুধু কংগ্রেসসেবীদের জন্য নহে, পরন্তু সমগ্র ভারতের জন্য স্বরাজলাভে চেষ্টিত। গত বৎসরের সংগ্রামে আমরা দেখিয়াছি যে. সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস এবং প্রীতি হইতে আমরা প্রভূত শক্তিলাভ করি। আমরা সানন্দে সাধারণের সাহায্য লইয়াছি। আমরা জনসাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে আমাদের শক্তি বৃদ্ধিই পাইয়াছে। যাহারা হিংসানীতির আশ্রয় লয়, তাহারাও আমাদের ভাই। আমরা আমাদের ভাইদের নিকটই নিবেদন জানাইব। তাহাদের কার্য্যের অংশভাগ আমাদের লইতেই হইবে, সে দায়িত্ব এড়াইলে চলিবে না।

"গত দশবৎসরের মধ্যে আমাদিগকে তিন তিন বার সংগ্রাম বন্ধ করিতে হইয়াছে; কারণ হিংসা দেখা দিয়াছিল। আপনাদের মনে থাকিতে পারে, রাওলাট আইনের সময় আমাদিগকে প্রথমবার সংগ্রাম বন্ধ করিতে হইয়াছিল। সাময়িকভাবে সংগ্রাম বন্ধ করায় আমাদের ক্ষতি হয় নাই, বরং লাভই হইয়াছে। অহিংস সংগ্রামের শক্তি নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে; গতবৎসর সত্যাগ্রহ-নীতির ফল বাস্তবিকই বিস্ময়কর হইয়াছে।

একথা অবশ্যই সত্য যে, দেশের যুবকেরা স্বাধীনতার জন্য অতিশয় ব্যগ্র, অতিশয় উদ্যমশীল এবং যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। করাচী কংগ্রেসে আমি ভগৎসিংহের প্রস্তাবের পক্ষে ছিলাম। সত্যকথা বলিতে কি, আমি স্বয়ং সেই প্রস্তাবটির মুসাবিদা করিয়াছিলাম। সেই প্রস্তাবে ত্যাগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছিল কিন্তু তারপর দেখিলাম যে, আমার উক্তির ভ্রমাত্মক ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। উহাতে আমি যে মনোবেদনা পাইয়াছি, তাহা ভগবান ব্যতীত কেহ জানে না। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, যুবকদের মন রক্ষার জন্যই, তাহারা দিল্লীর সর্ত্তে রাজী না হওয়ায় তাহাদের সহিত আপোষ করার জন্যই আমি নাকি ঐ প্রস্তাবে রাজী হইয়াছিলাম। কদাপি আমার মনে এভাব ছিল না। রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যাইবার জন্য আমি উহা করি নাই। কংগ্রেসের নিকট অহিংসা একটা সাময়িক নীতি হইতে পারে, আমার নিকট উহা জীবনের মূলমন্ত্র।

'দিল্লীর চুক্তিতে কোন ক্ষতি হয় নাই। অদ্যাপি আমি ঐ চুক্তিতে আস্থাবান। সে সময় উহা করাই সঙ্গত হইয়াছে। ঐ চুক্তির ফলে আমরা লাভবান হইয়াছি ও হইব।

আমি মনে করিয়াছিলাম যে, করাচী কংগ্রেসের প্রস্তাবের পর এই সমস্ত উপদ্রব বন্ধ হইবে। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার বিশ্বাস ভুল। আপনারা হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, অধীর যুবকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই সমস্ত সামান্য ঘটনাকে এত বড় করিয়া দেখিতেছেন কেন? এতকাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট যে প্রবলতর হিংসাত্মক কার্য্য করিতেছেন, তাহা দেখিতেছেন না কেন? কংগ্রেস, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হউক না কেন? সে প্রস্তাব হইবে। আমরা কখনও গবর্ণমেণ্টকে রেহাই দেই নাই, তাঁহাদের চণ্ডনীতির নিন্দা করিতে কসুর করি নাই। কিন্তু তজ্জন্য যুবকদিগকে হিংসানীতি হইতে নিবৃত্ত না করার কোন কারণ নাই।

আপনারা হয়তো পুনর্ব্বার বলিবেন—"একবার গবর্ণমেণ্টের অত্যাচারের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।" আমি পুনরায় উত্তর দিব—'হাঁ, আমরা তাহা জানি, আমরা সেই অত্যাচার অসম্ভব করার জন্যই চেষ্টিত। দেশভক্তির আতিশয্যে যে সমস্ত যুবক উদ্‌ভ্রান্ত, তাহারা তাহাদের কার্য্যের দ্বারা আমাদের চেষ্টায় বিঘ্নই উৎপাদন করে।

মিঃ পয়াপ্রপে একবার বলিয়াছেন—হাঁ, আমি গান্ধীকে পছন্দ করি বটে, কিন্তু তাহার নীতি পছন্দ করি না। দেশে সহস্র লেংটিওয়াল আছে, আর একটি লেংটিওয়ালা বৃদ্ধি পাইলেই ভারতবাসীরা স্বরাজ পাইবে, এরূপ বিশ্বাস করা যায় কি করিয়া।"

এ সমস্ত লোক মনে করেন যে, স্বরাজ লাভের জন্ম আমাদের পথ ভ্রান্ত। তাহাদের পথ সম্বন্ধেও আমরা ঠিক ঐ কথাই মনে করি। মতদ্বৈধের মধ্যে অসঙ্গতি নাই। কিন্তু এই মতদ্বৈধ উপস্থিত হওয়া মাত্র আমাদিগকে সঙ্গত্যাগ করিতে হইবে।

পাশ্চাত্য দর্শকগণ বলেন যে, কংগ্রেস এই সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া স্বরাজলাভ করিতেছে, তখন আমরা বেশ একটা গর্ব্ব অনুভব করি। যদি আমরা মনে মনে একথাই বিশ্বাস করি যে, ভগৎ সিং প্রভৃতির ত্যাগের দ্বারাই জয় লাভ হইয়াছে, তবে কংগ্রেসের গর্ব্ব করায় লাভ কি?

আপনারা মনে করিতে পারেন যে, এই গান্ধীটা যতদিন আছে ততদিন এইরূপ প্রস্তাব উঠিবেই এবং আপনাদিগকে তাহা গ্রহণ করিতেই হইবে। আমি এইরূপ গ্রহণ চাহি না। সে ভাবে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে আমি আপনাদিগকে বলি না।

যে সমস্ত পত্রিকা জাতীয়তার সমর্থক বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদিগকেও ধারা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

যদি আমরা অন্যায় করিয়া থাকি, তবে অন্যায়ের যথেষ্ট প্রতিকার করাও আমাদের কর্ত্তব্য।

হিংসানীতির উপাসকদের কর্ত্তব্য সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা না করিয়া আমাদিগকেই হত্যা করা, কারণ তাহাদের পথে আমরাই প্রধান কণ্টক। আমি সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে রক্ষা করার জন্য সর্ব্ব সময়ে সচেষ্ট, সুতরাং আমাকেই হত্যা করা উচিত।

জিন্নাহলের হাঙ্গামা সম্বন্ধে বলি—যদি কলহের নিষ্পত্তির জন্য লাঠির আশ্রয় লইতে হয়, তবে আমাদের নিজের মাথায়ই বাড়ি পড়িবে। হিন্দু-মুসলমানে মতভেদ হইলেই মুসলমানেরা কাটিবে হিন্দুদের গলা, হিন্দুরা কাটিবে মুসলমানদের গলা।

আমি শুধু কংগ্রেসের সেবক নহি কংগ্রেসের সমালোচকও বটে। অনেক মহত্ত্বের দাবী আমরা করি। আমাদের মহত্ত্ব যদি হিমালয় প্রমাণ হয়, তবে পাপটা অন্ততঃ বিন্ধ্য-প্রমাণ।" (নিখিল ভারত রাষ্ট্র সমিতিতে মহাত্মার কথার মর্ম্ম—)

আমেরিকা কেন ভারতের সহায় হইবে?

নিউইয়র্কের এষ্টার হোটেলে এক ভোজ-সভায় মহাত্মা গান্ধির কার্য্যাবলীর কথা আলোচিত হইয়াছিল। এই সভায় আমেরিকার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেনিরাল এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম—

আজ সমস্ত জগতবাসীর দৃষ্টি ভারতবর্ষ এবং যে লোকটি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা, তাঁহার উপর নিবদ্ধ হইয়াছে।

ভারতবর্ষ কিরূপ দেশ এবং এই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি কে?

ভারতবর্ষ প্রায় একটা মহাদেশ। ইহার লোক সংখ্যা ৩০ কোটী, সমগ্র পৃথিবীর লোক সংখ্যার এক ষষ্ঠাংশ। আর মহাত্মা বর্ত্তমান শতাব্দীর এক জন অত্যাশ্চর্য্য লোক।

আজ সমগ্র জগৎ আর্থিক দুর্দ্দশায় প্রপীড়িত। কাজের অভাবে লক্ষ লক্ষ লোক রাস্তায় ঘুরিতেছে। এরূপ দুর্দ্দিন আর কখনও আসে নাই। এসময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই আপন আপন সুখ দুঃখের কথা লইয়া দিন কাটাইতেছে।

তথাপি প্রত্যেক দেশে আজ ভারত-প্রসঙ্গ এবং মহাত্মা গান্ধীর কথা সাগ্রহে আলোচিত হয় কেন? কারণ, সে দেশ এবং সেই ব্যক্তিটির কার্য্যের মধ্যে দিয়া এমন একটি অঙ্কের অভিনয় হইতেছে যাহার সহিত সমগ্র মানব জাতির ভাবী স্বার্থ জড়িত আছে।

ভারতবর্ষ আজ প্রাণপণে স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে; ইংলণ্ডকে তাহারা বলিয়াছে, ভারতের কর্তৃত্ব ভারতবাসীর হাতে তুলিয়া দিয়া তোমরা তোমাদের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া প্রস্থান কর। ১৭০ বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ড এই দেশ শাসন করিতেছে, ইতিমধ্যে ইংরাজ অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ করিয়াছে; কিন্তু বৃটিশের শাসনাধীনে ভারতবাসী দারিদ্র্য ও দুর্দ্দশার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে।

কেহ কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, আমাদের তাহাতে কি? এই দূরবর্ত্তী দেশের সমস্যা লইয়া আমেরিকাবাসীর মাথা ঘামাইবার কি প্রয়োজন আছে?

হাঁ, কয়েকটি কারণ আছে। আমি সেগুলি আপনাদের নিকট বিবৃত করিব।

প্রথম কারণ—পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের অবস্থার সহিত আমাদের যোগ আছে।

১৭৭৬ সালে ৪ঠা জুলাই তারিখে ফিলাডেলফিয়া সহরে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। তদবধি সমগ্র জগতের দৃষ্টি আমাদের উপর পড়িয়াছে। আমরা যে নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তাহার ফলাফল সকলেই আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছে। আজ যে দেশের সহিত ভারতের সংগ্রাম চলিতেছে, সেই দেশের সহিত সাত বৎসর ধরিয়া আমরাও সংগ্রাম করিয়াছিলাম। ইহার ফলে আমেরিকা স্বাধীন হইয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পর অল্প সময়ের মধ্যে আমরা যেরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছি, তাহাতে অন্যান্য জাতির অগ্রে দাঁড়াইবার অধিকার আমাদের জন্মিয়াছে। স্বাধীনতার দ্বারাই ইহা সম্ভবপর হইয়াছে। আমাদের প্রদর্শিত পন্থা পৃথিবীর সকল জাতিকেই অনুপ্রাণিত করিয়াছে, এমন দেশ বোধ হয় নাই—যেখানে আমেরিকার প্রভাব অনুভূত হয় নাই। তাই আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল নির্য্যাতীত জাতি আমাদেরই অনুকরণে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমেরিকার স্বাধীনতা

লাভের পর যে সকল দেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তাহারাই আমাদের নৈতিক সমর্থন হইতে বঞ্চিত হয় নাই। আজ ভারতবর্ষ আমাদের সহানুভূতি চায় এসময়ে সাড়া দেওয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য। স্বাধীনতা তাহার জন্মগত অধিকার—এই অধিকার লাভে ভারতবর্ষকে যথাসাধ্য সাহায্য করা দরকার।

দ্বিতীয় কারণ—আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র দারুণ অর্থসঙ্কট দেখা দিয়াছে। সকল দেশই ইহাতে বিপন্ন হইয়াছে।

আমরা যে সমস্ত অসুবিধা ভোগ করিতেছি, তাহার প্রতিকার-কল্পে নানা প্রকার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

যাহারা যথেষ্ট শক্তিশালী তাহারাও করভারে কষ্ট ভোগ করিতেছেন। শাসন-কার্য্যের ব্যয়ভার অত্যন্ত বাড়িয়াছে। তাহাতে সকলেরই কষ্ট হইতেছে।

প্রেসিডেন্ট হুভার সম্প্রতি অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যয় সম্পর্কে যে ভীষণ বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, এই ব্যয়ভার অসম্ভবরূপে বাড়িয়াছে। জগতের সকল জাতিকে এই ব্যয়ভার বহনের ক্লেশ হইতে অব্যাহতি দিতে হইবে।

নৌবাহিনীর জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়। ইংরাজের নৌবলই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সাত সমুদ্রের উপর ইহার আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার জন্যই ইংরাজ এই বিরাট নৌবহরের ব্যয় বহন করে। আজ ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা হউক; ইংরাজের এতটা নৌবল রক্ষার প্রয়োজন আর থাকিবে না। তখন ইংরাজ করদাতাগণের স্কন্ধ হইতে একটা প্রকাণ্ড করভার নামিয়া যাইবে। তারপর ইংরাজের নৌবহর অন্তর্হিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র পথ বাধামুক্ত হইবে এবং অন্যান্য দেশের নৌবাহিনীও অদৃশ্য হইবে।

এসমস্ত কথা আলোচনা করিলে কে অস্বীকার করিবে যে, ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সহিত সকল দেশেরই স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে।

৪র্থ কারণ—কল কারখানা, কৃষি-ক্ষেত্র এবং বন হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আমার তাই পণ্যবিক্রয়ের জন্য একটা উপযুক্ত বাজার চাই। চীন দেশকে বাদ দিলে ভারতবর্ষই সর্ব্ব প্রধান বাজার হইতে পারে। কিন্তু আজ সেখানকার লোক সব অর্থ-হীন। ক্রয় করিবার শক্তি তাহাদের নাই। গড়ে প্রত্যেক ভারতবাসীর আয় ছয় সেণ্টের (প্রায় দুই আনা) বেশী নহে। সুতরাং তাহারা ক্রয় করিবে কি?

ভারতবাসীরা বুদ্ধিমান, তাহারা পরিশ্রমী। একবার স্বাধীন হইতে পারিলে তাহারা অল্প সময়ের মধ্যেই প্রভুত উন্নতি সাধনে সমর্থ হইবে। জাপানই তাহার দৃষ্টান্ত। স্বাধীন জাপান কোন অংশেই পাশ্চাত্য দেশ হইতে হীন নহে। এই অবস্থায় ভারতবাসীর সাহায্য করা, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র স্বাধীনতার সমর্থন করা আমাদের উচিত নহে কি?

ভারতবর্ষ একবার স্বাধীন হইলে সেখানে সকল জাতীর পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা হইবে, জগতের অর্থসঙ্কট দূর হইবে।"

মহাত্মাজীর চেষ্টা সার্থক হইবে কি? তিনি অনেক দূর অগ্রসর হইবেন, তাঁহার প্রতি পাদক্ষেপের সহিত আমাদের সাহায্য সহানুভূতি তাঁহাকে অনুসরণ করিবে। তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতির পক্ষপাতী, ইহা আজ পৃথিবীর আদর্শ হইতে চলিয়াছে। আমরা এই নীতির জয় কামনা করি। মহাত্মাজী ও তাঁহার নীতি সাফল্য লাভ করুক।

মহাত্মার উদ্যম সার্থক হউক আর না হউক, ভারতবর্ষ আজ স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতেছে এবং সমগ্র জগতের সহানুভূতি ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভ অবশ্যম্ভাবী, কেহই তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না। আপাততঃ কিছু দিনের জন্য বৃটিশের কূট রাজনীতি ভারতের লোকদিগকে দলে দলে বিভক্ত করিয়া রাখিতে পারে; কিন্তু ইহার ফল কখনও চিরস্থায়ী হইবে না।

যদি সম্ভবপর হয়, গান্ধীর নেতৃত্বে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতিদ্বারা ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিবে। কিন্তু তাহা যদি সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে অপর কোন নেতার অধীনে শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়াই ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে এবং জগতের জাতিসমূহের মধ্যে গৌরবের আসন গ্রহণ করিবে।

মহাত্মার বিলাত যাত্রা

(গত ২৯শে আগষ্ট বেলা ১-২০ মিনিটের সময় রাজপুতনা জাহাজে মহাত্মা বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। যাত্রার পূর্ব্বে সভায় ও জাহাজে উঠিয়া তিনি নিম্নোক্ত বাণী বলিয়া গিয়াছেন।)

লণ্ডন যাত্রার প্রাক্কালে আপনাদের আশীর্ব্বাদ চাহিতেছি। আমি গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে দিল্লীর চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হইয়াছি। উহা মনোযোগের সহিত আপনারা পাঠ করিবেন এবং উহার কি ফল হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। আমার আশঙ্কা হয় এই যে কেহ কেহ উহার প্রতি বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বিস্ময় সহকারে একথা বলিবে—এই লোকটা আবার কি করিয়া বসিল! তাঁহাদের সন্দেহ জাগিতে পারে কিন্তু আমি জানি জাতি আমাকে বিশ্বাস করে। কারণ, তাহারা কি আমাকে তাহাদের একমাত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া আমার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস দেখায় নাই?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলি যে, আমি আমার দুর্ব্বলতার কথাও অবগত আছি। যে দেশে আমি যাইতেছি, সেই দেশ এবং সেই দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ও আপনারা আমার উপর বিপুল দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, তাহার বিচার করিয়া আমি বুঝিতেছি যে, আমার তথায় যাওয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করাই কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু আমার প্রতি আপনাদের যে অবিচলিত আস্থা আছে, তাহা মহাত্মা

হিমালয়ের মত, এবং তাহাই আমাকে সমস্ত ঝড় ঝাপটা হইতে রক্ষা করিবে। ইহাই আমার ভরসা।

ভারতের কোটী কোটী লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। কংগ্রেস তাহাদের দুর্দ্দশা নিবারণের জন্য চেষ্টিত। প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতিটাই পঙ্গু, আমিও পঙ্গু পঙ্গুজাতির প্রতিনিধি পঙ্গু হইব, তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। পঙ্গুই পঙ্গু জাতির অসুবিধা ও দুর্দ্দশার কথা সম্যক উপলব্ধি করিতে সমর্থ। আমি আমার দুর্ব্বলতার কথা সম্পূর্ণ অবগত আছি এবং আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, আমি আমার ত্রুটি সম্বন্ধে অন্ধ নহি।

সত্য ও অহিংসার প্রতিনিধিরূপে আমি লণ্ডনে যাইতেছি, আমার বিশ্বাস আছে যে, যথাসময়ে সত্য ও অহিংসা সগৌরবে জয়ী হইবেই।

ভগবানের উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এ সমস্ত ঘটনার মধ্যেই যে ভগবানের হাত রহিয়াছে, তাহা আমি বিশ্বাস করি। ভগবানে যাহার বিশ্বাস আছে, সাফল্য সম্বন্ধে সে সুনিশ্চিত। দুর্ব্বল-নিঃসম্বল, শূন্যহস্ত যে তাহাকে ভগবান নিশ্চয়ই রক্ষা করেন। দুর্ব্বলতা ও বিনয়ই সাফল্যের মূল। অহিংসার শক্তি অসীম এবং সেই শক্তিই বিপুল বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করিবে।

এই বিশ্বাস লইয়াই আমি যাইতেছি। যদি ভাগ্য বিড়ম্বনায় ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া আসি, আপনারা যেন হতাশ না হন। যদি সিদ্ধিলাভ করিয়া ফিরিয়া আসি, আপনারা যেন গৌরবোদ্ধত না হন। একথা সুনিশ্চয় যে, জয় পরাজয় ভগবানের ইচ্ছাধীন।

আমাকে কংগ্রেসের আদেশ মান্য করিয়া চলিতে হইবে। আমি যাহাতে সেই আদেশ পালন করিতে পারি, আপনারা তাহা করুন। আমি অঙ্গীকার করিতেছি যে, আপনারা আমার উপর যে বিশ্বাস ন্যস্ত করিয়াছেন, তাহাতে আমি আপনাদিগকে নিরাশ করিব না। আমি যদি আপনাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করি এবং আপনাদের আদেশ অনুসারে না চলি, তবে আপনারা আমাকে কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করিতে পারিবেন, এমন কি তদপেক্ষাও গুরুতর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন। এজন্য যদি আপনারা আমাকে হত্যাও করেন, তবে তাহা আমি হিংসার কার্য্য মনে না করিয়া অহিংসার কার্য্যই মনে করিব। সে যাহা হউক, আমি কোন প্রকারেই আপনাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে বা আপনাদিগকে প্রবঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করি না।

ভারতের হতভাগ্য পঙ্গু জাতিকে আমি কি প্রবঞ্চিত করিতে পারি? ইংরাজ, মুসলমান খৃষ্টান বা শিখ কাহারও প্রতি আমার শত্রুতা নাই। আমি তাহাদের সকলের জন্য সম্ভব মত সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতে বাধ্য যে কোন শিখ বা মুসলমান ব্যক্তিগত ভাবে বলিতে পারে যে, আমি তাহার প্রতিনিধি নহি; কিন্তু কংগ্রেস আমাকে আদেশ দিয়াছে আমি সকলের অধিকার রক্ষা করিতে বাধ্য, কারণ কংগ্রেস ভারতের সকল সম্প্রদায় ও সকল লোকের প্রতিনিধি।

জমিদার ও দেশীয় নরপতিগণের কোন অহিত আমি করিতে পারি না। তাঁহারা যতদিন পর্য্যন্ত দরিদ্র প্রজাদের স্বার্থ রক্ষা করিবেন এবং তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাদের কোন অনিষ্ট করিব না। আমি তাঁহাদিগকে কৃষক ও কৃষিজীবীদের প্রতি উচিত ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেছি।

আমি আপনাদিগের নিকট আমার ধর্ম্মের কথা বুঝাইয়া দিলাম। আমি চাহি যে, আপনারা সকলে কংগ্রেসের আদেশ পালন করুন।

এখন আমি আমার চেষ্টার সাফল্যের জন্য আপনাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। আমার স্থির বিশ্বাস এই যে, আপনাদের শুভেচ্ছা তথা ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমরা সাফল্যলাভ করিব। ভগবান আমাদের মঙ্গল করুন।

ভগবান ভরসা

"দিকচক্রবালে আশার কোন লক্ষণ দেখিতেছিনা বটে, তথাপি আমি আজন্ম বিশ্বাস প্রবণ বলিয়া নিরাশার মধ্যেও আশা পোষণ করিতেছি। ভগবানই আমার ভরসা এবং ভগবানই যেন আমার লণ্ডন যাত্রার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং আমি আশা করি যে, মানবজাতির সেবার জন্য তিনি আমাকে নিমিত্ত স্বরূপ ব্যবহার করিবেন। আমার নিকট ভারতের সেবা এবং মানব জাতির সেবা সমানার্থ বাচক। ভারতের কোন কোন জনসমষ্টি কংগ্রেসকে অস্বীকার করিতে পারে, কিন্তু সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিত্ব করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য, সুতরাং আমার উপর যে বিশ্বাস ন্যস্ত হইয়াছে, সেই বিশ্বাসের যোগ্য হইবার জন্য আমি সকল প্রকার লোকের স্বার্থ রক্ষারই চেষ্টা করিব, প্রকাশ থাকে যে, সে স্বার্থ ভারতের মূক জন-সাধারণের স্বার্থের বিরোধী না হওয়া আবশ্যক, কারণ প্রধানতঃ এই মূক জনসাধারণের জন্যই কংগ্রেসের অস্তিত্ব। আশা করি যে, প্রাদেশিক সরকারগণ, সিভিল সার্ভিস এবং ইংরাজ ব্যবসায়িগণ অভিষ্টলাভে কংগ্রেসকে সাহায্য করিবে। কংগ্রেস অহিংসা ও সত্যের প্রতীক, জাতির সকল অংশের শুভেচ্ছার উপরই কংগ্রেসের সাফল্য নির্ভর করে সুতরাং আমি ভরসা করি যে, জাতির এ দীন প্রতিনিধি আজ যে কর্ত্তব্য পালনের জন্য যাইতেছে সকলেই তাহার সাফল্য কামনা করিবে।"

লণ্ডনে গিয়া মহাত্মা কি করিবেন ?

ব্রিটিশের নিকট ভারতবর্ষের যে দাবী আছে, পাছে অনুরোধ উপরোধে প'ড়িয়া মহাত্মা গান্ধী সেই দাবী খর্ব্ব করেন এবং যে অভীষ্ট লাভের জন্য ভারতবর্ষের এত বীর আত্মত্যাগ স্বীকার করিয়াছে ও আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছে, কিয়ৎপরিমাণেও সেই অভীষ্ট ত্যাগ করেন, এই আশঙ্কায় অনেকের হৃদয়ে উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। যাঁহারা এইরূপ ভয় ও সংশয় পোষণ করেন, তাঁহারা গান্ধীর মর্য্যাদারই হানি করেন। এই লোকটির সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রকৃত জ্ঞান খুবই কম। তথাপি তাঁহাদের আশঙ্কার কারণ বুঝা যায়।

সেপ্টেম্বরের সভায় হারাইবার অনেক আছে। যাঁহারা মহাত্মাকে শ্রদ্ধা করেন, তাঁহারা তাঁহাদের বিশ্বাসভাজন নেতার মর্য্যাদা ও শক্তির জন্য চিন্তিত; যাহারা ভারতবর্ষকে ভালবাসেন, তাঁহারা একটা জাতির দোলদোদুল্যমান ভাগ্যের জন্য চিন্তিত; পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে সমস্ত আদর্শ-বাদী গান্ধীর সত্যাগ্রহ নীতিকে মানবীয় সমস্যার সমাধানের একটা নূতন উপায় বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইয়াছেন যে, কোন একটা রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জ্জাতিক সমস্যায় এই নীতি ফলপ্রদ কিনা। কিছু দিন পূর্ব্বের উড্র উইলসনের মতই আজ মহাত্মা গান্ধী—উইলসনের মত কেন তদপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে—সমগ্র পৃথিবীর প্রাণশক্তির কেন্দ্রস্থলে দণ্ডায়মান তাঁহার দুইহস্তে অনাগত বহু শতাব্দীর ভাগ্য দোল খাইতেছে। শ্রেষ্ঠতম মানবও এই অতি বৃহৎ সমস্যার পীড়ন সম্পূর্ণ সহ্য করিতে সমর্থ বলিয়া মনে হয় না; সুতরাং গান্ধীও হয়তো সাগরপারের অজানা দেশে যাইয়া আপোষের লোভে অভীষ্ট ত্যাগ করিতে পারেন,—যেমন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসন করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা নিজকেই হীন করিয়াছিলেন,—যদি কেহ এরূপ আশঙ্কা করে, তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই।

বিষয়টাকে এইরূপ সাধারণভাবে বিচার যদি নাও করা যায় তাহা হইলে গান্ধীর দিক দিয়া আশঙ্কার বিশেষ কারণ আছে। সাম্রাজ্যের দাসত্ব হইতে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের যাঁহারা সমর্থক তাঁহাদের কাহারও কাহারও সহিত আলাপ করিয়া আমি উহা বুঝিয়াছি।

ইতিমধ্যেই কাহারও কাহারও মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, গান্ধী লর্ড আরুইনের সহিত চুক্তি করিতে যাইয়া অনেক নামিয়া গিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ডের নিকট সমস্ত সঁপিয়া দিবার পথ প্রস্তুত করিয়াছেন। যাঁহারা শত্রুকে কখনও বিশ্বাস করিতে পারেন না এবং শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিতে যাইয়া যদিও শত্রুর সহিত নিজেও সমভাবেই ধ্বংস হয়, তথাপি কিছুতেই শান্তিপূর্ণ আলোচনার দ্বারা অভীষ্ট লাভ অপেক্ষা শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রামের দ্বারাই চরম মীমাংসার পক্ষপাতী, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ ধারণা করা স্বাভাবিক। সে যাহা হউক, গান্ধীর চরিত্র এবং নয়াদিল্লীতে গান্ধীর কার্য্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হইতেই এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে।

গান্ধীর নীতি, গান্ধীর শিক্ষা এবং গান্ধীর এক বৎসরের কার্য্য বিবেচনা করিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, যে মুহূর্ত্তে ইংরাজ আপোষ করিবার অভিপ্রায় জানাইয়াছে,—এমন কি, কংগ্রেস ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক উত্থাপিত দাবী আলোচনা করিতে সম্মত হইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তেই গান্ধী সংগ্রামের অবসান করিয়া শান্তি স্থাপন করিতে বাধ্য। লর্ড আরুইন গান্ধীকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া আপোষের অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন। বড়লাটের অভিপ্রেত আলোচনায় সম্মত হইয়া মহাত্মা সহস্র দেশবাসীকে নিষ্ঠুর নির্য্যাতন হইতে মুক্ত করিয়াছেন; কিন্তু অহিংস সংগ্রাম দ্বারা যতটুকু সাফল্য লাভ করিয়াছেন, তাহা বা স্বাধীনতার দাবীর বিন্দুমাত্র পরিত্যাগ করেন নাই। পক্ষান্তরে তিনি অনেক—ভারতে স্বাধীনতা লাভের জন্য অন্য কোন ভারতবাসী অপেক্ষা অনেক বেশী—লাভ করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা লণ্ডনে জয়ের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন যখন দেখা যায় যে, গান্ধী-আরুইন চুক্তি শান্তি সন্ধি নহে, উহা বিরাম-সন্ধি মাত্র, তখনই এই চুক্তির প্রকৃত গুরুত্ব বুঝা যায়। শত্রুপক্ষে আবেদনক্রমে গান্ধী এই বিরাম-সন্ধি মঞ্জুর করিয়াছেন। ১৯৩০—৩১ সালের সংগ্রামে এখানেই তাঁহার জয় এবং বিরাম-সন্ধির [illegible] যখন শান্তি সন্ধি লিখিত হইবে, তখন তিনি যে ইচ্ছানুরূপ সর্ত্ত দিতে পারিবেন, এই জয়ের দ্বারা তিনি সেই শক্তিলাভ করিয়াছেন। এসম্বন্ধে আমাদের যদি কোন সংশয় থাকে, তবে উইনষ্টন চার্চ্চিল প্রভৃতির আশঙ্কার দিকে দৃক্‌পাত করিলেই সংশয় দূর হইবে, কারণ গান্ধী ভারতবর্ষের জন্য কি লাভ করিয়াছেন, আমাদের অনেকেই তাহা না জানিলেও তাঁহারা ঠিক জানেন।

তারপর রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সটি স্বতঃই একটা আশঙ্কার কারণ, এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় মহাত্মাজী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি থাকিবেন, বটে কিন্তু সমগ্র ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি নহেন। পক্ষান্তরে দেশীয় নরপতিগণ, উদারনীতিকগণ, মডারেটগণ এবং অন্যান্য এমন অনেকে থাকিবেন, খাস ভারতবর্ষ অপেক্ষা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিতই যাহাদের স্বার্থ অধিকতর জড়িত। ইঁহাদের মধ্যে গান্ধী কি একা পড়িয়া যাইবেন না? অন্ততঃ এমন একটা সময় নিশ্চয়ই আসিবে, যখন ব্রিটিশ সরকার হইতে এমন সর্ত্ত উপস্থিত করা হইবে, যাহা কংগ্রেসের পক্ষে, সুতরাং গান্ধীর পক্ষে, গ্রহণযোগ্য নহে; কিন্তু সকলের পক্ষে না হইলেও অন্ততঃ অধিকাংশ প্রতিনিধির পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। তখন মহাত্মাজী একান্ত একা পড়িয়া যাইবেন। যদি তখনও আপোষে সম্মত না হন, তবে তাঁহাকে সকলে এই বলিয়া উপহাস ও নিন্দা করিবে যে, তিনি দেশের মঙ্গল অপেক্ষা নিজের জিদকেই বড় মনে করেন, সুতরাং তাঁহার সঙ্গ কারবার অসম্ভব। এমতাবস্থায় গান্ধীর পক্ষে অটল থাকা অসম্ভব হইবে এবং শেষ কালে পরাভব স্বীকার করিবেন। শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, এমতাবস্থায় সকল লোকই পরাভব স্বীকার করে; মহাত্মার ত কথাই নাই। তিনি স্বভাবতঃই শত্রুকেও বিশ্বাস

করেন, একান্ত শান্তিকামী, সুতরাং তিনি শেষ পর্য্যন্ত যে-কোন মূল্যে শান্তি ক্রয় করিয়া আনিবেন।

এই আশঙ্কার উত্তর প্রথমতঃ ইতিহাসেই পাওয়া যায়। গান্ধী ইতিমধ্যেই এরূপ অবস্থায় পড়িয়া অটল রহিয়াছেন। গত বৎসর যখন তিনি রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে যাইতে অসম্মত হইয়াছিলেন, তখন তিনি কি তাঁহার দেশবাসীদের মতের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যের মতের বিরুদ্ধে এমন কি, পৃথিবীর মতের বিরুদ্ধে একক দাঁড়াইয়াছিলেন না? ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রত্যেক মতাবলম্বী যাওয়ার জন্য ব্যস্ত ছিল এবং গিয়াছিল। কংগ্রেসের বিগ্রহরূপী গান্ধী যাইতে চাহেন নাই এবং যান নাই। বৃটেন তাঁহার সর্ত্তে সম্মত হয় নাই সুতরাং তিনি একক হইয়াও আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন! শুধু তাহাই নহে, ব্রিটেনের বিরুদ্ধে একক যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন এবং সাম্রাজ্যের ভিত্তি টলাইয়া দিলেন। মহাত্মা একবার যাহা করিয়াছেন, পুনরায় তাহা করিবেন। আমাদের মনে হয়, গতকল্য লাহোরে মহাত্মার যে অবস্থা ছিল, আগামীকল্য লণ্ডনে তাঁহার অবস্থা অপেক্ষা সুবিধা-জনক হইবে। যদি প্রয়োজন হয় তবে ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তন হইবে।

কিন্তু ঐ আশঙ্কার আর একটা উত্তর আছে। ঐতিহাসিক উদাহরণের মধ্যে এই উত্তর পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু মহাপুরুষের অসাধারণ শক্তির মধ্যে ঐ উত্তর পাওয়া যায়। এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা আমরা গান্ধীর পক্ষে সম্ভব মনে করি না। এই যেমন, লণ্ডনের কূটনৈতিকদের আদর-আপ্যায়নে মহাত্মা আত্মবিস্মৃত হইবেন, বা রাজা ও রাজসভার জাকজমকে বিভ্রান্ত হইয়া পড়িবেন, অথবা জনসাধারণের স্তুতিনিন্দায় তুষ্ট রুষ্ট হইবেন, এমন কথা আমরা মনে করিতে পারি না। মহাত্মা এ সমস্তের অতীত। তাঁহাকে ক্রয় করা অসম্ভব শুধু এই জন্য যে, তাঁহার কোন বিষয়-তৃষ্ণা নাই। ভ্রান্ত পথে তাঁহাকে চালিত করা অসম্ভব, কারণ বহু বৎসরের সংযম-নিয়মের ফলে তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। রাজ পোষাকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কটিবাস গান্ধীর সত্তার বর্ম্মস্বরূপ হইবে।

এজন্যই আমরা কল্পনা করিতে পারি না যে, মহাত্মা গান্ধী কদাপি উহা করিবেন না, কারণ তিনি উহা করিতে পারেন না। তিনি ভারতের মুক্তির জন্য আত্মনিয়োগ করিতেছেন। লক্ষ লক্ষ লোকের বিশ্বাসের দ্বারা, লক্ষ লক্ষ লোকের ত্যাগের দ্বারা তাঁহারা এই ব্রত পবিত্রীকৃত। তিনি মহাবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—"সম্ভব হইলে শান্তির দ্বারা, আবশ্যক হইলে সংগ্রামের দ্বারা" দেশকে স্বাধীন করার জন্য তিনি অবিরাম চেষ্টা করিবেন। আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, গান্ধী যাহা বলেন, তাহা করেন ইহার বিপরীত বিশ্বাসের অর্থ একথা বিশ্বাস করা যে, জল পাহাড় হইতে না নামিয়া পাহাড়ে উঠে।

আর একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। গান্ধী অলৌকিক বীরত্ব ও রাজনৈতিক-বুদ্ধির দ্বারা ভারতবর্ষকে এমন এক স্থানে আনিয়া পৌঁছাইয়াছেন যে, ঐ অবস্থায় তাঁহার অপেক্ষা অনেক বেশী দূর সেও দাবী পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অটল থাকিবে, ভারতবর্ষ এ স্বাধীনতার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। লাহোরের প্রস্তাবের পর, স্বরাজ্যের সঙ্কল্প গ্রহণের পর এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জাতি আর ইচ্ছা করিলেও পশ্চাতে হটিতে পারে না। সে যাত্রা সুরু করিয়াছে, পশ্চাৎকে পশ্চাতে রাখিয়াই সে চলিবে। যা ঘোষণা করা হইয়াছে, ভারতবর্ষে যাহা ঘটিয়াছে, যে কষ্ট করিয়াছে, তাহার পরও যদি সে তাহার প্রাপ্য অপেক্ষা কম গ্রহণে সম্মত হয়, তবে সে সমগ্র জগতের নিকট হাস্যাস্পদ ও ইংরাজের নিকট উপহাসাস্পদ হইবে। এতদপেক্ষা অধিকতর দুর্গতি হইবে তাহার নিজ দেশের লোকের নিকট। ভারতের আত্মত্যাগীগণ মরণের পরপার হইতে অভিশাপ বর্ষণ করিবে। অগণিত কারা-প্রকোষ্ঠে বসিয়া বন্দিগণ নীরবে যে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে, যে রক্ত তাহাদের পথ-প্রস্তরকে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে, সেই অশ্রু, সেই রক্ত জিহ্বা বিস্তার করিয়া ভারতের কলঙ্ক ঘোষণা করিবে। আজ যদি ভারতবর্ষকে বাঁচিয়া থাকিতেই হয়, তবে তাহাকে সত্যিকার বাঁচা বাঁচিতে হইবে, যোগ্য হইয়াই বাঁচিতে হইবে, আদর্শের অনুগামী হইয়াই বাঁচিতে হইবে, অখণ্ড মুক্ত প্রাণ লইয়াই বাঁচিতে হইবে। আর কেহ এই সত্য উপলব্ধি করুক না করুক, মহাত্মা গান্ধীকে ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, এই সত্যকে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে হইবে, সুতরাং তিনি ইহা বিস্মৃত হইবেন না।

কিন্তু শুধু ভারত নহে, সমগ্র জগতের সমস্যাও এইখানে। এমন কতকগুলি জিনিষ আছে, যেগুলির সম্বন্ধে কোনরূপ আপোষ-নিষ্পত্তি চলে না। কোন একটী জাতির স্বাধীনতা ঐরূপ একটি জিনিষ। কারণ তাহাকে হয় স্বাধীন অথবা অধীন থাকিতে হইবে, দুইয়ের মাঝামাঝি কোন অবস্থা নাই। একটা জাতির আত্মাও তদ্রূপ আর একটি জিনিষ, কারণ সে আত্মাকে হয় খাঁটি থাকিতে হইবে, অথবা উহা খাঁটি থাকিবে না। কোন ব্রতের পবিত্রতা ঐরূপ একটি জিনিষ, হয় ঐ ব্রত পালন অথবা পালনে বিমুখতা। নিজের মাতৃভূমির বাহিরে গান্ধী লক্ষ লক্ষ লোকের অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছেন; এই অনুরাগ তাঁহার স্বদেশ-প্রীতির জন্য নহে,—প্রেম, অহিংসা এবং আত্মিক বলের জন্য। ঐ গুণগুলির জন্য জগতের ইতিহাসে তিনি নিজের বিশিষ্টতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি যেমন ভারতের মুক্তির ব্রতের সাধক, সেইরূপ তিনি বিশ্বজগতের আধ্যাত্ম শক্তির অভিভাবকস্বরূপ। লণ্ডন গিয়া তিনি যখন গোল টেবিল বৈঠকে উপবেশন করিবেন, তখন তিনি তাঁহার স্বদেশের কোটি কোটি লোকের প্রতিনিধিরূপে তথায় উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে দাসত্ব বন্ধন হইতে মুক্তিদাতারূপে দেখিয়া থাকে; কিন্তু ভারতের বাহিরের অন্যান্য দেশেরও কোটি কোটি লোক হিংসা, যুদ্ধ বিগ্রহ, ঈর্ষা-দ্বেষ এবং মৃত্যু হইতে তাঁহাকে তাহাদের ত্রাণ

রূপ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। গান্ধী বিশ্বসেবককে উন্নততর জীবন-যাপনের পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনিই কি ঐ পন্থাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিতে সক্ষম হইবেন এবং তদ্দ্বারা উহার যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন? লণ্ডনে গিয়া তাঁহাকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। যদি তিনি তাহাতে ব্যর্থকাম হন, সমস্ত জগতের অন্তর অবসন্ন হইবে।

গ্রেট ব্রিটেনে গিয়া গান্ধীকে যে শক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে, জগতের ইতিহাসে কখনও কোন মানবকে তেমন কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয় নাই। সে শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার বিশ্বমানবকে ধন্য করিবার মত মানসিক শক্তি এবং আধ্যাত্মিক বলসম্পন্ন গান্ধীর ন্যায় কোন লোককে সমগ্র জগতের ইতিহাসে কখনও দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তিনি শুধু ভারতের নহেন, কিন্তু সমগ্র জগতের মহাত্মা; আমরা তাঁহাকে বিশ্বাস করি এবং তজ্জন্য আমরা তাঁহাকে তাঁহার ব্রত উদ্‌যাপনে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিব।

(গত আগষ্টের 'ইউনিটি' পত্রিকায় মিঃ জন হেনস্ হোমস্ লিখিত প্রবন্ধের মর্ম্ম)

"শরৎ"

শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী

বরষার অবসানে হাসিছে জগৎ।
শেফালী মালিকা গলে এসেছে শরৎ।
নীলাকাশে নাহি আর,
রাশি রাশি মেঘ ভার,
কানন রচিছে তার পুষ্পের পথ।
মঙ্গল গীত গাহি এসেছে শরৎ।

রঙ্গিন আঁচলখানি উতলা হাওয়ায়
দিকে দিকে মধু-বাস কেবলি উড়ায়।
নিশার শিশির জলে,
কমল-চরণ ফেলে
জাগালো কুসুম দলে আপন মায়ায়।
সোনার শরৎ আজি নেমেছে ধরায়।

জার্ম্মানীর বর্ত্তমান অবস্থা

প্রবন্ধ

শম্ভু চন্দ্র সেন গুপ্ত

জার্ম্মানীর বর্ত্তমান অবস্থা এমন স্থানে এসে পৌঁছিয়েচে—যে তার আলোচনা করতে গেলে দশ বৎসর পূর্ব্বেকার ইতিহাসের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। যুদ্ধের অবসানে ভার্সাই সন্ধিতে স্বাক্ষর করার পর জার্ম্মানীর জনসাধারণকে এমন কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে থাকতে হ'য়েছিল—যা তারা স্বপ্নেও অনুভব করতে পারেনি। তার পর, দেশের শাসনতন্ত্রের আমূল পরিবর্ত্তন—রাজাধিপত্যের স্থানে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হ'ল, অত বড় বিরাট শিক্ষিত সেনার দল ছত্রভঙ্গ করা হ'ল, প্রজাদের মধ্যে খাদ্য-দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে—এই সমস্ত বিশৃঙ্খলা দেশে এখন পুরামাত্রায় চল্‌ছে—কিন্তু তা সত্বেও যে, দেশের শাসন রশ্মিকে অবিচলিত রাখা হ'য়েছিল—আভ্যন্তরিণ কোনও প্রকার বিদ্রোহ হয়নি—আইন ও শৃঙ্খলা পুরামাত্রায় বজায় ছিল—সে কেবল সম্ভব হ'য়েছিল, জনকয়েক মুষ্টিমেয় সিভিলিয়ানের স্বদেশপ্রেমের দরুণ। জার্ম্মানীর প্রথম প্রেসিডেণ্ট্ হার এবার্ট ও ফিল্ড মার্শাল্ ভন্ হিণ্ডেন্‌বার্গের আন্তরিকতা ও অতুল স্বার্থত্যাগ এর সঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রাজ্যের মধ্যে এত বড় একটা পরিবর্ত্তন যে অরাজকতা ও রক্তপাত বিনা সম্ভবপর হ'য়েছিল—যেটা রুশ বা ফরাসী বিপ্লবের সময় মোটেই সম্ভব হয়নি—তা এক বিস্ময়জনক ব্যাপার। যুদ্ধের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জার্ম্মানদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে গিয়েছিল যে, ভালই হোক মন্দই হোক, শান্তি তাদের চাই-ই—যুদ্ধের ওপর তাদের বিতৃষ্ণা এসে গেছে। রণপোতদ্বারা অবরোধ, ভার্সাই সন্ধির সর্ত্ত, পূর্ব্ব প্রাশিয়াকে স্বতন্ত্র করা, সাইলেসিয়ার ইকনমিক ইউনিটী ছত্রভঙ্গ করা—এতগুলো ব্যাপারের ফলে এখন জার্ম্মানীর বর্ত্তমান বংশধরদের অবস্থা সঙ্কটেই উপলব্ধি হচ্ছে। 'রুর' এর মত শিক্ষা ও সভ্যতার স্থানে শ্বেত জাতির ওপর কালা সৈন্যের সমাবেশ করার দরুণ জার্ম্মানরা খুবই অসন্তুষ্ট হ'য়েছিল। বিদ্রোহভাবাপন্ন কার্য্যাবলীকে প্ররোচনা দিয়ে জার্ম্মানী থেকে রাইন প্রদেশকে পৃথক করার চেষ্টা—যে রাইনের সঙ্গে জার্ম্মান জাতির ইতিহাস, ভাবধারা ও আর্থিক অবস্থা অবিচ্ছেদ্যরূপে যুগ যুগ ধরে জড়িত হ'য়ে রয়েচে—এই সব অত্যাচারের দরণ জনসাধারণকে বোঝান একপ্রকার দুঃসাধ্য হ'য়েছিল যে, দেশের অর্থিক অবস্থার পুনরুদ্ধার এখনও সম্ভব।

'রুঢ়' প্রদেশ পরহস্তগত হওয়ায়, প্রচলিত মুদ্রানীতির যে বিশৃঙ্খলা ঘটেছিল—তার দরুণ জার্ম্মানীর কতকগুলি সেরা ব্যক্তির সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। তাদের সঞ্চিত অর্থগুলি সব হস্তান্তর হ'য়ে গেল; শুধু তাই নয়, অবসর প্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের পেন্সনের পর্য্যন্ত কোনও মূল্য রইল না। কিন্তু তা বলে এটা ভাববেন না যে তারা নিরাশ হ'য়ে গিয়েছিল। নিরাশ হবার পাত্র ত' তারা নয়ই বরং চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা আবার যে পূর্ব্বাবস্থা ফিরে পাওয়া যাবে—এটা সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম ক'রে জার্ম্মানরা দ্বিগুণ উৎসাহ ও দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করতে সুরু করে দিলে। যারা এই আর্থিক বিশৃঙ্খলার সময় বর্ত্তমান ছিলেন, তাদের ওপর এটা কতখানি ক্ষতিকর হ'য়েছিল—তা ভাষায় প্রকাশ করা একরকম দুঃসাধ্য ব্যাপার বললেই চলে। ডাক্তার লুথার ও রিশ ব্যাঙ্কের প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার স্যাটের তীক্ষ্ণ রাজনীতিক বুদ্ধিই দেশের আর্থিক অবস্থাকে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছিল। কিন্তু জার্ম্মান জাতির ভবিষ্যতের ওপর অটল বিশ্বাস ও গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের আদেশানুবর্ত্তিতা যদি এ সময় না পাওয়া যেত তাহ'লে বোধ হয় ডাক্তার লুথার ও ডাক্তার স্যাটের রাজনীতিক বুদ্ধি ও দক্ষতা সফলকাম হ'ত না।



জীবের প্রতি দয়া

Lakshmibilas Press Ltd.,

যুদ্ধের পর মিলিত শক্তিবর্গের সঙ্গে মিটমাটের সময় ডাক্তার ষ্ট্রেস্‌মানের মত চতুর রাজনীতিককে যে জার্ম্মানী পেয়েছিল, তার দরুণ তাকে ভাগ্যবান বলতে হ'বে। সহকর্ম্মীদের সহস্র বাধা সত্ত্বেও তিনি তাঁর দেশকে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের সময় যে ভাবে পরিচালিত করেছিলেন, তা বাস্তবিকই এক অদ্ভুত ব্যাপার।—তাঁর সন্ধির কথাবার্ত্তার ফলেই ডজ্‌ প্ল্যান্ (Dawes plan) ও লোকার্ণো সন্ধি স্বাক্ষরিত হ'য়েছিল। এই দুটো চুক্তির দরুণ জার্ম্মানী পরাপদানত জাতিতে পরিণত হবার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল; শুধু তাই নয় সে অন্যান্য জাতির সমকক্ষ বলে গণ্য হ'ল ও তাকে জাতিসঙ্ঘের সভ্য করা হ'ল।

জার্ম্মান জাতির চরিত্র বিশ্লেষণ করলে যে গুণটা সচরাচর চোখে পড়ে, সেটা হ'চ্চে—তারা সহসা নিরাশ হয় না। এ ছাড়া তারা অবিশ্রান্ত, অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ও অসম্ভব কাজ ব'লে যে সব জাতি পেছিয়ে আসে, ওরা সর্ব্বাগ্রে সেইটার দিকেই এগিয়ে যায়। এই জাতিগত বিশিষ্টতাগুলি যুদ্ধের পর জার্ম্মানীর ক্রমবিকাশে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছিল। পূর্ণ চারবৎসরকাল বিচ্ছিন্ন থাকবার পর, জার্ম্মানরা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করলে, বিশেষতঃ আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের সঙ্গে। আমেরিকার মত—তারা বুঝতে পেরেছিল যে সমবায় প্রণালীতে দ্রব্য উৎপাদন করতে পারলে তারা পৃথিবীর বাজার পুনরায় অধিকার করতে সমর্থ হ'বে। আমেরিকানদের কার্য্য-প্রণালী তাদের কিরকম কাজে লাগতে পারে—এ বিষয় নিয়ে জার্ম্মান বিশেষজ্ঞরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন করতে লেগে গেলেন। এঁদের মধ্যে অনেকে এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন—নিশ্চিত রূপে না জেনেও যে এটা ইউরোপের অবস্থার উপযোগী হবে কিনা। জার্ম্মানীর লৌহ ও ইস্পাতের তৈরী শিল্প সম্ভার সমেত 'লরেন' নামে জাহাজখানি যখন ফ্রান্সকে হস্তান্তরিত করা হ'ল, তখন জার্ম্মান গবর্ণমেণ্টকে ঐ শিল্পদ্রব্যের মালিকদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ করতে হ'য়েছিল—এবং তারা যে ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়েছিল তার দ্বারা সংগঠন কাজ আরম্ভ ক'রে দিল। জার্ম্মান শিল্পীরা বাহির থেকে প্রচুর অর্থ ঋণরূপে পেয়েছিল—যদিও তারা এই টাকা পরিশোধের পন্থা খুঁজে বার করতে সমর্থ হয়নি। দ্রব্য-বিনিময় করে সমস্ত জাতির ক্ষতিপূরণ করার দরুণ জার্ম্মানীর শিল্পগুলি সব বেঁচে গেল। জার্ম্মানীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের টাকা পাচ্ছিল—এই রকম দেশগুলি জার্ম্মানীতে তাদের আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুতের আদেশ দিয়েছিল—যে সমস্ত জিনিষগুলি যুদ্ধের সময় পাওয়া একরকম অসম্ভবই ছিল। এ ছাড়া জার্ম্মানীর অন্যান্য প্রদেশ ও মিউনিসিপ্যালিটীগুলি বৈদেশিক ঋণের সাহায্য পেয়েছিল। সমবায় নীতি অনুসারে জনকয়েক ব্যক্তির অর্থে জার্ম্মানীর প্রদেশে প্রদেশে বাড়ী তৈরী হ'তে লাগল। এই সব বাড়ীর সবগুলিই যে আয় দিত তা নয়। এদের কতকগুলি জনহিতকর কার্য্যে অবশ্যক হ'য়েছিল বটে—তবে তার সংখ্যা মুষ্টিমেয়! দেশের ভেতর শিল্পদ্রব্যের যথেষ্ট চাহিদা ছিল এবং এর দরুণ অনেক লোকনিয়োগের আবশ্যক হ'ল। এ ছাড়া দেশের রেলপথগুলি যুদ্ধের সময় নষ্ট হওয়ার দরুণ তার সংস্কারের আবশ্যক হ'য়েছিল। জার্ম্মানীর অর্ণব পোতগুলোর ঠিক এই রকম অবস্থাই তখন ছিল।

দেশের কৃষি সংগঠনে আমেরিকান পদ্ধতি অনুসরণ করা হ'ল ও জমির উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াবার জন্য রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হ'তে লাগল। যুদ্ধের সময় জার্ম্মানীর যে সমস্ত কাল কয়লার খনি ছিল—সে গুলি নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। এর দরুণ বাদামি রংয়ের কয়লার খনিগুলিকে কাজে লাগান হল। এই ধরণের কয়লাকে খুব কম খরচে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করতে পারা যায় ও সঙ্গে সঙ্গে কয়লার পরিবর্ত্তে আলো ও উত্তাপের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায়। এর পর নানা স্থানে বড় বড় বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হ'তে লাগল, ও এর দরুণ শিল্প ও ঘরোয়া কাজের জন্য বিদ্যুতের ব্যবহার অতিরিক্তভাবে বেড়ে গেল। কয়লার খনিগুলি নষ্ট হওয়ায় জার্ম্মাণীর আর একটা মস্ত লাভ হ'য়েছিল —সেটা হচ্ছে তার ওয়াটার পাওয়ারের (water-power) উন্নতি।

এই সব সংস্কারের এই ফল দাঁড়াল যে জার্ম্মাণীর শিল্পদ্রব্যের উৎপন্নশক্তি বর্দ্ধিত হ'য়ে গেল। বর্দ্ধিত

উন্নত ধরণের পদ্ধতি অনুসরণ করার দরুণ নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে কমে গিয়েছিল, তবুও অন্যান্য কাজ এত বেড়ে গিয়েছিল যে উদ্বৃত্ত লোকের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী লোক সেই সমস্ত কাজে নিযুক্ত হ'ল। একদিকে যেমন শিল্পদ্রব্যের উৎপন্ন ব্যয় যথেষ্ট কমে গিয়েছিল, অন্যদিকে সেইরূপ দ্রব্য চাহিদা হ্রাসের সময় অল্প দ্রব্য উৎপাদন করা অসম্ভব হ'য়েছিল। এ সত্ত্বেও যারা চলতি বাজারের সময় বেকার হ'য়ে বসেছিল, তারা নানাদিকে কাজে নিযুক্ত হ'তে লাগল।

দেশের আর্থিক অবস্থার এই প্রকার উন্নতি ও জার্ম্মাণীর জাতিসঙ্ঘে যোগদান করার ফলে লোকের খাওয়া-দাওয়ার ভাবনা অনেকটা কমে গিয়েছিল। এইবার তাঁরা নিজেদের ভিত্তি সুদৃঢ় ক'রে দেশের বাইরের দিকটায় নজর দিলে না—প্রথমেই তাঁরা তাঁদের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় রাইনল্যাণ্ডকে বিদেশী সৈন্যের হাত থেকে বার ক'রে নেবার জন্য যথেষ্ট চাপ দিলেন। ডাক্তার ষ্ট্রেস্‌ম্যান্ ও তাঁর সহকর্মীরা এটা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে এ কাজটা সমাধা করবার জন্য যে কোনও উপায় খুঁজে বার করতেই হবে। তাঁরা এটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে যতদিন পর্য্যন্ত না ক্ষতিপূরণের একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হচ্ছে ততদিন এ কাজটা একেবারেই অসম্ভব। এই জন্যই জার্ম্মাণীকে "ইয়ং প্ল্যানে" স্বাক্ষর করতে হ'য়েছিল। এই "ইয়ং প্ল্যান" স্বাক্ষর করার দরুণ জার্ম্মাণীকে যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি সহ্য করতে হয়। এ ছাড়া আরও অনেক বোঝার ভার জার্ম্মাণীর ওপর চাপান হয়—যেটা তার পক্ষে খুবই অসহনীয় হ'য়ে উঠেছিল। শুধু যদি আর্থিক দিক দিয়ে দেখা যায়, তা'হলে জার্ম্মাণীর এই "ইয়ং প্ল্যানে" স্বাক্ষর করা মোটেই উচিত হয় নি বলতে হবে। কিন্তু দেশের মধ্যে শতকরা নব্বই জন যখন এই সামরিক শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবার জন্য জিদ্ ধরলে, তখন তার এতে স্বাক্ষর করা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু যদিও ডাক্তার স্যাট প্যারিসে এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করেছিলেন, পরে হেগ্ কনফারেন্সে তিনি এটা প্রত্যাখ্যান করেন। তার এই মতের পরিবর্ত্তনের কি কারণ তা নির্ণয় করা বড় শক্ত। মাইনে ও পরিশ্রমের দিক দিয়ে যুদ্ধের পর থেকে যদিও শ্রমিকদের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হ'য়েছিল, তবুও গ্রেট্ ব্রিটেনের মত জার্ম্মাণীতে এদের অবস্থা তত সুবিধাজনক নয়। জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট্ খুব ব্যাপকভাবে বেকার ইন্‌সিওরান্‌সের প্রবর্ত্তন করেছিলেন—যার ভার নিয়োক্তা ও নিযুক্ত উভয় ব্যক্তিকেই বহন করতে হ'ত। কিন্তু অর্থের ঘাটতির সময় গবর্ণমেণ্ট্ সাহায্য অগ্রসর হ'তেন।

রিশ প্রদেশের শাসন ব্যাপারে সংযুক্ত রাষ্ট্রের কোনই হাত ছিল না। এ ছাড়া প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ওপর হস্তক্ষেপ করবার কোনও ক্ষমতা তার ছিল না। এই প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট্ গুলি নয়া রাস্তা নির্ম্মাণে ও পুরানো রাস্তা সংস্কারে, পাব্লিক বাটী নির্ম্মাণে, সহরের নর্দ্দমা প্রস্তুতে ও বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহ প্রভৃতি কার্য্যে যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতেন। এই সমস্ত কার্য্যের জন্য মোটা মোটা ঋণ ত' নিতে হ'য়েছিলই এ ছাড়া নতুন ট্যাক্‌স্ও বসাতে হ'য়েছিল। এই নতুন ট্যাক্‌স্ যদিও প্রথমে মহাজনদের গায়ে লেগেছিল খুবই, পরে জীবনধারণের ও উৎপাদনের খরচ যথেষ্ট বেড়ে যাওয়াতে জনসাধারণের ওপর এর প্রতিক্রিয়া হ'য়েছিল। ব্যবসায়ের চলতির সময় এই নতুন ট্যাক্‌স্ ততটা গায়ে লাগে নি। রাজনৈতিক দলের চাঁইয়েরা আর্থিক ক্ষতি সত্ত্বেও সাধারণের সহানুভূতি ও শ্রমিক-দলের অনুগ্রহ-ভাজন হবার জন্য এটাকে আইনে পরিণত করবার আয়োজন করতে লাগলেন। কিন্তু সংস্কার-নীতির সমাপ্তি ও যুদ্ধের সময় সংগৃহীত দ্রব্যগুলি নিঃশেষ হওয়ার দরুণ, জার্ম্মাণীর শিল্পদ্রব্যের চাহিদা ও উৎপাদনের পরিমাণ যথেষ্ট কমে গেল। এ ছাড়া আমেরিকার আর্থিক সঙ্কট ও জার্ম্মাণী, আমেরিকা ও বিলাতের শেয়ারের বাজারগুলির নেমে যাওয়ার দরুণ, সাধারণ বা ব্যক্তিগত ঋণ পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য হ'য়ে উঠেছিল। এর ফলে দ্রব্য উৎপাদনের হার কমে গিয়ে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল।

যুদ্ধের পরই জার্ম্মাণী, ভারতবর্ষ ও চীনের বাজারের ওপর নজর দিলে। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা

বিপর্য্যয়ের দরুণ তাদের সমস্ত আশা নির্ম্মূল হয়ে গেল। যে সমস্ত শ্রমশিল্পী রাশিয়ায় ব্যবসায়ের সুযোগ খুঁজছিলেন, তাদেরকেও নিরাশ হ'তে হ'ল। দক্ষিণ রাশিয়ার কতকাংশে শত বৎসরেরও অধিক কাল জার্ম্মাণ উপনিবেশ স্থাপিত হ'য়েছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণ সীমান্ত রাশিয়ার অনেকখানি অধিকার করে ছিল। রাশিয়ার ঐ সীমানায় অনেক জার্ম্মাণ বাস করতেন; তারা রুষ ভাষা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতেন ও রুষে ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। যুদ্ধের পর রাশিয়ার এই সমস্ত স্থান জার্ম্মাণীকে ছেড়ে দিতে হ'য়েছিল। জার্ম্মাণরা কিন্তু সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের জন্য অজস্র টাকা এই স্থানে ব্যয় করতে কসুর করেনি। কিন্তু রুষ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণের দরুণ সব বিফল হল। যুদ্ধের আগে জার্ম্মাণী তার নৌসেনা ও পদাতিক সেনা বাবদ শিল্প নির্ম্মাতাদের কাছ থেকে যথেষ্ট অর্থ আদায় করত। যুদ্ধের পর কতকগুলি দেশ নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করায় ও তারা নিজ নিজ দেশে ব্যবসা-শুল্ক প্রবর্ত্তন করার দরুণ, জার্ম্মাণীর যথেষ্ট ক্ষতি হ'য়েছিল। কারণ এরা আগে জার্ম্মাণীর শিল্পদ্রব্যের খুব বড় ক্রেতা ছিল।

যুদ্ধের পর থেকে জার্ম্মাণরা তাদের আচার ব্যবহারে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধন করেচে। যুদ্ধের পূর্ব্বে লোক ও সৈন্যদের মধ্যে রাই'য়ের রুটী খুব বেশী পরিমাণে চলত। কিন্তু এখন সর্ব্বত্রই সাদা রুটীর ব্যবহার হচ্ছে। এর ফলে রাই'য়ের পরিবর্ত্তে গমের চাষ করবার আয়োজন হ'তে লাগল। কিন্তু যে সব জমিতে রাই'য়ের চাষ হ'ত, তার শতকরা পঁচিশ ভাগ জমি গম চাষের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হল। কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জমিতে 'রাই' উৎপন্নের পরিমাণ যথেষ্ট বেড়ে গেল। যুদ্ধের পূর্ব্বে দেশের অধিকাংশ লোকই আলু ব্যবহার করত। এর পরিবর্ত্তে শাকসব্জি, ফল মাংস প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য এখন বেশী পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। আলু এখন এত বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছে যে চাষারা সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রী করবার ক্রেতা পায় না।

এই সব ব্যবস্থাই শ্রমিক ও ভদ্রসম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার সৃষ্টির প্রধান কারণ হ'য়ে উঠল। শেষোক্ত সম্প্রদায়ের শ্রমিক আন্দোলনের ওপর যথেষ্ট সহানুভূতি না থাকলেও বর্ত্তমান কার্য্যধারার ওপর তাঁরা খুবই বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে উঠেছিল।

দেশের মধ্যে তখন বেকার গ্রাজুয়েটের সংখ্যা এত অসম্ভবরূপে বেড়ে গিয়েছিল যে ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে বা গবর্ণমেণ্টের অফিসে কোন কাজ তারা পাচ্ছিল না। বিদেশে গিয়েও যে কাজ পাবে, তারও কোনও সম্ভাবনা ছিল না। এই সব কারণে গবর্ণমেণ্ট তাঁদের জন্য যে 'প্রপ্যাগণ্ডা' প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, তাতে এরা সম্মতি দান করলেন। কারণ "মিলিত দল" (allies) তাদের ওপর যে সমস্ত দাবা চাপিয়েছিলেন, সেটা নিছক অত্যাচার ভিন্ন আর কিছুই নয়। এ ছাড়া সৈন্য বিভাগের অবসর প্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা ছিলেন। এঁরাও কর্ম্মবিহীন হ'য়ে অতি কষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন। এই সমস্ত কারণে দেশের মধ্যে অসন্তোষের বীজ দিন দিন বেড়ে চলছিল। স্থায়ী সৈন্যের সংখ্যা হ্রাস করার দরুণ যাঁরা বংশপরম্পরায় সৈন্যের কাজ করে আসছিলেন— তাঁদের অনেকেরই বেকার হ'য়ে পড়লেন। এই ব্যাপারে একদল দরিদ্র কিন্তু ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হলেন। চাষারাও তাদের জমি থাকা সত্ত্বেও অন্নের সংস্থান করতে পারছিল না। 'রুঢ়' ও 'রাইন' প্রদেশের অনেক অধিবাসী 'সামরিক দখলের' দরুণ যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করছিলেন। তাঁরা এই ভাবলেন যে, দেশের গবর্ণমেণ্ট তাঁদের স্বার্থের প্রতি উদাসীন ও "মিলিত শক্তির" ইচ্ছা মাফিক কাজ করচেন। দেশের চারদিকে এই রকম অসন্তোষ পরিব্যক্ত হওয়ার দরুণ ফল হ'ল এই যে, বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনে সমাজতন্ত্রবাদী দলের নেতা হার হিট্‌লার এমন অসম্ভব সাফল্য লাভ করলেন যে তা অপ্রত্যাশিত বললেও চলে।

বেকার লোকের সংখ্যাধিক্যের দরুণ সোস্যালিষ্ট সম্প্রদায়ের সংখ্যা যেমন কমে যেতে লাগল, সেই অনুপাতে কমিউনিষ্টদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। রাশিয়া থেকে আর্থিক সাহায্য আসতে লাগল। বার্লিনকে কেন্দ্র ক'রে এঁরা পৃথিবীর সমস্ত দেশে বলশেভিকবাদ প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। যাতে পৃথিবীব্যাপী একটা মস্ত বিপ্লবের সৃষ্টি হয় তার জন্য

যথাসাধ্য কাজ হ'তে লাগল। সোস্যালিষ্ট পার্টি এ সব সংবাদ খুব ভাল রকমই জান্‌তেন। তাঁরা কমিউনিজম্ প্রচার বন্ধ করতে চেষ্টার কোনও ক্রটী করেন নি। কারণ এই জিনিষটাকে দেশের ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের দিক দিয়ে তাঁরা যথেষ্ট অনিষ্টকর বলে জেনেছিলেন।

রিসষ্ট্যাগে হিট্‌লার দল আশাতীত ক্ষমতা লাভ করার দরুণ জার্ম্মাণীর অন্যান্য রাজনীতিক দলের চাঁইদের চোখ ফুট্‌ল। নিজ নিজ দলকে লোক ও অর্থের দিক দিয়ে শক্তিশালী করবার জন্য তাঁরা উঠে পড়ে লেগে গেলেন। রাজনৈতিক ও শ্রমশিল্পী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই, ডাক্তার ব্রুনিং যে ভীষণ প্রোগ্রাম্ দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করেছিলেন তাঁরা তা সমর্থন করলেন। কারণ এটা তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে প্রতিজ্ঞা পালনে সন্দেহ করার অর্থ জার্ম্মাণীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস নষ্ট করা ও সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভবিষ্যৎ রাজনীতিক ও আর্থিক অবস্থার ধ্বংসসাধন। এমন কোনও দায়িত্ব হীন ব্যক্তি ছিলেন না যিনি স্বপ্নেও "ইয়ং প্ল্যান" বাতিল করার কথা ভাবতে পারেন বা জার্ম্মাণীর পূর্ব্ব সীমান্ত পরিবর্ত্তনের জন্য সৈন্যের সাহায্য নেবার পরামর্শ দেন।

জার্ম্মাণ সৈন্যদের মধ্যে যদিও কোনও কোনও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী; পূর্ব্বেকার বৃহৎ স্থায়ী সৈন্যের সময় যেমন পদোন্নতি হ'ত—যেটা এখন বন্ধ হ'য়ে গেছে—সেইরকম আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন, তা সত্ত্বেও তাঁরা খুব রাজভক্ত, যে দলই প্রস্তুত করুক না কেন—সৈন্যেরা যে সেই গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞা পালন করবেন—তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

লোক-সংখ্যা অনুপাতে জার্ম্মাণীর বেকার সংখ্যার কথা বিবেচনা করতে গেলে, তাকে বিলেতের অবস্থাপেক্ষা কোন অংশে সঙ্কটাপন্ন বলা চলে না। বেকারদের জন্য যে ভাণ্ডার ব্যবস্থা আছে, সেই ব্যাপার নিয়ে দুই দেশেই বেশ জটীল সমস্যার উদ্ভব হয়েচে।

জার্ম্মাণীর কেউ কেউ এরূপ ভয় করচেন যে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সূত্রপাতের ছলে, পোল্যাণ্ড, ফিন্‌ল্যাণ্ড বা অন্য কোনও দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন কিংবা সীমান্তের দিকে অনাহারী রুষ নরনারীর দল স্বদেশ ত্যাগ করে, ঐ স্থানে বাস করতে পারে—এর যে কোনও একটার জন্য পোল্যাণ্ডের সীমান্ত সমস্যা নিয়ে জটীল অবস্থার সৃষ্টি হবে ও তার দরুণ পৃথিবীর শান্তিতে ব্যাঘাতের সৃষ্টি করবে। কিন্তু সীমান্তে অবস্থিত দেশগুলির ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরা এ ধারণার মূলে কোনও সত্য আছে ব'লে বিশ্বাস করেন না।

মধ্য ইউরোপের অবস্থার কথা বিবেচনা করলে এটা বেশ বুঝতে পারা যায় যে, জার্ম্মাণীতে এখন কোনও বিদ্রোহের বন্যা আসতে পারে না। যে দলই দেশ শাসন করুক না কেন তাঁরা পূর্ব্ববর্ত্তী দলের নীতি অনুসারেই কাজ করবেন। পশ্চিম সীমান্ত পরিবর্ত্তনের জন্য জোর জুলুম করা হোক—এরকম ভাব এখন আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আর্থিক ও অন্যান্য যে সমস্ত ভার যুদ্ধের পর জার্ম্মাণীর ওপর চাপান হ'য়েচে—এ সমস্ত তার পক্ষে দুঃসহ হ'য়ে দাঁড়িয়েচে। শান্তিপূর্ণ বৈঠক ছাড়া আর কোনও পন্থায় যে এর পরিবর্ত্তন হ'তে পারে—তার কোনও সম্ভাবনা নেই। জার্ম্মাণীতে আবার যে একাধিপত্যের প্রবর্ত্তন হ'তে পারে বা গবর্ণমেণ্ট্ যে নীতি অবলম্বন করেচেন তার আমূল পরিবর্ত্তন হ'তে পারে—এটা কখনই সম্ভব নয়।

এতদিন প্রাশিয়াই সামরিক নেতৃত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু যেদিন বিসমার্ক প্রাশিয়ার রাজাকে জার্ম্মাণ সম্রাটের পদ দিয়ে প্রাসিয়ার সঙ্গে মিলিত করলেন, সেই সময় থেকেই প্রাশিয়ার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েচে। তখন সামরিক রাজার অধীনে প্রাশিয়া একটী সম্পূর্ণ সামরিক রাজত্ব ছিল। এখন সোস্যালিষ্ট্ দলের একজন মন্ত্রী প্রেসিডেণ্টের কড়া শাসনে প্রাসিয়া রয়েচে। তিনি ইচ্ছা করলেই প্রাশিয়ার গবর্ণমেণ্ট গড়তে বা ভাঙ্গতে পারেন। "সেণ্ট্র্যাল পার্টি" তাকে সম্পূর্ণরূপেই সমর্থন করেন। যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত তিনিই প্রাসিয়ার রাজকার্য্য পরিচালনা করে এসেচেন। প্রুসীয় গবর্ণমেণ্টের সমস্ত চাকরীগুলি তাঁর দলভুক্ত ব্যক্তিরাই পেয়ে থাকেন। প্রাসিয়ার অর্দ্ধ সামরিক পুলিশ বাহিনী তার শাসনাধীনে রয়েচে। আয়তনে সবচেয়ে বড় ও গুরুত্ববিশিষ্ট রাজত্ব-হিসাবে জার্ম্মাণীর ওপর প্রাসিয়ার প্রভাব এখনও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কেউ যদি সামরিক কর্ত্তৃত্ব হস্তগত করতে চেষ্টা করে—তাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রাশিয়া দমন করতে পারে।

কেউ কেউ এমন মনে করেন প্রেসিডেণ্ট ভন্ হিণ্ডেন্‌বার্গের মৃত্যুর পর দেশে বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান সমস্যা যদি একটা সুরাহা হ'য়ে যায় তবে তাঁর তিরোধানে জার্ম্মাণীর কোনও বিশেষ ক্ষতি হ'বে না। শাসনপ্রণালীর কোনও পরিবর্ত্তন না হ'য়েও তাঁর উত্তরাধিকারী যথাযথভাবে নির্ব্বাচিত হবে।"



ভারত ও ইংলণ্ডের স্বার্থ সমন্বয়

দেখিতেছি আমাদের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হইয়াছে। গত ২৯শে আগষ্ট শনিবার মহামানব মহাত্মা গান্ধী বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার বিলাত যাত্রা সম্বন্ধে যখন ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলাম তখন তাঁহার যাত্রা-সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান ছিলেন কিন্তু ঘটনাগুলির সন্নিবেশ এমন ভাবে হইয়া আসিতেছিল যে আমরা তাঁহার বিলাত-যাত্রা সম্বন্ধে খুবই আশান্বিত ছিলাম এই জন্যই জোর করিয়া উহা প্রচার করিয়াছিলাম।

এখন অনেকেরই বিবেচ্য বিষয় হইতেছে যে মহাত্মাজী গোল টেব্‌ল বৈঠকে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন! বিলাতে মন্ত্রী সভার পতন হইয়াছে এবং একজন লেবার সদস্যের পরিবর্ত্তে একজন ঘোরতর রক্ষণশীল সদস্য ভারত সচিবের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইংরাজ রাজনৈতিকগণ বলিতেছেন, মাভৈঃ, তাহাতে তোমাদের কোন ভয়েরই কারণ নাই, কেননা ভারত সম্বন্ধে আমাদের মত ভেদ নাই। আমাদের বর্ত্তমান ঘরোয়া কলহ দেখিয়া তোমাদের শঙ্কিত হইবার কোন কারণই নাই। উদাহারণ স্বরূপে তাঁহারা বলিতে চাহেন যে গোলটেব্‌ল বৈঠকে যে সমস্ত ইংরাজ প্রধান ইংরাজ সরকারের পক্ষ হইতে যোগদান করিবেন একমাত্র বেন সাহেব ব্যতীত তাঁহারা সকলেই পূর্ব্ববারেই যোগদান করিয়াছিলেন। গোল টেব্‌ল বৈঠকের প্রধান হোতা ও ইংলণ্ডের রাজনীতির বর্ত্তমান কর্ণধার ম্যাকাডোনাল্ড সাহেব এবারও সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবেন। ফেডারল্ কমিটিতে সেই স্যাঙ্কি সাহেব ও লর্ড রিডিং আছেন। ব্যবস্থা যখন পূর্ব্বানুরূপ রহিল তখন উহার নীতি বদলাইবে কেন? ইংলণ্ডের সংবাদ পত্র সমূহ কিন্তু ঠিক ঐ একইরূপ ধারণা পোষণ করিতেছেন না। সংরক্ষণশীলদের পত্রগুলি ঐ একই সুরের সানাই বাজাইতেছে সত্য কিন্তু কোন কোন লেবর পত্র স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছে যে ইংলণ্ডের মন্ত্রী পরিবর্ত্তনের ফলে ভারতেও ইংরাজ শাসনের আদর্শ কিছু বদলাইয়া যাইবে। পার্লামেণ্টে তখন লেবার রীতি চলিত, লেবার দল কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ম্যাকডোনাল্ড সাহেব তাঁহার নূতন দল রক্ষণশীলদের লইয়া যখন কার্য্য করিবেন তখন তাঁহাদের রীতি অনুসারে চলিতেই হইবে।

আমাদের দেশেও দুইটী মত বেশ স্পষ্ট ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মহাত্মার নিন্দুকদের কথা ছাড়িয়া দিলে, একদল বলিতেছেন যে মহাত্মাকে বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতেই হইবে, কেননা রক্ষণশীলদের নিকট হইতে কোন প্রকার অধিকার প্রদান আশা করা দুরাশা মাত্র। অপর একদল আছেন তাঁহারা বলিতেছেন যে মহাত্মাজী যাহা লইয়া আসিবেন তাহা আমাদের দেশবাসীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না, কাজেই একটী দল গঠিত হইয়া যাইবে যাহারা মহাত্মাজীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া আরও অধিক অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিবে, তখন ভারতের বিপ্লববাদীরা মাথা তুলিয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিতে পারে।

আমরা সমস্ত মতামত গুলিই বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদের এই ধারণা যে মহাত্মাজীকে আমরা যদি আমাদের আশানুরূপ কার্য্য করিতে দিই তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। ইংরাজ সরকার এখন ভারতকে কোন প্রকারেই অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতে যে অসহযোগ সমর আরম্ভ করা হইয়াছে

তাহার ফলে ইংরাজের প্রধান পণ্য বস্ত্র ও লৌহ প্রায় মৃতবৎ হইয়া আসিতেছে। এই উভয়বিধ পণ্য বাবদ ইংরাজ এক ভারতবর্ষেই প্রায় ১০০ কোটী টাকার বার্ষিক ব্যবসা চালাইতেন। শতকরা ২০ টাকা মুনাফা ধরিলে, ইংলণ্ডের বার্ষিক শুধু ভারতবর্ষ হইতে ঐ দুইটী মাত্র পণ্য বিনিময়ে ২০ কোটী টাকা প্রাপ্য ছিল। এখন যৎসামান্ত আয় যাহা আছে তাহাও একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে যদি ইংরাজ ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করিতে না পারে। ইংরাজদেরই প্রধান স্বার্থ ভারতবাসীর সহিত স্বার্থের সমন্বয় করিয়া একটা আপোষ করা।

আমরা জানি মহাত্মা একজন মহামানব এবং তাঁহার soul force খুবই কার্য্যকরী। কিন্তু ইংরাজের স্বার্থরক্ষা এখন বিশেষ ভাবে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই, তথাকার সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিই তার স্বরে ভারতকে সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; এবং সেই জন্যই তাঁহার তাবৎ দাবী গ্রাহ্য করিয়া আদর অপ্যায়ণ পূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে। এ ক্ষেত্রে ইংরাজ রাজনৈতিকগণ যে কেবলমাত্র সাফাই গাহিবার জন্যই এত আগ্রহ দেখাইতেছেন এরূপ ধারণা পোষণ করা কি নেহাৎ অন্যায় নহে? তাঁহারা চাহেন তাঁহাদের স্বার্থ ও ভারতের স্বার্থ উভয়ের সমন্বয়ে এক নূতন স্বার্থের সৃষ্টি এবং সেই স্বার্থ রক্ষার জন্য ভারতবর্ষকে যতটা রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করা প্রয়োজন হইবে তাহা তাঁহারা ভারতকে প্রদান করিবেনই। এখন কথা হইতেছে যে এই স্বার্থ-সমন্বয় করিবার জন্য মহাত্মা জী যদি প্রস্তুত হন এবং তাঁহাকে অবাধে ঐ কার্য্য করিতে যদি আমরা দিই তবে নিশ্চয়ই জানিয়া রাখুন রাজনীতি ক্ষেত্রে আমরা অনেকটাই অগ্রসর হইয়া যাইব।

কথাটা বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে ইংরাজের যেমন স্বার্থ আমাদের হাতে রাখা আমাদের ও অনেকটা স্বার্থ ইংরাজদের অধীনে এখনও কিছুকাল থাকা। এই কথাটুকু মানিয়া লইলে অনেকটা ব্যবধান আপনা হইতেই দূর হইয়া যায়। ইংলণ্ড শিল্প প্রধান দেশ। তাহাকে বাণিজ্য-পণ্য বিক্রয় করিয়া জীবন-ধারণ করিতে হয়। এককালে বিশাল বিশ্বে তাহার বিবিধ প্রকারের বাণিজ্য পণ্য বিক্রয় হইত। ক্রমশঃ সমস্ত বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি হস্তচ্যুত হইয়া শুধু ভারত ও চীন তাহাদের হস্তগত থাকে। গত কয়েক বৎসর চীনে রাষ্ট্র বিপ্লব ভীষণ ভাবে আত্ম-প্রকাশ করায় ইংরাজ বণিকগণ চীনদেশের সহিত তাহাদের যে বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল তাহা ক্রমশঃ হারাইতেছেন। ভারতেও তাঁহাদের পণ্যের স্থান অসার হইতেছেনা। খুব সম্ভব মহাত্মাজী বিলাতে গমন করিলে বিলাতের বণিক ও রাজনৈতিকগণ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বিলাতের শিল্প কেন্দ্রগুলি দেখাইবেন। যে ম্যানচেষ্টার ও সেফিল্ড কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও কিরূপ সমৃদ্ধিশালী ছিল এখন তাহাদের কিরূপ অবস্থা হইয়াছে মহাত্মা স্বচক্ষে দেখিলে বিলাতের বণিকগণ ভাবিতেছেন যে মহাত্মাকে একটা আপোষের মধ্যে আনিয়া ফেলিতে পারিবেন। তাঁহাদের এই ধারণা, যে একেবারেই ভিত্তি হীন তাহাও বলিতে পারা যায় না, কেননা গত কয়েক মাস যাঁহারা মহাত্মার মতাবলী একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে মহাত্মাও যেন একটা আপোষের জন্য খুবই সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন। কোন এক ঘটনায় তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে ইংরাজের সহিত বা ইংলণ্ডের উপর তাঁহার কোনই আক্রোশ নাই। তিনি একথাও তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলীকে বলিয়াছেন যে যদি বিদেশজাত কোন পণ্য অত্যন্ত আবশ্যকীয় বস্তু জ্ঞানে আমাদিগকে গ্রহণই করিতে হয় তবে উহা ইংলণ্ডের নিকট হইতে গ্রহণ করা আমাদের উচিত। মহাত্মাজীর মনোভাব আমরা বেশ বুঝিতে পারি। বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীনতা লাভ করা যখন যাইতে পারে না, তখন ক্রম-পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করাই আমাদের একমাত্র পথ! ইংরাজ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতেই আসিয়াছিল এবং বাণিজ্য রক্ষা করিতে যাইয়া তাহারা সারা ভারতবর্ষে তাহাদের সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া বসে। পূর্ব্বেও তাহাদের উদ্দেশ্য যেরূপ ছিল এখনও সেইরূপই আছে, উহার বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন হয় নাই। যাঁহারা ভাবেন যে গুটি শতক ইংরাজ কর্ম্মচারীর অন্নের জন্যই ইংরাজ ভারতবর্ষকে শাসন করিতেছেন তাঁহারা বাস্তবিকই মহাভুল ধারণা পোষণ করেন। মহাত্মাজী যদি ম্যানচেষ্টার ও সেফিল্ড

পরিদর্শন করিয়া উহাদের পণ্য বিক্রয়ের জন্য ভারতের বাজার উন্মুক্ত করিয়া দেন, তাহা হইলে অনেকটা স্বায়ত্ত শাসন আমরা পাইতে পারিব।

কিন্তু এইরূপ কার্য্য করিবার দুইটী অন্তরায় আছে। বোম্বায়ের কাপড় ব্যবসায়ীরা মহাত্মাজীর আন্দোলনের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আছেন। ১৯০৫ সাল হইতে বিলাতী বর্জ্জনের বন্যা উঠিয়াছে বলিয়াই তাঁহাদের কাপড়ের কলগুলির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে; তাহা না হইলে জলবুদবুদের মতন তাহারা কোনখানে কালের অতল জলে মিশাইয়া যাইত। অবশ্য একথা সত্য যে এখন কলগুলির অনেকেরই অবস্থা ভাল। তুলাও এখন আমেরিকা হইতে আমদানী করা হয় না। কাজেই বিলাতী বস্ত্র যদি আমরা বিনা শুল্কে ভারতে প্রবেশ করিতে দিয়া উহার উপর হইতে বর্জ্জন-প্রথা তুলিয়া লইয়া দেশী কাপড়ের সহিত সমান প্রতিযোগীতা করিবার অবসর দিই, তাহা হইলে নূতন দুই একটী কাপড়ের কলের অসুবিধা হইলেও তাবৎ বস্ত্র শিল্পের বিশেষ অসুবিধা হইবে না। কিন্তু দেশীয় বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা এতকাল বিলাতি বর্জ্জনের আবরণে একটা মোটা লাভ করিয়া আসিতেছেন, পূর্ব্বোক্ত প্রথা অবলম্বন করিতে গেলে তাঁহাদের সেই স্বার্থে আঘাত লাগিবে, বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা তাহাতে সম্মত হইবেন কি? অপর কথাটী হইতেছে ইংরাজীতে যাহাকে বলে sentiment. আজ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া বিলাতি বর্জ্জন করিয়া উহা বর্জ্জন করাই যেন আমাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। নূতন বংশধরগণ হইয়াছেন যাহারা বিলাতী ব্যবহার কর বলিতে গেলেই খড়্গ হস্ত হইয়া উঠিবেন।

জাতির স্বার্থই জাতিকে বাঁচাইয়া রাখে। Sentiment প্রয়োজন কেননা স্বার্থকে মূর্ত্তি দিবার জন্য। কাজেই মহাত্মাজী যদি দেশবাসীর sentiment কে একটু তাচ্ছিল্য করিয়া এবং বোম্বায়ের কাপড়ওয়ালাদের প্রভাব ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন তাহা হইলে যে আপোষ হইবে তাহা ভারতকে চিরদিনের মত শান্তি প্রদান না করিলেও বর্ত্তমানে তাবৎ সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিতে পারিবে।

হিন্দু মুসলমান সমস্যা

শুনা যাইতেছে যে পোর্টসৈইদ হইতে মৌলানা সওকৎ আলী মহাত্মার সহিত মিলিত হইবেন। খবর সুখবর। এক সময়ে মহাত্মার আবহাওয়ায় আসিয়া মৌলানা ভ্রাতৃদ্বয় ভারতের উন্নতির জন্য জীবন পণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে কমিউন্যালইজম্ মৌলানাকে অন্ধ করিয়া রাখিলেও তাঁহার উদারতা ও বুদ্ধিমত্তায় আমাদের বিশ্বাস আছে। মিঃ জিন্না প্রভৃতি একদল মুসলমান আছেন, তাঁহারা মুখে না বলিলেও প্রাণে প্রাণে চাহেন যে হয় ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্ব অটুট থাকুক না হয়ত মুসলমান প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হউক। পাঞ্জাবের মিঃ সফিও এই দলের একজন প্রধান পাণ্ডা। জগতের রাজনীতি হইতে এই বিংশ শতাব্দিতে ধর্ম্ম তিরোহিত হইয়াছে এই খবর যে তাঁহারা রাখেন না তাহা নহে, তবে তাঁহারা চাহেন যে একটী দল সঙ্ঘবদ্ধ করিতে পারিলেই ভারত-শাসন তাঁহাদের হস্তগত হইতে পারিবে। কেননা ভারতবর্ষে হিন্দু প্রাধান্য থাকিলেও সঙ্ঘবদ্ধ পাঠান, ও মোগল এককালে ভারতের রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানেও মাত্র কয়েক সহস্র ইংরাজ, একতা সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া বিশাল ভারত শাসন করিতেছেন। এইরূপ আশা হৃদয়ে পোষণ করিবার হেতুও যথেষ্ট আছে। ভারতের হিন্দুগণ শতধা বিভক্ত। উচ্চ জাতি হিন্দুগণ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের সহিত পশুবৎ ব্যবহার করায় উভয় শ্রেণীর মধ্যে অনেকটা ব্যবধান বরাবরই রহিয়া গিয়াছে। আবার আচার ও ব্যবহারে ভারতের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা প্রদেশানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত; কেহ কাহারও সহিত একত্র পান-ভোজন বা পুত্রকন্যার বিনিময় করেন না। এরূপস্থলে সংখ্যায় অল্প হইলেও ভারতের তাবৎ মুসলমান সম্প্রদায় যদি এক বিরাট একতা সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে তাহা হইলে ভারতে মুসলমান প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এই জন্যই ভারতীয় মুসলমানগণ হিন্দুদের সহিত কোন কার্য্যই একযোগে করিতে চাহেন না। তাঁহারা সর্ব্বত্রই ভিন্ন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন। যুক্ত নির্ব্বাচকমণ্ডলীর মধ্য দিয়া আসিতে গেলে তাঁহাদের একতার হানি হয়। এক পাঠাগারে, বা বিদ্যালয়ে পাঠ করিলে তাঁহাদের ঐক্য সম্পাদনের

অন্তরায় হইতে পারে এই জন্যই ভারতীয় মুসলমানগণ চাহেন বিভিন্ন বিদ্যালয়, পাঠাগার এমন কি বিশ্ব-বিদ্যালয়ও বিভিন্ন হইলে তাঁহাদের মতে মন্দ হয় না! জাতীয়তার ধুয়া তুলিয়া যাঁহারা বলিতে চাহেন যে ইসলামীয় কল্‌চ্যর যতই উন্নত হউক না কেন, বর্ত্তমানে উহা একেবারেই অচল, তাঁহাদিগকে আমরা এই মাত্র বলিতে চাহি যে মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ ত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এক ভারতীয় জাতিতে পরিণত হইতে চাহেন না, তাঁহারা চাহেন নিজেরা সঙ্ঘ-বদ্ধ হইয়া ভবিষ্যতে ভারতে পূর্ব্বের ন্যায় প্রভুত্ব করিতে, কাজেই তাঁহাদের চালচলন ও আচার-ব্যবহারে এমন কতকটা পার্থক্য রাখা প্রয়োজন, যাহাতে তাঁহারা যেন কোনকালেই হিন্দুর সহিত এক না হইয়া যান।

একটু বেশ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে আমরা আর একটি জিনিষ বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাই। এই বৃহত্তর স্বার্থের নিম্নে আত্ম-গোপন করিয়া ব্যক্তিগত উন্নতি ও স্বার্থের ফল্গু খরস্রোতে বহিয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায় শিক্ষায় এখন অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় তাহাদের সমগ্র সধর্ম্মীদের নাম করিয়া যে দাবী প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইতেছেন তাহাতে তাঁহাদের সকলেই বিশেষ লাভবান হইতেছেন। তাবৎ সরকারী চাকুরীর এক তৃতীয়াংশ যদি মুসলমানদের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে তাহা হইলে তাবৎ শিক্ষিত মুসলমানই উহার একটু অংশ পাইবেন বলিয়া আশা করিয়া থাকেন। কাজেই এ ক্ষেত্রে শিক্ষিত সম্প্রদায়ই ভারতে হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ে এক জাতি গঠনের ভীষণ অন্তরায় হইয়া উঠিতেছেন।

মৌলানা সাহেব সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া যদি এই ধারণায় উপনীত হয়েন যে সংখ্যায় গরিষ্ঠ হিন্দু-সম্প্রদায়কে দাবাইয়া রাখিবার যুগ চলিয়া গিয়াছে কেননা তাহা সম্ভব হইলে পরাক্রান্ত ইংরাজ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই দাবাইয়া রাখিতেন; তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা মীমাংসা হইয়া যাওয়া কিছুই কঠিন হয় না। মুসলমানগণ যদি হিন্দুগণকে বিশ্বাস করেন, হিন্দুগণ যে কেন তাহাদিগকে অবিশ্বাস করিবেন তাহা আমরা বুঝি না। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের সহিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মিল নাই। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ এখনও অনুন্নত। মুসলমানগণ যদি হিন্দুদের সহিত মিলিত হন, শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানগণ হিন্দুদের সহিত নিশ্চয়ই সমান অধিকার পাইবেন এইরূপ আশাই আমরা করিতে পারি।

বাংলার কংগ্রেস ও বন্যা

বাংলায় কংগ্রেসী কেলেঙ্কারীর বোধ হয় আর শেষ হইবে না। সম্প্রতি শ্রীযুত বোসের সহিত আচার্য্য রায়ের চিঠি পত্র প্রদানে উহার ভীষণ পূতিগন্ধ জন-সাধারণকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে। আচার্য্য রায় বন্যার টাকা লইয়া কেন খাদি প্রতিষ্ঠানে ব্যয় করিলেন? উহার উত্তরত অতি সহজ। দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিবার জন্য সরকার পক্ষ হইতে সাধারণতঃ দুইটী পন্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে, উহার একটীর নাম Preventive measure আর একটীর নাম Protective measure. দুর্ভিক্ষ যখন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উপস্থিত হয় তখন যে সাহায্য করা হয় তাহারই নাম Preventive measure. অর্থাৎ, ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছে; লোকে খাইতে পাইতেছে না, পরিবার বস্ত্র নাই, তখন তাহাদিগকে অন্ন-বস্ত্র যোগাইয়া রক্ষা করিতে হয়। কিন্তু বন্যা ও দুর্ভিক্ষ মহামারীর ন্যায় বাংলায় দুইচার বৎসর অন্তর নিয়মিত ভাবেই সময়ে সময়ে আবির্ভাব হয়। উহা নিবারণ করিতে গেলে যাহাদের কোন সঙ্গতি নাই, তাহাদিগকে সঙ্গতিশালী করিয়া দিতে হয়; উহারই নাম Proctective measure। খাদি-প্রতিষ্ঠান Pro-tective measure এর কার্য্য করিয়া আসিতেছে। আচার্য্য রায় নিঃস্ব গ্রামবাসীদিগকে বিনামূল্যে চরকা ও তুলা দিয়া তাহাদের অবসর মত তুলা কাটিতে শিক্ষা দিয়া এবং উৎপন্ন পণ্য কিনিয়া লইয়া তাহাদিগকে কতকটা শক্তিশালী ও আত্ম-নির্ভরশীল করিয়া তুলিতেছেন। এইরূপ প্রতিষ্ঠান কোন কালেই লাভজনক হইতে পারে না, কাজেই খাদি-প্রতিষ্ঠান লাভজনক ব্যবসায় নহে, উহাতে দুঃখ করিবার কি আছে? বন্যায় সাহায্য করিবার জন্য যে টাকা উঠিয়াছিল উহারই একটা অংশ খাদিপ্রতিষ্ঠানে ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়া উহা আইনতঃ অন্যায় বলিয়া চীৎকার করিয়া লাভ কি? পরন্তু কংগ্রেসের হস্তে যে টাকাটা

এতদিন ছিল উহা কোন কার্য্যে এতদিন নিয়োজিত ছিল একথা কি জন সাধারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারে না? উত্তরে যদি বলা হয় উহা আমাদের নিকটেই আছে তাহা হইলে কি বলা যাইতে পারে না যে উহা নিশ্চয়ই ব্যাঙ্কে জমা আছে, সুতরাং উহার সুদ কোথায় গেল। গত বৎসরের অসহযোগ-আন্দোলন সময়ে কংগ্রেসী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার ভয়ে উহা আমাদের লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম বলিলে কি লোকে উপহাস করিবে না?

বিলাতী গবর্ণমেণ্ট ও মিঃ ম্যাকডোনাল্ড

ইংলণ্ডে লেবার সম্প্রদায়ের পতন হইয়াছে। ম্যাকডোনাল্ড প্রধান মন্ত্রী থাকিলেও বর্ত্তমানে যে মন্ত্রী-সমাজ রহিল উহাকে লেবর মন্ত্রীসমাজ অপেক্ষা রক্ষণশীল মন্ত্রী-সমাজ বলিলেই শোভন হয়। এসম্বন্ধে দেশী ও বিলাতি কাগজে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছে।. একদল ম্যাকডোনাল্ডকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া যেমন অভিনন্দিত করিতেছেন অপর দল আবার তাঁহার মহত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া দেশের একমাত্র পরিত্রাণ কর্ত্তা বলিয়া পূজা করিতেছেন। একই নেতার উপর দেশবাসী জনসাধারণের মনে এইরূপ বিভিন্নমুখী দুইটী ভাবের যুগপৎ উদয় পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম নয়। তিনি কিরূপ লোক ছিলেন ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখক পরে নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সাহেব প্রথম জীবনে সাধারণ শ্রমিক মাত্র ছিলেন। তাহার আত্মজীবন চরিতে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিবার যথেষ্ট আগ্রহ থাকিলেও পয়সার অভাবে ইচ্ছা পরিপূর্ণ করিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁহার স্ত্রী প্রকৃতই তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। রাত্রে মোমের বাতি জ্বালিয়া ম্যাকডোনাল্ড সাহেব গ্রন্থপাঠে মনোনিবেশ করিলে তাঁহার পত্নী তাঁহার নিকটে বসিয়া কখন বা বাতিটা ঠিক করিয়া দিতেন আবার কখন বা গ্রন্থাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া সাহায্য করিতেন। তিনি তাঁহার স্বামীর প্রধান উপদেষ্টা এবং সমালোচক ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। ম্যাকডোনাল্ড সাহেব তাঁহার প্রত্যেক লেখাই তাঁহার স্ত্রীকে দেখাইয়া ছাপিতে দিতেন। গ্রন্থের সমালোচনা করিয়া রচনার উৎকর্ষ সম্পাদন করিতেন। ক্রমশঃ ম্যাকডোনালড সাহেব ধীরে ধীরে উন্নতি করিয়া শ্রমজীবিদল সংগঠন করেন। ১৯০৫ সালে এই দলের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি ও তাঁহার সহচরগণ যখন পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন তখন কেহই ভাবিতে পারেন নাই যে কুড়ি বৎসরের মধ্যেই এই দলের হস্তেই রাজ্যভার ন্যস্ত হইবে। মোট কথা শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের উত্থানের ইতিহাস ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের স্বীয় জীবনেতিহাসের সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংবদ্ধ।

যে দল তিনি স্বয়ং সংগঠন করিয়াছিলেন এবং যে দলের নেতা হিসাবে তিনি আজ বিশ্ব-বরেণ্য হইতে পারিয়াছেন, কালের চক্রে সেই দল তাঁহাকে ছাড়িতে হইল, ভবিষ্যতে হয়ত বা তাঁহাকে চিরজীবনের জন্য রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেও হইবে। এইরূপ পরিবর্ত্তন কি হঠাৎ হইল? আমরা বলিব বাহ্যত: দেখিতে তাহাই হইলেও পরিবর্ত্তনটা একদিনেই হয় নাই। ১৯২৫ সাল হইতে যাঁহারা ম্যাকডোনাল্ডের কার্য্যাবলী বেশ সুন্দর ভাবে দেখিয়া আসিতেছেন তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে ম্যাকডোনাল্ড সাহেব ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইতেছিলেন। মধ্যে তাঁহার দল-ত্যাগ করিবার কথাটাও উঠিয়াছিল, মাত্র উপযুক্ত দল-পতির অভাবেই তাহা হইতে পারে নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রী-সমাজ গঠন করিয়া তিনি সংরক্ষণশীলদের সহানুভূতিতেই উহার পরিচালন করিয়া আসিতেছিলেন কাজেই এখন তাহাদের বিরাট স্বার্থের নিকট আপনার ও দলের স্বার্থকে বলি দিতে হইয়াছে। বন্ধু বৎসলতা ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের চরিত্রের বিশেষত্ব, এখানে উহা খুব উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে মাত্র

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান সমস্যা ও ম্যাকডোনাল্ড

ইংলণ্ডের সম্মুখে এখন ভীষণ সমস্যা। কয়েক বৎসর হইতেই বিলাতী সরকার তাহার আয়-ব্যয় মিলাইয়া উভয় অঙ্ক সমান করিতে পারিতেছিলেন না। বর্ত্তমান বর্ষে গ্রীষ্মকালে যখন জার্ম্মানী দেউলিয়া হয়-হয় গুজব রটে সেই সময় ফ্রান্স ও আমেরিকার ধনীগণ ইংলণ্ডের ব্যবসা

সমূহে যে সমস্ত টাকা আমানত রাখিয়াছিল তাহা তুলিয়া লয়, ফলে ইংলণ্ডে সোনার একান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে।' তথায় যে ইকনমিক কমিটী বসান হইয়াছিল তাহারা একযোগে বলিয়াছেন যে যদি ব্যাঙ্ক সমূহতে সোনার আমদানী না করিতে পারা যায় তবে ঐ সমস্ত ব্যাঙ্ক যে কোন মুহূর্ত্তে দেউলিয়া খাতায় নাম লেখাইতে পারে! বিলাতী সরকার এই তদন্তের ফলে শঙ্কিত হইয়া ফ্রান্স ও আমেরিকার নিকট ঋণ ভিক্ষা করেন। তাঁহারা বলেন যে ব্যয় আয়ের অঙ্কের সহিত না মিলাইতে পারিলে তাঁহারা ঋণ দিতে পারেন না। উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে গেলে মাত্র দুইটী উপায় আছে, যথা আয়-কর বৃদ্ধি বা ব্যয় সঙ্কোচ। আয়কর অতি অতিরিক্ত ভাবেই বসান আছে কাজেই ব্যয় সঙ্কোচ করাই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদের অভিমত দেন। বর্ত্তমানে সমস্ত খাদ্য-দ্রব্যেরই মূল্য শতকরা ১২ টাকা কমিয়া গিয়াছে। বিলাতের ধনিক সম্প্রদায় এই অভিমত দেন যে বেকার মজুরদের যে খোরাকী দেওয়া হয় উহা শতকরা ১০ টাকা কমাইয়া দেওয়া হউক তাহা হইলে উহাদের কোন ক্ষতিই হইবে না। শ্রমিক নেতাগণ এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিলেন না, তাঁহারা ঋণের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া, করবৃদ্ধির পরামর্শ দেন। ইংলণ্ডের ধনিক সম্প্রদায় বিবিধ করভারে প্রপীড়িত। আরও অধিক কর গ্রহণ করিতে গেলে বিলাতে ধনিকগণের অর্থহ্রাসের সহিত উহাদের উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতারও হ্রাস হইবে এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ম্যাকডোনাল্ড সাহেব তাঁহার দলকে ত্যাগ করিয়া রক্ষণশীল দলের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমানের দুর্য্যোগ কমিয়া গেলেই তিনি রাজ কার্য্যে ইস্তাফা দিয়া রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন। ইহার উত্তরে তাঁহার সহযোগীগণ বলিতেছেন যে, উহাই যদি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, তবে পদত্যাগ করিয়া দেশ কি চায় জানিবার জন্য নূতন ইলেকসনের ব্যবস্থা করিলেই'ত চলিত। ম্যাকডোনাল্ড সাহেব তাহার উত্তরে হয়ত বলিবেন তাহাতে দেশের পক্ষে যাহা শুভ তাহা হয়ত বা সম্পাদিত হইত না। নূতন নির্ব্বাচন আহ্বান করিলে শ্রমজীবিদল প্রবল হইয়া পার্লামেণ্টে তাহাদের মেম্বর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিলে, ধনিকেরই বৃদ্ধি করা হইত। ম্যাকডোনাল্ড সাহেব ঐ কর বৃদ্ধি করিতেই রাজী ছিলেন না।

আমরা বলিব উহাত তাঁহার নিজের অভিমত। কোন ব্যক্তি যতই বড় হউন না কেন তাঁহার অভিমত জোর করিয়া চালাইতে গেলেই তাঁহাকে লোকে স্বেচ্ছাচারী বলে।

কেননা নেপলিয়নই বলুন বা বর্ত্তমানে মুসোলিনীই বলুন সকলেই নিজ অভিমত অনুযায়ী কার্য্য করিতে গিয়া অপ্রিয় হইয়াছেন, তাঁহাদের মনে যে দেশ প্রীতি নাই একথা বোধহয় তাঁহাদের শত্রু পক্ষও বলিতে সাহস করিবেনা। এই হিসাবে ম্যাকডোনাল্ড সাহেব দোষী!

তাঁহার প্রস্তাবিত কার্য্যের আরও একটা দিক দেখিবার আছে। শ্রমজীবিদল প্রবল হইয়া বর্ত্তমান বৎসরে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিতে পারিলে বিলাতী সরকারে ধনিকদের যে প্রভাব আছে তাহা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইত। তাহাদের এই বিজয়শ্রীকে অগ্রসর হইতে বাধা প্রদান করায় ভবিষ্যতে class war এর বীজ বপন করিয়া রাখিলেন। কেননা, একথা সত্য যে বিলাতী সরকারকে একদিন অবনত মস্তকে সোশিয়ালিজম্ মানিয়া লইতে হইবে, ধনিক বন্ধু ম্যাকডোনাল্ড সাহেব উহার বিজয়-অভিযান কিছুদিনের জন্য স্থগিত করিয়া দিলেন মাত্র।

প্রস্তাবিত মোটর কর

স্বায়ত্বশাসন বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় তাঁহার প্রস্তাবিত বিল এ নূতন প্রথায় মোটরগুলির উপর নূতন কর বসাইলে উহা যে কত ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইবে এবং হয়ত বা ট্রামের সহিত প্রতিযোগীতায় উহারা হটিয়া যাইতে পারে আমরা খুব স্পষ্ট ভাবে গত সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছিলাম। তাহার পর দেখিলাম যে বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেট বাংলার সাংবাদিকগণকে একটী ভোজে আহ্বান করিয়া আমাদের আশঙ্কার কথাই অধিকতর স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা এই সব বিষয় আলোচনা করিয়াছেন বলিয়াই, আমরা নিম্নলিখিত কতকগুলি বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

তাঁহাদের সম্প্রদায়ের নাম বেঙ্গল বাস সিণ্ডিকেট হইলেও আমরা যতদূর জানি উহার প্রভাব শুধু কলিকাতার সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ। সুদূর পল্লীগ্রামে জন

সাধারণের সুবিধার জন্য যে সমস্ত বাস আছে তাহারা সকলেই এলোমেলো জীবন যাপন করে, তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া লইবার সময় আসিয়াছে। একটু জোর আন্দোলন করিতে পারিলেই অনেক সময় অনেক সুবিধা করিয়া লইতে পারা যায়। বাংলা সরকার প্রথম যে প্রজাসত্ব বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন উহা সঠিক ভাবে প্রবর্ত্তিত হইলে জমিদার মণ্ডলীর সমূহ ক্ষতি হইত এবং কৃষক সম্প্রদায়ের সুবিধা হইত। ঐ বিলটী লিপিবদ্ধ মাত্র হইয়াছে শুনিয়াই বাংলার ছোট বড় তাবৎ জমিদারই উহার ভীষণ প্রতিবাদ করিতে থাকেন তাহার ফলে বিলটী যখন লিপিবদ্ধ হইল তখন জানা গেল তাহা জমিদার মণ্ডলীরই অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছে। আমাদের বক্তব্য, এই যে মন্ত্রী মহাশয়কে যদি বুঝাইয়া দিতে পারা যায় বাৎসরিক ৬০।৭০ টাকা টাক্স দেওয়াই বর্ত্তমানে বাস-গুলির পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে তখন উহারা অতিরিক্ত কর তাহারা দিবে কোথা হইতে। আয় ব্যয়ের হিসাব দেখাইয়া উহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া বোধহয় বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়। তাহার পর কথা উঠিতে পারে মফস্বলের বাসগুলিকে লইয়া।

অনেকেই হয়ত জানেন না যে এই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি খুব জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হইলেও, উহাদের অধিকাংশেরই আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়। অতিরিক্ত হারে কর চাপাইয়া দিলে, এই বর্দ্ধিত কর উহাদিগকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবে।

ইহা ব্যতীত এই ব্যবসায়ের আর একটা দিক আছে। কলিকাতার বাসগুলি উঠিয়া গেলে ট্রাম কোম্পানী লাভবান হইবেন এবং মফঃস্বলের গুলি উঠিয়া গেলে রেলওয়ে কোম্পানী গুলি অনেক ক্ষেত্রে লাভবান হইতে পারেন, সর্ব্বত্রই যে তাঁহারা লাভবান হইবেন এমন কথা নিশ্চিত বলিতে পারা যায় না। কিন্তু বাসগুলি উঠিয়া গেলে বা ট্যাক্সির সংখ্যা কমিয়া গেলে যে সমস্ত বড় বড় ইংরাজ কোম্পানী মোটর, টায়ার, টিউব, তৈল বিক্রয় করিয়া ধ্বংসোন্মুখ ইংরাজ শিল্পকে চাড়া দিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাদের অনেককেই ব্যবসা গুটাইতে হইবে! বাসসিণ্ডিকেট এই সমস্ত ইউরোপীয় কোম্পানী গুলির নিকট গিয়া তাঁহাদের অংশীদারদের সহিত একযোগে একটী ডেপুটেশন করিয়া একদিন মন্ত্রীপ্রবরের সহিত সাক্ষাৎ করিলে কেমন হয়?

কাশ্মীর দাঙ্গা

কাশ্মীরের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার অবসান হইয়াছে। মহারাজ তাঁহাদের দাবী দাওয়া গ্রাহ্য করিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এদিকে চট্টগ্রামে এই ভ্রাতৃদ্রোহীতা আবার উৎকটভাব ধারণ করিয়াছে। কাশ্মীরের মহারাজ সন্দেহ করেন যে তাঁহার প্রজা মণ্ডলীকে উত্তেজিত করিবার জন্য বাহিরের কতকটা প্রভাব ছিল। আমরাও তাই ভাবিতেছি যে চট্টগ্রামে এই যে গোলমাল সুরু হইয়াছে উহার মূলেও ঐরূপ কোন উত্তেজনা আছে। বারবার অনেক তদন্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এইরূপ একটা তদন্ত হইলে এই বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যায়; সরকার পক্ষ এইরূপ একটা কিছু করিবেন কি?

জাতীয় ঋণের সুদ

বিলাতে একটা কথা উঠিয়াছে যে জাতীয় ঋণের সুদের হার কমাইয়া দিলে অনেক টাকার ব্যয় হ্রাস করা যাইতে পারে। কথাটা ভাবিবার কথা বটে। লর্ড কার্জ্জন যখন ভারতের বড়লাট ছিলেন তখন তিনি কোম্পানী কাগজের সুদ হ্রাস করিয়া সরকারী তহবিলের প্রাচুর্য্য ঘটাইয়া ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমানে সেটা সম্ভব কি? অর্থের বাজারে টাকার একান্ত প্রয়োজন, এ অবস্থায় সরকার পক্ষ ঋণ পরিশোধ করিয়া দিব বলিলে অনেকেই ঋণ পরিশোধ প্রস্তাবে রাজী হইবেন, কাজেই উক্ত ঋণ শোধ করিতে গেলে সরকার পক্ষকে আবার ঋণ করিতে হইবে, তখন কি সুদের হার কিছু কমিবে?

বাণিজ্য সম্বন্ধ

অনেকেই বলিতেছেন যে বিলাত ভারতবর্ষে বাণিজ্যাদির সুবিধা করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে চাহেন, সেই অর্থটা ভারত ইংলণ্ডকে যোগান দিতে স্বীকৃত হইলেই সন্ধি হইয়া যায়। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে উক্ত টাকার মাত্রাটা কত তাহাই ভারতবর্ষ জানিতে চাহে। চিরকালই ভারতবর্ষ তাহার শাসক-সম্প্রদায়কে পূজার অর্থ দিয়া আসিয়াছে। হিন্দু শাসনকালে ব্রাহ্মণগণ এই অর্থ পাইতেন, মুসলমান রাজত্বকালে মুসলমান-প্রধানগণ উহা ভোগ করিয়া ছিলেন। বর্ত্তমানে আমরা ইংরাজ

গণকেও উক্ত অধিকার দিতে রাজী আছি, কিন্তু দেখিতে হইবে উহা আমাদের সামর্থ্যে যেন কুলায়। কাপড় এবং লোহার দ্রব্য বেচিয়া ইংরাজ ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব্বে প্রায় এক শত কোটী টাকা বৎসর বৎসর লইয়া যাইতেন। ঐ দুইটী কারবারই এখন ধ্বংসোন্মুখ কাজেই উক্ত টাকাটা অর্জ্জন করিতে গেলে ইংলণ্ডকে হয় নূতন শিল্প প্রবর্ত্ত করিতে হইবে না হয়ত পূর্ব্বকার শিল্পের জন্যই ভারতকে তাহার বাজার ছাড়িয়া দিতে হইবে। বয়নশিল্প ভারতে বদ্ধমূল হইয়াছে, উহাকে কোণ ঠেলিয়া ইংরাজী বয়ন-শিল্প চলাইতে গেলে বাতুলতা মাত্র হইবে। এই জন্যই বলিতেছি যে গোল টেবিল বৈঠকের সহিত একটী ইকনমিক কমিটী বসাইলে মন্দ হইত না।

নারী—নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে

বর্ত্তমান যুগ নারী প্রাধান্যের যুগ। সম্প্রতি খবর আসিয়াছে যে স্পেনের কারাগার সমূহের প্রধান অধ্যক্ষ হইয়াছেন একজন স্ত্রীলোক। ইঁহার নাম ভিক্টোরিয়া কেণ্ট! নামটী ইংরাজী হইলেও উনি রীতিমত স্পেন দেশীয় ভাবে মানুষ। স্পেনে নারীজাতি খুব শিক্ষিতা না হইলেও ইনি খুবই উন্নতা হইয়া নারীজাতির জন্য নূতন কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত করিয়া ছিলেন।

মৃত্যুর পরে!

বিজ্ঞানের লীলাক্ষেত্র ইউরোপ মৃত্যুর পর কি আছে দেখিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্যর অলিভর লজ, প্রভৃতি মহাপুরুষগণ নানা সাধনার মধ্য দিয়া এই মহাসত্য আবিষ্কার করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। মৃত্যুর পর কি হয় সে সম্বন্ধে নানারূপ মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে। এই সমস্ত মতবাদ বেশ শ্রুতি-মুগ্ধকর। মৃত্যুর প্রয়োজন কি এই সম্বন্ধে যে মতবাদ সম্প্রতি প্রচলিত হইয়াছে তাহা শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে অনেকটা শান্তি আনয়ন করিবে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সকলেই বলিতেছেন যে প্রাণীগণ একটা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া নিম্নশ্রেণী হইতে ক্রমশঃ উচ্চ শ্রেণীতে গমন করিতেছেন। মৃত্যু এই ক্রম-পরিবর্ত্তনের উন্মুক্ত দ্বার। জগতে মৃত্যু না থাকিলে উহা নিকৃষ্ট প্রাণীগণ দ্বারা চিরকালই ভরপুর হইয়া থাকিত। মৃত্যু আছে বলিয়াই ক্রম-পরিবর্ত্তন কার্য্যকরী, হইতেছে। সুতরাং মৃত্যু আমাদের জীবনের উন্নতি করিবার একমাত্র সহায়ক।

চট্টগ্রামের হত্যা ও লুট তরাজ

চট্টগ্রামে পুলিশ ইনস্পেক্টর খাঁবাহাদুর মোঃ আসানুল্লা রিভলবারের গুলিতে হত হইয়াছেন। হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে, কোন বিপ্লববাদী দ্বারাই ইহা হইয়াছে, অনুমান হয়। আর এই ব্যাপারের অব্যবহিত পরেই সমগ্র চট্টগ্রাম সহরের হিন্দুরা গুণ্ডার লুঠ তরাজে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, হিন্দুদের প্রায় কোটি মুদ্রার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে—অনেকের প্রাণেরও আশঙ্কা আছে। বিপ্লবী হত্যাকাণ্ডে এ পর্য্যন্ত বহু হিন্দু, ইউরোপীয় হত হইয়াছেন—এবং এরূপ কাণ্ডে সকলেই দুঃখিত—কিন্তু রাজনৈতিক হত্যাকে এই রূপ দিয়া চট্টগ্রামের গুণ্ডারা যে কাণ্ড করিল তাহা অতীব বীভৎস। বৈপ্লবিক হত্যা হঠাৎ করা হয় তাহা গবর্ণমেণ্ট ত্বরিত বন্ধ না করিতে পারেন কিন্তু এ ভাবের দাঙ্গা যেরূপ ঢিলে ভাবে বন্ধ করা হয় ও প্রাণঘাতী হইয়া চলে তাহাতে শাসকদের তারিফ করা যায় না। এরূপ দাঙ্গা আরম্ভ হইবার সূচনায়ই যাহাতে বন্ধ করা যায় তৎপক্ষে বিশেষ অবহিত হইয়া কার্য্য করা এই মুহূর্ত্ত হইতে শাসকদের তথা দেশবাসীর সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্য।

কবি সম্বর্দ্ধনা

গত ৬ই ভাদ্র 'রসচক্রে'র উদ্যোগে কবি শ্রীযুত যতীন্দ্র মোহন বাগচীর সম্বর্দ্ধনা বেলঘরেতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এই সম্বর্দ্ধনায় বহু সাহিত্যিক যোগ দিয়াছিলেন এবং অনেকে উচ্ছ্বাসভরে গদ্যে-পদ্যে সম্বর্দ্ধিত কবির কাব্য-গুণগান করিয়াছিলেন। অ বেলায় আহারাদিরও আয়োজন প্রচুর ছিল। এ সম্বর্দ্ধনার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন কবিবর শ্রীযুত কালিদাস রায়।

রাজনৈতিক জীবনারম্ভ

মহাত্মাজী বিলাত যাইবার সময় কোন সম্বাদ পত্র প্রতিনিধি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—গোল টেবল বৈঠকে জাতীয় দাবী পূরণ হইলেও কি আর আপনি রাজনৈতিক ব্যাপারে থাকিবেন?

হাসিয়া মহাত্মাজী বলেন—বৈঠকে জাতীয় দাবী পূরণ হইলে, তখন হইতেই আমার রাজনৈতিক জীবন আরম্ভ হইবে।

চট্টগ্রামের ভীষণ খবর

চট্টগ্রামের শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস বড় বড় সরকারী কর্ম্মচারীদের জানাইয়াছেন - "গতকল্য রাত্রি প্রায় ১১টার সময় কতকগুলি লোক চট্টগ্রাম প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউসে প্রবেশ করিয়া তথায় লোকজনকে প্রহার করিতে থাকে। ইহারা নিম্নলিখিত............ মূল্যবান সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছে। দুর্ব্বৃত্তদলকে দেখিয়া ইউরোপীয়ান মনে হয়। তাহারা সংখ্যায় ৮ জন ছিল, ২ জন ভারতবাসীও তাহাদের সঙ্গে ছিল। তাহারা পিস্তল, বন্দুক ও একটি লুইস্‌গান লইয়া আসিয়াছিল।... এই আক্রমণকারীদের মধ্যে একজনকে ডি-আই-বির সহকারী দারোগাবাবু চারুবিকাশ চৌধুরী বলিয়া মনে হইল।"

স্বাক্ষর—মহিম দাস

৩১।৮।৩১

এ ভীষণ সংবাদটি কি? ইহার মূল শাসক সম্প্রদায় ও দেশের নেতারা অবিলম্বে বাহির করুন।

রবীন্দ্র বার্ত্তা

বন্যাপীড়িতদের দুঃখে ব্যথিত কবিবর রবীন্দ্রনাথ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট নিম্নোক্ত কবিতা পাঠাইয়াছেন :—

The famished, the homeless,
Raise their hands towards heaven,
And uttter the name of God
Their call will never be in vain.
In the land where God's response
Comes through the heart of man
In heroic service and love.

Rabindra nath Tagore. Santiniketan.

কর্পোরেশনে যতীন্দ্রমোহন

৬ নং ওয়ার্ড হইতে দেশপ্রিয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত কর্পোরেশন কাউন্সিলর নির্ব্বাচনে প্রার্থী দাঁড়াইয়াছেন। আশা করি যতীন্দ্রমোহন সকলেরই ভোট পাইয়া নির্ব্বাচিত হইবেন।

পরলোকে কেশবচন্দ্র রায়

গত ৭ই সেপ্টেম্বর এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী প্রসিদ্ধ সাংবাদিক কেশবচন্দ্র রায় পরলোকগমন করিয়াছেন। সংবাদ সেবায় রায় ভারতীয়দের মধ্যে অনেকটা শীর্ষস্থানে আরোহণ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।





শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ

কলম্বো সহর

ডেঙাতে নেমেই ঠিক সমুদ্রের ওপরেই প্রথম একটা প্রকাণ্ড বাড়ী নজরে পড়ে।—ইহাই G. O. H. বা Grand Orient Hotel। রাস্তার ধারে ধারে রিক্সা ওয়ালারা রিক্সা ধ'রে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। লোকগুলোর মাথায় পাগড়ী ও পরণে সাদা কোট ও সাদা ইজের হাঁটু পর্য্যন্ত গোড়ান এবং শুধু পা। এই থান থেকেই সাহেব পাড়া আরম্ভ হয়েছে। সাহেব পাড়াটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ব'লে বোধ হ'তে লাগ্‌লো।

খোঁপা বাঁধা সাহেব।

এখানে অনেকগুলি সাহেবদের বড় বড় দোকান দেখা গেল। Whiteaway Laidlaw'র—firmটা বেশ বড় গোছের। একটা জিনিষ প্রথমেই মনে হ'ল—সহরটা যেন কি রকম নিস্তব্ধ—যেন কোনও রাজা বা বড় লোক মরেচে—রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ার আওয়াজ নেই ও ক'লকাতার রাস্তার মত ফিরিওলাদের হাঁক-ডাক ও শোনা গেল না। সহরটা খুব ছোট ব'লে বোধ হল। কারণ সমস্ত সাহেব পাড়া ঘুরে দোকান-পত্তর দেখে ট্রামে চেপে সহরের শেষ পর্য্যন্ত যেতে ও সহরে ফিরে আস্‌তে ঘণ্টা খানেকের বেশী লাগল না। রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে অনেক খোঁপা বাঁধা সাহেব দেখা গেল অর্থাৎ অনেক সিংহলী দেখা গেল যাঁরা একদিকে সাহেবদের মত পোষাক পরেছেন আবার মাথায় বড় বড় চুলে খোঁপা বেঁধে তার ওপর সোলার টুপি পরেছেন।—

আমার ধারণা ছিল সিংহলবাসীরা বুঝি বেশ ফরশা। কিন্তু তাঁদের দেখে সে ধারণাটা কেটে গেল। অধিকাংশ লোকই কাল আর মুখের ছাঁচ Madrasi বা Dravidian গোছের। তবে রাক্ষসদের মতন নয়, কেন যে রামায়ণে এ-টা রাক্ষসের দেশ ব'লে গেছে বুঝতে পারলুম না। দেশী পাড়া অতি অপরিষ্কার ব'লে বোধ হ'ল। কোনও কোনও জায়গা থেকে এমন শুঁট্‌কি মাছের দুর্গন্ধ বেরুতে লাগল ঠিক যেন মনে হ'তে লাগল টেরিটি বাজারের শুঁটকি মাছের পাড়া কলম্বোতে উঠে এসেছে। অনেক পান ওয়ালার দোকান দেখা গেল - হায়, যে দেশের দিশি লোকদের প্রধান ব্যবসা পান বিড়ি—সে দেশের আর কত ভাল হবে?

ভগবানের অদ্ভুত সৃষ্টি!

এ কি—এ! ভূমিকম্প না কি। বাড়ী-ঘর রাস্তা-ঘাট সব দুলছে যে—না না এ ভূমিকম্প নয় মস্তক কম্প এ সেই ডাক্তার ব্যাটার বাড়ীর কাজ হচ্ছে। মাথাটা এমনি ঘুরে গেল ঠিক যেন মনে হ'ল সমুদ্রের ওপর রয়েছি। এখানকার মেয়েদের গড়নের এমনি ছাঁচ যে এক হাজার বিভিন্ন জাতীয় মেয়েদের মধ্য থেকে সিংহলী মেয়ে চিনে নেওয়া খুব সহজ। সমস্ত অবয়ব গুলি যেন অসামঞ্জস্য ভাবে গড়া। যে রকম ওরা খর্ব্বাকৃতি তাতে ওরকম বুক আদতেই মানায় না, আর যে রকম বুক তাতে ওরকম কোমরা আদতেই মানায় না। ঘাড়টা কি রকম—বাঁকা বাঁকা আর চলন ত্রিভঙ্গ মুরারীর মতন। শুধু এই নয় এর ওপর আবার ঘাঘ্‌রা বা গাউন ও জ্যাকেট পরা চাই। ঠিক মনে হয় যেন বিশ্বকর্ম্মা গোটা কতক হাত পা মুণ্ড ধড় ও আর আর যা দরকার সমস্ত তৈরী ক'রে রেখে কোথায় নেশা টেশা কর্ত্তে গিয়েছিলেন—ফিরে আসতে দেরী হচ্ছিল—সৃষ্টিকর্ত্তার যেন আর দেরী

সইছিল না, তাই তাড়াতাড়ি মানানসই হবে কিনা না দেখেই—হাতের গোড়ায় যে মুণ্ড ধড় ও হাত পা পেলেন, তাই দিয়েই একটা কিম্ভুতকিমাকার জীব সৃষ্টি করলেন। ভগবানের অদ্ভুত সৃষ্টি! সব দোকানের সামনেই প্রায় একজন ক'রে দালাল থাকে। দোকানের ধার দিয়ে যাবার সময় ডাকে "walk in please, needn't buy, just have a look" ইত্যাদি। একটা দালাল সে আমাদের ধ'রেছে কিছুতেই ছাড়্‌বে না। তাকে বলা গেল যে ফেরবার মুখে তার দোকানে ঢুকে জিনিষ-পত্র দেখে চরিতার্থ করা যাবে। ঘটা ২।৩ বাদে জাহাজে ফেরবার মুখে দেখি লোকটা ঠিক—সেই দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও আমাদের ডাক্‌ছে। এতক্ষণ ধ'রে সে দাঁড়িয়ে ছিল কিনা বল্‌তে পারি না আর যদি সে দাঁড়িয়েই থাক্‌ত, তা হ'লে তার পরিশ্রম পুষিয়ে নিয়েছে। কারণ আমার বন্ধুটী দুটো জল কিন্‌লে। লিমনেড্‌ তার দাম নিলে আট আনা। জানে যে কিছু কিন্‌ব না তথাপি কত দামী দামী আংটী দেখাতে লাগল কি জানি যদি নজরে পড়ে যায়। আমরা জাহাজে ফিরছি এমন সময় একটা গাড়ী যাচ্ছে দেখা গেল। দুজন ঘোড়-সওয়ার শরীর রক্ষক তাঁর পেছনে পেছনে যাচ্ছে। একজন ভদ্র লোককে কারা যাচ্চেন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্লেন সিংহলের গভর্ণর ও তাঁর পত্নী। কত সাদা সিদে ভাবে যাচ্ছেন আর পুলিশ পাহারার কোনও আড়ম্বর নাই।

টেলিগ্রাফ্‌ অফিসে আমার বন্ধুটী তার কর্ত্তে গেলেন। সেখানে যত লোক কাজ কচ্ছিল দেখা গেল সব সাহেবী পোষাক পরা! টেলিগ্রাফ্‌ লাইন টা কি সর্ব্বত্রই এদের একচেটে।

টেলিগ্রাফ্‌ অফিসের বিপরীত ফুটপাথে Government House দেখা গেল। এই জায়গাটা অনেকটা কলিকাতার Government House এর মত দেখায় বটে কিন্তু Compound টা অনেকটা Belvedere এর মত বেশ গাছ-পালা দিয়ে ঢাকা—

জাহাজে কলম্বোতে নামবার আগে একজন গল্প কচ্ছিল যে কলকাতায় কি ভয়ানক গরম—শরীর যেন পুড়ে যায়—তাতে আর একজন উত্তরে এই বলেছিল যে কলকাতার গরম ত পদে আছে। কলম্বোর গরম এত বেশী যে জামা ও ইজেরের বোতাম গরমে গলে গিয়ে ঝুল ঝুলে হ'য়ে পড়ে! আমাদের জামা কিম্বা ইজেরের বোতাম গ'লে গিয়ে জামা কিম্বা ইজের ঝুল ঝুলে হ'য়ে পড়েনি বটে কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপটা যেন বড় বেশী রকম অনুভব কর্ত্তে হয়েছিল।

Government House এর সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা বরাবর Galle faco Hotel—খুব বড় Hotel এবং দেখ্‌তে ঠিক প্রাসাদের মত—এর দিকে গেছে সেই রাস্তাতে সমুদ্রের ওপরেই fort দেখা গেল। এটা fort কিম্বা Barrack তার বিশেষ কোনও তফাৎ দেখ্‌তে পেলুম না।

কেউ কেউ বলে যে এই সহরটার নাম পূর্ব্বে "কলাম্বু" ছিল। পরে পর্ত্তুগিজরা এই নাম বদলে "colombus" এর নামে নাম দিলে—তখন থেকে এর নাম হ'ল "কলম্বো।"

এখানকার ফোড়েরা কি রকম জিনিষের দর করে তার একটা নমুনা দিচ্ছি; আমরা জাহাজে ফিরছি একটা আঙ্‌টীওলা এসে ধ'রেছে। অনেকগুলো আঙ্‌টীর ভেতর থেকে একটা বের ক'রে বল্‌ছে—

অ—"Very fine ring—don't you like it ?"

ঘো—How much ?

আ—Fifty Rupees

ঘো—Fifty for all।

আ—Beg your pardon sir, those are real stone in real gold, fifty for each sir,

ঘো—I will give your thirty rupees for the lot.

আ—I beg your pardon my master. How can you give me thirty rupees! Say, how much can you give sir.

ঘো—Ten Rupees!

আ—Ten for this ring sir!

ঘো—No, no, for the whole lot.

আ—O my master, how can you say ten rupees for the whole lot! When you just say ten for one and I not take—Say sir!

ইত্যাদি—ইত্যাদি—

জাহাজে ফেরবার মুখে দূরে গোটা কয়েক man of war বা রণতরী দেখা যাচ্ছিল। রণতরীর নাবিকেরা ছোট ছোট Boat এ-তে harbour এ rowing কচ্ছিল। এরা যে দেশেই থাক্ না কেন বা যে কাজই করুক না কেন কোনও Healthy Exercise এদের করা চাই ই!

রাত্রি ১০টায় আমাদের জাহাজ কলম্বো ছেড়েছে। আর ১৫ দিনের মধ্যে কোনও port এ আমাদের জাহাজ থাম্‌বে না। একেবারে Port Said এ গিয়ে থাম্‌বে, সুতরাং এই পনেরটা একঘেয়ে দিন কি ক'রে কাটবে তাই ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই সকাল বেলা উঠে চা ও Toast খাওয়া তার পর মুখ হাত ধুয়ে পরিষ্কার হ'য়ে Deck এ আসা!

Smoking Room

সকাল বেলা প্রত্যহ একদল লস্কর ডেক্ ধুত ও একদলে সেইটে পুঁছত। জাহাজের পেছন দিকটাতে যেখানে flagpost থাকে সেইখানে একটা pump বসিয়ে Pumpএ একটা hose লাগিয়ে সমস্ত ডেক ধুত ও একটা দলে সেইটে পুঁছত! যতক্ষণ ডেকটা ধোয়া পোঁছা হত ততক্ষণ আমরা ডেক এর ওপরে Smoking Room এ এসে বই-টই পড়তুম। Smoking Room যদিও নামে ধূম পানের ঘর বটে কিন্তু ইহাকে "আড্ডা বা মদখাবার ঘর" নাম দিলেই উপযুক্ত হ'ত। কারণ প্রত্যহ সন্ধ্যার পর এইখানে তাসখেলার সঙ্গে সঙ্গে মাতালদের মদ খাওয়াও চল্‌ত। এ ঘরটাতে বিশেষ কিছুই সাজ-সরঞ্জাম নেই। দু'টা গদি পাতা বেঞ্চী কাঠের দেওয়ালের সঙ্গে ফিট করা ও একখানা Table, একটা Electric light ও একটা fan। প্রত্যেক Seat এর পেছনে দেওয়ালের সঙ্গে একটা ক'রে Electric Bell লাগান আছে। কোনও attendance এর দরকার হ'লে Boy ব'লে চেঁচাতে হয় না। Bellটা টিপলেই Boy এসে জিজ্ঞাসা করে কি দরকার। এই ঘরটাতে মহিলাদের কখনও প্রবেশ কর্ত্তে দেখিনি।

Music Room

Smoking Room এর পাশের ঘরটাই হচ্ছে Music Room। এটা Smoking Room এর চেয়ে কিছু বড় বটে কিন্তু সাজ-সরঞ্জাম Smoking Room এরই মতন! বেশীর ভাগ একটা Piano আছে। এই ঘরটাতে বইঠকখানার কাজ হ'ত। এই ঘরটাতে ধূমপান নিষিদ্ধ ছিল। এই ঘরে মহিলারা বা পুরুষেরা সকলেই আস্‌তেন এবং সাধারণতঃ সন্ধ্যার পরেতেই যাঁরা Smoking Room এ থাক্‌তেন না তাঁরা এই খানে নিরীহ আমোদে গান বা গল্প করে সময় কাটাতেন।

দুপুর বেলা ১২টার পর থেকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সময়টা ভূগোল শাস্ত্রের আলোচনায় কেটে যেত। প্রত্যেক দিন ঠিক বারোটার সময় একটা লোক এসে একটা ছাপান ফর্ম Smoking Room এর দরজার সামনে একটা ছোট বোর্ডে এ টাঙ্গিয়ে দিত। এই ফর্ম এ লেখা থাক্‌ত আমাদের জাহাজ ঠিক ১২টার সময় ঠিক কোন জায়গায়। অর্থাৎ latitude বা কত আর longitude বা ক'ত। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমুদ্রের অবস্থা কিরূপ থাকবে। গত ২৪ ঘণ্টা আমরা কত travel করেছি। জাহাজ কত travel করেছে এটা Speed meter দেখে জান্‌ত পারা যায়। জাহাজের শেষের দিকে যে flag post টা আছে সেইখানে একটা রেলিঙের সঙ্গে একটা ছোট ঘড়ির মতন মিটার থাকে সেই মিটারের সঙ্গে একটা দড়ি বেঁধে দড়িটা সমুদ্রে ফেলে দেয়। এই দড়িটার সঙ্গে একটা আধ পোয়া আন্দাজ Weight বাঁধা থাকে। জাহাজটা যখন চলে তখন দড়িটা ঘুর্‌তে থাকে। আর মিটারের সঙ্গে একটা চাকা আছে সেটাও ঘুর্‌তে থাকে। এই মিটারের চাকা কতবার ঘুরেছে তা ঐ মিটারের কাঁটা দেখে জান্‌তে পারা যায়। প্রত্যহই বেলা ১২টার এক কোয়ার্টার, আধ ঘণ্টা আগে থেকে, যাত্রীদের মধ্যে একটা ঔৎসুক্য ভাব দেখা যেত। অনেকের ভোর বেলা উঠে খপরের কাগজের জন্যে যে ঔৎসুক্য ভাব দেখা যায় ঠিক সেই ভাব। তার পর একজন ম্যাপ দেখিয়ে ঠিক কোন জায়গায় আমাদের জাহাজ ভাস্‌ছে সেই জায়গাটা দেখিয়ে সেইখানে একটা পেন্সিলের চিহ্ন ক'রত। তারপর কার কত ভূগোলের জ্ঞান পরীক্ষা করা হ'ত। কলম্বো ছাড়বার পর থেকে রোজ বেলা ১২টার পর জাহাজের যাত্রীর সঙ্গে

সময় মিলিয়ে দেখতুম ১০।১৫ মিনিট আমার ঘড়ি কাট্‌ যায়। প্রথম প্রথম এর কারণ বুঝতে পার্তুম না। তারপর জ্ঞান হ'ল যে, রোজই একটু একটু করে আমাদের জাহাজ পশ্চিম দিকে যাচ্ছে এবং জাহাজের ঘড়ির time হচ্ছে local time.

Gun এর পৌত্রী

First class এ ক'জন passenger ছিল ঠিক বল্‌তে পারি না এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি একটী girl বা lady ছিলেন। ইনি একজন বিলেতের Cannon এর কন্যা (সুতরাং gun এর পৌত্রী) তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমাদের সঙ্গে গল্প কর্ত্তে আস্‌তেন। আমরা সন্ধ্যার সময় Dinner খেয়ে সকলে এক সঙ্গে Tip it off খেলতুম।

আমরা যে কজন Tip it off খেলতুম (সংখ্যাতে কিছু এসে যেত না) দুই ভাগে বিভক্ত হ'তুম। যেমন K ও G দুটো দল হ'ত। তারপর একটা Table এর দুই ধারে দুটো দল বস্‌তে। তারপর lottery হ'ত কোন দল আগে খেল্‌বে—lotteryতে যে দল জিতত যেমন K দল জিতেছে—K দলের একজন যে মধ্যিখানে বসত সে একটা সিকি নিয়ে সিকিটা নিজের দলের কারুর হাতে গুঁজে দিত কিম্বা নিজের হাতে রাখত। তারপর K দলের সকলে দুটো হাত মুটো ক'রে Table এর ওপর রাখলে অন্যদলের অর্থাৎ G দলের একজন বল্‌তে আরম্ভ কর্ত্ত সিকিটা কার হাতে নেই বা কার হাতে আছে M tip your right hand off অর্থাৎ M মশায় তোমার ডান হাতে সিকিটা নেই ডান হাতটা তুলে নাও। N tip your left hand অর্থাৎ N মশায় তোমার বাঁ হাতে সিকিটা আছে বাঁ হাতটা খোল। যদি N মশায়ের বাঁ হাতে সিকি থাকৃত, তা হ'লে K দলের হার হ'ত এবং G দলের লোকেরা সেই সিকিটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কারুরও হাতে গুঁজে রেখে হাতগুলো মুঠো ক'রে table এর ওপর রাখ্‌ত তখন K দলের একজন যেমন S। বল্‌তে আরম্ভ কর্ত্ত—কার হাতে সিকিটা আছে। S যখন বল্‌তে পারত না তখন G দলের যার হাতে সিকিটা আছে সে সেই সিকিটা দেখিয়ে দিত। যদি K দলের S ঠিক বল্‌তে পারত কোন হাতে সিকিটা আছে তাহ'লে সিকিটা K দলের কাছে যেত আর যতক্ষণ না বল্‌তে পারত ততক্ষণ পর্য্যন্ত G দলের লোকের কাছে সিকিটা থাকৃত।

Dinner খেয়ে এসে খানিক পরে থেকেই music Room এ এই খেলা হ'ত এবং Supper এর আগে পর্য্যন্ত এই খেলা চল্‌ত।

ক্রমশঃ



পুরাণে সূর্য্য-পরিচয়

প্রবন্ধ

শ্রীজগৎমোহন সেন, বি, এস, সি, বি, ই, ডি,

সমুদ্র তীর। তখনো উষাবিকাশ হয়নি। অর্দ্ধস্বচ্ছ অন্ধকারের ভেতর দিয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে,—কেবল তরঙ্গায়িত সমুদ্র,—অশেষ, অনন্ত। শত সহস্র ক্রুদ্ধ সর্প ফণার মত অবিশ্রান্ত গর্জ্জনমত্ত স-লীল জলতরঙ্গ মহা আক্রোশে বেলাভূমিকে আক্রমণ করছে, বালুকার বুকে আছড়ে পড়ে সঙ্করমাণ সর্পের মতই সামনের দিকে এগিয়ে আসছে; আবার ফিরে যাচ্ছে। সমুদ্র তরঙ্গ-সমাকুল।

আরো একটু আলো। দৃষ্টির প্রসার বাড়তে লাগল। দূরদিগন্তে অন্তহীন আকাশ অনন্ত সাগরে এসে মিলেছে। দূরে সমুদ্র বক্ষ নিস্তরঙ্গ, শান্ত—সমাহিত। আকাশের নীলিমার স্বপ্ন তার বুকে—সমুদ্র ওখানে সুষুপ্ত।

আকাশ লাল হয়ে উঠল। তার পর ধীরে ধীরে দিক্-চক্ররেখার উপর স্বর্ণকমলের মত ফুটে উঠল অপরূপ দ্যুতিমান এক সিন্দুর-লিপ্ত গোলক। তার কর-রঞ্জনে ফেন-পুষ্পিত তরঙ্গ-ফণা মণি-মণ্ডিত হয়ে উঠল। সুন্দর!

এই মহিমময় আলোকে পুলকে নবপ্রবুদ্ধ মানবের বক্ষের সুষুপ্ত কবি জেগে উঠলেন, চক্ষে তাঁর স্বপ্নাবেশ। তাঁর বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে ফুটে উঠল একটি ছবি। বর্ণ ও ভাব-বৈচিত্র্যে সে চিত্র অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্ব। তাঁর অন্তর্বিভেদী সূক্ষ্ম-দৃষ্টি বাহিরে সমস্ত জড়ত্ব, সমস্ত স্থূলত্বকে অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয় চেতনার রাজ্যে প্রবেশ করল। তিনি দেখলেন সহস্র-ফণ অনন্তের শয্যায় শায়িত নিষ্ক্রিয় এক বিরাট পুরুষ। জল তাঁর শয্যা, তাই তিনি নারায়ণ [নার+অয়ন]। যোগনিদ্রামগ্ন নারায়ণের মাথার উপর সহস্রফণ অনন্তদেব মণিদীপ্ত ফণার ছত্র ধরেছেন। তাঁর নাভিতে (মধ্য দেশে) সমুজ্জ্বল রাগ-রক্ত মেঘের দল বিস্তার করে রক্ত-শতদল বিকসিত আর সেই প্রস্ফুট পদ্মের মধ্যে এক উজ্জ্বল জ্যোতির্মণ্ডল। সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলস্থ পুরুষের সমগ্র শরীর দিয়ে চেতনাময় আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে, এই চেতনা তিনি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করছেন,—তিনি চতুর্ম্মুখ।

তিনি বেদ [=বিদ্ (জানা)+অল]—ময়, চেতনার আধার। তিনি আদিকবি। তাঁর দর্শনে মানবের অন্তরে ছন্দ স্পন্দিত হয়ে উঠল, দেবতার বন্দনা গান তাঁর মুখ দিয়ে নিঃসৃত হ'ল,—

> "ওঁ নমোঃ নারায়ণায় পুরুষায় মহাত্মনে
> বিশুদ্ধ সত্ত্ব-ধিষ্ণায় মহাহংসায় ধীমহি।"

অধ্যাত্ম-বিদ্যার দিক্ দিয়ে এর যে অর্থই হোক না কেন, এর স্থূল-অর্থই প্রথমে সে সূক্ষ্ম-অর্থকে ইঙ্গিত করেছে, মানুষের মনে। মানুষ প্রথমে বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে ভগবানকে দেখেছেন এবং এই থেকেই ভগবানকে সমগ্রভাবে জানবার প্রবৃত্তি পেয়েছেন। বাহিরে আলোর তমোহরণলীলা তাঁর অন্তরে জ্ঞানালোকপাতে অজ্ঞানান্ধকার অপসারণের সূচনা করেছে। তাই তিনি স্থূলভাবেও তমোহর হংসের (=হন্+স) জনক হংস-স্বরূপ জলশায়ী নারায়ণকে ধ্যান করেছেন।

গায়ত্রী মন্ত্রেও আমরা দেখি সেই সবিতারই 'ভর্গ' ধ্যানের কল্পনা আছে, কারণ তিনি আমাদের বুদ্ধিকে প্রণোদিত করেন :—

> "তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
> ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।"

এবং ভর্গ বল্‌তে আদিত্যান্তর্গত তেজকেই বোঝায়,—

"আদিত্যান্তর্গতং বর্চো ভর্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ।"

কিন্তু এ পরবর্ত্তী সময়ের কথা। তখন মানুষ বুঝতে পেরেছেন ঐ জ্যোতিঃপিণ্ডই সমস্ত প্রসব করেছেন। তিনি সবিতা,—

> "সর্ব্বলোক প্রসবনাৎ সবিতা সতু কীর্ত্ত্যতে।"

তাঁর দয়ায় জীব-বৃদ্ধি হয়, তাই তিনি ব্রহ্মা (=বৃন্হ্+মন্)। তাঁর প্রসূত এই অণ্ডের নাম ব্রহ্মাণ্ড।

আমাদের এই পৃথিবী যে সূর্য্যের সন্তান একথা আধুনিক বিজ্ঞানও স্বীকার করে।*

কিন্তু গায়ত্রীর "সবিতা" আমাদের এই সূর্য্যেই সম্ভবতঃ আবদ্ধ নন। গায়ত্রীর "সবিতা" আরো বড়, আরো ব্যাপক, তিনি সমস্ত লোক প্রসব করেছেন। [কে বলবে আকাশের অগণ্য জ্যোতিষ্ক একই অখণ্ড জ্যোতিঃ-পিণ্ডের সন্তান আদিত্য কি-না?] কিন্তু সমস্ত তত্ত্ব বা কল্পনার মূলে আছেন এই সূর্য্যই।

মানুষ সূর্য্যের কাছে কৃতজ্ঞ। ঋগ্বেদে নানারূপে এই সূর্য্যেরই স্তুতি গান করা হয়েছে। জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের নানা বিভূতির সঙ্গে মানুষের পরিচয় হয়েছে, তাই সূর্য্যের এত গুণবাচক নাম সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই।

'ইন্দ্র' [=ইন্দ্+র] শব্দে "স্বামিত্ব" বোঝায়। আকাশের 'অধিপতি' সূর্য্যের নাম 'ইন্দ্র' হওয়া অসঙ্গত নয়, আর প্রকৃতই 'ইন্দ্র' বলতে এক অর্থে সূর্য্যকে নির্দ্দেশ করে। "সোম" [=সু (প্রসব করা)+ম] অর্থে 'সবিতা' সূর্য্যকেই বোঝান উচিত। আবার শোষণ করেন বলে তিনিই পূষা বা পূষন্ [পুষ্+অন্]

আবার রশ্মি নিক্ষেপ করেন বলেই হোক্, কিংবা একসময়ে পৃথিবীকে স্বশরীর থেকে নিক্ষেপ করেছেন বলেই হোক্, সূর্য্যের এক নাম 'মিত্র' [মি-ক্ষেপণ করা)+ক্র]। আর পৃথিবী বেষ্টন করেন বলে হোক্ কিম্বা পৃথিবী তাঁকে প্রদক্ষিণ করেন বলেই হোক্, "বরুণ" [=বৃ বেষ্টন করা) + উনন্;, কর্ত্তৃবাচ্যে, কর্ম্মবাচ্যে] সূর্য্যেরও এক নাম। 'ব্রহ্মা' বলতে জীববর্দ্ধক সূর্য্যকে বোঝাতে পারে এ আমরা আগেই দেখেছি।

ইন্দ্র, সোম, মিত্র, বরুণ, পূষণ্, ব্রহ্মা এ সমস্তই বৈদিক দেবতা বা দেবতাদের নাম এবং এ সমস্ত নামকরণে মন্ত্র-দ্রষ্টা বৈদিক ঋষিদের জ্ঞানের পরিচয় বেশ ভাল করেই পাওয়া যায়।

(২)

পুরাণের যুগে বৈদিক বিজ্ঞানের অঙ্কুর কবি কল্পনার সাহায্যে পল্লবিত হয়ে প্রকৃত তথ্যকে অনেকখানি গোপন করেছে বলেই মনে হয়। তাই একটু চেষ্টা করলে একই সূর্য্যকে পুরাণের গল্পে আমরা বহু মূর্ত্তিতে দেখতে পাব। ব্রহ্মা, ইন্দ্র আর সূর্য্য নামে তাঁর ত্রিধা-বিভক্ত রূপ সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। আর এও দেখা যায় যে পৌরাণিক গল্প কেবল গল্প, ইতিহাস এবং রূপক নয়। তার মূলে অনেক প্রকৃত জ্ঞানের তথ্য আছে।

পুরাণের ব্রহ্মা, ইন্দ্র আর সূর্য্য এক সূর্য্যেরই ত্রিমূর্ত্তি কি না দেখতে হ'লে ক'টি বিষয় আলোচনা করা দরকার :—

(ক) অমর-কোষে সূর্য্যের "দ্বাদশাত্মা" বলে একটা অভিধান আছে। এই অভিধানের সঙ্গে সূর্য্যের গতি পথে অবস্থিত দ্বাদশ রাশির কোনো সম্বন্ধ আছে কি না জানি না, কিন্তু প্রসিদ্ধি এই যে বারটি অন্য নামের জন্য সূর্য্যের এই নাম হয়েছে। সে বারটি নাম হচ্ছে,—

বিবস্বান্, অর্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র এবং উরুক্রম।

এ সমস্ত কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভজাত দ্বাদশ আদিত্যের নাম। এর মধ্যে "ধাতা" আর "বিধাতা" নাম দু'টি ব্রহ্মা দাবী করেন; এবং ইন্দ্র দাবী করেন শক্র নামটি। 'ত্বষ্টা' নামটি বিশ্বকর্ম্মার এবং "বরুণ" নামটি জলাধিপতির।

কিন্তু এ সমস্ত নাম গুণবাচক এবং সূর্য্যের প্রতি সব ক'টিই আরোপ করা যায়। আগে দেখা গেছে "ব্রহ্মা" আর "ইন্দ্র" নাম দু'টির ওপর সূর্য্যের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে।

(খ)

পুরাণ বলেন ব্রহ্মা তাঁর আত্মজা সাবিত্রী বা গায়ত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু "সবিতা" শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে "সাবিত্রী" হয়। আবার এও দেখি

সর্ব্বলোক প্রসবনাৎ সবিতা স তু কীর্ত্ত্যতে
যতস্তদ্দেবতা দেবী সাবিত্রীত্যুচ্যতে ততঃ ॥"

এবং

"বেদ প্রসবনাচ্চাপি সাবিত্রী প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥"

বেদ বা জ্ঞান প্রসাবিত্রী আর জ্ঞানময়ী "সংজ্ঞা" [=সম্+জ্ঞা+ঙ] অভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। এবং সংজ্ঞা নামে গায়ত্রীকেও বোঝায়। আবার "গায়ন্তং ত্রায়সে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বং ততঃ স্মৃতা।" একথা সংজ্ঞাকেই বলা যেতে পারে।

সংজ্ঞা হচ্ছেন সূর্য্য-পত্নী, বিশ্বকর্ম্মার কন্যা। অমর

কেবেদের মতে "বিশ্বকর্ম্মা," "সূর্য্যঃ", "দেব-শিল্পী" এ সমস্ত বিশ্বকর্ম্মারই নাম।

আর সংজ্ঞাকে সূর্য্যাত্মজা বলা সঙ্গত। কারণ সূর্য্যই সংজ্ঞার আধার। এই জন্যই বলা হয়েছে "শক্তি শক্তি-মতোরভেদঃ"।

ব্রহ্মার গায়ত্রীকে বিবাহ করা সম্বন্ধে অন্য একটা গল্প আছে এবং তা থেকেও এই একই কথা জানা যায়। গল্পটা হচ্ছে এইঃ—

সস্ত্রীক যজ্ঞ করার নিয়ম আছে। ব্রহ্মা যজ্ঞ করতে গিয়ে সাবিত্রীকে আনবার জন্য ইন্দ্রকে পাঠালেন। কিন্তু সাবিত্রী তখন গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা ছিলেন, আসতে পারলেন না। অগত্যা ব্রহ্মাকে আবার বিবাহ করতে হ'ল। ইন্দ্র ঘটক হয়ে এক গোপকন্যার সঙ্গে ব্রহ্মার বিবাহ দিলেন। এই গোপ-কন্যা হচ্ছেন গায়ত্রী।

কিন্তু এই "গোপ"টি কে? 'গোপ' কথাটার মানে "গো-পালক।" নিয়ত গতিশীলা বলে পৃথিবীকে "গো" (গম্+ও) বলা হয়। পৃথিবীকে পালন করেন বলে সূর্য্যও "গোপ" হতে পারেন। তা' হলে গায়ত্রীকে সূর্য্য-কন্যা বলতে পারা যায়।

(গ)

পুরাণে ব্রহ্মার দশজন মানস-পুত্রের কথা আছে।

"মরীচিরভবৎ পূর্ব্বং ততোঽত্রি র্ভগবানৃষিঃ।
অঙ্গিরাশ্চাভবৎ পশ্চাৎ পুলস্ত্যস্তদনন্তরম্॥
ততঃ পুলহো নামা বৈ ততঃ ক্রতুরজায়ত।
প্রচেতাশ্চ ততঃ পুত্রো বশিষ্ঠশ্চাভবৎ পুনঃ॥
পুত্রো ভৃগুরভূৎ তত্র নারদোঽপি চিরাদভূৎ।
দশেমান্ মানসান্ ব্রহ্মা জপন্ পুত্রানজীজনৎ॥"

কিন্তু এই দশজন মানস-পুত্রের নামের মর্ম্ম যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে প্রত্যেকের স্থানে হয় সূর্য্যকে নয় সূর্য্যের কোনো বিশেষ বিভূতিকে দেখতে পাব।

(১) মরীচি (=মৃ+ঈচি)—তমোনাশক রশ্মি। সূর্য্য মরীচিমালী।

(২) অত্রি (=অৎ+ত্রি)—গতিশীল। সূর্য্য সাধারণ দৃষ্টিতে গতিশীলই বটেন। সূর্য্য নামটাই গতি-শীলত্ব সূচনা করে।

(৩) অঙ্গিরাঃ (=অঙ্গ+ইরস্)—জ্ঞানবান বা চেতনাময়।

(৪) প্রচেতাঃ (=প্র+চেতস্) সূর্য্য চেতনার আধার।

(৫) পুলস্ত্য [=পুল (মহৎভাবে)+স্ত্যৈ (একত্রিত হওয়া)+অ]—সূর্য্য সমস্ত জ্যোতির কেন্দ্রস্বরূপ।

(৬) পুলহ[=পুল—হা (ত্যাগ করা)+অ]—সূর্য্যের তাপজ্যোতিঃ'বকিরণ ত্যাগ ভিন্ন কি?

(৭) ক্রতু [=কৃ+অতু]—যজ্ঞ বা কর্ম্ম। কর্ম্মের প্রবৃত্তি আমরা সূর্য্য থেকেই পাই।

(৮) বশিষ্ঠ [=অব্+শাস্+ত]—শাস্তা। সূর্য্য আকাশে থেকে পৃথিবী শাসন করেন।

(৯) ভৃগু [ভ্রস্জ্ (ভাজা, ভর্জ্জন)+উ]—সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে পৃথিবী ভর্জ্জিতই হয়।

(১০) নারদ [নার (জল)+দ]—জলদ। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে,—

"সূর্য্যাদ্বিজায়তে তোয়ং তোয়াৎ শস্যানি শাখিনঃ।
তেভ্যো হন্নানি ফলান্যেব তেভ্যো জীবন্তি জীবিনঃ॥
সূর্য্যগ্রস্তঞ্চ নীরঞ্চ কালে তস্মাৎ সমুদ্ভবঃ।
সূর্য্যো মেঘাদয়ঃ সর্ব্বে বিধাত্রা চ নিরূপিতাঃ॥"

এখানে ইন্দ্র সূর্য্যের সঙ্গে এক হয়ে যান।

(ঘ)

ব্রহ্মার নাম বেদোদয়, পদ্মপাণি, হংস [=হন্+স=(তিমির) হন্তা] প্রজাপতি ইত্যাদি।

অভিধানে সূর্য্যেরও ঐ সমস্ত নামের উল্লেখ দেখা যায়। বিশ্লেষণ করে প্রত্যেক নাম সূর্য্যের উপর সুসঙ্গত ভাবে আরোপ করাও চলে।

আবার দেখি ব্রহ্মা হংস-বাহন। ব্রহ্মাণীও হংস-বাহিনী। হংস অজ্ঞানান্ধকারের অপসারক বিদ্যুরণ জ্ঞানা-লোকের প্রতীক নয় কি?

[৩]

(ক) পুরাণে সূর্য্য সম্বন্ধে ইন্দ্রকে আমরা দু'টি রূপে দেখতে পাই। কোথাও তিনি স্বয়ং-সূর্য্য আবার কোথাও সূর্য্য-বিভূতি।

সূর্য্য পূষা, তার পুত্রকন্যা বললে ইন্দ্র কিংবা কোথাকে বোঝায়।

গ্রীসের সূর্য্য দেবতা Apollo র সঙ্গে ইন্দ্রের অনেক মিল আছে। Apollo মেঘের দেবতা, পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তির নিয়ামক। আমাদের পুরাণে ইন্দ্রও তাই। Apollo আর ইন্দ্র দুজনেরই স্বর্ণময় তূণীরের বর্ণনা আছে। অস্তাচলোন্মুখ সূর্য্যের স্বর্ণকিরণে রঞ্জিত মেঘ দেখে এর পরিকল্পনা হয়েচে বলে মনে হয়।

মেঘের সঙ্গে বা বৃষ্টির সঙ্গে আমাদের সূর্য্যের কি সম্বন্ধ তা আগেই দেখানো হয়েছে।

(খ)

ইন্দ্রের বৃত্রাসুর বধের বিষয় ঋগ্বেদেও আছে, পুরাণেও আছে। তাই তাঁর এক নাম বৃত্রঘ্ন।

ঐতিহাসিক দেখিয়েছেন পার্শী ভেরেথ্র, ভেরেথগ্ন, আর গ্রীক Orthros. Orthropon এর সঙ্গে বৃত্র আর বৃত্রঘ্ন কথা দু'টির বেশ সামঞ্জস্য আছে। পার্শী-গ্রন্থ জেন্দ্ আবেস্তাতেও নাকি এই যুদ্ধের বর্ণনা আছে। সেইজন্য অনেকে বৃত্রকে আসিরিয়ার (Assyria) Semitic দলপতি বলেন। আসিরিয়ার অধিবাসীর নাম "অসুর" হওয়া সম্ভব ; তাই "বৃত্রাসুর।"

কিন্তু অন্যদিক দিক্ দিয়ে দেখলে, আমরা পাই "বৃত্র" [বৃৎ (বর্তমান থাকা) + রক্] অর্থে মেঘ বা অন্ধকার।

আর 'সুর' বলতে সূর্য্যকে বোঝায়। "সুরঃ সূর্য্যোঽর্য্যমাদিত্যঃ" অমরকোষের মতে। সুতরাং "অসুর" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ "সুরদ্বেষী" কে "সূর্য্য-দ্বেষী" বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সেই জন্যেই রাত্রির এক নাম "অসুরাণ"

ঋগ্বেদেও সূর্য্যগ্রহণের সময় চন্দ্রকে "আসুর স্বর্ভানু" বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

সুতরাং মেঘ বা অন্ধকারকে অসুর বলা অসঙ্গত নয়।

বৃত্রসংহারের জন্যে দধীচি অস্থি দান করেছিলেন। "দধীচি" [দধ্ (দান্ করা) + ঈচি] নামটা গুণবাচক, মানে হয় দাতা। "পুলহ" নাম যদি সূর্য্যে আরোপ করা যেতে পারে তবে সূর্য্যকে "দধীচি" বলাও অসঙ্গত নয়।

দধীচি ছিলেন ঋষি। "ঋষি" [ঋষ্ (গমন করা) + ই কিম্বা দৃশ্ (দর্শন করা) + ই] কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করলে আমরা পাই "গতিশীল" বা "দ্রষ্টা"। সূর্য্য গতিশীল, সূর্য্য বিশ্বদ্রষ্টা। সূর্য্য কি ঋষি ন'ন ?

ভাগবতে দধীচিকে "অশ্বশির" বলে বর্ণনা করা হয়েছে,

"মঘবন্ যাত ভদ্রং বো দধ্যঞ্চমৃষিসত্তমং।
বিদ্যাব্রত তপঃসারং গাত্রং যাচতমাচিরং॥
স বা অধিগতো দধ্যঙ্ ঙশ্বিভ্যাং ব্রহ্ম-নিষ্কলং।
যদ্বা অশ্বশিরো নাম তয়োরমরতাং ব্যধাৎ॥"

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জনক সূর্য্যের অশ্বরূপে উত্তর-কুরুবর্ষচারিণী অশ্বিনীরূপা সংজ্ঞাসঙ্গমের কথা পুরাণে আছে। এখানেও দেখা যাচ্ছে দধীচি অশ্ব মস্তকের সাহায্যে অশ্বী বা অশ্বিনীকুমার দু'জনকে বিদ্যাদান করেছিলেন, তাই তিনি অশ্বশির।"

এখন দেখা যাক "অশ্ব" কথাটির ব্যুৎপত্তিগত মানে কি হয়। "অশ্ব" [= অশ্ + ব] অর্থ "বেগগামী" হয়। আলোক-রশ্মির বেগগামিত্ব প্রসিদ্ধ। সূর্য্যকে কি "অশ্বশির" বলা অসঙ্গত ?

দধীচির অস্থি নিয়ে বিশ্বকর্ম্মা 'বজ্র' নির্ম্মাণ করেছিলেন। বিশ্বকর্ম্মা যে কে সে পরিচয় আগে পাওয়া গেছে। এখন দেখা যাক্ বজ্র কি ?

"বজ্র" [= (গমন করা) + র] আকাশগামী। এর অন্য নাম "কুলিশ" [= কুলি (হস্ত, কর) + শ (= শী, শয়ন করা) + অ] যা হস্তে বা করে থাকে। "বজ্র" কি "সূর্য্য = কর" (কিরণ) ? এ কথা মেনে নিতে যদি পূর্ব্বসংস্কারে বাধে, তবে সমস্ত প্রকার শক্তির আধার সূর্য্য কিরণের সঙ্গে বজ্রের সম্বন্ধ আছে বলা বোধ হয় অন্যায় হবে না, কারণ 'বজ্র' একটা শক্তির বিকাশ মাত্র।

এবার একটা প্রাকৃত-লীলার কল্পনা করা যাক্। অবিশ্রান্ত তুমুল ঝড়। মেঘে মেঘে আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। ঝঞ্জার বেগ বৃক্ষশাখায় প্রতিহত হয়ে একটা একটানা রুদ্র কোলাহলের সৃষ্টি করেছে। বনস্পতিরা পাতায় পাতায় হাততালি বাজিয়ে সে কোলাহলে যোগ দিয়েছে। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎসঞ্চার,—মুহুর্মুহু বজ্রনিনাদ। সারা সৃষ্টি জুড়ে একটা চঞ্চলতা জেগে উঠেছে। বিশ্বময় একটা উদ্দাম উন্মত্ত কোলাহল।

বর্ষণ সুরু হ'ল। ঝড় তেমনি অপ্রতিহত বেগে ভীতিজনক বিষাণনিনাদ করে বয়ে চলেছে। বায়ুচালিত জলকণা তীব্র বেগে শরীরের উপর এসে পড়েছে, যেন তীরের ফলার মত গায়ে বিঁধে যাচ্ছে। প্রভঞ্জনের অসহ্য

বিক্রমে বৃক্ষশাখা ভেঙে পড়েছে। মনটা সন্ত্রস্ত। এমনি চলল সারারাত। প্রকৃতির এই ভীমকান্ত লীলা উপভোগ করতে করতে একটা যুদ্ধের কল্পনা মনে আসা অসম্ভব নয়।

পরদিন প্রভাতে। ঝড় বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশে মেঘজাল ছিন্ন করে সূর্য্যের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ আত্মপ্রকাশ করেছে। পবনে সে উদ্দাম চঞ্চলতা আর নেই। বর্ষণধৌতা প্রকৃতির মুখে একটা অবসন্নতা শ্রী।

বৃত্রঘ্ন বাসব আর মেঘ-তমোহন্তা ভাস্কর এক ন'ন কি?

আরো একটা কথা। ত্বষ্টার যজ্ঞাগ্নি থেকে বৃত্রাসুরের উৎপত্তি হয়েছিল। "ত্বষ্টা" নাম সূর্য্যেরও আছে। সূর্য্যের সঙ্গে মেঘের সম্বন্ধের কথা সকলেই জানেন।

(গ)

ইন্দ্রের একটা কলঙ্ক আছে। তিনি গুরুপত্নী গৌতমী অহল্যাকে গৌতমের ছদ্মবেশে হরণ করেছিলেন।

সূর্য্য আপাতদৃষ্টিতে গতিশীল, তাই তিনি গোতম বা গৌতম [=গো, গৌ+তম=গো শ্রেষ্ঠ]। "গৌতম" স্ত্রীলিঙ্গে "গৌতমী" হয়। গতিশীলা পৃথিবী তাই গৌতমী।

আবার "অহল্যা" [ন+হল+যৎ] শব্দে অকর্ষিত ভূমিকে বোঝায়। স্ত্রীলিঙ্গে অহল্যা। তাহ'লে অহল্যা গৌতমী পৃথিবী হয়েই আমাদের দেখা দেন।

জল বর্ষণ করেন ব'লে ইন্দ্রের এবং মেঘেরও নাম বৃষা বা বৃষ [=বৃষ্+অন্]। বৃষ গো-শ্রেষ্ঠ অতএব গৌতম। এবার বোধহয় গৌতম-বেশী ইন্দ্রকে আমরা চিনতে পারব।

গৌতমের ছদ্মবেশে ইন্দ্র অহল্যা গৌতমীর শরীরে জল বর্ষণ করলেন। ক্রুদ্ধ গৌতমের শাপে ইন্দ্রের মেঘ-শরীর বিদীর্ণ হয়ে সারা দেহে ভগ-চিহ্ন প্রকাশ পেল। যখন গৌতমের ক্রোধ প্রশমিত হ'ল তখন তিনি কর-সংবরণ করে অস্তাচলে চলে পড়েছেন। মেঘ উড়ে গেছে। আকাশের নীল দেহে সহস্র তারা ফুটে উঠেছে—ইন্দ্র সহস্রলোচন।

(ঘ)

ইন্দ্রের "পাকশাসন" উপাধির সম্বন্ধে বামন-পুরাণে বলা হয়েছে ;—

"পাকং জঘান তীক্ষ্ণাগ্রৈঃ মার্গণৈঃ কঙ্কবায়সৈঃ।
তত্র নাম বিভুর্লেভে শাসনত্বাচ্ছরৈর্দৃঢ়ৈঃ॥
পাকশাসনতাং শক্রঃ সর্ব্বামর-পতির্বিভুঃ॥"

স্থূলতঃ এর মানে হয়, ইন্দ্র তীক্ষ্ণাগ্র শরের দ্বারা পাক নামক অসুরকে সংহার করে পাকশাসন উপাধি পেয়েছেন।

কিন্তু পাক অর্থে পেচকও হয় শব্দরত্নাবলীর মতে। ঐ দু'টি শব্দই পচ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন।

আগে আমরা 'অসুর' অর্থে সূর্য্য-বিদ্বেষী করেছি। পেচক সূর্য্য-বিদ্বেষী, সুতরাং অসুর। মার্গণ কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অন্বেষণকারী।

"কঙ্কবায়সৈঃ" কথাটি দ্বন্দ্বসমাসের সাহায্যে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় "কঙ্কাশ্চ বায়সাশ্চ কঙ্কবায়সাঃ, তৈঃ—কঙ্কবায়সৈঃ।"

"বিভু" এবং "শক্র" নাম দু'টির ওপর সূর্য্যের যথেষ্ট দাবী আছে।

তা'হলে পাকশাসন কে?

(ঙ)

ইন্দ্রের একটা নাম হরি-হয়। ইন্দ্ররথের অশ্বদের আমরা দেখিনি। সুতরাং তাদের বর্ণ কি বলা যায় না। সূর্য্যেরও নাম তাই। "হরি" কথাটার মানে এক্ষেত্রে সাধারণতঃ 'সবুজ' করা হয়। কিন্তু (মানুষের হৃদয়) হরণ করে বলে রশ্মির এক নাম হরি [=হৃ (হরণ করা)+ই]। সূর্য্যের রথে আমরা কেবলি সবুজ অশ্ব দেখিতে পাই না, বরং আমরা এই রশ্মিরূপী অশ্বদেরই দেখি।

সূর্য্যকে হরিদশ্ব [=হরিৎ+অশ্ব] ও বলা হয়। গ্রীক দেবতা Helius এর [সংস্কৃত হেলিঃ—সূর্য্য] রথাশ্বদের Charites। ইন্দ্র রথ-বাহী অশ্বেরাও 'হরিৎ' নামে আখ্যাত।

এখানেও আমরা ইন্দ্র এবং সূর্য্যকে অভিন্নরূপে দেখতে পাই।

পুরাণের সূর্য্যের বহুরূপকে এক করে সমস্ত পৌরাণিক কাহিনীর মূলে কি পাওয়া যাবে কে জানে? তাই বলে পুরাণের ঐতিহাসিকত্ব বা রূপকত্ব অস্বীকার করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

পুরাণের সমস্ত গল্প খুঁটিয়ে দেখলে হয়ত এই ধরণের আরো অনেক কথা পাওয়া যাবে কিন্তু এ প্রবন্ধে এই পর্য্যন্ত।



প্রবাসী-ভাদ্র—১৩৩৮

এ সংখ্যায় ছোট গল্প আছে চারিটী।

প্রথম গল্প শ্রীফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের "সংসার স্রোতে।" গল্পটির মধ্যে ছোট একটু প্লট আছে,—সেটুকু মন্দ লাগে না। দুই বন্ধু; একজন ধনী আর একজন নিতান্ত দরিদ্র। কিন্তু ছাত্র হিসাবে সে ধনী বন্ধু অপেক্ষা যথেষ্ট মেধাবী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিধারীও। তাহার পিতা সামান্য চাকুরী করে; ঘরে ভাই ভগ্নীর সংখ্যাও অনেকগুলি এবং তাহা ক্রম বর্দ্ধমান। দারিদ্র্যনিপীড়িত সংসারের দস্তুরমত তাহাদের সংসারে কেবল অভাবের হাহাকারই বাজে না। রোগ-মৃত্যুর নির্ম্মম লীলাও চলে। সে কোনদিক দিয়াই ইহা ফিরাইতে পারে না। অবশেষে অভাবের তাড়নায় একদিন তাহাকে পড়াশুনাও ছাড়িয়া দিতে হয়। এ সংবাদে তাহার ধনী বন্ধু নিজের ভগ্নীটির জন্য তাহাকে গৃহ শিক্ষক পদে নিযুক্ত করিয়া প্রকারান্তরে সাহায্যের চেষ্টা করিলে, তাহার আত্মমর্য্যাদায় আঘাত লাগে। বন্ধুর সাহায্য সে প্রত্যাখ্যান করে। তাহার তখন আশা ছিল বিপুল, আকাঙ্ক্ষা ছিল উচ্চ।

ইহার পর, তাহার জীবনে আর একটী পর্ব্বের সূত্রপাত। দীন, দরিদ্র সে সামান্য পঁচিশ টাকা মাহিনার চাকরীর উপর নির্ভর করিয়া মাতার অনুরোধে, তাঁহার সাধ আহ্লাদ পূরাইতে এবং গৃহ কর্ম্মের ক্লেশ লাঘব করিতে বিবাহ করে। ইহার মধ্যে অবশ্য নূতনত্ব কিছু নাই। আমাদের দেশে এরূপ প্রায় সকল গৃহস্থের ঘরেই সংঘটিত হইতেছে। এই নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপারটিকে অতি সুহজভাবে গল্পটির মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া লেখক আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শটিকে চমৎকার আঁকিয়াছেন। যাহাহউক, কালক্রমে সংসারস্রোতাবেগে ভাসিতে ভাসিতে এই দম্পতী পুত্র-কলত্র পরিবৃত ও যথারীতি দারিদ্র্যক্লিষ্ট হয় এবং যৌবনে যে বন্ধুর সাহায্য একদিন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহারই সাহায্য লাভ করিয়া স্বামী-স্ত্রী বিষম উৎফুল্ল হইয়া উঠে!

গল্পটির মধ্যে কারুণ্য শ্লেষ ও Irony আছে। তাহা বেশ উপভোগ্য; কিন্তু উপসংহারটুকু অতি হাল্কা, এত হাল্কা যে মনে হয় লেখক দরিদ্র বন্ধুটিকে বুঝি উপহাস করিতেছেন। বস্তুতঃ তাহা গল্পের উদ্দেশ্য নহে। তবে ইহাকে শক্তির অভাবই বলিব কি? শেষে রক্ষা না করিলে সব রস ও মাধুর্য্য বিশ্রী লাগে।

ভাষা বেশ মিঠা—তাহাতে একটা সহজ গতি আছে।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীমনোজ বাসুর "রাজা।"

এই গল্পটিও একটী দরিদ্রের সংসার লইয়া; তবে ইহাতে মনোবিশ্লেষণের ঘটা আছে। আর আছে কতকগুলি গ্রাম্য চরিত্র। সেগুলি বেশ লাগে—মানুষগুলি কাল্পনিক নহে, নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু গল্পটিতে পল্লীর শ্রী তাহাদের আওতায় ঢাকা পড়িয়াছে।

এই গল্পটিরও একেবারে শেষের দিকটা ভাল লাগে না। কর্ম্মচ্যুত সুধীরের স্বীয় প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া গৃহে আগমন এবং গৃহের সকলের—পিতা, মাতা, স্ত্রী—ও গ্রামশুদ্ধ লোকের প্রার্থনার বেলায় স্ত্রীর উদ্দেশ্যে পত্রে নিতান্ত Cynic এর মত প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া সেইদিন রাত্রেই গোপনে পলায়নের মধ্যে বিসদৃশ কৌতুক আছে। তাহার পিতার মুখ দিয়া পরদিন লোকের কাছে একটা মিথ্যা কৈফিয়ৎ দেওয়াতেও সেটুকু দূর হয় নাই।

তৃতীয় গল্প শ্রীঅমূল্যকুমার দাস গুপ্তের "ইকনমিক্‌স্ প্রাক্‌টিক্যাল্।" পাদটীকায় ইহার জাতি পরিচয় আছে—"ইংরাজী গল্প অবলম্বনে।" গল্পটি ভালই—পাঠে আনন্দ পাওয়া যায়।

—গল্পটীর বিষয় ছাগল-পোষা * * * বাড়ীতে কয়েকটা ছাগল থাকিলে, বাড়ির আশ-পাশের জঙ্গল সাফ করা, বাগানের ঘাস ছাটা প্রভৃতি খরচ অতি সহজে বাঁচিয়া যায়। ইত্যাদি……কিন্তু দুইটী ছাগল পুষিয়া এই খরচ বাঁচাইতে গিয়া গৃহস্বামীকে যে মনকষ্ট ও আর্থিক ক্ষতি ভোগ করিতে হয়, তাহা প্রভূত। গল্পটির মধ্যে হাস্যরসের উপাদান যথেষ্ট আছে।

চতুর্থ গল্প শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবীর "মা-হারা।" গল্পের পরিবর্ত্তে উচ্ছ্বাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এ সংখ্যায় রঙিন ছবি আছে তিন খানি। প্রথম ছবি শ্রীজহর সেনের "সাঁওতাল নৃত্য"। বর্ণবিন্যাসে ও নৃত্য ভঙ্গীমায় ছবিখানি বেশ লাগে। চমৎকার একটা সুষমা আছে। দ্বিতীয় ছবি শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভোজ্য"। অজাপুত্র নিঃসঙ্কোচে তাহার নিষ্ঠুর লালয়িতার হাত হইতে দানা খাইতেছে আর পালয়িতা শাণিত ছুরিকা উন্মুক্ত করিয়া ভোজের চিন্তায় মগ্ন। তেমন ভাল লাগিল না।

তৃতীয় ছবি শ্রীসুধীরঞ্জন খাস্তগিরের "অমানিশায় অর্ঘ্য।" ছবিখানিতে একটা চমৎকার ভাব আছে—শত প্রদীপ জ্বালিয়া অমানিশার তমসা দূর করিবার প্রচেষ্টা টুকু চমৎকার বৈকি।

ভারতবর্ষ—ভাদ্র—১৩৩৮

এ সংখ্যায় ছোট গল্প দুইটি, ছোট্ট গল্প একটা ও "এক দৃশ্যের" নাটক আছে একটা।

প্রথম গল্প—এইটাই ছোট্ট গল্প—শ্রীসলিল চট্টোপাধ্যায়ের "চঞ্চলা।" এক সুন্দরী দরিদ্র গৃহস্থ বধূকে লইয়া গল্প। মনোবিশ্লেষণের প্রচেষ্টা আছে—কিন্তু পড়িতে পড়িতে মনে হয় গল্পটি সাড়ী পরা বিলাতি বিবির মত—বিলাতি। যেন মনে হয়, সাজ সজ্জায়ও ইহার "জাত"—মারা যায় নাই। ইহাতে বিশেষ ক্ষতি ছিল না, কিন্তু গল্পটিতে আড়ষ্ট ভাব আছে—পড়িয়া আনন্দ পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া রচনাটির আর একটা বিশেষ দোষ ক্রিয়াগুলিকে কখনও ব্যবহার করা হইয়াছে কথ্য ভাষা, কখনও সাধু ভাষা। সর্ব্বনামগুলিও স্থানে স্থানে এই দোষে দুষ্ট। এরূপ হইবার কারণ, form এর প্রতি দৃষ্টির অভাব। শ্রীহীন ভাষা পাঠক, এমন কি লেখককেও, না দেয় আনন্দ, না পায় সম্মান। ভাষার লালিত্য, ছন্দ, বেগ ও সংযম না থাকিলে সমগ্র রচনাটিই ব্যর্থ হইয়া যায়।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এলের "—চ—বৈ—তু—হি—"

"বিলাতী ছাপ দেখিয়া সাধারণ একটা পাথরকে সে কোহিনুর ভাবিয়াছে, কিন্তু আসল একটা মাণিককে ভারতের মাটীতে পড়িয়াছিল বলিয়া পরের মত সে অবহেলা করিয়াছে।" ইহাই গল্পটির ভিতরের কথা। এবং কথা কয়টিকে বলিতে একটা নিতান্ত সাধারণ প্লট খাড়া করা হইয়াছে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কথা কয়টি বলাই হইয়াছে, তাহার একটু ছাপও পাঠকের মনে পড়িবার সম্ভাবনা নাই। তবে গল্পটি আগাগোড়া না জমিলেও নামটির মত একেবারে—চ বৈ-তু-হি নয়।

তৃতীয় গল্প শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "অনাদৃত" প্লটটি বেশ;—মাঝ হইতে শেষ অবধি জমিয়াছেও ভাল। স্থানে স্থানে প্রকাশ ভঙ্গীমা তারিফ করিবার মত। কোথাও রূপ বা রসের অভাব তেমন বাজে না। গল্পটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

"অতি শৈশবে শতদল ও মমতার বিবাহ হয়। শতদলের পিতার সাধ ছিল ঘরে একটা "ছোট্ট" বধূ আনেন। ইহাতে সে পথটি প্রস্তুত হইলেও প্রধান বাধা দিলেন মমতার পিতা! তিনি আবার কন্যা নিতান্ত বালিকা বলিয়া তাহাকে শ্বশুর-গৃহে পাঠান না। অবশ্য কন্যার পিতার পক্ষে এরূপ ধৃষ্টতা বিরল; কিন্তু এর কন্যার পিতা "বিরল-সংখ্যার" একজন। এই অস্বাভাবিক কার্য্যটি তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিলেও মমতার জীবনে বিধানমত বিষময় হইয়া ওঠে। তাহার শ্বশুর আর তাহাকে পুত্রের জন্য গ্রহণ করেন না। তাহার পর বহু বৎসর কাটিয়া যায়। সুদূর শৈশবের এই ব্যাপারটি একটা আবছায়া স্বপ্নে রূপান্তরিত হইয়া শতদল ও মমতার মনের এক কোণে লাগিয়া থাকে মাত্র। মমতা বোর্ডিংয়ে থাকিয়া পড়া-শুনা করে। তারপর শতদল যখন কৃতবিদ্য ও উপার্জনক্ষম তখন পিতা রেবার সহিত আবার তাহার বিবাহ দেন। রেবা ও মমতা ছিল দুই সখী; দুইজনে

একই স্কুলে পড়িত। কিন্তু রেবার বিবাহের পর সে আসিতে পারে নাই। সখীর বরের সহিত সম্পর্কটুকু মিষ্ট। তাই মমতা গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী না।—সখীর বরকে দেখিতে আসে। তখন সে দেহে পরিপুষ্ট। যথারীতি শতদলের সহিত তাহার আলাপ। ক্রমে সেই আলাপ প্রেম ও পরিচয়ে একদিন সহসা অভিব্যক্ত হইয়া মমতা, রেবা ও শতদলের জীবনে জ্বালিয়া দেয়।" ইহাই গল্পটির সার।

কিন্তু গল্পটির দুই এক যায়গায় একটু একঘেয়ে ভাব আছে যেমন—

"শতদল বল্লে—সুন্দর" যে তাকে চিরদিনই ভাল লাগে।

মমতা বল্লে—"চুপ, চুপ—এমন কথা বলবেন না। জানি আপনারা খুব খোষামোদ করতে পারেন কিন্তু সে খোষামোদের মূল্য যে কতটুকু তা আমরা যেমন বুঝি, তেমন আপনারা বোঝেন না।" বাস্তবিকই, মমতার পক্ষে এই কথাগুলি বলিবার মত অভিজ্ঞ হইয়াছিল কি? সে বিবাহিতা হইলেও তাহার কৌমার্য কোনদিন নষ্ট হয় নাই, দাম্পত্য-জীবনের রসপাত্র প্রজাপতি একদিন তাহার জীবনে বহিয়া আনিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু তাহা রাখিয়া যান্ নাই।"

আর একটী কথা—শতদল রেবার কাছে কৈফিয়ৎ দিতেছে—"মমতা তোমার বহু পূর্ব্বে হয়েছিল। তবে শুকতারা রূপে উদয় হয়নি, হয়েছিল কেতুরূপে।" ধূমকেতু আসিয়া ক্ষণিক থাকিয়া চলিয়া যায়। বোধ করি অনবধানবশতঃ ঐ খাপছাড়া কথাটি বলা হইয়াছে।

২। "এক দৃশ্যের নাটকটি" রচনা করিয়াছেন শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ।

নাম—স্বর্গচ্যুত; বিষয়—প্রেম; কলিকাতা মহানগরীর ভিকটোরিয়া মেমোরিয়া দক্ষিণধারের সোপান-শ্রেণী; কাল ফাল্গুনের অপরাহ্ন; পাত্র-পাত্রী—একটী তরুণী, দুইটি তরুণ ও একটী লাঙ্গিত কুকুর। তরুণ দুইটি বন্ধু—তরুণটি উভয়েরই কাম্য। কিন্তু একটী তরুণ আর একটী তরুণের জন্য তরুণীর কাছে ঘটকালি করিতে গিয়া নিজেই তাহাকে বিলাতী কুকুরটির লাঙ্গুল আন্দোলনের মাঝে লাভ করিয়া জীবন ও হৃদয় পূর্ণ করে। কাজেই নাটকটি মিলনান্তক।

নাটকের প্রারম্ভে লেখা আছে অবশ্য পাত্র-পাত্রীর সংখ্যা তিন ও দৃশ্য একটী। কিন্তু হিসাবে দাঁড়ায় কুকুরটি ও একটী অচেনা আগন্তুককে লইয়া পাঁচ এবং দৃশ্য একটী "নয় কয়েকটি"—শেষেরটি জবর। মিলনের গ্রন্থী তখন নিবিড় ও কুকুরটির সমগ্র লেজটি নড়িতেছে ঘন ঘন! যাহা হউক, নাটকটি বেশ হইয়াছে তবে নামটা যেন কেমন বেমানান।

এ সংখ্যায় রঙিন্ ছবি আছে তিনখানি। প্রথম ছবি শ্রীযুক্ত মণিমোহন রায় চৌধুরীর—"বিজয়-সিংহ।" তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে একখানি ময়ূরপঙ্খী নৌকা—না সে কালের জাহাজ—পাল তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে লঙ্কার পথেই আর বিজয় সিংহ তাহার ডেকের উপর রেলিং ধরিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন একটুও টলিতেছেন না। ইহা অবশ্য শিল্পীর বাহাদুরী। বিজয় সিংহের চেহারা হইয়াছে রাত-জাগা সুপুরুষ অভিনেতার মত। আর জাহাজখানিকে যে ভাবে আঁকা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, তাহা বুঝি কেবল পদ্ম-বিলের মধ্যেই চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইত।

দ্বিতীয় ছবি শ্রীযুক্ত সারদা উকীলের "যশোদা দুলাল।" সুন্দর সৃষ্টি। যশোদা দুলালের একটী চমৎকার জীবন্ত শিল্প। এমন ছবি বহুদিন চোখে পড়ে নাই।

তৃতীয় ছবি শ্রীযুক্ত ত্রিভঙ্গ মুরারী রায়ের "বেহুলা" লখিন্দরকে লইয়া বেহুলা সুন্দরী ভেলায় স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছে। কিন্তু ছবি দেখিয়া মনে হয়, ভেলাখানি মরুভূমির তরঙ্গায়িত বালুকার উপর পাতা রহিয়াছে। লখিন্দর সুপুরুষ ছিলেন। কিন্তু ছবিতে দেখিতেছি, তিনি পাত্ কাঠির (প্যাকাটি) মাথায় বত্তি-বাটির আলু। তাঁহার পা হইতে গ্রীবা এত লম্বা! সাপে কাটায় সাপের মত আকৃতি হইয়াছে বুঝি? আর বেহুলা সুন্দরীর কব্জি হইতে আঙ্গুলের ডগের গঠন এমন কুৎসিৎ ছিল?—যেন সাপের ছানা মাথা ঠোকাঠুকি করিতে করিতে মাথাগুলি চ্যাটাইয়া চাপ হইয়া আছে।

বসুমতী—শ্রাবণ—১৩৩৮

বসুমতীর রসপিপাসু পাঠক-পাঠিকাগণের মনোরঞ্জনার্থে এ সংখ্যায় গল্প আছে পাঁচটি।

প্রথম গল্প শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের "অসম্পূর্ণ" একদিকে এক নিঃসঙ্গ কবিহৃদয় অপরদিকে কঠোর সংসার—এ দু'য়ের সামঞ্জস্য ঘটাইতে হইলে কবিকে ত্যাগ করিতে হইবে অনেকখানি এবং কেবলমাত্র কাব্যলোকের পথে পথে ঘুরিলে, কঠিন সংসারে বাস তাহার পক্ষে দুরূহ। ইহাই গল্পটির মর্ম্ম।

রঞ্জন স্বভাব কবি। শৈশব হইতে যৌবন অবধি নানা অবস্থার মধ্য দিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়া তাহার কবিহৃদয়ের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও তাহার চরিত্রের Evolution দেখা যায় না। গল্পটির গোড়ায় যে বাঁধনি ছিল মাঝ বরাবর আসিয়া, তাহা যেন আলগা হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে অত্যন্ত ফেনানো—বস্তুর অপেক্ষা বাক্যই বেশী। আর কথাগুলি বলিতে যে আখ্যানভাগের সাহায্য লওয়া হইয়াছে, তাহা অতি কষ্টকল্পিত ও বিচিত্র।

কিন্তু গল্পটির মধ্যে অনেকগুলি টুকরা কবিতা চমৎকার লাগে।

দ্বিতীয় গল্প শ্রীসত্যেন্দ্ররঞ্জন চৌধুরীর "নিমকহারাম।" গল্পটির নায়ক বসির মিয়া চরিত্রগুণের জন্য সকল সম্প্রদায়েরই প্রিয়; কেবল মন রাখিতে পারে নাই তাহার উৎপীড়নকারী জমীদারের। কিন্তু পরিশেষে তাঁহার জন্যই প্রাণ দিয়া সে নিমকের মান রাখিল ও জমীদারের মন পাইল। বসির জমীদারদের পক্ষে যে টুকরা বক্তৃতাগুলি দিয়াছে, তাহা শুনিলে অনেক জমীদারের প্রাণ শীতল হইয়া যাইবে। এমন প্রজা পাওয়া ভাগ্যের কথা। লেখক বোধকরি প্রজাগণকে বসিরের মত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। নিরক্ষর প্রজাদের যদি এই গল্পটা পড়িয়া শুনানো সম্ভব হইত! গল্পটিতে তো সাপ্তাহিক বসুমতীর এক ছিটা বিজ্ঞাপন আছে—তাহাতে ছাপাইয়া দিলে অবশ্য তাহাও সম্ভব।

যাহা হউক, গল্প সাহিত্য যাঁহাদের প্রিয়, গল্পটি তাঁহাদের ভাল লাগিতে পারে।

তৃতীয় গল্প শ্রীহরনাথ গুপ্তের "কালনিমে"; দ্বিতীয়টার পর্য্যায়ভুক্ত। তবে নামটা "জুয়াচোর সত্যেন্দ্র" দিলে বেমালুম মানাইত। আর "দৈনিক বসুমতী" যে দেশের সঠিক সংবাদ বহন করে, এ বিজ্ঞাপনটুকু গল্পটির মারফৎ না দিলেও শিক্ষিত বাঙ্গালী সে খবর রাখে। ইহাতেও যদি বিক্রয় বাড়ে, আমরা সে শুভ কামনা করি।

চতুর্থ গল্প শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের "ধাঁধার উত্তর।" গল্পটির গোড়ায় আছে বিরাট এক তর্কের আয়োজন—নারী প্রকৃতির পক্ষে ও বিপক্ষে। এই লইয়াই গল্পটার পরিণতি।

পঞ্চম গল্প শ্রীঅবেন্দ্র লাল মুখোপাধ্যায়ের "অপদার্থ"। সত্যই "অ-পদার্থ" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রচনা কৌশল ইহাতে কিছুমাত্র নাই।

এ সংখ্যায় রঙিন ছবি আছে তিনখানি।

প্রথম ছবি শ্রীসতীশ চন্দ্র সিংহের "স্মৃতির সুখ।" চোখ বুজিয়া একটী কানের দুল দু'হাতে ধরিয়া মেয়েটি কি সুখ পাইতেছে কে জানে। দেখিলে তো মনে হয়, দুলটি খুলিতে গিয়া লাগিতেছে। যন্ত্রণা লাঘবের জন্যই খিল্ খাইয়া খিল চুরী করিতেছে।

দ্বিতীয় ছবি শ্রীচারুচন্দ্র সেন গুপ্তের "বেদুইন—তরুণী।" ছবিখানি অত্যন্ত বিলাতি। তরুণীর দাঁতগুলি কিছু উঁচু। আর তাহার গায়ের জামা ও দু'হাতের অলঙ্কার গুলি এ দেশী। বেদুইন—তরুণীরা কি ঐ ধরণের পেট বাহির করা জামার Apology ও দু'হাতে অলঙ্কার পরে?

তৃতীয় ছবি বি, সিংহের "আয় চাঁদ আয়।" মাও ছেলে আর দূরে বনের আড়ালে পরিপূর্ণ চাঁদ। কিন্তু তাহারা চাঁদকে না ডাকিয়া বনের অন্ধকারের দিকেই হাত বাড়াইয়া ডাকিতেছে—আয় চাঁদ আয়। মাও ছেলের আকৃতি ও বেশ-ভূষা দেখিয়া মনে হয়, তাহারা পশ্চিমের লোক, যাহাদের আমরা বলি খোট্টা; সেই জন্য ছবির নীচে—"চাঁদ আওতানি হো—"লিখিলে বেশ হইত।

গল্প প্রতিযোগিতার ফল কার্ত্তিকের সংখ্যায় বাহির হইবে।

গ্রন্থ-পরিচয়

'পাঞ্চজন্য' শ্রীকনকলতা ঘোষ বাণী বিনোদিনী প্রণীত র বই। প্রাপ্তিস্থান বড় বড় পুস্তকালয়। মূল্যের উল্লেখ গ্রন্থে ২০টি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলির নাম—মানব একটি কথা, শিক্ষার প্রসার, জাতীয় উন্নতি, ভারতের ..., বাঙ্গালার নারী-সমস্যা, বর্জ্জন আন্দোলনে ভারতনারী, অর্থ সমস্যায় ধনী দরিদ্র, পথ নির্দ্দেশ, অভিশাপ না আশীর্ব্বাদ, বঙ্গ সাহিত্যের কয়েক দিক, দেশের মুক্তি সাধনায় নারী, পণপ্রথা, কি লিখি, মহাত্মা গান্ধী, কিমাশ্চর্য্যমতপরম্, কার্য্যে শক্তির সদ্ব্যবহার, মুক্তিপথের যাত্রী, কর্ত্তব্যের আহ্বান, ...ের সাধনা। প্রবন্ধগুলিতে অযথা পাণ্ডিত্য দেখাইবার প্রয়াস নাই, বলিবার ঘোর-প্যাঁচে জটিলও করিয়া তোলা হয় নাই কোথাও। ...র কথা, দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যক্ষ সত্যগুলিকেই সরল ভাষায়, আন্তরিকতার সহিত বলা হইয়াছে। বাংলার লেখিকাদের প্রবন্ধ-সংগ্রহ খুব কম আছে—পাঞ্চজন্য সে-দিক্ দিয়া উল্লেখ যোগ্য। লেখিকা আরম্ভে দু'লাইনে বলিয়াছেন—

> ধ্বনিল ন্যায়ের 'পাঞ্চজন্য' আজি সমগ্র ভারতময়,
> অন্যায় যত হবে বিলুপ্ত—লভিবে ভারত ন্যায়ের জয়।

তাঁহার লেখার প্রতি ছত্রেও ন্যায়ের প্রতি তেমনি নিষ্ঠা আছে। নারী সম্পর্কীয় লেখাগুলি বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য—ইহাতে আধুনিক বা বিগত কোন যুগেরই অতি উপসর্গ নাই—অথচ বেশ সংযতভাবে ...দের সম্মুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা আছে। গ্রন্থে বানান ভুল রহিয়াছে প্রচুর, পদ-বিন্যাসেও কোথাও কোথাও গোলমাল আছে। ...নি ভাল করিয়া দেখিয়া বাহির করিলে বা যোগ্য কোন লোককে দেখাইয়া লইলে এ ত্রুটি থাকিত না।

'ব্যথার বাঁশী'—শ্রীমতী সুরতকুমারী দেবী রচিত কবিতার বই। দাম এক টাকা। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। গ্রন্থে ছোট ছোট ১৬২টি কবিতা আছে। অধিকাংশ ভক্তিমূলক ...রে লেখিকা লিখিয়াছেন—

> যাহা মনে আসে লিখে যাই তাই, ধরিও না কোন ছল।
> লিখার সহিত আছে যে মিশায়ে আমার নয়ন জল॥

গ্রন্থের ছাপা, কাগজ ভাল।

'মাধবিকা'—শ্রীদেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, রচিত কবিতার বই। মূল্য সাত আনা। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। গ্রন্থে লেখকের ২৮টি কবিতা আছে। মাধবিকার ২৮টি কবিতায় বেশ কবিত্ব আছে। সবগুলিরই ভাব উচ্চ। দেবপ্রসন্ন বাবুর হাত ভাল—প্রাণেও কবিত্ব আছে—তাঁহার সাধনাও তারিফ্ করিতে হয়। মাধবিকার কবিকে আমরা সাদরে বাংলার কবি-কুঞ্জে বরণ করিতেছি। —ডাঃ বঃ

'সরলআয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সংহিতা'—কবিরাজ শ্রীদুর্গাদাস গুপ্ত রায় প্রণীত, দাম একটাকা। এই গ্রন্থে স্বাস্থ্য-নিয়ম, নানা ঔষধ, টোটকা ঔষধ ও খাদ্য দ্রব্যাদির গুণাগুণ লিখিত হইয়াছে। এ ধরণের আরো পুস্তক দেখিয়াছি মনে হয়, বইখানি সু-সম্বদ্ধ মনে হইল। অনেক জানিবার বিষয় ইহাতে আছে। যাহারা স্বাস্থ্য ও খাদ্যাদি বিষয়ে কিছুমাত্র চর্চ্চা করেন তাঁহারা বইখানি পড়িয়া দেখিতে পারেন। ৭৯, নিমতলা ষ্ট্রীট হইতে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। অঃ প্রঃ

'হেঁয়ালি'—অমরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি এল, প্রণীত ও কালীঘাট বিপুল সাহিত্য ভবন হইতে প্রকাশিত। অ্যান্টিকে ছাপা, ১৬০পৃষ্ঠা—মূল্য ১৷০ আনা। বইখানি ছয়টী ছোট গল্পের সমষ্টি। প্রত্যেক গল্পই এক একটী নিখুঁৎ ছবি; কোনখানেই রংয়ে বা রেখায় ধ্যাবড়া হোয়ে যায় নি। লেখকের লেখার ধারার মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য আছে, যাহা প্রকৃতের পথেও চলেছে অথচ বিকট কিম্ভুত-কিমাকার হোয়ে ওঠে নি। সুতরাং নির্ভয়ে বাড়ীতে সুখে পড়া চলে। ইহার প্রত্যেক গল্পই কোন না কোন প্রথম শ্রেণীর মাসিকে প্রকাশিত হোয়েচে। হেঁয়ালির মধ্যে কোনখানেই যে হেঁয়ালি নেই, বরং সর্ব্বত্রই সুস্পষ্ট, সুশ্রী ও স্বচ্ছন্দগতি, ইহা বড়ই আনন্দের কথা। গ্রন্থের বাহ্য-সৌষ্ঠব উচ্চাঙ্গের। কিন্তু টাইটেল পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের শ্রী-হীন নাম দেখে প্রীতিলাভ করতে পারলুম না। অঃ শুঃ

পত্রিকা পরিচয়

উত্তরা ঃ—কাশী হইতে প্রকাশিত প্রবাসী বাঙ্গালীর মুখপত্র। সম্পাদক শ্রীসুরেশপ্রসাদ সেন ও শ্রী... চক্রবর্ত্তী। মাঝে উত্তরা প্রেসের গোলযোগে অনিয়মিত হইয়াছিল—এইবার চারি সংখ্যা একত্র বাহির করিয়া নিয়মিত হইয়াছে। উত্তরার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে—অনেক বিখ্যাত লেখকও লিখিয়া থাকেন। আশা করি নিয়মিত হইয়া উত্তরা আরো ভাল চলিবে।

বিচিত্রা ঃ—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। মাঝে মাঝে হস্ত পরিবর্ত্তনে বিচিত্রার প্রথমকার শ্রী না থাকিলেও উহাতে অনেক উল্লেখযোগ্য লেখা বাহির হইয়া থাকে।

বাংলার নৃশংস তাণ্ডব

রবীন্দ্রনাথের আবেদন

বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে সম্প্রতি যে নৃশংস অত্যাচার-উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হইতেছে, ঐ সম্বন্ধে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্নোক্তমর্ম্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানে পর পর যে সকল নৃশংস অত্যাচার-উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হইতেছে, উহা কেবল যে আমাদিগকে দুঃখিতই করিয়াছে তাহা নহে, অসহনীয় লজ্জার বোঝাও আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছে। ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা ছিল, এই সকল অত্যাচার-উৎপীড়নে তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বার বার অনায়াসে গ্রামের পর গ্রামে, সহরের পর সহরে এই সকল নৃশংসতার অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ সরকারের নৈতিক মর্য্যাদা অতিমাত্রায় আহত হইয়াছে।

কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যেরই কোন দল বিশেষকে যখন আমরা আমাদেরই মধ্যে বিদ্বেষের আগুন উস্কাইয়া তুলিতে ও আমাদের জাতীয় ইতিহাসকে চিরদিনের মত কলঙ্কিত করিতে দেখি, তখন লজ্জায় সঙ্কোচে আমরা নির্ব্বাক হইয়া পড়ি। এতৎসম্পর্কে আমি সমবেত চেষ্টাদ্বারা নিজদিগকে রক্ষা করিবার কার্য্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে বলিতে ইহাই বুঝাইতে চাই যে, একটি কার্য্যতৎপর নীতিসঙ্ঘ গঠন করিয়া আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। উত্তেজনা-অন্ধ আত্মঘাতীদল এই সকল নৃশংস অত্যাচার উৎপীড়ন দ্বারা আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়েরই—অত্যাচারী ও অত্যাচারিত সকলের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকি। শান্তি ও সভ্যতার ভিত্তিমূল বিধ্বস্ত করিয়া থাকি।

বহু দূরে অবস্থিত এক দ্বীপের অধিবাসীর পক্ষে চিরকালের জন্য ভারতের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত রাখা সম্ভবপর হইবে না, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা ভারতীয় হিন্দু-মুসলমান একই দেশ-মাতৃকার সন্তান। চিরকাল পাশাপাশি বাস করিয়া এক সম্মিলিত রাজতন্ত্র গড়িয়া তুলিব, জয় পরাজয়ের সমান অংশ সমভাবে বাঁটিয়া লইব। এই নিদারুণ সঙ্কটমুহূর্ত্তে আমাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। সমস্ত সাধু মুসলমানগণকে তাঁহাদের মহান ধর্ম্মের নামে, তাঁহাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার নামে ও বিপন্ন মানব সমাজের নামে আমি আমাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া, যে পাপ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া আমাদিগের উন্নতির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় ডুবাইয়া দিয়া সমগ্র জগতের চক্ষে আমাদিগকে হীন ও উপহাসাস্পদ প্রতিপন্ন করিয়া ফেলিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে, উহার উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান হইতে অনুরোধ করিতেছি।
